সীরাতুল মুস্তফা সা.
সীরাতুল মুস্তফা ﷺ প্রথম খন্ড
সীরাতুল মুস্তফা ﷺ দ্বিতীয় খন্ড
সীরাতুল মুস্তফা ﷺ শেষ খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সূচিপত্র

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

প্রথম খণ্ড

মূল

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)

কালাম আযাদ অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সীরাতুল মুস্তফা (সা) (১ম খণ্ড)
মূল : হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)
কালাম আযাদ অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ২৪৯/১
ইফা প্রকাশনা ২১৭১/১
ইফা গ্রন্থাগার ২৯৭.৬৩
ISBN 984-06-0819-3

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৪১৭
রজব, ১৪৩১
জুন ২০১০

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
নূরুল ইসলাম মানিক
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ হালিম হোসেন খান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য ঃ ১১০.০০

SEERATUL MUSTAFA (SM) written by Hazrat Allama Idris Kandlavi (R.) in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Agargaon, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1207, Revised 2nd Edition June, 2010.

Website : w w w. islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@ islamicfoundation-bd.org

Price : Tk. 110,00 US Dollar : $ 3.25

সূচিপত্র

বরকতময় বাণী /১৩
গ্রন্থকারের ভূমিকা/১৫
পবিত্র নসবনামা/২৫
মাতার দিক থেকে বংশ লতিকা/২৯
যমযমের কূপ এবং আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন/৪০
আবদুল মুত্তালিবের মান্নত/৪২
হযরত আমিনার সাথে আবদুল্লাহর বিবাহ/৪৮
আসহাবে ফীল-এর ঘটনা/৫০
ইরহাস/৫২
শুভাগমন/৫৩
পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসেপড়া এবং সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যাওয়া/৫৭
আকীকা ও নামকরণ/৬২
উপনাম/৬৭
খাতনা/৬৭
লালন-পালন ও দুধপান/৬৮
মা হালিমা সাদিয়া/৬৯
বক্ষ বিদারণ/৭২
সার কথা/৭৬
বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য/৭৬
বক্ষ বিদারণের রহস্য/৭৭
বক্ষ বিদারণের পর মোহরে নবূওয়াত কেন লাগানো হলো/৮১
মোহরে নবূওয়াত কখন লাগানো হয়েছে/৮১
আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে/৮২
আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল/৮৩
আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে/৮৩
সিরিয়ায় প্রথম সফর এবং বাহীরা দরবেশের কাহিনী/৮৪
হাররবুল ফুজ্জার/৮৮
নবী করীম (সা)-এর হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ/৮৯
ব্যবসায় আত্মনিয়োগ এবং 'আমীন' উপাধি লাভ/৯০
নবী (সা) কর্তৃক বকরী চরান/৯১
সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর এবং নাস্তুরা দরবেশের সাথে সাক্ষাত/৯২
মায়সারার কিসসার সত্যতা যাচাই ও পর্যবেক্ষণ এবং
সীরাতের তিন ইমামের বর্ণনা ও এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত/৯৫

ওয়াকিদীর বর্ণনায় সীরাতুন-নবী (সা)/৯৯
সার কথা/১০০
হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ/১০২
কা'বাগৃহ নির্মাণ এবং নবী (সা)-এর সিদ্ধান্ত দান/১০৩
জাহিলী প্রথা থেকে আল্লাহ প্রদত্ত ঘৃণা ও অনীহা/১০৬
ওহীর সূচনা ও নবুয়াতের সুসংবাদ/১০৯
সার কথা/১১৩
ফারান পর্বতের চূড়া থেকে রিসালাতের সূর্যোদয়/১১৯
কাজের কথা/১১৯
সার সংক্ষেপ/১২৬
বড় কাজের কথা/১২৭
নবূয়াত লাভের তারিখ/১২৮
সূক্ষ্ম তত্ত্ব/১২৮
তাওহীদ ও রিসালতের পর সবচে' প্রথম ফরয/১৩৫
সর্ব প্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন/১৩৬
আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৩৭
হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪২
আফীফ কিন্দী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪২
হযরত তালহা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৩
হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৩
হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৩
হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৫
হযরত আম্মার ও হযরত সুহায়ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৯
হযরত আমর ইবন আবাসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৪৯
হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৫০
আরকামের গৃহে মুসলমানদের জমায়েত/১৫১
দাওয়াতের ঘোষণা/১৫২
ইসলামের দাওয়াত এবং ভোজের নিমন্ত্রণ/১৫২
বড়ই কাজের কথা/১৫৫
ইসলামের প্রচার প্রসার বন্ধ করার জন্য কুরায়শদের পরামর্শ/১৫৮
হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৬০
হযরত হামযা (রা)-এর ক্রোধ/১৬২
কুরায়শ সর্দারদের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার জন্য ধন-দওলত, বাদশাহী-নেতৃত্ব প্রদানের প্রলোভন ও হযরত (সা)-এর জবাব/১৬৩
সূরা কাফিরুন অবতরণ/১৬৬
মক্কার মুশরিকদের কিছু অর্থহীন ও বাজে প্রশ্ন/১৬৬

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান/১৬৮
ইয়াহূদী আলিমদের সাথে মক্কার কুরায়শদের পরামর্শ/১৭০
রূহ এবং নফস/১৭১
রূহ ও নফসের মধ্যে কি পার্থক্য/১৭৪
রূহের আকৃতি/১৭৭
কাফিরগণ কর্তৃক হযরত (সা)-কে কষ্ট দেয়া/১৭৭
হযরত যিমাদ ইবন সালাবা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৮২
বিশিষ্ট দুশমনবৃন্দ/১৮৩
আবূ জাহল ইবন হিশাম/১৮৫
আবূ লাহাব/১৮৬
উমায়্যা ইবন খাল্‌ফ জুমাহী/১৮৮
উবাই ইবন খাল্‌ফ/১৮৮
উকবা ইবন আবূ মুয়াইত/১৮৯
ওলীদ ইবন মুগীরা/১৯০
আবূ কায়স ইবন ফাকাহ/১৯২
অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলাম বিমুখ করা জাহিলী যুগের রীতি/১৯২
নাযর ইবন হারিস/১৯২
আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী/১৯৩
হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় নবীহ ও বনীহ/১৯৪
আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব/১৯৪
আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস/১৯৪
হারিস ইবন কায়স সাহমী/১৯৪
মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার/১৯৬
সালাত ও কল্যাণের জন্য আহ্বানকারী মুয়াযযিনদের ইমাম হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা)/১৯৭
হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)/১৯৮
হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা)/২০০
হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)/২০১
হযরত আবূ ফুকায়হা জুহানী (রা)/২০২
হযরত যানিরা (রা)/২০৩
চন্দ্র দ্বিখণ্ডিতকরণের মু'জিযা/২০৭
সূর্যের প্রত্যাবর্তন/২০৯
সূর্যের গতি থেমে যাওয়ার মু'জিযা/২১০
আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত/২১১
আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত/২১৩

সূচিপত্র

[৬]

নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রা)-এর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এবং নাজ্জাশীর উপর এর প্রভাব/২১৮
কুরায়শ প্রতিনিধির কাছে হযরত জা'ফর (রা)-এর তিনটি প্রশ্ন/২২২
হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, নবূয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষ/২২৫
বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র লিখন ও মুহাররম মাসের অমর্যাদা, নবূয়াতের সপ্তম বর্ষ/২৩০
হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরত/২৩৪
কল্যাণ কথা/২৩৬
দুঃখ ও বিষণ্ণতার বছর/২৩৬
আবূ তালিব এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরার ইনতিকাল/২৩৬
আবূ তালিব প্রসঙ্গ/২৩৮
সতর্ক বাণী/২৩৯
ইসলামের দাওয়াতদানের জন্য তায়েফ সফর/২৩৯
একটি জরুরী সতর্ক বাণী/২৪৩
তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং জিন্নদের উপস্থিতি/২৪৪
হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/২৪৬
কারামত প্রসঙ্গে/২৪৮
ইসরা ও মি'রাজ/২৪৯
সূক্ষ্ম কথা/২৫০
মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ/২৫১
বৈচিত্র্যময় সফর এবং আলমে মিসালের উপমাহীন নিদর্শন/২৫৩
পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ/২৫৬
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা/২৫৮
হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসা/২৫৮
হযরত দাঊদ (আ)-এর প্রশংসা/২৫৮
হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা/২৫৮
হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসা/২৫৯
হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা/২৫৯
আসমানে আরোহণ/২৬০
আলমে মালাকূত সফর এবং আসমানসমূহে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাত/২৬১
সিদরাতুল মুনতাহা/২৬৩
জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন/২৬৩
সরীফুল আকলামের স্থান/২৬৩
নৈকট্য ও সৌহার্দ্য, একান্তে প্রভার প্রকাশ, দর্শন, বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদান/২৬৪
সূর্য স্থিতকরণ/২৬৯
সূক্ষ্মতা, পরিচয়, গোপন রহস্য ও নির্দেশ/২৭০

মাসআলা/২৭৩
বিধর্মীদের আপত্তি ও এর জবাব/২৮১
জবাব/২৮১
হজ্জের মওসুমে ইসলামের দাওয়াত/২৮৩
হযরত আয়াস ইবন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ/২৮৫
মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামের সূচনা (১১শ নববী বর্ষ)/২৮৬
আনসারদের প্রথম বায়'আত (১২শ নববী বর্ষ)/২৮৭
হযরত রিফাআ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/২৮৯
মদীনা মুনাওয়ারায় জুমু'আর জামাআত/২৯০
আনসারদের দ্বিতীয় বায়'আত (১৩শ নববী বর্ষ)/২৯১
নকীব নির্বাচন/২৯৭
নকীবগণের নাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিন এবং তাঁদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করান যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত/২৯৭
বায়'আত কি/২৯৮
একটি জরুরী সতর্ক বাণী/২৯৯
মদীনায় হিজরত, আল্লাহ তাঁর নূরকে বর্ধিত করুন/৩০৩
দারুন নাদওয়ায় কুরায়শদের বৈঠক এবং রাসূল (সা)-কে হত্যা করার পরামর্শ/৩০৭
ফায়েদা/৩১০
ফায়েদা/৩১১
ফায়েদা/৩১২
ফায়েদা/৩১৩
সাওর গুহা/৩১৩
সতর্ক বাণী/৩১৫
সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা/৩১৬
দু'জনের দ্বিতীয়জন যখন তারা ছিলে গুহায়/৩১৮
তারা ছিলেন গুহায়/৩১৮
তার সাথীর জন্য/৩১৮
চিন্তিত হায়োনা/৩১৯
নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন/৩২১
আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি নাযিল করুন/৩২২
তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা যাকে তোমরা দেখনি/৩২৩
গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন/৩২৮
ফায়েদা/৩৩০
রওয়ানা হওয়ার তারিখ/৩৩০
হযরত উম্মে মা'বাদ (রা)-এর ঘটনা/৩৩১
সুরাকা ইবন মালিকের ঘটনা/৩৩৫
ফায়েদা/৩৩৬

বুরায়দা আসলামীর ঘটনা/৩৩৭
তাকওয়ার মসজিদ প্রতিষ্ঠা/৩৩৯
হিজরতের তারিখ/৩৪০
ইসলামী তারিখের সূচনা/৩৪০
খুতবাতুত-তাকওয়া (প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমু'আর নামায)/৩৪১
বনী নাজ্জারের বালিকাদের আবৃত্তি/৩৪৫
নবী (সা)-এর খিদমতে ইয়াহূদী আলিমদের উপস্থিতি/৩৪৯
হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/৩৫১
হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/৩৫৩
হযরত সালমান ইবন ইসলাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/৩৫৪
মসজিদে নববী নির্মাণ/৩৬০
পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য হুজরা নির্মাণ/৩৬৩
পবিত্র সহধর্মিণীগণের ইনতিকালের পর/৩৬৪
নবী-রাসূল (আ)গণের শেষ মসজিদ খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক সম্প্রসারণ/৩৬৫
জানাযা নামাযের স্থান/৩৬৬
মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন/৩৬৭
দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন/৩৬৯
আযানের সূচনা/৩৭২
তত্ত্ব ও দর্শন/৩৭৪
মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত স্মরণে/৩৭৮
নবী (সা)-এর কুবায় উপস্থিতি এবং সেখান থেকে মদীনায় আগমন/৩৭৯
মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি/৩৮২
সতর্ক বানী/৩৮৫
প্রথম হিজরী সনের বিভিন্ন ঘটনাবলী/৩৮৫
হযরত সারমা ইবন আবূ আনাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/৩৮৬
দ্বিতীয় হিজরী সন/৩৮৮
সুফফা ও সুফফার অধিবাসীগণ/৩৮৮
সুফফাবাসীগণের গুণাবলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)/৩৯৩
সুফফাবাসীগণের নাম/৩৯৪
রমযানের রোযা/৩৯৫
ফিতরা এবং ঈদের নামায/৩৯৬
ঈদুল আযহা এবং কুরবানী/৩৯৬
দরূদ শরীফ/৩৯৬
সম্পদের যাকাত/৩৯৬
গ্রন্থকার পরিচিতি/৩৯৯

মহাপরিচালকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে গোটা মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

মহানবী (সা)-এর জীবন এক মহাসমুদ্রের মত। তিনি যদিও পৃথিবীতে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের আলোচনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তবুও মানুষের জন্যে খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি একমাত্র তারই মাধ্যমে ঘটাতে তাঁর সীরাত বা জীবনী চর্চার প্রয়োজন বর্তমানে আরো অধিক।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই মহানবী (সা)-এর সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলা ভাষায়ই বিগত কয়েক শ' বছরে পাঁচ শ'-এর অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা.)' শিরোনামে এই প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন মুসলিম বিশ্বের সুবিখ্যাত আলিম শায়খুত তাফসীর আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (রহ.)। তিনি হাদীস ও তাফসীরের মূলগ্রন্থ সমূহে বর্ণিত সীরাত বিষয়ক সকল রিওয়ায়াত তুলে ধরেন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে উপস্থাপন করেন। আর এ কারণে আলিম উলামাসহ সর্ব স্তরের পাঠকের কাছে গ্রন্থটি বিপুল গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে আসছে। উর্দূ ভাষায় তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি প্রথম খণ্ড অনুবাদ করেছেন কালাম আযাদ। আমরা লেখক ও অনুবাদকসহ গ্রন্থটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় প্রকাশনা কে কবুল করুন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

পরিচালকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজগতের জন্য মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক অনন্য আশিস্—রাহ্মাতুল্লিল আলামীন। তাওহীদের আলোকময় বাণীর অবিনাশী ঝাণ্ডা নিয়ে তিনি অজ্ঞানান্ধ ও সত্যভ্রষ্ট মানুষকে আহ্বান করেন সত্যের পথে, কল্যাণের পথে; শান্তি, সাম্য, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পথে। আল্লাহ্র প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য, সততা-নিষ্ঠা, আমানতদারি— সর্বোপরি পরিপূর্ণ তাকওয়াসমৃদ্ধ কল্যাণকর এক আদর্শ মানব সমাজ গঠনে তাঁর অসাধারণ সাফল্য বিশ্ব ইতিহাসের শীর্ষতম স্থানে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রখ্যাত মনীষী এডওয়ার্ড গীবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন এন্ড দি ফল্ অব দি রোমান এম্পায়ার' নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"আরবীয় পয়গাম্বরের মেধা, তাঁর জাতির আচার-আচরণ এবং তাঁর ধর্মের প্রাণশক্তি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ এবং আমাদের দৃষ্টি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় একটি বিপ্লবের দিকে অভিনিবিষ্ট, যা বিশ্ব জাতিসমূহের ওপর এক নতুন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে। মহানবী (সা) বিশ্ব মানবের, বিশ্ব সমাজের ওপর 'সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী' এক মহান মানুষ মহান পয়গাম্বর।

মানবমুক্তির মহান দিশারী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আলোকোজ্জ্বল জীবনাদর্শ বিশ্ব মানবের সামনে অনির্বাণ প্রদীপ শিখার মতো যুগ যুগ ধরে পথনির্দেশনা দিয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষকে। সেই আদর্শ আজও যেমন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, ভবিষ্যতেও তেমনি নিজের অনন্য অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে চির প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অম্লান জীবনাদর্শ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে অগণিত সীরাত গ্রন্থ। আরবী, উর্দু, ফারসি, ইংরেজিসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় রচিত এ সকল সীরাত গ্রন্থ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বৈচিত্র্যধর্মী উপস্থাপনা-নৈপুণ্যে ভাস্বর এবং স্ব-বৈশিষ্ট্য স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ কারণে মহানবী (সা)-এর মহাসমুদ্রতুল্য জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হলে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিশিষ্ট আলিম ও লেখক কালাম আযাদ কর্তৃক অনূদিত প্রথম খণ্ডটি ২০০৪ সালে এ বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' বইটি যেমন তথ্য বহুল, তেমনি সুলিখিত ও সুঅনূদিত। এ কারণে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর দু'টি সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এটি পুনঃ সম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশাকরি, বইটি আগের মতোই পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে।

আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

নূরুল ইসলাম মানিক

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

প্রথম খণ্ড

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত কুতুবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আশরাফ আলী সাহেব থানভী (কু. সি.)-এর

বরকতময় বাণী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

.দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْحَكِيْمِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى نَبِيِّهٖ ذِىْ خُلُقٍ عَظِيْمٍ

"মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সমস্ত প্রশংসা এবং মহান চরিত্রের অধিকারী, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নেতা, নবী (সা)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম।"

অতঃপর আহকার আশরাফ আলী থানভীর আরয, এই 'সীরাতুল মুস্তফা' (সা) শীর্ষক গ্রন্থের নিম্নোক্ত অংশটি স্বয়ং বিজ্ঞ লেখক ইলম ও আমলের বিশেষ অধিকারী মৌলবী হাফিয ইদ্রিস আলী কান্ধলভী (র)-এর মুখ থেকে শুনেছি। শ্রবণ মুহূর্তে এ দৃশ্যই সামনে পুরোপুরি ভেসে উঠেছিল :

يَزِيْنُكَ وَجْهُهٗ حُسْنًا　　اذَا مَا زِنْتَهٗ نَظَرًا

"তার চেহারার সৌন্দর্য তোমার দ্বারা বৃদ্ধি পাবে, যখন তার প্রতি বেশি বেশি দৃষ্টিপাত করা হবে।"

অংশটি এরূপ প্রথম ভূমিকা, দ্বিতীয়, ওহী নাযিলের বর্ণনা, যাতে সৎ স্বপ্নকে নবূয়াতের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর তত্ত্ব তাৎপর্য; তৃতীয়, নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জা'ফর (রা)-এর ভাষণ, চতুর্থ, আসহাবে সুফফার বর্ণনা, পঞ্চম নবী-রাসূল (আ)-গণের নবূয়াত পদে ভূষিত হওয়ার পূর্বেও পূত-পবিত্র ও মাসূম থাকা প্রসঙ্গসহ জীবনী গ্রন্থের জন্য যত আবশ্যকীয় বিষয় প্রয়োজন, মা-শা আল্লাহ্, তা বিশেষভাবে পূর্ণ করা হয়েছে। তাঁকে আল্লাহ্ উত্তম প্রতিদান দান করুন।

কোন কোন স্থানে এ অধম হালকাভাবে কিছু পরামর্শও দিয়েছিল যা বিজ্ঞ সংকলক আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছেন—এটা তাঁর সুবিবেচনা ও একনিষ্ঠতার প্রকাশ্য প্রমাণ। গ্রন্থটির প্রতিটি অংশই এমন চিত্তাকর্ষক যে :

زفرق تابه قدم هر كجاكه مع نـگرم

كرشمه دامن دل مى كشد كـه جا ايں جاست

"আপাদ মস্তক যেখানেই তাকাই, কারিশমা অন্তরের আঁচল ধরে টেনে বলে, জায়গা এখানেই।"

যদি আমার সময় ও শক্তি থাকত তবে আমি এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনতাম; কিন্তু দুর্বলতা ও সময় সংকীর্ণতাহেতু এ ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি। আশা করি, কিতাবের বাকী অংশও ইনশা আল্লাহ্ وَ لَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (পূর্বের চেয়ে পরবর্তীই তোমার জন্য উত্তম)-এর নমুনা হবে।

অতঃপর আমি ঐ বিজ্ঞ লেখককে উদ্দেশ্য করেই এ বিষয়ের উপর একটি বিশেষ পরামর্শ, আর একটি সাধারণ পরামর্শ ও দু'আর দ্বারা আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিশেষ পরামর্শ হলো এই যে, উল্লিখিত বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে আমার احسن التفهيم لمقولته এর সায়্যেদুনা ইবরাহীম (আ)-এর বর্ণনা (যা ইমদাদুল ফাতাওয়ার অংশ হিসেবে এর পঞ্চম অধ্যায়ে পৃ. ৪০৮ থেকে ৪১২-তে মুদ্রিত হয়েছে) সঙ্গতিপূর্ণভাবে হুবহু বা সার-সংক্ষেপ এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া যায়—যা এক উত্তম সংযোজন হবে।

সাধারণ পরামর্শ হলো সার্বজনীনভাবে সাধারণ লোকদের জন্য, যারা উর্দূ ভাষায় সাধারণ জ্ঞান রাখেন, তারা যেন এ কিতাব পাঠ থেকে বঞ্চিত না হন। এর সবচেয়ে উত্তম ও সহজতম উপকারিতা হবে এই যে, নিজ শ্রদ্ধাস্পদ পয়গাম্বর (সা)-এর প্রয়োজনীয় পরিচিতি অর্জিত হবে। এতে করে সঙ্গতভাবে ওয়াদাকৃত জান্নাত আপনার নসীব হবে—আর এটা উত্তম নিয়ামত হওয়ার ব্যাপারে কি কারও দ্বিমত থাকতে পারে?

আর দু'আ হলো, আল্লাহ্ তা'আলা গ্রন্থটির লেখককে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য, পার্থিব ও পারলৌকিক বরকত দান করুন এবং এ গ্রন্থটিকে গ্রহণযোগ্য ও কল্যাণকর করুন। আমীন, ছুম্মা আমীন।

থানা ভবন, ৫ শাওয়াল, ১৩৫৮ হি. **আশরাফ আলী**

গ্রন্থকারের ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْاَ نْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَاَزْوَاجِه وَذُرِّيَّاتِه اَجْمَعِيْنَ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ও মুত্তাকীদের শেষ আশ্রয়। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা, আমাদের পরম অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে নবী-রাসূলগণের নবুয়াতী ধারার পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে আর দরূদ ও সালাম তাঁর সমস্ত সাহাবী, সহধর্মিণী ও বংশধরগণের প্রতি।"

আমি গুনাহ্গার মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলভী, (যে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এবং আল্লাহ্ যার জন্য যথেষ্ট) সকল শ্রেণীর মুসলমানের প্রতি আরয এই যে, কোন মুসলমানের জন্য নিজেকে জানা ততোটা আবশ্যকীয় নয়, যতোটা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানা আবশ্যক। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ রাসূল (সা)-কে জানে না, সে তার ঈমান ও ইসলামকে কিভাবে জানবে ? মু'মিন তার ঈমানী অস্তিত্বের জন্য সরাসরি পয়গাম্বরের অস্তিত্বের মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ মাফ করুন, যদি পয়গাম্বর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়া হয়, তবে এক মুহূর্তের জন্যও মু'মিনের ঈমানী অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকতে পারে না। এ কারণেই ইরশাদ হয়েছে :

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

অর্থাৎ "মু'মিনদের নিকট নবী তাদের আপন সত্তা অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর।"
(সূরা আহ্যাব : ৬)

কেননা মু'মিনের অস্তিত্ব নবুয়াতী সূর্যের একটি সাধারণ প্রতিচ্ছায়া, প্রতিবিম্ব। আর এটা স্পষ্ট যে, প্রতিবিম্বের মূল উৎস সূর্যের সাথে তার যেই নৈকট্য, আয়নার দ্বারা তা ঘনিষ্ঠ নয়। মু'মিনের নিকট যে ঈমান, তা নবীর মাধ্যমেই এসেছে। কাজেই বুঝা যায় ঈমান নবীর নিকটবর্তী আর মু'মিন থেকে দূরবর্তী। এটা এ জন্যে যে, নবী ঈমানের সাথে প্রকৃতিগতভাবে একীভূত আর মু'মিন ঈমানের সাথে মাধ্যম দ্বারা

সম্পৃক্ত। কাজেই মু'মিনের জন্য নিজেকে এবং নিজের ঈমানকে জানার আগে নবী (সা)-এর জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ অত্যাবশ্যক; যাতে সে নিজে ঐ পথে চলতে পারে এবং অপরকেও চলার আহ্বান জানাতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হূদ-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেরিত নবী-পয়গাম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। অবশেষে এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কেন নবী-পয়গাম্বর (আ)গণের অবস্থাদি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِىْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

"রাসূলগণের যে সমস্ত বৃত্তান্ত আপনার কাছে বর্ণনা করছি, এসব দ্বারা আমি আপনার চিত্তকে সুদৃঢ় করি, এ সবের মাধ্যমে আপনার কাছে সত্য এসেছে এবং মুমিনদের জন্য এসেছে উপদেশ ও সাবধান বাণী।" (সূরা হূদ : ১২০)

অর্থাৎ এসব ঘটনা অবহিত হয়ে যেন তোমরা (কুরআনে বর্ণিত) প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী হতে পারো, তোমাদের অন্তরে ঈমান স্থির ও প্রতিষ্ঠিত থাকে, সত্যের উপর থাকতে পারো অটল, অবিচল। আর এগুলো শুনে তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ লাভ হয়। বরং পবিত্র কুরআনের অনেক সূরাই নবীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে— যাঁদের জীবনধারাও সূরাগুলোতে আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস, সূরা হূদ, সূরা ইউসুফ, সূরা ইবরাহীম ইত্যাদি। আর সূরা লুকমান এবং সূরা কাহফ হযরত লুকমান (আ) ও আসহাবে কাহফের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এর দ্বারা অনুমিত হয় আম্বিয়া, উলামা ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জীবন বৃত্তান্ত ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রাখা কত জরুরী। জীবনী দ্বারা মহানবী (সা)-এর সুমহান মর্যাদা, ফযীলত ও কামালিয়ত সম্পর্কে জানা যাবে; আর সাথে সাথে রাসূল (সা)-এর সাহাবা (রা)-দের গুণাবলী ও কামালিয়াতও অবহিত হওয়া যাবে। এতে ঈমান শক্তিশালী হবে ও ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এ সাথে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত ও মহানবী (সা)-এর হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য জানা যাবে। যে ব্যক্তি ঈমান পোষণ করে না, এ জীবনী গ্রন্থ পাঠে তার সীরাতে নববী সম্পর্কে জ্ঞান হবে, ঈমান ও সত্যের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করবে। পূর্ববর্তী উম্মতগণ নিজেদের নবী এবং বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায় নিজেদের বড় বড় নেতাদের জীবনী ও ইতিহাস লিখেছেন কিন্তু সবই অসম্পূর্ণ। যে সব সম্প্রদায়ের অবস্থা এই যে, তারা যেই গ্রন্থকে আসমানী কিতাব ও মহান আল্লাহ্র বাণী বলে মনে করে সেটিও তাদের কাছে সংরক্ষিত নেই। আর তাদের এটাও জানা নেই যে, এ বাণী কার প্রতি নাযিল হয়েছে, কোথায় এবং কিভাবে নাযিল হয়েছে। তারা যাঁদেরকে আপন নেতা ও পথিকৃৎ বলে মনে করে, তাঁদের কবরের ঠিকানাও তাদের জানা নেই। এ সব সম্প্রদায় নিজেদের নেতার পরিপূর্ণ জীবনী ও ইতিহাস কিভাবে উপস্থাপন করবে? গোটা জীবনের ঘটনাবলী ও ইতিহাস তো অনেক বড় কথা, তারা তাদের

নেতাদের একটি বাণীও এভাবে উপস্থাপনে সক্ষম নয়, যার পরম্পরা বর্ণনা লতিকা প্রামাণ্য সূত্রসহ তাদের নেতা পর্যন্ত সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ্। এ মর্যাদা কেবল উম্মতে মুহাম্মদী (তাঁর ও তাঁর সাহাবা কিরামের প্রতি সহস্র দরূদ ও সালাম) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের পয়গম্বর (সা)-এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ সনদের মাধ্যমে উপস্থাপন করে থাকে। এরা কেবল এরাই এমন এক উম্মত, যারা নিজেদের নবীর সাথে সুসম্পর্কিত। নবী (সা)-এর যামানা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এক মুহূর্তও এমন কাটেনি, যে সময়টুকুতে নিজেদের নবী থেকে এ উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। মহানবী (সা)-এর প্রকৃত সীরাত তো হাদীসসমূহ। কিন্তু পূর্ববর্তী আলিমদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেবল ছোট-বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ ও এর ঘটনা সমষ্টিকেই সীরাত বলা হতো। মূলত আটটি জ্ঞানের সমষ্টি হচ্ছে হাদীস, আর সীরাত হচ্ছে এর একটি অংশমাত্র।

سیر آدب و تفسیر و عقاید   فتن اشراط و احکام و مناقب

"সীরাত, আদব, তাফসীর, আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম, মানাকিব।"

কিন্তু বর্তমানে 'সীরাত' শব্দ জীবন বৃত্তান্ত অর্থে আলাদা ব্যবহৃত।

মুহাদ্দিসগণ মহানবী (সা)-এর বাণী ও কর্মের বস্তুনিষ্ঠতা সহকারে প্রাপ্তির মাধ্যমে ওগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণের যে সব নিয়ম-বিধি নির্ধারণ করেছেন এবং সহীহ ও দুর্বল পরিচিতির যে মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন, তা কোনরূপ পার্থক্য বা নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম ছাড়াই সর্বতোভাবে সর্বাস্থানে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যে কোন হাদীসই, সেটা আহকাম তথা বিধি-বিধান সম্পর্কিত হোক, অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা দণ্ডবিধি, তাঁর সকল কথা ও কর্ম এ মানদণ্ডেই যাচাই করা হয়েছে। অবশ্য যেসব হাদীসে দীনের মূল নীতি নিহিত, যেমন আকাইদ হালাল-হারাম ইত্যাদি। এসব হাদীস সনাক্তের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ অধিক কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আর যেসব হাদীস দীনের মূল নীতি-সম্পৃক্ত নয়, যেমন ফযীলত ইত্যাদি; সেখানে এ মানদণ্ডে কিছুটা শিথিলতা অবলম্বন করা হয়েছে। কারণ এখানে বিশেষ কোন কর্মের অবগতিই উদ্দেশ্য। কাজেই এখানে শৈথিল্য প্রদর্শনই যথার্থ। যেমন ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

اذَا رَوَيْنَا فِى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ تَشَدَّدْنَا وَ اذَا رَوَيْنَا فِى الْفَضَائِلِ تَسَاهَلْنَا

"যখন আমরা হালাল-হারাম বিষয়ক বর্ণনা করি, তখন যাচাই-বাছাইয়ে কঠোরতা অবলম্বন করি; কিন্তু ফাযাইলের বিষয় বর্ণনায় এ ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করি।"

মোটকথা, হাদীসের প্রমাণ সূত্রের সহীহ ও দুর্বল হওয়ার বিষয়টি নির্ধারণ করার যে মানদণ্ড এবং যে নিয়মাবলী আহকাম বা আইন-কানুন সম্পর্কিত হাদীস বাছাইয়ে অনুসরণ করা হয়, তা-ই মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) এবং সীরাতের হাদীসেও যথার্থতা

নির্ণয়ের একই নীতি অনুসরণ করা হয়। একই মানদণ্ডে সব ধরনের হাদীসই যাচাই-বাছাই করা হয় এবং তদনুযায়ী হাদীসের সহীহ্ বা দুর্বল অবস্থা চিহ্নিত করা হয়।

যেই মুহাদ্দিসগণের হাদীস সংকলন সহীহ্ বলে খ্যাত, তার সব ধরনের হাদীস—চাই তা আইনবিধি সংক্রান্ত হোক অথবা যুদ্ধ বিষয়ক কিংবা ফযীলত বা গুণাবলী। এগুলোর বিশুদ্ধতা যাচাই করেই তারা সংকলন করেছেন। যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ ইবন খুযায়মা, মুন্তাকা ইবন জরূদ, সহীহ্ ইবন হিব্বান। এ কিতাবসমূহে সীরাত এবং মানাকিবের এক বড় ভাণ্ডার বিদ্যমান এবং এর সবই সহীহ্ তথা বিশুদ্ধ।

আর যে সকল মুহাদ্দিস নিজেদের সংকলন গ্রন্থকে সহীহ্ বলে দাবি করেননি তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে হাদীস ভাণ্ডার জমা হয়ে যায় এবং মহানবী (সা) থেকে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তা একবার সংরক্ষিত হয়ে যাক। তাতে পরবর্তীতে এভাবে বাছ-বিচার করা হবে যে, সনদ যখন বিদ্যমান তখন এ সম্পর্কিত নির্ধারিত কষ্টিপাথরে তা যাচাই-বাছাই করা জটিল কোন বিষয় হবে না। মোটকথা, এ মণীষীগণ হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার ব্যাপারে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং চেষ্টা করেছিলেন যাতে কোন হাদীস বাদ না যায়।

সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ একদিকে হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণের মূল নীতিসমূহ নির্ধারণ করেন–যাতে কোন জাল কথা নবী (সা)-এর প্রতি আরোপিত না হয়। নবী (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ স্বেচ্ছাকৃত না হলেও তবুও তা মিথ্যা এবং অবশ্যই ভ্রান্ত বলে গণ্য হবে। অপরদিকে তাঁরা একইভাবে যা কিছু সনদসহ মহানবী (সা)-এর প্রতি আরোপিত হয়েছে, তা-ই একত্রিত করেছেন যাতে নবী (সা)-এর কোন বিষয়, কোন বাক্য অজানা থেকে না যায়, হারিয়ে না যায় যা তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত। এর কোনটির সনদ সুসংবদ্ধ না থাকলেও, সম্ভাবনা থাকে যে, ভিন্ন কোন সনদে এ হাদীস পাওয়া যাবে। তখন সনদ বর্ণনাকারীর সংখ্যা ইত্যাদি দেখে পরবর্তী আলিমগণ নিজেরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে, এ হাদীস কোন্ পর্যায়ের হতে পারে। অনেক সহীহ্ রিওয়ায়েতই বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে ধারাবাহিক ও প্রসিদ্ধির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কাজেই যে মুহাদ্দিসগণ হাদীস যাচাই-বাছাই ছাড়াই সব ধরনের রিওয়ায়েত একত্র করেছেন, তাঁরা দায়িত্বহীনভাবে নয়, বরং "আমার একটি বাক্য শুনলে তাও অপরের কাছে পৌঁছে দাও"(بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ اٰيَةً) মহানবী (সা)-এর এই নির্দেশের দিক থেকে সঠিক কাজই করেছেন। কোন যঈফ হাদীসের শব্দ দ্বারাও সহীহ্ হাদীসের মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং উক্ত সহীহ্ হাদীসে ব্যবহৃত একাধিক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতে যঈফ হাদীসের শব্দটি হাদীসের সঠিক অর্থ নিরূপণে সহায়ক হয়। ফলে নবী (সা)-এর বক্তব্যের লক্ষ্য সঠিকভাবে নির্ণীত হয়। পরন্তু ঐ শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিসগণ হাদীসসমূহ সংকলনে নিজেদের জ্ঞান-বিবেককে কখনও প্রাধান্য দেন নি; বরং পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়াত যেভাবে পেয়েছেন, হুবহু সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন; যেন বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী দু'টি রিওয়ায়াতের

মধ্যে সামঞ্জস্যদানের জন্য কোন সময় কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ্ দীনের বুঝ দিলে তাঁর দ্বারা এ বিরোধ দূরও হয়ে যেতে পারে। তিনি তখন ঐ দু' রিওয়ায়াতকে আল্লাহ্ প্রদত্ত প্রজ্ঞার নূরে পৃথক দেখে তার পৃথক ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হবেন। ফলে, যিনি দীর্ঘকাল যাবত এই দু' রিওয়ায়াতকে পরস্পর বিরোধী ভাবতেন, তখন আল্লাহ্ প্রদত্ত নূরে তার অন্তর্চক্ষু খুলে যাওয়াতে এ দু' রিওয়ায়াতের পার্থক্য তার দৃষ্টিতে ধরা পড়বে। অতঃপর দেখা যাবে, আসলে যাবতীয় পার্থক্য ও বৈপরীত্য ছিল আমাদের বুঝেই; হাদীসের মধ্যে পার্থক্য ও বৈপরীত্য আদৌ ছিল না।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম (র) তাঁর الوجوبة الكاملة গ্রন্থে বলেন ঃ

"হাদীসের কিতাব তিন প্রকার। প্রথম প্রকার এই যে, সংকলক নিজ কিতাবে এ শর্ত আরোপ করেন, সহীহ ছাড়া কোন হাদীস তিনি বর্ণনা করবেন না। যেমন সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি। এর উদাহরণ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত যে, এতে যা বলা হয়েছে তা রোগীর জন্য উপকারী।

অপর এক প্রকার, যাতে সহীহ্-যঈফ সব ধরনের হাদীস সংকলন করা হয়। এরপর মন্তব্যে সহীহকে সহীহ এবং যঈফকে যঈফ উল্লেখ করা হয়। যেমন তিরমিযী শরীফ, এতে কোন হাদীস লিখে তিনি বলেন, হাদীসটি সহীহ আর কোন হাদীসকে যঈফ বলা হয়। এর উদাহরণ হলো অধিকাংশ চিকিৎসার পুস্তক, এতে একক ও সমষ্টিগতভাবে উপকারী ও ক্ষতিকর সব বিষয়ই লিপিবদ্ধ থাকে যে এটি উপকারী—ঐটি ক্ষতিকর। কাজেই কোন নির্বোধও ঐ কবিরাজী বই দেখে ক্ষতিকর ঔষধ ব্যবহার করে না। অনুরূপভাবে যঈফ হাদীস কিতাবে দেখে একে দলীল হিসেবে উদ্ধৃত করা কোন জ্ঞানীর[১] কাজ নয়।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, সংকলক নিজ সংকলনে মাওযূ এবং যঈফ উভয় হাদীস একত্রিত করলেন। উদ্দেশ্য এটাই যে, জনসাধারণ যেন এগুলো অনির্ভরযোগ্য বিবেচনায় দীনী ব্যাপারে এর উপর আমল করা থেকে বিরত থাকেন। এ পদ্ধতির সংকলনও এরূপ : যেমন যে কোন চিকিৎসক নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি বিস্তারিত লিখে রোগীকে দেন যাতে সে আগামী দিনে ধোঁকায় না পড়ে। ইবনুল জাওযী প্রমুখ রচিত কিতাবগুলো এ ধরনেরই।[২]

যুদ্ধ এবং অভিযানের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে যদি কোন বর্ণনা পাওয়া যেত, তাও অবশ্য গ্রহণ করেছেন কিন্তু এতে নিজের মতামত ও রায়কে এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি, যাতে করে তা মূল বর্ণনার সাথে মিশে না যায়। আল্লাহ্ না করুন, যদি এ বুযুর্গগণ ইউরোপীয় ইতিহাসবিদদের মত উদ্দেশ্য ও প্রসঙ্গ নিয়ে বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন, তা হলে সে রিওয়ায়াত রিওয়ায়াতই থাকতো না; বরং তাদের ধারণা ও

---

১. প্রকৃতপক্ষে যিনি চিকিৎসক এবং ঔষধের বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব সম্বন্ধে অবগত।

২ আল-আজওয়িবাতুল কামিলা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সমষ্টিতে পরিণত হতো। পরবর্তী আলিমগণ এ জমাকৃত ভাণ্ডার থেকে যাচাই বাছাই করে বলে দিয়েছেন যে, অমুক রিওয়ায়াত সহীহ, অমুকটি মওযূ। যে ব্যক্তি 'উয়ূনুল আখবার', 'যাদুল মা'আদ' এবং যারকানী প্রণীত 'শরহে মাওয়াহিব' অধ্যয়ন করবেন, তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করবেন মুহাদ্দিসগণ তাঁদের যাচাই বাছাইয়ে একই ধরনের প্রক্রিয়া বহাল রেখেছেন। নিজেদের বাছাই প্রক্রিয়া কেবল আহ্কাম তথা আইন-বিধি সংক্রান্ত হাদীসসমূহের সাথে নির্দিষ্ট করেন নি। আজকাল এক বিদয়াতী প্রথার উদ্ভব হয়েছে—যা দ্বারা প্রকৃত রিওয়ায়াত হারিয়ে যাচ্ছে। লেখক নিজ ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত বহাল করেন আর এটাকে তিনি রিওয়ায়াতের আকারে উপস্থাপন করেন। অথচ তা রিওয়ায়াত ও ঘটনা নয়; বরং তার নিজ রায় ও ধারণা।

আল্লামা সুহায়লী, হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম ও আল্লামা যারকানী ঘটনা ও অবস্থা ছাড়াও সুযোগমত গুপ্ত রহস্য, আহকাম, উপমা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়াদিও বর্ণনা করেছেন যাতে সীরাতের স্বাদ দ্বিগুণ হয়েছে।

এ অধমও ঐ মনীষীগণের ইলমের মুখপাত্র এবং খাদিম। এ সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থে যদ্দুর সম্ভব সংগ্রহ এবং রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণযোগ্য ও সনদযুক্ত হওয়ার দাবি করে। এতে কিছু গুপ্ত রহস্য এবং আহকামও সন্নিবেশ করা হয়েছে—যা ইনশা আল্লাহ্ উপকারী ও লাভজনক প্রমাণিত হবে। এ সীরাত গ্রন্থে যত জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও সংগ্রহের ভাণ্ডার দেখবেন, এ সবই সম্মানিত মুহাদ্দিসগণের এবং তাঁরাই এর অধিকারী। এ অধম তাঁদের এক নগণ্য গোলাম ও তুচ্ছ খাদিম–যার কাজ শুধু এতটুকুই যে, তাদের মণি-মাণিক্যগুলো সুতোয় গেঁথে জ্ঞান পিপাসু ও ক্রয়কারীদের সামনে উপস্থাপন করা এবং যে খনিসমূহ থেকে এ মোতিগুলো আহরণ করা হয়েছে, সাথে সাথে তার সন্ধানও বলে দেয়া। স্বর্ণকারের কাজ তো এতটুকু যে, সিন্দুকসমূহ ভর্তি অলঙ্কার সামনে রেখে দেয়া। এরপর এর ধরন, প্রকার, মান ও বর্ণ পৃথক করে সুবিন্যস্তভাবে রাখা তো ভৃত্য এবং খাদিমদের কাজ। এ কারণেই পূর্ববর্তী আলিমদের সংগৃহীত জ্ঞান সুবিন্যস্ত নয়, বরং স্বর্ণকারের মত এলোমেলো ও অবিন্যস্ত হয়। যেহেতু এ শাস্ত্রে শ্রদ্ধেয় মুহাদ্দিসগণ আমাদের শিক্ষক এবং আমাদের ও নবী করীম (সা)-এর মধ্যে তাঁরাই মাধ্যম, এজন্যেই তাঁদের মূলনীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ গ্রহণযোগ্য ও আবশ্যকীয় মনে করছি। যেমন আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

"সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে, তা থেকে কি আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন, এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?" (সূরা কাহ্ফ : ৬৬)

এজন্যেই আপনি ইনশা আল্লাহুল আযীয এ কিতাবের কোন স্থানেই সম্মানিত মুহাদ্দিসগণের মূলনীতির বিরোধী কিছু পাবেন না। অনুরূপভাবে কুরআনে বর্ণিত

পিতৃপুরুষ, যাদের—"না কোন জ্ঞান আছে, আর না তারা হিদায়তপ্রাপ্ত।" অনুসরণ করা হয়েছে। সূরা বাকারা : ১৭০ আয়াতে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

তবে যাদের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক পিতৃপুরুষরা জ্ঞানী ও সঠিক পথপ্রাপ্ত, তাদের অনুসরণ উত্তম, এমনকি অত্যাবশ্যক হওয়াতে কোন আপত্তি থাকতে পারে কি? এই যুগে সীরাতের ওপর ছোট বড় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে কিন্তু এগুলোর লেখক সংকলকগণ অধিকতর আধুনিক দর্শন এবং ইউরোপীয় দার্শনিকদের প্রতি হীনমন্যতাবশত তারা আয়াত ও হাদীসের অনুবাদে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করে আধুনিক শিক্ষিতদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, মহানবী (সা)-এর কোন বাণী ও কর্ম পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান-দর্শনের পরিপন্থি ছিল না। (নাউযু বিল্লাহ্)।

এ কারণেই যখন মু'জিযা ও কারামতের বর্ণনা আসে, তখন যতদূর সম্ভব তা হালকা করে বর্ণনা করা হয়। যদি কোথাও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় হাদীস বিচারের মানদণ্ডে সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখা দেয়, তখন তো তাকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণে চেষ্টার কমতি থাকে না। রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ থেকে সমালোচনার বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করা হলেও প্রামাণ্য ও সমর্থনসূচক বক্তব্যসমূহ উদ্ধৃত করা হয় না—যা স্পষ্ট খেয়ানত ও অবিশ্বস্ততা এবং قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَ تُخْفُوْنَ كَثِيْرًا -এর[১] সত্যায়নকারী। আর যে বর্ণনাকারীদের সমালোচনা তথা প্রমাণ রীতির ত্রুটির অবকাশ থাকে না, সেখানে সূফী ও অভিজ্ঞদের ভঙ্গিমায় এসব ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, যাতে করে আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশেরই পরিবর্তন ঘটে।

এমনিভাবে যখন আল্লাহদ্রোহীদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধের প্রসঙ্গ আসে, তখন খুবই অস্বস্তি অনুভব করে এবং একে ইসলামের চেহারায় একটি কলঙ্ক দাগ মনে করে তা ধুয়ে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। কারণ আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আয়াত এবং হাদীসসমূহকে তো অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না; এজন্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় যে, যুদ্ধ প্রতিরোধ اعلاء كلمة الله। তথা আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরা, আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর আইন জারী করার জন্য ছিল না; ছিল নিজের আত্মরক্ষা ও জীবন বাঁচানো এবং দুশমনকে প্রতিহত করার জন্য। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, মুসলমানগণ মুনাফিকদের বলত تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ ادْفَعُوْا —"এসো, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো। অথবা (দুশমনদের) প্রতিরোধ করো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৭)

---

১. "কাগজের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে তার কিছু অংশ তোমরা প্রকাশ কর এবং এর বহুলাংশ তোমরা গোপন কর।" (সূরা আন'আম ঃ ৯১)

এতে প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এক জিনিস আর দুশমনদের প্রতিহত করা অন্য জিনিস। শেষটিতে মু'মিন ও মুনাফিক সব এক সমান। পার্থক্য হলো মুমিন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করে আর মুনাফিক কেবল নিজেদের রক্ষা ও দুশমন প্রতিহত করার জন্য লড়াই করে। কেবল শত্রু প্রতিহত করাই যদি জিহাদের তাৎপর্য হতো, তা হলে কুরআন ও হাদীসে এর গুরুত্ব দানের কোন প্রয়োজন ছিল না। দুশমনকে প্রতিহত করার আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা বিবেকসিদ্ধ, স্বভাব ও প্রকৃতিগত দাবি, কোন বুদ্ধিমানই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করবে না। খুলাফায়ে রাশিদীনের সকল জিহাদই কি একমাত্র শত্রু প্রতিহত করার উদ্দেশে ছিল? এর মধ্যে কোনোটিই কি ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানবতার কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে আক্রমণাত্মক ছিল না ?

এজন্যে অধম ইচ্ছে করেছে যে, সীরাত বিষয়ক এমন একটি কিতাব লিখা হোক, যাতে একদিকে দুর্বল সনদবিশিষ্ট, অপ্রামাণ্য রিওয়ায়তসমূহ হতে বিরত থাকা হবে, অপরদিকে কোন ডক্টর বা দার্শনিকের মন রক্ষায় কোনো রিওয়ায়াত গোপনও রাখা হবে না, আর তাদের খাতিরে হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও আশ্রয় নেয়া হবে না। হাদীসের বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা প্রমাণ করে এ হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য প্রমাণের চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হবে। এ অধমের উদ্দেশ্য এটাই, যা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো।

فاش می گویم واز گفتهء خود دل شادم بندهء عشقم وازهر دو جهاں آز ادم

"খোলামেলা বলছি আমি, আর এ কথায় আমার মন আনন্দিত, আমি প্রেমের গোলাম এবং উভয় জগত থেকে আমি মুক্ত।"

জিহাদ, দাসপ্রথা ও জিযয়ার মাসয়ালার ব্যাপারে আল্লাহর দুশমনদের চেঁচামেচি, প্রতিবাদ এবং পর্দা বা হিজাবের ব্যাপারে যৌনলিপ্সুদের প্রতিবাদই প্রমাণ করে দেয় যে, এসব আইনের যথার্থই দরকার রয়েছে। তাদের প্রতিবাদই ঐসব বিধানের যথার্থতার প্রমাণ :

وَاِذَا اَتَكَ مَذَمَّتِىْ مِنْ نَاقِصٍ   فَهِىَ الشَّهَادَةُ لِىْ بِاَنِّىْ كَامِلُ

"তোমার কাছে যখন স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমার প্রতি দোষারোপ পৌঁছে তা হলে বুঝবে যে, এটাই আমার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।"

যেভাবে বেকুফদের বিরোধিতা জ্ঞানীর জন্য প্রমাণ, সেভাবেই বাতিল পন্থীদের বিরোধিতা হকপন্থীদের পক্ষে দলীল।

যখন তুমি এই উম্মী নবীকে আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল হিসেবে মান্য কর এবং তাঁর সমস্ত কথা, কাজ আর মৌনতায় তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত নিষ্পাপ বলে গণ্য কর, তা হলে তাঁর হাদীস শোনার পর কোন ডক্টর এবং দার্শনিক কী বললো

সেদিকে কেন ঝুঁকে পড় এবং তাদের প্রতি লক্ষ্য করে কেন আয়াত ও হাদীসের বিশ্লেষণ কর ?

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ

"সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। সুতরাং ওরা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে ?" (সূরা মুরসালাত : ৪৯-৫০)

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ الاَّ الضَّلاَلُ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ

"সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকে ? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছ ?" (সূরা ইউনুস : ৩২)

نخواهم جزتويك ساعت تفكر درد گر كردن

که در هر دو جهاں جاناں ندر ام جزتو دلداری

"আমি চাই না যে, তুমি ছাড়া এক মুহূর্তও অন্য চিন্তা করি। কেননা উভয় জগতে তুমি ছাড়া আর কোন প্রেমাস্পদ নেই।"

হ্যাঁ, এ অধিকার তোমাদের অবশ্যই আছে যে, গ্রহণ করার পূর্বে যথেচ্ছ যাঁচাই বাছাই করে দেখ যে হাদীসটি সত্য, না কি জাল। তবে শর্ত এটাই যে, সত্যানুসরণই উদ্দেশ্য হতে হবে, পলায়নপর ও একপেশে উদ্দেশ্য হবে না।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

"আল্লাহই ভাল জানেন কে হিতকারী আর কে অনিষ্টকারী।"

(সূরা বাকারা : ২২০)

এবারে আমি এ ভূমিকা শেষ করব, যাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য শুরু করতে পারি এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা জানাই যে, হে পরওয়ারদিগারে আলম ! আপনি আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবূল করুন, আমার জন্য একে অব্যাহত কল্যাণ ও পরকালের সম্বলে পরিণত করুন।

گرچه يه هديه نه ميرا قابل منظور هے

پرجو هر مقبول کیا رحمت سے تیری دور

"যদিও আমার এ হাদিয়া গ্রহণের উপযুক্ত নয়, যতটুকু গ্রহণ করেন তা আপনার অনুগ্রহ থেকে দূরে নয়।"

ربنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

آمِيْنُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

আর হে পরওয়ারদিগারে আলম! এই সঙ্গে আপনি তাদের প্রতিও অনুগ্রহ করুন, যারা এ দু'আর সাথে সাথে আমীন বলেছে। চাই তা আস্তে বলুক বা জোরে, তাদেরকে ক্ষমা করুন, যারা হাত তুলে এ অধমকে দু'আ ও মাগফিরাতের মাধ্যমে স্মরণ করেছে এবং সূরা ফাতিহা ও কমপক্ষে দু' তিন আয়াত مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (কুরআন থেকে যতটুকু সম্ভব) পাঠ করে দু'আ করে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ - وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِه وَاَصْحَابِه وَاَزْوَاجِه وَذُرِّيَّاتِه اَجْمَعِيْنَ

"ওরা যা বলে, তা থেকে আপনার মহাসম্মানিত আল্লাহ পবিত্র, মহান। আর সালাম সকল প্রেরিত রাসূলের প্রতি। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। হে প্রভু, প্রতিপালক ! আমাদের দোয়া কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক শোনেন এবং অধিক জানেন। আমাদের তাওবা কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক তাওবা কবূলকারী। দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা, সর্দার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা), তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবাগণ, তাঁর সহধর্মিণীগণ ও সন্তানগণের প্রতি।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র নসবনামা

মহান আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنفسِكُمْ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের নিকট একজন রাসূল আগমন করেছেন (সূরা তাওবা : ১২৮)।

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَرَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَقَالَ اَنَا اَنْفَسَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا وَحَسَبًا لَيْسَ فِىْ اٰبَائِىْ مِنْ لَدُنْ اٰدَمَ سِفَاحٌ كُلُّنَا نِكَاحٌ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفَسِكُمْ এই আয়াতের ফা অক্ষরে যবর দিয়ে তিলাওয়াত করে ইরশাদ করেন : বংশ লতিকার দিক দিয়ে আমি তোমাদের থেকে উত্তম ও সম্ভ্রান্ত। আমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে আদম (আ) থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কোন যিনা নেই, বরং সবাই বিবাহিত। ইবন মারদুবিয়াহ্ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

—যারকানী, শারহে মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া, ১খ. পৃ. ৬৭

হযরত ইবন আব্বাস (রা) এবং ইমাম জুহরী (র) مِنْ اَنْفَسِكُمْ-এর ফা অক্ষরে যবর দিয়ে পড়তেন এবং এর তাফসীরে مِنْ اَفْضَلِكُمْ وَاَشْرَفِكُمْ (তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সম্ভ্রান্ত) বর্ণনা করতেন—হাদীসটি অনুবাদে আমরা যার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (সা)-এর পিতামাতা পর্যন্ত বংশপরম্পরায় পিতামহ প্রপিতামহ কিংবা মাতামহী পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রত্যেকেই সৎ ও সাধ্বী তথা নেককার এবং পবিত্র ছিলেন, ব্যভিচারের দ্বারা কেউ কখনই কলঙ্কিত হননি।[১]

সৎকর্মশীল বান্দা, যাঁদেরকে মহান আল্লাহ্ তাআলা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য নির্বাচন করেন, তাঁদের বংশপরম্পরা এমনটিই পবিত্র হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা

---

১. এটা একটা হাদীসের সার-সংক্ষেপ, যেটি ইমাম তিরমিযী হযরত আলী (রা) থেকে মরফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাফিয হায়সামী বলেন, একজন ছাড়া হাদীসটির সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। তবে হাকিম তাঁকেও নির্ভরযোগ্য বলেছেন।—যারকানী, ১খ. পৃ. ৬৭।

সবসময় পবিত্র পুরুষের মাধ্যমে পবিত্র নারীর গর্ভে তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। নির্বাচিত ও মনোনীতরূপে আল্লাহ তা'আলা যাঁকে গ্রহণ করবেন, সৃষ্টির পূর্বে অবশ্যই তার বংশকে নির্বাচিত করবেন, খাঁটি ও নির্মল করবেন, করবেন সর্বোত্তম নিষ্কলুষ। নবূওয়াত ও রিসালাতের জন্য আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত ও মনোনীত বান্দাদের যে বিষয়ে যে সীমা পর্যন্ত সম্পর্কযুক্ত হতে পারে, সে চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচন ও মনোনয়নের জন্য পসন্দ করা হয়ে থাকে।

মহানবী (সা)-কে হেয় এবং ইসলামের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য মুনাফিকরা যখন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, তখন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সিদ্দীক কন্যা সিদ্দীকার শানে সূরা নূরের দশটি আয়াত নাযিল করেছেন—যার মধ্যে একটি আয়াত এও ছিল মহানবী (সা) ও মুসলিম সৈনিকরা এক রণাঙ্গণ থেকে সওয়ারীসহ ফিরে আসার সময় হযরত আয়েশা (রা) কে সঙ্গে আনতে ভুলে যান। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়ার ফাঁকে কাফেলা রওয়ানা দিয়ে চলে আসে। পথিমধ্যে স্মরণ হলে পরে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। এতেই মুনাফিকরা কথা রটনা করতে থাকে।

وَلَوْ لاَ اذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا - سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ

"আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না যে, সুবহানাল্লাহ ! এটা এক কঠিন অপবাদ।" (সূরা নূর : ২১)

এ বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতে পারি না।

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! এ ঘটনা শোনামাত্রই তোমাদের বলা উচিত ছিল, সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, এতো চরম অপবাদ ! এ ধরনের কল্পনা থেকেও আল্লাহর আশ্রয় কামনা করি, পয়গাম্বরের স্ত্রী কিরূপে পাপিষ্ঠা হতে পারেন ! তাঁরা তো নেককার ও পবিত্রই হবেন।

ইবন মুনযির হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ ما بغت امراة النبى قط অর্থাৎ "কোন পয়গাম্বরের স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।"

ইবন জুরায়জ বলেন, নবূওয়াতের মর্যাদা ও সম্মাননার বৈশিষ্ট্যই এটা নয় যে, কোন নবীর স্ত্রী পাপ কাজে লিপ্ত হবেন। ইবন আসাকির আশরাজ খুরাসানী থেকে মরফু রিওয়ায়াত করেন যে, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ কোন পয়গাম্বরের স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।[১] হাফিয ইবন কাসীর স্বীয় তাফসীরে হযরত ইবন

---

১. দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ. ১৪৫।

আব্বাস (রা)-এর উক্তি ما بغت امراة النبى قط -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, হযরত ইকরামা, সাঈদ ইবন জুবায়র, যাহ্হাক প্রমুখ (র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[১]

যখন পয়গম্বরগণের স্ত্রীর পক্ষে পাপাচারী হওয়া নবূওয়াতের মর্যাদার পরিপন্থি, তখন তাঁদের মাতা-মাতামহী প্রমুখ নারীগণেরও পাপাচারী হওয়া নবূওয়াত মর্যাদার পরিপন্থি। কারণ সন্তানের জন্য পিতৃ আওতা থেকে মাতৃ কর্তৃত্ব অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। কাজেই নবীগণের জন্ম ও লালন পালন (আল্লাহ্ মাফ করুন) দুষ্কর্মে কলুষিত কোনো পরিবারে হওয়া অসম্ভব।

یہ غیر ضروری تذکرہ ہے جو امکانیت کا شبہ جنم دیگا

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে মহানবী (সা) পর্যন্ত যত নবী-রাসূল গত হয়েছেন, কারো বংশ সম্বন্ধেই কোন সমালোচক কোন কথা বলতে পারেননি। কেবল ইয়াহূদীরা (লা'নাতুল্লাহ্ আলাইহিম) মহান আল্লাহ্র অতুলনীয় ক্ষমতার নিদর্শন ঈসা (আ)-এর সতী-সাধ্বী মাতা মরিয়ম (আ)-এর উপর অপবাদ আরোপ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে সপ্রশংস ভাষায় হযরত মরিয়ম (আ) প্রসঙ্গে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর গৌরবময় জন্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এবং সেই সাথে ইয়াহূদীদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন।

যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল, মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত ও প্রেরিত কোনো পয়গাম্বরের বংশধারায় এক মুহূর্তের জন্যও কোন সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করার অবকাশ কোনো খবিসের জন্য রাখা হয়নি।

রোমের সম্রাট যখন আবূ সুফিয়ানের নিকট নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ সম্পর্কে এ প্রশ্ন করলেন : كيف نسبه فيكم "তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কিরূপ ?" সহীহ বুখারীর এ বাক্যে আছে, আবূ সুফিয়ান জবাব দিলেন : هو فينا ذو نسب "তিনি আমাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়।"

হাফিয আসকালানী বলেন, বাযযার এর বর্ণনায় এরূপ রয়েছে : هو فى حسب مالا يفضل عليه احد قال هذه الاية "অর্থাৎ বংশ মর্যাদা ও খান্দানের দিক দিয়ে কেউ তাঁর চেয়ে উর্ধ্বে নয়।" রোম সম্রাট বললেন, এটাও একটা নিদর্শন (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর)।[২] -[৩] অর্থাৎ নবী হওয়ার অন্যতম নিদর্শন এটাও যে, নবী (সা)-এর খান্দান সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিল। সহীহ্ বুখারীর রিওয়ায়াতে এ বাক্য রয়েছে

১. তাফসীরে ইবন কাসীর, ৮খ. পৃ. ৪১৯।

২ কিতাবুত তাফসীরের বর্ণনা এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, হাফিয আসকালানী বাযযার-এর মুসনাদ থেকে এ বর্ণনা কেবল এ স্থানেই উদ্ধৃত করেছেন। বাদাউল ওহী, কিতাবুল জিহাদ, মাগাযী প্রভৃতিতে বর্ণনা করেন নি।

৩. ফাতহুল বারী, মিসরে মুদ্রিত, ১৩০১ হি., ৮খ. পৃ. ১৬৩।

যে, আবূ সুফিয়ানের জবাব শুনে সম্রাট বললেন : وكذلك الرسل تبعث فى احسب قومها "অর্থাৎ পয়গাম্বরগণ সর্বদা সম্ভ্রান্ত বংশেরই হয়ে থাকেন।"[১]

আমাদের নবী আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বংশ লতিকা, যা সারা বিশ্বের সম্ভ্রান্ত বংশ লতিকা থেকে উন্নত অগ্রগামী এবং সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। তা এরূপ ঃ

সাইয়্যেদুনা মাওলানা মুহাম্মদ ইবন আবদিল্লাহ্ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদে মানাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুআই ইবন গালিব ইবন ফিহ্র ইবন মালিক ইবন নাযর ইবন কিনানা ইবন খুযায়মা ইবন মুদরিকা ইবন ইলিয়াস ইবন মুযার ইবন নিযার ইবন মা'আদ ইবন আদনান। [বুখারী শরীফ, বাবু মাবআসুন নবী (সা)]

হাফিয আসকালানী বলেন, ইমাম বুখারী স্বীয় জামে সহীহতে এ পবিত্র বংশ পরম্পরা কেবল আদনান পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন কিন্তু স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম (আ) পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন যা নিম্নরূপ ঃ

আদনান ইবন আদু ইবন মুকাওইম ইবন তারিহ ইবন ইয়াশজাব ইবন ইয়ারাব ইবন সাবিত ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (আ)।[২]

আদনান পর্যন্ত বংশ পরম্পরা সকল বংশ বিশেষজ্ঞের নিকট গ্রহণযোগ্য। এতে কারো মতপার্থক্য নেই এবং আদনানের পূর্বপুরুষ ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর হওয়াটাও সবার নিকটই গ্রহণযোগ্য।[৩]

মতপার্থক্য কেবল এ ব্যাপারে যে, আদনান থেকে হযরত ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত কত পুরুষ ছিল ? এটা কেউ ত্রিশ বলেছেন আর কেউ বলেছেন চল্লিশ। আল্লাহই ভালো জানেন। আর তাঁর জানাটা পরিপূর্ণ ও সুবিজ্ঞোচিত।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী (সা) তাঁর পবিত্র বংশ লতিকা বর্ণনা করতেন, তখন আদনান থেকে উর্ধ্বে বর্ণনা করতেন না, বরং আদনান পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যেতেন এবং বলতেন : كذبَ النسابون "বংশ লতিকা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।"[৪]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) প্রথমে এ আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

وَ عَادًا وَ ثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ

"আদ ও সামূদ এবং তাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, আল্লাহ্ তো বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম করতে চান না।" (সূরা মুমিন : ৩১)

---

১. বুখারী শরীফ, ১খ.।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

৩. জাদুল মা'আদ, ১খ. পৃ. ১৫।

৪. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৮।

এরপর বলতেন كذب النسابون "বংশ লতিকা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।" অর্থাৎ তাদের এ দাবি যে, সমস্ত বংশ লতিকা সম্পর্কে আমরা অবহিত—এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বরং আল্লাহ ছাড়া এ জ্ঞান কারো নেই। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ২৮)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, ইমাম মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কোন ব্যক্তির বংশ পরম্পরা হযরত আদম (আ) পর্যন্ত পৌঁছানো কিরূপ? এটা শুনে তিনি অপছন্দ করলেন। প্রশ্নকারী তখন হযরত ইসমাঈল (আ) পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তাও তিনি অপছন্দ করলেন এবং বললেন ঃ من يخبر -"কে তাকে খবর দিয়েছে?"[১]

মাতার দিক থেকে বংশ লতিকা

উপরে যে বংশ লতিকা বর্ণনা করা হয়েছে, তা পিতা ও দাদার দিক থেকে ছিল। তাঁর মাতার দিক থেকে বংশ লতিকা এরূপ :

মুহাম্মদ (সা) ইবন আমিনা বিনতে ওহাব ইবন আবদে মানাফ ইবন যুহরা ইবন কিলাব ইবন মুররা।[২] কিলাব পর্যন্ত পৌঁছে পিতা ও মাতা উভয়ের বংশ লতিকা একত্রিত হয়ে যায়।

যদি এখানে বংশ লতিকার পিতা-পিতামহের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হয়, তা হলে সম্ভবত তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

আদনান : কায়দার ইবন ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর। আবূ জাফর ইবন হাবীব স্বীয় তারীখ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলতেন যে, আদনান, রবীয়াহ, খুযাইমা, আসাদ এসব গোত্র ইবরাহীম (আ)-এর বংশোদ্ভূত, কল্যাণকর ও উত্তমভাবে এদের উল্লেখ করো। আর যুবায়র ইবন বাক্কার মরফূ' সূত্রে রিওয়ায়াত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মুযার ও রবীয়াহ গোত্রকে মন্দ বলো না, এরা ইসলামের উপর ছিল। হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীস এরই সমার্থক।[৩]

মা'আদ : মীম অক্ষরে জবর এবং দাল অক্ষরে তাশদীদ দিয়ে উচ্চারণ হবে। কেউ কেউ বলেন, মা'আদ ইফসাদ অর্থাৎ বিপর্যয়-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যিনি খুব বাহাদুর এবং যোদ্ধা ছিলেন, সারা জীবন বনী ইসরাঈলের সঙ্গে যুদ্ধ এবং সংঘাতে কেটেছে। প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ নাযযার।[৪]

---

১. রাউযুল উনূফ, মিসরে মুদ্রিত, ১৩৩২ হি. ১৯১৪, ১খ. পৃ. ১১০।

২ ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

ইমাম তাবারী বলেন, মা'আদ ইবন আদনান বুখত নাসর-এর সময়ে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। তৎকালীন পয়গাম্বর আরমিয়াঁ ইবন হালকিয়াঁর প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে ওহী নাযিল হয় যে, বুখত নাসরকে জানিয়ে দাও, আমি তাকে আরবের শাসনকর্তা মনোনীত করেছি এবং তুমি মা'আদ ইবন আদনানকে স্বীয় বোরাকে আরোহণ করাও যাতে সে কোন ব্যথা না পায়। এটা এজন্যে যে,

فانی مستخرج من صلبه نبیا کریما اختم به الرسل

"আমি তার থেকে এক সম্মানিত নবী পয়দা করতে যাচ্ছি, যার মাধ্যমে পয়গাম্বরের ধারাবাহিকতায় সমাপ্তি ঘটাবো।"

এজন্যে হযরত আরমিয়াঁ মাআদ ইবন আদনানকে নিজ বাহন বোরাকে আরোহণ করিয়ে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে মা'আদ বনী ইসরাঈলদের মাঝে বেড়ে উঠেন (যেমন আর-রাওযুস সুহায়লী, ১খ. পৃ. ৮-এ বর্ণিত হয়েছে)। এজন্যেই মা'আদ ইবন আদনানের বংশধারা আহলি কিতাব আলিমদেরও জানা ছিল।

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাতে আবূ ইয়াকূব তাদমূরী থেকে বর্ণনা করেন যে, বুরখ ইবন নারিয়া—যিনি হযরত আরমিয়াঁ (আ)-এর লেখক এবং সচিব ছিলেন—তিনি মা'আদ ইবন আদনানের যে বংশ লতিকা বর্ণনা করেছেন, তা আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। (তাবাকাত, ১খ. পৃ. ২৮)

নিযার : নিযার শব্দটি 'নযর' থেকে গৃহীত, যার অর্থ স্বল্প (বিরল)। আবুল ফারয ইসবাহানী বলেন, নিযার যেহেতু সমকালীন যুগে একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ খুব কমই ছিল, এজন্যেই তাঁর নাম নিযার হয়েছে।

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, যখন নিযার জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর ললাটে নূরে মুহাম্মদী (সা) চমকাচ্ছিল। এটা দেখে তাঁর পিতা খুবই খুশি হন। খুশিতে তিনি সবাইকে দাওয়াত করেন এবং বলেন, هذا كله نذر لحق هذا المولود فسمى نذار لذلك "এ সব কিছুই এই নবজাতকের মুকাবিলায় খুবই নগণ্য, এজন্যে তাঁর নাম নিযার রাখা হয়েছে।"[১]

তারীখুল খামীসে আছে, নিযার তাঁর সমকালীন সবচেয়ে সুন্দর, সুঠাম, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন (انه خرج اجمل اهل زمانه واكبرهم عقلا)।

আর কারো মতে নিযার অর্থ কৃশ ও রোগা-পাতলা। যেহেতু তিনি কৃশ ও রোগা পাতলা ছিলেন, এজন্যে তাঁর নাম নিযার ছিল।

মদীনা মুনাওয়ারার সন্নিকটে যাতুল জায়শে তাঁর কবর আছে।[২]

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

মুযার : মুযারের প্রকৃত নাম ছিল আমর আর উপনাম ছিল আবূ ইলয়াস। মুযার ছিল তাঁর উপাধি। মুযার শব্দটির মূল মাযির, যার অর্থ কঠোর মেজাজ। তিনি কিছুটা কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হওয়ায় তাঁর উপাধি মুযার হয়ে যায়।[১] তিনি ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীর মধ্যে কয়েকটি এরূপ ঃ

مِنْ يَزْرَعْ شَراً يَحْصُدُ نَدَامَةً وَخَيْرَ الْخَيْرِ اَعْجَلُهُ فَاَحْمِلُوْا اَنفسَكُمْ عَلٰى مَكْرُوْهِهَا وَاصْرِفُوْهَا عَنْ هَوَاهَا فَلَيْسَ بَيْنَ الصَّلاَحِ وَالْفَسَادِ الاَّ الصَّبْرُ

"যে অমঙ্গল বপন করবে, সে লজ্জার ফসল কর্তন করবে। আর কল্যাণের মধ্যে উত্তম হলো তাই, যা দ্রুত অর্জিত হয়। কাজেই নিজের আত্মাকে অপসন্দনীয় বস্তু থেকে নিবৃত্ত রাখো এবং আত্মাকে কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা করো, ভাঙ্গা ও গড়ার মধ্যে ধৈর্য ছাড়া কোন অন্তরায় নেই।"[২]

তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। দ্রুত উট চালনার হুদী তাঁরই উদ্ভাবিত ছিল। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮)

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাতে আবদুল্লাহ ইবন খালিদ থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন "মুযারকে মন্দ বলো না, কেননা তিনি মুসলমান ছিলেন।"[৩]

ইবন হাবীব তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, আদনান, তাঁর পিতা, তার পুত্র সাদ, রবীয়াহ, মুযার, কায়স, তামীম, আসাদ এবং রাযাইয়াহ ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মমতের অনুসরণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন।[৪]

ইলয়াস : হযরত ইলয়াস (আ)-এর নামানুসারে এ জন্যে এ নাম রাখা হয় যে, তিনিই প্রথম পবিত্র বায়তুল্লা হতে কুরবানীর পশু প্রেরণের প্রচলন করেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইলয়াস ইবন মুযার স্বীয় পৃষ্ঠদেশ থেকে নবী (সা)-এর হজ্জের তালবিয়া শ্রবণ করতেন। এটাও বলা হয় যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : ইলয়াসকে মন্দ বলো না, কারণ তিনি মু'মিন ছিলেন।[৫]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।

২. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।

৩. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত এ আসার হাফিয আসকালানী বিস্তারিতভাবে বাবুল মানাকিবে বর্ণনা করেন এবং মাররাআসে নবী (সা) অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত করেন, যেমনটি আমরা পরে আলোচনা করব।

৪. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩০।

৫. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৮৪।

আল্লামা যারকানী বলেন, এ হাদীসটির অবস্থা সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, এটি প্রামাণ্য লতিকার কোন্ পর্যায়ের।[১]

মুদরিকা : প্রসিদ্ধ আলিমগণের বক্তব্য অনুযায়ী মুদরিকার নাম ছিল আমর। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, তাঁর নাম ছিল আমর।[২] আর মুদরিকা ছিল উপাধি যা ইদরাক শব্দ থেকে উদ্ভূত। যেহেতু সব ধরনের সম্মান ও মর্যাদা তিনি অর্জন করেছিলেন, এজন্যে তাঁর উপাধি মুদরিকা হয়েছিল।[৩]

খুযায়মা : হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, খুযায়মা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মাদর্শের উপর ইনতিকাল করেন।[৪]

কিনানা : আরবে তাঁকে প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত মনে করা হতো। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁর নিকট আগমন করতো।[৫]

নয্র : নাযারাতুন মূল ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ চাকচিক্যময়, চির সতেজ। সৌন্দর্য ও সুঠাম দেহের কারণে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কায়স।[৬]

মালিক : তাঁর নাম ছিল মালিক এবং উপাধি ছিল আবুল হারিস। ইনি সমসাময়িক আরবে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন।[৭]

ফিহ্র : তাঁর নাম ছিল ফিহ্র, উপাধি ছিল কুরায়শ। কেউ কেউ বলেন, কুরায়শ ছিল নাম আর ফিহ্রই ছিল উপাধি। তাঁর বংশধরগণকে কুরায়শী বলা হয়। আর যে ব্যক্তি ফিহরের বংশধর নয়, তাকে বলা হয় কিনানী। কতিপয় আলিম বলেন, কুরায়শ ছিলেন নযর ইবন কিনানার বংশধর। হাফিয ইরাকী তাঁর আইফয়া-ই-সীরাত গ্রন্থে বলেন :

اما قريش فلا صح فهر جماعها والاكثرون النضر

"বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, ফিহ্রই কুরায়শ, তিনিই কুরায়শকে সংগঠিত করেন; অবশ্য অধিকাংশের মতে এ কাজটি করেছেন নয্র।"

হাফিয আলাঈ বলেন, এটাই সত্য। আর মুহাক্কিক আলিমদের বক্তব্য হলো নয্র ইবন কিনানার সন্তান ছিলেন কুরায়শ। কিছু কিছু মরফূ' হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর বক্তব্যও এটাই যে, কুরায়শ ছিল নয্র ইবন কিনানার সন্তানের নাম।

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৮।
২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৯।
৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৫।
৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৮।
৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৮।
৬ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৭।
৭. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৬।

কিছু কিছু হাদীসের হাফিয বলেন, ফিহ্‌রের পিতা মালিক ফিহ্‌র ছাড়া আর কোন সন্তান রেখে যাননি। এ কারণে যে ব্যক্তি ফিহ্‌রের বংশধর, তিনি নয্‌রেরও বংশধর। কাজেই কুরায়শ চিহ্নিতকরণে যে বিভিন্ন বক্তব্য ছিল, আল্লাহর শোকর, তা একীভূত হয়ে গেল।

কুরায়শ নামকরণের কারণ : কুরায়শ একটি সামুদ্রিক প্রাণীর নাম, যে স্বীয় শক্তি দ্বারা অন্যান্য প্রাণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। সে যে প্রাণীকে ইচ্ছা হয় খেয়ে ফেলে, কিন্তু একে কেউ খেতে পারে না। অনুরূপভাবে কুরায়শও নিজেদের শক্তি ও বীরত্ব দ্বারা সবার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে, কারো নিকট পরাজিত হয়নি। এজন্যে তারা কুরায়শ নামে আখ্যায়িত হয়ে যায়। ইবন নাজ্জার স্বীয় তারিখ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, একবার হযরত ইবন আব্বাস (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট আগমন করেন। সেখানে হযরত আমর ইবনুল আস (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইবন আব্বাস (রা) কে সম্বোধন করে বলেন, কুরায়শদের ধারণায় তুমিই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম। ভাল কথা, এবার তুমি বল, কুরায়শ নামকরণের কারণ কি? কুরায়শকে কেন কুরায়শ বলা হয়? হযরত ইবন আব্বাস (রা) কুরায়শ নামকরণের ঐ কারণ বর্ণনা করেন যা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এবারে বলেন, আচ্ছা, যদি এ প্রসঙ্গে তোমার কোন কবিতা স্মরণে থাকে তো শুনিয়ে দাও। ইবন আব্বাস (রা) বললেন, কবি শামরুখ ইবন আম্‌র হিময়ারী বলেন :

وقريش هى التى تسكن البحر　　بها سُمِيَّتْ قريش قريشا
تاكل الغث والسمين ولا تترك　　لذى الجنا حين ريشا
هكذا فى البلاد حى قريش　　يأكلون البلاد لكلا لميشا
ولهم اخر الزمان نبى　　يكثر القتل فيهموا والخموشا

"কুরায়শ এক জন্তুর নাম যা সমুদ্রে থাকে। এ থেকেই কুরায়শের নাম কুরায়শ রাখা হয়। ঐ জন্তু যে দুর্বল ও শক্তিশালী সব জন্তুকে খেয়ে ফেলে, এমনকি পালকও ফেলে না। অনুরূপভাবে কুরায়শ সম্প্রদায়কে শৌর্য-বীর্যের সাথে স্মরণ করা হয়। আর এ সম্প্রদায়ের মধ্যেই শেষ যামানায় এক নবী প্রকাশ পাবেন, যিনি–আল্লাহর নাফরমান বান্দাদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে অধিকাংশ নাফরমানের প্রাণ হরণ তাঁর হাতেই ঘটবে।"[১]

হাফিয বদরুদ্দীন আইনী (র) কুরায়শকে কুরায়শ বলার পনেরটি কারণ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে শরহে সহীহ বুখারী, উমদাতুল কারী, ৭খ. পৃ. ৪৮৬ মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায় দেখে নিন।

---

১. যাবকানী, ১খ. পৃ. ৭৫; ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৩৮৮; মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায়ে কবিতাটি বর্ণিত হয়েছে।

কা'ব : জুম্'আর দিন (যার পূর্বনাম ছিল ইয়াওমুল আরূবা) লোকজনকে একত্রিত হওয়ার পদ্ধতি সর্বপ্রথম কা'ব ইবন লুয়াই প্রচলন করেন। কা'ব ইবন লুয়াই জুমু'আর দিন লোকজনকে একত্রিত করে খুতবা দিতেন। এতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করতেন যে, আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য সবকিছু আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি, এরপর জনগণকে বিভিন্ন সদুপদেশ দান করতেন। পরোপকারকে উৎসাহ দিতেন। আর বলতেন, আমার বংশে একজন নবী আসবেন, যদি তোমরা ঐ সময় বেঁচে থাকো, তা হলে তাঁর অনুসরণ করো। এরপর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করতেন

يا ليتني شاهد فحواء دعوته   اذا قريش تبغى الحق خذلانا

"আহ্ ! যদি আমি তাঁর ঘোষণা ও দাওয়াতের সময় উপস্থিত থাকতাম, যখন কুরায়শগণ তাঁকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে।"

ইমাম ফাররা ও সালাব বলেন, এর পূর্বে ইয়াওমুল জুমু'আকে ইয়াওমুল আরূবা বলা হতো। সর্ব প্রথম কা'ব ইবন লুয়াই এ দিনের নাম জুমু'আ রাখেন। হাফিয ইবন কাসিরও স্বীয় তারিখে কা'ব ইবন লুয়াই-এর খুতবার উল্লেখ করেছেন।[১]

মুররা : শব্দটি মারারাত থেকে গৃহীত, যার অর্থ তিক্ত। যে ব্যক্তি শক্তিশালী ও বীরত্বব্যঞ্জক হতেন, আরবে এরূপ ব্যক্তিকে মুররা বলা হতো। তারা এজন্যে এরূপ ব্যক্তিকে মুররা বলতো যে, এ ব্যক্তি নিজ শত্রুদের জন্য খুবই তিক্ত। مرة শব্দটির ة অক্ষরটি স্ত্রীলিঙ্গবাচক নয়, বরং مبالغه জ্ঞাপক, যদ্দরুন এর অর্থ খুবই তিক্ত। হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত তালহা (রা) তাঁরই বংশধর ছিলেন।[২]

কিলাব : কালব শব্দের বহুবচন। কোন ব্যক্তি আবুর রাকিশ আরাবীকে প্রশ্ন করেছিল, এরূপ করার কারণ কি যে তোমরা তোমাদের সন্তানদের জন্য কালব (কুকুর), যি'ব (নেকড়ে) এ ধরনের খারাপ নাম আর ভৃত্যদের জন্য মারযূক (রিযকপ্রাপ্ত), রাবাহ্ (উপকারপ্রাপ্ত) এ ধরনের উত্তম নাম গ্রহণ কর ? আবুর রাকিশ আরাবী জবাব দিলেন যে, আমরা সন্তানদের নাম দুশমনদের জন্য এবং ভৃত্যদের নাম আমাদের জন্য রাখি। অর্থাৎ ভৃত্য তো কেবল আমাদের সেবার জন্য রাখা হয়, এর বিপরীতে সন্তানগণ শত্রুর সামনে বুক পেতে যুদ্ধ করে। এজন্যে তাদের নাম এরূপ নির্ধারণ করা হয়, যাতে এ ধরনের নাম শুনেই শত্রুরা ভীত হয়। কিলাবের প্রকৃত নাম হাকিম কিংবা উরওয়া অথবা মুহাযযাব ছিল। নানা মত অনুযায়ী কিলাব শিকারে আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি শিকারী কুকুর পুষতেন। ফলে তিনি কিলাব নামে আখ্যায়িত হন।[৩]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ.৭৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

২ প্রাগুক্ত।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

কুসাই : কুসাইয়ের নাম ছিল মুজমি' বা একত্রকারী, যা জমা শব্দ থেকে উদ্ভূত। কুসাই যেহেতু কুরায়শের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত গোত্রগুলোকে একত্র করেছিলেন, এজন্যে তাঁকে মুজমি' বা একত্রকারী বলা হতো। কুরায়শরা প্রথমে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং এক স্থানে বসবাসরত ছিল না। কেউ ছিল পাহাড়ে, কেউ ময়দানে, কেউ উপত্যকায়, কেউ নির্দিষ্ট কোন জায়গায় আর কেউ ছিল গুহায়। কুসাই সব গোত্রকে মক্কার আশ্রয়ে একত্রিত করেন এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক আবাসের জন্য স্থান চিহ্নিত করে দেন —এভাবে তিনি সবাইকে একত্রিত করেন। তখন থেকেই তাঁকে মুজমি' বলে সম্বোধন করা হতে থাকে। যেমনটি জনৈক কবি বলেন :

ابوكم قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر

"তোমাদের পিতা কুসাইকে মুজাম্মি' বলে সম্বোধন করা হতো এ জন্যে যে, তার মাধ্যমে আল্লাহ্ ফিহর সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছেন।"

ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণনা করেন, কুসাইয়ের নাম ছিল যায়দ।[১]

কুসাই খুব বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ইতর জনকে সম্মান করে, সেও ইতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। নিজের মর্যাদা অপেক্ষা যে বেশি চায়, সে বঞ্চনার শিকার হয়, আর হিংসুক গুপ্ত শত্রু।"

অন্তিমকালে তিনি স্বীয় পুত্রদের এই নসীহত করেন :

اجتنبوا الخمر فانها تصلح الابدان و تفسد الاذهان

"মদ্যপান থেকে বিরত থাকবে, কারণ তা শরীরকে ঠিক রাখে; কিন্তু মস্তিষ্ককে বিকৃত করে দেয়।" (যেমনটি মক্কা মুকাররামার মুফতী যায়নি যাহ্লান রচিত সীরাতুন-নববী, ১খ. পৃ. ৮-এ উল্লেখ করেছেন)।

কুসাই আরবে বিশেষ নেতৃত্বে আসীন হন। সমস্ত লোক তাঁর অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল। কুসাই 'দারুন নাদওয়া' নামে একটি পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজের পরামর্শ করা হতো। বিবাহ, পারিবারিক এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে ঐ সভায় পরামর্শ করা হতো। বাণিজ্যের যে কাফেলা যাত্রা করতো, তারাও এখান থেকেই যাত্রা শুরু করতো। ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকালেও প্রথমে দারুন নাদওয়াতে উপস্থিত হতো, যেন দারুন নাদওয়া আরববাসীর প্রশাসনিক ভবন ও পার্লামেন্ট ছিল। কাবায় গিলাফ পরানো, হাজীদের পানি পান করানো, সাহায্য এবং পরামর্শ এসব কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন কেবল কুসাই এবং তিনিই এ

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩।

সর্বপ্রকারের গুরুত্বপূর্ণ সেবাকার্যের যিম্মাদার ছিলেন। তাঁর পর এসব সেবা ও পদবী বিভিন্ন সপ্রদায়ের মধ্যে বন্টিত হয়।[১]

এছাড়া কুরায়শদের আরো দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল, যেমনটি আল্লামা হাফিয আইনী উমদাতুল কারী, শরহে বুখারী, মানাকিবে কুরায়শ অধ্যায় (৭খ. পৃ. ৪৮৬)-তে বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন যা আমরা পাঠকদের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উপস্থাপন করছি :

১. হিজাবাত : আল্লাহর ঘরের পাহারা এবং মসজিদের খিদমত—এ খিদমতের ভার বনী আবদেদ্দারকে দেয়া হয়েছিল, যা হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) আনজাম দেন।

২. সিকায়াত : হাজীদেরকে যমযমের পানি পান করানো—বনী হাশিমকে এ খেদমতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। বনী হাশিমের পক্ষে হযরত আব্বাস (রা) এ খেদমত আনজাম দেন।

৩. রিফাদাত : ফকীর-মিসকীন, হাজী ও মুসাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা—এ উদ্দেশ্যে অভাবীদেরকে সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছিল। এ তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল বনী নওফেলের পক্ষে ওয়ারিস ইবন আমের-এর উপর।

৪. ইমারত : মসজিদুল হারাম ও বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ, নির্মাণ ও মেরামতের দায়িত্ব বনী হাশিমের পক্ষে হযরত আব্বাস (রা)-এর উপর ছিল।

৫. সাফারাত : দু'পক্ষের বিরোধের সময় দুতিয়ালী করা—এ খিদমতের দায়িত্ব বনী আদীর পক্ষে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) পালন করতেন।

৬. নাদওয়া : পরামর্শ সভা—এ সভার আমীর ছিলেন ইয়াযীদ ইবন জামআ ইবন আসওয়াদ।

৭. কুব্বা : যুদ্ধের সময় সেনা ছাউনীর ব্যবস্থা করা—এ দায়িত্ব বনী মাখযূমের উপর ন্যস্ত ছিল। বনী মাখযূমের পক্ষে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) এ দায়িত্ব পালন করতেন।

৮. লিওয়া : পতাকা বহন, একে উকাবও বলা হয়—এ দায়িত্ব বনী উমায়্যা পালন করতো, যা তাদের পক্ষে আবূ সুফিয়ান উমূবী [হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর পিতা] পালন করতেন।

৯. আইন্না : যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ঘোড়দৌড়ের সময় ঘোড়া ও সওয়ারীর দেখাশোনা করা—এ খিদমতও বনী মাখযূমের পক্ষে হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) পালন করতেন। এটা এজন্যে যে, তিনি জাহিলী যুগেও যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন এবং خياركم فى الجاهلية خياركم فى الاسلام —"তোমাদের মধ্যে যে জাহিলী যুগে উত্তম ছিল, সে ইসলামী যুগেও উত্তম"—এ বাক্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

---

১. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৩৯।

১০. ইশনাক : গোত্রসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে দিয়ত, জরিমানা ইত্যাদি আদায় করা, যে ব্যক্তির দিয়ত পরিশোধের সামর্থ্য নেই, তাকে সাহায্য-সহায়তা করা—এ দায়িত্ব বনী তায়মের পক্ষে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উপর ন্যস্ত ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যে কাজের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতেন, কুরায়শ গোত্র তাঁর পক্ষ নিত এবং জান-প্রাণ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করতো। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছাড়া অন্য কেউ এ নেতৃত্ব গ্রহণ করলে কুরায়শ তাকে সাহায্য করতো না।

১১. আমওয়ালে মুহাজ্জারা : দানকৃত সম্পদ, যা দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ করা হতো, বনী সাহম-এর পক্ষে হারিস ইবন কায়স এ সম্পদের মুতাওয়াল্লী ছিলেন।

১২. আইসার ওয়া আযলাম : তীর নিক্ষেপের দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা ও যাত্রার শুভাশুভ চিহ্নিত করা—বনী খাযরাজের পক্ষে সাফওয়ান ইবন উমায়্যা এ ভাগ্য নির্ণয়ের পরিচালক ছিলেন।

আবদে মানাফ : ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, আবদে মানাফের নাম ছিল মুগীরা। তিনি দেখতে খুবই সুঠাম ও সুন্দর ছিলেন। এজন্যে তাঁকে 'কামারুল বাতহা'ও বলা হতো।[১]

মূসা ইবন উকবা বর্ণনা করেন, কোন কোন প্রস্তরখণ্ডে এ ধরনের লিখাও পাওয়া গেছে :

انا المغيرة بن قصى امر بتقوى الله وصلة الرحم

"আমি কুসাই পুত্র মুগীরা আল্লাহকে ভয় করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছি।"[২]

হাশিম : ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, হাশিমের নাম ছিল আমর। মক্কায় তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল, হাশিম ঝোলের মধ্যে টুকরা করা রুটি মক্কাবাসীকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্যে তাঁর নাম দেয়া হয় হাশিম। হিশম অর্থ চূর্ণ করা এবং এর اسم فاعل বা কর্তৃবাচক বিশেষ্য হলো হাশিম।

عمر والعلا هشم الثريد لقومه و رجال مكة مسنتون عجاف

"উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আম্‌র নিজ সম্প্রদায় এবং সমস্ত মক্কাবাসীকে সরীদ প্রস্তুত করে খাইয়েছেন; আর (এ সময়) মক্কার লোকজন দুর্ভিক্ষের কারণে দুর্বল ও অসমর্থ ছিল।"

একবার নয়, বরং বারবার তিনি মক্কাবাসীর খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাঁর দস্তরখান ছিল খুবই প্রশস্ত। সব ধরনের লোকের জন্য তাঁর দস্তরখান ছিল উন্মুক্ত। গরীব মুসাফিরকে উট দান করতেন। খুবই সুঠামদেহী ও

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩; রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৬।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৭৩।

সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। নবূওয়াতের নূর তাঁর কপালে চমকাতো। বনী ইসরাঈল আলিমগণ যখন তাঁকে দেখতো, সিজদায় লুটিয়ে পড়তো ও তাঁর হস্ত চুম্বন করতো।

আরবের গোত্রসমূহ ও বনী ইসরাঈলের আলিমগণ বিয়ে করার জন্য নিজেদের কন্যাদের হাশিমের সামনে পেশ করতো। এমনকি একবার রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস হাশিমকে পত্র লিখলেন যে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব ও ঔদার্যের খবর আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী আমার শাহজাদীকে আপনার সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করি। আপনি এখানে চলে আসুন যাতে আমি আমার ইচ্ছে পূর্ণ করতে পারি। হাশিম শাহজাদীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করেন। রোম সম্রাটের উদ্দেশ্য ছিল যে, ঐ নবূওয়াতের নূর, যা হাশিমের কপালে চমকাতো একে নিজের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া। বলা হয়ে থাকে যে, মৃত্যুকালে হাশিমের বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।[১]

হাশিমই প্রথমে কুরায়শদের মধ্যে এ প্রথা চালু করেন যে, বাণিজ্য কাফেলা বছরে মাত্র দু'বার যাত্রা করবে, গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার দিকে এবং শীতকালে ইয়েমেনের দিকে। এ প্রথা অনুযায়ী প্রতি মৌসুমে কাফেলা যাত্রা করতো। নিথর প্রান্তর, শুষ্ক মরুভূমি ও জল-স্থল অতিক্রম করে শীত মৌসুমে ইয়েমেন এবং আবিসিনিয়া পর্যন্ত পৌঁছতো। আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী হাশিমকে আতিথেয়তা করতেন এবং উপঢৌকন দিতেন। আর গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়া, গাযা ও আঙ্কারা (যা তৎকালে রোম সম্রাটের রাজধানী ছিল) পর্যন্ত পৌঁছতেন। রোম সম্রাটও হাশিমকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও উপঢৌকনাদি প্রদান করতেন। তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ (১খ. পৃ. ৪৩) একটি কবিতা বর্ণিত আছে :

سفرين سنها له ولقومه سفر الشتاء ورحلة الاصياف

"হাশিম নিজ সম্প্রদায়ের জন্য দু'টি সফরের প্রথা চালু করেন, এক সফর শীতকালীন এবং দ্বিতীয় সফর গ্রীষ্মকালীন।" —মা'আলিমুত তানযীল

হাশিম ইয়েমেন ও রোম শাসকের নিকট থেকে এ বাণিজ্য কাফেলার জন্য বাণিজ্য সহযোগিতা ও নিরাপত্তার নির্দেশনামা সংগ্রহ করেন। আরবের পথঘাট যেহেতু সাধারণত নিরাপদ ছিল না, তাই তিনি পথিপার্শ্বের গোত্রগুলোর সাথে এ মর্মে চুক্তি করেন যে, আমরা তোমাদের প্রয়োজন মেটাবো, বিনিময়ে তোমরা আমাদের বাণিজ্য কাফেলার ক্ষতি করতে পারবে না। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৪৫)

হাশিমের এ প্রচেষ্টার ফলে সমস্ত পথঘাট নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরায়শকে এ পুরস্কারের কথা এ বলে স্মরণ করিয়ে দেন :

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ٥ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٥ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ٥
الَّذِىْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ٥

১. যারকানী, ১খ. পৃ.৭২।

"যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের, ওরা ইবাদত করুক এই গৃহের রক্ষকের, যিনি ওদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে ওদের রক্ষা করেছেন।" (সূরা কুরায়শ : ১-৪)

যখন হজ্জের সময় এসে পড়তো, হাশিম হাজীদেরকে গোশত রুটি, খেজুর, ছাতু ইত্যাদি খাওয়াতেন এবং যমযমের পানি পান করাতেন। মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতেও তিনি এভাবেই খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতেন।

উমায়্যা ইবন আবদুশ শামস হাশিমের এ মান-মর্যাদা ও সমগ্র আরবে তাঁর আধিপত্য অসহনীয় ও কঠিন মনে করলেন। তিনিও হাশিমের মত জনগণকে খাদ্যদানের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রাচুর্য ও দৌলতের স্বল্পতাহেতু উমায়্যা হাশিমের মুকাবিলা করতে সক্ষম হননি। বনী হাশিমের সাথে বনী উমায়্যার শত্রুতার সূচনা এখান থেকেই হয়।

একবার হাশিম বাণিজ্য কাফেলার সাথে যাত্রা করেন। পথে মদীনা মুনাওয়ারায় যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে বাজারে একটি স্ত্রীলোক তাঁর চোখে পড়ে। অপূর্ব সুন্দরী হওয়া ছাড়াও তার চেহারায় আভিজাত্য, নিষ্কলুষতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ বিদ্যমান ছিল। হাশিম খোঁজ নিলেন স্ত্রীলোকটি বিবাহিত না অবিবাহিত। জানা গেল সে আসীহা ইবন জাল্লাহ-এর স্ত্রী ছিল। সে গর্ভে উমর এবং মাব'আদ নামক দু'টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। পরে আসীহা তাকে তালাক দেয়।

হাশিম তাকে বিয়ের প্রস্তাব করেন। হাশিমের আভিজাত্য ও আত্মসম্মান লক্ষ্য করে স্ত্রীলোকটি তার প্রস্তাব গ্রহণ করে; ফলে বিয়ে হয়ে যায়। স্ত্রীলোকটির নাম ছিল সালমা বিনতে আম্‌র। তারা ছিল বনী নাজ্জার গোত্রভুক্ত। বিয়ের পর হাশিম ভোজের আয়োজন করেন, যাতে সমগ্র কাফেলার লোক অংশগ্রহণ করে। এছাড়া খাযরাজ গোত্রের কিছু লোককেও দাওয়াত দেয়া হয়।

বিয়ের পর হাশিম কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করেন। আর সালমা গর্ভবতী হয়ে যান। যার ফলে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পর তার মাথায় একটি চুল সাদা ছিল, ফলে তার নাম শায়বা (বৃদ্ধ) রাখা হয়। হাশিম কাফেলার সাথে গাযা রওনা হন। গাযায় পৌঁছে তিনি ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।[১]

আবদুল মুত্তালিব : আবদুল মুত্তালিবের নাম ছিল শায়বাতুল হামদ। নামটি পরিবর্তনের পেছনে রয়েছে একটি ঘটনা। হাশিমের ইনতিকালের পর আবদুল মুত্তালিবের মাতা দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারায় স্বীয় গোত্র বনী খাযরাজের সাথে অবস্থান করেন। যখন পুত্র শায়বা একটু বড় হন, তখন তার চাচা মুত্তালিব তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে মদীনা আসেন। যখন তাকে নিয়ে ফিরে যান তখন মক্কায় প্রবেশের সময় শায়বা স্বীয় পিতৃব্য মুত্তালিবের পিছনে উটের পিঠে বসা ছিলেন। তার

---

১. ইবন সা'দ, তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪৫-৪৬।

পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল ময়লা ও ধূলিমলিন। চেহারা থেকে অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠছিল। লোকজন মুত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলো ছেলেটি কে ? তিনি লজ্জাবশত জবাব দিলেন, এটি আমার গোলাম, যাতে লোকজন এটা বলতে না পারে যে ভ্রাতুষ্পুত্রের পোশাকাদি এতো নোংরা। এ কারণে শায়বাতুল হামদ আবদুল মুত্তালিব নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। মুত্তালিব মক্কায় পৌঁছে ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তম পোশাক বানিয়ে দিলেন এবং সকলের কাছে প্রকাশ করলেন যে, এটি আমার ভাই-পো।[১]

তিনি দৃষ্টিকাড়া সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কবি বলেন :

على شيبة الحمد الذى كان وجهه   يضيئى ظلام الليل كالقمر البدرى

"পূর্ণিমার চাঁদের মতো শায়বাতুল হামদ-এর চেহারা, অন্ধকার রাতকে করে আলোকিত।"

ইবন সা'দ স্বীয় তাবাকাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, সমস্ত কুরায়শের মধ্যে আবদুল মুত্তালিব সবচে' সুন্দর সবচে' বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, সবচে' বেশি ধৈর্য ও সহ্যশক্তির অধিকারী, সবচে' বেশি দাতা ও দয়ালু এবং খারাপ কাজ ও ঝামেলা থেকে বেশি দূরে অবস্থানকারী ছিলেন, আর তিনি ছিলেন কুরায়শদের মনোনীত সর্দার।[২]

আবদুল মুত্তালিবের দয়া-দাক্ষিণ্য তাঁর পিতা হাশিমের চেয়ে বেশি ছিল। তাব মেহমানদারী মানুষের পর্যায় অতিক্রম করে পশু-পাখি পর্যন্ত পৌঁছায়। এ কারণে আরববাসী তাঁকে 'ফাইয়্যায' (পরম দাতা) ও مطعم طير السماء (আকাশের পাখিদের খাদ্যদানকারী) উপাধি দ্বারা স্মরণ করতো। মদ্যপানকে তিনি নিজের জন্য হারাম করে নেন। পবিত্র রমযান মাস এলে তিনি ফকীর-মিসকীনকে খাদ্যদানের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন। হেরা গুহায় নির্জন ইবাদতের সূচনা আবদুল মুত্তালিবই করেছিলেন।[৩]

যমযমেব কূপ এবং আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

জুরহুম গোত্রের প্রকৃত বাসস্থান ছিল ইয়েমেন। তাদের দুর্ভাগ্যবশত ইয়েমেনে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ কারণে বনী জুরহুম উপার্জনের সন্ধানে বের হয়। ঘটনাক্রমে চলার পথে হযরত ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাতা হযরত হাজেরা (আ)-এর সাথে যমযম কূপের নিকট সাক্ষাত ঘটে। বনী জুরহুমের জায়গাটি পছন্দ হয় এবং তারা সেখানেই বসবাস শুরু করে। এর কিছুদিন পর ঐ গোত্রের মেয়ের সাথেই ইসমাঈল (আ)-এর বিয়ে হয়। তিনি নবী হিসেবে আমালিকা, জুরহুম ও ইয়েমেনবাসীর প্রতি প্রেরিত হন। একশত ত্রিশ বছর বয়সে ইসমাঈল (আ) ইনতিকাল করেন। হাতীমে তার মাতার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়। তার ইনতিকালের পর ওসীয়ত অনুযায়ী তার পুত্র কায়দার কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী হন। এভাবেই ইসমাঈল (আ)-এর

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।
২ আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫১।
৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৭১।

বংশ থেকে কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী হতে থাকে। দীর্ঘকাল পরে ইসমাঈল বংশধর ও বনী জুরহুমের মধ্যে মতানৈক্য ও বিবাদের সূচনা হয়। অবশেষে বনী জুরহুম বিজয়ী হয় ও মক্কার কর্তৃত্ব তাদের হাতে এসে যায়। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর জুরহুম শাসকগণ জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু করে। তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসমাঈলের বংশধরগণ মক্কা ছেড়ে এর চতুষ্পার্শ্বে দূরে গিয়ে বসবাস শুরু করে। জুরহুমের অন্যায়-অত্যাচার, পাপাচারিতা এবং কাবার অসম্মানকরণ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মক্কার চারপাশের সমস্ত আরব গোত্র তাদের সাথে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হয়। অগত্যা জুরহুমগণকে মক্কা ত্যাগ করে পলায়ন করতে হয়। কিন্তু যখন তারা মক্কা ত্যাগ করা শুরু করে, তখন কা'বার মূল্যবান দ্রব্যাদি যমযম কূপে নিক্ষেপ করে এবং যমযম কূপকে মাটি ভরাট করে এভাবে বন্ধ করে যে যমীন সমান হয়ে যায়। এমনকি যমযমের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না।

বনী জুরহুম মক্কা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর বনী ইসমাঈল পুনরায় মক্কায় ফিরে আসে এবং বসতি স্থাপন করে। কিন্তু যমযম কূপের প্রতি কেউ নজর দেয় নি। কালের আবর্তনে এর নাম-নিশানা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি যখন মক্কার শাসনভার ও নেতৃত্ব আবদুল মুত্তালিবের হাতে আসে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় ঐদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় যে, যমযম কূপ যা দীর্ঘদিন যাবত বন্ধ রয়েছে এবং যার নাম-নিশানাও মুছে গেছে একে দৃশ্যমান করা হোক। তখন সত্য স্বপ্ন দ্বারা আবদুল মুত্তালিবকে ঐ জায়গা খননের নির্দেশ দেয়া হয়। জায়গার চিহ্ন ও আলামতসমূহও স্বপ্নে দেখিয়ে দেয়া হয়। যেমনটি আবদুল মুত্তালিব বলেছেন :

"আমি হাতীমে ঘুমিয়ে ছিলাম। এমন সময় দেখলাম এক আগন্তুক আমার নিকটে এলো এবং স্বপ্নে আমাকে বললো, احفر برة। অর্থাৎ 'কূপটি খনন কর।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কূপটি ? ততক্ষণে ঐ লোকটি চলে গেলো। পরদিন আবার ঐ জায়গায় ঘুমালাম। স্বপ্নে দেখলাম ঐ ব্যক্তি এসে বললো, احفر المضنونة। 'মাযনূনা খনন কর।' আমি প্রশ্ন করলাম, মাযনূনা কি ? কিন্তু লোকটি চলে গেল। তৃতীয় দিন পুনরায় একই জায়গায় ঘুমালাম। দেখলাম, ঐ ব্যক্তি এসে বললো, احفر طيبة। –'পবিত্র স্থান খনন কর।' আমি শুধালাম, তায়্যেবা কি ? কিন্তু লোকটি চলে গেল। চতুর্থ দিন ঠিক একই জায়গায় স্বপ্নে দেখলাম, ঐ ব্যক্তি এসে বলছে, احفر زمزم। 'যমযম খনন কর।' আমি শুধালাম, যমযম কি ? সে বললো, لا تنزف ابدا ولا تزم تسقى الحجيج الاعظم 'এটি পানির একটি কূপ, যার পানি কখনো নষ্টও হয় না আর কমেও না। অসংখ্য হাজীর পিপাসা নিবৃত্ত করে।"

অতঃপর তিনি সেই স্থানটির কিছু নিদর্শন ও চিহ্ন বলে দিয়ে সেই স্থান খুঁড়তে বলে। এভাবে বারবার স্বপ্নে দেখানো এবং নিদর্শন দেখানোর ফলে আবদুল মুত্তালিবের বিশ্বাস হলো যে এটা সত্য স্বপ্ন।

তিনি কুরায়শদেরকে নিজের স্বপ্নের কথা বলেন এবং এও বলেন যে, আমি ঐ জায়গা খুঁড়ে দেখতে চাই। কুরায়শরা এর বিরোধিতা করে। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব এ বিরোধিতার পরোয়া করলেন না, বরং কোদাল ইত্যাদি নিয়ে নিজ পুত্র হারিস সহ ঐ স্থানে পৌঁছলেন এবং চিহ্নিত স্থান খুঁড়তে শুরু করলেন। তিনি নিজে খুঁড়ছিলেন এবং পুত্র হারিস মাটি তুলে দূরে ফেলছিলেন। তিনদিন খোঁড়ার পর এর চিহ্ন দেখা গেল। আবদুল মুত্তালিব খুশিতে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং বললেন : هذا طوى اسماعيل "এটাই ইসমাঈল (আ)-এর কূপ।"

এরপর আবদুল মুত্তালিব যমযমের নিকটে কিছু হাউয নির্মাণ করালেন—যাতে হাজীদের পান করানোর জন্য পানি ভরে রাখা হতো। কিছু দুষ্কৃতকারী অপকীর্তি শুরু করলো। তারা রাতে এসে হাউযগুলো নোংরা করে রেখে যেত। যখন প্রভাত হতো, আবদুল মুত্তালিব সেগুলো পরিষ্কার করতেন। অবশেষে অতীষ্ঠ হয়ে এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট দু'আ করেন। তখন স্বপ্নযোগে তাঁকে বলা হয়, তুমি এ দু'আ করো : اللهم انى لا احلها المغتسل ولكن هى لشارب حل "হে আল্লাহ্ আমি এ যমযমের পানিতে লোককে গোসলের অনুমতি দিই না, শুধু পান করার অনুমতি দিই।"

সকালে উঠেই আবদুল মুত্তালিব এটা ঘোষণা করে দেন। এরপর যে কেউ এ হাউজ নষ্ট করার ইচ্ছা করতো, সেই কঠিন অসুখে পতিত হতো। যখন বারবার এ ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলো, তখন দুষ্কৃকারীরা আবদুল মুত্তালিবের হাউজের বিরোধিতা করা ছেড়ে দিল। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ইবন সা'দ-এর তাবাকাতে (পৃ. ৪৯-৫০); খাসাইসুল কুবরায় (১খ. পৃ. ৪৩-৪৪); যারকানী (১খ. পৃ. ৯৪) এবং ইবন কাসীর-এর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (২খ. পৃ. ২৪৪) উল্লিখিত আছে।

আবদুল মুত্তালিবের মান্নত

যমযমের কূপ খননকালে একমাত্র হারিস ছাড়া আবদুল মুত্তালিবের আর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না। এজন্যে তিনি মান্নত করলেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে দশটি পুত্র সন্তান দান করেন, আর তারা যদি জাওয়ান হয়ে আমার বল বৃদ্ধি করে, তা হলে আমি তাদের মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবো। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর এ ইচ্ছা পূর্ণ করলেন এবং দশটি পুত্রই যুবা বয়সে উপনীত হলো, তখন একদিন তিনি কাবাঘরের সামনে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন, يا عبد المطلب اوف بنذرك لرب هذا البيت "হে আবদুল মুত্তালিব ! এ গৃহের মালিকের উদ্দেশে তোমাব মান্নত পূর্ণ কর।"

আবদুল মুত্তালিব জাগ্রত হয়ে তাঁর সব পুত্রকে ডাকলেন এবং নিজ মান্নতের কথা ও স্বপ্নের কথা তাদেরকে বললেন। তখন সব পুত্র একবাক্যে বললেন, اوف بنذرك وافعل ما شئت "আপনার মান্নত আপনি পূর্ণ করুন, যা ইচ্ছে হয় করুন।"

আবদুল মুত্তালিব তাঁর সব পুত্রের নামে লটারী করলেন। প্রসঙ্গক্রমে আবদুল্লাহর নামই উঠলো—যাকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। তিনি আবদুল্লাহর হাত ধরে কুরবানীর স্থানের দিকে নিয়ে চললেন, হাতে ছুরিও ছিল। এ অবস্থা দেখে আবদুল্লাহর বোনেরা কান্নাকাটি শুরু করলো। ওদের এক বোন বললো, বাবা আপনি দশটি উট ও আবদুল্লাহর মধ্যে লটারী করুন। যদি দশ উটের পক্ষে লটারী উঠে তা হলে দশটি উট কুরবানী করুন আর আমাদের ভাইকে ছেড়ে দিন। সে সময়ে হত্যার বিনিময়ে দিয়াত হিসেবে দশটি উট নির্ধারণ করা হতো।

লটারী করা হলেও এতে আবদুল্লাহর নামই উঠলো। আবদুল মুত্তালিব দশটি দশটি করে উট বাড়িয়ে লটারী করতেই থাকলেন, কিন্তু প্রতিবারই আবদুল্লাহর নামই উঠতে থাকলো। এমনকি এভাবে যখন একশ' উট পূর্ণ হলো, তখন আবদুল্লাহর পরিবর্তে উটের নাম উঠলো। আবদুল্লাহ সহ উপস্থিত সবাই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। বোনেরা ভাইকে তুলে নিয়ে গেল। আবদুল মুত্তালিব সাফা মারওয়া পাহাড়েব মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে একশত উট কুরবানী করলেন।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, প্রথমে দিয়াতের পরিমাণ ছিল দশটি উট। আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম কুরায়শ এবং আরব জাহানে একশত উট দিয়াত প্রথার প্রচলন করেন। আর নবী করীম (সা) ও এ প্রথা চালু রাখেন। এ ঘটনার পর থেকে আবদুল্লাহকে 'যবীহ' উপাধি দেয়া হয়, আর নবী করীম (সা) কে 'ইবনুয-যবীহায়েন' অর্থাৎ দু'যবীহ-এর সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, একবার আমরা মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপবিষ্ট ছিলাম, ইত্যবসরে এক বেদুঈন এলো এবং নবী (সা)-কে এভাবে সম্বোধন করলো, يا ابن الذبيحتين 'হে দু'যবীহ-এর পুত্র !' এতে তিনি মুচকি হাসলেন। হযরত মুআবিয়া যখন এ হাদীস বর্ণনা সমাপ্ত করলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ প্রশ্ন করলো, ঐ দু'যবেহ কোনটি ? তখন হযরত মুআবিয়া (রা) আবদুল্লাহর ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করে বললেন, এক তো আবদুল্লাহ আর দ্বিতীয়জন হচ্ছেন হযরত ইসমাঈল (আ)।[৩] (হাকিম এবং ইবন জারীর এটি বর্ণনা করেছেন)।

আল্লামা যারকানী বলেন, কুরায়শগণ যখন বাৎসরিক দুর্ভিক্ষের মৌসুমে পড়তো তখন আবদুল্লাহকে সাবীর পাহাড়ে নিয়ে যেত এবং তাঁর উসীলায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতো। কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, কুরায়শদের সমস্যা আবদুল মুত্তালিবের উসীলায় সমাধান হয়ে যেত।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

২. হযরত ইসমাঈল (আ) ও পিতা আবদুল্লাহ।

৩. হাকিম ও ইবন জুবায়রের উদ্ধৃতিসহ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪৫।

সাধারণ আরব থেকে তাঁর বৈশিষ্ট্যই ছিল আলাদা। নিজ সন্তানদের তিনি অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন এবং উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতেন, তাদের নিম্ন ও নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত রাখতেন।

আবদুল মুত্তালিব মান্নত পুরা করার প্রতি গুরুত্ব দিতেন এবং মুহরিম (যেমন, বোন ফুফু খালা ইত্যাদি) স্ত্রীলোককে বিয়ে করতে বারণ করতেন। মদ্যপান, ব্যভিচার, কন্যা সন্তান হত্যা এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে বাধা দিতেন। তিনি চোরের হাত কাটার বিধান দিতেন (যারকানী, ১খ. পৃ. ৮২)। আর এগুলো সবই এমন কর্ম, (পরবর্তীকালে) কুরআন ও হাদীসেও যার সমর্থনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই সীরাতে হালবিয়া গ্রন্থে আল্লামা ইবনুল জাওযী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব থেকে যে সব কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে, এর অধিকাংশই কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ মান্নত পুরা করা, মুহরিমকে বিয়ে নিষিদ্ধ করা, চোরের হাত কাটা, কন্যা সন্তানকে জীবিত কবর দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা, মদ্যপান ও ব্যভিচারে নিষেধাজ্ঞা, নগ্নাবস্থায় বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফে নিষেধাজ্ঞা, পরিশেষে এ ঘটনাবলী ও বিষয়াবলী পাঠ করতে গিয়ে স্বভাবতই এ সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে যে, নবূওয়াতের সময় যতই নিকটবর্তী হচ্ছিল ততই উত্তম চরিত্র, সুন্দর শিষ্টাচার, বরকতের নূর এবং চাহিদার উপজীব্যের প্রকাশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষত আবদুল মুত্তালিবের জীবনে সত্য স্বপ্ন, যা পর্যায়ক্রমে দেখানো হচ্ছিল, এটা নবূওয়াতের সূচনা ও প্রারম্ভিকতার মতই। আবদুল মুত্তালিবের সামনে যখনই কোন সমস্যা দেখা দিত, তখনই সত্য স্বপ্ন কিংবা 'ইলহাম' দ্বারা তা সমাধানের পথ-নির্দেশ করা হতো।

সহীহ মুসলিমে হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদের মধ্যে বনী কিনানাকে নির্বাচন করেছেন, আর বনী কিনানার মধ্যে কুরায়শকে এবং কুরায়শের মধ্যে বনী হাশিমকে আর বনী হাশিমের মধ্যে আমাকে নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন। হযরত ইবন সা'দ (রা) বর্ণিত অনুরূপ একটি মুরসাল হাদীসে "বনী হাশিমের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবকে" বাক্যটি অতিরিক্ত আছে।

এরূপ বলার মধ্যে নবী করীম (সা)-এর আত্মগর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্য কোনক্রমেই ছিল না, বরং প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরাই ছিল উদ্দেশ্য—যাতে জনগণ তাঁর অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। অধিকন্তু আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু প্রদত্ত এ নিয়ামতের বর্ণনা প্রকাশই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, রাব্বুল আলামিনের লক্ষ লক্ষ শুকরিয়া, তিনি আমাকে একটি মনোনীত ও পছন্দনীয় বংশ থেকে প্রেরণ করেছেন।

নিজের অহমিকা প্রকাশ ও অপরের কুৎসাকে অহংকার বলে। নিজের সম্মান ও যথার্থ মূল্যায়নের লক্ষ্যে অপরের যিল্লতির প্রকৃত অবস্থা তথ্য হিসেবে তুলে ধরাকে গর্ব বা অহংকার বলা হয় না। এছাড়া নবী ও ওলীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, ওলীর জন্য নিজের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করা আবশ্যকীয় নয়, এমনকি ওলীর নিজের

বিলায়তের প্রকাশও আবশ্যকীয় নয়। হ্যাঁ, তবে যদি কোন সময়ে দীনী কোন বিষয়ে এটা ঘোষণা করা দরকার হয় (তবে তা স্বতন্ত্র)। এর বিপরীতে নবীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এটাই যে, নিজ নবূওয়াত ও রিসালাতের মতই তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত কামালাতেরও প্রচার করেন, যাতে উম্মত তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে পারে এবং তাঁর কামালাত থেকে উপকৃত হতে পারে এবং কোনো কারণে তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীতে কারো বিন্দুমাত্রও সন্দেহের সৃষ্টি না হয়। কারণ আল্লাহ্ না করুন, এরূপ বদ ধারণা কোন দুর্ভাগার ঈমান বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। মোটকথা কেউ তাঁর নবূওয়ত ও রিসালাতের উপর যেমনিভাবে ঈমান এনেছে, ঠিক তেমনিভাবে যেন তাঁর মুস্তফা, মুজতবা সহ সর্বপ্রকারের পসন্দনীয় গুণাবলীর উপরও ঈমান আনতে পারে। এজন্যেই হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : انا سيد ولد ادم ولا فخر। "আমি সমস্ত বনী আদমের সর্দার, এটা গর্ব করে বলছি না (বরং বাস্তব অবস্থা জানাবার জন্য বলছি)।"

এ জন্যে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ হলো :

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ –

–"হে রাসূল ! যা তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি না কর, তা হলে তুমি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলে না।"
(সূরা মায়িদা : ৬৭)

তাই নবূওয়াত ও রিসালাতের স্বার্থেই এই নির্দেশের ভিত্তিতে স্বীয় মর্যাদার কথা প্রচার করাও অত্যন্ত জরুরী। এটা অহংকার প্রকাশের জন্য নয়।

এক হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, জিবরাঈল (আ) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত জমি চষে বেড়িয়েছি; কিন্তু বনী হাশিম অপেক্ষা উত্তম কাউকেই পাইনি। হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিবরানী উদ্ধৃত করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, হাদীসটিতে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার সমুদয় শর্তই বিদ্যমান।[১]

হাকিম তিরমিযী বলেন, জিবরাঈল (আ) পবিত্র আত্মার সন্ধানে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু যুগটা যেহেতু জাহিলিয়াতের ছিল, সেহেতু জিবরাঈল (আ) মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেননি; বরং প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি দেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণভাবে আরববাসী এবং বিশেষভাবে বনী হাশিম থেকে উত্তম কাউকে পাননি। এই সময়ে তারা পৃথিবীর অপরাপর জাতিগোষ্ঠী থেকে কতিপয় বিষয়ে এমন মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল যে, আর কোন সম্প্রদায় এর সমমানসম্পন্ন এবং সমপর্যায়ের ছিল না।

---

১. যারকানী, ১খ, পৃ. ৬৮।

বংশ পরিচিতি : আরবে বংশ পরিচিতি অতীব গুরুত্ববহ ছিল। সেখানে মানুষ তো বটেই, ঘোড়ার পর্যন্ত বংশ পরিচিতিও স্মরণ রাখা হতো। এটাও স্মরণ রাখা হতো যে, কে স্বাধীন নারীর গর্ভজাত আর কে বাঁদীর গর্ভে জন্মগ্রহণকারী। কে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে আর কে নিম্ন কৃষ্টির অনুসারী বংশীয় স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে। যেমনটি ইবনুল আকওয়া (রা)-এর বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেছিলেন : انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع "আমি আকওয়ার পুত্র, আর আজ বুঝা যাবে যে, কে সম্ভ্রান্ত স্বাধীন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করেছে আর কে দাসীর দুধ পান করেছে।"

অনুরূপ জাহিলী যুগের এক কবি নিজ বংশ পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন, যদিও তা অহংবোধ-দুষ্ট। যেমন :

لو كنت من مازن لم تستبح ابلى   بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

"যদি আমি মাযিন গোত্রের সন্তান হয়ে থাকি, তা হলে যুহল ইন শায়বান গোত্রের লোক রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা মহিলার পুত্র কক্ষণই আমার উট ধরতে পারবে না।"

প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে 'বনী লাকীত' তথা 'রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা' শব্দদ্বারা আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ সে কোন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান নয়।

বীরত্ব : তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা এমন ছিল, যে সময় সমগ্র পৃথিবী যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিল, সে সময়ও আরবগণ তাদের দৈন্যদশা সত্ত্বেও কারো অধীন ছিল না। সাহসিকতার অবস্থা এমন ছিল যে একজন তুচ্ছ ফকীরও পরাক্রমশালী বাদশাহর সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত হতো না।

দানশীলতা ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দান : আরবদের দানশীলতার অবস্থা এমন ছিল যে, একজন মেহমানের জন্য তারা আস্ত একটা উট যবেহ করে ফেলতো। তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকাটা মামুলী ব্যাপার; কিন্তু মেহমানের অভুক্ত থাকাটা অসম্ভব অবমাননাকর মনে করতো।

স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধা : আরবদের স্মরণশক্তি ও তীক্ষ্ণ মেধার কথা পৃথিবীজোড়া। শত শত কবিতা ও কাসীদা তারা একবার শুনেই মনে রাখতে পারতো।

আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমবোধ : তাদের আত্মসম্মান ও সম্ভ্রমবোধের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাদের নিজের অথবা নিজ সম্প্রদায়ের সর্বনিকৃষ্ট সদস্যটির অপমানের প্রতিবাদেও তারা নিজেদের জানমাল পানির মতো ব্যয় করতো। মাত্রাতিরিক্ত আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই তাদের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ বিগ্রহ বেশিরভাগ সংঘটিত হতো।

ভাষার প্রাঞ্জল্য ও বিশুদ্ধতা প্রাঞ্জল্য ও বিশুদ্ধতায় কোন ভাষাই আরবীর ধারেকাছেও ছিল না। ভাষার প্রাঞ্জল্যের উপর তো কোন ভাষায় পৃথক কোন পুস্তকই

নেই। যদি কিছু থেকে থাকে, তা আরবী ভাষা থেকেই গৃহীত ও ধারণকৃত। প্রকৃতি তাদের স্বভাব চরিত্রে, সৃষ্টি আধিপত্যে পরিপূর্ণতার এই মণি-মাণিক্য দান করেছিল, কিন্তু মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে এটা কেবল অপাত্রে ব্যবহৃত হতো। অতঃপর যখন প্রভু প্রদত্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল, তখন এই সম্প্রদায় যারা কর্মে পশু থেকেও নিকৃষ্ট ছিল, তারা ফেরেশতাতুল্য উত্তম ও উন্নত চরিত্রের হয়ে গেল। আর এই সপ্রদায়, যারা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল, যখন আল্লাহর পথে জীবনোৎসর্গ ও মস্তকদানের জন্য দাঁড়িয়ে গেল, তখন আসমানের ফিরিশতাগণও শ্বেত উত্তরীয় ও কৃষ্ণ পাগড়ী বেঁধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। মোটকথা, আরববাসীগণ যদিও অনেকক্ষেত্রে ক্রিয়াকর্মের দিক থেকে তখন উত্তম ছিল না; কিন্তু চরিত্র,[1] প্রতিভা, স্বভাব-প্রকৃতি এবং যোগ্যতার দিক দিয়ে খুবই অগ্রগামী ছিল। কর্মের পরিশুদ্ধি সহজতর, কিন্তু স্বভাব-চরিত্র এবং অভ্যাস বদলে ফেলা অসম্ভব। এজন্যে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু নিজের নবূওয়াত ও রিসালাতের জন্য এই বংশকে নির্বাচন করেন যাতে করে এই সম্প্রদায়ে যে নবী পয়দা হবেন, তিনি পরিপূর্ণ চরিত্র, উত্তম স্বভাব, উৎকৃষ্ট আচরণবিশিষ্ট হবেন। তাই নবীর জন্য পরিপূর্ণ চরিত্রবান হওয়া একান্তই আবশ্যক যাতে অন্যরা তা দেখে নিজেদের সংশোধন করতে পারে।

আবদুল্লাহ্ : হাফিয আসকালানী বলেন, নিঃসন্দেহে এটা নবী (সা)-এর পিতার নাম।[2] এটা ঐ নাম, যা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "ঐ দু'টি নাম আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, একটি আবদুল্লাহ্ এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান" (মুসলিম)। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ শব্দটি ইসমে আযম—যেমনটি ইমাম আবূ হানীফা (নুমান) (র) থেকে বর্ণিত আছে, যা ইমাম তাহাবী স্বীয় মুশকিলুল আসার গ্রন্থে (১খ. পৃ. ৬৩) নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন :

اسم اعظم هست الله العظيم   جان جان و محيى اعظم رميم

"ইসমে আযম আল্লাহুল আযীম আমার প্রাণের প্রাণ, যা আমাকে করে মর্যাদাবান।"

সমস্ত সুন্দর নাম ইসমে আযম আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর অধীন। আল্লাহ্ নামের পর রাহমান নামের মর্যাদা অনুভূত হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী ঐদিকে ইঙ্গিত দান করে : قُلْ اَدْعُ اللّٰهَ اَوادْعُـوا الرَّحْمٰنَ (হে নবী !) "আপনি বলে দিন, তাঁকে আল্লাহ্ নামে ডাকো অথবা রাহমান নামে ডাকো।" এ কারণে ঐ দু'টি নাম সব চেয়ে প্রিয়। প্রথমটি আবদুল্লাহ্ যা ইসমে আযমের সাথে সম্বন্ধযুক্ত এবং দ্বিতীয়টি আবদুর রহমান যা রাহমান নামের সাথে সম্পর্কিত; যার মর্যাদা ইসমে আযমের পরেই।

---

১. হাফিয ইবন তাইমিয়া বলেন ঃ ليس فضل العرب فقريش فبنى هاشم بمجرد كون النبى صلعم منهم وان كان هذا من الفضل بل هم فى انفسهم افضل الى باعتبار الاخلاق الكرام والخصال الحميدة واللسان العربى وبذلك يثبت النبى صلعم انه افضل نفسا ونسها والا الزم الدور যারকানী, ১খ. পৃ. ৬৯

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

আশ্চর্যের কিছু নেই যে, হযরত আবদুল্লাহর জন্মকালীন সময়ে আবদুল মুত্তালিবের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে জাগরূক করে দেয়া হয়েছিল যে, এ পুণ্যময় সন্তানটির এমন একটি নাম রাখো, যা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।

হযরত আমিনার সাথে আবদুল্লাহর বিবাহ

আবদুল মুত্তালিব যখন পুত্র আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে মান্নত আদায় সম্পন্ন করলেন, অতঃপর তাঁর বিয়ের প্রতি মনোনিবেশ করলেন। বনী যোহরা গোত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ গোত্রের ওহাব ইবন আবদে মানাফের কন্যা, যার নাম ছিল আমিনা—যিনি স্বীয় পিতৃব্য উহায়ব ইবন আবদে মানাফের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাঁর সাথে পুত্র আবদুল্লাহর বিয়ের পয়গাম পাঠালেন আর নিজে উহায়বের কন্যা, যার নাম ছিল হালা, তার সাথে স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। একই মজলিসে দু'টি বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। হযরত হামযা ছিলেন তাঁরই গর্ভজাত যিনি সম্পর্কের দিক দিয়ে আবদুল্লাহর চাচাও হতেন, আবার দুধভ্রাতাও।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহকে বিয়ে করানোর জন্য যাত্রা করেন, পথিমধ্যে এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোককে অতিক্রম করেন যার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে মুররা। সে তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ ছিল। আবদুল্লাহর চেহারায় নবূওয়াতের নূর দেখে সে তাকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং প্রস্তাব করলো যে, আমি তোমাকে একশত উট উপহার দেব। হযরত আবদুল্লাহ তার জবাবে এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

اما الحرام فالممات دونه   والحل لاحل فاستبينه
فكيف بالامر الذى تبغينه   يحمى الكريم عرضه ودينه

"হারাম গ্রহণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। আর এমন কাজ মোটেও হালাল নয় যা প্রকাশ করা যায় না। যে অবৈধ কর্মে তুমি আগ্রহী তা আমা দ্বারা সম্ভব নয়। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ তো নিজের আব্রু এবং নিজের দীনের হিফাযত ও সংরক্ষণ করে।

অতঃপর আবদুল্লাহ যখন আমিনাকে বিয়ের পর প্রত্যাবর্তন করছিলেন, পথে পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটির সাথে সাক্ষাত হলো। তখন সে বলল, হে আবদুল্লাহ! তুমি এখান থেকে যাওয়ার পর কোথায় ছিলে? হযরত আবদুল্লাহ বললেন, এ সময়ের মধ্যে আমি ওহাব ইবন আবদে মানাফের কন্যা আমিনাকে বিয়ে করেছি। এরপর সেখানে তিনদিন অবস্থান করেছি। এ কথা শুনে ঐ ইয়াহূদী স্ত্রীলোকটি বলল, আল্লাহর কসম, আমি কোন অসৎ চরিত্রা স্ত্রীলোক নই। তোমার চেহারায় নবূওয়াতের নূর দেখে ইচ্ছে করেছিলাম যে, ঐ নূর আমা থেকে প্রকাশিত হোক। কিন্তু আল্লাহ্ যেখানে চেয়েছেন, সেখানেই ঐ নূর গচ্ছিত রেখেছেন।

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫৮।

এই রিওয়ায়াত দালাইলে আবূ নুআইমে[১] চার পদ্ধতিতে এবং তাবাকাতে ইবন সা'দ[২] -এ তিন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে—যাতে কিছু কিছু বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্যতার প্রামাণ্য মানদণ্ডে দুর্বলও। কিন্তু যে রিওয়ায়াত এ ধরনের বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে, যদি ধরে নেয়া হয় যে, এর প্রতিটি সনদের এক এক রাবী দুর্বল, তবুও হাদীসবিদদের নিকট এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়ার দরুন তা حسن لغيره-এর পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাই যে রিওয়ায়াতের কেবল কোন কোন বর্ণনাকারী দুর্বল এবং এটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত, তা গ্রহণযোগ্য ও অনুসরণীয় হতে দোষ কোথায়? বিশেষ করে এ রিওয়ায়াত তারিখে তাবারীতে (২খ. পৃ. ১৭৫) ও সনদসহ বর্ণিত হয়েছে, যার অধিকাংশ বর্ণনাকারী সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারী।

হযরত আবদুল্লাহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। পথিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়লে মদীনায় যাত্রাবিরতি করেন। বাণিজ্য কাফেলা যখন মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তখন আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলেন আবদুল্লাহ কোথায়? কাফেলার লোকজন জবাব দিল, অসুস্থতার কারণে তিনি মদীনায় তার মাতুল গোষ্ঠী বনী নাজ্জারে রয়ে গেছেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হারিসকে দ্রুত মদীনায় প্রেরণ করেন। মদীনায় পৌঁছে তিনি জানতে পান, হযরত আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেছেন। একমাস রোগ ভোগের পর তিনি ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় 'দারে নাবিগায়' তাঁকে দাফন করা হয়। হারিস ফিরে এসে পিতা আবদুল মুত্তালিব এবং অপরাপর আত্মীয়-স্বজনকে এ দুঃখজনক খবর জানান। যাতে সবাই খুবই দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন।[৩]

হযরত কায়স ইবন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নবী করীম (সা) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই আবদুল্লাহ ইনতিকাল করেন। হাকিম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ; ইমাম যাহবী তা সমর্থন করেছেন।[৪]

ইনতিকালের সময়ে আবদুল্লাহর বয়স মতভেদে ৩০, ২৫, ২৮ কিংবা ১৮ ছিল। হাফিয আলাঈ এবং আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ১৮ বছর এবং আল্লামা সুয়ূতীও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।[৫] মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ পরিত্যাক্ত সম্পদ হিসেবে রেখে যান পাঁচটি উট, কয়েকটি ছাগল এবং একটি বাঁদী যার উপনাম ছিল উম্মে আয়মান আর মূল নাম ছিল বরকত।

---

১. দালাইলে আবূ নুআইম, ১খ. পৃ. ৩৮।

২. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৫৯।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১০৯।

৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২খ. পৃ ৬০৫।

৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ১০৯।

আসহাবে ফীল-এর ঘটনা

রাসূলে করীম (সা)-এর জন্মগ্রহণের পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন দিন পূর্বে আসহাবে ফীল-এর ঘটনা সংঘটিত হয়—যা জীবন চরিত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত হয়ে আছে। আর কুরআন মজীদে এ ঘটনার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে তা এই

আফ্রিকার আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আবরাহা নামক এক ব্যক্তি ইয়েমেনের শাসনকর্তা ছিল। সে যখন দেখল যে, সমস্ত আরববাসী হজ্জ করার জন্য মক্কা মুকাররমায় চলে যায় এবং কা'বাগৃহ তাওয়াফ করে। তখন সে ইচ্ছে করলো যে, খ্রিস্টধর্মের নামে একটি বিরাট ইমারত তৈরি করবে যা খুবই মূল্যবান পাথর দিয়ে পরিশ্রম করে বানানো হবে; যাতে আরববাসীগণ সাদামাটা কা'বাঘর ছেড়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘরটির তাওয়াফ শুরু করে। সুতরাং সে ইয়েমেনের রাজধানী সানআয় একটি সুন্দর গীর্জা নির্মাণ করালো। যখন এ খবর আরবে ছড়িয়ে পড়লো, তখন কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি সেখানে যায় এবং আবরাহার নির্মিত ঘরটিতে মলত্যাগ করে পালিয়ে এলো। এটা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।

কেউ কেউ বলেন, আরবের যুবকরা ঐ গীর্জার নিকটবর্তী স্থানে আগুন জ্বালালে আগুনের ফুলকি উড়ে গিয়ে গীর্জায় পড়ে এবং তা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আবরাহা ক্রোধভরে শপথ নিল যে, কা'বাগৃহকে ধ্বংস ও মিসমার না করে সে দম ফেলবে না। এ উদ্দেশে আবরাহা মক্কার দিকে সেনা অভিযান পরিচালনা করে। পথিমধ্যে যে সব আরব গোত্র বাধা দান করে, তাদেরকে পর্যুদস্ত করে মক্কায় পৌঁছে যায়। এ বাহিনীর সাথে হাতিও ছিল। মক্কার উপকণ্ঠে মক্কাবাসীদের গবাদিপশুর চারণ ভূমি ছিল। আবরাহার বাহিনী পশুগুলোকে লুট করে নেয়, যেগুলোর মধ্যে মহানবী (সা)-এর সম্মানিত পিতামহ আবদুল মুত্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। ঐ সময়ে তিনি কুরাইশ গোত্রের সর্দার ও কাবাগৃহের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। আবরাহার আগমনের খবর শুনে তিনি সমস্ত কুরায়শকে একত্র করে বললেন ভয় পেয়ো না, তোমরা মক্কা খালি করে দাও, কা'বাঘর কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। এটা আল্লাহ্‌র ঘর এবং তিনিই এর হিফাযত করবেন। এরপর আবদুল মুত্তালিব কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কুরায়শসহ আবরাহার সাথে সাক্ষাত করতে যান। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। আবরাহা আবদুল মুত্তালিবকে জাঁকজমকপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। আল্লাহ্ তা'আলা আবদুল মুত্তালিবকে নযীরবিহীন্ রূপ-সৌন্দর্য, আশ্চর্যজনক শক্তি-ক্ষমতার অধিকারী ও প্রাঞ্জলভাষী করেছিলেন, যা দেখে প্রতিটি ব্যক্তিই ভক্তি গদগদ হয়ে পড়তো। আবরাহাও তাঁকে দেখে ভক্তি গদগদচিত্ত হয়ে পড়লো এবং খুবই শ্রদ্ধা ও বিনয়সহ সামনে এলো। এটা তো সম্ভবপর মনে হয়নি যে, তাকে নিজ আসনে একসাথে বসতে দেয়। অবশ্য এতটুকু সম্মান করেছিল যে, নিজে আসন থেকে নেমে এসে কুরায়শদের সাথে কার্পেটে বসে তাদেরকেও নিজের সাথে বসায়। কথা প্রসঙ্গে আবদুল মুত্তালিব তাঁর

উটগুলো ফেরত দেয়ার প্রস্তাব করলেন। আবরাহা অবাক হয়ে বলল, বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তুমি আমার সাথে নিজের উটগুলো ফেরত পাওয়ার জন্য আলোচনা করছ; অথচ কা'বাগৃহ, যা তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মীয় ভিত্তি, সে ব্যাপারে তো একটি কথাও বললে না! আবদুল মুত্তালিব উত্তর দিলেন আমি উটগুলোর মালিক, এজন্যে সেগুলো ফেরত পাওয়ার আগ্রহ করছি। আর কা'বাঘরের মালিক তো আল্লাহ্; তিনি অবশ্যই তা রক্ষা করবেন। আবরাহা কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবদুল মুত্তালিবের উটগুলো ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিল। আবদুল মুত্তালিব উটগুলো নিয়ে ফিরে এলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি কুরায়শদের মক্কা ত্যাগ করতে পরামর্শ দিলেন। উটগুলো কা'বাগৃহের উদ্দেশে উৎসর্গ করলেন এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে কা'বার দরজায় উপস্থিত হয়ে মুনাজাতের মাধ্যমে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আর এ কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করলেন

لاهم ان المرء يمنع   رحله فا منع رحالك

وانصر على ال الصليب   وعابديه اليوم الك

لا يغلبن صليبهم   ومحالهم ابدا محالك

جروا جميع بلادهم   والفيل كى يسبوا عيالك

عمدوا حماك بليدهم   جهلا وما رقبوا جلالك

"হে আল্লাহ, বান্দা তার জায়গার হিফাযত করে, তুমি নিজ গৃহের হিফাযত কর। ক্রুশের অধিকারী এবং ক্রুশের উপাসনাকারীদের মুকাবিলায় তোমার অনুসারীদের সাহায্য কর। ওদের ক্রুশ এবং ওদের প্রচেষ্টা তোমার ইচ্ছার উপর কখনই বিজয়ী হতে পারবে না। সৈন্য-সামন্ত ও হাতি নিয়ে ওরা এসেছে তোমার (ঘরের) প্রতিবেশিদের গ্রেফতার করতে। ওরা এসেছে তোমার হেরেমকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে; মূর্খতার কারণেই তারা এ সংকল্প করেছে; তোমার বড়ত্ব , মহত্ব ও শক্তিমত্তার প্রতি তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপও করছে না।"

প্রার্থনা শেষে আবদুল মুত্তালিব নিজ সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এদিকে আবরাহা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কা'বাগৃহ ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হলো। মুহূর্তের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট পাখি দৃষ্টিগোচর হলো। প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ও দু'পায়ের থাবায় ছিল ছোট ছোট পাথর—যা ক্ষণে ক্ষণে সৈন্যদের উপর পতিত হতে লাগলো। আল্লাহর কি মহিমা ! ঐ ছোট ছোট পাথরই বন্দুকের নিক্ষিপ্ত গুলীর মত কাজ করতে লাগলো। এগুলো আবরাহা বাহিনী ও তাদের সওয়ারীর মাথায় পড়ে দেহ ভেদ করে বের হতে শুরু করলো। ঐ পাথর যার উপর পড়তো, সাথে সাথেই সে মৃত্যুবরণ করতো। মোটকথা, এভাবেই আবরাহার সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আবরাহার শরীরে দেখা দিল বসন্তের গুটি। ফলে তার

সমস্ত শরীর পচে গেল এবং শরীর থেকে রক্ত ও পুঁজ গড়াতে থাকলো। এরপর তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক এক করে খসে পড়তে শুরু করলো। সবশেষে তার দেহের অভ্যন্তর থেকে কলিজা ফেটে বেরিয়ে পড়লো আর সাথে সাথে আবরাহা মৃত্যুর হিম শীতল কোলে ঢলে পড়লো। সবাই যখন ছিন্নভিন্ন দেহে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো, তখন মহাশক্তিধর আল্লাহ এক ভারী বর্ষণে ধ্বংসাবশেষের সবকিছু ধুয়ে মুছে সাগরে পৌঁছিয়ে দিলেন।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তিনি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল উৎপাটন করে ফেললেন। এ জন্যে রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা।"[১]

ইরহাস

এ আসমানী নিদর্শন ছিল শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনেরই অদৃশ্য ঘোষণা ও গায়বী নিদর্শন। কুরায়শদের প্রতি এ অদৃশ্য সাহায্য-সহায়তার কারণ একমাত্র এটাই ছিল যে, পৃথিবীতে শেষ নবীর আগমন অত্যাসন্ন। আবদুল মুত্তালিবের এ সম্প্রদায় ও পরিবার তারাই আর তারাই আল্লাহর ঘরের মুতাওয়াল্লী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, এজন্যে অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তাদের এ সাহায্য করেছেন। অন্যথায় ধর্মীয় দিক থেকে আবিসিনিয়ার সম্রাট ও ইয়েমেনের শাসক মক্কার কুরায়শ অপেক্ষা উত্তম ছিল। কেননা তখন সাধারণ কুরায়শগণ ছিল মূর্তি পূজক, পক্ষান্তরে ইয়েমেন ও আবিসিনিয়ার অধিবাসীরা আহলি কিতাব ও খ্রিস্টান ছিল (তখনও যার বাতিল হওয়ার ঘোষণা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আসেনি)। ফলে জানা গেল যে, কুরায়শের প্রতি এ অদৃশ্য সাহায্য এবং বায়তুল্লাহর অস্বাভাবিক হিফাযত, এ সব কিছুই মহানবী (সা)-এর জন্মের অলৌকিক ও বরকতপূর্ণ সুসংবাদ।

নবী হিসেবে ঘোষিত হবার পর নবীর দ্বারা যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পায়, একে 'মু'জিযা' বলে। আর যে সব অলৌকিক ঘটনা নবী জন্মের প্রাক্কালে ঘটে, তাকে 'ইরহাস' বলা হয়। ইরহাস অর্থ বুঁনিয়াদ বা ভিত্তি। যেহেতু এ ধরনের ঘটনা নবী জন্মের সূচনা বা প্রারম্ভিক অবস্থায় ঘটেছে, এজন্যে একে ইরহাস বলা হয়েছে।

আবরাহার বায়তুল্লাহ বিরোধী সেনা অভিযান এবং অতঃপর তার ধ্বংস ও বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা মুহররম মাসে সংঘটিত হয়। তখন রাসূল (সা)-এর শুভ জন্মের দিনক্ষণ খুবই সন্নিকটে পৌঁছেছিল। তখন এ ধরনের যত অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, সবই ছিল নবী (সা)-এর জন্মের পূর্বাভাস ও আলামত। আবরাহার ঘটনার পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন দিন পর এ ধূলির ধরায় রহমতরূপে মহানবী (সা)-এর আবির্ভাব ঘটে।

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৩-৩৯০।

আল্লামা মাওয়ারদী তদীয় গ্রন্থ 'ইলামুন-নবূওয়াত' গ্রন্থে বলেছেন :

واذا اختبرت حال نسبه ﷺ وعرفتَ طهارة مولده علمت انه سلالة اباء كرام ليس فيهم مسترذل بل كلهم سادة قادة وشرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة انتهى

"ওহে, যখন তুমি মহানবী (সা)-এর পবিত্র বংশধারার অবস্থা জেনে নিয়েছ এবং তাঁর পবিত্র বংশপরম্পরাকে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছ, তা হলে অবশ্যই এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে যে, নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সম্মানিত পিতা, শ্রদ্ধেয় পিতামহ ছিলেন উন্নত ও সম্ভ্রান্ত। তাঁর বংশের কেউই নীচ, হীন ও ইতর প্রকৃতির লোক ছিলেন না; বরং সবাই সর্দার ও আরব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন আর নবী বংশের জন্য ভদ্র সম্ভ্রান্ত ও পবিত্রতা শর্ত।"

নবী মুহাম্মদ(সা)-এর পিতা ও পিতামহের সবাই স্ব-স্ব যামানায় বিজ্ঞ ও সৌভাগ্যবান নেতা ছিলেন। তাদের চেহারা সুরত দৃষ্টি আকর্ষণীয়, সুন্দর ও উন্নত চরিত্র, প্রশংসনীয় কাজকর্ম, ধৈর্য সবর, দান ও মেহমানদারী সর্বক্ষেত্রেই তাঁরা স্ব-স্ব যামানায় ছিলেন অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রত্যেকেই সম্মান, আভিজাত্য, নেতৃত্ব ও সম্ভ্রম-এর অধিকারী ছিলেন। নবী (সা)-এর পূর্বপুরুষদের প্রসঙ্গে শতাধিক বক্তব্য তো কেবল মরফূ' হাদীস ও সাহাবা কিরামের 'আসার' থেকে জানা গেছে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেমে মহাত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী নবী ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর (যেমনটি উপরে বর্ণিত হয়েছে)। আর যেসব হাদীসে তাঁর ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর হওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই, এতে তাঁর সুস্থ সঠিক স্বভাব-চরিত্র ও সুন্দর প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা তো সরাসরি বর্ণিত আছে।

শুভাগমন

সারওয়ারে দো আলম, বনী আদমের সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা) হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চাশ অথবা পঞ্চান্ন[১] দিন পর ৮ই রবিউল আউয়াল[২] সোমবার মুতাবিক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এক সুবহে

১. প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, মহানবী (সা) হস্তী বাহিনীর ঘটনার পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন আর এ বক্তব্যই আল্লামা সুহায়লী গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন আলী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পঞ্চান্ন দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। এ বক্তব্য আল্লামা দিময়াতী গ্রহণ করেছেন। যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩০।

২. প্রসিদ্ধ আলিমদের বক্তব্য এটাই যে, মহানবী (সা) রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী এটাই আলিমদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি রবিউস সানী মাসে, কেউবা সফর মাসে, কেউবা রজব মাসে আবার কেউ বলেন, তিনি রমযানুল মুবারকে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এ সমুদয় বর্ণনাই দুর্বল। যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩০

সাদিকে[১] আবূ তালিবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শুভ জন্মের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বক্তব্য তো এটাই যে, রাসূল (সা) ১২ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদদের নিকট প্রসিদ্ধ ও অনুমোদিত বক্তব্য হলো এই যে, রাসূল (সা) ৮ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ও হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে এ বর্ণনাই পাওয়া যায় আর এ বক্তব্যই আল্লামা কুতুবুদ্দীন কাসতাল্লানী গ্রহণ করেছেন।[২]

১. হযরত উসমান ইবন আবুল আস[৩] (রা)-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আবদুল্লাহ

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর (সা) সোমবার সুবহে সাদিকের সূচনাকালে জন্মগ্রহণ করেন (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩৩)। এ বর্ণনা যদিও সনদের দিক থেকে দুর্বল তবুও এর দ্বারা অন্যান্য বর্ণনা সমন্বয় ও মিটমাট হয়ে যায়। এজন্যে যে, কিছু কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তিনি দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করেন আর কিছু বর্ণনায় জানা যায়, তাঁর জন্ম হয়েছিল রাত্রিকালে। কিন্তু সুবহে সাদিকের বর্ণনা দ্বারা এটা বলা যায় যে, তিনি পূর্বরাত্রেই জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা এটাই বলা যায় যে, তিনি পরবর্তী দিন অর্থাৎ সোমবার দিবাভাগের (প্রারম্ভে) জন্মগ্রহণ করেন। কাজেই যেসব বর্ণনায় তিনি সোমবার দিনে জন্মগ্রহণ করেছেন বলা হয়েছে, এটা যেমন সহীহ, ঠিক তেমনি তিনি পূর্ববর্তী রাত্রে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা-ও তেমনি সহীহ। এছাড়া এটাও বলা যায় যে, যদিও তিনি সুবহে সাদিকে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল পূর্ববর্তী রাত্রে। ইবন আসাকির ও যুবায়র ইবন বুকার মারূফ ইবন খারবুয থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) সোমবার ফজর উদয়কালে জন্মগ্রহণ করেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৫১)। ইবন হিব্বান মারূফ ইবন খারবুযের বক্তব্যকে সত্যায়ন করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, ইবন খারবুযের হাদীস উল্লেখ করার মত, যেমনটি খুলাসাতুত-তাহযীব গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সত্য ও হিদায়াতের সূর্য উদিত হওয়ার জন্য সুবহে সাদিকই উপযুক্ত সময় বলে মনে হয়, যার মধ্যাহ্ন চল্লিশ বছর পর হবে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩১।

৩. এ হাদীসটির সনদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতে ইয়াকূব ইবন মুহাম্মদ যুহরী অগ্রহণযোগ্য এবং আবদুল আযীয ইবন আবদুর রহমান ইবন আউফ মিথ্যা বলেন। আমি বলবো, যদিও ইয়াকূব ইবন মুহাম্মদ যুহরী আছেন, তবুও আহমদ ও আবূ যুর'আ হাজ্জাজ ইবন শাইর ইবন সা'দ ও আবূ হাতিম থেকে বর্ণনা করেছেন যারা নির্ভরযোগ্য। অধিকন্তু, এ হাদীসটি ইবন মাজাহ ও বুখারীতে মুআল্লাক সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে, যেমনটি হাফিয শফীউদ্দিন প্রণীত খুলাসাহতে বলা হয়েছে। আর আবদুল আযীয ইবন উমর ইবন আবদুর রহমান তৎকালীন আলিমদের মধ্যে খোলাখুলি বর্ণনাকারীদের নিকট যঈফ ছিলেন না। তার মিথ্যাবাদী হওয়ার খবরও অজ্ঞাত। এ হাদীসটি হাফিয আসকালানী তাঁর ফাতহ-এ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করেন নি। এরপর বলেছেন, হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা) বর্ণিত হাদীসটি –যা আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হিব্বান ও হাকিম সত্যায়ন করেছেন। সুতরাং যঈফ যখন সহীহ-এর অনুগামী হয়, তখন আর যঈফ থাকে না– আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত উসমান ইবন আবুল আস সাকাফী (রা) বনী সাকীফ-এর প্রতিনিধি দলের সাথে নবী (সা)-এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর (সা) তাঁকে তায়েফ-এর শাসক নিযুক্ত করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। ১৫ হিজরীতে উমর (রা) তাঁকে তায়েফ ছাড়াও আম্মান এবং বাহরায়নের শাসক নিযুক্ত করেন। সাকীফ সম্প্রদায়কে ধর্মচ্যুত

বলেন, হযরত নবী (সা)-এর জন্মের সময় আমি আমিনার কক্ষে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম যে, সমস্ত গৃহ উজ্জ্বল আলোতে ভরে গেছে। দেখলাম আসমানের তারকারাজি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এমনকি আমার মনে হচ্ছিল যে, নাজানি এসব আমার উপর পতিত হয়।[১]

২. হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা)[২] থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভ জন্মগ্রহণকালীন সময় তাঁর মাতা এক নূর দেখেন, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে যায়। এই বর্ণনা মুসনাদে আহমদ ও মুস্তাদরাকে হাকিম গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ইবন হিব্বান এ রিওয়ায়াতটি সহীহ বলেছেন। অনুরূপ অর্থে মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে (ফাতহুল বারী, আলামাতুন নবূওয়াত ফিল ইসলাম অধ্যায়) হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ বর্ণনা করেছেন, এর সনদ হাসান এবং এর পক্ষে শক্তিশালী সাক্ষ্য রয়েছে। তিবরানীও এটি বর্ণনা করেছেন।

৩. অপর এক বর্ণনায় বসরার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ তারকারাজি যমীনে ছিটকে পড়া বলতে এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, অচিরেই যমীন থেকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার দূরীভূত হবে এবং হিদায়েতের জ্যোতি আরও উজ্জ্বল আলোকে ভরপুর হয়ে যাবে। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ - يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ

"অবশ্যই তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নূর, হিদায়াত এবং একটি আলোকিত কিতাব এসেছে, যাদ্বারা আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের হিদায়াত করেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শান্তি-পথসমূহের প্রত্যাশী। তিনি নিজের ক্ষমতা দ্বারাই তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান।" (সূরা মায়িদা : ১৬-১৭)

হওয়ার হাত থেকে তিনিই রক্ষা করেন। তিনি তখন সাকীফ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেন : হে সাকীফ সম্প্রদায়! তোমরা সবশেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ। কাজেই সবার আগে ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ো না। শেষ বয়সে তিনি বসরায় বসবাস করেন এবং মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামলে ৫১ অথবা ৫৫ হিজরীতে বসরায় ইনতিকাল করেন।

১. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪২৬।

২ হযরত ইরবায ইবন সারিয়্যা (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী ও সুফফার অধিবাসী ছিলেন। ولا على الذين اذا ما اتوك لتحلهم আয়াতটি তাঁকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইসলামের প্রাথমিককালে মুসলমান হয়েছিলেন। সুনান চতুষ্টয়ে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি ইনতিকাল করেন।

কা'ব আহবার[১] থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে :

محمد رسول الله مولده بمكة ومهاجره بيثرب وملكه بالشام

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর জন্ম হবে মক্কায়, হিজরত হবে মদীনায় এবং শাসন কর্তৃত্ব হবে শাম (সিরিয়া)-এর উপর।"

অর্থাৎ মক্কা থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমগ্র এলাকা তাঁর ইনতিকালের পূর্বেই ইসলামের অনুসারী হয়ে পড়বে। কাজেই সিরিয়া তাঁর জীবদ্দশায় বিজিত হয়েছিল। এটা আশ্চর্য নয় যে, এ জন্যেই তাঁর শুভ জন্মলগ্নে সিরিয়ার প্রাসাদগুলো দেখানো হয়েছিল। আর ঐ দেশের একটি বিশিষ্ট শহর বসরাকে এজন্যে বিশেষভাবে দেখানো হয়েছিল যে, সিরিয়া এলাকার যে ভূখণ্ডটিতে সর্ব প্রথমে হিদায়াতের নূর পৌঁছবে, তা হলো বস্‌রা।

এটাও আশ্চর্য নয় যে, সিরিয়া এজন্যে দেখানো হয়েছিল যে, চল্লিশজনের মধ্যে ত্রিশজন আবদাল, যাঁরা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর প্রচারিত তাওহীদী দীনের উপর একনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের সবারই অবস্থানস্থল ছিল সিরিয়া। এ সম্পর্কের কারণেই সিরিয়ার উপর হিদায়াতের নূর ও আলোক শিখার প্রকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছিল। এ কারণে সিরিয়ার মহলসমূহ দেখানো হয়ে থাকবে – যাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, এ রাষ্ট্রে নবুওয়াতের নূর প্রকাশের বিশেষ স্থান হবে আর এজন্যেই মিরাজে তাঁকে মক্কা থেকে সিরিয়ায় অর্থাৎ মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়েছিল। যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ

"মহাপবিত্র ঐ সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত রাতের সামান্যতম অংশে ভ্রমণ করিয়েছেন; যার চতুষ্পার্শ্ব আমি বরকতময় করে রেখেছিলাম।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ১)

যা দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, সিরীয় রাজ্য, যা মসজিদে আকসার চতুষ্পার্শ্বে অবস্থিত, সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বরকত ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর হযরত ইবরাহীম (আ) যখন ইরাক থেকে হিজরত করেছিলেন, তখন সিরিয়ার দিকেই হিজরত করেছিলেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা ইবন

---

১. কা'ব আহবার ছিলেন বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট আলিম। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যামানা পেয়েছিলেন কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) অথবা হযরত উমর (রা)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাবী হিসেবে নির্ভরযোগ্য ছিলেন। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রমুখ এবং তাবিঈগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন (তাহযীবুত তাহযীব, পৃ. ১২) যেমনটি হাকিম তিরমিযী কর্তৃক 'আনওয়ারুল উসূলে' বর্ণিত হয়েছে, পৃ, ৬৯।

মরিয়ম (আ)-এর আসমান থেকে অবতরণ ঐ সিরিয়ারই দামেশক জামে মসজিদের মিনারে সংঘটিত হবে। নবী করীম (সা)ও কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সিরিয়ায় হিজরতের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন (হাকিম ও ইবন হিব্বান)।

৪. হযরত ইয়াকূব ইবন হাসান হযরত আয়েশা (রা) থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ইয়াহূদী ব্যবসা উপলক্ষে মক্কায় অবস্থান করতো। যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করলেন, এরপর ঐ ইয়াহূদী কুরায়শদের এক সভায় উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এ রাতে কোন্ ছেলে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে? কুরাইশরা বললো, আমরা তো জানি না। ইয়াহূদী বললো, একটু খবর নিয়ে দেখ। কেননা আজ রাতে এ উম্মতের নবী জন্মলাভ করেছেন। তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে একটি চিহ্ন (মোহরে নবূওয়াত) আছে। তিনি দু'রাত পর্যন্ত দুধপান করবেন না—এজন্যে যে, জনৈক জিন্নগ্রস্ত তাঁর মুখে অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়েছিল। লোকজন দ্রুত ঐ সভা থেকে উঠে অনুসন্ধান শুরু করলো। জানা গেল যে, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। ইয়াহূদী বললো, আমাকেও নিয়ে গিয়ে দেখাও। ইয়াহূদী যখন তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে ঐ চিহ্ন (মোহরে নবূওয়াত) দেখলো, তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। হুঁশ ফিরে আসার পর সে বললো, নবূওয়াত বনী ইসরাঈল থেকে চলে গেছে। হে কুরাইশ, আল্লাহর শপথ ! এই নবজাতক তোমাদের উপর এমনই আক্রমণ[১] করবে, যার খবর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। হাফিয আসকালানী এ হাদীসটির সনদ[২] হাসান বলেছেন। এছাড়া হাদীসটির দ্রষ্টা, শ্রোতা ও সাক্ষীর সংখ্যা দীর্ঘ এবং এর ব্যাখ্যাও সুদীর্ঘ।[৩]

পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসে পড়া এবং সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যাওয়া

৫. ঐ রাতে এ ঘটনাও সংঘটিত হলো যে, পারস্য সম্রাটের প্রাসাদে ভূ-কম্পন হলো এবং প্রাসাদের চৌদ্দটি গম্বুজ ধসে পড়লো আর পারস্যের হাজার বছর ধরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটি নিভে গেল এবং রাজকীয় অনুষ্ঠানাদি প্রদর্শন বন্ধ করা হলো। অবশেষে উযীরগণ ও রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করা হলো। ঐ দরবারেই এ সংবাদ পৌঁছলো যে, অগ্নিকুণ্ডটি নিভে গেছে। সম্রাটের পেরেশানী এতে বৃদ্ধি পেল। এদিকে এক সভাসদ দাঁড়িয়ে বললো, গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি

---

১. আক্রমণ দ্বারা মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে।

২. হাফিয ইয়াকূব ইবন সুফিয়ান ফারিসী হাফিযে হাদীসের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব, সত্য ও গঠনমূলক কাজ করতেন। কা'ব, সুলায়মান ইবন হারব ও আবূ নুয়াঈম থেকে ইলম হাসিল করেন। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ২৭৭ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ১২০)।

৩. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪২৫।

যে, দুর্দান্ত উট আরবী ঘোড়ার দলকে হাঁকিয়ে নিয়ে দজলা নদী পার হয়ে সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি ? সভাসদ বললো, সম্ভবত আরবের দিক থেকে কোন বিরাটকায় ঘটনা প্রকাশ হতে যাচ্ছে। সম্রাট শান্তি এবং স্বস্তির জন্যে নুমান ইবন মুনযিরের নামে ফরমান পাঠালেন যে, কোন বিজ্ঞ আলিমকে আমার নিকট প্রেরণ কর, যে আমার প্রশ্নাবলীর জবাব দিতে পারবে।

নু'মান ইবন মুনযির তৎকালীন জগতশ্রেষ্ঠ আলিম আবদুল মসীহ গাসসানীকে দরবারে প্রেরণ করলেন। আবদুল মসীহ দরবারে উপস্থিত হলে সম্রাট বললেন, আমি যে বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি ? আবদুল মসীহ জবাব দিলেন আপনি প্রশ্ন করুন, যদি আমার জানা থাকে তো বলে দেব, অন্যথায় কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট প্রেরণ করবো। বাদশাহ তখন সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। আবদুল মসীহ বললেন, এর ব্যাখ্যা সম্ভবত আমার মামা সাতীহ দিতে পারবেন, যিনি বর্তমানে সিরিয়ায় বসবাস করছেন।

সম্রাট তাকে নির্দেশ দিলেন যে, আপনি স্বয়ং আপনার মামার কাছে গিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে আসুন। আবদুল মসীহ যখন তাঁর মামা সাতীহ-এর নিকট পৌঁছলেন, তখন তার অন্তিম সময় উপস্থিত। কিন্তু হুঁশ তখনো অবশিষ্ট ছিল। আবদুল মসীহ গিয়ে তাকে সালাম দিলেন এবং কয়েক পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করলেন। আবদুল মসীহ-এর আবৃত্তি শুনে সাতীহ তার দিকে ফিরলেন এবং বললেন, আবদুল মসীহ দ্রুতগামী উটে চড়ে সাতীহ-এর নিকট এমন সময় পৌঁছলো যখন সে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে। তোমাকে সাসানীয় সম্রাট তার প্রাসাদে ভূমিকম্প, অগ্নিকুণ্ডের নিভে যাওয়া এবং সভাসদের স্বপ্নের কারণে এখানে পাঠিয়েছেন। শক্তিশালী উট আরবীয় ঘোড়াকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং দজলা নদী পার হয়ে সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ছে। হে আবদুল মসীহ ! মনযোগ দিয়ে শোন, যখন আল্লাহর বাণী বেশি বেশি তিলাওয়াত হতে থাকে, যষ্ঠিধারী প্রকাশ পায়, আসমানী প্রশস্ততা প্রকাশ পায়, সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যায় এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যায়, তখন সাতীহ-এর জন্য সিরিয়া সিরিয়া থাকবে না; সাসানীয় বংশের কিছু পুরুষ ও কিছু স্ত্রীলোক কেবল গম্বুজের পরিমাণ বাদশাহী করবে। আর যে বস্তু আগমনকারী, তা সম্ভবত এসে গেছে।

এ কথা বলেই সাতীহ মৃত্যুবরণ করলেন। আবদুল মসীহ ফিরে এলেন এবং সমুদয় বিবরণ সম্রাটকে শোনালেন। সম্রাট তা শুনে বললেন, চৌদ্দজন সম্রাট অতিক্রান্ত হতে তো দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হতে আর কত দেরী ? তাদের দশজন সম্রাট তো কেবল চার বছরেই গত হয়েছেন। আর অবশিষ্ট চার সম্রাট তো হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত শেষ হয়েছেন।

হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস এ ঘটনাটি স্বীয় উয়ূনুল আসার গ্রন্থে বিস্তৃত সনদের সাথে[১] বর্ণনা করেছেন। সনদটি নিম্নরূপ ঃ

اخبرنا الشيخ ابو الحسن على بن محمد الدمشقى بقراتى عليه قلت له اخبركم الشيخان ابو عبد الله محمد بن نصر بن عبد الرحمن بن محمد بن محفوظ القرشى والامير سيف الدولة ابو عبد الله محمد بن غسان بن غافل بن نجار الانصارى قراءة عليهما وانت حاضر فى الرابعة قالا انا الفقيه ابوالقاسم على بن الحسن الحافظ قراءة عليه ونحن نسمع قال انا المشايخ ابو الحسن على بن مسلم بن محمد بن الفتح بن على الفقيه وابو الفرج غيث بن على بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الارمنازى الصورى الخطيب وابو محمد عبد الكريم بن حمزة لخضر بن العباس الوكيل بدمشق قالوا انا ابوالحسن احمد بن عبد الواحد بن محمد بن احمد بن عثمان بن ابى الحديد السلمى انا جدى ابو بكر محمد بن احمد قال انا ابوبكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرايطى ثنا على بن حرب ثنا ابو ايوب يعنى بن عمران من آل جرير بن عبد الله البجلى قال حدثنى مخزوم بن هانىء المخزومى عن ابيه وانت له خمسون ومنه سنة قال لما كانت ليلة ولد رسول الله ﷺ ارتجس ايوان كسرى الى اخر الحديث

আর এ রিওয়ায়াত ইবন জারীর তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে একই সনদে বর্ণিত আছে :

حدثنا على بن الحرب الموصلى قال حدثنا ابو ايوب يعلى بن عمران البجلى قال حدثنى مخزوم بن هانى المخزومى عن ابيه واتت له مائة وخمسون سنة قال لما كانت ليلة ولد فيها رسول الله ﷺ ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه اربعة شرفة الى اخر الحديث

(তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ.১৩১)

আর ইবন সাকানও এ রিওয়ায়াতকে এ সনদেই বর্ণনা করেছেন। কাজেই হাফিয আসকালানী তাঁর গ্রন্থ ইসাবায় বলেন

واخرج ابن السكن من طريق يعلى بن عمران البجلى اخبرنى مخزوم بن هانى عن ابيه وكان اتت عليه مائة وخمسون سنة قال لما كانت ليلة مولد رسول ﷺ

১. উয়ূনুল আসার, ইবন সায়্যিদুন নাস, ১খ. পৃ. ২৯।

ارتجس ايوان كسرى وسقطت منه اربعة عشرة سرافة وغاضت بحيرة ساوة الحديث

আবূ মাখযূম হানীর সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আবুল ওলীদ দাব্বাগ তাঁকে সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন[১] এবং হাফিয ইবন কাসীর এ হাদীসটিকে এ সনদেই আবূ বকর খারাইতীর উদ্ধৃতি দিয়ে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার ارتجس ايوان অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।[২] আন আল্লামা সুয়ূতীর খাসাইসুল কুবরা দেখুন।[৩] অধিকন্তু, এ রিওয়ায়াতটি অপর একটি সনদেও বর্ণিত হয়েছে, যার সকল বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। (তা হলো :)

عن سعيد بن مزاحم عن معروف بن خربوذ عن بشير بن تيم قال لما كانت ليلة مولد رسول الله ﷺ رائ مؤبذان كسرى خيلا وابلا قطعت دجلة القصر بطولها رواه عبدان فى كتاب الصحابة

হাফিয আসকালানী এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এটি মুরসাল রিওয়ায়াত এবং ইবন আবি শায়বা বাশীর ইবন শায়বাকে সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন (ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৮০) বাশীর ইবন তামীম-এর জীবনী।[৪]

এ সনদের প্রথম বর্ণনাকারী সাঈদ ইবন মুযাহিম, যাঁর থেকে আবূ দাঊদ এবং নাসাঈ রিওয়ায়াত করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী মারূফ ইবন খারবূয, যাঁর থেকে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ প্রমুখ রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুল ইলম, 'বাবু মান খাস্‌সা বিল ইলমি কাউমান দূনা কাউমিন' (পৃ. ২৪)-এ মারূফ ইবন খারবূয-এর রিওয়ায়াত হযরত আবুত-তুফায়ল আমের ইবন ওয়াসিলা (রা) থেকে স্বীয় জামিউস সাহীহতে উদ্ধৃত করেছেন।

সাহাবাদের মধ্যে সর্বশেষ সাহাবী হযরত আবুত-তুফায়ল (রা) ১০০ হিজরীতে মক্কা মুকাররামায় ইনতিকাল করেন। মারূফ ইবন খারবূয মক্কা মুকাররামায় বসবাসকারী কনিষ্ঠতম তাবিঈ ছিলেন। সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫]

মোটকথা, এ বর্ণনাটি যদিও মুরসাল পর্যায়ের, তবুও এর সনদ সহীহ। এছাড়া মুরসাল হাদীস ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য। যেমনটি উসূলে হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয আসকালানী তাঁর ইসাবা গ্রন্থে হাদীসটিকে মুরসাল

---

১. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৯৭।
২. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ২৬৮।
৩. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫১।
৪. আল ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৮০।
৫. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৯৯।

বলেছেন এবং শরহে বুখারীতে এ হাদীসটি বর্ণনা করে নিশ্চুপ থেকেছেন, যা দ্বারা মনে হয় যে হাফিযে হাদীসগণের নিকট এ হাদীসটি মওযূ ও ভিত্তিহীন তো নয়ই; আর হাফিয আসকালানীর শরহে বুখারীতে কোন হাদীস বর্ণনার পর মন্তব্য না করে নিশ্চুপ থাকা আলিমগণের নিকট হাদীসটির সহীহ ও হাসান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমনটি হাফিয আসকালানী স্বয়ং ফাতহুল বারীর ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ৩১) তে লিখেছেন, যে পরিমাণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়, সে পরিমাণ সন্দেহযুক্ত রিওয়ায়াত কমতে থাকে। উদাহরণত এ রিওয়ায়াতটি, যখন রাসূলে করীম (সা) পৃথিবীতে এসেছেন তখন পারস্য সম্রাটের প্রাসাদের চৌদ্দটি স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়ে, পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে যায়, সাওয়া নহর শুষ্ক হয়ে যায়। বায়হাকী, আবূ নুয়ায়ম, খারাইতী, ইবন আসাকির এবং ইবন জাবীর ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তার কোন কিতাবেই এর পাত্তা নেই। সুবহান আল্লাহ্! এ হাদীসটির মওযূ' হওয়ার প্রমাণটি আশ্চর্যজনক। কোন হাদীস বুখারী, মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তায় বিদ্যমান না থাকাটাই কি এর মওযূ' ও যঈফ হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উদাহরণত নিঃসন্দেহে সহীহ হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার দাবি করেছেন, কিন্তু সমাপ্ত ও শেষ বলে দাবি করেননি। আর কেই বা তা করতে পারে? ইমাম বুখারী প্রমুখ এ দাবিও করেন নি যে, সহীহায়ন ও সিহাহ সিত্তাহ ছাড়া কোন হাদীস সহীহ ও গ্রহণযোগ্য নয়। বরং রসূলের কিতাবসমূহে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম থেকে এর বিপরীত বর্ণিত হয়েছে :

قال البخارى اوردت فى كتابى هذا الا ما صح ولقد تركت كثيرا من الصحاح

وقال المسلم الذى اوردت فى هذا الكتاب من الاحاديث صحيح ولا اقول ان ما تركت صعيف

"ইমাম বুখারী বলেন, আমি আমার এই কিতাবে সহীহ ছাড়া কোন হাদীস গ্রহণ করিনি এবং অনেক সহীহ হাদীসও ছেড়ে দিয়েছি। আর ইমাম মুসলিম বলেন, আমি যে সমস্ত হাদীস এই কিতাবে উল্লেখ করেছি, এর সবই সহীহ। তবে আমি এটা বলি না যে সব হাদীস আমি গ্রহণ করিনি, তার সবই যঈফ।"

এর দ্বারা বুঝা যায়, কোন হাদীস সিহাহ সিত্তায় না থাকাটাই কোন আলিমের নিকট হাদীসটির মওযূ' হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী গ্রন্থে শতাধিক এমন রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যার কোনটি না সহীহ বুখারীতে, না সহীহ মুসলিমে আর না সিহাহ গ্রন্থসমূহে আছে। জানা গেল যে, এ মূলনীতি খোদ আল্লামার নিকটই অনুসরণীয় ও গ্রহণযোগ্য নয়; তবে না জানি কেন তিনি এ হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করলেন। বিনা প্রমাণে কোন রিওয়ায়াতকে অস্বীকার করার নামই কি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ?

৬. তাবারানী, আবূ নুয়ায়ম এবং ইবন আসাকির বিভিন্ন সনদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সম্মান ও মর্যাদার মধ্যে এটাও যে, আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি, আমার গুপ্তাঙ্গ কেউ দেখেনি।

হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর মুখতারা গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ বলেছেন। আল্লামা যারাকশী বলেন, হাফিয মাকদিসীর সহীহ বলা হাকিম-এর সহীহ বলা অপেক্ষা মর্যাদাসম্পন্ন। আর হাফিয মুগালতাঈ এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং আবূ নুয়ায়ম হাদীসটি হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[১]

৭. হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) খাতনাকৃত ও নাড়ী কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল মুত্তালিব এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করেন এবং বলেন, আমার এ সন্তান বড়ই সৌভাগ্যশালী হবে। আর হয়েছিলও তাই।

এ বর্ণনা তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৬৪) প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী।

৮. হযরত ইসহাক ইবন আবদুল্লাহ হযরত আমিনা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) জন্মগ্রহণকালে খুবই পাক পবিত্র ছিলেন। পবিত্র শরীরে কোন প্রকার অপবিত্র বস্তু ছিল না।[২]

আকীকা ও নামকরণ

জন্মের সপ্তম দিনে[৩] আবদুল মুত্তালিব তাঁর আকীকা করেন। সাথে সাথে সমস্ত কুরাইশকে সাধারণ দাওয়াত দেন এবং তাঁর জন্য মুহাম্মদ নামটি নির্বাচন করেন। কুরাইশগণ বললো, হে আবুল হারিস (আবুল হারিস ছিল তাঁর উপনাম)! এ নামটি আপনি কিভাবে নির্বাচন করলেন, যে নাম আপনার পূর্বপুরুষ কিংবা আপনার সম্প্রদায়ের কেউ কোনদিন রাখেনি ? আবদুল মুত্তালিব বললেন, এ নাম আমি এজন্যে রেখেছি যে, যাতে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্ট জীব এ নবজাতকের প্রশংসা করে।[৪]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ১২৪; ৫খ. পৃ. ২৪৪।

২. সমুদয় ঘটনা আল্লামা যারকানী শরহে মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ৪খ. পৃ. ২৭১-এ হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর ভাষ্যে হাফিয ইবন আবদিল বার-এর আল ইসতিয়াবের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন। কিন্তু হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় কেবল আকীকার উল্লেখ আছে, এতে এক সপ্তাহের কিংবা দাওয়াতের বর্ণনা নেই। এ দু'টি বিষয় আল্লামা সুয়ূতী বায়হাকী ও ইবন আসাকির-এর বরাতে তাঁর খাসাইসুল কুবরায় (১খ. পৃ. ৫০) উল্লেখ করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, এ পবিত্র জন্মের পর পর আবদুল মুত্তালিব এক সাধারণ দাওয়াত করেন। পানাহারের পর লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আবদুল মুত্তালিব ! এ সৌভাগ্যবান শিশুটির নাম কি রেখেছ ? হাদীসের শেষ পর্যন্ত। ফাতহুল বারী, ৭ খ. পৃ. ১২৪, মহানবী (সা)-এর জন্ম অধ্যায়।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ.৬৩।

৪. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৪।

আবদুল মুত্তালিব নবী (সা)-এর জন্মের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেন যা তাঁর এ নাম রাখার কারণ ছিল। তিনি দেখেন, তাঁর পিঠ থেকে একটি শিকল বের হয়েছে—যার একটি মাথা আসমানে, একটি মাথা যমীনে, একটি মাথা পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এবং একটি মাথা পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ শিকলটি একটি বৃক্ষে পরিণত হয়। যার প্রতিটি পাতা সূর্যের আলোর চেয়ে সত্তর গুণ বেশি আলোকোদ্ভাসিত ছিল। পূর্ব ও পশ্চিমের জনগণ ঐ বৃক্ষের ডালের সাথে জড়িয়ে ছিল। কুরাইশের কিছু লোকও কিছু কিছু ডাল আকড়ে ধরে ছিল আর কুরাইশের কিছু লোক বৃক্ষটি কাটার ইচ্ছা করছিল। তারা যখন এ উদ্দেশ্যে বৃক্ষের নিকটবর্তী হচ্ছিল, তখন খুবই সুন্দর সুঠাম এক যুবক এসে তাদের সরিয়ে দিচ্ছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন যে, আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবেন, পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত মানুষ তাঁর অনুসরণ করবে এবং আসমান ও যমীনের অধিবাসীরা তাঁর প্রশংসা-স্তুতি জ্ঞাপন করবে। এ কারণে আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম 'মুহাম্মদ' রাখেন।[১] এ স্বপ্নের কারণে আবদুল মুত্তালিবের মনে তাঁর নাম মুহাম্মদ রাখার আগ্রহ জাগে। অপরদিকে নবীজীর মাতাকে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে এটা বলা হয়েছিল যে, তুমি সৃষ্টির সেরা, উত্তম চরিত্রের অধিকারী জাতির নেতাকে গর্ভে ধারণ করেছ, তাঁর নাম রাখবে 'মুহাম্মদ'। অপর এক রিওয়ায়াতে 'আহমদ' বলা হয়েছে। যেমনটি উয়ূনুল আসার[২] গ্রন্থে হযরত বারীদা ও হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখবে।[৩]

মোটকথা, ইলহাম, সত্য স্বপ্ন, সবকিছু দ্বারা পর্যায়ক্রমে তাঁর মা, দাদা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবার মুখ থেকেই ঐ নাম নির্বাচন করে দেয়া হয়, যে নাম দ্বারা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ঐ উম্মী নবীর সুসংবাদ দিয়ে আসছিলেন। যেমন আবদুল মুত্তালিবের সকল পুত্রের মধ্যে কেবল নবীজীর পিতার জন্য এমন নাম নির্বাচন করা, যা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়; অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ' নামটি রাখা, এটা মহান প্রভু কর্তৃক প্রদত্ত ছিল। একইভাবে তাঁর নাম মুহাম্মদ ও আহমদ রাখাটাও নিঃসন্দেহে দয়াময় প্রভুর নির্দেশ ছিল। যেমন আল্লামা নববী শরহে মুসলিমে ইবনুল ফারিস ও অন্যান্যের থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর গৃহবাসীদের ইলহাম করেন, যার ফলে তাঁর এ নাম রাখা হয় [শরহে মুসলিম, আসমাউন নবী (সা) অধ্যায়, ২খ. পৃ. ২৬] তাঁর এ দু'নামই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন : محمد رسول الله "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।" আর احمد আহমদ :

---

১. রাউযুল উনূফ,১খ. পৃ. ১০৫; যারকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪খ. পৃ. ২৭০।

২ ১খ. পৃ. ৩০।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪২।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْمَدُ

"আর যখন ঈসা ইবন মরিয়ম বললো, হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রেরিত রাসূল এবং আমার প্রতি অবতীর্ণ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং পরবর্তীতে আগমনকারী এক রাসূলের সুসংবাদদাতা, যার নাম হবে 'আহমদ'।"

(সূরা সাফ ঃ ৬)

মুহাম্মদ শব্দের ধাতু-মূল হামদ। প্রকৃতপক্ষে প্রশংসনীয় চরিত্র, পসন্দনীয় গুণসম্পন্ন, পরিপূর্ণ মানবতা-সম্পন্ন, ফযীলতসমৃদ্ধ, প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত বিষয়ের সমাহারকে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সাথে বর্ণনাকে হামদ বলে। আর তাহমীদ, যা থেকে 'মুহাম্মদ' শব্দ গৃহীত, তা تفعيل বাবের مصدر (শব্দমূল) যার ব্যবহার কেবল পরিপূর্ণতা ও পুনরাবৃত্তির জন্য হয়ে থাকে। কাজেই মুহাম্মদ শব্দটি তাহমীদ শব্দের কর্মকারক। ফলে এর অর্থ হবে, ঐ পবিত্র ও গুণসম্পন্ন সত্তা, যার প্রকৃতি ও স্বকীয় পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্যের কারণে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সাথে বারবার উচ্চারণ করা হয় :

اللهم صلى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم

"হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ; তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের প্রতি দরূদ বর্ষণ করুন, আর তাঁদেরকে বরকত ও শান্তি-সালামে ভূষিত করুন।"

আর কেউ কেউ বলেন, মুহাম্মদ শব্দের অর্থ হলো, যার মধ্যে প্রশংসনীয় অভ্যাস, প্রশংসনীয় গুণাবলী এবং উচ্চ পর্যায়ের পরিপূর্ণতা বিদ্যমান।

ইমাম বুখারী তাঁর তারিখে সাগীর-এ হযরত আলী ইবন যায়দ থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ তালিব এই কবিতা আবৃত্তি করেন :

وَشَقَّ لَه مِنْ اسْمِه لِيُجِلَّه فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُوْدٌ وَهٰذَا مُحَمَّدٌ

[ফাতহুল বারী, ماجاء فى اسماء رسول الله ﷺ অধ্যায়, ৬খ. পৃ. ৪০৪]।

কবিতাটি হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-এর দিওয়ানে উল্লিখিত আছে। সম্ভবত উভয়ে একই কবিতা তৈরি করেছিলেন অথবা হযরত হাসসান (রা) আবূ তালিবের কবিতাকে নিজের দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। (যারকানী, শরহে মুয়াত্তা)

'আহমদ' 'ইসমে তাফযীলে'র শব্দ। কারো কারো নিকট 'ইসমে মাফউলে'র অর্থজ্ঞাপক এবং কারো কারো মতে 'ইসমে ফায়িলে'র অর্থে ব্যবহৃত।

যদি ইসমে মাফউলের অর্থ গ্রহণ করা হয়, তা হলে অর্থ হবে 'সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত'। আর সৃষ্টিলোকের মধ্যে তিনি যে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত এতে কোন সন্দেহ নেই। আর তাঁর চেয়ে বেশি প্রশংসা আর কারো করা হয়নি।

আর যদি 'ইসমে ফায়িলে'র অর্থ নেয়া যায়, তা হলে আহমদ শব্দের অর্থ হবে সৃষ্টজীবের মধ্যে 'সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রশংসাকারী'। এটাও অত্যন্ত সত্য ও সঠিক কথা। পৃথিবীতে কেবল তিনি এবং তাঁর উম্মতগণ আল্লাহ্ তা'আলার যে প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করেন, অন্য কেউ তেমনটি করেনি। এজন্যে পূর্ববর্তী নবীগণ তাঁর আগমনের সংবাদ আহমদ শব্দ দ্বারা প্রদান করতেন আর তাঁর উম্মতের পরিচয়ে 'হাম্মাদিন' (প্রশংসাকারী) উপাধি ব্যবহার করতেন। এটা খুবই সঠিক কথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সূরা ফাতিহা দান করেছেন এবং পানাহার, ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর এবং সর্বপ্রকার দু'আর পর তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আখিরাতে শাফায়াতের সময় তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর এরূপ প্রশংসার বাক্য ব্যবহার করবেন, যা কোন প্রেরিত নবী-রাসূল কিংবা কোন শাসককে জানানো হয়নি। এজন্যে কিয়ামতের দিন তাঁকে 'মাকামে মাহমূদ' এবং 'লিওয়ায়ে হামদ' নামক পতাকা দান করা হবে। ঐ সময় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ, যারা হাশর ময়দানে জমা হবে, তারা সবাই তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করবে। মোট কথা, হামদ শব্দের সমস্ত অর্থ এর শাখা ও প্রকার সবই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী এবং নবীগণের বক্তব্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটাই অনুমিত হয় যে, আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি সব কাজ সমাপ্তির পর পসন্দনীয় ও দৃষ্টিনন্দন হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহর বাণী :

وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"তাদের মধ্যে হক্কের ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের।" (সূরা যুমার ৭৫)

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"জান্নাতবাসীগণের শেষ দু'আ হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।" (সূরা ইউনুস ১০)

"অত্যাচারীদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের।" (সূরা আন'আম : ৪৫)

পানাহারের পর দু'আ ও প্রশংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই বলেছেন ঃ كُلُوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ "তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত রিযক খাও এবং তাঁর শোকর কর।"

আর নবী করীম (সা) শোকরের ব্যাখ্যা হামদ শব্দের দ্বারা করেছেন। কাজেই হাদীস শরীফে اَفْضَلُ الشُّكْرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (উত্তম কৃতজ্ঞতা হলো আলহামদু লিল্লাহ বলা) এবং পানাহারের পর আলহামদু লিল্লাহ বলার জোর নির্দেশ এসেছে। যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তিনি (সা) বলতেন : اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ "আমরা

আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং স্বীয় প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।"

সালাত আদায় শেষে তিনি এ আয়াত পাঠ করতেন :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

মোটকথা, এই সমস্ত কুরআনের আয়াত এবং পবিত্র বাক্যাবলী দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কোন বস্তু সমাপ্তির পরই প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নাম মুহাম্মদ এবং আহমদ রেখেছেন যাতে ওহীর পূর্ণতা এবং নবী-রাসূল আগমনের সমাপ্তি এর দ্বারা বুঝা যায়।

হযরত রাসূল (সা)-এর এই দুই নাম মুহাম্মদ ও আহমদ-এর এই সমুদয় ব্যাখ্যা আল্লামা সুহায়লী ও হাফিয আসকালানীর বক্তব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী অর্থাৎ কুফর দূরকারী, আমি হাশির, কিয়ামতে লোকদের হাশর আমার দু'পায়ের উপর হবে। অর্থাৎ সর্বপ্রথম আমিই কবর থেকে উঠব। এর অর্থ হলো ঐ দিন তিনি সকলের নেতা ও সর্দার হবেন আর সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী হবে। এবং আমি আকিব অর্থাৎ সকল নবীর শেষে আগমনকারী।[১]

বুখারী ও তিরমিযীতে রয়েছে, انا عاقب الذى ليس بعدى نبى। "আমি আকিব, অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী নেই।"

ইমাম মালিক আকিব শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন : الذى ختم الله به الانبياء "যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন।"[২] সুফিয়ান সাওরী বলেন, আকিব অর্থ সর্বশেষ নবী।[৩]

মহানবী (সা)-এর আরো অনেক নাম আছে। কিন্তু হাদীসে এই পাঁচটি নাম নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, সাবেক নবীদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহে এ পাঁচটি নামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. আল্লামা সুহায়লী রাউযুল উনুফ, শরহে সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৬-এ উল্লেখ করেছেন এবং হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৩ আসমাউন নবী অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছেন। হাফিয আসকালানী বলেন, যে সব রিওয়ায়াতে আকিব-এরপর الذى ليس بعده نبى এসেছে, ঐ সব রিওয়ায়াতে الذى ليس بعده। লিখিত হওয়ার অবকাশ আছে। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনায় الذى ليس بعدى نبى। (অর্থাৎ উত্তম পুরুষে) نبى -এর সাথে লিখিত হওয়ার অবকাশ নেই। –দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৬, 'মা জাআ ফী আসমায়ি রাসূল (সা)' অধ্যায়।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, আল-মুসাফফা, শরহে মুয়াত্তা, ২খ. পৃ. ২৮৫।

৩. যারকানী, শরহে মুয়াত্তা, ৪খ. পৃ. ২৭২।

হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে (১খ. পৃ. ২১) বলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু আরবী ও আজমী সবার অন্তরে ও জিহ্বায় মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছিলেন যে, মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা কারো ধারণায়ই উদয় হয়নি। এজন্যে কুরায়শগণ আশ্চর্য হয়ে আবদুল মুত্তালিবকে প্রশ্ন করেছিল, আপনি এ ধরনের নূতন নাম কেন নির্ধারণ করলেন, যা আপনার কওমের কেউ কোনদিন রাখেনি ? কিন্তু শুভ জন্মের কিছুদিন পূর্বে লোকেরা যখন বনী ইসরাঈল আলিমদের মুখে শুনলো যে, শীঘ্রই মুহাম্মদ ও আহমদ নামে একজন নবী জন্মগ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তখন কিছু লোক আশার বশবর্তী হয়ে নিজেদের সন্তানের নাম মুহাম্মদ রাখে। কিন্তু আল্লাহর অপার মহিমা ও কুদরত যে, কেউ নিজেদের নবী বলে দাবি করেনি যাতে মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সা)-এর নবূওয়াত ও রিসালাতে কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না হয়। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৪-৪০৫ দেখা যেতে পারে।

مقام تو محمود نامت محمد بدنیان مقامی ونامی که دارد

"তোমার পদমর্যাদা প্রশংসিত, আর তোমার নাম মুহাম্মদ যে মর্যাদা এবং সুনাম বিশ্বসেরা।"

উপনাম

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সবচেয়ে বড়, প্রসিদ্ধ ও প্রচারিত উপনাম ছিল আবুল কাসিম, যা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম-এর নামানুসারে।

দ্বিতীয় উপাধি আবূ ইবরাহীম। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যখন মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভ থেকে ইবরাহীম জন্মালেন, তখন জিবরাঈল (আ) রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলেন السلام عليك يا ابا ابراهيم "হে ইবরাহীমের পিতা ! আপনার প্রতি সালাম।"[১]

খাতনা

খাতনার ব্যাপারে তিনটি বক্তব্য রয়েছে। প্রথমটি হলো, হুযূর (সা) খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। হাকিম বলেন, তাঁর খাতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণের ব্যাপারে অনেক মুতাওয়াতির হাদীস রয়েছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য হলো, তার জন্মের পর সপ্তম দিনে দাদা আবদুল মুত্তালিব আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর খাতনা করান। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সুন্নত হিসেবে তারা নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে খাতনা করাতেন।

তৃতীয় বক্তব্য হলো, দুধমাতা হযরত হালিমার আশ্রয়ে আসার পর তাঁর খাতনা করানো হয়েছে; তবে এটা দুর্বল বক্তব্য; প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য হলো প্রথম দু'টি। আর এ দু' বক্তব্যের মধ্যে সমন্বয়ও সম্ভব এভাবে যে, হুযূর (সা) খাতনাকৃত

১. মুস্তাদরাকে হাকিম, ২খ. পৃ. ৬০৪।

অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবদুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে এ সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন।

লালন-পালন ও দুধপান

শুভ জন্মের পর তিন-চারদিন তাঁর মাতা তাঁকে দুধপান করান। অতঃপর চাচা আবূ লাহাবের আযাদকৃত দাসী সুয়াযবা তাঁকে দুধপান করান। সুয়ায়বা যখন তাঁর জন্ম সংবাদ চাচা আবূ লাহাবকে শোনান, তখনই আবূ লাহাব আনন্দে তাঁকে মুক্ত করে দেন। তাঁর পূর্বে সুয়ায়বা নবীজীর আপন চাচা হযরত হামযাকে দুধপান করান। এজন্যে হামযা তাঁর দুধভ্রাতা ছিলেন। তাঁর পর সুয়ায়বা আবূ সালমাকে দুধপান করান (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৩৭)।

সহীহ্ বুখারী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে আরয করলাম যে, আমি শুনলাম আপনি আবূ সালমার কন্যা দুররাকে বিয়ে করার ইচ্ছে করেন। এতে তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, উম্মে সালমার কন্যার সাথে ? যে আমার তত্ত্বাবধানে আছে, যদি দুররা আমার রাবীবাহ[1] নাও হতো, তবুও সে আমার জন্য বৈধ হতো না। কেননা সে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী। আমাকে ও তার পিতা আবূ সালমাকে[2] সুয়ায়বা দুধপান করিয়েছে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সা) সমীপে আরয করেন, যদি আপনি হামযা (রা)-এর কন্যাকে বিয়ে করতেন, তা হলে কেমন হতো ? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, সে আমার দুধ সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী।

সুয়ায়বার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। হাফিয আবূ মিনযাহ্ সুয়ায়বাকে মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভাল জানেন (ফাতহুল বারী, কিতাবুন নিকাহ, ৯খ. পৃ. ১২৪)।

নবী করীম (সা) সুয়ায়বাকে খুবই সম্মান করতেন। হযরত খাদীজা (রা)-এর সাথে তাঁর বিয়ের পর সুয়ায়বা তাঁর খিদমতে হাযির হতেন। হিজরতের পরেও রাসূল (সা) মদীনা থেকেও সুয়ায়বার জন্য উপহার প্রেরণ করতেন। যখন মক্কা মুকাররমা বিজিত হলো, তিনি সুয়ায়বা ও তার পুত্র মাসরুহ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন। যখন জানতে পেলেন যে, তারা দু'জনই মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন তাদের নিকটাত্মীয় কাউকে তালাশ করেন, যাতে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে সক্ষম হন। জানা গেল, তার কোন আত্মীয়-কুটুম্বও জীবিত নেই।

---

১. রাবীবাহ ঃ আপন স্ত্রীর ঐ কন্যা সন্তানকে বলা হয়, যে স্ত্রীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত।

২ আবূ সালমা উম্মু সালমার প্রথম স্বামী ছিলেন। তার ওফাতের পর উম্মু সালমা মহানবী (সা)-এর স্ত্রীগণের অন্তর্ভুক্ত হন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ২খ. পৃ. ২৬৪)।

আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর কেউ[১] তাকে স্বপ্ন দেখল যে, সে খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছে। জিজ্ঞেস করা হলো, কি অবস্থায় আছো? আবূ লাহাব বললো, আমি তোমাদের অপেক্ষা আরামপ্রদ অবস্থা দেখিনি। কেবল এটুকু যে, সুয়ায়বাকে মুক্ত করে দেয়ার কারণে অঙ্গুলী পরিমাণ পানি পান করতে দেয়া হচ্ছে (বুখারী)। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জন্মের খবর শুনে যে অঙ্গুলীর ইশারায় তাকে মুক্ত করেছি, ঐ পরিমাণ পানিই পান করতে দেয়া হচ্ছে।

আল্লামা সুহায়লী (র) বলেন, একবার হযরত আব্বাস (রা) আবূ লাহাবকে স্বপ্নে দেখেন যে, সে খুবই খারাপ অবস্থায় আছে এবং বলছে যে, আমি তোমাদের থেকে বিদায়ের পরে কোন শান্তি দেখি নাই। অবশ্য প্রতি সোমবার শাস্তি লাঘব করা হয় (ফাতহুল বারী, ৯খ. পৃ. ১২৪)।

হালিমা সাদিয়া

সুয়ায়বার পর হালিমা সাদিয়া তাঁকে দুধপান করান। আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল, সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা নিজেদের দুগ্ধপোষ্য সন্তানদের শুরুতেই গ্রামে এ জন্যে প্রেরণ করতেন যাতে গ্রামের নির্মল আলো-বাতাসে শিশু বেড়ে উঠতে পারে, শিশুর ভাষা যাতে শুদ্ধ হয় এবং আরবের আসল তমদ্দুন ও খাঁটি আরবীয় স্বভাব থেকে বিচ্যুত না হয়। যেমন হযরত উমর (রা)-এর বাণী : تمعددو او تمعزروا واخشوشنوا "মা'আদ ইবন আদনানের বেশ গ্রহণ করো। অর্থাৎ অনারবীয় পোশাক ও আকৃতি গ্রহণ করো না। আর কাঠিন্যে ধৈর্য ধারণ করো। মোটা কাপড় পরিধান করো অর্থাৎ আরামপ্রিয় হয়ো না।"[২]

একবার হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার কথা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। জবাবে তিনি বললেন, প্রথমত আমি কুরায়শ বংশীয়, অধিকন্তু আমি সাদ গোত্রের দুধপান করেছি।[৩]

এ প্রথা অনুসারে বনী সা'দের স্ত্রীলোকগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে প্রতি বছর মক্কায় আগমন করতো। হালিমা (রা) বলেন, আমি গোত্রের অন্যান্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশুর সন্ধানে মক্কায় আগমন করলাম। আমার সাথে আমার স্বামী এবং নিজের দুগ্ধপোষ্য একটি শিশু ছিল। বাহন হিসেবে সঙ্গে একটি দুর্বল ও কৃশ গর্দভ আর এমন একটি উটনী ছিল যার ওলান থেকে এক ফোঁটা দুধও বের হতো না। ক্ষুধার কারণে রাত্রে আমাদের ঘুম আসতো না। নিজ শিশুটির অবস্থাও এমন ছিল যে,

---

১. এ স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন হযরত আব্বাস (রা)। এটা আবূ লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পরের ঘটনা। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৩)।

২. হাফিয ইবনুল আসীর হযরত উমর (রা)-এর এ বাণীর এ অর্থই গ্রহণ করেছেন যা আমরা উপরে প্রকাশ করেছি। হাফিয সাহেব বলেন, হযরত উমর (রা)-এর এ গুরুত্বপূর্ণ বাণীটি তিবরানী আবূ হাদর আসলামী থেকে মরফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন; অর্থাৎ এ বাণী মহানবী (সা)-এর অনুমোদিত (আন-নিহায়া)।

৩. রাওযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১০৯।

ক্ষুধার তাড়নায় সেও সারারাত কাঁদতো আর চেঁচামেচি করতো। আমার স্তনে এ পরিমাণ দুধও ছিল না, যাতে শিশুটি পরিতৃপ্ত হতে পারে। কোন স্ত্রীলোক এমন ছিল না যে, যার সামনে শিশু নবী (সা)-কে উপস্থিত করা হয়নি। তারা যখনই শুনতো যে, শিশুটি ইয়াতীম, তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতো। কারণ যার পিতাই নেই, তার লালন পালনের বিনিময়ে কী-ই বা এমন পাওয়া যাবে ! অথচ তখন এটা কারুরই জানা ছিল না যে, তিনি ইয়াতীম নন; বরং ইয়াতীমের লালনকারী এবং ইনি সেই পবিত্র শিশু, যার হাতে রোম ও পারস্য সম্রাটের ধন ভাণ্ডারের চাবিগুলো সোপর্দ করা হবে। পৃথিবীতে যদিও তাঁর কোন ওলী, অভিভাবক ও লালন-পালনের পারিশ্রমিক দেয়ার কেউ নেই, কিন্তু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, যার কুদরতী হাতে আছে পৃথিবী এবং আসমানের অগণিত ভাণ্ডার, তিনিই এই ইয়াতীমের ওলী, অভিভাবক, আর এ শিশুর লালন-পালনকারীকে মুহূর্তে ধারণাতীত পারিশ্রমিকসহ অনেক কিছু দিতে সক্ষম।

সব স্ত্রীলোকই দুগ্ধপোষ্য শিশু পেয়ে গেল, কেবল হালিমাই পেলেন না। এদিকে ফিরে যাওয়ার সময় হলো। খালি হাতে ফিরে যাওয়া হালিমার নিকট কষ্টকর মনে হলো। অদৃশ্যলোক থেকে তখন হালিমার অন্তরে ঐ ইয়াতীম শিশুটি গ্রহণের বলিষ্ঠ যুক্তি ও অত্যন্ত আগ্রহের সৃষ্টি হলো। তিনি গিয়ে স্বামীকে বললেন:

والله لاذهبن الى ذلك اليتيم فلاخذنه قال لا عليك عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة

"আল্লাহর শপথ ! আমি অবশ্যই ঐ ইয়াতীম শিশুটির নিকট যাব এবং অবশ্যই তাকে নিয়ে আসব। স্বামী বললেন, যদি তুমি এমনটি কর, তা হলে কোন ক্ষতি নেই। আশা করা যায় আল্লাহ তাকেই আমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকতের নিমিত্তে পরিণত করবেন।"

অভিধান অনুযায়ী বরকত আল্লাহ প্রদত্ত প্রাচুর্য ও কল্যাণের নাম। অর্থাৎ ঐ কল্যাণ ও মঙ্গলের নামই বরকত, যা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। আর বাহ্যিক কোন বস্তু এতে অংশীদারিত্ব থাকে না (ইমাম রাগিবকৃত আল-মুফরাদাতে এমনটিই বলা হয়েছে)। একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ "বান্দা আমার প্রতি যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে সে অনুযায়ী আচরণ করি।"

হালিমা এরূপ বরকতের প্রত্যাশা নিয়েই ইয়াতীম শিশু মুহাম্মদকে নিয়ে আসেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনও তাঁর বাসনা অনুযায়ী তাঁর প্রতি বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দিলেন। বনী সাদ-এর অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ সৃষ্টের প্রতি আশা পোষণ করে, আর হালিমা স্রষ্টার প্রতি আস্থা স্থাপন করলেন। হালিমা বললেন, শিশুটিকে মাত্র কোলে নিয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার শুষ্ক স্তন দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো। দুধ এতই বৃদ্ধি

পেল যে, তিনি (সা) পান করে পরিতৃপ্ত হলেন এবং তাঁর দুধভ্রাতাও তৃপ্ত হলো। উটনীর দুধ দোহনের সময় দেখা গেল, দুধে উটনীর স্তনও পরিপূর্ণ। আমি এবং আমার স্বামী দুধপান করে পরিতৃপ্ত হলাম। রাত্রিটা খুবই আরামে কাটলো। সকাল হলে স্বামী বলল : تَعَلَّمِى وَاللهِ يَا حَلِيْمَةُ لَقَدْ اَخَذْتِ نَسَمَةً مُبَارَكَةً "ওহে হালিমা ! বুঝে নাও, আল্লাহর কসম, তুমি এক মুবারক সন্তান গ্রহণ করেছো।"

জবাবে হালিমা বললেন : وَاللهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ ذٰلِكَ "আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই আল্লাহর নিকট এমনটিই আশা করেছিলাম।"

এবার কাফেলার ফিরে যাওয়ার পালা, আর কাফেলার সবাই সওয়ার হয়ে যাত্রা শুরু করেছে। হালিমাও এ ভাগ্যবান শিশুটি নিয়ে ঐ কৃশ ও দুর্বল উটটিতে সওয়ার হলেন—যাকে এর পূর্বে চাবুক মেরে চালাতে হতো, সেটি এখন বিদ্যুৎ গতিসম্পন্ন, কোনক্রমেই থামতে চায় না। কারণ এখন তো সে একজন নবীর বাহনে পরিণত হয়েছে। সঙ্গী স্ত্রীলোকগণ জিজ্ঞেস করলো হালিমা, এটা কি সেই সওয়ারী ? আল্লাহর কসম! এখন তো এর মর্যাদাই আলাদা! এভাবেই আমরা বনী সা'দ গোত্রে পৌঁছলাম। ঐসময় বনী সা'দ গোত্র এলাকা সবচাইতে অধিক দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা ছিল। আমার বকরিগুলো যখন চারণভূমি থেকে ফিরে এলো, তখন সেগুলো দুধে পরিপূর্ণ ছিল। আর অন্যেরগুলো ক্ষুধার্ত ও শুষ্ক স্তন নিয়ে ফিরে এলো, যাতে একফোঁটা দুধও ছিল না।

ফলে তারাও নিজেদের রাখালদের ঐ চারণভূমিতে বকরি চরাতে বললো, যেখানে হালিমার বকরীগুলো চরানো হয়। তাদের রাখালরা তাই করলো। এ সত্ত্বেও এমন হলো যে, সন্ধ্যায় হালিমার বকরীগুলো পরিতৃপ্ত ও দুধে ভরপুর অবস্থায় ফিরে আসতো আর অন্যদেরগুলো আসতো খালি পেটে এবং ওদের স্তনে একফোঁটা দুধও থাকতো না। হালিমা বলেন,[১] আল্লাহ তা'আলা এভাবেই আমাদের প্রতি কল্যাণ ও বরকত প্রদর্শন করতে থাকেন আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। এভাবে যখন দু'বছর পূর্ণ হলো তখন আমি তাঁকে দুধ ছাড়ালাম।

যখন দু'বছর পূর্ণ হলো, তখন হালিমা শিশু মুহাম্মদ (সা) কে নিয়ে মক্কায় এলেন। উদ্দেশ্য, মা আমিনার হাতে তাঁর আমানত প্রত্যার্পণ করা। কিন্তু তাঁর কারণে আল্লাহ তা'আলা হালিমাকে যে বরকত ও কল্যাণ দান করেছিলেন, এজন্যে তিনি মা আমিনার কাছে আবদার রাখলেন যে, এ ভাগ্যবান ইয়াতীম শিশুটিকে যেন আরো

---

১. হযরত হালিমার এ সমুদয় ঘটনা সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে। কেবল বাক্য বিন্যাসে পরিবর্তনসহ অপরাপর বর্ণনাও পাওয়া যায়– যা আল্লামা সুয়ূতী তাঁর খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে (১খ. পৃ. ৫৪) মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, তাবারানী ও বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেছেন। ঐ বাক্যটি ছিল ঃ فلم يزل الله يرينا البركة و لعترفها আর সীরাতে ইবন হিশামে আছে ঃ فلنم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير আমরা এ দু'টো মিলিয়ে অনুবাদ করেছি। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ হাদীস বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং সীরাত ও মা'গাযী লেখকগণের নিকট প্রসিদ্ধ। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৫; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; মাজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২১।

কিছুদিনের জন্য তার কাছে রাখা হয়। তখন মক্কায় মহামারী দেখা দিয়েছিল। এদিকে হালিমার অসাধারণ আগ্রহে মা আমিনা তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং আরো কিছুদিন শিশুকে তাঁর কাছে রাখার অনুমতি দিলেন। হালিমা আনন্দচিত্তে তাঁকে নিয়ে বনী সাদ গোত্রে ফিরে এলেন। কয়েক মাস পর তিনিও দুধ ভাইদের সাথে জংগলে বকরী চরানো শুরু করলেন।

বক্ষ বিদারণ (شق صدر)

একদিনের ঘটনা, তিনি তার দুধ ভাইদের সাথে জংগলে বকরি চরাতে গেছেন, এক পর্যায়ে দুধ ভাইয়েরা দৌড়ে এসে তাঁর সম্পর্কে খবর দিল যে, সাদা পোশাকধারী দু'ব্যক্তি আমাদের কুরায়শী ভাইকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেলেছে; এখন পেট সেলাই করছে। এ ঘটনা শুনে হালিমা ও তার স্বামী দিশেহারা হয়ে পড়লেন, পড়ি কি মরি করে উভয়ে ঘটনাস্থলে দৌড়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, শিশু মুহাম্মদ এক জায়গায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পবিত্র চেহারা ফ্যাকাসে বর্ণ। হালিমা বলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিলাম। এরপর তাঁর দুধ পিতাও তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কি হয়েছিল ? তখন তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন (এটি আবূ ইয়ালা ও তাবারানী বর্ণিত; বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।[১]

বক্ষ বিদারণের ঘটনা নবী মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনে চারবার ঘটেছিল। প্রথমবার শৈশবকালে, যখন তিনি হালিমা সাদিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল চার বছর। একদা তিনি জঙ্গলে ছিলেন, এমন সময় দু'জন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ) সাদা পোশাকধারী মানুষের বেশে একটি বরফে ভর্তি স্বর্ণের তশতরি নিয়ে আগমন করেন এবং তাঁর পেট চিরে পবিত্র কলব বের করেন। এরপর তা ফাঁড়েন এবং এর ভেতর থেকে এক অথবা দু' টুকরা জমাট রক্ত বের করে বললেন, এই টুকরো দু'টি শয়তান প্রভাবিত। এরপর ঐ তশতরির বরফে পেট ও কলব ধৌত করেন। পরে তা যথাস্থানে রেখে সেলাই করে দেন এবং দু'বাহুর মধ্যখানে একটি মোহর অংকিত করে দেন।

হালিমা সাদিয়ার এখানে হাঁটা শেখা অবস্থায় তাঁর বক্ষ বিদারণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি বিভিন্ন সাহাবা থেকে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম রিওয়ায়াত হচ্ছে হযরত উতবা[২] ইবন আবদ (রা)-এর। এটি মুসনাদে আহমদ এবং তাবারানীর 'মু'জাম'-এ উল্লিখিত আছে। উতবা (রা)-এর এ রিওয়ায়াত

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; মজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২১।

২ হাদীসে উতবা ইবন আবদ সুলামী (রা), যা আহমদ, তাবারানী ও অন্যরা বর্ণনা করেন, তা হলো ঃ انه سال رسول الله كيف كان بده إمرك فذكر القصة فى ارتضاعه فى بنى سعد وفيه ان الملكين لما شقا صدره قال احدهما الاخر خطه فخاطه وختم عليه يخاتم النبوة ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৪০৯, খাতামুন নবূওয়াত অধ্যায়।

'মুস্তাদরাকে হাকিম'-এও (২খ. পৃ. ৬১৬) বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, উতবা বর্ণিত এ হাদীসটি[১] ইমাম মুসলিমের প্রামাণ্য শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবী হাকিমের মতামতের ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। আল্লামা হায়সামী হযরত উতবার এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, আহমদ ও তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদীসটির ইমাম আহমদ বর্ণিত সনদটি 'হাসান'।[২]

দ্বিতীয় রিওয়ায়াত, এটি হযরত আবূ যর (রা) থেকে, যা মুসনাদে বাযযার দারিমী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যারকানী বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীসটিতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা' নামক গ্রন্থে এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আর আলিমগণের অভিমত হলো, হাফিয মাকদিসীর বিশুদ্ধ বলাটা হাকিম-এর অনুরূপ মন্তব্য থেকে অধিক গ্রহণযোগ্য।[৩] হযরত আবূ যর (রা)-এর এ হাদীসটি 'দালাইলে আবূ নুয়াইম'-এও বর্ণিত হয়েছে। আর হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী-তে (৬খ. পৃ. ৪০৯) বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীস মুসনাদে আহমদ ও দালাইলে বায়হাকীতে উল্লেখ আছে।

তৃতীয় রিওয়ায়াতটি হচ্ছে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর।[৪] এটি 'তাবাকাতে ইবন সা'দ'-এ বর্ণিত আছে। রিওয়ায়াতটি হলো :

اخبرنا يزيد بن هارون و عفان بن مسلم قالانا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضه بن مالك ان رسول الله ﷺ كان يلعب مع الصبيان فاتا ات فاخذه فشق

---

১. এ রিওয়ায়াতের সনদে এক বর্ণনাকারী হলেন বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ, যার কারণে কোন কোন গ্রন্থকার এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হওয়াকে অস্বীকার করেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহিয়া ইবন মুঈন, আবূ যুরআ আজালী ও ইবন সাদ বলেন, বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য। যদি তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করে থাকেন, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, অন্যথায় নয়। ইমাম নাসাঈ বলেন, বাকিয়া ইবনুল ওয়ালিদ যদি حدثنا কিংবা اخبرنا। দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি عن দ্বারা বর্ণনা করেন তবে তা গ্রহণ করা যাবে না (তাহযীব, ১খ. পৃ. ৪৭৪-৪৭৫)। এটা খুবই স্মরণীয় যে, উক্ত বর্ণনাটি যদিও বিশ্লেষণে عن-এর মর্যাদা দেয়া হয়েছে কিন্তু মুস্তাদরাকে حدثنا ও اخبرنا। দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنى بحير بن سعيد عن خالدبن معدان عن عتبة بن عبد السلمى অর্থাৎ বাকিয়া এটি গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে গ্রহণ করেছেন, কোন অজ্ঞাত কিংবা দুর্বল বর্ণনাকারী থেকে গ্রহণ করেন নি। এজন্যে যে, বুহায়র ইবন সাঈদ, যার থেকে বাকিয়া বর্ণনা করেছেন, আহমদ ইবন হাম্বল, আজালী, ইবন সাদ, নাসাঈ, আবূ হাতিম এবং ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তাহযীব, ১খ. পৃ. ৪২১।

২ আল্লামা যারকানীর বর্ণনা এরূপ ঃ قلت لا شك فى صحة اسناده فقد صححه ايضاء وقد قال العلماء ان تصحيحه اعلى من تصحيح الحاكم —যারকানী, ১খ. পৃ. ২১।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬০-১৬১।

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, 'বাবু আলামাতুন নবূওয়াত কাবলাল ইসলাম', ১খ. পৃ. ৯৭।

بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال هذا صدره النصيب الشيطان منك ثم غسل في طست من ذهب.من ماء زمزم ثم لائمـــه فاقبل الصبيان الى ظره قتل محمد فاستقبلت رسول الله ﷺ وقدانتقع لونه قال انس فلقد كنا نرى اثر المخيط في صدره

যার সমস্ত বর্ণনাকারীই বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য।[১]

চতুর্থ রিওয়ায়াতটি হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যা উদ্ধৃতি সহ আল্লামা সুয়ূতী 'বায়হাকী'তে এবং ইবন আসাকির তাঁর 'খাসাইসে' উল্লেখ করেছেন।[২]

পঞ্চম রিওয়ায়াত, এটি হযরত শাদ্দাদ ইবন আবুস (রা) থেকে বর্ণিত, যা হাফিয আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী'তে খাতামুন নবূওয়াত অধ্যায়ে এবং আল্লামা যারকানী তাঁর 'শারহে মাওয়াহিবে' (১খ. পৃ. ১৫০) 'মুসনাদে আবূ ইয়ালা' এবং' দালাইলে আবূ নুয়াইম'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন।[৩]

ষষ্ঠ রিওয়ায়াতটি হচ্ছে, তাবিঈ হযরত খালিদ ইবন মা'দান (র)-এর। এটি তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৯৬) 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের সনদ সূত্রে বর্ণিত যে, খালিদ ইবন মাদান কিলাঈ বলেন, একদল সাহাবী আমাকে শৈশবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্ষ বিদারণ সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন।[৪] সীরাতে ইবন হিশামে (১খ. পৃ. ৫৬, ১৭৫) হাফিয ইবন কাসীর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী।"[৫]

হযরত ইবন আব্বাস (রা), শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) এবং খালিদ ইবন মাদান (র)-এর বর্ণনায় কিছু কিছু বর্ণনাকারী 'যঈফ' হওয়ার দরুন, যদিও এ সমস্ত বর্ণনায়

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২২২।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬, ১৬১; ৬খ. পৃ. ৪০৯।

৩. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৯৭; খাসাইসুল কুবরা, পৃ.৫৫।

৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে (৩ খ.) ما جاء في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما অধ্যায়ে উল্লেখ করেন।

৫. হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা, যা দালাইলে আবূ নুয়াইমে বর্ণিত আছে, এতে দু'জন বর্ণনাকারী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রয়েছে। এদের একজন ইয়াযীদ ইবন ইয়ানবুস। আবূ হাতিম বলেন, তিনি অজ্ঞাত বর্ণনাকারী। অথচ দারে কুতনী তাঁর সম্বন্ধে দোষের কিছু নেই (لا بأس به) বলেছেন এবং ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে শামিল করেছেন (তাহযীব, ১১খ. পৃ. ৩১৬)। হাফিয মিযযী তাঁর তাহযীবুল-কামাল-এ বলেন ঃ تكره ابن حبان في الثقات وروى له البخاري في الادب و ابو داؤد والترمذي في الشمائل والنسائ (তাহযীবুল কামাল, ৭খ. পৃ. ২২১)। অপর বর্ণনাকারী দাউদ ইবনুল নযর, যাকে কোন কোন আলিম মিথ্যাবাদী বলেছেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ইবন মুঈন বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة), মিথ্যাবাদী নন। আবূ দাউদও তাঁকে নির্ভরযোগ্য কিন্তু যঈফ বলেছেন। নাসাঈও তাঁকে যঈফ বলেছেন। -তাহযীব, ৩খ. পৃ. ১৯৯।

এক এক ব্যক্তি যঈফ—আর প্রথমত বর্ণনাকারীর আধিক্যের দরুন যঈফের দোষ হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ যে যঈফ হাদীস বিভিন্ন সাহাবী থেকে ভিন্ন ভিন্ন সনদে প্রাপ্ত, নিঃসন্দেহে তা সহীহ্ হওয়ার দাবিদার। কারণ দুর্বল বর্ণনাকারীর আধিক্যে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বাকী থাকলো মি'রাজের ঘটনায় শৈশবের বক্ষ বিদারণের বর্ণনার প্রসঙ্গ, অথবা পুনরায় বক্ষ বিদারণ সম্পর্কিত বর্ণনা না হওয়া। কতিপয় বর্ণনায় এ বক্ষ বিদারণের উল্লেখ নেই। কিন্তু এটা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না। উল্লেখ না করাটা ঘটনা না ঘটার প্রমাণরূপে ধরে নেয়া যৌক্তিক দিক থেকে ঠিক নয়। মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন যে, এ হাদীসসমূহ্ প্রায় পঞ্চাশ জন সাহাবা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রত্যেক সাহাবীর বর্ণনায় এমন কিছু ঘটনার বিবরণ রয়েছে যা অপর সাহাবীর বর্ণনায় নেই। কাজেই ধরে নিন যে, বর্ণনাকারী কোন বর্ণনায় কেবল বক্ষ বিদারণের বর্ণনা করেছেন, কোন স্থানে কেবল শৈশবকালীন বক্ষ বিদারণের বর্ণনা করেছেন, আর কোন জায়গায় উভয়টি একত্রে বর্ণনা করেছেন। আর প্রত্যেকটি বক্ষ বিদারণের সময় ও স্থান ভিন্ন ভিন্ন এবং ঘটনাও পৃথক পৃথক। কাজেই একটি ঘটনার বর্ণনা দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি রাসূল (সা)-এর দশ বছর বয়সে ঘটেছিল। এটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায়[১] সহীহ্ ইবন হিব্বান, দালাইলে আবূ নুয়াইম প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ হাদীস হাফিয মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা'য় এবং আবদুল্লাহ্ ইবন আহমদ 'যাওয়ায়েদে মুসনাদে' সনদসহ বর্ণনা করেছেন। আল্লামা যারকানী বলেন, যাওয়ায়েদে মুসনাদে বর্ণিত হাদীসের সনদভুক্ত বর্ণনাকারীগণ সবাই নির্ভরযোগ্য (رواه عبد الله و رجاله ثقات وثقهم ابن حبان)।[২] সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে আর ফাতহুল বারীতে علامات النبوة فى الاسلام অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসের সনদে لا بأس به বলায় নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনক্রমেই দুর্বল বলা যায় না। যখন আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণিত সনদ এর সাথে মিলিত করা হয়, তবে তা আরো শক্তিশালী হয়। এ জন্যে হাফিয ইবন মুলাক্কিন এবং হাফিয আসকালানী প্রামাণ্য শব্দ দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেছেন। আর হাফিয ইবন মুলাক্কিনের বর্ণনা হচ্ছে ঃ ثبة شق الصدر ايضا عنه البعثت كما اخرجه ابو نعيم فى الدلائل এ ছাড়া শরহে বুখারীতে (৭খ. পৃ. ৩৮৭) এবং আসকালানীর বর্ণিত বাক্যাবলীও এর নিকটবর্তী–বরং এরূপই।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৭৫; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৮৩।

তৃতীয়বার এ ঘটনা নবূওয়াত লাভের প্রাক্কালে সংঘটিত হয়। যেমনটি 'মুসনাদে আবূ দাঊদ তায়ালিসী' (পৃ. ২১৫) এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' (১খ. পৃ.৬৯)-এ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয ইবন মুলাক্কিন' 'শরহে বুখারী'তে এবং হাফিয আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে ما جاء فى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما শীর্ষক অধ্যায়ে নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে বক্ষ বিদারণের ঘটনা সমর্থন করেছেন। অধিকন্তু, এ ঘটনা 'মুসনাদে বাযযার'-এ হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

আল্লামা হায়সামী বলেন, হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত এ হাদীসটি তাঁরই বর্ণিত ঐ হাদীসের অতিরিক্ত। এটি তিনি ইসরা ও মিরাজ সম্পর্কে বর্ণনা করেছিলেন। হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য এবং বুখারীর বর্ণনাকারী। তবে ঐ সনদের এক ব্যক্তি, জাফর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসমান আল-কাবীরকে আবূ হাতিম রাযী এবং ইবন হিব্বান নির্ভরযোগ্য বললেও উকায়লী এতে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

চতুর্থবার মি'রাজের সময় বক্ষ বিদারণের ঘটনাটি সংঘটিত হয়। যেমনটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ হযরত আবূ যর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস ধারাবাহিক এবং প্রসিদ্ধ।[২]

সার কথা

এই চারবার বক্ষ বিদারণের ঘটনা তো বিশুদ্ধ বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কোন কোন বর্ণনায় পাঁচবার বক্ষ বিদারণের কথাও এভাবে উল্লেখ আছে যে, কুড়ি বছর বয়সেও রাসূল (সা)-এর একবার বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল কিন্তু এ রিওয়ায়াত মুহাদ্দিসীনের ঐকমত্য দ্বারা গ্রহণযোগ্য ও প্রমাণিত নয়।

বক্ষ বিদারণের তাৎপর্য

আল্লামা কাসতাল্লানী 'মাওয়াহিব' গ্রন্থে এবং আল্লামা যারকানী 'শরহে মাওয়াহিবে' বলেন :

ثم ان جميع ما ورد من شق الصدر استخراج القلب وغير ذلك من الامور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقة لصلاحية القدرة فلا يستحيل شئ من ذلك هكذا فاله القرطبى فى المفهم والطيبى والتور بشتى والحافظ فى الفتح والسيوطى وغيره ويويده الحديث الصحيح انهم كانوا يرون

১. হাফিয ইবন মুলাক্কিনের লিখিত শরহে বুখারীর কপি হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) আসফিয়া কুতুবখানায় আছে। (মাজমুয়াউয যাওয়াইদ, ৮খ. পৃ. ২৫৫)।

২ যারকানী, শরহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ.২৪।

اثر المحيط فی صدره قال السيوطی وما وقع من بعض جهلة العصر من انكار ذلك وحمله على الامر المعنوی فهو جهل صريح وخطاء قبيح نشاء من خذلان الله تعالى لهم وعكوفهم على العلوم الفلسفة وبعدهم عن دقائق السنة عاقفا الله من ذلك انتهى

"এ পর্যন্ত যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, বক্ষ বিদারণ এবং পবিত্র কলব বিদীর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়াদির বর্ণনা এভাবে মেনে নেয়াই উচিত– ঠিক যেভাবে উপরে বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়কে নিজ চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেয়া উচিত নয়। আল্লাহর অপরিসীম কুদরতের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। ইমাম কুরতুবী, আল্লামা তায়বী, হাফিয তুরবাশতী, হাফিয আসকালানী, আল্লামা সুয়ূতী সহ অপরাপর বিশিষ্ট আলিমগণও এটাই বলেন যে, সিনাচাক স্বপ্রকৃতিতেই মহীয়ান। সহীহ হাদীসসমূহ হচ্ছে এর প্রত্যয়নকারী। যেমন, হাদীসে এসেছে সাহাবা কিরাম (রা) স্বচক্ষে রাসূল (সা)-এর বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, কতিপয় অজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সিনাচাক অস্বীকার করা এবং প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তে এর রূপক অর্থের উপর নির্ভর করা চরম অজ্ঞতা। (যেমন এ যুগের কিছু কিছু লেখক বলেছেন, সিনাচাক প্রকৃতপক্ষে আক্ষরিক অর্থে বক্ষ বিদারণ নয়, বরং অন্তর উন্মুক্ত করার অর্থে) বস্তুত এটা মারাত্মক ভ্রম– যা এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিতবহ। সুন্নতের জ্ঞান থেকে দূরে থাকার ফলেই এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ ধরনের উদ্ভট কল্পনা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।"

সার কথা হলো, شق صدر-এর দ্বারা বক্ষ বিদারণই বুঝায়। বক্ষ বিদারণ থেকে 'অন্তর উন্মুক্ত করার' অর্থ গ্রহণ নিঃসন্দেহে মহাভ্রান্তি। কেননা বক্ষ বিদারণ হচ্ছে রাসূল (সা)-এর এক বিশেষ মু'জিযা বা অলৌকিক ঘটনা যা নবীর জন্যই প্রযোজ্য। আর অন্তর উন্মুক্ত করা যে কারও ব্যাপারে প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন হযরত আবূ বকর (রা), হযরত উমর (রা)-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সৎকর্মশীল আলিমদের অন্তরে হয়ে আসছে। অধিকন্তু, সিনাচাক তথা বক্ষ বিদারণ দ্বারা যদি রূপকার্থে অন্তর উম্মুক্তকরণের অর্থ নেয়া হয়, তা হলে ঐ হাদীসের অর্থ কি হবে, যাতে সাহাবা কিরাম (রা) স্বচক্ষে রাসূল (সা)-এর পবিত্র বক্ষে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছেন? অন্তর উন্মুক্ত করার দ্বারা কি সেলাইয়ের চিহ্নের সৃষ্টি হয়? লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বক্ষ বিদারণের রহস্য

প্রথমবারে হযরত হালিমা সাদিয়ার গৃহে অবস্থানকালীন সময়ে বক্ষ বিদারণ করে যে কৃষ্ণবর্ণের খণ্ডটি হযরতের দেহ থেকে বের করে ফেলা হয়, সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে পাপ ও অন্যায় প্রবণতার উৎস, যা থেকে তাঁর কলবকে পবিত্র ও মুক্ত করে দেয়া

হলো। বস্তুটি বের করার পর খুব সম্ভব এ জন্যেই কলবকে ধৌত করা হয়েছিল, যাতে পাপ প্রবণতার শেষ চিহ্নমাত্র পবিত্র কলবে অবশিষ্ট না থাকে। আর বরফ দিয়ে এজন্যে ধৌত করা হয়েছে যে, পাপের প্রকৃতি উষ্ণ—যেমনটি শায়খ আকবর 'ফুতুহাত' নামক কিতাবে লিখেছেন, পাপের মূলকে নিভিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বরফ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পাপরূপ উষ্ণতার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট না থাকে। আর কুরআন-হাদীস থেকেও এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا

"অবশ্যই যে ব্যক্তি ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, প্রকৃতপক্ষে সে অগ্নি দ্বারাই নিজ পেট ভর্তি করে।"

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম সম্পদ যদিও বস্তুগত দৃষ্টিতে শীতল, আখিরাত তথা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে এর প্রকৃতি অগ্নি থেকেও উষ্ণ কম নয়। যেমন ধৈর্যের প্রকৃতি। এ বস্তু জগতে হানযাল অপেক্ষাও তিক্ত, কিন্তু আখিরাতে তা মধু অপেক্ষা মিষ্ট। উদাহরণত একটি হাদীস এখানে উল্লেখ্য

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار

"সদকা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমনটি পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।" [আহমদ ও তিরমিযী, হযরত মুয়ায ইবন জাবাল (রা) থেকে]

অপর এক হাদীসে এসেছে :

ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار انما يطفا النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضا

"ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আর শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে (এর ফলে ক্রোধ আগুন নিঃসৃত)। আর আগুন অবশ্যই পানি দিয়েই নেভাতে হয়। এজন্যে কেউ যদি রাগান্বিত হয়ে পড়ে, সে যেন উযূ করে।" (আবূ দাঊদ)

ইমাম গাযালী (র) বলেন, উযূ কিংবা গোসল ঠাণ্ডা পানি দিয়ে কর। কেননা আগুনের দু'টি ধর্ম আছে। একটি হলো তাপ ও দহন শক্তি, আর দ্বিতীয়টি উপরের দিকে উঠা। এজন্যে নবী করীম (সা) আগুনের প্রথম ধর্মকে নির্বাপন করার জন্য ক্রোধে এ চিকিৎসা দিয়েছেন যে, উযূ কর এবং ক্রোধের আগুনকে পানি দিয়ে নিভিয়ে দাও। আর দ্বিতীয় ধর্ম উপরের দিকে উঠার প্রেক্ষিতে তিনি শেষোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়েছেন :

اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع

"যার ক্রোধের উদ্রেক হয়, সে যদি দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে বসে পড়বে; এতে যদি ক্রোধ উপশম হয় তো ভাল, আর তা না হলে সে যেন শুয়ে পড়ে।" [আহমদ ও তিরমিযী, হযরত আবূ যর (রা) থেকে]।

ক্রোধ মানুষের এক ধরনের অহংকার ও বড়ত্ববোধের অভিব্যক্তি, এর প্রতিষেধক হলো বিনয় ও নম্রতা। এ জন্যে হুজুর (সা) ইরশাদ করেন ঃ "ক্রোধের উদ্রেক হলে দ্রুত মাটিতে বসে পড় অথবা শুয়ে পড়। আর চিন্তা কর যে, আমাকে এ মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই আগুনের গোলক তৈরি হওয়ার প্রয়োজনটা কি" ? বুখারী, মুসলিম ও অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে এসেছে, নবী করীম (সা) নামাযে সানা পাঠ করার পর এ দু'আও পাঠ করতেন :

اللهم اغسل خطايای بماء الثلج والبرد

"হে আল্লাহ ! আমার পাপরাশিকে বরফ শীতল পানি দ্বারা ধুয়ে দিন।"

এ দু'আ দ্বারা নবী করীম (সা) দু'টি বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন :

১. গুনাহের নাপাকী, যা ধুয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করেছেন। কারণ, নাপাকীকেই পানি দিয়ে ধৌত করতে হয়, পবিত্র জিনিস ধুতে হয় না।

২. তিনি পাপের উষ্ণতা ও গরমকে বরফযুক্ত পানি দ্বারা ধৌত করার আবেদন করেছেন। তা এজন্যে যে, গুনাহের মধ্যে যদি কেবল নাপাকী থাকে, উষ্ণতা না থাকে, তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে নবী করীম (সা) বরফ ছাড়া শুধু পানি অথবা গরম পানি দিয়ে গুনাহরাশি ধুয়ে দেয়ার আবেদন করতেন। কিন্তু গুনাহের মধ্যে নাপাকীর সাথে উষ্ণতাও থাকে বলেই তিনি আল্লাহ্র কাছে নাপাকী থেকে পবিত্র করার আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে শীতলীকরণ ও উষ্ণতা নিবারণের জন্যেও প্রার্থনা করেন। গরম পানি দ্বারা যদি নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জিত হয়, তা হলে শীতলীকরণ ও প্রশান্তির উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনের জন্য বরফ শীতল পানি দ্বারাই তা সম্ভব। এজন্যেই নবী করীম (সা) গরম পানির পরিবর্তে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পাপসমূহ ধৌত করে দেয়ার প্রার্থনা করেছেন। এ কারণেই ইমাম নাসাঈ হাদীসটি দ্বারা এ মাসয়ালা বের করেছেন যে, নামাযের জন্য গরম পানি অপেক্ষা ঠাণ্ডা পানি দ্বারা উযূ করা উত্তম। এটা এ জন্যে যে, উযূ এবং নামায আদায়ের উদ্দেশ্যই হলো গুনাহের আগুন নেভানো। যেমনটি হযরত আবূ যর (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা (যা ক্রোধের চিকিৎসা হিসেবে উপরে বর্ণিত হয়েছে) বুঝা যায় আর আল্লামা তাবারানীর 'মু'জাম'-এ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন "প্রত্যেক নামাযের সময় একজন ঘোষণাকারী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এই বলে ঘোষণা দেন যে, হে আদম সন্তান! উঠ এবং ঐ আগুন নির্বাপিত করো যা তোমরা নিজেদের জন্য প্রজ্জ্বলিত করেছ। এতে ঈমানদারগণ উঠেন এবং উযূ করে নামায আদায় করেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষমা করে দেন।"

যেভাবে উল্লিখিত আয়াতে কুরআন এবং হাদীসে নববী (সা) থেকে গুনাহের প্রকৃতি উষ্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, একইভাবে আল্লাহ তা'আলার মহব্বত ও ভালবাসার প্রকৃতিও স্নিগ্ধ শীতল বলেই অনুভূত হয়। হাদীস শরীফে আছে, মহানবী (সা) এরূপ দু'আ করতেন :

اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى ومن الماء البارد

"হে আল্লাহ ! আপনার মহব্বত আমার কাছে আমার জীবন, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষা প্রিয়তর বানিয়ে দিন।"

ঠাণ্ডা পানির প্রভাব তো ঠাণ্ডাই, পরিজনের প্রকৃতিও তো শীতলই হয়। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্দিষ্ট বান্দাদের প্রার্থিত এ দু'আটি উল্লেখ করেছেন:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

"হে আল্লাহ! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্তুতিদেরকে আমাদের জন্য চক্ষু শীতলকারীরূপে পরিণত করুন।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৪)

অর্থাৎ তাদেরকে আপনার আনুগত্যের দৃষ্টিতে দেখতে চাই এবং আপনার বিরুদ্ধাচরণ ও পাপাচারে দেখতে চাই না। এ জন্যে যে, মুমিনের দৃষ্টি আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারাই শীতল হয়। এতে জানা গেল যে, আল্লাহর আনুগত্যের স্বভাব বা প্রকৃতি হয় শীতল এবং গুনাহের প্রকৃতি গরম হয়। কেননা গুনাহের সম্পর্ক হচ্ছে জাহান্নামের সাথে। এজন্যেই রাসূল (সা) একইসঙ্গে স্বীয় পরিবারভুক্তদের সম্পৃক্ত করে দু'আ করেছেন যে, "আয় আল্লাহ ! আত্মীয়-পরিজনকে আমার কাছে ঠাণ্ডা পানির মত আরামদায়ক শীতল করে দিন, প্রিয় বানিয়ে দিন; আমীন।"

আরবী ব্যাকরণের আলিমদের নিকট যদিও 'মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ'-এর মধ্যে সম্পর্ক জরুরী নয়, কেননা এ বস্তু এর বিতর্ক থেকে বাইরে, কিন্তু ভাষাবিদদের মতে এতে সমন্বয় আবশ্যকীয়। অতএব এটা অসম্ভব যে, নবী করীম (সা)-এর ন্যায় আরব-আযমে সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী ব্যক্তির বক্তব্য উচ্চ মানের বিশুদ্ধতম হবে না। যেভাবে এ কুরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা অপরাধ চরিত্রের উষ্ণ হওয়া এবং আনুগত্য চরিত্রের শীতল হওয়া অনুভূত হয়। এভাবেই এটাও অনুমিত হয় যে, মুবাহ-এর প্রকৃতি হবে মধ্যম মানের—না উষ্ণ না শীতল। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

আর দ্বিতীয়বার বক্ষ বিদারণ হয়েছিল দশ বছর বয়সে। ঐ বয়সে তা এজন্যে করা হয়েছিল, যাতে করে তাঁর পবিত্র কলব অপেক্ষাকৃত স্থূল কর্ম খেল-তামাশার আকর্ষণ থেকে পবিত্র থাকে। কেননা খেল-তামাশা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে ফেলে।

তৃতীয়বারে নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রাক্কালে যে বক্ষ বিদারণ করা হয়েছিল, তা এজন্যে যে, পবিত্র কলব যাতে ওহীর রহস্য ও আল্লাহর ইলম গ্রহণ ও বহনে সক্ষম হয়।

আর চতুর্থবার মি'রাজের সময় বক্ষ বিদারণ করার উদ্দেশ্য ছিল যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র কলব যাতে ফেরেশতা জগতে ভ্রমণ, আল্লাহর তাজাল্লী, আল্লাহর নিদর্শন পর্যবেক্ষণ ও আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতার অধিকারী হয়। মূলত বার বার বক্ষ বিদারণ হয়েছে আর প্রত্যেক বারেরই লক্ষ্য, তাৎপর্য ও হিকমত আলাদা রয়েছে। বার বার বক্ষ বিদারণের উদ্দেশ্য এটাই ছিল, যাতে পবিত্র

কলব পবিত্রতা ও দীপ্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গকে এজন্যে 'ফাতহুল বারী' শীর্ষক গ্রন্থের মি'রাজ অধ্যায়ে মনোনিবেশ করতে অনুরোধ জানাই।

বক্ষ বিদারণের পর মোহরে নবূওয়াত কেন লাগানো হলো

যখন কোন বস্তু হিফাযত করার ইচ্ছা করা হয়, তখন তাতে মোহরাঙ্কিত করা হয়। যাতে এর ভিতরের বস্তু বের হতে না পারে। হীরা-জহরত, মণি-মুক্তা থলিতে ভরে তাতে মোহর লাগানোর উদ্দেশ্য, যাতে এগুলো থলি থেকে বের হয়ে না পড়ে। অনুরূপভাবে তাঁর অন্তরকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা পূর্ণ করে দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহর লাগানোর উদ্দেশ্য হলো ঐ পূঞ্জীভূত সম্পদের কোন কিছু নষ্ট হয়ে না যায়।[১]

অধিকন্তু, বক্ষ বিদারণের মাধ্যমে যেভাবে অন্তরের অভ্যন্তরভাগ শয়তানের চিহ্ন প্রভাব থেকে পবিত্র করা হয়েছে। অনুরূপভাবে দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে কলবের বিপরীতে বামদিকে মোহরটি লাগানো হয়েছে যাতে কলব শয়তানের ওয়াস ওয়াসা এবং বাইরের প্রভাব থেকে সুরক্ষিত হয়ে যায়। কারণ শয়তান ঐ স্থান দিয়ে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করায়। হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই বলে আরয করলো যে, হে রাব্বুল আলামিন ! মানবদেহে শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবেশের পথটি আমাকে দেখিয়ে দিন, যে পথ দিয়ে সে মানব মনে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করায়। তখন তাকে আল্লাহর তরফ থেকে দু'বাহুর মধ্যবর্তী কলবের বিপরীতে বাম পার্শ্বের স্থানটি দেখানো হয় যে, শয়তান এ পথেই আগমন করে আর বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন সে দ্রুত পিছু হটে।[২]

সার কথা এই যে, যেভাবে পবিত্র কলবের অভ্যন্তর ভাগ সিনাচাকের মাধ্যমে শয়তানী চক্রের মূল থেকে পবিত্র করা হয়েছে, একইভাবে পিছন দিকে মোহর লাগিয়ে বহির্ভাগ থেকেও শয়তানের আগমনের পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মোহরে নবূওয়াত কখন লাগানো হয়েছে

কেউ কেউ বলেন, মোহরে নবূওয়াত তাঁর জন্মকাল থেকেই ছিল। বনী ইসরাঈলের আলিমগণ তাঁকে এ চিহ্ন দ্বারাই চিনেছিলেন। আর কারও মতে এ মোহর বক্ষ বিদারণের পর লাগানো হয়েছিল। প্রথম বক্তব্যটি অধিক শুদ্ধ এবং খ্যাত। যেমন কতিপয় রিওয়ায়াত দ্বারা সরাসরি বুঝা যায় যে, মোহরে নবূওয়াত নিয়েই তাঁর জন্ম হয়েছিল। আর এটা অসম্ভবও নয় যে, বক্ষ বিদারণের পর মোহর লাগানোর কথা যে সব রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, সেটা ছিল পূর্ববর্তী মোহরের নবায়ন এবং পুনরাবৃত্তি। এভাবে সমুদয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সাযুজ্য আনয়ন সম্ভব।[৩]

---

১. খাওয়াতিমুল হুমূম, পৃ. ১৫২।

২. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১১।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৬০।

বক্ষ বিদারণের ঘটনার পর হযরত হালিমার মনে জাগলো যে, এ শিশুকে কোনরূপ ব্যথা দেয়া চলবে না। কাজেই তিনি তাঁকে সাথে নিয়ে মক্কায় হযরত আমিনার নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সকল ঘটনা খুলে বললেন। এ সব ঘটনা শুনে হযরত আমিনা খুব একটা বিস্মিত হলেন না; বরং তাঁকে গর্ভধারণ ও প্রসবকালীন সময়ে নূরের আভার সেই ঝলকানি এবং এর কল্যাণ ও বরকতময় যেসব ঘটনা ঘটেছিল, সেসব স্মরণ করে বললেন, আমার এ পুত্রের মর্যাদা খুবই বেশি হবে। জন্ম থেকেই তার প্রতি শয়তানের প্রভাব ও শ্যেনদৃষ্টি পড়েছিল। তুমি নিশ্চিন্ত থাক একে কোন বিপদ স্পর্শ করবে না। হালিমা নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন আর শিশু মুহাম্মদ (সা) নিজ মাতার কাছেই রয়ে গেলেন। যখন তাঁর বয়স ছয় বছর হযরত আমিনা তাঁকে সাথে নিয়ে মদীনা গমন করলেন। উম্মে আয়মানও তাঁদের সহযাত্রী ছিলেন। এক মাস তাঁরা নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে মদীনায় অবস্থান করলেন। এরপর মক্কার পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে হযরত আমিনা ইনতিকাল করলেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।[১]

আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে

উম্মে আয়মান তাঁকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন এবং তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের নিকট সোপর্দ করলেন। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে সব সময় সঙ্গে রাখতেন। তিনি যখন কাবাগৃহে গমন করতেন, কাবার ছায়ায় তার জন্য মসনদসহ একটি বিশেষ ফরাস বিছানো হতো। অন্য কারো সাধ্য ছিল না যে, তাতে পা রাখে। এমনকি আবদুল মুত্তালিবের পুত্রগণও ঐ ফরাসের আশপাশে ও কিনারেই উপবেশন করতেন। তিনি (সা) যখন আসতেন, অবলীলায় ঐ ফরাসে গিয়ে বসে পড়তেন। এ বয়সে ছেলের ওখানে বসা বেমানান ভেবে তাঁর চাচা তাঁকে ঐ আসন থেকে সরিয়ে দিতে উদ্যত হলে আবদুল মুত্তালিব পূর্ণ আনন্দের সাথে বলতেন, আমার এ সন্তানকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, তার মধ্যে নতুনতরো কিছু বৈশিষ্ট্যের আভাস পাচ্ছি। অতঃপর সরে গিয়ে নিজের কাছে টেনে বসাতেন আর তাঁর প্রতি তাকিয়ে আনন্দিত হতেন। সীরাতে ইবন হিশাম,[২] 'উয়ূনুল আসার' ও 'মুস্তাদরাকে হাকিম'-এ কিনদীর ইবন সাঈদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাহিলী যুগে আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হজ্জের উদ্দেশে মক্কায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, এক ব্যক্তি তাওয়াফরত, সে মুখে এ কবিতা আবৃত্তি করছে :

---

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১৬৩।

২ হাফিয সুয়ূতী বলেন, এ ঘটনা সীরাতে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে বর্ণিত আছে। আবূ নুয়াইমে ভিন্ন একটি সনদে এ ঘটনা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে ইবন সাদ ও ইবন আসাকির, জুহরী, মুজাহিদ এবং নাফি হযরত ইবন জুবায়র থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮১)।

رد الى راكبى محمدا　　يارب رده واصطنع عندى يدا

"হে আল্লাহ, আমার সওয়ার মুহাম্মদকে ফিরিয়ে দিন এবং আমার প্রতি সর্বোত্তম[১] অনুগ্রহ করুন।"

আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে ? তারা বলল, তিনি আবদুল মুত্তালিব, নিজ দৌহিত্রকে হারানো উট খুঁজতে পাঠিয়েছেন। কেননা যে কাজে তাঁকে পাঠানো হয়, তাতে তিনি অবশ্যই সফলকাম হন। তিনি অনেকক্ষণ পূর্বে গেছেন। এজন্যে আবদুল মুত্তালিব অস্থির হয়ে এ কবিতা পাঠ করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে আসেন এবং উটটি তাঁর পিছনে ছিল। দেখামাত্র আবদুল মুত্তালিব তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, বৎস, আমি তোমার জন্য খুবই পেরেশান ছিলাম। এখন থেকে আমি আর কখনো তোমাকে আমা হতে পৃথক হতে দেব না। হাকিম বলেন, এ রিওয়ায়াত মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবীও বর্ণনাটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ হওয়াকে সমর্থন করেছেন।[২]

আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল

দু'বছর পর্যন্ত তিনি (সা) স্বীয় পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে থাকেন। বয়স যখন আট বছর হলো, তখন আবদুল মুত্তালিবও এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৮২, ৮৫, ৯৫, ১১০ অথবা ১২০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং তাকে জহুন-এ দাফন করা হয়। আবূ তালিব যেহেতু হযরত আবদুল্লাহর সহোদর ভাই ছিলেন, এজন্যে মৃত্যুকালীন সময়ে আবদুল মুত্তালিব তাঁকে আবূ তালিবের হাতে সোপর্দ করেন এবং ওসীয়ত করেন যে, স্বচ্ছন্দচিত্তে পরিপূর্ণ ভালবাসা দিয়ে তার অভিভাবকত্ব ও লালন-পালন করবে।[৩]

উম্মে আয়মান বলেন, যখন আবদুল মুত্তালিবের জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু যাচ্ছিলেন।[৪]

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের কথা কি আপনার স্মরণ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঐ সময় আমার বয়স ছিল আট বছর।[৫]

আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে

আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকালের পর তিনি তাঁর নিজ চাচা আবূ তালিবের তত্ত্বাবধানে আসেন। আবূ তালিব তাঁকে নিজ সন্তানদের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন

---

১. يدا -এর দু'জবর সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

২ মুস্তাদরাক, ২খ. পৃ. ৬০৩।

৩. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ.৪০।

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৭৪-৭৫।

৫. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৫১।

এবং আনন্দ ও আগ্রহের সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর লালন-পালন ও অভিভাবকত্বের হক পুরোপুরি আদায় করেন। পরিতাপের বিষয় যে, এত মহব্বতের সাথে তাঁকে লালন-পালন করা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য থেকে তিনি বঞ্চিতই থেকে গেলেন। একবার মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে লোকজন আবূ তালিবকে বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করে। তিনি একদল লোকের সাথে ভবিষ্যত নবী ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ (সা)-কেও সঙ্গে নিয়ে কাবাগৃহে গমন করেন এবং কাবাগৃহের দেয়ালের সাথে তাঁর পিঠ ঠেকিয়ে দেন। অতঃপর একান্ত অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেন, যেখানে মেঘের কোনই চিহ্ন ছিল না। তিনি ইঙ্গিত করামাত্র চারিদিক থেকে মেঘ ছুটে এল এবং এত বৃষ্টিপাত হলো যে, সমস্ত নালা-খালে পানি প্রবাহিত হলো। এ উপলক্ষে আবূ তালিব বলেন—

و ابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للار امل

"তাঁর চেহারা এতই উজ্জ্বল ও আলোকময় যে, ঐ চেহারার বরকতে আল্লাহর নিকট থেকে বৃষ্টি চাওয়া হয়। যিনি ইয়াতীমের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের অবলম্বন ও সহায়।"[১]

সিরিয়ায় প্রথম সফর এবং বাহীরা[২] দরবেশের কাহিনী

তাঁর বয়স বার বছরে পৌঁছেছিল। এ সময় আবূ তালিব কুরায়শ কাফেলার সাথে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেতে মনস্থ করলেন। সফরের বিপদাপদের কারণে তাঁকে সাথে নেয়ার ইচ্ছা আবূ তালিবের ছিল না। কিন্তু যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর চেহারায় দুঃখের ছায়া দেখতে পেয়ে অবশেষে তাঁকে সাথে নিলেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬১; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪১)। রওয়ানা হয়ে যখন কাফেলা বসরা শহরের নিকটে পৌঁছলো, সেখানে এক খ্রিস্টান দরবেশ বাস করতেন যার নাম ছিল জারজীস। কিন্তু তিনি বাহীরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শেষ নবীর আগমন সংক্রান্ত আসমানী কিতাবসমূহের বর্ণনা সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। কাজেই মক্কার এই কাফেলা যখন বাহীরা দরবেশের আস্তানার পাশে অবতরণ করলো, তখন তিনি রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখামাত্র তাঁকে চিনে ফেললেন যে, তিনিই সেই শেষ নবী, যাঁর সম্পর্কে পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহে বলা হয়েছে। তিনি এসে তাঁর হাত ধরলেন (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৪; জামে তিরমিযী, নবূওয়াত, ২খ. পৃ. ২০৪)। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার আবূ তালিব কুরায়শ নেতৃবৃন্দের

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯০।

২ বাহিরা ب অক্ষরে যবর, ح অক্ষরে ى সাকিন ر-এ যের; আর কারো কারো মতে মদ্দ সহ উচ্চারিত হয়। দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ৯৫ (ফায়েদা)। গবেষকগণের মতে বাহীরা একেশ্বরবাদী ছিলেন, তিনি মুশরিক এবং মূর্তিপূজক ছিলেন না। আর কারো কারো মতে তিনি যে লাত ও উযযার কসম দিয়েছিলেন, তা ছিল পরীক্ষামূলক।

সাথে সিরিয়ায় গেলেন। সিরিয়ায় যেখানে তিনি অবতরণ করলেন, সেখানে এক দরবেশ বাস করতেন। ঐ দরবেশের আস্তানার পাশ দিয়ে এর পূর্বেও তারা একাধিকবার গমন করেছিলেন, কিন্তু দরবেশ কখনো তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। কিন্তু এবারে যখন সেখানে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা অবতরণ করলো, দরবেশ নিয়ম-নীতিবহির্ভূতভাবে নিজের আস্তানা থেকে বের হলেন এবং কাফেলার ব্যক্তিবর্গের প্রতি এক এক করে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত হুযূর (সা)-এর হাত ধরলেন এবং বললেন :

هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين

"তিনিই বিশ্বনেতা, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল, যাঁকে আল্লাহ গোটা বিশ্বের জন্যে রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন।"

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দরবেশকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আপনি কিভাবে বুঝলেন ? তখন দরবেশ বললেন, যখন আপনারা নিজ অবস্থান থেকে বের হলেন, তখন পথিপার্শ্বের গাছপালা, তরুলতা ইত্যাদি নতশীরে তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। আর এসব বস্তু কেবল নবীদেরকেই এভাবে সম্মান জানায়। এছাড়া মোহরে নবূওয়াত দেখেও তাঁকে চেনা যায়, যা তাঁর দু'বাহুর মাঝখানে একটি আপেলের মত দৃশ্যমান। দরবেশ এটুকু বলেই প্রস্থান করলেন এবং কেবল তাঁরই সৌজন্যে সমগ্র কাফেলার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করলেন। খাবার গ্রহণের জন্য সবাই উপস্থিত হলে এতে তিনি (সা) ছিলেন না। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোথায় এবং জানতে পেলেন যে তিনি উট চরাতে গিয়েছেন। তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। চারণভূমি থেকে আসার সময় একটি মেঘখণ্ড তাঁকে ছায়া দিয়ে আসছিল। তিনি কাফেলার নিকট পৌঁছে দেখতে পেলেন, সেখানে তাঁর পৌঁছার আগেই বৃক্ষের ছায়ার সবটুকুর নিচে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। আর কোন জায়গা ছায়ার নিচে অবশিষ্ট নেই। হযরত (সা) একপাশে বসে পড়লেন। তিনি বসামাত্রই গাছের ছায়া তাঁর দিকে প্রসারিত হলো। দরবেশ সবাইকে বললেন, আপনারা বৃক্ষের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে ছায়াটি সম্প্রসারিত হলো। এরপর দরবেশ দাঁড়িয়ে কসম করে বললেন, আপনারা কখনই তাঁকে রোমের দিকে নিয়ে যাবেন না। রোমবাসীরা তাঁকে দেখলে, তাঁর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ দেখে তাঁকে চিনে ফেলবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। কথাবার্তা বলার ফাঁকেই দরবেশ হঠাৎ দেখলেন, একদিক থেকে সাতজন রোমবাসী কোনকিছুর সন্ধানে এদিকেই আসছে। দরবেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি উদ্দেশে বের হয়েছ? জবাবে তারা বললো, আমরা ঐ নবীর সন্ধানে বের হয়েছি, তাওরাত এবং ইনজিলে যাঁর আগমনের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং যিনি এ মাসেই এদিকে সফরে আসার কথা। এজন্যে চারদিকেই আমরা লোক প্রেরণ করেছি। দরবেশ বললেন, তা হলে তোমরা বল যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যা ইচ্ছা করেন তা কি কখনও কেউ রুখতে পারে ? রোমবাসী নাগরিকরা বলল, না। এরপর দরবেশের নিকট তারা ওয়াদা

করলো, আমরা আর ঐ নবীর সন্ধানে ইচ্ছুক নই। অতঃপর ঐ সাত ব্যক্তি বাহীরা দরবেশের নিকটই রয়ে গেল। কেননা তারা যে উদ্দেশে বের হয়েছিল, এখানেই সে উদ্দেশ বদলে গেল। এখান থেকে ফিরে গেলে তাদের উপর উল্টা ফল ফলতে পারে আশঙ্কায় তারা না যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নেয়। দরবেশ কুরাইশ কাফেলাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে এ বালকটির অভিভাবক কে? লোকেরা আবূ তালিবের দিকে ইঙ্গিত করলো। দরবেশ আবূ তালিবকে বললেন, আপনি তাঁকে শীঘ্রই ফেরত পাঠিয়ে দিন। আবূ তালিব তাঁকে আবূ বকর ও বিলালের সাথে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন। দরবেশ তাঁদের পথের খাবার হিসেবে রুটি ও যয়তুন তেল দিয়ে দিলেন। (ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। হাকিম বলেন, এ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ)।

বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে যে, বাহীরা উঠে গিয়ে তাঁর পিছনে তাকালেন এবং যে অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবূওয়াত দেখতে পেলেন। ইমাম বায়হাকী বলেন, মাগাযী লিখকদের কাছে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী বলেন, এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী অনেক, যা এর সত্যতা প্রমাণ করে। আর আমি শীঘ্রই এ প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ পেশ করছি।[১]

হাফিয আসকালানী তাঁর গ্রন্থ 'ইসাবায়' বলেন, এ রিওয়ায়াতের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য এবং সহীহ বুখারীর রাবী। বুখারীর রাবীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন গাযওয়ানও আছেন। হাদীসের হাফিয ও আলিমদের এক বিরাট জামায়াত আবদুর রহমানকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। হাফিজ সাখাবী বলেন, আমি কোথাও আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে সমালোচনা পাইনি।

এ বর্ণনায় কেবল আবূ বকর ও বিলালকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণের তথ্যটি ভুলক্রমে লিখিত হয়েছে। কাজেই এ কথা বলা যায় যে, কেবল আবূ বকর ও বিলালকে তাঁর সঙ্গে প্রেরণের বিষয়টিই বিতর্কিত। আর একটিমাত্র বাক্য বিতর্কিত থাকার দরুন পুরো হাদীসটি যঈফ হতে পারে না। কেননা এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।[২] আর হাদীসটি ইমাম বাযযারের মুসনাদেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে বিলালের নামটি উল্লেখ নেই, বরং বিলালের স্থলে 'রাজুলান' (জনৈক ব্যক্তি) উল্লেখ আছে।[৩] ইমাম জাযারী বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং এর সমস্ত রাবীই সহীহ বুখারীর রাবী। কেবল আবূ বকর ও বিলাল-এর বর্ণনা ছাড়া সমস্ত বর্ণনা একইরূপ।[৪] হাফিয আসকালানী স্বীয় 'ফাতহুল বারী' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন, তিরমিযীর হাদীসের সনদ শক্তিশালী। বর্ণনার ধারাবাহিকতায় এটি একটি ভিন্ন বর্ণনা বলে অনুভূত হয়।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮৪।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪৩।

৩. যাদুল মা'আদ, ১৭খ. পৃ. ৭১।

৪. মিরকাত, ৫খ. পৃ. ৪৭২।

তা হলো—হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুড়ি বছর বয়সে সিরিয়ার দিকে ভ্রমণ করেন। ঐ সফরে আবূ বকর (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। আবূ বকরের বয়স এ সময় ছিল আঠার বছর। এ সফরেও বাহীরা দরবেশের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল। হাদীসটি ইবন মানদা ইসবাহানী উল্লেখ করেছেন। এর সনদ যঈফ। হাফিজ আসকালানী তাঁর 'ইসাবা' গ্রন্থে বলেন, যদি এ বর্ণনা সহীহ হয়, তবে এটা ছিল তাঁর ভিন্ন একটি সিরিয়া সফর, পূর্ব বর্ণিত সফর নয়। বর্ণনাকারীর এ বর্ণনায় সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, দু'টি বর্ণনা নিকটতর হওয়ার দরুন ঘটনায় বিভ্রম ঘটেছে এবং এতে আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।[১]

আল্লামা শিবলী এ বর্ণনার সমালোচনা করে 'সীরাতুন নবী' (১খ. পৃ. ১৩১) গ্রন্থে লিখেন, এ বর্ণনা ধর্তব্য নয়। এর শেষোক্ত বর্ণনাকারী হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা); ঐ ঘটনার তিনি অংশীদার নন। বর্ণনার শেষ পর্যায়ে তিনি বলেন, জানা উচিত যে, কোন সাহাবী যদি এমন ঘটনা বর্ণনা করেন যাতে তিনি স্বয়ং সংশ্লিষ্ট নন, তা হলে ঐ হাদীসকে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে 'মুরসালে সাহাবা' বলা হয়, যা মুহাদ্দিসগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য। অন্যথায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এবং কনিষ্ঠ সাহাবাগণ, যাঁরা ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন না, তাঁদের সকল বর্ণনাকেই অগ্রহণযোগ্য ও বাতিল সাব্যস্ত করতে হয়। কোন হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তা সাহাবা পর্যন্ত পৌঁছতে যে ক'জন বর্ণনাকারী রয়েছেন, তাঁদের সবাই নির্ভরযোগ্য হবেন। সাহাবাগণ রাসূল (সা) থেকে যা কিছুই বর্ণনা করুন, তা প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ, রাসূলুল্লাহ (সা) থেকেই গৃহীত হবে। হাফিজ সুয়ূতী স্বীয় গ্রন্থ 'তাদরীবুর রাবী' (পৃ. ৭১)-তে লিখেছেন, সিহাহ গ্রন্থসমূহে এ ধরনের বর্ণনা অসংখ্য। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির বর্ণনায় তিনি নিজেই এ মূলনীতি গ্রহণ করেছেন। কাজেই আল্লামা স্বীয় 'সীরাতুন নবী' (১খ. পৃ. ১৪৮) গ্রন্থের টিকায় লিখেছেন, এ বর্ণনা হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত—যদিও তিনি ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেননি। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এ ধরনের বর্ণনাকে 'মুরসাল' বলে। আর সাহাবা কিরামের এ ধরনের বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কেননা এর ছেড়ে দেয়া বর্ণনাকারীও নিঃসন্দেহে সাহাবীই হবেন।

জানি না, এই আল্লামা এ মূলনীতি কেন পরিহার করলেন। এখানে এসে এই আল্লামা ক্রুশ পূজারীদের সমালোচনায় এতোটা প্রভাবিত হয়ে ছিলেন যে, অনুসন্ধানের জোশ আর সমালোচনার জযবায় হাফিজ ইবন হাজারকেও বর্ণনা পূজারী বলেছেন; অর্থাৎ আল্লাহ না করুন হাফিজ ইবন হাজারও ক্রুশ পূজারীর মত রাবী পূজারীর শিরকে জড়িত আছেন। যদিও তিনি কুফরের উপর কুফর ও জুলুমের উপর জুলুমের মত পোষণকারী কিন্তু শিরকের বিরোধী ছিলেন। কোন মুহাদ্দিসের উপর কোন

---

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ১৭৭।

মুহাদ্দিসকে প্রাধান্য দেয়া আলিমগণের নিকট জায়েয; কিন্তু কোন মুহাদ্দিসের শানে অবজ্ঞাকর উক্তি করা নাজায়েয। হকের আদব রক্ষা করা আল্লাহ্ পাকের একটি বিরাট নিয়ামত। হাফিজ ইরাকী তার 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে লিখেন :

وكان يدعى بالامين ورحل   مع عمه بالشام حتى اذ وصل

بصرى راى منه بحيرا الراهب   ما دل انه النبى العاقب

محمد نبى هذه الامة   فرده تخوفا من ثمه

من ان يرى بعض اليهود امره   وعمره اذ ذاك ثنتا عشره

"তাঁকে আমীন বলে অভিহিত করা হতো, যখন তিনি তাঁর চাচার সাথে সিরিয়া সফর করেন। তিনি যখন বসরায় উপনীত হন, তখন দরবেশ (বাহিরা) তাঁকে নিশানা দ্বারা শেষ নবী বলে চিনতে পারেন। বাহীরা ভীত হয়ে তাঁকে বাড়িতে ফেরত পাঠাতে বললেন, যাতে কতিপয় ইয়াহূদী তাঁকে চিনতে না পারে। এ সময় তাঁর বয়স ছিল বার বছর।"

হারবুল ফুজ্জার

আরবে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছিল। হস্তী বাহিনীর ঘটনার পর যে প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ঘটনা সামনে আসে, তা হারবুল ফুজ্জার নামে খ্যাত। এ যুদ্ধ কুরায়শ এবং বনী কায়স গোত্রের মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রথমদিকে বনী কায়স কুরায়শের উপর প্রাধান্য লাভ করে। পরে কুরায়শ বনী কায়সের উপর জয়লাভ করে। সব শেষে সন্ধি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। কোন কোন দিন কিশোর মুহাম্মদ (সা)-ও চাচাদের নির্দেশের কারণে অংশগ্রহণ করেন কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হননি। আল্লামা সুহায়লী বলেন :

وانما لم يقاتل رسول الله ﷺ مع اعمامه وكان ينبل عليهم وقد كان بلغ من القتال لانها كانت حرب الفجار وكانوا ايضا كلهم كفارا ولم ياذن الله لمؤمن ان يقاتل الا تكون كلمت الله هى العليا

"এ যুদ্ধে নবী করীম (সা) নিজ চাচাদের সঙ্গে শরীক হননি। অথচ এ সময় তিনি যুদ্ধে যাওয়ার বয়সে উপনীত হয়েছেন। তিনি নিজ পিতৃব্যদেরকে তীর উঠিয়ে দিতেন; তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন না। কেননা এ যুদ্ধ হারবুল ফুজ্জার অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্য মানুষদের যুদ্ধ ছিল। এটি এমন মাসে সংঘটিত হয়েছিল, যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল অপরাধ অন্যায়, এমনকি হারাম। এ যুদ্ধকে 'হারবুল ফুজ্জার' এজন্যে বলা হয়। এতে উভয়পক্ষই আল্লাহ্র অবাধ্য ছিল। অন্যথায় মুমিনদেরকে যুদ্ধ-জিহাদের অনুমতি তো শুধু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার এবং আল্লাহর কালেমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যেই দেয়া হয়েছিল।"[১]

---

১. রাওযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২০।

ইবন হিশাম বলেন, এ সময়ে হযরতের বয়স চৌদ্দ অথবা পনর বছর ছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এ সময়ে হযরতের বয়স ছিল বিশ বছর।

(সীরাতে ইবন হিশাম)

নবী করীম (সা)-এর হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ

যুদ্ধ-বিগ্রহ আরব ভূ-খণ্ডে দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছিল। কিন্তু তা কতদূর বরদাশ্‌ত করা যায়? ফুজ্জার যুদ্ধের পরে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তির অন্তরে এ ভাব জাগলো যে, পূর্ববর্তী জামানায় যুদ্ধ বিগ্রহ ও ধ্বংসলীলার অবসানকল্পে যেমনভাবে ফযল ইবন ফুযালা, ফযল ইবন উদায়া এবং ফুযায়ল ইবন হারিস একটি শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাদের নামানুসারে সেই শান্তিচুক্তি 'হিলফুল ফুযুল" নামে খ্যাত ছিল, শান্তির লক্ষ্যে অনুরূপভাবে দ্বিতীয়বার চুক্তিটি পুনরুজ্জীবিত করা প্রয়োজন। যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব তার কিছু কিছু কবিতায় এ চুক্তির উল্লেখ করেছিলেন। যেমন :

ان الفضول تحالفوا وتعاقدوا الا يقيم ببطن مكة ظالم

امر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم

"ফযল ইবন উদায়া, ফযল ইবন ফুযালা এবং ফুযায়ল ইবন হারিস সবার থেকে ঐ কাজের উপর শপথ নিয়েছিলেন যে, মক্কায় কোন অত্যাচারী থাকতে পারবে না। সবাই এর উপর দৃঢ় শপথ নিল। কাজেই মক্কার প্রতিবেশী এবং অভ্যাগতরা সবাই নিরাপদ হয়ে গেল।" (সীরাতে ইবন হিশাম; রাউযুল উনূফ, পৃ. ৯০)

শাওয়াল মাসে যখন হারবুল ফুজ্জারের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেল। অতঃপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস যিলহজ্জ শুরু হলো, তখন ঐ হিলফুল ফুযুলের নবায়ন শুরু হলো এবং সর্বপ্রথম যুবায়র ইবন আবদুল মুত্তালিব ঐ শপথ ও চুক্তির নবায়নের লক্ষ্যে বনী হাশিম ও বনী তায়মকে আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে সমবেত করলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদআন সবার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করালেন। ঐ সময় তারা নির্যাতিত মযলুমদের সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে অঙ্গিকারবদ্ধ হলেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, নিজ গোত্র, ভিন্ন গোত্র, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সাহায্য ও নিরাপত্তাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন।[১]

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : " সে সময় আমিও আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের গৃহে উপস্থিত ছিলাম। ঐ শপথের পরিবর্তে যদি আমাকে লালবর্ণের উটও দেয়া হতো, তাও আমি অপসন্দ করতাম। এখন ইসলামী যুগেও যদি অনুরূপ একটি শপথনামা (চুক্তি)-র জন্য আমাকে আহ্বান করা হয়, তা হলে আমি অবশ্যই তা কবূল করবো।"

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৮২।

এই আবদুল্লাহ ইবন জুদআন ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর চাচাত ভাই। একবার হযরত আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আবদুল্লাহ ইবন জুদআন অত্যন্ত মেহমানদারী করতেন। লোকজনকে খানা খাওয়াতেন। তার এ সৎকাজ কি কিয়ামতের দিন নিজের কোন উপকারে আসবে? তিনি জবাব দিলেন, না। কেননা সে এ কথা বলেনি যে, رب اغفرلی خطیئتی یوم الدین "হে প্রভু ! আমার গুনাহগুলোকে প্রতিদান দিবসে মাফ করে দিন" (মুসলিম)। অর্থাৎ সে কখনো আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে নিজের গুনাহসমূহ মাফের জন্য আবেদন করেনি। ইবন কুতায়বা তাঁর 'গারীবুল হাদীসে' উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "গরমকালে আমি কখনো চলতে চলতে আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের কবরের ছায়ায় দাঁড়াতাম।" (রাউযুল উনূফ, পৃ. ৯২)। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের কবর এত দীর্ঘ ছিল যে, তার ছায়ায় একজন লোক দাঁড়াতে পারতো। যেন তা وجفان كالجواب -এর[১] একটি উদাহরণ ছিল।

ব্যবসায় আত্মনিয়োগ এবং 'আমীন' উপাধি লাভ

দাউদ ইবন হাসীন[২] থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বলেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ শান-শওকতের সাথে যুবক অবস্থায় পৌঁছলেন যে, তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্বাপেক্ষা সচ্চরিত্র, সঙ্গী-সাথীদের সর্বাধিক খোঁজ-খবরকারী, সর্বাপেক্ষা সহনশীল, সর্বাধিক সত্যবাদী ও আমানতদার এবং ঝগড়া-বিবাদ, কটু কথা, অশ্লীলতা ও বাজে কথা থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। যদ্দরুন তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে 'আমীন' উপাধিতে ভূষিত করে (ইবন সা'দ ও ইবন আসাকির, খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯১)।

আবদুল্লাহ ইবন আবুল হামসা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে নবী করীম (সা)-এর সাথে কোন ব্যাপারে আমার কিছু দেনা ছিল। আমি তাঁকে বললাম, অপেক্ষা করুন, আমি এখনই আসছি। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঘরে এসে বিষয়টি আমি বেমালুম ভুলে যাই। তিনদিন পর হঠাৎ বিষয়টি আমার স্মরণ হলে আমি দ্রুত ঐ জায়গায় গিয়ে দেখতে পাই, তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। তিনি কেবল আমাকে এটুকু বললেন যে, তুমি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছ; তিনদিন যাবত আমি এখানেই অপেক্ষা করছি। (সুনানু আবূ দাউদ, ইদ্দাতু মিন কিতাবিল আদাব)।

---

১. যেমনভাবে জিন্নেরা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশে হাউয সদৃশ্য বড় বড় পেয়ালা বানাতো। সূরা সাবা-র বর্ণনা অনুসারে।

২ ইয়াহিয়া ইবন মুঈন ও ইমাম নাসাঈ দাউদ ইবন হাসীনকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, যিনি ১৩৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। বুখারী তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। (খুলাসা, ৮খ. পৃ. ১০৯)।

আবদুল্লাহ্ ইবন সায়িব[১] বলেন, জাহিলী যুগে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবসার অংশীদার ছিলাম। তিনি যখন মদীনা আগমন করলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ কি ? আমি আরয করলাম, কেন নয় ?

كنت شريكى فنعم الشريك لاتدارى ولاتمارى

"আপনি তো আমার ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন। কত উত্তম অংশীদার ! না কোন কটুভাষী ছিলেন, না কোন বিষয়ে ঝগড়া করেছেন।"

কায়স ইবন সায়িব মাখযূমী[২] বলেন, জাহিলী যুগে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এ ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলাম।

আর তিনি[৩] وكان خير شريك لايمارى ولايشارى "ছিলেন ব্যবসায়ের উত্তম অংশীদার। না তিনি ঝগড়া করেছেন আর না দর কষাকষি করেছেন।" (ইসাবা, কায়স ইবন সায়িব-এর জীবন চরিত)।

নবী (সা) কর্তৃক বকরি চরান

যেভাবে তিনি হযরত হালীমা সাদিয়ার গৃহে শৈশবকালে তাঁর দুধ ভ্রাতাদের সাথে বকরি চরাতেন, অনুরূপভাবে যুবা বয়সেও বকরি চড়িয়েছেন। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, যাহ্রান নামক স্থানে আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমি সেখানে পিলু ফল ছিঁড়ছিলাম। তিনি বললেন, কালো কালো দেখে ছেঁড়ো, এগুলো সুস্বাদু হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনি বকরি চড়াতেন (যে কারণে আপনি এটা জেনেছেন) ? তিনি বললেন "হ্যাঁ, এমন কোন নবী নেই যিনি ছাগল চড়াতেন না।"[৪]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "এমন কোন নবী নেই যিনি বকরি চড়াতেন না।" সাহাবাগণ আরয করলেন, আপনিও ? তিনি ইরশাদ করলেন : "হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাতের বিনিময়ে

---

১. আবদুল্লাহ ইবন সায়িব (রা) মক্কায় বাস করতেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে মক্কায়ই ইনতিকাল করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) তাঁর জানাযা পড়ান (ইসাবা)।

২. তিনি মুজাহিদের আযাদকৃত দাস ছিলেন। যখন কায়স ইবন সায়িবের বয়স ১২০ বছর হলো এবং তাঁর রোযা রাখার শক্তি থাকলো না, তখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ আয়াতটি নাযিল হয়। কাজেই যখন রমযান আসতো, তিনি বলতেন, আমার পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে এক সা' করে খাদ্য দান কর। আবূ হাতিম বলেন, আমার ধারণা মতে কায়স ইবন সায়িব আবদুল্লাহ ইবন সায়িবের ভ্রাতা ছিলেন। কায়স ইবন সায়িব বলেছেন, নবী করীম (সা) পূর্বাকাশ অন্ধকার থাকতে ফজর নামায এবং সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর জোহরের নামায পড়তেন (ইসাবা)।

৩. আল্লামা সুয়ূতীকৃত 'তালখীস'।

৪. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আতইমা।

মক্কাবাসীদের বকরি চরিয়েছি।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইজারা, ১খ. পৃ.৩০১)। হাফিয তুরবাশতী (র) 'শরহে মাসাবীহ' গ্রন্থে বলেন, কতিপয় মুতাকাল্লিমীন বকরি চড়ানোর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ নবীর শানের বিরোধী মনে করে এ মতামত দিয়েছেন যে, এ হাদীসে কীরাত অর্থ কয়েকটি মুদ্রা নয়, বরং কীরাত একটি স্থানের নাম, যেখানে তিনি বকরি চড়াতেন। মুতাকাল্লিমদের এ বক্তব্য সরাসরি বাস্তবতা বর্জিত ও সত্যের অপলাপ। কেননা দীনের তাবলীগ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াতের বিনিময় এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ নিঃসন্দেহে নবীর শানের বিরোধী, কিন্তু জীবিকা নির্বাহের জন্য পারিশ্রমিক ও বিনিময় গ্রহণ কোনক্রমেই নবীর শানের বিরোধী নয়, বরং নবী (আ) গণের সুন্নত ও কর্ম এবং তাওয়াক্কুল তাঁদের বাস্তবতা; বরং এ কর্ম নবূওয়াতের সাথে সংগতিশীল। অধিকন্তু, কীরাতকে স্থানের নাম হিসেবে বর্ণনা অনির্ভরযোগ্য ও অসত্য বর্ণনা। এ বর্ণনাকারীর পূর্বে কোন বর্ণনাকারীই এমন পাওয়া যায়নি যিনি কীরাতকে স্থানের নাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

হাফিজ আসকালানী বলেন, প্রসিদ্ধ বর্ণনা এটাই যে, কারারীত কীরাত শব্দের বহুবচন, এটা কোন স্থানের নাম নয়। মক্কাবাসী কারারীত নামক স্থানের ব্যাপারে অবগত নন। ইমাম নাসাঈ নাসর ইবন খাযন থেকে বর্ণনা করেন, একবার উটের মালিকগণ বকরির মালিকদের উপর গর্ব করতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মূসা (আ)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি বকরি চরাতেন; দাঊদ (আ)-কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনিও বকরি চড়াতেন। আর আমাকেও নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে, আমিও 'আজইয়াদ' নামক স্থানে আমার গৃহবাসীদের বকরি চরিয়েছি।[১]

সার কথা হলো, নবী (আ)গণের বকরি চড়ানো নিজ উম্মতের দেখাশোনা করার পূর্বাভাস ও ভূমিকা ছিল। উট এবং গরু চড়ানো এতটা কঠিন নয় যেমনটা বকরি চড়ানো কঠিন। বকরি কখনো এক চারণভূমিতে যায়, কখনো আরেক চারণভূমিতে। এ মুহূর্তে যদি এ প্রান্তে থাকে, তবে পর মুহূর্তে দ্বিতীয় প্রান্তে দৌড়াতে দেখা যায়। দলের কিছু বকরি যদি এদিকে দৌড়ায়, তো কিছু ওদিকে দৌড়ায়। রাখালকে চারদিকেই দৃষ্টি রাখতে হয় যে, কোন নেকড়ে কিংবা শার্দুল তো শিকারের ধান্দা করছে না, রাখাল চাইবে সব বকরি একত্রে থাকুক। এবং এমনটি না হয় যে, একটি বকরি দলছুট হয়ে যাক আর নেকড়ে তাকে ধরে নিয়ে যাক। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাখাল এ চিন্তায় ওগুলোর পিছনে হয়রান পেরেশান হয়ে থাকে। নবী (আ)গণের অবস্থা নিজ উম্মতদের সাথে এমনটিই হয়ে থাকে। তাদের কল্যাণ ও সাফল্যের চিন্তায় তাঁরা দিনরাত পেরেশান থাকতেন। উম্মতের একাকীত্ব তো নেকড়ে ও বকরিব মত তাদেরও এদিক সেদিক তাড়িত করে। আর নবী (আ)গণ বুদ্ধিমত্তা ও দ্রুততার সাথে তাদেরকে সতর্কতার সঙ্গে নিজের দিকে আহ্বান করেন। উম্মতের এ ধরনের

১. ফাতহুল বারী, ৪খ. পৃ. ৪৬৪।

কাজের দরুন নবী (আ)গণের কষ্ট ও আঘাত লাগে, এর উপর তাঁরা ধৈর্য ধারণ ও সহ্য করেন। অধিকন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁরা কোন সময়েই তাবলীগ ও তা'লীম থেকে বিতৃষ্ণ হন না কিংবা দমে যান না। যেমনভাবে বকরির পাল নেকড়ে এবং হিংস্র পশুর হামলা থেকে উদাসীন থাকে, তেমনিভাবে উম্মতও নাফস ও শয়তানের আকস্মিক হামলায় উদাসীন হয়ে থাকে। আর নবী (আ)গণ সবসময় এদিকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখেন যেন আকস্মিকভাবে নাফস ও শয়তান তাকে পথচ্যুত করতে সক্ষম না হয়। উম্মতের কল্যাণ ও উম্মতের জন্য নবী (আ)গণ যেমন সার্বক্ষণিক চিন্তাযুক্ত থাকেন, উম্মত তার দশভাগের একভাগ চিন্তাও করে না। উম্মতের তো নিজের ধ্বংস ও বরবাদীর খেয়ালই থাকে না। অথচ নবী (আ)গণ এ চিন্তায় থাকেন সদা সন্ত্রস্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"সম্ভবত ওরা ঈমান আনে না বলে আপনি মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বেন।" (সূরা শু'আরা : ৩)

ইরশাদ হয়েছে : اَلنَّبِىُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنفُسِهِمْ

"নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজ সত্তা থেকেও ঘনিষ্টতর।" (সূরাআহযাব : ৬)

আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে : وهو اب لهم অর্থাৎ নবীগণ তাদের রূহানী পিতা হয়ে থাকেন।

হে আল্লাহ্ ! আপনি আপনার অসংখ্য রহমত, অগণিত বরকত সাধারণভাবে সকল নবী (আ)গণের উপর এবং বিশেষভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বর্ষণ করুন, যাঁর পবিত্র বাণী আমাদের মত নির্বোধ বান্দাদেরকে আপনার সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে। আমীন, ইয়া রাব্বুল আলামীন।

সিরিয়ায় দ্বিতীয় সফর এবং নাস্তুরা দরবেশের সাথে সাক্ষাত

হযরত খাদীজা (রা) আরবের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ধনী মহিলা ছিলেন। তাঁর উচ্চ বংশ মর্যাদা এবং নম্রতা ও পবিত্রতার জন্য জাহিলী এবং ইসলামী উভয় যুগের জনগণই তাঁকে 'তাহিরা' নামে সম্বোধন করতো। কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা রওয়ানা হলে খাদীজাও তাদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাণিজ্যে শরীক থাকতেন। এক খাদীজার পণ্য সামগ্রী সমগ্র কাফেলার পণ্য সম্ভারের সমান হতো। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছরে উপনীত হলো তখন ঘরে ঘরে তাঁর দায়িত্ববোধ ও আমানতদারীব সুনাম পৌঁছে গেল। এমনকি মক্কায় এমন কোন লোক ছিল না, যে তাঁকে 'আমীন' নামে সম্বোধন করতো না, খাদীজা তখন প্রস্তাব পাঠালেন যে, তিনি যদি তাঁর পণ্যসামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গমন করেন, তবে অন্যদের মতই তাঁকে পারিশ্রমিক ও

সম্মানী দেয়া হবে। তিনি স্বীয় পিতৃব্য আবূ তালিবের আর্থিক সংকটের প্রেক্ষিতে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং হযরত খাদীজার দাস 'মায়সারা'র সাথে সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। বসরা পৌঁছে তিনি একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে উপবেশন করেন। সেখানে 'নাস্তুরা' নামে এক দরবেশ বাস করতেন। দরবেশ তাঁকে দেখে কাছে এলেন এবং বললেন, ঈসা ইবন মরিয়ম[1] (আ)-এর পর আপনি ছাড়া আর কোন নবীই এখানে অবতরণ করেন নি। এরপর মায়সারাকে বললেন, তাঁর দু' চোখে ঐ রক্তিম আভা দেখতে পাচ্ছি। মায়সারা বলল, এ রক্তিম আভা তাঁর চোখ থেকে কখনো পৃথক হয় না। দরবেশ বললেন : هو هو وهو نبى وهو اخر الانبياء "তিনিই তিনি, ইনিই নবী, ইনিই শেষ নবী।"

এর পর বেচাকেনা শুরু হলে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হলো এবং তাঁকে বললো, আপনি লাত-উযযার কসম করে বলুন। নবী (সা) বললেন, আমি কখনো লাত-উযযার কসম খাইনি। আর ঘটনাক্রমে আমার সামনে লাত-উযযার প্রসঙ্গ এসে গেলে আমি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতাম অথবা কৌশলে পাশ কাটিয়ে সেখান থেকে চলে যেতাম। এ কথা শুনে লোকটি বলল, নিঃসন্দেহে এ তো আপনারই কথা অর্থাৎ সত্যবাদীর সত্য কথা। এরপর ঐ ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম, তিনিই ঐ ব্যক্তি, যাঁর শান ও গুণের বিষয় আমাদের আলিমগণ আপন ধর্মীয় গ্রন্থে লিখিত পেয়েছেন।

মায়সারার বর্ণনা হলো, যখন দুপুর হয় এবং প্রচণ্ড গরম পড়ে, তখন আমি দু'জন ফেরেশতাকে দেখতাম তারা তাঁর মাথার উপর ছায়া বিস্তার করে রাখতেন। তিনি যখন সিরিয়া থেকে রওয়ানা দেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহর আর দু'জন ফেরেশতা তাঁর উপর ছায়া দিচ্ছিলেন। হযরত খাদীজাও স্বীয় বালাখানা থেকে তাঁর এ মর্যাদা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি আশপাশের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে এ দৃশ্য দেখালেন। সকল স্ত্রীলোকই এতে আশ্চর্য হয়ে যায়। এরপর মায়সারা[2] এ সফরের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করলো এবং বাণিজ্য লব্ধ সমস্ত সম্পদ খাদীজার নিকট সোপর্দ করলো। নবী (সা)-এর বরকতে এবারে খাদীজার বাণিজ্যে এত অধিক মুনাফা অর্জিত হয় যে,

---

১. ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় 'ঈসার পরে' শব্দটি নেই। এ বর্ণনাটি যারকানী উদ্ধৃত করেছেন। এ বাক্যের অর্থ এই, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত মসীহ্ (আ)-এর পর তাঁর পূর্বে এ বৃক্ষের নিচে আর কেউ অবতরণ করেননি। আল্লামা সুহায়লী 'রাউযুল উনুফ' গ্রন্থে এ অর্থই করেছেন। আর দ্বিতীয় অর্থ, যা ইমাম ইবন জুমা'আ বলেছেন, তা এই যে, সম্ভবত হযরত মসীহ্ (আ)-এর পরে এ বৃক্ষের নিচে কোন নবী কিংবা সাধারণ কোন ব্যক্তিই অবতরণ করেননি। তিনি ছাড়া কেউ সেখানে অবতরণ না করাও একটি ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য বৈকি, যা কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৮ দ্র.।

২ প্রসিদ্ধ আছে যে, মায়সারা মহানবী (সা)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে। হাফিজ আসকালানী 'ইসাবা' গ্রন্থে বলেন, কোন সহীহ বর্ণনা দ্বারাই মায়সারার সাহাবী হওয়া প্রমাণ হয়নি। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৮)।

ইতোপূর্বে কোনবারেই এ পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয় নি। হযরত খাদীজা তাঁকে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে দিয়ে দেন।[১]

এ ঘটনার বর্ণনা কেবল ওয়াকিদীই নন, বরং মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ইবনুস সাকানও একই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ওয়াকিদী জমহূর আলিমগণের নিকট যঈফ, আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক তাবিঈ এবং জমহূর আলিমগণের নিকট গ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমদ বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের হাদীস আমার নিকট হাসান। আর ওয়াকিদী যদিও মুহাদ্দিসগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য, তবুও হাদীসের কোন কিতাবই ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে খালি নেই। হাফিয ইবন তাইমিয়া 'আস-সারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে (পৃ. ৯৬) বলেন, ওয়াকিদী যদিও দুর্বল, তবুও তাঁর মাগাযী বা যুদ্ধ সংক্রান্ত বর্ণনা সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবন হাম্বল প্রমুখ তাঁর কিতাবসমূহের উপর নির্ভর করেন। মোট কথা, উদ্দেশ্য এটাই যে, এ রিওয়ায়াত মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ওয়াকিদী উভয় থেকেই বর্ণিত এবং মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনা মুহাদ্দিসগণের নিকট উল্লেখযোগ্য ও 'হাসান' রিওয়ায়াতের মর্যাদার নিচে নয়। আর ওয়াকিদীর বর্ণনা যদিও 'যঈফ' কিন্তু 'হাসান' হাদীসের জন্য নিঃসন্দেহে সমার্থক ও সাক্ষী হতে পারে।

মায়সারার কিসসার সত্যতা যাচাই ও পর্যবেক্ষণ এবং সীরাতের তিন ইমামের বর্ণনা ও এর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত

মায়সারার ঘটনা যেহেতু মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও ওয়াকিদী উভয় থেকেই বর্ণিত হাদীসের যাচাই বাছাইতে যাদের সম্পর্কে আলিমগণের আলোচনা-সমালোচনা দীর্ঘ; এ জন্যে তিনজন সীরাত বিশেষজ্ঞের কিছু বর্ণনা ও অবস্থা আমরা পাঠকদের জন্য উপহার স্বরূপ উপস্থাপন করতে চাচ্ছি। যাঁরা মাগাযী লেখকদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ : ১. মুহাম্মদ ইবন উকবা, ২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ৩. ওয়াকিদী—যাতে এ সীরাত বিশেষজ্ঞদের রিওয়ায়াত সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানা যায়।

১. মূসা ইবন উকবা মূসা ইবন উকবা মদীনার অধিবাসী। তিনি হযরত জুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর আযাদকৃত দাস এবং তাবিঈ, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী নির্ভরযোগ্য রাবী। কেউই তাঁকে অগ্রহণযোগ্য বলেননি। ইমাম মালিক, সুফিয়ান ইবন উয়ায়না এবং আবদুল্লাহ ইবন মুবারক তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ১৪১ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। ছয়জন সিহাহ্ লিখকের প্রত্যেকেই তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিক মূসা ইবন উকবার মাগাযী প্রসঙ্গে বলতেন যে, এটা নির্ভরযোগ্য মাগাযী গ্রন্থ। কিন্তু মূসা ইবন উকবার মাগাযী গ্রন্থের

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৮৩; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯১; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৪৯।

কোন কপি বিদ্যমান নেই। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে তাঁর কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

২. মুহাম্মদ ইবন ইসহাক মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইয়াসার মাতলিবী মদীনাবাসী তাবিঈ। তিনি সীরাত ও মাগাযীর ইমাম। জমহূর আলিমগণ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম মালিক (র) তাঁর সমালোচনা করেছেন। হাফিয যাহবী 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ও গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর হাদীস সহীহ স্তর থেকে নিম্নোনের। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) তাঁর হাদীসকে হাসান পর্যায়ের বলেছেন। আলী ইবন মাদিনী বলতেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের হাদীস আমার নিকট সহীহ। ইমাম নাসাঈ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সনদ শক্তিশালী। দারু কুতনী বলেন, তাঁর রিওয়ায়াত প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মালিক তাঁকে দাজ্জাল বলেছেন। অর্থাৎ দাজ্জাল সম্প্রদায়ভুক্ত হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। ইমাম বুখারী সহীহ বুখারীতে তাঁর থেকে সরাসরি কোন রিওয়ায়াত গ্রহণ করেননি। অবশ্য তা'লিক সূত্রে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। সুনান বিশেষজ্ঞগণ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন আর ইমাম মুসলিম অপরের মাধ্যমে তাঁর রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৫১ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। ইবন ইসহাক রচিত মাগাযী গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। অবশ্য সীরাতে ইবন হিশামের যে সংস্করণ বর্তমানে বিদ্যমান, তা প্রকৃতপক্ষে সীরাতে ইবন ইসহাকেরই সংস্করণ, যা তিনি নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক সম্পর্কে দু'টি সমালোচনা করা হয়। একটি হলো তিনি রিওয়ায়াতে তাদলীস করতেন। দ্বিতীয়ত তিনি খায়বর ইত্যাদি প্রসঙ্গে বর্ণিত ঘটনাগুলো খায়বরের ইয়াহূদী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় কারণটির সমালোচনা আবশ্যিক নয়। অন্যান্য প্রমাণের পর অতিরিক্ত নির্ভরযোগ্যতার জন্য ইয়াহূদীর বর্ণনা দ্বারা ঘটনার সত্যায়ন করা তেমন সমালোচনাযোগ্য নয়। তবে শুধু কোনো ইয়াহূদীর উপর নির্ভর করা এবং তাদের বর্ণনা দ্বারাই শরীয়তের বিধান প্রমাণ করা বৈধ নয়। কিন্তু দুনিয়ার কোন মুসলমান এমন বক্তব্যের প্রবক্তা নয় এবং এটা প্রমাণিতও নয় যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক খায়বরের ইয়াহূদীদের থেকে নাফি' এবং যুহরীর মত বর্ণনা করেছেন তেমনি তিনি কাসিম ও আতার মত খায়বরের ইয়াহূদীদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন বলেও কোনো প্রমাণ নেই। কোন সাধারণ মুসলমানও কাফির থেকে রিওয়ায়াত করতে বা তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারে না। যারা এরূপ মনে করে তারা ভুল করে।

বাকী রইল 'তাদলীস'-এর ব্যাপারটি। খোদ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, عـن عـن তথা অমুক থেকে তমুক থেকে বর্ণিত 'তাদলীস'কৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বর্ণনাকারী ও শ্রোতার প্রত্যক্ষ শ্রবণ প্রমাণিত হয়।

৩. ওয়াকিদী : আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবন উমর ওয়াকিদ আল ওয়াকিদী ছিলেন মদীনার অধিবাসী। তিনি সীরাত ও মাগাযীর ইমাম ও প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। ইমাম মালিক, সুফিয়ান সাওরী, মুয়াম্মার ইবন রাশীদ এবং ইবন আবূ যি'ব-এর ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যেমনটি তারীখে ইবন খাল্লিকান (১খ. পৃ. ৬৪০) এবং তার শিষ্য রাশীদ মুহাম্মদ ইবন সা'দ তাবাকাত প্রণেতা সুফিয়ান ইবন উয়ায়নার শিষ্যভুক্ত ছিলেন (পূ. গ্র. পৃ. ৬৪২)। ওয়াকিদী ১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৭ হিজরীতে ইনতিকাল করেন (মিযানুল ই'তিদাল, ৩খ. পৃ. ১১১)।

ওয়াকিদীর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য বিভিন্ন। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মুহাম্মদ ওয়াকিদীকে অসত্যভাষী এবং তার কিতাবকে অসত্য, অনির্ভরযোগ্য বলেছেন। ইমাম বুখারী ও আবূ হাতিম তার হাদীসকে 'পরিত্যজ্য' বলেছেন। আলী ইবন মাদিনী ও নাসাঈ তাকে 'ওয়াজিউল হাদীস' বা হাদীস জালকারী বলে মন্তব্য করেছেন। আর হাদীস বিশেষজ্ঞদের একটি দল তাকে 'যঈফ' বলেছেন। অর্থাৎ ওয়াকিদী দুর্বল বর্ণনাকারী, মিথ্যাবাদী নন। ইয়াহিয়া ইবন মুঈন বলেন, ওয়াকিদী নির্ভরযোগ্য নন। দারু কুতনী বলেন, তিনি যঈফ রাবী। আলিমদের একটি ক্ষুদ্র দল ওয়াকিদীকে নির্ভরযোগ্য ও তার বর্ণনাকে সহীহ্ বলেছেন। ইয়াযিদ ইবন হারুন বলেন, ওয়াকিদী নির্ভরযোগ্য। আবূ উবায়দ ও ইবরাহীম হুযালীও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দারাওয়ার্দী বলেন, ওয়াকিদী হাদীসের আমীরুল মু'মিনীন। হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার'-এর ভূমিকায় বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করার পর ওয়াকিদীর নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিষয়টি প্রাধান্য দেন। হাফিয ইবন হাজার 'ফাতহুল বারী'তে বলেন :

وقد تعصب مغلطائ للواقدی فنقل کلام من قواه ووثقه وسکت عن ذکر من وهاه واتهمه وهم اکثر عددا واشد اتقانا واقوی مرفة به من الاولین ومن جملة ماقواه به ان الشافعی روی عنه وقد اسند البیهقی عن الشافعی انه کذبه کذا فی انهاء السکن مقدمة

"হাফিয মুগালতাঈ ওয়াকিদীর সমর্থনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন যে, যারা ওয়াকিদীকে গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী বলেছেন, তাদের বক্তব্য তো উদ্ধৃত করেছেন, আর যারা তাকে দুর্বল ও অপবাদযোগ্যরূপে চিহ্নিত করেছেন, তাদের ব্যাপারে মুগালতাঈ নিশ্চুপ থেকেছেন। অথচ ওয়াকিদীর সমালোচনাকারীর সংখ্যা তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার বর্ণনাকারীর সংখ্যার চেয়ে বেশি। উপরন্তু, তারা স্মরণশক্তি আল্লাহভীতি ও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় ছিলেন বড়। তারা ওয়াকিদীর বর্ণনা শক্তিশালী হওয়ার স্বপক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ তার থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। অথচ বায়হাকী নিজ সনদের সাথে ইমাম শাফিঈ থেকে এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ইমাম শাফিঈ ওয়াকিদীকে অসত্যবাদী বলতেন।" (ইলাউস সুনানের ভূমিকা, ইনহাউস সাকান, পৃ. ৭৫)।

হাফিয ইবন হাজার-এর সিদ্ধান্ত এই যে, কোন রাবীর ব্যাপারে যখন আলোচনা-সমালোচনা, নির্ভরযোগ্যতা ও দুর্বলতা একত্রিত হয়, তখন অধিকাংশের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। কাজেই ওয়াকিদীর সমালোচনাকে তার গ্রহণযোগ্যতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্যে যে, তাঁর সমালোচনাকারীর সংখ্যা তাঁর বর্ণনা গ্রহণকারীর সংখ্যার চেয়ে বেশি। হাফিয মুগালতাঈর রায় এটাই যে, মতভেদেও ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা ও ইনসাফকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত, যদিও এ মতের সপক্ষের ব্যক্তিদের সংখ্যা কম হয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে আলিমদের মধ্যে, বিশেষত সোনালী যুগের কোন বর্ণনাকারী ফাসিক প্রমাণিত না হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা গ্রহণযোগ্য। ঐ পর্যায়ে তাদের রিওয়ায়াত রদ করা যায় না। সন্দেহের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে :

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসে, তবে সে বিষয়ে তোমরা যাচাই বাছাই কর।" (সূরা হুজুরাত : ৬)

অপর এক কিরআতে فَتَبَيَّنُوا স্থলে فَتَثَبَّتُوا এসেছে। অর্থাৎ ফাসিক কোন খবর নিয়ে এলে তা প্রমাণিত করো এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করো, সাবধানতার সাথে কাজ করো; প্রত্যাখ্যান কিংবা গ্রহণে দ্রুততার সাথে কাজ করো না। আর تَبَيَّنُوا এবং تَثَبَّتُوا -এর হুকুম হচ্ছে ঐ বর্ণনাকারীর সংবাদের ব্যাপারে, যার ফাসিকী প্রমাণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন : ان جاءكم فاسق "যদি কোনো ফাসিক সংবাদ নিয়ে আসে" কাজেই যার ফাসিকীই প্রমাণিত হয়নি, তার ব্যাপারে মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত নিতে তো আরো কঠোর সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে। এরই ভিত্তিতে হাফিয মুগালতাঈ ওয়াকিদীর ব্যাপারে কঠোরতার সাথে নয়, বরং ইনসাফের সাথে কাজ করেছেন যে, তার গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরতার বিষয়টি অনুসরণ করেছেন। তিনি সমালোচনাকারী ও বিরোধিতাকারীদের প্রতি গুরুত্ব দেন নি; বরং ফকীহদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ কোন রাবীর ব্যাপারে যদি গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়, তবে মুহাদ্দিসগণের নিকট অধিকাংশের মতকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর ফকীহদের মতে গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে মত প্রদান করতে হবে। যদিও অগ্রহণযোগ্য মত প্রদানকারীর সংখ্যা গ্রহণযোগ্য মত প্রদানকারী অপেক্ষা অধিক হয়। আর গ্রহণেই সতর্কতার দাবি পূরণ হয়, তা বাতিল করে দেয়া বিবেচনাবিরুদ্ধ। হাফিয বদরুদ্দীন আইনী শরহে বুখারী ও শরহে হিদায়ায় এবং ইবন হুমামের শরহে হিদায়ায় এটাই গৃহীত হয়েছে যে, নির্ভরযোগ্যতাকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্যতার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলেরও[১] এটাই সিদ্ধান্ত যে, যখন পর্যন্ত কোন রাবীকে বর্জনের ব্যাপারে সমস্ত আলিম একমত না হন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বর্জন করতেন না। তিনি স্বীয় মুসনাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

১. আত-তাহযীব, ৫খ. পৃ, ৩৭৭।

এ নীতিই অনুসরণ করেছেন। আবূ দাঊদ এবং নাসাঈও একই নীতি অনুসরণ করেছেন। এতে জানা গেল যে, হাফিয মুগালতাঈ-এর অনির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভরযোগ্যতাকে প্রাধান্য দান এই মূলনীতির উপর নির্ভরশীল, স্থগিতের উপর নির্ভরশীল নয়। ওয়াকিদীর ব্যাপারে যে বিভিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো, এ সবই হাফিয যাহবীর মিযানুল ই'তিদাল (২খ. পৃ. ১১০) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ওয়াকিদীর ব্যাপারে হাদীসবিদদের এ সমস্ত মতপার্থক্য হাফিয যাহবীর সামনে। আর সব শেষে হাফিয যাহবী বলেন : واستقر الاجماع على وهن الواقدى "ওয়াকিদীর ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে।" অথচ এ ধরনের মতপার্থক্যের বিষয়ে ইজমার দাবি সঠিক নয়।

হাফিয ইবন তাইমিয়া 'আস-সারিমুল মাসলূল' গ্রন্থে বলেন :

مع مافى الواقدى من ضعف لا يختلف اثنان ان الواقدى اعلم الناس بتفاصيل امور المغازى واخبر باحوالها وقد كان الشافعى واحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه

"ওয়াকিদী যঈফ, তবে পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই এ ব্যাপারে মতপার্থক্য করেন না যে, ওয়াকিদী সর্বাধিক মাগাযী অভিজ্ঞ এবং মাগাযীর অবস্থা ও বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কিত তার অবগতি সর্বাধিক। ইমাম শাফিঈ, আহমদ এবং অপরাপর আলিমগণ তার কিতাবসমূহ থেকে উপকৃত হতেন।"

আর দুনিয়ার সীরাত, মাগাযী ও 'রিজাল শাস্ত্রে'র কোন কিতাব এমন নেই যা ওয়াকিদীর বর্ণনা থেকে মুক্ত। ফাতহুল বারী, যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব ওয়াকিদীর রিওয়ায়াত দ্বারা ভরপুর। আর আল্লামা শিবলী স্বয়ং ওয়াকিদীর পুস্তকাবলী থেকে উপকৃত এবং সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সীরাতুন নবীর বিভিন্ন অধ্যায়ে তাবাকাতে ইবন সাদ-এর ঐ সব রিওয়ায়াত গ্রহণ করা হয়েছে, যার প্রথম বর্ণনাকারীই ওয়াকিদী। আল্লামা শিবলী তাবাকাত গ্রন্থের খণ্ড এবং পৃষ্ঠা সংখ্যার উদ্ধৃতিও দিয়েছেন। কিন্তু ঐ অধ্যায়সমূহে তিনি এটা বলেন নি যে, এ বর্ণনার প্রথম রাবীই ওয়াকিদী, যাকে তিনি কাহিনীকার ও অনুল্লেখযোগ্য মনে করেন। আর কোন কোন স্থানে অনুল্লেখযোগ্য শব্দ দ্বারা তাকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু যখন তিনি ঐ প্রসিদ্ধ কাহিনীকারের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন, তখন তার নাম উল্লেখ করেননি। অবশ্য ঐ প্রসিদ্ধ কাহিনীকারের সুবোধ শিষ্য অর্থাৎ ইবন সা'দ-এর নামে রিওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন, যিনি সেই গল্পকারেরই শিষ্য !

ওয়াকিদীর বর্ণনায় সীরাতুন-নবী (সা)

এক্ষণে ওয়াকিদীর বর্ণনার কিছু নমুনা পাঠকদের জন্য হাদিয়া স্বরূপ উপস্থাপন করছি, যা আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন নবী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

১. কুসাই মৃত্যুকালে পবিত্র কা'বাগৃহের রক্ষণাবেক্ষণের উত্তরাধিকার স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুদ্দারকে হস্তান্তর করেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৪১; সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৫৪)। আল্লামা শিবলী এ ঘটনা তাবাকাতে ইবন সা'দ থেকে উদ্ধৃত করেছেন– যা শুধু ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত।

২. মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ্ উট, কিছু বকরী এবং একজন দাসী রেখে যান, যার নাম উম্মে আয়মান (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ৬২; সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৫৮)। এ ঘটনাও তাবাকাতে শুধু ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত; ওয়াকিদীর পরে সনদে আর কারো উল্লেখ নেই।

৩. ইবন সা'দ তাবাকাতে (১খ. পৃ. ৭১) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী। কেননা আমি কুরায়শ বংশীয় এবং আমার ভাষা বনী সা'দ-এর ভাষা।" (সীরাতুন-নবী, ১খ. পৃ. ১৬২)। এরও বর্ণনাকারী মুহাম্মদ উমর ওয়াকিদী।

৪. হিলফুল ফুজুলের ঘটনা সীরাতুন-নবী (১খ. পৃ. ১৭০)-তে তাবাকাতে ইবন সা'দ (১খ. পৃ. ৮২) থেকে বর্ণিত। এ ঘটনাও তাবাকাতে ওয়াকিদী থেকে উদ্ধৃত।

৫. আল্লামা শিবলী সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ৪৪০)-তে খায়বরের যুদ্ধ প্রসঙ্গে লিখেন—রাসূলুল্লাহ (সা) সাধারণ ঘোষণা দেন যে, لا يخرجن معنا الا راغب فى الجهاد "আমাদের সাথে তারাই আসবে, যারা জিহাদে অনুপ্রাণিত" (ইবন সা'দ)। এ বর্ণনাও তিনি ইবন সা'দ-এর উদ্ধৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন, যা ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত।

সার কথা

সার কথা এটাই যে, নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ ও সত্যের নিকটতর বর্ণনা হলো, ওয়াকিদী যঈফ, ধোঁকাবাজ ও গল্প রচনাকারী নন। ওয়াকিদীর বর্ণনার হুকুম এটাই, যা একজন যঈফ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ যখন পর্যন্ত কোন সহীহ হাদীস ঐ যঈফ বর্ণনার বিপরীতে না পাওয়া যাবে, তখন পর্যন্ত ঐ হাদীসের হুকুম পরিত্যাগ করা যাবে না। বিশেষত ঐ যঈফ হাদীস যদি বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যঈফ হাদীস আমার কাছে ব্যক্তি-বিশেষের মতামত থেকে অধিক প্রিয়। ইমাম আবূ হানীফার যখন কোন মাসয়ালায় কোন সহীহ হাদীস হস্তগত না হতো, তখন কিয়াসের বিপরীতে তিনি যঈফ হাদীসকে অগ্রাধিকার দিতেন। যঈফ হাদীসের অর্থ তা অধর্তব্য নয়, বরং এর অর্থ এই যে যঈফকে যঈফের মর্যাদায় রাখতে হবে। আর যখন যঈফ এবং সহীহ-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন সহীহকে অগ্রাধিকার দাও। আর যখন কোন হাদীস সহীহ পাওয়া না যাবে, তখন যঈফ হাদীসকে নিজের রায় থেকে অগ্রাধিকার দাও। এ জন্যে যে, রায় প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল ও কমজোর। আর হাদীসে নববী (সা) প্রকৃতিগতভাবে যঈফ নয়, বরং বর্ণনার ধারা ও সনদেব মূল্যায়নে

যঈফ–যা পদ্ধতিগত, মূল সত্তাগত নয়। আর রায়-এর মূল সত্তাই দুর্বল। এজন্যে যঈফ হাদীসকে রায়-এর উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং যঈফ হাদীস গ্রহণের শর্তাবলী উসূলে হাদীসের কিতাবাদিতে বর্ণিত আছে, সেখানে দেখে নিন। এই স্থানে এটাই আমার মত যা আমার নিকট প্রতিভাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এবং তাঁর ইলম পরিপূর্ণ ও শিরোধার্য।

হাফিয ইরাকী 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে বলেন :

ثم مضى للشام مع ميسرة　　　فى متجر والمال من خديجة

من قبل تزويج بها فبلغا　　　بصرى فباع وتقاضى ما بغى

وقد راى ميسرة المجائبا　　　منه وما خص به مواهبا

وحدث السيدة الجليلة　　　خديجة الكبرى فاحصت قبله

ورغبت فخطبت محمدا　　　فيالها من خطبة ما اسعدا

وكان اذ زوجها ابن الخمس　　　من بعد عشرين بغير لبس

ফায়েদা-১. এ বর্ণনা দ্বারা এটা জানা যায় যে, কারো কারো জন্য স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীতে ফিরিশতা দেখা সম্ভব। যেমনটি উপরোক্ত ঘটনায় মায়সারা ফিরিশতার ছায়া দেখেছেন।[১] আর হযরত মরিয়ম (আ) কর্তৃক জিবরাঈল (আ) ও অন্যান্য ফিরিশতাকে দেখার বর্ণনা কুরআন মজীদে, হযরত হাজেরা (আ) কর্তৃক ফিরিশতাকে দেখার বর্ণনা সহীহ বুখারীর কিতাবুল আম্বিয়ায় এবং হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) কর্তৃক স্বীয় কিরামান কাতিবীনকে দেখার ঘটনা 'ইসাবা' গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

ফায়েদা-২. এ যাবত বিভিন্ন বর্ণনায় এটা জানা গেল যে, নবী (সা)-এর উপর মেঘমালা ছায়াদান করতো। যেমনটি হযরত হালিমা এবং তাঁর সন্তানগণ কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর মেঘমালার ছায়াদান প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথম সিরিয়া সফরের সময় বহীরা দরবেশ কর্তৃক স্বয়ং তাঁর উপর মেঘের ছায়া দর্শন এবং অপরাপর ব্যক্তিকে দেখানো হযরত আবূ মূসা (রা)-এর উদ্ধৃতিতে তিরমিযী থেকে আমরা উৎকলিত করেছি। আল্লামা ইবন হাজার মক্কী 'শরহে কাসীদাতুল হামযিয়া' কিতাবে বলেন, এ ব্যাপারে তিরমিযীর বর্ণনা সর্বাপেক্ষা সহীহ। যেমন ইয ইবন জুমা'আ বলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, মহানবী (সা)-এর উপর মেঘমালার ছায়াদান সংক্রান্ত হাদীস মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ নয়, তবে তার বর্ণনা ভিত্তিহীন ও বাতিল। হ্যাঁ, এটা বিশুদ্ধ (যেমনটি হাফিজ সাখাবী থেকে বর্ণিত) যে, মেঘমালার ছায়াদান সব সময় ছিল না। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হিজরতের সফরে যখন রাসূল (সা)-এর উপর রৌদ্র পতিত হচ্ছিল, তখন হযরত আবূ বকর (রা) স্বীয় চাদর দ্বারা তাঁর উপর ছায়া দান করেন। অনুরূপভাবে জি'রানার ঘটনায়ও তাঁর উপর চাদর দ্বারা ছায়াদানের

১. যারকানী, ১খ. পৃ ১৯৯।

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আমরা যখন ছায়াদার বৃক্ষের নিচে অবতরণ করতাম, তখন ছায়াযুক্ত স্থানটুকু তাঁর জন্য ছেড়ে দিতাম।[১]

হযরত খাদীজার সাথে বিবাহ

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, হযরত খাদীজা নবী (সা)-এর সফরকালীন সমুদয় অবস্থা, দরবেশের বক্তব্য, ফিরিশতাগণ কর্তৃক মাথায় ছায়াদানের ঘটনাবলী ওরাকা ইবন নওফল-এর নিকট গিয়ে খুলে বলেন। ওরাকা বললেন, খাদীজা ! যদি এ ঘটনাবলী সত্য হয় তবে অবশ্যই মুহাম্মদ এ উম্মতের নবী। আর আমি ভালভাবেই জানি যে, এ উম্মতের একজন নবীর আগমনের সময় আসন্ন। আমরা যাঁর অপেক্ষা করছি, তাঁর সময় অত্যন্ত সন্নিকটবর্তী।[২]

এ কথা শুনে হযরত খাদীজার অন্তরে তাঁকে বিবাহ করার আগ্রহ জন্মায়। কাজেই সিরিয়া থেকে ফিরে আসার দু'মাস পঁচিশ দিন পর খাদীজা (রা) স্বয়ং তাঁর সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তিনি নিজ চাচার পরামর্শক্রমে এ প্রস্তাব কবূল করেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি নিজ চাচা আবূ তালিব, হামযা এবং বংশের অন্যান্য মুরুব্বীদের সাথে নিয়ে হযরত খাদীজার গৃহে আগমন করেন। মুবাররাদ থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাদীজার পিতা তো হারবুল ফুজ্জারের পূর্বেই ইনতিকাল করেছিলেন। বিবাহের সময় খাদীজার চাচা আমর ইবন আসাদ উপস্থিত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এ বিবাহের সময় খাদীজার পিতা খুয়ায়লিদ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা সুহায়লী বলেন, মুবাররাদের বর্ণনাই সঠিক। আর এটাই হযরত জুবায়র ইবন মুতইম, হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত।[৩]

আবূ তালিব বিবাহের খুতবা দেন। যার শেষাংশ ছিল নিম্নরূপ :

اما بعد فان محمدا ممن لا يوازن به فتى من قريش الا رجع به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وان كان فى المال قل فانه ظل زائل وعارية مسترجعة وله فى خديجة بنت خويلد غبتة ولها فيه مثل ذلك

"অতঃপর, মুহাম্মদ তো এমন এক ব্যক্তিত্ব, কুরায়শের মাঝে যে যুবক সম্ভ্রান্ত, উচ্চ মর্যাদা, গুণপনা ও জ্ঞানে সেরা, তার সাথে তাঁকে তুলনা করা হলে তাঁরই পাল্লা অধিক ভারী হবে। সম্পদ যদিও তাঁর কম, কিন্তু ধন-সম্পদ তো এক অস্তাচলমান ছায়ামাত্র এবং এমন বস্তু, যা প্রত্যর্পণ করা যায়। তিনি খাদীজা বিনতে খুয়ায়লিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে ইচ্ছুক এবং খাদীজাও তাঁর সাথে বিবাহে আগ্রহী।"[৪]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ ১৪৮।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৫১।

৩. রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ১২২।

৪. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ১২২।

বিবাহের সময় তাঁর বয়স পঁচিশ এবং হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। বিশটি উট দেনমোহর নির্ধারণ করা হয় (সীরাতে ইবন হিশাম) এবং হাফিয আবূ বিশর দুলাঈ বলেন, দেনমোহরের পরিমাণ ছিল সাড়ে বার উকিয়া; এক উকিয়ায় চল্লিশ দিরহাম হয়, কাজেই এ দেনমোহর ছিল পাঁচশত দিরহাম।[১]

এটা ছিল তাঁর প্রথম বিবাহ এবং হযরত খাদীজার তৃতীয় বিবাহ। হযরত খাদীজার বৈবাহিক জীবনের অবস্থা ইনশা আল্লাহ 'পবিত্র সহধর্মিণীগণ' শিরোনামে বর্ণনা করব।

কা'বাগৃহ নির্মাণ এবং নবী (সা)-এর সিদ্ধান্ত দান

প্রথম নির্মাণ : বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে ঐ সময় পর্যন্ত কা'বাগৃহ পাঁচবার নির্মাণ করা হয়। প্রথমবার হযরত আদম (আ) তা নির্মাণ করেন। দালাইলে বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কা'বাগৃহ নির্মাণের নির্দেশসহ হযরত আদম (আ)-এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন। যখন আদম (আ) নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন, তখন আদেশ হলো, এই গৃহের তাওয়াফ করো। বলা হলো, তুমিই পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর এ গৃহই (আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে) প্রথম নির্মিত হলো।[২]

দ্বিতীয় নির্মাণ : কিতাবুল আম্বিয়ায় মহান আল্লাহর বাণী واتخذ الله ابراهيم خليلا শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হয়েছে, হযরত নূহ (আ)-এর যামানায় যখন মহাপ্লাবন এলো, তখন এর ফলে কা'বাগৃহের নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। ফলে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দ্বিতীয়বার কা'বাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। ভিতের চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে ভিতের সীমা চিহ্নিত করে দেন এবং হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ) হযরত ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আ)-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় কা'বাগৃহ পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে। অতিরিক্ত জানার প্রয়োজন হলে ফাতহুল বারী, কিতাবুল আম্বিয়া, মহান আল্লাহর বাণী واتخذ الله ابراهيم خليلا শীর্ষক অধ্যায় এবং তাফসীরে ইবন কাসীর ও তাফসীরে ইবন জারীর দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় নির্মাণ : তৃতীয়বার মহানবী (সা)-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, যখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর ছিল, কুরায়শগণ কা'বাগৃহ নির্মাণ করলো। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নির্মিত ভিতের উপর কা'বা শরীফ ছিল ছাদবিহীন। এর দেয়াল কিন্তু খুব একটা উঁচু ছিল না। হযরত আদম (আ)-এর কদ থেকে খানিকটা উঁচু অর্থাৎ নয় হাত মাত্র উঁচু ছিল। কালের আবর্তনে অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। নিম্নাঞ্চলে হওয়ার কারণে বৃষ্টির সমুদয় পানি ভিতরে প্রবেশ করতো। এজন্যে নব পর্যায়ে তা

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ ২০২ঐ

২ ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২৮৫।

পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা কুরায়শগণের মনে জাগলো। যখন সমস্ত কুরায়শ সর্দার একমত হলেন যে, বায়তুল্লাহর কাঠামো বিলুপ্ত করে দিয়ে নতুন করে এর নির্মাণ করা হোক, তখন ওহাব ইবন আমর মাখযূমী [যিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিতার মামা ছিলেন] দাঁড়ালেন এবং কুরায়শদের সম্বোধন করে বললেন, দেখ, বায়তুল্লাহ নির্মাণে যা কিছুই ব্যয় করা হবে, তা যেন বৈধভাবে উপার্জিত হয়। যিনা, চুরি, সুদ ইত্যাদির কোন পয়সাই এতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না; শুধু হালাল মালই এ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পবিত্র আর তিনি পবিত্রতা পসন্দ করেন। তাঁর গৃহে পবিত্র অর্থই ব্যয় কর।

আর যাতে বায়তুল্লাহ নির্মাণের মত পবিত্র কাজ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়, এজন্যে তিনি কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন যে, অমুক সম্প্রদায় বায়তুল্লাহর অমুক অংশ নির্মাণ করবে এবং অমুক সম্প্রদায় অমুক অংশ।[১]

দরজার দিকটি বনী আবদে মানাফ এবং বনী যোহরার অংশে পড়ে। আর হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ বনী মাখযূম এবং অপর কুরায়শ গোত্রের ভাগে পড়ে। বায়তুল্লাহর পেছনের অংশ পড়ে বনী জমুহ ও বনী সাহমের ভাগে। আর হাতীম বনী আবদেদ্দার, বনী কুসাই, বনী আসাদ ও বনী আদীর ভাগে পড়ে। ইত্যবসরে কুরায়শদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যে, একটি বাণিজ্য জাহাজ জেদ্দা বন্দরে ধাক্কা লেগে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে গেছে। ওলীদ ইবন মুগীরা এ খবর শোনামাত্র জেদ্দায় যান এবং কা'বাগৃহের ছাদ নির্মাণের জন্য এর তক্তাগুলো নিয়ে নেন। ঐ জাহাজেই একজন রোম দেশীয় মিস্ত্রী ছিল যার নাম ছিল বাকুম। কা'বাগৃহ নির্মাণের জন্য ওলীদ তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসেন। হাফিজ আসকালানী 'ইসাবা' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে মুরসাল সূত্রে এ বর্ণনা পেশ করেছেন।[২] এ উদ্যোগের পর যখন পুরাতন ইমারত ভাঙার সময় এসে গেল, তখন কারো সাহস হলো না যে, বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার কাজে দণ্ডায়মান হয়। অবশেষে ওলীদ ইবন মুগীরা গাঁইতি হাতে অগ্রসর হলেন এবং বললেন : اللهم لا نريد الا الخير "হে আল্লাহ ! উত্তম ছাড়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই।"

"আল্লাহ না করুন, আমাদের উদ্দেশ্য অসৎ নয়।" এ বলে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর দিক থেকে ভাঙা শুরু করলেন। মক্কাবাসী বলল, রাত পর্যন্ত অপেক্ষা কর যে, ওলীদের উপর কোন আসমানী বালা নাযিল হয় কিনা। যদি তার উপর কোন আসমানী বালা নাযিল হয়, তবে আমরা বায়তুল্লাহকে পূর্বের মত করে দেব। আর যদি এরূপ কোন বালা তার উপর নাযিল না হয়, তা হলে আমরাও ওলীদের সাহায্যকারী হব। প্রভাত হলো, ওলীদ সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদে পুনরায়

---

১. প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ. ২৮৪-২৯২।

২ আল-ইসাবা, ১খ. পৃ ১৩৭।

গাঁইতি নিয়ে পবিত্র হেরেমে উপস্থিত হন। জনগণ বুঝল যে, আমাদের এ কাজে আল্লাহ তা'আলার সম্মতি আছে, তখন সবার সাহস বেড়ে গেল এবং সবাই মিলে মনেপ্রাণে এ কাজে অংশগ্রহণ করল। আর এ পর্যন্ত খনন করল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রদত্ত ভিত্তি বেরিয়ে পড়ল। এক কুরায়শী যখন ঐ ভিত্তির উপর গাঁইতি চালাল, তখন হঠাৎ করে একটা ভূকম্পন সৃষ্টি হলো, যে কারণে তারা এর অতিরিক্ত খোঁড়া থেকে বিরত থাকে এবং ঐ ভিত্তি থেকেই পুনর্নির্মাণ শুরু করা হয়। পূর্ববর্তী বন্টন অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায়ই পৃথক পৃথকভাবে পাথর জমা করে নির্মাণ কাজ শুরু করে। যখন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলো এবং হাজরে আসওয়াদকে তার স্থানে রাখার সময় এলো, তখন ভীষণ মতবিরোধ দেখা দিল। তরবারি কোষমুক্ত করা হলো এবং লোকজন যুদ্ধ বিগ্রহ, হত্যা ধ্বংসের কাজে প্রতিজ্ঞ হলো। যখন চার পাঁচদিন এভাবে কেটে গেল এবং কোন সিদ্ধান্তই হলো না, তখন আবূ উমাইয়া ইবন মুগীরা মাখযূমী, যিনি কুরায়শদের মধ্যে ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং গ্রহণীয় ব্যক্তিত্ব এ রায় দিলেন যে, কাল প্রভাতে যিনি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন তাকেই সিদ্ধান্ত দানকারী বানিয়ে তার দ্বারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। সবাই এ রায় পসন্দ করল। প্রভাত হলে সমস্ত লোক মসজিদে হারামে পৌঁছে কি দেখল ? সবাই দেখল যে, সর্বপ্রথম আগমনকারী ব্যক্তি হলেন মুহাম্মদ (সা)। তাঁকে দেখে সবার মুখ থেকে অবলীলায় এ বাক্য বেরিয়ে এলো

هذا محمد الامين رضينا هذا محمد الامين

"এই তো মুহাম্মদ,আল-আমীন, আমরা সবাই তাঁকে সালিশ মানতে সম্মত; তিনিই তো মুহাম্মদ আল-আমীন।"

তিনি একটি চাদর চেয়ে নিলেন এবং হাজরে আসওয়াদকে তার উপর রেখে বললেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই চাদর ধরুন, যাতে এ সম্মানজনক কাজ থেকে কোন সম্প্রদায়ই বঞ্চিত না হয়। এ ফয়সালা সবাই পসন্দ করলো এবং সবাই মিলে চাদর উঠালো। যখন সবাই এ চাদর উঠিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছলো, যেখানে তা রাখতে হবে, তখন তিনি নিজে এগিয়ে এলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে যথাস্থানে রেখে দেন।[১]

চতুর্থ নির্মাণ : চতুর্থবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর খিলাফতকালে তিনি বায়তুল্লাহকে ভেঙ্গে নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করান।

পঞ্চম নির্মাণ : পঞ্চমবার নির্মাণ করান হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ, যার অত্যাচার-নির্যাতনের নজীর পূর্বাপর কখনো ঘটেনি। বিস্তারিত জানার জন্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬৫; রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২৭; তারিখে তাবারী, ১খ. পৃ. ২০০; যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৩-২০৬।

হাফিয ইরাকী (র) 'আলফিয়াতুস সিয়ার' গ্রন্থে বলেন :

واذ بنت قريش البيت اختلف ملاهم تنازعا حتى وقف
امرهم فيمن يكون يضع الحجر الاسود حيث يوض
اذجاء قالوا كلهم رضينا لو ضعه محمدا الامينا
فحط فى ثوب وقال يرفع كل قبيل طرفا فرفعوا
ثمه اودع الامين الحجرا مكانه وقد رضوا بما جرى

জাহিলী প্রথা থেকে খোদায়ী ঘৃণা ও অনীহা

নবূওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে যদিও নবী-রাসূলগণ নবী-রাসূল অভিধায় আখ্যায়িত হন না, কিন্তু ঐ সময় ওলী ও সিদ্দীক অবশ্যই থাকেন। আর তাঁদের এ বিলায়েত এতটা পূর্ণ ও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে যে, বড় বড় ওলী-আল্লাহ ও সিদ্দীকগণের বিলায়েত ও সত্যবাদিতাও তাঁদের বিলায়েতের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার যোগ্য তো নয়ই, বরং সমুদ্রের তুলনায় এক ফোটা পানি কিংবা সূর্যের তুলনায় একটি রশ্মির সাথে তুলনার মতই কেবল এটা তুলনীয়। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ

"আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ, সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং তার সম্বন্ধে আমি ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আম্বিয়া ৫১)

এবং হযরত ইউসুফ (আ)-এর সমস্ত ঘটনা, বিশেষত তাঁর বাণী :

وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ

"আর আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন...।"

(সূরা ইউসুফ : ৩৩)

আর হযরত ইয়াহহিয়া (আ) প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী :

وَاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَّحَنَانًا

"আমি তাকে শৈশবেই দান করেছিলাম জ্ঞান এবং হৃদয়ের কোমলতা...।" (সূরা মরিয়ম : ১২-১৩)

ইত্যাদি সবই এরই উপর নির্ভরশীল যে, নবী (আ)গণ নবূওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই উচ্চমার্গের ওলী ও সিদ্দীক হয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে মহানবী (সা)-ও প্রথম থেকেই শিরক ও মূর্তিপূজা হতে এবং সর্বপ্রকার শিরকী সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র ছিলেন। যেমনটি ইবন হিশাম বলেছেন :

فشب رسول الله ﷺ والله يكلأه ويحفظ ويحوطه من اقذار الجاهلية لما يريد به من كرامة ورسالة حتى بلغ ان كان رجلا وافضل قومه مروءة واحسنهم خلقا

واكرمهم حسبا واحسنهم جوارا واعظمهم حلما واصدقهم حديثا واعزمهم امانة وابعدهم من الفحش والاخلاق التى تدنس الرجال تنزها وتكرما ما اسمه فى قومه الامين لما جمع الله فيه من الامور الصالح

"অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) এ অবস্থায় যৌবনে পদার্পণ করলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিফাযত ও দেখাশোনা করতেন এবং জাহিলিয়াতের সমস্ত নোংরামী থেকে আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতেন। কারণ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁকে নবূওয়াত ও রিসালাত এবং সর্বপ্রকার ইযযত ও সম্মান দ্বারা ভূষিত করবেন। এভাবে তিনি পরিপূর্ণতা লাভ করলেন। চাল-চলন ও সুন্দর চরিত্র, বংশ মর্যাদা, সহনশীলতা ও ধৈর্য, সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং অশ্লীলতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র থেকে এত বেশি দূরে থাকেন যে, তাঁর নাম 'আমীন' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৬২)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হলো, আপনি কি কোন সময় কোন মূর্তির পূজা করেছেন ? তিনি ইরশাদ করলেন, "না। আর এও বলেন যে, আমি সব সময়ই এগুলোকে কুফরী মনে করতাম। যদিও সে সময় আমার কিতাব ও ঈমানের জ্ঞান ছিল না।"(আবূ নুয়ায়ম ও ইবন আসাকির)

'মুসনাদে আহমদে' হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত খাদীজার একজন প্রতিবেশী বর্ণনা করেন, আমি মুহাম্মদ (নবী করীম (সা)) কর্তৃক হযরত খাদীজাকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহর কসম, আমি কখনো লাত-এর পূজা করব না; আল্লাহর কসম, আমি কখনো উযযার পূজা করব না।[১]

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) বলেন, জাহিলী যুগে যখন মুশরিকরা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করতো, তখন আসাফ ও নায়েলা (মূর্তি)-কে[২] স্পর্শ করতো। একবার আমি নবী করীম (সা)-এর সাথে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করি। যখন ঐ মূর্তিগুলোর নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি তা স্পর্শ করলাম। নবী করীম (সা) আমাকে এগুলো ছুঁতে নিষেধ করেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, দেখি তো, ছুঁলে কি হয়। এ ভেবে আমি দ্বিতীয়বার স্পর্শ করলাম। এবারে তিনি একটু রূঢ়ভাবে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি ? যায়দ বলেন, আল্লাহর কসম, এরপর আমি আর কোনদিন এগুলো স্পর্শ করিনি। এমনকি আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবূয়াত ও রিসালত দানে ধন্য করলেন এবং তাঁর প্রতি স্বীয় কালাম অবতীর্ণ করলেন। এ বর্ণনা 'মুস্তাদরাকে' হাকিম, 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' ও 'দালাইলে বায়হাকী'তে বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯০।

২. আসাফ ও নায়েলা দু'টি দেবতার নাম।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোনদিন জাহিলিয়াতের কোন সংস্কৃতির প্রতি আমার কোন খেয়াল ছিল না। কেবল দু'বার মাত্র এ খেয়াল মনে জেগেছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে তা থেকে বাঁচিয়েছেন এবং নিরাপদ রেখেছেন। এক রাতে আমি আমার বকরী চরানোর সাথীদের বললাম, আজ রাতে তোমরা আমার বকরীগুলোকে দেখে রাখবে। আমি মক্কায় গিয়ে কিছু কিসসা-কাহিনী শুনে আসি। মক্কায় প্রবেশ করে আমি এক বাড়িতে গান-বাজনার আওয়াজ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম এখানে কি হচ্ছে ? জানা গেল, অমুকের বিবাহ হচ্ছে। আমি বসেই ছিলাম, আমার চোখে ঘুম এসে গেল। আল্লাহ আমার কর্ণদ্বয়ে মোহর লাগিয়ে দিলেন। আমি ঘুমিয়েই থাকলাম; এমন কি সকালের রোদ আমাকে জাগিয়ে দিল। ঘুম থেকে উঠে আমি আমার সঙ্গীদের কাছে ফিরে আসি। সঙ্গীগণ জিজ্ঞেস করল, কি কি দেখে এলে ? তিনি বললেন, কিছুই না। এরপর তিনি নিজের ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা শোনালেন।

দ্বিতীয় এক রাতে তিনি একই ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একই অবস্থার সৃষ্টি হলো। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ, এরপর আর কোনদিন আমার অন্তরে এরূপ কোন খেয়াল হয়নি। তারপর তো আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর পয়গাম্বরী দানে ভূষিত করলেন। এ হাদীস 'মুসনাদে বাযযার' এবং 'মুসনাদে ইসহাক ইবন রাওয়াহ' প্রমুখ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। হাফিজ ইবন হাজার বলেন, এ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল এবং হাসান। এ হাদীসের সমস্ত রাবীই নির্ভরযোগ্য। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'বাগৃহ নির্মাণের সময় নবী (সা)-ও পাথর বহনের কাজ করেছেন। তাঁর চাচা হযরত আব্বাস বললেন, বেটা, লুঙ্গি খুলে ঘাড়ে দাও যাতে পাথরের আঘাত থেকে নিরাপদ থাকতে পার। তিনি চাচার হুকুম পালন করতে গিয়ে লুঙ্গি খোলার উদ্যোগ নেয়ার সাথে সাথে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর তাঁকে কখনো উলঙ্গ দেখা যায়নি।

হযরত আবুত তুফায়ল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ঐ সময় অদৃশ্য থেকে এ আওয়াজ এলো : يا محمد عورتك "হে মুহাম্মদ, নিজ সতর সম্পর্কে সতর্ক হও।" এ গায়বী আওয়াজই তাঁর প্রতি সর্বপ্রথম আওয়াজ ছিল, যা তাঁকে শোনানো হয়। আবুত তুফায়লের এ বর্ণনা দালাইলে আবূ নুয়াইম, দালাইলে বায়হাকী এবং মুস্তাদরাকে হাকিম এ উল্লেখ আছে। হাকিম বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে, আবূ তালিব তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার কী অবস্থা হয়েছিল ? তিনি বললেন, সাদা পোশাকধারী এক ব্যক্তি দেখা গেল, আর তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ, নিজ সতর ঢাকো। হাকিম বলেন,

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৮৮।

বর্ণনাটি সহীহ। ইবন সা'দ, ইবন আদী, হাকিম, সহীহায়ন ও আবূ নুয়াইম ইকরামা....ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এটি বর্ণিত।[১]

একবার কুরায়শ তাঁর সামনে কিছু খাদ্য রাখলো। ঐ মজলিসে যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়লও ছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যায়দও অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি দেবদেবীর নামে যবেহকৃত জন্তু এবং দেবদেবীর নামে উৎসর্গকৃত বস্তু আহার করি না; কেবল ঐ বস্তুই খেয়ে থাকি যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে। যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল কুরায়শদের এ কথাও বলতেন যে, বকরীকে আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহই তার জন্য ঘাস ইত্যাদি জন্মিয়েছেন। এরপর একে কেন তোমরা গায়রুল্লাহর নামে যবেহ কর ? (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১০৮, যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল বর্ণিত হাদীস)।

যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর চাচাত ভাই এবং সাঈদ ইবন যায়দ (যিনি ছিলেন আশারা মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত)-এর পিতা। তিনি শিরক ও মূর্তিপূজায় নাখোশ এবং সত্য দীনের অনুসন্ধানী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে, যে সময়ে কা'বাঘরের নির্মাণ কাজ চলছিল, ঐ সময়ে তিনি ইনতিকাল করেন।[২]

ওহীর সূচনা ও নবূয়াতের সুসংবাদ

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে এ কথা ভালভাবে প্রমাণিত হলো যে, নবী (আ)গণ নবী হওয়ার পূর্বেই কুফর, শিরক এবং সব ধরনের অশ্লীল, অসত্য ও অবাঞ্ছনীয় কথা ও কাজ থেকে পাক-পবিত্র থাকেন। শুরু থেকেই এ মহাত্মাগণের পবিত্র কলব তাওহীদ, আল্লাহভীতি, আল্লাহ্‌প্রেম ও আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর থাকে। এটা কি করে সম্ভব যে সমস্ত মহান ব্যক্তিত্ব অচিরেই কুফর ও শিরক নিশ্চিহ্ন করা এবং সমস্ত অশ্লীল ও অসত্য থেকে উদ্ধারপ্রাপ্তি এবং মানুষকে কল্যাণের প্রতি দাওয়াত দেয়ার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হতে যাচ্ছেন, হতে যাচ্ছেন তাঁর পসন্দনীয় প্রিয় বান্দা, তাঁদের পক্ষে এসবে জড়ানো আদৌ স্বাভাবিক নয়। তাই খোদ মহানবী (সা)-এর পক্ষেও (নাউযুবিল্লাহ্) মহান নবূয়াতের সৌভাগ্য, সম্মান ও মর্যাদালাভের পূর্ববর্তী সময়ে কুফর ও শিরকের নাপাকীতে জড়িত হওয়া এবং অশ্লীল ও অসত্যের নোংরামীতে আচ্ছন্ন হওয়া কি করে সম্ভব? নিশ্চয়ইই এটা অবাস্তব এবং তাঁর জন্যে অসম্ভব। নবী (আ)গণ নবূয়াত ও রিসালত লাভের পূর্বে যদিও নবী-রাসূল অভিধায় আখ্যায়িত হন না, তাঁরা অবশ্যই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আউলিয়া এবং 'আরিফ' মর্যাদার

---

১. প্রাগুক্ত।

২. বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১০৮ থেকে ৭খ. পৃ. ১১০ পর্যন্ত যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল বর্ণিত হাদীস শীর্ষক অধ্যায়; ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৬৯, যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল-এর জীবন চরিত; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১০৫, আলামাতে নুবূয়াত কাবলাল বা'আসাত অধ্যায় দ্র.।

অধিকারী হয়ে থাকেন। এ মর্যাদার লোকেরা আল্লাহ্ সম্পর্কীয় জ্ঞানে অজ্ঞ থাকেন না, আর না তাঁরা আল্লাহর কোন গুণ সম্পর্কে অবাস্তব বিভ্রান্তির শিকার হন; তেমনি কোন শোবা-সন্দেহও তাঁদের স্পর্শ করে না। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عٰلِمِيْنَ

"আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত।" (সূরা আম্বিয়া : ৫১)

এখন দেখা যাক 'রুশদ'-এর অর্থ কি, আর রাশীদ ও রাশেদ কাকে বলা হয়। সূরা হুজুরাতের নিম্নোক্ত আয়াত এ ব্যাপারে দিক-নির্দেশনা দান করেছে :

وَاعْلَمُوْا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ اُولٰئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"আর জেনে রাখ, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, যদি তোমাদের অনেক কথাই তিনি মেনে নেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তোমরা কষ্টে পড়তে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সে কষ্ট থেকে এভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন যে, ঈমান ও আনুগত্য তোমাদের অন্তরে প্রিয় ও আপন বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা ঢেলে দিয়েছেন। এ শ্রেণীর লোকেরাই আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে সুপথপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ তা'আলা সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা হুজুরাত ৭)

এ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পেল যে, অন্তরে ঈমান ও আল্লাহর আনুগত্যের মহব্বত এবং কুফরী, ফাসিকী ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শনের নামই রুশদ তথা সুপথপ্রাপ্তি। আর এ সুপথপ্রাপ্তি আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রথম থেকেই দান করেছিলেন, যেমনটি সূরা আম্বিয়ার উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর 'রুশদ' শব্দটি আরবী অভিধানে পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার বিপরীতার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ "হিদায়াত ও সুপথ নিশ্চয়ই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে স্পষ্ট পৃথক হয়ে গেছে।" এ থেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকেই সুপথ এবং হিদায়াতের উপর ছিলেন। আল্লাহ্ না করুন, পথভ্রষ্ট ছিলেন না। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তারকা, চন্দ্র ও সূর্যকে هذا ربى (এই আমার প্রভু) উক্তি দ্বারা সাম্প্রতিক কতিপয় লেখকের[১] এ ধোঁকায় পতিত হওয়া যে, আল্লাহ্ মাফ করুন,

১. আল্লামা শিবলী সীরাতুন নবী গ্রন্থে (১খ. পৃ. ১৮৭) লিখেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) নবূয়াতের পূর্বে যখন তারকারাজি দেখেন, এতে যেহেতু আলোকচ্ছটা ছিল, এতে তিনি সন্দেহে পড়েছিলেন, যখন চন্দ্র উদিত হয়, তখন আরো বেশি সন্দেহে পতিত হন। কেননা এটি পূর্বেরটির তুলনায় ছিল বেশি আলোকোজ্জ্বল। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো, তখন তিনি

ইবরাহীম (আ) সম্ভবত সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হয়েছিলেন, যখন তা অস্তমিত হতো তখন সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যেত। হযরত ইবরাহীম (আ) প্রথম থেকেই চন্দ্র-সূর্যকে আল্লাহ তা'আলার মামুলী সৃষ্টি হিসেবেই জানতেন। তাঁর সম্প্রদায় যেহেতু নক্ষত্র পূজায় লিপ্ত ছিল, এজন্যে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস রদ করার জন্যই বলেছিলেন যে, যুক্তির খাতিরে যদি কিছু সময়ের জন্য ধরেও নেয়া হয়, এ নক্ষত্ররাজি তোমাদের ধারণামতে আমার প্রভু; তা হলে খুবই ভাল কথা, একটু অপেক্ষা কর, এটার অস্তাগমন ও ডুবে যাওয়ার অপেক্ষা কর। এর নশ্বর ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টি স্বয়ং তোমাদের সামনেই প্রতিভাত হবে। ঠিক একইভাবে তিনি চন্দ্র ও সূর্যের অনতিত্ব ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়ে বুঝিয়ে দেন। এ জন্যে, নক্ষত্র পূজারীদের বিশ্বাস এই ছিল যে, তারকারাজি ডুবে যাওয়ার পর এগুলোর মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট থাকে না যা উদয়ের সময় থাকে। কাজেই এটা যদি খোদা হয়, তবে এর গুণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিবর্তন ও দুর্বলতা কিছুতেই আসতো না। কেননা আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং গুণাবলী পরিবর্তন ও দৌর্বল্য হতে পবিত্র। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমুদয় কথাবার্তা ছিল বিতর্কমূলক ও রূপকার্থক। যেমনটি এর পরবর্তী আয়াত : ও

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هدَانِ

এ আয়াত : تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ

সরাসরি এ কথা প্রমাণ করে যে, এর সবটাই নক্ষত্র পূজারীদের সাথে বিতর্কমূলক ও রূপক অর্থে ছিল। আর এটাই সে দলীল ও প্রমাণ, যা আল্লাহ তাঁকে বিতর্কের জন্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মূলত এ বিতর্ক ছিল হযরত খলীলুল্লাহর সত্তাগত, রূপক, চিন্তাগত ছিল না। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ) কি এর পূর্বে চন্দ্র-সূর্য দেখেন নি ? খোদ বুখারী-মুসলিম এবং অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীস বিদ্যমান আছে :

كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه

"প্রতিটি শিশুই ফিতরত প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মাতাপিতা তাদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা অথবা অগ্নি পূজকে পরিণত করে।"

অজ্ঞাতসারে বলে উঠলেন ঃ انى لا احب الافلين (আমি অস্তগামীকে পসন্দ করি না)। পরিশেষে আল্লামা শিবলীর মন্তব্য এটাই ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ধোঁকায় পড়েছিলেন। আল্লাহ না করুন, হযরত নবী (আ)গণ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর ব্যাপারে কখনো ধোঁকায় পড়েন না। আর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তো নবী-রাসূলগণের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আসমান-যমীনের রহস্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান দান করেছিলেন এবং তাঁকে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী বানিয়েছিলেন। তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি এ সবই আল্লাহর হুকুমে পরিভ্রমণ করে। আল্লাহ না করুন, ইবরাহীম (আ) কোনরূপ ধোঁকায় পড়েন নি, বরং আল্লামাই ইসলামী আকীদার ব্যাপারে এবং আরবীর অনুবাদ করতে গিয়ে ধোঁকায় পড়েছেন।

এখানে এটা বলেন নি যে, يُسَلِّمَا অর্থাৎ "তার পিতামাতা তাকে মুসলমানে পরিণত করে।" এটা এজন্যে যে, প্রকৃতিগতভাবে সে মুসলমান হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে। সহীহ মুসলিমে ইয়ায ইবন হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : قال الله تعالى انى خلقت عبادى حنفاء

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি আমার বান্দাকে প্রকৃতিগতভাবে হানীফ তথা সরল পথের অনুসারীরূপে পয়দা করেছি।"

কাজেই যখন প্রতিটি শিশু জন্ম থেকেই সহজ ও ইসলামী প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে, তা হলে যিনি নবী হবেন, সমস্ত নবীর ইমাম হবেন, সরল পথের অনুসারী সকলের মুখপাত্র হবেন, সমস্ত তাওহীদবাদীর জন্য উত্তম আদর্শ হবেন; কুফর ও শিরক-এর প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণকারী ও এর বিরোধীদের নেতৃস্থানীয় হবেন, তিনি যে প্রথম থেকেই সরল ও সৎপথপ্রাপ্ত হবেন, তাঁর প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অনুগত এবং সর্বদা সোজা পথের অনুসারী হবে। কুরআন মজীদে স্থানে স্থানে হযরত নবী করীম (সা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 'হানীফ মিল্লাতে'র অনুসরণের নির্দেশ বর্ণিত আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"আমি তোমার প্রতি ওহী করলাম যে, তুমি এখন ইবরাহীমের হানীফ মিল্লাতের অনুসরণ কর। এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা নাহল : ১২৩)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ دِيْنًا قِيَمًا مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

"বল, আমার প্রতিপালক আমাকে একটি সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, যা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।" (সূরা আন'আম : ১৬১)

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে প্রখ্যাত ইমাম হাফিয ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর প্রণীত তাফসীর গ্রন্থ পাঠ করুন।

জাহিলী যুগে যখন কুফর ও শিরকের অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই সময় যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল ও ওরাকা ইবন নাওফল এবং অনুরূপ কিছু তাওহীদবাদী ও সরল পথের পথিকদের অন্তরে তাওহীদের রোশনী প্রোজ্জ্বল ছিল। তাঁরা যদি তাওহীদে ইবরাহীমের প্রতিবিম্ব না হয়ে থাকেন, তবে কার প্রতিবিম্ব ছিলেন? যায়দ এবং ওরাকার প্রকৃতি কি ইবরাহীম (আ) থেকে বেশি সুস্থ ছিল?

কাযী ইয়ায শরহে শিফায় বলেন :

اعلم متحنا الله تعالى واياك توفيقه ان ما تعلق منه بطريق التوحيد والعلم بالله وصفاته والايمان به وبما اوحى اليه فعلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن الجهل بشئ من ذلك او الشك الريب فيه والعصمة من كل ما يضاذ المعرفة بذالك واليقين هذا ما وقع عليه اجماع المسلمين عليه والايصح بالبراهين الواضحة ان يكون فى عقود الانبياء سواه

"জেনে রাখ, (আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদেরকে স্বীয় তাওহীদের নিয়ামত দান করেছেন) যে বস্তু আল্লাহর একত্ববাদ, আধ্যাত্মিকতা, ঈমান ও ওহীর সাথে তার সম্পর্ক, তা সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে নবী (আ)গণের আয়ত্বাধীন। নবী (আ)-গণের আল্লাহ তা'আলার সত্তাগত ও গুণগত গুণাবলী সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। আল্লাহ না করুন, কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত থাকেন না, আর না তাঁদের ঐ সমস্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ-সংশয় থাকে। আর তাঁরা সে সব বিষয় সম্পর্কে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে থাকেন—যা তাঁদের জ্ঞান ও বিশ্বাসের পরিপন্থি। এর উপরই সমগ্র মুসলমান একমত। আর অকাট্য দলীল ও প্রমাণ দ্বারা এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবীগণের বিশ্বাসে কোন ভ্রান্তি থাকে না।"[১]

সার কথা

সার কথা এই যে, মহান নবী (আ)গণের পবিত্র আত্মা শুরু থেকেই সর্বপ্রকার কুফর, শিরক এবং সব ধরনের অশ্লীল ও অসত্য থেকে পাক-পবিত্র হয়ে থাকে। শুরু থেকেই তা থাকে সরল সুপথে প্রতিষ্ঠিত আবিলতা। প্রকৃতিগতভাবেই তাঁরা সর্বপ্রকার অন্যায় ও খারাবীকে ঘৃণ্য ও অপসন্দনীয় মনে করেন। যেমন শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন :

فلما نشاءت بغضت الى الاوثان وبغض الى الشعر

অর্থাৎ "যখন থেকে আমি বড় হতে লাগলাম, তখন থেকেই মূর্তির প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা এবং অসার কবিতার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা আমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়।"[২]

নবীদের জন্য এটা জরুরী যে, তাঁদের আপাদমস্তক সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাঁদের কথা, কাজ, নিয়্যত বা উদ্দেশ্যে কখনো মিথ্যা বা খেয়াল-খুশির অনুসরণ ও শামিল হওয়া প্রকৃতিগতভাবে আদপেই অসম্ভব। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

---

১. কাযী ইয়ায, আশ-শিফা, ২খ. পৃ. ৮৮।

২ এ বর্ণনা কানযুল উম্মালে আবূ ইয়ালা ও আবূ নুয়াইম সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

"আমি তাকে কবিতার জ্ঞান দান করিনি, আর এ জ্ঞান তার শোভনীয়ও নয়।"[১]
(সূরা ইয়াসীন : ৬৯)

যেহেতু নবুয়াত ও রিসালাতের মর্যাদা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়েই ছিল, এজন্য আল্লাহ তা'আলা শুরু থেকেই তাঁর পবিত্র কলবকে ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি বিদ্বিষ্ট ও নিস্পৃহ করে রেখেছেন, যে সমস্ত বস্তু নবুয়াত ও রিসালাতের মর্যাদার পরিপন্থি ও বিরোধী ছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যৌবন ও বার্ধক্য দান করেন। নবুয়াতের সময় যখন আসন্ন হলো, তখন সত্য ও সৎ স্বপ্ন[২] তাঁকে দেখা দিতে শুরু করলো। 'নবী' শব্দটি 'নাবা' থেকে গৃহীত। আরবী অভিধানে 'নাবা' ঐ খবরকে বলা হয়, যা মর্যাদাপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সত্য ও ঘটনার যথার্থ বর্ণনা হয়ে থাকে। সাধারণ খবরকে 'নাবা' বলা হয় না। আর নবীকে এজন্যে নবী বলা হয় যে, ওহীর দ্বারা অদৃশ্য খবর, যা নেহায়েত মর্যাদাপূর্ণ, সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব-ভিত্তিক, কখনো যা মিথ্যা হয় না, নবীকে ওহী দ্বারা এমন খবরই দেয়া হয়ে থাকে। ইমামে রব্বানী শায়খ মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) তাঁর এক পত্রে নবুয়াতের হাকীকত সংক্ষিপ্তাকারে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

وچنانچه طور عقل درا طورحس است كه انچ بحس مدرك نشود عقل ادراك آدمی نمائد همچنین طور نبوت ورا طور عقل ست انچه بعقل مدرك نشود بتوسل نبوت بدرك می وراید

"জ্ঞানগত অনুভূতির পদ্ধতি যেমন ধারণাগত অনুভূতি থেকে পৃথক, যে বস্তু বাহ্যিক অনুভূতি দ্বারা বুঝা যায় না, জ্ঞান তাকে বুঝতে পারে; অনুরূপভাবে জ্ঞানের অনুভূতির বাইরে নবুয়াতের অনুভূতি। অর্থাৎ যে বিষয় অনুভবের ক্ষেত্রে জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অপারগ, ঐ সব বিষয় নবুয়াতের জ্ঞান দ্বারাই অনুভব করা হয়। জড়বস্তু বাহ্যিক অনুভূতি দ্বারাই কেবল অনুভব করা হয়, আর জ্ঞান দ্বারা কেবল জ্ঞানগত বস্তুর ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু যেগুলো অদৃশ্য বিষয়, যা জ্ঞানানুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, সেগুলো কেবল ওহী আর নবুয়াতের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অদৃশ্য বিষয় প্রাপ্তির মাধ্যমই হলো নবীপ্রাপ্ত ওহী। নবীগণের প্রতি কৃত ওহীর তাৎপর্য কেবল নবীগণই অনুভব করতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার অনুগ্রহে আমাদের মত অবুঝ মানুষদের বুঝানোর জন্য ওহীয়ে নবুয়াতের এক নমুনামাত্র দান করেছেন, যা দেখে মানুষ নবুয়াতের রহস্য কিছুটা উপলব্ধি করতে পারে। ওহীয়ে নবুয়াতের ঐ

---

১. কানযুল উম্মাল, ৬খ. পৃ. ৩০৫।

২. হযরত নবী (আ)-গণের স্বপ্ন সর্বদা সত্য হয়ে থাকে, মিথ্যে হয় না। অবশ্য পার্থিব দৃষ্টিতে তা কখনো সঠিক হয়, আর কখনো বেঠিক। তবে আখিরাতের বিষয়ে সর্বদা সঠিকই হয়ে থাকে। যেমন মুসীবত মুমিনদের বেলায় দুনিয়ার প্রেক্ষিতে অপসন্দনীয় এবং আখিরাতের প্রেক্ষিতে প্রিয় ও পসন্দনীয় হয়ে থাকে। –ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাবীর, ১২খ. পৃ. ৩১১।

নমুনা হলো সত্য স্বপ্ন, যা অনুভব ও জ্ঞান ব্যতিরেকে অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের একটা ন্যূনতম মাধ্যম।

যে সময় মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার সমুদয় বাহ্যিক এবং গুপ্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ ও অকেজো হয়ে পড়ে। ঐ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ পায়। বিস্তারিত জানার জন্য হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) প্রণীত 'আল-মুনকিযু মিনাদ-দালাল' কিতাবটি পাঠ করুন।

সার কথা এই যে, অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম হলো নবীপ্রাপ্ত ওহী। অনুরূপ অদৃশ্য বিষয় প্রকাশের সর্বনিম্ন মাধ্যম হলো সত্য স্বপ্ন। সত্য স্বপ্ন হচ্ছে ওহীয়ে নবূয়াতের একটি নমুনা, যার মাধ্যমে নবী (আ)গণের নবূয়াতের সূচনা হয়ে থাকে। কাজেই 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' 'হাসান' সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর শিষ্য আলকামা ইবন কায়স সূত্রে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম প্রথম নবী (আ)গণকে প্রচুর সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। এমন কি যখন সত্য স্বপ্ন দ্বারা অন্তর স্থির হয়, তখন জাগ্রত অবস্থায় তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওহী নাযিল হয়।[১] যেমন হযরত ইউসুফ (আ) নবূয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁকে এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখানো হয়। তা এজন্যে যে, সৎ স্বপ্ন ওহীয়ে নবূয়াতেরই নমুনা। হাদীস শরীফে আছে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের একটি অংশ। নবী (আ)গণের স্বপ্ন তো সর্বদা সত্যই হয়ে থাকে। তাঁদের স্বপ্নে মিথ্যার কোন সম্ভাবনাই নেই। অবশ্য সৎকর্মশীলদের স্বপ্নেও সত্যের প্রাধান্য থাকে। সামান্য সামান্যতম ক্ষেত্রে এটা ইলহামের বিপরীতও হয়ে থাকে। ফাসিক ও ফাজিরদের স্বপ্ন অধিকাংশ সত্যের বিপরীত হয়। সহীহ হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন

اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا

"যে ব্যক্তি কথাবার্তায় সবচে' বেশি সত্যবাদী, তার স্বপ্নও সর্বাধিক সত্য হয়ে থাকে।"

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রকাশিত হলো যে, স্বপ্ন সত্য হওয়ার জন্য জাগ্রত অবস্থায় সত্য বলার বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান। যে ব্যক্তি যত বেশি সত্যবাদী, তিনি তত বেশি নবূয়াতের নিকটবর্তী। সত্য থেকে যে যত বেশি দূরে, সে নবূয়াত থেকেও ততটাই দূরে। এজন্যে নবী করীম (সা) কখনো বলেছেন, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের ছাব্বিশ ভাগের একভাগ, কখনো বলেছেন, চল্লিশ ভাগের একভাগ, এক হাদীসে আছে পঁয়তাল্লিশ ভাগের একভাগ, অপর একটি হাদীসে আছে পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, এক হাদীসে সত্তর ভাগের একভাগ, এক হাদীসে আছে ছিয়াত্তর ভাগের একভাগ। ইমাম গাযালী (র) তাঁর ইহ্ইয়াউল উলূম গ্রন্থের 'আল-ফাকরু ওয়ায্-যুহ্দ' অধ্যায়ে বলেন, এ বিভিন্ন বক্তব্য থেকে কখনো এ কথা মনে করো না যে, এগুলো পরস্পর

---

১. ফাতহুল বারী, كيف كان بدء الوحى অধ্যায়, ১খ. পৃ. ৭।

বিরোধী ও বেমিল। বরং এ বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা এর বিপরীত মর্তবার বিভিন্নতার প্রতি ইঙ্গিত মনে করো যে, স্বপ্ন দ্রষ্টাদের অবস্থানও বিভিন্ন। সত্যবাদীদের স্বপ্নও নবূয়াতের সাথে এভাবেই সম্পর্কিত হবে, যেমন মর্যাদার তারতম্যে ছাব্বিশ ভাগের একভাগের অনুরূপ হবে। একইভাবে চল্লিশ ভাগের একভাগ, পঞ্চাশ ভাগের একভাগ, সত্তর অথবা ছিয়াত্তর ভাগের একভাগ হয়ে থাকে।[১] হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস اصدقهم رؤيا اصدقهم حديثا (যা আমরা কিছু পূর্বেই বর্ণনা করেছি) তাও এই মতপার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিতবাহী অনুভূত হয়। ফলে জানা গেল, এটা এ জন্যে যে, মর্যাদাপূর্ণ কার্যক্রমের ঐ স্থানই উপযুক্ত যেখানে মরতবা ও মর্যাদা বিভিন্ন ও পর্যায়ক্রমিক মর্যাদাপূর্ণ হয়।

হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) থেকে সরাসরি বর্ণিত যে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের অংশ হওয়ার ব্যাপারে যত বর্ণনা আছে, তা মতভেদে পরিপূর্ণ।[২] এবারে একটি প্রশ্ন রয়ে গেল যে, সত্য স্বপ্ন নবূয়াতের অংশ হওয়ার অর্থ কি ? সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী, এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে ফাতহুল বারী কিতাব অধ্যয়ন করুন।[৩] অতঃপর নিজ ছাত্র ও শিষ্যবর্গকে বুঝান, আল্লাহ তা'আলা এ কাজের জন্য এ বুযর্গগণকে উত্তম প্রতিফল দান করবেন। উত্তম কাজের প্রতিদান পেতে এ অধমও পরওয়ারদিগারের দরবারের মুখাপেক্ষী। বর্ণনা বিস্তারিত হওয়ার আশংকায় আমরা এ আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি। لعل الله يحدث بعد ذلك امرا।

এবারে মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح

"মহানবী (সা)-এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে ওহীর সূচনা হয়। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা প্রভাতের রশ্মির মত স্পষ্ট প্রতিভাত হতো।"

ইবন জামরাহ বলেন, সত্য স্বপ্নের সাথে প্রভাত রশ্মির উপমা এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, ঐ সময় পর্যন্ত নবূয়াতের সূর্য উদিত হয়নি। যেভাবে প্রভাতের রশ্মি সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস, অনুরূপভাবে সত্য স্বপ্ন নবূয়াত ও রিসালতের সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ছিল।

সুবহে সাদিকরূপী সত্য স্বপ্ন এ সুসংবাদ দিচ্ছিল যে, অচিরেই নবূয়াতের সূর্য উদিত হতে যাচ্ছে। আর এভাবে প্রভাতরশ্মি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত নবূয়াতের সূর্য ফারান পর্বতের চূড়ায় উদিত হয়। যিনি অন্তর চোখে দেখতে সক্ষম

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ.৭।

২ প্রাগুক্ত, ১২খ. পৃ. ৩১৯-৩২৪; মাদারিজুস সালিকীন, ১খ. পৃ. ২৮।

৩. প্রাগুক্ত, ১২খ. পৃ. ৩৩১-৩৩২।

ছিলেন। যেমন হযরত আবূ বকর (রা), তিনি এগিয়ে আসেন এবং নবূয়াতের সূর্যের রশ্মি দ্বারা উপকৃত হন। আর যে চামচিকা সদৃশ্য অন্ধ ছিল, যেমন আবূ জাহল, নবূয়াতের সূর্য উদিত হতেই সে চামচিকার ন্যায় চক্ষু বন্ধ করে এবং নবূয়াত ও রিসালতের বিশ্বময় ব্যাপ্ত সূর্যরশ্মি থেকে আলোক গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

گرنه بنید بروز شپره چشم   چشمئه افتاب راچـرگناه

چهرنه آفتاب خود فاش است   بے نصیبی نصیب خفاش است

"দিনের বেলায় যদি অন্ধ দেখতে না পায়, তবে সূর্যের আলোর দোষটা কোথায়, সূর্যের চেহারা তো স্বয়ং প্রকাশিত, দুর্ভাগ্য তো কেবল চামচিকার।"

বাদ বাকী লোক আবূ বকর কিংবা আবূ জাহলের অনুসরণ করে তারা নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মার নূরের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী প্রত্যেকেই নবূয়াতের সূর্য থেকে উপকৃত হয়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন : ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوا بغار حراء "অতঃপর তিনি একাকীত্ব ও নির্জনতা প্রিয় হয়ে উঠেন। তিনি হেরা গুহায় নির্জন অবস্থান গ্রহণ করেন।"

উম্মুল মু'মিনীন حُبِّبَ (মাজহূল তথা কর্ম বাচ্যের শব্দ) এ জন্যে ব্যবহার করেছেন এটা জানা যায় না যে, ঐ কারণ ও উদ্দেশ্য কি ছিল, যা তাঁকে নির্জনতা ও একাকীত্ব প্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল। এটা সম্ভবত অদৃশ্য ও গুপ্ত কোন বিষয় ছিল, যা তাঁকে নির্জনতাপ্রিয় ও একাকীত্ব প্রেমিক বানিয়ে দিয়েছিল। আল্লাহই জানেন, তা কি ছিল। অন্যান্য ব্যক্তির কাছে তা সরাসরি গুপ্ত ছিল। এজন্যে উম্মুল মু'মিনীন মাজহূলের শব্দ দ্বারা তা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির প্রতি খাস অনুগ্রহ বর্ষণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তার অন্তরে একাকীত্ব ও নির্জনতা পসন্দনীয় করে তোলেন। কাজেই আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন :

وَاِذِ اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ الاَّ اللّٰهَ فَأْوٗا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْلَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ رَّحْمَتِه وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ اَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا

"আর যখন তোমরা কাফিরগণ থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া ওদের সমস্ত উপাস্য থেকে পৃথক হয়ে যাও, তা হলে একটি গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর যাতে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে পার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের সব কাজ সহজসাধ্য করে দেবেন।" (সূরা কাহফ : ১৬)

এটা জরুরী নয় যে, নির্জনতা প্রীতি ও একাকীত্ব নবূয়াত ও রিসালত প্রাপ্তির শর্ত। কারণ নবূয়াত ও রিসালত কোন অর্জনের বিষয় নয়। আল্লাহ যাকে চান, নবী ও রাসূল মনোনীত করেন। আল্লাহই ভাল জানেন কিভাবে তিনি রিসালত দান করেছেন।

تبارك الله ما وحى بمكتسب ولا نبى على غيب بمتهم

হ্যাঁ, যাঁকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে নবী ও রাসূল বানাতে চান, নির্জনতা ও একাকীত্বপ্রিয়তা তাঁর রিসালতের পূর্বাভাস হয়ে থাকে। যেমনটি সত্য স্বপ্ন কেবল নবী (আ)গণের নবূয়াত ও রিসালতের সূচনা হয়ে থাকে। যে কারণে নবূয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত আল্লাহর ইলমে নির্ধারিত হয়ে আছে। এর অর্থ এটা নয় যে, সত্য স্বপ্ন ও সৎ স্বপ্ন যিনি দেখবেন, তিনি নবী হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰه وَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيًّا

"যখন ইবরাহীম কাফিরগণ থেকে এবং আল্লাহ ছাড়া সমস্ত উপাস্য থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের মত পুত্র ও ইয়াকূবের মত পৌত্র দান করলাম এবং প্রত্যেককেই নবী বানালাম।" (সূরা মরিয়ম : ৪৯)

এ আয়াত থেকে এটা জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নবূয়াতের মর্যাদা হযরত ইবরাহীম (আ) এর নির্জন বাসের বরকতের ফলশ্রুতি। অনুরূপভাবে মহানবী (সা)ও হেরা গুহায় গিয়ে ই'তিকাফ করতেন। এজন্যে পানাহারের দ্রব্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত বন্দেগী করতেন। কোন হাদীসে তাঁর এ ইবাদতের ধরন বলা হয় নি। কোন কোন আলিম বলেছেন, আল্লাহর স্মরণ, ধ্যান, চিন্তা, ধারণা এ সবই ছিল তাঁর তৎকালীন ইবাদত।[১]

এছাড়া ফাসিক, ফাজির, মুশরিক এবং কাফির থেকে আলাদা থাকাও ছিল একটা পৃথক ইবাদত। (শেষে হিজরত, যার প্রশংসা ও সুনামে সম্পূর্ণ কুরআন ভরপূর, তা বাস্তবে কি ছিল ? এটা তো ছিল আল্লাহ ও রাসূলের দুশমনদের থেকে পৃথক হওয়ারই নাম)। আর যখন খাদ্য-পানীয় শেষ হয়ে যেত, তখন গৃহে ফিরে আসতেন এবং পানাহারের দ্রব্যাদি সাথে নিয়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১১)

والمختار عندنا انه كان يعمل بما ظهرله من الكشف الصادق من شريعة ابراهيم وغيره

---

১. من القوسين যে ইবাদত, তা পরিবর্তিত অন্তঃকরণবিশিষ্টদের পক্ষ থেকে হয়। এ জন্যে একে আল্লামা যুরকানীর বক্তব্য দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যে প্রমাণ দ্বারা খালিস ইবাদতকারী কর্তৃক আল্লাহ তা'আলাকে দেখা উত্তম ও কল্যাণকর প্রতিদান। এই দলীল দ্বারা আল্লাহর দুশমন ও আল্লাহর অনুগতগণ কর্তৃক আল্লাহকে দেখা তাদের স্ব-স্ব গ্রহণযোগ্যতা ও অনাচারসাপেক্ষে হয়ে থাকে। হারুন ও মূসা ইবন ইমরান আর ফিরাউন, হামান এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) ও আল্লাহর দুশমন আবূ জাহল, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও মুসায়লামা কাযযাবের দেখা কি একইরূপ? অন্তরে সন্দেহ পোষণকারী ছাড়া কেউই তা অস্বীকার করবে না। আর জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।

"আমাদের কাছে প্রমাণিত যে, তিনি এই আমল করতেন যা সত্য রহস্য হিসেবে তাঁর নিকট প্রকাশিত হতো হযরত ইবরাহীম (আ) ও অপরাপর নবীর শরীয়াত।" যেমনটি দুররুল মুখতারে (১খ. পৃ. ১৬৩) বর্ণিত আছে।

অর্থাৎ হানাফী ফকীহদের নিকট প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে তাঁর নিকট প্রকাশিত রহস্য, বিশুদ্ধ ইলহাম দ্বারা যা প্রকাশিত হয়, এটা ছিল হযরত ইবরাহীম (আ) কিংবা অন্য কোন নবীর শরীয়ত, এর উপরই তিনি আমল করতেন। যেমন কোন কোন বর্ণনায় فيتحنث এর স্থলে فيتحنف শব্দ এসেছে, যার অর্থ ইবরাহীম (আ) সরল সঠিক (হানীফ) পথের উপর চলতেন। এ শব্দ এর উপর জোর দেয় যে, তিনি (সা) সরল সঠিক পথের অনুসারী সম্প্রদায়ের মত স্বীয় কাশ্‌ফ ও ইলহামের উপর আমল করতেন।

ফারান পর্বতের চূড়া থেকে রিসালাতের সূর্যোদয়

এমনকি যখন তাঁর বয়স চল্লিশ[১] বছরে পৌঁছল, নিয়মানুযায়ী একদিন তিনি হেরা গুহায় এলেন। ঘটনাক্রমে এক ফিরিশতা গুহার ভিতরে এলেন এবং তাঁকে সালাম দিলেন। এরপর বললেন, اقراء পড়ুন। তিনি বললেন, ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না। [নবী (সা) বলেন] এতে ঐ ফিরিশতা আমাকে কঠিনভাবে আলিঙ্গন করলেন যে, আমার কষ্টের[২] কোন অন্ত ছিল না। এরপর ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, اقراء পড়ুন। আমি পুনরায় জবাব দিলাম ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না।

কাজের কথা

ما انا بقارى এর বাহ্যিক অর্থ আমি পড়া জানি না, নিরক্ষর। কিন্তু এ অর্থে সমস্যা এই যে, কিরাআত অর্থাৎ (মুখস্থ) পড়াটা নিরক্ষরতা বিরোধী নয়। নিরক্ষর ব্যক্তিও অপরের শিক্ষাদান ও অনুশীলনের দ্বারা পড়তে ও মুখস্থ করতে পারে। বিশেষত বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বৈয়াকরণিক জ্ঞান তার আয়ত্বে। নিরক্ষতা লিখতে জানার বিপরীত। নিরক্ষর ব্যক্তি লিখিত বিষয় পড়তে পারে না। কিন্তু মৌখিক শিক্ষায় মুখে মুখে উচ্চারণ করে বাক্য বলতে পারে। কাজেই জিবরাঈল (আ) যদি লিখিত কোন বক্তব্য নিয়ে এসে থাকতেন, যাতে ঐ আয়াতগুলো লিখিত ছিল এবং এ প্রসঙ্গে বলতেন যে,

---

১. চল্লিশ বছর বয়সে ওহীপ্রাপ্ত হওয়া হযরত ইবন আব্বাস (রা) ও হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে জুবায়র ইবন মুতইম, আতা, সাঈদ ইবন মুসায়্যেব (র) থেকেও বর্ণিত আছে। (উয়ূনুল আসার ও যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৭)।

২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) বাদাউল ওহী, কিতাবুত তাবীর ও কিতাবুত তাফসীরে উল্লেখ করেছেন। حتى بلغ منى الجهد শীর্ষক বাক্যটি বাদ্উল ওহী অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয়বার বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিতাবুত তাফসীর ও কিতাবুত তাবীরে বাক্যটি তৃতীয়বারেও উল্লিখিত আছে।

اقراء অর্থাৎ লিখিত বক্তব্যটি পড় ন। আর এর জবাবে ما انا بقارى আমি পড়তে জানি না বলাটা প্রকাশ্য ও সমীচীন ছিল। যেমন কিছু কিছু বর্ণনায়[১] আছে যে, জিবরাঈল (আ) একটি লিখিত পুস্তিকা নিয়ে আসেন যা মণিমুক্তা সজ্জিত ছিল। ঐ পুস্তিকা নবী (সা)-এর হাতে দেন এবং বলেন, اقـراء অর্থাৎ এই লিখিত পুস্তিকাটি পাঠ করুন। জবাবে তিনি বললেন, ما انا بقارى অর্থাৎ আমি নিরক্ষর, এ লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে সক্ষম নই।

কতিপয় মুফাসসিরের বক্তব্য হলো, الم ذلك الكتاب لا ريب فيه-তে ঐ পুস্তিকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যা জিবরাঈল (আ) এনেছিলেন। আর যদি জিবরাঈল (আ) কোন লিখিত পুস্তিকা না এনে থাকেন এবং اقـراء দ্বারা ঐ লিখিত বস্তু পাঠের উদ্দেশ্য না হতো, এবং শুধু মুখে উচ্চারণ ও আবৃত্তি উদ্দেশ্য হতো, তা হলে এ অবস্থায় ما انا بقارى-এর এ অর্থ ছিল না যে, আমি নিরক্ষর নই, বরং এর অর্থ হবে, ওহীর ভীতি ও ব্যাপকতার কারণে আমি তা পড়তে পারছি না। রাজাধিরাজের বক্তব্য, ওহীর ঔজ্জ্বল্যের কারণে অন্তরে এমন ভীতি ও বিহ্বলতা বিস্তার করেছে যে, মুখ তা উচ্চারণে ব্যর্থ হচ্ছে। যেমন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি (সা) বলেছেন, كيف اقرا কেমন করে পড়ব? এরই ভিত্তিতে আমরা এ অনুবাদ করেছি, অর্থ আমি পড়তে জানি না, যা এ অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং পূর্বে কৃত অর্থের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। এ ব্যাখ্যাই শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) আশআসুল লুমুআত (২খ. পৃ. ৪০০), মাদারিজুন নুবূয়াত (১৭খ. পৃ. ৩৩)-এ এবং অনুরূপ শায়খ নূরুল হক দেহলবী কৃত বুখারী শরীফের ফারসী শরাহ তায়সীরুল কারী (১খ. পৃ. ৭) এবং শায়খুল ইসলাম দেহলবী কৃত ফারসী অনুবাদে প্রদত্ত হয়েছে।[২]

[নবী (সা) বলেন] ফিরিশতা এরপর তৃতীয়বার আমাকে বুকে কঠিনভাবে চেপে ধরলেন এবং ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন :

اِقْرَاْبِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ٥

"আপনি আপনার সৃষ্টিকর্তার নামে পড়ুন, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন রক্তপিণ্ড দ্বারা, আপনি পড় ন, আপনার প্রভু বড়ই মেহেরবান, যিনি কলম দ্বারা শিখিয়েছেন আর মানুষকে ঐ জ্ঞান শিখিয়েছেন যা সে জানতো না।"[৩] (সূরা আলাক : ১-৫)

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২১৮।

২. কতিপয় মুফাসসিরের এ বক্তব্য আশআসুল লুমুআতে নয়; বরং শরহে সীরাতে ইবন হিশাম-এ আছে।

৩. কিতাবুত তাফসীর ও কিতাবুত তাবীরে مـالم يعلم পর্যন্ত বর্ণিত আছে এবং বাদ্উল ওহীতে কেবল وربك الاكرم পর্যন্ত বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন।

এরপর তিনি গৃহে ফিরে আসেন। এ অবস্থায় যে, শংকায় তাঁর শরীর থর থর করে কাঁপছিল। এসেই তিনি হযরত খাদীজাকে বললেন, زملونى زملونى "আমাকে বস্ত্রাবৃত কর, আমাকে বস্ত্রাবৃত কর।" কিছুক্ষণ পর যখন তাঁর ভীতি ও বিমূঢ়তার ভাব কেটে গেল, তখন তিনি হযরত খাদীজার সামনে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার আশংকা হচ্ছে যে, আমার প্রাণ বায়ু বেরিয়ে না যায়! যেহেতু ওহীর অবতরণ এবং নূরান্বিত ফিরিশতার উজ্জ্বল প্রভা নবী (সা)-এর মানবীয় প্রকৃতির উপর প্রথম অবতরণের কারণে তাঁর অন্তরে ভীতি প্রবেশ করেছিল এ জন্যে যে, ওহীর আমানত ও প্রচণ্ডতা দ্বারা তাঁর এ ধারণা হয়েছিল যে, যদি ওহীর কাঠিন্য এমনটিই হয়, তা হলে আশ্চর্য নয় যে, আমার নশ্বর দেহ ওহীর ওজন এবং দায়িত্বভার বহন করতে পারবে না। অথবা নবূয়াতের দ্বারা পরাস্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কাজেই এ আয়াতে ঐ বোঝার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে : اِنَّا سَنُلْقِىْ عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيْلاً (হে মুহাম্মদ!) "আমি আপনার উপর এক কঠিন ও ভারী আয়াত নাযিল করব।" (সূরা মুযযাম্মিল : ৫)

আরোহী অবস্থায় যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হতো, তখন ওহীর ভারে উটনী বসে পড়তো। হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, একবার তাঁর উপর ওহী নাযিল হলো। এ সময় তাঁর শরীর আমার রানের ওপর ছিল। ঐ সময় তা আমার কাছে এতই ভারী মনে হলো যে, আমার রান ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। একটা সাধারণ বস্তু যদি প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে এসে যায়, তখন এতে মানুষ হয়রান হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে যদি একটা বিশাল ঘটনা সামনে এসে যায়, যা চিন্তা ও ধারণার ঊর্ধ্বে, এমন ঘটনা দ্বারা ঘাবড়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। মূসা (আ)-কে যখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে লাঠি বিষয়ক মু'জিযা দেয়া হয়েছিল এবং নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, হে মূসা ! তোমার লাঠি মাটিতে ফেলে দাও, তখন তিনি দেখলেন যে, সেটি সাপ হয়ে চলতে শুরু করেছে, তখন মূসা (আ) ভীত হয়ে এত দ্রুত পলায়ন শুরু করলেন যে, পিছনে ফিরেও দেখেন নি; তখনই আওয়াজ হলো : اَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ "অগ্রসর হও, এবং ভয় করো না, তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।" মূসা (আ)-এর এ ভীতি ও পলায়ন ছিল সম্পূর্ণ মানবিক প্রবৃত্তিজাত। কেননা خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا "মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সন্দেহ কিংবা দোদুল্যমানতা ছিল না। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা)-এর ভীতি এবং পেরেশানীও এরই ভিত্তিতে ছিল যে, এই প্রথমবারের মত তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছিল; কোন সন্দেহ কিংবা দোদুল্যমানতার কারণে ছিল না। গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, সন্দেহ সংশয়ে পড়বেন না, মানবীয় প্রকৃতির প্রথম ফেরেশতা দর্শনে প্রাবল্যের দরুন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া কোন আশ্চর্য কিছু নয়। যখন বার বার ফেরেশতার গমনাগমনের ফলে তাঁর মানবীয় প্রকৃতি অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল,

তখন এ ভীতিও ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছিল। অবশ্য নবূয়াতের ভার অর্পিত হওয়ার পর তিনি ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং এ সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন যে, আমাকে মেরে ফেলা হবে না তো ! আল্লাহর আশ্রয়, নবূয়াত ও রিসালতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল না। এটা ছিল এজন্যে যে, জিবরাঈল (আ)-এর অবতরণ ও নূরের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হওয়ার পর নবূয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল অসম্ভব। যেমনটি ইবন শিহাব যুহরীর একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমার বক্ষ বিদারণ করলেন এবং আমাকে একটি অতি উত্তম মসনদে বসালেন যা ছিল মণিমুক্তা খচিত।

ثم استعان له جبرئيل فبشره برسالته الله حتى اطمان النبى ﷺ ثم قال له اقراء فقال كيف اقراء فقال اقراء باسم ربك الذى خلق الى قوله مالم يعلم فقبل الرسول رسالة به وتنصرف فجعل لا يمر على شجر ولا حجر الاسلم عليه فرجع مسرورا الى اهله موقنا قد راى امرا عظيما الحديث

"আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) আবির্ভূত হলেন এবং নবূয়াতের সুসংবাদ দান করলেন, এমন কি তিনি এতে নিশ্চিত হলেন। এরপর বললেন, পড়। তিনি বললেন, কি করে পড়বো? জিবরাঈল (আ) বললেন, اقراء باسم তিনি আল্লাহর পয়গাম গ্রহণ করলেন এবং যখন ফিরে চলছিলেন, তখন পথিপার্শ্বের সমস্ত পাথর ও বৃক্ষরাজি বলতে লাগল, হে আল্লাহর নবী ! আপনার প্রতি সালাম। এভাবে তিনি আনন্দ ও স্বস্তির সাথে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আর তাঁর এ প্রত্যয় জন্মেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নবূয়াত ও রিসালতের ন্যায় বিরাট বস্তু দান করেছেন।"

এ বর্ণনা 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' মূসা ইবন উকবা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।[১] আর বর্ণনাটি 'উয়ূনুল আসার'-এ হাফিয আবুল বাশার দুলাবীর সনদে বর্ণিত আছে।

হাফিয আসকালানী বলেন, উবায়দ ইবন উমর থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) বলেন : জিবরাঈল এলেন এবং আমাকে একটি মসনদে বসালেন, যা মণি-মুক্তা খচিত ছিল। ইমাম যুহরী থেকে একটি মুরসাল বর্ণনায় রয়েছে, আমাকে এমন একটি মসনদে বসানো হয়েছিল যে, তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছিলাম।[২] মোট কথা, তিনি গৃহে ফিরে এলেন এবং হযরত খাদীজাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং বললেন যে, আমার জীবনের আশংকা করছি। হযরত খাদীজা বললেন, এটা আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি কখনই ভীত হবেন না।

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৩।

২ ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩।

আল্লাহর কসম! তিনি আপনাকে কখনই অপসন্দ করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেন, আপনার এ ঔদার্য খুবই যুক্তিযুক্ত, আপনি সর্বদা সত্য কথা বলেন, লোকদের বোঝা বহন করেন, অর্থাৎ অন্যের দায়িত্ব নিজের মাথায় বহন করেন। অনাথ-অসহায়ের খোঁজ-খবর নেন, আপনি আমানতদার, জনগণের আমানত রক্ষা করেন, মেহমানকে আহার্যদানের হক আদায় করেন, আপনি সত্যের পক্ষে সর্বদা রক্ষক ও সাহায্যকারী।

এটা বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা। ইবন জারীর-এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত খাদীজা এও বলেছেন যে, ما اتيت فاحشة قط অর্থাৎ আপনি অশ্লীলতার কাছেও কখনো যান নি।[১]

সার কথা এই যে, যে ব্যক্তি সুন্দর, পরিপূর্ণ এবং এমন প্রশংসিত ও পবিত্র আর এমন চরিত্র ও দৈহিক পূর্ণতার অধিকারী; এমন অর্থ এবং গুণাবলীর ভাণ্ডার ও খনি, তার অপদস্থতা অসম্ভব। এমন ব্যক্তি পৃথিবীতেও অপদস্থ হতে পারে না আর আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা যাঁকে এহেন সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দান করেছেন, তাঁকে সর্বপ্রকার বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদে রাখেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত খাদীজা তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে খাদীজার প্রাণ, আমি দৃঢ় আশা রাখি যে, আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।[২] বর্ণিত আছে যে,

واخبرها بما جاء به فقالت ابشر فوالله لا يفعل الله بك الا خيرا فاقبل الذى جاءك من الله فانه حق وابشر فانك رسول الله حقا

"তিনি সমুদয় ঘটনা হযরত খাদীজার নিকট বর্ণনা করলেন। হযরত খাদীজা বললেন, কল্যাণ হোক এবং আপনার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহর শপথ! তিনি আপনার জন্য কল্যাণই করবেন। যে সৌভাগ্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার নিকট এসেছে, তা গ্রহণ করুন, নিঃসন্দেহে তা সত্য। আবার বলছি, আপনার জন্য সুসংবাদ, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর সত্যিকারের রসূল।" (বায়হাকী, দালায়িলে আবূ মায়সারা থেকে মুরসালরূপে বর্ণিত)।[৩]

হাফিয আসকালানী এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, এ বর্ণনায় সরাসরি এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাই ঈমান আনয়ন করেন। এরপর হযরত খাদীজা একাকী তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নাওফলের নিকট গেলেন, যিনি তাওরাত ও ইঞ্জিলের বড় আলিম ছিলেন। তিনি সুরিয়ানী ভাষা থেকে আরবীতে ইঞ্জিল অনুবাদ করেছিলেন এবং জাহিলিয়াতের যুগে মূর্তি পূজায় বিতৃষ্ণ হয়ে খ্রিস্টধর্ম

---

১. তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ৮১।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৮১।

৩. ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৫।

গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি খুবই বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হযরত খাদীজা সমুদয় ঘটনা তাঁকে খুলে বললেন। শুনে ওরাকা বললেন :

لئن كنت صدقتنى انه لياتيه ناموس عيسى

"তুমি যদি সত্যি বলে থাক, তা হলে অবশ্যই তিনি নামূস[১] (ফেরেশতা) যিনি ঈসা (আ)-এর নিকট আসতেন।"

এই বর্ণনা 'দালাইলে আবূ নুয়াইম' গ্রন্থে 'হাসান' সনদে বর্ণিত হয়েছে।

এরপর হযরত খাদীজা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে নিয়ে ওরাকার নিকটে গেলেন এবং বললেন, ভাইজান ! আপনার ভাতিজার[২] অবস্থা তার মুখ থেকেই শুনুন। ওরাকা তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, ভাতিজা ! বল দেখি, তুমি কি দেখেছ ? হযরত (সা) সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওরাকা যখন তাঁর সমস্ত কথা শুনলেন, তাতে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, তিনি যা কিছু বলেছেন, সবই সত্য। ওরাকা তাঁর কথা বুঝতে পারলেন এবং তা সমর্থন করলেন (ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৭)।

ওরাকা তাঁর সকল অবস্থা শুনে বললেন, আগন্তুক হলেন ঐ নামূস (ফেরেশতা), যিনি মূসা (আ)-এর নিকট আসতেন। হায়, তোমার পয়গাম্বরীর সময় যদি আমি শক্তিমান থাকতাম এবং অন্ধ না হতাম ! যখন তোমার সম্প্রদায় তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে, কিংবা অন্তত জীবিতও যদি থাকতাম ! তিনি (সা) খুবই আশ্চর্য[৩]

---

১. ভাল সংবাদ আনয়নকারী ফিরিশতাকে 'নামূস' ও মন্দ খবর আনয়নকারীকে 'জাসূর' বলে। (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ২৪)।

২ এ অতিরিক্ত বর্ণনা এ জন্যে করা হয়েছে, যাতে বুখারী ও দালাইলে আবূ নুয়াইমের বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য না ঘটে।

৩. শ্রবণ, বিশ্বাস, জানার সবগুলোর কর্তা ছিলেন ওরাকা। কিন্তু আল্লামা শিবলী এগুলোর কর্তা হিসেবে মহানবী (সা)-কে বুঝে এভাবে অর্থ করেছেন যে, যখন তিনি ওরাকার কথা শুনলেন, এতে তাঁর সত্যের প্রতি বিশ্বাস জন্মালো এবং তিনি তা বুঝতে সক্ষম হলেন (সীরাতুন নবী, ১খ. পৃ. ১৮৯)। আল্লামা শিবলী বুঝেছেন যে, মহানবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে সন্দেহে ছিলেন, ওরাকার কথা শুনে তাঁর এ বিষয়ে প্রত্যয় জন্মালো। আল্লামা শিবলীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নবীজী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাত সম্পর্কীয় জ্ঞান ও বিশ্বাস পূর্বেই অর্জিত ছিল। যখন হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথম হেরা গুহায় প্রবেশ করেন, তখন প্রথমেই নবী (সা)-কে সালাম দেন। যেমনটি আবূ দাউদ তায়ালিসীর বর্ণনায় রয়েছে। (দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ২১১; ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩, তাবীর অধ্যায়)। এরপর জিবরাঈল তাঁকে আল্লাহর রাসূল হওয়ার সুসংবাদ দেন। এমন কি এতে তাঁর প্রত্যয় জন্মায়। এরপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে বলেন, اقرا এবং সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত তাঁকে পড়িয়ে দিলেন। এরপর যখন তিনি হেরা গুহা থেকে বের হলেন তখন পথিপার্শ্বের বৃক্ষ ও পাথর কর্তৃক তাঁকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ," আওয়াজ শুনতে পেতেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৪)। মোট কথা, ঐ সমস্ত বিষয় থেকে তাঁর নবূয়াতের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মেছিল। অবশ্য তাঁর মুখে এ ঘটনা শুনে ওরাকার মনে এ প্রত্যয় জন্মেছিল এবং তিনি চিনতে পেরেছিলেন যে, তিনিই সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। তাঁর নবূয়ত ও রিসালতের প্রতি ওরাকার প্রত্যয়নের বিষয়টি আল্লামা শিবলী ভুলক্রমে নবী (সা)-এর প্রতি আরোপ করে ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।

হয়ে বললেন, ওরা কি আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, কেবল তুমিই নও, এ পৃথিবীতে যিনিই আল্লাহর বাণী নিয়ে এসেছেন, মানুষ তাঁরই সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আমি ঐ পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই তোমাকে সাধ্যমত সাহায্য করবো। কিন্তু এরপর ওরাকা বেশিদিন বেঁচে ছিলেন না। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত আবূ মায়সারা বর্ণিত একটি মুরসাল হাদীসে আছে, ওরাকা বলেন :

ابشر فانا اشهد انك الذى بشربه ابن مريم وانك على مثل ناموس موسى وانك نبى مرسل وانك تومر بالجهاد

"আপনার জন্য সুসংবাদ, আপনি আল্লাহর নবী। যেমনটি নবী ছিলেন ঈসা ইবন মরিয়ম (আ), যাঁকে এ সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া আপনি মূসা (আ)-এর অনুরূপ প্রেরিত নবী। অচিরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে জিহাদের হুকুম দেয়া হবে।"[১]

যেহেতু তিনিও মূসা (আ)-এর ন্যায় জিহাদের নবী, আর মূসা (আ)-এর শরীয়তের মতই তাঁর শরীআতে হদ, জিহাদ ও কিসাসের বিধান রয়েছে, হালাল-হারামের বিধান এতে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিদ্যমান,সেহেতু ওরাকা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে বলেছেন, তিনিই নামূস (ফেরেশতা) যিনি মূসা (আ)-এর নিকট অবতীর্ণ হতেন। হযরত খাদীজা (রা) প্রথমবার একাকী ওরাকার সাথে সাক্ষাতের সময় ওরাকা খ্রিস্টান হওয়ার কারণে ঐ ফিরিশতাকে ঈসা (আ)-এর নামূস (ফিরিশতা)-এর সাথে সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনায় আছে, নবী (সা) প্রত্যাবর্তনকালে ওরাকা তাঁর মস্তকে চুম্বন করেন।[২] তিনি গৃহে ফিরে এলেন এবং কয়েকদিন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল বন্ধ রাখা হয়[৩] যাতে তাঁর ভীতি ও কষ্ট দূর হয়ে যায় এবং পরবর্তী ওহী আগমনের উৎসাহ ও অপেক্ষা করার আগ্রহ তাঁর অন্তরে জাগ্রত হয়।

دیرست که دلدار پیامی نفرستاد   نتوشت سلامے وکلامے نفرستاد

"বহুদিন হলো বন্ধু কোন বার্তা পাঠাচ্ছে না, না বার্তা, আর না সালাম-কালাম।"

ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুন হযরত (সা) এতটা চিন্তিত ও ব্যথাতুর হয়ে পড়লেন যে, তিনি বার বার পাহাড় চূড়ায় উঠতেন এবং নিজকে সেখান থেকে ফেলে দেয়ার চিন্তা করতেন।

هر دل سالك هزاران غم بود   گرزباغ دل خلافے کم بود

هجرسے بره کر مصیبت کچه نهین   اس سے بهترهے که مر جاؤن کهین

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৪৫৪; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৮৪।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৮৭।

৩. ওহী বন্ধ হওয়া অর্থ কয়েকদিনের জন্য কুরআন করীম নাযিল বন্ধ হয়ে যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর আগমন বন্ধ হয়ে যায়; বরং তাঁর গমনাগমন সর্বদা অব্যাহত ছিল। (উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৩)।

"প্রত্যেক সাধকের অন্তরে হাজারো চিন্তা-ভাবনা থাকে, নিশ্চিন্ত জীবন কমই আছে। বিরহ অপেক্ষা বড় মুসীবত কিছুই নেই, কোনভাবে মরে যাওয়াও যেন এর চেয়ে উত্তম।"

কিন্তু তিনি যখনই এরূপ চিন্তা করতেন তখনই জিবরাঈল (আ) দৃশ্যমান হতেন এবং বলতেন ঃ يا محمد انك رسول الله حقا "হে মুহাম্মদ! সত্যিই আপনি আল্লাহর রাসূল।" এ কথা শুনে তাঁর অন্তরে স্বস্তি ফিরে আসতো।[১]

একবার হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা)-কে বললেন, আবার যখন ঐ নামূস আসবেন, সম্ভব হলে আমাকে অবশ্যই খবর দেবেন। কাজেই এরপর যখন হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে এলেন, তিনি ওয়াদা মুতাবিক হযরত খাদীজা (রা)-কে খবর দিলেন। খাদীজা (রা) নবীজী (সা)-কে বললেন, আপনি আমার আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন। এমতাবস্থায় হযরত খাদীজা মাথার কাপড় খুলে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন, এখনও কি আপনি ফিরিশতাকে দেখতে পাচ্ছেন? নবী (সা) বললেন, না। তখন খাদীজা (রা) বললেন, আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহর শপথ, তিনি ফেরেশতা, শয়তান নয়। এ বর্ণনা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইসমাঈল ইবন হাকিম থেকে 'মুরসাল' সনদে রিওয়ায়াত করেন। সীরাতে ইবন হিশামের[২] অপর এক বর্ণনায় আছে, খাদীজা বললেন, আপনার জন্য সুসংবাদ, তিনি অবশ্যই ফেরেশতা, শয়তান হলে (আমার ঘোমটা খুলে ফেলাতে) লজ্জাবোধ করতো না। আবূ নুয়াইম হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে দুর্বল সনদে 'দালাইলে' বর্ণনা করেছেন।[৩]

সার সংক্ষেপ

সার কথা এই যে, হযরত খাদীজার এ প্রমাণ উপস্থাপন ছিল যৌক্তিক। কারণ, নবী করীম (সা)-এর ন্যায় এমন সুন্দর চরিত্র ও পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী অনুপম ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য কেবল নবূয়াত ও রিসালাতের জন্যই প্রযোজ্য। আর ওরাকার যুক্তি ছিল উদ্ধৃতিগত যে, তিনিই সেই নবী ও রাসূল, যাঁর সুসংবাদ হযরত মসীহ ইবন মরিয়ম (আ) প্রদান করেছিলেন। সুলায়মান তায়মী এবং মূসা ইবন উকবা তাঁদের কিতাবুল মাগাযীতে উল্লেখ করেন, হযরত খাদীজা ওরাকার পূর্বে আদ্দাস[৪] -এর নিকট যান এবং জিবরাঈল (আ)-এর আগমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। আদ্দাস জিবরাঈলের

---

১. ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৭; যারকানী, ১খ. পৃ. ২১৬।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৯৫।

৩. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৮১।

৪. আদ্দাস (রা) উতবা ইবন রবীয়ার গোলাম ছিলেন। তিনি ছিলেন নিনুয়া নগরের অধিবাসী, যেখানে হযরত ইউনুস (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রিস্টান ছিলেন এবং পরে ইসলাম কবূল করেন। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৬৬)।

নাম শুনতেই বললেন, কুদ্দুস, কুদ্দুস, অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ! মূর্তিপূজায় কলুষিত এ যমীনে জিবরাঈল কিভাবে আসবেন ? তিনি তো আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত বান্দা, আল্লাহ ও তাঁর পয়গাম্বরদের মধ্যে ভ্রমণকারী এবং হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-এর বন্ধু। এরপর খাদীজা ওরাকার নিকটে যান।[১]

কিছু কিছু সীরাত গ্রন্থে আছে, হযরত খাদীজা বহিরা দরবেশের নিকটও গিয়েছিলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বহীরার জবাবও প্রায় তাই ছিল যে জবাব আদ্দাস দিয়েছিলেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাদীজা একবার নবী (সা)-কে আরয করলেন, ওরাকা আপনার নবুয়াত ও রিসালাত প্রত্যায়ন করেছেন, কিন্তু দীনের প্রকাশ্য দাওয়াতের পূর্বেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি (সা) ইরশাদ করেন, আমি ওরাকাকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তিনি সাদা পোশাক পরিহিত আছেন। যদি দোযখের অধিবাসী হতেন, তবে অন্য কোন রঙের পোশাক পরিহিত থাকতেন। ফাতহুল বারীর সূরা আলাকের তাফসীরে, মুসনাদে বাযযারে এবং মুসনাদে হাকিমে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ওরাকাকে মন্দ বলো না। তার জন্যে আমি বেহেশতে একটি অথবা দু'টি বাগান দেখেছি।"[২]

বড় কাজের কথা

মহানবী (সা)-কে নিয়ে হযরত খাদীজার কখনো ওরাকার নিকট গমন, কখনো তাঁকে আদ্দাসের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং ঘটনা খুলে বলাটা কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের কারণে বা প্রত্যয় জন্মানোর জন্য ছিল না, বরং রাসূল (সা)-কে সান্ত্বনা দান ও তাঁর উদ্বেগ প্রশমনই ছিল উদ্দেশ্য। ওহী নাযিলের কারণে রাসূল (সা)-এর উপর ক্লেশ ও উৎকণ্ঠা বিদ্যমান ছিল, যা থেকে তিনি স্বস্তি লাভ করতে পারেন। কেননা হযরত খাদীজা (রা) হযরত নবী করীম (সা)-কে যে বিবাহ করেছিলেন, তা তাঁর অদৃশ্য কারামত ও বৈশিষ্ট্য দেখে এ উদ্দেশ্যেই করেছিলেন, যে শেষনবীর সুসংবাদ তিনি তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নওফল থেকে বার বার শুনে আসছিলেন, এর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি তিনিই হবেন। কাজেই যখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয় এবং হেরা গুহা থেকে ফিরে এসে তিনি খাদীজাতুল কুবরাকে তা বললেন, তা শোনার সাথে সাথেই খাদীজার অন্তরে তাঁর নবুয়াতের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আনন্দের প্রকাশ ঘটানো এবং ভালবাসার প্রেরণায় অতিরিক্ত নিশ্চয়তার জন্য কখনো ওরাকার নিকট, কখনো আদ্দাসের নিকট তাঁকে নিয়ে যান, তিনি যে উদ্দেশ্যে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, তা সফল হয়েছে। খাদীজা কেবল নবী (সা)-এর পেরেশানী দেখে দুঃখিত ছিলেন। অন্যথায় অন্তরে অফুরন্ত খুশিতে ভরপুর ছিলেন। আর রাসূল (সা)-এর উদ্দেশ্যও ছিল কেবল

---

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৫৫৪।

২ উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৫।

সান্ত্বনা ও উদ্বেগ প্রশমন। আল্লাহ্ না করুন, রাসূল (সা)-এর স্বীয় নবূয়াত ও রিসালাতের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ও ছিল না। আর জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষ্য এবং দৃশ্য ও অদৃশ্য ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার পর, এ ব্যাপারে দ্বিধা-সন্দেহ হওয়াটাও অসম্ভব ও অগ্রহণযোগ্য।

এর কারণ এটাই ছিল যে, ওরাকা যদিও আলিম ছিলেন; কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রকৃতিজান্তা ছিলেন না। নবী (সা)-এর অন্তরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, এর প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃত স্বাদ এবং সে স্বাদের বৈশিষ্ট্য নবী করীম (সা)-এরই কেবল জানা ছিল। এটা উপভোগের পর্যায়ে অনুধাবন করতে ওরাকা ছিলেন অক্ষম, স্বাদ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অনবহিত; কেবল জ্ঞানগত পর্যায়েই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, নবী (আ)-গণের উপর ওহী নাযিলের সময় এরূপই হয়ে থাকে। এজন্যে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। আর এ অবস্থায় কেবল তিনিই সান্ত্বনা দিতে পারেন। যার এ অবস্থা সৃষ্টি হয়নি, বরং কিছুটা ভাসা ভাসাভাবে যিনি এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা কিছু জানেন, যেমন ডাক্তার রোগীকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকে। অন্যথায় যার উপর এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তিনি নিজেই ভীত ও দিশেহারা হয়ে পড়বেন, তার নিজের খবরই থাকবে না, তিনি আবার অন্যকে কি সান্ত্বনা দেবেন ? আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা আবশ্যিক নয় যে, সান্ত্বনাদানকারী অবস্থার শিকার ব্যক্তি থেকে উত্তম এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান হবেন।

নবূয়াত লাভের তারিখ

সমস্ত মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবিদ একমত যে, নবূয়াতের এ মর্যাদা তাঁকে সোমবার দিনেই দান করা হয়। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, তিনি কোন্ মাসে নবূয়াত লাভ করেন। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে এ মর্যাদা লাভ করেন। এ প্রেক্ষিতে যে, ঐ তারিখে তাঁর বয়স পূর্ণ চল্লিশ বছর হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন যে, ১৭ই রমযান তিনি নবূয়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

واتت عليه اربعون فاشرقت شمس النبوة منه فى رمضان

এ প্রেক্ষিতে নবূয়াত লাভের সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর ছয় মাস ছিল। হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে এ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্যে যে, হেরা গুহায় তিনি রমযান মাসেই ই'তিকাফ করতেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ২০৭; ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ৩১৩; কিতাবুত তাবীর, ৮খ. পৃ. ৫৫১; কিতাবুত তাফসীর, ১খ. পৃ. ২৬ দ্র.)।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব

১. নবূয়াত ও রিসালাতের মর্যাদাদানের জন্য চল্লিশ বছর বয়সকে এজন্যে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তি চল্লিশ বছর বয়সেই

চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً "এমনকি যখন সে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং যখন পৌঁছে চল্লিশ বছর বয়সে।"

কাজেই মানুষের উপযুক্ত বয়স তো চল্লিশ বছরই। এরপর পতন আর ভাটার সময়। একইভাবে যখন শারীরিক ও আত্মিক শক্তি চূড়ান্ত পূর্ণতায় উপনীত হয় এবং আল্লাহর নূরের দীপ্তি ও পূত-পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার যোগ্যতা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁকে নবূয়ত ও রিসালাতের মর্যাদা অর্পণ করেন। وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ "আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা : ১০৫)

২. ইমাম শা'বীর একটি মুরসাল রিওয়ায়াত, যা ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল স্বীয় তারিখে উল্লেখ করেছেন, তা হলো, নবূয়াতপ্রাপ্তির পর কিছুদিন হযরত ইসরাফিল (আ) নবী (সা)-এর সাহচর্যদান ও সহায়তার জন্য আদিষ্ট হন। অধিকন্তু, তিনি তাঁকে আদব ও সৌজন্যবোধ শিক্ষা দেন। তবে তাঁর মাধ্যমে কোন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়নি। এ রিওয়ায়াতটি সনদের দিক থেকে সহীহ।[১]

ইসরাফিল (আ)-এর সাহচর্যদান ও সহায়তা এ কথার ইঙ্গিতবাহী ছিল যে, এ নবীই শেষ নবী, তাঁর পর কেবল কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করা কর্তব্য হবে। এটা এ জন্যে যে, ইসরাফিল (আ)-ই কিয়ামতের প্রাক্কালে শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে আদিষ্ট হয়েছেন। তাঁরই শিঙ্গায় ফুৎকারে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আল্লামা সুয়ূতী কতিপয় আলিম থেকে তাঁর 'ইতকানে' এ কথা উল্লেখ করেছেন।

৩. হাদীসের বাক্য ثم حبب اليه الخلاء "অতঃপর একাকীত্ব তাঁর নিকট প্রিয়তর করে তোলা হয়।" এখানে مجهول তথা কর্মবাচ্যের শব্দ ব্যবহার করার উদ্দেশ্য ঐ দিকে ইঙ্গিত করা যে, একাকী থাকার এ অভ্যাস তাঁর মধ্যে আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং কোন প্রয়োগকারী এটা তাঁর প্রতি প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎ এটা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। নির্জনতা প্রিয়তা তাঁর অন্তরে এ জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, নিঃসঙ্গতা (খালাওয়াত ও আয্লাত) হচ্ছে সৃষ্টি থেকে দূরে থাকা ও একাকীত্ব সকল উপাসনার মূল, বরং এটা একটা পৃথক ইবাদত। যদি একাকীত্বের সাথে যিকর ও ফিকির-এর ন্যায় ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তো সুবহানাল্লাহ তা নূরের উপর নূর।

৪. এ হাদীসে ঐদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীর জন্য একাকীত্ব ও সৃষ্টি থেকে দূরে থাকাটাই উপযুক্ত। গৃহে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে থেকে উত্তমরূপে ইবাদত করা যায় না। শিক্ষা সমাপনকারীর বিশেষ নির্জনতা আবশ্যকীয় নয়; এজন্যে

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৩৬।

যে, পরিপূর্ণ ও বিদ্বান ব্যক্তির জন্য আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্য আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয় না। যেমনটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন : رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاَقَامِ الصَّلٰوةِ "সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখে না...." (সূরা নূর : ৩৭)

ازدرون شو اشناؤ از برون بیگانہ باش

این چنین زیبا روش کم می بود اندر جهان

"অভ্যন্তর সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানী হও, বাহির সম্পর্কে হও অজ্ঞ, পৃথিবীতে এ ধরনের রূপাচারী কমই হয়ে থাকে।"

কিন্তু শিক্ষা সমাপনকারীর জন্যও এতটুকু একাকীত্ব জরুরী যে, দিনের কোন না কোন সময় একাকীত্বের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া। যেমনটি আল্লাহ তা'আলার বাণী فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ "অতএব যখনই অবসর পাও সাধনায় লিপ্ত হও এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ কর।" (সূরা ইনশিরাহ : ৮)

৫. হেরা গুহায় গমনকালে তাঁর পাথেয় নিয়ে যাওয়া এ কথারই প্রমাণ যে, পানাহারের ব্যবস্থা করা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়; বরং এটা আল্লাহর রিযিকের প্রতি নিজের দারিদ্র্য, অক্ষমতা এবং ক্ষুধা ও অভাব-অনটন-জনিত মুখাপেক্ষিতারই বহিঃপ্রকাশ, যা ইবাদতের প্রাণ স্বরূপ।

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস : ২৪)

والفقرلی وصف ذات لازم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتی

"দারিদ্র্য এবং প্রয়োজন আমার মূল বৈশিষ্ট্য; আমার সত্তা ও প্রকৃতির জন্য আবশ্যিক, কখনো তা পৃথক হবার নয়। যেমন প্রাচুর্য ও মুখাপেক্ষিহীনতা আল্লাহর সত্তাগত গুণ। কাজেই আল্লাহর জন্য যেমন প্রাচুর্য ও মুখাপেক্ষিহীনতা মহাগুণ, তেমনি বান্দার জন্য দারিদ্র্য ও অভাব সত্তাগত আবশ্যিক।"

কবিতাটি হাফিয ইবন তাইমিয়ার। তিনি এ কবিতাটি বেশি বেশি আবৃত্তি করতেন। পূর্ণ কবিতাটি 'মাদারিজুস সালিকীনে' বর্ণিত আছে। একই বক্তব্য এ গুনাহগার (লেখক) নিম্নোক্ত কবিতায় উল্লেখ করেছি ঃ

توغنی مطلقی ائ ذوالجلال من فقیر مطلقم بے قیل وقال

تو کریمی من گدائے مطلقم تو عزیزی من ذلیل مطلقم

ذات پاکت منبع جود و نوال ماز سرتا پاشده نقش سوال

"আমার কাছে তুমিই পরিপূর্ণ হে সর্ব শক্তিমান. আমি অন্তহীন দরিদ্র, নাই কোন উচ্চবাচ্য, তুমি দয়ালু আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব, তুমি সম্মানী আমি পুরোপুরি অধম, তোমার সত্তা দয়া আর দানের উৎস, আর আমি তো হলাম পুরোপুরি সওয়ালের প্রতিভূ।"

হযরত মূসা (আ) মাদাইনে পৌঁছার পর যখন ক্ষুধার উদ্রেক হলো, তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নিজের দারিদ্র ও ক্ষুধাকে এভাবে পেশ করেছিলেন

رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

"হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস : ২৪)

আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকের দিকে নিজের দারিদ্র ও মুখাপেক্ষিতাকে সম্পৃক্ত রাখা ইবাদতের সার কথা এবং নবী (আ)-গণের সুন্নত। আর পাথেয় সঙ্গে না নেয়া নেপথ্যে তাওয়াক্কুলের দাবি করা। কাজেই কিছু কিছু সৎ ব্যক্তির অভ্যাস ছিল যে, একাধারে কয়েকদিন রোযা রাখতেন কিন্তু বালিশের নিচে একটি রুটি অবশ্যই রেখে দিতেন। একদিন এক ভক্ত তার মুর্শিদের বালিশের নিচ থেকে রুটিটি সরিয়ে নিল। শায়খ যখন দেখলেন যে, রুটিটি নেই, এতে তিনি অনুসারীদের প্রতি খুবই নাখোশ হন এবং কঠোর তিরস্কার করেন। ভক্তবৃন্দ বলল, হযরতের এটার কী প্রয়োজন ? শায়খ বললেন, তোমরা ভাবছো যে, আমি যেহেতু একাধিক্রমে রোযা রাখতে সক্ষম, কাজেই রুটি রাখার কোন প্রয়োজন নেই! তোমাদের এ ধারণা ভুল। আমি আমার শক্তির উপর নির্ভর করে রোযা রাখি না; বরং মহামহিম আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের উপর ভরসা করি এবং সব সময় নিজের দুর্বলতা ও অসহায়ত্বকে ভয় করে চলি, না জানি কোন্ সময় আমার এ সামর্থ্য ও আত্মনির্ভরতা থামিয়ে দেয়া হয় এবং মানবীয় ও দৈহিক প্রবৃত্তির প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তখন তো ঐ رزاق ذو القوة المتين (মহান রিযিকদাতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) তখন শুকনা রুটিরই মুখাপেক্ষী হতে হবে। বান্দা নিজ সত্তা থেকে এক লহমার জন্যও আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে অনির্ভরশীল হতে পারে না। আত্মার প্রশান্তির জন্যই সব সময় সঙ্গে রুটি রাখি, আত্মার প্রতি যাতে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপিত না হয়। 'সালেক' তথা সাধকের জন্য আত্মার চাহিদায় প্রেক্ষিতে রিযিককে রিযিক মনে করে, বরং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিকে তৃপ্ত হওয়া ও নির্ভর করা উত্তম।

৬. হেরা গুহায় নির্জনবাস ও সৃষ্টজীব থেকে দূরে থাকাকালীন তাঁর অভ্যাস ছিল, কখনো কখনো তিনি গৃহে আগমন করতেন এবং কয়েক দিনের রসদ সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতেন। এটা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নির্জনবাসে অবস্থানকারীর জন্য লোকসমাজ থেকে একেবারেই সম্পর্কচ্ছেদ করা সমীচীন নয়, গৃহবাসী ও প্রতিবেশীর হক আদায় করাও আবশ্যক। এ কারণে তিনি ইরশাদ করেন : لا رهبانية فى الاسلام "ইসলামে বৈরাগ্য নেই।"

অভ্যন্তরীণ রোগ চিকিৎসার জন্য এবং ইবাদতে দৃঢ়তা ও মযবুতি আনয়নের লক্ষ্যে যদি কোন গুহা কিংবা পাহাড়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্জনবাস (যেমনটি সূফীগণের নিয়ম) করা হয়, তবে এটা সুন্নত, বিদ'আত নয়।

৭. আর এটি এদিকেও ইঙ্গিত করে যে, যে ব্যক্তি গুহা কিংবা পাহাড়ে নির্জন বাসের ইচ্ছা করে, তবে তার নির্জনবাসের ঠিকানা গৃহবাসীদের জানানো উচিত। যাতে করে তাদের কোন প্রকার দুশ্চিন্তা না হয়, তার প্রতি তাদের অন্তরে কোন কু ধারণার সৃষ্টি না হয়, প্রয়োজনের সময় খোঁজ-খবর নিতে পারে, অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা-শুশ্রূষা করতে পারে, ইত্যাদি।

৮. জিবরাঈল (আ) কর্তৃক তাঁকে তিনবার চাপ দেয়া ছিল ফিরিশতাসুলভ ও আত্মিক ফয়েয দানের উদ্দেশে, যাতে জিবরাঈল (আ)-এর আধ্যাত্মিক ও ফেরেশতাসুলভ ক্ষমতা তাঁর মানব প্রবৃত্তির উপর বিজয়ী হয় এবং তাঁর পবিত্র অন্তর আল্লাহর বাণী, অদৃশ্যের গোপন রহস্য এবং প্রভুর জ্ঞান বহন করতে পারে। আর তাঁর সত্তা বরকতের সাথে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মাধ্যম এবং দৃশ্যমান জগতের সমাপ্তি ও অদৃশ্য জগতের সূচনা হতে পারেন। সম্মানিত 'আরিফ'গণের এভাবে কাউকে ফয়েয পৌঁছানো বর্ণনা পরম্পরায় প্রমাণিত। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী করীম (সা) আমাকে নিজ বক্ষে চেপে ধরলেন এবং এ দু'আ করলেন : اللهم علمه الكتاب "হে আল্লাহ ! একে আপনার কিতাবের জ্ঞান দান করুন।" (বুখারী শরীফ)

নবী করীম (সা) কর্তৃক হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে বুকে চেপে ধরা তেমনই ছিল, যেমন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বুকে চেপে ধরেছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সময় সময় আপনার নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করি এবং ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর বিছাও। আমি চাদর বিছালাম, তিনি হাত দিয়ে কিছু ইশারা করলেন যেমন কেউ দু' হাত ভর্তি করে কিছু দেয়। এরপর বললেন যে, এখন এ চাদর তোমার বুকের সাথে লাগাও। আমি ঐ চাদর আপন বুকের সাথে লাগালাম। অতঃপর আমি আর কোন হাদীস ভুলিনি। (সহীহ বুখারী, ১খ. পৃ.২২)।

হাফিয আসকালানী 'ফাতহুল বারী'তে বলেন, কোন হাদীসে এ ব্যাখ্যা নেই যে, তিনি দু' হাত ভর্তি করে হযরত আবূ হুরায়রার চাদরে কি দিয়েছিলেন। কিন্তু এই অধম বান্দা (লিখক) বলছে, অবশ্য যদি তা পুণ্যের হয় তবে তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে, আর যদি (দু'হাত ভর্তির কথাটা) ভুলবশত হয়ে থাকে, তবে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আমার ধারণা এই যে, অদৃশ্য জগতে যে হিফযের ভাণ্ডার রয়েছে, রাসূল (সা) ঐ হিফযের ভাণ্ডার থেকে দু' হাত ভর্তি করে নিয়ে আবূ হুরায়রার চাদরে ঢেলে দেন। আর পরে ঐ চাদর থেকে তা আবূ হুরায়রার বক্ষে পৌঁছে। হিফয যদিও দৃশ্যমান জগতবাসীর কাছে অনুভবযোগ্য, কিন্তু অদৃশ্য জগতের দূরদর্শী

বাসিন্দাদের দৃষ্টিতে গোপন ও অদৃশ্য নয়। এ ধরনের বাক্য ঐসব লোকই অস্বীকার করে যারা মহান নবী (আ)-গণের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ধরন সম্পর্কে অজ্ঞ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুখস্থ শক্তির আরো অনেক ঘটনা আছে, যা এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। (বিজ্ঞ পাঠক ফাতহুল বারী, হিফযুল ইলম অধ্যায়, ১খ. পৃ. ১৯২-এ দেখুন।)

৯. আল্লামা তীবী তাইয়্যাবাল্লাহু সারাহু শরহে মিশকাতে লিখেছেন, সূরা আলাক-এর নাযিল হওয়া আয়াতে নবী (সা)-এর সন্দেহ যে, ما انا بقارئ "আমি পড়তে জানি না", এর জবাবে বলছে যে, অবশ্যই আপনি পড়তে জানেন না, কিন্তু স্বীয় প্রভুর পবিত্র নামের বরকতে ও সহযোগিতায় পড়ুন, সব সহজ হয়ে যাবে। আর বুঝুন যে, আল্লাহ তা'আলা কাউকে কিতাব এবং কলমের মাধ্যমে জ্ঞান দান করেন, যাকে পরিভাষাগত অর্থে কিতাবী জ্ঞান বলা হয় عَلَّمَ الاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ "তিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষাদান করেন" আয়াত দ্বারা এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার কাউকে সরাসরি কোন বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই জ্ঞান দান করেন যাকে পরিভাষাগত অর্থে 'ইলমে লাদুন্নী' বলা হয়। আর আয়াত এ এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপ জবাব এটাই যে, তিনি (সা) যদিও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কুদরত খুবই প্রশস্ত। প্রকাশ্য উপকরণ ছাড়া এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি যাকে ইচ্ছা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দানে ধন্য করেন। একইভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জানিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আর আপনার উপর তা ছিল বিরাট অনুগ্রহ।" (সূরা নিসা : ১১৩)

১০. হযরত খাদীজা (রা)-এর সান্ত্বনাপ্রদ জবাব দ্বারা সহমর্মিতা, অতিথি আপ্যায়ন, দানশীলতা ও পরোপকারিতার দরুন পৃথিবীতেও মানুষ বিপদ-মুসীবত থেকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত থাকে।[১]

১১. হযরত খাদীজা (রা) কর্তৃক নবী (সা)-এর গুণপনা ও পরিপূর্ণতার উল্লেখ এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, কারো বাস্তব স্বয়ংকৃত সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে তার সামনে বর্ণনা করা, যদি তাতে অহমিকা ও আত্মপ্রশ্বস্তিতে পরিণত হওয়ার আশংকা না থাকে, তবে তা কেবল জায়েযই নয়, বরং উত্তম।[২]

১২. নবী করীম (সা) কর্তৃক এ ঘটনাটি সর্ব প্রথম হযরত খাদীজাকে বলা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মানুষের জীবনে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়, তখন যদি তার স্ত্রী পরহেযগার ও সমঝদার হয়, তবে সর্ব প্রথম তারই নিকট বলা উচিত, এরপর জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবানদের নিকট বর্ণনা করা যেতে পারে।

---

১. উমদাতুল কারী, ১খ. পৃ. ৭৫।

২ প্রাগুক্ত।

১৩. হযরত খাদীজা (রা) এ কথা শুনে নবী (সা) কে ওরাকা ইবন নওফলের নিকট নিয়ে যাওয়া, যিনি তৎকালে সর্বাপেক্ষা বড় আলিম ছিলেন, এটাই প্রমাণ করে যে, কোন বিরল ঘটনা যখন ঘটে যায়, তখন তা আল্লাহওয়ালা আলিমের নিকট উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

১৪. অধিকন্তু, কারো মধ্যস্থতায় জ্ঞানী ব্যক্তির খেদমতে উপস্থিত হওয়া অধিক উত্তম। যেমন নবী করীম (সা) হযরত খাদীজার মাধ্যমে ওরাকা ইবন নওফলের সাথে সাক্ষাত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী ওরাকার নিকট গমন করেন নি; বরং হযরত খাদীজাকে সঙ্গে নেন যার সাথে ওরাকার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। এতে জানা গেল যে, আলিম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যদি কোন পথ-প্রদর্শক সাথে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তা হবে উপযুক্ত কাজ, যাতে করে কথোপকথন সহজতর হয়।

১৫. যে ব্যক্তি বয়সে নিজের চেয়ে বড়, তাকে শ্রদ্ধা, ইযযত-সম্মান করা খুবই জরুরী; যদিও অল্প বয়সী ব্যক্তি জ্ঞান, মর্যাদা, সম্মান ও পরিপূর্ণতায় সমস্ত আলিম সমাজ থেকে উন্নত ও উচ্চতর হয়।

১৬. ছোট যদিও মর্যাদার দিক থেকে বড় হয়, তবুও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য ছোটদেরকে সম্বোধনকালে ঐরূপ বাক্য ব্যবহার করা বৈধ যা বয়সে ছোটদের জন্য সাধারণত ব্যবহার করা হয়। যেমন হযরতকে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার পরেও ওরাকা يَا ابْنَ اَخِىْ "হে ভ্রাতুষ্পুত্র !" বলে সম্বোধন করেছেন। অধিকন্তু, এটাও জানা গেল যে, ছোটরা যখন বড়দের মজলিসে উপস্থিত হয়, তখন বড়র প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ মুরব্বী কথা না বলবেন, ছোট ততক্ষণ পর্যন্ত বক্তব্য শুরু করবে না। কাজেই হযরত খাদীজা যখন তাঁকে ওরাকার নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললেন : يا ابن عم اسمع من ابن اخيك "ওহে চাচাত ভাই, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট কিছু শুনুন।" তখনও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। যখন ওরাকা স্বয়ং কথা শুরু করলেন এবং বললেন : يا ابن اخى ماذا ترى "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কি দেখেছ ?" তখন তিনি ঘটনার বিশদ বর্ণনা দিলেন।[১]

১৮. ওরাকার কথার জবাবে তাঁর এ কথা বলা : او مخرجى هم "কী, ওরা আমাকে (মক্কা থেকে) বের করে দেবে ?" বাক্য থেকে এটা জানা গেল যে, মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্নতা নবী (আ) গণের জন্যেও কষ্টদায়ক।[২]

১৯. অধিকন্তু, ঐ সময় ওরাকার বক্তব্য, হায় ! যদি আমি ঐ সময় শক্তিমান ও যুবক থাকতাম; যখন আপনার সম্প্রদায় আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। এটা প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য কোন উত্তম কামনা করা বৈধ, যদিও সে উত্তম কর্ম অর্জনের অবকাশ না থাকে।[৩]

---

১. বাহজাতুন নুফূস, ১খ. পৃ. ২০।

২ রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৫৮।

৩. বাহজাতুন নুফূস, ১খ. পৃ. ২১।

২০. ইমাম মালিক (র)-কে কোন ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, মানুষের নাম জিবরাঈল রাখা কিরূপ? তিনি এটা পসন্দ করেননি।[১]

তাওহীদ ও রিসালতের পর সবচে' প্রথম ফরয

তাওহীদ ও রিসালতের শিক্ষাদানের পর মহানবী (সা)-কে যে বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়, তা ছিল উযূ ও নামায। প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ) পায়ের গোড়ালী দ্বারা মাটিতে আঘাত করলে একটি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। এতে জিবরাঈল (আ) প্রথমে উযূ করেন এবং নবী করীম (সা) দেখতে থাকেন। এরপর তিনিও একইভাবে উযূ করেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) দু' রাক'আত নামায পড়ান এবং নবী (সা) তাঁর ইকতিদা করেন। উযূ ও নামায শেষে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হযরত খাদীজা (রা)-কে উযূ ও নামায শিক্ষা দেন। এ বর্ণনা 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' (১খ. পৃ. ৭০) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। হাফিয আসকালানী হাদীসটির সনদ 'যঈফ' বলেছেন।[২]

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) স্বীয় পিতা হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেন, নবূয়াতের প্রাথমিককালে ওহী নাযিলের সময় জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসেন এবং আমাকে উযূ ও নামায শিক্ষা দেন। এ রিওয়ায়াত 'মুসনাদে আহমদ', 'সুনানে দারা কুতনী' এবং 'মুস্তাদরাকে হাকিমে' বর্ণিত আছে। আল্লামা আযিযী শরহে 'জামে সগীরে' এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন, শায়খ বলেছেন, হাদীসটি 'সহীহ'।

(সিরাজুম মুনীর, ১খ. পৃ. ২৯)

আর হাদীসটি সুনানে ইবন মাজাহতেও উল্লেখ আছে। আল্লামা সুহায়লীও নিজ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উভয়ের সনদেই ইবন লাহিয়া নামে একজন রাবী আছেন, যার সম্বন্ধে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। হাফিয ইবন সাইয়্যেদুন নাস (কু. আ.) বলেন, যেভাবে এ হাদীস হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, একইভাবে হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবন আব্বাসের হাদীসে আছে, 'এটা ছিল প্রথম ফরয।' (উয়ূনুল আসার, পৃ. ৯১)

আল্লামা সুহায়লী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, কাজেই উযূ ফরয হওয়ার দিক থেকে মক্কী আর তিলাওয়াতের দিক থেকে মাদানী। এ জন্যে যে, উযূ সম্পর্কিত আয়াতটি হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছে। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬৩)

নবূয়াতের প্রথম থেকেই নবী (সা)-এর নামায পাঠ অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। মতভেদ কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বে (যা মি'রাজের রাত্রিতে ফরয

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৫৬।

২ ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৮১।

হয়েছে) তাঁর উপর কোন নামায ফরয ছিল কি না। কিছু আলিমের মতে মি'রাজের পূর্বে কোন নামায ফরয ছিল না। নবী (সা) যতটা চাইতেন, নামায পড়তেন। কেবল রাতের নামাযের নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল। আর কিছু আলিমের মতে নবূয়াতের শুরু থেকে দু'টি নামায ফরয ছিল। দু' রাক'আত ফজরের এবং দু' রাক'আত আসরের। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ

"আর সকাল সন্ধ্যায় আপনার প্রভুর প্রশংসা জ্ঞাপন করুন।"

(সূরা মু'মিন : ৫৫)

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا

"সূর্যোদয় ও অস্তগমনের পূর্বে আপনার রবের সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করুন।"

(সূরা তাহা : ১৩০)

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ

"আর দিনের দু'প্রান্তে নামায কায়েম করুন।" (সূরা হূদ : ১১৪)

আর এর কিছুদিন পরে সূরা মুযযাম্মিল নাযিল হয় এবং কিয়ামে লায়ল অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের নির্দেশ নাযিল হয়।

(ফাতহুল বারী, কিতাবুস সালাত, كيف فرضت الصلاة অধ্যায়)

আল্লামা সুহায়লী বলেন, মুযানী ও ইয়াহিয়া ইবন সাল্লাম থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।[১]

মুকাতিল ইবন সুলায়মান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামের শুরুতে দু' রাক'আত প্রত্যূষের এবং দু' রাক'আত সন্ধ্যার নামায ফরয করেন। পরে শবে মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়।[২]

সর্ব প্রথম যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন[৩]

সর্ব প্রথম তাঁর পবিত্র সহধর্মিণী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর সাথে প্রথম নামায আদায় করেন। কাজেই প্রথম কিবলার অনুসারী তিনিই ছিলেন। (ইসাবা, উয়ূনুল আসার)। এরপর ওরাকা ইবন

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬২।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯১।

৩. رضي الله عنهم ورضوا عنه অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বাক্যই উদ্ধৃত হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের প্রতিই সন্তুষ্ট থাকেন যাঁর সমাপ্তি ঈমান ও ইসলামের উপর হয়; ফাসিক ও মুনাফিকের উপর আল্লাহ কখনই সন্তুষ্ট থাকেন না।

নওফেল ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন এবং এর পরপরই হযরত আলী (ক), যিনি দীর্ঘকাল তাঁরই অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন,[১] তিনি দশ বৎসর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবূয়াত লাভের পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[২] ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবূয়াত লাভের পরবর্তী দিন আলী (রা) নবী (সা) ও হযরত খাদীজা (রা)-কে নামায পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি ? জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, এটাই আল্লাহর দীন। এ দীন নিয়েই পয়গাম্বরগণ পৃথিবীতে আসেন। আমি তোমাকে আল্লাহর দীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তাঁরই ইবাদত কর এবং লাত-উযযাকে অস্বীকার কর। হযরত আলী বললেন, এতো সম্পূর্ণ নতুন কথা! ইতোপূর্বে কখনো এ ধরনের কথা শুনিনি। আমি আমার পিতা আবূ তালিবের কাছে না শুনে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না। নবী (সা)-এর কাছে এটা খুব কঠিন মনে হলো যে, এ গুপ্ত বিষয়টি না জানি কারো কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে! কাজেই বললেন হে আলী, যদি তুমি ইসলাম কবূল নাও কর, তবুও কারো কাছে এটা ফাঁস করবে না। হযরত আলী চুপ থাকলেন। একটা রাতও কাটলো না, আলীর অন্তরে ইসলাম প্রবেশ করিয়ে দেয়া হলো। প্রভাত হলে তিনি তাঁর সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ বিষয়ে দাওয়াত দিচ্ছেন ? তিনি (সা) ইরশাদ করলেন : "সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। লাত-উযযাকে অস্বীকার কর, মূর্তিপূজা থেকে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ কর।" হযরত আলী ইসলাম কবূল করলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত (অর্থাৎ কিছু কিছু বর্ণনামতে এক বছর) নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা আবূ তালিবের কাছে গোপন রাখলেন।[৩] এর কিছুকাল পরে তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম যায়দ ইবন হারিসা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন।[৪]

আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

যখন পরিবারভুক্ত সবাই ইসলামে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি নিজ বন্ধু ও সৎকর্মশীলদেরকে এ বিরাট অনুগ্রহ ও বিশাল দানে শরীক হওয়ার আহ্বান জানান।

---

১. এক বৎসর যখন মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হযরত (সা) নিজ পিতৃব্য হযরত আব্বাসকে বললেন, চাচা আবূ তালিবের পোষ্যের সংখ্যা বেশি, আর দুর্ভিক্ষও চলছে। এজন্যে আবূ তালিবকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করা দরকার, যাতে তার ভার কিছুটা লাঘব হয়। কাজেই তার কোন কোন সন্তানকে আপনি আর কাউকে আমি নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসি। তাঁরা উভয়ে আবূ তালিবের কাছে এসে প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন। আবূ তালিব বললেন, আকিলকে আমার জন্য রেখে তোমরা যাকে ইচ্ছা, নিয়ে যাও। ফলে তিনি আলীকে এবং আব্বাস (রা) জাফরকে নিজ অভিভাবকত্বে গ্রহণ করতে পসন্দ করলেন। (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৮৪)।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯৩।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৪।

৪. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৯৪।

সর্বপ্রথম তিনি স্বীয় নিস্বার্থ সুহৃদ, বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ, দীর্ঘদিনের বন্ধু, দুর্দিনের সাথী অর্থাৎ হযরত আবূ বকরকে ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেন। আবূ বকর কোন চিন্তা-ভাবনা, কোন দ্বিধা-সংশয় ছাড়াই প্রথম প্রস্তাবেই তাঁর দাওয়াত কবূল করেন।

چشم احمد بر ابوبکرے زده   وزیکے تصدیق صدیق امده

"আহমদ (সা)-এর চক্ষু আবূ বকর (রা)-এর উপর পড়ে। এক প্রত্যায়নই তাঁকে সিদ্দীকে পরিণত করল।"

সুতরাং হাদীসে এসেছে, আমি যার নিকটই ইসলাম পেশ করেছি, সেই ইসলামের ব্যাপারে কিছু না কিছু ইতস্তত করেছে। কিন্তু আবূ বকর ইসলাম গ্রহণে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব করেননি।[১]

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-কে যখন প্রশ্ন করা হলো যে, সর্ব প্রথম কে মুসলমান হয়েছেন ? জবাবে তিনি বলেন যে, স্বাধীন পুরুষদের মধ্যে সর্ব প্রথম আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা), দাসদের মধ্যে হযরত যায়দ (রা) এবং বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা)।[২-৩]

বাদ্উল ওহী-এর রিওয়ায়াত থেকে যদিও প্রকাশ্যত এটা মনে হয় যে, হযরত আলী সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন, তাঁর এ অগ্রগামিতা ফযীলত এবং বড়ত্বের কারণে নয়; বরং এজন্যে যে হযরত খাদীজা তো তাঁর স্ত্রী ছিলেন ও তাঁর অনুগত ছিলেন। আর হযরত আলী ছিলেন অল্প বয়স্ক ও তাঁরই অভিভাবকত্বে প্রতিপালিত। গৃহের মহিলা ও শিশুদের এ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থাকে না যে, বড়দের কোন সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করে।

কিন্তু আবূ বকর (রা) এর ব্যতিক্রম, তিনি ছিলেন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। কারো অনুগত ও প্রভাবাধীন ছিলেন না। কোন চাপ, প্রভাব বা ঝোঁকের বশবর্তী না হয়ে ইসলাম গ্রহণ ছিল তাঁর মর্যাদার স্বীকৃতি। অধিকন্তু, হযরত খাদীজা ও হযরত আলীর ইসলাম গ্রহণ তাঁদের সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এর বিপরীতে হযরত আবূ বকরের ইসলাম গ্রহণ ছিল ব্যাপক ও সার্বজনীন। আর সত্তাগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা ব্যাপক বৈশিষ্ট্য সর্বদাই উত্তম হয়ে থাকে। এ জন্যে যে, হযরত আবূ বকর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেই ইসলামের প্রচার-প্রসার, দাওয়াত-তাবলীগে আত্মনিয়োগ করেন এবং হুযূর (সা)-কে সাহায্য করতে থাকেন; তাঁর জন্যে একটি শক্তির উৎসে পরিণত হন। আর হযরত আলী (রা) ঐ সময়ে বালকমাত্র ছিলেন। তিনি ইসলামের দাওয়াতে কি সাহায্য করতে পারতেন ? হযরত আলী তো তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা আপন পিতার

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৯৫।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৯।

৩. প্রাগুক্ত।

নিকটও গোপন রেখেছিলেন (দ্র. যারকানী, ১খ., পৃ. ২৪৪)। আর আবূ তালিবের দারিদ্র্যের কারণে তিনি মহানবী (সা)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি হুযূর (সা)-কে কিংবা ইসলামকে কোন আর্থিক সাহায্য করতেও সক্ষম ছিলেন না। অধিকন্তু ছোটদের অভ্যাস এটাই যে, তারা যখন কোন ব্যক্তির সাহচর্যে ও তত্ত্বাবধানে থাকে, তখন তাকে যে কাজ করতে দেখে, তারই রেশ ধরে ঐ কাজই করতে থাকে। শিশুদের মধ্যে কোন কাজের উপকারিতা কিংবা ক্ষতি, সৌন্দর্য কিংবা অসৌন্দর্য বুঝার ও পরীক্ষা করার সামর্থ্য বা জ্ঞান কোনটাই থাকে না। হযরত আলীর অবস্থা তখন এমনটিই ছিল।[১]

এর বিপরীতে হযরত আবূ বকর ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও হুঁশিয়ার ব্যক্তি; যিনি উপকার-ক্ষতি, সৌন্দর্য-কদর্যের মাঝে পার্থক্য করার পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন এবং তিনি নবী করীম (সা)-এর সমবয়সী ছিলেন। এছাড়া তিনি মক্কার প্রভাবশালী, সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ অবস্থায় কারো কোন চাপ ছাড়াই প্রথম আহ্বানেই ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত কবূল করেন এবং জনগণের মাঝে তা প্রকাশ করেন। পিতা কিংবা ভাইয়ের নিকট নিজের ইসলাম গ্রহণ গোপন রাখেন নি। নিজের বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে বিশেষভাবে স্বীয় ইসলামকে প্রকাশ করেন এবং এ দীনে প্রবেশের আহ্বান জানান। এরূপ ইসলাম গ্রহণকারীর জন্য রয়েছে শত কল্যাণ।

সারকথা হলো, আবূ বকর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি ছিলেন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, জ্ঞানী, প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত, প্রথম আহ্বানেই ইসলাম গ্রহণকারী। প্রথম থেকেই ইসলামের দাওয়াতে নবী করীম (সা)-এর হাত ও বাহুতে পরিণত হন এবং নিজের ধন-সম্পদ ও জীবন সবকিছুই ইসলামের জন্য উৎসর্গ করে দেন। পূর্ণ তের বছর পর্যন্ত সর্ব প্রকারের কষ্ট ও বিপদে হযরত রাসূল (সা)-এর সঙ্গে থাকেন এবং শত্রু প্রতিরোধ করেন। আর হযরত আলী অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে শত্রু প্রতিরোধ ও তাদের মুকাবিলা করার শক্তি তাঁর ছিল না। আর আবূ বকর (রা) ইসলামে প্রবেশ করেই ইসলামের প্রচার শুরু করেন। তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধুদের মধ্যে যারা তাঁর কাছে আসতেন কিংবা তিনি যাদের কাছে যেতেন, প্রত্যেককেই তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কাজেই তাঁর বন্ধু ও সঙ্গীদের মধ্যে তাঁর প্রচারের দরুন এ ব্যক্তিগণ ইসলামে প্রবেশ করেন ঃ[২] উসমান ইবন আফফান, যুবায়র ইবন আওয়াম, আবদুর রহমান ইবন আউফ, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা), এরা সবাই কুরায়শদের বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন হযরত আবূ বকর-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এদের সবাইকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর

---

১. প্রাগুক্ত।

২. মক্কার নেতৃস্থানীয় এগার অথবা বারজন সাহাবীর পর ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা)।

দরবারে উপস্থিত হন। এখানে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে নামায আদায় করেন। এদের পর পর ইসলাম গ্রহণ করেন, আবূ উবায়দা[১], আমের ইবন জাররাহ, আরকাম ইবন আবুল আরকাম, মাযঊন ইবন হাবীবের তিন পুত্র উসমান ইবন মাযঊন, কুদামা ইবন মাযঊন ও আবদুল্লাহ ইবন মাযঊন, উবায়দা ইবন হারিস, সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল এবং তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে খাত্তাব অর্থাৎ হযরত উমর (রা)-এর বোন, আসমা বিনতে আবূ বকর, খাব্বাব ইবন আরাত, উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস অর্থাৎ সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাসের ভাই, আবদুল্লাহ[২] ইবন মাসঊদ, মাসঊদ ইবন কারী, সলীত ইবন আমর, আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াহ এবং তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে সালামাহ, খুবায়স ইবন হুযাফা, আমের ইবন রবীয়াহ, আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ ও তাঁর ভাই আবূ আহমদ ইবন জাহাশ, জা'ফর ইবন আবূ তালিব ও তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স, হাতিব ইবন হারিস, তাঁর স্ত্রী ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল, তাঁর ভাই খাত্তাব ইবন হারিস, তাঁর স্ত্রী ফাকিহা বিনতে ইয়াসার, মামার ইবন হারিস, সাঈদ ইবন উসমান ইবন মাযঊন, মুত্তালিব ইবন আযহার, তাঁর স্ত্রী রামলা বিনতে আবূ আউফ, নাঈম ইবন আবদুল্লাহ নুহাম[৩], হযরত আবূ বকর-এর মুক্ত ক্রীতদাস আমির[৪] ইবন ফুহায়রা, খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস, তাঁর স্ত্রী উমায়না বিনতে খালফ, হাতিব ইবন আমর, আবূ হুযায়ফা ইবন উৎবা, ওয়ালিদ ইবন

---

১. হযরত আবূ উবায়দা নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাবাকাতে ইবন সাদ, পৃ. ১২)।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ বলেন, আমি উকবা ইবন আবূ মুয়াঈতের বকরী চরাতাম। একদিন হযরত (সা) আমাদের গলিপথ অতিক্রম করছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলন, তোমার কাছে কি দুধ আছে ? আমি বললাম, আমি তো রক্ষক মাত্র। তিনি (সা) বললেন, কোন দুধহীন বকরী থাকে তো নিয়ে আস। আমি একটি দুধহীন বকরী তাঁর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি এর স্তনে নিজের পবিত্র হাত রাখলেন এবং দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। প্রথমে আবূ বকরকে এবং তারপর আমাকে দুধপান করালেন। এমনকি আমরা পুরোপুরি তৃপ্ত হলাম। এরপর তিনি বকরীর স্তনের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, হে দুধ, তুই স্তন থেকে পৃথক হয়ে যা। তখন বকরীটির স্তন পূর্ববৎ দুধহীন হয়ে যায়। এ মুজিযা দেখে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এরপর বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে তালীম দিন। তিনি (সা) তাঁর পবিত্র হাত আমার মাথায় বুলালেন এবং বললেন, আল্লাহ তোমাতে বরকত দিন, তুমি আল্লাহর জ্ঞানে জ্ঞানান্বিত বালক। হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস নিজ সনদে এ রিওয়ায়াত করেছেন। (উয়ূনুল আসার)

৩. নুহাম নাহম শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ আওয়াজ। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, سمعت نحمه في الجنة "আমি তার (নাঈম ইবন আবদুল্লাহর) আওয়াজ বেহেশতে শুনেছি।" (ইসাবার বরাতে সীরাতে ইবন হিশাম, ৩খ. পৃ. ৫৬৭; তাবাকাত, ৪খ. প্রথম অধ্যায়, পৃ. ১০২)।

৪. হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন এবং ফিরিশতারা তাঁর শবদেহ আসমানে উঠিয়ে নেন। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৬৮)।

আবদুল্লাহ, বুকায়র ইবন আবদ ইয়ালীলের চার[১] পুত্র, খালিদ, আমির, আকিল এবং আয়্যাস, আম্মার ইবন ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইবন জুদআনের আযাদকৃত দাস সুহায়ব ইবন সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

যখন নামাযের সময় আসতো, তখন তিনি কোন ঘাঁটি অথবা উপত্যকায় গোপনে নামায আদায় করতেন। একবারের ঘটনা, তিনি (সা) ও হযরত আলী (রা) কোন উপত্যকায় নামায পড়ছিলেন, হঠাৎ আবূ তালিব তাঁদের দিকে বেরিয়ে আসেন। হযরত আলী ততদিন পর্যন্ত তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর নিজ মা-বাবা চাচা এবং অপরাপর নিকটাত্মীয়ের নিকট প্রকাশ হতে দেন নি। আবূ তালিব হযরত (সা)-কে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! এটা কেমন ধর্ম আর এটা কি ধরনের ইবাদত? তিনি বললেন, চাচা! এটাই আল্লাহর দীন, ফেরেশতাদের দীন, পয়গাম্বরগণের দীন; বিশেষ করে আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর দীন। আর আল্লাহ আমাকে তাঁর সমস্ত বান্দার প্রতি রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। আপনিই আমার নসীহতের সর্বাপেক্ষা বেশি উপযুক্ত যে, আপনাকেই প্রথমে কল্যাণ ও হিদায়াতের প্রতি আহ্বান জানাই। আর আপনারও কর্তব্য যে, আপনিই সর্বপ্রথম এ সত্য হিদায়াত ও দীন গ্রহণ করবেন এবং এ ব্যাপারে আমার সাহায্য ও সহায়তাকারী প্রমাণিত হবেন।

আবূ তালিব বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি তো আমার পিতৃপুরুষের ধর্ম ছাড়তে পারি না, তবে এতটুকু অবশ্যই পাবে যে, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এরপর হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে পুত্র, এটা কেমন ধর্ম যা তুমি গ্রহণ করেছ ? হযরত আলী বললেন, বাবা, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি, আরও তিনি যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন, তা সত্যায়ন করেছি। এর সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করি এবং এরই অনুগত ও অনুসারী। আবূ তালিব বললেন, উত্তম, তোমাকে কল্যাণ ও মঙ্গলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, এর সাহচর্য ত্যাগ করবে না। (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ., পৃ. ৮৭)।

---

১. আরকামের গৃহে এই চার ভাই খালিদ, আমির, আকিল এবং আয়্যাস সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত হন। যখন হিজরতের হুকুম হলো, এই চার ভাইই তাঁদের স্ত্রী-সন্তান-সন্তুতি সহ, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন কেউই মক্কায় বাকী ছিলেন না, ঘরে তালা লাগিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন এবং রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির-এর গৃহে অবতরণ করেন (তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ. পৃ. ২৮২)। আকিলের নাম প্রকৃতপক্ষে গাফিল ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর গাফিল নাম পরিবর্তন করে আকিল রাখেন (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৪৭) প্রথমে আখিরাত বিষয়ে গাফিল (অসতর্ক) ছিলেন, এক্ষণে আকিল (জ্ঞানী) হয়ে গেলেন।

হযরত জাফর ইবন[১] আবূ তালিব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

একদিন হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। হযরত আলী তাঁর ডান পার্শ্বে ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবূ তালিব ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, জাফরও তার সঙ্গে ছিলেন। নবী (সা)-কে যখন তিনি নামাযরত অবস্থায় দেখলেন, তখন জাফরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে পুত্র ! তুমিও আলীর মত তোমার চাচাত ভাইয়ের শক্তিশালী বাহুতে পরিণত হও, আর তার বামপার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার সাথে নামাযে শরীক হয়ে যাও (উসদুল গাবা, ১খ. পৃ. ২৮৭)। জাফর প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং একত্রিশ অথবা পঁচিশজন সাহাবার পর ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। (ইসাবা, ১খ. পৃ. ২৩৭)

আফীফ[২] কিন্দী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আফীফ কিন্দী (রা) হযরত আব্বাস (রা)-এর দোস্ত ছিলেন। তিনি আতরের ব্যবসা করতেন। এ সূত্রে তাঁর ইয়েমেনে যাতায়াতও ছিল। আফীফ কিন্দী বলেন, একবার আমি হযরত আব্বাসের সাথে মিনায় ছিলাম। সে সময় এক ব্যক্তি এলো এবং খুবই উত্তমরূপে উযূ করলো। অতঃপর নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এরপর একজন স্ত্রীলোক এলো এবং একইভাবে উযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর একটি এগার বছর বয়স্ক বালক এলো এবং একইভাবে উযূ করে তাঁর পাশে নামাযে দাঁড়িয়ে গেল। আমি আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোন্ ধর্ম ? হযরত আব্বাস বললেন, এটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ধর্ম, যিনি বলেন, আল্লাহ তাকে তাঁর রাসূল করে প্রেরণ করেছেন। আর এ বালক আলী ইবন আবূ তালিবও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যে ঐ ধর্মের অনুসারী এবং ঐ স্ত্রীলোক মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর স্ত্রী। এরপর আফীফ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর তিনি এরূপ বলতেন যে আহা, আমি যদি চতুর্থ মুসলমান হতাম! (উয়ূনুল আসার)। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, এ হাদীসটি খুবই উত্তম এবং এর হাসান হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। হাফিয আসকালানী বলেন, এ হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর তারিখে এবং বাগাবী ও ইবন মান্দাও উল্লেখ করেছেন। এতে অতিরিক্ত এটাও আছে যে, হযরত আব্বাস এও

---

১. তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং বয়সে আলী থেকে দশ বছর বড় ছিলেন। আবিসিনিয়ার শাসক নাজ্জাশী তাঁর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মুতার যুদ্ধে শাহাদত লাভ করেন, এ যুদ্ধে তাঁর পবিত্র দেহে নয়টিরও বেশি যখম হয়েছিল। বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ মুতার যুদ্ধ অধ্যায়ে দেয়া হবে। (ইসাবা)।

২. আফীফ প্রকৃতপক্ষে উপাধি। হাফিয (আসকালানী) বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম শারাহীল, নিষ্পাপ ও পবিত্রতার দরুন আফীফ উপাধিতে ভূষিত হন। কাজেই হযরত আফীফের কবিতা-সমূহের মধ্যে একটি কবিতা এটাও যে, وقالت لى حلم النصابى قلت عففت عما تعلمينا "সে আমাকে খেল-তামাশার দিকে আহ্বান করে, আমি বললাম, তুমি তো আমার পরহেযগারী ও পবিত্রতা সম্বন্ধে জানই।" (ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৮৭)।

বলেছেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আরো বলে যে, রোম ও পারস্যের ধনভাণ্ডারও তাঁর হাতে বিজিত হবে (ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৮৭; আফীফ কিন্দীর জীবন চরিত)।

হযরত তালহা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত তালহা বলেন, আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বসরা গিয়েছিলাম। একদিন আমি বসরার বাজারে ছিলাম, এ সময়ে এক দরবেশ তার উপাসনা গৃহ থেকে উচ্চৈঃস্বরে বলছিল, জিজ্ঞেস করে দেখ, এ লোকদের মধ্যে পবিত্র মক্কায় বসবাসকারী কেউ নেই তো? তালহা বললেন, আমি পবিত্র মক্কায় বাসকারী। দরবেশ বলল, আহমদ (সা) কি প্রকাশিত হয়েছেন? আমি বললাম, কোন্ আহমদ (সা)? দরবেশ বলল, আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, এ মাস তাঁর প্রকাশ পাওয়ার মাস, মক্কা মুকাররমায় প্রকাশ পাবেন, একটি প্রস্তরময় খেজুর বাগানবিশিষ্ট স্থানের দিকে হিজরত করবেন। তিনিই শেষ নবী। দেখ, তুমি পিছে পড়ো না। দরবেশের সাথে এ ধরনের কথোপকথনের দ্বারা আমার অন্তরে বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। সত্বর মক্কায় ফিরে গেলাম এবং লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, নতুন কিছু ঘটেছে কি ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আল-আমিন মুহাম্মদ নবূওয়াতের দাবি করেছেন এবং ইবন আবূ কুহাফা অর্থাৎ হযরত আবূ বকর তাঁকে সমর্থন করেছেন। আমি শীঘ্র আবূ বকরের নিকট উপস্থিত হলাম। আবূ বকর আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়েই আমি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম এবং ঐ দরবেশের ঘটনা পুরোপুরি বর্ণনা করলাম। [ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২৯, হযরত তালহা (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের তিন রাত্রি পূর্বে এ স্বপ্ন দেখলাম যে, আমি যেন ঘুটঘুটে ভীষণ অন্ধকারে আছি। অন্ধকারের কারণে কোন কিছুই আমার নজরে আসছে না। হঠাৎ একটি চন্দ্র উদিত হলো। আমি এর পিছু নিয়ে দেখলাম যে, যায়দ ইবন হারিসা, আলী এবং আবূ বকর ঐ নূরের প্রতি আমার চেয়ে অগ্রগামী। আমি হযরতের খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানান ? তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর একত্ব এবং আমার রাসূল হওয়ার প্রতি সাক্ষ্যদানের জন্য তোমাকে আহ্বান করছি। আমি কালেমা শাহাদত পাঠ করলাম। (ইবন আবিদ-দুনইয়া ও ইবন আসাকির সূত্রে খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১২২)।

হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তিনি প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ অথবা পঞ্চম মুসলমান[১] ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি স্বপ্নে দেখেন, (তিনি বলেন ঃ) আমি যেন প্রচণ্ড

---

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪০৬।

অগ্নি প্রজ্জ্বলিত একটি গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিতা সাঈদ আমাকে ঐ গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার ইচ্ছা করছে, হঠাৎ করে রাসূলুল্লাহ (সা) এসে পড়লেন এবং আমার কোমর ধরে সরিয়ে নিলেন। ঘুম থেকে জেগে আমি কসম খেয়ে বললাম, আল্লাহর কসম, এ স্বপ্ন সত্য।

এরপর আমি হযরত আবূ বকরের নিকট এলাম এবং স্বপ্ন খুলে বললাম। আবূ বকর বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য মঙ্গলের ইচ্ছা করেছেন, তিনি আল্লাহর রাসূল। তাঁর অনুসরণ কর এবং ইসলাম কবূল কর। ইনশা আল্লাহ তুমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ করবে এবং ইসলামে প্রবেশ করবে। আর ইসলামই তোমাকে অগ্নিতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তোমার পিতা অগ্নিতে প্রবেশ করবে। অতঃপর আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, হে মুহাম্মদ (সা) ! আপনি কিসের প্রতি আহ্বান করেন ? তিনি বললেন :

ادعوك الى الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله تخلع ما كنت عليه من عبادة حجر لا يضرو ولا ينفع ولا يدرى من عبده ممن لم يعبده

"আমি তোমাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করি, যাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর আমি তোমাকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও[১], এটা কোন উপকারও করতে পারে না আর কোন ক্ষতিও করতে পারে না। ওরা জানতেও পারে না যে, কে ওদের পূজা করলো আর কে পূজা করলো না।"

খালিদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ এক এবং আপনি সত্য রাসূল। আমি ইসলামে শামিল হয়ে গেলাম। আমার পিতা যখন আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পেলেন, তখনই আমাকে এমন মার দিলেন যে, আমার মাথা যখম হয়ে গেল এমনকি একটি ছড়ি আমার মাথায় ভেঙে ফেললেন, অতঃপর বললেন, তুই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করিস! পুরো সমাজ যার বিরোধী। সে আমাদের উপাস্যদের খারাপ বলে এবং আমাদের পিতা-পিতামহদেরকে আহমক ও মূর্খ বলে? খালিদ বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আল্লাহর শপথ, মুহাম্মদ (সা) সম্পূর্ণ সত্য সঠিক কথাই বলেন।

এ কথা শুনে আমার পিতার রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি আমাকে খুবই কটু-কাটব্য করলেন, বকুনি দিলেন এবং বললেন, রে মূর্খ ! তুই আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আল্লাহর কসম, আমি তোর খানাপিনা বন্ধ করে দেব।

---

১. তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণার পর কুফর ও শিরক থেকে পৃথক হওয়ার হুকুম দেয়া দ্বারা কুফরের প্রতি অনীহা ও অপসন্দের ইঙ্গিত দেয় যা ইসলাম ও ঈমানের জন্য শর্ত, আমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে বর্ণনা করব।

আমি বললাম, তুমি যদি আমার খানাপিনা বন্ধ করে দাও, তখন আল্লাহ তা'আলাই আমাকে রিযক দান করবেন। এর ফলে পিতা আমাকে ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং অন্য পুত্রদের বললেন, কেউ যেন ওর সাথে কথা না বলে। যে কথা বলবে, তার সাথেও এ ব্যবহারই করা হবে। খালিদ নিজ পিতার আশ্রয় ছেড়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশ্রয়ে এসে গেলেন। তিনি (সা) খালিদকে খুবই সমীহ করতেন।[১]

হাফিয আসকালানীও 'ইসাবায়' এ ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত মানুষ কারো আশ্রয় ছেড়ে অপমানিত ও অপদস্থ হয় না; কিন্তু সে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর আশ্রয় ছেড়ে যদি অন্যত্র কোথাও চলে যায়, তা হলে সে সম্মান পেতে পারে না।

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ এ আয়াত দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সম্মান জড়িত থাকে ঈমানের সাথে আর অপমান জড়িত হলো কুফরের সাথে।

عزیز یکه ازدر گهش سرپتافت بهر درکه شد هیچ عزت نه یافت

"পরম প্রভু আল্লাহ্ এমন সম্মানিত সত্তা যে, তাঁর দরবার থেকে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে কোথাও সে আর ইযযত পায় না।"

খালিদ (রা) বলেন, আমার পিতার একবার অসুখ হলে বললেন যে, আল্লাহ্ যদি আমাকে এবারের অসুখ থেকে মুক্তি দেন, তা হলে আমি মক্কায় ঐ খোদার ইবাদত হতে দেব না, মুহাম্মদ (সা) যে খোদার ইবাদত করার কথা বলে।

খালিদ বলেন, এ কথা শুনে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আয় আল্লাহ, আমার পিতাকে তুমি এ অসুখ থেকে মুক্ত করো না। ফলে ঐ অসুখেই আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেন।[২]

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান বলেন, আমি একবার ঘরে গিয়ে আমার খালা সু'দাকে অন্যদের সাথে বসা অবস্থায় দেখলাম। আমার খালা ভবিষ্যদ্বাণীও করতেন। আমাকে দেখামাত্র বললেন :

ابشرو حييت ثلاثا وترا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى

"হে উসমান তোমার জন্য সুসংবাদ ও নিরাপত্তা, তিনবার, তিনবার এবং আরো তিনবার";

ثم باخرى لكى تتمم عشرا لقيت خيرا ووقيت شرا

"আরো একবার যাতে দশ পূর্ণ হয়ে যায়, তুমি কল্যাণের সাথে মিলিত হয়েছ এবং অকল্যাণ থেকে নিরাপদ হয়েছ।"

---

১. আল-মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২৪৮।

২ আল-মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২৪৯।

نكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولقيت بكرا

"আল্লাহর কসম, তুমি এক পবিত্রা সুন্দরী রমণীকে বিয়ে করেছ, তুমি নিজেও আল্লাহর অনুরাগী আর আল্লাহর অনুরাগীর সাথেই বিয়ে হয়েছে।"

এটা শুনে আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং বললাম, খালা, আপনি এসব কি বলছেন ! তখন সু'দা এ কবিতা আবৃত্তি করলেন ঃ

عثمان يا عثمان يا عثمان لك الجمال ولك الشان

"হে উসমান, হে উসমান, হে উসমান ! তোমার জন্য সৌন্দর্য আর তোমার জন্য মর্যাদা",

هذا نبى معه البرهان ارسله بحقه الديان

"তিনি নবী আর তাঁর সাথে রয়েছে নবূয়াতের দলীল প্রমাণ, প্রতিদানদাতা প্রভু তাঁকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন।"

وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيابك الاوثان

"তাঁর প্রতি আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয় এবং তিনি সত্য আর অসত্য পৃথককারী, কাজেই তুমি তাঁরই অনুসরণ কর, যাতে মূর্তি তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে।"

আমি বললাম, হে খালা, আপনি এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করছেন, শহরে কোন দিন যার নামও শোনা যায় নি। কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন সু'দা বললেন :

محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو الى الله قوله صلاح

ودينه فلاح وامره نجاح ما ينفع الصياح لو وقع الرماح وسلت الصفاح ومدت الرماح

"মুহাম্মদ আবদুল্লাহর পুত্র, আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, তাঁর বাণী কল্যাণময়, তাঁর দীন হবে সফলকাম, তাঁর নির্দেশ পরিত্রাণের উপায়, তাঁর বিপরীতে তাঁর বিরুদ্ধে যতই তরবারি ও বর্শা চালানো হোক, কারো চিৎকার ও আহ্বান কল্যাণকর হবে না।"

এ পর্যন্ত বলে তিনি উঠে পড়লেন। কিন্তু তার কথা আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো। ঐ সময় থেকেই আমি চিন্তা-ভাবনায় পড়ে গেলাম। হযরত আবূ বকরের সাথে আমার সুসম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল। কাজেই তাঁর কাছে এসে বসে পড়লাম। আবূ বকর আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, চিন্তিত কেন? আমি নিজ খালার নিকট থেকে যা শুনেছিলাম, তা সবিস্তারে আবূ বকর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলাম। সব শুনে আবূ বকর (রা) বললেন, মাশাআল্লাহ, হে উসমান ! তুমি খুবই সতর্ক এবং বুদ্ধিমান, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য খুবই বুঝতে পারো। তোমার মত ব্যক্তির হক ও বাতিলের ব্যাপারে সংশয় থাকতে পারে না। ঐ মূর্তিগুলো কি বস্তু যার পূজায় আমাদের সম্প্রদায় নিমগ্ন ? ঐ মূর্তিগুলো কি অন্ধ এবং বধির নয়, যারা শুনতেও পায় না, দেখতেও পায় না; আর না কারো ক্ষতি করতে পারে, না উপকার। হযরত

উসমান বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, অবশ্যই ব্যাপারটা তো সেরকমই, যেমনটি তুমি বলছো। এতে আবূ বকর বললেন, আল্লাহর কসম, তোমার খালা বিলকুল সত্য কথাই বলেছেন। তিনি মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ, আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে নিজ পয়গাম দিয়ে সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরণ করেছেন। তুমি যদি ভাল মনে কর, তা হলে তাঁর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বাণী শুনতে পার। এসব কথাবার্তাই চলছিল, ঠিক এ সময় দেখলাম, রাসূল (সা) ঐদিক দিয়েই যাচ্ছেন আর হযরত আলী তাঁর সঙ্গী ছিলেন। কি একটা কাপড় তাঁর হাতে ছিল। হযরত আবূ বকর তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং চুপে চুপে তাঁর কানে কি যেন বললেন। তিনি তাশরীফ আনলেন এবং বসে পড়লেন। এরপর উসমানের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, ওহে উসমান, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের দাওয়াত দিচ্ছেন, তুমি জান্নাতের দাওয়াত কবূল কর। আর আমি আল্লাহর রাসূল, তোমার প্রতি এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

হযরত উসমান (রা) বলেন :

فوالله ما تمالكت حين سمعت قوله ان اسلمت واشهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

"আল্লাহর কসম, আপনার কথা শোনামাত্রই অজ্ঞাতসারে ও অবলীলায় ইসলাম দ্রুত আমার অন্তরে এসে গেল, আর মুখে জারী হয়ে গেল এই কালেমা –

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

در دل هر امتی کز حق مزه است   روئ وآواز پیمبر معجزه است

"প্রত্যেক জাতির অন্তরে সত্যের স্বাদ বিদ্যমান থাকে, পয়গম্বরের চেহারা ও আওয়ায তার জন্য মু'জিযা।"

এর অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর শাহযাদী হযরত রুকাইয়া (রা) আমার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। সবাই এ বিয়েকে স্বাগত ও সাধুবাদ জানালেন। আর আমার খালা সু'দা তখন এ কবিতা পাঠ করলেন :

هدى الله عثمان الصفى بقوله   فارشده والله يهدى الى الحق

"আল্লাহ তাঁর বান্দা উসমানকে হিদায়েত দিয়েছেন, আর আল্লাহই সত্যের পথ প্রদর্শন করেন।"

فتابع باراءِ السديد محمدا   وكان ابن اروى لايصد عن الحق

"অতঃপর উসমান নিজ সঠিক সিদ্ধান্তে মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসরণ করলো, আরওয়ার পুত্র সঠিক চিন্তা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করলো।" অর্থাৎ সে হককে অস্বীকার করলো না। (আরওয়া বিনতে কারীয হযরত উসমানের মাতার নাম)।

وانكحه المبعوث احدى بناته   فكان كبدر مازج الشمس فى الافق

"আরর সেই প্রেরিত পয়গাম্বর (সা) নিজের এক কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দিয়েছে, সত্য সত্যই তা এমন জুটি, যেন পূর্ণিমার চাঁদ সূর্যের সাথে একত্রিত হয়েছে।"

فدى لم يا ابن الهاشميين مهجتى   فانت امين الله ارسلت للخلق

"ওহে হাশিমের পুত্র মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ (সা) ! আমার জীবন আপনার প্রতি হোক উৎসর্গিত, আপনি তো আল্লাহর আমীন এবং সৃষ্টির হিদায়তের জন্য প্রেরিত।"[১]

হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের দু'দিন পর হযরত আবূ বকর (রা) নিম্নের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন ঃ

উসমান ইবন মাযউন[২], আবূ উবায়দা[৩] ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবূ সালমা[৪] ইবন আবদুল আসাদ, আরকাম ইবন আরকাম, এঁরা সবাই একই মজলিসে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। (রিয়াযুন নাযরাহ, ১খ. পৃ. ৮৫) ইয়াযীদ ইবন রুমান থেকে বর্ণিত আছে যে, উসমান ইবন মাযউন, উবায়দা ইবনুল হারিস, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ, আবদুর রহমান ইবন আউফ, আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ এঁরা সবাই মিলে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তিনি (সা) তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন এবং ইসলামের শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত ও সাবধান করলেন। ফলে একই সময়ে এঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বে এঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫]

---

১. আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩২৭।

২. হযরত উসমান ইবন মাযউন (রা) জাহিলী যুগ থেকেই শারাবকে অপসন্দ ও ঘৃণা করতেন এবং বলতেন যে, আমি এমন বস্তু কখনই পান করব না, যা জ্ঞানকে অবলুপ্ত করে দেয় এবং আমার চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষকে আমার প্রতি হাসার সুযোগ করে দেয়, আর বেহুঁশ অবস্থায় এমন ব্যক্তির সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিই যাকে আমি অপসন্দ করি। যখন শারাব নিষিদ্ধের ব্যাপারে সূরা মায়িদার আয়াত নাযিল হলো, তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে ঐ আয়াত শোনালেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ শারাবকে হালাক ও বরবাদ করুন, আমার দৃষ্টি প্রথম থেকেই এর বিরোধী ছিল। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ২৮৬, প্রথম অংশ)।

৩. আবূ উবায়দা ছিল তাঁর ডাকনাম, প্রকৃত নাম ছিল আমির, আর উপাধি ছিল আমীনুল উম্মত। প্রথম যুগের মুসলমান ও আশারা মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি দু'দফা হিজরত করেন, একবার আবিসিনিয়ায়, আর একবার মদীনায়। তিনি সমস্ত জিহাদে শরীক হয়েছিলেন। হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর খিলাফতকালে সিরীয় বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন। ১৮ হিজরীতে মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সিরিয়ায় ইনতিকাল করেন। উমর (রা) ইনতিকালের সময় বলেছিলেন, যদি আবূ উবায়দা জীবিত থাকতেন, তবে তাকেই খলীফা বানাতাম।

৪. হযরত আবূ সালমা হযরত (সা)-এর দুধভ্রাতা এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর প্রথম স্বামী ছিলেন।

৫. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২৮৬।

হযরত আম্মার ও হযরত সুহায়ব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

আম্মার ইবন ইয়াসির বলেন, আরকামের গৃহের দরজায় সুহায়ব ইবন সিনানের সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) ভিতরে ছিলেন। আমি সুহায়বকে জিজ্ঞেস করলাম, উদ্দেশ্যটা কি ? সুহায়বও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন, তোমার কি ইচ্ছা ? আমি বললাম, আমার ইচ্ছা হলো তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য শুনব। সুতরাং আমরা দু'জনেই তাঁর খিদমতে হাযির হলে তিনি আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং আমরা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হই।[১]

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত আমর ইবন আবাসা (রা) বলেন, শুরু থেকেই আমার মূর্তি পূজার প্রতি ঘৃণা ও অনীহা ছিল। আর এটা বুঝতাম যে, এ মূর্তি উপকার অপকার কোনকিছু করার আদৌ অধিকারী নয়, এ কেবলই পাথর। আমি আহলে কিতাবের আলিমদের মধ্যে এক আলিমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, সর্ব প্রথম উন্নত ও উত্তম ধর্ম কোনটি ? ঐ আলিম বললেন, মক্কায় এক ব্যক্তি প্রকাশিত হবেন, মূর্তিপূজা থেকে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম ও উন্নত দীন তিনিই আনয়ন করবেন। তুমি যদি তাঁকে পাও, তবে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করবে। আমর ইবন আবাসা বলেন, ঐ সময় থেকে সকল সময় কেবল আমার মক্কার কথাই খেয়ালে থাকত, ছোট বড় সবার কাছেই মক্কার খবর জিজ্ঞেস করতাম। শেষ পর্যন্ত আমি হযরত (সা)-এর সংবাদ পেলাম। এ বর্ণনা 'মু'জামে তাবারানী' এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' উদ্ধৃত আছে। আমর ইবন আবাসা (রা)-এর বর্ণনায়, তাঁর খবর পাওয়ার পর আমি মক্কা মুকাররামায় গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং অত্যন্ত গোপনে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নবী। বললাম, আল্লাহই কি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ আপনাকে কি পয়গাম দিয়ে পাঠিয়েছেন? তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, আল্লাহকে এক বলে মানা হোক, তাঁর সাথে কোন শরীক না করা হোক, মূর্তিগুলোকে ভাঙা হোক আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা হোক। আমি বললাম, এ ব্যাপারে কে আপনার সাথে আছেন? তিনি বললেন, এক আযাদ আর এক গোলাম, অর্থাৎ হযরত আবূ বকর ও হযরত বিলাল (রা)। আমি আরয করলাম, আমিও আপনার অনুগত, অনুসারী ও সাহায্যকারী হতে চাই। তিনি বললেন, এ সময়ে তুমি নিজ দেশে ফিরে যাও, যখন আমার বিজয়ের সংবাদ জানতে পারবে, তখন আসবে। হযরত আমর ইবন আবাসা বলেন, আমি মুসলমান হয়ে নিজ দেশে ফিরে এলাম এবং তাঁর সংবাদাদি নিতে থাকলাম। যখন তিনি (সা) হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২১২।

(সা)! আমাকে চিনতে পেরেছেন কি? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাত করেছিলে। আমি আরয করলাম, জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ; আমাকে কিছু তালিম দিন,... (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)। সম্পূর্ণ হাদীস মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, আর এ হাদীস সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে।[১]

হযরত আবূ যর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ যর গিফারী (রা)-এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত লাভের খবর পৌঁছলো, তখন তিনি নিজ ভ্রাতা উনায়সকে[২] বললেন, মক্কায় যাও এবং ঐ ব্যক্তির খবর নিয়ে এসো যিনি দাবি করেন, আমি আল্লাহর নবী এবং আসমান থেকে আমার প্রতি ওহী নাযিল হয়। তাঁর বক্তব্যও শুনবে। আবূ যর-এর পরামর্শ অনুসারে উনায়স মক্কায় আগমন করেন এবং তাঁর সাথে মিলিত হয়ে ফিরে গেলেন। আবূ যর জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর নিয়ে এসেছ? উনায়স বললেন, যখন আমি মক্কায় পৌঁছলাম, তখন কেউ তাঁকে মিথ্যাবাদী, জাদুকর বলছিল আর কেউ গল্পকার ও কবি বলছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম, তিনি কবিও নন, আর গল্পকারও নন। উনায়স নিজে একজন খুব বড় কবি ছিলেন। এ জন্যে তিনি বললেন, আমি গল্পকারের কথাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর বক্তব্য গল্পকারদের বক্তব্যের অনুরূপ নয়। তাঁর বক্তব্যকে কবিতার ওজনে রেখে দেখেছি, তা কবিতাও নয়। আল্লাহর কসম, তিনি সম্পূর্ণ সত্যবাদী। তিনি আরো বললেন :

رآيته يامر بالخير و ينهى عن الشر ورايته يامر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر

"ঐ ব্যক্তিকে আমি কেবল কল্যাণ এবং উত্তম কাজের নির্দেশ দিতে আর খারাপ ও অকল্যাণকর কাজ থেকে নিষেধ করতে দেখেছি। উত্তম ও পবিত্রতম চরিত্র গঠনের নির্দেশ দিতে দেখেছি। আর তাঁর থেকে যে বাক্য শুনেছি, কবিতা বলতে যা বুঝায় তার সাথে এর কোন মিল নেই।"

আবূ যর এ সব শুনে বললেন, অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তি হলো না। সম্ভবত আবূ যর তাঁর অবস্থা ও ঘটনাবলী পুরোপুরি শুনতে চেয়েছিলেন। এত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তাঁর জন্য যথেষ্ট ও প্রশান্তিদায়ক হলো না। এ জন্যে আবূ যর নিজেই কিছু পাথেয় এবং পানির মশক নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হন এবং হযরত আলীর মাধ্যমে দরবারে রিসালতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁর বক্তব্য শোনেন ও তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হেরেম শরীফে পৌঁছে স্বীয় ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে কাফিরেরা তাঁকে এত বেশি মারধর করে যে, যমীনে শুইয়ে দেয়। হযরত আব্বাস এসে তাঁকে উদ্ধার

---

১. আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৬।

২ উনায়স আবূ যরব থেকে বড় ছিলেন; (ইসাবা, ১খ., পৃ. ৭৬।

করেন। রাসূল (সা) বললেন, এখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকেও এ ব্যাপারে অবহিত কর। আমাদের বিজয়ের সংবাদ পেলে ফিরে আসবে। আবূ যর (রা) ফিরে যান এবং দু'ভাই মিলে তাদের মাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। মাতা অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে এ দাওয়াত কবূল করেন। এরপর তারা সম্প্রদায়ের লোকদের দাওয়াত দেন। সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক ঐ সময়েই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

দ্রষ্টব্য : হযরত আমর ইবন আবাসা এবং হযরত আবূ যর (রা)-এর এ ঘটনা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হুযূর (সা)-এর আল্লাহর দীনের বিকাশ এবং বিজয় সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অন্যথায় এ ধরনের সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বিজয়ের প্রত্যাশা ওহীর সংবাদ ছাড়া অসম্ভব।

আরকামের গৃহে মুসলমানদের জমায়েত

যখন এভাবে আস্তে আস্তে জনগণ ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করলেন, তখন মুসলমানদের একটি ছোট দল তৈরি হলো। সবাই তখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত আরকাম[২] (রা)-এর গৃহে একত্রিত হওয়া যাক। হযরত আরকাম প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে সপ্তম অথবা দশম অবস্থানে ছিলেন আর তাঁর গৃহটি ছিল সাফা পাহাড়ে। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানগণ সেখানে একত্রিত হতেন। হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা যেখানে ইচ্ছা, একত্রিত হতেন।[৩]

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

واتـخذ الـنبى دار الارقم   للصحب مستخفيـن عن قومهم

وقيل كانوا يخرجون تقرى   الـى للشـعـاب الصلـوة سـرا

حتـى مضـت ثـلـثة سنينا   واظـهـر الـرحمن بـعد الـدنـيا

وصدع النبى جهـرا معلنا   اذ نزلت فاصدع بـمـا فـما ونـى

وانـذر العشائـر التى ذكـر   يـجـمـعـهـم اذ نـزلـت وانــذر

"নবী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান নেন, সঙ্গীদের জন্য—তাদের সম্প্রদায় থেকে গোপন রাখার জন্য, বলা হয় তারা গোপনে বের হন, গোপনে সালাত আদায় করেন, এমনকি তিন বছর চলে গেল, দয়াময় আল্লাহ এরপর পৃথিবীতে তাদের প্রকাশ ঘটালেন, নবী (সা) প্রকাশ্যে আহ্বান শুরু করলেন, যখন নাযিল হলো فـاصـدع بـمـا تـؤمـر, "যে ব্যাপারে তোমাকে আদেশ করা হয়, সেটা প্রকাশ্যে জানিয়ে দাও।"

---

১. আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৬২।

২. হযরত আরকাম (রা) বদর, উহুদ ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আমীর মু'আবিয়া (রা) এর খিলাফতকালে ৫৫ হিজরীতে ইনতিকাল করেন।

৩. আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮।

তিনি নিকটজনদের একত্র করে সকলকে সতর্ক করলেন। যখন নাযিল হলো وانذر।"

দাওয়াতের ঘোষণা

তিন বৎসর পর্যন্ত হযরত (সা) গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন এবং মানুষ ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকলো। তিন বৎসর পর এ নির্দেশ নাযিল হলো যে, প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিন।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ

"যে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পরিস্কার ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।"

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"আর সর্বপ্রথম আপনার নিকটাত্মীয়দের কুফর ও শিরকের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করুন।"

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর যারা ঈমান এ আপনার আনুগত্য করছে, তাদের সাথে নম্র ও সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করুন।"

وَقُلْ اِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْمُبِيْنُ

"আর আপনি এ ঘোষণা দিন যে, আমি প্রকাশ্যে সতর্ককারী।"

অতএব তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং কুরায়শ সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের নাম ধরে ডাকলেন। যখন সবাই একত্রিত হলো, তিনি ইরশাদ করলেন, যদি আমি তোমাদের এ খবর দেই যে, পাহাড়ের অপর প্রান্তে একদল সৈন্য জমায়েত হয়েছে যারা তোমাদের উপর হামলার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তবে কি তা সত্য মনে করবে ? সবাই একবাক্যে বলল, অবশ্যই; কেননা আমরা তো আপনার মধ্যে সত্যবাদিতা ছাড়া কিছু দেখিনি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি (অর্থাৎ মূর্তিপূজার শিরকী গুনাহর শাস্তি। তোমাদের ইলআহ্ শুধু একজন–ইলাহুকুম ইলাহুল ওয়াহিদ)। আবূ লাহাব তখন গোসসায় জাবলে উঠলো; বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যে আমাদেরকে একত্রিত করেছ ? এ প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ রাগান্বিত হয়ে সাথে সাথে এ মর্মে ওহী পাঠালেন যে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাবিউঁ ওয়া তাব্ব...' যার অর্থ আবূ ল াহাব ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক..(শেষ পর্যন্ত) সূরা নাযিল হয় (বুখারী)।

ইসলামের দাওয়াত এবং ভোজের নিমন্ত্রণ

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত ঃ তিনি বলেন যে, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আর সর্বপ্রথম আপনার নিকটাত্মীয়দের কুফর ও শিরকের শাস্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার ও

ভীতি প্রদর্শন করুন) আয়াতটি নাযিল হলো, তখন হযরত (সা) আমাকে বললেন, এক সা' শস্য, ছাগলের একটি রান ও এক পেয়ালা দুধ সংগ্রহ কর এবং এরপর আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের একত্র কর। আমি তাঁর নির্দেশ পালন করি। কমবেশি চল্লিশ ব্যক্তি একত্রিত হলো; যাদের মধ্যে তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিব, হামযা, আব্বাস এবং আবূ লাহাবও শামিল ছিলেন। তিনি এক পেয়ালা গোশত তাঁর পবিত্র দাঁত দ্বারা চিরে ঐ পেয়ালাতেই রাখলেন এবং বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে সকলে আহার করুন। ঐ এক পেয়ালা গোশতে সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলেন। এরপরও কিছু বেঁচে গেল। আসলে ঐ খাবার এতটুকু ছিল যে, একজনের জন্য তা যথেষ্ট হতে পারতো। এরপর আমাকে হুকুম দিলেন, দুধের পেয়ালা আন এবং সবাইকে পান করাও। ঐ এক পেয়ালা দুধে সবাই পরিতৃপ্ত হলেন অথচ এক পেয়ালা দুধ এত অধিক পরিমাণ ছিল না। এক পেয়ালা দুধ তো একজনই খেতে পারে। যা হোক, এভাবে চল্লিশ ব্যক্তি যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন তিনি (সা) কিছু বলার ইচ্ছা করলেন, আবূ লাহাব তখন বলে উঠলো, লোক সকল! উঠে পড়, মুহম্মদ তো আজ তোমাদের খাবারের উপর জাদু করেছে। এমন জাদু, যা এর আগে কখনো দেখিইনি। এ কথা বলাতে লোকজন উঠে পড়তে শুরু করলো আর তাঁর কিছু বলার সুযোগই হলো না। দ্বিতীয় দিন তিনি একইভাবে হযরত আলীকে খাবারের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। এমনিভাবে দ্বিতীয় দিনও লোকজন একত্রিত হলো। আহার শেষে তিনি (সা) বললেন, যে বস্তুটি আমি এবার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি, এর চেয়ে উত্তম কোন বস্তু এর পূর্বে কোন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থাপন করেনি। আমি আপনাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সংবাদ নিয়ে এসেছি। (ইবন ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম থেকে উদ্ধৃত)।[১]

আবূ লাহাব যদিও সম্পর্কে তাঁর চাচা ছিলেন, কিন্তু সত্যায়ন, আত্মোৎসর্গ ও সত্যিকারের ভালবাসায় হযরত আবূ বকর (রা) সবার শীর্ষে ছিলেন। একইভাবে মিথ্যা প্রমাণ, কষ্ট দেয়া, বিদ্রূপ করা, হিংসা এবং শত্রুতায় আবূ লাহাব ছিল সবার শীর্ষে। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত দিন। এ শত্রুতার কারণেই নবী (সা)-এর দু' কন্যা অর্থাৎ হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম (রা) নবূয়াত লাভের পূর্বে আবূ লাহাব পুত্র উতবা ও উতায়বার স্ত্রী ছিলেন। আবূ লাহাব হযরতের অন্তরে কষ্ট দেয়ার জন্যে নিজ পুত্রদের থেকে উভয়ের তালাক নিয়ে নেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিরাট রহমত। এরা দু'জনই পর্যায়ক্রমে হযরত উসমান (রা)-এর সহধর্মিণী হন এবং হযরত উসমান যুন-নূরাইন উপাধিতে ভূষিত হন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর (আ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত উসমান (রা) এমন সাহাবী, যিনি নবীর দু' সাহেবযাদীকে পর্যায়ক্রমে (একের মৃত্যুর পর

---

১. আল-খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১২৩।

অপরকে) বিবাহ করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং 'যুন-নূরাইন' উপাধিতে আখ্যায়িত হন। যত দিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) জনগণকে শুধু ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কুরায়শ তাঁর কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু যখনই প্রকাশ্য ঘোষণা, মূর্তিপূজার অসারতা ও খারাবী বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং কুফর ও শিরক থেকে লোকজনকে বারণ করতে লাগলেন, তখনই কুরায়শগণ নবী (সা)-এর প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করে। কিন্তু আবূ তালিব তাঁর সহায় ও সাহায্যকারী হিসেবে থেকে যান।

একবার কুরায়শের কয়েক ব্যক্তি একত্র হয়ে আবূ তালিবের কাছে এসে বলল, আপনার ভাইপো আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলে, এগুলোর সমালোচনা করে, আমাদের ধর্মকে খারাপ আর আমাদেরকে আহমক, মূর্খ এবং আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট বলছে। আপনি হয় তাকে নিষেধ করুন অথবা তার ও আমাদের মধ্যে কিছু হলে আপনি আসবেন না, আমরা নিজেরাই বোঝাপড়া করব। আবূ তালিব তাদেরকে সুসম্পর্ক ও নম্রতা দিয়ে বশীভূত করেন। আর হযরত (সা) একইভাবে তাওহীদের দাওয়াত এবং কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধাচরণে মশগুল থাকলেন। এতে আবূ লাহাব এবং তার সমচিন্তার লোকদের হিংসা ও শত্রুতার আগুনে ঘৃতাহূতির কাজ করল।

ঐসব লোকের একটি দল দ্বিতীয়বার আবূ তালিবের নিকট এলো এবং বলল, আপনার শরাফত ও মর্যাদা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, কিন্তু নিজেদের প্রভুদের প্রতি অভিসম্পাত আর পূর্বপুরুষদেরকে আহমক ও মূর্খ বলার বিষয়টি আমরা সহ্য করতে পারি না। আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বারণ করুন, অন্যথায় লড়াই করে আমাদের কোন এক পক্ষ শেষ হয়ে যাবে। এ কথা বলেই তারা চলে গেল। পুরো খান্দান ও সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও শত্রুতা আবূ তালিবের মনকে প্রভাবিত করলো।

যখন হযরত (সা) তাশরীফ আনলেন। আবূ তালিব বললেন, হে প্রিয় বৎস! তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন আমার কাছে এসেছিল এবং এইসব বলে গেল। কাজেই তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ কর এবং নিজের প্রতিও একটু নজর দাও। আমার উপর সাধ্যের অতীত বোঝা চাপিও না। আবূ তালিবের এ ধরনের বাক্যালাপে রাসূল (সা)-এর মনে এ ধারণার উদয় হলো যে, হয়ত আবূ তালিব আমার সাহায্য-সহায়তা থেকে বিরত থাকতে চাইছেন। কাজেই তিনি ছলছল নেত্রে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বললেন, চাচাজান ! আল্লাহর কসম, যদি এরা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও এনে দেয় এবং বলে এ কাজ ছেড়ে দাও, তবুও আমি কখনো তা ছাড়তে পারবো না; যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমার দীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি ধ্বংস হয়ে যাই। এ কথা বলে তিনি কেঁদে ফেলেন এবং উঠে চলে যেতে লাগলেন। আবূ তালিব উচ্চৈস্বরে বললেন, ওহে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার যা খুশি কর, আমি কখনই তোমাকে শত্রুর হাতে তুলে দেব না।[১]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৪৭।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব : বাহ্যিক দৃষ্টিতে চন্দ্র–সূর্য থেকে কোন বস্তুই উজ্জ্বল ও প্রভাযুক্ত নয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিকট ঐ প্রকাশ্য নূর, যা মুহাম্মদ রাসূল (সা) পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন, তা ঐ চন্দ্র-সূর্য থেকেও বেশি উজ্জ্বল ও প্রভাময়। মুশরিকগণ এ প্রকাশ্য নূরকে নিভিয়ে দিতে তৎপর, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِؤُا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ الاَّ اَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

"এরা চায় ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নূরকে পূর্ণতায় পৌঁছাবেন যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।" (সূরা তাওবা : ৩২)

রাসূল (সা) এ জন্যে চন্দ্র-সূর্যের উল্লেখ করে বলেন, যে প্রকাশ্য নূর আমি নিয়ে এসেছি, এর সামনে চন্দ্র ও সূর্যের কোন গুরুত্বই নেই। চন্দ্র ও সূর্যের ঐ প্রকাশ্য নূরের সামনে অণুর সাথে সূর্যের যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, ততটুকু সম্পর্কও নেই। কাজেই তোমাদের মত মূর্খের কথা অনুযায়ী আমি উন্নততর নূরকে ছেড়ে তুচ্ছ নূরকে কেন গ্রহণ করব ? আর যেভাবে বাঁ হাতের তুলনায় ডান হাত উন্নত ও উত্তম, তেমনি চন্দ্রের তুলনায় সূর্যও উন্নত ও উত্তম, এ জন্যেই আরব ও আজমের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী নবী করীম (সা) সূর্যকে ডান হাতে এবং চন্দ্রকে বাম হাতে রাখার কথা বলেছেন।

বড়ই কাজের কথা

হযরত (সা)-এর কুফর ও শিরক বিরোধী প্রকাশ্য ঘোষণা এবং মূর্তি ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘৃণার দরুন তাঁর ও তাঁর সাহাবাদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতার মুখে অটল থাকা এ বিষয়েরই প্রকাশ্য প্রমাণ যে, ঈমান এবং ইসলামের জন্য কেবল অন্তরে সত্যায়ন অথবা মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট নয়, বরং কুফর ও কাফিরী এবং শিরকের বৈশিষ্ট্য ও আনুসঙ্গিকতার বিরোধিতা জরুরী এবং সেগুলো অপসন্দ করাও অত্যাবশ্যক। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰؤُا مِنْكُمْ وَمِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীগণের মধ্যে অবশ্যই একটি অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যার পূজা কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো যদি না তোমরা এক আল্লাহ্ বিশ্বাস স্থাপন কর।" (সূরা মুমতাহানা : ৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন : فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

"এটা যখন তার নিকট সুস্পষ্ট হলো যে, সে (আযর) আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহীম তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল।" (সূরা তাওবা : ১১৪)

এ আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রকাশ পেল যে, যেভাবে ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং তাঁর রাসূল মুজতবা (সা)-এর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্য ঘোষণা করা আবশ্যিক, ঠিক তেমনিভাবে (ক্ষেত্র বিশেষে) আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা ও বিদ্বেষের ঘোষণা দেয়াও জরুরী। যেমন তিনি (সা) নবম হিজরীতে হযরত আলী (ক)-কে বিশেষভাবে এজন্যে মক্কায় প্রেরণ করেছিলেন, হজ্জের মৌসুমে যেন তিনি সমগ্র উম্মতের কাছে ঐ ঘোষণা দেন, যা সূরা তাওবায় নাযিল হয়েছিল। এবং হাদীস শরীফে এসেছে : مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ "যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে ভালবাসলো এবং আল্লাহর জন্যই বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে তার ঈমান পূর্ণ করলো।" আর আল্লাহর প্রতি মহব্বত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের সাথে পূর্ণ শত্রুতা ও বিদ্বেষভাব পোষণ না করবে। অন্তরে আল্লাহর দুশমনদের প্রতি যতটুকু অনুভূতি থাকে, আল্লাহর মহব্বত অন্তর থেকে ততটুকই খালি থাকে। আল্লাহ তা'আলা কারো জন্যই দুটি অন্তর সৃষ্টি করেননি, কাজেই একটি অন্তরে দুটি পরস্পর বিরোধী বস্তু কিরূপে অবস্থান করবে ? পরিপূর্ণ মু'মিন তো ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দির বিপরীতে সারা দুনিয়ার অসন্তুষ্টির বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। اسخطت كل الناس فى ارضائه

মহান পয়গাম্বর (আ)-গণের সুন্নত তথা আদর্শ তো এটাই, যেভাবে তাঁরা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি ঈমান ও সত্যায়নের আহ্বান জানান, ঠিক তেমনিভাবে কুফর, শিরক ও তাগূতকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অস্বীকারের আহ্বান জানান। যেমন আল্লাহ বলেন :

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ

"অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।" (সূরা নিসা : ৬০)

বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) প্রণীত মাকতুবাত,পৃ. ৩২৫, প্রথম দফতর, মাকতুব নং ২৬৬ দেখুন।

কুরায়শগণ যখন দেখলো যে, দু'বার বলা সত্ত্বেও আবূ তালিব নবীজী (সা)-এর সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে কিছুটা নমনীয়, তখন তারা তৃতীয়বার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আবূ তালিবের কাছে এলো এবং বলল, আবূ তালিব ! এই যে উমারা ইবন ওলীদ, কুরায়শের খুবই সুন্দর, সুঠাম এবং অনিন্দ্য সুন্দর, খুবই চতুর ও বুদ্ধিমান যুবক, আপনি তাকে গ্রহণ করুন আর তার পরিবর্তে আপনার ভাইপো, আমাদের পুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন, যেন আমরা তাকে হত্যা করে গোটা সম্প্রদায়কে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি।

আবূ তালিব বললেন, এটা কি করে সম্ভব, আমি আমার প্রতিপালনাধীন পুত্রকে তোমাদের কাছে সোপর্দ করব আর তোমাদের পুত্রকে নিয়ে প্রতিপালন ও দেখাশুনা করব ? আল্লাহর কসম, এটা কখনই হতে পারে না। মুতইম ইবন আদী বলল, হে আবূ তালিব ! আল্লাহর শপথ, এই বিপদ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে আপনার সম্প্রদায় একটা বিজ্ঞজনোচিত ইনসাফপূর্ণ রায় এবং একটা উত্তম পন্থা আপনার সামনে পেশ করেছিল, কিন্তু আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। আবূ তালিব বললেন, "আল্লাহর কসম, আমার সম্প্রদায় আমার সাথে ইনসাফ করেনি। তোমাদের যা করার থাকে, কর।" কুরায়শগণ আবূ তালিব থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে প্রকাশ্য শত্রুতা করতে প্রস্তুত হয়ে গেল। সম্প্রদায়ের মাঝে যেসব নিঃস্ব অসহায় মুসলমান ছিল, তারা তাদের উপর নানা ধরনের যুলুম নির্যাতন চালাতে লাগল। আবূ তালিব বনী হাশিম এবং বনী মুত্তালিবকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য সহায়তা করার আহ্বান জানালেন। আবূ তালিবের এ আহ্বানে সমগ্র বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব সাড়া দিল। বনী হাশিম শাখা গোত্রের আবূ লাহাবই কেবল দুশমনদের সাথে শরীক হলো (উয়ূনুল আসার)।

রবীয়া ইবন আব্বাদ (রা) বলেন, আমি নবী করীম (সা)-কে উকায এবং যুল-মাজায বাজারে দেখেছি যে, তিনি লোকদের বলছেন : يايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا "হে লোক সকল ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সাফল্য অর্জন করবে।" আর তাঁর পিছে পিছে একটা ট্যাড়া চোখবিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে বলতে যাচ্ছে যে, এ ব্যক্তি সাবী (বেদীন) এবং মিথ্যাবাদী। আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে ? জানা গেল যে, তাঁরই চাচা আবূ লাহাব। হাদীসটি 'মুসনাদে আহমদ' ও 'মু'জামে তাবারানী'তে উল্লেখ আছে। ইসাবায় রবী' ইবন আব্বাদ-এর জীবনী এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাসও নিজ নিজ সনদে এ হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে এতে রয়েছে তিনি লোকদেরকে বলছেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَعْبُدُوْنَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

"হে লোক সকল ! আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, কেবল তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না।"[১]

আর আবূ লাহাব তাঁর পিছে পিছে এ কথা বলে চলছিল : ايها الناس ان هذا يأمركم ان تتركوا دين اباكم "হে লোক সকল ! এ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছে তোমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে দেয়ার জন্য।"

মূলত নবীকুল শিরোমণি (সা) তো ইসলাম ও শান্তির দিকে আহ্বান করছিলেন, আর আবূ লাহাব আহ্বান করছিল প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার দিকে।

---

১. ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫০৯।

ইসলামের প্রচার প্রসার বন্ধ করার জন্য কুরায়শদের পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন দেখলো যে, দৈনন্দিন ইসলামের প্রসার বেড়েই চলছে, তখন একদিন তারা ওলীদ ইবন মুগীরার নিকট একত্রিত হলো, যে ছিল তাদের মধ্যে বয়োঃবৃদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তি, তারা বলল, হজ্জের মৌসুম তো সমাগত, আর তাঁর [নবী (সা)-এর] উল্লেখ ও চর্চা তো সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে, এ উপলক্ষে দেশের আনাচে কানাচে থেকে সব লোক আসবে আর আপনাকে ঐ ব্যক্তি [হযরত মুহাম্মদ (সা)] সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কাজেই তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত থাকা দরকার এবং সবাই এ ব্যাপারে একই সিদ্ধান্ত দেয়া দরকার, যাতে তা পরস্পর বিরোধী না হয়। অন্যথায় আমাদের মধ্যেই একজনের কথায় অপরেরটা মিথ্যা ও পরস্পর বিরোধী প্রতিপন্ন হবে, যা মোটেই সমীচীন হবে না। কাজেই হে আবূ আবদুশ শামস (ওলীদের উপাধী) ! আপনি আমাদের জন্য একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিন, যার উপর আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকব।

ওলীদ বলল, তোমরা প্রস্তাব কর, আমি শুনি; এরপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তারা বলল, ইনি (আল্লাহ মাফ করুন) গণক। ওলীদ বলল, এটা মিথ্যা কথা, আল্লাহর কসম তিনি গণক নন। আমি যথেষ্ট গণক দেখেছি। তাঁর মধ্যে না গণকের কোন চিহ্ন আছে, আর না তাঁর বক্তব্য গণকদের মত গোঙ্গানো কথার সাথে কথা জড়ানো। লোকেরা বলল, তিনি (সা) পাগল। ওলীদ বলল, তিনি পাগলও নন। আমি পাগল ও উন্মাদদের প্রকৃতিও জানি, আমি তাঁর মধ্যে এ ধরনের কোন আলামত পাই না। লোকেরা বলল, তিনি কবি। ওলীদ বলল, আমি নিজেও কবি, এর সমস্ত শাখা-প্রশাখা, যেমন রাজায ও হাযাজ, মাকবূয ও মাবসূত ইত্যাদি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত। তাঁর বক্তব্যের সাথে কবিতার কোনই সম্পর্ক নেই। লোকেরা বলল, তিনি জাদুকর। ওলীদ বলল, তিনি জাদুকরও নন। তিনি জাদুকরদের মত ঝাঁড়ফুকও করেন না আর তাদের মত গিরাও বাঁধেন না। লোকেরা বলল, ওহে আবূ আবদুশ শামস, তা হলে আপনিই বলুন শেষ পর্যন্ত তা হলে কি ?

ওলীদ বলল, আল্লাহর কসম, মুহম্মদ (সা)-এর কথা[১] এক আশ্চর্য ধরনের মিষ্টি ও মাধুর্যমণ্ডিত। আর এর এক আশ্চর্য ধরনের চমক রয়েছে। এ বক্তব্যের উৎস মূল অত্যন্ত সজীব এবং এর শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত ফলবান (অর্থাৎ এই ইসলাম একটি পবিত্র বৃক্ষের ন্যায়, যা অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে শক্ত জমি থেকে উদ্গত এবং এর শাখা-প্রশাখা আসমান পর্যন্ত বিস্তৃত, যা ফলে-ফুলে পরিপূর্ণ)। কাজেই যা কিছু তোমরা বললে, আমি ভালভাবেই জানি যে তা সবই বাতিল ও ভিত্তিহীন। আমার বিবেচনায় এটা বলা সবচেয়ে উপযুক্ত হবে যে এ ব্যক্তি জাদুকর এবং তার কথাও জাদু যা স্বামী-স্ত্রীতে,

---

১. মুস্তাদরাকের বর্ণনায় অতিরিক্ত আছে যে, وانه ليعلوا وما يعلى وانه ليحطم ما تحته অর্থাৎ "এ বাক্যাবলী সমুচ্চ ও প্রাধান্য বিস্তার করবে, কখনই বিজিত হবে না এবং সবকিছুকেই পরাভূত করবে।" (মুস্তাদরাক, ২খ. পৃ. ৫০৭)।

পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং গোত্রে-গোত্রে বিভেদ সৃষ্টি করে—যেটা জাদুরই বৈশিষ্ট্য। এ সব কথার পর সভা ভঙ্গ হলো।

যখন হজ্জের মৌসুম এলো, লোকজন আসতে শুরু করল, কুরায়শরা পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়ল এবং যে ব্যক্তিই সেদিক দিয়ে যেত, মুহম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে তাকেই বলতে থাকল, ঐ ব্যক্তি জাদুকর, তোমরা তার থেকে দূরে থাকবে। কিন্তু কুরায়শদের এ প্রচেষ্টা ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম হলো না (বরং এ ব্যাপারে আগ্রহ আরো বেড়ে গেল)। দেশের আনাচে কানাচে থেকে আগত লোকজন হযরত (সা) সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়েছে।[১] আল্লামা যারকানী বলেন, এ হাদীসটি ইবন ইসহাক, হাকিম এবং বায়হাকী উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[২]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ওলীদ ইবন মুগীরার ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন :

ذَرنِى وَمَن خَلَقْتُ وحِيْدًا - وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوْدًا وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا وَّمَهَّدْتُّ لَهُ تَمْهِيْدًا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلاَّ اَنَّهُ كَانَ لاِيٰتِنَا عَنِيْدًا سَاُرْهِقُهُ صَعُوْدًا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وبسر ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ يُّؤْثَرَ اِنْ هٰذَا اِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ

"আমাকে আর তাকে ছেড়ে দাও, যাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো বেশি দিই। না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের ঔদ্ধত্য বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তিতে আচ্ছন্ন করব। সে তো চিন্তা করেছে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে এ সিদ্ধান্ত নিল ! আরো অভিসম্পাত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো ! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ভেঙচিয়ে চলে গেল। এরপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল ও দম্ভ জাহির করল। আর ঘোষণা করল, এ তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ছাড়া কিছুই নয়। এ তো মানুষেরই কথা, আমি অচিরেই তাকে সাকার-এ নিক্ষেপ করব....আয়াতের শেষ পর্যন্ত।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির ১১-২৬)

আর একটি মুরসাল রিওয়ায়াতে এসেছে, আয়াতটি ছিল :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ., পৃ. ১০১।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৬১।

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন; তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।" (সূরা নাহল ৯০)–যা পরিপূর্ণ চরিত্র ও উত্তম কর্মের সমষ্টি।[১]

হযরত হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ[২]

একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) সাফা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘটনাক্রমে আবূ জাহলও সেখানে এসে পড়ল। হযরতকে দেখে সে অনেক রূঢ় কথা বলল কিন্তু তিনি আবূ জাহলের অনভিপ্রেত এ কথাবার্তার কোন জবাব দিলেন না। তিনি এ অজ্ঞতাপূর্ণ কথার প্রতিউত্তর না দিয়ে চুপচাপ চলে গেলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী এ সমুদয় ঘটনা দেখছিল। ইতিমধ্যে হযরত হামযা তীর-ধনুক ইত্যাদিসহ শিকার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী হযরত হামযাকে দেখে বলল, হে আবূ উমারা, তুমি যদি ঐ সময় উপস্থিত থাকতে, যখন আবূ জাহল তোমার ভাই পোকে রূঢ় ও অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলছিল !

এ কথা শোনামাত্র হযরত হামযার আত্মসম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগল। তিনি আবূ জাহলের সন্ধানে রওয়ানা হলেন। হযরত হামযার অভ্যেস ছিল, শিকার থেকে ফিরে তিনি সর্বাগ্রে হারেম শরীফে উপস্থিত হতেন। এ অভ্যাসবশত তিনি আজও হারেম শরীফে গিয়ে দেখেন যে, আবূ জাহল কুরায়শের একটি দলের সাথে বসে আছে। পৌঁছেই তিনি তার মাথায় ধনুক দ্বারা এমন আঘাত করলেন যে, তার মাথায় যখম হয়ে গেল এবং বললেন, তুই মুহাম্মদকে গালি দিস, অথচ আমি নিজেই তাঁর দীনের অনুসারী ! সভার উপস্থিত কেউ কেউ আবূ জাহলের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইল, কিন্তু আবূ জাহল নিজেই তাদের বাধা দিল এবং বলল, আজ আমি এর ভাইপোকে অনেক গালিগালাজ করেছি, হামযাকে তার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও। সভায় উপস্থিতদের কেউ কেউ হামযাকে উদ্দেশ্য করে বলল, হামযা, তুমি কি সাবী (বেদীন) হয়ে গেলে ? হামযা বললেন, মুহাম্মদের রাসূল (সা) হওয়ার ব্যাপারে যথার্থতা ও সত্যতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল আর তিনি যা বলেন, তা যথাযথ সত্য। আমি কখনো তা থেকে বিরত হব না, তোমাদের যা খুশি করতে পার। হযরত হামযা এ কথা বলে বাড়ি চলে গেলেন। শয়তান কুমন্ত্রণা দিল যে, হে হামযা, তুমি কুরায়শের সর্দার, তুমি এ ধর্মত্যাগীর আনুগত্য কিরূপে করলে, আর নিজের বাপ-দাদার ধর্ম কেন ছেড়ে দিচ্ছ ? এরচেয়ে

---

১. প্রাগুক্ত।

২ ইবনুল জাওযী বলেন যে, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। হাফিয ইবন হাজার তাঁর ইসাবায় বলেন, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৫৬)।

তো মরে যাওয়াই উত্তম। এর ফলে হামযা কিছুটা বিব্রত হলেন এবং সন্দেহে পড়ে গেলেন। হযরত হামযা বলেন, তখন আমি আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করলাম :

اللهم ان كان رشدا فاجعل تصديقه في قلبي والا فاجعل لي مما وقعت فيه مخرجا

"হে আল্লাহ ! যদি এটা হিদায়াত হয়, তবে তার সত্যতা আমার অন্তরে ঢেলে দাও, অন্যথায় এ বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন বলিষ্ঠ পন্থা সৃষ্টি করে দাও।"[১]

অপর এক বর্ণনায় আছে, এই অস্থিরতা ও দুর্ভাবনার মধ্যে তাঁর সারা রাত কেটে গেল, এক মুহূর্তও চোখে ঘুম এলো না। যখন কিছুতেই এ দুর্ভাবনা ও অস্থিরতা দূর হলো না, তখন তিনি হারেম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং খুবই কাকুতি মিনতি ও ক্রন্দন সহকারে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে সত্যের জন্য বিকশিত করে দাও এবং যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর করে দাও। দু'আ তখনও শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে আমার অন্তর সকল বাতিল চিন্তা-ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেল, আনুগত্য ও নিশ্চিন্ততায় আমার অন্তর ভরপুর হয়ে গেল। প্রভাত হতেই আমি হযরত (সা)-এর পবিত্র খেদমতে গিয়ে হাযির হলাম এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। তিনি আমাকে অবিচল ও ইসলামের উপর দৃঢ় ও অটল থাকার জন্য দু'আ করলেন।[২] 'মুস্তাদরাকে হাকিমে' বর্ণিত আছে, যখন হযরত হামযা রাসূল (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলেন, তখন বললেন :

اشهد انك لصادق شهادة المصدق والعارف

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই সত্য নবী, সত্যায়নকারী এবং পৌঁছে দেয়ার মত সাক্ষ্য দিচ্ছি।"

হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! আপনি আপনার দীনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর কসম, যদি দুনিয়া এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবই আমি পেয়ে যাই, তবুও আপনার দীন ত্যাগ করে নিজ পিতা-পিতামহের ধর্ম গ্রহণ করব না। অতঃপর হামযা এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

حمدت الله حين هدى فوادى   الى الاسلام والدين الحنيف

"আর আমি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি করছি যেহেতু তিনি আমার অন্তরে ইসলাম ও দীনে ইবরাহীম (আ) গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন।"

لدين جاء من رب عزيز   خبير بالعباد بهم لطيف

---

১. ইবনুল জাওযী বলেন যে, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের ষষ্ঠ বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাই প্রসিদ্ধ বর্ণনা। হাফিয ইবন হাজার তাঁর ইসাবায় বলেন, হযরত হামযা (রা) নবূয়াতের দ্বিতীয় বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ১৫৬)।

২. মুস্তাদরাক, ৩খ., পৃ. ১৯৩।

"ঐ দীন গ্রহণের তওফীক দিয়েছেন যা সেই পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে আগত, যিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত এবং তাদের প্রতি দয়াবান।"

اذا تليت رسائله علينا تحدر دمع ذى اللب الحصيف

"যখন তাঁর বাণী আমাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন পূর্ণ জ্ঞানবানদের চোখে অশ্রু প্রবাহিত হয়।"

رسائل جاء احمد من هداها بايات مبينت الحروف

"ঐ আল্লাহর বাণী যা আহমদ (সা) মানুষকে হিদায়াত করার জন্য নিয়ে এসেছেন, তা স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য নিদর্শন।"

واحمد مصطفى فينا مطاع فلا تغشوه بالقول العنيف

"আর আহমাদ মুজতবা আল্লাহর মনোনীত, তিনি যা কিছু সত্য নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য করা আমাদের জন্য অপরিহার্য, একে তোমরা কঠিন বাক্যের আড়ালে গোপন করো না।"

فلا والله نسلمه لقوم ولما نقض فيهم بالسيوف

"আল্লাহর কসম, যতক্ষণ আমরা তরবারির মাধ্যমে ফয়সালা না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা) কে মানুষের হাতে কিছুতেই তুলে দেব না।"[১]

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে কুরায়শগণ বুঝে ফেলল যে, হযরত (সা)-এর উপর যুলুম-নির্যাতন করা আর সহজ ব্যাপার নয়।

হযরত হামযা (রা)-এর ক্রোধ

যখন আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আনের দাসী হযরত হামযার নিকট আবূ জাহল কর্তৃক নবী (সা) কে রূঢ় ভাষায় গালি-গালাজের ঘটনা বলল, তখন হযরত হামযার ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল। 'সীরাতে ইবন হিশাম', 'মুস্তাদরাকে হাকিম' এবং 'উয়ূনুল আসার'-এ হযরত হামযা (রা)-এর ক্রোধের বর্ণনা এ ভাষায় বিবৃত হয়েছে : فاحتمل الغضب لما اراد الله به من كرامته "হযরত হামযা (রা) রেগে গেলেন, এ জন্যে আল্লাহ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দানের ইচ্ছা করলেন।"

মনে হয় আল্লাহ জাল্লা শানুহু যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরে নিজ দুশমনদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ঈর্ষা সৃষ্টি করেন। ঈমানের পাল্লা যখনই সমান সমান হয়ে যায়, তখন ডান পাল্লায় আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং বাম পাল্লায় আল্লাহর জন্য ক্রোধে ভরপুর থাকে। যেমনটি নবী করীম (সা) বলেছেন : مَنْ اَحَبَّ لله وَاَبْغَضَ لله فَقَد اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসল এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করল, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিল।"

---

১. রাউযুল, উনুফ, ১খ., পৃ. ১৮৬।

এ অধমের (লেখকের) ধারণায় আল্লাহর জন্য ভালবাসার মতই আল্লাহর জন্য শত্রুতাও অত্যাবশ্যক, এর একটা থেকে অপরটাকে পৃথক ও বিভক্ত করা অসম্ভব ও অবাস্তব বলে মনে হয়। পার্থক্য কেবল এটুকুই যে, কখনো আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রকাশ প্রথমে ঘটে, আর কখনো আল্লাহর প্রতি শত্রুতা পোষণের। কেননা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য, আর আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ আপেক্ষিক উদ্দেশ্য। এ জন্যে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা ঈমানের পাল্লার ডানদিকে আর তাঁর জন্য শত্রুতা পোষণ পাল্লার বামদিকে রাখাই যুক্তিযুক্ত। আল্লাহই ভাল জানেন।

কুরায়শ সর্দারিদের পক্ষ থেকে ইসলামের প্রচার বন্ধ করার জন্য অর্থ ব্যয়, বাদশাহী-নেতৃত্ব প্রদানের প্রলোভন ও হযরত (সা)-এর জবাব

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, হযরত হামযাও ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছেন এবং প্রতিদিন মুসলমানের সংখ্যা বেড়েই চলছে, তখন আবূ জাহল, উতবা, শায়বা, ওলীদ ইবন মুগীরা, উমায়্যা ইবন খালফ, আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব এবং অপরাপর কুরায়শ সর্দারগণ পরামর্শ করে নবী (সা)-এর সাথে কথা বলার জন্য উতবা ইবন রবীয়াকে নির্বাচন করল, রবীয়া জাদুবিদ্যা, কাহিনীকার এবং কবিতাচর্চায় সেকালের একক ব্যক্তিত্ব ছিল।

উতবা নবী (সা)-এর নিকটে এলো এবং বলল, মুহাম্মদ ! তোমার বংশ, মর্যাদা, যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, তুমি সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। তুমি আমাদের প্রতিমাগুলোকে মন্দ বলো, আমাদের পিতা-পিতামহকে বোকা ও মূর্খ বলো, তাই এ ব্যাপারে আমি কিছু কথা বলতে চাই। রাসূল (সা) বললেন, হে আবুল ওলীদ, বলুন, আমি শুনছি।

উতবা বলল, ওহে আমার ভাতিজা ! তোমার এ সব কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য কি? তুমি যদি ধন-দওলতের প্রত্যাশী হও, তা হলে আমরা সবাই মিলে এতটা পরিমাণ সম্পদ একত্র করে দেব যে, বড় থেকে বড় আমীর ব্যক্তিও তোমার সমকক্ষ হতে পারবে না। আর যদি তুমি বিয়ে করতে চাও, তা হলে যে মেয়েকে ইচ্ছা, যতজনকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পার। আর যদি সম্মান ও নেতৃত্ব লাভের ইচ্ছা পোষণ কর, তা হলে আমরা সবাই তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নেব। আর যদি বাদশাহী চাও, তা হলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহ রূপে মেনে নেব। আর যদি তুমি অসুস্থ হয়ে থাক, তবে তোমার চিকিৎসা করাব।

হযরত (সা) বললেন, হে আবুল ওলীদ, আপনার যা বলার ছিল, তা কি বলে শেষ করেছেন ? উতবা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আচ্ছা, এখন আমি যা বলি, তা শুনুন। আপনাদের মাল-সম্পদের প্রয়োজন আমার নেই, আর আপনাদের নেতৃত্ব সর্দারী করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তো আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে আপনাদের প্রতি পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন, তিনি আমার প্রতি একটি কিতাব

অবতীর্ণ করেছেন। তিনি আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি আপনাদেরকে আল্লাহ প্রদেয় নেকীর সুসংবাদ শোনাব এবং তাঁর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করব। আমি আপনাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি। আপনাদের কল্যাণকামী হিসেবে উপদেশ আকারে তা অবহিত করেছি। যদি আপনারা তা গ্রহণ করেন তবে তা আপনাদের জন্য উভয় জগতের সৌভাগ্য ও কল্যাণের নিমিত্ত হবে। আর যদি আপনারা না মানেন, তা হলে আল্লাহ আমার এবং আপনাদের মধ্যে ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমি সবর করব। আর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ - تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِيْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِيْنَ فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। হা-মীম, ইহা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। এ এক কিতাব, এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কুরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে; কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং ওরা শুনবে না। ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে আছে যবনিকা, সুতরাং তুমি তোমাদের কাজ কর আর আমরা আমাদের কাজ করি। বল, আমি তো তোমাদের

মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য—যারা যাকাত দান করে না এবং ওরা আখিরাতেও অবিশ্বাসী। যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও ? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং ওতে রেখেছেন কল্যাণ আর চারদিনের মধ্যে সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য এতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। ওরা বলল, আমরা এলাম অনুগত হয়ে। তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে এই বলে তার বিধান ব্যক্ত করলেন যে, আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। তবুও এরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমি তো তোমাদেরকে আদ ও সামূদের শাস্তির অনুরূপ এক ধ্বংসকর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছি।" (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা : ১-১৩)

তিনি তিলাওয়াত করছিলেন আর উতবা দু'হাত পিছনে জমিতে ঠেক দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কিন্তু যখন তিনি শেষ আয়াত فان اعرضوا -এ পৌঁছলেন, তখন উতবা নিজ হাত নবীজী (সা)-এর মুখের উপর ধরল এবং তাঁকে দোহাই দিয়ে বলল, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আমাদের উপর অনুগ্রহ কর। উতবার ভয় হচ্ছিল যে, না জানি আদ ও সামূদ সম্প্রদায়ের মত এখনই তার উপর আযাব নাযিল হয়ে না যায় ! এরপর হযরত (সা) সিজদা পর্যন্ত আয়াত তিলাওয়াত করলেন। যখন তিলাওয়াত শেষ হলো, উতবাকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবুল ওলীদ, যা কিছু শোনার ছিল, তা আপনি শুনেছেন, এখন আপনার ইচ্ছা। উতবা তাঁর থেকে বিদায় গ্রহণ করে নিজ বন্ধুদের নিকটে ফিরে গেল। কিন্তু উতবা যেন আর সে উতবা ছিল না। কাজেই আবূ জাহল বলে উঠল, উতবা তো সে উতবা নেই, উতবা তো ধর্মত্যাগী হয়ে গেছে ! উতবা বলল, আমি তাঁর কথা শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি এমনটি আর কোনদিন শুনিনি। তা না কবিতা, না জাদু আর না তা কাহিনী, এ তো অন্য কিছু। হে আমার সম্প্রদায় ! যদি তোমরা আমার কথা শোন, তা হলে মুহাম্মদকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আল্লাহর শপথ, যে বাণী আমি তার থেকে শুনে এলাম, অচিরেই তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হবে। আরববাসী যদি তাকে ধ্বংস করে দেয়, তবে তো তোমাদের কোন চিন্তার প্রয়োজনই নেই। আর যদি মুহাম্মদ আরববাসীর উপর বিজয়ী হয় তা হলে তার সম্মান তো তোমাদেরই সম্মান, তার নেতৃত্ব তো তোমাদেরই নেতৃত্ব; কারণ সে তো তোমাদেরই কওমের লোক। কুরায়শগণ বলল, ওহে আবুল ওলীদ! মুহাম্মদ

তোমাকে জাদু করেছে। উতবা বলল, আমার মত তো এটাই, এখন তোমাদের যা ইচ্ছা হয় করো।[১]

সূরা কাফিরূন অবতরণ

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, কুরায়শগণ নবী (সা)-এর কাছে এ আবেদন জানাল যে, হয় আপনি আমাদের মূর্তিগুলোকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকুন। আর যদি এটা সম্ভব না হয় তবে আপনার ও আমাদের মধ্যে এভাবে ফয়সালা হতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের মূর্তিগুলোর পূজা করবেন আর এক বছর আমরা আপনার আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করব। 'মুজামে তাবারানী'তে বর্ণিত আছে যে, এর পরই এ সূরা নাযিল হয় :

قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ   لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ   وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ   وَلاَ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ   وَلاَ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ   لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ

"বলে দাও, হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর, আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও আমি যাঁর ইবাদত করি এবং আমি তার ইবাদতকারী নই, তোমরা যার ইবাদত করে আসছ এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের জন্য, আমার দীন আমার জন্য।" (সূরা কাফিরূন : ১-৬)

ইবন জারীর তাবারীর বর্ণনায় আছে, সূরা কাফিরুন ছাড়াও এ সময় নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّىْ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ   وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ   بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

"বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা ! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ ? অথচ (হে নবী) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো বিফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও।" (সূরা যুমার : ৬৪-৬৬)

মক্কার মুশরিকদের কিছু অর্থহীন ও বাজে প্রশ্ন

এরপর কুরায়শগণ তাঁকে বলল, ভাল কথা, যদি এ প্রস্তাব আপনার মনমত না

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৫; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ২৫৭; খাসাইসুল কুবরা, ১খ., পৃ. ১১৪।

হয় তা হলে অপর একটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি। তা এই যে, আপনি জানেন, আপনার সম্প্রদায় খুবই গরীব আর এ মক্কা শহরও খুবই সংকুচিত, চারদিকে কেবল পাহাড় আর পাহাড়, সবুজ শ্যামলিমার নাম-নিশানাও নেই। কাজেই আপনি আপনার রব, যিনি আপনাকে পয়গাম্বর করে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছে এ মর্মে আবেদন করুন যে, এই শহর থেকে পাহাড়গুলো সরিয়ে দিন[১] যাতে শহর প্রশস্ত হয় এবং সিরিয়া ও ইরাকের মত এ শহরে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করে দিন আর আমাদের পিতৃপুরুষদের, বিশেষত কুসাই[২] ইবন কিলাবকে জীবিত করে দিন যাতে আমরা আপনার ব্যাপারে, আপনি যা বলছেন সে ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি যে, তা সত্য নাকি মিথ্যা। যদি আমাদের পিতৃপুরুষ জীবিত হওয়ার পর আপনাকে সত্য বলে, তা হলে আমরা বুঝব আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন আমরাও আপনাকে সত্য বলে মেনে নেব।

তিনি (সা) বললেন, আমি এ জন্যে প্রেরিত হইনি। আল্লাহ আমাকে যে বাণী দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। যদি তোমরা তা গ্রহণ কর তবে তা হবে তোমাদের সৌভাগ্য, আর যদি তোমরা তা না মানো, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমার ও তোমাদের মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা প্রদান করেন।

কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা, যদি আপনি আমাদের জন্য এমনটি করতে না পারেন তবে আপনি আপনার নিজের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি আপনাকে সত্যায়ন করবেন এবং সর্বত্র আপনার সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার কাছে এ দু'আও করুন যেন তিনি আপনাকে বাগ-বাগিচা, প্রাসাদ এবং সোনা-রূপার ভাণ্ডার দান করেন, যাতে আমরা আপনার মর্যাদা এবং মাহাত্ম্য জানতে পারি। আমরা দেখি যে, আমাদের মত আপনিও জীবিকা অর্জনের জন্য বাজারে গমন করেন।

তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কখনই এ ধরনের প্রার্থনা করব না, আমি এজন্যে প্রেরিত হইনি। আমি তো সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে

---

১. যেমন আল্লাহ বলেন : وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا "যদি কোন কুরআন এমন হতো যদ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেতম অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবুও ওরা তাতে বিশ্বাস করত না। কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। তবে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন"? (সূরা রা'দ : ৩১)

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ. পৃ. ৫১; কুসাই ইবন কিলাবের নাম তারা এ জন্যে বলেছিল যে, তিনি সত্যবাদী ও পরহেযগার ছিলেন। এ ঘটনা প্রসঙ্গে সূরা ফুরকানের ৭–১০ আয়াত নাযিল হয়।

প্রেরিত হয়েছি। যদি তোমরা মানো, তবে দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আর যদি না মানো, তবে আমি ধৈর্যধারণ করব যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালা প্রদান করেন।

কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি আমাদের প্রতি কোন আযাব নাযিল করেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রতি আযাব নাযিল করা কিংবা অবকাশ দেয়া আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ কথার পর আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ উমায়্যা[১] দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, ওহে মুহাম্মদ, আপনার সম্প্রদায় আপনার সামনে এত কথা বলল, আপনি তাদের একটি কথাও গ্রহণ করলেন না ? হে মুহাম্মদ ! আল্লাহর শপথ, যদি আপনি সিঁড়ি লাগিয়ে আসমানেও আরোহণ করেন এবং সেখান থেকে নিজের নবূয়াত ও রিসালতের পরওয়ানা লিখিয়ে নেন আর চারজন ফেরেশতা যদি আপনার সহায়তায় আসেন এবং আপনার নবূয়াতের পক্ষে উচ্চ কণ্ঠে সাক্ষ্য দেন, তা হলেও আমি আপনাকে সত্য বলে মানব না। হযরত (সা) নিরাশ হয়ে গৃহে ফিরে এলেন।[২]

সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম অনুসন্ধান

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কাউকে নবূয়াত ও রিসালতের মর্যাদা দান করেন, সাথে সাথে সেই রিসালতের তথ্য-প্রমাণ, নিদর্শন ও চিহ্নও প্রেরণ করেন. যাতে কোন ব্যক্তি যদি তার অন্তরকে সন্দেহ-সংশয় থেকে মুক্ত রেখে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তা হলে তার নবূয়াত ও রিসালতের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এমন কোন দলীল-প্রমাণ দেয়া হয় না, যা দেখামাত্রই বাধ্য হয়ে নবী (আ)গণের সত্য হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়। এটা এ জন্যে যে, উদ্দেশ্য তো (ঈমানের) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। আর পরীক্ষায় সাফল্য তো অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ যে ঈমান নবূয়াতের আলামত ও রিসালতের নিদর্শনে চিন্তা-ভাবনা করার পর আনা হয়, এ ধরনের ঈমান ও বিশ্বাসের উপরই শাস্তি অথবা প্রতিদান প্রযোজ্য। যে ঈমান ও

---

১. আবদুল্লাহ্ ইবন আবূ উমায়্যা হযরত (সা)-এর ফুফাত ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমার ভাই। মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। উম্মুল মু'মিনীনের সুপারিশে নবী (সা) তাকে ক্ষমা করেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "এবং ওরা বলে, কখনই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না যতক্ষণ না আমাদের জন্য ভূমি থেকে এক ঝর্ণাধারা উত্থিত করবে, অথবা তোমার খেজুর কিংবা আংগুরের একটি বাগান থাকবে, যার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র নদীনালা প্রবাহিত করে দেবে। অথবা তুমি যেমন বলে থাক, আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের উপর ফেলবে অথবা আল্লাহ্ ও ফিরিশতাগণকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে, অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে। কিন্তু আমরা তোমার আকাশে আরোহণ কখনো বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বল, পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক, আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৯০–৯৩)। (ইসাবা, ২খ. পৃ ৩৭)।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৫০।

সত্যায়ন স্বেচ্ছায় ও ইচ্ছামাফিক করা হয়, শরী'আতে তাই কেবল ধর্তব্য, আর যে সত্যায়ন বাধ্যতামূলকভাবে কিংবা আবশ্যিকভাবে অর্জিত হয়, না তা শরী'আতের কাছে ধর্তব্য, আর না তা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। কেবল হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের আস্থা ও ভরসায় ফিরিশতাদের সত্য বলে জানা এটা ইচ্ছাধীন ঈমান ও ঐচ্ছিক সত্যায়ন আর মৃত্যুকালে ফেরেশতাগণকে দেখে তাঁদের সত্য বলে জানা বাধ্যতামূলক ও অনিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস ও সত্যায়ন, যা শরী'আতে ধর্তব্য নয়। এ পৃথিবী পরীক্ষাগার, কাজেই আল্লাহর নবী (আ)গণকে এমন কোন মুজিযা দান করা, যা দেখামাত্রই বাধ্যতামূলকভাবে নবী (আ)গণের উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিরও অস্বীকার করার কোন উপায় না থাকে, এটা সরাসরি প্রজ্ঞাবিরোধী (তাতে পরীক্ষার তাৎপর্য থাকে না)। অধিকন্তু, এর দ্বারা নবী প্রেরণের যে উদ্দেশ্য, তাও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ উদ্দেশ্য তো এটাই যে, মানুষ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ঈমান আনয়ন করবে। যদি বাধ্যতামূলকভাবেই ঈমান আনানো উদ্দেশ্য হতো, তা হলে নবী (আ)গণকে পৃথিবীতে প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল ? আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা যথারীতি স্বীয় বাণী সরাসরি বান্দাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। কোন মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর বাণী শোনার পর অতঃপর কারো পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল।

মক্কার মুশরিকগণ এ ধরনেরই অযৌক্তিক দলীল-প্রমাণ চাইছিল, যাতে দেখামাত্র অপরিহার্যভাবে তাঁর নবূয়াত ও রিসালাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস এসে যাবে। যেমন ফিরিশতাগণের মানুষের সামনে এসে তাঁর নবূয়াত ও রিসালতের সাক্ষ্য দেয়া কিংবা মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তাঁর নবূয়াত-রিসালতের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া। এ ধরনের চিহ্ন ও নিদর্শন প্রকাশকে এজন্যে অস্বীকার করা হয়েছে যে, এরূপ মু'জিযা প্রকাশ প্রজ্ঞা এবং নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের সরাসরি পরিপন্থি। আর আল্লাহ তা'আলারও নিয়ম এটাই, যে সম্প্রদায় চায় না, তারা মুজিযা দেয়ার পরও ঈমান আনে না। ফলে সে সময়েই তাদের আল্লাহর আযাব এসে ধ্বংস করে দেয়। যেমনটি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের ঘটনাবলী কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত আছে। যথা আল্লাহ বলেন :

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نرسِلَ بِالْاٰيٰتِ الاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ

"পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৫৯)

এই বিশেষ বিশেষ নিদর্শনাবলী যা কুরায়শগণ চাচ্ছিল বাস্তবে তা পাঠানোয় কোনই বাধা নেই, কিন্তু কেবল কারণ এটাই যে, পূর্ববর্তী লোকেরা এ ধরনের মু'জিযা দেয়ার পরেও ঈমান আনয়নে অস্বীকার করেছে। এজন্যে তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে এরাও তাদের প্রার্থিত মুজিযা দেয়ার পরও যদি ঈমান না আনে, তা হলে পূর্বের রীতি অনুসারে এদেরকেও ধ্বংস করে দেয়া হবে।

আর যেহেতু নবী করীম (সা) কে রাহমাতুললিল আলামিন করে প্রেরণ করা হয়েছে, এর বরকতে এ ধরনের সকল আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর আপতিত হয়েছিল। কাজেই একটি বর্ণনায় রয়েছে, কুরায়শগণ তাঁর কাছে এ আবেদন করলো যে, সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করুন। তিনি ইচ্ছা করছিলেন যে, এবারে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন। জিবরাঈল (আ) আগমন করলেন এবং বললেন হে নবী করীম (সা) ! আপনি ওদের বলে দিন যে তোমরা যা চাও তাই হবে, কিন্তু জেনে রাখ এই নিদর্শন প্রকাশ হওয়ার পর যদি ঈমান না আন তবে মঙ্গল হবে না, তৎক্ষণাৎ সব ধ্বংস করে দেয়া হবে। কুরায়শগণ বলল, আমাদের প্রয়োজন নেই। এ সমুদয় বর্ণনা আল্লামা সুহায়লীর বক্তব্যের বিশ্লেষণ।[১]

ইয়াহূদী আলিমদের সাথে মক্কার কুরায়শদের পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন বুঝতে পারল যে, আমাদের এ প্রশ্নাবলী ছিল মূর্খতা ও বৈরিতামূলক, তখন পরামর্শ করে নাযর ইবন হারিস ও উকবা ইবন আবূ মুয়াইতকে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রেরণ করল–যাতে তারা সেখানে পৌঁছে ইয়াহূদী আলিমদের সাথে তাঁর ব্যাপারে অনুসন্ধান করে। তারা নবী (আ) বিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানী এবং পয়গাম্বরগণের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত ও জ্ঞাত ছিল। এ দু'ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলো এবং ইয়াহূদী আলিমদের নিকট সমুদয় ঘটনা উল্লেখ করল। ইয়াহূদী আলিমগণ বলল, তোমরা তিনটি জিনিসের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সা) কে জিজ্ঞেস করবে। (প্রথম) ঐ সকল ব্যক্তি কারা, যারা গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেছিল আর তাদের ঘটনাটি কি ? অর্থাৎ তাঁর নিকট আসহাবে কাহ্ফের ঘটনা জিজ্ঞেস কর। (দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি কে ছিল, যে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত অভিযান চালিয়েছে। অর্থাৎ যুল কারনায়নের ঘটনা জিজ্ঞেস কর। (তৃতীয়) রূহ কি বস্তু ? মুহাম্মদ (সা) যদি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দেন এবং তৃতীয়টির ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন, তবে বুঝবে তিনি প্রকৃতই প্রেরিত নবী, অন্যথায় সে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক।

নাযর এবং উকবা আনন্দে গদগদ চিত্তে মক্কায় ফিরে এল এবং কুরায়শদের বলল, আমরা একটি নিষ্পত্তিযোগ্য বক্তব্য নিয়ে এসেছি। তারা নবীজী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং সেখানে ঐ প্রশ্নাবলী পেশ করল। আগামীকাল পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হবে, এ আশায় হযরত (সা) বললেন, আগামীকাল জবাব দেব। মানব প্রকৃতি অনুসারে তিনি ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলতে ভুলে গেলেন। কয়েকদিন অপেক্ষার পর সূরা কাহ্ফের আয়াতসমূহ নাযিল হলো, যাতে আসহাবে কাহ্ফ ও যুল কারনায়নের কিসসা বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো এবং তৃতীয় জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى অর্থাৎ "আপনি বলে দিন, রূহ-এর হাকীকত তোমাদের বুঝে আসবে না।" এতটুকু জানা যথেষ্ট যে, রূহ এমন

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১৮৭।

একটি বস্তু, আল্লাহর নির্দেশে যখন তা দেহে প্রবেশ করে, তখন দেহ জীবিত হয় আর যখন তা বেরিয়ে যায়, তখন মানুষ মরে যায় (মুযিহুল কুরআন)। আর মানবীয় কারণে হযরত (সা) 'ইনশা আল্লাহ' বলা ভুলে যাওয়ার দরুন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايءٍ اِنِّى فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ

"কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো না যে, আমি তা আগামীকাল করব, আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ কথা না বলে, যখন ভুলে যাও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো...।" (সূরা কাহফ : ২৩-২৪)

এ জন্যে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলতেন, যদি এক বছর পরেও ইনশা আল্লাহ স্মরণে আসে, তবে তখনই বলে নাও, যাতে ঐ ভুল এবং ভ্রান্তি অপনোদন হয়ে যায়। এক বছর পর ইনশা আল্লাহ্ বলার অর্থ এটাই। এটা অর্থ নয় যে, তালাক বা দাস মুক্তির ক্ষেত্রেও এক বছর পর তা মূলতবী হয়ে যাবে।

কাজেই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছার উপর ভরসা করে 'আমি আগামীকাল এটা করব' এটা বলা আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়। এজন্যে যদি কোন ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ইনশাআল্লাহ বলা ভুলে যায়, তবে এর প্রতিকার হলো, যখনই স্মরণ হবে, তখনই ইনশা আল্লাহ্ বলবে, যাতে ছুটে যাওয়ার প্রতিকার হয়ে যায়।

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ উদ্দেশ্য কখনই ছিল না যে, তালাক এবং দাস মুক্তি কসম এবং ঋণের ব্যাপারেও এক বছর পর ইনশাআল্লাহ বলা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম ইবন জারীর ও হাফিয ইবন কাসীর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের এ অর্থই করেছেন। ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করুন।

রূহ এবং নফস

রূহ-এর প্রকৃতি নিয়ে আলিমদের অনেক উক্তি রয়েছে, কিন্তু বাস্তব কথা হলো, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ ছাড়া তা কারো জানা নেই। হাফিয ইবন আরসালান মাতনুয-যাবদীনে বলেন :

والروح ما اخبر منها المجتبى فنمسك المقال عنها ادبا

"রূহ তো হলো তাই, যে সম্পর্কে নবী মুজতবা (সা) অবহিত করেছেন। আদব ও শিষ্টাচারবশত আর কিছু বলা থেকে আমরা বিরত থাকলাম।"

এ ব্যাপারে দার্শনিক এবং চিকিৎসকদের বিভিন্ন বক্তব্য উদ্ধৃত করে পাঠকদের হয়রানী পেরেশানীতে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সা)-এর সুন্নত রূহ ও নফসের ব্যাপারে কি নির্দেশ দিয়েছে এবং কোন্ সীমা পর্যন্ত, সংক্ষিপ্তাকারে এটা বলে দেয়া যা আমাদের অবহিত করেছেন। জমহূর (অধিকাংশ)

আলিমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তুর নাম, যা শরীরে এভাবে অবস্থান করে, যেমনটি গোলাপের মধ্যে পানি, যায়তুনের মধ্যে তেল এবং অঙ্গারের মধ্যে আগুন অবস্থান করে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সূক্ষ্ম বস্তু জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ জড় দেহ জীবিত থাকে। আর যখন এ সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তু জড় দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন ঐ দেহ মরে যায়। সূক্ষ্ম আলোকিত বস্তুটির সাথে জড় দেহের সংযুক্তি ও সম্পৃক্তির নামই আয়ুষ্কাল ও জীবন। আর দেহ সত্তা থেকে তার পৃথক ও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার নামই মৃত্যু। আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হওয়া কুরআনের আয়াত ও পর্যাপ্ত পরিমাণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উদাহরণত রূহকে ধরা এবং ছেড়ে দেয়া এবং ফেরেশতাগণ কর্তৃক তা বের করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া, মৃত্যুকালীন রূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া—রূহের এসব গতি-প্রকৃতি কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। এ থেকে রূহের বস্তু হওয়াটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

হাদীস শরীফে আছে, যখন মু'মিন ব্যক্তির রূহ কবয করা হয়, তখন মু'মিনের দৃষ্টি তা দেখে। মু'মিনের রূহ পাখির মত বেহেশতের বৃক্ষরাজিতে উড়তে থাকে এবং সেখানকার ফল-ফলাদি আহার করে। আরশের শামাদানে গিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করে। মু'মিনের রূহকে ফেরেশতাগণ জান্নাতের কাফনে জড়িয়ে আসমানে নিয়ে যান এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক আসমানের ঊর্ধ্বতন ফেরেশতা দরজা পর্যন্ত তার অনুগমন করেন, এমন কি অবশেষে তা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর কাফিরদের রূহকে সর্বনিম্নতম স্থান সিজ্জিনে নিক্ষেপ করা হয়। মুমিনের রূহের জন্য ফেরেশতাগণ বেহেশতের সূক্ষ্ম কাফন নিয়ে আসেন আর কাফিরের রূহের জন্য মোটা চটের অনুরূপ চাদরের কাফন নিয়ে আসেন। মুমিনের রূহ আতরযুক্ত ও সুরভিত হয়ে থাকে। ফেরেশতাদের যে দলের নিকট দিয়েই অতিক্রম করে, তারা বলেন, সুবহানাল্লাহ কি পবিত্র রূহ! আর কাফিরের রূহ পুঁতিগন্ধময় হয়। হাফিয ইবনুল কাইয়্যেম (র) তাঁর 'কিতাবুর রূহ' পুস্তকে রূহের সূক্ষ্ম বস্তু হওয়ার সপক্ষে একশ' ষোলটি দলীল দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন। এসব দলীলে কেবল আল্লাহর কিতাব, সুন্নাতে রাসূল (সা) এবং পূর্ববর্তী মনীষীগণের মতামতই উপস্থাপন করেছেন। উক্ত হাফিয সাহেব বলেন, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (সা) এবং সাহাবীগণের ঐকমত্য এ বক্তব্য প্রমাণিত করে যে, রূহ একটি সূক্ষ্ম বস্তুর নাম এবং সুস্থ ও যথাযথ প্রকৃতি এরই সাক্ষ্য।[১]

ইমাম গাযালীর উস্তাদ ইমামুল হারামাইন তাঁর 'ইরশাদ' নামক পুস্তকে রূহ-এর এ বর্ণনাই দিয়েছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর এটাই আল্লামা তাফতাযানী 'শারহে মাকাসিদ'-এর পরলোক বিষয়ক আলোচনায় উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা বুকাঈ 'সিররুর রূহ' কিতাবে ইমামুল হারমাইনের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন :

---

১. ইবনুল কাইয়্যেম, কিতাবুর রূহ, পৃ. ২৮৪।

على هذا القول دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وادلة العقل والفطرة

কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল, সাহাবাগণের ইজমা এবং জ্ঞান ও স্বভাব-প্রকৃতি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রূহ একটি সূক্ষ্ম বস্তু যা এই জড় দেহে পরিব্যাপ্ত থাকে (সিররুর-রূহ, পৃ. ৪)। আর শায়খ ইয্যুদ্দীন আবদুস সালাম বলেন :

ويجوز ان تكون الارواح كلها نور لطيفة شفاقة ويجوز ان يختص ذلك بارواح المؤمنين والملائكة دون ارواح الكفار والشياطين

"সম্ভবত সমস্ত রূহই নূরান্বিত, সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। আরও সম্ভাবনা আছে যে, কাফির ও শয়তানদের রূহ ছাড়া সকল মুমিন ও ফেরেশতাদের জন্য নূরান্বিত রূহ নির্দিষ্ট।"[১] যেমন শিঙ্গা বিষয়ক হাদীসে আছে :

ان اسرافيل يدعوا لارواح فتاتيه جميعا ارواح المسلمين تتوهج نورا والاخرى مظلمة

"ইসরাফীল (আ) রূহসমূহকে আহ্বান করবেন। মুসলমানদের রূহসমূহ নূরান্বিত ও প্রোজ্জ্বল অবস্থায় উপস্থিত হবে আর কাফিরদের রূহ ঘুটঘুটে অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায়।"[২]

এ হাদীস থেকে এটা জানা যায় যে, নূরান্বিত হওয়া মু'মিনদের রূহের জন্য নির্দিষ্ট আর কাফিরের রূহ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও প্রকৃতি ও সহজাতভাবে মু'মিন ও কাফির উভয়ের রূহই নূরানী ছিল। যেমন হাদীস শরীফে আছে :

كل مولد يولد على الفطر فابواه يهودانه وينصر انه ويمجسانه .

"প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের পিতামাতা সন্তানদেরকে ইয়াহূদী, নাসারা কিংবা অগ্নিপূজকে পরিণত করে।"

মু'মিনের রূহ ঈমানের দরুন এ জন্যে অধিক ঔজ্জ্বল্য লাভ করে যে, ঈমান প্রকৃতিগতভাবেই একটি নূর। যেমন হাজরে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে নাযিল হয়েছিল, তখন দুধ অপেক্ষা সাদা ছিল। আদম সন্তানের পাপরাশি একে কালো বানিয়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে প্রকৃতিগতভাবে কাফিরদের রূহ নূরান্বিত থাকলেও পরে শিরক এবং কুফরীর অপরাধের দরুন পরে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ কুফর তথা আল্লাহ্র অবাধ্যতা প্রকৃতিগতভাবেই অন্ধকার, আর ঈমান হচ্ছে সঙ্গতভাবেই নূর। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُوْلٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১. শারহে সুদূর, পৃ. ২১৬।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯।

"যারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কাফির, তাগূত (বিদ্রোহী)-রাই তাদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়।" (সূরা বাকারা : ২৫৭)

উল্লিখিত আয়াতটি এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ঈমান হচ্ছে নূর এবং কুফর হচ্ছে অন্ধকার। আর কিয়ামতের দিন মু'মিনদের চেহারা উজ্জ্বল ও নূরান্বিত হওয়া এবং কাফিরদের চেহারা কালো ও অন্ধকারময় হওয়ার কথা কুরআন মজীদে স্পষ্ট বর্ণিত আছে : يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ অর্থাৎ "ঐদিন তাদের কারো চেহারা হবে শুভ্র আর কারো চেহারা হবে কৃষ্ণবর্ণ।"

এ সব কিছুই ঈমানকে নূর এবং কুফরকে অন্ধকার হিসেবে প্রকাশ করার জন্য করা হবে। এ কারণেই আল্লাহর ফেরেশতাগণ মু'মিনের রূহকে সাদা কাফনে আর কাফিরের রূহকে কালো মোটা চাদরের কাফনে গ্রহণ করে নিয়ে যাবেন। মোটকথা, কুরআনের এ সব আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে এটা জানা গেল যে, আনুগত্যের রং সাদা এবং পাপের রং কালো। যার বিস্তারিত বর্ণনার এখানে অবকাশ নেই।

রূহ ও নফসের মধ্যে কি পার্থক্য

কিছু কিছু আলিমের মতে রূহ ও নফস একই বস্তু; কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলিমগণের মতে রূহ ও নফস দুটি পৃথক বস্তু।

উস্তাদ আবুল কাসিম কুশায়রী (র) বলেন, প্রশংসনীয় চরিত্রের খনি ও উৎসের নাম হচ্ছে রূহ এবং দুষ্ট চরিত্রের খনি এবং উৎসের নাম হচ্ছে নফস। কিন্তু সূক্ষ্মদেহী হওয়ার ব্যাপারে উভয়ে এক। যেমন ফেরেশতা এবং শয়তান উভয়ে সূক্ষ্মদেহী হওয়ার ব্যাপারে এক। কিন্তু ফেরেশতা নূর দ্বারা সৃষ্ট এবং শয়তান আগুন দ্বারা তৈরি। ফেরেশতাকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দিয়ে এবং শয়তানকে আগুন দিয়ে। যেমন সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে খোলাখুলি বলা হয়েছে। হাফিয ইবন আবদুল বার এ ব্যাপারে যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তা হলো এই :

ان الله خلق ادم وجعل فيه نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحمله وسخاءه ووفاءه ومن النفس شهوته وطيشه وسفهه وغضبه ونحو هذا .

"আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ) কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে একটি নফস ও একটি রূহ রাখলেন। ফলে রূহ থেকে ক্ষমা, বিবেচনা, ধৈর্য, দানশীলতা ও বিশ্বস্ততা ইত্যাদি প্রকাশ পায় এবং নফস থেকে কুপ্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয় প্রবণতা, নির্বুদ্ধিতা, ক্রোধ ও এ ধরনের দুশ্চরিত্রতামূলক কাজগুলো প্রকাশ পায়।"[১]

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ ১৯৭।

মোটকথা হলো, প্রশংসনীয় চরিত্র এবং পসন্দনীয় গুণাবলী রূহের দ্বারা প্রকাশ পায় আর চরিত্রের দোষসমূহ নফস আম্মারাহ থেকে প্রকাশ পায়। খোদ কুরআন এবং হাদীস নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই এটা বুঝা যায় যে, কুপ্রবৃত্তি, নির্বুদ্ধিতা, ইন্দ্রিয় প্রবণতা এবং এ ধরনের চারিত্রিক দূষণীয় কর্মগুলো কুরআন এবং হাদীসে নফস আম্মারাহর সাথেই সম্পৃক্ত করা হয়েছে, রূহের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اَنْفُسُكُمْ

"তোমাদের জন্য জান্নাতে তাই রয়েছে যা তোমরা ইচ্ছা কর।"

(সূরা হা-মীম সাজদাহ : ৩১)

তিনি আরো বলেছেন : وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ "মানুষ লোভহেতু স্বভাবত কৃপণ।" (সূরা নিসা : ১২৮)

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْس عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

"পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজকে প্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে, জান্নাত হবে তাদের আবাসস্থল।"

(সূরা নাযি'আত : ৪০-৪১)

এ আয়াতসমূহে প্রবৃত্তি, লোভ, ইত্যাদি কামনা-বাসনাকে নফসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর এমনটি বলেননি যে :

ولكم فيها تشتهى ارواحكم احضرت الارواح الشح ونهى الروح عن الهوى

এবারে নির্বুদ্ধিতার ব্যাপারটি দেখুন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهِمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ

"যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, একমাত্র সেই ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ থেকে বিমুখ হবে!" (সূরা বাকারা : ১৩০)

এ আয়াতে নির্বুদ্ধিতাকে নফসের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন এবং الا من سفهت روحه বলেননি। ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি ও ক্রোধের কথা ধরুন, হাদীস শরীফে এসেছে, ঐ ব্যক্তি পাহলোয়ান ও শক্তিশালী বীর, যে ক্রোধের অবস্থায় নিজের নফসকে সংযত রাখে। এখানে বলা হয়নি 'যে রূহকে সংযত রাখে।' অধিকন্তু হাদীসসমূহে নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে অধিক তাকিদ এসেছে। আর নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকে 'জিহাদে আকবর' বা বড় জিহাদ বলা হয়েছে। কিন্তু রূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করার কথা কোন হাদীসে দেখা যায়নি। এমনকি একটি দুর্বল সনদ বিশিষ্ট হাদীসে এসেছে : اعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك অর্থাৎ "তোমার সবচে' বড় দুশমন হচ্ছে তোমার নফস, যা তোমার দু' পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে।" এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা যায়, প্রথমত নফস হচ্ছে সবচে' বড় দুশমন আর দ্বিতীয় যে বিষয় জানা গেল, সেটি হলো

দু'পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে নফসের অবস্থান। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় রূহ হচ্ছে নফস থেকে পৃথক বস্তু। কারণ রূহ মানুষের শত্রু নয়; দ্বিতীয়ত এই যে, রূহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবাহিত ও বিতৃত, পাঁজরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। অধিকন্তু, হযরত খুযায়মা ইবন হাকিম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা) কে নফসের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এটা কলবে। এ হাদীসটি তাবারানীকৃত 'মু'জামে আওসাতে' বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।[১] এছাড়া হিংসা এবং অহংকারকে কুরআন মজীদে নফসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে : حسدا من عند انفسهم "ঈর্ষামূলক মনোভাব বশত..."(সূরা বাকারা : ১০৯) لقد استكبروا فى انفسهم। "এবং ওরা ওদের অন্তরে (নফসে) অহংকার পোষণ করে..."(সূরা ফুরকান : ২১)। অধিকন্তু, আল্লাহ তা'আলার এ বাণী : ان النفس لامارة بالسوء "নফস অবশ্যই মন্দ কাজের জন্যে অধিক নির্দেশদাতা।" এর উপর সরাসরি নির্ভর করে যে, সমস্ত মন্দ ও খারাপীর খনি ও উৎসমূল হলো নফস। পবিত্র কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে, ان الروح لامارة بالسوء "নিশ্চয়ই মন্দ কাজের জন্যে অধিক নির্দেশদাতা।" হযরত ওহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, রূহ মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে এবং নফস খারাপীর দিকে; কলব যদি মু'মিন হয় তবে রূহ এর আনুগত্য করে (ইবন আবদুল বার-এর তামহীদ থেকে)।[২] তাবাকাতে ইবন সাদ-এ ওহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রথমে মাটি ও পানি দিয়ে হযরত আদম (আ)-এর পুত্তুলি তৈরি করেন। অতঃপর এতে নফস সৃষ্টি করেন। এর পরে তাতে রূহ ফুঁকে দেন।[৩] কাজেই জানা গেল যে, নফস ও রূহ আলাদা আলাদা বস্তু। রূহ 'আলমে আমর' থেকে আর নফস 'আলমে খালক' থেকে সৃষ্ট। আল্লামা বুকাঈ 'সিররুর-রূহ' কিতাবে লিখেছেন :

وفى زاد المسير لابن الجوزى فى تفسير سورة الزمر عن ابن عباس ابن ادم نفس وروح فالنفس العقل والتمييز والروح النفس والتحريك فاذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه وقال ابن جريج فى الانسان روح ونفس بينهما حاجز فهو تعالى يقبض النفس عند النوم ثم يردها الى الجسد عند الانتباه فاذا اراد اماتة العبد فى النوم لم يرد النفس وقبض الروح والله اعلم

"আল্লামা ইবনুল জাওযীর কিতাব 'যাদুল মাসীরে' সূরা যুমারের তাফসীরে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, মানুষ রূহ ও নফসের সমষ্টি। মানুষ নফস দ্বারা পাওয়ার চেষ্টা ও বিবেচনা করে এবং রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে ও নড়াচড়া

---

১. শারহুস সুদূর, পৃ. ২১৭।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬।

৩. প্রাগুক্ত।

করে। যখন মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তার নফসকে কবয করে নেন, কিন্তু রূহ কবয করেন না। ইবন জুরায়জ বলেন, মানুষের মধ্যে একটি রূহ এবং একটি নফস থাকে, আর এর মধ্যে একটি পর্দা অন্তরাল থাকে। ঘুমানোর সময় আল্লাহ নফসকে কবয করে নেন এবং জাগ্রত হওয়ার সময় তা ফিরিয়ে দেন। আর যখন আল্লাহ্ কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুদানের ইচ্ছা করেন, তখন তার নফস ফিরিয়ে দেন না এবং রূহকে কবয করে নেন। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

রূহের আকৃতি

রূহের আকৃতি দৃশ্যত তাই, যেমন মানুষ। যেমন শরীরের চোখ নাক হাত পা আছে, তেমনি রূহেরও চোখ নাক হাত পা ইত্যাদি আছে। প্রকৃত মানুষ তো রূহ; আর এ দৃশ্যে শরীর হচ্ছে রূহের পোশাকতুল্য। শরীরের হাত রূহের হাতের জন্য জামার আস্তিনের মত এবং পদদ্বয় পায়জামার অনুরূপ, আর মাথা টুপির ন্যায় ও চেহারা নেকাবের সদৃশ। তা এভাবেই কিয়াস করা যায়।

আল্লামা আরেফ রূমী বলেন :

جان همه نور است وتن رنگست بو رنگ وبو بگزار دیگر آن بگو
رنگ دیگر شد ولیکن جان پاك فارغ از رنگست وازار كان خاك
عالم خلق است باسو جهات بے جهت دان عالم امر و صفات
بے جهت دان عالم امرای صنم بے جهت تر باشد آمر لا جرم
روح من چون امر ربی مختفی است هر مثالیكه بگویم منتفی است

"প্রাণ পুরোটাই হচ্ছে আলো আর দেহ হচ্ছে রং ও বর্ণের সমষ্টি। কাজেই দেহ ও রং ত্যাগ কর এবং অন্য কথা বল। রং বদলে যায় কিন্তু আত্মা পবিত্র ও রং থেকে বিচ্ছিন্ন। মাটির বৈশিষ্ট্য তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সৃষ্টি জগতে শত শত দিক রয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্র নির্দেশ 'রূহ' এবং সিফাতের কোন দিক নেই।"

কাফিরগণ কর্তৃক হযরত (সা) কে কষ্ট দেয়া

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে, তখন তারা এটা বরদাশত করতে পারল না এবং যিনি এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছিলেন, তাঁর সাথে তারা দুশমনি ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে লেগে গেল, তাওহীদের মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবী (সা) কে এ পরিমাণ কষ্ট-যাতনা দিতে হবে, যাতে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

১. 'মু'জামে তাবারানী'তে হযরত মুনীব গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে লোকদের উদ্দেশ্য করে বলতে শুনলাম, হে লোক সকল!

বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং স্বস্তি লাভ করো। কিন্তু বদবখত কতিপয় দুর্ভাগা তাঁকে গালি-গালাজ করছিল এবং তাঁর প্রতি থু থু নিক্ষেপ করছিল; আর কেউ নিক্ষেপ করছিল মাটি। এভাবে দুপুর হয়ে গেল। ঐ সময় একটি বালিকা পানি নিয়ে এল এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ও হাত ধুয়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কে ? লোকেরা বলল, তাঁর কন্যা যয়নব (রা)।

ইমাম বুখারী একই সনদে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হারিস ইবন হারিস গামিদী (রা) থেকেও বর্ণিত আছে। তাতে অতিরিক্ত আছে যে, রাসূল (সা) হযরত যয়নব (রা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, প্রিয়তমা কন্যা! তুমি তোমার পিতার পরাজিত ও অপদস্থ হওয়ায় দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ো না। ইমাম বুখারী কর্তৃক তাঁর 'তারিখ'-এ বর্ণিত এবং তাবারানী, আবূ নুয়ায়ম, আবূ যুরআ ও আল্লামা দিমাশকী হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১]

২. হযরত তারিক ইবন আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি যেতে যেতে বলছেন, হে লোক সকল ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, মুক্তি পাবে, কল্যাণ লাভ করবে। এদিকে তাঁর পিছে পিছে এক ব্যক্তি পাথর ছুঁড়ছিল, আর হযরতের পবিত্র দেহ রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে। লোকটি বলছিল, হে লোক সকল ! এর কথা শুনো না, কেননা সে মিথ্যাবাদী। এটি ইবন আবূ শায়বার বর্ণনা।[২]

৩. বনী কিনানার এক শায়খ বলেন, আমি নবী করীম (সা) কে যুল-মাজায বাজারে দেখলাম, তিনি বলতে বলতে যাচ্ছিলেন যে, হে লোক সকল! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, মুক্তি পাবে, কল্যাণ লাভ করবে। আর আবূ লাহাব তাঁর প্রতি মাটি নিক্ষেপ করতে করতে বলছে, হে লোকেরা ! তোমরা এর ধোঁকায় পড়ো না; এ তোমাদেরকে লাত ও উযযা থেকে বিমুখ করতে চায়। আর রাসূলুল্লাহ (সা) তার কথায় একটুও ভ্রূক্ষেপ করছিলেন না।[৩]

৪. হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেন, আমি একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কে মুশরিকগণ যে কষ্ট দিয়েছে, তা বর্ণনা করুন। আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) বললেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) নামায আদায় করছিলেন, এ সময় উকবা ইবন আবূ মুয়াইত একটা কাপড় তাঁর গলায় দিয়ে এমন জোরে পেঁচাতে শুরু করলো যে, এতে তাঁর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। সামনের দিক থেকে হযরত আবূ বকর (রা) এসে পড়লেন এবং উকবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। তখনই হযরত আবূ বকর (রা) এ আয়াত পাঠ করলেন :

---

১. কানযুল উম্মাল, ৬খ. পৃ. ৩০৬।

২ প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ. ৩০২।

৩. মুসনাদে আহমদ, ৪খ. পৃ. ৬৩।

اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

"তোমরা এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যে বলে, আমার রব আল্লাহ। আর সে ব্যক্তি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে।"

ফিরাউন ও হামান যখন হযরত মূসা (আ) কে হত্যার পরামর্শ করল, তখন ফিরাউনের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে গোপনে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল, সে তাদেরকে যে কথা বলেছিল, সেটাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করেছেন :

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ

"ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি, যে মুমিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজন লোককে এ জন্যেই হত্যা করবে যে, সে বলে, আল্লাহ আমার রব। অথচ সে তোমাদের রব্বের নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে।" (সূরা মুমিন : ২৮)

মুসনাদে বাযযার ও দালাইলে আবূ নুয়াইমে মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আলী (রা) খুতবার শুরুতে বললেন, বল দেখি সবচে' শক্তিশালী ও বাহাদুর ব্যক্তি কে ? লোকেরা বলল, আপনি। আলী (রা) বললেন, আমার অবস্থা তো এই যে, কেউ যদি আমার সাথে মুকাবিলা করে, তখন আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করি। সবচে' বেশি শক্তিশালী তো ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)। আমি একবার দেখেছিলাম, কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (সা) কে মারতে উদ্যত অবস্থায় তিনি বলছেন : انت الالهة الها واحدا অর্থাৎ "তুমিই আমাদের সমস্ত মাবূদকে এক মাবূদ বানিয়ে দিয়েছ।" আমাদের কারোই এ সাহস হচ্ছিল না যে, তাঁর নিকটে যাই এবং তাঁকে দুশমনদের নিকট থেকে ছাড়িয়ে আনি। হঠাৎ সেখানে হযরত আবূ বকর (রা) এসে পড়লেন এবং তিনি শত্রুর দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে একে এক ধাক্কা, ওকে এক ঘুষি দিলেন। এ সময় যেমন সেই মর্দে মুমিন ফিরাউন ও হামানকে বলেছিলেন اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ অনুরূপভাবে আবূ বকরও কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলছিলেন ঃ وَيْلَكُمْ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ অর্থাৎ "আফসোস, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্যে হত্যা করবে, সে বলে, আমার প্রভু আল্লাহ... ।"

হযরত আলী (রা) এ কথা বলে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি যে, বলো, ফিরাউনের বংশের সেই ব্যক্তি উত্তম ছিলেন, না আবূ বকর ? লোকজন চুপ করে রইল। তিনি অতঃপর বললেন, আল্লাহর কসম, আবূ বকরের এক ঘন্টা ফিরাউন বংশীয় ঐ মর্মে মু'মিনের সারা জীবন থেকে

মর্যাদার দিক থেকে উত্তম। ঐ ব্যক্তি তার ঈমানকে গোপন করেছিলেন আর আবূ বকর তাঁর ঈমানকে নির্ভয়ে প্রকাশ করেছিলেন। [ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ১২৯) ما لقى النبى ﷺ واصحابه من المشركين بمكة অধ্যায়]। অধিকন্তু, ঐ ব্যক্তি কেবল মুখে উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন। আর আবূ বকর (রা) মৌখিক উপদেশ ছাড়াও হাত দ্বারা নবী (সা)-এর সাহায্য- সহায়তা করেছেন।

৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা)-এর এক বর্ণনায় আছে, যা ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের خلق افعال العباد অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন আর আবূ ইয়ালা ও ইবন হিব্বান এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন যে, দুশমন যখন পৃথক হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন :

والذى نفسى بيده ما ارسلت اليكم الابالذبح

"ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মত (আল্লাহ্র চরম অবাধ্য) লোকদের হত্যা করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (ফাতহুল বারী, ما لقى النبى ﷺ واصحابه من المشركين بمكة অধ্যায়)।

আর 'দালাইলে আবূ নুয়াইম', 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'সীরাতে ইবন ইসহাকে'র বর্ণনায় এ-ও আছে যে, তাঁর এ কথা বলামাত্র কাফিরদের উপর পরাজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ অবস্থানে মাথা হেঁট করে বসে রইল।[১] কেননা তারা জানত যে, তিনি (সা) যা বলবেন, তা অবশ্যম্ভাবী।

৬. মুসনাদে আবূ ইয়া'লা ও মুসনাদে বাযযারে হযরত আনাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে, একবার কুরায়শগণ তাঁকে এতই মেরেছিল যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। আবূ বকর (রা) তাঁকে সাহায্যের জন্য এলে ওরা তাঁকে ছেড়ে আবূ বকরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় হাসান সনদে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, ওরা আবূ বকর (রা) কে এতই প্রহার করেছিল যে, তাঁর মাথা যখম হয়ে গিয়েছিল। যখমীর কারণে তিনি মাথায় হাতও দিতে পারছিলেন না।[২]

৭. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) বলেন, একবার আমি নবী করীম (সা)-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফরত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তিনি তাওয়াফ করছিলেন আর উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, আবূ জাহল ও উমায়্যা ইবন খালফ হাতীমে বসেছিল। তিনি যখন ওদের সামনে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন ওরা তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে কিছু অশোভন বাক্য বলল। তিনি দ্বিতীয়বার যাওয়ার সময়ও ওরা এরূপ বলল। যখন তিনি তৃতীয়বার ওদের সামনে এলেন, তখনও ওরা একই ধরনের বেহুদা কথা বলছিল। এতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৪৪; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৯৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১২৯।

বললেন, আল্লাহর কসম, শীঘ্রই তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব না আসা পর্যন্ত তোমরা বিরত হবে না। হযরত উসমান (রা) বলেন, তখন সেখানে এমন কোন ব্যক্তি ছিল না, যে ভয়ে কাঁপছিল না। এ বলে তিনি গৃহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। আমরাও তাঁর অনুগমন করলাম। তখন হযরত (সা) আমাদেরকে বললেন :

ابشروا فان الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر دينه ان هؤلاء الذين تدرون ممن يذبح بايديكم عاجلا فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بايدينا

"তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ অবশ্যই তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন, তাঁর বাণীকে পূর্ণ করবেন, স্বীয় দীনকে সাহায্য করবেন। আর ঐ লোক, যাদের তোমরা দেখছ, শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের হাতে হত্যা করাবেন। হযরত উসমান (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমরা দেখেছি, আল্লাহ ওদেরকে আমাদের হাতে যবেহ করিয়েছেন।" এ বর্ণনা দারা কুতনীর।[১] 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে'ও এ বর্ণনা আছে এবং ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ.১২৮)-তেও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) হারাম শরীফে নামায আদায় করছিলেন। এবং আবূ জাহল ও তার সঙ্গী-সাথীরাও[২] সেখানে উপস্থিত ছিল। আবূ জাহল[৩] বলল, এমন কেউ নেই কি, যে অমুক উটের নাড়িভুড়ি উঠিয়ে আনবে আর মুহাম্মদ (সা) যখন সিজদায় যাবে, তার পিঠের উপর রেখে দেবে ? ঐ সময়[৪] সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ছিল, অর্থাৎ উতবা ইবন আবূ মুয়াইত,[৫] সে উঠল এবং উটের ঐ নাড়িভুড়ি এনে রাসূল (সা)-এর পিঠের উপর রেখে দিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখছিলাম, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। ওদিকে মুশরিকরা পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে হাসছিল। আর হাসির চোটে একে অপরের উপর গড়িয়ে পড়ছিল।

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১০৪।

২. আবূ জাহলের সঙ্গী-সাথী দ্বারা ঐ সব লোক বুঝায়, যাদের নাম নিয়ে হুযূর (সা) বদদু'আ করেছিলেন। যেমনটি এ বর্ণনারই শেষে উল্লেখ আছে। আর মুসনাদে বাযযারে তা বিশদভাবে উল্লেখিত আছে। (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০১)।

৩. সহীহ বুখারীতে আবূ জাহলের নাম স্পষ্ট উল্লেখ নেই, মুসলিমের রিওয়ায়াতে উল্লেখ আছে। (ফাতহুল বারী)।

৪. প্রকৃতপক্ষে তো আবূ জাহলই সবচে' পাপিষ্ঠ ছিল। কেননা সে ছিল ঐ সম্প্রদায়ের ফিরাউন, কিন্তু ঐ সময়ে সর্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য উকবা ইবন আবূ মুয়াইতই ছিল। কেননা আবূ জাহল ও অন্যান্যরা তো কেবল উস্কানী দিয়েছিল, আর ঐ হতভাগ্য তা কার্যে পরিণত করেছিল। আর প্রকাশ থাকে যে, কার্যে বাস্তবায়ন উস্কানীর চেয়ে কঠিন অপরাধ। যেমন 'কুদার' জনগণকে উস্কানী দেয়ার ফলে তারা সালিহ (আ)-এর উটনীকে যবেহ করে ফেলল, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا এজন্যে আল্লাহ তা'আলা তাকেই সবচে' বেশি পাপিষ্ঠ বলেছেন।

৫. উকবা ইবন আবূ মুয়াইতের নামের উল্লেখ মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসীতে আছে (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)। উপরন্তু এ হাদীসটি ইমাম বুখারী কিতাবুল জিহাদের শেষে طرح جيف المشركين فى البر অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ঐ মুহূর্তে সেখানে হযরত ফাতিমা এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি চার-পাঁচ বছরের বালিকা মাত্র, দৌড়ে গিয়ে হযরতের উপর থেকে ঐ বোঝা সরিয়ে দিলেন। রাসূল (সা) সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করলেন এবং কুরায়শদের জন্য তিনবার বদ দু'আ করলেন। তাদের কাছে তাঁর বদ দু'আ দুঃসহ মনে হলো। কেননা কুরায়শদের বিশ্বাস[১] ছিল যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। এরপর তিনি বিশেষভাবে আবূ জাহল, উকবা ইবন রবীয়াহ, শায়বা ইবন রবীয়াহ, ওলীদ ইবন উকবা, উমায়্যা ইবন খালফ, উকবা ইবন আবূ মুয়াইত এবং আম্মারা ইবন ওলীদের নাম ধরে ধরে বদদু'আ করেন। তাদের অধিকাংশ বদর যুদ্ধে নিহত হয়।[২]

বুখারী শরীফের কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুস সালাতের এক বর্ণনায় আছে যে, কাপড় পাক সংক্রান্ত কুরআনী নির্দেশ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ এ ঘটনার পরেই নাযিল হয়েছে।[৩] হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি দুটি মন্দতম প্রতিবেশীর মাঝখানে বাস করছি, আবূ লাহাব এবং উকবা ইবন আবূ মুয়াইত। এরা উভয়েই আমার দরজায় ময়লা আবর্জনা রেখে দিত।[৪]

হযরত যিমাদ ইবন সালাবা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

যিমাদ ইবন সালাবা ইয্দী জাহিলী যুগ থেকেই নবী করীম (সা)-এর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করতেন। মহানবী (সা)-এর নবূয়াত লাভের পর তিনি মক্কায় এলেন। দেখলেন, একদল বালক নবীজীর পিছু নিয়েছে, তাদের কেউ তাঁকে জাদুকর, কেউ গল্পকার বলছে, আবার কেউ কেউ তাঁকে পাগল বা উন্মাদও বলছে। যিমাদ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি পাগলের চিকিৎসা জানি। আপনি আমাকে চিকিৎসা করার অনুমতি দিন। সম্ভবত আল্লাহ আমার হাতে আপনাকে আরোগ্য দান করবেন। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন :

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له وانى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

---

১. সহীহ মুসলিমে আছে যে, তাঁর আওয়ায শোনামাত্র তাদের সমস্ত হাসি কর্পূরের মত উড়ে গেল এবং তাঁর বদদু'আয় তারা ভীত হয়ে পড়ল (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)।

২. কুরায়শদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরী'আতের কিছু কিছু বিষয় অবশিষ্ট ছিল। সম্ভবত মক্কার হারামে দু'আ কবূল হওয়ার বিশ্বাসও শরী'আতে ইবরাহীমের অবশিষ্ট বিশ্বাস ছিল (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩০২)।

৩. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৫২১।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৫১।

"আলহামদু লিল্লাহ, আমরা সবাই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করছি এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁরই ক্ষমার প্রত্যাশী। নিজেদের নফসের খারাপী থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর সত্য রাসূল।"

যিমাদ বলেন,আমি বললাম, এ বাক্যগুলো পুনরায় বলুন। আল্লাহর কসম, আমি অনেক কবিতা শুনেছি একং গল্পকারদের অনেক তন্ত্রমন্ত্রও শুনেছি, কিন্তু আল্লাহর শপথ, এ ধরনের বাক্য তো আমি কখনো শুনিনি। এ বাক্যাবলী তো বিশুদ্ধ ভাষার সমুদ্রের তলদেশ থেকে উৎসারিত। আর আমিও তাই বলছি যে,

وانى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই; এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

যিমাদ এভাবে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন এবং নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষে তাঁর হাতে বায়য়াত হলেন।[১]

হাফিয ইরাকী বলেন :

ثم الى ضماد وهو الازدى يستبين أمره بالنقد

ما هو الا ان محمدا خطب اسلم للوقت وذهب

"নুবূয়াত প্রাপ্তির পাঁচ অথবা নয় বছর পর যিমাদ ইবন সালাবা আযাদী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য মক্কায় উপস্থিত হন" (যেমনটি শারহে বলা হয়েছে),তিনি (সা) যিমাদের সামনে এক খুতবা পাঠ করেন, যা শুনেই যিমাদ তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে যান।"

বিশিষ্ট দুশমনবৃন্দ

তাওহীদের ঘোষণা ও দাওয়াতের পর সমস্ত মক্কাবাসীই তাঁর দুশমনে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যে সব ব্যক্তি হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে দুশমনী ও শত্রুতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

১. আবূ জাহল ইবন হিশাম, ২. আবূ লাহাব ইবন আবদুল মুত্তালিব,
৩. আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূস, ৪. হারিস ইবন কায়স,
৫. ওলীদ ইবন মুগীরা, ৬. উমায়্যা ইবন খালফ ও
৭. উবাই ইবন খালফ অর্থাৎ খালফের পুত্রদ্বয়,
৮. আবূ কায়স ইবন ফাকাহ, ৯. আস ইবন ওয়ায়েল,

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২১৯; অধিকন্তু, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩৬।

১০. নাযর ইবন হারিস, ১১. মানবা ইবন হাজ্জাজ,
১২. যুহায়র ইবন আবূ উমায়্যা, ১৩. সাইব ইবন সায়ফী,
১৪. আসওয়াদ ইবন আবদুল আসওয়াদ,
১৫. আস ইবন সাঈদ, ১৬. আস ইবন হাশিম,
১৭.উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, ১৮. ইবনুল আসদী,
১৯. হাকাম ইবন আস, এবং ২০. আদী ইবন হামরা।

এদের মধ্যে বেশিরভাগ তাঁর প্রতিবেশী, মান্যবর ও সম্ভ্রান্ত ছিল, তাঁর প্রতি শত্রুতায় ছিল উৎসাহী। দিবারাত্র তাদের এটাই ছিল কর্ম, এটাই ছিল ধ্যান। আবূ জাহল, আবূ লাহাব এবং উকবা ইবন আবূ মুয়াইত ছিল সব চেয়ে অগ্রসর।[১] আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদি রীতি তো এটাই যে, যখন তিনি কোন বস্তু সৃষ্টি করেন, তখন এর বিপরীত অর্থাৎ বিরোধীও তৈরি করেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

কাজেই যেমন আল্লাহ তা'আলা আলোর বিপরীতে অন্ধকার, দীর্ঘকায়ের বিপরীতে খর্বকায় সৃষ্টি করেছেন, একইভাবে কল্যাণের বিপরীতে অকল্যাণ এবং হিদায়াতের বিপরীতে ভ্রষ্টতা ও ফিরিশতাদের বিপরীতে শয়তানদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সত্য ও মিথ্যার মুকাবিলা এবং দ্বন্দ্ব চলতে থাকে আর লোকজন স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যে কোন এক পক্ষ গ্রহণ করে। এটা যেন না হয় যে, কোন এক পক্ষ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়ে পড়ে। যদি কেবল সত্য ও সত্যপন্থীদের সৃষ্টি করা হতো এবং বাতিলের কোন অস্তিত্বই না থাকত, তা হলে মানুষ সত্য গ্রহণে বাধ্য হতো– যা সরাসরি প্রজ্ঞা বিরোধী। শরী'আতের উদ্দেশ্য কখনই এটা নয় যে, মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে ও চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করুক। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে, তারা সবাই ঈমান আনতো। (সূরা ইউনুস : ৯৯)

এজন্যে আল্লাহ তা'আলা যখন নবী (আ)গণকে পয়দা করেন, তখন তাঁদের বিরোধিতা করার জন্য জিন ও মানুষরূপী শয়তানকেও সেইসাথে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীবাসী হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব এবং হিদায়াত ও গুমরাহীর দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভালভাবে প্রত্যক্ষ করে এবং নিজের ইচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে হক ও বাতিলের মধ্যে যে পক্ষ ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পারে। নিম্নের আয়াতে এরই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে :

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৪।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

"এরূপে আমি মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি।" (সূরা আনআম : ১১২)

কাজেই যেমন প্রত্যেক ফিরাউনের জন্য একজন মূসা প্রয়োজন, ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যেক মূসার জন্যও একজন ফিরাউন আবশ্যক। তর্কশাস্ত্রের একটি স্বীকৃত নিয়ম হলো, প্রত্যেক বিষয়ের বিপরীত আবশ্যকীয় ও সত্য হয়।

در کار خانہء عشق از کفر ناگزیر است دوزخ کرابسوز دگر بولهب بناشد

"প্রেমের রাজ্যে অস্বীকৃতি অনিবার্য; আবূ জাহল না থাকলে দোযখ জ্বালাত কাকে?"

এজন্যে আমরা হযরত রাসূল (সা)-এর কতিপয় বিশিষ্ট দুশমনের অবস্থা সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি।

আবূ জাহল ইবন হিশাম

নবী (সা)-এর উম্মতের ফিরাউন ছিল, যে তাঁর সাথে শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণে এক মুহূর্তও বিরত থাকেনি। আবূ জাহলের শত্রুতার কিছু কিছু ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, আর সামনে আরো কিছু বর্ণনা করা হবে। মৃত্যুকালীন সময়ে সে যে বক্তব্য দিয়েছিল (যার বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে) যা দ্বারা সম্মানিত পাঠকবর্গ আবূ জাহলের শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন। আবূ জাহলের নাম ছিল আবুল হাকাম, রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আবূ জাহল উপাধি দান করেন যেমনটি ফাতহুল বারী ذكر نبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আবূ জাহল নিজে বলত যে, আমার নাম আযীয করীম, অর্থাৎ সম্মানিত নেতা। সে প্রেক্ষিতে এ আয়াতসমূহ নাযিল হয় :

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِىْ فِى الْبُطُوْنِ كَغَلْىِ الْحَمِيْمِ خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَاءِ الْجَحِيْمِ ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ذُقْ اَنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهٖ تَمْتَرُوْنَ

"নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে—পাপীর খাদ্য, গলিত তামার মত, তা তার উদরে ফুটতে থাকবে–ফুটন্ত পানির মত। ওকে ধর এবং জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও, তারপর তার মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি দাও এবং বলা হবে, আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। এটা তো তাই, যে বিষয়ে সন্দেহ করতে।[১] (সূরা দুখান : ৪৩-৫০)

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩৬।

আবূ লাহাব

আবূ লাহাব ছিল তার উপাধি, প্রকৃত নাম ছিল আবদুল উযযা ইবন আবদুল মুত্তালিব। সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আপন চাচা ছিল। প্রথমে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শগণকে একত্রিত করে আল্লাহর বাণী শোনান, তখন সবার আগে আবূ লাহাবই তাঁকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে এবং বলে : تبا لك سائر اليوم الهذا اجمعتنا "আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন, এজন্যেই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ?"

এ প্রসঙ্গে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়। আবূ লাহাব যেহেতু খুবই সম্পদশালী ছিল, এজন্যে যখন তাকে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখান হতো, তখন সে বলত, যদি আমার ভাইপোর কথাই সত্য হয়, তা হলে কিয়ামতের দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি উপঢৌকন দিয়ে মুক্তি পাব। তার জবাবে আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে জানালেন مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ "তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নি।" (সূরা লাহাব : ২) আয়াতটি দ্বারা এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তার স্ত্রী উম্মে জামিল বিনতে হারব অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান ইবন হারবের বোনেরও হযরত (সা)-এর প্রতি ক্রোধ ও শত্রুতা ছিল। রাতের বেলা সে নবীজী (সা)-এর পথে কাঁটা ছড়িয়ে রাখত (তাফসীরে ইবন কাসীর ও রূহুল মা'আনী)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, যখন উম্মে জামিল জানতে পেল যে, তার এবং তার স্বামীর ব্যাপারে সূরা নাযিল হয়েছে, তখন একটি পাথর নিয়ে তাঁকে হত্যার উদ্দেশে দৌড় দিল। ঐ সময় তিনি ও হযরত আবূ বকর (রা) মসজিদে হারামে গিয়েছিলেন। উম্মে জামিল যখন সেখানে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চোখের উপর এমন পর্দা দিয়ে দিলেন যে, সে কেবল হযরত আবূ বকরকেই দেখতে পাচ্ছিল, নবী (সা) কে দেখতেই পাচ্ছিল না। উম্মে জামিল আবূ বকর (রা) কে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গী কই? আমি জানতে পেলাম সে আমাকে অভিসম্পাত দেয় ও নিন্দাবাদ করে। আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাকে পেতাম তা হলে এই পাথর দ্বারা তাকে হত্যা করতাম। আল্লাহর কসম, আমি একজন বড় কবি। এরপর সে বলল ঃ

مذمما عصينا * وامره ابينا * ودينه قلينا *

"অভিসম্পাত দিয়েছি আমরা তাকে, তার অবাধ্যতা করেছি, আর তার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছি ও তার দীনের সাথে শত্রুতা পোষণ করেছি।"

শত্রুতার দরুন নবী (সা)-কে তারা মুহাম্মদের পরিবর্তে 'মুযাম্মাম' বলত। 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ প্রশংসিত আর 'মুযাম্মাম' শব্দের অর্থ নিন্দিত ও মন্দ। আর এ বলে সে ফিরে গেল।[১]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৩।

কুরায়শগণ যখন হযরত নবী করীম (সা) কে নিন্দিত ও মন্দ বলত, তখন তিনি বলতেন, হে লোক সকল ! তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ না যে, আল্লাহ তা'আলা কিরূপে ওদের গালমন্দকে আমা থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, ওরা নিন্দিত ও মন্দ বলছে, আমি তো মুহাম্মদ প্রশংসিত। (ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৪)

অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আবূ বকর (রা) যখন উম্মে জামিলকে নবী (সা)-এর দিকে আসতে দেখলেন, আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! উম্মে জামিল সামনের দিক থেকে আসছে, আপনার ব্যাপারে আমার ভয় করছে। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন ঃ انها لن ترانى "সে আমাকে কখনই দেখবে না।" এবং কিছু কুরআনের আয়াত[১] তিলাওয়াত করলেন (তাফসীরে ইবন কাসীর, সূরা লাহাবের তাফসীর)।

মুসনাদে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাসান সনদে বর্ণিত আছে, যখন উম্মে জামিল আবূ বকর (রা)-কে এ সব বলছিল, তা তাকে সত্যায়নই করছিল। যখন উম্মে জামিল চলে গেল, তখন আবূ বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্ভবত উম্মে জামিল আপনাকে দেখেনি। তিনি বললেন, তার প্রস্থান পর্যন্ত একজন ফেরেশতা আমাকে আড়াল করে রেখেছিল।[২] বদর যুদ্ধের সাত দিন পর আবূ লাহাবের শরীরে বিষাক্ত গুটি দেখা দেয়। এর ফলেই সে মৃত্যুবরণ করে। নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তার পরিবারের লোকজন তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। তিন দিন পর্যন্ত লাশ সেখানেই পচতে থাকে। লজ্জা এবং দুর্নামের ভয়ে কয়েকজন হাবশী শ্রমিক ডেকে এনে লাশ উঠানো হয়, মজুররা একটি গর্ত খুড়ে লাঠির দ্বারা তার মরদেহ সে গর্তে ফেলে মাটি ও পাথর চাপা দেয়। এ তো গেল তার পার্থিব যিল্লতি ও অপমান। আর আখিরাতে তার অবমাননার তো কোন প্রশ্ন করাই অবান্তর। اجارنا الله تعالى من ذلك "আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে পানাহ দিন।" আবূ লাহাবের তিন পুত্র ছিল, উতবা, উতায়বা ও মুয়াত্তাব। তন্মধ্যে উতবা ও মুয়াত্তাব মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উতায়বা, যে আবূ লাহাবের কথায় নবী (সা)-এর কন্যাকে তালাক দিয়েছিল, অধিকন্তু, অপরাধও করেছিল, নবী (সা)-এর বদ দু'আর ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত রাসূল (সা) হযরত আব্বাস (রা) কে বললেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র উতবা এবং মুয়াত্তাব কোথায়, কোথাও তো চোখে পড়েনি ? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সম্ভবত কোথাও আত্মগোপন করে আছে। নবী (সা) বললেন, তাদেরকে খুঁজে আনুন। সন্ধান করতে

---

১. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا "তুমি যখন কুরআন পাঠকর, তখন তোমার ও যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা রেখে দিই।" (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৪৫)

২ ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৫৬৭, সূরা লাহাবের তাফসীর।

গিয়ে আরাফাতের ময়দানে পাওয়া গেল। হযরত আব্বাস (রা) উভয়কে নিয়ে নবী (সা)-এর সামনে হাযির হলেন। নবী (সা) তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবূল করলেন এবং নবী (সা)-এর হাতে বায়'আত হলেন। নবী (সা) বললেন, আমি আমার চাচার এ দু'পুত্রকে আল্লাহর কাছে চেয়েছিলাম, আল্লাহ তাদের দু'জনকে আমাকে দান করেছেন।[১]

উমায়্যা ইবন খাল্ফ জুমাহী

উমায়্যা নবী (সা)-কে সবচে' বেশি গালি-গালাজ করত। তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে চোখ টিপত। এ প্রেক্ষিতে এ সূরা নাযিল হয় :

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحِيم

وَيلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝ نِ الَّذِى جَمَعَ مَا لاً وَّعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ

كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ الَّتِىْ تَطَّلِعُ

عَلَى الْاَفْئِدَةِ ۝ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গুণে দেখে, সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে;কখনই নয়, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়; তুমি কি জানো হুতামা কি ? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। নিশ্চয়ই এটা ওদেরকে বেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।" (সূরা হুমাযা : ১–৯)

উমায়্যা ইবন খালফ, উতবা, উতায়বা ও মুয়াত্তাব খাল্ফ বদর যুদ্ধে হযরত খুবায়ব অথবা হযরত বিলাল (রা)-এর হাতে নিহত হয়।[২]

উবাই ইবন খাল্ফ

উবাই ইবন খাল্ফও তার ভাই উমায়্যা ইবন খাল্ফের প্রতি পদে পদে অনুসরণ করত। একদিন সে একটি জরাজীর্ণ হাড় নিয়ে নবী (সা)-এর সামনে এসে তা হাত দিয়ে গুড়ো করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, আল্লাহ কি একেও দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একে এবং তোর হাড়ও এমনটি হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন; আর তোকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৪৫৫।

২ ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৪।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوْقِدُوْنَ ۝ اَوَلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهِ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়, বলে, অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পচে গলে যাবে? বল, এর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত কর। যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি এর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলেন হও, ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যাঁর হাতে প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"

(সূরা ইয়াসীন : ৭৮-৮৩)

উবাই ইবন খাল্ফ উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে নিহত হয় (তারিখে ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬; ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২৬; উহুদ যুদ্ধে যে সব মুশরিক নিহত হয়েছিল-এর বর্ণনা)।

উকবা ইবন আবূ মুয়াইত

উকবা উবাই ইবন খাল্ফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। একদিন উকবা মহানবী (সা)-এর নিকট এসে কিছুক্ষণ বসে এবং তাঁর কথা শোনে। উবাই সংবাদ পেয়ে, দ্রুত উকবার নিকট এসে বলল, আমি সংবাদ পেলাম যে, তুমি মুহাম্মদ-এর নিকট বসেছ এবং তার কথা শুনেছ। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুহাম্মদের মুখে থুথু দিয়ে না আসবে, ততক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলা এবং তোমার চেহারা দেখা আমার জন্য হারাম। কাজেই হতভাগা উকবা উঠল এবং তাঁর পবিত্র চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করল। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلاً ۝ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلاَنًا خَلِيْلاً ۝ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلاً ۝ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۝ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

"যালিমগণ সেদিন নিজ হস্তদ্বয় দংশন করতে করতে বলবে, হায়, আমি যদি রাসূলের সাথে একইপথ অবলম্বন করতাম! হায়, দুর্ভোগ আমার, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম ! আমার কাছে উপদেশ পৌঁছবার পর সে তো আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল, শয়তান তো মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। রাসূল বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে। (আল্লাহ বলেন,) এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছিলাম। তোমার জন্য তোমার প্রতিপালকই পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারীরূপে যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান ২৭-৩১)

উকবা বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং সাফরা নামক স্থানে পৌঁছে তাকে হত্যা করা হয়।[১]

ওলীদ ইবন মুগীরা

ওলীদ ইবন মুগীরা বলে বেড়াত যে, এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, মুহাম্মদের উপর ওহী নাযিল হলো অথচ আমাকে এবং আবূ মাসঊদ সাকাফীকে বাদ দিয়ে ! কার্যত আমরা দু'জনই নিজ নিজ শহরে সর্বাধিক সম্মানিত। আমি কুরায়শের সর্দার আর আবূ মাসঊদ সকীফ গোত্রের সর্দার। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"এবং তারা বলে, এই কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর ? এরা কি তোমার প্রতিপালকের করুণা বন্টন করে ? আমিই ওদের মধ্যে রিযক বন্টন করি ওদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে তা থেকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।" (সূরা যুখরুফ : ৩১-৩২)

অর্থাৎ নবূয়াত ও রিসালতের উৎস ধন-দৌলত ও পার্থিব মান-সম্মানের উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং একদিনের ঘটনা ঃ ওলীদ ইবন মুগীরা, উমায়্যা ইবন খাল্ফ, আবূ জাহ্ল, উতবা, শায়বা, রবীয়ার পুত্রগণ এবং অপরাপর কুরায়শ সর্দারগণ ইসলামের বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য নবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হলো। তিনি ওদের বুঝাতে ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময়ে মসজিদে নববীর অন্ধ মুয়াযযিন আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা) কিছু জিজ্ঞেস করার জন্য এসে পড়েন। তিনি (সা) মনে করলেন, ইবন উম্মে মাকতূম তো মুসলমান, তিনি অন্য কোন সময় জেনে

---

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৭।

নিতে পারবেন; কিন্তু এ ব্যক্তিগণ প্রভাবশালী, যদি এরা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে এদের কারণে সহস্র মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। এজন্যে তিনি ইবন উম্মে মাকতূমের প্রতি দৃষ্টি দিলেন না এবং তার অসময়ে প্রশ্ন করার দরুন তাঁর চেহারা মুবারকে কিছুটা বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এ কারণে যে, তার উচিত ছিল চলমান কথাবার্তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু আল্লাহ জাল্লা শানুহুর রহমত উথলে উঠল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল করলেন :

عَبَسَ وَتَوَلّٰى   اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى . وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى   اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى
اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى . فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى . وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى . وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى
وَهُوَ يَخْشٰى   فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى   كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ   فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ   فِيْ صُحُفٍ
مُّكَرَّمَةٍ   مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ   بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ   كِرَامٍ بَرَرَةٍ   قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ
مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ   مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ   ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهُ   ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَقْبَرَهُ .
ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ   كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهُ   فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهِ   اَنَّا
صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا   ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا   فَاَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا   وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا
وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلاً   وَّحَدَائِقَ غُلْبًا   وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا   مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ   فَاِذَا
جَاءَتِ الصَّاخَّةُ   يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ   وَاُمِّهِ وَاَبِيْهِ   وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ   لِكُلِّ
امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ   وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ   ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ   وَوُجُوْهٌ
يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ   تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ   اُولٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল, এ জন্যে যে, তার নিকট অন্ধ লোকটি এলো। তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে পরোয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নাই, অন্যদিকে যে তোমার কাছে ছুটে এলো এবং সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে; না, এ আচরণ অনুচিত, এ তো উপদেশ বাণী, যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে, তা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র, মহান পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ। মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ ! তিনি তাকে কোন্ বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন ? শুক্রবিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন, পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন, এরপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন; তারপর

তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা, তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। এ প্রকার আচরণ অনুচিত, তিনি ওকে যা আদেশ করেছেন সে এখনও তা পুরাপুরি করেনি। মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং এতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য, এটা তোমাদের ও তোমাদের পশুপালের জন্য। যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে এবং তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে, সেদিন ওদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণ ব্যস্ত রাখবে। অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল, এবং অনেক মুখমণ্ডল হবে সেদিন ধূলিধূসর; সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে মলিনতা। এরাই কাফির এবং গুনাহগার। (সূরা আবাসা : ১-৪২)

এর পরে নবী (সা)-এর অবস্থা এই ছিল যে, যখন কোন সময় আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম উপস্থিত হতেন, তখন তিনি তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিতেন এবং বলতেন, মারহাবা ঐ ব্যক্তির জন্য, যার জন্য আমার রব আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

আবূ কায়স ইবন ফাকাহ

এই ব্যক্তিও মহানবী (সা)-কে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছে। সে আবূ জাহলের বিশিষ্ট সাহায্য-সহায়তাকারী ছিল। আবূ কায়স বদর যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে নিহত হয়।[১]

অপসংস্কৃতি দ্বারা ইসলামবিমুখ করা জাহিলী যুগের রীতি

নাযর ইবন হারিস

নাযর ইবন হারিস কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে একজন ছিল। ব্যবসা উপলক্ষে সে পারস্য যেত এবং সেখান থেকে সে অনারবী রাজা-বাদশাহদের গল্প-কিসসা-কাহিনী কিনে আনত আর কুরায়শদের শোনাত। বলত, মুহাম্মদ তো তোমাদেরকে কেবল আদ ও সামূদের কাহিনী শোনায়, আর আমি তোমাদের রুস্তম, ইসফান্দিয়ার এবং পারস্যরাজদের কাহিনী শোনাচ্ছি। এ সব কাহিনী মানুষের কাছে খুব উপভোগ্য মনে হতো (যেমন আজকালকার নভেল)। জনগণ এ সব কিসসা শুনত এবং কুরআন শুনত না।

একটি গায়িকা দাসীও সে কিনে রেখেছিল, জনগণকে তার গান শোনাত। যে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে এটা জানা যেত যে, সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট, তার নিকট সে

---

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬।

ঐ গায়িকাকে নিয়ে যেত এবং তাকে বলত, লোকটিকে পানাহার করাও ও গান শোনাও। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে বলত—বল তো, এটা উত্তম না ঐ বস্তু উত্তম যার প্রতি মুহাম্মদ (সা) আহ্বান করে ? বলে, নামায পড়, রোযা রাখ, আল্লাহর দুশমনদের সাথে জিহাদ কর ? তখনই এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِيْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য কিনে নেয় এবং আল্লাহ্ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতে পায় নি, যেন তার কান দুটি বধির; অতএব ওদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।"[১] (সূরা লুকমান : ৬–৭)

সতর্কবাণী : খাওয়ানো, পান করানো এবং বালিকাদের গান শুনিয়ে নিজ ধর্ম মতাদর্শের প্রতি লোকদের আকৃষ্ট করে রাখাটা বাতিলপন্থীদের প্রাচীন রীতি, যা বিশেষভাবে নাসারাদের পদ্ধতি; আর তাদের দেখাদেখি হিন্দুস্থানের আর্যগণও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ যাকে সামান্যতম জ্ঞানও দিয়েছেন, সে ভালই বুঝে যে, এ পদ্ধতি আল্লাহর উপাসনাকারীদের নয়; বরং কাম-বাসনা পূজারীদের। ঐসব থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

নাযর ইবন হারিস বদর যুদ্ধে বন্দী হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।[২]

আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী

আস ইবন ওয়ায়েল সাহমী ছিল হযরত আমর ইবন আস (রা)-এর পিতা। যারা নবী (সা) কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত—এ ব্যক্তিও ছিল তাদের অন্তর্ভুক্ত। নবী (সা)-এর যত পুত্র সন্তান জন্মেছিল, সবাই তাঁর জীবদ্দশায়ই ইনতিকাল করেন। এতে আস ইবন ওয়ায়েল বলল : ان محمدا ابتر لا يعيش له ولد "নিশ্চয়ই মুহাম্মদ নির্বংশ, তার কোন পুত্রই জীবিত থাকে না।"

আবতার বলা হয় লেজকাটা জন্তুকে। আগে পরে যে ব্যক্তির নাম নেয়ার মত কেউ না থাকে, সে যেন লেজকাটা জন্তুর মতই। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় : اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ "তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।" (সূরা কাওসার : ৩)

---

১. রূহুল মা'আনী, ২খ. পৃ. ৬৯।

২ ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৭।

হযরতের নাম নেয়ার মত লোক তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। হিজরতের একমাস পর কোন জন্তু আস-এর পায়ে দংশন করে যদ্দরুন তার পা এমন ফুলে উঠে যে, উটের গর্দানের ন্যায় হয়ে যায়। এতেই আস মারা যায়।[১]

হাজ্জাজের পুত্রদ্বয় নবীহ ও বনীহ

নবীহ ও বনীহও নবী (সা)-এর কঠোরতর দুশমনদের মধ্যে ছিল। যখনই তারা নবী (সা) কে দেখত তখনই বলত, আল্লাহ কি তাকে ছাড়া আর কাউকে পয়গাম্বর বানানোর জন্য খুঁজে পাননি ? এ দু'জনই বদর যুদ্ধে নিহত হয়।[২]

আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব

আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব ও তার সঙ্গীরা যখনই রাসূল (সা) অথবা তাঁর কোন সাহাবীকে দেখত, তখন চোখ টেপাটিপি করত আর বলত, এরাই ঐ সব লোক, যারা পৃথিবীর বাদশাহ হবে, রোম ও পারস্যের বাদশাহর ধনভাণ্ডার হস্তগত করবে ! এ সব বলত আর শিষ দিত, হাতে তালি দিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বদ দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, ওকে অন্ধ বানিয়ে দাও (যাতে তার চোখ টেপার যোগ্যতাই না থাকে) আর তার পুত্রকে ধ্বংস করে দাও। সুতরাং আসওয়াদ তো ঐ সময়েই অন্ধ হয়ে গেল, আর তার পুত্র বদর যুদ্ধে নিহত হলো। কুরায়শগণ যে সময় উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঐ সময় আসওয়াদ অসুস্থ ছিল, জনগণকে সে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। উহুদ যুদ্ধের পূর্বেই সে মারা যায়।[৩]

আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস

আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মামাত ভাই। যার বংশ লতিকা ছিল এরূপ, আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস ইবন ওহাব ইবন মান্নাফ ইবন যোহরা। সেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কঠোরতম দুশমনদের একজন ছিল। যখন সে কোন দরিদ্র মুসলমানকে দেখত, তখন বলত, এরাই পৃথিবীর বাদশাহ হতে যাচ্ছে, এরা কিসরার বাদশাহীর উত্তরাধিকার হবে। আর যখন হযরত (সা) কে দেখত তখন বলত, আজ কি আসমান থেকে কোন কথা আসে নি ! এমনি ধরনের আজে বাজে কথা বলত আর বিদ্রূপ করত।[৪]

হারিস ইবন কায়স সাহমী

যাকে হারিস ইবন আয়তালাও বলা হতো। আয়তালা ছিল তার মার নাম আর কায়স ছিল তার পিতার নাম। এ ব্যক্তিও ঐ সব লোকের দলে ছিল, যারা নবী

---

১. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ২৬।

২. প্রাগুক্ত।

৩. প্রাগুক্ত পৃ. ২৭।

৪. প্রাগুক্ত

(সা)-এর সাহাবীগণের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত আর বলত, মুহাম্মদ তার সঙ্গীদের এ বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, মৃত্যুর পর তারা পুনর্জীবিত হবে!

وَقَالُوْا مَاهِيَ الاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا الاَّ الدَّهْرَ

"ওরা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এবং সময়কালের (স্বাভাবিক) নিয়মই আমাদেরকে ধ্বংস করে।" (সূরা জাসিয়া ২৪)

যখন তাদের ঠাট্টা-তামাশা সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন :

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদেরকে উপেক্ষা কর। বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরা হিজর ৯৪-৯৫)

বেশি হাস্য-পরিহাসকারী ছিল এ পাঁচ ব্যক্তি, আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূস, ওলীদ ইবন মুগীরা, আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব, আস ইবন ওয়ায়েল এবং হারিস ইবন কায়স।

একবার হযরত (সা) বায়তুল্লাহ[১] তাওয়াফ করছিলেন, সে সময় জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। তিনি জিবরাঈল (আ) কে তাদের ঠাট্টা-মস্করার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। ইত্যবসরে ওলীদ সামনে দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি ওলীদ। জিবরাঈল (আ) ওলীদের শাহরগের দিকে ইশারা করলেন। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি করলেন? জিবরাঈল বললেন, আপনি ওলীদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। এরপর আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ হলো আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব। জিবরাঈল (আ) তার দু' চোখের প্রতি ইশারা করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে জিবরাঈল, কি করলেন ? জিবরাঈল বললেন, আপনি আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিবের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন। এরপর আসওয়াদ ইবন ইয়াগূস অতিক্রম করল। তিনি বললেন, এ হলো আসওয়াদ ইবন ইয়াগূস। জিবরাঈল (আ) তার মাথার প্রতি ইশারা করলেন। পূর্বের ন্যায় তাঁর প্রশ্নের জবাবে জিবরাঈল বললেন, আপনি যথেষ্ট হয়েছেন। এরপরে আস ইবন ওয়ায়েল ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করল। জিবরাঈল (আ) তার পায়ের তলায় কিছু ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, আপনি তার জন্য যথেষ্ট হয়েছেন।

সুতরাং ওলীদের ঘটনা এই হলো যে, একবার ওলীদ বনী খুযা'আর এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিল, যে তীর বানাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে তার কোন তীরের

---

১. এ বর্ণনা রূহুল মা'আনী, ৪খ. পৃ. ৭৮ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার ঘটনা ইবন ইসহাকের বর্ণনা থেকে গৃহীত–যাকে হাফিয ইবন কাসীর স্বীয় তাফসীরে সংশ্লিষ্ট আয়াতের নিচে লিপিবদ্ধ করেছেন।

উপর ওলীদের পা পড়ে যায় এবং তাতে সে সামান্য আহত হয়। ঐ যখমের প্রতিই ইশারা করা হয়েছিল। ফলে যখম বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং এতেই সে মারা গেল। আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিবের ঘটনা হল, একদিন সে একটি বাবলা গাছের নিচে গিয়ে বসেছিল, এমতাবস্থায় নিজ ছেলেদের চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল যে, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, কোন ব্যক্তি আমার চোখে কাঁটা ফুটিয়ে দিচ্ছে। ছেলেরা বলল, আমরা তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। এভাবে বলতে বলতে সে অন্ধ হয়ে গেল। আসওয়াদ ইবন আবদ ইয়াগূসের ঘটনা এই ঘটল যে, জিবরাঈল (আ) তো তার মাথার দিকে ইশারা করেছিলেন, কাজেই তার সমস্ত মাথা ফোঁড়ায় ভরে গেল, আর এ কষ্টেই সে মারা গেল। হারিসের পেটে এমন অসুখ হলো যে, তার মুখ দিয়ে পায়খানা[১] বের হতে শুরু করে। আর এতে সে মারা যায়। আস ইবন ওয়ায়েলের পরিণতি এই ঘটল যে, সে গাধায় চড়ে তায়েফ যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে গাধা থেকে কাঁটাযুক্ত একটি ঘাসের ঝোঁপের উপর পড়ে যায়। এতে তার পায়ে একটা সাধারণ কাঁটা বিঁধে। কিন্তু সেই সাধারণ কাঁটাই এমন কঠিন হলো যে, তার প্রাণ রক্ষা হলো না। এতেই সে মারা গেল। এটি আল্লামা তাবারানী[২] তাঁর আওসাতে, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম উভয়ের দালাইলে এবং ইবন মারদুবিয়া উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ! এ ঘটনাবলী থেকে অনুমান করুন যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারে কি জোর-যবরদস্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল, নাকি একে স্তব্ধ ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য জোর-যবরদস্তির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল ?

মুসলমানদের প্রতি অত্যাচার

(بَاطِنَهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ)

(এতে অন্তর্নিহিত রয়েছে রহমত আর বাহ্যত এর পূর্বে রয়েছে অত্যাচার)।

যে গতিতে ইসলাম প্রসারিত হচ্ছিল আর মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, ঠিক সে অনুপাতেই মক্কার মুশরিকদের ক্রোধ ও ঈর্ষা বেড়ে চলছিল। যে সকল মুসলমানের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী ছিল, তাদের উপর তো মক্কার কাফিরদের বাড়াবাড়ি চলছিল না। তবে হ্যাঁ, যারা অভিভাবকহীন মুসলমান ছিল, যাদের পেছনে ছিল না কোন আশ্রয়-অবলম্বন, তারা মক্কার কুরায়শদের অত্যাচার-নির্যাতন অনুশীলনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তাঁদের কাউকে মারতো, কাউকে ক্ষুদ্র কক্ষে আটক করে নির্যাতন চালাতো। এক্ষণে আমরা কতিপয় ঘটনা বর্ণনা করছি, যা দ্বারা মক্কার মুশরিকদের যুলম-অত্যাচার এবং সাহাবীগণের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে।

---

১. যেমন তূসীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, শেষ সময়ে তার মুখ থেকে পায়খানা আসত। যাতে করে আল্লামা শীরাযী বলেছেন ঃ این ان ریلست که در آخر تجرید خورده

২ এ বর্ণনা খাসাইসুল কুবরায় ১খ. পৃ. ১৪৬ এবং তাফসীরে ইবন কাসীরে সূরা হিজর, ৫খ. পৃ. ৩৩৬ পুরাতন সংস্করণে উল্লিখিত আছে। তবে এতে হাসান সনদের কথা বলা হয়নি; এটা কেবল রূহুল মা'আনীতে ১৪খ. পৃ. ৭৮ উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন।

সালাত ও কল্যাণের জন্য আহ্বানকারী মুয়াযযিনদের ইমাম হযরত বিলাল ইবন রাবাহ[১] (রা)

তিনি ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত, উমায়্যা ইবন খালফের ক্রীতদাস। ঠিক দুপুর বেলা যখন রোদ খুব তীব্র হয়ে উঠত এবং পাথর আগুনের মত উত্তপ্ত হয়ে যেত, তখন সে চাকরদের নির্দেশ দিত বিলালকে ঐ উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে তাঁর বুকের উপর একটা ভারী পাথর তুলে দিতে, যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন। আর বলত, তুই এভাবেই মারা যাবি। যদি উদ্ধার পেতে চাস, তবে মুহাম্মদকে অস্বীকার কর এবং লাত-উযযার পূজা কর। কিন্তু বিলাল (রা)-এর মুখ থেকে এ সময়ও আহাদ, আহাদ (তিনি এক, তিনি এক) উচ্চারিত হতো।[২]

موحد چه برپائے ریزی زرش　　چه فولاد هندی نهی برسرش

امیدو هراش نباشد زکس　　همیں است بنیاد توحید وبس

"একত্ববাদী কি শেষ পর্যায়ে ভারতীয় লোহা তার মাথায় তুলে রাখে, কারো মাঝে আশাও থাকবে না, ভয়ও থাকবে না, আর এটাই তাওহীদের বুঁনিয়াদ, এটাই শেষ কথা।"

আর কখনো গরুর চামড়ায় জড়িয়ে এবং কখনো লৌহ বর্ম পরিয়ে রৌদ্রে রেখে দিত। এ অসহনীয় কষ্টের মধ্যেও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই উচ্চারিত হতো। উমায়্যা যখন দেখল যে, তাঁর অটল ধৈর্যে কোন প্রকার চিড় ধরেনি, তখন তাঁর গলায় রশি বেঁধে বালকদের হাতে তুলে দেয় যাতে তারা তাঁকে সারা শহরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। তবুও তাঁর মুখ থেকে কেবল আহাদ আহাদ-ই বের হতো।[৩] হাকিম এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন; কিন্তু তিনি তা উদ্ধৃত করেননি, আর ইমাম যাহবী তা সমর্থন করেছেন।[৪]

এভাবেই হযরত বিলাল (রা) কে অত্যাচার-নির্যাতনের অনুশীলনক্ষেত্রে পরিণত করা হচ্ছিল, এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি অন্তরে ব্যথা পেলেন। আর উমায়্যাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ لا تتقى الله فى هذا المسكين حتى متى انت "তুমি কি এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না, এ অত্যাচার-নিপীড়ন কতদিন চালাবে ?"

উমায়্যা বলল, তুমিই তো তাকে নষ্ট করেছ, এখন তুমিই তাকে উদ্ধার কর। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, উত্তম, আমার কাছে একটি গোলাম আছে, যে খুবই

---

১. রাবাহ ছিল তাঁর পিতার নাম, আর রাহমামা ছিল তাঁর মাতার নাম।

২. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৯।

৩. তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ২৬, ২৭।

৪. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩খ. পৃ. ২৮৪।

শক্তিশালী এবং তোমার ধর্মের উপর অটল ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাকে তুমি নিয়ে নাও এবং তার পরিবর্তে বিলালকে আমার হাতে সোপর্দ কর। উমায়্যা বলল, আমি প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। আবূ বকর (রা) উমায়্যার নিকট থেকে বিলাল (রা) কে নিয়ে মুক্ত করে দিলেন।[১]

আল্লাহর পথে সর্বোত্তম আহ্বানকারী সায়্যিদুনা মাওলানা হযরত বিলাল (রা)-এর পবিত্র পৃষ্ঠদেশে মুশরিকদের অত্যাচার নির্যাতনের যখম ও চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। কাজেই যখন তিনি পৃষ্ঠদেশের কাপড় উঠাতেন, তখন ঐ যখম ও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হতো।

لاقـــى بـلال بـلاء مـن امـيـة قـد   احله الصبـر فـيـه اكـرم الـنـزل
اذ جهدوه بضنك الامر وهو على   شدائد الازل ثبت الازر لم يـزل
القوه بطحا برمضاء البطاح وقد   علوا عـلـيـه صخورا جمة اثقل
فوحد الله اخلاصا وقد ظهـرت   بظهره كندوب الطل فـى الطلل
ان قد ظهر ولـى الله مـن دبـر   قـد قـد قـلـب عـذو الله من قبل

(যেমনটি মাওয়াহিবে বর্ণিত হয়েছে)।

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) কাহতানী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা ইয়াসির (রা) তাঁর এক হারিয়ে যাওয়া ভাইয়ের সন্ধানে মক্কা মুকাররামায় আসেন। তাঁর অপর দুই ভাই হারিস এবং মালিকও তাঁর সাথে ছিলেন। হারিস ও মালিক পরে ইয়েমেনে ফিরে যান কিন্তু ইয়াসির মক্কায় থেকে যান এবং আবূ হুযায়ফা মাখযূমীর সাথে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আবূ হুযায়ফা দাসী সুমাইয়া বিনতে খায়্যাতকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন, যার গর্ভে হযরত আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। আবূ হুযায়ফার মৃত্যু পর্যন্ত ইয়াসির এবং আম্মার তার সাথেই থাকেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা ইসলাম প্রকাশ করেন আর ইয়াসির, সুমাইয়া, আম্মার এবং তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসির সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আম্মারের আরো একটি ভাই ছিল, যে ছিল হযরত আম্মারের চেয়ে বয়সে বড়, তার নাম ছিল হারিস ইবন ইয়াসির, জাহিলী যুগে বনী দায়লের হাতে নিহত হয়।[২] মক্কায় যেহেতু আম্মার ইবন ইয়াসিরের এমন কোন গোত্র কিংবা সম্প্রদায় ছিল না, যারা তাঁদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হতে পারে; এ জন্যে তাঁকে কুরায়শগণ খুবই কঠিন কঠিন শাস্তি দেয়। দুপুরের সময় উত্তপ্ত যমীনে তাঁকে শুইয়ে দিত এবং এমনভাবে মারতো যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। কখনো পানিতে চুবাতো আবার কখনো জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১০৯।

২ তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ১৭৬।

শুইয়ে দিত। এ অবস্থায় যখন হযরত নবী করীম (সা) হযরত আম্মারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন, তখন তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং বলতেন :

يا نار كونى بردا وسلاما على عمار كما كنت على ابراهيم

"হে আগুন, তুমি ঠাণ্ডা এবং আম্মারের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও, যেমনটি হয়েছিলে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উপর।"

যখন নবী করীম (সা) হযরত আম্মার, তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির এবং তাঁর মাতা সুমাইয়াকে বিপদগ্রস্ত দেখতেন, তখন বলতেন, হে ইয়াসির পরিবার, সবর কর। কখনো বলতেন, হে আল্লাহ্, তুমি ইয়াসির পরিবারকে ক্ষমা কর। আবার কখনো বলতেন, তোমাদের জন্য বেহেশতের সুসংবাদ, তোমাদের আশা পূর্ণ হবে। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, প্রথম ভাগ ও ইবন আবদুল বার-এর আল-ইসতিয়াব, হযরত আম্মার (রা)-এর আলোচনা।

হযরত আলী (ক) থেকে বর্ণিত যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আম্মারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঈমানে ভরপুর। হাদীসটি জামে তিরমিযী ও সুনানে ইবন মাজাহ্-এ আছে; এর সনদ হাসান।[১] বাযযার হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন, নাসাঈতেও বর্ণিত আছে, যার সনদও সহীহ্, মানাকিবে আম্মার অধ্যায়।[২]

হযরত আম্মার (রা) একবার তাঁর জামা খুললেন, তখন মানুষ তাঁর পিঠে কালো কালো দাগ দেখতে পেল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মক্কার কুরায়শগণ আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চিৎ করে শুইয়ে রাখতো এ চিহ্ন তারই।[৩] আর এ একই ব্যবহার তাঁর পিতা হযরত ইয়াসির ও মাতা হযরত সুমাইয়া (রা)-এর সাথেও করা হতো।

মুজাহিদ বলেন, সাত ব্যক্তি সর্ব প্রথম নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন :

হযরত রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সুহায়ব (রা), হযরত আম্মার (রা) এবং হযরত সুমাইয়া (রা)। বংশ মর্যাদার কারণে তো রাসূলুল্লাহ (সা)[৪] ও হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর মক্কার মুশরিকদের পুরা খবরদারী চলতো না; কাজেই হযরত বিলাল (রা), হযরত খাব্বাব (রা), হযরত সুহায়ব (রা), হযরত আম্মার (রা) ও হযরত সুমাইয়া (রা)-কে নিজেদের নির্যাতন-নিপীড়নের অনুশীলনের শিকারে পরিণত করে। ভর

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৫১২।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ৭২।

৩. তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ, পৃ. ৭৭।

৪. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৩৩৫।

দুপুরে এ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে লৌহ বর্ম পরিয়ে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো। একদিন আবূ জাহল তাঁদের সামনে এসে পড়লো এবং হযরত সুমাইয়া (রা)-এর লজ্জাস্থানে বর্শাদ্বারা আঘাত করলো, এতে তিনি শহীদ হয়ে যান আবূ বকর ইবন আবূ শায়বা মুজাহিদ থেকে সহীহ মুরসাল সূত্রে হযরত সুমাইয়া (রা) অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ থেকে সহীহ সূত্রে তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ বর্ণিত আছে যে, ইসলামের সর্ব প্রথম শহীদ ছিলেন হযরত সুমাইয়া (রা), যিনি ছিলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল। বদর যুদ্ধে যখন আবূ জাহল মারা গেল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আম্মারকে উদ্দেশ্য করে বলেন : قتل الله قاتل امك "আল্লাহ তোমার মার হত্যাকারীকে ধ্বংস করেছেন।" আর হযরত ইয়াসির (রা) ঐ কঠিন নির্যাতনের ফলে হযরত সুমাইয়ার পূর্বেই ইনতিকাল করেন।[১]

হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা)

সুহায়ব (রা) প্রকৃতপক্ষে মসূলের আশপাশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা এবং পিতৃব্য পারস্য সম্রাটের পক্ষে ওবুল্লার শাসনকর্তা ছিলেন। একবার রোমক বাহিনী ঐ এলাকা আক্রমণ করে। সুহায়ব (রা) ঐ সময় অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন। লুটপাটের সময় রোমানরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন। এ জন্যে তিনি সুহায়ব রূমী নামে প্রসিদ্ধ হন। বনী কালবের এক ব্যক্তি তাঁকে রোমানদের নিকট থেকে ক্রয় করে মক্কায় নিয়ে আসে। মক্কায় আবদুল্লাহ ইবন জুদ'আন তাঁকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন হযরত সুহায়ব এবং হযরত আম্মার একই সময়ে আরকামের গৃহে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। হযরত আম্মারের মত হযরত সুহায়বকেও মক্কার মুশরিকরা নানা ধরনের কষ্ট দেয়। যখন তিনি হিজরতের ইচ্ছা করলেন, তখন মক্কার কুরায়শরা বলল, যদি তুমি ধন-সম্পদ এখানে ছেড়ে যাও, তা হলে যেতে পার, অন্যথায় নয়। হযরত সুহায়ব (রা) এটা মেনে নিলেন এবং পার্থিব তুচ্ছ বস্তুকে পদাঘাত করে হিজরত করলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে তিনি নবী (সা)-এর দরবারে সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। শুনে তিনি বললেন, ربح البيع "এ ব্যবসায়ে সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে।" অর্থাৎ সে নশ্বরকে ছেড়ে অবিনশ্বরকে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিও আছে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম-বিক্রি করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।"

(সূরা বাকারা ২০৭)

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ১৭।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি (সা) বারবার বলতে থাকেন : ربح صهيب ربح صهيب "সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে, সুহায়ব খুবই মুনাফা অর্জন করেছে।"

উমর ইবন হাকাম থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কার মুশরিকরা হযরত সুহায়ব, হযরত আম্মার, হযরত আবূ ফায়েদা, হযরত আমির ইবন ফুহায়রা প্রমুখ (রা) কে এমনই নির্যাতন করতো যে, তাঁরা অপ্রকৃতস্থ ও বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অপ্রকৃতস্থতা এমনই ছিল যে, মুখ দিয়ে কি বলা হচ্ছে, সে খবরও থাকতো না। এর প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয় :

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে, তোমার প্রতিপালক এ সবের পর তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নাহল : ১১০)

এ আয়াত ঐ বুযর্গদের প্রসঙ্গেই নাযিল হয়েছে।[১]

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ষষ্ঠতম মুসলমান ছিলেন এবং নবীজী (সা) আরকামের গৃহে অবস্থান গ্রহণের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি উম্মে আনমারের দাস ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে উম্মে আনমার তাঁর উপর কঠোর নির্যাতন চালায় (ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪১৬)। একবার হযরত খাব্বাব (রা) হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলে উমর (রা) তাঁকে নিজ আসনে উপবেশন করান এবং বলেন, বিলাল (রা) বাদে এ মসনদে বসার উপযুক্ত তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। এতে খাব্বাব (রা) বললেন, আমীরুল মুমিনীন, বিলালও আমার চেয়ে বেশি উপযুক্ত নন। কেননা সেই কঠিনতম দিনগুলোতে মক্কার মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক অন্তত হযরত বিলালের সহমর্মী ও সহায়তাকারী ছিল, কিন্তু আমার সহায়তাকারী কেউ ছিল না। একদিন মক্কার মুশরিকরা আমাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং একজন আমার বুকের উপর তার পা রাখল, যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। তিনি জামা তুলে পৃষ্ঠদেশের দাগগুলো দেখালেন।[২]

হযরত খাব্বাব (রা) বলেন, জাহিলী যুগে আমি কামার ছিলাম, তরবারি বানাতাম। একবার আমি আস ইবন ওয়ায়েলের জন্য তরবারি বানালাম। যখন এর মজুরীর জন্য

১. ইসাবা, ২খ. পৃ.১৯৫ ও তাবাকাতে ইবন সাদ, ৩খ. পৃ. ১৬১।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১১৭।

তাকিদ দিতে এলাম, তখন আস ইবন ওয়ায়েল বলল, আমি তোমাকে এক কড়িও দেব না, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার করছ। খাব্বাব (রা) বললেন, যদি তুমি মরেও যাও এবং মরার পর আবার জীবিত হও, তবুও আমি মুহাম্মদ (সা) কে অস্বীকার করব না। আস বলল, কী ! মারা যাওয়ার পর আবার আমাকে জীবিত করা হবে ? খাব্বাব (রা) বললেন, হ্যাঁ। আস বলল, যখন আল্লাহ্ আমাকে মৃত্যু দেবেন এরপর দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন, আর এভাবে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান আমার সাথে থাকবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন

اَفَرَئَيْتَ الَّذِىْ كَفَرَ بِاٰيٰتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا ۝ اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُوْلُ وَنَمُدُّ لَهٗ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝ وَّنَرِثُهٗ مَا يَقُوْلُ وَيَاْتِيْنَا فَرْدًا

"তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দেয়া হবেই। সে কি অদৃশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে অথবা দয়াময়ের নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কখনই নয়, তারা যা বলে, আমি তা লিখে রাখব এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করতে থাকব। সে যে বিষয়ে কথা বলে, তা থাকবে আমার অধিকারে এবং সে আমার নিকট আসবে একা।" (সূরা মরিয়ম ৭৭-৮০) (সহীহ বুখারী, পৃ. ২৯১; তাফসীরে সূরা মরিয়ম; ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৩৬)।

হযরত আবূ ফুকায়হা জুহানী (রা)

আবূ ফুকায়হা উপাধি, প্রকৃত নাম ছিল ইয়াসার, তবে উপাধিই বেশি প্রসিদ্ধ। সাফওয়ান ইবন উমায়্যার গোলাম ছিলেন। উমায়্যা ইবন খালফ কখনো তাঁর পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে নিয়ে বেড়াত, কখনো লোহার বেড়ী পরিয়ে উত্তপ্ত যমীনে উপুড় করে শুইয়ে রেখে পিঠে একটা মস্ত ভারী পাথর রেখে দিত, এমন কি তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন; আর কখনো তাঁর গলা টিপে ধরত।

একদিন উমায়্যা ইবন খালফ তাঁকে উত্তপ্ত যমীনে শুইয়ে তাঁর গলা টিপে ধরল। এ সময়ে সামনে থেকে উমায়্যা ইবন খালফের ভাই উবাই ইবন খালফ এসে পড়ল। সে কমীনা দয়া প্রদর্শনের পরিবর্তে বলতে থাকল, আরো জোরে টিপে ধর। কাজেই সে এত জোরে টিপে ধরল যে, লোকে মনে করল তাঁর দম হয়ত বেরিয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে হযরত আবূ বকর (রা) ঐদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি আবূ ফুকায়হাকে কিনে নিয়ে মুক্তি দিয়ে দেন।[১]

---

১. আল ইসতিয়াব, ৪খ. পৃ. ১৫৭।

হযরত যানিরা (রা)

হযরত যানিরা (রা) প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি হযরত উমর (রা)-এর দাসী ছিলেন। প্রাক-ইসলামী যুগে উমর (রা) তাঁকে এতই মারতেন যে, নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। আবূ জাহলও তাঁকে নির্যাতন করতো। আবূ জাহল ও মক্কার অন্যান্য সর্দারগণ হযরত যানিরা (রা) কে দেখলে বলত, ইসলাম যদি এত ভালো কিছু হতো, তা হলে যানিরা আমাদের অগ্রগামী হতো না (সে রকম নয় বলেই তো যানিরার মত নির্বোধেরা তাতে অংশ নেয়)। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করেন :

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ

"মুমিনদের সম্বন্ধে কাফিররা বলে, যদি এ দীন ভালই হতো তবে তারা (সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা) এর প্রতি আমাদের অগ্রগামী হতো না।" (সূরা আহকাফ : ১১)

অর্থাৎ আমীর এবং সর্দারদের আল্লাহর নবীগণের হিদায়াত ও নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আর ধন-সম্পদের প্রতি নিস্পৃহ দরবেশদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে গ্রহণ না করা, এটা কখনই হক-এর বাতিল হওয়ার প্রমাণ নয়; বরং অস্বীকারকারীদের অহংকার, দর্প, আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্বেরই এটা প্রকাশ্য প্রমাণ। বরং দুর্বল এবং অভাবী লোকেরা সত্য গ্রহণ করলে এর দরুন বরং ঐ দুর্বল ও অভাবী ব্যক্তিরাই লাভবান হয়। তারা সত্য গ্রহণ করার ফলে পেছনের সারি থেকে উচ্চতর মর্যাদার স্তরে উন্নীত হন। অপরদিকে তথাকথিত প্রভাবশালী আমীর ও রঈসরা হক অস্বীকার করার কারণে সূক্ষ্মদর্শীদের দৃষ্টিতে দুনিয়া-আখিরাতে অপদস্থ ও নিগৃহীত হবার পথই বেছে নেয়। হ্যাঁ, যদি সমাজের আমীর ও প্রভাবশালী হয়েও হক গ্রহণে ইতস্তত না করে, যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক, হযরত উসমান গনী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা), তা হলে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হবে।

কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন ও বিপদের ফলে হযরত যানিরা (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেতে থাকে। মক্কার মুশরিকরা বলতে থাকে, লাত ও উযযা তাকে অন্ধ বানিয়ে দিচ্ছে। হযরত যানিরা (রা) মক্কার মুশরিকদের জবাবে বললেন, লাত ও উযযার তো এ খবরও নেই যে, কে তাদের পূজা করে। আল্লাহ যদি চান তা হলে আমার দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতের কারিশমা দেখুন, ঐ রাতের পরদিন ভোরেই তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ জাদু করেছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বাঁদী যানিরাকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন।[১]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এভাবে অনেক গোলাম ও বাঁদীকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন এবং অত্যাচারিতদের জীবন বাঁচান। হযরত বিলাল, হযরত আবূ ফুকায়হা, হযরত আমর ইবন ফুহায়রা, হযরত যানিরা, হযরত নাহদিয়া, হযরত নাহদিয়ার

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৬৯।

কন্যা, হযরত লাবিনা, হযরত মুমিলিতা এবং হযরত উম্মে উবায়স (রা), এঁদের সবাইকে হযরত আবূ বকরই ক্রয় করে আযাদ করে দেন।[১]

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পিতা আবূ কুহাফা তখনো মুসলমান হন নি, একবার আবূ বকরকে বললেন, আমি দেখছি তুমি খুঁজে খুঁজে দুর্বল এবং অসহায়দের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছ, যদি শক্তিশালী এবং যুবকদের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিতে, তবে তা তোমার উপকারে আসতো। আবূ বকর বললেন, যাদের কিনে নিয়ে আযাদ করে দিচ্ছি, তাদের কেনার উদ্দেশ্য তো আমার অন্তরে আছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗ اِذَا تَرَدّٰى اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقٰى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

"সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে আমি তার জন্য সহজ পথ সুগম করে দেব। আর কেউ কার্পণ্য করলে এবং নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণতির পথ। আর যখন সে ধ্বংস হবে, তখন তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না। আমার কাজ তো কেবল পথ নির্দেশ করা। আমি তো পরলোকের ও ইহলোকের মালিক। আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি; যে নিতান্তই হতভাগা, যে হককে অস্বীকার করে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে-ই ওতে প্রবেশ করবে। আর পরম মুত্তাকীদের তা থেকে বহু দূরে রাখা হবে, যে আত্মশুদ্ধির জন্য নিজ সম্পদ দান করে এবং কারো প্রতি তার অনুগ্রহের প্রতিদান পাওয়ার জন্যে নয়, কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় তা করে, সে তো অচিরেই (নিজ অনুগ্রহের পুরস্কার দেখে) সন্তোষ লাভ করবে।" (সূরা লায়ল ৫-২১)

হাকিম হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) থেকে (যে উপলক্ষে আয়াতটি নাযিল হয়েছে) হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৬৯; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৫৮)।

---

১. প্রাগুক্ত।

এ আয়াত সর্বসম্মত মতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে اتقى বলা হয়েছে। অর্থাৎ সবচে' বেশি পরহেযগার এবং আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী। সূরা হুজুরাতে ইরশাদ হয়েছে : ان اكرمكم عند الله اتقكم "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।" (সূরা হুজুরাত ১৩)

বুঝা গেল যে, মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট নবী করীম (সা)-এর পরে উম্মতের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। আর হুযূর (সা)-এর পরে তাঁরাই সবচে' উত্তম ছিলেন, যাঁরা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে জীবন ও সম্পদ দিয়ে ইসলামকে সাহায্য করেছেন এবং ক্রীতদাসদের কিনে কিনে আযাদ করে দিয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তের বছরে ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমতে চল্লিশ হাজার দিরহাম মূলধন ব্যয় করেছেন। আর যা অতিরিক্ত ছিল, হিজরতের সফর এবং মসজিদে নববীর জায়গা ক্রয়ে তা ব্যয় হয়ে গেছে। যখন কাপড় ছিল না, তখন চাদর জড়িয়ে নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, তবুও আমি আমার পরওয়ারদিগারের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

কতিপয় শী'আ বলে থাকে যে, এ আয়াত হযরত আলী (রা)-এর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর জবাব হলো, এ সূরার সমুদয় বাক্যই এ কথার সাক্ষ্য যে, সূরাটি ঐ ব্যক্তির প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যিনি নিজের ধন-সম্পদ কেবল আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী হাসিলের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছেন। আর সারা পৃথিবীই জানে যে, হযরত আলী (রা) সে সময় অল্পবয়স্ক ছিলেন, আবূ তালিবের অভাবের কারণে তিনি নবী করীম (সা)-এর তত্ত্বাবধানে ও অভিভাবকত্বে ছিলেন। তাঁর মধ্যে ঐ সময় না ছিল আর্থিক সামর্থ্য, আর না ছিল শারীরিক শক্তি, যা দিয়ে ইসলামের সাহায্য করতে পারেন। তিনি কেমন করে এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারেন ? পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) জান ও মাল দিয়ে ইসলামকে এতটা সাহায্য করেছেন যে, যখন ইসলাম অসহায়, নির্বান্ধব ও অভিভাবকহীন ছিল, ঐ সময়ের সাহায্য গ্রহণীয় ও শত কল্যাণময় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

"তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে (ইসলামের দুর্দিনে) ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে, তারা আর পরবর্তীরা সমান নয়; তারা ওদের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, যারা পরবর্তীকালে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।" (সূরা হাদীদ : ১০)

মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের আর্থিক উন্নতি হয়, সে সময় আর সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন থাকেনি। এ কারণে নবী করীম (সা)-এর পর সমস্ত উম্মতের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এ জন্যে পূর্ববর্তী আয়াতের ভিত্তিতে তাঁর মুত্তাকী হওয়ার বিষয়টি জানা যায়, যা আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আর দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা জানা যায়। এজন্যে যে, তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলামকে সহায়তা করেছেন এবং জান-মাল দ্বারা ইসলামের সাহায্য করেছেন।

অধিকন্তু, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের কথা ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, আর হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহযাত্রী হওয়া, হেরা গুহায় তাঁর সাহচর্য এবং নবী (সা)-এর মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতাকালীন সালাতে ইমামতি করার বর্ণনা ইনশা আল্লাহ এর পরেই আসছে। এ সমুদয় কর্মকাণ্ড হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উত্তম হওয়ারই প্রমাণ বহন করে।

মোটকথা, কুরায়শ মুসলিম নির্যাতনে এক মুহূর্তও নষ্ট করেনি। ওরা মুসলমানদের গাছে লটকিয়ে রেখেছে, পায়ে রশি বেঁধে হেঁচড়িয়ে নিয়েছে, পেট ও পিঠে উত্তপ্ত অঙ্গার রেখেছে, সব কিছুই করেছে, কিন্তু সত্য দীন থেকে কাউকে পদস্খলিত করতে সক্ষম হয়নি। অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু ইসলাম থেকে বিমুখ হননি। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

এ তো ছিল ঐ সব লোকের বর্ণনা, যাঁরা ক্রীতদাস ছিলেন অথবা ভিনদেশী ছিলেন। মুশরিকদের নির্যাতনের কালো হাত থেকে ঐ সব লোকও রেহাই পাননি, যাঁদের বংশীয় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জিত ছিল।

১. হযরত উসমান গনী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চাচা হাকিম ইবন আবুল আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখল এবং বলল যে, কেন তুমি বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো এ দীন পরিত্যাগ করব না, আর এর থেকে কখনো পৃথকও হবো না। হাকিম যখন দেখল যে, তিনি দীনের উপর খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তখন তাঁকে ছেড়ে দিল।[১]

২. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন তাঁর চাচা তাঁকে একটি বস্তায় ভরে ধোঁয়া দিত, যাতে তিনি পুনরায় স্বধর্মে ফিরে আসেন। কিন্তু হযরত যুবায়র (রা) বলতেন : لا اكفر ابدا "আমি কখনই কুফরী করব না।"[২]

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৩৮।

২. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৫৪৫।

৩. হযরত উমর (রা)-এর ভগ্নিপতি এবং চাচাত ভাই হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন হযরত উমর (রা) তাঁকে রশি দিয়ে বাঁধেন। (সহীহ বুখারী, হযরত সাঈদ ইবন যায়দ-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়)।

৪. হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর পিতা তাঁকে এতই প্রহার করেন যে, তাঁর মাথা ফেটে যায় এবং তাঁর খানাপিনা বন্ধ করে দেয়া হয়। বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে।

৫. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত তালহা (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন কুরায়শের ব্যাঘ্র বলে কথিত নওফেল ইবন খুয়ায়লিদ দু'জনকে ধরে একই রশি দিয়ে বেঁধে রাখে। এ কারণে হযরত আবূ বকর ও হযরত তালহাকে 'কারনায়ন' (অর্থাৎ দু'জন এক 'কারন' বা একই রশি দিয়ে বাঁধা) বলা হতো। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, হযরত তালহা (রা)-এর জীবন চরিত)।

৬. হযরত ওলীদ ইবন ওলীদ, হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া ও হযরত সালমা ইবন হিশাম (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, মক্কার কাফিরগণ তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালালো এবং তাঁদেরকে হিজরত পর্যন্ত করতে দেয় নি; যাতে করে হিজরতের ফলে এ নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহানবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় তাঁদেরকে মক্কার মুশরিকদের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য ফজরের সালাতের পর প্রত্যেকের নাম নিয়ে দু'আ করতেন যে, আয় আল্লাহ ! তুমি ওলীদ ইবন ওলীদ, আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া ও সালমা ইবন হিশাম-কে মুশরিকদের অত্যাচারের খপ্পর থেকে নাজাত দাও। (সহীহ বুখারী)।

৭. হযরত আবূ যর গিফারী (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন মসজিদে হারামে গিয়ে নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ফলে মক্কার মুশরিকগণ তাঁকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দেয়। হযরত আব্বাস (রা) এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। (সহীহ বুখারী, হযরত আবূ যর-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়)।

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণের মু'জিযা

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ। কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।

মদীনায় হিজরতের প্রায় পাঁচ[১] বছর পূর্বে একবার মক্কার মুশরিকগণ একত্রিত হয়ে নবী (সা)-এর কাছে এলো। যাদের মধ্যে ওলীদ ইবন মুগীরা, আবূ জাহল, আস ইবন ওয়ায়েল, আস ইবন হিশাম, আসওয়াদ ইবন আবদে ইয়াগূস, আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব, জামা'আ ইবনুল আসওয়াদ, নযর ইবন হারিস প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা তাঁর কাছে এ আবদার করল যে, যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হয়ে থাকেন তবে নবূওয়াতের বিশেষ কোন নিদর্শন দেখান। অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, চাঁদকে দু'টুকরা করে দেখান। তখন রাত ছিল এবং চতুর্দশী চাঁদ আকাশে উদিত হয়েছিল।

---

১. যেমনটি রূহুল মা'আনীর সূরা কামার-এর তাফসীরে উল্লিখিত আছে।

নবী (সা) বললেন, আচ্ছা, যদি এ মু'জিযা দেখাই, তা হলে ঈমান আনবে তো ? লোকেরা বলল, হ্যা, আমরা ঈমান আনব। হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং পবিত্র আঙ্গুল দিয়ে চাঁদের প্রতি ইশারা করলেন। সাথে সাথে চাঁদ দু 'টুকরা হয়ে গেল। এক টুকরা আবূ কুবায়স পাহাড়ের উপর এবং অপর টুকরা কায়কায়ান পাহাড়ের উপর ছিল। দীর্ঘক্ষণ মানুষ আশ্চর্য হয়ে দেখতে থাকে। ওরা এতটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল যে, কাপড় দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে থাকে এবং চাঁদের দিকে দেখতে থাকে, এতে চাঁদ পরিষ্কার দু' টুকরা দেখা যেতে থাকে। রাসূল (সা) তখন বলছিলেন, আশহাদু আশহাদু; "হে লোকেরা, সাক্ষ্য থাকো, সাক্ষ্য থাকো।" আসর এবং মাগরিবের মধ্যে যতটা সময় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ দু' টুকরা থাকে, পরে আবার তা একত্রিত হয়ে যায়।

মক্কার মুশরিকরা বলল, মুহাম্মদ, তুমি তো জাদু করেছ। কাজেই বাইরে থেকে আগত মুসাফিরের অপেক্ষা কর এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। কেননা এটা কখনই সম্ভব নয় যে, মুহাম্মদ সমস্ত লোকের উপর জাদু করবে। যদি তারাও এ ব্যাপারে নিজেরা দেখার সাক্ষ্য দেয়, তবে ঠিক আছে; আর যদি তারা বলে যে, আমরা দেখি নি, তবে নিশ্চিত মুহাম্মদ তোমাদের উপর জাদু করেছে। সুতরাং মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করা হল। সমস্ত দিক থেকে আগত মুসাফিরেরা নিজেদের সাক্ষ্য দিল যে, আমরা চাঁদকে দু' টুকরা হওয়া দেখেছি। কিন্তু এ সাক্ষ্যের ফলেও ঐ দুশমনেরা ঈমান আনলো না; বরং বলল- এটা চিরাচরিত জাদু। অর্থাৎ শীঘ্রই এর প্রতিক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হলো

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে, ওরা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো চিরাচরিত জাদু।" (সূরা কামার ১-২)

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার মু'জিযা রাসূল (সা)-এর যামানায় সংঘটিত হওয়া কুরআনুল করীম, মুতাওয়াতির, সহীহ্ ও উত্তম সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যদি কোন নাম-গোত্রহীন ব্যক্তি, যে ইনশাক্কা-কে 'সা-ইনশাক্ক' অর্থাৎ অতীতকাল বাচক বলতে চায়, সে সরাসরি কুরআনের আয়াত, সহীহ্ ও প্রসিদ্ধ হাদীস এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের ইজমার বিরোধিতা করে; যা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়।

চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণের এ ঘটনা, যা আমরা বর্ণনা করেছি, হাফিয ইবন কাসীরের আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া[১] এবং ফাতহুল বারী-র ইনশিকাকুল কামার[২] অধ্যায় থেকে গ্রহণ করেছি। সম্মানিত উলামায়ে কিরাম, মূল কিতাব দেখে নিন। ইসলাম বিরোধীগণ

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৮।

এ মু'জিযা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, প্রথমত এটা অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা যে, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা যায়। দ্বিতীয়ত, এ ঘটনা কোন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়নি। এর জবাব এটাই যে, আজ অবধি কোন জ্ঞানায়ত্ব প্রমাণ দ্বারা এ ধরনের কোন ঘটনা অসম্ভব ও অবাস্তব প্রমাণিত হয়নি। আল্লাহ্ তা'আলা সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

যেমন মৃত্তিকার স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুর হওয়া জ্ঞানত অবাস্তব ও অসম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও ইচ্ছায় উর্ধ্বাকাশেরও স্থায়িত্ব ও ভঙ্গুর হওয়া অসম্ভব নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নিরিখে আসমান এবং যমীন, সূর্য এবং চন্দ্র, বৃক্ষ এবং পাথর সব একইরূপ। যে আল্লাহ্ সূর্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ্ তাকে ভাঙতেও পারেন, জুড়তেও পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কারামত প্রকাশ নিশ্চিতভাবে অসম্ভব নয়। হ্যাঁ, ধারণাতীত ও বিরল তো বটেই। আর মু'জিযার জন্য কল্পনাতীত হওয়াটাই আবশ্যিক। যে ব্যক্তি কেবল ধারণাতীত হওয়ার কারণে এটা অসম্ভব দাবি করে, সে অসম্ভব এবং ধারণাতীত-এর পার্থক্যটাই জানে না। বাকী রইল এ ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে না থাকার অভিযোগ যা এ ধরনের শত শত, হাজার হাজার আশ্চর্য ও ধারণাতীত ঘটনা, যা বাস্তবে ঘটেছে কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ নেই। তাওরাত এবং ইঞ্জিলে এ ধরনের অনেক এমন ঘটনা আছে, যার নাম-নিশানাও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে নেই। অধিকন্তু, চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণ ছিল রাতে সংঘটিত ঘটনা, যা সাধারণত মানুষের আরাম করার সময় এবং কেবল সামান্য সময় মাত্র ছিল। এ কারণে যদি ব্যাপকভাবে জনগণ এটা না জানে, তা হলে তা অসম্ভব কিছু নয়। কোন কোন সময় চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ লাগে, আর অনেক মানুষ হয়ত তার খবরও রাখে না। অধিকন্তু, স্থানিক দূরত্বের কারণে অনেক স্থানে তখন হয়ত দিন হয়ে থাকবে, আবার কোন স্থানে অর্ধ রাত্রি হয়ে থাকবে, সাধারণত সেখানে লোকজন ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। এ মু'জিযার উদ্দেশ্য ছিল কেবল মক্কাবাসীকে দেখানো ও তাদেরকে প্রমাণ দেখিয়ে দেয়া সে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গিয়েছিল, সমগ্র বিশ্বকে দেখানো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ছাড়া কোন বস্তু দেখা আল্লাহ্ তা'আলার দেখানোর উপর নির্ভর করে। যদি কোন বস্তু চোখের সামনেও থাকে, আর আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখাতে না চান, তা হলে ঐ বস্তু চোখে পড়বে না।

সূর্যের প্রত্যাবর্তন[১]

রাসূল (সা)-এর প্রসিদ্ধ মু'জিযাসমূহের মধ্যে সূর্যের প্রত্যাবর্তনও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পুনরায় ফিরে আসা। হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সা) খায়বরের সন্নিকটে 'সাহবা' নামক স্থানে ছিলেন।

---

১. এ মু'জিযা যদিও হিজরতের পর সপ্তম হিজরীতে খায়বার থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'সাহবা' নামক স্থানে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় এখানে বর্ণনা করা উপযুক্ত মনে হলো। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

হুযূর (সা) হযরত আলী (ক)-এর কোলে মাথা রেখে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত আলী তখনো আসরের সালাত পড়েননি, এ অবস্থায় ওহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। এমনকি সূর্য ডুবে গেল। রাসূল (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আসরের সালাত পড়নি? তিনি বললেন, না। তৎক্ষণাৎ রাসূল (সা) হাত তুলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, আয় আল্লাহ! আলী তোমার রাসূলের আনুগত্য করছিল, সূর্যকে ফিরিয়ে দাও, যাতে সে ওয়াক্তমত আসরের সালাত আদায় করতে পারে। আসমা বিনতে উমায়স (রা) বলেন, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর ফিরে এলো, আর এর রশ্মি যমীন এবং পাহাড়সমূহের উপর পতিত হলো। ইমাম তাহাবী বলেন, হাদীসটি সহীহ এবং এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জাওযী ও ইবন তায়মিয়া হাদীসটি মওযূ' ও ভিত্তিহীন বলেছেন। আর শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতী এ হাদীস সম্পর্কে একটি পৃথক পুস্তিকা রচনা করেন, যার নাম দেন كشف اللبس عن حديث رد شمس যাতে তিনি হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা ও সনদসমূহ বর্ণনা করেন এবং এ হাদীসটিকে সহীহ বলে প্রমাণিত করেন আল্লামা যারকানীও শারহে মাওয়াহিবে হাদীসটি সহীহ ও বিশুদ্ধ সনদ সম্বলিত বলে প্রমাণ করেছেন।[১]

সূর্যের গতি থেমে যাওয়ার মু'জিযা

কতিপয় যঈফ বর্ণনায় আছে যে, একবার রাসূল (সা)-এর জন্য সামান্য সময় সূর্যের গতি থামিয়ে দেয়া হয়েছিল। এ বর্ণনা মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেননি। (যারকানী, ৫খ. পৃ. ১১৮, নাসীমুর রিয়ায, ৩খ. পৃ. ১৪ এবং আল্লামা কারীকৃত আশ-শিফা, ১খ. পৃ. ৫৯১)।

যেহেতু চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া, সূর্যের প্রত্যাবর্তন এবং সূর্যের গতি থেমে যাওয়া কাছাকাছি ধরনের মু'জিযা, এ জন্যে আমরা এ তিনটিকে একই ধারাবাহিকতায় বর্ণনা করলাম।

এ মু'জিযা মক্কা মুকাররমায় সংঘটিত হয়। হযরত (সা) যখন মি'রাজ থেকে ফিরে আসেন এবং কুরায়শদের সামনে মি'রাজের অবস্থা বর্ণনা করেন, কুরায়শগণ সততা পরীক্ষার্থে হযরতকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শনাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করছিল। তারা তাঁর কাছে একটি কাফেলা সম্পর্কেও জানতে চায়, যে কাফেলাটি বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিল সেটি কবে ফিরে আসবে। তিনি (সা) বললেন, কাফেলাটি বুধবার মক্কায় প্রবেশ করবে। যখন বুধবার শেষ হতে চলল এবং সন্ধ্যা সমাগত হলো, তখন কাফিরেরা শোরগোল আরম্ভ করলো। রাসূল (সা) তখন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে ঐ স্থানেই স্থির রাখেন, এমনকি ইতিমধ্যে কাফেলা এসে পড়লো। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীর বক্তব্যের সত্যতা প্রকাশ করলেন।

---

[১] কাযী ইয়ায কৃত আশ শিফা-র শরাহ নাসীমুর রিয়ায, ৩খ. পৃ. ১০-১৩; যারকানী, ৫খ. পৃ. ১১৩-১১৬।

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

মক্কার মুশরিকগণ যখন দেখল যে, দিনকে দিন মানুষ ইসলামে দাখিল হচ্ছে, আর ইসলামের পরিধি বিস্তৃত হতে চলেছে, তখন তারা মুসলমানদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালানোর জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হলো। নানাভাবে মুসলমানদের উপর যুলুম-নিপীড়ন চালাতে লাগলো। উদ্দেশ্য, যেন তাঁরা ইসলাম ত্যাগ করেন। তখন নবী (সা) ইরশাদ করলেন :

تفرقوا فى الارض فان الله سيجمعكم قالوا الى اين نذهب قال الى هنا واشار بيده الى ارض الحبشة

"তোমরা আল্লাহর যমীনের কোথাও হিজরতে চলে যাও, আল্লাহ্ শীঘ্রই তোমাদের একত্রিত করবেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, কোথায় যাব ? তিনি আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেন।" (আবদুর রাযযাক মা'মার থেকে এবং তিনি যুহরী থেকে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেন)।

হযরত (সা) আরো বললেন, সেখানে এক বাদশাহ আছেন, যাঁর সাম্রাজ্যে কেউ কারো উপর যুলুম করতে পারে না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) তখন কুফর ও শিরকের এ ফিতনার কারণে ঘাবড়িয়ে যান এবং দীন ও ঈমান হরণকারী দস্যুদের কালো থাবার বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন, নিরুপদ্রব পরিবেশে নিশ্চিন্তে স্বীয় প্রভুর নাম নিতে পারাটাই ছিল তাঁদের কাম্য। কাজেই নুবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে নিম্ন বর্ণিত সাহাবা কিরাম (রা) আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন

পুরুষ

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা);
২. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা);
৩. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা);
৪. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা);
৫. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা);
৬. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৭. হযরত উসমান ইবন মাষ'উন (রা);
৮. হযরত আমের ইবন রবীয়াহ (রা);
৯. হযরত সুহায়ল ইবন বায়যা (রা);
১০. হযরত আবূ সাবরা ইবন আবূ রুহম আমিরী (রা), (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩);
১১. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা)। (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৫)।

মহিলা

১. হযরত রুকাইয়্যা (রা), অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা ও হযরত উসমান সম্মানিত স্ত্রী;
২. হযরত সাহলা বিনতে সুহায়ল (রা), হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর স্ত্রী;
৩. হযরত উম্মে সালমা বিনতে আবূ উমায়্যা (রা), হযরত আবূ সালমা (রা)-এর স্ত্রী, যিনি আবূ সালমার ইনতিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীত্ব লাভে ধন্য হন এবং উম্মুল মু'মিনীন উপাধিতে ভূষিত হন;
৪. হযরত লায়লা বিনতে আবূ হাসমা (রা), হযরত আমের ইবন রবীয়াহ (রা)-এর স্ত্রী, (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩, আবিসিনিয়ায় হিজরত অধ্যায়);
৫. হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল ইবন উমর (রা), হযরত আবূ সাবরা (রা)-এর স্ত্রী। (উয়ূনুল আসার)।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকায় হাতিব ইবন উমর এবং উম্মে কুলসুমের নাম উল্লেখ করেন নি। এ নাম হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস উয়ূনুল আসার-এ উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর নামও উল্লেখ করেছেন।

হাফিয আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ এটাই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে শরীক ছিলেন না, বরং দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন, যা আমরা শীঘ্রই উল্লেখ করব।

আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকও এটাই বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতে শরীক ছিলেন না; বরং দ্বিতীয় হিজরতে শরীক ছিলেন এবং মুসনাদে আহমদের হাসান সনদে বর্ণিত একটি রিওয়ায়াত দ্বারাও এটাই অনুমিত হয়।[১]

এই এগারজন পুরুষ ও পাঁচজন স্ত্রীলোক গোপনে রওয়ানা হন। কয়েকজন বাহনে আর কয়েকজন পদব্রজে। ঘটনাক্রমে যখন তাঁরা বন্দরে পৌঁছলেন, তখন দুটি ব্যবসায়ী নৌকা আবিসিনিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। পাঁচ দিরহাম নিয়ে তারা তাঁদের সবাইকে নৌকায় তুলে নিল।

মক্কার মুশরিকদের কাছে যখন এ খবর পৌঁছল, তারা পিছনে লোক লেলিয়ে দিল। কিন্তু তারা বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই নৌকা যাত্রা করেছিল (উয়ূনুল আসার, ৭খ. পৃ. ১১৬)।

হযরত আসকালানী বলেন, এ সাহাবীগণ জেদ্দার উপকূল থেকে নৌকায় আরোহণ করেছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০)। এঁরা রজব থেকে শাওয়াল পর্যন্ত আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩।

শাওয়াল মাসে খবর শুনলেন যে, মক্কাবাসী সবাই মুসলমান হয়ে গেছে, তখন তাঁরা মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কার নিকটে পৌঁছে যখন জানলেন, খবরটি মিথ্যা, তখন তাঁরা মহাসংকটে পড়ে গেলেন। অগত্যা তাঁদের কেউ গোপনে এবং কেউ কারো আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

এবার কুরায়শরা পূর্বের তুলনায় বেশি অত্যাচার শুরু করলো। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে পুনরায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। তখন নিম্নবর্ণিত সাহাবায়ে কিরাম (রা) হিজরত করেন :

পুরুষ

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা);
২. হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা);
৩. হযরত আমর ইবন সাঈদ ইবন আস (রা);
৪. হযরত খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আস (রা),হযরত আমর ইবন সাঈদ (রা)-এর ভাই;
৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা);
৬. উবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশ, যিনি আবিসিনিয়া গিয়ে খ্রিস্টান হয়ে যান এবং খ্রিস্টান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন;
৭. হযরত কায়স ইবন আবদুল্লাহ (রা);
৮. হযরত মুয়াইকিব ইবন আবূ ফাতিমা দাওসী (রা);
৯. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা);
১০. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা);
১১. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা);
১২. হযরত আসওয়াদ ইবন নওফেল (রা);
১৩. হযরত ইয়াযীদ ইবন যাম'আ (রা);
১৪. হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা);
১৫. হযরত তালিব ইবন উমায়র (রা);
১৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা);
১৭. হযরত সুয়ায়বিত ইবন সা'দ (রা);
১৮. হযরত জুহম ইবন কায়স (রা);
১৯. হযরত আমর ইবন জুহম (রা), অর্থাৎ হযরত জুহম ইবন কায়স (রা)-এর পুত্র;
২০. হযরত খুযায়মা ইবন জুহম (রা), অর্থাৎ জুহমের দ্বিতীয় পুত্র;
২১. হযরত আবুর রূম ইবন উমায়র (রা) অর্থাৎ হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর ভাই;

২২. হযরত ফিরাস ইবন নাযর (রা);
২৩. হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা);
২৪. হযরত আমর ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা);
২৫. হযরত মুত্তালিব ইবন আযহার (রা);
২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা);
২৭. হযরত উতায়বা ইবন মাস'ঊদ (রা), অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর ভাই;
২৮. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা);
২৯. হযরত হারিস ইবন খালিদ (রা);
৩০. হযরত আমর ইবন উসমান (রা);
৩১. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৩২. হযরত শাম্মাস (রা), যাকে উসমান ইবন আবদুশ শারীদ বলা হতো;
৩৩. হযরত হাব্বার ইবন সুফিয়ান ইবন আবদুল আসাদ (রা);
৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুফিয়ান (রা), হযরত হাব্বার (রা)-এর ভাই;
৩৫. হযরত হিশাম ইবন আবূ হুযায়ফা (রা);
৩৬. হযরত সালমা ইবন হিশাম (রা);
৩৭. হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াহ (রা);
৩৮. হযরত মুয়াত্তাব ইবন আওফ (রা);
৩৯. হযরত উসমান ইবন মায'ঊন (রা);
৪০. হযরত সায়িব ইবন উসমান (রা);
৪১. হযরত কুদামা ইবন মায'ঊন (রা);
৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মায'ঊন (রা), হযরত কুদামা এবং আবদুল্লাহ (রা) এ দু'জনই হযরত সায়িব (রা)-এর চাচা;
৪৩. হযরত হাতিব ইবন হারিস (রা);
৪৪. হযরত মুহাম্মদ ইবন হাতিব (রা);
৪৫. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), অর্থাৎ হযরত হাতিব (রা)-এর উভয় পুত্র;
৪৬. হযরত খাত্তাব ইবন হারিস (রা), অর্থাৎ হাতিব ইবন হারিস (রা)-এর ভাই;
৪৭. হযরত সুফিয়ান ইবন মা'মার (রা);
৪৮. হযরত জাবির ইবন সুফিয়ান (রা);
৪৯. হযরত জুনাদা ইবন সুফিয়ান (রা), হাসনার গর্ভজাত সুফিয়ানের পুত্র;
৫০. হযরত শারজীল ইবন হাসনা (রা), অর্থাৎ হযরত জাবির এবং সুফিয়ানের বৈপিত্রেয় ভাই;
৫১. হযরত উসমান ইবন রবীয়াহ (রা);
৫২. হযরত খুনায়স ইবন হুযাফাহ সাহমী (রা);

৫৩. হযরত কায়স ইবন হুযাফা সাহমী (রা);
৫৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী (রা), এ তিনজন পরস্পর ভাই;
৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হারিস সাহমী (রা);
৫৬. হযরত হিশাম ইবন আস সাহমী (রা);
৫৭. হযরত আবূ কায়স ইবন হারিস সাহমী (রা);
৫৮. হযরত হারিস ইবন হারিস ইবন কায়স সাহমী (রা);
৫৯. হযরত মা'মার ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬০. হযরত বিশর ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬১. হযরত সাঈদ ইবন আমর সাহমী (রা), বিশর ইবন হারিসের বৈপিত্রেয় ভাই;
৬২. হযরত সাঈদ ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬৩. হযরত সায়িব ইবন হারিস সাহমী (রা);
৬৪. হযরত উমায়র ইবন রুয়াব সাহমী (রা);
৬৫. হযরত মুহাম্মিয়া ইবন জাযর (রা);
৬৬. হযরত মা'মার ইবন আবদুল্লাহ (রা);
৬৭. হযরত উরওয়া ইবন আবদুল উযযা (রা);
৬৮. হযরত আদী ইবন নাযলা (রা);
৬৯. হযরত নুমান ইবন আদী (রা), অর্থাৎ হযরত আদী ইবন নাযলা (রা)-এর পুত্র;
৭০. হযরত আমির ইবন রবীয়াহ (রা);
৭১. হযরত আবূ সাবরা ইবন আবূ রুহম (রা);
৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা);
৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুহায়ল ইবন আমর (রা);
৭৪. হযরত সালীত ইবন আমর (রা);
৭৫. হযরত সুকরান ইবন আমর (রা), অর্থাৎ গযরত সালীত ইবন আমর (রা)-এর ভাই;
৭৬. হযরত মালিক ইবন রবীয়াহ (রা);
৭৭. হযরত আবূ হাতিব ইবন আমর (রা);
৭৮. হযরত সা'দ ইবন খাওলা (রা);
৭৯. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা);
৮০. হযরত সুহায়ল ইবন বায়যা (রা);
৮১. হযরত আমর ইবন আবূ সারাহ (রা);
৮২. হযরত ইয়ায ইবন যুহায়র (রা);
৮৩. হযরত আমর ইবন হারিস ইবন যুহায়র (রা);
৮৪. হযরত উসমান ইবন আবদে গানাম (রা);
৮৫. হযরত সা'দ ইবন আবদে কায়স (রা);
৮৬. হযরত হারিস ইবন আবদে কায়স (রা)।

মহিলা

১. হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রাসূলুল্লাহ (সা);
২. হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা), হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফর (রা) জন্মগ্রহণ করেন;
৩. হযরত ফাতিমা বিনতে সাফওয়ান (রা), হযরত আমর ইবন সাঈদ (রা)-এর স্ত্রী;
৪. হযরত উমায়না বিনতে খালফ (রা), হযরত খালিদের স্ত্রী;
৫. হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা), হযরত উবায়দুল্লাহ (রা)-এর স্ত্রী, উবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন;
৬. হযরত বরকত বিনতে ইয়াসার (রা), কায়সের স্ত্রী;
৭. জাহমের স্ত্রী, হযরত উম্মে হারমালা বিনতে আবদুল আসওয়াদ (রা);
৮. হযরত মুত্তালিবের স্ত্রী, হযরত রামলা বিনতে আওফ (রা);
৯. হযরত হারিসের স্ত্রী হযরত রায়তা বিনতে হারিস ইবন জাবালা, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে মূসা, আয়েশা, যয়নব এবং ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন;
১০. আবূ সালমার স্ত্রী, উম্মে সালমা, যাঁর গর্ভে আবিসিনিয়াতে যয়নব জন্মগ্রহণ করেন, আবূ সালমার মৃত্যুর পর যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সৎ মেয়ে বলা হতো;
১১. হযরত হাতিবের স্ত্রী, হযরত ফাতিমা বিনতে মুজাল্লাল (রা);
১২. খাত্তাবের স্ত্রী, হযরত ফাকিহা বিনতে ইয়াসার (রা);
১৩. সুফিয়ানের স্ত্রী, হযরত হাসনা (রা);
১৪. আবূ সাবরার স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে সুহায়ল (রা);
১৫. সুকরানের স্ত্রী, হযরত সাওদা বিনতে জাম্‘আ (রা);
১৬. মালিকের স্ত্রী হযরত উমরা বিনতে সা‘দী (রা)।

(সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ, পৃ. ১১১–১১৪; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৬)।

ইবন হিশাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নামসমূহ বংশ ও গোত্র পরিচিতি সহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন আর হাফিয ইবন সায়্যিদুন নাস উয়ূনুল আসারে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)-এর ব্যাপারে জীবনী লেখক আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে ছিলেন কিনা। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আবিসিনিয়ার মুহাজিরদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা)-এর পবিত্র নামও উল্লেখ করেছেন। ওয়াকিদী এবং অপরাপর আলিম এটা অস্বীকার করেছেন। কতিপয় আলিম তো এ পর্যন্ত বলে দিয়েছেন যে, মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের মত ইমামের এ ব্যাপারে চুপ থাকা অসম্ভব। হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) ইয়েমেনে বসবাসকারী। নবূয়াতের সূচনাকালে তিনি মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন, এরপর ইয়েমেনে ফিরে যান। আর যখন হযরত জাফর ও অপরাপর সাহাবা (রা)দের

হিজরত করে আবিসিনিয়া গমনের খবর জানতে পারেন, তখন যেহেতু আবিসিনিয়া ইয়েমেনের সন্নিকটবর্তী, কাজেই তিনি হিজরত করে আবিসিনিয়া গমন করেন এবং সেখানে স্থায়ী হন। এরপর সপ্তম হিজরী সালে হযরত জাফর (রা)-এর সাথে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় আসেন। যেহেতু হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, যদিও সে হিজরত মক্কা থেকে ছিল না; বরং ইয়েমেন থেকে ছিল। এ জন্যে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের তালিকায় উল্লেখ করেন। যে সমস্ত ব্যক্তি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, চাই তা মক্কা থেকে হোক অথবা ইয়েমেন থেকে কিংবা অন্য কোন স্থান থেকে, তাঁদের মধ্যে হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)ও শামিল ছিলেন। হ্যাঁ, যদি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এমনটি বলতেন যে, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) মক্কা থেকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেছেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তা অস্বীকার করার উপযুক্ত ছিল।[১]

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) আবিসিনিয়া গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং নিরাপদে ইসলামের হুকুম-আহকাম পালন করে চলছেন, তখন তারা পরামর্শ করল যে, আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াকে দিয়ে নাজ্জাশী এবং তার পারিষদবর্গ ও নিকটজনদের পর্যাপ্ত পরিমাণে হাদিয়া বা উপঢৌকন দিয়ে নিজেদের মতে আনয়ন করবে। সুতরাং আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়া আবিসিনিয়া উপস্থিত হলো এবং প্রথমে পারিষদবর্গ ও মোসাহেবদেরকে উপহার দিয়ে বলল যে, আমাদের শহরের কিছু মূর্খ ও আহমক নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ওরা নিজেদের পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে আপনাদের খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেনি; বরং এমন এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে, যে সম্পর্কে আমরা আপনারা, কেউই কিছু জানি না। দেশের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাদের দু'জনকে মহামান্য বাদশাহর কাছে এ জন্যে প্রেরণ করেছেন যেন ঐ লোকগুলোকে আমাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আপনারা অনুগ্রহ করে বাদশাহর কাছে সুপারিশ করুন, যাতে কোন কথাবার্তা ছাড়াই বাদশাহ ওদেরকে আমাদের হাতে তুলে দিন। কাজেই তারা যখন নিশ্চিন্ত হলো এবং হাদিয়া বা উপঢৌকনের বিনিময়ে দরবারী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের আরযী পেশ করল, তখন তারা এদের পুরোপুরি সমর্থন করল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ সাহাবায়ে কিরামের কাউকে ডেকে তাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করুন কিংবা তাদের কাছ থেকে বাদশাহ কিছু কথা শুনুন, আমর ইবন আস ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়ার জন্য এটা খুবই কঠিন ও কষ্টকর ব্যাপার ছিল।

পাঠকবর্গ খুব ভাল করেই বুঝেন যে, তারা কেন এটা চাচ্ছিল না হাবশী বাদশাহ মুহাজির সাহাবাগণের কারো সঙ্গে কোন কথা না বলুন কিংবা তাঁদের কিছু জিজ্ঞেস না

১. যাদুল মা'আদ,২খ. পৃ. ৪৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৩।

করুন, এমনিতেই মুহাজিরগণকে ওদের হাতে সোপর্দ করুন। প্রকাশ্য কারণ এটাই যে, কথা বললে ওরা যে হক কথাই বলবেন এটা ওদের জানা ছিল। মোটকথা, তারা বাদশাহের সামনে নিজেদের আরযী পেশ করলো আর দরবারীরাও পুরোপুরি সমর্থন করল ঐ লোকগুলোকে আরব প্রতিনিধিদের হাতে সোপর্দ করা হোক। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। নাজ্জাশী রাগান্বিত হয়ে সাফ সাফ বলে দিলেন, আমি তাদের অবস্থা সম্বন্ধে না জেনে, তাদের সাথে কথা না বলে তাদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করতে পারি না। এটা কি করে সম্ভব হতে পারে, যে সমস্ত লোক নিজেদের দেশ ছেড়ে আমার সাম্রাজ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সম্বন্ধে তত্ত্ব-তালাশ না নিয়েই তাদের বিরোধী লোকদের হাতে তাদেরকে তুলে দেব ? বাদশাহ সাহাবা (রা) দের ডেকে আনার জন্য এক ব্যক্তিকে পাঠালেন। দূত তাঁদের কাছে বাদশাহর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিল। তখন সাহাবীদের মাঝে একজন বললেন, দরবারে পৌঁছে কি বলব (অর্থাৎ বাদশাহ খ্রিস্টান আর আমরা মুসলমান, অনেক কিছু বিশ্বাসেই আমরা তাদের বিপরীত)। সাহাবাগণ বললেন, আমাদের নবী (সা) যা আমাদের শিখিয়েছেন ও বলেছেন আমরা দরবারে গিয়ে তাই বলব। যত কিছুই হোক, আমরা তা থেকে সামান্যও পিছপা হব না। দরবারে পৌঁছে তাঁরা কেবল বাদশাহকে সালাম জানিয়েই ক্ষান্ত হলেন, কেউই তাকে সিজদা করলেন না। দরবারী অভিজাত শ্রেণীর নিকট মুসলমানদের এ কাজ খুবই দৃষ্টিকটূ মনে হল। তখন মোসাহেব এবং অমাত্যবর্গ প্রশ্ন করে বসলেন, আপনারা বাদশাহ নামদারকে কেন সিজদা করলেন না ? অপর এক বর্ণনায় আছে, বাদশাহ স্বয়ং এ প্রশ্ন করলেন যে, আপনারা সিজদা করলেন না কেন? হযরত জাফর (রা) বললেন, আমরা এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করি না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনিই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাকে ছাড়া আর কাউকে সিজদা না করতে। মুসলমানগণ বললেন, আমরা রাসূল (সা) কেও এভাবেই সালাম দিয়ে থাকি এবং নিজেরা একে অপরকে এ পদ্ধতিতেই সালাম করি। আর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, জান্নাতবাসীরাও এভাবে পরস্পর পরস্পরকে সালাম করবে। আর সিজদা, তোমাদেরকে সিজদা করে আল্লাহর সমকক্ষ বানানো থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছেই আশ্রয় চাই। নাজ্জাশী সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, খ্রিস্টধর্ম ও মূর্তিপূজা ছাড়া এটা আবার কোন্ ধর্ম আপনারা গ্রহণ করেছেন ? সাহাবীদের দল থেকে হযরত জাফর (রা) বাদশাহর প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন।

নাজ্জাশীর দরবারে হযরত জাফর (রা)-এর হৃদয়গ্রাহী ভাষণ এবং নাজ্জাশীর উপর এর প্রভাব

হে বাদশাহ নামদার ! আমরা সবাই মূর্খ ও অবুঝ ছিলাম, মূর্তির পূজা করতাম, মৃত জন্তু খেতাম, নানা ধরনের নির্লজ্জ কাজকর্মে লিপ্ত ছিলাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীর সাথে কদাচরণ করতাম। আমাদের মধ্যে যে শক্তিশালী হতো,

সে চাইত দুর্বলদের খেয়ে ফেলতে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন, আমাদের মধ্য থেকে তাঁর এক পয়গাম্বর প্রেরণ করলেন, যাঁর বংশ মর্যাদা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারী, পবিত্রতা ও নিস্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আমরা ব্যাপক পরিচিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে এই বলে আহ্বান করলেন যে, আমরা যেন তাঁকে এক বলে স্বীকার করি, এক বলে বিশ্বাস করি এবং বুঝি, শুধু তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী করি। আর আমরা, আমাদের বাপ-দাদারা যে মূর্তি ও পাথরের পূজা করতো, তা সব কিছু একবাক্যে ছেড়ে দিই; সত্যবাদিতা, আমানতদারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করি। তিনি রক্তপাত ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বাঁচার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সব ধরনের নির্লজ্জতা থেকে, বাতিল এবং অন্যায় বলা থেকে, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা থেকে এবং কোন নিস্পাপ ব্যক্তির প্রতি অপবাদ আরোপ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, যেন শুধু আল্লাহরই ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করি, সালাত আদায় করি, যাকাত দান করি এবং রোযা রাখি। মোটকথা এই যে, আমরা যেন জীবন ও সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ না করি।

এছাড়া হযরত জাফর (রা) ইসলামের আরো কিছু শিক্ষার উল্লেখ করে বললেন, আমরা তাঁকে সত্য মেনেছি ও তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তিনি আল্লাহর নিকট থেকে যা কিছু এনেছেন, তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছি। কাজেই আমরা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করি, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না, হালাল কাজ করি এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকি। এ কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার করে, নানা প্রকারে কষ্ট দেয়, যাতে আমরা এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় পূর্ববর্তী অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতায় নিমগ্ন হই। অবশেষে আমরা যখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম এবং নিজেদের দীনের উপর চলা, এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করা আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ল, তখন আমরা নিজেদের জন্মভূমি ত্যাগ করলাম। আপনি আমাদের প্রতি অত্যাচার করবেন না এ প্রত্যাশায় আমরা আপনার প্রতিবেশী হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।

নাজ্জাশী বললেন, তোমাদের পয়গাম্বর আল্লাহর নিকট থেকে যে বাণী এনেছেন, তার কিছু কি তোমার মনে আছে ? হযরত জাফর বললেন, হ্যাঁ। নাজ্জাশী বললেন, আচ্ছা, তা হলে এর থেকে কিছু পড়ে আমাকে শোনাও। হযরত জাফর সূরা মরিয়মের প্রথমাংস পড়ে শোনালেন। বাদশাহ এবং দরবারের অন্যান্যের চোখে পানি এসে গেল, কাঁদতে কাঁদতে বাদশাহর দাঁড়ি ভিজে গেল (বুঝা গেল যে, বাদশাহ দাঁড়ি রেখেছিলেন আর এটাই সকল নবীরই তরীকা, আল্লাহ মাফ করুন, কোন পয়গাম্বর কখনই দাঁড়ি কামাতেন না, দাঁড়ি রাখা সমস্ত নবী ও সৎকর্মশীলদের বিশেষ নিয়ম)।

হযরত জাফর (রা) তিলাওয়াত[১] শেষ করলেন, তখন নাজ্জাশী বললেন, এ বাণী আর হযরত ঈসা (আ) যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন, দুটোই একই প্রদীপের বিচ্ছুরিত রশ্মি। আর কুরায়শ প্রতিনিধিদের পরিষ্কার বলে দিলেন যে, এ লোকদেরকে আমি কখনই তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না, এর কোনই সম্ভাবনা নেই।

যখন আমর ইবন আস এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াহ এভাবে বাদশাহর দরবার থেকে হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে, তখন আমর ইবন আস বলল, আগামীকাল আমি বাদশাহর সামনে এমন কথা বলব যাতে তিনি ঐ লোকদেরকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াহ বলল, এমনটি কখনো করো না, ওদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, ওরা আমাদের প্রিয় এবং আত্মীয়-স্বজন; যদিও ধর্মের দিক থেকে ওরা আমাদের বিরোধী। কিন্তু আমর ইবন আস এ কথা শুনলো না। পরের দিন এলো, আমর ইবন আস নাজ্জাশীকে বলল যে, হে বাদশাহ নামদার ! এ লোকগুলো হযরত ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গে অনেক খারাপ কথা বলে। নাজ্জাশী সাহাবা (রা) দের ডেকে পাঠালেন। এ সময় সাহাবীদের খুবই দুশ্চিন্তা দেখা দিল। কেউ একজন বললেন, হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গে বাদশাহকে কি বলবে ? এতে সবাই একমত হয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরা তাই বলব যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) বলেছেন। যাই হোক না কেন, আমরা এর বিপরীত এতটুকুও বলব না।

তাঁরা দরবারে পৌঁছলে নাজ্জাশী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গে কি বল ? হযরত জাফর (রা) বললেন, আমরা তাঁর ব্যাপারে সে কথাই বলি, যা আমাদের নবী (সা) বলেন। সেটা হলো, ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল ছিলেন, আল্লাহর খাস রূহ এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বাণী ছিলেন। নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি তৃণখণ্ড উঠিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, মুসলমানরা যা বলল, ঈসা (আ) তা থেকে এ তৃণ পরিমাণও বেশি কিছু নন। এতে দরবারীরা অনেকে নাখোশ হলো, কিন্তু নাজ্জাশী এতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করলেন না, পরিষ্কার বলে দিলেন, তোমরা যতই নাখোশ হও না কেন প্রকৃত ঘটনা[২] তো এটাই। আর

---

১. দালাইলে আবূ নুয়ায়ম, ১খ. পৃ. ৮১-তে আছে, হযরত জাফর (রা) সূরা মরিয়ম তিলাওয়াত করেন, নাজ্জাশী তা শোনামাত্র বুঝে ফেললেন যে, এটা সত্য এবং হযরত জাফর (রা)-কে বললেন, ওহে জাফর, এ পবিত্র কালাম থেকে কিছু আরো শোনাও। হযরত জাফর অপর একটি সূরা তিলাওয়াত করে শোনালেন। শুনেই নাজ্জাশী বললেন, অবশ্যই সত্য, তোমরা সত্যই বলেছ, আর তোমাদের নবী (সা) ও সত্য বলেছেন। আল্লাহর শপথ, তোমরা সবাই সঠিক পথেই আছো, আল্লাহর নামে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকো।

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বর্ণনায় আছে, এরপর নাজ্জাশী বললেন, মারহাবা তোমাদেরকে। আর তাঁকেও, যাঁর নিকট থেকে তোমরা এসেছ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি সত্যই আল্লাহর রাসূল। অবশ্যই তিনি সেই পয়গাম্বর, যাঁর সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন। যদি বাদশাহীর দায়িত্ব না থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাঁর খেদমতে উপস্থিত

মুসলমানদের বললেন, তোমরা নিরাপদে অবস্থান কর, এক পাহাড় স্বর্ণের বিনিময়েও আমি তোমাদেরকে নির্যাতন করা পসন্দ করি না। আর নির্দেশ দিলেন, কুরায়শদের সমুদয় উপহার-উপঢৌকন ফেরত দেয়া হোক, ওদের নযরানার আমার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমার এই সালতানাত ও বাদশাহী আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঘুষের বিনিময় ছাড়াই দিয়েছেন। কাজেই তোমাদের থেকে ঘুষ নিয়ে এ লোকগুলোকে কখনই তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না।

দরবার সমাপ্ত হলো, মুসলমানেরা পরম সন্তুষ্টচিত্তে, আর কুরায়শ প্রতিনিধি অপমান-অপদস্থ হয়ে দরবার ত্যাগ করল। (মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বল, ১খ., পৃ. ২০১, জাফর ইবন আবূ তালিব-এর হিজরতের হাদীস; হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ রিওয়ায়াত করেছেন যার বর্ণনাকারীগণ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ব্যাতিত সবাই সহীহ; সরাসরি শ্রুত হিসেবে বর্ণনা করেছেন 'মাজমাউয-যাওয়ায়েদ', ৬খ. পৃ. ২৭; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১১৫)।

এতদসমুদয় ঘটনা মুসনাদে আহমদ ও সীরাতে ইবন হিশামে বর্ণিত আছে। শুধু দরবারে সিজদা না করার ঘটনা উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১১৮-এ সংক্ষিপ্ত আকারে এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে, ১খ. পৃ. ৮১-তে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। আর মাজমাউয যাওয়ায়েদে 'আবিসিনিয়ায় হিজরত' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বেশ কিছু বর্ণনা সরাসরি বিদ্যমান আছে। ৬খ. পৃ. ২৩ থেকে পৃ. ৩৩-এ দেখে নিন। ইমাম যুহরী বলেন, আমি হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত এ বিস্তারিত হাদীস হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। উরওয়া (রা) আমাকে বললেন, নাজ্জাশীর বক্তব্যটি তোমার জানা আছে কি, 'আল্লাহ আমাকে বিনাঘুষে আমার রাজত্ব ফিরিয়ে দিয়েছেন' এর অর্থ কি ? আমি বললাম, না।

উরওয়া (রা) বললেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আমাকে বলেছেন যে, নাজ্জাশীর পিতা আবিসিনিয়ার বাদশাহ ছিলেন। নাজ্জাশী ছাড়া তার আর কোন পুত্র ছিল না। বাদশাহর ভাই অর্থাৎ নাজ্জাশীর চাচার বারজন পুত্র ছিল। একবার আবিসিনিয়াবাসীর এ ধারণার উদ্রেক হলো যে, নাজ্জাশী তো তার পিতার একমাত্র পুত্র, আর বাদশাহর ভাইয়ের অধিক সন্তান। এ জন্যে বাদশাহকে হত্যা করে তার ভাই অর্থাৎ নাজ্জাশীর চাচাকে বাদশাহ বানানো উচিত, তা হলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ বংশেই বাদশাহর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কাজেই তারা বাদশাহকে হত্যা করে বাদশাহর ভাইকে বাদশাহ বানালো আর নাজ্জাশী তার চাচার তত্ত্বাবধানে এসে গেলেন। নাজ্জাশী ছিলেন খুবই চালাক এবং সমঝদার ব্যক্তি। এ জন্যে চাচার দৃষ্টিতে

হতাম এবং তাঁর জুতায় চুমো খেতাম। এরপর মুসলমানদের বলে দিলেন, যতদিন ইচ্ছা আমার রাজত্বে বাস কর এবং তিনি আমাদের খাদ্য এবং পোশাক প্রদানেরও নির্দেশ দিলেন। তিরমিযী বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন; হাদীসটির রাবীগণ বিশুদ্ধ হাদীসের রাবী। মাজমাউয-যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ.৩১ 'আবিসিনিয়ার মুহাজিরীন' পরিচ্ছেদ।

নাজ্জাশীর যে মর্যাদা ছিল, অন্য কারো প্রতি তা ছিল না। সুযোগ এ পর্যন্ত পৌঁছল যে, বাদশাহর প্রতিটি কাজেই নাজ্জাশীর অন্তর্ভুক্তি দেখা যেতে শুরু হলো। আবিসিনিয়াবাসী তার এ মেধাদৃষ্টে সন্দেহ পোষণ করছিল যে, না জানি সে তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়! এ জন্যে তারা বাদশাহর কাছে আবেদন জানালো যে, তাকে হত্যা করা হোক। বাদশাহ্ বললেন, কাল তোমরা তার পিতাকে হত্যা করেছ, আর আজ তার পুত্রকে হত্যা করতে বলছ, এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বড়জোর এটা হতে পারে যে, তাকে আমি এখান থেকে পৃথক করে দিই।

লোকেরা এটা অনুমোদন করল এবং নাজ্জাশীকে বাদশাহর নিকট থেকে নিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে ছয়শত দিরহামে বিক্রি করে ফেলল। ব্যবসায়ী নাজ্জাশীকে নিয়ে রওয়ানা হলো। সে সন্ধ্যায়ই এক দুর্ঘটনা ঘটল যে, বাদশাহর উপর বজ্রপাত হলো। বাদশাহ তো বজ্রপাতের সাথে সাথেই মৃত্যুবরণ করলেন। তখন লোকজনের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল, এবার কাকে বাদশাহ বানানো যায়। বাদশাহর বারটি পুত্রের মধ্যে কেউই মসনদে আরোহণের উপযুক্ত বলে মনে হলো না। প্রথম থেকে শেষেরটি পর্যন্ত সবাই ছিল বোকা ও নির্বোধ। এতে লোকজন এ সিদ্ধান্ত নিল যে, যদি দেশের কল্যাণ চাও, তবে নাজ্জাশীকে খুঁজে এনে সিংহাসনে বসাও। জনগণ নাজ্জাশীর জন্য ব্যবসায়ীর খোঁজে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঐ ব্যবসায়ীর নিকট থেকে নাজ্জাশীকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাল। সিংহাসনারোহণের পর ঐ ব্যবসায়ী এসে প্রদত্ত মূল্য ফেরত চাইল। নাজ্জাশী তাকে ছয়শত দিরহাম ফেরত দিয়ে দিলেন।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কুরায়শ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহ আমাকে ঘুষ ছাড়াই আমার এ সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। সম্রাট নাজ্জাশীর এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।[১] নাজ্জাশীর এ ঘোষণার পর মুহাজিরগণ নিশ্চিন্তে আবিসিনিয়ায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। যখন নবী করীম (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন, তখন অধিকাংশ লোক সংবাদ পাওয়া মাত্র আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় ফিরে এলেন, যাদের মধ্যে চব্বিশ ব্যক্তি বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। অবশিষ্ট দুর্বলেরা হযরত জা'ফর (রা)-এর সঙ্গে সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়কালে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হলেন। [উয়ূনুল আসার, ফাতহুল বারী, নবী (সা) ও সাহাবাগণের মদীনা হিজরত অধ্যায়]।

কুরায়শ প্রতিনিধির কাছে হযরত জা'ফর (রা)-এর তিনটি প্রশ্ন

হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত জাফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আমি ওদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি ওদের থেকে এর উত্তর চেয়ে নিন।

১. আমরা কি কারো গোলাম যে নিজেদের প্রভুর নিকট থেকে পলায়ন করে এসেছি? যদি এমনটি হয়, তবে অবশ্যই আমরা ফিরিয়ে দেয়ার উপযুক্ত।

---

১. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৭৫।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এরা কি কারো গোলাম? আমর ইবন আস বললেন, بل احرار كرام "গোলাম নন, বরং তাঁরা মুক্ত এবং সম্মানিত।"

২. হযরত জা'ফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আপনি ওদের এটাও জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কি সেখানে কাউকে খুন করে এসেছি? যদি আমাদের কেউ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে এসে থাকে, তা হলে আপনি নির্দ্বিধায় নিহতের অভিভাবকের হাতে আমাদেরকে সোপর্দ করুন।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে উদ্দেশ্য করে বললেন, هل احرقوا دما بغير حقه "এরা কি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে এসেছে?" আমর ইবন আস বললেন, لا قطرة من دم "এক ফোঁটা রক্তও নয়।"

৩. হযরত জা'ফর (রা) নাজ্জাশীকে বললেন, আপনি ওদের এটাও জিজ্ঞেস করুন যে, আমরা কি কারো ধন-সম্পদ নিয়ে পালিয়ে এসেছি? আমরা যদি কারো মাল নিয়ে এসে থাকি, তবে তা পরিশোধ করে দেয়ার জন্য অবশ্যই আমি প্রস্তুত।

নাজ্জাশী আমর ইবন আসকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা যদি কারো মাল-সম্পদ নিয়ে এসে থাকে, তবে আমি এদের অভিভাবক ও যিম্মাদার হিসেবে তা পরিশোধের দায়িত্ব নিব।

আমর ইবন আস বললেন, ولا قيراط "এরা তো কারো এক কীরাত তথা এক পয়সাও নিয়ে আসেনি।"

এবার সম্রাট নাজ্জাশী কুরায়শ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তা হলে বল দেখি তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি?

আমর ইবন আস বললেন, আমরা এবং এরা একই দীনে ছিলাম। আমরা আমাদের ধর্মের উপরই আছি, আর এরা একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে।

নাজ্জাশী সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে ধর্মকে তোমরা ছেড়ে দিয়েছ আর যে ধর্ম তোমরা গ্রহণ করেছ এটা কেমন ধর্ম?

হযরত জা'ফর (রা) বললেন:

اما الذى كنا عليه فدين الشيطان وامر الشيطان نكفر بالله ونعبد الحجارة واما الذى نحن عليه فدين الله عز وجل نخبرك ان الله بعث الينا رسولا كما بعث الى الذين من قبلنا فاتانا بالصدق والبر ونهانا عن عبادة الاوثان فصدقناه وامنا به واتبعناه فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وارادوا قتل النبى الصادق وردنا فى عبادة الاوثان ففررنا اليك بديننا ودمائنا ولو اقرنا قومنا لا ستقررنا فذلك خبرنا

"যে ধর্মে আমরা পূর্বে ছিলাম, তা ছিল শয়তানের ধর্ম আর শয়তানের নির্দেশ। ও ধর্মটা এমন ছিল যে, আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করতাম, পাথরের উপাসনা করতাম আর এখন যে ধর্মের উপর অবস্থান করছি এটা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ধর্ম।

আল্লাহ আমাদের প্রতি একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যেমন পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর নবী-রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। আর সেই রাসূল সত্য এবং পুণ্য নিয়ে এসেছেন এবং আমাদেরকে মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেছেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনেছি, তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি। এ কারণে আমাদের সম্প্রদায় আমাদের শত্রু হয়ে গেল এবং আমাদের নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল, তাদের ইচ্ছা যে, আমাদেরকে তারা পুনরায় মূর্তি পূজায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এজন্যে আমরা নিজেদের ঈমান ও জীবন নিয়ে আপনার দেশে পালিয়ে এসেছি। আমাদের সম্প্রদায় আমাদেরকে দেশে থাকতে দিলে, আমরা দেশ থেকে বের হতাম না। এটাই আমাদের বক্তব্য।"[১]

হযরত জা'ফর (রা) এবং তাঁর সঙ্গীরা যখন আবিসিনিয়া থেকে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হলেন, নাজ্জাশী তাদের সবারই পথ খরচা ও অতিরিক্ত কিছু উপহার-উপঢৌকনও দিলেন এবং একজন দাসও সঙ্গে দিলেন। আর বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে যা কিছু করেছি, হযরত নবী (সা) কে সব কিছু বলবে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল।' তাঁর প্রতি আমার আবেদন, তিনি যেন আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন।"

হযরত জা'ফর (রা) বলেন, আমরা আবিসিনিয়া থেকে রওয়ানা হয়ে নবী (সা)-এর খিদমতে পৌঁছলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন আমি জানি না যে, খায়বর বিজয়ে আমি বেশি খুশি হয়েছি, না জা'ফরের প্রত্যাবর্তনে। এরপর তিনি বসে পড়লে নাজ্জাশীর দূত দাঁড়িয়ে আরয করল, (হে আল্লাহর রাসূল), এই যে জা'ফর আপনার সামনে উপস্থিত, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন আমাদের বাদশাহ তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন।

হযরত জা'ফর বললেন, "নিঃসন্দেহে নাজ্জাশী আমাদের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করেছেন। এমনকি ফিরে আসার সময় আমাদেরকে বাহন দিয়েছেন এবং পথ খরচাও দিয়েছেন, আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আর আমাদের সামনে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। তিনি আপনার কাছে তার জন্যে মাগফিরাতের দু'আ করার আবেদন জানিয়েছেন।" রাসূল (সা) সঙ্গে সঙ্গে উঠেই উযূ করলেন এবং তিনবার এ দু'আ করলেন : اللهم اغفر للنجاشى

"আয় আল্লাহ ! তুমি নাজ্জাশীকে মাফ করে দাও।" আর সব মুসলমান আমিন বললেন।

হযরত জা'ফর (রা) বলেন, আমি ঐ দূতকে বললাম, যা কিছু তুমি নবী (সা)-এর এখানে দেখলে, ফিরে গিয়ে বাদশাহকে সব বলবে। তাবারানী হাদীসটি

---

১. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৮০।

আসাদ ইবন আমর....মুজালিদ সূত্রে বর্ণনা করেন, কিন্তু তারা উভয়ই যঈফ; নির্ভরযোগ্য বর্ণনা। (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬খ. পৃ. ৩০, আবিসিনিয়ায় হিজরত অধ্যায়)।

হযরত উমর[১] (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ, নবূয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষ

হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের মূল এবং প্রকৃত কারণ ছিল রাসূল (সা)-এর দু'আ।

هيچ عاشق خود نباشد وصل جو   كه نه معشوقش بود جويائے او

ميل معشوقان نهانست وستير   ميل عاشق باد وصد طبل ونفير

"কোন প্রেমিকই নিজে নিজে মিলন প্রত্যাশী হবে না, যদি প্রেমাস্পদ তার খোঁজ-খবর না করে, প্রেমাস্পদরা চায় যে গোপন থাকুক, লড়াই করুক, আর প্রেমিক চায় মত্ততা, ঢোল পেটানো আর হৈ হুল্লোড়।"

প্রথমে রাসূল (সা) এ দু'আ করেছিলেন যে, আয় আল্লাহ ! আবূ জাহল এবং উমর ইবন খাত্তাব, এ দু'জনের মধ্যে যে তোমার কাছে বেশি প্রিয়, তার দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী ও সম্মানিত কর (আহমদ ও তিরমিযী; তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ)। ইবন আসাকির বলেন, এরপর ওহীর মাধ্যমে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আবূ জাহল ইসলাম গ্রহণ করবে না, তখন তিনি হযরত উমরের জন্য নির্দিষ্টভাবে দু'আ করলেন ঃ

اللهم ايد الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة

"আয় আল্লাহ ! বিশেষভাবে উমরের মাধ্যমে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি কর।"

এ হাদীস সুনানু ইবন মাজাহ ও মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। হাফিয যাহবীও হাকিমকে সমর্থন করেছেন।

মোটকথা, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের মূল ও প্রকৃত কারণ তো ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আরই ফলশ্রুতি। বাকী প্রকাশ্য কারণ, হযরত উমর (রা) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা হলো ঃ

হযরত উমর (রা) বলেন, আমি শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কঠোর বিরোধী এবং দীন ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ ও এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম।

بد عمررا نام ايں جابت پرست   ليك مومن بود نامش در اَلَسْتُ

আবূ জাহল ঘোষণা করল, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করবে, তার জন্য আমি একশত উট প্রদানের যিম্মাদার ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি সরাসরি আবূ জাহলকে

১. হযরত উমর (রা) আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতের পরে এবং দ্বিতীয় হিজরতের পূর্বে নবূয়াতের সপ্তম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর কেউ কেউ লিখেছেন যে, তিনি নুবূয়াতের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করেন। [যারকানী, ১খ. পৃ. ২৭২, ফারুক (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

প্রশ্ন করলাম, তোমার পক্ষ থেকে এ প্রতিশ্রুতি ও যিম্মাদারী কি সঠিক? আবূ জাহল বলল, হ্যাঁ। উমর বলেন, আমি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে একটি বাছুর নজরে পড়ল, যেটিকে লোকেরা যবেহ করার ইচ্ছা চাচ্ছিল। আমিও দেখার জন্য দাঁড়ালাম। কিন্তু কি দেখলাম ! মনে হল বাছুরের পেটের ভিতর থেকে কোন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলছে :

يا ال ذريع امر نجيع رجل – يصيح بلسان فصيح يدعو الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

"হে অনুসন্ধানকারীরা, একটি সফল কাজ হলো, এক ব্যক্তি বিশুদ্ধ ভাষায় মানুষকে আহ্বান করে এ সাক্ষ্য দিতে বলছেন, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রাসূল।"

হযরত উমর (রা) বলেন, এ আওয়াজ শোনামাত্র মনে হলো যেন আমাকেই এ আহ্বান করা হচ্ছে, আমিই যেন ঐ ঘোষণাকারীর উদ্দেশ্য [আবূ নুয়াইম, হযরত তালহা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা) হযরত (রা) উমর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন]।[১] আর বাছুর থেকে আওয়াজ শোনার ঘটনা সহীহ বুখারীতেও বর্ণিত হয়েছে [সহীহ বুখারী, উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

কিন্তু উমর তবুও নিজ উদ্দেশ্য থেকে বিরত হলেন না এবং সামনে অগ্রসর হতে থাকলেন। কয়েক কদম যেতেই নঈম ইবন আবদুল্লাহ নুহহাম-এর সাথে সাক্ষাত হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে উমর, ভরদুপুরে কি উদ্দেশে কোথায় রওয়ানা দিয়েছো ? উমর বললেন, মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করার উদ্দেশে। নঈম বললেন, মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করে আপনি বনী হাশিম ও বনী যোহরা থেকে কি করে নিজকে রক্ষা করবেন ? উমর বললেন, আমার ধারণায় তুমিও সাবী (ধর্ম ত্যাগী) হয়েছ এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ। নঈম বললেন, আমাকে কি বলছেন, আপনি জানেন না যে, আপনার বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবন যায়দ উভয়ই সাবী হয়েছেন এবং আপনাদের দীন ত্যাগ করে ইসলাম কবূল করেছেন ?

এ কথা শুনেই উমর রাগে জ্বলে উঠলেন এবং বোনের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হযরত খাব্বাব (রা), যিনি তার বোন ও ভগ্নিপতিকে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, উমরের আওয়াজ পেয়েই লুকিয়ে পড়লেন।

উমর ঘরে ঢুকলেন এবং বোন ও ভগ্নিপতিকে বললেন, সম্ভবত তোমরা উভয়ে সাবী হয়ে গিয়েছ ? ভগ্নিপতি বললেন, ওহে উমর, যদি তোমাদের দীন সত্য না হয়, বরং এটা ছাড়া অপর কোন দীন সত্য হয়, তা হলে বল, কি করা উচিত ? ভগ্নিপতির এ জবাব দেয়ার অপেক্ষামাত্র; উমর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৮।

বোন তাঁর স্বামীকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে উমর তাঁকেও এমনভাবে প্রহার করলেন যে, তার চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। এ সময় বোন বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, তুই যা ইচ্ছা ক্ষতি করতে পারিস কর, আমরা অবশ্যই মুসলমান হয়েছি। রে আল্লাহর দুশমন, তুই তো কেবল এ জন্যে মারছিস যে আমরা আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করেছি। ভালভাবে জেনে নে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, 'যদিও এতে তোর নাসিকা রক্তাপ্লুত হয়' (অপমান বোধ করিস)।

উমর বোনের ঈমানদীপ্ত বক্তব্যে ভাবান্তরিত হলেন। কিছুটা লজ্জানুভূতির সঙ্গে বললেন আচ্ছা, তোমরা এতক্ষণ যে কিতাবটি পড়ছিলে তা আমাকে কিছু শোনাও তো। এটা শুনতেই হযরত খাব্বাব (রা), যিনি ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিলেন, দ্রুত বেরিয়ে এলেন। বোন উমরকে বললেন : انك رجس وانه لا يمسه الا المطهرون فقه فتوضا "তুমি তো নাপাক, আর কুরআন পাককে কেবল পবিত্র ব্যক্তিরাই ছুঁতে পারে। যাও, উযূ করে এসো।"

উমর উঠে গিয়ে উযূ-গোসল[১] করলেন এবং পবিত্র সহীফা হাতে নিলেন যাতে সূরা তাহা লিখিত ছিল, তা পাঠ করতে শুরু করলেন। যখনই এ আয়াতে পৌঁছলেন যে,

اِنَّنِىْ اَنَا اللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমিই সত্যিকারের মাবূদ, আমি ছাড়া আর কোন প্রকৃত মাবূদ নেই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে নামায কায়েম কর।" তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উমর বলে উঠলেন, ما احسن هذا الكلام واكرمه "কতই না উত্তম ও পবিত্র বাক্য এটি!"

হযরত খাব্বাব (রা) উমরের এ কথা শুনে বললেন, হে উমর, তোমার জন্য সুসংবাদ, আমি আশাকরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'আ তোমার ব্যাপারেই কবূল হয়েছে। উমর বললেন, খাব্বাব, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

হযরত খাব্বাব উমরকে সাথে নিয়ে আরকামের গৃহ অভিমুখে চললেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবা কিরাম একত্রিত হতেন। দরজা বন্ধ ছিল। কাজেই কড়া নাড়লেন এবং ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। উমর ভিতরে আসার অনুমতি চাইছেন, এ ভয়ে কেউ দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। হযরত হামযা (রা) বললেন, দরজা খুলে দাও এবং আসতে দাও, যদি আল্লাহ উমরের সাথে উত্তম ও কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করবেন, সে ইসলাম গ্রহণ করবে আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে। তার ব্যতিক্রম কিছু করলে তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় তার দুশমনি থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকবে। আল্লাহর প্রশংসা, উমরকে হত্যা করা আমাদের জন্য মোটেও অসম্ভব নয়।

---

১. এ ব্যাপরে বর্ণনাকারীদের মধ্যে মতভেদ আছে, সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত হামযা বললেন যে, উমর যদি সদুদ্দেশে এসে থাকে তবে আমরাও তার সাথে উত্তম ব্যবহার করব, আর যদি ক্ষতি করার উদ্দেশে আসে, তবে তার তরবারি দিয়েই তাকে হত্যা করব। রাসূলুল্লাহ (সা)ও দরজা খোলার অনুমতি দিলেন। দরজা খোলা হল, আর দু'ব্যক্তি আমার দু'বাহু ধরলেন এবং তাঁর সামনে এনে আমাকে দাঁড় করালেন। রাসূল (সা) ঐ দু'ব্যক্তিকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। অতঃপর তিনি আমার জামা ধরে নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললেন, ওহে খাত্তাবের পুত্র ! ইসলাম গ্রহণ কর। তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন : "হে আল্লাহ ! তাকে হিদায়াত দাও।"

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত (সা) দু'আয় বলেছেন :

اللهم هذا عمر بن الخطاب اللهم اعز الدين بعمر بن الخطاب

"হে আল্লাহ ! উমর ইবন খাত্তাব উপস্থিত, তাকে দিয়ে তুমি দীনকে শক্তিশালী ও সম্মানিত কর।"

আর উমরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে উমর, তুমি কি ততক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি কোন অপমানজনক আযাব নাযিল না করবেন ?

উমর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এ উদ্দেশেই এসেছি যে, আমি ঈমান আনব আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি আর যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, সেসবের প্রতি। اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দের আতিশয্যে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিলেন, যাতে গৃহের সবাই জেনে গেলেন যে, উমর মুসলমান হলেন। এ সমুদয় বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে ইবন হিশাম ও উয়ূনুল আসার-এ বর্ণিত আছে।

আল্লামা যারকানী বলেন, হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের এ বিস্তারিত বিবরণ 'মুসনাদে বাযযার', 'মু'জামে তাবারানী' ও 'দারা কুতনী'তে হযরত আনাস (রা) থেকে আর দালাইলে বায়হাকীতে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এবং দালাইলে আবূ নুয়াইমে হযরত তালহা ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যখন হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন জিবরাঈল আমীন (আ) অবতরণ করে বলেন যে, হে মুহাম্মদ (সা), উমরের ইসলাম গ্রহণে সমস্ত আসমানবাসী আনন্দিত হয়েছে (এ বর্ণনা ইবন মাজাহ ও হাকিমের, হাকিম একে সহীহ বলেছেন। আর যাহবী বলেছেন, এতে একজন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবন খিরাশ দুর্বল)। (দারা কুতনী)।[২]

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৭৬।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১২৬; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১৯৩।

হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, আর তখন থেকেই দীনের সম্মান ও ইসলামের অভ্যুদয় ও বিজয় শুরু হয়ে গেল। প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে মসজিদুল হারামে নামায আদায় শুরু হলো। প্রকাশ্যভাবে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু হলো। এ দিন থেকেই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট ও প্রকাশিত হলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর নাম রাখলেন ফারুক।[1]

چون عمر شیدانے ال معشوق شد   حق و باطل را چو دل فاروق شد

زان نشد فاروق راز هرصے گزند   که بدان تریاق فاروقیش قند

"উমর যখন সেই প্রেমাস্পদের প্রেমে মত্ত হলেন, তখন তিনি সত্য-মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হলেন। এর ফলে ফারুককে কোন কিছু ক্ষতি করতে পারল না, বরং তিনি বিষকে মিষ্টিতে পরিণত করলেন।"

হযরত উমর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্রেক হলো যে, যদি আমি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর এমন ব্যক্তিকে জানাই, যে কথা ছড়াতে পারদর্শী। তা হলে সবার কাছে আমার ইসলাম গ্রহণের খবর পৌঁছে যাবে। কাজেই আমি জামীল ইবন মা'মার, যে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল, তার নিকটে গেলাম এবং বললাম হে জামীল, তুমি অবশ্যই জেনে গেছ যে, আমি মুসলমান হয়েছি এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মে প্রবেশ করেছি। জামীল এ কথা শোনামাত্র ঐ অবস্থায়ই নিজের চাদর টেনে নিয়ে মসজিদুল হারামের দিকে দৌড় দিল। যেখানে কুরায়শ সর্দারেরা জমায়েত হয়েছিল, সেখানে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে বলল, হে লোক সকল! উমর সাবী হয়ে গেছে। উমর (রা) বলেন, আমিও পিছে পিছে গেলাম এবং বললাম, এ ভুল বলছে, আমি সাবী হইনি; আমি তো ইসলাম গ্রহণ করেছি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, আর মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। কথাটা কেবল শোনার অপেক্ষা, লোকজন উমরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে মারতে শুরু করল। ঘটনাক্রমে আস ইবন ওয়ায়েল আস-সাহমী সেখানে এসে গেলেন। আস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটা কি ? লোকেরা বলল, উমর সাবী হয়ে গেছে। আস বললেন, তাতে হয়েছেটা কি, এক ব্যক্তি নিজের জন্য একটা কর্ম (দীন) সাব্যস্ত করে নিয়েছে, অথচ তোমরা কেন তাতে অন্তরায় হচ্ছো ? তোমরা কি মনে করেছ যে, বনী আদী তাদের লোকের (অর্থাৎ হযরত উমর) ব্যাপারটা এমনিতে ছেড়ে দেবে ? যাও, আমি উমরকে আশ্রয় দিলাম। আস উমরকে আশ্রয় দেয়ামাত্র জমায়েত হওয়া সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। [ইবন হিশাম, পৃ. ১২১, ইবন কাসীর বলেন, হাদীসটির সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, যেমনটি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় ৩খ. পৃ. ৮২; আর আস ইবন ওয়ায়েলের আশ্রয় দানের ঘটনা সংক্ষেপে সহীহ বুখারীতেও

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ১৯৩।

আছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৩৫, হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়]।

বনী হাশিমের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ, নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র লিখন ও মুহাররম মাসের অমর্যাদা, নবুয়াতের সপ্তম বর্ষ

কুরায়শের প্রতিনিধি যখন আবিসিনিয়া থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো, আর জানতে পেল যে, নাজ্জাশী হযরত জা'ফর এবং তাঁর সাথীদের যথেষ্ট সম্মান করেছেন, অপরদিকে হযরত হামযা ও হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাতে করে কুরায়শদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। অধিকন্তু, মুসলমানের সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। কোন অস্ত্রই সত্য দীনকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কার্যকর হচ্ছে না, তখন কুরায়শদের সমস্ত গোত্র ঐকমত্যের ভিত্তিতে একটি চুক্তিপত্র তৈরি করলো যে, মুহাম্মদ (সা), বনী হাশিম ও তাদের সব মিত্রের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক যে না কেউ বনী হাশিমের সাথে বিয়ে-শাদী করবে না, আর না তাদের সাথে কেউ মেলামেশা করবে—যতক্ষণ না বনী হাশিম মুহাম্মদকে হত্যার জন্য আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে।

এ মর্মে একটি ঘোষণাপত্র লিখিয়ে কাবাঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দেয়া হলো। মানসূর ইবন ইকরামা, যে এ ধরনের নির্যাতন-নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্রটি লিখেছিল, তার পর থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল তার হাতের আঙ্গুল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অবশ হয়ে গেল; ফলে চিরদিনের মতো তার হাত কোনকিছু লিখার অযোগ্য হয়ে গেল। আবূ তালিব বাধ্য হয়ে খান্দানের সবাইমিলে 'শে'বে আবূ তালিবে' আশ্রয় নিলেন। বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব বংশের মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলেই এই সামাজিক বয়কটের শিকার হলেন; মুসলমানগণ দীনের খাতিরে আর কাফিরেরা বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে। বনী হাশিমের মধ্য থেকে কেবল আবূ লাহাব কুরায়শদের শরীক হয়ে তাদের সঙ্গে রয়ে গেল।

একাধিক্রমে তিন বছর যাবত তাদের অবরুদ্ধ[১] জীবন কতই না দুঃখ-কষ্টের সাথে অতিবাহিত করতে হলো। এমনকি ক্ষুধার কারণে শিশুদের কান্নাকাটির আওয়াজ বাইরে থেকেও শোনা যেত। পাষাণ হৃদয়ের কাফিররা তা শুনে আনন্দ উপভোগ করতো। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা দয়ার্দ্রচিত্ত ছিল, তাদের কাছে এটা অসহনীয় বোধ হলো এবং পরিষ্কার বলে দিল, মানসূর ইবন ইকরামার উপর কি বিপদ আপতিত হয়েছে, তা কি তোমাদের চোখে পড়ে না?[২]

---

১. বলা হয়ে থাকে যে, এ অবরোধ নবুয়াতের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসে শুরু হয়েছিল। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭)।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৩৯; উয়ূনুল আসার, সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২২; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৩৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৬।

এ অবরোধকালে মুসলমানগণ বাবলা পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা) বলেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, দৈবক্রমে রাতে আমার পা ভেজা কোন বস্তুর উপর পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে তা জিহ্বায় রেখে গিলে ফেললাম। এখনো পর্যন্ত জানি না যে, সেটি কি ছিল। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াককাস (রা) নিজের আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার রাতে আমি প্রস্রাব করার জন্য বের হলাম, পথিমধ্যে উটের একটি শুকনো চামড়ায় হাত পড়ল। পানিতে ধুয়ে সেটি পোড়ালাম। এরপর সেটি চূর্ণ করলাম এবং পানিতে গুলিয়ে পান করলাম। তিনটি রাত্রি আমি এর সাহায্যে অতিবাহিত করেছি। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিল যে, কোন বাণিজ্য কাফেলা যখন মক্কায় আসতো, তখন আবূ লাহাব গিয়ে এ ঘোষণা দিয়ে বেড়াতো যে, কোন ব্যবসায়ী যেন মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের নিকট প্রচলিত দামে কোন দ্রব্য বিক্রি না করে; বরং দ্বিগুণ চতুর্গুণ মূল্য আদায় করে। এতে যদি কোন ক্ষতি বা ঘাটতি হয় আমি এর যিম্মাদার হবো। সাহাবাগণ দ্রব্যাদি ক্রয় করতে আসতেন, কিন্তু বাজার দর অপেক্ষা চড়া মূল্য দেখে খালি হাতে ফিরে যেতেন। মোট কথা, একদিকে নিজেদের অসহায়ত্ব এবং দুশমনদের প্রবল প্রতাপ, আর অপরদিকে ক্ষুধার জ্বালায় শিশুদের কান্নাকাটি ও ছটফটির করুণ দৃশ্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।[১]

কেউ কেউ প্রিয়জনদের এ দুঃখ দেখে অন্তরে কষ্ট অনুভব করতো, গোপনে তাদের জন্য কিছু খাদ্য-পানীয় দ্রব্যাদি পাঠাতো। একদিনের ঘটনা ঃ হাকিম ইবন হিযাম[২] তার ফুফু হযরত খাদীজা (রা)-এর জন্য একটি চাকরের সহায়তায় কিছু খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবূ জাহল তা দেখে ফেলে বললো, তুমি কি বনী হাশিমের জন্য খাদ্যশস্য নিয়ে যাচ্ছ ! আমি কখনই তা নিয়ে যেতে দেব না এবং সবার সামনে তোমাকে অপদস্থ করব।

দৈবক্রমে আবুল বুখতারী সেখানে এসে উপস্থিত। তিনি অবস্থার নাজুকতা বুঝে আবূ জাহলকে বলতে শুরু করলেন ও নিজের ফুফুর জন্য খাদ্যশস্য পাঠাচ্ছে আর তুমি কেন তাকে গালাগাল দিচ্ছ ? এতে আবূ জাহলের ক্রোধ বেড়ে গেল এবং সে বুখতারীকে যা তা বকতে শুরু করল। আবুল বুখতারী একটি উটের হাড় হাতে নিয়ে

---

১. রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ২৩২

২ হাকিম ইবন হিযাম জাহিলিয়াতের যুগ থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দোস্ত ছিলেন। নুবূয়াত প্রাপ্তির পরও তাঁর প্রতি তার ভালবাসা অটুট ছিল। মক্কা বিজয়ের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুগ্রহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা তাঁর স্বভাব ধর্ম ছিল। হাকিম (রা) যখন হযরত মুআবিয়ার নিকট দারুন নাদওয়া একলক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তাকে তিরস্কার করেন। তখন হাকিম (রা) জবাব দেন, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ! আমি এর বিনিময়ে বেহেশতের এক ঘর ক্রয় করেছি। আর এক লক্ষ দিরহামের সম্পূর্ণটাই দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করে দেন। হাকিম (রা) একশত কুড়ি বৎসর বয়সে ৫০ অথবা ৫৪ হিজরীতে ইনতিকাল করেন। (ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩৪৯)।

আবূ জাহলের মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা যখম হয়ে গেল। মার খাওয়ার চেয়ে আবূ জাহলের কাছে বেশি কষ্টের কারণ ছিল যে, এ ঘটনাটি শে'বে আবূ তালিবে দাঁড়িয়ে হযরত হামযা (রা) দেখছিলেন (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩২)।

তাঁদের এহেন কষ্ট ও বিপদের দরুন কিছু দয়ার্দ্রচিত্ত ব্যক্তির অন্তরে এ চুক্তিপত্রটি লংঘনের ইচ্ছা জাগলো। সবার আগে হিশাম[১] ইবন আমরের এ চিন্তা জাগলো যে, আফসোস, আমরা তো খাচ্ছি, পান করছি অথচ আমাদেরই নিকটাত্মীয়, ঘনিষ্টজনেরা চরম দুঃখ-কষ্ট ও অনাহারে দিন যাপন করছে। অতঃপর যখন রাত্রি হলো, তিনি একটি উট বোঝাই খাদ্যশস্য শে'বে আবূ তালিবে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেন।

একদিন হিশাম ইবন আমর এ উদ্দেশ্যে যুহায়র[২] ইবন উমাইয়ার নিকট গেলেন। যিনি ছিলেন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। গিয়ে বললেন, হে যুহায়র, তোমার কি এটা পসন্দনীয় যে তুমি যা খুশি খাও, পরিধান কর, বিয়ে কর, আর তোমার মামা খাদ্যকণা খুঁজে বেড়ান? আল্লাহর কসম ! যদি আবূ জাহলের মামা এবং মাতুল গোষ্ঠীর লোকের এ অবস্থা হতো তবে কখনো সে এরূপ চুক্তিনামার পরোয়া করতো না। যুহায়র বললেন, আফসোস, আমি একা একা কি করতে পারি ? যদি আমার একজন সমচিন্তার লোকও থাকতো তা হলে আমি এ কাজের জন্য প্রস্তুত আছি।

হিশাম ইবন আমর সেখান থেকে উঠে মুতঈম ইবন আদীর কাছে গেলেন। তাকেও এভাবে সহমর্মী বানিয়ে নিলেন। মুতঈমও বললেন যে, আমাদের আরো একজন সহমর্মী বানানো প্রয়োজন।

হিশাম সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং প্রথমে আবুল বুখতারীকে এবং পরে যামআ ইবন আসওয়াদকে সহমর্মী বানালেন।

যখন এ পাঁচ ব্যক্তি ঐ চুক্তিনামা ভঙ্গ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, তখন সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন যে, কাল যখন সবাই একত্রিত হবে, তখন এ প্রসঙ্গ উপস্থাপন করা হবে। প্রভাত হলো, লোকজন মসজিদে একত্রিত হলে যুহায়র দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে মক্কাবাসী ! বড়ই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় যে, আমরা খাচ্ছি, পান করছি, কাপড় পরিধান করছি, বিয়ে-শাদী করছি, আর বনী হাশিম অনাহারে মরছে। আল্লাহর কসম, যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদের এ নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্র ছিন্ন করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসব না। আবূ জাহল বলল, আল্লাহর এ চুক্তিনামা কখনই ছিন্ন করা যায় না।

---

১. হিশাম ইবন আমর রবীয়া (রা) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৬০৫)।

২ যুহায়র ইবন আবূ উমাইয়া (রা) মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৫৫২)।

যাম'আ ইবন আসওয়াদ বললেন, আল্লাহর কসম অবশ্যই ছিন্ন করা যাবে। যখন এ চুক্তিপত্র লিখা হচ্ছিল, তখনই আমরা সম্মত ছিলাম না। আবুল বুখতারী বললেন, যাম'আ সত্যই বলছেন, আমরা রাজী ছিলাম না। মুতঈম বললেন, নিঃসন্দেহে এ দু'জন সত্য বলছেন। হিশাম ইবন আমর পুনরায় নিজ বক্তব্য সমর্থন করলেন। আবূ জাহল সভার এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বলল, এটা গত রাতের কোনো সিদ্ধান্তের ফল বলে মনে হচ্ছে ![1]

ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ তালিবকে এ সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর নাম ছাড়া ঐ চুক্তিনামাটির বাকী অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং 'হে আল্লাহ তোমার নামে' কথাটি যা সকল লিখার শুরুতে লিখা হয়ে থাকে, সেটুকু বাদ দিয়ে বাকী সকল অক্ষরই পোকায় খেয়ে ফেলেছে।

আবূ তালিব এ ঘটনা কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কখনই মিথ্যা বলেনি আর না তার কোন কথা আজ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ব্যাস, এসো এর উপর ফয়সালা হয়ে যাক, যদি মুহাম্মদের সংবাদ সত্য হয়, তা হলে তোমরা এ যুলুম-অত্যাচার থেকে রেহাই পাবে। আর যদি ভুল প্রমাণিত হয়, তা হলে মুহাম্মদ (সা) কে তোমাদের হাতে তুলে দিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, চাই তোমরা তাকে হত্যা কর অথবা তাকে জীবিত ছেড়ে দাও। জনগণ বলল হে আবূ তালিব, আপনি নিঃসন্দেহে ইনসাফপূর্ণ কথা বলেছেন এবং তৎক্ষণাৎ কাবাঘরে গিয়ে চুক্তিনামা চাওয়া হলো। দেখা গেল, সত্যিই আল্লাহর নাম ছাড়া বাকী সমুদয় অংশ পোকায় খেয়ে ফেলেছে। এটা দেখামাত্র অপমান ও লজ্জায় প্রত্যেকের মাথা নিচু হয়ে গেল। এভাবেই দশম নবূয়তী বর্ষে এই নিপীড়নমূলক চুক্তিপত্রের সমাপ্তি ঘটলো। আবূ তালিব ও তার সমস্ত সঙ্গী অবরোধ থেকে বেরিয়ে এলেন। এর পরে আবূ তালিব হারাম শরীফে উপস্থিত হলেন এবং তিনি ও তার সঙ্গীরা বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ, যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে, আমাদের নৈকট্যের সম্পর্ক কর্তন করেছে এবং আমাদের বেইজ্জত করেছে, তুমি তাদের থেকে এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আসিম ইবন উমর ইবন কাতাদা (রা), হযরত আবূ বকর ইবন আবদুর রহমান ইবন হারিস (রা), হযরত উসমান ইবন আবূ সুলায়মান (র) এবং হযরত ইকরামা ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৩৯-১৪১ এবং তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৯)।

আবূ তালিব এ ব্যাপারে একটি কাসীদাও পাঠ করেন, যার একটি পংক্তি এই—

الم يأتكم ان الصحيفة مزقت   وان كل مالم يرضه الله يفسد

---

১. তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৮; সীরাতে ইবন হিশাম,১খ. পৃ. ১৩০।

"তোমাদের কি খবর নেই যে, ঐ চুক্তিনামা ছিন্ন করা হয়েছে, আর যে বস্তু আল্লাহর নিকট অপসন্দনীয়,তা এভাবেই নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে থাকে।" (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫১)।

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, যখন নবী করীম (সা) এবং বনী হাশিম শে'বে আবূ তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখনই আবূ তালিব 'কাসীদায়ে লামিয়া' লিখেন, যা একটি বিখ্যাত কাসীদা। যেমনটি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া (২খ. পৃ. ৮৬)-এ উল্লিখিত আছে।

এভাবেই তিন বছরের ধারাবাহিক বিপদের পরিসমাপ্তি ঘটলো এবং দশম নববী সালে অর্থাৎ হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে তাঁরা শে'বে আবূ তালিব থেকে বের হলেন।

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭, تقاسم المشركين على انبى ﷺ অধ্যায়)।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর হিজরত

ঐ সময়ই,[১] মক্কার হাশিমীয়গণ যখন শেবে আবূ তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন, হযরত আবূ বকর (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশে বের হলেন (যাতে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের[২] সাথে মিলিত হতে পারেন)। যখন তিনি বারকুল গামাদ নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন 'কারা' গোত্রের সর্দার ইবনুদ-দাগুন্নার সাথে সাক্ষাত হলো।

ইবনুদ-দাগুন্না জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ বকর, কোন্ উদ্দেশে যাত্রা করেছ? আবূ বকর বললেন, আমার সম্প্রদায় আমাকে বের করে দিয়েছে। তাই আমি চাচ্ছি যে, আল্লাহর যমীনে ভ্রমণ করব আর আল্লাহর ইবাদত করব।

ইবনুদ-দাগুন্না বললেন, হে আবূ বকর, তোমার মত (ভাল) মানুষ বের হয়ে যায় না, আর এমন মানুষকেও বের করে দেয়া যায় না। তুমি দুঃস্থ মানুষদের মাল-সম্পদ দিয়ে সাহায্য কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, মানুষের বোঝা (ঋণ ও জরিমানা) আদায় করে দাও, মেহমানকে আপ্যায়ন কর, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী ব্যক্তি। আমি তোমাকে নিজ আশ্রয়ে নিচ্ছি, তুমি ফিরে যাও। ইবনুদ-দাগুন্না কুরায়শ সর্দারদের উপস্থিতিতে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আবূ বকরের মত মানুষ দেশ থেকে বের হয়ে যায় না, আর এরূপ লোককে বহিষ্কারও করা যায় না। তোমরা কি এমন একজন মানুষকে বের করে দিচ্ছ, যে দুঃস্থদের মাল-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে,

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০, ৮ম লাইন, অনুরূপ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৯৫।

২ بين القوسين মূল ইবারতের অংশ নয়, এটা ব্যাখ্যামূলক বাক্য, যা ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮০, যারকানী, ১খ. পৃ. ২৮৮)।

মানুষের ঋণের বোঝা বহন করে, মেহমানকে আপ্যায়ন করে এবং যিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনকারী ও সাহায্যকারী ? আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি।

কুরায়শগণ ইবনুদ-দাগুন্নার আশ্রয়দানকে মেনে নিল এবং বলল, আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ গৃহেই আল্লাহর ইবাদত করেন, নামায আদায় করেন, কুরআন তিলাওয়াত করেন, তবে উচ্চৈঃস্বরে নয়। উচ্চৈস্বরে নামায আদায়, উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াতে আমাদের কষ্ট হয়। এছাড়া আমাদের আশঙ্কা যে, আমাদের স্ত্রীলোক ও সন্তানরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ে। ইবনুদ-দাগুন্না আবূ বকরকে এসব বলে চলে গেলেন। তখন থেকে তিনি নিজ গৃহেই শুধু আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। কয়েক দিন পরেই আবূ বকর নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় একটি মসজিদ বানিয়ে নিলেন, যেখানে তিনি এখানে নামায পড়বেন, কুরআন তিলাওয়াত করবেন।

কুরায়শদের সন্তান ও স্ত্রীলোকেরা এ মসজিদ দেখার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারা অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে একের পর এক আবূ বকরকে দেখতে থাকে। যেই তাঁকে দেখছিল আবূ বকরের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো।[১] আর আবূ বকর আল্লাহর ভয়ে অধিক কান্নাকাটিকারী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পুরুষ হওয়ার কারণে কুরআন তিলাওয়াতকালে নিজ দৃষ্টি সংযত রাখতে পারতেন না। হাজার চেষ্টা করেও চোখকে থামিয়ে রাখতে পারতেন না (এ কারণে শ্রোতারাও নিজেদের অন্তরকে সংযত রাখতে পারত না, শত চেষ্টা সত্ত্বেও আবূ বকরের তিলাওয়াতের সময় নিজেদের অন্তরকে সংযত রাখতে ব্যর্থ হতো)।

কুরায়শ সর্দারগণ যখন এ অবস্থা দেখল, তারা ঘাবড়ে গেল এবং ইবনুদ-দাগুন্নাকে দ্রুত ডেকে পাঠাল। তার কাছে তারা এ অভিযোগ করল যে, আমরা আপনার কথায় এ শর্তে আবূ বকরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে চুপে চুপে গোপনে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করবেন, উচ্চৈঃস্বরে করবেন না, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত চুপে চুপে করবেন কিন্তু আবূ বকর এখন ঐ শর্ত ভঙ্গ করে উচ্চৈঃস্বরে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের 'বিগড়ে যাওয়ার' আশংকা করছি। আপনি আবূ বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ শর্তের উপর থাকেন অথবা আপনি তার আশ্রয়দানের কথাটি প্রত্যাহার করুন। আপনার আশ্রয়দানের প্রশ্নে আমাদের সম্মতি আমরা প্রত্যাহার করতে চাই না। আবূ বকর (রা) বললেন, আমি তোমাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয়কে ফিরিয়ে দিচ্ছি; শুধু আল্লাহ্ তা'আলার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের উপর সন্তুষ্ট আছি।[২]

---

১. বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ২৩৭, ৫৫২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮১।

২. يعجبون منه وهو ينظرون বুখারীর বাক্য এরূপ যে, আরবের প্রচলিত কথায় বাক্যের শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আসে, আমরা এ বক্তব্যে ঐ বাক্যের অর্থ এবং দলীলের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছি।

কল্যাণ কথা

ইবনুদ-দাগুন্না হযরত আবূ বকর (রা)-এর যে সমস্ত গুণ বর্ণনা করেছেন, দৃশ্যত সেগুলো ঐ গুণাবলী, যা হযরত খাদীজা (রা) নবী করীম (সা)-এর গুণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন (যেমনটি নুবূয়াতপ্রাপ্তি অধ্যায়ে বলা হয়েছে), যা দ্বারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত, পূর্ণতা এবং সিদ্দীকের অবস্থান নবূয়াতের অবস্থানের নিকটতর ও সংযুক্ত হওয়ার বিষয়ে জানা যায়।

মুহাক্কিক জ্ঞানীগণের মতে সিদ্দীকের অবস্থান এবং নুবূয়াতের অবস্থানের মধ্যবর্তী আর কোন স্তর নেই, সিদ্দীকের স্তরের সমাপ্তি নুবূয়াতের হিদায়েতের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভাল জানেন।

দুঃখ ও বিষণ্নতার বছর

আবূ তালিব এবং হযরত খাদীজাতুল কুবরার ইনতিকাল

শেবে আবূ তালিব থেকে বের হওয়ার কয়েক দিন পরে দশম নববী বর্ষের রমযান অথবা শাওয়াল মাসে আবূ তালিব ইনতিকাল করেন। আর তার তিন অথবা পাঁচ দিন পর হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকাল ঘটে।[১]

মুসনাদে আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈতে আছে, যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় হয়ে এলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে এলেন। আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া সেখানে উপস্থিত ছিল। রাসূল (সা) বললেন, হে চাচা, আপনি একবার মাত্র لا اله الا الله বলুন, যাতে আল্লাহর সামনে আপনার জন্য শাফায়াত ও সুপারিশ করার আমার একটা অজুহাত ও প্রমাণ থাকে।

আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া বলল, হে আবূ তালিব, তুমি কি আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম ছাড়তে চাও ? আবূ তালিব لا اله الا الله বলতে অস্বীকার করলেন। আর মৃত্যুকালীন শেষ কথা যা তার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর আছি।

আবূ তালিব তো এ কথা বলে ইনতিকাল করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি সদা সর্বদাই আবূ তালিবের জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করতেই থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তখন এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৯১, ২৯৬।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا اُوْلِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحَابُ الْجَحِيْمِ

"নবী ও মু'মিনদের পক্ষে মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সঙ্গত নয়; যদিও তারা তাদের আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। কারণ এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা : ১১৪)

اِنَّكَ لاَ تَهْدِيْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

"আপনি যাকে চান, হিদায়াত করতে পারেন না; বরং আল্লাহ যাকে চান, হিদায়াত দান করেন।" (সূরা কাসাস : ৫৬)

হযরত আব্বাস[১] (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আপনার চাচার জন্য কি করলেন, যিনি আপনার সাহায্য-সহায়তাকারী ছিলেন? তিনি

---

১. আল্লামা সুহায়লী তাঁর রাউযুল উনূফে এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর উয়ূনুল আসার গ্রন্থে (১খ. পৃ. ১৩৩) এবং হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে (৭খ. পৃ. ১৪৮) বলেন, হযরত আব্বাস (রা)-এর এ প্রশ্ন দ্বারা আবূ তালিবের ঈমান আনয়ন প্রসঙ্গে ঐ রিওয়ায়াত, যা হযরত আব্বাস (রা)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা হয়, তা সহীহ নয়। ঐ রিওয়ায়াতটি এই যে, মৃত্যুকালে আবূ তালিবের ওষ্ঠ নড়াচড়া করছিল, হযরত আব্বাস কান পেতে শোনেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলেন, আপনি যে কালেমার কথা বলছিলেন, আবূ তালিব ঐ কালেমা বলেছেন। তিনি বললেন, আমি শুনি নাই। এ জন্যে যে, যদি আব্বাস (রা) আবূ তালিবকে কালেমা শাহাদত বলতে শুনতেন তবে এ প্রশ্নের অর্থ কি ? মোট কথা, এ রিওয়ায়াত যদি সহীহও হয়, তা হলে কুরআনের আয়াত এবং বুখারী-মুসলিম এবং অপরাপর সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত ও বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হাদীসসমূহের বিপরীতে তা দলীল হতে পারে না; যদিও ঐসব বর্ণনা দুর্বল ও মুনকাতি'ও হয়। আল্লামা শিবলী ইবন ইসহাকের ঐ দুর্বল ও মুনকাতি' বর্ণনা দ্বারা বুখারী-মুসলিম এবং সিহাহ সিত্তার সমস্ত সহীহ হাদীসের বর্ণনাকে রদ করে আবূ তালিবের ঈমান আনয়ন প্রমাণ করতে চান। এ আল্লামার নিকট কিসরার প্রাসাদে ভূমিকম্পের বর্ণনা এ জন্যে অগ্রহণযোগ্য ছিল যে, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, বরং সিহাহ সিত্তাহর কোথাও এ হাদীসের পাত্তা ছিল না। কিসরার প্রাসাদের এই হাদীস সিহাহ সিত্তাহর কোথাও না থাকলেও এ হাদীসের বিরুদ্ধেও সিহাহ সিত্তাহয় একটি হরফও ছিল না। ইবন ইসহাকের এ বর্ণনার বিপরীতে সিহাহ সিত্তাহয় স্পষ্ট বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ বিদ্যমান। স্বয়ং আল্লামার বিশ্লেষণ হলো, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এ জন্যে সমালোচিত যে, তিনি ইয়াহূদী-নাসারা থেকে রিওয়ায়াত করতেন এবং তাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। আমরা জানি না যে, এ ধরনের ব্যক্তির বর্ণনার দ্বারা সহীহায়ন এবং সিহাহ সিত্তাহর বর্ণনাসমূহ রদ করার প্রতি আল্লামা কিভাবে উদ্যোগী হলেন ? অধিকন্তু, আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের প্রসঙ্গে যত বর্ণনাই আছে, এর সবগুলোই এ ধরনের বুযর্গ ব্যক্তি কর্তৃক বর্ণিত, (যারা নাউযু বিল্লাহ), হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-কে কাফিররূপে আখ্যায়িতকারী। হাফিয আসকালানী তাঁর ইসাবা শীর্ষক গ্রন্থে (৪খ. পৃ. ১১৫) 'আবূ তালিবের প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সম্মানিত আলিমগণ ইসাবা ছাড়াও আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (৩খ. পৃ. ১৪২–১৪৬) ও আল্লামা যারকানীর শারহে মাওয়াহিব (১খ. পৃ. ২৯১) দেখে নিতে পারেন।

বললেন, পায়ের গিরা পর্যন্ত আগুনে আছেন, যদি আমি সুপারিশ না করতাম তবে জাহান্নামের তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে যেতেন (বুখারী শরীফ, আবূ তালিবের ঘটনা অধ্যায়)।

আবূ তালিব প্রসঙ্গ

আল্লামা সুহায়লী বলেন, আবূ তালিব আপাদমস্তক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্য-সহযোগিতায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। কেবল চরণ যুগল ইসলামের পরিবর্তে আবদুল মুত্তালিবের অনুসরণে নিয়োজিত ছিল। এ জন্যে কেবল চরণদ্বয়ে আযাব নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা-কে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।"

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, যখন আবূ তালিব মারা গেলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, যাও, দাফন করে এসো। আমি বললাম, তিনি তো মুশরিক অবস্থায় মারা গেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, দাফন করে এসো। এ হাদীসটি আবূ দাঊদ ও নাসাঈতে আছে। হাফিয আসকালানী[১] তাঁর ইসাবায় বলেন, ইবন খুযায়মা হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন।

এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রা) আবূ তালিবের দাফন শেষে নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হলে নবী (সা) তাকে বললেন, গোসল দিয়ে নাও। একে ভিত্তি করে ফকীহ ও আলিমগণের বক্তব্য হলো, কাফির ও মুশরিককে কাফন-দাফন করার পর গোসল করা মুস্তাহাব যেমনটি হাদীসসমূহে এসেছে।

হাফিয তুরবাশতি (র) বলেন, এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই মুজতাহিদ ইমামগণ, বিশেষত ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (র) কাফিরের দাফন জায়েয বলে দলীল পেশ করেছেন। অধিকন্তু, এর উপর ভিত্তি করেই তাঁরা এ মাসয়ালাও দিয়েছেন যে, মুসলমানরা কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না। এ জন্যে যে, আবূ তালিবের চার পুত্র ছিল,তালিব, আকিল, জা'ফর এবং আলী। আবূ তালিবের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কেবল তালিব ও আকিল পেয়েছিল, যারা পিতৃধর্মের উপর ছিল। আর জা'ফর এবং আলী (রা) সম্পত্তি পাননি, কেননা তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। যেমনটি আল-মুতামিদ ফিল ইতিকাদে বর্ণিত হয়েছে।[২]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৮।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩২।

সতর্ক বাণী

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের[১] সর্বসম্মত বিশ্বাস এই যে, আবূ তালিব কুফরী অবস্থায় মারা গেছেন; যেমনটি পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয তুরবাশতী লিখেছেন, আবূ তালিবের কাফির হওয়া নিরবচ্ছিন্ন হাদীসের সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর পূর্ববর্তী আলিম এবং দীনের ইমামদের এটাই সিদ্ধান্ত। রাফিযীদের সিদ্ধান্ত এই যে, আবূ তালিব ঈমান নিয়ে মারা গেছেন। জানা উচিত যে, ঈমানের জন্য ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গই যথেষ্ট নয়, নুবূয়াত ও রিসালতের সত্যায়ন এবং সাক্ষ্যদান ছাড়া মু'মিন হওয়া যায় না। অতএব এটা বুঝে নিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।

ইসলামের দাওয়াতদানের জন্য তায়েফ সফর

আবূ তালিবের পর নিজ গোত্রের অবিশ্বাসীদের থেকে তাঁর আর কোন সহমর্মী ও সাহায্যকারী রইল না। আর হযরত খাদীজা (রা)-এর বিদায় গ্রহণের পর কোন সান্ত্বনাদানকারী ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারীও থাকলেন না। মক্কার কুরায়শদের শক্তিমত্তার দরুন বাধ্য হয়ে দশম নববী বর্ষের শাওয়াল মাসের শেষভাগে তিনি (সা) তায়েফে গমন করলেন এ জন্যে যে, সম্ভবত এ লোকগুলো আল্লাহর প্রতি হিদায়াত গ্রহণ করবে এবং দীনের সাহায্য-সহায়তাকারী হবে। হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) কে সাথে নিয়ে তিনি তায়েফ গমন করলেন।

আবদ ইয়ালিল, মাসঊদ ও হাবীব—এরা ছিল তিন ভাই যারা সেখানকার নেতৃস্থানীয়দের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন। তারা কালেমার সত্য দাওয়াত শ্রবণ করার পরিবর্তে রূঢ়ভাবে তাঁকে জবাব দিল। তাদের একজন বলল, কাবার পর্দা ছিন্ন করার জন্য বুঝি আল্লাহ তোমাকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন ! আর একজন বলল, আল্লাহ্ বুঝি নবী বানানোর জন্য তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পান নাই ! একজন বলল, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলব না। যদি আসলেই তোমাকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল বানিয়ে পাঠিয়ে থাকেন, তবে তোমার কথার বিরোধিতা করা ভয়ংকর (কিন্তু এ নির্বোধ এটা বুঝল না যে, আল্লাহর পয়গাম্বরের সাথে ঠাট্টা-মস্করা করা এর চেয়েও বেশি কঠিন অপরাধ), আর যদি তুমি আল্লাহর রাসূল না হও, তবে তো তোমাকে সম্বোধন করার বা তোমার

---

১. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের এটাই সম্মিলিত রায়। কাজেই আল্লামা শিবলীর সীরাতুন নবী (১খ. পৃ. ১৮১) এটা লিখা যে, আবূ তালিবের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে স্রেফ প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী। আহলে সুন্নাতের মধ্যে তার কুফরীর ব্যাপারে কোনই মতপার্থক্য নেই। অবশ্য রাফিযীরা আবূ তালিবের ঈমান আনয়নের প্রবক্তা। তবে প্রকাশ থাকে যে, রাফিযীদের মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা হযরত আবূ বকর, হযরত উমর বরং সমস্ত সাহাবা কিরাম (রা) কে কাফির ও মুনাফিক মনে করে, তাদের মতপার্থক্য কেমন করে ধর্তব্য ও দৃষ্টিদানের যোগ্য হতে পারে?

প্রতি দৃষ্টি দেয়ার যোগ্যই তুমি নও। এরপর ওরা দুশ্চরিত্র বখাটে ভবঘুরে ছেলেদেরকে উস্কিয়ে দিল যে, তাঁর প্রতি তারা পাথর নিক্ষেপ করুক ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করুক। যালিমরা তখন এত পাথর নিক্ষেপ করল যে, রাসূল (সা) ভীষণভাবে আহত হলেন। আঘাতের যন্ত্রণায় যখন তিনি বসে পড়তেন, ঐ হতভাগারা তাঁর বাহু ধরে পুনরায় তাঁকে পাথর মারার জন্য দাঁড় করিয়ে দিত এবং হাসাহাসি করত।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা), যিনি তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন, তিনি হযরত (সা)-কে রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন যে, তাঁর পরিবর্তে নিজের গায়ে সকল পাথরের আঘাত লাগুক। ফলে যায়দ ইবন হারিসার সমস্ত মাথা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়। আর নবী (সা)-এর পায়ে এমন আঘাত লাগে যে, তাঁর পা থেকে রক্ত গড়াতে থাকে।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে উতবা ইবন রবীয়া এবং শায়বা ইবন রবীয়ার বাগান ছিল, বিশ্রাম গ্রহণের জন্য তিনি সেখানে একটি গাছের নিচে বসে পড়লেন এবং এ দু'আ করলেন :

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهو اني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين الى من تكلنى الى عدو بعيد يتجهمنى ام الى صديق قريب ملكته امرى ان لم تكن غضبانا على فلا ابالي غير ان عافيتك اوسع لى اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه امرالدنيا والاخرة من تنزل بى غضبك اويحل بى سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিজের দুর্বলতা, চেষ্টার স্বল্পতা এবং মানুষের অসাবধানতার অভিযোগ করছি। আয় আরহামুর রাহিমীন! তুমি তো বিশেষভাবে দুর্বলদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী। তুমি আমাকে কার কাছে সোপর্দ করবে, কোন ভীতিপ্রদ ত্রাস সৃষ্টিকারী দুশমনের কাছে, নাকি কোন বন্ধুর কাছে যাকে আমার ও আমার কর্মের অধিকারী বানাবে। যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে না থাক, তবে আমি আর কিছুরই পরোয়া করি না; বরং তোমার ক্ষমা ও নিরাপত্তা আমার কাজ সহজসাধ্য হওয়ার নিমিত্ত হবে। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার পবিত্র সত্তার কাছে যার ওসীলায় সমগ্র অন্ধকাররাশি আলোকিত হয়ে উঠে এবং এ নূরের দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাতের কারখানা চলে। আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ এবং অসন্তোষ যাতে আমার উপর পতিত না হয় তা থেকে। আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য তোমাকেই শোনানো এবং সম্মত করানো; কেননা তোমার প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়া বান্দার মধ্যে কোন মন্দ থেকে বিরত থাকা ও ভাল কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই।" (ইবন ইসহাক ও তাবারানী)।

দু'আ কবূলের জন্য তো কেবল রিসালত ও নবূয়াতের গুণই যথেষ্ট ছিল। কেননা নবীগণ মুস্তাজাবুদ-দা'ওয়াত (যাঁদের দু'আ কবূল হয়ে থাকে) হন। কিন্তু ঐ সময়ে নবূয়াতের গুণ ছাড়াও ব্যর্থতা, নির্যাতন, অসহায়ত্ব ও মুসাফিরের শর্তও অতিরিক্ত যুক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের বাণী :

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ

"বরং তিনিই আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে আর তিনিই বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন।" (সূরা নামল : ৬২)

আর এটাও বিবেচ্য, নির্যাতিত ও মুসাফির প্রত্যেকের ব্যাপারে পৃথক পৃথক হাদীসে এসেছে যে, মুসাফির এবং মযলুমের দু'আ নিঃসন্দেহে কবূল হয়।

بترس از آه مظلومه که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید

"মযলূমের আহাজারীকে ভয় কর, কেননা তার দু'আকে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়।"

অতঃপর এরূপ প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী দু'আর ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ কোথায়, যেখানে দু'আকারী একজন নবী ও রাসূল। একই সাথে তিনি অসহায়, নির্যাতিত, দরিদ্র এবং মুসাফিরও। এমন দু'আ তো কেবল মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার অপেক্ষা,[1] সাথে সাথে কবূলের দরজা খুলে গেল। ঐ উতবা এবং শায়বা, যাদের অন্তর ছিল পাথরের চেয়েও কঠিন, তারা রাসূল (সা)-এর এ অসহায়ত্ব ও নিপীড়িত অবস্থা বাগানে বসে দেখছিল। অবস্থা দেখে তাদের অন্তর কিছুটা আর্দ্র হলো, আর রক্ত সম্পর্কীয় নৈকট্যের কারণে তাদের স্নায়ুতন্ত্রে তাঁকে সহায়তা করার ভাব জাগ্রত হলো। আদ্দাসকে ডেকে নিয়ে বলল, একটি পাত্রে আঙ্গুর নিয়ে তাঁর নিকটে যাও এবং তাঁকে বল, তিনি যেন এর থেকে কমবেশি অবশ্যই আহার করেন। আদ্দাস তাঁর সামনে এনে ঐ খাঞ্চা রাখল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিসমিল্লাহ্ বলে তা থেকে খেতে শুরু করলেন। আদ্দাস বলল, আল্লাহর শপথ, এ শহরে তো এমন বাক্য বলার মত কেউ নেই ! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি কোন্ শহরের অধিবাসী আর তোমার ধর্মই বা কি ?

আদ্দাস বলল, আমি নিনেভা[2] শহরের অধিবাসী এবং ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান। রাসূল (সা) বললেন, ঐ নিনেভা, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দা ইউনুস ইবন মাত্তা বাস করতেন ? আদ্দাস বলল, ইউনুস ইবন মাত্তা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন ?

---

১. পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে, তার সূচনা ছিল এই দু'আ, এদিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে।

২. নিনেভা মসূল এলাকার একটি শহর। (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৯৯)।

তিনি বললেন, তিনি আমার ভাই নবী ছিলেন, আর আমিও নবী। আদ্দাস তাঁর কপাল, হাত ও পায়ে চুমো দিল এবং বলল, أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি[১] যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" যখন আদ্দাস তাঁর নিকট থেকে ফিরে এলো, তখন উতবা ও শায়বা বলল, তুমি ঐ ব্যক্তির হাত-পায়ে কেন চুমো দিচ্ছিলে ? এ ব্যক্তি না জানি তোমাকে তোমার দীন থেকে সরিয়ে না নেয়, তোমার ধর্ম তার ধর্ম থেকে উত্তম।[২]

হাকিম ইবন হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন উতবা এবং শায়বা মক্কার কুরায়শদের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন আদ্দাস তাদের পা ধরে বলল, আল্লাহর শপথ ! তিনি আল্লাহর রাসূল, তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে এ লোকগুলোকে ধ্বংসের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে।

আদ্দাস (রা) বসে বসে কাঁদছিলেন, আস ইবন শায়বা ঐ পথে যাচ্ছিল, সে আদ্দাসকে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছো কেন ? আদ্দাস বললেন, আমাদের ঐ দুই সর্দারের কারণে কাঁদছি, তারা এ সময়ে আল্লাহর রাসূলের মুকাবিলা করতে যাচ্ছে। আস ইবন শায়বা বলল, তিনি কি সত্যিই আল্লাহর রাসূল ? আদ্দাস বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, সমগ্র বিশ্বমানবের প্রতি তিনি আল্লাহর রাসূল হিসেবে এসেছেন।[৩]

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার উপর কি উহুদ যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে ? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে কষ্ট পাওয়ার, তা তো পেয়েছি, কিন্তু সর্বাপেক্ষা কঠিনতম দিন ছিল ঐ দিন, যেদিন আমি নিজেকে আবদ ইয়ালীলের পুত্রদের সামনে উপস্থাপন করি। ওরা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আমি সেখান থেকে অত্যন্ত চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফিরছিলাম। 'কারনুস সাআলিব' নামক স্থানে পৌঁছে কিছুটা স্বস্তি এলো, হঠাৎ যখন মাথা উঠালাম তখন দেখলাম একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়াদান করছে এবং এর মধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) বিদ্যমান। জিবরাঈল সেখান থেকেই আওয়াজ দিলেন, আপনার সম্প্রদায় আপনার কথার যে উত্তর দিয়েছে, আল্লাহ তা শুনেছেন। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা আপনার নিকট পাহাড়ের ফিরিশতাকে প্রেরণ করেছেন, আপনি তাকে যা ইচ্ছা, নির্দেশ দিতে পারেন।

ইত্যবসরে মালিকুল জাবাল (পাহাড়ের ফেরেশতা) আমাকে আহ্বান করলেন এবং সালাম জানিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ ! আল্লাহ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ

---

১. এ সমুদয় বর্ণনা আমরা উয়ূনুল আসার থেকে উদ্ধৃত করেছি, اشهد انك عبد الله ورسوله শুধু আদ্দাসের এ সাক্ষ্য হাফিয আসকালানী সীরাতে সুলায়মান তায়মী সূত্রে ইসাবায় (২খ. পৃ. ২৬৬) 'আদ্দাসের বক্তব্য' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

২ উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩৪; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৩৫।

৩. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৬৭।

করেছেন, আমি পাহাড়ের ফেরেশতা, পাহাড়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করি। আপনি যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ দিতে পারেন। আপনি যদি আদেশ করেন তা হলে দুই পাহাড়কে (যার মধ্যবর্তী স্থলে মক্কাবাসী এবং তায়েফবাসীর অবস্থান) একত্রিত করে দিই, যাতে সমস্ত মানুষ পিষ্ট হয়ে যায়।

তিনি ইরশাদ করলেন, না, আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশা করি যে, আল্লাহ ওদের বংশে এমন মানুষ সৃষ্টি করুন, যারা শুধু একক সত্তা লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।

এ সমুদয় বর্ণনা সহীহ্ বুখারীর যিকরুল মালাইকা (ফেরেশতাদের কথা) অধ্যায়ে আছে, শুধু উদ্ধৃত বাক্যাবলী মু'জামে তাবারানীর রিওয়ায়াতের অনুবাদ।[১]

একটি জরুরী সতর্ক বাণী

কঠিন থেকে কঠিনতর কষ্ট পাওয়ার পরেও এ বিশ্ববাসীর প্রতি অনুগহ, দয়ার মূর্ত প্রতীক নবী করীম (সা)-এর আভিজাত্য ও অনুগ্রহ, ঐ মানুষগুলোর ধ্বংস ও বিনাশের জন্য এ কারণে দু'আ করেননি যে, যদিও এরা ঈমান আনেনি, কিন্তু তাদের বংশ থেকে আল্লাহর অনুগত, আজ্ঞাবহ, নিষ্কলুষ ও তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারীর জন্ম হবে।

সায়্যেদুনা হযরত নূহ (আ)-এর বিপরীত (আমার জীবন ও আত্মা তাঁর প্রতি উৎসর্গ হোক), যখন তাঁর এ আশা ভঙ্গ হয়ে গেল, আর আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে জানানো হলো যে, যাদের ঈমান আনার ছিল, তারা ঈমান এনেছে, অবশিষ্ট লোকেরা না নিজেরা ঈমান আনবে, না তাদের সন্তানদের মধ্যে আল্লাহকে মান্যকারী কোন বান্দার জন্ম হবে, তখন সায়্যেদুনা নূহ (আ) তাদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্য দু'আ করলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلاَّ مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ

"আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল যে, পূর্বে যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। কাজেই তুমি ওদের কার্যকলাপে চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না।" (সূরা হূদ : ৩৬)

এর পর নূহ (আ) এ দু'আ করলেন

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا اِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا

---

১. ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২২৫।

"হে আমার প্রতিপালক, পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্যে কোন গৃহবাসীকে অবশিষ্ট রেখো না। তুমি ওদের ছেড়ে দিলে ওরা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির জন্ম দিতে থাকবে।" (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

হযরত নূহ (আ) ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন যে, এরা কেউ ঈমান আনবে না, আর এদের বংশধরদের মধ্যেও কেউ ঈমান আনবে না। ভবিষ্যতে যারাই পয়দা হবে, তারাই কাফির, সীমা-লংঘনকারী এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অবাধ্যই পয়দা হবে। এ জন্যে তিনি এ দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ ! এক্ষণে তোমাকে অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে কাউকেই পৃথিবীতে জীবিত ছেড়ো না। এরা যদি জীবিত থাকে, তা হলে তোমার অবাধ্য হবে আর ওদের সন্তান-সন্তুতিও নাফরমান হবে। যখন ঈমান থেকেই নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন ঔদার্য ও অনুগ্রহের কোন অবকাশই অবশিষ্ট থাকল না। এ কুদরতী কারখানা ততক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাম নেয়ার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে। যখন আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নাম নেয়ার মত কোন বান্দাই অবশিষ্ট থাকবে না, এ কারখানা তখন ওলট পালট করে দেয়া হবে।

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং জিন্নদের উপস্থিতি

প্রত্যাবর্তনকালে তিনি কয়েক দিন নাখলায় অবস্থান করেন। এক রাতে তিনি নামায পড়ছিলেন, ইত্যবসরে নাসীবীন-এর সাতজন জিন্ন ঐ পথে যাচ্ছিল, তারা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করে এবং চলে যায়। ওদের আগমনের বিষয়ে তাঁর কিছুই জানা ছিল না। এমনকি এই আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِيْنَ قَالُوْا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءُ اُولٰئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ

"স্মরণ কর, আমি একদল জিন্নকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হলো, তখন একে অপরকে বলতে লাগল, চুপ করে শোন। যখন কুরআন পাঠ শেষ হলো, ওরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে ওরা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে

সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেউ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। ওরাই তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সূরা আহকাফ ২৯-৩২)[১]

যখন তিনি মক্কার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) আরয করলেন, মক্কায় কিভাবে প্রবেশ করব ? মক্কাবাসীরাই তো আপনাকে বের করে দিয়েছে। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে যায়দ![২] আল্লাহ তা'আলা এ মুসীবত থেকে উদ্ধারের কোন পন্থা অবশ্যই বের করে দেবেন। আর আল্লাহই তাঁর দীনের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং অবশ্যই তিনি তাঁর নবীকে সবার উপরে বিজয়ী করবেন। অতঃপর তিনি হেরা গুহায় পৌঁছে আখনাস ইবন শুরায়কের নিকট প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি কি আপনার আশ্রয়ে মক্কায় আসতে পারি ? আখনাস বলল, আমি তো কুরায়শের মিত্র, কাজেই আমি আপনাকে আশ্রয় দিতে পারি না। পরবর্তীতে তিনি এই প্রস্তাব সুহায়ল ইবন আমরের নিকট পাঠালেন। সুহায়ল বলল, বনী কা'বের বিরুদ্ধে বনী আমের আশ্রয় দিতে পারে না। এরপর তিনি মুতইম ইবন আদীর কাছেও এ প্রস্তাব পাঠালেন যে, আমি কি আপনার আশ্রয়ে মক্কায় আসতে পারি ? মুতইম তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং নিজ পুত্রদের ও সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ডেকে বললেন, অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তোমরা হারামের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, আমি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিয়েছি। আর নিজেও উটে সওয়ার হয়ে হারামের নিকটে এসে দাঁড়ালেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বললেন, হে কুরায়শ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মদ (সা)-কে আশ্রয় দিয়েছি, কেউ যেন তাঁর বিরোধিতা না করে।

তিনি (সা) হারাম শরীফে পৌঁছে হাজরে আসওয়াদে চুমো দিলেন, তাওয়াফ করলেন এবং দু'রাকাত শোকরানা নামায আদায় করলেন, এরপর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। মুতইম এবং তার পুত্রগণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল।[৩]

মুতইমের এ অনুগ্রহের ভিত্তিতে বদর যুদ্ধের দিন যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে তিনি এ কবিতা পাঠ করেছিলেন :

لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء التى لتركتهم له

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৩৭।

২ প্রকৃত বাক্যগুলি ছিল ঃ يا زيد ان الله جاعل لما نوى فرجا مخرجا وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه (তাবাকাতে ইবন সাদ, ১খ. পৃ. ১৪২)।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৪২; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৪৭।

"যদি আজ মুতইম ইবন আদী বেঁচে থাকতেন আর এ অপবিত্রদের ব্যাপারে কিছু বলতেন, তা হলে আমি তার খাতিরে এদের সবাইকে বিনাশর্তে ছেড়ে দিতাম।"
(উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৩৬)

হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এ সময়ে হযরত তুফায়ল ইবন আমর দাওসী (রা) মক্কায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সে সময় ইসলামের প্রচার করছিলেন। তুফায়ল শরীফ বংশীয় হওয়া ছাড়াও উচ্চমানের কবি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, সমঝদার এবং অতিথি বৎসল ছিলেন। কুরায়শদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক ছিল।

তিনি যখন মক্কায় এলেন, তখন কুরায়শের কিছু লোক তার নিকট এলো এবং বলল, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। সে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। তার কথা ঐন্দ্রজালিক ও জাদুর মত, যা পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিভেদ সৃষ্টি করে। আপনি তার থেকে দূরে থাকবেন। আশঙ্কা হয়, পাছে আপনি ও আপনার সম্প্রদায় এ বিপদে জড়িয়ে না পড়েন। যতটা সম্ভব আপনি ঐ লোকের কোন কথা শুনবেন না। কুরায়শরা তুফায়ল ইবন আমর দাওসীকে এতই ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে, তিনি নিজের দু'কানের ছিদ্রে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে হঠাৎ করেও ঐ ব্যক্তির কথা কানে প্রবেশ না করে। (তিনি বলেন,) এমনকি লোকে আমাকে ذو القطنتين (যুল-কাতনাতায়ন) বলতে লাগল। ঘটনাক্রমে আমি একদিন মসজিদে হারামের দিকে গেলাম। দেখলাম মুহাম্মদ (সা) বায়তুল্লাহর সামনে নামায আদায় করছেন।

তুফায়ল (রা) বলেন, আমি তাঁর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। যদিও আমি চাচ্ছিলাম যে, তাঁর কোন কথা শুনব না; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা চাচ্ছিলেন যে, তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে দেন। অবলীলায় আমি তাঁর কিছু কথাবার্তা শুনতে পেলাম। কথাগুলো অতি উত্তম ও ভালো লাগল। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি তো বুদ্ধিমান পুরুষ এবং বড় কবি, তাঁর কোন বাক্যের সৌন্দর্য ও সাবলীলতাই আমার কাছে গোপন থাকবে না।

আমি তাঁর কথা অবশ্যই শুনব। যদি কোনো কথা উত্তম ও সৌন্দর্যমণ্ডিত মনে হয় তা হলে গ্রহণ করব; আর যদি মন্দ ও অবাঞ্ছিত হয় তা হলে পরিত্যাগ করব। কাজেই যখন নবী (সা) হারাম শরীফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, আমি তাঁর পিছু নিলাম। যখন তিনি তাঁর ঠিকানায় পৌঁছলেন, আমি তাঁর খিদমতে গিয়ে আরয করলাম, আপনার সম্প্রদায় আমাকে আপনার কথা শোনা থেকে এমনভাবে ভয় দেখিয়েছে যে, আমি কানের দু'ছিদ্রে কাপড় প্রবিষ্ট করেছি, যাতে আপনার কোনো কথা শোনা না যায়। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এটা নয় যে, আমি আপনার কথা শুনব না। আপনার বাণীর যেটুকু কানে পড়েছে, খুবই ভালো লেগেছে। আপনি আপনার দীন আমার সামনে

উপস্থাপন করুন। তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন এবং আমার সামনে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করলেন। এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তিনি সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াত করেছিলেন। আল্লাহর শপথ! কুরআন করীমের চেয়ে উত্তম কোন বাক্য আমি কখনো শুনিনি এবং ইসলাম অপেক্ষা ইনসাফপূর্ণ[১] ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী কোন দীনও পাইনি। কাজেই সাথে সাথে মুসলমান হয়ে গেলাম।

আমি তাঁর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী, আমি আমাদের সম্প্রদায়ের সর্দার। আমার ইচ্ছা, এলাকায় ফিরে গিয়ে আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেব। আপনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমাকে কোন নিদর্শন দান করেন, যা এ ব্যাপারে আমার পরিচায়ক ও সাহায্যকারী হবে। তিনি (সা) এ দু'আ করলেন : اللهم اجعل له اية। "আয় আল্লাহ ! একে কোন নিদর্শন দান কর।"

অতঃপর আমি যখন আমার বস্তির নিকটবর্তী হলাম, আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রদীপের মত একটি আলো সৃষ্টি হলো। আমি প্রার্থনা করলাম, আয় আল্লাহ, এ নূরকে আমার মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোন স্থানে দিয়ে দিন, যাতে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বিকৃতি মনে না করে। আর এটা মনে না করে যে, পিতৃধর্ম পরিত্যাগের কারণে এর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ঐ নূর তৎক্ষণাৎ আমার চাবুকে চলে গেল ! আর ঐ চাবুক একটি মোমবাতি এবং লণ্ঠনে পরিণত হলো।

প্রভাত হলে আমি প্রথমেই আমার পিতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম, আর এরপর আমার স্ত্রীকে। উভয়েই নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র করল, গোসল করল এবং ইসলাম গ্রহণ করল। আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, তোমার যদি এ ভয় হয় যে, প্রতিমাদের পরিত্যাগ করায় সন্তানদের কোন অমঙ্গল ঘটতে পারে, তবে আমি তার যিম্মাদার হলাম।

এরপর আমি আমার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু দাওস সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণে গড়িমসি করতে লাগল। আমি দ্বিতীয়বার মক্কা মুকাররামায় তাঁর

---

১. এটা ইসলামের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে,এর প্রতিটি নির্দেশ ইনসাফপূর্ণ ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী। উগ্রতা ও শৈথিল্য থেকে পবিত্র। প্রতিটি নির্দেশেই মধ্যম পন্থা, বিবেচনা প্রসূত ও ভারসাম্যপূর্ণ। উদাহরণত ইসলাম শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না আবশ্যিক করেছে, আর না ক্ষমা করাকে আবশ্যিক করেছে; বরং প্রতিশোধ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে এবং ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করেছে। আর ক্ষমাকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী বলেছে। ইসলাম জনসাধারণের জন্য অপব্যয় ও কার্পণ্য উভয়কেই নিষিদ্ধ আখ্যায়িত করেছে। অপচয় এবং অপব্যয়ও নয়, আর কিপটেপণাও নয়, বরং যেন ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকে। আর যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ নির্ভরতা ও বৈরাগ্যে এতই মগ্ন যে, সম্পদ থাকা আর না থাকাটা তাদের দৃষ্টিতে একইরূপ, এই মহাপুরুষদের জন্য ইসলাম অনুমতি দিয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের সমুদয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে পারেন। এভাবে চিন্তা করুন।

খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, হে আল্লাহর নবী ! দাওস সম্প্রদায়[1] ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করেনি, আপনি তাদের বদ-দু'আ করুন। তিনি (সা) হাত তুলে এ দু'আ করলেন : اللهم اهد دوسا وائت بهم "আয় আল্লাহ দাওস সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান কর এবং মুসলমান বানিয়ে এখানে প্রেরণ কর।" আর আমাকে (তুফায়ল রা. কে) বললেন, যাও, নম্রভাবে ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাও। হযরতের পরামর্শ অনুসারে আমি লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে থাকলাম। সপ্তম হিজরী পর্যন্ত সত্তর অথবা আশিটি পরিবারের লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিল। আমি তাদের সাথে নিয়ে সপ্তম হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম।

মক্কা বিজয়ের পর আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম যে, আমর ইবন হামীমার মূর্তি ও মণ্ডপ (যুল-কফিন) জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলে তুফায়ল সেখানে গিয়ে মূর্তিগুলো জ্বালিয়ে দেন। মূর্তি জ্বালিয়ে দেয়ার সময় তিনি নিচের বাক্যগুলো পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন :

يا ذا الكفين لست من عبادك * ميلادنا اكبر من ميلادك *

انى خشوت النار فى فؤادك

"হে যুল-কফিন, আমি তোমার পূজাকারীদের মধ্যে নই, আমার জন্ম হয়েছে তোমার জন্মের পূর্বে; আমি তোমার মধ্যে প্রচুর আগুন ভরে দিয়েছি।"

সম্প্রদায়ের অর্ধেক লোক তো পূর্বেই মুসলমান হয়ে গেছে, অবশিষ্ট লোক মূর্তি জ্বালানোর পর শিরক ও মূর্তি পূজা থেকে তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, হযরত তুফায়ল (রা) যখন আপন সম্প্রদায়ে গিয়ে পৌঁছেন, তখন অন্ধকার রাত ছিল ও বৃষ্টি হচ্ছিল, পথ দেখা যাচ্ছিল না। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা এ নূর সৃষ্টি করেন। লোকেরা তা দেখে খুবই আশ্চর্য হলো এবং হযরত তুফায়লকে ঘিরে ধরল। তার চাবুকটি ছুয়ে দেখতে শুরু করল। এ নূর মানুষের আঙ্গুলে চমকাচ্ছিল।

অন্ধকার রাত হলে চাবুকটি এভাবেই আলোকিত হয়ে উঠত। এ কারণে হযরত তুফায়ল (রা) طفيل ذى النور (আলোকধারী) উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[2]

কারামত প্রসঙ্গে

আল্লাহর ওলীদের কারামত আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালামের মু'জিযার নমুনা হয়ে থাকে। যেমনভাবে আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী আলিমগণ নবী (আ)গণের ওয়ারিস,

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, ঐ সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ছাড়া কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২৬)।

২ আল-ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ২৩১; আল-ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২২৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৬।

ঠিক তেমনিভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে কারামতের সোপান ও প্রকৃতির অলৌকিকত্বের নিমিত্ত তাঁরা নবী (আ)গণের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, العلماء ورثة الانبياء "আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী।" কাজেই হযরত তুফায়ল (রা)-এর এ কারামত হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযা হাতের ঔজ্জ্বল্য-এর একটি উদাহরণ বলে অনুমিত হয়। আল্লাহই অধিক প্রজ্ঞাশীল।

উপরন্তু, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা তাহরীমে সাহাবা কিরাম (রা)-এর ব্যাপারে ইরশাদ করেন :

يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীদের অপদস্থ করবেন না। তাদের সামনে ও ডানে নিজেদের নূর ধাবিত হবে।" (সূরা তাহরীম : ৮)

আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, হযরত তুফায়ল (রা)-এর এই নূর ঐ নূরের নমুনা, যা কিয়ামতের দিন হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) কে বিশেষভাবে দেয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ দু'আর বদৌলতে হযরত তুফায়ল (রা) কে এ নূর পৃথিবীতেই দেখানো হয়েছে। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন এবং তাঁর জানাটাই পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত।[১]

ইসরা ও মি'রাজ

তায়েফ[২] থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ জাল্লা শানুহু নবী করীম (সা) কে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং মসজিদে আকসা থেকে সপ্তাকাশ পর্যন্ত এ দেহ-আত্মায় জাগ্রত অবস্থায় একই রাতে সফর করান, একেই ইসরা ও মি'রাজ নামে অভিহিত করা হয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ মু'জিযা অধ্যায়ে আসবে। তাঁর মি'রাজ সফরের ব্যাপারে কোন্ বছর এ তা অনুষ্ঠিত হয়েছে আলিমগণের মধ্যে এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে।

এ প্রসঙ্গে আলিমগণের দশটি বক্তব্য আছে। যেমন

১. হিজরতের ছয় মাস পূর্বে মি'রাজ হয়েছে;

২. হিজরতের আট মাস পূর্বে;

৩. হিজরতের এগার মাস পূর্বে;

৪. হিজরতের এক বছর পূর্বে;

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৪খ. পৃ. ১৭৫; সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৩৫; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৩৫; দালায়িলে আবূ নুয়াইম, ১খ. পৃ. ৭৮; আল-ইসাবা, ২খ. পৃ. ২২০।

২. হাফিয ইবন কায়্যিম যাদুল মা'আদে তায়েফ সফরের ঘটনা বর্ণনার পর লিখেছেন, এরপরে তাঁর মি'রাজ হয়েছে। যা দ্বারা এটা জানা গেল যে, হাফিয ইবন কায়্যিমের নিকট ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর সংঘটিত হয়।

৫. হিজরতের এক বছর দু'মাস পূর্বে;
৬. হিজরতের এক বছর তিন মাস পূর্বে;
৭. হিজরতের এক বছর পাঁচ মাস পূর্বে;
৮. হিজরতের এক বছর ছয় মাস পূর্বে;
৯. হিজরতের তিন বছর পূর্বে;
১০. হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে।

এ সমুদয় বক্তব্য বিস্তারিতভাবে ফাতহুল বারীর 'মি'রাজ' অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। প্রসিদ্ধ বক্তব্য হলো, হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর এবং আকাবার বায়'আতের পূর্বে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে। যেমন প্রথমোক্ত আটটি বক্তব্য এর উপর একমত যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর ওফাতের পর মি'রাজ হয়েছে। অধিকাংশ আলিম এ মতই পোষণ করেন। উপরন্তু, এ বক্তব্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত খাদীজা (রা) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন। আর এটাও স্বীকৃত যে, হযরত খাদীজা (রা) শে'বে আবূ তালিবে নবী (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। শে'বে আবূ তালিব থেকে বেরিয়ে আসার পর তিনি ইনতিকাল করেন। আর এটা পূর্বেই জানা গেছে যে, তিনি (সা) এবং তাঁর সঙ্গীগণ শে'বে আবূ তালিব থেকে দশম নববী বর্ষে বেরিয়ে আসেন। কাজেই এ সমুদয় বিবরণ থেকে এ ফলাফল বেরিয়ে আসে যে, মি'রাজ দশম নববী বর্ষের পর একাদশ নববী বর্ষে তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কোন এক মাসে সংঘটিত হয়েছে। এবারে বাকী রইল কোন্ মাসে তা হয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী, রজব অথবা রমযান কিংবা শাওয়াল মাসে হয়েছে—এ পাঁচটি বক্তব্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতামত এটাই যে, রজব মাসের সাতাশের রাতে হয়েছে। শারহে মাওয়াহিব (১খ. পৃ. ৩০৭) পর্যালোচনার পর আমার কাছে এটাই প্রতিভাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

সূক্ষ্ম কথা

দশম নববী বর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে, বিপদ এবং পরীক্ষার সমস্ত পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে, অপমান-অপদস্থতার এমন কোন শাখা অবশিষ্ট ছিল না, যা মহান আল্লাহর রাহে বরদাশত করা হয়নি। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের পথে অপমান আর নির্যাতনের প্রতিদান সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং মিরাজ ও উন্নতি ছাড়া আর কী হতে পারে?

কাজেই যখন শে'বে আবূ তালিবে এবং তায়েফ সফরে অপমান-অপদস্থতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ইসরা ও মি'রাজের অতুলনীয় সম্মান ও ইযযতে তাঁকে ভূষিত করেন। এতে তিনি তাঁকে এতদূর ঊর্ধ্বে উঠান যে,

শ্রেষ্ঠ কৈটেপ্রাপ্ত ফেরেশতা[১] হযরত জিবরাঈল (আ)-ও তাঁর পিছনে থেকে যান। তাঁকে এমন স্থান পর্যন্ত ভ্রমণ করান, যা চূড়ান্ত অর্থাৎ আরশে আযীম পর্যন্ত।

এ কারণে কিছু বিজ্ঞ ব্যক্তির বক্তব্য হলো, আরশ পর্যন্ত সফর করানো খাতামুন নুবূয়াতের প্রতিই ইঙ্গিতবহ। কেননা সমগ্র বিশ্ব আরশে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পবিত্র কুরআন এবং সুন্নাহ (হাদীস) দ্বারা আরশের পর কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে নবূয়াত ও রিসালাতের সমগ্র পরিপূর্ণতার সমাপ্তি তাঁর মাধ্যমে ঘটেছে। এটা বুঝে নিন এবং এর উপর দৃঢ় থাকুন।

মি'রাজের বিস্তারিত বিবরণ

মহান আল্লাহ্ বলেন :

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

"পবিত্র ঐ মহান সত্তা, যিনি স্বীয় বিশিষ্ট বান্দা [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) কে] রাত্রির সামান্যতম সময়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করান, যার গোটা পরিবেশকে আমি (আল্লাহ্) বরকতবিমন্ডিত করেছি। আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর এ সফরের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে আসমানে ভ্রমণ করানো এবং সেখানকার বিশেষ বিশেষ নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করানো" যার কিছু কিছু আল্লাহ্ সূরা নাজম[২] -এ উল্লেখ করেছেন, তা শেষ নবী (সা)-এর জন্য ছিল এক অনন্য সম্মান। তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং সেখানে জান্নাত ও জাহান্নাম এবং অপরাপর সৃষ্টি বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করেন। মূলত প্রকৃত শ্রোতা এবং প্রকৃত দর্শক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, তিনি যাকে চান স্বীয় কুদরতের নিশানা দেখান। তখন ঐ বান্দা আল্লাহর দৃষ্টিতে দেখেন এবং আল্লাহর শ্রবণে শ্রবণ করেন।

---

১. তাবারানী বর্ণিত ঐ যঈফ হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

عن ابن عباس (رضـ) قال قال رسول الله الا اخبركم بافضل الملائكة جبرائيل

"হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি কি তোমাদের এ খবর দেব না যে, সর্বোত্তম ফিরিশতা হলেন জিবরাঈল (আ) ।" (রূহুল মা'আনী, ১খ. পৃ. ৩০১)

২ যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ۝ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۝ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۝ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ۝ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى

"নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি ছিল যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার, তা দ্বারা আচ্ছাদিত, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার সৃষ্টিকর্তার মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল। (সূরা নাজম ঃ ১৩-১৮)।

আলিমগণের পরিভাষায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে ইসরা বলে এবং মসজিদে আকসা থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত ভ্রমণকে মি'রাজ বলে। আর এ সময়ের সম্পূর্ণ সফরকে ইসরা ও মি'রাজ শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন। মি'রাজকে এজন্যে মি'রাজ বলা হয় যে, মি'রাজ অর্থ সিঁড়ি। মসজিদে আকসায় পৌঁছার পর নবী (সা)-এর জন্য জান্নাত থেকে একটি সিঁড়ি আনা হয়েছিল যার মাধ্যমে তিনি আসমানে আরোহণ করেন। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে এ সিঁড়ির উল্লেখ এসেছে।[১] পবিত্র কুরআনে তো এ ঘটনা মোটামুটি এভাবেই উল্লিখিত আছে। অবশ্য হাদীসসমূহে এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে যার সার-সংক্ষেপ এরূপ :

এক রাতে নবী করীম (সা) হযরত উম্মে হানী (রা)-এর ঘরে শুয়ে আরাম করছিলেন। অবস্থা ছিল অর্ধ নিদ্রা অর্ধ জাগরণের মত, এমতাবস্থায় ঘরের ছাদ ফেটে গেল এবং ছাদ থেকে হযরত জিবরাঈল (আ) অবতরণ করলেন আর তাঁর সাথে আরো ফিরিশতা ছিলেন। তাঁরা তাঁকে জাগালেন এবং মসজিদে হারামের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি হাতীমে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) এবং হযরত মিকাঈল (আ) এসে তাঁকে জাগালেন ও যমযম কূপের পাড়ে নিয়ে গেলেন। আর সেখানে শুইয়ে সিনা চাক করলেন এবং কলব বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। আর একটি স্বর্ণের তশতরি আনা হলো যা ঈমান ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিল। ঐ ঈমান ও জ্ঞান তাঁর কলবে ভরে দিয়ে সিনা ঠিক করে দিলেন এবং দু'বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নুবুয়াত লাগানো হলো [যা নবী (সা)-এর শেষ নবী হওয়ার প্রামাণ্য ও প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল]। এরপর বুররাক আনা হলো। বুররাক একটি বেহেশতী পশুর নাম, যা খচ্চর থেকে কিছুটা ছোট এবং গাধা থেকে কিছুটা বড়, শ্বেতবর্ণের বিদ্যুৎ গতিতে চলৎশক্তিসম্পন্ন ছিল। যার একেকটি পদক্ষেপ দৃষ্টিসীমার বাইরে পড়ত। যখন তার পিঠে আরোহণ করা হলো, সে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে শুরু করল। জিবরাঈল (আ) বললেন, ওহে বুররাক, এ কেমন ঔদ্ধত্য! তোমার পিঠে আজ পর্যন্ত নবী (সা) অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন কোন বান্দা আরোহণ করেনি। এতে বুররাক লজ্জায় ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে গেল এবং নবীজীকে নিয়ে রওয়ানা হলো। জিবরাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। এহেন মর্যাদার সঙ্গে নবী (সা) রওয়ানা হলেন। আর কতিপয় রিওয়ায়াতে জানা যায়, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা) কে বুররাকে আরোহণ করান আর নিজে নবী করীম (সা)-এর 'রাদীফ' অর্থাৎ বুররাকে তাঁর পিছনে আরোহণ করেন। (দ্র. যারকানী ও খাসাইসুল কুবরা, মি'রাজ অধ্যায়)।

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৩৩, ৫৫।

হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল মকবূল (সা) বলেছেন ঃ আমি এমন জমি অতিক্রম করলাম যেখানে প্রচুর খেজুর গাছ ছিল। জিবরাঈল আমীন বললেন, এখানে অবতরণ করে নফল নামায আদায় করুন। আমি সেখানে নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনার কি জানা আছে, এটা কোন্ জায়গায় নামায আদায় করলেন ? আমি বললাম, না, আমার জানা নেই। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি ইয়াসরিব অর্থাৎ পবিত্র মদীনায় নামায আদায় করলেন, যেখানে আপনি হিজরত করবেন।

এরপর রওয়ানা হয়ে অপর একটি স্থানে পৌঁছলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানেও নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি সিনাই মরুভূমিতে হযরত মূসা (আ)-এর এলাকার সন্নিকটে নামায আদায় করলেন, যেখানে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

অতঃপর আরেকটি ভূমি অতিক্রমকালে জিবরাঈল (আ) বললেন, এখানে নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি মাদাইনে নামায আদায় করলেন [যা হযরত শুয়াইব (আ)-এর আবাসস্থল ছিল]।

সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে অপর একটি স্থানে পৌঁছলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, নেমে নামায আদায় করুন। আমি নেমে নামায আদায় করলাম। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা বায়তুল-লাহ্ম (বেথেলহেম) যেখানে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম হয়েছিল। [ইবন আবূ হাতিম, বায়হাকী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এ হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন, বাযযার ও তাবারানী হযরত শাদ্দাদ ইবন আওস (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন]।[1]

واما قصة الصلاة بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام فقد اخرجها النسائ عن انس بن مالك رضه

আর মূসা (আ) কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার স্থান সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে নামায আদায়ের ঘটনা ইমাম নাসাঈ হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন; যেমনটি বর্ণিত হয়েছে খাসাইসুল কুবরায়, (১খ. পৃ. ১৫৩)। উপরন্তু এ সমুদয়ের বিশদ বর্ণনা আল্লামা যারকানীর শারহে মাওয়াহিব, (৬খ. পৃ. ৩৯)-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈচিত্র্যময় সফর এবং আলমে মিসালের উপমাহীন নিদর্শন

১. তিনি (সা) বুররাকে সওয়ার হয়ে চলছিলেন, পথিমধ্যে একটি বৃদ্ধাকে অতিক্রম

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৮; ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৫৩।

করলেন, সে তাঁকে আহ্বান করল। জিবরাঈল (আ) বললেন, আগে চলুন, আর ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। অগ্রসর হয়ে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হলো। সেও নবীজী (সা)-কে আহ্বান জানাল। জিবরাঈল (আ) বললেন, সামনে অগ্রসর হোন। এবার সামনে অগ্রসর হয়ে একটি দলকে অতিক্রম করলেন, যারা তাঁকে নিম্নোক্ত বাক্যে সালাম জানালেন :

السلام عليك يا اول السلام عليك يا اخر السلام عليك يا حاشر

পনাকে সালাম হে প্রথম, আপনাকে সালাম হে শেষ, আপনাকে সালাম হে একত্রকারী !"

জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি ওদের সালামের উত্তর দিন। আর কিছুক্ষণ পর বললেন ঐ বৃদ্ধা মহিলা যে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল, সে ছিল পৃথিবী। পৃথিবীর বয়স এত অল্পই অবশিষ্ট আছে, যতটুকু এ বৃদ্ধা মহিলার আয়ূ অবশিষ্ট আছে। আর ঐ বৃদ্ধ পুরুষটি ছিল শয়তান। এদের উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল আপনাকে ওদের প্রতি আকৃষ্ট করা। আর ঐ জামায়াত, যারা আপনাকে সালাম জানালেন, তারা ছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা এবং হযরত ঈসা (আ)। হাদীসটি ইবন জারীর ও বায়হাকী হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১]

২. সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) বলেন, শবে মি'রাজে আমি মূসা (আ) কে অতিক্রমকালে দেখলাম, তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন।[২]

আর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেন, শবে মি'রাজে আমি হযরত মূসা (আ), দাজ্জাল এবং দোযখের দারোগা, যাকে মালিক বলা হয়, তাকে দেখেছি। বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে : ولينظر هل كانت هذه الروية فى الارض او فى السماء والله اعلم "এ দৃশ্য তিনি যমীনে দেখেছেন নাকি আসমানে, আল্লাহই ভাল জানেন।"[৩]

৩. এমনকি পথিমধ্যে তিনি এমন একটি সম্প্রদায় অতিক্রম করেন, যাদের নখগুলো তামার তৈরি ছিল। আর তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ ঐ নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছিল। নবী (সা) এদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল (আ) বলেন, এরা ঐ সমস্ত লোক, যারা মানুষের মাংস খেত, অর্থাৎ মানুষের গীবত করত ও তাদের ইযযত-আব্রু (গোপনীয়তা) ফাঁস করে দিত। আহমদ ও আবূ দাউদ হযরত আনাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[৪]

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৫; তাফসীরে ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৮০।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৬।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬০।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৬।

৪. নবী (সা) এরপর এক ব্যক্তিকে দেখেন, সে একটি ঝর্ণায় সাঁতার কাটছে এবং পাথরকে গ্রাস বানিয়ে আহার করছে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দেন, এ সুদখোর। ইবন মারদুবিয়া হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন।

৫. অতঃপর তিনি (সা) এমন এক সম্প্রদায় অতিক্রম করেন যারা একই দিনে বীজ বুঁনছে এবং একই দিনে ফসলও কাটছে। আর কাঁটার পর ক্ষেত পুনরায় পূর্বের মত হয়ে যাচ্ছে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করেন, এ কেমন ব্যাপার ! জিবরাঈল আমীন বললেন, এরা আল্লাহর পথে জিহাদকারী, এদের একটি নেকী সাতশত গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পায়। তারা এর যা কিছুই ব্যয় করেছে, আল্লাহ্ তাআলা তার উত্তম বিনিময় দান করেন। এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায় অতিক্রম করেন যাদের দেহ পাথর দিয়ে থেঁতলে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই তা পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বারবার একই ব্যাপার ঘটছে, কখনো শেষ হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা ফরয নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শনকারী।

এরপর একদলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের লজ্জাস্থানের সামনে পেছনে সামান্য বস্ত্রখণ্ড জড়ানো আছে। আর তারা উট ও গরুর মত চরিয়ে বেড়াচ্ছে। 'দারী' ও 'যাক্কুম' অর্থাৎ কাঁটা এবং জাহান্নামের পাথর খাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা নিজেদের সম্পদের যাকাত দিত না। এরপর তিনি এমন একটি সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, যাদের সামনে এক হাঁড়িতে রান্না করা গোশত আর অন্য হাঁড়িতে কাঁচা ও পচা গোশত রাখা ছিল, এ লোকগুলো পচা গোশতগুলো খাচ্ছিল এবং রান্না করা গোশত খাচ্ছিল না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সব লোক, যাদের ঘরে সতী-সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ব্যভিচারিণী ও দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সাথে রাত্রি যাপন করে এবং সকাল পর্যন্ত তাদের কাছেই থাকে। অথবা আপনার উম্মতের ঐ সব স্ত্রীলোক যারা নিজেদের বৈধ ও পবিত্র স্বামীদের ছেড়ে কোন ব্যভিচারী ও দুশ্চরিত্র লোকের সাথে রাত কাটায়। এর পর তাঁকে এমন একটি কাঠের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল যা রাস্তার মধ্যস্থলে, কাপড় কিংবা অন্য কোন দ্রব্যই এর নিকট দিয়ে গেলে এটি তাকে চিরে ফেলে এবং টুকরা টুকরা করে ফেলে। তিনি জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত লোকের উদাহরণ, যারা পথের পাশে ওঁৎ পেতে থাকে এবং পথচারীদের ছিনতাই রাহাজানি করে।

এরপর তাঁকে এমন একটি দলের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, যারা কাঠের একটি ভারী বোঝা একত্র করেছে, যা তারা বহন করতে সক্ষম নয়। অথচ তারা তা আরো বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কি ? জিবরাঈল (আ) বললেন,

এরা আপনার উম্মতের ঐ সমস্ত লোক, যাদের উপর আমানতদারী ও লোকের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের দায়িত্ব ছিল, যা তারা পালন করেনি। কাজেই সে বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছে। অতঃপর তিনি এমন একটি দল অতিক্রম করলেন, যাদের ঠোঁট ও জিহ্বা কেঁচি দিয়ে কর্তন করা হচ্ছে। আর কাটার পরক্ষণেই তা পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। এভাবে অবিরত চলছে যা শেষ হচ্ছে না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা ? জিবরাঈল (আ) বললেন, এরা আপনার উম্মতের খতীব ও ওয়ায়েয (যারা নিজেরা যা বলত, তা করত না—এর উদাহরণ) অর্থাৎ অপরকে ওয়ায-নসীহত করত কিন্তু নিজেরা আমল করত না। ইবন জারীর, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী এ হাদীস হযরত বারীরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[১] লোহার কেঁচি দিয়ে ঠোঁট কর্তনের হাদীসটি ইবন মারদুবিয়া হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। এরপর তিনি এমন একটি স্থান অতিক্রম করেন, যেখানে শীতল ও সুগন্ধিযুক্ত বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা জান্নাতের খুশবু। পরক্ষণেই এমন স্থান অতিক্রম করলেন, যেখানে দুর্গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। জিবরাঈল বললেন, এটা জাহান্নামের দুর্গন্ধ।[২]

সতর্ক বাণী দৃশ্যত এতদ সমুদয় ঘটনা আসমানে উত্থিত হওয়ার পূর্বের, এজন্যে যে, এ সমস্ত ঘটনার উল্লেখ বুররাকে আরোহণের পরে ধারাবাহিকভাবে মসজিদে আকসায় পৌঁছার পূর্বে এসেছে। এর ফলে জানা গেল যে, এ সমস্ত আসমানে আরোহণের পূর্বের। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ[৩]

মোট কথা, এ অবস্থায় নবী (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছলেন এবং সেখানে অবতরণ করলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বুররাককে সেই স্তম্ভের সাথে বাঁধলেন যাতে (পূববর্তী) নবী (আ)গণ নিজেদের বাহন বাঁধতেন। আর বাযযারের বর্ণনায় রয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) আঙ্গুল দিয়ে একটি পাথর ছিদ্র করে তার সাথে বুররাক বাঁধেন। আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, বুররাক বাঁধায় উভয়েই অংশীদার ছিলেন। সম্ভবত কালের বিবর্তনে ঐ ছিদ্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং জিবরাঈল (আ) আঙ্গুল দিয়ে তা খুলে দেন।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২; যুরকানী,৬খ. পৃ. ৪১।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২।

৩. যেমনটি নাসাঈ হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন [রাসূল (সা) বলেছেন] অতঃপর আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করি। সেখানে আম্বিয়া আলাইহিমুস-সালাম একত্রিত হয়েছিলেন। জিবরাঈল (আ) আমাকে এগিয়ে দেন। আর আমি তাঁদের ইমামতি করি। (ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৯)।

এরপর নবী (সা) মসজিদে আকসায় প্রবেশ করেন এবং দু'রাকআত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ)[১] নামায আদায় করেন (মুসলিম হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন)। আর যারকানীতে (৬খ. পৃ. ৪৫) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি এবং জিবরাঈল আমীন উভয়েই মসজিদে প্রবেশ করি এবং উভয়েই দু'রাকআত নামায আদায় করি (বায়হাকী)।[২]

তাঁর মহান উপস্থিতি উপলক্ষে পূর্বেই আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম[৩] নবী (সা)-এর অপেক্ষায় উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-ও ছিলেন।[৪]

সামান্য সময় অতিক্রান্ত না হতেই অনেক সম্মানিত ব্যক্তি মসজিদে আকসায় সমবেত হলেন। অতঃপর এক মুয়াযযিন আযান দিলেন এবং ইকামত বললেন। আমরা কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, এ অপেক্ষায় ছিলাম যে, কে ইমামতি করবেন। জিবরাঈল আমীন আমার হাত ধরে সামনে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সবাইকে নামায পড়ালাম। যখন আমি নামায শেষ করলাম, জিবরাঈল আমীন বললেন, আপনি জানেন কি, কাদের আপনি নামায পড়ালেন? আমি বললাম, আমার জানা নেই। জিবরাঈল আমীন বললেন, যত নবী প্রেরিত হয়েছেন, সবাই আপনার পেছনে নামায পড়েছেন। ইবন আবূ হাতিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অপর এক রিওয়ায়াতে আছে যে, তাঁর আগমনে ফিরিশতাগণও আসমান থেকে অবতরণ করেন; আর নবী (সা) সমস্ত নবী (আ) এবং ফিরিশতাগণের ইমামতি করেন। যখন নামায সমাপ্ত হলো, তখন ফেরেশতাগণ জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার এ সাথীটি কে? জিবরাঈল বললেন, তিনি মুহাম্মদ (সা)। হাদীসটি ইবন জারীর, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী আবুল আলিয়া সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর অপর এক বর্ণনায় আছে, জিবরাঈল বললেন, তিনি মুহাম্মদ (সা), খাতিমুন নাবিঈন। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছিল? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতাগণ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিরাপদে জীবিত রাখুন, অত্যন্ত উত্তম ভাই এবং উত্তম খলীফা। অর্থাৎ আমাদের ভাই এবং আল্লাহর খলীফা। এরপর নবী (সা) আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের রূহসমূহের সাথে সাক্ষাত করলেন। তাঁরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করলেন।

---

১. 'বায়নাল কাওসাইন' (بين القوسين) মুসলিম শরীফে নেই। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭২)।

২. তাফসীরে ইবন কাসীর, ৬খ. পৃ. ৩০২।

৩. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৫০।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৭।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসা

হযরত ইবরাহীম (আ) এ বাক্য দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করলেন

الحمد لله الذى اتخذنى خليلا واعطنى ملكا عظيما وجعلنى امة قانتا يؤتم بى وانقذنى من النار وجعلها على بردا وسلاما

"প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে তাঁর বন্ধু বানিয়েছেন আর আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন এবং ইমাম ও নেতা বানিয়েছেন এবং আগুনকে আমার জন্য শীতল ও শান্তিদায়ক করেছেন।"

হযরত মূসা (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى كلمنى تكليما وجعل هلاك ال فرعون ونجاة بنى اسرائيل على يدى وجعل من امتى قوما يهدونى بالحق وبه يعدلون

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি বিনা মাধ্যমে আমার সাথে কথা বলেছেন এবং ফিরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নকরণ ও বনী ইসরাঈলের পথ প্রদর্শন আমার হাতে করেছেন। আর আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক গোষ্ঠী তৈরি করেছেন, যারা সত্যপন্থি, সৎ পথ প্রদর্শন ও ইনসাফ করে থাকে।"

হযরত দাউদ (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيما و علمنى الزبور ولى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير واعطانى الحكمة وفصل الخطاب

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন, আমাকে যবুর কিতাব শিখিয়েছেন, লোহাকে আমার জন্য নরম করেছেন, পাহাড় ও পক্ষীকুলকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমার সাথে তারা তাসবীহ পাঠ করে। আমাকে বিদ্যা ও জ্ঞান দান করেছেন এবং মনোমুগ্ধকর বক্তব্য পেশ করার ক্ষমতা আমাকে দান করেছেন।"

হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى سخرلى الرياح و سخرلى الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات وعلمنى منطق الطير واتانى من كل شئى فضلا وسخرلى جنود الشياطين والانس والطير وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين واتانى ملكا عظيما لاينبغى لاحد من بعدى وجعل ملكى ملكا طيبا ليس فيه حساب

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি বায়ু, শয়তান ও জিন্নকে আমার অনুগত করেছেন যাতে তারা আমার নির্দেশমত চলে এবং পাখির ভাষা আমাকে শিখিয়েছেন। আর মানুষ-জিন্ন, পশু-পাখির সৈন্যদের আমার অনুগত করেছেন। আমাকে এমন বাদশাহী দান করেছেন যে, আমার পরে আর কাউকে এরূপ দেয়া হবে না আর এর জন্য আমার কোন হিসাব-নিকাশও নেয়া হবে না।"

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى جعلنى كلمة وجعل مثلى مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وجعلنى اخلق من الطين كهئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وجعلنى ابرئ الاكمه والابرص واحى الموتى باذن الله ورفعنى وظهرنى واعاذنى وامى من الشيطان الرجيم فلم يكن للشيطان علينا سبيل

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে তাঁর বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, হযরত আদম (আ)-এর মত আমাকে পিতা ব্যতিত সৃষ্টি করেছেন। পাখি সৃষ্টি করার, মৃতকে জীবিত করার এবং কুষ্ঠরোগী ও মাতৃগর্ভ থেকে অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণকারীকে নিরাময় করার মুজিযা আমাকে দান করেছেন। আমাকে ইঞ্জিল কিতাব দান করেছেন, আমাকে এবং আমার মাতাকে শয়তানের প্রভাব থেকে নিরাপদ রেখেছেন, আমাকে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং কাফিরদের সাহচর্য থেকে আমাকে পবিত্র রেখেছেন।"

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসা

الحمد لله الذى ارسلنى رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وانزل على الفرقان فيه بيان لكل شيئ وجعل امتى خير امة اخرجت للناس وجعل امتى هم الاولين والاخرين وشرح لى صدرى ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلنى فاتحا وخاتما

"প্রশংসা সেই মহান পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত তথা অনুগ্রহ স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়েছেন, আমার প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন যাতে তিনি দীনের সমস্ত নির্দেশাবলী, বিস্তারিত অথবা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। আমার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন এবং আমার উম্মতকে প্রথম ও শেষ উম্মত অর্থাৎ প্রকাশে শেষ ও মর্যাদায় প্রথম বানিয়েছেন। আমার বক্ষ উন্মোচন করেছেন এবং আমার স্মরণকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। আর আমাকে সূচনাকারী ও সমাপ্তকারী অর্থাৎ মূল ও আত্মা সৃষ্টিতে প্রথম এবং দৈহিক প্রকাশে সর্বশেষ বানিয়েছেন।"

হযরত নবী (সা) আল্লাহর প্রশংসা ভাষণ থেকে অবসর হলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ) সমস্ত নবী (আ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন : بهذا افضكم محمد ﷺ অর্থাৎ মর্যাদা ও পরিপূর্ণতার কারণে মুহাম্মদ তোমাদের সবার চেয়ে অগ্রগামী।[১]

যখন তিনি এসব সমাপ্ত করে মসজিদ আকসা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সামনে তিনটি পেয়ালা উপস্থিত করা হলো।[২] একটি পানির, একটি দুধের এবং একটি শরাবের, তিনি দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি স্বভাব ধর্ম বেছে নিলেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। আর যদি আপনি পানির পেয়ালা গ্রহণ করতেন তা হলে আপনার উম্মত নিমজ্জিত হয়ে যেত। কিছু কিছু রিওয়ায়াতে আছে—মধুর পেয়ালাও দেয়া হয়েছিল, তিনি তা থেকেও কিছু পান করেছিলেন।

মোটকথা, সমুদয় বর্ণনা একত্র করা হলে জানা যায় যে, চারটি পেয়ালা উপস্থিত করা হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য 'যারকানী' গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে।[৩]

আসমানে আরোহণ

এর পর নবী (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) এবং অপরাপর ফিরিশতাগণের সঙ্গে আসমানের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। কিছু কিছু রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, নবী (সা) পূর্বের ন্যায় বুররাকে আরোহণ করেই আসমানে উঠতে থাকেন। আর কিছু রিওয়ায়াতে জানা যায়, মসজিদে আকসায় পৌঁছার পর জান্নাত থেকে মণিমুক্তা খচিত একটি সিঁড়ির মাধ্যমে তিনি আসমানে আরোহণ করেন। আর সিঁড়ির ডানে বামে আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর সহগামী ছিলেন।

قال ابن اسحاق واخبرنى من لايتهم عن ابى سعيد قال سمعت رسول ﷺ يقول لما فرغت مما فرغت مما كان فى بيت المقدس اتى بالمعراج ولم ار شياء قط احسن منه وهو الذى يمد اليه ميتكم عليه اذا حضر فاصعدنى فيه صاحبى حتى انتهى بى الى باب من ابواب السماء يقال له باب الحفظة الحديث

"ইবন ইসহাক বলেন, বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলতেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ (সা)

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৩।

২. কিছু কিছু রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, এ তিন পেয়ালা সিদরাতুল মুনতাহার পরে উপস্থিত করা হয়েছিল। হাফিয ইবন হাজার বলেন, আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, এ পেয়ালা দু'বার উপস্থিত করা হয়েছিল, একবার মসজিদে আকসায় নামায আদায় সমাপ্তের পর এবং দ্বিতীয়বার সিদরাতুল মুনতাহায়। আর দুধ গ্রহণের বিষয়টি সত্যায়নের জন্য অতিরিক্ত তাকিদ উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন। (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৪৮)।

৩. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৪৭।

কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যখন আমি বায়তুল মুকাদ্দাসের ক্রিয়াকর্ম সমাপ্ত করলাম, তখন একটি সিঁড়ি আনা হলো। আমি এর চেয়ে উত্তম সিঁড়ি আর কখনো দেখিনি। এটা ঐ সিঁড়ি ছিল, যা দ্বারা আদম সন্তানের আত্মাসমূহ আসমানে উঠে এবং মৃত্যুকালে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি ঐ দিকে চক্ষু তুলে দেখে। আমার পথের সাথী জিবরাঈল (আ) আমাকে ঐ সিঁড়িতে উঠান। এমনকি আমি আসমানের একটি দরজায় উপস্থিত হলাম, যাকে 'বাবুল হিফয' বলে। (হাফিয ইবন কাসীরকৃত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১০ এবং যারকানী প্রণীত শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ৫৫)।

হাফিয ইবন কাছীর[১] বলেন, হযরত (সা) বায়তুল মুকাদ্দাসের কর্মব্যস্ততা থেকে অবসর হওয়ার পর ঐ সিঁড়ি দিয়ে আসমানে গমন করেন এবং বুররাক মসজিদুল আকসার দরজায় বাঁধা ছিল। নবী (সা) আসমান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে এসে অবতরণ করেন এরপর ঐ বুররাকে সওয়ার হয়ে মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করেন (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১১০)। আর এটাও সম্ভব যে, নবী (সা) বুররাকে সওয়ার অবস্থায়[২] ঐ সিঁড়ির দ্বারা আসমানে আগমন করেন, যেমনটি কতিপয় আলিমের মতামত। এ অবস্থায় সমস্ত বর্ণনা একই রূপ হয়ে যায়। অধিকন্তু, এ অবস্থা নবী (সা)-এর অধিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের অনুকূল। আল্লাহই ভাল জানেন।

আলমে মালাকূত সফর এবং আসমানসমূহে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের সাথে সাক্ষাত

এভাবে তিনি প্রথম আসমানে উপনীত হন। জিবরাঈল (আ) দরজা খোলান। পৃথিবীর নিকটতম আসমানের দারোয়ান জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কে ? জিবরাঈল বললেন, মুহাম্মদ (সা)। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করেন, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতা তা শুনে স্বাগত জানান এবং দরজা খুলে দেন। তিনি আসমানে প্রবেশ করেন এবং একজন অত্যন্ত বুযুর্গ ব্যক্তির দেখা পান। জিবরাঈল (আ) বললেন, তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আ), একে সালাম করুন। তিনি তাঁকে সালাম জানান। হযরত আদম (আ) সালামের জবাব দেন এবং বলেন : مرحبا بالابن الصالح والنبى للصالح "স্বাগতম, সৎ সন্তান ও সুশীল নবীর জন্য" এবং তিনি

---

১. আর এর ইবারত এরূপ : والمقصود انه ﷺ لما فرغ من امر بيت المقدس نصب له المعريج وهو السلم فصعد فيه الى الماء ولم يكن الصعود - على البراق كما يتوهمه بعض الناس بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع عليه الى مكة তাফসীরে ইবন কাসীর, সূরা বানী ইসরাঈল, ৬খ. পৃ. ২৮-এ আছে : ثم نزل الى البيت المقدس ثانيا وهم (اى انبياء) معه صلى بهم ثم انه ركب البراق وكر راجعا الى مكة والله اعلم বাক্যের শেষ পর্যন্ত।

২ আল্লামা নুমানী বলেন : ما المانع من انه ﷺ رقى المعراج فوق ظهر البراق بظاهر الحديث (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৩৩)।

তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। এ সময় তিনি দেখেন, হযরত আদম (আ)-এর ডানে কিছু আকৃতি এবং বামে কিছু আকৃতি। যখন তিনি ডানদিকে তাকান তখন আনন্দিত হন এবং হাসেন আর যখন বামদিকে তাকান, তখন কাঁদেন। হযরত জিবরাঈল বললেন, ডানদিকে তাঁর সৎ বংশধরদের আকৃতি। এরা দক্ষিণপন্থি ও জান্নাতী, এদেরকে দেখে তিনি আনন্দিত হন। আর বামদিকে খারাপ সন্তানদের আকৃতি আছে, এরা বামপন্থি এবং অগ্নিবাসী, এদের দেখে তিনি কাঁদেন। এ সমুদয় ঘটনা সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের বর্ণনাসমূহে আছে। আর মুসনাদে বাযযারে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, হযরত আদম (আ)-এর ডানদিকে একটি দরজা আছে, যেদিক থেকে উত্তম সুগন্ধি আসে আর একটি দরজা বাঁদিকে আছে, যেদিক থেকে খুবই দুর্গন্ধ আসে। যখন তিনি ডানদিকে তাকান, তখন আনন্দিত হন আর যখন বাঁদিকে তাকান বিমর্ষ হয়ে পড়েন (যারকানী, ৬খ. পৃ. ৬০)।

এরপর দ্বিতীয় আসমানে গমন করেন এবং ঐভাবেই জিবরাঈল (আ) দরজা খোলান। সেখানে যে দারোয়ান ছিলেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সাথে কে ? জিবরাঈল বললেন, মুহাম্মদ (সা)। ঐ ফেরেশতা বললেন, তাঁকে কি আহ্বান করা হয়েছে ? জিবরাঈল বললেন, হ্যাঁ। ফেরেশতা বললেন : مرحبا نعم المجئ جائر "স্বাগতম, কত উত্তম আগমন !" এখানে তিনি হযরত ইয়াহিয়া ও হযরত ঈসা (আ) কে দেখেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, এঁরা ইয়াহিয়া এবং ঈসা (আ), এঁদের সালাম করুন। তিনি তাঁদের সালাম জানালেন। তাঁরা দু'জনই সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন : مرحبا بالاخ الصالح والنبى الصالح "সুশীল ভ্রাতা ও সৎ নবীর জন্য স্বাগতম।" এরপর তিনি তৃতীয় আসমানে আগমন করেন এবং জিবরাঈল আমীন একইভাবে দরজা খোলান। সেখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয় এবং তাঁর সাথে একইভাবে সালাম-কালাম হয়। তিনি বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) কে লাবণ্য ও সৌন্দর্যের এক বিরাট অংশ দান করা হয়েছে। এরপর চতুর্থ আসমানে আগমন করেন, সেখানে হযরত ইদরীস (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। এরপর পঞ্চম আসমানে আগমন করেন এবং সেখানে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। ষষ্ঠ আসমানে আসেন এবং সেখানে হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। আর সপ্তম আসমানে আগমন করেন। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ হয়। তিনি দেখেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামূরে পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মামূর ফেরেশতাদের কিবলা, যা ঠিক কাবাগৃহের বরাবরে অবস্থিত। মোট কথা যদি সেটি ভেঙ্গে পড়ে, তা হলে কাবাগৃহের উপরেই পড়বে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা এ গৃহ তাওয়াফ করেন। একবার তাওয়াফের পর দ্বিতীয়বার তারা এ সুযোগ পান না। জিবরাঈল (আ) বললেন, তিনি আপনার পিতা, তাঁকে সালাম করুন। তিনি তাঁকে সালাম জানালেন। হযরত ইবরাহীম (আ) সালামের

জবাব দিলেন এবং বললেন : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح "স্বাগতম, নেক পুত্র এবং নেক নবীকে।"

সিদরাতুল মুনতাহা

এরপর তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হলো, যা সপ্তম আসমানের উপরে একটি কুলবৃক্ষ। পৃথিবী থেকে যা কিছু উপরে উত্থিত হয়, তা সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। এরপর আরো উপরে উঠানো হয়। আর ফেরেশতাকুল থেকে যা অবতীর্ণ হয়, তাও সিদরাতুল মুনতাহায় এসে স্থির হয়। এরপর নীচে অবতীর্ণ হয়। এ জন্যে এর নাম সিদরাতুল মুনতাহা।[১]

এ স্থানে নবী (সা) জিবরাঈল আমীনকে তাঁর প্রকৃত চেহারায় দেখেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অদৃশ্যপূর্ব ও অভাবনীয় নূরের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য ফেরেশতা, স্বর্ণ নির্মিত কীট-পতঙ্গ ও পাখি প্রত্যক্ষ করেন, যারা সিদরাতুল মুনতাহাকে ঘিরে রেখেছিল।

জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন

জান্নাত যেহেতু সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে : عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى এ জন্যে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, বায়তুল মামুরে নামায আদায়ের পর নবী (সা) কে সিদরাতুল মুনতাহায় উঠানো হয় এবং সেখান থেকে জান্নাতে উঠানো হয়। আর জান্নাত পরিভ্রমণের পর তাঁর সামনে জাহান্নাম পেশ করা হয় অর্থাৎ দেখানো হয়।[২]

আর বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণনায় রয়েছে নবী (সা) বলেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহায় উপস্থিত হলাম। সেখানে অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় রং-বেরংয়ের কিছু জিনিস দেখলাম, আমার জানা নেই যে, ওগুলো কি ছিল। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো। এর গম্বুজগুলো ছিল মোতির আর এর মাটি ছিল মিশকের ন্যায়।

সরীফুল আকলামের[৩] স্থান

এরপর তাঁকে আরো উপরে নেয়া হয়, এমনকি তিনি সরীফুল আকলামের আওয়াজ শুনতে পান। লিখার সময় কলম থেকে যে শব্দ সৃষ্টি হয, একে সরীফুল আকলাম বলে। ঐ স্থানে ভাগ্য ও নিয়তি লিখায় কলমগুলো মশগুল ছিল। সেখানে

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ১৮।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৯।

৩. নবী (সা)-এর সরীফুল আকলামে উপস্থিতি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস ও হযরত আবূ হুবায় আনসারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত। আর বাকী সরীফুল আকলামের সূচনা যারকানী থেকে গৃহীত।

আল্লাহর অভিপ্রায় ও নির্দেশ লিখন এবং আল্লাহর বিধানসমূহ লাওহ মাহফূয থেকে নকল করা হচ্ছিল।[১]

সতর্ক বাণী : হাদীসসমূহ বিশ্লেষণে মনে হয়, সরীফুল আকলামের স্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে। কেননা সরীফুল আকলামের স্থান সিদরাতুল মুনতাহায় উত্থানের পর 'সুম্মা' (অতঃপর) দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকন্তু, সিদরাতুল মুনতাহাকে এজন্যে সিদরাতুল মুনতাহা বলা হয় যে, উপর থেকে যে সমস্ত নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তার সর্বশেষ ঘাঁটি এটিই। এতে জানা গেল যে, সিদরাতুল মুনতাহার উপরে আরো কোন স্থান আছে, যেখান থেকে বিশ্বের পরিচালনার জন্য স্রষ্টার নির্দেশাবলী অবতীর্ণ হয় আর সেই ঘাঁটিটিই হলো সরীফুল আকলাম। এটি যেন স্রষ্টার নির্দেশাবলী এবং বিধানের উপমাহীন ও তুলনাবিহীন কেন্দ্র ও প্রধান কার্যালয়। সিদরাতুল মুনতাহা এবং জান্নাত-জাহান্নামের পর নবী (সা) কে এ জায়গা পরিদর্শন করানো হয়। অধিকন্তু, হাদীসসমূহে নামায ফরয হওয়ার বিধান এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে নবী (সা)-এর কথপোকথনের বিবরণ সরীফুল আকলামের বর্ণনার পরে এসেছে। এর দ্বারাও জানা ও বুঝা যায় যে, সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে অবস্থিত। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

নৈকট্য ও সৌহার্দ্য, একান্তে প্রভার প্রকাশ, দর্শন, বাক্যালাপ ও বিধানাবলী প্রদান

সরীফুল আকলামের[২] স্থান থেকে পর্দাসমূহ অতিক্রম করে নবী (সা) মহাপ্রভুর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর বাহন হিসেবে একটি রফরফ (অর্থাৎ একটি সুসজ্জিত সবুজ সিংহাসন) আগমন করে এবং এতে সওয়ার

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৮৮।

২ হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ১৬৯) মিরাজ অধ্যায়ে লিখেন ঃ وقع فى غير هذه الرواية زيادات راها ﷺ بعد سدرة المنتهى لم تذكر فى هذه الرواية منها ما تقدم فى الصلاة حتى ظهرت استوى اسمع فيه صريف الاقلام –এ বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে। আল্লামা সাফারিনী বলেন ঃ لما وصل ﷺ سدرة المنتهى غشيته سحابة فيها من كل لون فتاخر جبريل ثم عرة بالنبى ﷺ حتى وصل لمستوى مع فيه صريف الاقلام فدنا من الحضرة الالهنيه كان قاب قوسين من ذلك كذا فى شرح عقيدة الصفارينية او ادنى اى اقرب اى بل اقرب (আল-আকীদাতুস সাফারিনীয়াহ, ২খ. পৃ. ২৭১); এ বর্ণনা দ্বারাও সরীফুল আকলামের অবস্থান সিদরাতুল মুনতাহার পরে হওয়া পরিষ্কার বুঝা যায়। হাফিয আসকালানী বলেন ঃ قال القرطبى وقيل تدلى الرفرف لمحمد ﷺ حتى جلس عليه ثم دنى محمدبن ربه (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ৪০৩, তাওহীদ অধ্যায়; যারকানী, ৬খ. পৃ. ৯৭)। (উপকারিতা) কাযী ইয়ায কিতাবুশ-শিফায় বলেন, এ পবিত্র আয়াতে মহান পবিত্র আল্লাহর নৈকট্য ও সন্নিকটে উপস্থিতি এমন, যেমন হাদীসসমূহে মহান আল্লাহ শেষরাতে কোন উপমা-উদাহরণ ছাড়াই তাজাল্লী বিকীরণের উল্লেখ এসেছে। এর দ্বারা বুঝে নিন এবং আস্থাবান হোন। (নাসীমুর রিয়ায, ২খ. পৃ. ৩৩৬)।

হয়ে রাসূল (সা) মহাপ্রভুর পরম পবিত্র সান্নিধ্যে ও একান্ত নৈকট্যে এমনকি দুই ধনু পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা নিকটে উপস্থিত হন। আল্লামা কাযী ইয়ায (র) তাঁর 'আশ-শিফা' নামক কিতাবে বলেন :

وقال ابن عباس هواى قوله تعالى دنى فتدلى مقدم وموخر فاصله فتدلى فدنا اى فتدلى الرفرف لمحمد ﷺ ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع ودنا من ربه

"হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নৈকট্য ও সৌহার্দ্যের মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ যে, প্রথমে সৌহার্দ্য ও পরে নৈকট্য। এর অর্থ হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বাহন হিসেবে মিরাজের রাতে একটি রফরফ[১] অবতীর্ণ হয়। তিনি এতে উপবেশন করেন অতঃপর তাঁকে উত্তোলন করা হয়। এমনকি স্বীয় প্রতিপালকের একান্ত নিকটে পৌঁছে যান।"[২]

وفتح لى باب من ابواب السماء فرايت النور الاعظر واذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت واوحى الله الى ماشاء ان يوحى

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ আমার জন্য আসমানের একটি দরজা খোলা হল। আমি বিশাল নূর দেখলাম এবং পর্দার মধ্য দিয়ে মুক্তা নির্মিত একটি রফরফ (মসনদ)-ও দেখলাম। আর অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে কথা বলার ইচ্ছা করেন, তা আমাকে ব্যক্ত করেন।[৩]

রাসূল (সা) যখন মহান প্রতিপালকের দরবারের নৈকট্য লাভে ধন্য হলেন, তখন দয়াময় রবের উদ্দেশ্যে সিজদা করলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৫৯, মি'রাজ অধ্যায়)। আর আসমান-যমীনের নূরের ঝলক বৃহৎ পর্দার বাইরে থেকে প্রত্যক্ষ করেন এবং কোন মাধ্যম ছাড়াই মহান প্রতিপালকের সাথে কথা বলে এবং নির্দেশ লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন فاوحى الى عبده ما اوحى ।

---

১. আল্লামা শিহাব খাফফাযী বলেন, রফরফ অর্থ বিছানা জাতীয় কিছু । অথবা সবুজ চাদর অথবা মখমলের বিছানা বিশেষ। আর কেউ কেউ বলেন, রফরফ এবং زربى مبثوثة একই বস্তু। আর এ বাক্যটি পবিত্র কুরআনেও এসেছে متكئين على رفرف خضر । (নাসীমুর রিয়ায, ২খ. পৃ. ৩৩৪; অধিকন্তু যারকানী, ৬খ. পৃ. ৯৫ ও দেখে নিতে পারেন)। (সতর্ক বাণী) রফরফের উল্লেখ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং যঈফ এবং মুনকার হাদীসসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে। কাজেই একে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও বলা যাবে না। হাফিয আসকালানী বলেন, ইবন আবূ হাতিম... ইবন আয়েয... ইয়াযীদ ইবন আবূ মালিক...হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ ثم انطلق حتى انتهى ابى الى شجره فغشيتنى سحابة من كل لون فتاخر جبريل وخررت ساجدا (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৯)। আর যারকানী বলেন : وفى رواية فراى ربه سبحانه فخر ﷺ ساجدا الحديث (যারকানী, ৬খ. পৃ. ১০৩)।

২ নাসীমুর রিয়ায, ২খ. পৃ. ২৬৪।

৩. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৫৭।

اخرجه الطبرانى فى السنة والحكيم عن انس قال قال رسول الله ﷺ رايت النور الاعظم فاوحى الله الى ماشاء ان يوحى

"ইমাম তাবারানী এবং হাকিম তিরমিযী হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি নূরে আযম অর্থাৎ আল্লাহর নূরকে দেখেছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যা ইচ্ছা, ওহী প্রেরণ করলেন। অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি আমার সাথে কথা বললেন।" [১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ রিওয়ায়াত দ্বারা دنا تدلى এবং فاوحى الى عبده ما اوحى-এর তাফসীরও হয়ে যায় যে, এর দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার এমন বিশেষ নৈকট্য এবং পরিপূর্ণতা বুঝায়, যাঁর সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলার নূরের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দ লাভ এবং সেই সঙ্গে বিনা মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথোপকথন ও ওহীও বুঝা যায়। এ জন্যে যে, সাক্ষাতের পর অন্যের মাধ্যমে কথা বলা অর্থহীন বরং বিনা মাধ্যমে কথা বলা এবং তা বিনা মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত ও উচিত কর্ম।

মোটকথা, নবী করীম (সা) মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন এবং বিনা মাধ্যমে তাঁর সাথে কথা বলে ধন্য হন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে কথা বলেন এবং তাঁর জন্য ও তাঁর উম্মতের জন্য দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ধার্য করেন। সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তিনটি অনুগ্রহ দানে ধন্য করেন। ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায, ২. সূরা বাকারার শেষ কয়েক আয়াত, অর্থাৎ সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের সারমর্ম দান করা হয়। যার মাধ্যমে এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ, আনন্দ ও দান, সংক্ষেপ ও আরামদায়ক ক্ষমা ও মার্জনা এবং কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় ও সাহায্যের বর্ণনা যা দু'আর আকারে এই উম্মতকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের যে দু'আ তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের সমস্ত দু'আ এবং আবেদন মঞ্জুর করব।

ولو لم ترد نيل مانرجو ونبطله   من فيض جودك ما علمنا الطلبا

"যদি তোমার ইচ্ছা আমার দয়ার সাগর থেকে তোমাকে না দেয়াই উদ্দেশ্য হতো, তা হলে তো আমি তোমাকে চাওয়া ও প্রার্থনা করার শিক্ষাই দিতাম না।" অর্থাৎ আবেদনের ভাষাই শিখাতাম না।

তৃতীয়ত তাঁকে এ উপহার দেয়া হয়েছে যে, তাঁর উম্মতের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত না করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কবীরা গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। অর্থাৎ কবীরা গুনাহে লিপ্তদেরকে কাফিরদের মত সর্বকালের জন্য

---

১. দুররে মানসূর, ২খ. পৃ ১২৩।

জাহান্নামে রাখবেন না; বরং কাউকে নবী (আ)-গণের সুপারিশে মাফ করবেন আর কাউকে বা মর্যাদাপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণের সুপারিশে আর কাউকে বা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায়। যার অন্তরে একবিন্দু পরিমাণও ঈমান থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রশংসা বাক্যের মধ্যে বলেন :

فقال له ربه قد اتخذتك خليلا وحبيبا وارسلتك الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا اذكر الا ذكرت معى وجعلت امتك خير امة اخرجت للناس وجعلت امتك وسطا وجعلت امتك هم الاولين والاخرين وجعلت من امتك اقواما اما قلوبهم اناجيلهم وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا واعطيتك سبعا من المثانى لم اعطها نبيا قبلك واعطيتك خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم اعطها نبيا قبلك واعطيتك الكوثر واعطيتك ثمانية اسهم الاسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتما الى اخر الحديث

"তাঁকে তাঁর প্রতিপালক বললেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু ও প্রিয়ভাজন বানিয়েছি এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী বানিয়ে প্রেরণ করেছি। আর আপনার বক্ষ উন্মোচন করেছি এবং আপনার ভার লাঘব করেছি। আর আপনার স্মরণ উচ্চতর করেছি, আমার একত্ববাদের সাথে সাথে আপনার রিসালত ও দাসত্বেরও উল্লেখ করা হয়। আপনার উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মধ্যবর্তী উম্মত, ন্যায় প্রতিষ্ঠকারী ও মধ্যস্থতাকারী করেছি। আভিজাত্য ও মর্যাদার দিক থেকে সর্ব প্রথম এবং প্রকাশ ও স্থিতির দিক থেকে সর্বশেষ করেছি। আর আপনার উম্মতের কিছু লোককে এমন সৃষ্টি করেছি যে, তাদের অন্তর ও বক্ষই ইনজিল হবে। অর্থাৎ তাদের অন্তর ও বক্ষেই আল্লাহর বাণী অঙ্কিত থাকবে। আপনাকে নূরের অস্তিত্ব ও আত্মার দিক থেকে নবীদের মধ্যে প্রথম এবং প্রেরণের দিক থেকে শেষ নবী করেছি। আর আপনাকে সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ দান করেছি যা আপনার পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি। আর আপনাকে হাউযে কাউসার দান করেছি এবং আপনার উম্মতের জন্যই বিশেষভাবে আটটি জিনিস দান করেছি....ইসলাম এবং মুসলমান উপাধি, হিজরত, জিহাদ, নামায, সাদকা, রমযানের রোযা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ। আর আপনাকে উন্মোচনকারী ও সমাপ্তকারী করেছি। অর্থাৎ নবীদের মধ্যে সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ বানিয়েছি" (হাদীসের শেষ পর্যন্ত)।

আল্লামা ইবন জারীর তাবারী সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীরে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে দীর্ঘ বর্ণনা সূত্রে, যেমনটি খাসাইসুল কুবরায় রয়েছে।[1]

وقال السيوطى فى الاية للكبرى فى شرح قصة الاسرا اخرجه الحاكم وغيره ورجاله موثقون الا ان ابا جعفر الرازى وثقه بعضهم وضعفه بعضهم وقال ابو زرعة يتهم وقا الحافظ ابن كثير الا ظهر انه سيئ الحفظ

"এবং আল্লামা সুয়ূতীও তাঁর খাসাইসুল কুবরায় সূরা বানী ইসরাঈলের তাফসীরে এটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম প্রমুখও এটি বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কেবল আবূ জাফর আল-রাযী ব্যতিত। তাঁকে কেউ কেউ নির্ভরযোগ্য এবং কেউ কেউ যঈফ বলেছেন। আবূ যু'রআ তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, তাঁর স্মরণশক্তিতে কোন দোষ প্রকাশ পায়নি।" (পৃ. ২৬)।[2]

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা এ নিকটবর্তী স্থানে নবী (সা) কে নানা ধরনের সৌভাগ্য ও সাহায্য দানে ধন্য করেন এবং নানা ধরনের সুসংবাদ দানে আনন্দিত করেন। আর বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ প্রদান করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল, তাঁর এবং তাঁর উম্মতের প্রতি পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। নবী (সা) তো এ সমুদয় বিধান ও নির্দেশ নিয়ে আনন্দিত ও সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে আসছিলেন। ফেরার পথে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাক্ষাত হলো। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান ও নির্দেশাবলী কিংবা ফরয নামায ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই বলেন নি (ফাতহুল বারী, মি'রাজ অধ্যায়)।[3] এরপরে তিনি মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার প্রতি কি নির্দেশ হয়েছে? তিনি বললেন, দিন-রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূসা (আ) বললেন, আমি বনী ইসরাঈলকে খুবই পরীক্ষা করেছি, আপনার উম্মত দুর্বল ও স্বল্প শক্তিসম্পন্ন, তারা এ ফরয পালন করতে পারবে না। এ জন্যে আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং আপনার উম্মতের জন্য সংক্ষেপ করার আবেদন করুন। নবী (সা) ফিরে গেলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কিছু কমানোর আবেদন জানালেন। আল্লাহ্ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন। আবার তিনি মূসা (আ)-এর নিকটে এলেন, তিনি আবার একই কথা বললেন। তিনি পুনরায় গিয়ে কমানোর আবেদন করলেন। এভাবে কমানোর পর যখন কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকল, তখনও মূসা (আ) একই পরামর্শ দিলেন যে, গিয়ে পুনরায় কমানোর আবেদন করা হোক। তখন তিনি বললেন, আমি বারবার আবেদন

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৫।

২ যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ১০৩।

৩. قال الحافظ وفى هده الروايةّ من الزيادة فانصرفت سريعا فلم يقل شيأ ثم اتيت على موسى فقال ما صنعت (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৯)।

করেছি, এক্ষণে আল্লাহ তা'আলার নিকট যেতে লজ্জাবোধ করছি। তিনি মূসা (আ) কে এ জবাব দিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। তখন অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এল যে, এটা পাঁচ কিন্তু পঞ্চাশের সমান। অর্থাৎ সওয়াবের দিক থেকে পঞ্চাশের অনুরূপ, আমার কথার কোন পরিবর্তন হয়নি। আমার জ্ঞানে এটাই সাব্যস্ত ও নির্দিষ্ট করা ছিল যে, প্রকৃত ফরয পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই, আর পঞ্চাশ থেকে পাঁচ পর্যন্ত ধাপে ধাপে কমানো বিচক্ষণতা ও কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ও ক্রমপর্যায় কৌশল ও বিচক্ষণতার উপর নির্ভরশীল। আর রোগী তার অজ্ঞতার কারণে একে পরিবর্তন ও পাল্টানো মনে করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

এভাবে তিনি আসমান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে এসে অবতরণ করেন। আর এখান থেকে বুররাকে আরোহণ করে প্রভাত হওয়ার পূর্বেই মক্কা মুকাররামায় পৌঁছেন। সকাল হওয়ার পর তিনি এ ঘটনা কুরায়শদের সামনে বর্ণনা করেন। তারা এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কেউ আবার অবাক হয়ে মাথায় হাত রাখল, কেউ আবার হাততালি দিল এবং অবাক বিস্ময়ের সাথে বলতে লাগল যে, একই রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে ফিরে এল। ওদের মধ্যে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস দেখেছিল, তারা পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিভিন্ন নিদর্শন জিজ্ঞেস করা শুরু করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে তাঁর চোখের সামনে এনে দিলেন। কাফিররা প্রশ্ন শুরু করলে তিনি দেখতে থাকেন এবং তা দেখে দেখে তাদের প্রশ্নসমূহের উত্তর দিতে থাকেন। এমনকি যখন কোন কিছু প্রশ্ন করার মত আর অবশিষ্ট থাকল না, তখন বলল আচ্ছা, তা হলে পথের কোন ঘটনা বর্ণনা কর। তিনি বললেন, পথে অমুক জায়গায় বাণিজ্য কাফেলার দেখা পাই যারা সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে ফিরে আসছে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যা পরে পাওয়া গিয়েছে। ইনশা আল্লাহ, তিনদিন পর ঐ কাফেলা মক্কায় পৌঁছবে আর একটি মেটে বর্ণের উট ঐ কাফেলার অগ্রগামী হবে, যার পিঠে দু'টি বড় বোঝা থাকবে। সুতরাং তৃতীয় দিন এভাবেই ঐ কাফেলা মক্কায় প্রবেশ করল এবং উট হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাও বর্ণনা করল। ওলীদ ইবন মুগীরা এসব দেখে ও শুনে বলল, এটা জাদু; লোকেরা বলল, ওলীদ যথার্থই বলেছে।[১]

সূর্য স্থিতকরণ

বায়হাকীর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন যে, অমুক বাণিজ্য কাফেলা, যারা সিরিয়া থেকে ফিরছে, আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মক্কায় পৌছে যাবে। যখন বুধবার এসে গেল, আর কাফেলা মক্কায় পৌঁছল না, আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হলো, নবী (সা) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তা'আলা সূর্যকে

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ১২৬।

কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে দিলেন। এমনকি কাফেলা তাঁর সংবাদ অনুসারে ঐ দিন সন্ধ্যায় মক্কায় পৌঁছে গেল।[১] কোন কোন বর্ণনার দ্বারা জানা যায়, কাফেলা প্রত্যূষে মক্কা মুকাররামায় পৌছে। সম্ভবত দুটি কাফেলা ছিল, একটি ভোরে পৌঁছে, আর অপরটি সন্ধ্যায়। আর সম্ভবত এটাও হতে পারে যে, একই কাফেলার কিছু লোক প্রভাতে মক্কায় পৌঁছে এবং কিছু লোক সন্ধ্যায়। সীরাত বিশেষজ্ঞগণের নিকট এ ঘটনা সূর্য স্থিতকরণ নামে অভিহিত। শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (র) বলেন :

وشمس الضحى طاعتك عند مغيبها   فما غربت بل وافصتكبوقفه

এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কথার সত্যতা প্রকাশ করলেন। আর কুরায়শগণ তাঁর সততা স্বচক্ষে অবলোকন করল একং স্বকর্ণে শ্রবণ করল কিন্তু নিজেদের মিথ্যা এবং ভ্রান্তির মধ্যেই নিমজ্জিত থাকল ও বিরোধিতায় মগ্ন থাকল। কিছু লোক হযরত আবূ বকরের কাছে এলো এবং বলল, তোমার দোস্ত অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) বলছে যে, আজ রাতে আমি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলাম এবং ভোর হওয়ার পূর্বে ফিরে এসেছি! তুমি কি এটাও বিশ্বাস করবে ? আবূ বকর প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কি এ কথা বলেছেন ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা বলে থাকেন তা হলে সম্পূর্ণ সত্যই বলেছেন। আমি এটা সত্যায়ন করছি। আর আমি তো এর চেয়ে এগিয়ে তাঁর দেয়া আসমানী খবরও সকাল সন্ধ্যায় সত্য বলে আসছি। এ দিন থেকেই তাঁর উপাধি হলো সিদ্দীক বা চরম সত্যবাদী।[২]

সূক্ষ্মতা পরিচয় গোপন রহস্য ও নির্দেশ

১. আল্লাহ তা'আলা মি'রাজের এ ঘটনা 'সুবহানাল্লাযী' দ্বারা এজন্যে শুরু করেছেন যে, যাতে কোন অসূক্ষ্ম দৃষ্টি ও অন্ধ ধারণার অনুসারীর নিকট তা অবাস্তব ও অসম্ভব মনে না হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রকারের দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে পাক ও পবিত্র। আমরা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারীরা যদিও কোন বস্তুকে অসম্ভব ও বিস্ময়কর মনে করি কিন্তু আল্লাহর অসীম কুদরত ও ইচ্ছার সামনে তা মোটেও কষ্টসাধ্য নয়।

نہ ہر جائے مرکب تواں تاختن   کہ جاھا سپر باید انداختن

অধিকন্তু, এটা এদিকেই ইঙ্গিতবাহী যে, এ ঘটনা কোন সাধারণ ঘটনা নয়, বরং এক বিশাল মু'জিযা ও কারামত যা তিনি ছাড়া আর কেউ অর্জন করেননি।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমতা দ্বারা নবী (সা) কে জাগ্রত অবস্থায় এ পবিত্র শরীরকেই আসমানসমূহ ভ্রমণ করান। সকল সাহাবয়ে কিরাম, তাবিঈ ও পূর্ববর্তী আলিমগণের এটাই বিশ্বাস যে, নবী (সা)-এর এ দেহেই এবং জাগ্রত অবস্থায়

---

১. প্রাগুক্ত।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৬।

মিরাজ সংঘটিত হয়। কেবল দু'তিনজন সাহাবী ও তাবিঈ থেকে বর্ণনা করা হয় যে, এ ভ্রমণ ছিল আত্মিক (রূহানী) অথবা কোন অত্যাশ্চর্যজনক স্বপ্ন। কিন্তু সত্য এটাই যে, ইসরা ও মিরাজের সমস্ত ঘটনা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এবং এ শরীরেই সংঘটিত হয়েছে। যদি স্বপ্ন কিংবা কাশফ-এর মাধ্যমে সংঘটিত হতো, তবে মক্কার মুশরিকগণ এতটা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত না। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন সম্পর্কেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করত না। স্বপ্নযোগে দর্শনকারীকে না কেউ নিদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আর না কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। অধিকন্তু 'ইসরা' শব্দটি স্বপ্ন কিংবা কাশফের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, বরং জাগ্রত অবস্থার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত লূত (আ)-এর ঘটনায় আছে :

قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسر باهلك بقطع من الليل

এবং হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনায় আছে ঃ فاسر بعبادى ليلا

এ উভয় ঘটনায়ই 'ইসরা' দ্বারা রাত্রিকালে জাগ্রত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার অর্থ নেয়া হয়েছে। অধিকন্তু যদি এ মি'রাজের ঘটনা কোন স্বপ্ন হতো, তা হলে এটা নবী (সা)-এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত হতো না। কেননা স্বপ্নে তো ইয়াহূদী-নাসারারাও আসমান, বেহেশত, দোযখ ভ্রমণ করতে পারে। অধিকন্তু, অন্যান্য নবীদের উপর আমাদের নবী (সা)-এর যে ফযীলত, এর কারণ বিশেষভাবে দুটি—পৃথিবীতে মি'রাজ এবং আখিরাতে শাফায়াত। আর কেবল স্বপ্ন এ বিরাট ফযীলতের কারণ হতে পারে না। আলিমগণ বলেন, নবী (সা)-এর এ দুটি ফযীলত, এ দুটি সম্পদ বিনয়ের দরুন অর্জিত হয়েছে। নবী (সা) আল্লাহর কাছে বিনীত হয়েছেন, ফলে মি'রাজের মর্যাদা লাভ করেছেন। আর সৃষ্টির সাথে বিনীত হওয়ায় তাদের শাফায়াতের অধিকার লাভ করেছেন।

২. এখানে আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর বান্দা হওয়ার শান বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, নবী কিংবা রাসূল হওয়ার বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেননি। অর্থাৎ اَسْرٰى بِعَبْدِه বলেছেন, اَسْرٰى بِنَبِيِّه وَرَسُوْله বলেননি এ জন্যে যে, আল্লাহর দিকে ভ্রমণের জন্য বান্দাত্বের পরিচয়ই সমীচীন যে, বান্দা সবকিছু ছেড়ে স্বীয় প্রভুর সমীপে গমন করছে। আর নবূয়ত ও রিসালতের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি আগমন করা। কাজেই নবূয়ত ও রিসালতের উল্লেখ ঐ স্থানে মানায় যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি আগমন করার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا الى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً

"আমি তোমাদের নিকট পাঠিয়েছি এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠিয়েছিলাম ফিরাউনের নিকট।" (সূরা মুযযাম্মিল : ১৫)

এখানে اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ عَبْدَنَا (তোমাদের প্রতি আমার দাস প্রেরণ করেছিলাম) বলেন নি। কেননা এ স্থলে নবী (আ)গণ পৃথিবীতে প্রেরিত হওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন;

পৃথিবী ছেড়ে তাঁর নিকট যেতে বলার বর্ণনা করেন নি। মোটকথা, এ অবস্থা ছিল আল্লাহর দিকে ভ্রমণ ও আল্লাহর দিকে গমন করার। এ জন্যে এখানে 'বান্দা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, নবী ও রাসূল শব্দ ব্যবহার করেননি। অধিকন্তু, 'দাস' শব্দ এ জন্যেও গ্রহণ করা হয়েছে যে, যাতে অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন খ্রিস্টানদের মত মহানবী (সা)-এর মি'রাজ এবং ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণের দরুন পাছে তাঁকে কেউ খোদা ভেবে না বসে।

ইমাম রাযী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম সুলায়মান আনসারীকে বলতে শুনেছি যে, মি'রাজের রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সা) কে প্রশ্ন করেন, কোন্ উপাধি এবং কোন্ গুণ আপনার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলেন, দাস-এর গুণ আর তোমার বান্দা হওয়া আমার নিকট বেশি প্রিয়। এ জন্যে যখন এ সূরা অবতীর্ণ হলো, তখন ঐ পসন্দনীয় উপাধিসহ অবতীর্ণ হয়।

৩. ইসরা অর্থ যদিও রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়া, তবুও রাত্রি শব্দ দ্বারা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা এ জন্যে করা হয়েছে যাকে 'লা নাফিয়াহ' অনির্দিষ্ট হওয়ার দরুন চিহ্নিত ও ন্যূনতমের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতে রাতের কিছু এবং ন্যূনতম অংশে যমীন এবং আসমান পরিভ্রমণ করিয়ে দেন। আর রাতকে সুনির্দিষ্টভাবে এ জন্যে বলেছেন যে, রাত স্বভাবতই নির্জনতা ও একাকীত্বের সময়। এ সময়ে আহ্বান করা অতিরিক্ত নৈকট্য ও বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করার প্রমাণ। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআন ও হাদীসসমূহে রাত্রিতে দণ্ডায়মান হওয়া (সালাত আদায় করা) এবং তাহাজ্জুদ আদায়ের কথা বিশেষভাবে এসেছে। যেমন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

"এবং রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৭৯)

اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلاً

"অবশ্য রাত্রিকালে উঠা বড় কঠিন এবং বাক্যস্ফূরণে সঠিক।"
(সূরা মুযযাম্মিল : ৬)

كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

"তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করতো, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।" (সূরা যারিয়াত : ১৭-১৮)

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

"এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে এবং দণ্ডায়মান থেকে।" (সূরা ফুরকান : ৬৪)

অধিকন্তু, কুরআন করীমে নবী (সা)-এর উপাধি সিরাজাম মুনীর দেয়া হয়েছে। সিরাজাম মুনীর অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রদীপ-এর জন্য রাতই উপযুক্ত ।

قلت يا سيدى فلم توثر   الليل على بهجة النهار

قال لا استطيع تغير رسمى   هكذا الرسم فى طلوع البدور

"আমি বললাম, হে আমার প্রিয়, আপনি ভ্রমণের জন্য রাতকে কেন দিনের উপর প্রাধান্য দেন যে রাতেই বের হন, দিনে বের হন না ? জবাবে তিনি বললেন, আমি আমার প্রথা ও অভ্যেস কখনই বদল করতে পারি না, পূর্ণিমার চাঁদের রেওয়াজই হলো রাত্রে উদিত হওয়া।"

৪. মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পেছনে সম্ভবত এই কৌশল ছিল যে, উভয় কিবলারই বরকতের নূর এবং বনী ইসরাঈলের নবী (আ)গণের মর্যাদা ও কামালিয়াত নবী (সা)-এর মাঝে সন্নিবেশ ঘটানো। আর সম্ভবত এদিকেও ইঙ্গিত ছিল যে, বানী ইসরাঈলের কিবলা শীঘ্রই বনী ইসমাঈলের কর্তৃত্বে ন্যস্ত হবে এবং উম্মতে মুহাম্মদী (সা) উভয় কিবলা অর্থাৎ খানায়ে কাবা ও মসজিদুল আকসার নূর ও বরকতের ধারক-বাহক হবে। আর নবী-রাসূলগণ ও সম্মানিত ফিরিশতাগণের নবী (সা)-এর ইমামতিতে নামায আদায় করা মহানবী (সা)-এর নেতৃত্ব ও সমস্ত নবীর ইমাম হওয়ার প্রকাশ্য দলীল প্রদর্শনের উদ্দেশেই ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ যাতে নিজেদের চোখে দেখে প্রিয় নবী (সা)-এর নেতৃত্ব এবং ইমামতের সাক্ষ্য হতে পারেন।

মাসআলা

সম্মানিত নবী (আ)গণ এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাগণ নবীজী (সা)-এর পেছনে নামায আদায় করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, সবাই নীরবে তাঁর কিরাআত শ্রবণ করেছেন, তাঁর পেছনে কেউ পাঠ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। আর কুরআনুল করীমের মর্যাদাও এমনটিই যে, তা নীরবে শুনতে হয়।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।" এখানে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-এ অনুগ্রহের ওয়াদা তো চুপ করে থাকা ব্যক্তির জন্যই। আর ইমামের সাথে কিরাআত পাঠকারীদের জন্য তো অনুগ্রহের ওয়াদা নেই। এজন্যে ইমাম আবূ হানীফা (র) ইমামের পেছনে কিরাআত পাঠের প্রবক্তা নন।

৫. দৃশ্যত যে নামায নবী (সা) মসজিদে আকসায় পড়িয়েছেন, তা ছিল নফল নামায। তবে কেউ কেউ বলেন, এটা ফরয নামাযই ছিল, যা মি'রাজের পূর্বে তাঁর উপর ফরয ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।[১]

---

১. যারকানী, ৬খ. পৃ. ৫৪।

বিশুদ্ধ মত এটাই যে, তা ছিল নফল নামায, কেননা রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (সা)-এর এ ভ্রমণ ইশা এবং ফজর সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ছিল। তিনি (সা) ইশার সালাত আদায় করে আরাম করার জন্য বিছানায় শয়ন করেছিলেন, এমন সময়ে হযরত জিবরাঈল (আ) বুররাক নিয়ে আগমন করেন এবং ফজরের পূর্বেই মক্কা মুকাররমার আসমান থেকে অবতরণ করেন ও ফজরের নামায মক্কায় আদায় করেন যেমনটি ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৫১ তে ইসরা বিষয়ক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আম্বিয়া (আ) ও ফিরিশতাগণের যে নামায তিনি পড়িয়েছেন তা নফল ছিল, ফরয ছিল না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

৬. হযরত জিবরাঈল (আ)-এর দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ঘরের ছাদ দিয়ে প্রবেশ করা ছিল তাঁর বক্ষ বিদারণের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, এভাবেই তাঁর বক্ষ বিদারণ করা হবে এবং অনতিবিলম্বে তা সেলাই করে দেয়া হবে।

৭. ঈমান ও হিকমত যদিও ইহজগতের হিসাবে আন্দাজ-অনুমানের বিষয়; কিন্তু পরলোকে এসবকেও দেহধারী বানানো হবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান দুটি মেঘখণ্ডের মত দৃশ্যমান হবে এবং তা পাঠকারীদের উপর ছায়াদান করবে, মৃত্যুকে মেষের আকৃতিতে আনা হবে ইত্যাদি। (বিস্তারিত জানার জন্য যুরকানী অধ্যয়ন করুন।)[১]

৮. বক্ষ বিদারণের রহস্য এবং নির্দেশ পুস্তকের প্রথমদিকে অতিক্রান্ত হয়েছে, সেখানে দেখে নিতে পারেন।

৯. আসমানে নির্দিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট নবী (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় নির্ধারণ এক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিতবাহী ছিল, যে সব অবস্থা নবী (সা)-এর পরবর্তী জীবনে পর্যায়ক্রমে সামনে আসবে। যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিমগণের ব্যাখ্যা এরূপ, যে নবী (আ) কে স্বপ্নে দেখা যায়, তাঁর জীবনের অবস্থা তার সামনে আসবে। প্রথম আসমানে তিনি হযরত আদম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন প্রথম নবী এবং আদি পুরুষ, এ জন্যে সর্ব প্রথমে তাঁর সাথে সাক্ষাত করানো হয়েছে। আর এ সাক্ষাতে ইঙ্গিত ছিল হিজরতের প্রতি যে, হযরত আদম (আ) একটি শত্রুর কারণে আসমান এবং জান্নাত থেকে পৃথিবীতে হিজরত করেন, অনুরূপভাবে তিনিও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করবেন। আর আদম (আ)-এর মতই প্রকৃত জন্মভূমি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া প্রকৃতিগতভাবে দুঃখজনক হবে।

দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা ও হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

أَنَا أَقْرَبُ النَّاسِ بِعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ

---

১. প্রাগুক্ত, ৬খ. পৃ ২৮-৩০।

"সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যে আমি ঈসা (আ)-এর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। আমার এবং তাঁর মধ্যে কোন নবী নেই।"

অধিকন্তু, হযরত ঈসা (আ) শেষ যামানায় দাজ্জালের জন্য আসমান থেকে অবতরণ করবেন এবং উম্মতে মুহাম্মদীর একজন মুজাদ্দিদ হওয়ার কারণে মুহাম্মদী শরীআত প্রতিষ্ঠিত করবেন। আর কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আ) তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত অনুসারীসহ প্রিয় নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হবেন, মুখ্য শাফা'আতের আবেদন জানাবেন, এসব কারণে হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করানো হয়েছে। আর হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কেবল নৈকট্যের কারণেই ছিল। হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ) ছিলেন পরস্পর খালাতো ভাই। এ সাক্ষাতে ইঙ্গিত ছিল ইয়াহূদীদের দ্বারা প্রদত্ত কষ্ট ও আঘাত পৌঁছানোর প্রতি। কেননা ইয়াহূদীগণ তাঁকে উত্যক্ত করার জন্য উদ্যত হবে এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য নানা ধরনের কূট-কৌশল ও ছল-চাতুরী করতে থাকবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেমনভাবে ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদী-অইয়াহূদীদের দুশমনি থেকে নিরাপদ রেখেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও ওদের দুশমনি থেকে নিরাপদ রাখবেন।

তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতের দ্বারা ইঙ্গিত এদিকে ছিল যে, ইউসুফ (আ) যেমন তাঁর ভাইদের দ্বারা কষ্ট পেয়েছিলেন, নবী (সা)ও তেমনি নিজ ভাইদের দ্বারা কষ্ট পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করবেন ও তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করবেন। কাজেই মক্কা বিজয়ের দিন তিনি কুরায়শদেরকে ঐ বাক্যে সম্বোধন করেছেন, যে বাক্য দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদের সম্বোধন করেছিলেন। সুতরাং ইরশাদ করেছেন :

لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ   اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ اَىُّ الْعُتَقَاءُ

"আজকের দিনে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি আরহামুর রাহিমীন। যাও, তোমরা মুক্ত।"[1]

অধিকন্তু, উম্মতে মুহাম্মদী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের চেহারা হযরত ইউসুফ (আ)-এর অনুরূপ হবে।

আর হযরত ইদরীস (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, তিনি (সা) বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াতসহ পত্র প্রেরণ করবেন। কেননা পত্র ও লিখনীর প্রথম আবিষ্কারক ছিলেন হযরত ইদরীস (আ)। খোদ হযরত ইদরীস (আ)-এর প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا এসেছে। কাজেই তাঁর

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৩।

সাথে সাক্ষাতে ইশারা এদিকে ছিল যে, নবী (সা) কেও আল্লাহ্ তা'আলা উচ্চতর মর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। সুতরাং যখন তিনি রোমের বাদশাহর প্রতি দাওয়াতনামা লিখেন, তখন রোম সম্রাট ভীত হয়ে পড়েন। যেমনটি সহীহ্ বুখারীতে আবূ সুফিয়ানের বক্তব্য ঃ

امر امر ابن ابى كبشة حتى يخافه ملك نبى الاصفر

আর হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, যেমনভাবে সামিরী ও গো-বৎস পূজারীরা হযরত হারূন (আ)-এর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছিল, যার পরিণতিতে আল্লাহ্র নির্দেশে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার অভিপ্রায়ে আগত কুরায়শের সত্তর সর্দারকে বদর যুদ্ধে হত্যা করা হয় এবং সত্তরজনকে বন্দী করা হয়, আরনীনকে হত্যা করা হয় ধর্মত্যাগী হওয়ার কারণে।

আর হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাতে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, হযরত মূসা (আ) যেমন সিরিয়ায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দান করেছিলেন, অনুরূপভাবে নবী (সা)ও জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য সিরিয়ায় প্রবেশ করবেন। সুতরাং তিনি তাবূক যুদ্ধের উদ্দেশে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন এবং দুমাতুল জন্দলের নেতা জিযিয়া প্রদান করে সন্ধির আবেদন জানান। তিনি (সা) তার আবেদন মঞ্জুর করেন। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ)-এর পর সিরিয়া হযরত ইউশা (আ)-এর হাতে বিজিত হয়েছিল, একইভাবে নবী (সা)-এর পর হযরত উমর (রা)-এর হাতে সম্পূর্ণ সিরিয়া বিজিত হয় এবং ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয়লাভ করে।

আর সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। নবী (সা) দেখেন, হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামূরে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বায়তুল মামূর সপ্তম আসমানে অবস্থিত একটি মসজিদ, যা কাবাগৃহের বরাবর উপরে বিদ্যমান। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফিরিশতা এখানে হজ্জ ও তাওয়াফ করেন। যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ) কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা, সেহেতু তাঁকে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথে এ অনন্য সাক্ষাতকার ছিল নবী (সা)-এর বিদায় হজ্জের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, রাসূল (সা) ওফাতের পূর্বে বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করবেন। আর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী আলিম-গণের নিকট স্বপ্নে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দেখা হজ্জ করার সুসংবাদ স্বরূপ।

এ রহস্য ও নির্দেশনা ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬২; রাউযুল উনুফ, ১খ. পৃ. ২৫০ এবং যারকানীর শারহে মাওয়াহিব, ৬খ. পৃ. ৬৭-৭২ থেকে নেয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানান্বেষীগণ ! মূলের প্রতি ফিরে আসুন। ইবন মুনীর বলেন, এ পর্যন্ত সাতটি মি'রাজ হল। অষ্টম মি'রাজ হয় সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। এতে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল, যা অষ্টম হিজরীতে বিজিত হয়। নবম মি'রাজ হয় সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সরীফুল আকলাম পর্যন্ত। এ মি'রাজে তাবূক যুদ্ধের প্রতি ইশারা ছিল, যা নবম

হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। আর দশম মি'রাজ রফরফ এবং নৈকট্য এবং চরম নৈকট্য পর্যন্ত ছিল, যেখানে আল্লাহ তা'আলার দর্শন এবং বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছিল। দশম মি'রাজে যেহেতু আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ হয়েছিল, সেহেতু তা এদিকে ইঙ্গিতবাহী ছিল যে, হিজরী দশম বর্ষে নবী (সা)-এর ওফাত হবে এবং সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর দর্শন লাভ হবে। আর তিনি এ পার্থিব আবাস ত্যাগ করে পরম বন্ধুর সাথে মিলিত হবেন। যেমনটি হাফিয সুয়ূতী প্রণীত আর রিসালার পৃ. ৪৫, মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

১০. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা নবী (আ)গণের দেহকে যমীনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। যমীন তাঁদের দেহ হজম করতে পারে না। এ জন্যে নবী (আ)-গণের পবিত্র দেহের নির্দিষ্ট আবাস তাঁদের কবরসমূহ। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক আম্বিয়ায়ে কিরামকে বায়তুল মুকাদ্দাসে এবং আসমানসমূহে দেখার দ্বারা হয়তো তাঁদের রূহসমূহকে দেখা বুঝানো হয়েছে, অথবা পূর্ণাঙ্গ দেহসহ সাক্ষাতও বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে যে, মহানবী (সা)-এর সম্মান ও মর্যাদার কারণে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে সশরীরে মসজিদে আকসায় এবং আসমানসমূহে আহ্বান করা হয়েছিল। যেমন পবিত্র কুরআনে আছে : وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ "আর আল্লাহ তা'আলা এ কাজে মোটেই অক্ষম নন।"

আর কতিপয় আলিমের মত হলো, তাঁদের আসল দেহ কবরেই ছিল; বরং আল্লাহ তা'আলা নতুন দেহ তৈরি করে সে দেহেই নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের একত্রিত করেন। অবশ্য হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে প্রকৃত দেহ সহই দেখেছেন। কেননা তাঁকে প্রকৃত দেহ সহই আসমানে উত্তোলন করা হয়েছে। একইভাবে হযরত ইদরীস (আ)-কেও তাঁর প্রকৃত দেহের সাথেই দেখেছেন। কেননা তাঁকেও জীবিত তুলে নেয়া হয়েছে।[১]

১১. ঐ রাতেই তাঁর এবং তাঁর উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। তিনি (সা) 'শুনলাম ও আনুগত্য করলাম' বলে রওয়ানা হন। প্রত্যাবর্তনকালে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়, কিন্তু তিনি কিছুই বলেননি। এরপর হযরত মূসা (আ) কে অতিক্রম করেন। তিনি এ ফরয সংক্ষিপ্ত করিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেন। কারণ ছিল এই যে, ভালবাসার মাকাম হচ্ছে সম্মতি ও সন্তুষ্টির মাকাম, উৎসর্গের মাকাম। আর বাক্যালাপের মাকাম হলো গর্বিতের মাকাম। এ জন্যে হযরত খলীলুল্লাহ (আ) নিশ্চুপ ছিলেন। আর হযরত কালীমুল্লাহ (আ) সংক্ষেপকরণের পরামর্শ দেন। খলীলুল্লাহ (আল্লাহর বন্ধু) চুপ থাকেন আর কালীমুল্লাহ (আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী) কথা বলেন।

১২. হযরত মূসা (আ) এর পরামর্শের ভিত্তিতে হুযূর (সা) বারবার সংক্ষেপকরণের আবেদন জানাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট থাকলো,

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৬২; যারকানী, ৬খ. পৃ. ৭২-৭৩।

তখন নবী (সা) বললেন, আমার লজ্জা করছে। লজ্জার কারণ এটাই ছিল যে, তিনি এর পূর্বে নয়বার সংক্ষেপকরণের আবেদন করতে গিয়ে দেখেন যে, প্রত্যেকবার পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমে যায়, কাজেই যখন কমতে কমতে কেবল পাঁচ ওয়াক্তই অবশিষ্ট থাকলো, তখন যদি এর পরও সংক্ষেপকরণের আবেদন করা হয়, তা হলে এ আবেদনের অর্থ এই হবে যে, এ পাঁচ ওয়াক্তও প্রত্যাহার করে নেয়া হবে এবং ফরযের এমন কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না যা অবশ্য পালনীয়ের উদাহরণ হতে পারে। এ কারণে রাসূল (সা) লজ্জাবোধ করেন এবং পুনরায় যেতে অস্বীকার করেন।

১৩. আসমানে আরোহণের পূর্বে নবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণ করা হয়েছে, যমযমের পানিতে তা ধৌত করা হয়েছে এবং এতে ঈমান ও প্রজ্ঞা ভরে দিয়ে সেলাই করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে এ পরম ও চূড়ান্ত পবিত্রতার পর সর্বোত্তম ইবাদত ফরয হওয়ার নির্দেশ দেয়া যায়।

১৪. আসমানী সফরে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাগণকে বিভিন্ন ইবাদতে নিমগ্ন দেখতে পান। কিছু সংখ্যক কিয়ামের অবস্থায় হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন, কতিপয় রুকূ অরস্থায় রয়েছেন এবং কখনই মাথা উত্তোলন করেন না, কিছু সংখ্যক সর্বদাই সিজদারত অবস্থায় আছেন, আর কিছু সংখ্যক সব সময় বসা অবস্থায়ই রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এ সমুদয় শর্ত নামাযের একই রাকাআতে একত্র করে দেন, যাতে করে উম্মতের ইবাদত সমস্ত ফিরিশতার ইবাদতের সমষ্টি ও সার-সংক্ষেপে পরিণত হয়।[১]

পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তু সব সময়ই আল্লাহর তাসবীহ ও প্রশংসায় নিয়োজিত রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَاِنْ مِنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لاَيَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

"আর প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে, কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পারো না।" (সূরা বানী ইসরাঈল : ৪৪)

বিশ্বের কোন একটি মুহূর্তও আল্লাহর প্রশংসা ছাড়া অতিক্রান্ত হয় না, আর প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বের সবার তাসবীহ একইরূপ নয়, বরং তা বিভিন্ন প্রকারের। বৃক্ষ এবং লতা-গুল্মের তাসবীহ সব সময় কিয়াম অবস্থায় হয়ে থাকে, পশু এবং চতুষ্পদ জন্তুর তাসবীহ সব সময় রুকূ অবস্থায় হয়ে থাকে, পোকা-মাকড়ের তাসবীহ সব সময় সিজদার অবস্থায় হয়ে থাকে, সদা-সর্বদা তাদের ললাট যমীনের সাথে লেগে থাকে এবং পাথর ও শীলাখণ্ডের তাসবীহ সব সময় বসা অবস্থায় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নামাযে প্রশংসা এবং তাসবীহের সমস্ত প্রকারকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৬৮।

অধিকন্তু, মানুষ মূল উপাদান চতুষ্টয়ের সমষ্টি, এ জন্যে তার ইবাদতও কিয়াম, বৈঠক, রুকূ ও সিজদা এ শর্ত চতুষ্টয়ের সমষ্টি করা হয়েছে। আর যেহেতু আল্লাহর ব্যাপারে ঔদাসীন্যের কারণ পাঁচটি, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় পাঁচটি, এ জন্যে একদিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে।

১৫. মি'রাজের রাত্রিতে মহানবী (সা) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দর্শন লাভে ধন্য হয়েছেন কিনা, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যদি দর্শন লাভ করেই থাকেন, তবে তা কি চাক্ষুস দর্শন ছিল, নাকি আত্মিক দর্শন অর্থাৎ কপালের চোখ দিয়ে দেখেছেন, নাকি অন্তরের চোখ দিয়ে। আর মানস চক্ষু দিয়ে দেখা ভিন্ন জিনিস এবং চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা ভিন্ন জিনিস। প্রসিদ্ধ সাহাবা এবং তাবিঈগণের অভিমত হলো তিনি (সা) চর্ম চক্ষু দিয়েই মহান পরওয়ারদিগারের দর্শন লাভ করেছেন। আর হকপন্থী আলিমগণের নিকট এ বক্তব্যই প্রসিদ্ধ এবং সত্য। এ জন্যে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং নবী (সা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছেন ? তিনি বলেন হ্যাঁ, আমি শবে মি'রাজে আমার প্রভুকে দেখেছি।

اخرج احمد بسند صحيح عن ابن عباس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ

"মুসনাদে আহমদে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন : আমি আমার সর্বশক্তিমান প্রভুকে দেখেছি।"[১]

واخرج الطبرانى فى السنة والحكيم عن انس قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاَيْتُ النُّوْرَ الْاَعْظَمَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَىَّ مَاشَاءَ

"তাবারানী তাঁর 'সুন্নাহ' গ্রন্থে এবং হাকিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : আমি বিশাল নূর দেখেছি, এর পর আল্লাহ আমার প্রতি যা ইচ্ছা ওহী করলেন।"[২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এক মারফূ রিওয়ায়াতে[৩] জানা যায় যে, শবে

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ.১৬১।

২. তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ.১২৩।

৩. পূর্ণ বর্ণনাটি এরূপ : اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ رَأَيْتُ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ باحْسنِ صُوْرَةٍ الى ان كان قال ما كنت الفواد ما راى فجعل نور بصرى فؤادىَ فنظرت اليه بفوادى التهى "ইবন জারীর হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আমার সর্বশক্তিমান প্রভুকে উত্তম সূরতে দেখেছি।" (তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬খ. পৃ.১২৪)।

মি'রাজে তাঁর চাক্ষুস ও আত্মিক উভয় প্রকার দর্শনই লাভ হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা চোখের আবরণকে দর্শনীয় নূরের মধ্যে এভাবে মিশ্রিত করে দেন যে, নবী (সা)-এর চাক্ষুস দর্শন এবং রূহানী দর্শনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

کلام سرمدی بے نقل بشنید   خداوند جهاں رابے جهت دید

وراں دیدن که حیرت حاملش بود   دلش در چشم وچسمش در دلش بود

"চিরন্তনী বাক্য কেউ অস্বীকার করতে পারে না, আল্লাহ্র ইচ্ছায় বিশ্বের কেউ কোন মাধ্যম ছাড়াই তাঁকে দেখতে পায়। যদিও এ দেখা আশ্চর্যজনক, তবুও চোখ তাঁর অন্তরে এবং অন্তর তাঁর চোখে পরিণত হয়েছিল।"

হযরত নিযামী (র) বলেন :

کلامیکه بے اله امد شنید   لقائے که آن دیدنی بود دید

چنانچه دیدکز حضرت ذوالجلال   نه زانسوجهت بد نه زیں سو خیال

"যে কথা মাধ্যম ছাড়া শ্রুত হয়, সে সাক্ষাতে যা দেখার, তিনি তা দেখলেন। হযরত (সা) যুল-জালাল (আল্লাহ্ তা'আলা)-কে এমনভাবে দেখলেন যে, এর কোন দিকও ছিল না, আর তা কল্পনায়ও ছিল না।"

হযরত জামী (র) বলেন :

بدید انچه از دیدن برون بود   مپرس از ماز کیفیت که چون بود

نه چندی وگنجد آنجا و نه چونی   فروبند از کمی لب وزفزونی

شنید انگه کلامے نه باواز   معانی در معانی راز با راز

نه آگاهی از وکام وزباں را   نه همراهی از ونطق وبیاں را

"তিনি দেখলেন, যা ছিল দর্শনের বাইরে; সেই দেখার ধরন কি ছিল,আমার কাছে জিজ্ঞেস কর না। সেখানে 'কি' বা 'কতক্ষণ' কিংবা 'কেমন' এর অবকাশ ছিল না, 'স্বল্পতা' এবং 'আধিক্য' নিয়ে কথা বলা বন্ধ কর, তখন একটা কথা শুনলেন তবে আওয়াজ সহকারে নয়; তা ছিল অর্থের মধ্যে অর্থ, রহস্যের মধ্যে রহস্য। মুখ বা রসনা জানে না এর স্বরূপ, ভাষা বা বর্ণনার সাধ্য নেই তা বর্ণনা করার।"

হাফিয তুরবশতী তাঁর 'আল-মুতামিদ ফিল-মুতাকিদ' গ্রন্থে লিখেন যে, আত্মিকভাবে দেখা অর্থাৎ রূহানী দর্শনের অর্থ কেবল জানা বা ধারণা করাই নয়, কেননা এটা তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পূর্ব থেকেই অর্জিত হয়েছিল। বরং এর ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর অন্তরে এভাবে দর্শন দেন, যেমনটি দর্শন কপালের চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অথবা এর অর্থ এই যে, চোখ অন্তরের সাহায্যে এবং অন্তর চোখের আনুকূল্য এবং সম্মিলিতভাবে দর্শনের সৌভাগ্যে ধন্য হয়েছেন।

দর্শনের সময় চোখ অন্তরের সাথে এবং অন্তর চোখের সাথে ছিল, একে অপর থেকে পৃথক ছিল না। মোটামুটি কথা এটুকুই, আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বিধর্মীদের আপত্তি ও এর জবাব

বিধর্মীগণ হুযূর (সা)-এর সশরীরে মি'রাজ গমনের ব্যাপারে যে আপত্তি করেছে, সামষ্টিকভাবে তা হলো এই যে, প্রাচীন দর্শনমতে আসমান ছিন্ন ও ছিদ্র করা অসম্ভব বলা হয়েছে, আর আধুনিক দর্শনে তো আসমানের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই আসমানের অস্তিত্বই যেখানে প্রমাণিত নয়, সেখানে দৈহিকভাবে মি'রাজের প্রমাণ করা কিভাবে সম্ভব হবে ? অধিকন্তু, নব্য ও প্রাচীন উভয় দর্শনই এ বিষয়ে একমত যে, পৃথিবীর কিছুটা উপরে শৈত্যস্তর রয়েছে এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মতে রয়েছে অগ্নিস্তর, আর এ দু'স্তর ভেদ করে কোন শারীরী জীবদেহের পক্ষে নিরাপদ, সুস্থ জীবিতাবস্থায় ঐ দূরত্ব অতিক্রম করা অসম্ভব। কাজেই আসমানে উত্থানও অসম্ভব হবে। আর কেউ কেউ বলেন, স্থূল দেহের পক্ষে এত উঁচুতে এত দ্রুত ভ্রমণ করাও জ্ঞানত অসম্ভব।

জবাব

এ সবই তাদের কল্পনা ও খেয়াল; বাস্তবে কোন বিষয়ই অসম্ভব নয়। هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ - انْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ যে ব্যক্তি এ সমস্ত বিষয়কে অসম্ভব মনে করে, সে তার দাবিতে সত্যবাদী হলে যেন প্রমাণ পেশ করে।

১. সকল নবী (আ) এবং সমস্ত আসমানী কিতাব এ ব্যাপারে একমত যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং আসমান টুকরা টুকরা হয়ে ফেটে পড়বে। اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ "যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে।" (সূরা ইনফিতার : ১, সূরা ইনশিকাক ১) আর নবী (আ)গণের পক্ষে কোন অসম্ভব বিষয় সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে একমত হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব। অধিকন্তু, প্রাচীন দার্শনিকগণের মতে গ্রহের উপরিস্তর ছিন্ন করার যে প্রশ্ন রয়েছে, সম্মানিত মুতাকাল্লিমগণ এর পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।

২. বাকি রইল নব্য দার্শনিকদের আসমানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার প্রশ্ন। এটা কিন্তু মহাশূন্য অনুভবের প্রমাণ হতে পারে না। সমস্ত বিজ্ঞ পণ্ডিত এ ব্যাপারে একমত যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়াটা এর অস্তিত্বহীনতার প্রমাণ নয়। অন্যথায় আসমান-যমীনের অজস্র বস্তু অস্বীকার করা আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে, যে সব বস্তু আমাদের দৃষ্টি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি থেকে গোপন এবং লুক্কায়িত। খোদ পণ্ডিতবর্গ এ ব্যাপারেও একমত যে, কারো অজ্ঞতা-মূর্খতা অপরের জন্য প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে না।

৩. আজকাল নতুন নতুন ধরনের নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হচ্ছে যা দ্বারা কোন বস্তুকে বাইরের উষ্ণতা ও শীতলতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা সম্ভব।

আর আল্লাহ তা'আলার কুদরত তো এর চেয়ে অনেক উচ্চ ও উন্নত পর্যায়ের। কাজেই তুচ্ছ মাটি আর মহাশূন্যের সাথে রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'আলার তুলনা কোথায় ? সরকারি বাগানে এমন বৃক্ষও বিদ্যমান, যার গোড়ায় পানির পরিবর্তে আগুন জ্বালানো হয়। এ বৃক্ষ আগুনের উষ্ণতায় সবুজ শ্যামল থাকে। যদি আগুনের উষ্ণতা কমে যায়, তা হলে শুকিয়ে যায়। সমুদ্রের এক প্রকার কীট আগুনে জন্মলাভ করে। এটা আগুনে জ্বলেও যায় না, মরেও না; বরং আগুনই তার জন্য জীবনীশক্তি এবং আগুন থেকে পৃথক হওয়াটা তার জন্য মৃত্যুর কারণ।

৪. সহস্র মণ ওজনের উড়োজাহাজের আসমানে উড্ডয়ন এবং ঘন্টায় হাজারো মাইল পরিভ্রমণ সমস্ত দুনিয়ার সামনে বিদ্যমান, কাজেই মাত্র একজন মানুষের উর্ধ্বে আরোহণ এবং ভ্রমণের ব্যাপারে কেন তারা মাথা ব্যথা ও অস্বস্তিতে ভোগেন !

৫. আজকাল এমন লিফটও আবিষ্কৃত হয়েছে যে, বিদ্যুতের একটি সুইচ টিপলেই মিনিটের মধ্যে শত মনযিলের শেষ বালাখানায় নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা কি এ ধরনের একটি সিঁড়ি বা লিফট বানাতেও অক্ষম, যা তাঁর কোন খাস বান্দাকে যমীন থেকে মিনিটের মধ্যে আসমানে পৌঁছে দিতে পারে ?

৬. বিশিষ্ট আবিষ্কারকদের পক্ষ থেকে একের পর এক ঘোষণা আসছে যে, বিজ্ঞান ও দর্শনের মাধ্যমে আজ অবধি যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা নিতান্তই সামান্য। ভবিষ্যতে যা আবিষ্কার করার আশা করা যায়, তা এসব থেকে কয়েক হাজার গুণ বেশি। এমনকি এ পর্যন্ত ঘোষণা আসছে যে, অদূর ভবিষ্যতে আমরা গ্রহ-নক্ষত্রে পৌঁছে যাব।

আফসোসের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের সংস্কৃতিবান ভ্রাতৃবর্গ, যারা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রাহক ও খরিদ্দার, তারা এ খবরগুলো খুবই আনন্দের সাথে শোনেন এবং শোনান। কিন্তু যখন উম্মী নবী (সা)-এর মি'রাজের খবর শোনেন, তখন রকম রকম সন্দেহ এবং কুমন্ত্রণা তাদের সামনে এসে যায়। ইউরোপের ওহীকে তারা বিনা বিচার-বিবেচনায় গ্রহণ করেন, কিন্তু আল্লাহর ওহীর মধ্যে সন্দেহ পোষণ করেন ও সন্দেহের সৃষ্টি করেন !

৭. ইয়াহূদীদের নিকট হযরত ইলইয়া (আ)-এর এ নশ্বর দেহ সহ জীবিত আসমানে উঠে যাওয়া এবং খ্রিস্টানদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর জীবিত আসমানে উঠে যাওয়া এবং শেষ যামানায় আসমান থেকে অবতরণ স্বীকৃত বিষয়। অনুরূপভাবে হযরত নবী করীম (সা)-এর মুবারক দেহ নিয়ে আসমানে আরোহণ এবং অবতরণ কুরআন-হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যদি আসমানে গমন জ্ঞানত অসম্ভব হতো, তবে সাহাবা এবং তাবিঈগণ কখনই এ ব্যাপারে একমত হতেন না।

হজ্জের মওসুমে ইসলামের দাওয়াত

যখন তিনি দেখলেন যে, কুরায়শগণ তাদের সেই শত্রুতায় নিমজ্জিত রয়েছে। কাজেই যখন হজ্জের মওসুম আসে এবং দূর প্রান্ত থেকে লোকজন আগমন করে, তখন তিনি নিজেই তাদের অবস্থানস্থলে চলে যেতেন এবং ইসলামের দাওয়াত দিতেন, সত্য দীনকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাতেন। তিনি তো মানুষকে তাওহীদ-একত্ববাদ, সত্য ও নিষ্ঠার প্রতি আহ্বান জানাতেন, আর তাঁর চাচা আবূ লাহাব, যার নাম ছিল আবদুল উযযা ইবন আবদুল মুত্তালিব, সে নিজের সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে নবী (সা)-এর পিছে পিছে বলে ফিরত যে, হে লোক সকল ! দেখ, এ ব্যক্তি তোমাদেরকে লাত-উযযা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চায় এবং নব আবিষ্কার ও ভ্রষ্টতার প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করে। তোমরা কখনই এর অনুসরণ করবে না।

মোটকথা, তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামকে পেশ করেন এবং ইসলামকে সাহায্য-সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এতে কেউ নম্রভাবে জবাব দেয় আর কেউবা শক্ত এবং রূঢ়ভাবে। কেউ কেউ বলল, আমরা এ শর্তে আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করব যে, যদি আপনি জয়লাভ করেন তা হলে আমাদেরকে আপনার খলীফা বানাবেন। তিনি বললেন, এটা আমার এখতিয়ারে নয়; বরং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন বানাবেন। ঐ লোকগুলো বলল, ভাল কথা! আমরা আপনার সঙ্গী হয়ে নিজেদের গর্দান কাটাব, নিজেদের বক্ষকে আরবদের তীরের নিশানা বানাব, আর যখন আপনি সফলকাম হবেন তখন অন্য কেউ আপনার খলীফা ও উত্তরাধিকারী হবে।[১] বনী যাবল ইবন শায়বান সম্প্রদায়ের কাছে তিনি গেলেন, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। মাফরুক ইবন উমর এবং হানী ইবন কাবীসা ঐ সম্প্রদায়ের সর্দারদের মধ্যে ছিল। হযরত আবূ বকর (রা) মাফরুককে সম্বোধন করে বললেন, তোমার কাছে কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়াত ও রিসালাতের সংবাদ পৌঁছেনি ? এই যে, যিনি আমার সাথে, ইনিই আল্লাহর রাসূল। মাফরুক বলল, হ্যাঁ, আমি তাঁর কথা শুনেছি। হে কুরায়শ ভাই, আপনি কিসের প্রতি আহ্বান জানান ? তিনি অগ্রসর হয়ে বললেন, আল্লাহ এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই আর আমাকে তাঁর রাসূল এবং বাণীবাহক মান্য কর আর এ দীনের সাহায্য কর। কুরায়শগণ আল্লাহর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলকে মিথ্যা বলেছে আর বাতিলের নেশায় হক থেকে বিমুখ হয়েছে। আর وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ "আল্লাহই সবচে' বেশি অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত।" অর্থাৎ এ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিতের তো বিন্দু পরিমাণও প্রয়োজন নেই যে, তোমরা তাঁর দীন গ্রহণ কর, এর সাহায্য-সহযোগিতায় আত্মনিয়োগ কর। তবে হ্যাঁ, যদি নিজেদের কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা কর, তবে সত্য ও সুপথকে গ্রহণ কর এবং বাতিল ও ভ্রষ্ট পথ ত্যাগ করো। মাফরুক

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৪৮।

বলল, আপনি আর কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? নবীজি (সা) তখন এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"আপনি বলুন, এসো, আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয় পাঠ করে শোনাই, যা তোমাদের রব তোমাদের প্রতি নিষিদ্ধ করেছেন। (আর তা হলো :) আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিযক দিয়ে থাকি। আর গোপনে বা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না। বৈধভাবে ছাড়া আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন এমন কোন প্রাণীকে হত্যা করবে না। এগুলোই তোমাদের প্রতি উপদেশ, যাতে তোমরা অনুধাবন কর।" (সূরা আন'আম : ১৫১)

মাফরূক বলল, আল্লাহর শপথ ! এ বাক্যতো কোন মর্ত্যবাসীর নয়। হে কুরায়শ ভ্রাতা ! আপনি আর কি কি বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন ? তখন তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ইনসাফ এবং অনুগ্রহ করার, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার। আর অশ্লীল, অসত্য এবং বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়াকে তিনি নিষেধ করেন। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হলো, যাতে তোমরা স্মরণ কর।" (সূরা নাহল : ৯০)

মাফরূক বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি খুবই উত্তম চরিত্র এবং পসন্দনীয় কর্মের প্রতি আহ্বান করেছেন। কিন্তু অপারগতা হলো আমি আমার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা না করে তাদের অসাক্ষাতে আপনার সাথে কোন চুক্তি করা সমীচীন মনে করি না। কি জানি ওরা এ চুক্তি গ্রহণ করবে, না প্রত্যাখ্যান করবে। এ ছাড়াও আমরা রোম সম্রাটের প্রভাবাধীন, সম্রাটের সাথে আমরা চুক্তি করেছি যে, নতুন কোন কাজই তাকে না জানিয়ে আমরা করব না। আমার প্রবল ধারণা, যদি আমরা আপনার সাথে এ ধরনের কোন চুক্তি করি, তবে তা অবশ্যই সম্রাটের অপসন্দ হবে।

মাফরূকের এ ধরনের সত্য ও সাদাসিধে কথা নবী (সা)-এর খুবই পসন্দ হলো। তাই বললেন, আল্লাহ তাঁর দীনের নিজেই সাহায্যকারী, আর যে ব্যক্তি এ দীনের পৃষ্ঠপোষকতা করবে, অচিরেই আল্লাহ তাকে রোম সম্রাটের সম্পদ ও সাম্রাজ্যের

উত্তরাধিকারী বানাবেন।[১] এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে মজলিস থেকে উঠে পড়লেন এবং আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ের যে সব লোক মদীনা মুনাওয়ারা থেকে এসেছে, তাদের বৈঠকে উপস্থিত হলেন। (যেমন শীঘ্রই তাদের বর্ণনা আসছে) তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ওয়াদা করলেন।[২]

হাফিয আসকালানী বলেন, হাকিম, আবূ নুয়াইম ও বায়হাকী হাসান সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে হযরত আলী (ক) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৭১; وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة وبيعة العقبة অধ্যায়)।

সতর্ক বাণী : হাফিয আবূ নুয়াইম ইস্পাহানী বলেন, মাফরূক ইসলাম গ্রহণ করেছিল কি না আমার জানা নেই।[৩]

হযরত আয়াস ইবন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ

ঐ বছরেই আবুল হায়সার আনাস ইবন রাফে' কতিপয় যুবক সহ এ উদ্দেশে মক্কায় আগমন করে যে, খাযরাজ সম্প্রদায়ের মুকাবিলায় কুরায়শের কোন গোত্রকে মিত্র বানানো যায় কি না। ঐ যুবকদের মধ্যে আয়াস ইবন মু'আযও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিকট গেলেন এবং বললেন, যে উদ্দেশে এসেছ, তার চেয়ে উত্তম কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। আবুল হায়সার এবং তার সঙ্গীগণ বললেন, সেটা কি? নবীজি (সা) বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আমাকে এ জন্যে প্রেরণ করেছেন যে, আমি তাঁর বান্দাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করব যেন বান্দারা কেবল আল্লাহরই ইবাদত করবে, কোন বস্তুকে কোনভাবেই তাঁর সাথে শরীক করবে না। আর আল্লাহ আমার প্রতি একটি কিতাব নাযিল করেছেন। এরপর তিনি কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন এবং তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন।

আয়াস ইবন মু'আয বললেন, ওহে স্বগোত্রীয়গণ, আল্লাহর কসম, যে কাজের উদ্দেশে আমরা এসেছি, এটা তার চাইতে উত্তম। আবুল হায়সার কঙ্কর তুলে আয়াসের মুখে নিক্ষেপ করল এবং বলল, আমরা এ কাজের জন্য আসিনি। আয়াস চুপ হয়ে গেলেন, আর নবী (সা) মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ওরা মদীনায় ফিরে গেল। কিছুদিন যেতে না যেতেই আয়াস ইবন মু'আয ইনতিকাল করলেন। মৃত্যুকালীন সময়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ' ইত্যাদি কালেমা তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল। উপস্থিত সকলেই তা শুনছিল। এতে কারো কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন।[৪]

---

১. বিশ্ববাসী দেখেছে যে, আল্লাহ তা'আলা সাহাবা কিরাম (রা) কে সামান্য কয়েক দিনের মধ্যেই রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিকারী বানিয়েছেন।

২. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৪৬৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৩।

৩. উসদুল গাবা, ৪খ. পৃ. ৪০৯।

৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮; আল-ইসাবা, ১খ. পৃ. ৯১।

হাফিয হায়সামী বলেন, আহমদ ও তাবারানী ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।[১]

মদীনা মুনাওয়ারায় ইসলামের সূচনা (১১শ নববী বর্ষ)

মদীনার অধিকাংশ অধিবাসী ছিল আওস ও খাযরাজ সম্প্রদায়ভুক্ত, যারা ছিল মুশরিক ও মূর্তিপূজক। আর এদের সাথে কিছু ইয়াহূদীও বাস করত, যারা ছিল আহলি কিতাব ও শিক্ষিত। মদীনায় ইয়াহূদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু ছিল, কাজেই যখন তাদের সাথে আওস বা খাযরাজের ঝগড়া-বিবাদ লেগে যেত। তখন ইয়াহূদীরা বলত, শীগগিরই আখিরী নবী প্রেরিত হতে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর আনুগত্য করব এবং তাঁকে সাথে নিয়ে আমরা তোমাদেরকে 'আদ ও ইরাম জাতির মত ধ্বংস ও পর্যুদস্ত করব।

যখন হজ্জের মওসুম এলো, খাযরাজের কিছু লোক মক্কায় আগমন করল। এটা ছিল নুবূয়াতের ১১শ বর্ষ। হযরত রাসূল (সা) তাদের কাছে গেলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তাদের সামনে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন। এ ব্যক্তিগণ তাঁকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন এবং পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, আল্লাহর কসম, ইয়াহূদীরা যাঁর উল্লেখ করে থাকে, তিনি সেই নবী। দেখ, এমনটি না হয় যে, সৌভাগ্য ও মর্যাদার দিক থেকে ইয়াহূদীরা যেন আমাদের অগ্রগামী হয়ে না যায়। আর ঐ বৈঠক থেকে উঠার পূর্বেই তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো আপনার প্রতি ঈমান আনলাম, আর ইয়াহূদীদের সাথে আমাদের প্রায়ই ঝগড়া হয়। যদি আপনি অনুমতি দেন তো আমরা ফিরে গিয়ে তাদেরও ইসলামের দাওয়াত দিতে পারি। যদি ওরাও এ দাওয়াত গ্রহণ করে আর এ অবস্থায় তারা এবং আমরা একতাবদ্ধ হই, তা হলে অতঃপর আপনার চেয়ে শক্তিশালী কেউ হবে না। এ ঈমান আনয়নকারী ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তি, নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হল :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা),
২. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
৩. হযরত রাফি ইবন মালিক ইবন আজলান (রা),
৪. হযরত কুতায়বা ইবন আমির (রা)
৫. হযরত উকবা ইবন যুরারা (রা)
৬. হযরত জাবির[২] ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা)

---

১. মাজমু'আ-উয-যাওয়ায়িদ, ৬খ. পৃ. ৩৬০।

২ তিনি অপর জাবির, জাবির নামে যে সাহাবী প্রসিদ্ধ, তিনি হচ্ছেন জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন হারাম (রা)। (যারকানী, ১খ. পৃ.৩১১)।

কতিপয় জীবনী লিখক হযরত জাবির-এর পরিবর্তে হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)-এর নাম উল্লেখ করেছেন।[1] ফাতহুল বারী; وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة وبيعة العقبة অধ্যায়।[2]

এ ছয় ব্যক্তিত্ব রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা যে বৈঠকেই বসতেন, সেখানেই নবী (সা)-এর উল্লেখ করতেন। প্রচারণা এ পর্যন্ত পৌঁছে যে, মদীনার কোন গৃহ এবং কোন মজলিস তাঁর উল্লেখ থেকে বাদ ছিল না।

আনসারদের প্রথম বায়'আত (১২শ নববী বর্ষ)

যখন পরবর্তী বৎসর এলো, যা ছিল নবূয়াতের দ্বাদশতম বর্ষ, বার ব্যক্তি নবীজির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করেন। পাঁচজন তো পূর্ববর্তীদের মধ্যেই, আর বাকি সাতজন ছিলেন নতুন। যাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা),
২. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
৩. হযরত রাফি' ইবন মালিক (রা),
৪. হযরত কুতায়বা ইবন আমির (রা),
৫. হযরত উকবা ইবন যুরারা (রা) এ বৎসর হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা) উপস্থিত ছিলেন না;
৬. হযরত মু'আয ইবন হারিস (রা) [অর্থাৎ হযরত আউফ ইবন হারিস (রা)-এর ভাই];
৭. হযরত যাকওয়ান[3] ইবন আবদুল কায়েস (রা),
৮. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা),
৯. হযরত ইয়াযীদ ইবন সা'লাবা (রা),
১০. হযরত আব্বাস ইবন উবাদা ইবন নাযলা (রা),
১১. হযরত আবুল হায়সাম মালিক ইবন তায়হান (রা),
১২. হযরত উয়াইম ইবন সাঈদা (রা)।

এ বার ব্যক্তিত্ব নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং মিনায় আকাবার সন্নিকটে নবী (সা)-এর হাতে এ মর্মে বায়'আত হন যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করব না, চুরি এবং যিনা করব না, সন্তানদের হত্যা করব না, কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম করব না। এটা ছিল আনসারদের প্রথম বায়'আত, যাকে আকাবার প্রথম বায়'আত বলা হয়।

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৫০।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮।

৩. যাকওয়ান (রা) মক্কায়ই থেকে যান, পরে হিজরত করে মদীনায় যান। এ জন্যে কেউ কেউ তাঁকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন।

এঁরা যখন বায়'আত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে উদ্যত হন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম ও হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) কে কুরআন মজীদ এবং ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষাদানের জন্য তাঁদের সঙ্গে প্রেরণ করা হয় এবং তাঁরা মদীনায় পৌছে হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-এর গৃহে অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং মদীনার মুসলমানদের নামাযে ইমামতি করতেন। তিনিই ছিলেন ইমাম। একদিন হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন, অনেক লোক একত্রিত হয়েছিল।

উসায়দ ইবন হুযায়র যখন এ খবর পেলেন, খোলা তরবারি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, আপনি এখানে কেন এসেছেন, আমাদের নারী ও শিশুদের কেন বিভ্রান্ত করছেন ? আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) বললেন, যদি সম্ভব হয়, তবে দয়া করে সামান্য সময় এখানে বসুন, আমি যা বলি মেহেরবানী করে শুনুন। যদি পসন্দ হয় গ্রহণ করবেন, আর না হলে চলে যাবেন। উসায়দ ইবন হুযায়র বললেন, এটা অবশ্য আপনি ইনসাফপূর্ণ কথাই বলেছেন। এ বলে তিনি বসে পড়লেন। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) ইসলামের সৌন্দর্য বর্ণনা করলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন। শুনে উসায়দ ইবন হুযায়র বললেন, مَا اَحْسَنَ هٰذَا الْكَلَامُ وَاَجْمَلَهُ "কত উত্তম, কতই না চমৎকার কালাম !" এবং জিজ্ঞেস করলেন এ ধর্মে প্রবেশ করতে হলে কি করতে হয় ? মুস'আব (রা) বললেন, প্রথমে শরীর এবং পোশাক পবিত্র করুন এবং গোসল করুন। এরপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন এবং নামায আদায় করুন।

উসায়দ (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে পোশাক পবিত্র করে গোসল করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর বললেন, আর এক ব্যক্তি আছেন, সা'দ ইবন মু'আয, যদি তিনি মুসলমান হন, তা হলে আওস সম্প্রদায়ের কেউই অমুসলমান থাকবে না। আমি এখনই গিয়ে তাকে আপনার নিকট প্রেরণ করছি। সা'দ ইবন মু'আয উসায়দ (রা) কে আসতে দেখেই বললেন, যে উসায়দ এখান থেকে গেল, এ যেন সে উসায়দ নয়! নিকটে পৌঁছলে সা'দ উসায়দকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করলে ? উসায়দ বললেন, আমি তো তার কথায় ক্ষতিকর কিছু পাইনি। সা'দ ইবন মু'আয এতে রাগান্বিত হলেন। তরবারি খুলে নিয়ে নিজেই সেখানে উপস্থিত হলেন এবং আস'আদ ইবন যুরারা (রা) কে সম্বোধন করে বললেন, যদি তোমার সাথে আমার নৈকট্য না থাকত এবং যদি তুমি আমার খালাত ভাই না হতে, তা হলে এখনই এ তলোয়ার দিয়ে ফয়সালা করে দিতাম। সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার জন্য তুমিই ওদের এখানে এনেছ।

মুস'আব (রা) বললেন, ওহে সা'দ, এটা কি হতে পারে না যে, তুমি এখানে কিছুক্ষণ বসে আমার কথা শুনবে, পসন্দ হলে গ্রহণ করবে, আর না হলে যা খুশি

করবে ? সা'দ "তুমি ইনসাফের কথাই বলেছ" বলে বসে পড়লেন। মুস'আব (রা) তার সামনে ইসলাম উপস্থাপন করলেন এবং পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন। শোনামাত্রই সা'দের রং পরিবর্তন হয়ে গেল। বললেন, এ ধর্মে প্রবেশের পথ কি ?

মুস'আব (রা) বললেন, প্রথমে শরীর এবং পোশাক পবিত্র করুন এবং গোসল করুন। এরপর কালেমা শাহাদাত পাঠ করুন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করুন। সা'দ (রা) তৎক্ষণাৎ উঠে পোশাক পবিত্র করে গোসল করলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। আর এখান থেকে উঠে সোজা নিজের কওমের বৈঠকে ফিরে গেলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা দূর থেকেই দেখে বুঝে ফেলল যে, সা'দ পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। মজলিসে পৌঁছে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা আমাকে কেমন মনে কর ? সবাই সমস্বরে বলল, তুমি আমাদের সর্দার, মতামত গ্রহণকারী, প্রসিদ্ধ, সবচে' উত্তম ও মর্যাদাবান। সা'দ বললেন আল্লাহ্র কসম, আমি সে পর্যন্ত তোমাদের সাথে কথা বলব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনে আসছ। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হলো না, বনী আবদুল আশহাল গোত্রের এমন কোন পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক অবশিষ্ট থাকলো না যারা মুসলমান হয়নি।[১]

বনী আবদুল আশহাল গোত্রের মাত্র এক ব্যক্তি আমর ইবন সাবিত, যার উপাধি ছিল উসায়রিম। তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রয়ে গেলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেই জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন ও শহীদ হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রসিকতা করে বলতেন, বল তো ঐ ব্যক্তি কে ছিলেন, যিনি এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েননি, অথচ জান্নাতে পৌঁছে গেছেন।

যখন লোকেরা জবাব না দিত, তখন নিজেই বলতেন, তিনি হলেন বনী আবদুল আশহাল গোত্রের উসায়রিম (রা)। [ইবন ইসহাক হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হাসান সনদে এক দীর্ঘ হাদীসে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন]।[২]

হযরত রিফা'আ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত রিফা'আ ইবন রাফে যুরাকী (রা) বলেন, ছয় আনসারীর মক্কায় আগমনের পূর্বেই আমি এবং আমার এক খালাত ভাই মু'আয ইবন আফরা মক্কায় আগমন করি এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদের সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং বলেন, রিফা'আ, বল দেখি আসমান, যমীন ও পাহাড়গুলো কে সৃষ্টি করেছেন ? আমি বললাম, আল্লাহ। তিনি বললেন, স্রষ্টা ইবাদতের হকদার, নাকি সৃষ্টি ? আমি বললাম,

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৫৮; উপরন্তু ইবন হিশাম, তাবারী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া।

২ যারকানী, ১খ. পৃ.৩১৬।

স্রষ্টা। তিনি বললেন, তা হলে এ মূর্তিগুলো তোমাদের ইবাদত করবে এবং তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে। এ জন্যে যে, এ মূর্তিগুলো তোমাদের সৃষ্টি এবং তোমাদেরকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। আর আমি তোমাকে এক আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানাচ্ছি। তোমরা আল্লাহকে এক স্বীকার কর এবং কেবল তাঁরই ইবাদত-বন্দেগী কর, আমাকে আল্লাহর রাসূল ও নবী বলে স্বীকার কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, যুলুম-অত্যাচার ছেড়ে দাও। আমি বললাম, নিঃসন্দেহে আপনি উন্নততর কর্ম এবং পবিত্র চরিত্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তাঁর নিকট থেকে উঠে হারাম শরীফে পৌঁছলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বললাম : اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।" (হাকেম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি সহীহ হাদীস; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ.১৮২)।

মদীনা মুনাওয়ারায় জুমু'আর জামাআত

ঐ বৎসরই হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা) মদীনা মুনাওয়ারায় জুমু'আর জামাআত কায়েম করেন। তিনি যখন দেখলেন যে, ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের একত্রিত হওয়ার জন্য সপ্তাহে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট আছে। ইয়াহূদীরা শনিবারে এবং খ্রিস্টানেরা রোববারে এক জায়গায় একত্রিত হয়। এ জন্যে তাঁর ধারণা হলো যে, মুসলমানদের জন্যও সপ্তাহে একটি দিন এভাবে নির্দিষ্ট করা করা যায়, যে দিন সব মুসলমান একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির ও শোকর করবে, নামায আদায় করবে এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী করবে। আস'আদ ইবন যুরারা (রা) এ জন্যে শুক্রবারটি বেছে নিলেন এবং ঐ দিন সবাইকে নামায পড়ালেন।

আবদ ইবন হুমায়দ ইবন সিরীন সূত্রে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম (রা) শুধু নিজেদের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রথমত জুমু'আ কায়েম করলেন এবং দ্বিতীয়ত জুমু'আর দিনটি, যাকে জাহিলী যুগে আরূবা অর্থাৎ ইয়াওমে আরূবা বলত। এ দিনের নাম 'ইয়াওমুল জুমু'আ' নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তা'আলার ওহী এ উভয় ইজতিহাদকেই অনুমোদন করে। যে প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"হে মু'মিনগণ, জুমু'আর দিনে যখন নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ কর।"

(সূরা জুমু'আ : ৯)

যা দ্বারা জুমু'আ ফরয হওয়ার বিষয়টিও জানা গেল এবং এটাও জানা গেল যে; আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে 'ইয়াওমুল জুমু'আ' নামটিই পসন্দনীয়। আল্লাহর ওহী

জাহিলী যুগে প্রচলিত 'ইয়াওমে আরূবা' নামটি প্রত্যাখ্যান করে এবং আনসারীগণ যে নামটি নির্ধারণ করেছেন, অবলীলায় তা ব্যবহার করে। আর এ রীতি সূচনা দ্বারা আনসারীগণের ইজতিহাদ প্রশংসনীয় অনুমোদন লাভ করে।

আর এর মাত্র কয়েক দিন পরেই জুমু'আ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক নির্দেশনামা হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) বরাবরে পৌঁছে যে, সবাই মিলে দ্বিপ্রহরের পর আল্লাহর দরবারে দু'রাকাআত নামাযের মাধ্যমে নৈকট্য হাসিল কর। [দারু কুতনী হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ শব্দমালা যারকানীর, ১খ. পৃ. ৩১৫]।

হযরত আবদুর রহমান ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, আমার পিতা কা'ব ইবন মালিক (রা) যখনই জুমু'আর আযান শুনতেন, আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-এর জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতেন। আমি একবার তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, মদীনায় সর্বপ্রথম আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-ই আমাদেরকে জুমু'আ পড়িয়েছেন।

ফায়েদা : আল্লামা সুহায়লী বলেন, ইসলামে সর্বপ্রথম আস'আদ ইবন যুরারা (রা)-ই জুমু'আর প্রতিষ্ঠা করেন এবং জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রপিতামহ কা'ব ইবন লুয়াই জুমু'আ প্রতিষ্ঠা করেন, যেমনটি নবী (সা)-এর নসবনামার বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে।

আনসারদের দ্বিতীয় বায়'আত (১৩শ নববী বর্ষ)

এর পরবর্তী বছর যখন এলো, সেটা ছিল নবূয়াতের ১৩শ বছর। হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা) মুসলমানদের একটি দলসহ হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় যাত্রা করলেন। মুসলমানগণ ছাড়া আওস এবং খাযরাজ গোত্রীয় মুশরিকগণ, যারা তখনো ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়নি, তারাও হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সংখ্যায় তারাই ছিল বেশি, চারশ'রও অধিক। আর প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল পচাত্তর, যাদের মধ্যে তিহাত্তর জন ছিলেন পুরুষ এবং দু'জন ছিলেন স্ত্রীলোক–যাঁরা নবী (সা)-এর হাতে ঐ ঘাঁটিতেই বায়'আত হন, যেখানে পূর্ববর্তীগণ বায়'আত হয়েছিলেন। এ বায়'আতের নাম আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত। আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) বায়'আতে অংশগ্রহণকারী মহাত্মাগণের যে নাম উল্লেখ করেছেন, তা পচাত্তর থেকে কিছু বেশি। যেগুলো নিম্নরূপ :

আলিফ বর্ণ

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা), ২. হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা),
৩. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা), ৪. হযরত আওস ইবন সাবিত (রা),
৫. হযরত আওস ইবন ইয়াযীদ (রা),

বা বর্ণ

৬. হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা), ৭. হযরত বিশর ইবন বারা ইবন মারূর (রা),

৮. হযরত বশীর ইবন সা'দ (রা),
৯. হযরত বুহায়র ইবন হায়সাম (রা),

সা বর্ণ

১০. হযরত সাবিত ইবন জাযা (রা), ১১. হযরত সালাবা ইবন আদী (রা),
১২. হযরত সালাবা ইবন গানামা (রা),

জীম বর্ণ

১৩. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা), ১৪. হযরত জাবির ইবন সাখরা (রা),

হা বর্ণ

১৫. হযরত হারিস ইবন কায়স (রা),

খা বর্ণ

১৬. হযরত খালিদ ইবন যায়দ (রা), ১৭. হযরত খালিদ ইবন আমর ইবন আবূ কা'ব (রা),
১৮. হযরত খালিদ ইবন আমর ইবন আদী (রা), ১৯. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা), (কেবল ওয়াকিদীর বর্ণনামতে)।
২০. হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা), ২১. হযরত খাদীজ ইবন সালামা (রা),
২২. হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ ইবন সালাবা (রা),

যাল বর্ণ

২৩. হযরত যাকওয়ান ইবন আবদে কায়স (রা), (আকাবার উভয় বায়'আতে অংশগ্রহণকারী)।

রা বর্ণ

২৪. হযরত রাফি' ইবন মালিক ইবন আজলান (রা), ২৫. হযরত রিফা'আ ইবন রাফি ইবন মালিক (রা),
২৬. হযরত রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির (রা), ২৭. হযরত রিফা'আ ইবন আমর (রা),

ঝা বর্ণ

২৮. হযরত যিয়াদ ইবন উবায়দ (রা), ২৯. হযরত যায়দ ইবন সাহল আবূ তালহা (রা),

সীন বর্ণ

৩০. হযরত সা'দ ইবন যায়দ ইবন মালিক আল-আশহালী (রা), (কেবল ওয়াকিদীর বর্ণনা মতে)। ৩১. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা),

৩২. হযরত সা'দ ইবন রবী (রা), ৩৩. হযরত সা'দ ইবন উবাদাহ (রা)
৩৪. হযরত সালমা ইবন সালামা ৩৫. হযরত সালীম ইবন আমর (রা), ইবন ওয়াক্বাশ (রা),
৩৬. হযরত সিনান ইবন সায়ফী (রা), ৩৭. হযরত সাহল ইবন উতায়ক (রা),

শীন বর্ণ

৩৮. হযরত শামর ইবন সা'দ (রা),

সাদ বর্ণ

৩৯. হযরত সায়ফী ইবন সাওয়াদ (রা),

যোয়াদ বর্ণ

৪০. হযরত যাহহাক ইবন যায়দ (রা), ৪১. হযরত যাহহাক ইবন হারিসা (রা),

তোয়া বর্ণ

৪২. হযরত তুফায়ল ইবন নু'মান (রা),

যোয়া বর্ণ

৪৩. হযরত যাহীর ইবন রাফে' (রা),

আইন বর্ণ

৪৪. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা), ৪৫. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
৪৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা), ৪৭. হযরত আব্বাস ইবন নায়লা (রা),
৪৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রবী' (রা) ৪৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা);
৫০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা), (আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা)। ৫১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা),
৫২. হযরত আবস ইবন আমির (রা), ৫৩. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন তাহমান (রা), (অর্থাৎ আবুল হায়সাম ইবন তাহমানের ভ্রাতা; কেউ কেউ তাঁর নাম 'উবায়দ' স্থলে 'আতীক' বলেছেন)।
৫৪. হযরত উকবা ইবন আমর (রা), ৫৫. হযরত উকবা ইবন আমির (রা)
৫৬. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা), ৫৭. হযরত উবাদা ইবন হাযম (রা),
৫৮. হযরত আমর ইবন হারিস (রা), ৫৯. হযরত আমর ইবন গাযিয়্যা (রা),
৬০. হযরত আমর ইবন উমায়র (রা), ৬১. হযরত উমায়র ইবন হারিস (রা),
৬২. হযরত আওফ ইবন হারিস (রা), ৬৩. হযরত উয়ায়ম ইবন সাঈদাহ (রা),

ফা বর্ণ

৬৪. হযরত ফারওয়া ইবন আমর (রা),

ক্বাফ বর্ণ

৬৫. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা), ৬৬. হযরত কুতবাহ ইবন আমির (রা), (ইবন ইসহাক ব্যতীত সবাই তাঁর উল্লেখ করেছেন)।
৬৭. হযরত কায়স ইবন আমির (রা), ৬৮. হযরত কায়স ইবন আবূ সা'সা' (রা),

কাফ বর্ণ

৬৯. হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা),

মীম বর্ণ

৭০. হযরত মালিক ইবন তায়হান আবুল হায়সাম (রা),
৭১. হযরত মালিক ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন জুশূম (রা),
৭২. হযরত মাসঊদ ইবন ইয়াযীদ (রা),
৭৩. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা),
৭৪. হযরত মুয়ায ইবন হারিস (রা), (মাতা আফরার নামে পরিচিত)।
৭৫. হযরত মু'আয ইবন আমর আল-জমূহ (রা),
৭৬. হযরত মাকাল ইবন মুনযির (রা),
৭৭. হযরত মান ইবন আদী (রা),
৭৮. হযরত মাঊয ইবন হারিস (রা), (উম্মে আফরা নামে পরিচিত)।
৭৯. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),

নূন বর্ণ

৮০. হযরত নু'মান ইবন হারিসা (রা),
৮১. হযরত নু'মান ইবন আমর (রা),

হা বর্ণ

৮২. হযরত হানী ইবন নায়্যার আবূ বুরদাহ (রা),

ইয়া বর্ণ

৮৩. হযরত ইয়াযীদ ইবন সা'লাবাহ (রা),
৮৪. হযরত ইয়াযীদ ইবন খিযাম (রা),
৮৫. হযরত ইয়াযীদ ইবন আমির (রা),
৮৬. হযরত ইয়াযীদ ইবন মুনযির (রা),
৮৭.হযরত নাসীবাহ বিনতে কা'ব(রা),
৮৮.হযরত আসমা বিনতে আমর (রা)।

এ সমুদয় নাম আমরা আল্লামা ইবনুল জাওযী প্রণীত কিতাব 'তালকীহ্', পৃ. ২১৫ থেকে উদ্ধৃত করেছি। আল্লামা ইবন হিশাম তার সীরাতে এবং হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে প্রায় এই নামই উল্লেখ করেছেন। কেবল আট দশটি নাম নিয়ে হেরফের আছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) মানুষের ঘরে ঘরে, বাজারে এবং মেলায় গিয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং বলতেন : من يؤوني ومن ينصرني حتى ابلغ رسالة ربى وله الجنة "কে আছে, যে আমাকে আশ্রয় দেবে, কে আছে, যে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আল্লাহর বাণী প্রচার করতে পারি, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।" কিন্তু কোন নিরাপত্তাদানকারী বা সাহায্যকারী পাওয়া যেত না। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ইয়াসরিব থেকে তাঁর নিকট প্রেরণ করলেন। আমরা তাঁকে সত্য বলে মেনে নিলাম এবং আশ্রয় দান করলাম। আমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতো, সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসত। যখন মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম পৌঁছে গেল, তখন আমরা পরামর্শ করলাম, শেষ পর্যন্ত ক'দ্দিন আমরা আল্লাহ্র রাসূল (সা) কে এ

অবস্থায় থাকতে দেব যে, তিনি মক্কার পর্বতে-কন্দরে ভীত-পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুরবেন। (কাজেই) আমাদের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তি মক্কায় এলেন... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটির সনদ উত্তম। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৫৯)। আর হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন, আহমদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। (মাজমা-উয-যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৪৬)। কাফেলা মক্কায় পৌঁছলে মুসলমানগণ গোপনে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এ পয়গাম পৌঁছালেন যে, আমরা হযরতের কদমবুসি করার সৌভাগ্য অর্জন করতে ইচ্ছুক। তিনি আইয়ামে তাশরীকের সময় রাত্রিতে ঐ পবিত্র ঘাঁটিতে মিলিত হওয়ার ওয়াদা করলেন, যেখানে বিগত বছরে দ্বাদশ ব্যক্তি তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণে ধন্য হয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন, আর তাঁর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হযরত আব্বাস যদিও তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেননি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) কে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করতেন। বসামাত্র হযরত আব্বাস আনসারদের উদ্দেশ্য করে বললেন যে, মুহাম্মদ (সা) স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র (মানুষ যদিও তাঁর দীনের বিরোধী ছিল, কিন্তু যে সম্মান ও শ্রদ্ধাভরে তাঁকে দেখত, তা কারো ভাগ্যে জোটেনি)। আর আমরা তাঁর সহায়তা ও সাহায্যকারী। তিনি তোমাদের ওখানে যেতে চান। যদি তোমরা তাঁকে পূর্ণ সাহায্য ও হিফাযত করতে পারো এবং আমৃত্যু এর উপর অবিচল থাকো, তবে উত্তম। অন্যথায় এখনই সাফ সাফ বলে দাও।

আনসারীগণ বললেন, আপনি যা বললেন, তা আমরা শুনলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাছে কি চান, আমরা এ জন্য উপস্থিত আছি যে, আপনি নিজের জন্য এবং আল্লাহর জন্য যা ইচ্ছা, আমাদের থেকে ওয়াদা নিন।

তিনি (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি এবং ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তিনি কুরআন থেকে তিলাওয়াত করলেন এবং বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত-বন্দেগী কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। আর নিজের সঙ্গীদের জন্য চাই যে, আমাদেরকে আশ্রয় দান কর। যেভাবে নিজেদেরকে, নিজেদের সন্তান-সন্তুতি এবং স্ত্রীলোকদেরকে হিফাযত কর, সেভাবেই আমাদের হিফাযত কর। আনন্দে কিংবা বিষাদে, শান্তি কিংবা কষ্টে, দারিদ্র্যে কিংবা স্বচ্ছলতায়, সর্বাবস্থায় আমার আনুগত্য করবে এবং যা বলবো, শুনবে। আনসারীগণ বললেন, যদি আমরা এমনটি করি, তবে আমাদের জন্য কি পুরস্কার রয়েছে? তিনি বললেন, জান্নাত (অর্থাৎ আখিরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত)। আনসারীগণ বললেন, আমরা সবই মেনে নিলাম, আসুন, বায়'আতের জন্য পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন। হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা) আরয করলেন, ইয়া

রাসূলাল্লাহ, আমার কিছু নিবেদন আছে। আর তা এই যে, আমাদের এবং ইয়াহূদীদের মাঝে কিছু কিছু সম্পর্ক আছে। আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ঐ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এমনটি তো হবে না যে, যখন আল্লাহ আপনাকে বিজয় এবং সাহায্য নসীব করবেন, তখন আপনি মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করবেন আর আমাদেরকে (ছটফট করা অবস্থায়) এখানে ছেড়ে যাবেন। এটা শুনে আল্লাহর নবী (সা) হাসলেন এবং বললেন :

"কখনই নয়, তোমাদের আত্মা আমার আত্মা, তোমরা আমার এবং আমি তোমাদের, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা, তাদের সাথে আমারও শত্রুতা, যাদের সাথে তোমাদের মিত্রতা, তাদের সাথে আমারও মিত্রতা।"

এ কথার পর সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্টি ও আগ্রহের সাথে বায়'আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন।[১]

বায়'আতের জন্য সর্বপ্রথম কে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন; এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবন সা'দের একটি বর্ণনার দ্বারা সমুদয় বিভিন্ন মত একত্রিত হয়ে যায়। সুলায়মান ইবন নুজায়ম বলেন, যখন আওস এবং খাযরাজের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ হলো যে, কে সর্বপ্রথম তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত হয়েছেন। তখন কেউ কেউ বললেন, এর সঠিক জ্ঞান হযরত আব্বাস (রা)-এর হবে। কেননা তিনি ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, সর্বপ্রথম হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (যিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান ও ধন্য) তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত করেন। এরপর হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা) এবং তাঁর পর হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা)।[২]

হযরত আব্বাস ইবন উবাদা আনসারী (রা) (বায়'আতকে মযবুত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে) বললেন, "ওহে খাযরাজ গোত্র, তোমাদের জানা আছে কি, কোন্ বিষয়ের উপর তোমরা বায়'আত করছ ? মনে করো যে, আরব ও অনারবের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বায়'আত করছ। যদি ভবিষ্যতে বিপদাপদে ঘাবড়ে গিয়ে বায়'আত ভেঙে দেয়ার খেয়াল করে থাকো, তা হলে এখনই ছেড়ে দাও। বিপদের মুখে ছেড়ে দিলে, আল্লাহর কসম, তা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্থতার কারণ। যদি তোমরা অনাগত বিপদ ও কাঠিন্যের মুকাবিলা করার হিম্মত রাখো, আর নিজেদের জানমালের বাজী রেখে নিজেদের শপথ ও প্রতিজ্ঞায় অবিচল থাকতে পারো, তা হলে আল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সাফল্য দান করবেন।" সবাই বললেন, হ্যাঁ, এর উপরই তো আমরা বায়'আত করছি। তাঁর জন্য জানমাল উৎসর্গে

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, ঘটনাটি ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন ও ইবন হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৭৩।

২. আল্লামা যারকানী বলেন, বায়হাকী শা'বী থেকে শক্তিশালী সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তাবারানী ও আহমদ এটি বর্ণনা করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩১৭)।

আমরা কুণ্ঠিত নই, বিপদে ভীত হয়েও আল্লাহর কসম, আমরা এ বায়'আতকে বর্জন করতে প্রস্তুত নই।[১]

নকীব নির্বাচন

যখন সবাই বায়'আত গ্রহণ করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করেছিলেন। অনুরূপভাবে আমিও হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করছি। অতঃপর ঐ বারজনকে সম্বোধন করে বললেন যে, তোমরা স্ব-স্ব গোত্রের অভিভাবক ও যিম্মাদার, যেমন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ) এর পক্ষে অভিভাবক ছিলেন।[২]

নকীবগণের নাম, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দিন এবং তাঁদের এমন জান্নাতে প্রবেশ করান যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত

যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে রাসূলুল্লাহ (সা) নকীব নির্বাচিত করেছিলেন, তাঁদের পবিত্র নামসমূহ নিম্নরূপ :

১. হযরত আস'আদ ইবন যুরারা (রা), ২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা),
৩. হযরত সা'দ ইবন রবী' (রা), ৪. হযরত রাফে' ইবন মালিক (রা),
৫. হযরত আবূ জাবির আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা), ৬. হযরত বারা' ইবন মা'রূর (রা),
৭. হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা), ৮. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),
৯. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা), ১০. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা),
১১. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা), ১২. হযরত রিফা'আ ইবন আবদুল মুনযির (রা)।

আর কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি রিফা'আর পরিবর্তে আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা)-এর নাম উল্লেখ করেন। ইমাম মালিক (র) বলেন, আমাকে আনসারীদের মধ্যে জনৈক শায়খ বলেছেন যে, নকীব নির্বাচনের সময় জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ইশারায় বলে দিচ্ছিলেন, অমুককে ঘোষক নির্বাচন করুন।[৩]

ইমাম যুহরী বলেন, নবী (সা) আনসারদের সম্বোধন করে বলেন, আমি তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নকীব নির্বাচন করব। তোমাদের মধ্যে যেন কেউ এ ধারণা না করে যে, আমাকে কেন নকীব বানানো হলো না। তা এ জন্যে যে, আমি কেবল আদিষ্ট, যেমন নির্দেশ, তেমনই করব। আর জিবরাঈল আমীন (আ) তাঁর পাশে বসা ছিলেন। যাকে নকীব বানানো উদ্দেশ্য ছিল, তার দিকেই তিনি ইশারা করছিলেন।[৪]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৬।

২ ইবন সা'দ, ১খ. পৃ.১৫০।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ.৩১৭।

৪. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৭৭।

প্রভাত হলে এ সংবাদ যখন মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল, মক্কার কুরায়শগণ তখন ইয়াসরিববাসীর কাফেলার মূর্তি পূজক ও মুশরিক সদস্যদের এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করল। যেহেতু তাদের এ বিষয়ে কিছুই জানা ছিল না, সেহেতু তারা এ সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং বলল, এ সংবাদ পুরোপুরিই মিথ্যা। যদি এমনটি হতো তা হলে আমরা অবশ্যই অবগত হতাম।[১]

পরে এ কাফেলা মদীনায় যাত্রা করল। তারা প্রস্থানের পর কাফিররা এ খবরের সত্যতা অবহিত হলো। তারা আনসারদের ধরার জন্য ধাবিত হলো। কিন্তু ততক্ষণে তারা নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে কেউ ধরা পড়ল না। কেবল হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) পিছনে ছিলেন। মাঝপথ থেকে তাঁকে ধরে এনে ওরা খুব মারধর করলো। হযরত জুবায়র ইবন মুতইম (রা) এসে তাঁকে ছাড়িয়ে নিলেন।[২]

বায়'আত কি ?

বায়'আত بَيْعٌ (বায়'উন) শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিক্রি করা, আর শরীয়তের পরিভাষায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার সাথে নিজের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার কাছে বিক্রি করে দেয়ার নাম বায়'আত।

কাজেই যখন এ বায়'আত হতে যাচ্ছিল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের প্রতি যা খুশি, শর্ত আরোপ করুন, কিন্তু এটা তো বলুন যে, এর বিনিময়ে আমরা কি পাব ? তিনি বললেন, জান্নাত। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) আরয করলেন : رَبِحَ الْبَيْعُ لاَنَقِيْلُ وَلاَنَسْتَقِيْلُ, "খুবই লাভজনক ক্রয়-বিক্রয়, আমরা এটা কম হওয়া বা বাতিল হওয়ায় সন্তুষ্ট হব না।"

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ - ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে কখনো (শত্রুদের) হত্যা করে আর কখনো বা নিহত হয়। তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৭।

২ প্রাগুক্ত।

যে সওদা করেছ. সেজন্য আনন্দ কর, আর এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা তাওবা ১১১; ফাতহুল বারী. ৬খ. পৃ. ২, কিতাবুল জিহাদ)

জান্নাতে একটি বাজার বসবে, যারা এখানে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার হাতে নিজেদের জান-মাল বিক্রি করে দিয়েছে, আর সমস্ত জান ও মাল তাঁর হাওয়ালা করে দিয়েছে, সে সেখানে তার বিনিময় পাবে এবং ঐ বাজারে যা খুশি, বিনামূল্যে গ্রহণ করতে পারবে। কেননা সে তো মূল্য (জান ও মাল) পূর্বেই পরিশোধ করে দিয়েছে।

জনৈক আরব কবি এ কথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায় :

وحی علی السوق الذی فیه یبلقی ار   محبون ذاك السوق للقوم معلم

فماشئت خذ منه بلاثمن له   فقد اسلف التجار فيه واسلموا

(حاوی الارواح)

একটি জরুরী সতর্ক বাণী

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বায়'আতের সময় কেবল পুরুষদের সাথে মুসাফাহা করতেন, স্ত্রীলোকদের সাথে মুসাফাহা করতেন না। তাদের থেকে শুধু মৌখিক শপথ গ্রহণ করে বলতেন, যাও, তোমাদের বায়'আত নেয়া হলো।[১]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন :

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْه مِنَ الْمُؤْمِنَات بِهٰذَا الْاٰيَة يَقُوْلُ اللّٰهُ يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَات يُبَايِعُوْنَكَ اِلٰى قَوْله غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ فَمَنْ اَقَرَّ هٰذَا الشَّرْط مِنَ الْمُؤْمِنَات قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَدْ بَايَعْتكَ كَلاَمًا وَلاَوَاللّٰه مَا مَسَّتْ يَدُهٗ يَدَ اَمْرَاَةٍ قَطُّ فِى الْمُبَايَعَة مَا يُبَايِعُهُنَّ اِلاَّ بِقَوْلِه قَدْ بَايَعْتُك عَلٰى ذٰلِكَ

"যে সকল স্ত্রীলোক হিজরত করে আসত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াত অনুসারে পরীক্ষা করতেন। যে স্ত্রীলোক সে শর্তাবলী গ্রহণ করত যা ঐ আয়াতে উল্লিখিত আছে, তাকে বায়'আত করে নিতেন এবং বলতেন, আমি তোমাকে কথার মাধ্যমে বায়'আত করে নিয়েছি। আল্লাহর শপথ, তাঁর পবিত্র হাত বায়'আত গ্রহণের সময় কোন স্ত্রীলোকের হাত স্পর্শ করেনি, শুধু মৌখিকভাবে কথার মাধ্যমে বায়'আত সম্পন্ন করতেন।"[২]

আর মুসনাদে আহমদ ও তাবারানীকৃত মুজামে হযরত আসমা বিনত আয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৬৩।

২ সহীহ বুখারী, ২খ. পৃ. ৭২৬।

اِنِّى لَا اُصَافِحُ النِّسَاءَ وَلٰكِنْ اٰخُذُ عَلَيْهِنَّ مَا اَخَذَ اللّٰهُ عَلَيْهِنَّ

"আমি স্ত্রীলোকদের সাথে মুসাফাহা করি না, শুধু আল্লাহর আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করি।"

এ রিওয়ায়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে তাবাকাতে ইবন সা'দ, মুসনাদে আহমদ এবং তিরমিযীতেও এসেছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্। কাজেই আজকাল কোন কোন পীরের এর বিরোধী যে সব কাজ প্রচলিত আছে, ইসলাম এর বিরুদ্ধে। এর দ্বারা প্রতারিত হবেন না।[1]

আনসারীদের কাফেলা যখন মক্কা থেকে মদীনা পৌঁছল, তখন ইসলামের ঘোষণা দিলেন। মদীনার অধিকাংশ গোত্র পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু কিছু কিছু বৃদ্ধ ব্যক্তি পূর্বেকার মূর্তিপূজায় কঠোরভাবে নিবেদিত ছিল। এদের মধ্যে বনী সালামা গোত্রের সর্দার আমর ইবন জামুও ছিলেন। তার পুত্র মু'আয ইবন আমর ইবন জামু এইমাত্র মক্কা থেকে হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ফিরছিলেন। আমর ইবন জামু কাঠের একটি মূর্তি বানিয়ে রেখেছিলেন, যাকে তিনি খুবই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। এক রাতে খোদ তার পুত্র মু'আয ইবন আমর, মু'আয ইবন জাবাল এবং বনী সালামার কতিপয় মুসলমান যুবক আমরের মূর্তিটিকে নিয়ে গিয়ে একটি চৌবাচ্চায় উপুড় করে রেখে দিলেন। প্রভাত হলে আমর ইবন জামু দেখলেন, তার স্বঘোষিত খোদা উধাও হয়ে গেছে। আফসোস করে বললেন, না জানি কে আমার প্রভুকে নিয়ে পলায়ন করেছে। আর এর খোঁজে এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। দেখলেন, সেটি একটি চৌবাচ্চায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সেখান থেকে বের করে একে গোসল করালেন এবং সুগন্ধি লাগালেন। যখন পরবর্তী রাত এল, ঐ ব্যক্তিগণ আবারো অনুরূপ কাজই করলেন যে, সেটিকে একটি গর্তে ফেলে দিলেন। প্রভাত হলে আমর ইবন জামু এটি খুঁজে নিয়ে এলেন, গোসল করালেন এবং সুগন্ধি লাগালেন।

যখন পরপর কয়েক দিন একই কাণ্ড ঘটল, তখন আমর ইবন জামু একটি তরবারি এনে ঐ মূর্তির কাঁধে রেখে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জানি না, কোন্ ব্যক্তি তোমার সাথে এমন ব্যবহার করে। তোমার মাঝে যদি কোন কল্যাণ ও গুণপনা থেকে থাকে, তা হলে এই তরবারি থাকল, তুমি নিজে তোমাকে রক্ষা কর। যখন রাত্রি হলো, তখন লোকে ঐ মূর্তির ঘাড় থেকে তরবারি সরিয়ে নিল এবং একটি মৃত কুকুর ও মূর্তিটিকে একই রশি দিয়ে বেঁধে একটি গর্তের উপর লটকিয়ে রাখল। সকালে যখন দেখলেন মূর্তিটি উধাও হয়েছে, আমর ইবন জামু এর খোঁজে বের হলেন। দেখলেন, ঐ মূর্তি এবং একটি মৃত কুকুর একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় কূপের উপর ঝুলছে। এ দেখে তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল এবং (মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, আল্লাহর শপথ, যদি তুমি খোদা হতে, তবে এমন অপদস্থ হতে না।

১. কানযুল উম্মাল, ১খ. পৃ.২৬।

তিনি ইসলাম কবূল করলেন এবং এজন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শোকর আদায় করলেন যে, তিনি তাকে স্বীয় অনুগ্রহে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান বানিয়েছেন এবং তিনি এ কবিতা বললেন :

وَاللهِ لَوْ كُنْتُ الِهًا لَمْ تَكُنْ — اَنْتَ وكَلْبُ وَسْطَبِئْرٍ فِىْ قَرَنْ

أُفْ لِمَلْقَاكَ الِهًا مُسْتَدَنْ[১] — الْاٰنَ فَتَّشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِّى ذِىْ الْمِنَنْ — اَلْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَيَّانَ الدِّيْنِ

هُوَ الَّذِىْ اَنْقَذَنِىْ مِنْ قَبْلِ اَنْ — اَكُوْنَ فِىْ ظُلْمَةِ قَبْرٍ مُرْتَهَنْ

بِاَحْمَدَ الْمَهْدِىْ النَّبِىُّ الْمُؤْتَمَنُ

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি খোদা হতে, তবে কূপের উপর একই রশিতে বাঁধা অবস্থায় ঝুলন্ত থাকতে না। তোমার খোদায়িত্বের জন্য আফসোস, আজ আমার কাছে আমার আহাম্মকী ও ভ্রান্ত ধারণা ধরা পড়ল। সমস্ত প্রশংসা সর্বশক্তিমান ঐ আল্লাহ তা'আলার, যিনি খুবই অনুগ্রহশীল, রিযকদাতা এবং প্রতিদান প্রদানকারী। আমি কবরের অন্ধকারে প্রোথিত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর হিদায়েতপ্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ আমীন (সা)-এর বরকতে হিদায়েত লাভ করি। তিনিই আমাকে এ ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেছেন।"[২]

অধিকন্তু, তিনি এ কবিতাও পাঠ করেন :

اَتُوْبُ اِلَى اللهِ مِمَّا مضى — وَاَسْتَنْقِذُ اللهَ من نَادِهِ

وَاُثْنِى عَلَيْهِ بِنَعْمَائِه — اِلٰهَ الْحَرَامِ واسْتَارِهِ

فَسُبْحَانَهُ عَدَدَ الْخَاطِئِيْنَ — وَقَطْرِ السَّمَا وَمِدْرَارِهِ

هَدَانِىْ وَقَدْ كُنْتُ فِىْ ظُلْمَةٍ — حَلِيْفَ مَنَاةِ وَاَحْجَارِهِ

وَاَنْقَذَنِى بَعْدَ شَيْبِ الْقَذَا — ل من شَيْنِ ذَاكَ ومِنْ غَارِهِ

فَقَدْ كِدتُ اَهْلِكَ فِىْ ظُلْمَة — تَدَارَكَ ذَاكَ بِمِقْدَارِهِ

فَحَمْدًا وَشُكْرًا لَهُ مَا بَقِيْتُ — اِلٰهَ الْاَنَامِ وَجَبَّارِهِ

"পূর্বে কৃত গুনাহরাশির জন্য আমি আল্লাহর নিকট তাওবা করছি এবং জাহান্নামের আগুন থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর তাঁর নিয়ামতসমূহের শোকর আদায় করছি, যিনি বায়তুল হারাম এবং এর পর্দাসমূহের প্রভু। আর আমি তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ এবং

---

১. অর্থাৎ বায়তুল্লাহর খিদমত এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। —রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৮।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৬৫; ইবন হিশাম, ১খ. পৃ.১৫৮।

পবিত্রতা বর্ণনা করছি পাপীদের পরিমাণে আর বৃষ্টির ফোঁটার পরিমাণে। তিনি আমাকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন এ অবস্থায় যে, আমি শিরকের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম আর ছিলাম মানাত ও এর সমগোত্রীয় প্রস্তরখণ্ডের মদদগার। বার্ধক্যের অবস্থায় আল্লাহ্ আমাকে এ ত্রুটি (মূর্তি পূজা) থেকে নিবৃত্ত করেন, এমতাবস্থায় যে, এ মূর্তিপূজার তমসা এবং মূর্খতার দরুন আমি ধ্বংস হয়ে যাব, ঈমান আনয়ন হলো আমার জন্য এর প্রতিষেধক। ইয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, যতদিন আমি জীবিত থাকি ততদিন পর্যন্ত সবসময় আমি তোমার প্রশংসা, স্তুতি ও শোকর করতেই থাকব। এর দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনই আমার উদ্দেশ্য।"[১]

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম এটাই যে, যখন নবী (আ) ও মুমিনগণ বিরোধিতাকারী ও মিথ্যাচারীদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যাচারের সীমা অতিক্রম করে এবং নবীর সহচর ও অনুসারীগণের উপর বিপদ-মুসীবতের চূড়ান্ত পর্যায়ের কিছু অবশিষ্ট না থাকে, এমন কি পয়গাম্বরগণও তাদের সংশোধনের ব্যাপারে প্রায় নিরাশ হয়ে যান, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি ? অর্থ-সঙ্কট ও দুঃখ-ক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমন কি রাসূল ও তাঁর সাথে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ? হ্যাঁ, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই।" (সূরা বাকারা : ২১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলেন এবং মানুষ চিন্তা করল যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এলো।"

(সূরা ইউসুফ : ১১০)

অনুরূপভাবে যখন তাঁর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর মুসীবত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেল এবং তায়েফ ভ্রমণ তাদের সংশোধনের ব্যাপারে তাঁর অন্তরে এক ধরনের নৈরাশ্য সৃষ্টি করল, তখন তাঁদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যের লক্ষণ প্রকাশ পেল এবং আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তা এসে পৌঁছলো। তা ছিল এই যে, আল্লাহ

---

১. দালাইলে আবূ নুয়াইম, ২খ. পৃ. ১১০।

তা'আলা আনসারগণকে তাঁকে এবং তাঁর দীনকে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের জন্য মদীনা থেকে প্রেরণ করলেন। তারা এলেন এবং তাঁকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য তাঁর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে ফিরে গেলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

মদীনায় হিজরত, আল্লাহ তাঁর নূরকে বর্ধিত করুন

যেভাবে নবূয়াতের সূচনা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিল, তেমনিভাবে হিজরতের সূচনাও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেই হয়েছিল। প্রথমে নবী (সা) কে স্বপ্নযোগে হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছিল। স্থানের নাম বলা হয়নি, বরং মোটামুটিভাবে কেবল এতটুকু দেখানো হয়েছিল যে, তিনি একটি খেজুর বাগান সমৃদ্ধ সবুজ-শ্যামল ভূমির দিকে হিজরত করছেন। ফলে তাঁর ধারণা হলো যে, সম্ভবত তা 'ইয়ামামা' কিংবা 'হিজর' হবে। তিনি এরূপ সফরের প্রতি দোদুল্যমান ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহর ওহী মদীনা মুনাওয়ারা নির্দিষ্ট করে দেয়। তখন তিনি সাহাবীগণকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন।[১]

অপর একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর প্রতি এ ওহী নাযিল করলেন যে, মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরিন, এ তিন শহরের মধ্যে যে শহরেই গিয়ে আপনি অবস্থান করবেন, সেটাই হবে আপনার দারুল হিজরা বা হিজরত-ভূমি। তিরমিযী এবং বায়হাকী হযরত জারীর (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যেমনটি আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৩খ. পৃ. ১৬৮-তে বর্ণিত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : সম্মানিত মেহমানের সামনে যেমন বিভিন্ন স্থান ও ব্যবস্থাদি পেশ করা হয়, যাতে তিনি যা ইচ্ছা পসন্দ করে নিতে পারেন, অনুরূপভাবে সম্মান ও মর্যাদার কারণে নবী (সা)-কে হিজরতের জন্য বিভিন্ন স্থান দেখানো হয় আর শেষ পর্যন্ত মদীনা মুনাওয়ারা চিহ্নিত ও নির্বাচিত করা হয়। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, আকাবার বায়'আত পরিপূর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ শোনামাত্র গোপনভাবে হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। সর্ব প্রথম নবী (সা)-এর দুধ ভাই হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ মাখযূমী (রা) নিজ স্ত্রী-সন্তান সহ হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু হিজরত করাও খুব সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। যে ব্যক্তিই হিজরতের ইচ্ছা করতেন, কুরায়শগণ পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করত যাতে হিজরত করতে না পারেন। অন্যথায় ওরা নিজেদের অত্যাচার-উৎপীড়নের অনুশীলন কাদের উপর চালাবে? কাজেই যখন হযরত আবূ সালমা স্বীয় স্ত্রী ও সন্তান সহ হিজরতের প্রস্তুতি নিলেন, উটের পিঠে মাল-সামান বেঁধে নিলেন এবং স্ত্রী-সন্তানদের উটের পিঠে তুলেও দিলেন, এ সময় ওরা জেনে ফেলল। তাঁর স্ত্রী উম্মে সালমার (যিনি আবূ সালমার ইনতিকালের

---

১. যুরকানী, ১খ. পৃ. ৩১৮।

পর উম্মুল মু'মিনীনের অন্তর্ভুক্ত হন) আত্মীয়-স্বজন এসে বলল, তোমার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার আছে, কিন্তু আমাদের মেয়েকে তুমি নিয়ে যেতে পারো না। এ বলে তারা হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর হাত ধরে টেনে নামিয়ে নিল। আর এদিকে আবূ সালমার আত্মীয়-স্বজন এসে পৌঁছল এবং বলল, এ সন্তান আমাদের বংশের, সুতরাং এদের কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। ওরা উম্মে সালমার কোল থেকে সন্তান কেড়ে নিল। ফলে মা-বাবা এবং সন্তান পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর হযরত আবূ সালমা (রা) একাকী মদীনার পথে যাত্রা করলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, প্রভাত হলেই আমি আল-বাতহায় গিয়ে বসে পড়তাম এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত কাঁদতে থাকতাম। এভাবে যখন একটি বছর কেটে গেল, তখন আমার মাতুল গোষ্ঠীর এক ব্যক্তির আমার প্রতি দয়া হল। সে বনী মুগীরাকে বলল, এ মিসকীনের জন্য তোমাদের দয়া হয় না ? ফলে বনী মুগীরা আমাকে মদীনা গমনের অনুমতি দান করে এবং বনী আসাদ আমাকে আমার সন্তান ফিরিয়ে দেয়। আমি সন্তানকে কোলে নিয়ে উটে আরোহণ করে একাকী মদীনার পথে যাত্রা করলাম।

যখন 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলাম, উসমান[1] ইবন তালহার সাথে সাক্ষাত হলো। আমাকে একাকী দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্‌দিকে যাওয়া হচ্ছে ? আমি বললাম, মদীনায় নিজ স্বামীর কাছে যাচ্ছি। বললেন, তোমার সাথে কেউ নেই ? আমি বললাম, لا والله الا الله وبنى هذا "আল্লাহর কসম, আল্লাহ এবং এ শিশু সন্তান ছাড়া কেউ নেই।" এ কথা শুনে উসমান ব্যথিত হলেন এবং উটের লাগাম ধরে আগে আগে চলতে শুরু করলেন। যখন কোন মনযিলে পৌঁছত, উটটি বসিয়ে তিনি পিছনে সরে যেতেন। যখন আমি নেমে পড়তাম, তিনি উটটি নিয়ে দূরে কোন গাছের সাথে বেঁধে নিজে ঐ গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। যাত্রার সময় হলে উট নিয়ে এসে বসিয়ে দিয়ে নিজে পেছনে সরে যেতেন এবং বলতেন, আরোহণ কর। আমি সওয়ার হলে তিনি লাগাম ধরে চলতে থাকতেন। আবার যখন কোন মনযিল আসত, তিনি এরূপই করতেন। এমনকি এভাবেই মদীনায় পৌঁছে গেলাম। যখন দূর থেকে কুবার ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হলো, তখন তিনি বললেন, এ বস্তিতেই তোমার স্বামী থাকেন, আল্লাহর বরকতের সাথে ঐ বস্তিতে প্রবেশ কর। আমাকে স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়ে তিনি মক্কায় ফিরে গেলেন। আল্লাহর কসম, আমি উসমান ইবন তালহার চেয়ে শরীফ কোন ব্যক্তি দেখিনি।[2]

---

১. হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদের সাথে মদীনায় হিজরত করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে হযরত উসমান ইবন তালহা (রা) শাহাদতবরণ করেন। (রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ.২৮৪)।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৬৯।

এরপর হযরত আমির ইবন রবীয়া (রা) স্বীয় স্ত্রী হযরত লায়লা বিনতে খায়সামা (রা) সহ, অতঃপর হযরত আবূ আহমদ ইবন জাহশ (রা) এবং তাঁর ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা) ঘরে তালা লাগিয়ে নিজ নিজ স্ত্রী-পরিজন সহ হিজরত করেন।

উতবা এবং আবূ জাহল দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল, লোকজন একে একে মক্কা ত্যাগ করছে। মক্কার ঘরগুলো খালি এবং পরিত্যক্ত হয়ে যাচ্ছে। এ দেখে উতবার মন ব্যথিত হয়ে উঠল এবং নিঃশ্বাস ফেলে বলল :

كُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا النَّكبَاءُ وَالْحُوْبُ

"প্রত্যেক গৃহ তা যতদিনেই বসবাসপূর্ণ ও আনন্দে গমগম করে উঠুক; কিন্তু একদিন না একদিন তা জনশূন্য ও বিষাদময় হয়ে যায়।"

অতঃপর বলল, এ সব কিছুই আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের কর্ম, যে আমাদের দলের মধ্যে মতপার্থক্য প্রবেশ করিয়েছে।

এরপর হযরত উকাশা ইবন মিহসান (রা), হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা), হযরত শুজা ইবন ওহাব (রা), হযরত আরবাদ ইবন জুমায়রা (রা), হযরত মুনকিয ইবন নাবাতা (রা), হযরত সাঈদ ইবন রুকায়শ (রা), হযরত মিহরায ইবন নাযলা (রা), হযরত ইয়াযীদ ইবন রুকায়শ (রা), হযরত কায়স ইবন জাবির (রা), হযরত আমর ইবন মিহসান (রা), হযরত মালিক ইবন আমর (রা), হযরত সাফওয়ান ইবন আমর (রা), হযরত সাকীফ ইবন আমর (রা), হযরত রবীয়া ইবন আকতাম (রা), হযরত যুবায়র ইবন উবায়দ (রা), হযরত তামাম ইবন উবায়দা (রা), হযরত সাখরা ইবন উবায়দা (রা) এবং হযরত মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা)।

আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন, হযরত যয়নব বিনতে জাহশ (রা), হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (রা), হযরত জুযামা বিনতে জান্দল (রা), হযরত উম্মে কায়স বিনতে মিহসান (রা), হযরত উম্মে হাবীব বিনতে সুমামা (রা), হযরত উমায়না বিনতে রুকায়শ (রা), হযরত সাখবারা বিনতে তামীম (রা) এবং হযরত হামনা বিনতে জাহশ (রা)।

এঁদের হিজরতের পরপরই হযরত উমর (রা) এবং হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া (রা) কুড়িজন অশ্বারোহীর সাথে মদীনা যাত্রা করেন।

হযরত হিশাম ইবন আস (রা)-ও হযরত উমর (রা)-এর সাথে হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁর গোত্রের লোকজন বাধার সৃষ্টি করে এবং তাঁকে হিজরত করা থেকে বিরত রাখে।

যখন হযরত উমর (রা) এবং হযরত আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়া (রা) মদীনায় পৌঁছে যান, তখন আবূ জাহল ইবন হিশাম এবং হারিস ইবন হিশাম (আবূ জাহলের ভাই, যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) উভয়ে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং বলে,

তোমার মা তো শপথ করেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে না দেখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত চুলও আঁচড়াবে না এবং রোদ থেকে ছায়ায়ও যাবে না। এ কথা শুনে আয়্যাশের মন ব্যথিত হলো এবং তিনি আবূ জাহলের সাথে ফিরে চললেন। আবূ জাহল পথিমধ্যেই আয়্যাশের পানির মশক বেঁধে ফেলল এবং মক্কায় এনে তাঁকে দীর্ঘ দিন ধরে বন্দী করে রেখে নানা প্রকারে কষ্ট দিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযে কুনূতে নাযেলা পাঠ করতেন এবং তাঁর মুক্তির জন্য দু'আ করতেন :

اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابى ربيعة

"আয় আল্লাহ ! তুমি ওলীদ ইবন ওলীদ, সালমা হিশাম এবং আয়্যাশ ইবন আবূ রবীয়াকে মুশরিকদের যুলুম-অত্যাচার থেকে নাজাত দাও।"

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নাজাত দিলেন এবং তাঁরা পালিয়ে মদীনা পৌঁছলেন। যে সমস্ত ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর সাথে হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম নিম্নরূপ :

হযরত যায়দ[১] ইবন খাত্তাব (রা) (হযরত উমর-এর বড় ভাই), সুরাকার দু'পুত্র হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুরাকা (রা), হযরত খুনায়স ইবন হুযাফা সাহমী (রা), হযরত সাঈদ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা), হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ তামিমী (রা), হযরত খাওলা ইবন খাওলা (রা), হযরত মালিক ইবন আবূ খাওলা (রা), বুকায়রের চার পুত্র হযরত আয়াস ইবন বুকায়র (রা), হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা), হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা) এবং হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা) হিজরত করে মদীনা পৌঁছেন।

এরপর হিজরতের এক ধারাবাহিকতা শুরু হয়। হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা), হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা), হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা), হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা), হযরত আবূ মারসাদ কুনায ইবন হুসায়ন (রা), হযরত উনায়স (রা), হযরত আবূ কাবশা (রা), হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা) এবং তাঁর দু'ভাই হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা) ও হযরত হুসায়ন ইবন হারিস (রা), হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা), হযরত সুয়াইত ইবন সা'দ (রা), হযরত তুলাইব ইবন উমায়র (রা), হযরত খাব্বাব ইবন আরাত (রা), হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা), হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা), হযরত আবূ সাবরা

১. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা) প্রথম যুগের মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হিজরী দ্বাদশ বর্ষে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। হযরত উমর (রা)-এ নিকট যখন তাঁর শাহাদতের খবর পৌঁছে, তখন হযরত উমর খুবই ব্যথিত হন এবং বলেন, যায়দ দুটি উত্তম কাজেই আমার অগ্রগামী। তিনি আমার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আমার পূর্বেই শাহাদত লাভ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২০)।

ইবন আবূ রুহম (রা), হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা), হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা), আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালিম (রা), হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) ও হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) হিজরত করে মদীনা পৌঁছেন। মোট কথা, ধীরে ধীরে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম হিজরত করে মদীনা পৌঁছে যান।

মক্কায় হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর নিকট কেবল হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত আলী (ক) ছাড়া কেউই অবশিষ্ট ছিলেন না। তবে কিছু সংখ্যক অসহায় নিরাশ্রয় মুসলমান, যাঁরা কাফিরদের নির্যাতনের থাবায় আটকা পড়েছিলেন, তাঁরা ছাড়া।[1]

'দারুন নাদওয়ায়'[2] কুরায়শদের বৈঠক এবং রাসূল (সা) কে হত্যা করার পরামর্শ

কুরায়শগণ যখন দেখল যে, সাহাবীগণ ধীরে ধীরে হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন, আর রাসূল (সা)ও আজকালের মধ্যেই প্রস্থানোদ্যত, তখন পরামর্শের জন্য নিম্নবর্ণিত কুরায়শ নেতৃবৃন্দ 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হয় ঃ উতবা ইবন রবীয়া, শায়বা ইবন রবীয়া, আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, তাইমা ইবন আদী, জুবায়র ইবন মুতইম, হারিস ইবন আমির, নাযর ইবন হারিস, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম, যাম'আ ইবন আসওয়াদ, হাকীম ইবন হিযাম, আবূ জাহল ইবন হিশাম, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়াহ ও মুনবিয়াহ, উমায়্যা ইবন খালফ প্রমুখ। অভিশপ্ত শয়তান সেখানে এক বৃদ্ধের আকৃতিতে উপস্থিত হয় এবং দরজায় এসে দাঁড়ায়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? সে বলল, আমি নজদের একজন শায়খ, তোমাদের কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছুক। যদি সম্ভব হয় তবে স্বীয় মতামত ও পরামর্শ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করব।

লোকেরা তাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিল এবং আলোচনা শুরু হলো। কেউ একজন বলল, তাঁকে কোন বদ্ধ কুঠরিতে আটক করে রাখা হোক। শায়খ নজদী

---

১. ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৬৩।

২ মক্কায় এটি ছিল প্রথম গৃহ যা কুসাই ইবন কিলাব বিশেষ পরামর্শ সভার জন্য তৈরি করেছিলেন। যেখানে একত্রিত হয়ে লোকজন পরামর্শ করত। কুসাই ইবন কিলাবের পর তা বনী আবদেদ্দারের অধিকারে আসে এবং এ বংশের হযরত হাকিম ইবন হিযাম (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আমীর মুআবিয়া (রা)-এর খিলাফতকালে হাকিম (রা) তা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করেন। তাঁর কতিপয় বন্ধু-বান্ধব এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, পিতা-পিতামহের ঐতিহ্যের ধারক একটি স্মৃতিচিহ্নকে তুমি নিজ হাতে হারিয়ে ফেললে? হাকিম (রা) বিজ্ঞতাসূচক জবাব দিলেন যে, আল্লাহর কসম, আল্লাহ-ভীতি ও পরহেযগারী ছাড়া সমস্ত মর্যাদা ও আভিজাত্য খতম হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি জাহিলী যুগে এক মশক শরাবের বিনিময়ে এটি কিনেছিলাম, আর এক্ষণে তা এক লক্ষ দিরহামে বিক্রি করলাম। তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এ এক লক্ষ দিরহামের সম্পূর্ণটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছি। বল, ক্ষতিটা কি হলো। মুয়াত্তার সনদ সূত্রে দারু কুতনী হাদীসটি বর্ণনা করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২১)।

বলল, এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয় এ জন্যে যে, তাঁর সঙ্গীগণ যদি তা শুনতে পায়, তা হলে তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কেউ বলল, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক। শায়খ নজদী বলল, এ সিদ্ধান্ত তো পুরোটাই ভুল। তোমরা কি তাঁর সৌন্দর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত, হৃদয়গ্রাহী ও মনকে আচ্ছন্নকারী কথা শোননি? যদি তাঁকে এখান থেকে বের করে দেয়া হয়, তা হলে আশংকা আছে যে, অপর শহরের লোকেরা তাঁর কথা শুনে ঈমান আনবে এবং তারা সবাই মিলে তোমাদের উপর চড়াও হবে।

আবূ জাহল বলল, আমার সিদ্ধান্ত হলো না তাঁকে বন্দী করা হবে, আর না তাঁকে বহিষ্কার করা হবে; বরং প্রতিটি গোত্র থেকে এক-একজন যুবক নির্বাচন করা হোক, আর তারা সবাই মিলে একযোগে মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করুক। এত করে মুহাম্মদ (সা)-এর খুনের দায় সকল গোত্রের উপর বর্তাবে আর বনী আবদে মানাফ সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে একা লড়াই করতে সক্ষম হবে না, বরং অগত্যা তারা রক্তপণের দ্বারা এ বিষয় নিষ্পত্তি করবে।

শায়খ নজদী বলল, কসম আল্লাহর, রায় তো এটাই। আর সভায় উপস্থিত সবাই এ রায়কে খুবই পসন্দ করল।[১]

আর এটাও সিদ্ধান্ত হলো যে, কাজটা আজ রাতের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এদিকে সভা সমাপ্ত হলো আর ওদিকে হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন :

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكِرِيْنَ

"স্মরণ কর, কাফিরগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে, আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই কুশলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনফাল : ৩০)

আর সমুদয় ঘটনা তাঁকে অবহিত করেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি পৌঁছে যায়। সাথে এ দু'আ শিখিয়ে দেয়া হয় :

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

"বল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে নিষ্ক্রান্ত করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার নিকট হতে আমাকে দান করো সাহায্যকারী শক্তি।" (সূরা ইসরা : ৮০)

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫২; উয়ূনুল আসার, ১খ.পৃ.১৭৭।

তিরমিযী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং হাকিমও মুস্তাদরাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১৭৭ ও যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২৪)

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) হযরত জিবরাঈল (আ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার সাথে কে হিজরত করবে ? জিবরাঈল বললেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এটি হাকিমের বর্ণনা এবং তিনি বলেন, এর সনদ সহীহ, আর যাহবী বলেন, হাদীসটি সহীহ-গরীব।[১]

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) দুপুর বেলায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর গৃহে আগমন করেন এবং বলেন আমাকে হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবূ বকর আরয করলেন, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ অধমের কি আপনার সহযাত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হতে পারে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইবন ইসহাকের বর্ণনামতে, এ কথা শুনে আবূ বকর কেঁদে ফেলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর আগে আমার ধারণা ছিল না যে, খুশির দরুনও কেউ কাঁদতে পারে।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) পূর্বে থেকেই হিজরতের উদ্দেশ্যে দুটি উট প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। চার মাস থেকে সেগুলোকে বাবলা পাতা খাওয়ানো হচ্ছিল। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, (আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক) এ দুটির মধ্য থেকে যেটি আপনার পসন্দ হয়, গ্রহণ করুন; আমি আপনাকে হাদিয়া দিচ্ছি। তিনি বললেন, আমি বিনামূল্যে গ্রহণ করব না।

তাবারানীর মু'জাম গ্রন্থে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবূ বকর বললেন উত্তম, যদি আপনি মূল্য দিয়ে নিতে চান তবে মূল্য দিয়েই গ্রহণ করুন।[২]

এর অর্থ হলো, আমার নিজস্ব ইচ্ছা বলতে কিছুই নেই, আমার সমস্ত ইচ্ছা ও সমস্ত আগ্রহ আপনারই ইঙ্গিতের আজ্ঞাবহ।

এ স্থলে কিছু লোকের মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) উটনীর মূল্যের চেয়েও পবিত্র সত্তার [নবী (সা)]-এর জন্য অধিক ব্যয় করেছিলেন এবং নবী (সা) তা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, [রাসূল (সা) বলেছেন] আবূ বকর তার জান ও মাল দিয়ে আমার যতটা উপকার করেছেন, অন্য কেউ তা করেনি।

আর তিরমিযীতে রয়েছে, [রাসূল (সা) বলেছেন] যে ব্যক্তি আমার প্রতি যতটা অনুগ্রহ করেছে, আমি তার প্রতিদান দিয়েছি। কেবল আবূ বকর ছাড়া, তার অনুগ্রহের

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ.২২৬।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৩।

বদলা কেবল কিয়ামতের দিন আল্লাহই দেবেন। এ জন্যে সন্দেহ হয় যে, ঐ সময় তিনি উটনীর মূল্য দেয়ার প্রতি কেন জোর দিয়েছিলেন।

এর উত্তর হলো, হিজরত একটা বড় ধরনের ইবাদত, আল্লাহ তা'আলা ঈমানের পরেই এর উল্লেখ করেছেন। এ জন্যে তিনি এ বিরাট ইবাদতে কাউকে অংশীদার করতে চাননি। তিনি চাচ্ছিলেন যে, আল্লাহর রাহে হিজরত শুধু নিজের জান ও মাল দ্বারা আদায় হোক।[১]

ফায়েদা

ওয়াকিদী বলেন, ঐ উটনীটির নাম ছিল কাসওয়া। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এর নাম ছিল জুদ'আ। (বুখারী বাবু গাযওয়াতুর রাজী')।[২]

ওয়াকিদী বলেন, ঐ উটনীটির মূল্য ছিল আটশত দিরহাম। আল্লামা যারকানী বলেন, বিশুদ্ধ মত হলো এর মূল্য ছিল চারশত দিরহাম, আটশত দিরহাম ছিল দুটি উটনীর মূল্য।

অতএব হযরত আয়েশা (রা) এর এক রিওয়ায়াতে এর সমাধান দেয়া হয়েছে যে وَكَانَ اَبُوبَكْرٍ اِشْتَرَاهُمَا بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "আবূ বকর (রা) দুটি উটনী আটশত দিরহাম দিয়ে কিনেছিলেন।"[৩]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে নবী (সা) কে কুরায়শদের পরামর্শের খবর দেন এবং এ পরামর্শ দেন যে, আজ রাতটি আপনি নিজ গৃহে থাকবেন না (বায়হাকী)।[৪]

সুতরাং যখন রাত এলো এবং অন্ধকার ছেয়ে গেল, তখন কুরায়শরা[৫] কৃত ওয়াদা মাফিক এসে তাঁর গৃহ ঘিরে ফেলল, যাতে তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়বেন তখন হামলা করতে পারে। নবী (সা) হযরত আলী (রা) কে নির্দেশ দিলেন যে, আমার সবুজ চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে পড়। আর ভয় করো না, কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুরায়শগণ যদিও তাঁর দুশমন ছিল, কিন্তু তাঁকে সত্যবাদী ও আমানতদার বলেই জানত এবং নিজেদের গচ্ছিত দ্রব্য তাঁরই কাছে জমা রাখত। তিনি এ সমস্ত আমানত হযরত আলী (রা)-এর যিম্মায় দিয়ে দিলেন যাতে প্রভাতে এ আমানত এর মালিকদের পৌঁছে দিতে পারেন।

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ.৩।

২ যারকানী, ১খ. পৃ.৩২৭।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৩।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৮৫।

৫. যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁর গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল, তাদের নাম নিম্নরূপ ঃ আবূ জাহল, হাকাম ইবন আস, উকবা ইবন আবূ মুয়াইত, নাযর ইবন হারিস, উমায়্যা ইবন খালফ, ইবন আতিয়্যা, যাম'আ ইবন আসওয়াদ, তায়মা ইবন আদী, আবূ লাহাব, উবাই ইবন খালফ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবিয়্যাহ ও মুনাব্বাহ। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ.১৫৪)।

অভিশপ্ত আবূ জাহল বাইরে দাঁড়িয়ে হেসে হেসে লোকদের বলছিল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর ধারণা হলো, যদি তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, তা হলে পৃথিবীতে আরব ও আজমের বাদশাহ হবে আর মৃত্যুর পর উন্নত জান্নাত লাভ হবে। আর যদি ঈমান না আনো, তা হলে পৃথিবীতে তাঁর অনুসারীদের হাতে নিহত হবে এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে জ্বলবে।

নবী আকরাম (সা) নিজ গৃহে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমি তাই বলছি আর তুমিও তাদেরই মধ্যকার একজন, যে পৃথিবীতে আমার অনুসারীদের হাতে নিহত হবে এবং মৃত্যুর পর জাহান্নামে জ্বলবে। আর ঐ মুষ্টি মাটির উপর সূরা ইয়াসীনের আয়াত فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ "অতঃপর তাদের আচ্ছন্ন করে ফেললাম; ফলে তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না" পর্যন্ত পাঠ করে তাদের মাথায় ছিঁটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাদের চোখে পর্দা দিয়ে দিলেন এবং তিনি ওদের সামনে দিয়েই চলে গেলেন কিন্তু কেউই দেখতে পেল না।[1]

তিনি ওদের সামনে থেকে বেরিয়ে হযরত আবূ বকর (রা)-এর গৃহে গেলেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর পাহাড়ের পথ ধরলেন। সেখানে গিয়ে একটি গুহায় আত্মগোপন করলেন।

ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি নবী (সা)-এর গৃহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করাকালে কুরায়শদের দলকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কেন দাঁড়িয়ে আছ এবং কার অপেক্ষা করছ? ওরা বলল, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অপেক্ষা করছি যে, তিনি বেরোলেই তাঁকে হত্যা করব। লোকটি বলল, আল্লাহ তোমাদের ব্যর্থ করুন, মুহাম্মদ (সা) তো তোমাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে গেছেন।

যখন প্রভাত হলো এবং হযরত আলী (রা) তাঁর বিছানা থেকে উঠলেন, তখন ওরা বলতে থাকল, আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল; এবং অত্যন্ত লজ্জিতভাবে হযরত আলী (রা) কে প্রশ্ন করল, মুহাম্মদ (সা) কোথায়? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি জানি না।[2]

এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দে হযরত আলী (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রা) এবং হযরত সুরাকা ইবন জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত আছে।

ফায়েদা

কুরায়শ কাফিরগণ সমস্ত রাত তাঁর গৃহ তো ঘিরে রেখেছিল, কিন্তু তারা গৃহের অভ্যন্তরে এ জন্যে প্রবেশ করেনি যে, স্ত্রীলোক থাকতে পারে এমন কোন গৃহে প্রবেশ করাকে তারা দূষণীয় মনে করত। পরে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুকাররামা থেকে

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ১৭৯।

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ.১৭৬।

রওয়ানা হলেন তখন একটি টিলার উপর উঠে মক্কার দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন :

وَاللّٰهِ اِنَّكَ لَخَيْرُ اَرْضِ اللّٰهِ وَاَحَبُّ اَرْضِ اِلَى اللّٰهِ وَلَوْلاَ اَنِّىْ اُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ

"আল্লাহর কসম, অত্যন্ত উত্তম এ যমীন, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় যমীন, যদি আমাকে বহিষ্কার করা না হতো, আমি এখান থেকে কখনই বের হতাম না।" হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের নিকট সহীহ।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঐ সময় এ কথা বলেছিলেন :

مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَاَحَبَّكِ اِلَىَّ وَلَوْلاَ اَنَّ قَوْمِىْ اَخْرَجُوْنِىْ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

"তুমি কতই না পবিত্র শহর, আর আমার কাছে বড়ই প্রিয়, যদি আমার কওম আমাকে বের করে না দিত, আমি অন্য কোন জায়গায় আশ্রয় নিতাম না।" হাদীসটি ইমাম আহমদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[২]

ফায়েদা

এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল যে, মক্কা মুকাররামা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে উত্তম। আর এটাই অধিকাংশ আলিমদের অভিমত।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা হযরত আসমা (রা) সফরের জন্য নাশতা প্রস্তুত করেন। তাড়াতাড়ি করার কারণে রশির বদলে ফিতা ছিঁড়ে নাশতার পোটলা বেঁধে দেন।[৩] ঐ দিন থেকে হযরত আসমা (রা) 'যাতুন-নাতাকায়ন' (দুই ফিতার অধিকারিণী) নামে অভিহিত হন। ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক টুকরা দিয়ে নাশতার পোটলা বাঁধেন এবং আরেক টুকরা দিয়ে মশকের মুখ বেঁধে দেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর, যিনি ছিলেন আবূ বকরের প্রিয় পুত্র এবং যুবক, তিনি সারা দিন মক্কায় অবস্থান করতেন এবং রাত্রিবেলা কুরায়শদের খবরাদি পৌঁছিয়ে দিতেন এবং হযরত আবূ বকরের মুক্ত দাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রা বকরী চরাতেন আর ইশার সময়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) কে দুধপান করাতেন।[৪]

---

১. মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ.৭।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩২৮।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৪।

৪. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৮৪।

আবদুল্লাহ ইবন আরিকত[1] দুয়ালীকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথপ্রদর্শক নিয়োগ করা হয়, যাতে অজ্ঞাত পথ দিয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবন আরিকত যদিও ধর্মীয় দিক থেকে কাফির ও মুশরিক ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ও হযরত আবূ বকর (রা) তার প্রতি নির্ভর ও আস্থা রেখেছিলেন (সহীহ্ বুখারী, হিজরত অধ্যায়)। আর উটনী দুটি তাকে সোপর্দ করা হয়, যাতে সে তৃতীয় দিনে সে দুটিকে নিয়ে সাওর গুহায় উপস্থিত হয় এবং তাঁদের নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হতে পারে।

ফায়েদা

রাস্তা স্বয়ং হুযূর (সা)-ই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং কাফিরকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সহযাত্রী করেছিলেন, যাতে সে তাঁর উটের লাগাম ধরে অগ্রসর হয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, যদি কোন কাফির বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তার থেকে সেবা গ্রহণ করা জায়েয। এ কাফির হুযূর (সা)-এর মজুর এবং আজ্ঞাবহ ছিল। আল্লাহ্ থেকে পানাহ চাই, নেতা ও সর্দার ছিল না। এ হাদীস থেকে কাফিরদের দ্বারা মজুরীর বিনিময়ে কাজ করানো ও সেবা গ্রহণ বৈধ বলে জানা গেল। কিন্তু কাফির ও মুশরিককে নিজের নেতা ও সর্দার মনোনীত করা বৈধ বলে এর দ্বারা কখনই প্রমাণিত হয় না।

সাওর গুহা

মোট কথা, রাতের বেলায়ই এ দুই শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয়ে সাওর গুহার দিকে যাত্রা করেছিলেন। 'দালাইলে বায়হাকী'তে মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি গুহার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তাঁর গুহার সাথী, নিখাদ প্রাণের বন্ধু, বিশিষ্ট সঙ্গীর অস্থিরতা ও অস্বস্তি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের। কখনো তিনি তাঁর সামনে চলছিলেন, কখনো পিছনে, কখনো ডাইনে আবার কখনো বামে। শেষ পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আবূ বকর, এ কি ব্যাপার কখনো আগে চলছ, আর কখনো পিছে? আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, যখন মনে হয় পিছন থেকে কেউ হয়ত আপনার সন্ধানে আসছে, তখন পিছে চলি। আর যখন মনে হয়, কোন বাঁকে কেউ ওঁৎ পেতে আছে তখন সামনে চলি। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে আবূ বকর, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য এটাই যে, তুমি নিহত হও আর আমি বেঁচে থাকি? আবূ বকর (রা) আরয করলেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্; ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এটাই চাই যে, আপনি রক্ষা পান আর আমি নিহত হই। যখন গুহার নিকটে পৌঁছলেন, তখন বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সামান্য অপেক্ষা করুন, আমি ভিতরটা

---

১. ইমাম নববী বলেন, আবদ ইবন আরিকত ইসলাম গ্রহণ করেছে কিনা, তা আমার জানা নেই। (ওয়াফা উল ওয়াফা, ১খ. পৃ. ১৬৯)।

পরিষ্কার করে নিই। হাফিয আসকালানী এ রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করে বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবূ মুলায়কা এবং হাসান বসরী (র) থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।[১]

দালাইলে বায়হাকীতে যাবতা ইবন মিহসান থেকে বর্ণিত যে, হযরত উমর (রা)-এর সামনে যখন হযরত আবূ বকর (রা)-এর উল্লেখ করা হতো, তখন তিনি বলতেন, আবূ বকর (রা)-এর এক রাত ও এক দিনের ইবাদত উমরের সারা জীবনের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। রাত বলতে ঐ গুহার রাতের ঘটনা বুঝানো হতো যা এখনই বলা হয়েছে। আর দিন বলতে ঐ দিনের কথা বলা হয়েছে, যখন নবী (সা) ওফাত লাভ করেছেন এবং আরবের অনেক গোত্র ধর্মত্যাগী হয়ে গেল সেই সময়ে আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আরয করলাম, হে রাসূলের খলীফা, আপনি কিছুটা নমনীয় হোন এবং সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করুন। আবূ বকর রাগান্বিত হয়ে বললেন : خيار فى الجاهلية وخوار فى الاسلام "জাহিলিয়াতের যামানায় তো তুমি শক্তিশালী ও সাহসী ছিলে, আর ইসলামে প্রবেশ করে ভীরু হয়ে গেলে !" বল দেখি, সত্যিকারের কোন্ বিষয়ে ওদের সাথে সমঝোতা করব ? রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, যদি ঐ লোকেরা সে রশিটি পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে, যা রাসূলুল্লাহর সময় দিয়ে থাকত, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করব। উমর (রা) বলেন, অতঃপর আমরা আবূ বকরের নির্দেশে জিহাদ করি এবং আল্লাহ তা'আলা আবূ বকরের মাধ্যমে ঐ সমস্ত লোককে ইসলামে পুনঃ প্রবেশ করান, যারা ইসলাম থেকে পলায়ন করেছিল। এটাই ছিল আবূ বকরের সেই দিন, যার বিনিময় উমর (রা) তাঁর সমস্ত জীবনের ইবাদত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।[২]

আর এ রিওয়ায়াত মুস্তাদরাকে হাকিমেও বর্ণিত আছে। হাকিম বলেন, যদি এ রিওয়ায়াত মুরসাল না হতো, তা হলে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হতো। হাফিয যাহবী বলেন, হাদীসটি সহীহ মুরসাল। হযরত আবূ বকর (রা) প্রথমে গুহায় অবতরণ করেন এবং এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)ও অবতরণ করেন। আর আল্লাহর হুকুমে গুহার মুখে এক মাকড়সা এসে জাল বোনে। এ রিওয়ায়াত তাবাকাতে ইবন সা'দ-এ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত ইবন আব্বাস (রা), হযরত আলী ইবন আবূ তালিব (রা), হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রা) এবং হযরত সুরাকা ইবন জুশুম (রা) থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটি সূত্রের বর্ণনাকারীগণ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে, কুরায়শগণ সারা রাত তাঁর গৃহ ঘেরাও করে রাখে। যখন সকাল হলো, তখন

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৫।

২ দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২৪১।

হযরত আলী (রা) কে তাঁর বিছানা থেকে উঠতে দেখল। ওরা তাঁর বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল যে, তিনি কোথায়। হযরত আলী (রা) জবাব দিলেন, আমার জানা নেই। তখনই তারা তাঁর সন্ধানে দিকে দিকে ছুটে গেল। খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল। তখন গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল দেখে বলল :

فَرُوْا عَلَى بَابِهِ نَسَجَ الْعَنْكَبُوْتِ فَقَالُوْا لَوْ دَخَلَ هُنَا لَمْ يَكُنْ نَسِيْجُ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى بَابِهِ

"যদি এর মধ্যে কেউ প্রবেশ করত, তবে মাকড়সার জাল অবশিষ্ট থাকত না।"

হাফিয আসকালানী[১] বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।[২] হাফিয ইবন কাসীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে বলেন, এর সনদ হাসান, গুহার মুখে মাকড়সার জাল তৈরির ঘটনা সম্বলিত যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়, সবগুলোই উত্তম সনদে বর্ণিত।

আবূ মুস'আব মক্কী বলেন, আমি হযরত আনাস ইবন মালিক (রা), হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা) এবং হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সাওর গুহায় আশ্রয় নিলেন, তখন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সামনে একটি বৃক্ষ এগিয়ে এলো আর একজোড়া বন্য কবুতর এসে সেখানে ডিম দিল। মুশরিকগণ যখন খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন কবুতরের বাসা দেখে ফিরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের থেকে ওদেরকে নিরাশ করলেন।[৩]

সতর্ক বাণী

এ ঘটনা হাদীসের কিতাবসমূহে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। যদিও কতিপয় বর্ণনাকারী দুর্বল, কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে তা শক্তিশালী ও মযবূত হয়ে যায়, যা মুহাদ্দিসীন পরম্পরায় 'হাসান লি-গায়রিহী' পর্যায়ে পৌঁছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) আমাকে বলেন, যখন আমি এবং রাসূলুল্লাহ (সা) গুহায় ছিলাম আর কুরায়শগণ রখুঁজতে খুঁজতে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল, তখন আমি তাঁকে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ওদের মধ্যে কারো দৃষ্টি যদি নিজের পায়ের দিকে পড়ে, তা হলে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি ইরশাদ করলেন :

---

১. হাফিয আসকালানীর বাক্যগুলো ছিল এরূপ ঃ 'আহমদ হাদীসটি হযরত আব্বাস (রা) থেকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।' আর হাফিয ইবন কাসীর মুসনাদে আহমদের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করে বলেন ঃ وهذا اسناد حسن وهو من وجود ما روى قصة نسج العنكبوت على فم الغار وذالك من حماية الله رسول الله ﷺ (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৮১)।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৪।

৩. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৫৪।

مَا ظَنُّكَ يَا اَبَابَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اَللّٰهُ ثَالِثُهُمَا "ওহে আবূ বকর, ঐ দুয়ের ব্যাপারে তোমার কি ধারণা, যার তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা ?"

অর্থাৎ আমরা কেবল দু'জনই নই, বরং আমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন, যিনি আমাদেরকে ঐ শত্রুদের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন।

যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি দেখলেন আবূ বকর খুবই বিমর্ষ এবং চিন্তিত, তখন ইরশাদ করলেন : لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "তুমি মোটেও চিন্তান্বিত হবে না, অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।"

আর আবূ বকরের অন্তরের প্রশান্তির জন্য দু'আও করলেন। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আবূ বকরের প্রতি এক বিশেষ প্রশান্তি ও এক বিশেষ স্বস্তি দান করে আয়াত নাযিল হলো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ৪০; দালাইলে আবূ নুয়াইম, পৃ. ১১২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.১০, মানাকিবে আবূ বকর অধ্যায়)।

সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা

(تحقيق نزول آية الغار درباره يار غار سيد الابرار عليه افضل الصلوات واكمل التحيات وعلى آله وازواجه الطاهرات وعلى اصحابه الذين هم كانوا نجوم الهداية للبريات لاسيما على صاحبه فى الغار وفى الحيات وبعد الممات ورفيقه فى الدنيا وصاحبه على الحوض وفى روضات الجنات)

এর পূর্বে আমরা গুহা সম্পর্কিত আয়াতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব কথা পাঠকদের উপহার দিব। এটাই যথার্থ মনে করি যে, প্রথমত সম্পূর্ণ আয়াতটি তরজমাসহ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যাতে পাঠকবর্গের বুঝতে কোন কষ্ট পেতে না হয়। তা হলো এই :

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর তবে স্মরণ কর, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুইজনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, [অর্থাৎ সফরে কেবল দু'জনই ছিলেন, একজন রাসূল (সা) এবং অপরজন আবূ বকর সিদ্দীক (রা), এ দু'জন ছাড়া তৃতীয় কোন ব্যক্তি সঙ্গী ছিল না, যার নিকট থেকে কোন সাহায্যের আশা করা যেতে পারে]। সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও নিরাপত্তা আমাদের সাথে আছে)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার উপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি (অর্থাৎ প্রকাশ্য কোন কারণ ছাড়াই সৈন্য দ্বারা সাওর গুহার হিফাযত করেন) এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন (যে গুহার কিনার থেকে দুশমনদের ব্যর্থতার সাথে ফিরিয়ে দেন), আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (যে তিনি স্বীয় নবী এবং তাঁর সাথীকে দুশমনের চক্র থেকে বের করে নিরাপদে মদীনা পৌঁছে দেন)।" (সূরা তাওবা ঃ ৪০)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যে ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন, উম্মতের কারো ভাগ্যে তার এক-দশমাংশও জোটেনি। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর যে ফযীলত এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এক্ষণে আমরা তা সামষ্টিকভাবে বর্ণনা করব।

[১]

নিকৃষ্ট কাফিরগণ যখন মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিল এবং সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে হত্যা করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হলো, তখন আল্লাহর নির্দেশে তিনি হিজরতের ইচ্ছা করলেন এবং আল্লাহর নির্দেশেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে নিজের সফরসঙ্গী করলেন। যদি পরাক্রমশালী আল্লাহর নিকট আবূ বকর নিষ্ঠাবান, প্রকৃত ঈমানদার এবং নবী (সা)-এর সত্যিকারের আশিক না হতেন, তা হলে এ সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা কখনই তাঁকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি দিতেন না। অনুরূপভাবে স্বয়ং পয়গাম্বরেরও যদি তাঁর সত্যবাদিতা, ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা না থাকত, তা হলে কখনই আবূ বকর সিদ্দীককে এ ধরনের সফরে নিজের সফরসঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করতেন না।

[২]

হযরত আলী (রা), হাসান বসরী এবং সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য না করার জন্য সারা বিশ্বের প্রতি অসন্তুষ্ট হন; কিন্তু শুধু আবূ বকরকে এ অসন্তুষ্টির বাইরে রাখেন। আর কেবল বাইরে রাখাই নয়, বরং সংকটপূর্ণ দুঃসময়ে রাসূল (সা) কে সাহচর্যদান, সঙ্গ এবং সাহায্য করার জন্য তাঁর উল্লেখ প্রশংসার সাথে করেছেন।

[৩] ثَانِىَ اثْنَيْنِ দু'জনের দ্বিতীয়জন

আল্লাহ তা'আলা 'দু'জনের দ্বিতীয়জন' বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সা)-এর পর মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, 'দু'জনের দ্বিতীয়জন' শব্দটি এ কথার দলীল যে, নবী করীম (সা)-এর পর খলীফা আবূ বকর (রা)-ই হবেন। কেননা, খলীফা বাদশাহর পরবর্তীজনই হয়ে থাকেন।[১]

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন নবী করীম (সা) হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে বললেন, তুমি কি আবূ বকরের নামেও কোন কবিতা বলেছ ? হাসসান বললেন, হ্যাঁ। নবী (সা) বললেন, বল, আমি শুনছি। হাসসান বললেন :

وثانى اثنين فى الغار المنيف وقد   طاف العدويه اصعد الجبلا

وكان حب رسول الله قد علموا   من البرية لم يعدل به رجلا

ইবন আদী ও ইবন আসাকির ইমাম যুহরী সূত্রে হযরত আনাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

[৪] اِذْهُمَا فِى الْغَارِ যখন তারা ছিল গুহায়

আল্লাহ তা'আলা 'যখন তারা ছিল গুহায়' বাক্য দ্বারা আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর গুহার বন্ধু হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন, তখন থেকেই 'গুহার বন্ধু' বাক্যটি প্রবাদ বাক্য হিসেবে প্রচলিত হয়েছে। যে ব্যক্তি বন্ধুর সুখে-দুঃখে তার হক আদায় করে, পরিভাষাগতভাবে তাকে 'গুহার বন্ধু' বলা হয়।

[৫] لِصَاحِبِه তার সাথীর জন্য

আল্লাহ তা'আলা 'তার সাথীর জন্য' বাক্য দ্বারা আবূ বকরের সাহাবী হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। আর শী'আ এবং সুন্নী উভয়ে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে اِذْهُمَا فِى الْغَارِ শব্দ দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা)-ই উদ্দেশ্য। আরবী ভাষায় 'সাহিব' এবং 'সাহাবী' সমার্থবোধক। 'সাহিব' এবং 'সাহাবী' শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর এ মর্যাদা কেবল আবূ বকর (রা)-ই লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহাবী হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আর এর উপর ভিত্তি করে যে সকল সাহাবীর সাহাবী হওয়া মুতাওয়াতির হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত, তাঁদের ব্যাপারেও হুকুম এটাই। অর্থাৎ কোন কারণে তাঁদের সাহাবিয়ত অস্বীকৃতি কুরআনের, সেই স্বীকৃতি অস্বীকৃতিরই নামান্তর। অবশ্য বুযুর্গগণের সাহাবী হওয়া 'খবরে আহাদ' দ্বারা প্রমাণিত, তাঁদের ব্যাপারে অস্বীকৃতিকে কুফরী বলা যাবে না, তবে বিদ'আতী বলা যাবে।

---

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৮খ. পৃ. ১৪৭।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সময়ে এক ব্যক্তি সূরা তাওবা তিলাওয়াত করতে করতে যখন এ আয়াতে পৌঁছলেন : إذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ। তখন আবূ বকর সিদ্দীক কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, ঐ 'সাহিব' আমিই।[১]

[৬] لا تَحْزَنْ চিন্তিত হয়ো না

যখন মক্কার মুশরিকগণ রাসূল (সা) কে খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন গুহার ভিতর থেকে আবূ বকরের দৃষ্টি তাদের প্রতি পড়ল। তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি আমি মারা যাই, তা হলে কেবল একটিমাত্র ব্যক্তি ধ্বংস হবে। কিন্তু শত্রুদের দুর্ভাগ্যগুণে যদি আপনি মারা যান, তবে সমস্ত উম্মত বরবাদ হয়ে যাবে। ঐ সময় নবী (সা) আবূ বকর (রা) কে সান্ত্বনাদানের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ لا تَحْزَنْ إنَّ اللهَ مَعَنَا "হে আবূ বকর, তুমি চিন্তিত হয়ো না, মনকে সান্ত্বনা দাও এবং নিশ্চিত জান যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে আছেন।"[২]

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতুবী (র) 'হাদিয়াতুশ-শী'আ' গ্রন্থে লিখেন, لا تَحْزَنْ শব্দটি, যার অর্থ হলো তুমি চিন্তিত হয়ো না, এ বাক্যটি হযরত আবূ বকরের সত্যিকারের প্রেমিক এবং সত্যনিষ্ঠ মু'মিন হওয়ার কথা প্রমাণ করে। অন্যথায় তাঁর চিন্তিত হওয়ার কি প্রয়োজন ছিল।

মোটকথা এই যে, আবূ বকরের নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া এবং দুশমনদের দেখে কেঁদে ফেলা, এ সব কিছুই ছিল রাসূল (সা) কে ভালবাসা এবং নৈকট্যের কারণে। যদি আবূ বকরের নিজের জানের ভয় হতো, তা হলে চিন্তার স্থলে ভয়ের বাক্য ব্যবহৃত হতো। এ জন্যে যে, আরবী ভাষায় 'হুযন' শব্দটি চিন্তা, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং আশাভঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর যেখানে প্রাণের ভয় কিংবা ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেখানে তারা ভয়ের শব্দই ব্যবহার করে থাকে। কাজেই হযরত মূসা (আ) যখন তূর পাহাড়ে গেলেন এবং পয়গাম্বরী লাভ করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) কে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেল। মাটিতে ফেলায় তা এক বিরাট সাপ হয়ে গেল। আর মূসা (আ) এতে ভীত হয়ে এমনভাবে পলায়ন করতে থাকলেন যে, পিছনে ফিরে পর্যন্ত দেখছিলেন না। সে সময় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন يَا مُوسَى لا تَخَفْ إنِّي لا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ "ওহে মূসা, ভয় করো না, আমার নিকটে আমার রাসূলগণ ভয় করে না। (সূরা নামল : ১০)

এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ঐ সাপের দ্বারা মূসা (আ) নিজের প্রাণের আশংকা করছিলেন বলেই পলায়ন করছিলেন। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা সান্ত্বনা দেন যে, 'ভয় করো না'। আর এ কথা বলেননি যে, 'ভীত ও চিন্তিত হয়ো না'। তদ্রূপ

---

১. তাফসীরে ইবন জারীর, ১খ. পৃ. ৯৬।

২ রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ.৪।

অনিচ্ছাকৃতভাবে যখন মূসা (আ)-এর হাতে এক কিবতী মারা গেল এবং ফিরাউনের লোকজন এজন্যে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, তখন মূসা (আ) ভয় পেয়ে সেখান থেকে আত্মগোপন করলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন : فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا "মূসা ভীত হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।"

আর আল্লাহর কালামে অনেক স্থানে 'খাওফ' (ভয়) শব্দটি বিদ্যমান, যেখানেই শব্দটি আছে, সেখানে এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেখানে চিন্তা বুঝানো হয়েছে, সেখানে 'হুযন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন হযরত ইয়া'কূব (আ) কে বলল, 'আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি ইউসুফের শোকে মরে না যান।' তখন হযরত ইয়া'কূব (আ) বললেন : اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ

"আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি।"

এ স্থানে তিনি 'হুযন' শব্দ ব্যবহার করেছেন; 'খাওফ' ব্যবহার করেননি। এ ছাড়াও অনেক আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'হুযন' এবং 'খাওফ' ভিন্ন অর্থবোধক। যেমন আল্লাহ বলেন : تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

"তাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বললো, তোমরা ভীত হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না।"

যদি 'হুযন' এবং 'খাওফ'-এর একই অর্থ হতো তা হলে নির্দিষ্টভাবে বলার কি প্রয়োজন ছিল ? শুদ্ধ এটাই যে, 'হুযন' এক বস্তু এবং 'খাওফ' আর এক বস্তু। খাওফ তাকেই বলে যা কিছুটা সামনে আসার আশঙ্কা রয়েছে; আর غم (চিন্তা) বলে মনের বাসনা কার্যত বেহাত হয়ে যাওয়াকে।

অধিকন্তু, 'চিন্তা' 'খুশির' বিপরীতে বলা হয় আর 'ভয়' 'প্রশান্তি'র বিপরীতে। উদাহরণত, যখন কারো কোন প্রিয় ও আপনজন মারা যায়, তখন তার যে অবস্থা দাঁড়ায় তাকে 'গুম' (চিন্তা) বলে; কেউই একে খাওফ (ভীতি) বলে না।

আর যদি কারো পুত্র দেয়ালে আরোহণ করে এবং সেখান থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ আশঙ্কাকে অবশ্যই খাওফ বা ভয় বলবে, কোন নাদানই একে 'চিন্তা' বলবে না। অবশ্য বিপদের প্রাক্কালে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকেই চিন্তা বলে এবং ভয় বিপদ আসার পরবর্তী অবস্থার নাম।

আর যদি আমরা আমাদের শী'আ বন্ধুদের খাতিরে لَا تَخَفْ-এর অর্থ لَا تَحْزَنْ-ই বুঝি, তাতেও আমাদের কিছুমাত্র লোকসান নেই। এ জন্যে যে, তখন অর্থ হবে ওহে আবূ বকর, ভয় করো না। প্রকাশ্য অবস্থা এই যে, আবূ বকর যে ভীত হবেন এবং তাঁর জীবন যে সংশয়াপন্ন হবে এবং তা এ কারণে হবে যে, কাফিরদের সাথে তাঁর দুশমনি থাকবে আর সে দুশমনি ঈমান ও ইসলামের জন্যেই। অন্যথায় রাসূল

(সা)-এর সান্ত্বনাদানের কী প্রয়োজন ছিল, তাও আবার এ পর্যন্ত বলে যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন !

[৭] اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) কে لَا تَحْزَنْ (চিন্তিত হয়ো না–ভয় করো না) বলার পর সান্ত্বনা দেন যে, তুমি নিরাশ ও চিন্তিত হয়ো না, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সাথে আছেন)। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তো মুসলমানদেরই পক্ষাবলম্বন ও সাহায্য করেন। اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন) اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহভক্ত মুত্তাকী বা সাবধানীদের সাথে রয়েছেন), اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُحْسِنِيْنَ (নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে রয়েছেন) এবং এ ধরনের বাক্যাবলীর দ্বারা আল্লাহর কালাম ভরপুর।

কাজেই আল্লাহর বাণী : اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (যখন সে তার সঙ্গীকে বলল ভয় করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন) দ্বারা এ বলেও সতর্ক করে দিলেন যে, কেবল রাসূল নন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথেও কাফিররা শত্রুতা পোষণ করে। অন্যথায় রাসূল (সা) কেন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলাই বা কেন তাঁর সাথে থাকবেন বলছেন। আমাদের জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে এভাবে আছেন, যেভাবে তিনি তাঁর রাসূলের সাথে আছেন। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা مَعَنَا "আমাদের সাথে" শব্দ দ্বারা উভয়কে সাহায্য করার কথা বলেছেন। এটা বলেননি যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعِىْ وَمَعَكَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার সাথে ও তোমার সাথে আছেন।" যার অর্থ দাঁড়ায় 'আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন এবং তোমার সাথেও আছেন।' কাজেই এর দ্বারা আরও প্রকাশিত হয়ে গেল যে, আল্লাহ যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন, ঠিক সেভাবেই হযরত সিদ্দীক (রা)-এর সাথেও ছিলেন।

অধিকন্তু, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন" বাক্যটি বিশেষ্য বাচক বাক্য হওয়ার কারণে স্থায়ী এবং চলমান হওয়ার প্রমাণ দেয়। যার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, আল্লাহর সাহায্য, সাহচর্য ও অনুগ্রহ সদাসর্বদার জন্যই তাঁর সাথে থাকবে এবং আল্লাহ কখনই তাঁর থেকে পৃথক হবেন না।

ফিরাউন যখন হযরত মূসা (আ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গীগণ বলল : اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ "নিঃসন্দেহে আমরা তো ধরা পড়তে যাচ্ছি।"

মূসা (আ) বললেন, كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ "কখনই নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রভু আমার সঙ্গে আছেন, তিনি অবশ্যই আমাকে পথ বাতলে দেবেন।"

মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার সাহচর্যকে একবচনের শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, مَعِىَ অর্থাৎ (তিনি আমার সাথে আছেন), বহুবচনের শব্দ অর্থাৎ مَعَنَا

(তিনি আমাদের সবার সাথে আছেন) ব্যবহার করেননি। উদ্দেশ্য এটাই যে, মূসা (আ) আল্লাহর সাহচর্য ও সাহায্যকে নিজের সত্তার সাথে নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন, নিজ উম্মতের জন্য এতে কোন অংশ বা হিসসা দেননি। আর নবী করীম (সা) বাক্যটিতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ ওহে আবূ বকর, তুমি চিন্তিত হয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের উভয়ের সাথে আছেন। তিনি আল্লাহর সাহচর্য ও সাহায্যকে নিজের সাথে নির্দিষ্ট করে নেননি, বরং স্বীয় বিশিষ্ট প্রিয় বন্ধু ও সহযাত্রীকেও এর অংশীদার করেছেন।

অধিকন্তু, মূসা (আ)-এর জন্য সাহচর্য ছিল দাসের প্রতি তার প্রভুর সাহচর্য, এ জন্যে মূসা (আ) আল্লাহকে 'রব' (প্রভু) হিসেবেই সম্বোধন করেছেন إِنَّ مَعِىَ رَبِّى (আমার সাথে আমার প্রভু পরোয়ারদিগার রয়েছেন)।

আর নবী করীম (সা) এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইলাহ-এর সাহচর্য ছিল, যাকে নবী করীম (সা) আল্লাহ শব্দযোগে বলেছেন إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন)। তিনি আল্লাহ তা'আলার সাহচর্যকে মর্যাদাবান ও সর্বোচ্চ গুণবাচক নামে উল্লেখ করেছেন যা সমস্ত পূর্ণ গুণবাচক নামের সমষ্টি। আর মূসা (আ) 'রব' নামের মাধ্যমে আল্লাহর সাহচর্য চেয়েছেন। মাওয়াহিবের বর্ণনামতে যা আল্লামা আরিফুল-লিসান (র) বর্ণনা করতে চেয়েছেন, এটাই তার সারসংক্ষেপ ও সারমর্ম।

[৮] فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন

আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি নাযিল করেন এবং তাঁর বরকতে আবূ বকর (রা) কেও এর অংশ প্রদান করেন। যেমন বায়হাকীর এ রিওয়ায়াতে আছে যে, নবী করীম (সা) আবূ বকরের জন্য দু'আ করেন, ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আবূ বকরের প্রতি প্রশান্তি নাযিল হয়। (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৮৫)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, প্রশান্তি এখানে সন্তুষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা হারবী বলেন, প্রশান্তি একটি বিশেষ বস্তুর নাম, যা তিনটি বস্তুর সমষ্টির দ্বারা হয়ে থাকে ঃ নূর, কুওয়াত (শক্তি) এবং রূহ।

নূর দ্বারা আত্মা আলোকিত ও উজ্জ্বল হয়, ঈমানের প্রমাণ এবং বিশ্বাসের তাৎপর্য তার সামনে প্রকাশিত হয়, সত্য এবং মিথ্যা, হিদায়েত এবং গুমরাহী, সন্দেহ এবং বিশ্বাসের পার্থক্য তার সামনে উদ্ভাসিত হয়।

শক্তি (কুওয়াত) দ্বারা সংকল্প ও ধৈর্য সৃষ্টি হয়। পরাক্রমশালী আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের সময় বিশেষ আনন্দ লাভ হতে থাকে। এ শক্তির কারণেই আত্মা প্রবৃত্তির সমস্ত চাহিদা ও দাবির বিপরীতে বিজয়ী এবং কৃতকার্য হয়ে থাকে। আর রূহ দ্বারা আত্মায় আয়ু ও জীবন সৃষ্টি হয় যে কারণে আলস্যের স্বপ্ন ছেড়ে আল্লাহর বান্দা জাগ্রত হয়ে আল্লাহর পথে সাবধানী পথিক হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিমে আছে, খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা)-এর মুখে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার এ রাজায (কবিতা) উচ্চারিত হচ্ছিল :

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

"হে আল্লাহ! তোমার অনুগ্রহ না হলে আমরা হিদায়াত পেতাম না, আর না সাদকা দিতাম, না নামায পড়তাম। কাজেই তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি নাযিল কর।" (বিস্তারিত জানার জন্য মাদারিজুস সালিকীন, ২খ. পৃ.২৭৮ দেখুন)

প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, عَلَيْهِ শব্দটি দ্বারা নবী (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। আর ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, عَلَيْهِ শব্দটি দ্বারা সাথী অর্থাৎ আবূ বকর (রা) কে বুঝানো হয়েছে। কেননা صَاحِبِهِ শব্দটি নিকটবর্তী এবং যমীর (সর্বনাম) নিকটবর্তী শব্দের দিকে সম্পৃক্ত করা বেশি ভাল। অধিকন্তু, فَاَنْزَلَ -এর ফা অক্ষরটি এ প্রমাণ দেয় যে, এটি 'চিন্তিত হয়ো না' বাক্যের অধীন। আর এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে যখন আবূ বকর সিদ্দীক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি নাযিল করলেন, যাতে তাঁর আত্মা প্রশান্ত হয় এবং চিন্তা ও পেরেশানী দূর হয়ে যায়।[১]

ইমাম রাযীও তাঁর তাফসীরে কাবীরে এ মতই গ্রহণ করেছেন যে, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ বাক্যে عَلَيْهِ-এর যমীর (সর্বনাম) আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আল্লামা সুহায়লী বলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট عَلَيْهِ-এর যমীর আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত। এ জন্যে যে, নবী করীম (সা)-এর তো পূর্বে থেকেই প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি অর্জিত ছিল। আর কতিপয় আলিমের নিকট এর যমীর নবী করীম (সা)-এর প্রতি সম্পৃক্ত এবং আবূ বকর (রা) এতে স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত। হযরত হাফসা (রা)-এর নিকট রক্ষিত কুরআনের কপিতে এভাবে আছে : فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِمَا এখানে عَلَيْهِ এর স্তরিবর্তে عَلَيْهِمَا দ্বিবচনের শব্দ এসেছে।[২]

[৯] وَاَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যাদের তোমরা দেখনি

"তাকে (আল্লাহ্) শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দ্বারা, যাদের তোমরা দেখনি।" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সাওর গুহায় ফেরেশতা দিয়ে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করেন যার কারণে মুশরিকদের অন্তরে এমন ভীতির সঞ্চার হয়েছিল যে, তাদের গুহার ভিতরে দেখার সাহস হয়নি। যেমনিভাবে আসহাবে কাহফের গুহার ভিতরেও আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ ভীতি ছিল, যার কারণে কোন ব্যক্তিই ঐ গুহার ভিতরে উঁকি মেরে দেখতে পারেনি।

---

১. রূহুল মা'আনী, ১০খ. পৃ. ২৭।

২ রাওযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ৫।

যেমন আল্লাহ বলেন :

لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

"তাকিয়ে ওদের দিকে দেখলে, তুমি পিছন ফিরে পলায়ন করতে আর ওদের ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তে।" (সূরা কাহফ : ১৮)

সুতরাং 'মু'জামে তাবারানী'তে হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন কুরায়শগণ তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে গুহা পর্যন্ত পৌঁছল, তখন আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ লোকেরা, যারা সম্পূর্ণ গুহার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন কখনই নয়, ফিরিশতাগণ নিজেদের পাখা দিয়ে আমাদের ঢেকে রেখেছে। এ সময়ে এক ব্যক্তি গুহার সামনে বসে পেশাব করতে শুরু করল। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ বকরকে বললেন, এ ব্যক্তি যদি আমাদের দেখত, তা হলে আমাদের সামনে বসে পেশাব করত না। অনুরূপভাবে মুসনাদে আবূ ইয়া'লায় হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর (রা) থেকে এ বর্ণনা করেছেন।

কতিপয় আলিম وَاَيَّدَهُ -এর যমীর (সর্বনাম) হযরত আবূ বকরের প্রতি সম্পৃক্ত করেছেন। যার সত্যতা হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) বর্ণিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। যাতে নবী করীম (সা) বলেছেন যে, يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْكَ وَاَيَّدَكَ الخ "ওহে আবূ বকর, আল্লাহ তোমাকে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেছেন এবং তোমাকে শক্তি ও সাহায্য-সমর্থন দিয়েছেন।"

[১০] وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ তিনি কাফিরদের বক্তব্যকে হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন যে, শত্রুদেরকে গুহার প্রান্ত থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেন ও অদৃশ্য শক্তি দ্বারা তাঁকে হিফাযত করেন। গুহায় ফিরিশতাদের পাহারায় নিয়োজিত করেন। আর এক মাকড়সার জালকে, যাকে গৃহের আপদ বলা হয়, তারই মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে নিরাপত্তার মাধ্যম বানিয়ে দেন আর আল্লাহর কথাই সর্বদা উচ্চে ও সমুন্নত থাকে। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাঁর সঙ্গীসহ গুহা থেকে সুস্থ ও নিরাপদে মদীনা পৌঁছে দেন। আর পথে যে সুরাকা তাঁকে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করেছিল, সে স্বয়ং তাঁর আনুগত্যের আঁচলে বাঁধা এবং বন্দী, সব সময়ের জন্য বান্দায় পরিণত হলো। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তাঁর কুদরত ও প্রজ্ঞা সবার উপর বিজয়ী এবং তাঁর অদৃশ্য সাহায্য, সাহচর্য এবং নাযিলকৃত ফেরেশতা, যাঁরা প্রশান্তি নিয়ে এসেছিলেন সব কিছু তারই প্রভাব।

প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিবর্গের নিকট এটা স্পষ্ট যে, গুহার সাথী, আত্মোৎসর্গকারী সুহৃদ আল্লাহ নবীর বন্ধুত্বের ফলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য, প্রশান্তি, স্বস্তি এবং ফিরিশতাদের সাহায্যের ভাগ পেয়েছেন, তার মর্যাদা অপরিসীম।

অতএব যে আল্লাহ হিজরতের সফরে প্রকাশ্য কোন অবলম্বন ছাড়াই স্বীয় নবীকে হিফাযত করেছেন এবং অপর স্থানেও স্বীয় নবীর হিফাযত করতে সক্ষম। কারো এটা ধারণা করার অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তাঁর নবী এবং নবীর সঙ্গীকে গুহায় হিফাযত করতে অপরের সাহায্য ও কৃপার মুখাপেক্ষী।

منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت شناس ازوکه بخدمت بداشتت

"তুমি বাদশাহের সেবা করছো বলে এটাকে তাঁর প্রতি করুণা জ্ঞান করো না; বরং তোমাকে সেবার সুযোগ দানের জন্য বাদশাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"

সারকথা

আল্লাহ তা'আলা ঐ আয়াতে হিজরতের সফরে আবূ বকরের বন্ধুত্বের ঘটনা যে মর্যাদার সাথে বর্ণনা করেছেন, এটা তাঁর মর্যাদা এবং আত্মোৎসর্গের সনদ ও সাক্ষ্য, যা তাঁর চরম দুশমনরাও স্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে 'হামলায়ে হায়দারীর' কয়েক চরণ কবিতা পাঠকদের উপহার দেয়া যাচ্ছে :

چنین گفت راوی که سالار دین چو سالم بحفظ جهاں آفرین
زنزدیك آن قوم پر مکر رفت بسوئے سرائے ابوبکر رفت
پئے هجرت اونیز آماده بود که سابق رسولش خبر داده بود
نبی بر در خانه اش چوں رسید بکوشش ندائے سفر درکشید
چو بوبکر زاں حال آگاه شد زخانه بروں رفت وهمراه شد
گرفتند پس راه یثرب به پیش نبی کند نعلین از پائے خویش
بسرپنجه آں راه رفتن گرفت پئے خودز دشمن نهفتن گرفت
چو رفتند چندے زد امان دشت قدوم فلك سائے مجروح گشت
ابوبکر انگه بدوشش گرفت ولے زیں حدیث است جائے شگفت
که درکس چنان قوت آئد پدید که بار نبوت تواند کشید
برفتند القصه چندے دگر چوگر دید پسید انسان سحر
بجستند جائیکه باشد پناه زچشم کسان دریکسوز راه
بدید ندغارے وراں تیره شب که خواندے عرب غار ثورش لقب
گرفتند در جوف آن غار جائے ولے پیش بنهاد بوبکر پائے

بهر جاكه سوراخ يار خز ديد　　قبارا بدريد وآن رخز چيد
بدينگونه تاشد تمام آں قبا　　يكے رخنه نگرفته ماند ازقضا
بران رخنه گويندان يار غار　　كف پائے خودرا نمود استوار
نيامد جزاو اين شرف از كسے　　كه دور از خرومی نمايد بسے
بغار اندروں درشب تيره فام　　چسان ديد سوراخهارا تمام
دران تيره شب يك بيك چون شمرد　　يكئے كا امدافزون بروپافشرد
نيايد چنين كارے ازغيراو　　بدينمان چو پرداخت از رفت درد
در آمد رسول خدا هم بغار　　نشتند يك جابهم هر دو يار

"বর্ণনাকারী বলেন, ঐ প্রতারক জাতির নিকট থেকে দীনের সিপাহ্সালার যখন মহান স্রষ্টার হিফাযতে সহী-সালামতে চলে গেলেন, তখন প্রথমে তিনি আবূ বকরের গৃহের পানে গেলেন। হিজরতের জন্য তিনিও প্রস্তুত ছিলেন; কেননা পূর্বে রাসূল তাকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছিলেন। নবীজি যখন তাঁর দরজায় উপস্থিত হলেন, তাঁকে হিজরত সফরের সংবাদ দিলেন। আবূ বকর ঐ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং হযরতের সঙ্গী হলেন। অতঃপর ইয়াসরিবের পথে অগ্রসর হলেন। নবীও তাঁর পাদুকা পরে নিলেন। সর্বান্তকরণে তিনি চলতে আরম্ভ করলেন। দুঃশাসনের কাছ থেকে আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন। পাহাড়ের প্রান্ত ধরে যখন কিছুদূর গেলেন, তাঁর পবিত্র কদম আহত হয়ে পড়ল। এরপর আবূ বকর তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন। কিন্তু এ কথাটি আশ্চর্জজনক বলেই মনে হয়। কেননা কার মাঝে এমন শক্তি হবে যে, তিনি নবূয়াতের বোঝা বহন করতে পারবেন? মোটকথা, তাঁরা আরো কিছুদূর অগ্রসর হলেন। এমন এক স্থানে গেলেন, যা আশ্রয় কেন্দ্র হবে। যারা তাঁদের খুঁজছিল, তাদের চোখের আড়াল হবেন। রাতের সেই অন্ধকারে একটি গুহা দেখলেন, আরবরা যাকে সাওর গুহা বলেই জানে। সেই গুহার পেটে হযরত (সা) আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানে প্রথম আবূ বকরই প্রবেশ করলেন। সেখানে যখন কোন গর্ত বা ফাঁক দেখতে পেলেন, নিজ জামা ছিঁড়ে সে গর্তের মুখ বন্ধ করলেন। এভাবে জামার কাপড় পুরোটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু একটা গর্ত ঘটনাক্রমে বাকি ছিল। বলা হয় যে, সেই গর্তের মুখে গুহার সাথী (আবূ বকর) নিজের পা রাখলেন। তিনি ছাড়া আর কারো এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়নি যে, ঘন অন্ধকার রাতে গুহার অভ্যন্তরে গর্তগুলো তিনি দেখতে পেলেন পুরোপুরি। রাতে গর্তগুলো এক এক করে গণনা করলেন। এভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল গুহায় প্রবেশ করলেন এবং দুই সাথী একত্রে বসলেন।"

এ রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, হযরত নবী (সা) এ বিপদসঙ্কুল সফরে আবূ বকরকে নিজের সঙ্গী করেছেন। প্রথমে তিনি নিজে আবূ বকর সিদ্দীকের

গৃহে গিয়েছেন এবং সেখান থেকে উভয়ে একসাথে রওয়ানা হয়েছেন। আবূ বকর (রা) নবী (সা) কে নিজ বাহনে আরোহণ করিয়েছেন, নিজে প্রথমে গুহায় নেমেছেন এবং তা পরিষ্কার করেছেন, নিজের চাদর ছিড়ে এর ছিদ্রগুলো বন্ধ করেছেন। আর একটি ছিদ্র বাকি থাকায় নিজের পায়ের তলা দিয়ে তা বন্ধ করেছেন। এ সমুদয় কাজই আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সততা, নিষ্ঠা, ভালবাসা এবং বন্ধুত্বের প্রমাণ ও উদাহরণ। অতঃপর এ তিনদিন তিনি গুহায় অবস্থান করেন এবং খাবার আসতো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঘর থেকে। আর তৃতীয় দিন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর পুত্র দুটি উটনী নিয়ে গুহায় উপস্থিত হন। একটিতে হযরত (সা) নিজে আরোহণ করেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কে নিজের সাথে আরোহণ করান। অপরটিতে আবূ বকর সিদ্দীকের আযাদকৃত দাস আমির এবং উষ্ট্র চালক আরোহণ করেন। এভাবেই তাঁরা মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন। সুতরাং 'হামলায়ে হায়দারী'র লেখকও এভাবে তা বর্ণনা করেছেন :

پغار اندروں تاسه روز وسه شب   بسر بردآن شر بفرمان رب
شدے پور بوبکر هنگام شام   رساندے درآں غارآب وطعام
نمودے هم ازحبال اصحاب شر   حبیب خدائے جهان را خبر
که هستند در جستجو آں گروه   شب وروز درشهر وصحرا وکوه
دگر رائیے بود عامر بنام   که کردے شبانی به بیت الحرام
که او نیز اسلام آورده بود   زابریق توفیق می خور ده بود
شدے شب به نزد بشیر ونذیر   ببردے برش هدیه جامی رشیر
جزیشان دگر از صدیق وعدو   نبذ هیچکش واقف از راز او
نبی گفت پس پور بوبکر را   که اے چون پدر اهل صدق وصفا
دوجمازه باید کنون راه وار   که مارارساند به یثرب دیار
برفت از برش پور بوبکر زود   بدنبال کارے که فرموده بود
بگفتش فلاں روز وقت سحر   دو جمازه بهر پیمبر ببر
از وجمله دار ایں سخن چوں شنود   دو جمازه در دم مهیا نمود
تهی شد ازان قوم آن کوه ودشت   رسول خدا عازم راه گشت
بصبح چهارم بر آمد زغار   دو جمازه آور ده بدجمله دار
نشست از بریك شتر شاه دین   ابوبکر راکرده باخود قرین
بر آمد برآن دیگر حمله وار   بهمراه اوگشت عامر سوار

"আল্লাহর নির্দেশে সেই বাদশাহ্ গুহার ভেতরে তিন দিন তিন রাত অবস্থান করলেন, সন্ধ্যা হলে আবূ বকরের পুত্র আসতেন, সেই গুহায় পানি ও খাবার পৌঁছাতেন। দুষ্ট লোকদের অবস্থার খবরাখবরও আল্লাহর হাবীবকে জানাতেন। বলতেন, ঐ লোকেরা তাঁদের সন্ধানে আছে, রাত-দিন, শহরে-প্রান্তরে-পাহাড়ে। আমির নামে একজন রাখাল ছিলেন, যিনি বায়তুল হারাম এলাকায় রাখালী করতেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মদীরা পান করেছিলেন তাওফীকের পানপাত্র থেকে। রাতের বেলা বাশীর ও নাযীর-এর কাছে আসতেন, তাঁর জন্য হাদিয়া নিয়ে আসতেন দুধের পেয়ালা। এরা ছাড়া বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে কেউ তাদের খবরাখবর জানত না। নবীজি আবূ বকরের পুত্রকে বললেন, ওহে, তুমিও তোমার পিতার মত সৎ ও নিষ্ঠাবান। এখন আমাদের দুটি উটনী দরকার, যা আমাদেরকে ইয়াসরিবে পৌঁছে দেবে। আবূ বকরের পুত্র তখন যে কাজের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন তা পালন করতে ছুটে গেলেন। রাখালকে বললেন, অমুক দিন সাহরীর সময় দুটি উটনী পয়গাম্বরের জন্য নিয়ে এসো। এ কথা শোনামাত্র তারা সময়মত দুটি উটনী হাযির করল। সেই পর্বতে আর কোন লোক নেই, আল্লাহর রাসূল সফরে প্রতীজ্ঞ হলেন। দুটি উটনীতে সওয়ার হয়ে চতুর্থ দিনের প্রভাতে গুহা থেকে বের হলেন। দীনের বাদশাহ্ বসলেন একটি উটনীর উপর, আর পেছনে নিলেন আবূ বকরকে; আর অপর উটনীতে উষ্ট্র চালকের সাথে সওয়ার হলেন আমির।"

গুহা থেকে প্রত্যাবর্তন

তিনদিন তিনি ঐ গুহার মধ্যেই ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ[১] ইবন আবূ বকর সমস্ত দিন মক্কায় থাকতেন এবং মুশরিকদের সংবাদাদি সংগ্রহ করতেন আর রাতে এসে খবরাদি জানিয়ে দিতেন এবং ভোরেই সেখান থেকে বেরিয়ে যেতেন। আমির[২] ইবন ফুহায়রা (হযরত আবূ বকরের মুক্ত দাস) ইশার পর যখন অন্ধকার হয়ে আসত, তখন বকরিগুলো নিয়ে সেখানে উপস্থিত হতেন যাতে তাঁরা প্রয়োজনমত দুধপান করতে পারেন। এভাবে তিনটি রাত গুহায় অতিক্রান্ত হয়। তিনদিন পর আবদুল্লাহ[৩]

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর প্রিয় পুত্র ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর পিতার খিলাফতকালে পিতার পূর্বেই তিনি ইনতিকাল করেন। (ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৮৩)।

২. হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত। তুফায়ল ইবন আবদুল্লাহর গোলাম ছিলেন, যে তাঁকে খুবই কষ্ট দিত। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁকে তুফায়লের নিকট থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হন এবং বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁর লাশ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং পরে পুনরায় যমীনে নামিয়ে দেয়া হয়। (ইসাবা এবং অন্যান্য গ্রন্থ)।

৩. হাফিয আবদুল গনী মুকাদ্দাসী, আল্লামা সুহায়লী এবং আল্লামা নববী বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আরিকত ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আমরা কোন সহীহ সূত্রে এমন খবর পাইনি, আর এটাই সত্য। অবশ্য ওয়াকিদীর বর্ণনামতে তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৩৯; ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৭৪)।

ইবন আরিকত দু'আলী (যাকে মজুরীর বিনিময়ে পথপ্রদর্শনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল) ওয়াদামাফিক প্রত্যুষে দুটি উটনী নিয়ে গুহার নিকট উপস্থিত হয় এবং সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে অপরিচিত পথে তাঁদের নিয়ে উপকূল বরাবর চলতে থাকে (বুখারী শরীফ, বাবুল হিজরাত)।

হযরত নবী করীম (সা) একটি উটনীতে এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) অপর উটনীটিতে আরোহণ করেন। মুক্ত দাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রাকে খিদমত করার জন্য সাথে নেন এবং নিজের পিছনে বসান। আবদুল্লাহ ইবন আরিকত[১] আপন উটে আরোহণ করে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে থাকে।[২]

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) বলেন, একটি উটনীর উপর রাসূলুল্লাহ (সা) সওয়ার হন এবং আবূ বকরকে পিছনে বসিয়ে নেন। আর অপর উটনীটিতে আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর এবং আমির ইবন ফুহায়রা আরোহণ করেন।[৩] কিন্তু প্রথম বক্তব্যটিই সঠিক। এ জন্যে যে, হাফিয আসকালানী তাঁর 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, এ সফরে নবী করীম (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর সাথে আমির ইবন ফুহায়রা (রা) ছাড়া আর কোন সঙ্গী ছিলেন না। আর তৃতীয় উটে আবদুল্লাহ ইবন আরিকত আরোহণ করে এবং সাধারণ প্রশস্ত রাস্তা ছেড়ে অপ্রসিদ্ধ পথে অগ্রসর হন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর কাছে চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। আল্লাহর রাস্তায় এবং ক্রীতদাসদের কিনে কিনে মুক্ত করে দিয়ে এর সমুদয় অর্থই ব্যয় হয়ে গিয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল, তাও হিজরতের সময় সাথে নিয়েছিলেন। মদীনায় এসে মসজিদে নববীর জন্য জায়গা ক্রয়, ইত্যাদি কাজে সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মৃত্যু-কালে আবূ বকর (রা) একটি দীনার কিংবা একটি দিরহামও অবশিষ্ট রেখে যাননি।[৪]

আবদুল্লাহ ইবন আরিকত রাসূল (সা) এবং আবূ বকর (রা) সহ মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বেরিয়ে উপকূলের দিকে অগ্রসর হয় এবং আসগালে উসফান অতিক্রম করে মনযিলের পর মনযিল পার হয়ে কুবায় প্রবেশ করে।[৫]

---

১. আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) মক্কায়ই থেকে যান আর আবদুল্লাহ ইবন আরিকত পথপ্রদর্শক হিসেবে তাঁর সাথে মদীনা গমন করে। মদীনা থেকে ফিরে এসে উভয় বুযুর্গের নিরাপদে মদীনা পৌঁছার সংবাদ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) কে অবহিত করে। এ খবর পাওয়ার পর আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরিবার-পরিজন নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪০।

৩. মাদারিজুন নুবূয়াত, ২খ. পৃ. ৮৫।

৪. ইসাবা, ২খ. পৃ. ৩৪২।

৫. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৬।

ফায়েদা

রাসূলে করীম (সা) যখন নিজের গৃহ থেকে বের হয়ে আবূ বকরের গৃহে আসেন এবং তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন, তখন কাফিরেরা এসে তাঁর গৃহ ঘেরাও করে। যখন সেখানে তাঁকে পেল না, তখন তাঁর সন্ধানে নিমগ্ন হলো, স্থানে স্থানে মানুষ পাঠাল এবং খুঁজতে খুঁজতে সাওর গুহার মুখে উপস্থিত হলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মাকড়সার জাল দ্বারা ঐ কাজ করলেন যা শত-সহস্র লৌহ বেষ্টনীও করতে পারে না। তিনদিন পর্যন্ত তিনি গুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন, আর কাফিররা তিনদিন পর্যন্ত খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত থাকল। যখন কাফিররা নিরাশ হয়ে গেল ও ব্যর্থ হয়ে বসে পড়ল এবং ঐ ঘোষণা প্রচার করল যে, মুহাম্মদ (সা) অথবা আবূ বকর (রা) কে যে ব্যক্তি ধরে আনবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। এরপরেও যখন কোন সাফল্য এলো না, তখন অনুসন্ধানে ভাটা পড়ল। রাসূল (সা) ও আবূ বকর (রা) তখন গুহা থেকে বেরিয়ে উপকূলবর্তী পথে মদীনায় রওয়ানা হয়ে গেছেন। মানুষ আবূ বকরকে ভালভাবেই চিনত, তবে রাসূল (সা) কে খুব একটা চিনত না। পথিমধ্যে যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হতো, সেই আবূ বকরকে জিজ্ঞেস করত, সঙ্গে তিনি কে, যিনি তোমার সামনে বসে আছেন? আবূ বকর বলতেন, هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِى السَّبِيْلَ "ইনি সেই ব্যক্তি, যিনি আমাকে পথ দেখাচ্ছেন।" আর তাঁর অর্থ মনে করতেন যে, আখিরাত ও কল্যাণের পথ দেখাচ্ছেন। (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫৫৬)

রওয়ানা হওয়ার তারিখ

বায়'আতে আকাবার প্রায় তিন মাস পর পয়লা রবিউল আউয়াল তিনি মক্কা মুকাররামা থেকে রওয়ানা হন। হাকিম বলেন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি সোমবারে মক্কা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সোমবারেই মদীনায় পৌঁছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন মূসা খাওয়ারিযমী বলেন, তিনি মক্কা থেকে বুধবারে বের হন। হাফিয আসকালানী বলেন, বিশুদ্ধ এটাই যে তিনি বুধবারে মক্কা থেকে বের হন, তিনদিন গুহায় অবস্থান করেন এবং সোমবারে গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন।[১]

হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, তাঁর রওয়ানা হওয়ার পর কিছু লোক আমার পিতার গৃহে আগমন করে, যাদের মধ্যে আবূ জাহলও ছিল, তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার আব্বা কোথায়? আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি জানি না। আবূ জাহল আমাকে এমন জোরে চপেটাঘাত করল যে, আমার কানের দুল ছিঁড়ে পড়ে গেল।[২]

---

১. যারকানী, পৃ. ৩২৫।

২ সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭২।

হযরত উম্মে মা'বাদ (রা)-এর ঘটনা

গুহা থেকে বেরিয়ে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার রাস্তা ধরেন। পথে উম্মে মা'বাদ-এর তাঁবু অতিক্রম করেন। উম্মে মা'বাদ ছিলেন একজন অত্যন্ত ভদ্র এবং অতিথি সেবক। তাঁবুর চত্বরে বসে থাকতেন। নবীজির কাফেলার লোকেরা এসে উম্মে মা'বাদকে গোশত এবং খেজুর ক্রয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি যখন ঐ তাঁবুর প্রতি পড়ল, তখন তাঁবুর একদিকে একটি বকরি দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এটি কেমন বকরি ? উম্মে মা'বাদ বললেন, এ বকরিটি রোগা এবং দুর্বল হওয়ার কারণে বকরি পালের সাথে জঙ্গলে যেতে পারে না। তিনি (সা) বললেন, এতে কিছু দুধ আছে। উম্মে মা'বাদ বললেন, এর মধ্যে কোত্থেকে দুধ আসবে ? তিনি বললেন, আমাকে এর দুধ দোহনের অনুমতি দেয়া হোক। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, যদি এতে দুধ থাকে তবে আপনি অবশ্যই দোহন করে নিন। হযরত (সা) 'বিসমিল্লাহ' বলে এর স্তনে পবিত্র হাত রাখলেন। স্তন দুধে ভরে গেল এবং তিনি দুধ দোহন করতে শুরু করলেন। একটি বড় পাত্র (যা দ্বারা আট দশ ব্যক্তি তৃপ্ত হতে পারে) দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। প্রথমে তিনি উম্মে মা'বাদকে দুধ পান করালেন, এমনকি উম্মে মা'বাদ তৃপ্ত হলেন। এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদের পান করালেন এবং সবশেষে নিজে পান করলেন। এরপর তিনি পুনরায় দোহন করলেন। এমনকি ঐ বড় পাত্রটি ভরে গেল। তিনি পাত্রটি উম্মে মা'বাদকে দান করলেন এবং তাকে বায়'আত করে রওয়ানা হলেন। যখন সন্ধ্যা হলো এবং উম্মে মাবাদের স্বামী আবূ মা'বাদ জঙ্গলে বকরী চড়িয়ে ফিরে এলেন, দেখলেন, একটি বড় 'ভাণ্ড' দুধে ভর্তি! খুবই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে উম্মে মা'বাদ, এ দুধ এলো কোত্থেকে? এ বকরির তো দুধের নাম-নিশানাও ছিল না। উম্মে মা'বাদ বললেন, এ পথে আজ এক পবিত্র পুরুষ গমন করেছেন, আল্লাহর কসম, এ সব তাঁরই বরকতে। আর তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। আবূ মা'বাদ বললেন, অন্তত তাঁর কিছু অবস্থা তো বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ তাঁর পবিত্র আকৃতি, তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি সাহস এবং চমৎকার একটা পরিচিতি তুলে ধরলেন যা মুস্তাদরাকে বিস্তারিত বর্ণিত আছে।

আবূ মা'বাদ বললেন, আমি বুঝে ফেলেছি, আল্লাহর কসম, তিনি ঐ কুরায়শী ব্যক্তি, আমিও অবশ্যই তাঁর খিদমতে উপস্থিত হব। এদিকে তো ঘটনা এই, অন্যদিকে অদৃশ্য ঘোষক কর্তৃক মক্কায় এই কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছিল। এর শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু পাঠককে দেখা যাচ্ছিল না। কবিতাটি এই :

جَزَى اللّٰهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَائِهِ رَفِيْقَيْنِ حَلاَّ خَيْمَتَىْ أُمِّ مَعْبَدِ

"আল্লাহ তা'আলা এ উভয় বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যারা উম্মে মা'বাদের তাঁবুতে অবতরণ করেছিল।"

هُمَا نَزَلاَ هَا بِالْهُدٰى فَاهْتَدَتْ بِهِ فَقَدْ فَازَ مَنْ اَمْسٰى رَفِيْقَ مُحَمَّدٍ

"উভয়ে হিদায়াত নিয়ে অবতরণ করেছিল, আর উম্মে মা'বাদ হিদায়াত গ্রহণ করেছে এবং লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে। যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর এ সফরে সঙ্গী হয়েছে অর্থাৎ আবূ বকর (রা)"

لِيَهْنَ اَبَا بَكْرٍ سَعَدَةُ جَدِّهِ بِصُحْبَتِهِ مَنْ يُسْعِدِ اللّٰهُ يَسْعَدِ

"আবূ বকর তার সাহচর্য ও বন্ধুত্বের দরুন কল্যাণ ও সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ঐ আবূবকরকে ধন্যবাদ, যাকে আল্লাহ সৌভাগ্যবান করেন, সে অবশ্যই সৌভাগ্যবান হবে।"

لِيَهْنِ بَنِى كَعْبٍ مَقَامِ فَتَاتِهِمْ........وَمَقْعَدُهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ بِمَرْصَدِ

"কল্যাণ হোক বনী কা'ব-এর এবং তাদের স্ত্রীলোকদের মর্যাদা, আর ঈমানদারদের জন্য তাদের ঠিকানা কাজে আসা"

سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَاِنَائِهَا فَاِنَّكُمْ اِنْ تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِ

"তুমি নিজের বোনের কাছে তার বকরি এবং পাত্রের অবস্থা তো জিজ্ঞেস কর, যদি তুমি বকরিকেও জিজ্ঞেস কর তবে বকরীও সাক্ষ্য দেবে"

دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ عَلَيْهِ صَرِيْحًا ضُرَّةُ الشَّاةِ مُزْبَدُ

"তিনি তার কাছে একটি বকরি চাইলেন, অতঃপর সে এতটা দুধ দিল যে, হাত ভর্তি হয়েছিল।"

فَغَادَرَهَا رَهْنًا لَدَيْهَا لِحَالِبٍ يُرَدِّدُهَا فِيْ مَصْدَرٍ ثُمَّ مَوْرِدُ

"এরপর তিনি বকরিটি তারই কাছে রেখে আসেন যে প্রত্যেক গমনাগমনকারীর জন্য দুধ দোহন করে।"

হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-এর কাছে যখন অদৃশ্য ঘোষকের এ কবিতা পৌঁছল, তখন এর জবাবে হাসসান এই কবিতা বললেন :

لَقَدْ خَابَ قَوْمٌ غَابَ عَنْهُمْ نَبِيُّهُمْ وَقُدِّسَ مَنْ يَسْرِى اِلَيْهِ وَيَغْتَدِىْ

"অবশ্যই হৃত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারাই যাদের মধ্য থেকে তাদের পয়গাম্বর চলে গেছেন অর্থাৎ কুরায়শ। আর পাক-পবিত্র হলো তারাই যারা সকাল-সন্ধ্যায় ঐ নবীর খিদমতে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ আনসার।"

تَرَحَّلَ عَنْ قَوْمٍ فَضَلَّتْ عُقُوْلُهُمْ وَحَلَّ عَلٰى قَوْمٍ بِنُوْرٍ مُجَدَّدِ

"ঐ নবী এক সম্প্রদায়কে ত্যাগ করেছেন, তাদের জ্ঞান তো বরবাদ হয়ে গেছে, আর অপর সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর এক একটি নতুন নূর নিয়ে অবতরণ করেছেন।"

هَدَاهُمْ بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ رَبُّهُمْ فَاَرْشَدَهُمْ مَنْ يَتْبَعُ الْحَقَّ يَرْشُدُ

"পথভ্রষ্টতার পর আল্লাহ ঐ নূর দিয়ে তাদের পথ প্রদর্শন করেন, আর যারা সত্যের অনুসরণ করবে, তারা হিদায়াত পাবে।"

وَهَلْ يَسْتَوِىْ ضَلَالُ قَوْمٍ تَسَفَّهُوْا عَمًى وَهُدَاةٌ يَهْتَدُوْنَ بِمُهْتَدِ

"আর পথভ্রষ্ট এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি এক সমান হতে পারে ?"

وَقَدْ نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى اَهْلِ يَثْرِبُ رِكَابُ هُدًى حَلَّتُ عَلَيْهِمْ بِاَسْعُدِ

"আর ইয়াসরিববাসীদের উপর হিদায়াতের কাফেলা সৌভাগ্য ও কল্যাণ নিয়ে অবতরণ করেছেন.।"

نَبِيٌّ يَرَى مَالاَ يَرَ النَّاسُ حَوْلَهُ وَيَتْلُوْ كِتَابَ اللّٰهِ فِيْ كُلِّ مَشْهَدِ

"তিনি নবী, তাঁর ঐসব জিনিসও নজরে আসে, যা তাঁর পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তির নজরে আসে না, আর তিনি মজলিসে সবার সামনে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন।"

وَاِنْ قَالَ فِيْ يَوْمٍ مَقَالَةُ غَائِبٍ فَتَصْدِيْقُهَا فِي الْيَوْمِ اَوْ فِيْ ضُحِيَ الْغَدِ

"আর যদি তিনি কোন অদৃশ্যের খবর শোনান, তবে তা আজই অথবা আগামীকাল সকাল পর্যন্ত এর বাস্তবতা ও সত্যতা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।"

এ রিওয়ায়াত বিভিন্ন সাহাবা কিরাম থেকে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। উম্মে মা'বাদ, আবূ মা'বাদ (অর্থাৎ উম্মে মা'বাদের স্বামী), হুবায়শ ইবন খালিদ (রা), অর্থাৎ উম্মে মা'বাদের ভাই, আবূ সলীত বদরী (রা) ও হিশাম ইবন হুবায়শ ইবন খালিদ-এর মধ্যে প্রথমোক্ত চারজনের সাহাবী হওয়ার ব্যাপার স্বীকৃত এবং সকলেই একমত। হিশাম ইবন খালিদ ইবন হুবায়শের সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। ইবন হিব্বান হিশামকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন, হিশাম হযরত উমর (রা) থেকে (হাদীস) শুনেছেন। (ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৬০৩)

১. উম্মে মা'বাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত ইবন সাকান উল্লেখ করেছেন। (ইসাবা, উম্মে মা'বাদ-এর জীবনী, বাবুল কুনা)

২. আর আবূ মা'বাদ (রা)-এর রিওয়ায়াত ইমাম বুখারী তাঁর 'তারিখে' এবং ইমাম ইবন খুযায়মা তাঁর 'সহীহ'-এ উল্লেখ করেছেন। (ইসাবা, আবূ মা'বাদ-এর জীবনী, বাবুল কুনা এবং ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ. পৃ. ১৫৫-তে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে, ৩খ. পৃ. ১১-এ উল্লেখ করেছেন)।

৩. হুবায়শ ইবন খালিদ (রা)-এর রিওয়ায়াত বাগাবী, ইবন শাহীন, ইবন সাকান, তাবারানী, ইবন জিদ্দা প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।[1]

হুবায়শ (রা)-এর রিওয়ায়াত হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাসও তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। অধিকন্তু, হুবায়শ ইবন খালিদ (রা)-এর রিওয়ায়াত হাফিয মিযযী (র) বিস্তারিতভাবে তাঁর 'তাহযীবুল-কামাল' গ্রন্থে নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন।[2]

---

১. ইসাবা, ১খ. পৃ. ৩১০।

২. তাহযীবুল কামাল, ১খ. পৃ. ৩৪, (তাহযীবুল কামাল বিশ্বখ্যাত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, এর হাতে লিখা পাণ্ডুলিপি হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আসফিয়া কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। আমি সেখান থেকে উপকৃত হয়েছি)। –গ্রন্থকার।

৪. আবূ সলীত বদরী (রা)-এর রিওয়ায়াত উয়ূনুল আসারে উল্লিখিত আছে।

৫. হিশাম ইবন হুবায়শ (রা)-এর রিওয়ায়াত মুস্তাদরাকে উল্লেখ আছে। হাকিম এ রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে বলেন, এ হাদীসটির সনদ সহীহ। এরপর হাকিম এ হাদীসটি অন্যান্য সনদের সাথেও বর্ণিত বলে প্রমাণ করেন (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১০)। এ সনদগুলো চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে সহীহ হওয়ার শর্ত পাওয়া না গেলেও একত্রিতভাবে উপকারী, শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে।

হাফিয ইবন আবদুল বার তাঁর 'আল-ইস্তিয়াবে' বলেন, উম্মে মা'বাদের ঘটনা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরামের এক বিরাট জামায়াত বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও এ বর্ণনার প্রায় নিকটতর, বরং চাক্ষুস বর্ণনা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা হাকিম তাঁর 'ইকলীলে' এবং বায়হাকী তাঁর 'দালাইলুন নুবূয়াতে' উল্লেখ. করেছেন। আর হাফিয ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৯১-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, এর সনদ হাসান। পার্থক্য কেবল এতটুকুই যে, এ বর্ণনায় উম্মে মা'বাদের নাম উল্লেখ নেই, কেবল 'জনৈক স্ত্রীলোকের ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন, যা মূলত উম্মে মা'বাদের সাথেই মিলে যায়।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং ইমাম বায়হাকীর অভিমত এই যে, এ ঘটনা বাস্তবে উম্মে মা'বাদেরই ঘটনা। আর হাফিয মুগালতাঈর অভিমত যে, এটি উম্মে মা'বাদ ভিন্ন অপর কারো ঘটনা। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[1]

৬. অধিকন্তু, এ বর্ণনা কায়স ইবন নু'মান থেকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত আছে। এ প্রসঙ্গে হাফিয হায়সামী বলেন, হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন এবং এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয-যাওয়াইদ)।[2]

ঐ আবূ মা'বাদ খুযাঈ থেকে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) তাঁর মুসনাদে অট্টহাসি বিষয়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই :

ابو حنيفة عن منصور بن زاذان الوسطى عن الحسن عن معبد بن ابى سعيد الخزاعى عنه ﷺ قال بينما هو فى الصلوة اذاقبل اعمى يريد الصلوة فوقع فى زبية فاستضحك القوم فقهقهوا فلما انصرف ﷺ قال من كان منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلوة

"আবূ হানীফা.... মা'বাদ ইবন আবূ সাঈদ খুযাঈ (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন তাঁর সাথে নামাযে ছিলাম, এমন সময় এক অন্ধ ব্যক্তি নামাযের উদ্দেশে আসছিল, সে একটি গর্তে পড়ে গেল। তখন সবাই হেসে

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ ১৯০।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৯।

উঠল, এমনকি অট্টহাস্য করল। নবী (সা) নামায শেষে বললেন যে তোমাদের মধ্যে অট্টহাসি হেসেছে, সে যেন পুনরায় উযূ করে এবং নামায আদায় করে।"

(ফাতহুল কাদীর, ১খ. পৃ. ৩৫, কিতাবুত তাহারাত, নাওয়াকিযে উযূ অধ্যায়)

সুরাকা ইবন মালিকের ঘটনা

কুরায়শগণ এ ঘোষণা দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) অথবা আবূ বকর (রা) কে হত্যা অথবা বন্দী করে আনতে পারবে,তাদের প্রত্যেকের বিনিময়ে পৃথক পৃথকভাবে একশত করে উট পুরস্কার দেয়া হবে। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ.৬)। সুরাকা ইবন মালিক ইবন খাস'আম বলেন, আমি আমার বৈঠকে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি রাত্রিকালে উপকূল এলাকা দিয়ে কয়েক ব্যক্তিকে যেতে দেখেছি। আমার ধারণা যে, তারা মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর সঙ্গীগণই হবেন।

সুরাকা বলেন, আমি নিজের মনে মনে বুঝে নিয়েছিলাম যে, নিঃসন্দেহে তিনিই হবেন। কিন্তু তাকে এ বলে দুর্বল করে দিলাম যে, এরা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণ নন বরং অন্য কেউ হবে। উদ্দেশ্য ছিল যে, এই ব্যক্তি কিংবা অপর কেউ এটা শুনে কুরায়শের পুরস্কার হাতিয়ে না নেয়। এর একটু পর আমি বৈঠক থেকে উঠলাম এবং দাসীকে বললাম, ঘোড়া নিয়ে অমুক টিলার নিচে অপেক্ষা কর। আর আমি আমার বর্শা নিয়ে ঘরের পিছন দিয়ে বের হলাম এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত ছুটলাম। যখন সুরাকা তাঁর নিকটে পৌঁছল, তখন আবূ বকর (রা) তাকে দেখতে পেলেন এবং ঘাবড়িয়ে গিয়ে বললেন, এক্ষণে আমরা ধরা পড়তে যাচ্ছি। এ ব্যক্তি আমাদের খোঁজে আসছে। তিনি বললেন, অবশ্যই নয়, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا "তুমি চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাথে রয়েছেন।"

আর তিনি সুরাকার জন্য বদ-দু'আ[1] করলেন। সাথে সাথে সুরাকার ঘোড়ার হাঁটু[2] পর্যন্ত শক্ত পাথুরে যমীনে বসে গেল। সুরাকা বললেন, নিশ্চিত যে, এটা আপনাদের দু'জনার বদদু'আর ফল। আপনারা দু'বুযুর্গ আমার জন্য দু'আ করুন। আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের সাথে ওয়াদা করছি যে ব্যক্তি আপনাদের খোঁজে আসবে, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।

তিনি দু'আ করলেন, আর সাথে সাথে যমীন ঘোড়ার পা মুক্ত করে দিল। আমি বুঝে ফেললাম, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁকে বিজয় দান করবেন। আর কুরায়শগণ যে তাঁকে হত্যা অথবা গ্রেফতারের জন্য শত উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে, সে খবরও তাঁকে অবহিত করলাম এবং আমার সাথে যে পাথেয় ছিল, তা তাঁর খিদমতে পেশ

---

১. বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে, তিনি এ বলে বদদু'আ করেছিলেন যে, "আয় আল্লাহ, ওকে ধসিয়ে দাও।" আর অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ, তুমি যেভাবে ইচ্ছা, আমাদের সাহায্য কর।" (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৭)।

২ অপর বর্ণনায় আছে, পেট পর্যন্ত ধসে গিয়েছিল। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৮)।

করলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না। অবশ্য এটা বললেন যে, আমাদের কথা কারো কাছে প্রকাশ করো না।

অতিরিক্ত নিশ্চয়তার জন্য আমি আরয করলাম, আপনি আমার নিরাপত্তা ও ক্ষমার ব্যাপারে কিছু লিখে দিন। তাঁর নির্দেশে আমির ইবন ফুহায়রা এক টুকরা চামড়ায় আমাকে ক্ষমা করার কথা লিখে দিলেন[১] এবং সামনে অগ্রসর হলেন। আর আমিও নিরাপত্তা পত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলাম। পথে তাঁর অনুসন্ধানকারী যে ব্যক্তির সাথেই দেখা হতো, তাকেই এ বলে ফিরিয়ে দিতাম যে, তোমাদের যাওয়ার প্রয়োজন নেই, আমি দেখে এসেছি। (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫১০, ৫১৫ ও ৫৫৭)।

এ ব্যাপারে সুরাকা আবূ জাহলকে উদ্দেশ্য করে বললেন

اباحكم والله لو كنت شاهدا لامر جوادى حين ساخت قوائمر

"ওহে আবূ জাহল, আল্লাহর কসম, যদি তুমি ঐ সময় উপস্থিত থাকতে, যখন আমার ঘোড়ার পাগুলো যমীনে দেবে যাচ্ছিল,

علمت ولم تشكك بان محمدا نبى ببرهان فمن ذايقا ومه

"তা হলে তুমি বিশ্বাস করতে আর এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকতো না যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাঁকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেছেন, কে তাঁর মুকাবিলা করতে সক্ষম"?[২]

ফায়েদা

নবী করীম (সা)-এর মু'জিযা হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযারই অনুরূপ। কারূন যেভাবে মূসা (আ)-এর দু'আয় যমীনে ধসে গিয়েছিল, অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর দু'আয় সুরাকার ঘোড়াও যমীনে ধসে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর হযরত (সা) নির্ভয়ে পথ চলতে শুরু করলেন।

অবশেষে যখন তিনি মদীনার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত যুবায়র (রা)-এর বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর সাথে সাক্ষাত ঘটে। হযরত

---

১. একটি হাদীসে আছে, তিনি সুরাকাকে বলেছিলেন, হে সুরাকা, ঐ সময় তোমার অবস্থা কেমন হবে, যখন তুমি কিসরার (প্রাচ্যের সম্রাট) কাঁকন তোমার হাতে পরবে? সুতরাং যখন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতকালে প্রাচ্য বিজিত হলো এবং কিসরার মুকুট, কাঁকন এবং অন্যান্য অলঙ্কারাদি মসজিদে নববীতে হযরত উমরের সামনে ঢেলে দেয়া হলো, তখন তিনি বললেন, সুরাকাকে ডাক। সুরাকাকে উপস্থিত করা হলে হযরত উমর (রা) সুরাকাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হাত উঠাও, প্রশংসা সেই মহান যাত পাকের, যিনি পরম প্রতিপত্তিশালী কিসরার হাতের কাঁকন নিয়ে সুরাকা নামক এক সাধারণ ব্যক্তির হাতে পরালেন। এরপর তিনি সমস্ত অলঙ্কার মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৮; ইসাবা, সুরাকা ইবন মালিকের জীবনী; ইবন আবদুল বারকৃত আল-ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ১২০)।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯; রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৬।

যুবায়র (রা) তাঁর জন্য এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জন্য শ্বেতবর্ণের পোশাক উপহার দেন। এ বর্ণনা ইমাম বুখারী (র)-এর।

ইবন আবূ শায়বার বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, হযরত তালহা (রা)ও এ দু'বুযুর্গের জন্য পোশাক দিয়েছিলেন।[১]

বুরায়দা আসলামীর ঘটনা

কিছুটা সামনে অগ্রসর হলে সুরাকার মত বুরায়দা আসলামীও সত্তরজন অশ্বারোহী সহ তাঁর সন্ধানে বের হন, যাতে করে কুরায়শের নিকট থেকে একশত উট পুরস্কার পাওয়া যায়। যখন বুরায়দা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? বুরায়দা বললেন, আমি বুরায়দা। নবী (সা) হযরত আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে ফাল নির্ধারণের মত করে বললেন يَا اَبَا بَكْرٍ بَرُدَ اَمْرُنَا وَصَلُحَ "ওহে আবূ বকর, আমাদের কাজ শীতল ও সঠিক হয়েছে।"

এরপর বললেন, তুমি কোন্ গোত্রের? বুরায়দা বলল, আমি আসলাম গোত্রের। তিনি (সা) হযরত আবূ বকরের দিকে তাকিয়ে ফাল নির্ধারণের মত করে বললেন سَلِمْنَا "আমরা নিরাপদ।" এরপর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আসলাম গোত্রের কোন্ শাখার? বুরায়দা বললেন, বনী সাহমের। তিনি বললেন, خرج سهمك "তোমার অংশ বেরিয়ে এসেছে।" অর্থাৎ ইসলামে তোমার অংশ আছে। বুরায়দা বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন : اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ "আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এবং আল্লাহর রাসূল।" বুরায়দা বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।"

বুরায়দা মুসলমান হলেন এবং ঐ সত্তর ব্যক্তি, যারা বুরায়দার সঙ্গী ছিলেন, সবাই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলেন। বুরায়দা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মদীনায় প্রবেশকালে আপনার সামনে একটি পতাকা থাকা উচিত। তিনি স্বীয় পাগড়ি খুললেন এবং বর্শার মাথায় বেঁধে বুরায়দাকে দিলেন। যে সময় নবী (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন, বুরায়দা পতাকা হাতে তাঁর সামনে ছিলেন (বায়হাকী তাঁর দালাইলে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং একই সনদে ইবন আবদুল বার তাঁর 'আল-ইস্তিয়াবে' হযরত বুরায়দা আসলামীর ভাষ্যে উপস্থাপন করেন)।[২]

তাঁর আগমনের সংবাদ পূর্বেই মদীনায় পৌঁছেছিল। মদীনার প্রতিটি মানুষ তাঁকে দেখার অধীর আগ্রহ নিয়ে (প্রতিদিন প্রভাতে) 'হিরা' নামক স্থানে এসে দাঁড়িয়ে থাকত। দুপুর হয়ে গেলে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যেত। প্রতিদিন তারা এ কাজই করত। একদিন তারা অপেক্ষা করার পর ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় এক ইয়াহূদী

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৪৯।

টিলার উপরে তাঁর আগমনের পবিত্র চিহ্ন দেখে অজ্ঞাতসারে চিৎকার দিয়ে বলল, يَا بَنِيْ قَيْلَةَ هٰذَا جَدُّكُمْ "ওহে কায়লার[১] সন্তানেরা, তোমাদের উদ্দিষ্ট এবং সৌভাগ্যের প্রতীক এসে গেছেন।"[২]

পারস্য কবির ভাষায় :

اینك آن سر و خر امان می رسد	اینك ان گلبرگ خندان می رسـد
شـابـاش اے خستـه هجـران	بلا كرپئے درد تو درمان می رسد
شوق كن اے بلبل گلزار عـشق	كان گل نواز گلستـان مـی رسـد
دردل افسرده روحے مـی دمـد	مـروه تـن رامزده حـان مـی رسـد
تـازه بـاش اے تشنه وادی غـم	كـز برایت آب حیـوان مـی رسـد
دور شوائے ظلمت شـام فـراق	كا افتاب وصل تـابـان مـی رسـد

"মনোরম ভঙ্গিতে তিনি আসলেন, ফুল বাগানের পরিচর্যাকারী এসে গেছেন, সাবাস ওহে পথশ্রান্ত পথিক, তোমার চিকিৎসা ব্যবস্থা এসে গেছে। ওহে ফুল-মেলার বুলবুল, তুমি আনন্দ কর। ফুল বাগানের মালির আগমনে হৃদয়ে স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে, মুর্দা দিলে প্রাণের সুসংবাদ এস গেছে। ওহে ব্যথিত অন্তর, তোমার জন্য আবে হায়াত এসে গেছে। রাতের আঁধার দূরীভূত হয়ে গেছে, মিলনের প্রদীপ্ত সূর্য এসে গেছে।"

সংবাদটি কেবল কানে আসার অপেক্ষা ছিল, আনসারগণ তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য উদ্বেলিত হৃদয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল এবং আমর ইবন আউফ গোত্রের এলাকা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল।

পবিত্র মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে একটি জনবসতি আছে, যাকে কুবা বলে। এখানে আনসারদের কয়েকটি গোত্র বসবাস করত। এদের মধ্যে আমর ইবন আউফের বংশ ছিল প্রসিদ্ধ। আর এ বংশের সর্দার ছিলেন কুলসুম ইবন হাদম। নবী (সা) সেখানে পৌঁছে কুলসুম ইবন হাদমের গৃহে উঠলেন আর আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খুবায়ব ইবন উসাফের গৃহে অবস্থান নিলেন। চারদিক থেকে আনসারগণ আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে আসছিলেন এবং প্রত্যয় ও মহব্বতের সাথে তাঁকে সালাম জানাতে আসছিলেন।

হযরত আলী (রা) নবী (সা)-এর রওয়ানা হওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। আর রাসূল (সা) যাত্রার প্রাক্কালে তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানত হযরত আলীর হাতে সোপর্দ করে এসেছিলেন, সে আমানতসমূহ ফেরত দিয়ে তিনি

---

১. কায়লা আনসারদের প্রপিতামহী অর্থাৎ আওস এবং খাযরাজ গোত্রের পিতামহীর নাম। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫০)।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৮৯।

কুবায় এসে পৌঁছান এবং নবী (সা)-এর সাথে কুলসুম ইবন হাদমের গৃহে অবস্থান নেনেন।[১]

তাকওয়ার মসজিদ প্রতিষ্ঠা

কুবায় আগমনের পর সর্বপ্রথম তিনি যে কাজটি করেন তা হলো, একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং সর্বপ্রথম নবী (সা) স্বয়ং একটি পাথর এনে কিবলা বরাবর স্থাপন করেন। তাঁর পরে হযরত আবূ বকর (রা) এবং আবূ বকরের পর হযরত উমর (রা) এক একটি পাথর স্থাপন করেন। এরপর অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাথর আনয়ন করে স্থাপন শুরু করেন এবং নির্মাণ কাজ শুরু হয়। সাহাবায়ে কিরামের সাথে তিনিও বড় বড় পাথর আনতে শুরু করেন এবং কোন কোন সময় পাথর যাতে পড়ে না যায়, এজন্যে পবিত্র পেটের সাথে লাগিয়ে নিতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাখুন, আমরা উঠাচ্ছি। তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এ মসজিদেরই শানে এ আয়াতটি নাযিল হয় :

لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

"যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার উপর, সেটিই তোমার সালাত আদায়ের জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে, যারা পবিত্রতা অর্জন ভালবাসে এবং আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পসন্দ করেন।" (সূরা তাওবা : ১০৮)

যখন এ আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি আমর ইবন আউফকে জিজ্ঞেস করলেন ওটা কোন্ ধরনের পবিত্রতা, যে ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা করেন ?

বনী আমর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা ঢিলা দ্বারা ইস্তিনজা করার পর পানির দ্বারাও পবিত্রতা অর্জন করি। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ কাজ পসন্দ করে থাকবেন।

রাসূল (সা) বললেন হ্যাঁ, এটাই সে আমল, যে জন্য তোমাদের প্রশংসা খোদ আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এ কাজটিকে নিজেদের জন্য আবশ্যকীয় করে নাও এবং সব সময় এর উপর আমল করতে থাক (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১১০)।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি শনিবারে বাহনে আরোহণ করে অথবা পায়ে হেঁটে কুবার মসজিদ দেখতে আসতেন এবং সেখানে দু'রাকাআত নামায আদায় করতেন। হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, যে

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭৪।

ব্যক্তি নিজ গৃহে উযূ করে (পদব্রজে) আসে এবং মসজিদে কুবায় এসে দু'রাকাআত নামায আদায় করে, সে উমরার সওয়াব পাবে (ইবন মাজাহ)।

হিজরতের তারিখ

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, যে দিন মহানবী (সা) হিজরত করে কুবা এসে পৌছান, ঐ দিন ছিল শনিবার, ১২ই রবিউল আউয়াল, ১৩ নববী বর্ষ। আর সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে ২৭ সফর, বুধবার রওয়ানা হন। তিন দিন সাওর গুহায় অবস্থান করে ১লা রবিউল আউয়াল, সোমবারে মদীনা মুনাওয়ারা রওয়ানা হন এবং উপকূলবর্তী পথে অগ্রসর হয়ে ৮ই রবিউল আউয়াল, সোমবার দ্বিপ্রহরে কুবা পল্লীতে উপস্থিত হন। আল্লামা ইবন হাযম এবং হাফিয মুগালতাঈ এ বক্তব্যই গ্রহণ করেছেন।[১]

ইসলামী তারিখের সূচনা

ইমাম যুহরী বলেন, ঐ দিন থেকেই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন রবিউল আউয়াল থেকে তারিখ লিখার নির্দেশ দেন। হাকিম এ বর্ণনা তাঁর 'ইকলীলে' উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্ণনাটি মু'দাল (معضل) বা জটিল। প্রসিদ্ধ বর্ণনা হল, হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইসলামী তারিখ গণনার সূচনা হয়। শা'বী এবং মুহাম্মদ ইবন সীরীন থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হযরত উমর (রা) কে লিখে পাঠান, আপনার নির্দেশসমূহ আমাদের কাছে পৌঁছে, কিন্তু এতে তারিখ লিখা থাকে না। হযরত উমর (রা) ১৭ হিজরীতে তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সহযোগিতা কামনা করেন। কেউ বলেন, তারিখের সূচনা নুবূয়াতের সূচনা থেকে করা উচিত; কেউ বলেন হিজরত থেকে; আর কেউ বলেন, মহানবী (সা)-এর ওফাতের দিন থেকে। হযরত উমর (রা) বলেন, তারিখের সূচনা হিজরতের দিন থেকেই হওয়া উচিত। এজন্যে যে, হিজরতের মাধ্যমেই হক ও বাতিলের পার্থক্য সূচিত হয়। সম্মিলিতভাবে সবাই এ রায় পসন্দ করেন।

কিয়াস-এর দাবি তো এটাই ছিল যে, রবিউল আউয়াল মাসই হিজরী সালের প্রথম মাস হওয়া উচিত। কেননা এ মাসেই তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন। কিন্তু রবিউল আউয়ালের পরিবর্তে মুহররম মাসকে প্রথম মাস এজন্যে করা হয় যে, তিনি (সা) মুহররম মাস থেকেই হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। আনসারগণ দশই যিলহজ্জ তাঁর হাতে বায়'আত হন এবং যিলহজ্জের শেষ তারিখে তারা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাদের প্রত্যাবর্তনের কয়েক দিন পরেই হিজরতের ইচ্ছা করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে হিজরতের অনুমতি দেন। এ কারণে হিজরী

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫১।

সনের প্রথম মাস মুহররমকে করা হয়েছে। এছাড়া হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা) হযরত উমর (রা) কে পরামর্শ দেন যে, হিজরী সনের সূচনা মুহররম মাস থেকেই হওয়া উচিত।

কেউ বললেন, রমযানুল মুবারক থেকেই বছরের সূচনা হওয়া উচিত। হযরত উমর (রা) বললেন, মুহররমই এজন্যে উপযুক্ত, কারণ হজ্জ থেকে মানুষ মুহররম মাসেই প্রত্যাবর্তন করে। এর উপরই সবাই একমত হন।

(বাবুত-তারীখ, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২০৯; তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২৫২; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫২; উমদাতুল কারী, ৮খ. পৃ. ১২৮)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে সূরা ওয়াল-ফাজর-এর তাফসীরে বলা হয়েছে, এখানে 'ফাজর' শব্দ দ্বারা মুহররম মাসকে বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বছরের সূচনা হয়।[১]

ইমাম সারাখসী 'সিয়ারুল কাবীর'-এর শরাহতে লিখেছেন, হযরত উমর (রা) যখন তারিখ নির্দিষ্ট করার উদ্দেশে সাহাবায়ে কিরামকে একত্রিত করেন, তখন কেউ পরামর্শ দেন যে, তারিখের সূচনা মহানবী (সা)-এর শুভ জন্ম থেকে করা উচিত, কিন্তু হযরত উমর (রা) এ প্রস্তাব পসন্দ করলেন না। কেননা এটা খ্রিস্টানদের অনুরূপ হয়ে যায় যে, তাদের তারিখ হযরত ঈসা (আ)-এর শুভ জন্ম থেকে গণনা করা হয়।

কেউ কেউ বলেন যে, নবী (সা)-এর ওফাতের তারিখ থেকে ধার্য করা হোক। এটাও হযরত উমর (রা) অপসন্দ করলেন এ জন্যে যে, তাঁর ওফাত তো একটি বড় দুর্ঘটনা এবং বড় ধরনের মুসীবত। এ দিন থেকে তারিখ সূচনা করা ঠিক নয়।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়ে যান যে, হিজরতের দিন থেকেই তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। হযরত ফারূকে আযম (রা) এ রায়টি পসন্দ করলেন এ জন্যে যে, হিজরতের দ্বারাই হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে এবং ইসলামের প্রসার অর্থাৎ দু' ঈদ এবং জুমু'আ প্রকাশ্যে আদায় করা সম্ভব হয়েছে (যেমনটি শরহে সিয়ারুল কাবীরে বর্ণিত হয়েছে, ৪খ. পৃ. ৬৩)।

কুবায় কয়েক দিন অবস্থানের পর জুমু'আর দিনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় গমনের ইচ্ছা করলেন এবং উটে সওয়ার হলেন। পথিমধ্যে বনী সালিম গোত্র সেখানে পৌঁছার পর জুমু'আর সময় হয়ে গেল। তিনি সেখানেই জুমু'আর নামায আদায় করলেন। এটাই ছিল ইসলামে তাঁর প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমু'আর নামায।

খুতবাতুত-তাকওয়া (প্রথম খুতবা এবং প্রথম জুমু'আর নামায)

এটা ছিল সেই খুতবা, যার প্রতিটি শব্দ বিশুদ্ধতা ও উত্তম শব্দ চয়নের কৃতিত্বে পরিপূর্ণ। আর যার প্রতিটি শব্দই ছিল রুগ্ন আত্মার জন্য আরোগ্যদানকারী এবং মৃত আত্মার জন্য অমীয় সুধা। যার প্রতিটি বাক্য ছিল স্বাদের দিক দিয়ে পরম উপাদেয় এবং সুমধুর।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২০৭।

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) اَحْمَدُهُ وَاَسْتَعِيْنُهُ وَاَسْتَغْفِرُهُ وَاَسْتَهْدِيْهِ وَاُؤْمِنُ بِهِ وَلاَ اَكْفُرُ وَاُعَادِيْ مَنْ يَّكْفُرُهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدٰى وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلٰى فِتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَقِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَضَلاَلَةٍ مِنَ النَّاسِ وَانْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَدُنُوٍّ مِّنَ السَّاعَةِ وَقُرْبٍ مِّنَ الاَجَلِ - مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَقَدْ غَوٰى وَفَرَّطَ وَضَلَّ ضَلاَلاً بَّعِيْدًا وَاُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهُ خَيْرَ مَا اُوْصِيَ بِهِ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمَ اَنْ يُّحِضَّهُ عَلَى الْاٰخِرَةِ وَاَنْ يَاْمُرَهُ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاحْذَرُوْا مَا حَذَّرَكُمُ اللّٰهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلاَ اِلاَّ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ نَصِيْحَةً وَلاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ ذِكْرٰى وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلٰى وَجَلٍ وَمَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنُ صِدْقٍ عَلٰى مَا تَبْغُوْنَ مِنْ اَرِ الْاٰخِرَةِ وَمَنْ يُّصْلِحِ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ مِنْ اَمْرِهِ فِيْ السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ لاَيَنْوِيْ بِذٰلِكَ اِلاَّ وَجْهَ اللّٰهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْرًا فِيْ عَاجِلِ اَمْرِهِ وَذُخْرًا فِيْمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِيْنَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ اِلٰى مَاقَدَّمَ وَمَا كَانَ مِنْ سِوٰى ذٰلِكَ يُوَدُّ لَوْ اَن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا - وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاللّٰهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ وَالَّذِيْ صَدَّقَ قَوْلَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ لاَخَلْفَ لِذٰلِكَ فَاِنَّهُ يَقُوْلُ عَزَّ وَجَلَّ مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ فَاتَّقُوْا اللّٰهَ فِيْ عَاجِلِ اَمْرِكُمْ وَاٰجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ يُوْقِيْ مَقْتَهُ وَيُوَقِّيْ عُقُوْبَتَهُ وَيُوْتِيْ سَخْطَهُ وَاِنَّ تَقْوَى اللّٰهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوْهَ وَيُرْضِي الرَّبَّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَتَهُ خُذُوْا لِحَظِّكُمْ - وَلاَتُفَرِّطُوْا فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ قَدْ عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ كِتَابَهُ وَنَهَجَ لَكُمْ سَبِيْلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَيَعْلَمَ الْكَاذِبِيْنَ فَاَحْسِنُوْا كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ وَعَادُوْا اَعْدَاءَهُ - وَاَجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَاللّٰهِ وَاعْمَلُوْا لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ فَاِنَّهُ مَنْ يُّصْلِحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ يَكْفِهِ اللّٰهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ يَقْضِيْ عَلَى النَّاسِ وَلاَيَقْضُوْنَ عَلَيْهِ وَيَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَلاَيَمْلِكُوْنَ مِنْهُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের), আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তাঁর প্রতি ঈমান আনছি এবং তাঁর সাথে কুফরী করছি না, বরং তাঁর সাথে কুফরীকারীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি, আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল: যাকে আল্লাহ হিদায়াত, নূর, হিকমত এবং উপদেশ সহ প্রেরণ করেছেন। এমন সময় আমি প্রেরিত হয়েছি, যখন নবী ও রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছিল, পৃথিবীতে জ্ঞানের নামটুকু কেবল অবশিষ্ট ছিল, মানুষ ছিল ভ্রষ্টতায় নিমগ্ন, আর কিয়ামত ছিল নিকটবর্তী। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করল, তারা হিদায়াত লাভ করল। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করল, তারা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হলো এবং সংকীর্ণতা ও কঠিন ভ্রষ্টতায় লিপ্ত হলো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ ভীতির নসীহত করছি। কারণ এ হচ্ছে এক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের সর্বোত্তম নসীহত। এ নসীহত তাকে পরকালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং তাকে আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারীর নির্দেশ দেয়। অতএব তোমরা ঐ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, যা থেকে আল্লাহ তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ ভীতির চেয়ে বেশি কোন উপদেশ এবং নসীহত নেই, আর নিঃসন্দেহে তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি আখিরাতের ব্যাপারে প্রকৃত সাহায্যকারী এবং বন্ধু। যে ব্যক্তি নিজের প্রকাশ্য এবং গোপন বিষয়সমূহ আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে, যাতে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভই উদ্দেশ্য থাকে এবং তাতে কোন পার্থিব উদ্দেশ্য ও কর্ম না হয়, তখন তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা ও নিষ্ঠা পার্থিব জীবনে তার সম্মান ও মর্যাদার নিমিত্তে পরিণত হয় আর মৃত্যুর পর তা হয় পরকালের পাথেয়। কারণ যখন কোন ব্যক্তি সৎকর্মের প্রত্যাশী হয় এবং তাকওয়া বিরোধী কর্মের ব্যাপারে তার কামনা-বাসনা হয় যে, এর ও আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি হলে তা কতই না উত্তম হতো। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করেন। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহশীল। তিনি তাঁর বক্তব্যে সত্যবাদী এবং প্রতিশ্রুতি পালনকারী। তাঁর বক্তব্য এবং প্রতিশ্রুতি অলঙ্ঘনীয়। আল্লাহর ওয়াদা পরিবর্তিত হয় না। তিনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচারীও নন। কাজেই দুনিয়া এবং আখিরাতে, প্রকাশ্যে এবং গোপনে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং মহা পুরস্কার দান করেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, নিঃসন্দেহে সে পরম সাফল্য অর্জন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভীতি এমন বস্তু, যা আল্লাহর গযব, তাঁর প্রতিশোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করে। আর আল্লাহ ভীতিই কিয়ামতের দিন মানুষের চেহারাকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণে পরিণত হবে। কাজেই আল্লাহ ভীতির যে পরিমাণ অংশ সংগ্রহ

করতে পার করে নাও, এতে হ্রাস করো না। আল্লাহর আনুগত্যে কোন প্রকার কার্পণ্য করো না। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শিক্ষার জন্য কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং হিদায়াতের পথ তোমাদের সামনে পরিস্ফুটিত করেছেন, যাতে তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার। সুতরাং যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সেভাবে তোমরাও সুন্দর ও উত্তমরূপে তাঁর আনুগত্য কর, তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ কর। আর তাঁর পথে প্রয়োজনে জিহাদ কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষিত ও নির্দিষ্ট করেছেন এবং তোমাদের নাম 'মুসলিম' অর্থাৎ মনেপ্রাণে 'অনুগত' ও 'আদেশ পালনকারী' রেখেছেন। কাজেই এ নামের মর্যাদা রক্ষা কর। আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, যারা ধ্বংস ও বরবাদ হবে, তারা এর কারণও সৃষ্টি করবে এবং কারণের দরুনই তারা ধ্বংস হবে। আর যারা জীবিত থাকবে, তারাও কারণ প্রতিষ্ঠা ও তা দর্শন করেই জীবিত থাকবে। কোন রক্ষা, কোন শক্তি এবং কোন উদ্যম আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর কর এবং আখিরাতের জন্য কাজ কর। যে ব্যক্তি নিজের কাজকর্ম আল্লাহর উপর সোপর্দ করবে, আল্লাহ্ মানুষের দ্বারা তার সহায়তা করাবেন, কেউ তার অনিষ্ট করতে পারবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ তো মানুষের জন্যই প্রযোজ্য, আর মানুষ তো আল্লাহকে নির্দেশ দিতে পারে না। আল্লাহই সমস্ত মানুষের মালিক, আর মানুষ আল্লাহর কোন কিছুরই মালিক নয়। কাজেই তোমরা নিজেদের কাজকর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কর, মানুষের ধান্দায় পড়ো না। আল্লাহ্ সবাইকে সাহায্য করবেন। আল্লাহু আকবার, ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।"[১]

দ্রষ্টব্য এটাই হযরত রাসূল (সা)-এর প্রথম খুতবা যা তিনি হিজরতের পর দিয়েছিলেন। তের বছর নির্যাতিত জীবন যাপনের পর যে খুতবা দেয়া হচ্ছে, এর একটি শব্দও স্বীয় দুশমনদের প্রতি অভিসম্পাত বা অভিযোগপূর্ণ ছিল না। তাকওয়া, পরহেযগারী ও আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি ছাড়া কোন শব্দই নবীর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়নি। তিনি ছিলেন "নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"-আল্লাহ্র এ বাণীর জীবন্ত প্রতিভূ। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সালাত ও বরকত এবং অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

জুমু'আর সালাত থেকে অবসর হয়ে তিনি স্বীয় উষ্ট্রীতে আরোহণ করেন ও হযরত আবূ বকর (রা) কে নিজের পেছনে বসিয়ে নেন এবং মদীনার পথে যাত্রা করেন। আর আনসারগণের এক বিরাট বাহিনী অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর সামনে পেছনে ডানে ও বামে চলতে থাকেন।[২]

প্রত্যেক ব্যক্তিরই কামনা ছিল, যদি নবী (সা) আমার গৃহে অবতরণ করতেন! সকল দিকেই এই আগ্রহ ও মহব্বত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার

---

১. তারিখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২২৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২১৩।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯৫।

গরীবালয় আপনার জন্য প্রস্তুত। তিনি প্রত্যেকের জন্য দু'আ করছিলেন এবং বলছিলেন, এই উষ্ট্রী আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট, কাজেই সে যেখানে বসবে, আমি সেখানেই অবস্থান করব।[১] পারস্য কবির ভাষায় :

رشتـه درگرونم افگنده دوست   مى بردهر جاكه خاطر خواء اوست

লাগাম তিনি সম্পূর্ণ ঢিলে করে দিয়েছিলেন, কোনদিকেই পবিত্র হাত দিয়ে লাগাম টানছিলেন না। উৎসাহ-উদ্দীপনা এতটা ছিল যে, স্ত্রীলোকগণও নবী (সা)-এর সৌন্দর্য দেখার জন্য ছাদে উঠে গিয়েছিলেন এবং এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا   مِنْ ثَنِيَاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا   مَادَعَ لِلّٰهِ دَاعِ
اَيُّهَا الْمَبْعُوْثُ فِيْنَا   جِئْتَ بِالْاَمْرِ الْمَطَاعِ

"সানিয়া উপত্যকা থেকে আমাদের নিকট চতুর্দশ রজনীর চাঁদ উদিত হয়েছে, যখন পর্যন্ত আল্লাহকে ডাকার মত কেউ অবশিষ্ট থাকবে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আমাদের উপর অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। হে মহান প্রেরিত পুরুষ ! আপনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন বিষয় নিয়ে এসেছেন, যার আনুগত্য আমাদের জন্য অপরিহার্য।"

বনী নাজ্জারের বালিকাদের আবৃত্তি

نَحْنُ جَوَارٌ مِنْ بَنِى النَّجَّارِ   يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارَ

"আমরা বনী নাজ্জারের বালিকা দল আর আমাদের প্রতিবেশী মুহাম্মদ (সা) কত উত্তম প্রতিবেশী !"

আর আনন্দ ও খুশিতে ছোট বড় সবার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহর নবী আমাদের মাঝে এসেছেন, আল্লাহর রাসূল আমাদের মাঝে এসেছেন।"

সহীহ বুখারীতে হযরত বারা' ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি মদীনাবাসীকে আর কোন ব্যাপারে এতটা আনন্দিত হতে দেখিনি, যতটা আনন্দিত হতে দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আগমনে। সুনানু আবূ দাউদে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় উপস্থিত হন, তখন হাবশীরা তাঁর আগমনের আনন্দে তাদের বর্শা নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিল।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯২।

হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন নবী (সা) মদীনায় আগমন করলে মদীনার আনাচে কানাচে আলোকিত হয়ে উঠেছিল, আর যখন তিনি ইনতিকাল করলেন, সেদিন সবকিছু ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁকে কবর মুবারকে রেখে হাতের মাটি ঝাড়াও শেষ হয়নি, প্রত্যেকে অন্তরে পরিবর্তন অনুভব করছিল। (ইমাম তিরমিযী তাঁর 'মানাকিব' অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং একে সহীহ্-গরীব বলে মন্তব্য করেন, ইবন মাজাহ্ও হাদীসটি 'জানাযা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন)।

মোটকথা, উষ্ট্রী নিজস্ব ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে চলছিল, আর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর আশপাশে, ডানে-বামে চলছিলেন, যাদের অন্তর আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি থেকেই তাঁর এবং তাঁর নবীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার জন্য নির্বাচিত ও নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন আর অন্যান্যের জন্য তাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রাখেননি। আল্লাহর শপথ! এ যা কিছু বলছি, তা সর্বৈব বাস্তব, এতে অতিরঞ্জন কিংবা উপমার কোন নাম-নিশানাও নেই। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিঃসন্দেহে এমনটিই ছিলেন। তিনি চলছিলেন আর তাঁর প্রেমে মত্ত ও একনিষ্ঠ সঙ্গীগণের দৃষ্টি পথে গালিচার মত বিস্তৃত হয়ে চলছিল। যে ব্যক্তিই নিজ ভক্তি শ্রদ্ধা ও দৃঢ় ভালবাসার আতিশয্যে উটনীর লাগাম ধরতে উদ্যত হতেন, তখন নবী (সা) বলতেন : دَعُوهَا فَانَّهَا مَامُورَةٌ "একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট।"

শেষ পর্যন্ত উটনী বনী নাজ্জার মহল্লায় (যারা তাঁর মাতামহী গোষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজন ছিলেন) ঐ স্থান পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলো, যেখানে বর্তমানে মসজিদে নববীর দরজা অবস্থিত। তিনি কিন্তু উট থেকে অবতরণ করলেন না। কিছুক্ষণ পর উটনী পুনরায় উঠল এবং হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহের দরজায় গিয়ে বসে পড়ল। আর কিছুক্ষণ পর উঠে পুনরায় পূর্বের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল ও নিজের গর্দান জমিতে বিছিয়ে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উটনী থেকে অবতরণ করলেন আর হযরত আবূ আয়্যূব (রা) তাঁর মালপত্র নিয়ে নিজ গৃহে গেলেন।[১]

ফারসী কবি বলেন :

مبارك منزلے كان خانه راماهے چنيں باشد

همايون كشورے كان عرصه راشاه بے چنيں باشد

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যক্তিগত আগ্রহও ঐ দিকেই ছিল যে, তিনি বনী নাজ্জারেই অবতরণ করেন, যা ছিল তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের মাতুল বংশ। তাঁর আগমনের কারণে এর ইযযত ও আভিজাত্য অর্জিত হয়, যেমনটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় জানা যায়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ অভিপ্রায়কে অলৌকিকভাবে পূর্ণ করেন যে, উটনীর লাগাম তাঁর হাত থেকে ছাড়িয়ে দেয়া হয়, যাতে তিনি নিজ ইচ্ছামাফিক কোনদিকে একে লাগাম দ্বারা চালিত করতে না পারেন, আর না তিনি কোন বিশেষ

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭; উয়ূনুল আসার; ফাতহুল বারী, ৭খ, পৃ. ১৯২।

গৃহকে নিজ অবতরণের জন্য নির্দিষ্ট করেন, যাতে তাঁর নিষ্কলুষ ও একনিষ্ঠ আত্মা নিজ প্রবৃত্তি ও অভিলাষ থেকে পুরোপুরি পবিত্র থাকে। আর যাতে বুঝা যায় যে, প্রকৃতিগতভাবে তাঁর কোন বিশেষ ইচ্ছা কিংবা ঝোঁক ছিল না; বরং উটনী আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল আদিষ্ট, যেখানে আল্লাহর হুকুম হবে, সেখানেই সে থামবে। তিনি ছিলেন আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় অপেক্ষমান। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছাও পূর্ণ করেন এবং সাহাবা কিরামের জন্য এভাবে অবতরণকে একটি অলৌকিক ঘটনা ও নিদর্শনে পরিণত করেন যার বরকতে তাঁদের অন্তর দীর্ঘশ্বাস, বিদ্বেষ, ঝগড়া এবং মনোকষ্ট থেকেও পবিত্র থাকে। আর তারা ভালভাবেই বুঝে নেন যে, হযরত আবূ আইউব আনসারী (রা)-এর গৃহ নির্বাচন তাঁর পক্ষ থেকে নয়, বরং এ নির্বাচন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُوْالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

"এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন, আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহকারী।"[১] অধিকন্তু, ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্বা[২] যখন মদীনার যমীন অতিক্রম করছিলেন, তখন তাঁর সহগামী ছিলেন চারশত তাওরাত বিশেষজ্ঞ আলিম। সমস্ত আলিমই এ দাবি করতে শুরু করলেন যে, আমাদেরকে এ যমীনেই থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তারা বললেন, আমরা আম্বিয়া (আ)-এর বিবরণের পৃষ্ঠাসমূহে এ কথা লিখিত পেয়েছি যে, শেষ যামানায় একজন নবী পয়দা হবেন, যাঁর নাম হবে মুহাম্মদ, আর এ যমীনই হবে তাঁর হিজরতের স্থান। বাদশাহ তাদের সবাইকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দান করেন এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক ঘর তৈরি করিয়ে দেন, প্রত্যেককে বিয়ে করিয়ে দেন এবং সবাইকে দেন প্রচুর ধন-সম্পদ। এছাড়া তিনি নবী (সা)-এর জন্য একটি বিশেষ গৃহ নির্মাণ করান যে, যখন শেষ যামানার নবী (সা) হিজরত করে এখানে আসবেন, তখন এ গৃহে অবস্থান করবেন। এছাড়া তিনি নবী (সা)-এর নামে একটি পত্রও লিখেন, যাতে স্বীয় আনুগত্য ও তাঁকে দর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। পত্রের সার-সংক্ষেপ ছিল এরূপ

شَهِدْتُ عَلٰى اَحْمَدَ اَنَّهُ رَسُوْلٌ مِنَ اللّٰهِ بَارِىَ النَّسَمِ
فَلَوْ مَدَّ عُمْرِىْ اِلٰى عُمُرِهِ لَكُنْتُ وَزِيْرًا لَهُ وَابْنَ عَمٍّ
وَجَاهَدْتُ بِالسَّيْفِ اَعْدَاءَهُ وَفَرَّجْتُ عَنْ صَدْرِهِ كُلَّ غَمٍّ

১. যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৫৫।

২ এ বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, তুব্বা নেককার ব্যক্তি ছিলেন। যেমনটি انتم خير ام قوم تبع আয়াতের তাফসীরে কতিপয় সাহাবা ও তাবিঈ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আহমদ (সা) প্রকৃতই আল্লাহর রাসূল, যদি আমার বয়স ঐ পর্যন্ত পৌঁছায়, তা হলে আমি অবশ্যই তাঁকে প্রত্যায়ন করব এবং তাঁর সাহায্যকারী হব। তাঁর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করব এবং তাঁর পেরেশানী দূর করব।"

তুব্বা এ পত্রটি মোহরাঙ্কিত করেন এবং জনৈক আলিমের নিকট সোপর্দ করে বললেন, যদি তুমি ঐ শেষ যামানার নবী (সা) কে পাও, তা হলে আমার এ নিবেদন তাঁর কাছে পেশ করবে। অন্যথায় তোমার সন্তানদের নিকট তা সোপর্দ করে এ ওসীয়তই করবে, যা আমি তোমাকে করছি।

হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) ঐ আলিমের বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং এ গৃহও ঠিক ঐ গৃহটি ছিল, যা ইয়েমেনের বাদশাহ তুব্বা কেবল ঐ উদ্দেশে নির্মাণ করিয়েছিলেন যে, শেষ যামানার নবী (সা) যখন হিজরত করে আসবেন তখন ঐ গৃহে উঠবেন। আর বাদবাকি আনসারগণ সেই চারশ' আলিমেরই সন্তান-সন্তুতি ছিলেন। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে উটনী ঐ গৃহের দরজায় এসে দণ্ডায়মান হলো, যা তুব্বা পূর্বেই তাঁর উদ্দেশে নির্মাণ করিয়েছিলেন।

শায়খ যয়নুদ্দীন মারাগী বলেন যদি বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহে উঠেননি, বরং আপন গৃহেই উঠেছিলেন তা হলে ভুল হবে না। এজন্যে যে, এ গৃহ তো তাঁরই জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সে গৃহে হযরত আবূ আয়্যূব (রা)-এর অবস্থান ছিল তো কেবল তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করা পর্যন্ত।

বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর শুভাগমণের পর আবূ আয়্যূব (রা) ঐ পংক্তিমালা লিখিত পত্রটি তুব্বার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে হস্তান্তর করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।[১]

হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) নবী (সা)-এর নিকট আরয করলেন যে, আপনি উপর তলায় অবস্থান করুন আর আমরা নিচের ঘরগুলোতে থাকি। কিন্তু তাঁর খিদমতে সব সময় লোকজন আনাগোনা করবে। এতে যদি হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) নিচে অবস্থান করেন তা হলে এ আসা-যাওয়ায় তাদের কষ্ট হবে, এ ধারণা করে তিনি দ্বিতলে অবস্থানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন না; বরং নিচে থাকাই পসন্দ করলেন। ফলে আমরা উপর তলায় থাকা শুরু করলাম। একবার ঘটনাক্রমে পানির পাত্র ভেঙ্গে গেল। পানি নিচে গড়িয়ে যাবে এ আশঙ্কায় ঘাবড়ে গিয়ে আমি এবং উম্মে আয়্যূব তাড়াতাড়ি নিজেদের লেপ দিয়ে পানি শোষণের ব্যবস্থা নিলাম। কেননা পানি শোষণের জন্য এ ছাড়া আমাদের আর কোন কাপড় ছিল না। আমরা প্রতিদিন তাঁর জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাতাম। তিনি খাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ ফেরত পাঠাতেন। খাবারের যে অংশে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঙুলের চিহ্ন দেখা যেত, আমি ও উম্মে আয়্যূব বরকত লাভের উদ্দেশে সেখানে আঙুল দিয়ে খাবার গ্রহণ করতাম।

---

১. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ১২৪।

একবার আমরা খাবারে রসুন ও পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। ফলে তিনি খাবার ফেরত পাঠালেন। দেখলাম তাতে পবিত্র আঙুলের চিহ্ন নেই। আমি ত্রস্তে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি খাবার ফেরত পাঠিয়েছেন, যাতে আপনার আঙুলের চিহ্ন নেই। আমি এবং উম্মে আয়্যুব বরকত লাভের উদ্দেশে ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ জায়গা থেকেই খাদ্য গ্রহণ করি, যেখানে আপনার পবিত্র আঙুলের স্পর্শ থাকে। তিনি ইরশাদ করলেন, এ খাবারে আমি পেঁয়াজ ও রসুনের গন্ধ পাচ্ছিলাম। তোমরা খাও। আমাকে যেহেতু ফিরিশতাগণের সাথে কথা বলতে হয়, সেহেতু এটা খাওয়া আমি অপসন্দ করি। আবূ আয়্যূব (রা) বলেন, এর পর আর কোন সময়ই আমরা তাঁর খাবারে পেঁয়াজ-রসুন অন্তর্ভুক্ত করিনি।[১]

নবী (সা)-এর খিদমতে ইয়াহূদী আলিমদের উপস্থিতি

মহানবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় এলেন, তখন ইয়াহূদী আলিমগণ বিশেষভাবে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং পরীক্ষামূলকভাবে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে থাকলেন। কেননা ইয়াহূদী আলিমগণ পূর্ববর্তী নবী (আ) গণের প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদ দ্বারা শেষ যামানার নবী (সা)-এর আগমন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। আর তারা এটাও জানতেন যে, মূসা (আ) যে নবী আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন, তিনি শীঘ্রই 'বাতহায়' আত্মপ্রকাশ করবেন। তারা এ অপেক্ষায়ই ছিলেন। সুতরাং হিজরতের বর্ণনায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, নবী (সা) যখন প্রথমবার আনসারদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন, তখন তারা পরস্পর পরামর্শ করল এবং বলল, সম্ভবত ইনিই সেই নবী যাঁর আগমন সম্পর্কে ইয়াহূদীরা আলোচনা করে। যাতে এমন না হয় যে, এ ফযীলত ও সৌভাগ্যের ব্যাপারে তারা আমাদের অগ্রগামী হয়ে যায় (দ্র. ফাতহুল বারী وفود الانصار الى النبى ﷺ بمكة অধ্যায় এবং বায়'আতে আকাবা, আরো দ্রষ্টব্য, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ১৪৮)।

জানা গেল, ইয়াহূদী আলিমদের এ ব্যাপারে জানা ছিল যে, মূসা (আ) যে নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর আগমন সন্নিকটবর্তী। কাজেই তারা বিশেষভাবে তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে আগমন করলেন। ভাগ্য যাঁর নসীবে প্রসন্নতা লিখে রেখেছে, তা তাঁকে দেখামাত্র চিনে ফেললেন যে, তিনিই সেই সত্যিকারের নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবী (আ) গণ দিয়েছিলেন। কাজেই বিলম্বমাত্র না করে সাথে সাথে ঈমান আনয়ন করলেন। আর যাদের ভাগ্যে বঞ্চনা লিখা ছিল, তারা বঞ্চিতই রয়ে গেল।

১. ইবন আয়েয হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, ইয়াহূদী আলিমগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হুয়াই ইবন আখতাবের ভাই ইয়াসীর ইবন আখতাব নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং তাঁর কথা শোনেন। এরপর ফিরে গিয়ে

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১৭৬।

নিজ সম্প্রদায়কে বলেন : اطيعونى فان هذا النبى الذى كنا ننتظر। "আমার কথা শোন, অবশ্যই তিনি সেই নবী, যাঁর প্রতীক্ষা আমরা করছিলাম। তিনি এসে পড়েছেন। কাজেই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আন।"

কিন্তু তার ভাই হুয়াই ইবন আখতাব এর বিরোধিতা করে। সম্প্রদায়ের মধ্যে হুয়াইকে সবচে' বড় এবং নেতা মনে করা হতো। সম্প্রদায়ের লোকজন তারই অনুসরণ করত। তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং সত্য গ্রহণে তাকে বাধা দান করে। সম্প্রদায়ের লোকজন তারই অনুসরণ করল এবং তার কথা শুনলো। আর আবূ ইয়াসীরের কথা শুনলো না।[১]

২. সাঈদ ইবন মুসায়্যিব হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারা আগমন করেন, তখন ইয়াহূদী আলিমগণ বায়তুল মাদারিসে (ইয়াহূদীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম) একত্রিত হয়ে পরামর্শ করল যে, এ ব্যক্তির [রাসূল (সা)-এর প্রতি খারাপ ইঙ্গিত করে] নিকট গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার।

৩. বায়হাকী হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ইয়াহূদী আলিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে এমন সময় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি বললেন, "ওহে মুহাম্মদ ! কে আপনাকে এ সূরা শিখিয়েছেন ?" তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে শিখিয়েছেন। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ ইয়াহূদী আলিম দ্রুত তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেলেন। গিয়ে নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, মুহাম্মদ কুরআন তিলাওয়াত করছেন। মনে হলো এটা ঐ কিতাব, যা মূসা (আ)-এর প্রতি নাযিল হওয়া তাওরাতের মতই। এর পর তিনি ইয়াহূদীদের একটি বড় দল সহ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তারা তাঁর চেহারা-সূরত দেখেই চিনে ফেললেন, ইনি সেই নবী যাঁর আগমনের সুসংবাদ তাওরাতে প্রদত্ত হয়েছে। তারা তাঁর দু'বাহুর মধ্যস্থলে মোহরে নবূয়াত দেখলেন এবং তিনি যে সূরা ইউসুফ পাঠ করছিলেন, তা মনোযোগের সাথে শুনলেন ও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২]

৪. ইবন ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, একবার নবী (সা) ইবন সুরিয়াকে (ইয়াহূদী আলিম) বললেন আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি সত্যি সত্যি বল যে, বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে তাওরাতে প্রস্তরাঘাতে হত্যার নির্দেশ আছে কি না ? ইবন সুরিয়া বললেন :

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৩।

২ প্রাগুক্ত।

اَللّٰهُمَّ نَعَمْ اَمَّا وَاللّٰهِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اِنَّهُمْ لَيَعْرِفُوْنَ اَنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلٰكِنَّهُمْ يَحْسُدُوْنَكَ

"আয় আল্লাহ! নিঃসন্দেহে তাওরাতে এরূপই নির্দেশ আছে। আর ওহে আবুল কাসিম ! আল্লাহর কসম করে বলছি, কিতাবধারীগণ খুব ভাল করেই জানে এবং চিনে যে, আপনিই সেই প্রেরিত নবী। কিন্তু ওরা আপনার ব্যাপারে পরশ্রীকাতর।" (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৯৩)।

৫. আবদুল্লাহ ইবন আহমদ তাঁর 'যাওয়াইদে মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত জাবির ইবন সামুরা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একবার জনৈক বহিরাগত ব্যক্তি[১] এল এবং সাহাবায়ে কিরামের নিকট নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যে, তোমাদের ঐ সঙ্গী কোথায়, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করেন। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব, যাতে বুঝা যাবে তিনি নবী কিনা। ইতোমধ্যে নবী (সা) সামনে এসে পড়লেন। তখন আগন্তুক তাঁকে বলল, আপনার কাছে যে ওহী আসে তা আমাকে শোনান। তিনি তার সামনে আল্লাহর কিতাব থেকে কিছু পাঠ করে শোনালেন। আগন্তুক তা শোনামাত্র বলল, আল্লাহর শপথ ! এ তো ঐ ধরনের কালাম যা মূসা (আ) এনেছিলেন।[২]

অনুরূপভাবে আরো অনেক ইয়াহূদী আলিম, যেমন যায়দ ইবন সানা প্রমুখ তাঁর খিদমতে উপস্থিত হন এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ[৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাওরাতের একজন প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ)-এর বংশোদ্ভূত। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হুসায়ন. ইসলাম গ্রহণের পর নবী (সা) তাঁর নাম আবদুল্লাহ ইবন সালাম রাখেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেন, তখন এ খবর শোনামাত্র আমি তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত হলাম এবং فَلَمَّا رَأَيْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ اَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ "তাঁর চেহারা মুবারক দেখামাত্র চিনে ফেললাম যে, (তিনি তাওরাতে উল্লেখিত সেই নবী) এ কোন মিথ্যা ভাষীর চেহারা হতে পারে না।" তাঁর মুখ থেকে প্রথম বাক্য যা আমি শুনলাম, তা ছিল

---

১. অনারব সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৯৪

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৪।

৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩১০-৩১২-তে দ্রষ্টব্য।

اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوْا الطَّعَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصِلُوا الاَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نِيَام تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

"ওহে লোক সকল! ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াও, পরস্পরে সালামের প্রসার ঘটাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো এবং রাতে (নফল) নামায পড়, যখন সাধারণ মানুষ নিদ্রিত থাকে, তা হলে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" হাদীসটি তিরমিযী এবং হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং উভয়ে একে সহীহ্ বলেছেন।

'দালাইলে বায়হাকী'তে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত ছিলাম, কিন্তু কারো কাছে তা প্রকাশ করিনি।

যখন তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করলেন এবং আমি এ সংবাদ শুনলাম, তখন আমি একটি খেজুর গাছে আরোহণ করেছিলাম। আনন্দে সেখান থেকেই আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলাম।

আমার ফুফু খালিদা বিনতে হারিস বললেন, যদি তুমি মূসা (আ)-এর (আগমনের) সংবাদ শুনতে, তবুও এর চেয়ে বেশি আনন্দিত হতে না। আমি বললাম, অবশ্যই। তিনিও মূসা (আ)-এরই ভ্রাতা, তিনিও ঐ দীন নিয়েই প্রেরিত, যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন মূসা (আ)। আমার ফুফু বললেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র, তিনি কি সেই নবী, যাঁর খবর তোমরা শুনে আসছিলে যে, তিনি কিয়ামতের সন্নিকটে প্রেরিত হবেন ? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনিই সেই নবী। আমি ঘর থেকে বের হয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম। ফিরে এসে আমি গোত্রের সব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। সবাই ইসলাম গ্রহণ করল।[১]

দ্রষ্টব্য 'কিয়ামতের সন্নিকট' বলতে ঐসব হাঙ্গামা ও দুর্ঘটনা বুঝানো হয়েছে, যা কিয়ামতের পূর্বে প্রকাশ পাবে। আর কিয়ামতের সূচনা বা ভূমিকা হিসেবে এ সব ঘটনা সংঘটিত হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : نَذِيْرٌلَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ "সে তো আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র।" (সূরা সাবা : ৪৬)

নবী (সা) বলেছেন, بُعِثْتُ اَنَا وَالْقِيَامَةُ كَهَاتَيْنِ "আমার আগমন ও কিয়ামত দুটি পাশাপাশি ঘটনা।" (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৫)।

অতঃপর আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা) ! আমার গোত্র আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানার পূর্বেই আপনি আমাকে একটি গোপন কুঠরীতে বসিয়ে রাখুন এবং আমার অগোচরে ইয়াহূদীদেরকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। কেননা ইয়াহূদীরা বড়ই অপবাদ রটনাকারী সম্প্রদায়। সুতরাং যখন ইয়াহূদীরা তাঁর খিদমতে এলো, তখন তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন সালামকে একটি কুঠরীতে বসিয়ে রেখে তাদের উদ্দেশে বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ সত্তার

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯৭।

কসম, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তোমরা ভাল করেই জান যে আমি সত্যিই আল্লাহর রাসূল এবং সত্য নিয়ে এসেছি। কাজেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। ইয়াহূদীরা বলল, আমরা জানি না। তিনি তিনবার একই প্রশ্ন করলেন। প্রত্যেকবারই ইয়াহূদীরা একই কথা বলতে থাকে। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন সালাম কিরূপ ব্যক্তি ? ইয়াহূদীরা বলল, তিনি আমাদের সর্দারের পুত্র সর্দার, আমাদের মধ্যে সব চে' বড় আলিম এবং বড় আলিমের পুত্র, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র।

হযরত (সা) বললেন, যদি আবদুল্লাহ ইবন সালাম আমার উপর ঈমান আনে, তা হলে কি তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করবে ? ইয়াহূদীরা বলল, আবদুল্লাহ ইবন সালাম কখনই ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। তিনি বললেন, অবশ্যই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইয়াহূদীরা বলল, কখনই না, অসম্ভব, তিনি কখনই মুসলমান হতে পারেন না। তিনি বললেন, ওহে ইবন সালাম, বেরিয়ে এসো। আবদুল্লাহ ইবন সালাম اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ [আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি (ঘোষণা করছি) যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল] বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন। আর ইয়াহূদীদের সম্বোধন করে বললেন, ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা ভাল করেই জান যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সত্যসহ আগমন করেছেন। এ কথা শোনামাত্র ইয়াহূদীরা বলল, তুমি মিথ্যুক ও কাযযাব; আমাদের মধ্যে সবচে' মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির পুত্র (বুখারী শরীফ)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاٰمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হয়ে থাকে, আর তোমরা এতে অবিশ্বাস কর, অথচ বনী ইসরাঈলের একজন এর অনুরূপ কিতাব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে; আর তোমরা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছো, (তোমাদের পরিণাম কি হবে?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা আহকাফ : ১০)।[১]

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা) ছিলেন নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদীদের মধ্যে একজন। তিনি নবী (সা) কে দেখে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন। তাঁর অবস্থাও হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর মত হয়েছিল।

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২০৭।

হযরত মায়মূন ইবন ইয়ামীন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, আপনি ইয়াহূদীদেরকে আহ্বান করুন এবং আমাকে বিচারক মানুন, ওরা আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। মায়মূন একটি গোপন কক্ষে আড়ালে চলে গেলেন এবং ইয়াহূদীদেরকে ডাকার জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তারা এলো এবং হযরতের সাথে কথাবার্তা বলল। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা আমার ও তোমাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে তোমাদের মধ্যকার কোনো ব্যক্তিকেই সালিশ মনোনীত কর। ইয়াহূদীরা বলল, আমরা মায়মূন ইবন ইয়ামীনকে বিচারক মনোনীত করতে সম্মত আছি। তিনি যে ফয়সালা করবেন, আমরা তা গ্রহণ করব। তিনি খবর দিয়ে মায়মূনকে ডেকে আনালেন। মায়মূন এসে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল, কিন্তু ইয়াহূদীরা (মুহূর্তের মধ্যে তাদের পূর্ব কথা থেকে সরে আসে এবং) তা সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল।[১] (اتيان اليهود النبى ﷺ حين قدم المدينة অধ্যায়)

হযরত সালমান ইবন ইসলাম[২] (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

তাঁর নাম সালমান। ডাকনাম আবূ আবদুল্লাহ, 'সালমান আল-খায়র' উপাধিতে প্রসিদ্ধ। যেন সালমান ছিলেন সারা অবয়বে উত্তম। পারস্য সাম্রাজ্যের রাম হুরমুয

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১১৩।

২. হাফিয আসকালানী বলেন, হযরত সালমান ফারসী (রা)-কে সালমান ইবন ইসলাম এবং সালমান ইবন খায়রও বলা হয়। অর্থাৎ ইসলাম তাঁর কাছে পিতৃতুল্য এবং তিনি ইসলামের পুত্রস্বরূপ। [ইসাবা, ২খ. পৃ. ৬২, হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর জীবন চরিত]। হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, যদি হযরত সালমানের নাম জিজ্ঞেস কর তবে তা আবদুল্লাহ, যদি বংশধারা জিজ্ঞেস কর তা হলে তা ইবনুল ইসলাম, অর্থাৎ ইসলামের পুত্র, যদি তাঁর সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তবে তা হল ফকিরী। মসজিদই তাঁর দোকান, তাঁর উপার্জন হলো ধৈর্য, তাঁর পোশাক হলো, আল্লাহভীতি, তাঁর শয্যা হলো জাগরণ, তিনি হলেন ইসলামের নিকটজন [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, সালমান আমাদের]। যদি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর, তা হলে তাঁর উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সত্তা, আল্লাহর সন্তুষ্টিই তাঁর কাম্য। যদি জিজ্ঞেস কর, কোথায় যাচ্ছেন, তা হলে বুঝে নাও তিনি জান্নাতের দিকেই যাচ্ছেন। যদি জানতে চাও এ সফরে তাঁর পথ-প্রদর্শক ও রাহনুমা কে, তবে জেনে রাখ, তাঁর পথ-প্রদর্শক হলেন মুত্তাকীদের ইমাম, আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবতার পথ প্রদর্শনকারী, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের নেতা, নবী-রাসূলদের সমাপ্তকারী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর সঙ্গীগণ ও সহধর্মিণীগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

اِذَا نَحْنُ اَدْلَجْنَا وَاَنْتَ اَمَامَنَا — كَفٰى بِالْمَطَايَا طِيْبُ ذِكْرَاكَ حَادِيًا

وَاِنْ نَحْنُ اَضْلَلْنَا الطَّرِيْقَ وَلَمْ نَجِدْ — دَلِيْلاً كَفَانَا نُوْرُ وَجْهِكَ هَادِيًا

"যদি আমরা অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলি আর তুমি আমাদের নেতা হও, তা হলে উটের হুদীর জন্য তোমার পবিত্র যিকরই যথেষ্ট, যদি আমরা পথ হারিয়ে বসি, আর কোন পথ প্রদর্শক না পাই, তবে তোমার হেরার নূর আমাদের পথ প্রদর্শনের জন্য সম্পূর্ণই যথেষ্ট।"(ইবন কায়্যিম কৃত ফাওয়াইদ, পৃ. ৪১)।

এলাকার 'জাঈ' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন পারস্য সম্রাটের বংশধর। যদি কেউ তাঁকে প্রশ্ন করত, আপনি কার পুত্র? তিনি জবাব দিতেন, انا سلمان بن الاسلام। (আমি ইসলামের পুত্র সালমান)। (ইবন আবদুল-বার কৃত আল-ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ৫৬; ইসাবার হাশিয়া)। অর্থাৎ ইসলামই আমার আত্মিক অস্তিত্বের কারণ আর এটাই আমার অভিভাবক। কত উত্তম পিতা আর কত উত্তম পুত্র!

হযরত সালমান (রা) দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) কে পেয়েছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন, ঈসা (আ)-এর যামানা তো নয়; বরং তাঁর একজন হাওয়ারী (সাহায্যকারী) ও অছী (উপদেষ্টার) যামানা পেয়েছিলেন। হাফিয যাহবী বলেন, তাঁর বয়স সম্পর্কে যত ধরনের বক্তব্যই পাওয়া যাক না কেন, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, তাঁর বয়স ছিল দু'শো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি।

আবুশ শায়খ তাঁর 'আল-ইসবাহানী'তে লিখেন, হযরত সালমান (রা) সাড়ে তিন'শ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু দু'শো পঞ্চাশ বছরের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহই নেই [আল-ইসাবা, ২খ. পৃ.৬২, হযরত সালমান (রা)-এর জীবন চরিত]। হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, সালমান ফারসী (রা) আমাকে তাঁর নিজ যবানীতে ইসলাম গ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন যে, আমি পারস্য দেশের 'জাঈ' নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলাম। আমার পিতা ছিলেন নিজ গ্রামের শাসক। আর তিনি আমাকে সবচে' বেশি ভালবাসতেন। যেভাবে কুমারী মেয়েদের হিফাযত করা হয়, সেভাবে তিনি আমাকে হিফাযত করতেন। আমাকে ঘর থেকে বাইরে যেতে দিতেন না। ধর্মের দিক থেকে আমরা ছিলাম অগ্নিপূজক। আমার পিতা আমাকে অগ্নির তত্ত্বাবধায়ক ও নিরাপত্তার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যাতে কোন সময় আগুন নিভতে না পারে। একবার আমার পিতা কোন কিছু নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে আমাকে কোন জমির কৃষি কাজ দেখাশোনার জন্য প্রেরণ করেন এবং তাকিদ করেন, আমি যেন বিলম্ব না করি। আমি ঘর থেকে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি গীর্জা ছিল, সেখান থেকে কিছু একটা আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। আমি তা দেখার জন্য ভিতরে প্রবেশ করি। দেখলাম একদল খ্রিস্টান উপাসনায় মগ্ন রয়েছে। তাদের এ উপাসনা আমার খুবই পসন্দ হলো। মনে মনে বললাম, এ ধর্ম আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম। আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, এ ধর্মের মূল কোথায়? তারা বলল, সিরিয়ায়। ইত্যবসরে সূর্য ডুবে গিয়েছিল, পিতা আমার জন্য অপেক্ষা করে শেষে আমাকে খুঁজতে চাকর প্রেরণ করেছিলেন। যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম, তখন পিতা জিজ্ঞেস করলেন বাবা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি সমুদয় ঘটনা খুলে বললাম। পিতা বললেন, এ ধর্মে (খ্রিস্টধর্মে) কোন কল্যাণ নেই, তোমার পিতা-পিতামহের ধর্মই (অর্থাৎ অগ্নি পূজা) উত্তম।

আমি বললাম, কখনই নয়, আল্লাহর শপথ! খ্রিস্টানদের ধর্মই আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম। পিতা আমার পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিলেন এবং আমার বাইরে বেরুনো বন্ধ করে দিলেন। যেমন ফিরাউন মূসা (আ) কে বলেছিল : لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ। "যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে মাবূদ মেনে নাও, তা হলে তোমাকে বন্দী করে রাখব" (যাসমস্ত বাতিলপন্থিরই পদ্ধতি)। আমি গোপনে খ্রিস্টানদের বলে পাঠালাম যে, যখন কোন কাফেলা সিরিয়া যাবে আমাকে জানাবেন। কাজেই তারা সুযোগমত আমাকে খবর পাঠাল, খ্রিস্টান বণিকদের একটি দল সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছে। আমি সুযোগ বুঝে পায়ের বেড়ী ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গৃহ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গী হলাম।

সিরিয়ায় পৌঁছে আমি জিজ্ঞেস করলাম, খ্রিস্টানদের সবচে' বড় আলিম কে ? তারা একজন পাদ্রীর নাম বলল। আমি তার নিকট উপস্থিত হলাম এবং সমুদয় ঘটনা খুলে বললাম। আর এও বললাম যে, আমি আপনার কাছে থেকে আপনার ধর্ম শিখতে চাই, আমি আপনার ধর্মের প্রতি আগ্রহী ও তা পসন্দও করি। যদি আপনি অনুমতি দেন, তো আমি আপনার কাছে থাকি ও ধর্ম শিখে নিই এবং আপনার সাথে উপাসনা করি। তিনি বললেন, উত্তম। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে অভিজ্ঞতা হলো যে, সে ভাল মানুষ ছিল না, খুবই লোভী ও স্বার্থপর ছিল। অন্যদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিত, আর যখন লোকেরা টাকা-পয়সা নিয়ে আসত, তখন তা জমা করত, ফকীর-মিসকীনকে দিত না। এভাবে সে সাত মটকা স্বর্ণ মুদ্রা জমা করে। যখন সে মরে গেল এবং লোকেরা সদুদ্দেশে তার দাফন-কাফনের জন্য একত্রিত হলো, আমি তাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করলাম এবং ঐ সাতটি মটকা দেখালাম। লোকেরা এ সব দেখে বলল, আল্লাহর কসম, আমরা এমন ব্যক্তিকে দাফন করব না। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ পাদ্রীকে শূলীতে লটকিয়ে অপদস্থ করলো এবং তদস্থলে অপর এক আলিমকে নিয়োগ করল।

সালমান (রা) বলেন, আমি ঐ পাদ্রী অপেক্ষা বড় কোন আলিম, তারচে' বেশি ইবাদতকারী, দুনিয়াত্যাগী, আখিরাতে আগ্রহী এবং ইবাদত গুযার কাউকে দেখিনি। তাকে আমি যতটা ভালবাসতাম, ততটা আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি। আমি সদা-সর্বদা তার খিদমতে নিয়োজিত ছিলাম। যখন তার শেষ সময় ঘনিয়ে এলো, তখন বললাম, আপনি আমাকে ওসীয়ত করুন এবং বলুন, আপনার পরে আমি কার নিকটে গিয়ে অবস্থান করব। তিনি বললেন, মসূলে একজন আলিম আছেন। তুমি তার কাছে চলে যাবে। সুতরাং আমি তার নিকটে গেলাম এবং তার পরে তারই ওসীয়ত মত 'নাসিবীনে' এক আলিমের নিকট গিয়ে অবস্থান করি। তার মৃত্যুর পর তার ওসীয়ত মত 'উমূরিয়া' শহরের এক আলিমের নিকটে গিয়ে অবস্থান করি। যখন তার অন্তিমকাল উপস্থিত হলো, আমি বললাম, আমি 'অমুক অমুক' আলিমের নিকটে ছিলাম। এখন আপনি বলুন, এরপর আমি কোথায় যাব। তিনি বললেন, আমার

দৃষ্টিতে বর্তমানে এমন কোন আলিম নেই, যিনি সত্য পথে আছেন এবং আমি তোমাকে তার সন্ধান দেব।

অবশ্য একজন নবী আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে, যিনি ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত হবেন। আরবের ঊষর ভূমিতে তাঁর অভ্যুদয় হবে এবং খেজুর বাগান সুশোভিত ভূমির দিকে হিজরত করবেন। তোমার সেখানে পৌছা সম্ভব হলে অবশ্যই পৌছবে। তাঁর বৈশিষ্ট্য এটাই হবে যে, তিনি সাদকার মাল গ্রহণ করবেন না, তবে উপহার গ্রহণ করবেন। তাঁর উভয় বাহুমূলের সন্নিকটে 'মোহরে নবূয়াত' থাকবে, তুমি তাঁকে দেখলেই চিনতে পারবে। এ সময়ের মধ্যে আমি কিছু গরু-ছাগলের মালিক হয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে আরব দেশগামী একটি কাফেলার সাথে আমার সাক্ষাত হয়ে গেল। আমি তাদের বললাম, যদি তোমরা আমাকে তোমাদের সাথে নিয়ে যাও, তা হলে এ গরু-ছাগল সব তোমাদের দিয়ে দেব। তারা সেগুলো গ্রহণ করল এবং আমাকে তাদের সাথে নিয়ে নিল। যখন 'ওয়াদিউল কুরায়' পৌছল, তখন তারা আমার সাথে প্রতারণা করে আমাকে দাস হিসেবে এক ইয়াহূদীর কাছে বিক্রি করে দিল। যখন তার সাথে এলাম, খেজুর গাছ দেখে আমার ধারণা হলো, সম্ভবত এটাই সেই যমীন, কিন্তু তখনো পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করিনি। ইত্যবসরে বনী কুরায়যায় এক ইয়াহূদী তার কাছে এলো এবং আমাকে খরিদ করে মদীনায় নিয়ে এলো। حَتّٰى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ رَاَيْتُهَا فَعَرَفْتُهَا بِصِفَةِ صَاحِبِىْ وَاَيْقَنْتُ اَنَّهَا هِىَ الْبَلْدَةُ الَّتِىْ وُصِفَتْ لِىْ (যখন আমি মদীনায় পৌছলাম, তখন আল্লাহর কসম, মদীনাকে দেখামাত্র আমি চিনে ফেললাম এবং নিশ্চিত হলাম যে, এটাই সেই শহর যার কথা আমাকে বলা হয়েছিল)।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান (রা) সূত্রেই বর্ণিত আছে যে, এভাবে আমি দশবারেরও বেশি বিক্রি হই [লোকে সালমান (রা) কে অনাগ্রহের সাথে বারবার তুচ্ছ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে; কিন্তু তাঁর প্রকৃত মূল্য কেউ জানেনি]। আমি মদীনায় সেই ইয়াহূদীর কাছে থেকে গেলাম এবং বনী কুরায়যায় তার খেজুর গাছের পরিচর্যা করতে থাকলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা) কে মক্কায় প্রকাশ করলেন; কিন্তু গোলামী এবং কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন এ বিষয়ে আমার সম্যক ধারণা হলো না। যখন তিনি মদীনায় হিজরত করলেন এবং কুবা পল্লীতে আমর ইবন আওফ গোত্রে উঠলেন, সে সময়ে আমি একটি খেজুর গাছে উঠে কাজ করছিলাম আর আমার মনিব গাছের নিচে বসা ছিল। এ সময় এক ইয়াহূদী এলো, যে আমার মনিবের চাচাত ভাই ছিল। সে বলতে লাগল, আল্লাহ বনী কায়লা অর্থাৎ আনসারদের ধ্বংস করুন, ওরা কুবায় এক ব্যক্তির কাছে ভিড় জমিয়েছে, যে মক্কা থেকে এসেছে। আর তারা বলছে, ঐ ব্যক্তি নাকি নবী ও পয়গাম্বর। সালমান (রা) বলেন, فَوَاللّٰهِ اِنْ هُوَ اِلاَّ اَخَذَتْنِى الْعُرَوَاءُ

حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنِّىْ سَاَسْقُطُ عَلٰى صَاحِبِىْ (আল্লাহর কসম, এটা শোনামাত্রই আমার মধ্যে চাঞ্চল্য ও কম্পন সৃষ্টি হলো। মনে হলো আমি এক্ষুণি আমার মনিবের উপর পড়ে যাব)।

সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী নবী (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ হযরত সালমান (রা) কে এতই আবেগাপ্লুত করে তুলল যে, لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا-এর[১] পর্যায় না হলে, তিনি গাছ থেকে পড়েই যেতেন। উভয় ইয়াহূদী তাঁর এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। আর হযরত সালমানের অবস্থা যেন এ কবিতা পাঠ করছিল :

خَلِيْلَىَّ لَاوَاللّٰهِ مَا اَنَا مِنْكُمَا   اذا عَلَمٌ مِنْ الِ لَيْلٰى بَدَالِيَا

"ওহে আমার বন্ধুগণ, আল্লাহর কসম, আমি আর তোমাদের কেউ নই, যখন আমার দৃষ্টি লায়লীর প্রেম সমুদ্রে পাহাড় দেখতে পেয়েছে।"

مدتے بود کہ مشتاق لقایت بودم   لا جرم روئے تراديدم وازجا رفتم

মোটকথা, অন্তরকে কাবু করে গাছ থেকে নেমে পড়লাম এবং ঐ আগন্তুক ইয়াহূদীকে বললাম, সত্য করে বল দেখি তুমি কি বলছিলে ? সংবাদটা আমাকেও শোনাও দেখি। অবস্থা দেখে আমার মনিব রেগে গেল। সে আমাকে জোরে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দিল এবং বলল, এতে তোর কি দরকার ? যা, নিজের কাজ কর গিয়ে।

যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো এবং নিজের কাজ শেষ হলো, তখন আমার কাছে যা কিছু জমা হয়েছিল, সব সাথে নিলাম এবং তাঁর খিদমতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন কুবায় অবস্থান করছিলেন। আমি আরয করলাম, আমি জানি যে, আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের কাছে কিছুই নেই। আপনারা সবাই প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী। কাজেই আমি আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের জন্য সদকা পেশ করতে চাই।

তিনি তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য সদকা গ্রহণে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি সদকা খাই না; আর সাহাবাদের অনুমতি দিলেন, তোমরা তা গ্রহণ কর।

সালমান (রা) বলেন, আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম, এটা ঐ তিন নিদর্শনের মধ্যে একটি। আমি ফিরে গেলাম এবং পুনরায় কিছু জমা করতে শুরু করলাম। যখন তিনি মদীনায়, তখন আবার একদিন আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। আরয করলাম, আমার মন চায় যে, আপনার খিদমতে কিছু হাদিয়া পেশ করি। সদকা তো আপনি গ্রহণ করেন না, তাই কিছু হাদিয়া নিয়ে এসেছি। তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং নিজে কিছু খেলেন ও সাহাবাদেরও কিছু দিলেন। আমি মনে মনে বললাম, এটা দ্বিতীয় নিদর্শন।

---

১. এ অবস্থাকেই হযরত সূফিয়ায়ে কিরাম (র)-এর পরিভাষায় 'উজূদ' (وجـــود) বলে। আর এ আয়াত 'উজূদ'-এর উৎস। আল্লাহই ভাল জানেন।

আমি ফিরে এলাম এবং দু'চার দিন পর আবার তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলাম। সে সময় তিনি একটি লাশের সাথে 'জান্নাতুল বাকী'তে এসেছিলেন আর সাহাবায়ে কিরামের একটি দল তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত (সা) ছিলেন দলের মাঝখানে। আমি তাঁকে সালাম দিলাম এবং সামনে থেকে উঠে তাঁর পেছন দিকে গিয়ে বসলাম, যাতে মোহরে নবূয়াত দেখতে পারি। তিনি বুঝতে পারলেন এবং পিঠের উপর থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি দেখামাত্র চিনে ফেললাম এবং উঠে গিয়ে মোহরে নবূয়াতে চুম্বন করলাম এবং কেঁদে ফেললাম। তিনি ইশারা করলেন, সামনে এসো। আমি সামনে এলাম আর ওহে ইবন আব্বাস! যেমনটি তোমার কাছে আমার ঘটনা বলছি, অনুরূপভাবে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে সাহাবায়ে কিরামের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে বর্ণনা করলাম এবং ঐ সময়ই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলাম। তিনি (সা) খুবই খুশি হলেন। এরপরে আমি স্বীয় মনিবের কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। ফলে আমি বদর ও উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে পারিনি। তিনি (সা) বললেন, ওহে সালমান, স্বীয় মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও।[১] সালমান নিজ মনিবের সাথে কথা বললেন। মনিব বলল, যদি তুমি চল্লিশ উকিয়া স্বর্ণ দিতে পার এবং তিনশ' খেজুর গাছ লাগাতে পার, তা হলে সেগুলো ফলবান হলে তুমি মুক্ত হবে। সালমান (রা) রাসূল (সা)-এর নির্দেশমত এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। তিনি লোকজনকে উৎসাহ দিলেন যে, সালমানকে খেজুর চারা দিয়ে সাহায্য কর। সুতরাং কেউ ত্রিশটি, কেউ বিশটি, কেউ পনরটি আর কেউ দশটি চারা দিয়ে সাহায্য করলেন। চারা জমা হওয়ার পর তিনি বললেন, ওহে সালমান, গর্ত প্রস্তুত কর। যখন গর্ত প্রস্তুত হলো, তিনি (সা) নিজ হাতে চারাগুলো রোপণ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন। এক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই গাছে ফল এলো এবং এমন একটি চারাও পাওয়া গেল না, যেটি শুকিয়ে গেছে। সবগুলোই সবুজ ও তরতাজা হয়েছিল এবং সবগুলোতেই ফল এলো। গাছের শর্ত তো পূরণ হলো, কেবল দিরহাম অবশিষ্ট রয়ে গেল। একদিন এক ব্যক্তি ডিমের আকারের একটি স্বর্ণখণ্ড নিয়ে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন, চুক্তিবদ্ধ মিসকীন অর্থাৎ সালমান ফারসী কোথায়, তাকে ডাকো। আমি উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ঐ ডিমের আকারের স্বর্ণখণ্ডটি দান করলেন এবং বললেন, এটি নিয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ঋণমুক্ত করবেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তো সামান্যমাত্র স্বর্ণ, এর দ্বারা আমার ঋণ কিভাবে আদায় হবে? তিনি বললেন যাও। এর দ্বারাই আল্লাহ্ তোমার ঋণ পরিশোধ করবেন। সুতরাং যখন আমি এটি ওজন করলাম, তো দেখলাম এটি ছিল পূর্ণ চল্লিশ উকিয়া। এতে আমার সম্পূর্ণ ঋণ আদায় হয়ে গেল এবং আমি মুক্ত হয়ে তাঁর সাথে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলাম।

---

১. কোন দাস তার মুনিবের সাথে এভাবে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, সে মুনিবকে এত এত সম্পদ দিতে সক্ষম হলে মুনিব তাকে মুক্তি দেবে। ইসলামের পরিভাষায় এ ধরনের চুক্তিকে 'কিতাবাত' এবং চুক্তিবদ্ধ দাসকে 'মুকাতিব' বলে।

এর পর থেকে আমি প্রতিটি জিহাদেই তাঁর সঙ্গে থেকেছি (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ৭৩)।

মসজিদে নববী নির্মাণ

নবী (সা)-এর উটনী প্রথমে যে স্থানে বসেছিল, স্থানটি ছিল কয়েকটি ইয়াতীমের খেজুর শুকানোর খলান। স্থানটি কার মালিকানাধীন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পেলেন সাহ্ল এবং সুহায়ল নামক দু'টি ইয়াতীম বালক এর মালিক। তিনি ঐ বালকদেরকে ডাকালেন, যাতে তাদের জমিটুকু ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। আর তারা যে চাচার তত্ত্বাবধানে ছিল, তাকে ডেকে এ ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। বালকদ্বয় বলল, আমরা এ জমি বিনামূল্যে আপনাকে উপহার দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আমরা এর বিনিময় মূল্য চাইব না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি, বরং মূল্য দিয়ে তা কিনে নেন।

ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) কে নির্দেশ দিলেন, এ জমির মূল্য পরিশোধ করে দিন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ বকর (রা) এর মূল্য বাবদ দশ দিনার পরিশোধ করেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৯২)।

এরপর তিনি ঐ জমি থেকে খেজুর গাছের গুঁড়িগুলো তুলে ফেলার এবং মুশরিকদের কবরগুলো সমান করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আর অতঃপর কিছু কাঁচা ইঁট তৈরির নির্দেশ দেন এবং নিজেও এ মসজিদ নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। আনসার ও মুহাজিরগণও তাঁর সাথে শরীক ছিলেন।[১] সাহাবায়ে কিরামের সাথে তিনি নিজেও ইঁট বহন করে আনছিলেন এবং মুখে বলছিলেন :

هٰذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالُ خَيْبَرَ   هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرُ

"এটা খায়বরের খেজুরের বোঝা নয়, হে আল্লাহ ! এ বোঝা সবচে' উত্তম।"

কখনো বা বলতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الاَجْرَ اَجْرُ الاٰخِرَةِ   فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই সর্বোত্তম পুরস্কার হলো আখিরাতের পুরস্কার; অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ কর।" (যারা শুধু আখিরাতের পুরস্কারের প্রত্যাশী)।

অপর এক রিওয়ায়াতে এভাবে আছে :

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الاٰخِرَةِ   فَانْصُرِ الاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

"হে আল্লাহ! আখিরাতের মঙ্গল ছাড়া কোন কল্যাণ নেই; অতএব তুমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য কর।" (যারা কেবল আখিরাতের কল্যাণেরই প্রত্যাশী)।

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৪খ. পৃ. ৫৩।

আর সাহাবায়ে কিরামের মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِىُّ يَعْمَلُ لَذٰلِكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ

"যদি আমরা বসে পড়ি আর নবী (সা) কাজ করতে থাকেন, তা হলে আমাদের কাজ (অর্থাৎ বসে থাকা) খুবই খারাপ কাজ হবে।"

আর হযরত আলী (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন :

لاَ يَسْتَوِىْ مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدًا × يَدْأَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَّقَاعِدًا

وَمَنْ يُرٰى عَنِ التُّرَابِ حَائِدًا

"যে ব্যক্তি উঠতে বসতে মসজিদ নির্মাণের চিন্তায় পেরেশান থাকে, আর যে ব্যক্তি পোশাকে ধূলিবালি লাগা থেকে বাঁচিয়ে রাখে, উভয়ে সমান নয়।"

ইঁট বহনকারীদের মধ্যে হযরত উসমান ইবন মাযঊন (রা)ও শামিল ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই পরিচ্ছন্ন রুচিবোধসম্পন্ন। পোশাকের পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সচেতন। কাজেই ইঁট বহনকালে তিনি পোশাক বাঁচিয়ে বহন করতেন। আর ছিঁটেফোঁটা ধূলিবালি লেগে গেলে সাথে সাথে ঝেড়ে ফেলতেন (হাসান সূত্রে বায়হাকী বর্ণিত)।[১]

হযরত আলী (রা) وَمَنْ يُرٰى عَنِ التُّرَابِ حَائِدًا হযরত উসমান ইবন মাযঊন (রা) কে শোনাবার জন্য পাঠ করতেন। আশ্চর্য নয় যে, এর দ্বারা হযরত আলী (রা) এদিকেও ইঙ্গিত করতেন, এ অবস্থায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার চেয়ে ধূলি ধূসরিত হওয়াই উত্তম। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, প্রকৃত হাজী তো ঐ ব্যক্তি, যে ধূলি ধূসরিত ও অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত তালক ইবন আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে গর্তের ময়লা নিষ্কাষণের নির্দেশ দেন। আমি এ জন্যে কোদাল নিয়ে প্রস্তুত হই। সহীহ ইবন হিব্বানে আছে, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ইঁট বহন করি ? তিনি (সা) বললেন, না, তুমি মাটি মাখ, তুমি এ কাজটি ভালই জান।[২]

এ মসজিদ সাদা সিধে[৩] হওয়ার ব্যাপারে ছিল অতুলনীয়। দেয়াল ছিল কাঁচা

---

১. প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৬৮।

২ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ৩৬৬।

৩. সুতরাং হযরত হাসান বসরী (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা এমন ছাপড়া বানাও যেমন ছাপড়া বানিয়েছিলেন হযরত মূসা (আ)। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মূসা (আ)-এর ছাপড়া কেমন ছিল ? তিনি বললেন, যখন হাত উঠাতেন, তখন ছাদে হাত স্পর্শ করত। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আনসারগণ কিছু অর্থ জমা করে আরয করলেন যে, মসজিদের মেঝে পাকা করা হোক। তিনি ইরশাদ করলেন, আমার ভ্রাতা মূসা (আ)-এর পদ্ধতি থেকে আমি অতিরিক্ত কিছু করতে চাই না। ব্যাস, এটা একটা ছাপড়া, মূসা (আ)-এর ছাপড়ার মত। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২১৫)।

ইঁটের, খুঁটি ছিল খেজুর কাণ্ডের আর ছাউনী ছিল খেজুর পাতার। বৃষ্টি এলে পানি ভিতরে প্রবেশ করত। ফলে ছাদ কাদা দ্বারা লেপে দেয়া হয়। দৈর্ঘ্য একশত গজ ও প্রস্থেও প্রায় একশত গজ ছিল এবং প্রায় তিন হাত ভিত্তি ছিল। উচ্চতায় দেয়াল ছিল মানুষের উচ্চতা থেকে বেশি। কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রাখা হয়েছিল এবং দরজা রাখা হয়েছিল তিনটি। একটি দরজা ঐদিকে ছিল, যেদিকে বর্তমানে কিবলার দেয়াল বিদ্যমান, দ্বিতীয় দরজা ছিল পশ্চিমদিকে, যাকে বর্তমানে 'বাবুর-রহমত' বলা হয়, আর তৃতীয় দরজা, যেটি দিয়ে তিনি আসা-যাওয়া করতেন। একে বর্তমানে 'বাবু জিবরীল' বলা হয়। আর ষোল-সতর মাস পর যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতি কিবলা হওয়া মনসুখ হয়ে গেল এবং কাবাগৃহের দিকে কিবলা করে নামায আদায়ের নির্দেশ জারী হল, তখন কাবাগৃহের দিকের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এর বিপরীতে আরেকটি দরজা খোলা হলো।

সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কত ছিল এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কেউ কেউ বলেন, একশ গজ দীর্ঘ ও একশ গজ প্রস্থ ছিল। মদীনার ফকীহ খারিজা ইবন যায়দ (র) বলেন, সত্তর গজ দীর্ঘ এবং ষাট গজ প্রস্থ ছিল। ইমাম মালিকের ছাত্র মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া (র) বলেন, পূর্ব-পশ্চিমে তেষট্টি গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে অনুরূপ এবং আরো দুই-তৃতীয়াংশ ছিল।

মূলত মসজিদে নববী দু'বার নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রথমত যখন তিনি হিজরত করে হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর গৃহে অবস্থান করেন। দ্বিতীয়বার সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় তিনি একে সম্পূর্ণভাবে পুনরায় নির্মাণ করান। যেমনটি বিভিন্ন হাদীস এবং বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। প্রথমবারে নির্মিত মসজিদের দৈর্ঘ্য একশ গজের কম ছিল এবং দ্বিতীয়বার নির্মাণে দৈর্ঘ্য একশ গজের কিছুটা বেশি ছিল। কাজেই ইবন জুরায়জ জা'ফর ইবন আমর থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মসজিদটি দু'দফা নির্মাণ করান। প্রথম দফা যখন তিনি হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন মসজিদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ একশ গজের কম ছিল। দ্বিতীয়বার সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর অতিরিক্ত জমি নিয়ে মসজিদটি বর্ধিত আকারে পুনর্নির্মাণ করান। মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মসজিদ প্রশস্ত করার ইচ্ছা করলেন, তখন মসজিদ সংলগ্ন এক আনসারীর জমি ছিল। তিনি ঐ আনসারীকে বললেন, জান্নাতের একটি মহলের বিনিময়ে তুমি এ জমি আমাদের কাছে বিক্রি কর। কিন্তু তিনি তার দারিদ্র্য, অর্থ সঙ্কট ও পরিবারের সদস্য সংখ্যাধিক্যের কারণে বিনামূল্যে দানে অপারগ ছিলেন। এ কারণে হযরত উসমান গনী (রা) এ জমিটুকু দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ আনসারীর নিকট থেকে খরিদ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যে জমিটুকু জান্নাতে মহলের বিনিময়ে আপনি ঐ আনসারীর নিকট থেকে খরিদ করতে চেয়েছিলেন, তা এ অধমের নিকট থেকে খরিদ করুন। তিনি জান্নাতের

বিনিময়ে জমিটুকু খরিদ করে মসজিদে অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং প্রথম ইঁটটি স্বহস্তে স্থাপন করেন। এরপর তাঁর নির্দেশে হযরত আবূ বকর (রা), তারপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা) ও পরে হযরত আলী (রা) ইঁট রাখেন। এ হাদীসটি যদিও সনদের দিক থেকে যঈফ কিন্তু মুসনাদে আহমদ এবং জামে তিরমিযী কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত একটি হাদীস এর সমর্থনে রয়েছে। তা হলো এই যে, বিদ্রোহীরা যখন হযরত উসমান (রা)-এর গৃহ অবরোধ করে, তখন তিনি বলেন, তোমরা কি জান না, যখন মসজিদে নববীতে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না, তখন নবী (সা) ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে অমুক জমিটুকু খরিদ করে জান্নাতের বিনিময়ে মসজিদে শামিল করে দেয় ? আর তোমরা জান যে, ঐ জমি আমিই কিনে নিয়ে মসজিদে শামিল করে দিয়েছি। অথচ তোমরা আমাকে সেই মসজিদে দু' রাকাআত সালাত আদায়ে বাধা দিচ্ছ ?

এ বর্ণনা জামে তিরমিযীতে সুমামা ইবন হুযন কুশায়রী থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। আর এ বর্ণনাই মুসনাদে আহমদ এবং সুনানু দারু কুতনীতে হযরত আহনাফ ইবন কায়স (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। অধিকন্তু, হযরত আবূ হুরায়রা (রা), যিনি সপ্তম হিজরীতে মহানবী (সা) সকাশে উপস্থিত হন, তিনিও এ নির্মাণে শরীক হয়েছিলেন। যেমনটি মুসনাদে আহমদে খোদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কিরামের সাথে নবী (সা)ও স্বয়ং ইঁট বহন করছিলেন। এক দফা আমি সামনে পড়ে গেলাম। দেখলাম, তিনি অনেকগুলো ইঁট নিয়েছেন এবং বুকের সাথে লাগিয়ে নিয়েছেন। বুঝলাম, তিনি ভার ঠেকানোর জন্য এমনটি করেছেন। আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন : خُذْ غَيْرَهَا يَا اَبَاهُرَيْرَةَ فَانَّهُ لاَعَيْشَ الاَّ عَيْشَ الاْخِرَةَ (হে আবূ হুরায়রা, তুমি অন্যগুলো বহন কর। কেননা আখিরাতের জীবনের চেয়ে উত্তম কোন জীবন নেই)।

এতে প্রকাশ পেল যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর এ অংশগ্রহণ দ্বিতীয় নির্মাণকালে ছিল, যা সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজয়ের পর করা হয়েছিল। আর যা প্রথম হিজরীতে হয়েছিল, তাতে হযরত আবূ হুরায়রার অংশগ্রহণ কিভাবে সম্ভব ? এছাড়া হযরত আমর ইবন আস (রা), যিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, মসজিদ নির্মাণে তাঁর অংশগ্রহণের কথা 'দালাইলে বায়হাকী'তে বর্ণিত আছে। উল্লেখ্য যে, যিনি পঞ্চম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সা) সকাশে উপস্থিত হলেন, তিনি কিভাবে প্রথম হিজরীর মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করবেন ? এটা অসম্ভব। কাজেই তাঁর অংশগ্রহণ দ্বিতীয় নির্মাণকালে ধরে নিতে হবে। এতদসমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে 'ওফা আল-ওফা' এবং 'খুলাসাতুল ওফা' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে।

পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য হুজরা নির্মাণ

যখন মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করলেন; তখন পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য

হুজরা তৈরির ভিত দিলেন এবং প্রথমে দু'টি হুজরা নির্মাণ করালেন, একটি হযরত সাওদা বিনত জামা'আ (রা)-এর জন্য এবং অপরটি হযরত আয়েশা (রা)-এর জন্য। বাকী হুজরাগুলো পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। মসজিদ সন্নিকটে হযরত হারিসা ইবন নু'মান আনসারী (রা)-এর ঘরগুলো অবস্থিত ছিল। যখন নবী (সা)-এর প্রয়োজন দেখা দিত, হযরত হারিসা (রা) তাঁকে একটি ঘর হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দিতেন। এভাবে একটির পর একটি করে সবগুলো ঘর তিনি হাদিয়া হিসেবে দিয়ে দেন।

অধিকাংশ ঘর ছিল খেজুর ডাল দ্বারা এবং কয়েকটি ছিল কাঁচা ইঁটের তৈরি, দরজায় ছিল কম্বল অথবা চটের পর্দা। হুজরা বলতে ছিল অল্পে তুষ্টির বাস্তব চিত্র এবং অস্থায়ী দুনিয়ার প্রতিচ্ছবি। এ হুজরাসমূহে যদিও অধিকাংশ ও বেশির ভাগ সময়ে বাতি জ্বলত না (বুখারী শরীফ, ১খ. পৃ. ৫৬) এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও ছিল না। যে গৃহে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী উজ্জ্বল প্রদীপ অবস্থান করেন, সেখানে সান্ধ্য দীপের কি প্রয়োজন ? কেউ বলেছেন :

يَـا بَـدِيْـعُ الـدَّلِّ وَالْغَـنَـجِ لَكَ سُلْطَانُ عَلَى الْمُهَجِ
اِنَّ بَـيْـتًـا اَنْتَ سَـاكِنُـهُ غَيْرَ مُحْتَاجٍ اِلَى السُّرُجِ
وَجْهُكَ الْـمَـاءُ مُوْلُ حُجَّتُنَا يَوْمَ يَأْتِى النَّاسُ بِالْـحُـجَجِ

"ওহে আশ্চর্য ও বিস্ময়কর শান-শওকতের অধিকারী, আপনার বাদশাহী তো মানুষের অন্তরের উপর। যে গৃহে আপনি অবস্থান করেন তা প্রদীপের মুখাপেক্ষী নয়। যে দিন লোকেরা নিজ নিজ দলীল পেশ করবে, সেদিন আপনার পবিত্র চেহারাই আমাদের জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট হবে।"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আমি যখন কিছুটা বড় হলাম হাত দিয়ে হুজরার ছাদ স্পর্শ করতাম। এ হুজরাসমূহ পূর্বমুখী এবং সিরিয়ার দিকে ছিল; পশ্চিমদিকে কোন হুজরা ছিল না (খুলাসাতুল ওফা, পৃ. ১২৭)।

পবিত্র সহধর্মিণীগণের ইনতিকালের পর

পবিত্র সহধর্মিণীগণের ইনতিকালের পর ওলীদ ইবন আবদুল মালিকের নির্দেশে এ সমুদয় হুজরা মসজিদে নববীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যখন ওলীদের এ নির্দেশ মদীনায় পৌঁছল, সমস্ত মদীনাবাসী বেদনায় চিৎকার করে উঠেছিল।

আবূ উমামা সাহল ইবন হুনায়ফ বলতেন, যদি হুজরাসমূহ ঐভাবেই ছেড়ে দেয়া হতো, যাতে লোকজন দেখতে পেত যে, আল্লাহর তরফ থেকে সারা পৃথিবীর সম্পদের চাবি যে নবীর হাতে দেয়া হয়েছিল, সেই নবী কেমন হুজরা ও কেমন ছাপড়ায় জীবন যাপন করতেন। সেই নবী, তাঁর সন্তান-সন্তুতি, তাঁর সহধর্মিণীগণ ও তাঁর সাহাবীগণের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০)

মসজিদে নববীর কাছে হুজরা নির্মাণের সময়ই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ রাফে (রা) কে মক্কায় প্রেরণ করেন। যাতে তাঁরা হযরত ফাতিমাতুয যোহরা,[১] হযরত উম্মে কুলসূম এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা) কে নিয়ে আসতে পারেন। আর তাদের সাথেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর (রা) কে প্রেরণ করেন যাতে তিনি হযরত আয়েশা, হযরত আসমা, হযরত উম্মে রুমান এবং হযরত আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) কে নিয়ে আসতে পারেন।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন সবাইকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন নবী (সা) হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-এর গৃহ ছেড়ে নির্মিত হুজরায় চলে এলেন। [এ হদীস তাবারানী হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০]।

নবী-রাসূল (আ)গণের শেষ মসজিদ[২] খুলাফায়ে রাশিদীন কর্তৃক সম্প্রসারণ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে মসজিদে নববীতে কোন কিছু বর্ধিত করেননি। শুধু যে সমস্ত খুঁটি পুরাতন হওয়ায় পড়ে গিয়েছিল, সেগুলোর স্থলে খেজুর গাছের খুঁটিই পুনঃস্থাপন করেছিলেন।

হযরত উমর (রা) সতর হিজরীতে কিবলার দিক এবং পশ্চিম পার্শ্ব বর্ধিত করেন। পূর্ব পার্শ্বে যেহেতু পবিত্র নবীসহধর্মিণীগণের হুজরা ছিল, তাই সেদিকে বর্ধিত করেননি।

---

১. হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ রাফে (রা)-এর সাথে মদীনা আগমন করেন। আর হযরত রুকাইয়া (রা) নিজ স্বামী হযরত উসমান (রা)-এর সাথে পূর্বেই মদীনায় এসেছিলেন। হযরত যয়নব স্বীয় স্বামী আবুল আস ইবন রবীর সাথে মক্কায়ই থেকে যান। কেননা আবুল আস তখনো মুসলমান হননি। বদর যুদ্ধে যখন তিনি বন্দী অবস্থায় নীত হন, তখন নবী (সা) তাকে এ শর্তে ছেড়ে দেন যে, আমার কন্যা যয়নবকে তুমি পাঠিয়ে দেবে। কাজেই আবুল আস মক্কা ফিরে আসেন এবং হযরত যয়নবকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭০)।

২ এটি একটি হাদীসের প্রতি ইশারা। সহীহ মুসলিম এবং নাসাঈতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'আমি নবীদের ধারা সমাপ্তকারী এবং আমার মসজিদ নবীগণের শেষ মসজিদ।' এ বাক্য নাসাঈর। মুসলিমের বাক্যাবলী হলো, 'আমি শেষ নবী, আর আমার মসজিদ শেষ মসজিদ।' মুসনাদে বাযযার ইত্যাদিতে এ বাক্যাবলী রয়েছে যে, 'আমি নবীদের ধারা সমাপ্তকারী আর আমার মসজিদ নবীগণের শেষ মসজিদ। যে সমস্ত মসজিদ আম্বিয়া (আ) নির্মাণ করিয়েছেন, এটি তার শেষ মসজিদ।' সুতরাং তাঁর পরে যেমন কোন নবী বা পয়গাম্বর আগমন করবেন না, তেমনি তাঁর মসজিদ নির্মাণের পর আর কোন পয়গাম্বর এসে মসজিদ নির্মাণ করবেন না। এ অর্থ নয় যে, তাঁর মসজিদের পর পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ নির্মিত হবে না।

হযরত উমর (রা) কেবল মসজিদ বর্ধিতই করেছিলেন, এর আসল রূপ ও বৈশিষ্ট্যে কোন পরিবর্তন করেন নি। অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর মতই কাঁচা ইঁট দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করান, খেজুর গাছের কাণ্ড দ্বারা খুঁটি এবং খেজুর পাতা ও কাদা লেপে ছাদ নির্মাণ করান এবং এর প্রকৃত সাদাসিধে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখেন।

হযরত উসমান (রা) তাঁর খিলাফতকালে মসজিদের বিস্তৃতি সাধনও করেন এবং সেইসঙ্গে কাঁচা ইঁটের পরিবর্তে নকশী পাথর এবং কলি চুন দ্বারা নির্মাণ করান, স্তম্ভগুলোও পাথর দ্বারা নির্মাণ করান এবং শাল কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করান।

হযরত উসমান (রা) যখন এভাবে মসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম মসজিদের এ বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের প্রবল বিরোধিতা করেন। হযরত উসমান যখন সাহাবীগণের বারবার অস্বীকৃতি এবং অপসন্দের প্রকাশ লক্ষ্য করলেন, তখন এক ভাষণে তিনি বলেন :

انكم اكثرتم وانى سمعت النبى ﷺ النبى يقول من بنى مسجدا يبتغى به وجه له مثله فى الجنة

"তোমরা এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি করেছ, আর আমি অবশ্যই নবী করীম (সা) থেকে শুনেছি, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি কেউ একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি মহল তৈরি করে দেন।"[১]

উনত্রিশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ত্রিশ হিজরীর মুহররম মাসে সমাপ্ত হয়। এ হিসেবে নির্মাণকাল হয় দশ মাস।[২]

ইমাম মালিক (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উসমান (রা) যখন মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করান তখন কা'ব আল-আহবার প্রার্থনা করেন যে, আয় আল্লাহ ! এ নির্মাণ যেন সমাপ্ত না হয়। লোকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়া মানে আসমান থেকে ফিতনা অবতীর্ণ হওয়া।[৩]

জানাযা নামাযের স্থান

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) যখন হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন আমাদের মধ্যে কারো অন্তিমকাল উপস্থিত হলে আমরা তাঁকে সংবাদ দিতাম। তিনি এসে তার জন্য ইস্তিগফার পাঠ করতেন। মৃত্যুর পর দাফন পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করতেন। কোন কোন সময় এ কাজে অনেক বিলম্ব হয়ে যেত। এ জন্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, মৃত্যুর পরই কেবল তাঁকে সংবাদ দেয়া হবে। সুতরাং কয়েকদিন এ নিয়মই চালু রাখা হলো যে, কারো মৃত্যুর পরই

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

২ ওফা আল-ওফা, ১খ. পৃ. ৩৫৬।

৩. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

কেবল তাঁকে সংবাদ দেয়া হতো। তিনি এসে জানাযা পড়াতেন এবং মৃতের জন্য দু'আ ইস্তিগফার পাঠ করতেন। কোন কোন সময় দাফনেও শরীক হতেন, আর কোন সময় জানাযা পড়িয়েই চলে যেতেন।

কিছুদিন পর তাঁর সুবিধার জন্য আমরা এ নিয়ম চালু করলাম যে, জানাযা বহন করে আমরাই তাঁর হুজরায় উপস্থিত হতাম। তিনি নিজ হুজরার পাশেই জানাযা পড়িয়ে দিতেন। এ জন্যে তিনি যে স্থানে জানাযা পড়াতেন, সে স্থানের নাম 'জানাযার স্থান' হিসেবে পরিচিত হয় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. দ্বিতীয় অংশ, পৃ. ১৪)। বুখারী শরীফে[১] বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর হাদীস থেকেও এটাই জানা যায় যে, জানাযা আদায়ের জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তাঁর চিরাচরিত নিয়ম এটাই ছিল যে, তিনি মসজিদে জানাযা পড়াতেন না। তবে কোন কোন সময় বিশেষ কোন কারণবশত মসজিদেও জানাযা পড়িয়েছেন (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৬০, الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد অধ্যায়)। এ কারণে মসজিদে জানাযা পড়ানো ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে মাকরূহ। আর ইমাম শাফিঈর নিকট জায়েয।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

মুহাজিরগণ কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে মক্কায় নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে মদীনায় এসেছিলেন। মহানবী (সা) তাই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন যাতে মাতৃভূমি এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হওয়ার দুঃখ ও পেরেশানী আনসারদের ভালবাসা ও অন্তরঙ্গতার দ্বারা লাঘব হয়। প্রয়োজনের সময় একে অপরের সাহায্য- সহযোগিতা করতে পারে আর বিপদের সময় পরস্পরে সমব্যথী হতে পারে। দুর্বল যাতে শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তির ভ্রাতৃত্বের দরুন শক্তি অর্জন করতে পারে আর দুর্বল শক্তিশালীর সহায়ক হতে পারে। উত্তম ব্যক্তি নিম্নস্তরের ব্যক্তির উপকারের দ্বারা এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তির অনুদানে তৃপ্ত এবং লাভবান হতে পারে। আর মুহাজির এবং আনসারের পৃথক অবস্থা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের দ্বারা এককে পরিণত হতে পারে এবং বিভেদ ও মতপার্থক্যের কোন নিশানা অবশিষ্ট না থাকে। সবাই মিলে যাতে আল্লাহর রশি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারে। যে বিভেদ ও মতপার্থক্য বনী ইসরাঈলের ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হওয়ার কারণে পরিণত হয়েছিল, অনুগ্রহপ্রাপ্ত এ উম্মত যেন তা থেকে নিরাপদে থাকে। আর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দরুন আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাত তাদের

---

১. ইমাম বুখারী এ হাদীসটি তাঁর জামিউস-সহীহ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে এনেছেন। উদাহরণত الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد অধ্যায়ে পৃ. ১৭৭; আলামাতুন নুবূওয়াত অধ্যায়ে পৃ. ৫১৩; কিতাবুত-তাফসীরে, পৃ. ৬৪৫; কিতাবুল মুহারিমীনের الرجم بالبلاط পৃ. ১০০৭ ইত্যাদি।

মাথার উপরে থাকে। আর যদি জাহিলী যুগের আত্মগর্ব ও অহংকারের বাতিল ধারণা কারো মনে অবশিষ্ট থাকে, তা হলে এ সাম্যের সম্পর্কের দরুন তা যেন বিলীন ও পরিপূরক হয়ে যায় এবং আত্মগর্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, অহংকার ও জাঁকজমকের পরিবর্তে বিনয়, দারিদ্র্য ও ভ্রাতৃত্বের সাম্য আর সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। খাদিম এবং খিদমত গ্রহণকারী, দাস এবং প্রভু, মাহমূদ এবং আয়ায সব এক কাতারে শামিল হয়ে যায়। পার্থিব সমস্ত বিভেদ দূরীভূত হয়ে কেবল আল্লাহভীতি ও পরহেযগারীর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশিষ্ট থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে বেশি আল্লাহর হুকুম পালনে সাবধান।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

এ কর্মের দরুনই তিনি মদীনায় আগমনের পূর্বে মক্কায় শুধু মুহাজিরগণের মধ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্বে সম্পর্ক গড়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং হাফিয আবদুল বার বলেন, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক দু'বার বেঁধে দেয়া হয়েছিল। একবার শুধু মুহাজিরদের মধ্যে যে, এক মুহাজিরকে অপর মুহাজিরের ভাই সাব্যস্ত করা হয়, আর দ্বিতীয়বার ভ্রাতৃত্বের বন্ধন হিজরতের পর আনসার ও মুহাজিরগণের মধ্যে সম্পাদন করা হয়।

সুতরাং হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বেঁধে দেন। অথচ তাঁরা উভয়েই ছিলেন মুহাজিরের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসটি হাকিম এবং ইবন আবদুল বার বর্ণনা করেন। এর সনদ হাসান। আর হাদীসটি হাফিয যিয়াউদ্দীন মাকদিসী তাঁর 'মুখতারা' গ্রন্থে তাবারানীর 'মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থের বরাতে উদ্ধৃত করেন।

হাফিয ইবন তাইমিয়া বলেন, মুখতারার হাদীসসমূহ মুসতাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অনেক বেশি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী। মুসতাদরাকে হাকিমে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর মধ্যে এবং অমুক ও অমুকের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বেঁধে দেন। তখন হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাই কে? তিনি (সা) বলেন, তোমার ভাই হলাম আমি।[১]

হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস তাঁর 'উয়ূনুল আসার' গ্রন্থে বলেন, মক্কায় বিশিষ্ট সাহাবীদের মধ্যে যাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বেঁধে দেয়া হয়, তাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)	হযরত উমর (রা)
২. হযরত হামযা (রা)	হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)
৩. হযরত উসমান গনী (রা)	হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১।

৪. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)	হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ (রা)
৫. হযরত উবায়দা ইবনুল হারিস (রা)	হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা)
৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)	হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)
৭. হযরত আবূ উবায়দা (রা)	হযরত আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম (রা)
৮. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)	হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)
৯. হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)	হযরত আলী (রা)।

দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

হিজরতের পাঁচ মাস পর হযরত আনাস (রা)-এর গৃহে পঁয়তাল্লিশজন আনসার ও পঁয়তাল্লিশজন মুহাজিরের মধ্যে দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সম্পাদিত হয়। এক এক মুহাজিরকে এক এক আনসারের ভাই বানানো হয় (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১০)। যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ ঃ

মুহাজির	আনসার
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)	হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা)
হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)	হযরত উতবান ইবন মালিক (রা)
হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)	হযরত সাদ ইবন মু'আয (রা)
হযরত আবদুর রাহমান ইবন আউফ (রা)	হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)
হযঃ যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)	হযঃ সালামা ইবন সালামা ইবন ওকীশ (রা)
হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)	হযরত আওস ইবন সাবিত (রা)
হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)	হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা)
হযরত সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা)	হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)
হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)	হযরত আবূ আয়্যুব খালিদ ইবন যায়দ আনসারী (রা)
হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা)	হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা)
হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা)	হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)
হযরত আবূ যর গিফারী (রা)	হযরত মুনযির ইবন আমর (রা)
হযরত সালমান ফারসী (রা)	হযরত আবুদ-দারদা উয়ায়মির ইবন সা'লাবা (রা)
হযরত বিলাল (রা)	হযরত আবূ রাওয়ায়হা আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রাহমান (রা)
হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)	হযরত আওয়াইম ইবন সায়িদা (রা)
হযরত আবূ মারসাদ (রা)	হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা)
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহশ (রা)	হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা)
হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা)	হযরত আবূ দুজানা (রা)
হযরত আবূ সালামা ইবন আবদুল আসাদ (রা)	হযরত সা'দ ইবন খায়সামা (রা)
হযরত উসমান ইবন মায'ঊন (রা)	হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা)

হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)
হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা)
(অর্থাৎ উবায়দা ইবন হারিসের ভ্রাতা)
হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)
হযরত মিকদাদ (রা)
হযরত যু-শ-শামালাইন (রা)
হযরত আরকাম (রা)
হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা)
হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা)
হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা)
হযরত খুনায়স ইবন হুযায়ফা (রা)
হযরত সিররা ইবন আবূ রুহম (রা)
হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা)
হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)
হযরত আমের ইবন ফুহায়রা (রা)
হযরত উমর (রা)-এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাস মাহজা (রা)
হযরত উমায়র ইবন হাম্মাম (রা)
হযরত সুফিয়ান নাসর খাযরাজী (রা)
হযরত রাফে ইবন মুয়াল্লা (রা)
হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)
হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস (রা)
হযরত তালহা ইবন যায়দ (রা)
হযরত মা'আন ইবন আদী (রা)
হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা)
হযরত মুবাশশির ইবন আবদুল মুনযির (রা)
হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা)
হযরত উবাদা ইবন খাশখাশ (রা)
হযরত যায়দ ইবন মুযায়্যিন (রা)
হযরত মুজযির ইবন দিমার (রা)
হযরত হারিস ইবন সিম্মাহ (রা)
হযরত সুরাকা ইবন আমর ইবন আতিয়্যা (রা)।[১]

আনসারগণ ভ্রাতৃত্বের যে হক আদায় করেন, নিঃস্বার্থভাবে নিজের উপর অপরকে প্রাধান্য দানের যে নযীর স্থাপন করেন, পূর্বে এবং পরবর্তীতে এর উদাহরণ পাওয়া অসম্ভব। জায়গা-জমি এবং ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্রের ব্যাপারে মুহাজিরদের সাথে যে ব্যবহার করেন, তা এভাবে করেছেন যে কৃষি জমি এবং বাগানাদি তো মুহাজিরদেরকে দিয়েই দিয়েছেন; এমনকি যে আনসারীর দু'জন স্ত্রী ছিল, তিনি তার একজনকে তালাক দিয়ে নিজ মুহাজির ভাইয়ের বিবাহ দেয়ারও প্রস্তাব দেন।

সুনানু আবূ দাউদ ও জামে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন আনসারীই নিজের অর্থ-কড়ির ভাগের ব্যাপারে আপন মুহাজির ভাই অপেক্ষা নিজকে বেশি হকদার মনে করতেন না (যারকানী, ১খ., পৃ. ৩৭৪)।

কাজেই মুহাজিরগণ আনসারীগণের এহেন নযীরবিহীন সহমর্মিতা ও অগ্রাধিকার দানের উৎসাহ দেখে নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যে সম্প্রদায়ে আমরা এসে উপনীত হয়েছি, এদের অপেক্ষা অন্য কোন সম্প্রদায়কে আমরা সহমর্মী, চিন্তা হরণকারী, নিঃস্বার্থ, অভাব এবং প্রাচুর্য সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী দেখিনি। আমাদের সন্দেহ হয় যে, তারাই সমস্ত সওয়াব নিয়ে নেবে, আমাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন না, তা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের

---

১. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২০১।

জন্য দু'আ করবে [ইবন সায়্যিদুন-নাস হযরত আনাস (রা) থেকে নিজস্ব সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেন, উয়ূনুল আসারেও হাদীসটি এসেছে; আল্লামা ইবন কাসীর বলেন, এটি সুলাসী সনদবিশিষ্ট হাদীস, বুখারী-মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। তবে এ সনদে সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থেই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়নি]।[১]

অর্থাৎ দু'আর অনুগ্রহ অর্থ-কড়ির অনুগ্রহ অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়; বরং কিছু বেশিই। গণনাযোগ্য দিরহাম তো সামান্য ব্যাপার। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর মাত্র একটি নিঃস্বার্থ দু'আ অপর পাল্লায় রেখে ওজন করা হয়, তা হলে ইনশা আল্লাহ দু'আর পাল্লাই বেশি ভারী হবে। আর এ 'ইনশা আল্লাহ' শর্ত সাপেক্ষ নয়; বরং বরকতের জন্য বলছি। ইমাম বুখারী 'জামিউস সহীহ' গ্রন্থের কিতাবুত তাওহীদের فى المشية والارادة অধ্যায়ে অধিকাংশ এ ধরনের হাদীসই উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে নয়; বরং বরকতের জন্য 'ইনশা আল্লাহ' বলাকে উদ্ধৃত করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকটে যখন কোন ফকীর এসে দু'আ করত, যেমনটি সাহায্যপ্রার্থীদের অভ্যাস, তখন উম্মুল মু'মিনীন (রা)ও সে ফকীরের জন্য দু'আ করতেন। এরপর কিছু সাহায্য দান করতেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, হে উম্মুল মুমিনীন, আপনি সাহায্যপ্রার্থীকে সদকাও দেন এবং সে যেভাবে আপনার জন্য দু'আ করে, আপনিও তার জন্য অনুরূপ দু'আ করেন ? তিনি বললেন, আমি যদি কেবল তাকে সাদকাই দান করি এবং দু'আ না করি তা হলে আমার প্রতি তার অনুগ্রহ বেশি হবে। দু'আ সাদকা অপেক্ষা উত্তম, এ জন্যে আমি দু'আর বিনিময় দু'আ দ্বারা করে থাকি, যাতে আমার সাদকা সঠিক থাকে, তা যেন কোন অনুগ্রহের বিনিময়ে না হয়। যেমনটি 'মাফাতীহে শারহে মাসাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি সীমিত দিরহামের বিনিময়ে নিঃস্বার্থ দু'আ খরিদ করতে পারে, সে তা কখনই ছাড়বে না, আর এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না। ফারসী কবির ভাষায় :

جمادے چند دادم جان خریدم بحمد الله زہے ارزان خریدم

এ ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এতই অটুট ও শক্তিশালী ছিল যে, একে নিকটাত্মীয়তার বিকল্প মনে করা হতো। কোন আনসারী ইনতিকাল করলে মুহাজির তার উত্তরাধিকারী হতেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২২৮।

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু।" (সূরা আনফাল ঃ ৭২)

কিছুদিন পর উত্তরাধিকারের নির্দেশ স্থগিত হয়ে যায় এবং সমস্ত মু'মিনকে ভাই ভাই বানানো হয়। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হয় : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ "নিশ্চয়ই মু'মিনগণ ভাই ভাই।"

এক্ষণে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কেবল পারস্পরিক সহানুভূতি, দুঃখে সান্ত্বনা দান এবং সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে রয়ে গেল, আর উত্তরাধিকার শুধু আত্মীয়-স্বজনের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হলো (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১০; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭৪)।

আযানের সূচনা

দু' ওয়াক্ত নামায, ফজর ও আসর তো নবূয়াত লাভের প্রারম্ভেই ফরয করা হয়েছিল, এরপর শবে মি'রাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়। কিন্তু তখন মাগরিব ছাড়া অপরাপর ওয়াক্তের নামায ছিল দু'রাকাআত করে। হিজরতের পর মুসাফিরের জন্য তো দু' দু' রাকাআতই রয়ে গেল আর মুকীমের জন্য যোহর, আসর ও ইশার নামায চার রাকাআত করে দেয়া হলো [হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বুখারীতে বর্ণিত]।

এ পর্যন্ত এ নিয়মই চালু ছিল যে, নামাযের ওয়াক্ত হলে লোকজন আপনা আপনি একত্রিত হতো। ফলে তাঁর ধারণা হলো যে, নামাযের জন্য কোন নিদর্শন এমন হওয়া উচিত, যাতে করে মহল্লার সব লোক একই সাথে অনায়াসে মসজিদে উপস্থিত হতে পারে।

কেউ বলল, নাকূস[১] বাজানো হোক, কেউ বলল বুক[২] বাজানো হোক, যাতে লোকজন এর আওয়াজ শুনে একত্রিত হবে। কিন্তু তিনি খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার কারণে নাকূস এবং ইয়াহূদীদের মত হওয়ার কারণে বুক বাজানোর প্রস্তাব নাকচ করে দেন। কারণ উভয় প্রস্তাবই ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার দরুন তিনি অপসন্দ করেন। কেউ বলল, কোন উঁচু স্থানে আগুন জ্বালানো হোক, যা দেখে লোকজন একত্রিত হবে। তিনি বললেন, এটা অগ্নিপূজকদের পদ্ধতি। অগ্নিপূজকদের সদৃশ হওয়ার কারণে তিনি এটাও অপসন্দ করলেন। সভা ভেঙ্গে গেল এবং কোন সিদ্ধান্তই হলো না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চিন্তা ও ধারণার প্রভাব হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহ (রা)-এর উপর খুব বেশি পড়ত।

---

১. নাকূস এমন একটি কাঠির নাম, খ্রিস্টানরা তাদের গীর্জায় লোকজন একত্র করার জন্য যা বাজাতো। যেমন আজকালকার ঘন্টা অথবা শঙ্খ।

২ বুক অর্থ বিউগল, ইয়াহূদীদের পদ্ধতি ছিল যে, যখন তারা তাদের উপাসনালয়ে লোকজন একত্রিত করতে চাইত, তখন বিউগল বাজাতো।

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) স্বপ্নে দেখেন যে, সবুজ পোশাক পরিহিত জনৈক ব্যক্তি একটি নাকূস হাতে নিয়ে আমাকে অতিক্রম করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, নাকূসটি কি বিক্রি করবে ? সবুজ পোশাকধারী বলল, তুমি এটা কিনে নিয়ে কি করবে ? আমি বললাম, এটি বাজিয়ে লোকজনকে নামাযের জন্য আহ্বান করব। সবুজ পোশাকধারী বলল, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কোন পদ্ধতি বলব না ? আমি বললাম, কেন নয়, অবশ্যই বল। ঐ ব্যক্তি বলল, এভাবে বল ঃ 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার', 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', 'হাইয়্যা আলাস সালাহ হাইয়্যা আলাস সালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ-হাইয়্যা আলাল ফালাহ', 'আল্লাহু আকবার-আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

আর কিছুটা সরে গিয়ে ইকামত শিক্ষা দিল। এভাবে যে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে, তখনও অনুরূপ বলবে এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ-এর পর দু'বার 'কাদ কামাতিস সালাত' অতিরিক্ত যোগ করল। প্রভাত হতেই আমি নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং এ স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। শোনামাত্র তিনি বললেন : انَّ هٰذه لَرُؤْيَا حَقٌّ انْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى "এ স্বপ্ন ইনশা আল্লাহ অবশ্যই সত্য।"[১]

এখানেও 'ইনশা আল্লাহ' বাক্যটি শর্তসাপেক্ষ ও সন্দেহের কারণে নয়, বরং বরকত ও আদবের জন্য বলা হয়েছে, যেমনটি আমরা একটু আগেই বর্ণনা করেছি।

পরে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দকে নির্দেশ দিলেন যে, এ বাক্যগুলো বিলালকে বলে দাও এবং সে আযান দিক। কেননা বিলালের স্বর তোমার চেয়ে বেশি উচ্চ।

বিলাল (রা) আযান দিলেন আর এ ধ্বনি হযরত উমর (রা)-এর কানে পৌঁছামাত্র তিনি চাদর টানতে টানতে ঘর থেকে বেরুলেন এবং নবী (সা) সকাশে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, والذى بعثك بالحق لقد رايت مثل الذى ارى "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমিও অনুরূপ স্বপ্নই দেখেছি।" শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। হাদীসটি মুহাম্মদ ইবন ইসহাক নিম্নরূপ সনদে বর্ণনা করেন :

---

১. এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

احمد الله ذالجلال وذاالاكرام محمدا على الاذان كثيرا اذا اتانى به البشير من الله

فاكرم بـه لـدى بـشـيـرا فى ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زانى توقيرا

"আমি আযানরূপ নিয়ামতের জন্য আল্লাহ যুল-জালালের অসংখ্য প্রশংসা করি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কাছে এক সুসংবাদদাতা এলেন, আর তিনি ছিলেন উত্তম সুসংবাদদাতা। পরপর তিন রাত্রি পর্যন্ত আল্লাহর ঐ সুসংবাদদাতা এলেন আর আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকলেন।" (সুনানু ইবন মাজাহ)

قال ابن اسحق حدثنى بهذا الحديث محمد بن ابراهيم التيمى عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن ابيه

"ইবন ইসহাক বলেন, হাদীসটি আমাকে মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম তায়মী মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।"

ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম আবূ দাঊদ এ সনদেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবন ইবরাহীম তায়মীর এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীসটি সহীহ্ (ইমাম বায়হাকী কৃত 'সুনানুল কুবরা')। ইমাম ইবন খুযায়মা তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেন, هذا الحديث صحيح ثابت من جهت النقل "হাদীসটি সনদ এবং মূলপাঠ উভয় দিক থেকে বিশুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত।"

মুহাম্মদ ইবন ইয়াহিয়া যুহলীও হাদীসটি সহীহ্ বলেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ বর্ণিত এ হাদীসটি হাসান সহীহ।[১]

আবদুর রাহমান ইবন আবূ লায়লা বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবী বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি স্বপ্নে দেখলাম দুটি সবুজ চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি প্রথমে দেয়ালের উপর চড়ে আযানের বাক্যগুলো দু'বার করে বলল। এরপর নিচে নেমে ইকামতে দু' দু'বার বলল।

হাফিয আলাউদ্দীন মারবিনী বলেন, এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী বুখারীর শর্তানুযায়ী বিশ্বস্ত। জাওহার নকী প্রণীত 'সুনানুল কুবরা'র হাশিয়ায় (১খ. পৃ. ৪২০) এবং 'মু'জামে তাবারানী'র আওসাতে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও এ স্বপ্নই দেখেছিলেন (দ্র. শায়খ ইবন আল্লান মক্কী প্রণীত 'আল-ফুতূহাতে রাব্বানিয়াহ আলাল-আযকারিন-নবূবিয়াহ', ২খ. পৃ. ৭০)।

তত্ত্ব ও দর্শন

ঈমানের পরেই নামাযের স্থান, যা জামায়াতের সাথে আদায় করা অত্যন্ত জরুরী। আর ঘোষণা দান ও অবহিতকরণ ছাড়া লোকজন একত্রিত করা সুকঠিন। নবী (সা) বিষয়টি মজলিসে উল্লেখ করেন। কেউ আগুন জ্বালানোর কথা বলেন, কেউবা বিউগল বাজানোর কথা উল্লেখ করেন আর কেউ নাকূস বাজানোর বিষয়ে উল্লেখ করেন। নবী (সা) আগুন জ্বালানো অগ্নিপূজকদের সাথে সদৃশ হওয়ার কারণে অনুমোদন করেননি। আর বিউগল ইয়াহূদীদের অনুরূপ হওয়ার দরুন এবং নাকূস খ্রিস্টানদের অনুরূপ হওয়ার কারণে বাতিল করে দেন। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই মজলিস সমাপ্ত হয় এবং লোকজন আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

---

১. নায়লুল আওতার, ২খ. পৃ. ৬।

[১]

ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আবদে রাব্বিহী (রা) কে স্বপ্নে আযান ও ইকামত দেখানো হয়। আবদুল্লাহ ইবন যায়দ তার স্বপ্ন নবী (সা)-এর সামনে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, এ স্বপ্ন বাস্তব ও সত্য। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত, শয়তানের প্ররোচনা থেকে পাক-পবিত্র। উত্তম স্বপ্ন ও ইলহাম দ্বারা যদিও নিশ্চিত নির্দেশ প্রমাণিত হতে পারে না, কিন্তু নবী (সা)-এর সত্যায়ন এবং তা বহাল রাখা এটিকে প্রকাশ্য ওহীর রূপ দিয়েছে এবং ঐ বাক্যাবলী দ্বারাই তিনি লোকদেরকে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। এমন কি আযানের প্রচার দীন ইসলামের একটি বিরাট প্রচারে পরিগণিত করা হয়। আর তা দীনের একটি বিশেষ নিদর্শনে পরিণত হয়।

[২]

আবার আযানের এ বাক্যগুলোর প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিও খুবই আশ্চর্যজনক যে, মাত্র কয়েকটি বাক্যের মধ্যেই ইসলামের তিনটি মৌলিক ভিত্তি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের অস্বীকৃতি বিদ্যমান।

'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'তে রিসালতের প্রত্যায়ন বিদ্যমান এবং এ বাক্যের ঘোষণা যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয় এবং তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি আমরা এ সত্য নবীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আর তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষণার পর মানুষকে সর্বাপেক্ষা উত্তম ইবাদত নামাযের দিকে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলে আহ্বান করা হয়।

এরপর আবার 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলে স্থায়ী কল্যাণের প্রতি আহ্বান করা হয়, যা দ্বারা মূলের দিকে অর্থাৎ আখিরাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে যায় যে, যদি চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করতে চাও, তা হলে প্রকৃত প্রভুর আনুগত্য ও ইবাদতে নিয়োজিত থাক। ফালাহ দ্বারা (পরকালীন) স্থায়ী সাফল্যই উদ্দেশ্য।

সবশেষে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে স্মরণ করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহই সবার বড় এবং তিনি ছাড়া কেউই আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়।[১]

---

১. আল্লামা কুরতুবী বলেন ঃ قال القرطبى وغيره الاذان على قلته الفاظه مشتمل على مسائل العقيده لانه بداء بالاكبرية وهى تتضمن وجود الله وكماله ثم ثنى بالتوحيد ونفى الشرك ثم اثبات الرسالة لمحمد ﷺ ثم دعا الى الطاعته المخصوصة عقيب الشهادة لانها لا نعرف الا من جهة الرسول ثم دعا الى الفلاح وهو البقاء الدائم وفيه الاشارة الى المعاد ثم اعاده ما عاد توكب (ফাতহুল বারী, ২খ. পৃ. ৬২)।

আল্লাহ তা'আলা যাকে কিছুমাত্র সাধারণ জ্ঞান দান করেছেন, সে ব্যক্তিই আযানের বাক্যগুলোর সরাসরি অর্থ এই দেখতে পাবে যে, আযান সত্যের প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী আওয়াজ। আর ইয়াহূদী, খ্রিস্টান অথবা হিন্দুদের বিউগল, নাকূস, ঘন্টাধ্বনি বা শিঙ্গা, সবকিছু খেল-তামাশার বস্তু। আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও একত্বের ঘোষণার দ্বারা বান্দা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম, ঘন্টা ধ্বনি এবং তবলার আওয়াজে কখনই আল্লাহর নিকট পৌঁছা সম্ভব নয়।

این ره که تومی روی بترکستان است

[৩]

স্বপ্নের মাধ্যমে আযানের বিধিবদ্ধতা বাহ্যত এ জন্যে হয়েছে যে, আযান হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাতের ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত। আর তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের ডংকা বাজানো এবং তাঁর দীনের প্রতি লোকজনকে আহ্বান করা এটা খাদিম ও দাসদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

خوشتران باشد که سر دلبران　گفته آید در حدیث دیگران

মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সরাসরি নামাযের নির্দেশ দেন এবং আসমানসমূহে আরোহণ ও অবতরণের সময় তাঁকে আযান শোনানো হয়। আসমানে ফিরিশতাগণ আযান দেন এবং তিনি শ্রবণ করেন। যেমনটি 'খাসাইসুল কুবরা' গ্রন্থে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে।[১]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল আমীন (আ) আসমানে আযান দেন এবং ইমামতির জন্য আমাকে আগে বাড়িয়ে দেন।[২]

আবার হিজরতের পর যখন নামাযের জামায়াতের জন্য লোকজনকে অবহিতকরণ ও ঘোষণা দানের প্রয়োজন অনুভূত হলো, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) কে স্বপ্নে আযান ও ইকামত দেখানো হলো। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) স্বপ্নে যে আযান ও ইকামত দেখেন, মহানবী (সা) তা শোনামাত্র বুঝলেন যে, এটা ঐ আযান ও ইকামত, যা মি'রাজের রাতে আমি আসমানে শুনেছিলাম। এ জন্যে তিনি শোনামাত্র বলেছিলেন, এটা সত্য স্বপ্ন। অর্থাৎ আমি মি'রাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় যা শুনেছি, তা সম্পূর্ণ এরই মত ও অনুরূপ।

[৪]

আযান ও ইকামতের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর বর্ণনায় পুনরাবর্তন এসেছে, যাতে আযানে ঊনিশটি এবং ইকামতে সতরটি

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৬৪।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ১৭৬।

বাক্য রয়েছে। ইমাম শাফিঈ (র) হযরত আবূ মাহযূরা (রা)-এর আযান গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর হাদীস অনুসারে বর্ণিত আযান গ্রহণ করেছেন। এ জন্যে যে, আযানের প্রকৃত সূচনা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন থেকে শুরু হয়। হযরত ফারূকে আযম (রা) ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

শায়খ ইবন আল্লান[1] মক্কী 'শরহে কিতাবুল আযকারে' (২খ. পৃ.৭০) বলেন, মু'জামে তাবারানী'র আওসাত গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অধিকন্তু, নবী করীম (সা) একে সত্য স্বপ্ন বলে সত্যায়ন করেছেন এবং তদনুসারে হযরত বিলাল (রা) কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। এ জন্যে যে, আবদুল্লাহ ইবন যায়দের আযান ঐ আযানের অনুরূপ ছিল, যা নবী (সা) মি'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আ) থেকে শুনেছিলেন এবং জিবরাঈল (আ)-এর কথামত ফিরিশতাদের নামায পড়িয়েছিলেন। হাদীসে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) যখন নিজ স্বপ্ন নবী (সা)-এর সামনে বর্ণনা করলেন, তখন নবী (সা) বললেন, এ আযান যা তোমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে, বিলালকে শিখিয়ে দাও। কেননা তার আওয়াজ তোমার চেয়ে বেশি উচ্চ।

এরপর বিলাল (রা) সারা জীবন নবী (সা)-এর উপস্থিতিতে এ আযানই দিতে থাকেন যা হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) তাঁকে শিখেয়েছিলেন।

আর বিশুদ্ধতা ও পরম্পরার দিক থেকে প্রামাণ্যতার পর্যায়ে উপনীত হাদীসসমূহে এসেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা)-এর আযানে পুনরাবর্তন ছিল না এবং কিছু পূর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও হযরত ফারূকে আযম (রা) অনুরূপ স্বপ্নই দেখেছিলেন যেমনটি হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা) দেখেছিলেন (যাতে পুনরাবর্তন ছিল না)।

এ জন্যে ইমাম আযম (র) এ সমস্ত দলীলের ভিত্তিতে আযানের এ বর্ণনাকে

---

১. তাবারানীর 'আওসাত' গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-ও এ স্বপ্ন দেখেছিলেন। অধিকন্তু 'ওয়াসীতে' আছে, দশের অধিক ব্যক্তি এ স্বপ্ন দেখেছেন। 'ফুতূহাতে রাব্বানিয়াহ আলা আযকারে নুবূবিয়াহ' (২খ. পৃ. ৭০) গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা যারকানী বলেন, তাবারানীর 'আওসাত' গ্রন্থে আছে, হযরত আবূ বকর (রা)-ও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন। যুফর ইবন হুযাইল আবূ হানীফা থেকে, তিনি আলকামা ইবন মিরসাদ থেকে, তিনি ইবন বুরায়দা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে জনৈক আনসার সাহাবী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি প্রসঙ্গে তাবারানী বলেন, আবূ হানীফা ছাড়া এ হাদীসটি আর কেউ আলকামা থেকে বর্ণনা করেন নি (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৭৭)।

উত্তম ঘোষণা করেছেন যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

[৫]

আযান যেহেতু ইসলামের একটি বিরাট প্রচার, সেহেতু এর বাক্যাবলীতে বিশেষ নূর ও বরকত নিহিত রয়েছে। এ জন্যে শরী'আতের নির্দেশ হলো, যখন সন্তান জন্ম নেবে, তখন তার কানে আযান দিতে হবে যাতে জন্মগ্রহণের পর সর্বপ্রথম তার কানে তাওহীদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছে যায় এবং যাতে করে 'আলাসতু' (الست بربكم। আমি কি তোমাদের রব নই)-এর নবায়ন ও স্মরণ হয়ে যায়।

আরব কবির ভাষায় :

اَتَانِىْ هَوَاهَا قَبْلَ اَنْ اَعْرِفُ الْهَوٰى   فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا

অধ্যায় : মক্কা মুকাররামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত স্মরণে

وَاِذْ فَشَا الْاِسْلَامُ بِالْمَدِيْنَةِ   هَاجَرَ مَنْ يَّحْفَظْ فِيْهَا دِيْنَهُ

"মদীনায় যখন ইসলাম প্রসার লাভ করল, সাহাবায়ে কিরাম তখন নিজেদের দীনের হিফাযতের উদ্দেশে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন"– যাতে নিশ্চিন্তে ইসলামের বিধানগুলো পালন করতে পারেন এবং নিরাপদে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করতে পারেন।

وَعَزَمَ الصِّدِّيْقُ اَنْ يُّهَاجِرَا   فَرَدَّهُ النَّبِىُّ حَتّٰى هَاجَرَا

مَعًا اِلَيْهَا فَتَرَافَقَا اِلٰى   غَارِبِثُوْرِ بَعْدَ ثُمَّ اَرْتَحَلَا

"আর (আবূ বকর) সিদ্দীক হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন, নবী (সা) তা নাকচ করে দেন। এমন কি তাঁরা পরে উভয়ে একত্রে হিজরত করেন। তাঁরা উভয়েই সওর গুহায় সঙ্গী হন এবং এরপর (মদীনার পথে) যাত্রা করেন।"

যখন মুসলমানগণ একের পর এক মদীনায় রওয়ানা হতে শুরু করেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) ও হিজরতের ইচ্ছা করেন। কিন্তু নবী করীম (সা) তার সহায়তা ও বন্ধুত্বের খাতিরে হযরত আবূ বকর (রা) কে হিজরত থেকে নিরস্ত করেন। পরে তিনি ও আবূ বকর (রা) এক সাথে হিজরত করেন। প্রথমে ঘর থেকে বেরিয়ে উভয়ে সওর গুহায় আত্মগোপন করেন। তিন রাত এখানে অবস্থানের পর উভয়ে মদীনার পথে যাত্রা করেন।

وَمَعَهُمَا عَامِرُ مَوْلَى الصِّدِّيْقُ   وَابْنُ اَرِيْقَطِ دَلِيْلُ لِلطَّرِيْقِ

فَاَخَذُوْا نَحْوَ طَرِيْقِ السَّاحِلِ   وَالْحَقُّ لِلْعَدُوِّ شَاغِلُ

تَبِعَهُمْ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ　　يُرِيْدُ فَتْكًا وَهُوَ غَيْرُ فَاتِكٍ

لَمَّا دَعَ عَلَيْهِ سَاخَتِ الْفَرَسُ　　نَادَاهُ بِالْاَمَانِ اِذْ عَنْهُ حَبَسُ

مَرُّوْا عَلٰى خَيْمَةِ اُمِّ مَعْبِدٍ　　وَهِيَ عَلٰى طَرِيْقِهِمْ بِمَرْصَدِ

وَعِنْدَهَا شَاةٌ اَضَرَّ الْجُهْدُ　　بِهَا وَمَا بِهَا قُوىً تَشْتَدُّ

فَمَسَحَ النَّبِيُّ مِنْهَا الضَّرْعَا　　فَحَلَبَتْ مَا قَدْ كَفَاهُمْ وُسْعًا

وَحَلَبَتْ بَعْدُ اِنَاءً اٰخَرَا　　تَرَكَ ذٰلِكَ عِنْدَهَا وَسَافَرَا

"আর তাঁদের সাথে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীকের দাস আমের এবং পথপ্রদর্শক ইবন আরীকত। অতঃপর তাঁরা উপকূলের পথ ধরেন এবং দুশমনকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ধরতে ব্যস্ত রাখেন। অথচ তাঁরা নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে যান। সুরাকা ইবন মালিক তাঁদের অনুসরণ করে এবং হযরতকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু যাঁর সাথে আল্লাহ্ থাকেন, কেউ কি তাঁকে হত্যা করতে পারে ? সুরাকার প্রতি যখন তাঁর দৃষ্টি পড়ল, তিনি তাকে বদ-দু'আ করলেন, সাথে সাথে সুরাকার ঘোড়া যমীনে ধ্বসে গেল। বাধ্য হয়ে সে তাঁর কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানাল। পথিমধ্যে উম্মে মা'বাদের তাঁবু অতিক্রম করেন আর তার তাঁবু ছিল যাত্রা বিরতিস্থলে। উম্মে মা'বাদের একটি বকরি ছিল, অসুখের কারণে যেটা চলতে পারত না। এমনকি দলের সাথে হেঁটে চারণভূমিতে যাওয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না (কাজেই সেটি তাঁবুতে বাঁধা ছিল)। নবী (সা) তার পালানে হাত ছোঁয়ালেন। ফলে সে এ পরিমাণ দুধ দিল যে, সবার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে গেল এবং সবাই তৃপ্ত হলো। এরপর আরেকটি পাত্রে দুধ দোহন করলেন এবং ঐ দুধ ভর্তি পাত্র উম্মে মা'বাদের কাছে রেখে তাঁরা যাত্রা করলেন।"

যেমনটি হাফিয ইরাকী তাঁর 'উলফিয়াতুস-সীরাত' (সীরাত বিষয়ক কবিতা শতক) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় : নবী (সা)-এর কুবায় উপস্থিতি এবং সেখান থেকে মদীনায় আগমন

حتى اتى الى قباء　　نزلها بالسعدوالهناء

فى يوم اللاثنين لثنتى عشره　　من شهر مولود فنعم الهجره

اقام اربعا لديهم وطلع　　فى يوم جمعة وصلى وجمع

فى مسجد الجمعة وهى اول　　ما جمع النبى فيما نقلوا

وقيل بل اقام اربع عشره　　فيهم وهم ينتحلون ذكره

وهو الذى اخرة الشيخان　　لكن ما مر من الاتيان

بمسجد الجمعة ويوم الجمعه　　لايستقيم مع هذه المدة

الا على القول بكون القدمه	الى قبا كانت بيوم الجمعة
بنى بها مسجده وارتحلا	بطيبة الفيحاء طابت نزلا
فبركت ناقته المامــوره	بموضع المسجد فى الظهيره
فحل فى دار ابى ايوبا	حتى ابتنى مسجده الرحيبا
وحولــه منازلا لاهلـه	وحولـه اصحابـه فى ظله
طابت به طيبة من بعد الردى	اشرق ماقد كان منها اسود
كانت لمن اوبا ارض الله	فزال داءها بهذا الجاه
ونقل الله بفضل رحمه	ما كان من حمى بها للجحفه

"এমনকি তিনি তাঁর জন্মের মাস অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবারে সহীহ-সালামতে কুবায় পৌঁছেন। চার রাত কুবায় অবস্থান করে শুক্রবারে তিনি মদীনা মুনাওয়ারার পথে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি জুমু'আ মসজিদে জুমু'আর নামায আদায় করেন। আর এটা ছিল তাঁর প্রথম জুমু'আ আদায়। (কুবায় চারদিন অবস্থান করা সীরাত গ্রন্থকারদের বক্তব্য। বুখারী ও মুসলিমের বক্তব্য পরবর্তী পংক্তিমালায় আসছে)। কেউ বলেন, তিনি চৌদ্দ রাত কুবায় অবস্থান করেন। আর মুহাক্কিক আলিমগণ এ বর্ণনার প্রতিই আকৃষ্ট। যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে আছে, তিনি কুবায় চৌদ্দ রাত অবস্থান করেন। কিন্তু এতে সমস্যা এই যে, তিনি সোমবারে কুবায় উপস্থিত হন এবং শুক্রবারে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। যদি প্রথম শুক্রবারেই তিনি মদীনায় যাত্রা করেছেন বলে ধরে নেয়া হয়, তা হলে এ হিসেবে কুবায় তিনি চার রাত অতিবাহিত করেন। আর যদি পরবর্তী শুক্রবারে রওয়ানা হয়েছেন বলে ধরা হয়, তা হলে তিনি দশ রাত কুবায় কাটিয়েছেন। মোট কথা, বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনামতে চৌদ্দ রাত কুবায় অবস্থান সঠিক বলে মনে হয় না। তবে যদি কুবায় উপস্থিতি সোমবারের পরিবর্তে শুক্রবার ধরা হয়, তা হলে শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চৌদ্দ রাত হয়। কুবায় অবস্থানকালে তিনি কুবার মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তারপর কুবা থেকে মদীনায় যাত্রা করেন। আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট তাঁর উটনী, দ্বিপ্রহরে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং মসজিদে নববীর স্থলে বসে পড়ে। আর তিনি আবূ আয়্যুব আনসারী (রা)-এর গৃহে গিয়ে অবতরণ করেন। এমনকি তিনি সেখানে এক বিরাট মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের পাশে পবিত্র সহধর্মিণীগণের জন্য হুজরা নির্মাণ করেন। নির্মাণ সমাপ্ত হলে রাসূল (সা) আবূ আয়্যুব (রা)-এর গৃহ ছেড়ে হুজরায় চলে আসেন। তাঁর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশে কতিপয় সাহাবীও তাঁর হুজরার আশপাশে গৃহ নির্মাণ করেন। পূর্বে মদীনা ছিল নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। তাঁর আগমনে তা পবিত্র হয়ে যায়। পূর্বে ছিল অন্ধকার, তাঁর আগমনে হয়ে উঠে আলোকিত। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন, তখন

সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, হাদীসটি সহীহ-গরীব। (যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৫৯)।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে মদীনার জ্বরকে জুহফার দিকে প্রেরণ করেন। বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, নবী (সা) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন পৃথিবীর মধ্যে বেশি মহামারী আক্রান্ত এলাকা ছিল মদীনা। তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন যে, আয় আল্লাহ ! মদীনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দাও এবং মহামারী জুহফার দিকে প্রেরণ কর। হাদীসটি সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়, যেমন 'ফাযাইলে মদীনা', 'কিতাবুল মারীয', 'কিতাবুদ দাওয়াত' প্রভৃতি অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে :

قال ابن اسحق وذكر ابن شهاب الزهرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله ﷺ لما قدم المدينة هو واصحابه اصابتهم الحتمى المدينة حتى جهد وامرضا وصرف الله ذلك عن نبيه ﷺ حتى كانوا ما يصلون الاوهم قعود قال فخرج عليهم رسول الله ﷺ وهم يصلون كذلك فقال لهم اعلموا ان صلوة القاعد على النصف من صلوة القائم قال فتجثم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل

"ইবন ইসহাক বলেন, ইবন শিহাব যুহরী (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জ্বরে এতই দুর্বল হয়ে পড়েন যে, বসে বসে নামায আদায় শুরু করেন। একদিন নবী (সা) চলার পথে দেখতে পান, লোকজন বসে নামায আদায় করছে। তিনি বলেন, বসে নামায আদায়ে দাঁড়িয়ে নামাযের অর্ধেক সওয়াব হয়। এ কথার পর সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের অত্যন্ত দুর্বল এবং অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কষ্ট সহ্য করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন যাতে দাঁড়ানোর সওয়াব ও ফযীলত লাভ করতে পারেন।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ২১৬)।

ليس دجال ولا طاعون يدخلها فحررها حصين

"মদীনায় না দাজ্জাল প্রবেশ করতে সক্ষম হবে, আর না মহামারী। মদীনা এ সমস্ত বিপদাপদের ক্ষেত্রে মযবুত দুর্গবিশেষ।"

যেমন বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মদীনার পথে পথে ফিরিশতাদের পাহারা রয়েছে, কাজেই এখানে দাজ্জালও প্রবেশ করতে পারবে না, আর মহামারীও না। ইমাম বুখারী এ হাদীসটি ফাযাইলে মদীনা, কিতাবুত-তিব এবং কিতাবুল ফিতান-এ বর্ণনা করেছেন।

اقام شهرا ثم بعد نزلت عليه اتمام الصلوة كملت

"এক মাস অবস্থানের পর মুকীম ব্যক্তির নামাযে দু' রাকাআত বৃদ্ধি পায় এবং মুসাফিরের নামায পূর্ববৎ দু'রাকআতই থেকে যায়, যেমন শুরু থেকে ছিল।"

যেমনটি বুখারী ও মুসলিমে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

اقام شهرا ربيع لصفر يبنى له مسجده

ووداع اليهود فى كتابه ما بينهم وبين اصحابه

"রবিউল আউয়াল মাস থেকে সফর মাস পর্যন্ত সময় মসজিদে নববী নির্মাণে ব্যস্ত থাকেন। আর এ সময়ের মধ্যেই তিনি সাহাবায়ে কিরাম এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে একটি চুক্তিনামা লিখান।" (যে প্রসঙ্গে আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব)।

وكان امر البدء بالاذان رويا ابن زيدا ولعام ثان

"আর আযানের সূচনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ (রা)-এর স্বপ্ন থেকেই হয়েছিল। এটা প্রথম অথবা দ্বিতীয় হিজরী সনের ঘটনা।" (এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে)।

মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে চুক্তি

মদীনা মুনাওয়ারায় অধিকাংশ ও বেশিরভাগ আবাস ছিল আওস ও খাযরাজ গোত্রের। তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। মদীনা এবং খায়বর ছিল তাদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং খায়বরে ছিল তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। এরা ছিল আহলে কিতাব এবং হিজায ভূমির মুশরিকদের তুলনায় শিক্ষিত। তাদের আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তারা শেষ নবী (সা)-এর অবস্থা এবং গুণাবলী সম্বন্ধে ছিল সম্যক অবগত। যেমন আল্লাহ্ বলেন يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ "তারা তাকে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদের।" কিন্তু তাদের মানসিকতা ভাল ছিল না। সত্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ, জেদ, জেনে শুনে অস্বীকৃতি ও অহংকার তাদের মধ্যে ছিল পুরোমাত্রায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন : وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسَهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا "ওরা অন্যায় ও উদ্ধত্যভাবে আমার নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল।"

নবী (সা) যতদিন মক্কা মুকাররামায় ছিলেন, সে সময়ও ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে কুরায়শদেরকে উস্কানী দিত। তাদেরকে শিখিয়ে দিত যে, তাঁকে আসহাবে কাহফ, যুল কারনায়ন এবং রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর ইত্যাদি। যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন, তখন তাদের বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন অধিক জ্বলে উঠলো। আর তারা বুঝতে পারলো যে, আমাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে গেছে। এ প্রবৃত্তির অনুসারী ও স্বেচ্ছাচারীরা তখন শত্রুতার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ করলো এবং 'আসহাবুস-সাবত'-এর রীতি গ্রহণ করলো। وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ "আর তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।"

ইয়াহূদী আলিম ও দরবেশদের মধ্যে যারা সৎ ও সাদাসিধে প্রকৃতির ছিলেন, তারা শেষ নবীর আগমন বার্তা প্রকাশ করেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। কিন্তু অধিকাংশই বিদ্বেষের পথ অনুসরণ করল এবং হিংসা ও শত্রুতা তাদের জন্য শত রাস্তা খুলে দিল। নবী (সা) তাদের হিংসা-বিদ্বেষ ও ফিতনা-ফাসাদের পথ রুদ্ধ করার লক্ষ্যে তাদের সাথে লিখিত চুক্তি করেন, যাতে তাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। কাজেই তিনি মদীনায় হিজরতের পাঁচ[1] মাস পর মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে একটি চুক্তি করেন। এ চুক্তিতে তাদেরকে তাদের ধর্ম ও তাদের সম্পত্তিতে বহাল রেখে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহে তাদের নিকট থেকে লিখিত অঙ্গীকারনামা নেয়া হয়। বিস্তারিত চুক্তিনামা 'সীরাতে ইবন হিশাম', (১খ. পৃ. ১৭৮) এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া', (৩খ. পৃ. ২২৪)-তে বর্ণিত হয়েছে। যার সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ :

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

এ লিখিত চুক্তিনামা উম্মী নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে কুরায়শ মুসলমান এবং ইয়াসরিবের ইয়াহূদীদের মধ্যে, যারা মুসলমানদের অধীনে এবং যারা তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিম্নের শর্তসমূহ পালন করবে ঃ

১. হত্যার প্রতিশোধ এবং বদলা গ্রহণের যে পদ্ধতি পূর্বকাল থেকে চলে আসছে, তা সুবিচার ও ইনসাফের সাথে যথারীতি বহাল থাকবে।

২. প্রত্যেক গোত্রকেই সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজ দলের পক্ষে মুক্তিপণ দিতে হবে। অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ের যতজন বন্দী থাকবে, তাদের উদ্ধারের জন্য মুক্তিপণ প্রদান তাদেরই যিম্মায় থাকবে।

৩. অত্যাচার, পাপাচার, শত্রুতা ও বিবাদের বিরুদ্ধে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না, যদিও অপরাধী কারো পুত্রও হোক না কেন।

৪. কোন মুসলমান কোন মুসলমানকে হত্যায় কোন কাফিরের বিরুদ্ধে সহায়তা করতে পারবে না। আর কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করারও অনুমতি থাকবে না।

৫. (বিপন্নকে আশ্রয়দানের ক্ষেত্রে) একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের যে অধিকার থাকবে, একজন সাধারণ মুসলমানেরও অনুরূপ অধিকার থাকবে।

৬. যে সমস্ত ইয়াহূদী মুসলমানদের অধীনে থাকবে, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তাবে। তাদের প্রতি না কোন অত্যাচার করা হবে, আর না তাদের শত্রুকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবে।

---

১. আসল চুক্তি তো 'সীরাতে ইবন হিশাম' এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া' (৩খ. পৃ.২২৪)-তে উল্লিখিত আছে। কিন্তু এতে তারিখের উল্লেখ নেই। হিজরতের পাঁচ মাস পর চুক্তির সময়কাল 'তারিখুল খামীস' (১খ. পৃ. ৩৫) থেকে নেয়া হয়েছে।

৭. কোন কাফির বা মুশরিকের এ অধিকার থাকবে না যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কাফিরের জীবন অথবা সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে; কিংবা (মক্কার) কুরায়শ এবং মুসলমানদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

৮. যুদ্ধের সময় ইয়াহূদীদেরকে জীবন ও সম্পদ দিয়ে মুসলমানদের সহায়তা করতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধ পক্ষকে সাহায্য করার অনুমতি থাকবে না।

৯. নবী করীম (সা)-এর কোন দুশমন যদি মদীনা আক্রমণ করে, তা হলে মহানবী (সা) কে সাহায্য করা ইয়াহূদীদের জন্য আবশ্যকীয়।

১০. যে সমস্ত গোত্র এ চুক্তি ও শপথে শরীক আছে, তাদের মধ্যে যদি কেউ এ চুক্তি ও শপথ থেকে পৃথক হতে চায়, তা হলে নবী করীম (সা)-এর অনুমতি ছাড়া পৃথক হতে পারবে না।

১১. কোন ফিতনাবাজকে সাহায্য করা কিংবা আশ্রয় দেয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কাউকে সাহায্য করে কিংবা আশ্রয়দান করে, তার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত ও ক্রোধ নিপতিত হবে। কিয়ামত পর্যন্ত তার কোন আমল কবূল হবে না।

১২. মুসলমানগণ যদি কারো সাথে সন্ধি করতে চায়, তা হলে ইয়াহূদীদের জন্যও ঐ সন্ধিতে অংশগ্রহণ করা আবশ্যকীয়।

১৩. যে কেউ কোন মুসলমানকে হত্যা করলে যদি তার সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলে এ হত্যার বদলা নেয়া হবে। তবে নিহতের অভিভাবক যদি রক্তপণ ইত্যাদির বিনিময় গ্রহণে সম্মত হয় তা হলে বদলা নেয়া হবে না।

১৪. যদি কখনো কোন ঝগড়া-বিবাদ কিংবা পারস্পরিক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তা হলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে পেশ করা হবে। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২২৪)।

যে সমস্ত গোত্রের সাথে নবী (সা) এ চুক্তি করেন, তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের তিনটি বড় গোত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, যারা মদীনা এবং মদীনার উপকণ্ঠে বাস করত। তারা ছিল ১. বনী কায়নুকা, ২. বনী নযীর এবং ৩. বনী কুরায়যা।[1] এ গোত্রগুলো যেহেতু নবী করীম (সা)-এর আনুগত্য থেকে পলায়ন করেছিল, সেহেতু তাদের জন্য তিনি এ চুক্তিনামা লিখান, যাতে তারা ফিতনা-ফাসাদ বিস্তার করতে না পারে। কিন্তু তিনটি গোত্রই একের পর এক এ চুক্তির লঙ্ঘন করে এবং ইসলামের সাথে শত্রুতা ও ইসলাম

---

১. ইবন ইসহাক বলেন ঃ ان النبى ﷺ وادع اليهود لما قدم المدينة امتعوا من اتباعه فكتب منهم كتابا وكانوا ثلاث قبائل قينقاع والنضير واستاصل بنى قريضة فنقص الثلاثة العهد طائفة بعد طائفة فمن على بنى قينقاع واجل بنى نضير واستاصل بنى قريضة ويناتى بيان ذلك كله مفصلا انشا الله تعالى (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ ৩১৪)।

বিরোধী ষড়যন্ত্রের সাথে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে শাস্তিযোগ্য করে তোলে। যে বিষয় সামনে যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় আসবে।

আবূ উবায়দ কিতাবুল আমওয়ালে বলেন, এ চুক্তিনামা জিযয়ার বিধান নাযিলের পূর্বে লিখিত হয়েছিল। ইসলাম সে সময়ে দুর্বল ছিল এবং নির্দেশ এও ছিল যে, ইয়াহূদীরা যদি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তা হলে গনীমতের কিছু অংশ তাদেরকেও দেয়া হবে। এ কারণে এ চুক্তিনামায় ইয়াহূদীদের জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয় যে, যুদ্ধের ব্যয় বহনে তাদেরও অংশ নিতে হবে।[১]

সতর্ক বাণী

চুক্তিনামার বাক্যাবলী দ্বারা এটা পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে যে, এ চুক্তি মুসলমান এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে এভাবে সম্পাদিত হয় যে, মুসলমানগণ আনুগত্য গ্রহণকারী এবং ইয়াহূদীরা তাদের অনুগত হবে। আর নবী করীম (সা) হবেন উভয়ের মধ্যে বিচারক। যখন কোন মতভেদ সৃষ্টি হবে, তখন তা নিষ্পত্তির জন্য নবী (সা)-এর সামনে উপস্থাপন করা হবে। এতে তিনি যে ফয়সালা করবেন, তা মেনে নেয়া হবে আবশ্যিক।

আপাতদৃষ্টিতে এ চুক্তিটি এ ধরনের, যেমনটি মুসলমান এবং যিম্মীদের মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু তা আসলে এমনটি নয়। কেননা হিজরত পরবর্তী সময় এটা ছিল ইসলামের শক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ প্রারম্ভিক কাল। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয় থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের শুরু হয়।

কিছু সংখ্যক মুসলমান, যারা (অবিভক্ত ভারতে তৎকালীন) কংগ্রেসের সাথে ঐক্য গঠনের প্রবক্তা, তারা এরূপ ঐক্যের সপক্ষে আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাহতে কোন সুযোগ না পেয়ে মদীনার চুক্তিনামাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা শুরু করেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এ চুক্তির সমুদয় ধারা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ কথার সাক্ষ্য যে, ইসলামের নির্দেশ বিজয়ী হবে এবং অমুসলিম সম্প্রদায় ইসলামী হুকুমতের অধীনে থাকবে, যেমনটি 'সিয়ারুল কাবীর' প্রভৃতি গ্রন্থে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রবক্তাদের এ এক নব আবিষ্কার, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি নেই।

প্রথম হিজরী সনের বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. মদীনায় আগমনের পর কুবায় অবস্থানকালে নবী (সা) যার গৃহে অবস্থান করেছিলেন, সেই কুলসুম ইবন হাদম ইনতিকাল করেন।

২. মসজিদে নববী নির্মাণ সবে শেষ করেছেন, বনী নাজ্জারের নকীব হযরত সা'দ ইবন যুরারা (রা) ইনতিকাল করেন। বনী নাজ্জার নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত

১. রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ১৭।

হয়ে অপর কাউকে নকীব নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করে। তিনি (সা) বললেন, তোমরা আমার মাতুল গোষ্ঠীর, আমি তোমাদেরই একজন। আমিই তোমাদের নকীব।[১]

তাঁর নকীব হওয়াটা ছিল বনী নাজ্জারের জন্য গৌরবের ব্যাপার। কাজেই এ জন্যে তারা গর্ববোধ করত।[২]

৩. এ বছরেই মক্কার মুশরিকদের দু'জন সর্দার, ওলীদ ইবন মুগীরা এবং মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবন আস (রা)-এর পিতা আস ইবন ওয়ায়েল মৃত্যুবরণ করে।[৩]

৪. মদীনা পৌঁছার আট মাস পর এ বছরের শাওয়াল মাসে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে গৃহে বরণ করে নেন, যাঁকে হযরত খাদীজা (রা)-এর ইনতিকালের পর হিজরতের পূর্বেই বিয়ে করেছিলেন।

বিয়ে করার সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ছয় অথবা সাত বছর এবং বাসরকালে বয়স হয়েছিল নয় বছর। কারো কারো মতে হিজরতের আঠার মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করেছেন।[৪]

৫. হিজরতের পর যখন মুসলমানগণ মদীনা আগমন করেন, তখন মদীনার সমস্ত কূপের পানি ছিল লবণাক্ত। একমাত্র 'বিরে রুমা' নামক কূপটির পানিই মিষ্ট ছিল, যা ছিল এক ইয়াহূদীর মালিকানাধীন। সে বিনামূল্যে পানি দিত না। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য পানি সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়ল। হযরত উসমান গনী (রা) 'বিরে রুমা' খরিদ করে "জান্নাতের একটি ঝর্ণার বিনিময়ে" নবী (সা)-এর হাতে সোপর্দ করেন এবং মুসলমানদের জন্য তা ওয়াক্ফ করে দেন, যেন যে কোন লোক ইচ্ছে করলে এ থেকে পানি নিতে পারে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

হাদীসটি প্রসিদ্ধ। ইমাম তিরমিযী ছাড়াও অপরাপর হাদীসবেত্তাগণ এটি উদ্ধৃত করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য 'কানযুল উম্মাল' দেখুন।

হযরত উসমান গনী (রা)-এর এ ঘটনা ইমাম বুখারী সাধারণভাবে 'কিতাবুল মুসাকাত' ও 'কিতাবুল উকূফ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[৫]

হযরত সারমা ইবন আবূ আনাস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত সারমা ইবন আবূ আনাস আনসারী নাজ্জারী (রা) প্রথম থেকেই তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট এবং কুফর শিরক থেকে বিরক্ত ও বিদ্বিষ্ট ছিলেন। এক সময় খ্রিস্টধর্মে

---

১. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৭০।

২. তারীখে তাবারী, ২খ. পৃ. ২৫৭।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৩৭২।

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছেও করেছিলেন; কিন্তু (সম্ভবত খ্রিস্টানদের শিরকী ধ্যান-ধারণার কারণে) সে ইচ্ছে বাতিল করেন।

তিনি খুবই ইবাদত গুযার ও পরহেযগার ছিলেন। দরবেশ সুলভ জীবন যাপন করতেন, কখনো পাতলা কাপড় পরতেন না, সব সময় মোটা কাপড় পরিধান করতেন।

ইবাদত করার জন্য একটি বিশেষ কক্ষ নির্মাণ করিয়েছিলেন যেখানে ঋতুবতী স্ত্রীলোক এবং অপবিত্র ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল না। সারমা ইবন আবূ আনাস (রা) বলতেন, আমি ইবরাহীম (আ)-এর প্রভুর ইবাদত করি।

তিনি সমসাময়িক কালের বড় কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা ছিল বিজ্ঞোচিত উপদেশমালায় সমৃদ্ধ।[1]

যখন নবী করীম (সা) হিজরত করে মদীনা আগমন করেন, তখন সারমা খুবই বয়ঃবৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। নবী (সা)-এর খিদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ আবৃত্তি করেন :

ثوى فى قريش بضع عشرة حجة — يذكر لو يلقى صديقا مواتيا
ويعرض فى أهل الموسم نفسه — فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا
فلما اتانا اظهر الله دينه — فاصبح مسرور بطيبة راضيا
والقى صديقا واطمانت به النوى — وكان له عونا من الله باديا
يقص لنا ما قال نوح لقومه — وما قال موسى اذا جاب المناديا
فاصبح لا يخشى من الناس واحدا — قريبا ولا يخشى من الناس نائيا
بذلناله الاموال من جل مالنا — وانفسنا عند الوعى والتاسيا
ونعلم ان الله لا شئى غيره — ونعلم ان الله افضل هاديا
نعادى الذى عادى من الناس كلهم — جميعا وان كان الحبيب مصافيا

"তিনি কুরায়শদের মাঝে (মক্কা মুকাররামায়) দশ বছরেরও অধিক অবস্থান করেন এবং লোকজনকে সদুপদেশ দান করেন। আর মনে মনে এ কামনা করেন, যদি কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী মিলে যায়।

আর হজ্জের মওসুমে নিজেকে উপস্থাপন করে বলতেন, আমাকে কেউ এখান থেকে নিয়ে যাও, আমাকে আশ্রয় দাও। কিন্তু কোন আশ্রয়দানকারী এবং সাড়াদানকারী পাওয়া গেল না।

---

১. ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে দুটি কাসিদা বর্ণনা করেছেন। সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠক 'সীরাতে ইবন হিশাম' (১খ. পৃ. ১৮২) দেখে নিন।

"অতঃপর তিনি যখন আমাদের কাছে এলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দীনকে বিজয় দান করলেন আর মদীনার প্রতি তিনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হলেন। আর এখানে এসে তিনি বন্ধুও পেলেন এবং মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছেদ ব্যথায় সান্ত্বনাও লাভ করলেন। আর তাঁর বন্ধুগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য প্রকাশ্য সাহায্য ও সহায়তাকারী হলেন।

"তিনি আমাদের কাছে ঐ সব কথা বলেন, যা নূহ (আ) এবং মূসা (আ) তাঁদের সম্প্রদায়কে বলতেন। আর এখানে এসে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁর থাকল না নিকট কিংবা দূরবর্তী কোন ভীতি।

"আমরা আমাদের সমুদয় সম্পদ তাঁর জন্য উৎসর্গ করেছি। যুদ্ধের ময়দানেও তাঁর জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করব। আর আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই। আর এটাও জানি যে, আল্লাহই সর্বোত্তম হিদায়াতকারী ও শক্তি সামর্থ্য দাতা। নিশ্চয়ই আমরা সেই ব্যক্তির দুশমন, যে নবী মুস্তফা (সা)-এর দুশমন যদিও কেউ হোক না আমাদের অতীব প্রিয় স্বজন।"

দ্বিতীয় হিজরী সন

কিবলা পরিবর্তন : মহানবী (সা) যতদিন পর্যন্ত মক্কায় ছিলেন, ততদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতেন। তবে তা এভাবে যে, বায়তুল্লাহও যেন সামনে থাকে। যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন উভয় কিবলা একসাথে অনুসরণের সুযোগ আর থাকলো না। এ জন্যে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী ষোল অথবা সতের মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকেন।

কিবলা পরিবর্তনের বিধান নাযিলের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা নবীজির মনে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায়ের সুপ্ত বাসনা সৃষ্টি করে দেন। কাজেই তিনি এ উদ্দেশে বার বার আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাতেন যে, কখন কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের হুকুম নাযিল হবে। সুতরাং দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসের মাঝামাঝি এ বিধান নাযিল হয় : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ "অতঃপর তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও।"

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের দ্বিতীয় পারার শুরুতেই কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ এবং এর রহস্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। পাঠকগণ, তাফসীর গ্রন্থসমূহ দেখে নিন।

সুফফা ও সুফফার অধিবাসীগণ

কিবলা পরিবর্তনের পর যখন মসজিদে নববীর মিহরাব বায়তুল্লাহর দিকে হলো, তখন প্রথম কিবলার দিকটিতে দেয়াল তোলা হলো এবং এর সন্নিহিত স্থানে ঐ দরিদ্র

নিঃস্ব ব্যক্তিদের অবস্থানের জন্য ছেড়ে দেয়া হলো যাঁদের কোন ঠিকানা বা ঘরবাড়ি ছিল না। স্থানটি 'সুফফা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ছায়া ঢাকা স্থানকে প্রকৃতপক্ষে সুফফা বলা হয়। ঐ সব অসহায় মুসলমান এবং শোকরগুযার দরিদ্র ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা নিজেদের দারিদ্র্যে কেবল ধৈর্যই ধারণ করতেন না; বরং আমীর ও ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা বেশি শোকরগুযার ও আত্মতৃপ্ত ছিলেন। যখন হাদীসে কুদসী ও মহানবীর কথা শোনার জন্য নবীর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন সেখানেই পড়ে থাকতেন। মানুষ এ মহাত্মাগণকে 'আসহাবে সুফফা' নামেই স্মরণ করতেন। যেন এটা সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী প্রদর্শনকারী দরিদ্র নবীরই বৈঠকখানা ছিল, যিনি অল্পে তুষ্টি ও দারিদ্র্যকে পৃথিবীর বাদশাহীর উপর প্রাধান্য দিতেন।

আসহাবে সুফফা ছিল আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার প্রতীক ও একনিষ্ঠতার অধিকারী একটি দল। তাঁরা দিবারাত্র আত্মশুদ্ধি এবং কিতাব ও হিকমত, বস্তু ও বিষয় সম্পর্কিত সূক্ষ্মভাষী শেখার উদ্দেশে নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতেন। এ ছাড়া না ছিল তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ, আর না ছিল কৃষি কাজের প্রতি কোন উৎসাহ।

এ মহাত্মাগণ নিজেদের চোখকে কেবল নবী (সা) কে দেখার জন্য, দু'কানকে তাঁর পবিত্র বাক্যাবলী শোনার জন্য এবং দেহকে তাঁর সাহচর্যে অবস্থান ও তাঁকে সাহায্য করার জন্য ওয়াক্ফ ও নিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

وان حدثوا عنها فكلى مسامع وكلى اذا حدثتهم السن تتلو

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি এমন সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, যাঁদের চাদর পর্যন্ত ছিল না, শুধু লুঙ্গি ছিল অথবা কম্বল, যা তাঁরা গলার সাথে বেঁধে রাখতেন। আর কম্বলও এত ছোট ছিল যে, কারো পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছত, আর কারো টাখনু পর্যন্ত। আর তা তাঁরা হাত দিয়ে ধরে রাখতেন, যাতে সতর খুলে না যায়। (সহীহ বুখারী, ১খ, পৃ, ৬৩, نوم الرجال فى المسجد অধ্যায়)।

হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) বলেন, আমিও আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। আমাদের কারো কাছে পূর্ণ একটি কাপড়ও ছিল না। ঘামের দরুন শরীরে

---

১. হাফিয ইবন তাইমিয়া (র) তাঁর 'আল-জাওয়াবুস-সহীহ' গ্রন্থের কোন এক স্থানে নবী করীম (সা)-কে পূর্ববর্তী নবী (আ) গণ অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান ছিলেন। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাদের নবী করীম (সা) হযরত সুলায়মান (আ) অপেক্ষা অধিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এ জন্যে যে, সুলায়মান (আ) ছিলেন নবী বাদশাহ, আর আমাদের নবী ছিলেন নবী ফকীর। যেমনটি হযরত মূসা (আ) বলেছেন, رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ "হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে, আমি তার কাঙ্গাল।" (সূরা কাসাস ঃ ২৪)

ময়লা জমে যেত (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১খ. পৃ. ৩৪১), যা আল্লাহ্র দরবারে সহস্র পবিত্রতার চেয়ে অধিক প্রিয় ও পসন্দনীয় ছিল। বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই বুযুর্গগণকে ঐ ধূলি-ধূসর মাথা ও নোংরা শরীর নিয়ে থাকতে হতো যে, যদি তাঁরা কোন বিষয়ে আল্লাহ্র কসম করে কিছু বলতেন, আল্লাহ্ তখন তাঁর কসম পুরা করতেন।

মুজাহিদ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, ঐ আল্লাহ্ পাকের শপথ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি কোন কোন সময় ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের বুক ও পেট মাটিতে লাগিয়ে রাখতাম (যাতে মাটির আর্দ্রতা ও শীতলতার দরুন ক্ষুধার জ্বালা কিছুটা হ্রাস পায়)। আর কোন কোন সময় পেটে পাথর বাঁধতাম, যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারি।

একদিন আমি রাস্তার মাথায় গিয়ে বসে পড়লাম। ইত্যবসরে হযরত আবূ বকর (রা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি আমার অবস্থা ও প্রয়োজন অনুভব করে খাওয়ানোর জন্য সাথে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আবূ বকর চলে গেলেন (উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি)।

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রা) অতিক্রম করলেন। তাঁকেও আমি একইভাবে কুরআনের আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনিও চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত আবুল কাসেম নবী মুস্তাফা (সা) (যাঁকে আল্লাহ্ যুল জালাল কল্যাণ ও বরকত বন্টন করার জন্য প্রেরণ করেছেন), ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। আমাকে দেখামাত্র তিনি ব্যাপার বুঝে ফেললেন। মুচকি হেসে বললেন, ওহে আবূ হুর (অর্থাৎ আবূ হুরায়রা)।

আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন, আমার সাথে চলে এসো। আমি তাঁর সঙ্গী হলাম। রাসূল (সা) ঘরে পৌঁছলেন। দেখলেন, এক পেয়ালা দুধ রাখা আছে। জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ কোত্থেকে এলো ? ঘর থেকে বলা হলো, অমুক আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছে। তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবূ হুরায়রা, আসহাবে সুফফাকে ডাকো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আসহাবে সুফফা ছিলেন ইসলামের মেহমান। তাঁদের না ছিল ঘর আর না ছিল কোন সম্পদ। মোট কথা, তাঁদের কোন আশ্রয়ই ছিল না। নবী (সা)-এর কাছে যখন কোন সদকা আসত, তিনি আসহাবে সুফফার কাছে তা পাঠিয়ে দিতেন, নিজের জন্য কিছুই রাখতেন না (কেননা সদকা তাঁর জন্য নিষিদ্ধ ছিল)। আর যদি হাদিয়া আসত, তা হলে নিজেও কিছু গ্রহণ করতেন এবং আসহাবে সুফফাকেও তাতে শরীক করতেন। এই সময়ে তাঁর নির্দেশটি যে, "আসহাবে সুফফাকে ডাকো" আমার অন্তরে কিছুটা কষ্টের সৃষ্টি করল এবং মনে মনে বললাম, মাত্র এক পেয়ালা দুধ, এ কি আসহাবে সুফফার জন্য যথেষ্ট হবে ? এর সবচে' বেশি

হকদার তো ছিলাম আমিই—যে কিছুটা পান করে শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করতাম। এখন আসহাবে সুফফা আসার পর তো তিনি আমাকেই বন্টন করার নির্দেশ দেবেন, আর বন্টনের পর এ আশা নেই যে, আমার জন্য এর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য না করে উপায় ছিল না।

সুতরাং আসহাবে সুফফাকে ডেকে আনলাম এবং তাঁর নির্দেশে এক এক করে তাঁদের ডাকলাম। সবাই তৃপ্ত হয়ে গেলেন। তখন নবী (সা) আমার প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, কেবল আমি আর তুমি অবশিষ্ট আছি। আমি বললাম, সম্পূর্ণ ঠিক। তিনি বললেন, বসে যাও এবং পান কর। আমি পান করা শুরু করলাম আর তিনি বার বার বলতে থাকলেন, আরো পান কর, আরো পান কর। এমন কি আমি বলতে বাধ্য হলাম, কসম ঐ আল্লাহর, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, পেটে আর কোন জায়গা নেই। তিনি আমার হাত থেকে পেয়ালাটি গ্রহণ করলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করে ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে যা অবশিষ্ট ছিল, তা পান করে ফেললেন (বুখারী শরীফের কিতাবুর রিকাক-এ كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে)।

হযরত আবদুর রাহমান ইবন আবূ বকর (রা) বলেন,[১] আসহাবে সুফফাগণ ছিলেন নিঃস্ব। রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণের মধ্যে তাঁদেরকে ভাগ করে দিতেন এভাবে যে, যার কাছে দু'জনের খাদ্য আছে, সে একজন এবং যার কাছে তিনজনের খাদ্য আছে, সে চতুর্থজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং এ অনুপাতে (বুখারী শরীফ)।

মুহাম্মদ ইবন সীরীন বলেন, যখন সন্ধ্যা হতো, তখন তিনি আসহাবে সুফফার সদস্যগণকে জনগণের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কেউ দু'জনকে নিয়ে যেত, কেউ তিনজনকে এবং এভাবে। আর হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) তো আশিজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং তাঁদের খানা খাওয়াতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ,আমিও আসহাবে সুফফার একজন ছিলাম। যখন সন্ধ্যা হতো, আমরা সবাই নবী (সা)-এর কাছে চলে যেতাম। তিনি এক একজন, দু' দু'জন করে ধনী সাহাবাগণের কাছে সোপর্দ করতেন। যারা অবশিষ্ট থাকত, তাদের তিনি নিজের সাথে খাবারে শরীক করতেন। খাওয়ার পর আমরা রাতে মসজিদে ঘুমাতাম (ফাতহুল বারী, كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়)।

মসজিদে নববীর দুটি খুঁটির মধ্যে একটি রশি বাঁধা থাকত। আনসার সাহাবীগণ বাগান থেকে থোকা থোকা ফল এনে আসহাবে সুফফার জন্য তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন।

---

১. হযরত আবদুর রাহমান ইবন আবূ বকর (রা)-এর এ হাদীস ইমাম বুখারী তাঁর 'জামিউস-সহীহ' গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেছেন। যেমন, السمر مع الاهل وضيف অধ্যায় ১খ. পৃ. ৮৪ এবং علامت النبوة فى الاسلام অধ্যায়, ১০খ. পৃ. ৫০৬।

আসহাবে সুফফা তা লাঠির দ্বারা নামিয়ে খেতেন। হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা) এর ব্যবস্থাপনা ও দেখাশোনা করতেন। (ওফা আল-ওফা, ১খ. পৃ. ৩২৪)।

হযরত আউফ ইবন মালিক আশজাঈ (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) এলেন, তাঁর পবিত্র হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি দেখলেন, একটি নষ্ট থোকা ঝুলে আছে। তিনি সেই নষ্ট থোকায় লাঠি লাগিয়ে বললেন, এ সদকাকারী ইচ্ছে করলে এর চেয়ে উত্তম থোকা সদকা করতে পারত। (ইমাম নাসাঈ হাদীসটি[১] বর্ণনা করেছেন। এর সনদ শক্তিশালী)।

অপর একটি হাদীসে তিনি (সা) নির্দেশ দেন যে, প্রত্যেক বাগানের মালিক একটি করে থোকা এনে দরিদ্রদের জন্য ঝুলিয়ে রাখবে (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪৩১, القسمة وتعليق القنو فى المسجد অধ্যায়)।

হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন

فى كل عشرة اقناء قنو بوضع فى المسجد للمساكين

"প্রতি দশটি থোকার মধ্যে একটি থোকা মসজিদে এনে মিসকীনদের জন্য রেখে যাওয়া জরুরী" (তাহাবী, ২খ. পৃ. ৩১৩, العرنا অধ্যায়)। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত।

মাসআলা : ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তের জন্য পানি এবং খাদ্যদ্রব্য এনে রাখা একটি পসন্দনীয় ও উত্তম কাজ।

আবদুল্লাহ ইবন শাকীক বলেন, আমি এক বছর হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর কাছে ছিলাম। একদিন তিনি বলছিলেন, আহা! যদি তুমি আমাদের সময়টা দেখতে, যখন পর পর কয়েকদিন আমাদের এমন কাটত যে, এতটুকু খাদ্যও জুটত না, যা দ্বারা মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারি। এমন কি কোমরে পাথর বাঁধতাম, যাতে মেরুদণ্ড সোজা রাখা যায় (ইমাম আহমদ বর্ণিত, ফাতহুল বারী, ১১খ. পৃ.২৪২)।

হযরত ফুযালা ইবন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কোন কোন সময় আসহাবে সুফফা ক্ষুধার যন্ত্রণায় নামাযরত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। বাইরে থেকে যদি কোন বেদুঈন কিংবা গ্রাম্য লোক আসত, তা হলে তাঁকে মস্তিষ্ক বিকৃত উম্মাদ মনে করত।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে আসতেন এবং নিম্নোক্ত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন :

لو تعلمون مالكم عند الله لاحببتم ان تزدادوا فقرا وحاجة

---

১. হাফিয আসকালানী বলেন, যদিও এ হাদীসটির সনদ সহীহ, কিন্তু বুখারীর শর্তানুযায়ী নয়। এ জন্যে ইমাম বুখারী হাদীসটি উদ্ধৃত করেন নি, কিন্তু তরজমাতুল বাব-এ القسمت وتعليق القنو فى المسجد শীর্ষক অধ্যায়ে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যেমনটি ইমাম হুমাম-এর অভ্যেস।

"যদি তোমরা জানতে যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কি প্রস্তুত রয়েছে, তা হলে তোমরা অবশ্যই কামনা করতে আমাদের দারিদ্র্য ও উপবাস থাকা আরো বেড়ে যাক।" (ওফা উল-ওফা, ১খ. পৃ.৩২২; উপরন্তু আবূ নুয়ায়ম-এর 'হিলয়া' গ্রন্থে সংক্ষেপে, ১খ. পৃ. ২৩৯)।

সুফফাবাসীগণের গুণাবলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)

হযরত ইয়ায ইবন গানাম (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে বাছাইকৃত, পসন্দনীয় এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি তারাই, যাদের ব্যাপারে মালা-ই-আ'লা তথা নৈকট্য-ধন্য ফিরিশতাগণ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা বাহ্যত আল্লাহ তা'আলার বিশাল অনুগ্রহ স্মরণ করে হাসে, আর অন্তরে আল্লাহর আযাব ও ভয়াবহ শাস্তির কথা স্মরণ করে কাঁদে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্র গৃহ অর্থাৎ মসজিদসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করে।

আশা এবং ভীতির সাথে মুখে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, আর অন্তরে তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহ পোষণ করে। মানুষের উপর তাদের বোঝা খুবই হালকা এবং তাদের নিজেদের আত্মার উপর তারা খুবই ভারী ও দুর্বহ। তারা যমীনে খুবই ধীরে ও আরামের সাথে পা ফেলে চলে, বিলাসিতা এবং অহমিকার সাথে চলে না। পিপীলিকার মত চলে, অর্থাৎ তাদের চলায় বিনয় ও দারিদ্র্য প্রকাশ পায়।

তারা কুরআন তিলাওয়াত করে, পুরাতন ও ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে, সব সময় আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টি সব সময় তাদের হিফাযত করে। তাদের আত্মা পৃথিবীতে থাকে কিন্তু মন থাকে আখিরাতের দিকে। আখিরাত ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তা নেই এবং সব সময় তারা আখিরাত ও কবরের প্রস্তুতি গ্রহণে রত থাকে।

ازدروں شوآشنا وازبروں بیگانه باش

این چنیں زیبا روش کم مي بود اندر جهان

পরে রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ "এ ওয়াদা ঐ সমস্ত ব্যক্তির জন্য, যারা আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং আমার সতর্ক বাণীকে ভয় করে।"[১]

সুফফাবাসীগণের নাম

আসহাবে সুফফা বা সুফফাবাসীগণের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতো। আরিফ সুহরাওয়ার্দী তাঁর 'আওয়ারিফ' গ্রন্থে লিখেছেন, আসহাবে সুফফার সংখ্যা চারশ' পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

---

১. হিলয়াতুল আউলিয়া, ১খ. পৃ. ১৬।

আবূ আবদুর রাহমান সুলামী, ইবনুল আরাবী এবং হাকিম তাঁদের নাম এবং অবস্থাসমূহ একত্র করার ব্যবস্থা করেন। হাফিয আবূ নুয়াইম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া'[১] গ্রন্থে এ সব কিছু একত্র করেছেন এবং সংসার ত্যাগী ও সুফফাবাসী সাহাবীগণের বিস্তারিত অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। (দ্র. ফাতহুল বারী, ১১খ. পৃ. ২৪৫ كيف كان عيش النبى ﷺ واصحابه تخليهم من الدنيا অধ্যায়)।

তাঁদের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা),
২. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসীর আবূ ইয়াকযান (রা),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা),
৪. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা),
৫. হযরত খাব্বাব ইবন আরাত (রা),
৬. হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা),
৭. হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা),
৮. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা), [হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা)-এর ভাই],
৯. হযরত আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হুসায়ন আদাবী (রা),
১০. হযরত আবূ কাবশাহ (রা), [রাসূল (সা)-এর গোলাম],
১১. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা),
১২. হযরত আবূ আবস ইবন জুবায়র (রা),
১৩. হযরত সালিম (রা), [হযরত আবূ হুযায়ফা (রা)-এর মুক্ত দাস],
১৪. হযরত মিসতাহ ইবন উসাসা (রা),
১৫. হযরত উকাশা ইবন মিহসান (রা),
১৬. হযরত মাসউদ ইবন রবী' (রা),
১৭. হযরত উমায়র ইবন আওফ (রা),
১৮. হযরত উয়ায়ম ইবন সায়েদাহ (রা),
১৯. হযরত আবূ লুবাবা (রা),
২০. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা),
২১. হযরত আবুল বাশার কা'ব ইবন আমর (রা),
২২. হযরত খুবায়ব ইবন সায়্যাফ (রা),
২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা),
২৪. হযরত জুনদুব ইবন জানাদাহ, আবূ যর গিফারী (রা),
২৫. হযরত উতবা ইবন মাসউদ হুযালী (রা),

---

১. মিসরে মুদ্রিত।

২৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা), [বিয়ের পূর্বে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) সুফফাবাসীদের সাথে থাকতেন এবং তাঁদের সাথেই মসজিদে রাত কাটাতেন]।
২৭. হযরত সালমান ফারসী (রা),
২৮. হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা),
২৯. হযরত আবুদ-দারদা উয়ায়মির ইবন আমির (রা),
৩০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ জুহানী (রা),
৩১. হযরত হাজ্জাজ ইবন আমর আসলামী (রা),
৩২. হযরত আবূ হুরায়রা দাওসী (রা),
৩৩. হযরত সাওবান (রা), [রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস],
৩৪. হযরত মু'আয ইবন হারিস (রা),
৩৫. হযরত সায়িব ইবন খাল্লাদ (রা),
৩৬. হযরত সাবিত ইবন ওয়াদিয়া (রা)। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১৮)।

রমযানের রোযা

একই বছরের শা'বান মাসের শেষ দশকে রমযানের রোযা ফরয হয় এবং এ আয়াত নাযিল হয় :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"রমযান মাস। এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে, তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মদীনায় আগমন করে আশূরার রোযা অর্থাৎ দশই মুহররমের রোযা পালনের নির্দেশ দেন। রমযানের রোযা যখন ফরয হলো, তখন ইরশাদ করলেন, এখন আশূরার রোযার ব্যাপারটি ইচ্ছাধীন, কেউ চাইলে পালন করুক, আর না চাইলে ছেড়ে দিক। (বুখারী শরীফ)।

হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সা) আশূরার দিন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, মানুষের মাঝে ঘোষণা দিয়ে দাও যে, যে ব্যক্তি এখনো খায় নি, সে যেন রোযা রাখে। আর যে ব্যক্তি খেয়ে ফেলেছে, সেও যেন দিনের অবশিষ্টাংশ রোযাদারের ন্যায় না খেয়ে কাটায়।

(বুখারী শরীফ, اذا نوى بالنهار صوما অধ্যায়; বিস্তারিত জানার জন্য 'ফাতহুল বারী' এবং 'তাহাবী' দেখুন)।

ফিতরা এবং ঈদের নামায

রমযান মাস শেষ হতে দু'দিন মাত্র বাকি ছিল। এ সময় ঈদের নামায এবং ফিতরা আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হলো এবং এ আয়াত নাযিল হলো :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি সাফল্য লাভ করবে যে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও রীতিমতো সালাত কায়েম করে।"

(সূরা আলা : ১৪-১৫)

হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) এবং আবুল আলিয়া এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, 'ঐ ব্যক্তিই সাফল্য অর্জন করবে, যে ফিতরা আদায় করেছে এবং ঈদের নামায আদায় করেছে।'[১]

ঈদুল আযহা এবং কুরবানী

আর এ বছরেই ঈদুল আযহা এবং কুরবানীর নির্দেশ আসে এবং এ আয়াত নাযিল হয় ঃ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

"অতএব তোমার প্রভুর জন্য (ঈদের) নামায আদায় কর এবং কুরবানী কর।"

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, এ আয়াত দ্বারা ঈদুল আযহার নামায এবং কুরবানী বুঝানো হয়েছে। (আল্লামা জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ৩খ. পৃ. ৪৭৫)।

দরূদ শরীফ

হযরত আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর দরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশও দ্বিতীয় হিজরীতে নাযিল হয়। আর কেউ বলেন, শবে মি'রাজে এ নির্দেশ হয়েছে (ফাতহুল বারী, তাফসীরে সূরা আহযাব, ৮খ. পৃ. ৪১১)।

সম্পদের যাকাত

সম্পদের বার্ষিক যাকাত আদায় কখন ফরয হয়েছে এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। জমহূর আলিমগণের বক্তব্য হলো, এটা হিজরতের পর ফরয হয়েছে। কেউ বলেন প্রথম হিজরীতে, আর কেউ বলেন দ্বিতীয় হিজরীতে রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর এটা ফরয হয়েছে।

মুসনাদে আহমদ, সহীহ ইবন খুযায়মা, নাসাঈ এবং ইবন মাজাহ-এ হযরত কায়স ইবন সা'দ (রা) সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, যাকাতের বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে ফিতরা দানের নির্দেশ দেন। ইমাম ইবন খুযায়মা বলেন, সম্পদের যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয হয়েছে। যেমনটি আবিসিনিয়ায়

---

১. আল্লামা জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ৩খ. পৃ. ৪৭৩।

হিজরতের ঘটনায় হযরত উম্মে সালমা (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, নাজ্জাশী যখন হযরত জা'ফর (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নবী কি নির্দেশ দেন ? তখন হযরত জা'ফর (রা) বলেন :

اِنَّهُ يَاْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّيَامِ "তিনি আমাদেরকে নামায, যাকাত এবং রোযার নির্দেশ দেন।"

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

وفيه فرض الصوم والزكاة — للفطر والعيدين بالصلاة

بخطبتين بعد والاضحية — كذا زكوة مالهم والقبله

للمسجد الحرام والبناء — بعايش كذلك الزهراء

"আর ঐ দ্বিতীয় বর্ষে রমযানের রোযা, ফিতরা অর্থাৎ সদকা এবং ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায শুরু হয়। আর ঈদের নামাযের পর দু' খুতবা, কুরবানী এবং সম্পদের যাকাতও এ বছরেই শুরু হয় এবং এ বছরেই কিবলা পরিবর্তনের হুকুম নাযিল হয়। এ বছরেই তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে যথারীতি দাম্পত্য জীবন যাপন করেন এবং হযরত আলী (রা)-এর সাথে হযরত ফাতিমা (রা) কে বিয়ে দেন।" মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

[ছবি : বাহরায়নের গভর্নর মুনযিরের প্রতি নবী (সা)-এর পত্র]

ইফা (উন্নয়ন)/ ২০০৯-২০১০/অঃ সঃ/ ৪৫১৫—৩,২৫০

গ্রন্থকার পরিচিতি

হাফিয, আলিম, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও লেখক মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী (র) ১৮৯৯ খ্রি. ভূপালে এক ঐতিহ্যবাহী আলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারটির আদি নিবাস কান্ধালাহ হলেও তাঁর পিতা বিশিষ্ট আলিম ও হাফিয মুহাম্মদ ইসমাঈল কান্ধলবী চাকুরীর সুবাদে তৎকালে ভূপালে অবস্থান করছিলেন।
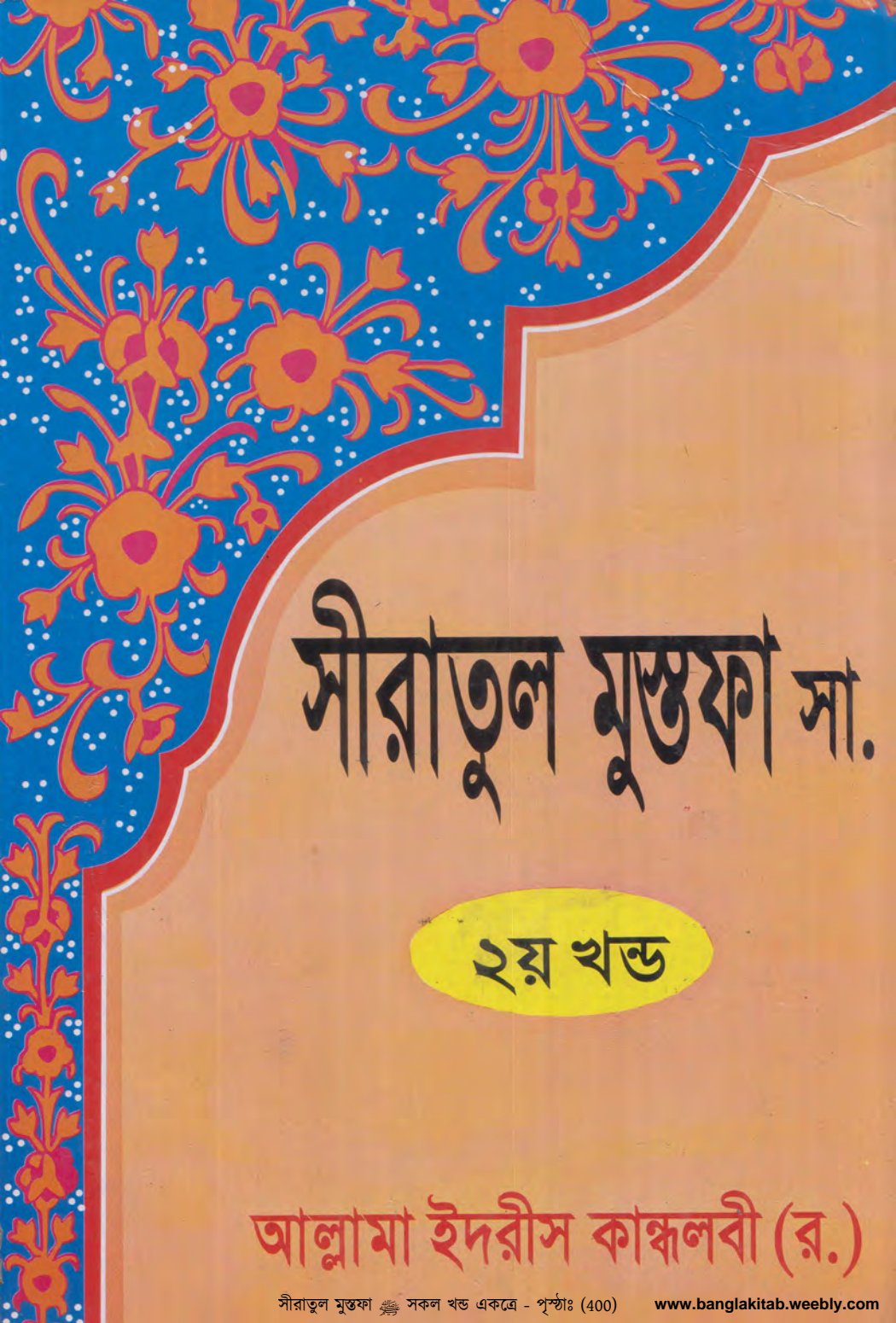
মাওলানা ইদ্রিসের জন্মের পর তাঁর পিতা চাকুরী ভূপালের ত্যাগ করেন এবং কান্ধালায় ফিরে এসে এক মসজিদে অবৈতনিকভাবে হাদীসের দরস দানে নিয়োজিত হন। মাত্র নয় বছর বয়সে পবিত্র কুরআন হিফয সমাপ্তের পর তাঁর পিতা তাঁকে থানা ভবনে এনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর তত্ত্বাবধানে মাদরাসা-ই-আশরাফিয়াতে ভর্তি করেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর মাওলানা থানবী তাঁকে সাহারানপুরে মাদরাসা আরাবিয়া মাযাহিরুল উলূমে ভর্তি করেন।

১৯১৯ খ্রি. মাদরাসা আমীনিয়ায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। মাত্র এক বছর পর তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে মুদাররিস হিসেবে তাফসীর ও হাদীসের অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রি. তিনি শায়খুত-তাফসীর পদলাভ করেন এবং ১৯২৯ খ্রি. দেওবন্দের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য) চলে যান। সেখানে তিনি 'আত-তা'লিকুস-সাবীহ শারহ মিশকাতিল মাসাবীহ' রচনা করেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটি তাঁর রচিত প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থটি ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়াও মিসর, সিরিয়া ইরাক প্রভৃতি দেশের আলিমগণের নিকট মিশকাত শরীফের একটি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৩৮ খ্রি. দারুল উলূম দেওবন্দে তাফসীর বিভাগ খোলা হলে তাঁকে শায়খুত তাফসীর হিসেবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি ইলমের খিদমতের উদ্দেশে হায়দরাবাদে মাসিক দুইশত পঞ্চাশ টাকা আয় পরিত্যাগ করে মাত্র সত্তর টাকা বেতনে এ পদে যোগদান করেন। প্রায় দশ বছর অধ্যাপনার পর তিনি উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ভাওয়ালপুর জামেয়া আব্বাসিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর ১৯৫১ খ্রি. তিনি লাহোর জামেয়া আশরাফিয়ার শায়খুল হাদীস পদে যোগ দেন। সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করার পর ২৮ জুলাই, ১৯৭৪ খ্রি. তিনি লাহোরে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন ইত্যাদিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে তিনি পাকিস্তানের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা কান্ধলবী একাধারে তাফসীর, হাদীস, সীরাত, গীতি কাব্য, আকাইদ ও ইলমে কালাম প্রভৃতি নানা বিষয়ে পঞ্চাশেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর রচিত 'সীরাতুল মুস্তফা' শীর্ষক গ্রন্থটি মহানবী (সা)-এর সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

[সূত্র ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ. পৃ. ৩৯৭-৪০০, ২সং, ২০০০ খ্রি., ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা]

সীরাতুল মুস্তফা সা.
২য় খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সীরাতুল মুস্তফা (সা)

দ্বিতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলবী (র)

কালাম আযাদ অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) দ্বিতীয় খণ্ড

মূল: হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র)
কালাম আযাদ অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪০৪

ইফা প্রকাশনা : ২২৮৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0950 5

প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০০৪

তৃতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ১৮০.০০ (একশত আশি) টাকা।

SEERATUL MUSTAFA (SM) : written by Hazrat Allama Idris Kandlavi in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535, August 2013.

E-mail : Directorpubif@yahoo.com

Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 180.00 ; US Dollar : 7.00

সূচিপত্র

আল্লাহর পথে জিহাদ /১১
সারকথা/১৩
জিহাদের নির্দেশ/১৮
যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য/১৯
জিহাদের তাৎপর্য/২০
সার-সংক্ষেপ/২০
জিহাদের আদব/২৩
জিহাদের প্রকারভেদ/২৬
জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য/২৯
ইসলাম এবং জবরদস্তি/৩০
ইসলাম এবং দাসত্বের মাসআলা/৩৪
সারকথা/৩৬
মূল উদ্দেশ্য প্রত্যাবর্তন/৪০
একটি সন্দেহ ও তার সমাধান/৪১
রাজনৈতিক দাসত্ব/৪২
যুদ্ধ ও অভিযানের ধারাবাহিকতা/৪৩
হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান/৪৩
হযরত উবাদা ইবন হারিস (রা)-এর অভিযান/৪৪
হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর অভিযান/৪৫
আবওয়ার যুদ্ধ/৪৫
বুয়াতের যুদ্ধ/৪৬
উশায়রার যুদ্ধ/৪৬
বদরের প্রথম যুদ্ধ (বদরে সুগরা/গাযওয়ায়ে সাফওয়ান)/৪৮
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর অভিযান/৪৮
ইসলামে প্রথম গনীমত/৫০
বদর যুদ্ধ (বদরে কুবরা)/৫৩
ঘটনার সূত্রপাত/৫৩
কুরায়শের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবহিত হওয়া, নবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ এবং আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ/৫৮
হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ/৫৮
হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ/৬০
আতিকা বিনত আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন/৬২
জুহায়ম ইবন সালতের স্বপ্ন/৬৩
যুদ্ধের প্রস্তুতি/৬৬
যুদ্ধের ময়দানে উতবার ভাষণ/৭০
যুদ্ধের সূচনা/৭১
উতবা, শায়বা ও ওলীদ হত্যার বর্ণনা/৭২
মহানবী (সা) কর্তৃক বিজয়লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা /৭৪
একটি সন্দেহ ও তার সমাধান/৭৬
ইসলামপন্থীদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতার অবতরণ/৭৭

ফেরেশতাগণকে জিহাদ ও লড়াইয়ের নিয়ম শিক্ষাদান /৭৯
আবূ জাহলের প্রার্থনা এবং লোকজনকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহদান/৮২
উমাইয়্যা ইবন খালফ ও তার পুত্রকে হত্যা/৮৫
আল্লাহর দুশমন, মুসলিম উম্মাহর ফিরাউন আবূ জাহল নিহত/৮৭
বিজয় লাভের পর আবূ জাহলের লাশের অনুসন্ধান/৮৮
বদর যুদ্ধের বন্দিগণ/৯১
বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশ কূপে নিক্ষেপকরণ/৯২
বিজয়লাভের সংবাদসহ মদীনায় দূত প্রেরণ/৯৩
গনীমতের মাল বন্টন/৯৪
বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ/৯৬
বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ/৯৭
মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি/১০০
একটি সন্দেহ ও তার জবাব/১০৩
সার-সংক্ষেপ/১০৪
তাৎপর্যপূর্ণ উপকারিতা/১০৪
মুক্তিপণের পরিমাণ/১০৬
প্রথম ঈদের নামায/১১৬
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা/১১৬
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা/১১৭
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা/১১৯
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা/১২০
বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসার সাহাবী (রা)-গণের বর্ণনা/১২২
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতা (আ)-গণের নামের বর্ণনা/১২৯
বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সাহাবিগণের নাম/১৩০
বদরের যুদ্ধবন্দীদের নাম/১৩৪
ইসলামের বিরুদ্ধে সম্প্রদায় এবং স্বদেশের সহযোগিতা/১৩৭
বদর যুদ্ধের উপর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত/১৩৮
সার-সংক্ষেপ/১৪৩
ইয়াহূদী মহিলা আসমাকে হত্যা (২৬ রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হিজরী)/১৪৪
কারকারতুল কুদর-এর যুদ্ধ/১৪৫
আবূ আফক ইয়াহূদীকে হত্যা/১৪৫
বনী কায়নুকার যুদ্ধ (১৫ শাওয়াল, শনিবার দ্বিতীয় হিজরী)/১৪৬
সাবীকের যুদ্ধ (দ্বিতীয় হিজরীর ৫ যিলহজ্জ)/১৪৮
ঈদুল আযহা/১৪৯
হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রা)-এর বিয়ে/১৪৯
গাতফান যুদ্ধ (তৃতীয় হিজরী)/১৫০
বুহরান যুদ্ধ/১৫২
ইয়াহূদী কা'ব ইবন আশরাফ হত্যা (তৃতীয় হিজরীর ১৪ রবিউল আউয়াল রাত্রিতে)/১৫২
কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার কারণসমূহ/১৫৬
হযরত হুয়ায়সা ইবন মাসউদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/১৫৭
হযরতযায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান(তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথমভাগ)/১৫৮
আবূ রাফে'কে হত্যা (তৃতীয় হিজরীর মধ্য জমাদিউস সানী)/১৫৮

উহুদ যুদ্ধ/১৬১
কুরায়শগণ কর্তৃক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া/১৬২
হযরত আব্বাস (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরায়শের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ/১৬২
মহানবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ/১৬২
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রস্তুতি ও অস্ত্র-সজ্জা/১৬৫
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধযাত্রা এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস/১৬৫
ইসলামী বাহিনী থেকে মুশরিকদের পৃথক হওয়া এবং ফিরে যাওয়া/১৬৭
সেনা বিন্যাস/১৬৮
কুরায়শ বাহিনীর অবস্থা/১৬৯
মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর ভাষণ/১৭০
যুদ্ধের সূচনা এবং যুদ্ধবাজ কুরায়শদের এক এক করে নিহত হওয়া/১৭১
হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর বীরত্ব/১৭৩
হযরত হামযা (রা)-এর বীরত্ব ও তাঁর শাহাদাতের বর্ণনা/১৭৪
ফেরেশতা কর্তৃক গোসলদানকৃত হযরত হানযালা (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা /১৭৬
মুসলমান তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগ এবং যুদ্ধের গতিতে পরিবর্তন /১৭৭
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র এবং তাঁর দশজন সঙ্গীর (রা) শাহাদাতবরণ/১৭৭
হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর শাহাদাতবরণ/১৭৭
মুসলমানদের হাতে ভুলক্রমে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর পিতার শাহাদাতবরণ /১৭৮
খালিদ ইবন ওয়ালিদের আকস্মিক আক্রমণে ইসলামী বাহিনীর চাঞ্চল্য এবং রাসূল (সা)-এর দৃঢ়তা/১৭৮
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তা রক্ষিগণ/১৭৯
মুহাজিরগণের নাম/১৭৯
আনসারগণের নাম/১৭৯
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর আকস্মিক আক্রমণ এং সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগ/১৮০
হযরত যিয়াদ ইবন সাকান (রা)-এর শাহাদাতবরণ/১৮০
উতবা ইবন আবূ ওয়াক্কাস কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ/১৮১
আবদুল্লাহ ইবন কুমায়্যা কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ/১৮১
হযরত আলী (রা) এবং হযরত তালহা (রা) কর্তৃক নবী (সা)-কে সহায়তাদান/১৮১
হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর কুরবানী/১৮৩
মহানবী (সা) কর্তৃক মুশরিকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ/১৮৪
মহানবী (সা) কর্তৃক কতিপয় কুরায়শ সর্দারের জন্য বদ দু'আ করা এবং এ প্রসঙ্গে ওহী নাযিল হওয়া/১৮৪
যুদ্ধকালে হযরত কাতাদা ইবন নুমান (রা)-এর চোখের মণি বেরিয়ে যাওয়া এবং নবী (সা) কর্তৃক তা পুনঃস্থাপন ও তা পূর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে যাওয়া/১৮৫
নবী (সা) নিহত হওয়ার মিথ্যা সংবাদের প্রসার লাভ/১৮৬
হযরত আনাস ইবন নযর (রা)-এর শাহাদাতবরণের ঘটনা/১৮৬
উবাই ইবন খালফকে হত্যা/১৮৯
হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতের স্থানসমূহ ধৌত করা/১৮৯
কুরায়শগণ কর্তৃক মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করা/১৯০
আবূ সুফিয়ানের প্রশ্ন এবং হযরত উমর (রা)-এর জবাব/১৯০
হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/১৯৩

হযরত হামযা (রা)-এর লাশ অনুসন্ধান/১৯৪
হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/১৯৫
হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/১৯৮
হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/১৯৯
হযরত খায়সামা (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/২০১
হযরত উসায়রিম (রা)-এর শাহাদাতের বর্ণনা/২০১
রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদ ও সুস্থ আছেন কিনা তা জানার জন্য মদীনার নারী-পুরুষের ভিড় জমানো/২০২
যুদ্ধের দুশ্চিন্তার মধ্যে নিষ্ঠাবান আল্লাহ-প্রেমিকদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তাঁদের তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া/২০২
কতিপয় স্ত্রীলোকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও তাঁদের ব্যাপারে নির্দেশ/২০৩
উহুদের শহীদদের কাফন-দাফন/২০৬
শহীদ সপ্রদায়/২০৭
রহস্য এবং কৌশল/২০৮
উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতার উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য /২১৪
উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতা বর্ণনার পর/২১৭
হামরাউল আসাদ যুদ্ধ, ১৬ শাওয়াল (রোববার, তৃতীয় হি.)/২১৭
বিভিন্ন ঘটনাবলী (তৃতীয় হি.)/২১৯
হযরত আবূ সালমা আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আসাদ (রা)-এর অভিযান (চতুর্থ হি.)/২১৯
হযরত আবুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর অভিযান/২১৯
রাজী'র ঘটনা/২২০
কুররা অভিযান অর্থাৎ বীরে মাউনার ঘটনা/২২৭
বনী নাযীরের যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, চতুর্থ হি.)/২৩০
শারাব নিষিদ্ধ হওয়া/২৩৪
যাতুর রিকা' যুদ্ধ (জমাদিউল আউয়াল, চতুর্থ হি.)/২৩৪
প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধ (শাবান, চতুর্থ হি.)/২৩৬
চতুর্থ হিজরীর বিভিন্ন ঘটনা/২৩৮
দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, পঞ্চম হি.)/২৩৮
মুরাইসি বা বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ (সোমবার, ২০ শাবান, পঞ্চম হি.)/২৩৯
তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা/২৪২
ইফকের ঘটনা/২৪৬
অন্যান্য ফায়দাসমূহ/২৫৮
উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা) এবং অপরাপর নবী-সহধর্মিণিগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের ব্যাপারে বিধান/২৬০
তায়াম্মুমের বিধান অবতরণ/২৬৪
খন্দক ও আহযাবের যুদ্ধ (শাওয়াল, পঞ্চম হি.)/২৬৫
তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা/২৬৯
জরুরী সতর্কবাণী/২৭০
বনী কুরায়ার যুদ্ধ, যিলকদদ, পঞ্চম হি.)/২৭৭
হযরত যয়নব (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর বিবাহ /২৮৫
পর্দার বিধান অবতরণ/২৮৬
মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর কুরতা অভিযান (১০ মুহাররম, ষষ্ঠ হি.)/২৮৭

বনী লিহয়ানের যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, ষষ্ঠ হি.)/২৯০
যী কারাদের যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, ষষ্ঠ হি.)/২৯০
গামরে হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা) অভিযান/২৯২
যিল কাসসা অভিমুখে হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর অভিযান ও একশ' লোকের শাহাদত/২৯২
যিল কাসসা অভিমুখে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর অভিযান/২৯২
জমুম অভিযান/২৯৩
ঈস অভিযান (জমাদিউল আউয়াল, ষষ্ঠ হি.)/২৯৩
তারিফ অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হি.)/২৯৩
হাসমা অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হি.)/২৯৩
ওয়াদিউল কুরা অভিযান (রজব, ষষ্ঠ হি.)/২৯৪
দুমাতুল জন্দল অভিযান (শাবান, ষষ্ঠ হি.)/২৯৪
ফিদক অভিযান (শাবান, ষষ্ঠ হি.)/২৯৬
উম্মে কিরাফা অভিযান (রমযান, ষষ্ঠ হি.)/২৯৬
আবূ রাফে' ইবন হুকায়ক ইয়াহূদীকে হত্যার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন উতায়ক (রা)-এর অভিযান/২৯৭
হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর অভিযান (শাওয়াল মাস, ষষ্ঠ হি.)/২৯৭
উরায়না গোত্রের লোকদের প্রতি কুরয ইবন জাবির ফিহরী (রা)-এর অভিযান (শাওয়াল মাস, ষষ্ঠ হি.)/২৯৮
হযরত আমর ইবন উমায়্যা যামরী (রা)-এর অভিযান/২৯৮
হুদায়বিয়ার উমরা (১ যিলকাদ, ষষ্ঠ হি.)/৩০০
বায়'আতুর রিদওয়ান/৩০২
সন্ধির শর্তাবলী/৩০৮
হুদায়বিয়ার সন্ধির সুফল/৩১১
ফায়দা, উদাহরণ এবং মাসয়ালা ও নির্দেশ/৩১৪
বায়'আতের মাহাত্ম্য/৩১৯
সার-সংক্ষেপ/৩২১
পৃথিবীর বিভিন্ন শাসকের নামে ইসলামের দাওয়াতী পত্র/৩২৩
রোম সম্রাট কায়সারের নামে পবিত্র পত্র/৩২৫
রোম সম্রাটের দরবারে হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-এর ভাষণ/৩২৬
পরিসমাপ্তি/৩৩১
ফায়দা ও উদাহরণ/৩৩২
কিসরা, ইরান সম্রাট খসরু পারভেযের নামে পত্র/৩৩৪
আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র/৩৩৬
নাজ্জাশীর জবাব/৩৩৭
নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে নবী (সা)-এর পত্রের জবাব/৩৩৭
মাকূকাস, মিসর সম্রাট ইসকান্দারিয়ার নামে পবিত্র পত্র/৩৩৯
মাকূকাসের দরবারে হযরত হাতিব (রা)-এর ভাষণ/৩৪০
সম্রাটের জবাব/৩৪১
ইসলামপূর্ব অবস্থায় মাকূকাসের সাথে মুগীরার সাক্ষাত/৩৪২
বাহরায়নের বাদশাহ মুনযির ইবন সাবীর প্রতি পবিত্র পত্র/৩৪৬
মুনযিরের জবাব/৩৪৬

মুনযির সাবীর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্রের জবাব /৩৪৭
আম্মানের বাদশাহর নামে পত্র/৩৪৮
ইয়ামামা প্রধান হাওয়া ইবন আলীর প্রতি পত্র/৩৫২
দামেশকের আমীর হারিস গাসসানীর নামে পবিত্র পত্র/৩৫৩
ফায়দাসমূহ/৩৫৪
খায়বরের যুদ্ধ (মুহাররম, সপ্তম হি.)/৩৫৬
নাঈম দূর্গ/৩৬০ ও কামূস দূর্গ/৩৬০
সা'আব ইবন মা'আয দূর্গ/৩৬২
হিসন দূর্গ/৩৬৩
অতীহ্ ও সালালিম দূর্গ/৩৬৩
ফিদক বিজয়/৩৬৫
বিষ প্রদানের ঘটনা/৩৬৬
সংবাদ/৩৬৭
হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপস্থিতি/৩৬৭
খায়বরের গনীমত বন্টন/৩৬৭
প্রশিক্ষকদের জন্য ফায়দা/৩৬৯
মুহাজিরগণ কর্তৃক আনসারগণের ক্ষেত-খামার ফেরতদান/৩৭০
মাসয়ালা ও বিধানসমূহ/৩৭১
নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ/৩৭১
ভূমি বন্টন/৩৭১
খায়বরে নিষিদ্ধকৃত বিষয়সমূহ/৩৭২
মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়া/৩৭৩
মুত'আ হারাম হওয়া/৩৭৩
ইসলামের শুরুতে কি ধরনের মুত'আ অনুমোদিত ছিল/৩৭৬
সারকথা/৩৭৯
মুত'আ হারাম হওয়ার একটি বিজ্ঞোচিত প্রমাণ/৩৮০
আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন/৩৮১
ওয়াদিউল কুরা ও তায়মা বিজয়/৩৮১
প্রত্যাবর্তন ও তা'রীস রজনীর ঘটনা/৩৮২
ফায়দাসমূহ/৩৮২
হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর সাথে বাসর উদযাপন/৩৮৩
উমরাতুল কাযা (যিলকাদ, সপ্তম হি.)/৩৮৩
হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে বিবাহ/৩৮৬
আখরাম ইবন আবুল আওজা (রা)-এর অভিযান (যিলহজ্জ, সপ্তম হি.)/৩৮৭
হযরত গালিব ইবন আবদুল্লাহ লাইসী (রা)-এর অভিযান/৩৮৭
কতিপয় অভিযান/৩৮৭
হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ, হযরত উসমান ইবন তালহা এবং আমর ইবনুল আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ/৩৮৮
মূতার যুদ্ধ (জমাদিউল আউয়াল, সপ্তম হি.)/৩৯২
কাহিনী/৪০০
যাতুস সালাসিলে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর অভিযান/৪০২
সাইফুল বাহারে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর অভিযান/৪০৩

মহাপরিচালকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) সর্বকালের সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জন্য আদর্শ, শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

আর মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।"

তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও নাজাতের নিশ্চয়তা।

মহানবী (সা)-এর জীবন এক মহাসমুদ্রের মত। তিনি যদিও পৃথিবীতে মাত্র ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন ও কর্মের আলোচনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। মানুষের জন্যে খোদায়ী জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি একমাত্র তাঁরই মাধ্যমে ঘটাতে তাঁর সীরাত বা জীবনী চর্চার প্রয়োজন বর্তমানে আরো অধিক হওয়ার দাবিদার।

পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব ভাষায়ই মহানবী (সা)-এর সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষের তথ্য অনুযায়ী শুধু বাংলা ভাষায়ই বিগত কয়েক শ' বছরে পাঁচ শ'-এর অধিক সীরাত গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

'সীরাতুল মুস্তফা (সা)' নামের এই প্রসিদ্ধ সীরাত গ্রন্থটি রচনা করেছেন বিখ্যাত আলিমে দীন আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র)। তিন খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট অনুবাদক জনাব কালাম আযাদ। প্রথম সংস্করণে কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় তৃতীয় সংস্করণে এটি পূনঃসম্পাদনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের যাবতীয় প্রকাশনাকে কবুল করুন। আমিন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বজগতের জন্য মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক অনন্য আশিস্–রাহ্‌মাতুললিল আলামীন। তাওহীদের আলোকময় বাণীর অবিনাশী ঝাণ্ডা নিয়ে তিনি অজ্ঞানান্ধ ও সত্যভ্রষ্ট মানুষকে আহ্বান করেন সত্যের পথে, কল্যাণের পথে; শান্তি, সাম্য, মানবতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পথে। আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁর অসাধারণ চরিত্র-মাধুর্য, সততা-নিষ্ঠা, আমানতদারি, সর্বোপরি পরিপূর্ণ তাকওয়াসমৃদ্ধ কল্যাণকর এক আদর্শ মানব সমাজ গঠনে তাঁর অসাধারণ সাফল্য বিশ্ব-ইতিহাসের শীর্ষতম স্থানে তাঁকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। প্রখ্যাত মনীষী এডওয়ার্ড গীবন তাঁর 'দি ডিক্লাইন এন্ড দি ফল্ অব দি রোমান এম্পায়ার' গ্রন্থে নবী মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : 'আরবীয় পয়গাম্বরের মেধা, তাঁর জাতির আচার-আচরণ এবং তাঁর ধর্মের প্রাণশক্তি প্রাচ্য সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ; এবং আমাদের দৃষ্টি অন্যতম প্রধান স্মরণীয় একটি বিপ্লবের দিকে অভিনিবিষ্ট, যা বিশ্বের জাতিসমূহের ওপর এক নতুন ও স্থায়ী বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছে।' মহানবী (সা) বিশ্বমানবের, বিশ্বসমাজের ওপর 'সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারকারী' এক মহান মানুষ, মহান পয়গাম্বর।

মানবমুক্তির মহান দিশারী সাইয়েদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আলোকোজ্জ্বল জীবনাদর্শ বিশ্বমানবের সামনে অনির্বাণ প্রদীপ-শিখার মতো–যুগ যুগ ধরে যা পথনির্দেশনা দিয়ে চলেছে কোটি কোটি মানুষকে। সেই আদর্শ আজও যেমন আমাদের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, ভবিষ্যতেও তেমনি নিজের অনন্য অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর অম্লান জীবনাদর্শ নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে অগণিত সীরাত গ্রন্থ। আরবী, উর্দু, ফারসি, ইংরেজিসহ পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় রচিত এ সকল সীরাত গ্রন্থ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-বিশ্লেষণ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বৈচিত্র্যধর্মী উপস্থাপনা-নৈপুণ্যে ভাস্বর এবং স্ব-বৈশিষ্ট্য ও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। এ কারণে মহানবী (সা)-এর মহাসমুদ্রতুল্য জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে হলে বিভিন্ন ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠ করা অত্যন্ত জরুরী।

এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় রচিত বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করে আসছে। এই ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) কর্তৃক উর্দু ভাষায় রচিত মূল্যবান সীরাত গ্রন্থ 'সীরাতুল মুস্তাফা (সা)' অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়। বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। বিশিষ্ট আলিম ও লেখক জনাব কালাম আযাদ কর্তৃক অনূদিত দ্বিতীয় খণ্ডটি ২০০৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

'সীরাতুল মুস্তাফা (সা)' বইটি যেমন তথ্যবহুল ও তেমনি সুলিখিত তেমনি অনুবাদটিও হয়েছে মূলানুগ। এ কারণে প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির পুনঃসম্পাদিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আমরা আশা করি, বইটি আগের মতোই সম্মানিত পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করবে। আল্লাহ্ আমাদের এই নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ

নবী (আ)-গণের আগমন আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট নিয়ামত। এ নিয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপনে মানব দেহের প্রতিটি পশম প্রশংসামুখর জিহ্বায় পরিণত হলেও তা শেষ করা যেত না। তাঁদের শুভাগমন পৃথিবীতে না ঘটলে মহান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্বন্ধে পথহারা মানুষদের কে পথনির্দেশনা দিত? প্রকৃত প্রভুর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সম্পর্কে কে আমাদের অবহিত করত? ঐ প্রকৃত মা'বূদের ইবাদত-বন্দেগীর পদ্ধতি কে আমাদেরকে শেখাত? কে বুঝাত হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের পার্থক্য? উপার্জন ও পরিশ্রম, দীন ও দুনিয়া, আত্মার পরিশুদ্ধিতার অনুশীলন, শাসন ও সুবিচার করার পথ কে আমাদের দেখাত? মসজিদের চটে বসে কিভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়, মহা ন্যায়বিচারক মহানস্রষ্টা আল্লাহর অবাধ্য জনগণের শোষক তৎকালীন রোম ও পারস্য সম্রাট তাদের সিংহাসন কিভাবে ন্যায় ও সত্যের কাছে ধসে পড়ে, কিভাবে মসজিদের ইমাম হয়ে যুগপৎ রাষ্ট্রপতি ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক হওয়া যায় এবং মসজিদের মেঝেতে বসে তৎকালীন বৃহৎ শক্তিসমূহের অন্যায় দখলমুক্ত করা যায়, সম্পদ মযলূম মানুষদের মাঝে বন্টন করা যায়—এ বিরাট কাজসমূহ একমাত্র নবী (আ)-গণ ছাড়া কেউই আমাদের শেখাতে পারতেন না। আমাদের অসম্পূর্ণ জ্ঞান, অমসৃণ কর্মকুশলতার নূর, পথ প্রদর্শন ও হিদায়াত ছাড়া সম্পূর্ণই অকার্যকর, অর্থহীন।

চোখ যতই জ্যোতির্ময় ও দৃষ্টিপ্রখর হোক না কেন, যদি সূর্য ও চন্দ্রের আলোর সাহায্য না পায়, তখন তা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে জ্ঞানের জ্যোতি এবং চোখের জ্যোতির দ্বারা সত্য-মিথ্যার পার্থক্য তখনই ধরা পড়ে, যখন নবূওয়াতের নূর এবং হিদায়ত প্রদীপের আলো তার পরামর্শদানকারী ও পথপ্রদর্শক হয়। যেমন রাতে এবং অন্ধকারে দৃষ্টিশক্তি কোনো কাজে আসে না, তেমনি পথহারাদের রাতের গভীরতা তুল্য অন্ধকারে জ্ঞানের আলোও ফলপ্রসু হয় না।

জ্ঞানও একটি দলীল কিন্তু ওহী ও নবূওয়াতী জ্ঞান ছাড়া তা অসম্পূর্ণ, পরিপূর্ণতার স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারে না। পরিপূর্ণ দলীল তো নবী (আ)-গণের আবির্ভাব, যার ওপর পরকালের স্থায়ী আযাব ও সওয়াব এবং পুরস্কার ও শাস্তি নির্ভরশীল। মানুষের এ অন্ধ, পঙ্গু ও খোঁড়া জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলার সুন্দরতম নামসমূহ, তাঁর উচ্চমার্গের গুণাবলী, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি, আম্বিয়ায়ে কিরাম (তাঁদের প্রতি হাজার সালাম) এর শিক্ষা ব্যতীত কি করে শিখবে?

মোটকথা নবী-রাসূল (আ)-গণের আবির্ভাব হচ্ছে রহমত এবং বাস্তব নিয়ামতের মূর্তপ্রতীক। তাঁদের শিক্ষা ও আদর্শের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য ও সাফল্য নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে এর সূত্রপাত ঘটান আর বান্দার হিদায়াতের জন্য একের পর এক পয়গাম্বর প্রেরণ করেন, যাতে তাঁরা মানুষকে প্রকৃত ইলাহ্-এর আনুগত্যের আহ্বান জানাতে পারেন এবং তাদেরকে নাফরমানী থেকে বাঁচাতে পারেন, অনুগত ও আজ্ঞাবহদের জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতে পারেন এবং নাফরমান ও অবাধ্যদেরকে আযাবের ভয় দেখাতে পারেন।

যাঁরা সৌভাগ্যবান, তাঁরা এ মহা নিয়ামতের প্রতি সম্মান দেখান ও আল্লাহর শোকর আদায় করেন এবং নিছক পার্থিব বিষয়াদিতে নিমজ্জিত না থেকে আল্লাহর নবী (আ)-গণের পথনির্দেশনা গ্রহণ করেন। আর নিজের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা ও সন্তুষ্টিকে ঝেড়ে ফেলে প্রতিটি কাজকর্ম নবী-রাসূলগণের আদর্শ ও নির্দেশনা অনুসারে করে থাকেন। এ শ্রদ্ধাভাজনদের হাতে নিজেদেরকে এমনভাবে সমর্পন করেন, যেমনিভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের হাতে সমর্পিত হয়ে থাকে। আর যারা নির্বোধ ও ভাগ্যাহত, তারা এ মহা নিয়ামতের মর্যাদা অনুধাবনে ব্যর্থ। তাদের কাছে শরীআতের অনুসরণ ও আল্লাহর নির্দেশ মানা কঠিন মনে হবে। তারা অন্য প্রাণীর ন্যায় চলা নিজেদের জন্য পসন্দ করবে। তারা ঐ সম্মান ও মর্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না, যা আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা পালনের আহ্বানের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। আর নিজেদের কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনায় এবং অভিশপ্ত শয়তানের উস্কানী ও ফুসলানোর ফলে ওরা আল্লাহর নবী (আ)-গণকে অস্বীকার ও তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাঁদের সাথে শত্রুতা ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। আল্লাহ্ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আনুগত্যকে তারা দূষণীয় ও অপমানজনক মনে করে এং প্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্যকে নিজেদের জন্য সম্মানজনক মনে করে। হযরত আম্বিয়া (আ) সুন্দর ও নম্রভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন। যেমনিভাবে মহানুভব ও দয়ার্দ্র পিতা তার অপদার্থ সন্তানকে সংশোধন ও সুশিক্ষাদানের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন না, তেমনি নবী (আ)-গণ নিঃস্বার্থ উপদেশ ও স্নেহপূর্ণ বক্তৃতার দ্বারা উম্মতের অযোগ্য ও দুর্ভাগা সদস্যদের বুঝানোর ও সংশোধনের কোন চেষ্টাই বাদ রাখেননি।

তাঁরা সুদীর্ঘকালব্যাপী সুন্দর ও নম্রভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু হতভাগার দল দিনকে দিন আল্লাহ্ থেকে দূরে পলায়ন করতে থাকে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَالَ رَبِّ انِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَّنَهَاراً - فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ الاَّ فِرَاراً وَانِّىْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِىْ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً .

"সে [নূহ (আ)] বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্র আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান ওদের পলায়ন-প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।

আমি যখনই ওদের আহ্বান করি, যাতে তুমি ওদের ক্ষমা কর, ওরা কানে আঙুল দেয়, নিজেদেরকে কাপড়ে ঢেকে রাখে ও হঠকারিতর ওপর অটল থাকে এবং খুবই ঔদ্ধত্য সহকারে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে।" (সূরা নূহ : ৫-৭)

যখন নবী (আ)-গণ নসীহত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, ওদের ওপর এর কোনোই প্রভাব পড়ে না; বরং ওদের ঔদ্ধত্য ও পাপ-প্রবণতা আরো বাড়তে থাকে, তাদের বিরোধিতায় অনুগতদের পক্ষে আল্লাহর নাম নেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল্লাহর নবী এবং তাঁদের সঙ্গী অনুসারীদের ওপর যখন ওদের যুলুম-নিপীড়ন, ঠাট্টা-বিদ্রুপ বৃদ্ধি পায়, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি আযাব নাযিল করেন। মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের রক্ষা করেন এবং অস্বীকারকারী ও মিথ্যাবাদীদের ধ্বংস করে দেন। কাউকে পানিতে ডুবিয়ে আবার কাউকে যমীনে ধসিয়ে মারেন, কারো প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করেন আর কারো জন্য পাঠান ভূমিকম্প। কারো প্রতি প্রবল ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করেন, আবার কাউকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেন। (হে আল্লাহ্ তুমি আমাদেরকে এসব শাস্তি থেকে রক্ষা কর)। মোটকথা আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে অস্বীকারকারী ও তাঁদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হওয়াটা ঐতিহাসিক সত্য, এতে কারো দ্বিমত নেই।

একমাত্র আল্লাহই প্রকৃত আযাব দানকারী এবং চরম প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব সময় তিনি আড়ালে থেকে এর প্রকাশ ঘটান। তিনি স্বীয় দুশমনকে ধ্বংস করার নির্দেশ যাকেই প্রদান করেন, সে কোনরূপ ইতস্তত না করেই তা পালন করে থাকে।

তিনি কখনো সমুদ্রকে স্বীয় দুশমনদের ডুবিয়ে দেয়ার জন্য, কখনো যমীনকে ওদের ধসিয়ে দেয়ার জন্য, কখনো বা বাতাসকে ওদের ছিন্নভিন্ন করতে, আবার কখনো ফেরেশতাকে ওদের ধ্বংস করতে নির্দেশ দেন।

সারকথা

সারকথা হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাঁর প্রতিনিধি নবী (আ)-গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শত্রুতার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অবাধ্য অকৃতজ্ঞদের প্রতি তাঁর গযব এবং অপদস্থতার ধারাবাহিকতাও চলতে থাকে। ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক দাবিও এটাই। সুতরাং তেমনি নবী (আ)-গণকে অস্বীকারকারী এবং তাঁদের প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের ফেরেশতা কর্তৃক আযাব দান ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারেরই দাবি।

অনুরূপভাবে সত্য অস্বীকারকারী ও মিথ্যা আরোপকারীদেরকে খোদ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম, তাঁদের সঙ্গী ও অনুসারীদের মাধ্যমে শাস্তি দান ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারেরই দাবি। যেমন আল্লাহর নির্দেশ :

قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ ۔

"তোমরা ওদের সাথে যুদ্ধ করো; তোমাদের হাতদ্বারা আল্লাহ্ ওদেরকে শাস্তি দিবেন।" (সূরা তাওবা : ১৪)

এ আয়াত দ্বারা এটা পরিষ্কার হলো যে, বান্দার হাত দিয়ে যে আযাব প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে তা আল্লাহরই কাজ। বান্দার হাত তা প্রকাশ ও বাস্তবায়নের মাধ্যম মাত্র। যেমন আঘাতকারী দ্বারা হত্যা ও আঘাত কোন মাধ্যম ছাড়াই কোন সময় সংঘটিত হয়, আর কোন সময় তীর-তরবারির মাধ্যমে। একইভাবে আল্লাহর আযাবের প্রকাশ অনেক সময় কোন মাধ্যম ছাড়াই ঘটে, আবার কোন কোন সময় তার প্রকাশ ঘটে মানুষ অথবা ফেরেশতার হাত দিয়ে।

وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيْدِيْنَا

"এবং আমরা প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ। তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন, সরাসরি নিজ পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দিয়ে। (সূরা তাওবা : ৫২)

এ আযাবে ইলাহী কখনো বা শুধু ফেরেশতার হাত দিয়ে প্রকাশ পায়, আর কখনো কেবল মানুষের হাত দিয়ে যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের আকারে প্রকাশ পায়। মানুষ ও ফেরেশতার হাত দিয়ে কেবল আল্লাহর আযাবই প্রকাশ পায়। যেমন বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের হত্যা সাহাবায়ে কিরামের হাত এবং সম্মানিত ফেরেশতাদের হাত উভয় দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। সৎকর্মশীল মু'মিন এবং সম্মানিত ফেরেশতা, উভয় দল মিলে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অস্বীকার-কারী ও তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপকারীদের বিরুদ্ধে যেভাবে মুকাবিলা করেছিলেন, ইনশা আল্লাহ্ শীঘ্রই তা বদর যুদ্ধের বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে। যেহেতু নিয়ম এই যে, অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দানকে শাসক ও বিচারকের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়, জাল্লাদ, তীর বা তরবারি চালনাকারীর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয় না, এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ - وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى

"তোমরা তাদেরকে হত্যা করো নি, আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং যখন তুমি তীর নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করো নি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন।" (সূরা আনফাল : ১৭)

অর্থাৎ ঐ বিদ্রোহীদের হত্যাকারী প্রকৃতপক্ষে আমি। আর তোমরা কেবল হাতিয়ার অথবা মাধ্যম মাত্র। যেমন তীর ও তরবারি তোমাদের কাজের হাতিয়ার ও মাধ্যম, একইভাবে আমার কাজের জন্য তোমরা তীর ও বন্দুক সাবরূপ মাত্র। আবূ তায়্যিব বলেন :

فانت حسام الملك وَاللّٰهُ ضارب * وانت لواء الدين والله عاقد

"অতএব তুমি রাষ্ট্রের তরবারি আর আল্লাহ্ হলেন অপরাধীকে আঘাতকারী। তুমি দীনের পতাকা আর আল্লাহ্ তা বন্ধনকারী।"

বরং আল্লাহর অবাধ্যদেরকে ফেরেশতা দিয়ে শাস্তি না দিয়ে মানুষের হাত দিয়ে যুদ্ধ ও হতাহতের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব প্রকাশ পাওয়া, এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ রহমত। কারণ ফেরেশতাদের মাধ্যমে যেসব উম্মতকে ধ্বংস করা হয়েছে, তাদের সংশোধনের অবকাশও দেয়া হয়নি। আর যে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে

নবী রাসূল এবং তাঁদের অনুসারীগণের যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়েছে, তারা বুঝার, শোনার ও চিন্তা-ভাবনা করার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছে। কাজেই মু'মিনদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার উৎসাহ ও আসমানী সাহায্য আল্লাহ্-প্রেমীদের সহায়ক, আর আল্লাহর ফেরেশতাদের অগণিত সৈন্যের শত্রুদের দিকে সক্রোধে দৃষ্টিপাত দেখে অনেকেই সত্যের সামনে মাথা নত করে দেয়। তারা বুঝতে পারে যে, এঁরা আল্লাহরই প্রেরিত, আসমান-যমীন, জল-স্থল, বৃক্ষ-পাথর সব কিছুই এঁদের সাহায্যে নিয়োজিত। কাজেই এ মহাত্মাগণের সামনে গর্দান ঝুঁকিয়ে দেয়াতেই নিরাপত্তা। যারা আদি পাপাচারী ও দুর্ভাগা ছিল, তারা এর পরেও নির্লজ্জ এবং বেপরোয়াভাবে মুকাবিলা করতে থাকে। যার ফল হলো, দুনিয়াতেও তারা অপদস্থ হলো, আর আখিরাতে অপদস্থ হওয়ার ব্যাপারে তো কোন প্রশ্নই আসে না। দুনিয়াতে দেখুন যে, রাষ্ট্রীয় অপরাধে বড় থেকে বড় অপরাধও ক্ষমা করা হয়, কিন্তু বিদ্রোহের শাস্তি হত্যা অথবা যাবজ্জীবন কারাবাস ছাড়া আর কিছুই নেই। অথচ ওরাও মানুষ আর এরাও মানুষ।

সীমিত কয়েকদিনের রাষ্ট্রশক্তিও বিদ্রোহের অপরাধকে ক্ষমার অযোগ্য মনে করে এবং সমস্ত বিজ্ঞজন একে যথার্থ, উপযুক্ত ও সঠিক বিবেচনা করে। অথচ বিদ্রোহী ব্যক্তি না বাদশাহর সৃষ্ট, না সমজাত; তাছাড়া সামান্য কোন জিনিসের ব্যাপারেও বাদশাহর মুখাপেক্ষী নয়।

অথচ সেই আহকামুল হাকিমীন, রাব্বুল আলামীন চরম ও পরম ক্ষমতাবান আল্লাহ্ এবং তাঁর প্রতিনিধি নবী-রাসূল (আ)-গণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের তোমরা কেন তুচ্ছ মনে কর ? মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীকে বিধি মুতাবিক শাস্তিদান এবং আল্লাহর বিধান থেকে ঘাড় ফিরানোদের ঘাড় ভেঙ্গে দেয়াকে কেন অত্যাচার ও সীমালংঘন মনে কর?

পৃথিবীর শাসক কর্তৃক তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালিয়ে কাউকে হত্যা করা, কাউকে বন্দী করা, তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং সেই সম্পদ রাষ্ট্রের শুভাকাঙ্ক্ষী ও দেশের প্রতি বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের মাঝে উপঢৌকন হিসেবে বন্টন করাকে তোমরা শান-শওকতের ব্যাপার এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে মনে কর, অথচ তোমরাই আবার সেই আহকামুল হাকিমীন, আসমান এবং যমীনসমূহের বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সাথে যুদ্ধ করা ও তাদের হত্যা করা, বন্দী করা, তাদের দাস বানানো এবং তাদের ধন-সম্পদ জব্দ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।

কাজেই যুদ্ধে শত্রুর জীবনের ক্ষতি সাধন রাজনৈতিক নিয়ম এবং সামরিক কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা, অনুরূপভাবে শত্রুর সামরিক এবং আর্থিক শক্তিকে দখল করে নেয়াও সামরিক কৌশলের পূর্ণতা। আশ্চর্যের বিষয় যে, ইউরোপ যখন শত্রুর আর্থিক সামর্থ্য কব্জা করে, তখন তাকে সামরিক-রাজনৈতিক কৌশল বলা হয়, আর যখন ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদের আর্থিক সামর্থকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, তখন এর নাম লুটপাট ও ছিনতাই হয়ে যায়। আবার যুদ্ধে যখন শত্রুর জীবন সংহার করাও

বৈধ, তখন তাদের সম্পদ গ্রহণে কেন এত হৈচৈ ও প্রতিবাদ করা হয় ? অবশেষে ইসলাম যখন রকান বাণিজ্য কাফেলার প্রতি আক্রমণ পরিচালনা করেছে, তখন কি সে সব দুশমনদের বাণিজ্য কাফেলা ছিল না, যারা ইসলামের জানমালের দুশমন ? এ ধরনের মানুষের জানমালের প্রতি আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ কোন্ বিচার বা নীতির কাছে দূষণীয় ? বিশেষ করে এ আক্রমণ যদি কেবল তাদের সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে না হয়, বরং এ উদ্দেশ্যে হয় যে, এর সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রকারী ? অধিকন্তু সাধারণ রাষ্ট্রগুলোর সেনা অভিযান তো কেবল রাজ্যসীমা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, জাতিসংঘ সনদ থাকা সত্ত্বেও এখনো যা অনেকের কাছে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত। হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের জিহাদ এবং সাহাবায়ে কিরামের পদক্ষেপ শুধু আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর হুকুমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল, যাতে আল্লাহর বিধান ভূলুণ্ঠিত না হয়; আল আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীআত খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত না হয় এবং আল্লাহর স্মরণকারীগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে নিতে পারে নিজেদের প্রকৃত প্রভুর নাম। তেমনি কাফির ও ফাজিরগণ ঈমান আনুক বা না আনুক, তারা যেন আহকামুল হাকিমীন, আসমান ও যমীনসমূহের অধিপতি মহান আল্লাহর বিধানাবলী প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান করতে না পারে।

হযরত ইউশা ইবন নূন, হযরত সুলায়মান, হযরত দাঊদ ও অপরাপর নবী (আ)-গণের জিহাদ এ উদ্দেশ্যেই ছিল। আর হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) কিয়ামতের পূর্বে আসমান থেকে অবতরণ করার পর এ উদ্দেশ্যেই দাজ্জাল ও তার সেনাবাহিনীর সাথে জিহাদ করবেন, যেমনটি 'মুকাশিফাতে ইউহান্না' এবং তাহলিকীদের নামে পলের দ্বিতীয় পত্রে বলা হয়েছে। পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতিগুলো যদি চায় যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা, হুকুমত, রাষ্ট্রীয় ভাব-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়া তাদের অধিকার, ইযযত ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে, তবে তা হবে অসম্ভব। অথবা কোন রাষ্ট্র যদি চায় যে, তাদের উপদেশ বাণী দ্বারা খারাপ রীতিনীতি, বাতিল রেওয়াজ, ভ্রষ্ট চিন্তাধারা ও অবাস্তব কল্পনা রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই মিটিয়ে দেবে, তবে তা হবে দুঃসাধ্য।

নিঃসন্দেহে উপদেশ ও নসীহতের প্রভাব আছে, তবে তা সাদাসিধে মানুষদের জন্য। ঠাণ্ডা মাথার অপরাধীদের আপনি যতই নিষ্ঠা ও সহানুভূতির সাথে উত্তম থেকে উত্তম উপদেশ দিন না কেন, এরদ্বারা কিন্তু হঠকারী ও ধর্মবিমুখ ব্যক্তি খুব কমই প্রভাবিত হয়।

মানুষের মধ্যে সবার প্রবৃত্তি একই রকম নয়। এমন অনেক আছে যে, তাদের কারো জন্য আল্লাহ্ কিতাব নাযিল করেছেন, আর কারো জন্য লৌহ অবতরণ করেছেন। আজ যদি সহস্র ওয়ায়েয মিলে চান যে, তাদের ওয়ায-নসীহত দ্বারা ঐ সব লোককে হিদায়াত করবেন ও খারাপ প্রথাকে বিলোপ করবেন, তা হলে স্বাভাবিক

অবস্থায় তা পারবেন না। কিন্তু একটি শাহী ফরমান একই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উল্লিখিত হঠকারী ও ধর্মবিমুখ লোকের উক্ত খারাপ প্রথার বিলোপ সাধন করতে সক্ষম।

আদম সন্তানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ সন্তান, আমাদের নেতা, খাতিমুল আম্বিয়া ও সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে যখন মহা বিচারক, আসমান-যমীন তথা সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ্ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেন, সে সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী; না ছিল তাঁর কেউ সাহায্যকারী, না ছিল কোন উপদেষ্টা, এমনকি কোন সহকারীও ছিল না।

তিনি নবূওয়াত ও রিসালাতের ঘোষণা দিলেন। এই বলে আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত দিলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে এক মানো, এক উপলব্ধি করো এবং এক উপাস্য মানো, তাঁরই কাছে চাও এবং তাঁরই সামনে মাথা নত কর। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে তিনি সবাইকে নিষেধ করলেন; তাদেরকে সুন্দর চরিত্র গঠন ও সম্মানজনক কাজে উৎসাহ দিলেন। মোটকথা, তিনি পার্থিব ও পারলৌকিক এমন কোন কল্যাণ ও মঙ্গলজনক কাজ বাদ দেননি যার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং যার নির্দেশ প্রদান করেননি। তেমনি ইহ-পারলৌকিক এমন কোন গর্হিত কাজ ছিল না, যা থেকে তিনি নিষেধ করেননি।

সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষগুলো তাঁর সরাসরি বাণী, নির্দেশ ও উপদেশগুলো কান লাগিয়ে শুনল এবং গ্রহণ করল। আর যারা হঠকারী, ধর্মবিমুখ, একগুঁয়ে ও ধন-সম্পদের নেশায় উগুত্ত ছিল, তারা কেবল তাঁকে অস্বীকার ও মিথ্যারোপ করেই ক্ষান্ত থাকল না, বরং তাঁকে নানা ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণা দিল এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপে জর্জরিত করল। তাঁকে এবং তাঁর সাহাবীগণকে কষ্ট দিতে তারা কোনই ত্রুটি করল না (বিস্তারিত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করতেন আর এ পথভ্রষ্টদের জন্য দু'আ করতেন : اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ "হে আল্লাহ্! আমার কওমকে হিদায়াত দান কর, কেননা তারা জানে না।"

মক্কার মুশরিকদেরকে হাত দিয়ে কিংবা মুখ দিয়ে কোনরূপ প্রতিশোধ নেয়ার ব্যাপারে হযরত (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুমতি ছিল না; বরং নির্দেশ ছিল :

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর, যতক্ষণ না ঐ ব্যাপারে আল্লাহ্ কোন নির্দেশ দেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারা : ১০৯)

পরিশেষে যখন তিনি ও তাঁর সাহাবা কিরাম হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হন, তখন জিহাদের অনুমতি সম্বলিত কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

জিহাদের নির্দেশ

হযরত ইবন আব্বাস[১], হযরত আবূ হুরায়রা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), যুহরী, সাঈদ ইবন যুবায়র, মুজাহিদ, উরওয়া ইবন যুবায়র, যায়দ ইবন আসলাম, কাতাদা, মুকাতিল ইবন হায়্যান (র) এবং অপরাপর মহান আলিমগণের বর্ণনানুযায়ী জিহাদের অনুমতি যে আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম নাযিল হয়, তা হলো এই :

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ - اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ - اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ·

“যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম; তাদেরকে শুধু এ কারণে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্।’ আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তা হলে (খৃস্টান সংসার বিরাগীদের) আশ্রয়স্থল, গির্জা, (ইয়াহূদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত–যাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী সত্তা। আমি এদেরকে (মুসলমানদেরকে) যদি প্রতিষ্ঠা দান করি, তা হলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে। আর সকল কাজের শুভ অশুভ পরিণাম আল্লাহরই এখতিয়ারে।” (সূরা হজ্জ : ৩৯-৪১)[২]

---

১. হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মুস্তাদরাক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন। হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ। যারকানী ও যাদুল মাআদ হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে, আবদুর রাযযাক ও ইবন মিসতাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন (দুররে মনসূর, ৪খ. পৃ. ৩৬৪)। আর হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা নাসাঈ সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। যারকানী (১খ. পৃ.৩৭৮) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে এবং যুহরী হযরত সাঈদ ইবন যুবায়র (রা) থেকে ও আল্লামা আবূ বকর রাযী আল-জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে (১খ. পৃ. ১৭৫) বর্ণনা করেছেন। আর এ সনদেই মুকাতিল তাফসীরে ইবন কাছীরে বর্ণিত হয়েছে।

২ আল্লামা যারকানী (১খ, পৃ. ২৮৭) বলেন, এ আয়াত তৃতীয় হিজরীর সফর মাসের এগার তারিখে অবতীর্ণ হয়। আর কারো কারো বক্তব্য থেকে জানা যায়, যুদ্ধের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিলের সময়কাল ছিল প্রথম হিজরী।

আর কিছু সংখ্যক আলিমের বক্তব্য হলো, যুদ্ধের ব্যাপারে প্রথম যে আয়াত নাযিল হয়, তা হচ্ছে :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ·

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।" (সূরা বাকারা : ১৯০)

এ উদ্ধৃতি আবুল আলিয়া সূত্রে ইবন জারীর তাবারীর। আর হাকিম তাঁর 'ইকলীল' গ্রন্থে বলেছেন, যুদ্ধ বিষয়ে সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এ আয়াত :

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ·

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।" (সূরা তাওবা : ১১১) (যারকানী, ১খ. পৃ. ২৮৭)।

যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা সামষ্টিকভাবে যুদ্ধের প্রয়োজন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং ইঙ্গিতে ঐ সমস্ত লোকের এ সন্দেহেরও জবাব দিয়েছেন, যারা বলে যে, যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে ইসলাম রক্তপাতের দ্বার উণ্ডুক্ত করে দিয়েছে। মোটামুটি জবাব এই যে, প্রয়োজনে যুদ্ধের নির্দেশ কেবল ইসলামের সর্বশেষ নবীর সাথেই নির্দিষ্ট নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী-রাসূল (আ)-গণকেও জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি জিহাদের অনুমতি না দেয়া হতো, তা হলে আল্লাহর নাম নেয়াটাও কঠিন হয়ে দাঁড়াতো এবং সমস্ত উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো। আর আল্লাহ্ তা'আলার এটাও চিরন্তন বিধান যে, তিনি সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে জিহাদের আদেশ করে থাকেন যাতে ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টিকারী, বিবাদকারী, ফিতনাবাজ অনিষ্টকারীদের হাত থেকে আল্লাহর অন্য বান্দাদের রক্ষা করা যায়। আল্লাহ্ বলেন :

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ·

"আল্লাহ্ যদি মানব জাতির একদলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তা হলে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু আল্লাহ্ গোটা বিশ্বজাহানের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা বাকারা : ২৫১)

এ সকল আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদের সাধারণ প্রয়োজন এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছাড়াও এর কারণও বর্ণনা করেছেন—সাহাবায়ে কিরামকে কেন যুদ্ধ ও জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে? তা এ জন্য যে, তাঁদের প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল এবং বিনা অপরাধে ও অকারণে তাঁদেরকে আপন ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে 'আমাদের রব আল্লাহ্' শুধু এ কথা বলার কারণে। আর জিহাদের অনুমতি কেবল মক্কার মুশরিকদের কালো হাত গুড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই নয়, বরং

এর উদ্দেশ্য আল্লাহর দীনকে সাহায্য সহযোগিতা করা। وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ "আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।"

আর সর্বশক্তিমানের এ শক্তি রয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে তাঁর অনুসারী বান্দাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে তাঁর দীন এবং বিধি-বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের শক্তি ও সামর্থ্য দান করেন, যাতে তারা পৃথিবীর কর্তৃত্ব পেয়ে নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করে। নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং অন্যকেও সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে।

অর্থাৎ যে সমস্ত লোককে আমি জিহাদের অনুমতি দিয়েছি এবং যাদেরক সাহায্য সহযোগিতা করার ওয়াদা করেছি, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, শাসন কর্তৃত্ব পাওয়ার পর তারা পৃথিবীর অপরাপর শাসকদের ন্যায় আরাম-আয়েশে নিমজ্জিত হবে না; বরং জীবন ও সম্পদের সদ্ব্যবহার দ্বারা তারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হবে এবং অপরকেও সঠিক পথে পরিচালিত করবে। মোটকথা নিজেও পরিপূর্ণ হবে এবং অপরকেও পরিপূর্ণ করবে, নিজেও হিদায়াতের ওপর থাকবে এবং অপরকেও সুপথে আনয়ন করবে। কাজেই এ পরিপূর্ণ গুণাবলী খুলাফায়ে রাশেদীনের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল। আর তা কেন হবে না, যাঁদেরকে আল্লাহ্ আসমানী নিরপেক্ষ বিধি-বিধান সমৃদ্ধ শাসন কর্তৃত্ব খিলাফতের জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁদের তো এমন গুণাবলীই থাকা প্রয়োজন।

সুতরাং হযরত উসমান গনী (রা) বলতেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খিলাফত রাজত্বদানের পূর্বেই তাঁদের প্রশংসা ও গুণগান করেছেন যে, তাঁরা খিলাফত ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পেলে এমনটিই হবেন।

জিহাদের তাৎপর্য

জিহাদ শব্দটি 'জুহদ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, এর অর্থ শক্তি। যার তাৎপর্য হলো, স্বীয় শক্তিকে শুধু ধন-সম্পদ অর্জন, গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব, জাতীয়তা, স্বদেশ প্রীতি, বাহাদুরী ও বীরত্ব প্রদর্শন, রাজ্যসীমা বৃদ্ধি বা শাসন করার জন্যই নয়, বরং আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ও তাঁর প্রদত্ত বিধানের শ্রেষ্ঠত্বকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে নিজের শক্তিকে পানির মত বইয়ে দেয়াকে শরীআতের পরিভাষায় জিহাদ বলে।

যদি আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা উদ্দেশ্য না হয়, বরং কেবল সম্পদ-কাঞ্চন উদ্দেশ্য হয় অথবা হক-বাতিলের বাছ-বিচার না করে দেশ এবং সম্প্রদায়কে সাহায্য করা অথবা নিজের বীরত্ব ও শক্তিমত্তা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সেটা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে জিহাদ নয়। জিহাদ তো কেবল তা-ই, যা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করা হয়, পার্থিব ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ কালিমা থেকে তা সম্পূর্ণ পবিত্র হবে।

সার সংক্ষেপ

আল্লাহর বিদ্রোহীদের সাথে তাঁর বিরোধী হওয়ার কারণে বিশ্বস্ত বান্দাদের লড়াই করার নাম জিহাদ। তবে শর্ত হলো, তা হবে একমাত্র আল্লাহর বাণী ও তাঁর

বিধি-বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পার্থিব কোন প্রকার লাভের উদ্দেশ্য তাতে থাকবে না। এমন বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গকারীকে শরীআতে শহীদ বলা হয়।

نشود نصیب دشمن که شود هلاك تغیت

سردو ستاں سلامت که توخنجر از مای

যদি সম্পদ উদ্দেশ্য হয় কিংবা সুখ্যাতি লাভের বাসনা, অথবা ইসলাম ছাড়া কেবল দেশ জয় বা জাতির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা, তা হলে শরীআতে তা জিহাদ নয়, বরং এক ধরনের যুদ্ধ। সুতরাং হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মানুষ কখনো বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, কখনো নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও অহমিকার ভিত্তিতে, আর কখনো যশ ও খ্যাতির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে। এর মধ্যে কোন্টি আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে বিবেচ্য হবে? জবাবে তিনি বললেন :

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ٠

"যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, শুধু সেটাই 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় সংযোজন করেছেন যার নাম হলো لا يقال فلان شهيد অর্থাৎ কারো সম্পর্কে পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলা যাবে না যে, সে ব্যক্তি শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করেছে। তা এ জন্যে যে, তার উদ্দেশ্য ও জীবনকালের সমাপ্তির অবস্থা কারো জানা নেই। তিনি ঐ অধ্যায়ে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কোন এক যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের সাথে নবী করীম (সা)-এর মুকাবিলা হলো। ঐ যুদ্ধে সাহবায়ে কিরামের বাহিনীর সাথে কোযমান নামে এক ব্যক্তি ছিল– যে ছিল গোপনে মুনাফিক। এ যুদ্ধে সে মুশরিকদের বিরুদ্ধে খুবই বীরত্ব দেখায় ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সাহাবী হযরত সাহল ইবন সা'দ সাইদী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ما اجزا منا اليوم احدكما اجزا فلان "আজ আমাদের মধ্যে কেউ ততটা কাজ করেনি, যতটা অমুক ব্যক্তি করেছে।" উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اما انه من اهل النار "জেনে রাখ, সে জাহান্নামী।"

শেষ পর্যন্ত কাফিরের সাথে যুদ্ধ করতে করতে সে ব্যক্তি গুরুতর আহত হলো এবং আঘাতের যন্ত্রণা সইতে না পেরে সে আত্মহত্যা করল। হাফিয আসকালানী[১] এ হাদীসের ভাষ্যে বলেন, অধ্যায় শিরোনামের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এই যে, ঐ ব্যক্তি

---

১. হাফিয আসকালানীর মূল ইবারত এই : ووجه اخذ الترجمة مسئلة انهم شهيد وابرحجائه فى امر الجاد فلو كان كان قتل لم يمتنع ان يشهدوا له بالشهادة وقد ظهر منه انه لم يقاتل لله وانما قاتل غضبا لقومه فلا يطلق على كل مقتول فى الجهاد انه شهيد لاحتمال ان يكون مثل هذا ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৬৬, কিতাবুল জিহাদ, باب لايقال فلان شهيد অধ্যায়।

আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করেনি, বরং জাতির শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় উদ্দীপ্ত হয়ে যুদ্ধ করেছিল। ফলে এরূপ ব্যক্তিকে শহীদ বলা যায় না। বর্ণনার উপসংহারে জানা গেল, যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সাহায্যার্থে কাফিরের সাথে যুদ্ধ করে, কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে নয়, বরং দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করে, তা হলে এরূপ ব্যক্তিকেও মুজাহিদ বা শহীদ বলা যাবে না। এ যেন স্বজাতি ও স্বদেশী ভাইদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামী ভাইদের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রস্তুত হয়েছে। হাফিয বদরুদ্দীন আইনী লিখেছেন, যুদ্ধের ময়দানে এ ব্যক্তি (কোযমান) সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। সে কাফিরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে এবং চিৎকার দিয়ে বলে, ওহে আওস সম্প্রদায়! নিজেদের মান-মর্যাদা ও দেশ-জাতির নিরাপত্তার জন্য লড়াই কর। হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা) নামক জনৈক সাহাবী তার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার গুরুতর অবস্থা দেখে বলেন, هنيا لك الشهادة "ওহে কোযমান, তোমার শাহাদত কল্যাণময় হোক।" কোযমান এ কথা শুনে উত্তর দিল :

انى والله ما قاتلت على دين ما قاتلت الاعلى الحفاظ

"আল্লাহর শপথ, আমি ইসলাম ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিনি, আমি তো কেবল গোত্র ও সপ্রদায়ের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যুদ্ধ করেছি।"

পরিষ্কার অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সমাজে তাঁর বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার নিয়্যত ছাড়া নিছক জাতি ও দেশের জন্য যুদ্ধ করা এবং এতে নিহত হওয়ায় মানুষ মুজাহিদ বা শহীদ হয় না। নিছক আল্লাহর ওয়াস্তে যে যুদ্ধ আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে করা হয়, তাতে নিহত হলে সে শহীদ হয়।

এর পরে ঐ ব্যক্তি যখন আত্মহত্যা করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কখনো কখনো ফাজির ও কাফির ব্যক্তি দ্বারাও ইলামকে শক্তিশালী করে থাকেন।" এ বর্ণনা উমদাতুল কারী গ্রন্থে (৬খ. পৃ. ৬৩১) باب لا يقال فلان شهيد শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী :

وَمَا اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِادْفَعُوْا ۔

"যেদিন দুই দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, সেদিন তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল, এটা মু'মিন এবং মুনাফিকদের প্রকাশ্যে জানার জন্য আল্লাহর নির্দেশেই হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৬-১৬৭)

কেননা শত্রু যদি জয়যুক্ত হয়, তবে প্রতিশোধ গ্রহণে মু'মিন এবং মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য করবে না। সাধারণ মুসলমানদের ন্যায়ই তোমাদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ আয়াত মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূল প্রসঙ্গে নাযিল

হয়েছিল। উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যুদ্ধ করেছিলেন আর আবদুল্লাহ ইবন উবাই ও অপরাপর মুনাফিকগণ কেবল সম্প্রদায় ও দেশকে সাহায্য করার লক্ষ্যে শত্রু প্রতিহত করছিল। এর দ্বারা পরিষ্কার জানা গেল, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতিতে সম্প্রদায় এবং দেশের জন্য শত্রু প্রতিহত করার নাম জিহাদ নয়। উপরোক্ত আয়াতের قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰه অংশে যে শর্ত চিহ্নিত করা হয়েছে, তার অর্থ এটাই।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, (বদর যুদ্ধে) কিছু সংখ্যক মুসলমান নিজ জন্মভূমি রক্ষার্থে মুশরিকদের সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুকাবিলায় বের হয়। আর বদরের যুদ্ধে কাফির সেনাদলের সাথে অংশগ্রহণকারী এ মুসলমানদের মধ্যে যারা সাহাবায়ে কিরামের হাতে নিহত হয়, তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰۤئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰۤئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاۤءَتْ مَصِيْرًا ٠

"নিশ্চয়ই যখন ফেরেশতাগণ এরূপ লোকদের রূহ কবয করেন, যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হিজরত না করে নিজেদের পাপী করে রেখেছিল, তোমরা কোন্ কর্মে ছিলে ? তারা বলবে, আমরা যমীনে অসহায় ছিলাম। তখন ফেরেশতারা বলবেন, আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না ? তোমাদের উচিত ছিল হিজরত করে সেখানে যাওয়া। এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কত মন্দ আবাস।" (সূরা নিসা : ৯৭)

এ আয়াত ঐসব ব্যক্তি প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা ইসলামকে সহায়তা না করে বরং নিজ সম্প্রদায় এবং নিছক দেশের খাতিরে কাফির সেনাদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হয়েছিল।

জিহাদের আদব

১. জিহাদের উদ্দেশ্যে যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন আল্লাহর নাম স্মরণ করে বের হবে।

২. অহংকার কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা ভুলে জৌলুসের সাথে বের হবে না।

৩. পরস্পর পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করবে না, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে সবসময় সামনে রাখবে।

৪. সংঘর্ষের সময় দৃঢ়পদ থাকবে, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে মুকাবিলা করবে।

৫. তুমুল লড়াই চলাকালেও আল্লাহর স্মরণ থেকে অন্যমনস্ক হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ

الصّٰبِرِيْنَ - وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ .

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হবে, তখন (১) অবিচল থাকবে এবং (২) আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে এবং (৪) নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে সাহাস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা অটল অবিচল থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। (৫) তোমরা তাদের মত হবে না, যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজ গৃহ থেকে রণাঙ্গণে বের হয়। তারা যা করে, আল্লাহ্ তা বেষ্টন করে আছেন।" (সূরা আনফাল : ৪৫-৪৭)

৬. নিজেদের সংখ্যাধিক্যে ও অস্ত্র-রসদের প্রাচুর্যে কখনো গর্বিত হবে না এবং সংখ্যাস্বল্পতায় কখনো হতাশ হবে না; বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার ওপর নির্ভর করবে। বিজয়দাতা ও সাহায্যকারী হিসেবে কেবল আল্লাহর ওপরেই নির্ভর করবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ - ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ .

"আল্লাহ্ তোমাদেরকে তো বহু ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি, বরং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল ও পরে তোমাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের ওপর তাঁর নিকট থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী অবতরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। এটাই হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা : ২৫-২৬)

৭. যখন বাহনে আরোহণ করবে, তখন প্রথমে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করবে যে, তিনি তোমার আরামের জন্য এ বাহন তৈরি করেছেন। আর এ আয়াত পাঠ করবে :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ .

"পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি এটিতে আমার বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও এটিকে বশীভূত করতে আমরা সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ফিরে যাব।" (সূরা যুখরুফ : ১৩-১৪)

৮. যখন কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করবে, তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্মরণ করে তাকবীর ধ্বনি দেবে। আর যখন কোন নিম্নভূমিতে অবতরণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ বলবে। এ জন্যে যে, তিনি সর্বপ্রকার নীচুতা থেকে পাক ও পবিত্র।

৯. যদি আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে বিজয় ও সাফল্য দান করেন, তখন মুজাহিদ বাহিনীর সিপাহসালারের কর্তব্য হলো, মুজাহিদদেরকে কাতারবন্দী করে নিম্নের বাক্যসমূহ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার শোকর করা, তাঁর প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করা; আর মুজাহিদরা তখন 'আমিন' বলবে।

اللهم لك الحمد كله لاقابس لما ببضطت ولاباسط لما قبضت ولا هادى لمن اضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطى لما منعت ولا مانع لما اعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورفقك ·

"হে আল্লাহ্! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, যা তুমি প্রশস্ত কর, তা কেউ সংকুচিত করতে পারে না, আর তুমি যা সংকুচিত করবে, কেউ তা প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে গুমরাহ কর, কেউ তাকে পথ দেখাতে পারে না, আর তুমি যাকে পথ দেখাও, কেউ তাকে গুমরাহ করতে পারে না। তুমি যাকে বঞ্চিত কর, কেউ তাকে সেটা দিতে পারে না, আর তুমি যাকে দাও, কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না। আর তুমি যাকে কাছে টানো, কেউ তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য তোমার বরকত, তোমার অনুগ্রহ, তোমার মর্যাদা এবং তোমার বন্ধুত্বকে প্রশস্ত করে দাও।" (নাসাঈ ও ইবন হিব্বান)

১০. বিজয়ের সৌভাগ্য অর্জনের পর বলো না যে, আমরা জয় করেছি। বরং আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করে বল যে, কেবল তাঁরই অনুগ্রহ ও দয়ায় আমরা জয়লাভ করেছি। যেমন এমর্মে হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তাঁর মুখে তাওহীদের এ বাণী উচ্চারিত হতো :

لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ - صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ·

"আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, মালিকানা তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, আর তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী, গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রুদলকে একাই পর্যুদস্ত করেছেন।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ)

১১. কুকুর, ঘন্টা ও বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে নিও না। যে কাফেলার সাথে এসব থাকে, (রহমতের) ফেরেশতা তাদের সাথে থাকেন না। (হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মুসলিমে বর্ণিত)। অর্থাৎ আরাম-আয়েশ এবং আনন্দ-স্ফূর্তির কোন বস্তুই সঙ্গে রাখবে না।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ভেবে দেখুন, ইসলামী জিহাদের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে তারা ইসলামের একদল সৈন্য কিন্তু অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে তারা পৃথিবীব্যাপী আসমান যমীনের স্রষ্টার ভালবাসায় সিক্ত একটি দল।

জিহাদের প্রকারভেদ

জিহাদ বিভিন্ন প্রকার। জিহাদের একটি প্রকার হলো প্রতিরোধ। একে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধও বলা হয়। অর্থাৎ কাফিরদের কোন সম্প্রদায় প্রথমে তোমাদের ওপর হামলা চালালে এর প্রতিরোধে তোমরা ওদের মুকাবিলা করবে। এ প্রকারের জিহাদকে আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَاتَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ·

"যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (সূরা বাকারা : ১৯০)

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُنِ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ·

"যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে, যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। তাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক'।" (সূরা হাজ্জ : ৩৯-৪০)

জিহাদের দ্বিতীয় প্রকার হলো অগ্রগামী হয়ে আক্রমণ করা। অর্থাৎ কাফিরের শক্তি ও দাপট ইসলাম ও তার লালনক্ষেত্র মুসলিম ভূ-খন্ডের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি ও বিপজ্জনক হয়ে পড়ে, এক্ষেত্রে ইসলাম স্বীয় অনুসারীদের এ নির্দেশ দেয় যে, বিপদ নিশ্চিত জানলে আক্রমণাত্মক হামলা কর এবং প্রতিরোধে অগ্রসর হও। কেননা যখন দুশমনদের থেকে ভয়ের কারণ থাকে, তখন সাবধানতা এবং এরূপ পন্থা অবলম্বন সময়ের দাবি হয়ে পড়ে—যাতে ইসলাম ও মুসলমানগণ কাফির ও মুশরিকের আগ্রাসন থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আর নির্ভয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বিধান পালন করতে সক্ষম হয় এবং যে কোন অপশক্তি ও বিক্রম তাদেরকে নিজেদের দীন থেকে সরাতে বা বিরত রাখতে না পারে। তেমনি কোন শক্তি আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে। এমতাবস্থায় জ্ঞান ও দূরদর্শিতা, বিচার-বিবেচনা ও রাজনীতির

এটাই দাবি যে, বিপদ সামনে আসার পূর্বেই তা নির্মূলের ব্যবস্থা করা। বিপদ সামনে এসে পড়লে তা প্রতিহত করা হবে—এ লক্ষ্যে অপেক্ষা করা উচ্চ পর্যায়ের বোকামী ও মূর্খতা বৈ কিছু নয়। সিংহ ও ব্যাঘ্র হামলা করার পূর্বেই যেমন এগুলো হত্যা করা, দংশন করার পূর্বেই যেমন সাপ ও বিচ্ছুকে মেরে ফেলা যুলুম নয়, বরং উন্নত পর্যায়ের বিচক্ষণতা এবং সঠিক ব্যবস্থাপনা, অনুরূপ ক্ষেত্রেও কাফির ও মুশরিকদের কোথাও ইসলাম ও মুসলমানদের বড় রকমের ক্ষতির জন্য সম্ভাব্য মাথাচাড়া দেয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করা উচ্চ পর্যায়ের দূরদর্শিতা। চোর, লুটেরা কিংবা হিংস্র পশু যদি কোন জঙ্গল অথবা বিরানভূমিতে একত্রিত হয়, তা হলে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবি হলো, আবাসিক এলাকায় আক্রমণের পূর্বেই তাদের শেষ করে দেয়া। হিংস্র পশুকে আক্রমণের পূর্বেই হত্যা করা জ্ঞান এবং বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ "(তোমাদের হত্যার জন্য উদ্যত বা তাতে লিপ্ত) মুশরিকদের হত্যা কর, যেখানে তাদের পাও।" এবং اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِلُوْا تَقْتِيْلاً "ওদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং যথাযথভাবে হত্যা করা হবে।" প্রভৃতি আয়াতে যুদ্ধরতদের ব্যাপারে এ ধরনের নির্দেশ এসেছে। হিংস্র পশুকে হত্যা করা, আক্রমণাত্মক মনে করা এবং এ ধারণা করা যে, ঐ পশুগুলো একত্রিত হয়ে যখন আমাদের ওপর হামলা করবে, তখন তা প্রতিহত করা হবে, এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের খোলাখুলি বোকামী ও মূর্খতা। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন : وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ "আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন (প্রতিবন্ধকতামুক্ত হয়ে) সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যায় (কোন প্রতিবন্ধকতা অবশিষ্ট না থাকে)।" এসব পরিস্থিতিতে এ ধরনের জিহাদই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও লড়াই কর যেন কুফরের ফিতনা অবশিষ্ট না থাকে এবং আল্লাহর দীনের পূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়। এ আয়াতে ফিতনা বলতে কাফিরের শক্তি ও দাপট বুঝানো হয়েছে। আর আয়াতের দ্বার দীনের প্রকাশ ও প্রাধান্যই উদ্দেশ্য। যেমন অপর আয়াতে আছে, দীনের প্রভাব ও প্রাধান্য যেন এতটাই অর্জিত হয় যে, কাফিরের শক্তি দ্বারা যাতে এর পরাজিত হওয়ার কোন অবকাশই অবশিষ্ট না থাকে এবং কুফর ও শিরকের ফিতনা থেকে দীন ইসলাম সম্পূর্ণ নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হয়।

বাকী থাকলো কুফরের ফিতনা থেকে দীন ইসলাম কিভাবে পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এ নিরাপত্তার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। একটি পদ্ধতি হলো কাফিররা মুসলমানদের সামনে অস্ত্র সমর্পণ করবে এবং মুসলমানদের প্রজা হয়ে জিযয়া দিয়ে ইসলামী হুকুমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। যখন বিশ্ব সমাজে দাসপ্রথা চালু ছিল, তখনকার নিয়মানুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের প্রতিপক্ষ ক্ষতিপূরণ দিয়ে ফেরত না নিলে বা বন্দী বিনিময় না করলে তখন তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ওরা মুসলমানদের দাস হিসেবে থাকতো।

নিরাপত্তার দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কাফিররা মুসলমানদের সাথে নিরাপত্তামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। আর তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কাফিররা মুসলমানদের নিরাপত্তায়

এসে পড়বে। এ পদ্ধতিসমূহে এ ধরনের কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়ে যায়। ইসলামী সমাজে জিহাদের হুকুম কেবল যুদ্ধবাজ কাফিরের জন্য নির্দিষ্ট; যিম্মী এবং চুক্তিবদ্ধ শান্তিপ্রিয় কাফিরদের ব্যাপারে হুকুম আলাদা (তখন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অনুসরণীয়)।

যে সমস্ত কাফির ইসলামী হুকুমতে বসবাস করে, তারা ইসলামী শরীআতের বিচার ব্যবস্থা এবং সামাজিক জীবনের হুকুম-আহকামে নাগরিক অধিকারের দিক থেকে মুসলমানদের সমান। তাদের জীবন-সম্পদ ও ইযযত-সম্ভ্রমের হিফাযত করা মুসলমান এবং ইসলামী হুকুমতের জন্য ফরয বা আবশ্যিক। তবে শর্ত এই যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে কোন গোপন ষড়যন্ত্র করবে না। বলা বাহুল্য, শত্রু ও মিত্র, যুদ্ধবাজ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের ব্যাপারে নির্দেশের তারতম্য সকল বিজ্ঞজনের কাছেই সমর্থিত।

জিহাদের উদাহরণ : জিহাদের উপমা এভাবে বুঝে নিন যে, যখন কোন ব্যক্তির হাতে একটি ফুস্কুড়ি কিংবা ফোঁড়া উঠে, তা হলে এর প্রথম চিকিৎসা পট্টি বাঁধা, এটা লাগালে দূষিত রক্ত বেরিয়ে যাবে কিংবা ভাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো অস্ত্রোপচার আর তৃতীয় পর্যায় হলো পূরো দেহসত্তার সুস্থ রাখার বৃহত্তর স্বার্থে চিকিৎসকের দ্বারা ঐ আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলা, যাতে শরীরের অন্য সুস্থ অঙ্গ এর দ্বারা আক্রান্ত হতে না পারে।

এ অবস্থায় যদি চিকিৎসক কারো হাত কিংবা পা কেটে দেয়, তা হলে সবাই ঐ চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তাকে উচ্চ মূল্যের ফী, হাদিয়া ও উপঢৌকন দিয়ে থাকে। আর জীবনভর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে এজন্যে যে, তিনি একটি অঙ্গ কেটে অপরাপর অঙ্গসমূহকে পচে যাওয়া, গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং গোটা দেহসত্তার নিরাপত্তা বিধান করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জীবনকে সুখী করেছেন। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই চিকিৎসকের এ কাজকে পাশবিক কিংবা নির্যাতনমূলক বলে মনে করে না। অনুরূপভাবে রূহানী চিকিৎসক (নবী-রাসূল)-গণ আল্লাহর নির্দেশে প্রথমে কুফরীরূপ ফোঁড়ায় ওয়ায-নসীহতের পট্টি বেঁধে দেন। যদি এ দ্বারা উপকার না হয় এবং ঐ অঙ্গ সুস্থ হওয়ার আশা তিরোহিত হয়, বরং আশঙ্কা দেখা দেয় যে, এ অঙ্গ সংক্রমিত হয়ে নষ্ট করে ফেলবে, তখন ঐ অঙ্গ কেটে ফেলে দেন যাতে অন্য অঙ্গ এর ক্ষতি থেকে রক্ষা পায় এবং দূষিত রক্ত বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ না পায়। ঈমানদারদের ঈমানকে উল্লিখিত পন্থায়ও রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ : চোর এবং ডাকাতের শাস্তি বিধান রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্যাদির অন্তর্ভুক্ত। যদি তা না হয়, তা হলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যারা মানুষের ঈমানরূপ সম্পদ ছিনতাই করে, আর এটা চায় যে, আমাদের থেকে ঈমান ও সত্যকে লুট করে নেবে, আর তারা ইচ্ছা করে যে, (আল্লাহ্ মাফ করুন) সত্যপন্থীদেরকেও তাদের মত ডাকাত এবং লুটেরা অর্থাৎ কাফির বানিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিশ্বাসী বান্দাদের দফতর থেকে তাদের নাম কাটিয়ে

আল্লাহদ্রোহীদের দলে শামিল করে নেবে, তা হলে এরূপ ব্যক্তির বিরুদ্ধেও জিহাদ ও লড়াই করা ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিবেচনা প্রসূত কাজই হবে। বরং তা হবে ওয়াজিব। শরীআতের অপরাপর ফরয কাজের মতই মানব সমাজের দুশমন ঐ অপরাধপ্রবণ লুটেরাদের মূলোৎপাটন করাও অবশ্য কর্তব্য। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে উল্লিখিত যালিম ও শোষকদের নিপীড়নে মানবতা আর্তনাদ করতে থাকলে, ইসলাম তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলে ঐ জনগণ তখন ইসলাম ও মুসলমানদের স্বাগত জানায়।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : জিহাদের নির্দেশদানের মাধ্যমে সমস্ত কাফিরকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য এটাই যে, গোটা মানবতার কল্যাণে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে শাসক হয়ে থাকবে এবং মানুষ সম্মানের সাথে জীবন যাপন করবে ও নিরাপদে নিশ্চিন্তে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে। এ ভীতি থাকবে না যে, কাফিররা তাদের দীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

ইসলাম তার শত্রুদের জীবন ও অস্তিত্বের শত্রু নয়, বরং তাদের এমন প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানসিকতা, কার্যক্রম ও আড়ম্বরের শত্রু, যা ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদের জন্য ভীতির কারণ। পৃথিবীর সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক-বাহক জাতি-গোষ্ঠীগুলো এ কথা সমর্থন করে যে, নিজেদের জান-মাল, ইযযত-আব্রুর নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার এবং এটা ঐতিহ্যবাহী বীরত্বব্যঞ্জক ধারণা। তবে জানি না, মুসলমানদের জন্য এ অধিকারকে সমর্থন করতে কেন কৃপণতা করা হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক দল, সর্বপ্রকারের বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা-চালাকী-চাতুরী, যেভাবেই সম্ভব নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব-আধিপত্য ও নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী এবং নিজেদের বিরোধীদের পরাভূত করার জন্য যে অস্ত্রই ব্যবহার করা সম্ভব, তার নাম তারা রাজনীতি ও দূরদর্শিতা রেখে থাকে। কিন্তু যদি কোন জনগোষ্ঠী সত্য ও সততার সাথে, বৈধ পন্থায়, সুবিচার ও পরম ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে অসত্যের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা হলে স্বার্থান্ধ ঐ সকল শক্তি ও ব্যক্তিগণ এর নাম দেয় গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদিতা ইত্যাদি।

সুবহানাল্লাহ্! যে সত্য দীনে নিজেদের দুশমনের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলা, তাদেরকে অপবাদ দেয়া এবং তাদের ওপর যুলুম-নির্যতন করা হারাম, তাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযত করা তাদের প্রথম পর্যায়ের ফরয ও উদ্দেশ্য, সে দীন ইসলমের উচ্চ মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজ্ঞোচিত কার্যক্রম সম্পর্কে ঐ মতলববাজ, স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক অসাধু ও লুটেরাদের এ সমালোচনা করার কী অধিকার আছে?

ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য এই যে, সত্য এবং প্রকৃত ন্যায় ও সুবিচারকামীরাই পৃথিবীর নেতৃত্ব দান করবে, যাতে স্বার্থপর ব্যক্তি কিংবা পার্টি বা কোন অন্যায়কারী আধিপত্যবাদী শক্তি পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করতে না পারে এবং কোন জনপদের মানুষের ওপর অত্যাচার, শোষণ, যুলুম-নিপীড়ন চালাতে না পারে।

যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য শুধু সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা ও সত্য সুরক্ষিত হোক, আর ঘুষখোর, চোর, পাপিষ্ঠ, ব্যভিচারী, অসৎ চরিত্র, বেহায়াপনা এবং সমস্ত

গর্হিত কাজ ও স্বার্থপরতার মূলোচ্ছেদ হোক, এ ধরনের যুদ্ধ বর্বরতা নয়; বরং উন্নত পর্যায়ের ইবাদত ও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অশেষ কল্যাণ ও অনুগ্রহ।

আর কুরআন মজীদে যে জিযয়ার নির্দেশের উল্লেখ রয়েছে, এর উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও বাতিল যাতে সত্য ও ন্যায়ের সামনে মাথানত করে। জিযয়ার আয়াত : حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ এ صغار (সিগার) শব্দদ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে। আর এ জিযয়াদাতাকে শরীআতের পরিভাষায় যিম্মী ও মু'আহিদ এজন্যে বলে যে, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ঐ শ্রেণীর লোকের জীবন ও সম্পদের হিফাযতের যিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন।

ইসলাম এবং জবরদস্তি

মানুষকে জোরজবরদস্তি করে মুসলমান বানানোর জন্য জিহাদ নয়, বরং ইসলামের ইযযত ও সম্মানের হিফাযত ও মযলূমের মুক্তির জন্য। আর পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়, বিশ্বের কোন ধর্ম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছাড়া মানবতার কল্যাণে এ কাজ করতে পারে না। ইসলাম ও মানবতার দুশমনেরা আকাশ মাথায় তুলে নিয়েছে এবং মুখে ও কলমের দ্বারা (ও মিডিয়ার জোরে) এ ঢাক বাজিয়ে বেড়াচ্ছে যে, তরবারির দ্বারাই ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং ইসলাম সন্ত্রাসী। অথচ তারাই মুসলমানদের ভূখণ্ড রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দ্বারা দখল করে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের উল্টো সন্ত্রাসী বলছে! ওদের এটা জানা নেই যে, ইসলামী শরীআত অনুযায়ী মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলে, যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে ইসলামের সত্যকে মুখে স্বীকার এবং অন্তর দিয়ে তা সত্যায়ন করে। আর যে ব্যক্তি কোন প্রকার লোভ-লালসায় কিংবা কোন ভয়-ভীতির কারণে কেবল মুখে ইসলামের উচ্চারণ করে এবং অন্তর দ্বারা এর সত্যায়ন কিংবা বিশ্বাস পোষণ না করে, এ ব্যক্তি ইসলামী শরীআত অনুযায়ী মুসলমান নয়; বরং তাকে মুনাফিক বলা হয়। প্রকাশ থাকে যে, এ বিশ্বাস আবশ্যিক। আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন (যা ইসলামের অংশবিশেষ নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস) না কোন জোরজবরদস্তির দ্বারা আদায় করা যায়, আর না কোন উৎসাহ দান বা ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা। আর যদি কোন লোভ কিংবা ভয় দেখিয়ে জোর করে মুখে কোন বিষয়ে শপথ উচ্চারণও করানো হয়, কিন্তু অন্তর তখনই তা সত্যায়ন করে, যখন তার সামনে দলীল-প্রমাণ দ্বারা এর সত্যতা উদ্ভাসিত হয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত শক্তিও যদি চায় যে, জোরজবরদস্তি করে কারো অন্তরে শান্তি দেবে, তবে তা হবে অবাস্তব ও অসম্ভব। খঞ্জর, তীর ও তরবারি দিয়ে কোন বিশ্বাসকে অন্তরে গেঁথে দেয়া যায় না। আর এ প্রকৃত কারণকে সম্ভবত কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অস্বীকার করতে পারবে না। সুতরাং ইসলাম তরবারির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করেছে—এ কথা কেবল নেহায়েত ভুলই নয়, বরং নিজেদের জঘন্য অপরাধকে ঢাকা দেয়ার বা তা থেকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে নেয়াই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

২. সাহাবায়ে কিরাম (রা) একাদিক্রমে তের বছর পর্যন্ত মক্কার কাফিরদের হাতে নানা ধরনের বিপদ ও নির্যাতন ভোগ করেছেন; ইসলামের কারণে পিতামাতা, আত্মীয় ও আপনজনদের পরিত্যাগ করা এ কাজের প্রকাশ্য ও উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তাঁরা

ইসলামকে সানন্দে ও সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামের মাধুর্য ও মিষ্টতা তাঁদের অন্তরে এভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, তা পৃথিবীর তিক্ত থেকে তিক্ত বিপদগুলোকে তাঁদের কাছে সুমিষ্ট ও উপাদেয় বস্তুতে পরিণত করেছিল। নিজেদের জীবন ও সম্পদ সবকিছুই তাঁরা এর প্রতি কুরবানী করেছিলেন। বিরোধিতাকারী ও প্রতিবাদীগণ বলুন তো, যে বিষয় জবরদস্তি করে গর্দানে তরবারি ঠেকিয়ে স্বীকার করানো হয়, তার বৈশিষ্ট্য কি এরূপ হতে পারে?

৩. অধিকন্তু ইসলামী শরীআতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে এর নির্দেশগুলো গ্রহণ করবে, যাতে করে সওয়াব ও পরকালীন মুক্তি তার জন্য প্রযোজ্য হয় যে, বান্দা ঈমান আনয়ন করেছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকট সেই ঈমান ও ইসলাম গ্রহণযোগ্য যা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয়। জোর-জবরদস্তি সহকারে কাউকে মুসলিম বানানো ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ·

"তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে অবস্থানকারী সবাই ঈমান আনতো, তুমি কি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?" (সূরা ইউনুস : ৯৯)

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ·

"সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক, আর যার ইচ্ছা সে সত্য প্রত্যখ্যান করুক।" (সূরা কাহফ : ৪৯)

৪. হযরত নবী করীম (সা) যে সময় নবূওয়াতের ঘোষণা দিয়ে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, ঐ সময় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। কোন রাজত্ব ও বাদশাহী তাঁর ছিল না। ছিল না তাঁর হাতে কোন তরবারি, যা দিয়ে ঈমান অস্বীকারকারীদের তিনি ভয় দেখাতেন। অন্যদের কথা আর কী উল্লেখ করা যায়, গোত্র এবং স্ববংশীয়, যারা মানুষের সাহায্যকারী ও মদদগার হয়ে থাকে, তারাই তাঁর প্রাণের শত্রু এবং রক্ত পিপাসুতে পরিণত হয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতনের এমন কোন প্রকার বা পর্যায় অবশিষ্ট ছিল না, যা তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাথীদের প্রতি প্রয়োগ করা হয়নি। আর যদি আল্লাহ্ তাঁকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা না জানাতেন, তা হলে ঐ অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করা তাঁর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। জোরজবরদস্তি দ্বারা এ অবস্থা কি করে সম্ভব?

৫. নবূওয়াতপ্রাপ্তির পর মক্কায় তাঁর অবস্থানকাল ছিল তের বছর। ঐ সময়ে এবং ঐ অবস্থাতেই শত শত গোত্র ইসলামে দাখিল হয়েছে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা) সূচনাপর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন। আর তিনি যখন ফিরে যান, তখন তাঁর আহ্বানে গিফার গোত্রের অর্ধেক মানুষ মুসলমান হয়ে যায়। হিজরতের পূর্বেই তিরাশিজন পুরুষ এবং আঠারজন স্ত্রীলোক (যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) মক্কার কাফিরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করেন। আবিসিনিয়ার খৃস্টান শাসক নাজ্জাশী হযরত জাফর তাইয়্যার (রা)-এর ওয়ায শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার সত্তরজন মানুষ মিনায় নবী (সা)-এর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর ওয়াযে একদিনেই বনী আবদে আশহাল গোত্রের সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর অবশিষ্টরাও মুসলমান হয়ে আনসারের মর্যাদায় ভূষিত হন।

এ সমস্ত সম্প্রদায় জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার পূর্বেই মুসলমান হন। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), হযরত ফারুকে আযম (রা), হযরত উসমান গনী (রা) এবং হযরত আলী (রা), যাঁরা দুনিয়ার চতুর্দিকে ইসলামের ডঙ্কা বাজিয়েছেন, ইসলামের এ বীর সিপাহসালারগণও জিহাদ ও লড়াইয়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়েছেন।

৬. নাজরান ও সিরিয়ার খৃস্টানদের কে বাধ্য করেছিল যে, তারা প্রতিনিধি দল হিসেবে নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ? প্রত্যেক এলাকা থেকেই এভাবে প্রতিনিধি দল আগমনের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল, দলগুলো তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করতেন। জবরদস্তি তো দূরের কথা, তিনি তাদেরকে ডাকার জন্য কোন দূতও প্রেরণ করেননি। যেমনটি সামনে অগ্রসর হয়ে 'প্রতিনিধি দল' শীর্ষক বর্ণনায় জানা যাবে।

৭. জিহাদের প্রসঙ্গ ইসলামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের শরীআতেও এ বিধান বিদ্যমান ছিল। কাজেই যদি ইসলামের উন্নতি এবং প্রসারের কারণ কেবল জিহাদই হয়, তা হলে অপর নবী (আ)-গণের যাঁদের মধ্যে এ বিধান বিদ্যমান ছিল, তাঁরা কেন এরদ্বারা বিকাশলাভ করতে পারলেন না ? বিশেষত যখন ইতিহাসে অধিক সংখ্যায় এ ধরনের উদাহরণই বিদ্যমান যে, সব সময় প্রতাপশালী শাসকবর্গ এবং ইয়াহূদী-নাসারাগণ নিজ নিজ বিরোধীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে।

৮. ইসলামী হুকুমত যদি লোকজনকে জবরদস্তি করে মুসলমান বানাতো কিংবা এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালাতো, যা খৃস্টধর্মের জন্য করা হয়েছে এবং করা হচ্ছে, তা হলে তো মুসলিম দেশে কোন ভিনধর্মী লোকের অস্তিত্বই অবশিষ্ট থাকতো না। কারণ সত্য ও ন্যায়ের সাথে যখন বস্তুগত সাহায্য-সহযোগিতাও শামিল হয়ে যায়, তখন সত্য গ্রহণে আর বাধা থাকে কোথায় ? যখন লোভ-লালসার দরুন ত্রিত্ববাদের রাগ-রাগিণী ঝংকৃত হয়, একই মানুষের মধ্যে যখন হাজারো মানবীয় প্রয়োজনের সমাবেশ ঘটে, বৃক্ষ ও পাথরকে খোদা এবং সত্তা ও আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায় অনাদি, অবিনশ্বর, প্রাচীন ও চিরন্তন মানা হয়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার অনাবিল একত্ববাদ, নিষ্কলুষতা, তাঁর একত্ব, চিরন্তনতা, তাঁর জ্ঞানশক্তি, শ্রবণ ও দর্শনশক্তিকে লোভ-লালসা দ্বারা মানিয়ে নেয়া কিরূপে অসম্ভব হবে ? কিন্তু ইসলামের আল্লাহ্ প্রদত্ত পরম সৌন্দর্য এ থেকে পবিত্র ও অমুখাপেক্ষী যে, দিরহাম ও দীনারের চাকচিক্যকে এ প্রসারের মাধ্যমে পরিণত করবে এবং শয়তানের ধনুকের[১] মাধ্যমে নিজেদের তীর

১. শয়তানের বক্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীলোক হলো আমার পুরাতন ধনুক, এর মাধ্যমে আমি যে তীর নিক্ষেপ করি, তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অতএব (পাঠকবর্গ) এটা বুঝে নিন এবং এর ওপর অবিচল থাকুন।

চালনা করবে। যারা এ পদ্ধতিতে কোন ধর্ম অবলম্বন করে, তারা আল্লাহর বান্দা নয়, বরং দিরহাম ও দীনারের বান্দা। আমরা এর থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

৯. অধিকন্তু ইসলামের আইনসমূহ স্বয়ং এর সাক্ষী–ইসলাম তরবারি দ্বারা বিস্তারলাভ করেনি। কেননা ইসলাম প্রসারের নিয়ম এটাই যে, কোন সম্প্রদায়ের ওপর যখন আক্রমণ পরিচালনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তখন তাদের সামনে এই বলে ইসলাম পেশ কর যে, তোমরা ঈমান আনয়ন কর। যদি তারা ঈমান আনে, তা হলে তারা তোমাদের ভাই। তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সবাই এক সমান। আর যদি ইসলাম কবূল না করে এবং নিজধর্মে স্থির থাকতে চায়, তা হলে তাদের বল যে, তোমরা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার কর, জিযয়াদানে সম্মত হও এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করো না। তা হলে তোমাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযতের দায়িত্ব আমাদের, তোমাদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযত মুসলমানদের জানমাল, ইযযত-আব্রুর হিফাযতের অনুরূপ হবে। এ শর্ত অনুযায়ী তোমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও ধর্মের ক্ষতি হয়, এমন তৎপরতায় লিপ্ত হতে পারবে না। অধিকন্তু তোমাদের এ স্বাধীনতা থাকবে যে, ইসলাম তোমাদের প্রতি তার নিষেধাজ্ঞাসমূহ প্রয়োগ করবে না। যেমন মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ, যা তোমাদের ধর্মে বৈধ। সুতরাং তোমাদের মদ্যপানে এবং এর ক্রয়-বিক্রয়ে বাধা দেবে না। তবে সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত করা চলবে না। বিয়ের ব্যাপারে ইসলামে যে বিশেষ শর্তাবলী রয়েছে, তোমাদেরকে তা পালন করতে ইসলাম বাধ্য করবে না। নিজ ধর্মমতে বিয়ে-শাদী করার ব্যাপারে ইসলম তোমাদেরকে অনুমতি দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর যদি তারা ইসলামী রাষ্ট্রীয় বিধান জিযয়াদানেও সম্মত না হয়, তা হলে এরপর তরবারি চালনার নির্দেশ আছে। এতে জানা গেল যে, তরবারি চালনার নির্দেশ মুসলমান বানানোর জন্য নয়, বরং এ ব্যবস্থা সর্বশেষ পর্যায়ে তাদের ঔদ্ধত্যের জবাব স্বরূপ। তাই বলতে হয়, যদি ইসলাম তরবারির মাধ্যমে প্রসার লাভ করতো, তা হলে সর্বপ্রথমেই তরবারি চালনার নির্দেশ দিত; এত বিধি-বিধানের অবতারণা করা হতো না।

১০. যদি ইসলাম জোরজবরদস্তির মাধ্যমে প্রসার লাভ করতো, তা হলে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিতগণ নিষ্ঠাবান ইসলামপ্রেমী ও এ জন্যে আত্মোৎসর্গকারী হতো না। কেননা জোরজবরদস্তির প্রভাব থাকে উপরি উপরি, এর প্রভাব অন্তর পর্যন্ত যায় না। কাজেই জোর করে কাউকে মুসলমান বানানো হলে তাদের অবস্থা এরূপ হতো যে, বাহ্যিকভাবে তারা মুখে ইসলামের কালেমা পাঠ করলেও অন্তর থেকে এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতো ও অসন্তুষ্ট থাকতো। অথচ বাস্তবতা হলো, এ সকল ব্যক্তি শরীর-মন দিয়ে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে, লোক সমক্ষে-গোপনে সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতি আত্মনিবেদিত ছিলেন, মসজিদ অপেক্ষা গৃহে বেশি (নফল) ইবাদত করতেন, সৌভাগ্য মনে করতেন ইসলামের জন্য জানমাল উৎসর্গ করাকে। এছাড়াও ইসলামী শরীআতের মাসআলা হলো, যে ব্যক্তি মুখে কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, তাকে হত্যা করা অবৈধ। কাজেই যে ধর্ম দুশমনের হাতে এ ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছে যে, একবার মুখে

কালেমা পাঠ করামাত্র সে অব্যাহতি পেয়ে যায়, এ ধর্ম সম্পর্কে জোরজবরদস্তির অভিযোগ-অপপ্রচার করা যায় কি ? সমস্ত কাফিরই কালেমা পাঠ করে হত্যা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। বিরোধিতাকারীদের কথামতো যে মানুষগুলো চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা কেন আজীবন এ চাপের অনুসারীই থেকে গেল, সুযোগমত কেন তাদের পূর্বের ধর্মে ফিরে গেল না ?

ইসলাম এবং দাসত্বের মাসআলা

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, তা আর কোন সৃষ্টিকে দেননি। তিনি মানুষকে জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি, বাকশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি ইত্যাদি পরিপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলনস্থলে পরিণত করেছেন। তাকে স্বীয় খিলাফতদানে ধন্য করেছেন, ফেরেশতাগণের সিজদার পাত্ররূপে সমস্ত সৃষ্টির ওপর মর্যাদা দান করেছেন। এমনকি অভিশপ্ত শয়তান অবলীলাক্রমে বলে উঠেছে : هٰـذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ "এতো হচ্ছে মাটির তৈরি সে আদম, যাকে তুমি আমার ওপর মর্যাদা দান করেছ।" সমস্ত সৃষ্টিকেই তার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে এতই আযাদী ও স্বাধীনতা দান করেছেন যে, সমস্ত পৃথিবীই তার মালিকানা ও অধিকারে দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا "পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" কিন্তু যখন সেই অথর্ব মানুষ সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আনুগত্য অপরিহার্য হওয়াকে অস্বীকার করে বসে, সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (কুফরী) করে বসে, আর নবী (আ)-গণের মুকাবিলা ও তাঁদের সাথে যুদ্ধের জন্য ময়দানে বেরিয়ে আসে, তখন তার সমুদয় মর্যাদা ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সেই প্রদত্ত আযাদী ও স্বাধীনতা তার থেকে কেড়ে নেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিদ্রোহী ও অবাধ্য ব্যক্তিদেরকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দা, যাঁরা ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটানোর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁদের দাস ও আজ্ঞাবহে পরিণত করে দেন। আর তাদের এ অনুমতি দান করেন যে, চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু ও মালিকানাধীন সম্পত্তির মতই ওদেরকে যেভাবে ইচ্ছা, ক্রয়-বিক্রয় কর। ওদেরকে কেনা, বিক্রি করা, দান করা কিংবা বন্ধক রাখার পূর্ণ এখতিয়ার তোমাদেরকে দেয়া হলো। এরা তোমাদের অনুমতি ছাড়া কোনকিছু করতে পারবে না। অপরাধীর শাস্তি অপরাধের ধরন অনুযায়ী হয়ে থাকে। যে ধরনের অপরাধ হবে, শাস্তিও হবে ঠিক সেই ধরনেরই। চুরি এবং ব্যভিচারের অপরাধীকে কয়েকদিন শাস্তিদানের পর অব্যাহতি দেয়া হয়ে থাকে। কেননা এ অপরাধ সমাজ বিরোধী। কিন্তু বিদ্রোহের অপরাধ ক্ষমা করা হয় না। কেননা তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্রোহ। এ জন্যে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرِكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۰

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। আর এছাড়া তিনি অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।" (সূরা নিসা : ৪৮)

কেননা সত্য অস্বীকারকারী কাফিররা নীতিগতভাবে আল্লাহ্ তা'আলার অপরিহার্য আনুগত্য এবং তাঁর প্রেরিত বিধানের প্রতি সক্রিয় আনুগত্য স্বীকার করে না। তারা নিজেদেরকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছার অনুগত বলে নিজকে মনে করে না। এ জন্যই আল্লাহর বিদ্রোহী। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, যৌক্তিক ও নৈতিকভাবে এদের দ্বারা এমন সব কর্ম সাধিত হয়, যা শরীআত সম্মত। এটা তাদের আনুগত্য বা খোদায়ী নীতির অনুসরণ নয়, বরং দৃশ্যত তা কেবল সৎকর্মের অনুরূপ। নীতিগতভাবে তারা বিরোধী ও বিদ্রোহী। আর প্রকাশ থাকে যে, যদি মৌলিক বিরোধিতা, সামগ্রিক অবাধ্যতা ও বিশ্বাসগত দ্বন্দ্ব থাকে, তা হলে আংশিক কিংবা বাহ্যিক সাযূজ্যের কী মূল্যায়ন হতে পারে ? এজন্যেই ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া ক্ষমাপ্রাপ্তি অসম্ভব। আর তার সমুদয় সৎকর্ম এবং চারিত্রিক গুণাবলী একজন ফাসিক মু'মিনের তুলনায় কিছুই নয়। কেননা ফাসিক মু'মিনের এ ফাসিকী আংশিক ক্ষেত্র হিসেবে সীমাবদ্ধ। বুনিয়াদীভাবে সে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আবশ্যিক আনুগত্য সমর্থন করে। যদি সে কখনো কোন গুনাহ করে বসে, তখন আল্লাহর দরবারে প্রত্যাবর্তন করে শত বিনয়-নম্রতা ও অজস্র অনুতাপসহ ক্ষমা প্রার্থনা করে। এজন্যে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ط اُولٰئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ

"এবং মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। ওরা আগুনের দিকে আহ্বান করে।" (সূরা বাকারা : ২২১)

আত্মোৎসর্গকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর আল্লাহর বিদ্রোহী ও প্রতারককে সমমর্যাদা দান করা জ্ঞান, প্রকৃতি ও রাষ্ট্রীয় আইনে স্পষ্ট যুলুম। এটা কোন্ ধরনের সংস্কৃতিবান রাষ্ট্র, যার আইনে অনুগত ও পাপী উভয়ে সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে ? আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন : اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ "আমি কি মুসলিমদেরকে অপরাধীদের সদৃশ্য গণ্য করব ?" (সূরা কালাম : ৩৫)

সকল আধুনিক রাষ্ট্রেই বিদ্রোহী আর রাজনৈতিক অপরাধীদের শাস্তি সাধারণ অপরাধী। যেমন চোর, বদমায়েশ, প্রতারক ও ধোঁকাবাজদের শাস্তি থেকে বেশিই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে অপরাধী, তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। যদিও মূলত বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র উভয়ই অপরাধ, কিন্তু চুরি কিংবা বদমায়েশীর অপরাধ মাত্র এক বা একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়ে থাকে, অথচ রাষ্ট্রদ্রোহীতা এবং রাজনৈতিক অপরাধ সমসাময়িক শাসক, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধে হয়ে থাকে। এরা চায় যে, এ রাষ্ট্রই ধ্বংস হয়ে যাক। আর সমস্ত সভ্য রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহ অপেক্ষা বড় কোন অপরাধ নেই। চুরি-ডাকাতির অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহের তুলনায় স্বল্প। রাষ্ট্রের সর্বসম্মত আইন হচ্ছে, যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে, তার সর্ব প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায় এবং তার সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। তার সাথে হীন আচরণ করা হয়।

রাজনৈতিক এ অপরাধী যতই যোগ্য, জ্ঞানী ও মর্যাদাশীল হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় আইনে এটাই তার পাওনা। এ অপরাধী ব্যক্তি জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষায় প্রজাতন্ত্রের শীর্ষ ব্যক্তি অপেক্ষাও যোগ্যতর হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পার্থিব রাষ্ট্রগুলো যদি তাদের বিদ্রোহীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করার অধিকারী হতে পারে, তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা (যিনি ঐ বিদ্রোহীদেরকে অস্তিত্ব, জীবন, জ্ঞান-বুঝ এবং ধন-সম্পদ দান করেছেন) তাঁর কি ঐ বিদ্রোহী (কাফির) থেকে স্বপ্রদত্ত স্বাধীনতা হরণ করে নেয়ার অধিকার নেই ?

সারকথা : আল্লাহ্ তা'আলার দাসত্ব থেকে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফরীর জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে। তাওরাত ও ইনজীলেও এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বরং এমন কোন জাতি বা ধর্ম নেই যাতে দাসত্বের বিষয়টি অনুপস্থিত। বরং এটা অনস্বীকার্য যে, দাসত্ব ও গোলামীর বিষয়টি সমস্ত ধর্ম ও জাতির সমন্বিত ঐকমত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

যদি দাসত্ব প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ কিছু হতো, তা হলে তা কোন শরীআতেই বৈধ হতো না। তাওরাত ও ইনজীল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলই এটাকে বৈধ রেখেছেন। দাসত্ব যদি প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ কিংবা কোন বন্য প্রথা হতো অথবা কোন লজ্জাকর বিষয় হতো, তা হলে নবী (আ)-গণ কিভাবে এটাকে বৈধ রেখেছেন ? হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের কি এটা জানা ছিল না যে, দাসত্ব প্রকৃতিগতভাবেই মন্দ এবং প্রকৃতির বিধানের বিপরীত ? হযরত মারিয়া কিবতীয়া (রা) দাসী হিসেবে নবী (সা)-এর শয্যাসঙ্গিণী ছিলেন, যাঁর গর্ভে হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। নবী করীম (সা) কি আজীবন প্রকৃতিগতভাবে গর্হিত একটি কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, তিনি কি প্রকৃতির বিধান বিরোধী কাজ করেছিলেন ? অসম্ভব হলেও যদি ধরে নেয়া হয় যে, নবী (আ)-গণ থেকে এ ব্যাপারে কোন ইজতিহাদী ভুল হয়ে গেছে, তা হলে প্রশ্ন হলো, সর্বজ্ঞাতা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কেন ওহীর মাধ্যমে এ ভ্রান্তি থেকে সতর্ক করলেন না ?

ইসলামের পূর্বে এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না, যাদের মধ্যে দাসত্বের প্রচলন ছিল না। ইসলাম এসে কেবল এ বিধান বৈধ রেখেছে। কিন্তু দাসদের সাথে যে লজ্জাকর ও মানবতাবিরোধী কাজকর্ম করা হতো, ইসলাম এক মুহূর্তেই তা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের মালিকদের অধিকার চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে, যা হাদীস এবং ফিক্হ গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

হ্যাঁ, তবে ইসলাম দাসপ্রথাকে সমূলে শেষ করে দেয়নি। কেননা এটা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ অর্থাৎ কুফরীর শাস্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত এ পৃথিবীতে কুফর ও শিরক অবশিষ্ট আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দাসত্ব ও দাসপ্রথাও অবশিষ্ট থাকবে এবং থাকা উচিত। অপরাধ যখন বিদ্যমান তখন শাস্তি কেন থাকবে না ? শরীআত প্রকৃত দাসত্ব অবশিষ্ট রেখেছে কিন্তু এর অবৈধ কাজগুলোকে সংশোধন করেছে। এতে সন্দেহ নেই যে, দাসত্ব একটি বড় ধরনের অপমানজনক কাজ, কিন্তু শিরক ও কুফরী এর চেয়ে কি কম অপমানজনক ? সব ধরনের অপরাধের ক্ষতি ও এর অকল্যাণ নির্দিষ্ট, কিন্তু

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহের ক্ষতি ও অকল্যাণের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তাই কুফরীর জন্য স্থায়ী শাস্তি এবং ঈমানের জন্য স্থায়ী সওয়াব নির্দিষ্ট। কেননা কুফরীর ক্ষতি ও অকল্যাণের যেমন সীমা নেই, তেমনি ঈমানে সৌন্দর্য ও কল্যাণেরও কোন সীমা-পরিসীমা নেই। ইসলামের উদ্দেশ্যই হলো কুফরীকে অপদস্থ করা। চুরি এবং বদমায়েশীর পেছনে উদ্দেশ্য থাকে লোভ এবং কুপ্রবৃত্তি, আর আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে অস্বীকৃতি ও অহংকার। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ "সে অমান্য করল এবং অহংকার করল, সুতরাং সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হলো।"

এজন্যে প্রথমোক্ত অপরাধের শাস্তি তাদের উপযোগী নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যে অপরাধের উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অবাধ্যতা, এর শাস্তি অপদস্থতা অর্থাৎ দাসত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। আর অপরাধের শাস্তি অপরাধের অনুরূপই হয়ে থাকে। যে সমস্ত মানুষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং এ পথে জীবনপাত ও আত্মোৎসর্গ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এভাবে ইযযত ও সম্মান দান করেছেন যে, তাদেরকে ঐ অহংকারী ও বিদ্রোহীদের অধিকারী ও প্রভুতে পরিণত করেছেন। وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ "আর সম্মান আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।"

যে ব্যক্তি ভাল ও মন্দ, ঈমান ও কুফর, সৎ ও অসৎ, মু'মিন ও কাফিরের মাঝে বিভাজনের প্রবক্তা, তার জন্যে এ বিষয়টি কোন সমস্যা নয়, আর যে ব্যক্তি সরাসরি ভাল ও মন্দ, সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্যই মানে না, তাদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই; তারা মানুষই নয়, বরং পশুতুল্য।

কুরআনুল করীমে مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ বাক্যটি পনেরবার এসেছে এবং গুনাহের কাফফারা স্বরূপ দাসমুক্ত করার কথাও পবিত্র কুরআনে সরাসরি এসেছে। অনুরূপভাবে মুকাতাব[1] দাসের কথাও কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে এসেছে। এ ধরনের সমস্ত আয়াতদ্বারা দাসত্বের প্রমাণ এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তা অস্বীকার করা অসম্ভব। আর হাদীস শরীফে এসেছে : المكاتب عبد مابقى عليه درهم "মুকাতাব ঐ সময় পর্যন্ত গোলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তির এক দিরহামও অপরিশোধিত থাকে।" হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) যখন বনী কুরায়যার ব্যাপারে এ আদেশ দিলেন, تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم "তাদের মধ্যকার যুদ্ধোক্ষম পুরুষদের হত্যা করা হোক এবং অল্পবয়স্কদের গোলাম বানানো হোক।" তখন নবী (সা) বললেন, قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللهِ "ওহে সা'দ! তুমি আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ফয়সালা

১. দাসকে নির্ধারিত অর্থ কিংবা অপর কোন শর্তে মুক্তিদানের ব্যাপারে মালিকের সাথে চুক্তিবদ্ধ দাসকে মুকাতাব বলে।

করেছ।" আর আওতাস যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ الاَّ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ "আর নারীর মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ।" কাজেই কুরআন ও হাদীসের দ্বারা দাসপ্রথার প্রমাণ দিবালোকের মতই উজ্জ্বল।[১]

আরিফ রূমী (কু. সি.) তাঁর মসনবীর চতুর্থ দফতরে (পৃ. ১২১) বলেন :

در تفسير اين حديث نبوى كه

ان اللّه تعالى خلق الملائكة وركب فيهم العقل خلق البهائم وركب فيها الشهرة وخلق بنى آدم وركب فيهم العقل والشهوة فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكة ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم صدق النبى ﷺ ·

"নবী করীম (সা)-এর এ হাদীসের তাফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতা পয়দা করলেন এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান দিলেন। তিনি জীবজন্তু সৃষ্টি করলেন আর তাদের মধ্যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করলেন। তিনি বনী আদম সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে জ্ঞান এবং প্রবৃত্তি উভয়ই দিয়েছেন। কাজেই যার জ্ঞান প্রবৃত্তির ওপর বিজয়ী হলো, সে ফেরেশতা অপেক্ষাও উচ্চ মর্যাদা লাভ করল। আর যার প্রবৃত্তি তার জ্ঞানের ওপর বিজয়ী হলো, সে পশু থেকেও নিম্নস্তরে পৌঁছে গেল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

در حديث امدكه يزدان مجيد * خلق عالم راسركونه افريد

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিকে তিনভাগে সৃষ্টি করেছেন।

يك كره احمله علم و عقل وجود * ان فرشته است ونداند جزسجود

একভাগকে জ্ঞান ও অফুরন্ত উদারতা দ্বারা ধন্য করেছেন, এরা হলো ফেরেশতার দল; যারা আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হওয়া এবং তাঁর আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই জানে না।

نيست اندر عنصرش حرص رهوا * نور مطلق زنده از عشق خدا

এদের মূলে লোভ এবং আত্মপ্রবৃত্তির কোন নাম-নিশানাও নেই, তারা নূরের তৈরি এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রেম-ভালবাসাই তাদের জীবন।

يك گروهى ديگر از دانش نهى * همچوان ازعلف در فربهى

---

১. এসব ছাড়াও যুদ্ধবন্দীদেরকে যদি তাদের দেশ মুক্তিপণ কিংবা বন্দী বিনিময় না করে, তখন বিজয়ী মুসলিম শক্তি তাদের কিভাবে ছাড়তে পারে ? এ কারণেই যেহেতু যুদ্ধবন্দী যে কোন সময় হতে পারে, এজন্যে এ পদ্ধতি বহাল রাখতে হয়েছে। অন্যথায় বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়া কিংবা তাদেরকে আটকে রাখা ছাড়া উপায় কি ? তাই ইসলাম সমস্যাটির সমাধান মানবিকভাবে করেছে।

দ্বিতীয় দলটি, যারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যেমন পশু, যাদের কাজ কেবল চরে বেড়ানো ও মোটাতাজা হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

اونه بنيد جز كه اصطبل وعلف * از شقاوت غالف ست دز شرف

এরা আস্তাবল এবং ভূষি ছাড়া আর কিছুই চেনে না। সৌভাগ্য ও সুকীর্তি সম্পর্কে তারা পুরোপুরি অজ্ঞ।

ان سوم هست آدمى زاده بشر * از فرشته نـميى ونيمش زخز

তৃতীয় দল হলো মানুষ, যার অর্ধাংশ ফেরেশতাসুলভ এবং বাকী অর্ধাংশ মূর্খ অর্থাৎ পশুতুল্য। ফেরেশতার গুণ এবং পশুর আচরণ মিলে সে সৃষ্টি হয়েছে।

نيـم خر خود مائل شفلى بود * نيـم ديگر مائل علوى بود

এ মানুষের অর্ধাংশ মূর্খ পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট, আর দ্বিতীয় অংশ ফেরেশতাসুলভ গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট এবং উন্নত।

تاكه اميـن غالب ايد در نبرد * زين دوكانه تاكد اميـن بردنرد هازى

আর এ দু'অংশে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিদ্যমান। দেখে এ সংঘাতে কে বিজয়ী হয় এবং এ পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হয়।

عقل گر غالب شود پش شدفزون * از ملائك اين بشر در آزمون

অতএব যদি এ পরীক্ষায় জ্ঞান বিজয়ী এবং পশুত্ব পরাজিত হয়, তা হলে এ ব্যক্তি আল্লাহর ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম ও মর্যদাবান হয়। এজন্যে যে, সে জ্ঞানকে পশুত্ব ও কুপ্রবৃত্তির ওপর ফেরেশতাদের বিপরীতে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা ফেরেশতাদের নিমগ্নতার মধ্যে কোন বস্তু অন্তরায় হয় না।

شهوت ازغالب شودپس كمتراست * ازبهائم ايـن بشر زان كـمتر است

যদি কুপ্রবৃত্তি বিজয়ী হয়, তা হলে এ ব্যক্তি জানোয়ার ও পশু থেকেও নিকৃষ্ট হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : أُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ "ওরা পশুর ন্যায়, বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট।"

آں دو قوم اسوده از كنگ وحراب * وين بشر بادو مخالف دو عذاب

ঐ দুই দল ফেরেশতা ও পশু, এরা প্রবৃত্তি ও শয়তানের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত প্রতিহত করা থেকে মুক্ত। কিন্তু তৃতীয় দল অর্থাৎ মানুষ জ্ঞান এবং কুপ্রবৃত্তির বিরোধ ও সংঘাতে এক ধরনের শাস্তি ও সমস্যায় নিমজ্জিত থাকে।

وين بشر هم زامتجان قسمت شدند * آدمى شكل اندوسراست شدند

অতএব, এ মানুষ পরীক্ষা ও নিমগ্নতার প্রেক্ষিতে তিনভাগে বিভক্ত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ - وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ والسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ - أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ·

"ডানদিকের দল, কত ভাগ্যবান ডানদিকের দল! এবং বামদিকের দল, কত হতভাগ্য বামদিকের দল! আর অগ্রবর্তিগণই তো অগ্রবর্তী, তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।" (সূরা ওয়াকিয়াহ : ৮-১১)

يك كروه مستغرق مطلق شده * همچو عيسى باملك ملحق شده

এক দল তারা, যারা আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসায় নিমজ্জিত ও উৎসর্গিত এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মত ফেরেশতাদের সাথে মিলে গিয়েছেন।

দ্রষ্টব্য : হযরত ঈসা (আ) যেহেতু জিবরাঈল (আ)-এর ফুঁ-এর মাধ্যমে জন্মলাভ করেছেন, এজন্যে তিনি আকৃতিগতভাবে মানুষ এবং প্রকৃতিগতভাবে ফেরেশতা ছিলেন। অনুসন্ধানের জন্য 'ফুতুহাতে মাক্কিয়্যা' এবং 'ফুসূসুল হিকাম' গ্রন্থ দেখুন।

نقش آدم ليك ٥ عنى جبرئيل * رسته از خشم وهواؤ قال وقيل

এর যদিও আকৃতিগতভাবে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে জিবরাঈল (আ), কাম-তাড়না, ক্রোধ এবং সব ধরনের গালমন্দ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

قسم ديگر باخران ملحق شدند * خشم محض وشهوت مطلق شدند

দ্বিতীয় দল তারাই, যারা গর্দভ ও পশুর সাথে মিলে যায় এবং প্রবৃত্তি ও ক্রোধের অনুগত হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ "ওরা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন " اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ " "ওরা পশুর ন্যায়, বরং তা থেকেও নিকৃষ্ট।"

وصف جبريلى ور ايشان بود رفت * تنگ بود آنخانه وان وصف رفت

জিবরাঈলের গুণপনা তার থেকে দূরীভূত হয়, ধারণ ক্ষমতার সংকীর্ণতার কারণে তার মধ্যে ঐ গুণাবলী অবশিষ্ট থাকে না। দ্বিতীয় দল বামদিকের দল।

مانديك قسم وگراندر جهاد * نيم حيوان نيم حيى بارشاد

তিন দলের মধ্যে আরেক দল অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এরা সাধারণ মু'মিনের দল। যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা 'আসহাবুল মায়মানাহ' বা দক্ষিণপন্থী দল বলেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছেন কিন্তু এখনো তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়নি। তাদের ঈমান তাদেরকে আল্লাহর দিকে টানে, আর প্রবৃত্তি তাদেরকে সুস্বাদু সামগ্রী ও কামনা-বাসনার পথে নিয়ে যেতে চায়। তারা আশ্চর্য ধরনের দোটানায় ভোগে। কখনো পশু প্রবৃত্তি বিজয়ী হয়, আর কখনো ঈমান ও হিদায়াত জয়ী হয়।

روزشب در كنگ واندر كشمكش * كرده چالش اولش ياخرش

দিনরাত তারা এই যুদ্ধ ও দোটানার মধ্যে থাকে। তাদের জ্ঞান প্রবৃত্তির সাথে এবং আত্মা শরীরের সাথে সংঘর্ষ চালাতে থাকে।

আরিফ রূমীর এ বর্ণনা আমরা সংক্ষিপ্তভাবে সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করলাম। এখন আসল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হব।

মূল উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন : মানুষের মধ্যে যে স্বাধীনতা ও মুক্তির গুণ বিরাজমান, তা তার প্রকৃতি ও মূলের সাথে সম্পৃক্ত নয় (যে, তার থেকে তা অপসারণ অসম্ভব

হবে), বরং এ গুণ ফেরেশতাসুলভ গুণের সাথে যতক্ষণ সম্পৃক্ত থাকে, ততক্ষণ তার স্বাধীনতা বজায় থাকবে। আর যখন সে পশুসুলভ গুণের সাথে সম্পৃক্ত হয়, তখন ঐ মুক্তি ও স্বাধীনতা খতম হয়ে যায়। কুরআনী দলীল দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, কুফর ও শিরক করার কারণে মানুষের প্রতি পশুসুলভ নির্দেশ বর্তায়। কেননা খোদায়ী বিধানের পরিপন্থি কাজের দ্বারা মানব চরিত্রে মনুষত্বের বদলে পশুত্বের বিকাশ ঘটে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنْ هُمْ اِلاَّ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلاً ‏.

"ওরা তো পশুর মতই, বরং ওরা অধিক পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফুরকান : ৪৪)

اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ‏.

"আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই, যারা কুফরী করে।" (সূরা আনফাল : ৫৫)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامِ ‏.

"যারা কুফরী করে, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদরপূর্তি করে।" (সূরা মুহাম্মদ : ১২)

যেমন আজকাল পশুসুলভ সংস্কৃতি ও সভ্যতার চর্চা হচ্ছে, যার সংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা দিয়েছেন, আজকালকার সাংস্কৃতিক আসরসমূহ এর প্রত্যায়ন নয়, বরং সাক্ষ্য পেশ করছে। পৃতিবীর বিজ্ঞজনেরা কি এ চারিত্রিক অপরাধীদেরকে জন্তু-জানোয়ার থেকে নিকৃষ্ট মনে করেন না ? তা হলে যদি ইসলাম আল্লাহদ্রোহীদের পশু থেকে নিকৃষ্ট বলে, এতে দোষটা কোথায় ?

কাজেই যেমন পশু ধরা হলে বা শিকার করা হলে এর মালিক হওয়া যায়, একইভাবে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহকারীকে বন্দী অথবা গ্রেফতার করলেও এর মালিক হওয়া যায়। আর যেমনভাবে পশুকে বন্দী অথবা শিকার করা এর মালিকানা লাভের কারণ, অনুরূপভাবে কাফিরদের ওপর জয়লাভ করা বা অধিকার লাভ করা তার মালিকানা অর্জন ও দাসত্বে নেয়ার পরিপূর্ণ কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ ও পশুতে যে পার্থক্য, তা কেবল জ্ঞান, অনুভূতির দরুনই হয়ে থাকে। আর এ কারণে সমস্ত জ্ঞানী সম্প্রদায়ের নিকটই জ্ঞানসম্পন্ন না হওয়ার দরুন পশু ক্রয়-বিক্রয় কেবল বৈধই নয়, বরং উত্তম। কাজেই মানুষ যখন অজ্ঞতার পর্যায়ে নেমে আসে এবং পশুর ন্যায় কারো অধিকার খর্ব করে, তবে কোন কোন সময় আদালতও তার ক্রয়-বিক্রয়ে নেতিবাচক ঘোষণা প্রদান করে। আর কোন কোন সময় আদালত শক্তি প্রয়োগ করে তার সম্পদ ও মালিকানা খরিদ করে মানুষের অধিকার আদায় করে থাকে। এটা কি স্বাধীনতা ও মুক্তি হরণ নয় ?

একটি সন্দেহ ও তার সমাধান : জানা আবশ্যক, মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে যে স্বাধীন বলা হয়, তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, মুক্তি ও স্বাধীনতা মানুষের আত্মপ্রকৃতির সাথে অত্যাবশ্যকীয় ও অবিচ্ছেদ্য। বরং এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এ জন্যে সে প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন। আর দাসত্ব

অপরাধের শাস্তিস্বরূপ, যা প্রকৃতি বিরোধী। যদি কিছুক্ষণের জন্য এটা স্বীকারও করে নেয়া হয় যে, স্বাধীনতা মানুষের প্রকৃতিগত অধিকার, তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এটা কি এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন লাগামছাড়া স্থায়ী অধিকার যে, কোন অপরাধ কর, কুফরী কর, শিরক কর, আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, তাঁর নাযিলকৃত বিধানের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান কর, তাঁর প্রেরিত পয়গাম্বরকে মিথ্যা বল, তাঁদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর, তাঁদের মুকাবিলা কর, তাঁর অনুসারীদের ওপর নিপীড়ন চালাও, যে অপরাধ ইচ্ছা, তাই কর, তাও তোমার কোন দোষ নেই, তোমার স্বাধীনতা অধিকার কোনক্রমেই বিনষ্ট হবে না।

গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে যে, সমস্ত আসমানী ধর্ম এবং সমস্ত আস্তিক জাতিগোষ্ঠী এ ব্যাপারে একমত যে কুফর ও শিরক অবলম্বনের পর জীবন ও অস্তিত্বের অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। এমন লাগামহীন স্বাধীনতা তো কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংস্কৃতিবান ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও নেই। এমন নয় যে, রাষ্ট্রকেও অস্বীকার কর, মন্ত্রীবর্গ ও শাসনকর্তাকে অমান্য কর, অমান্য কর রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনকেও; এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা কর, এর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে বাধাদান কর, এরপরও তুমি স্বাধীন থাকবে। তোমাকে গ্রেফতার করা হবে না, তোমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে না আর তোমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হবে না, তোমার অর্থ-কড়ি যা ব্যাংকে জমা আছে, তাও জব্দ করা হবে না কেন হবে না ? যখন তুমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, তখন রাষ্ট্রও তোমার বিরুদ্ধে ও সবই করবে যা তোমার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও মানুষের আয়ুষ্কাল প্রকৃতিগত বিষয়, কিন্তু শরীআতী শাস্তি বিধান ও হত্যার বদলায় শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন এবং আয়ুষ্কালের সমাপ্তি ঘটানো ওয়াজিব বা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অপররাধ সংঘটনের কারণে প্রকৃতিগত অধিকার শেষ হয়ে যায়। আর কুফর থেকে কোন বড় অপরাধই বড় নয়।

রাজনৈতিক দাসত্ব

ফিরিঙ্গি জাতি ইসলামী দাসত্বের উল্লেখ করে। কিন্তু তাওরাত ও বাইবেলে যে দাসত্বের মাসআলা উল্লেখিত আছে, তার নামটিও নেয় না। আর অন্যদের ওপর রাজনৈতিক দাসত্ব প্রতিষ্ঠা নিজেদের জন্য আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় মনে করে। বর্তমান পাশ্চাত্য রাজনীতি পুরো সম্প্রদায় এবং গোটা দেশকেই দাসত্বে আবদ্ধ করার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ কারণে ব্যক্তি পর্যায়ে দাসত্বের প্রয়োজন নেই। আর তারা গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের যুগেও সাদা মানুষদেরকে কালো মানুষের ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও লোহিত বর্ণের অধিবাসীর জন্য কৃষ্ণ অধিবাসী থেকে পৃথক আইন প্রণয়ন করে রেখেছে।

যুদ্ধ ও অভিযানের ধারাবাহিকতা

আল্লাহর রাস্তায় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ এবং আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের দমনে আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ ও মস্তকদানকারীদের আত্মোৎসর্গের একটি অধ্যায়

জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হয় এবং রাসূল (সা)-ও যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেন এবং আশেপাশে বাহিনী প্রেরণ করেন। যে যুদ্ধে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেন, সীরাত বিশেষজ্ঞ ও আলিমগণের পরিভাষায় তাকে 'গাযওয়া' (غزوة) বলে। আর যাতে তিনি নিজে অংশগ্রহণ করেননি, তাকে 'সারিয়্যা' (سريه) অথবা 'বা'স' (بعث) বলে।

যুদ্ধের সংখ্যা

মূসা ইবন উকবা, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক, ওয়াকিদী, ইবন সা'দ, ইবনুল জাওযী এবং দিময়াতী ইরাকী বলেছেন যুদ্ধর সংখ্যা হচ্ছে সাতাশটি। আর হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব[১] (রা) থেকে চব্বিশটি, হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্[২] (রা) থেকে একুশটি আর হযরত যায়দ ইবন আরকাম[৩] (রা) থেকে উনিশটির কথা বর্ণিত আছে। আল্লামা সুহায়লী বলেন, সংখ্যার ব্যাপারে এ মতপার্থক্যের কারণ হলো, কোন কোন আলিম নিকটতম সময়ে এবং একই অভিযানে সংঘটিত হওয়ার কারণে কয়েকটি যুদ্ধকে একটি বলে গণনা করেছেন। ফলে তাদের নিকট যুদ্ধের সংখ্যা কম হয়েছে। আর এ সম্ভাবনাও থাকতে পারে যে, কেউ কেউ কোন কোন যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।[৪]

অভিযানের সংখ্যা : অনুরূপভাবে অভিযানের সংখ্যায়ও মতভেদ আছে। ইবন সা'দ থেকে চল্লিশটি, ইবন আবদুল বার থেকে পঁয়ত্রিশটি, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে আটত্রিশটি, ওয়াকিদী থেকে আটচল্লিশটি এবং ইবনুল জাওযী থেকে এ সংখ্যা ছাপ্পান্নটি বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৮ দেখুন)।

হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান

হিজরতের সাত মাস পর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্ব প্রথম পহেলা হিজরীর রমযান মাসে অথবা দ্বিতীয় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে

---

১. সহীহ সনদে আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন।

২. সহীহ সনদে আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন।

৩. বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

৪. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৮; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮৮।

ত্রিশজন[১] মুহাজিরের (বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে) একটি দলকে সায়ফুল বাহর-এর দিকে প্রেরণ করেন, যাতে তারা আবূ জাহলের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনরত তিনশ' কুরায়শের একটি কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন। হিজরতের পর এটা ছিল প্রথম অভিযান এবং এ বাহিনীতে মুহাজির ছাড়া আনসারদের কেউ ছিলেন না। হযরত হামযা (রা) যখন সায়ফুল বাহর-এ উপস্থিত হলেন এবং উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো ও যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধও হলো, তখন মাজদী ইবন আমর জুহানী উভয় পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে মিটমাট করে দিল। ফলে আবূ জাহল কাফেলা নিয়ে মক্কায় চলে গেল এবং হযরত হামযা (রা) মদীনায় ফিরে এলেন।[২]

হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)-এর অভিযান

এটা আবার হিজরতের আট মাস পর প্রথম হিজরী সালের শাওয়াল মাসে নবী করীম (সা) ষাট অথবা আশিজন ঘোড় সওয়ার মুহাজিরের একটি দলকে হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা)-এর নেতৃত্বে রাবিগের দিকে প্রেরণ করেন। এ অভিযানেও কোন আনসার সদস্য ছিলেন না।

সেখানে পৌঁছে কুরায়শের দু'শ অশ্বারোহীর একটি দলের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু যুদ্ধের সুযোগ এলো না। শুধু হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) একটি তীর নিক্ষেপ করেন। এটাই ছিল ইসলামী আমলের প্রথম তীর। আবূ সুফিয়ান[৩] ইবন হারব অথবা ইকরামা ইবন আবূ জাহল অথবা মিকরায ইবন হাফস (বর্ণনায় বিভিন্নতা রয়েছে) এ বাহিনীর প্রধান ছিল। হযরত মিকদাদ ইবন আমর ও হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা) যদিও পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলেন, কিন্তু কাফিরদের নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে হিজরত করতে অপারগ ছিলেন। তারা এজন্যে কুরায়শের কাফেলার সাথে ছিলেন এবং সুযোগ পাওয়ামাত্র মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন। সুতরাং যখন মুসলমান এবং কাফির উভয়পক্ষ মুখোমুখি হলো, এ দু'ব্যক্তি সেই সুযোগে কাফির দল থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের দলে শামিল হলেন।[৪]

---

১. কেউ কেউ বলেন, এ অভিযানে কিছু আনসারও ছিলেন। ইবন সা'দ বলেন, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, আনসারদের মধ্যে কেউ এতে ছিলেন না। বদর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) যতগুলো অভিযান পরিচালনা করেছেন, তাতে কোন আনসার এ জন্যে ছিলেন না যে, আনসারগণ মদীনায় অবস্থান করে তাঁর হিফাযতের শপথ করেছিলেন, বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার শপথ করেননি। এ কারণে নবী (সা) বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে আনসারদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, তোমাদের সিদ্ধান্ত কি? তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২, প্রথম অধ্যায়; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৮০।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৪৪।

৩. আবূ সুফিয়ান ইবন হারব ও ইকরামা ইবন আবূ জাহল মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। মিকরায ইবন হাফসকে কেউ সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখ করেননি। কেবল ইবন হিব্বান তাঁর কিতাবুস সিকাত গ্রন্থে এ পর্যন্ত বলেছেন : "বলা হয় তিনি একজন সাহাবী।" যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯১।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯১।

হযরত হামযা ও হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান যেহেতু খুবই কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ হযরত হামযার অভিযানকে অগ্রগামী বলেন, আর কেউ হযরত উবায়দার অভিযানকে প্রথম বলেছেন।

কেউ বলেন, এ দু'অভিযান একইসাথে হয়েছিল। এজন্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। কেউ হযরত হামযার অভিযানকে অগ্রগামী বলেছেন, আর কেউবা হযরত উবায়দার অভিযানকে। ফলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থানে সঠিক রয়েছেন।

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর অভিযান

পুনরায় হিজরী প্রথমবর্ষের যিলকাদ মাসে হযরত সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে বিশজন মুহাজিরের একটি পদাতিক বাহিনী খাররার দিকে প্রেরণ করেন।

খাররার ছিল জুহফার নিকটবর্তী একটি উপত্যকা। গাদীরে খুমও এরই সন্নিকটে অবস্থিত। এ দলটি দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত এবং রাত্রিবেলা পথ চলত। খাররার পৌঁছে জানা গেল, কুরায়শের কাফেলা চলে গেছে। ফলে তারা মদীনায় ফিরে এলেন।[১]

জানা দরকার যে, ওয়াকিদী এবং মুহাম্মদ ইবন সা'দ-এর নিকট এ তিনটি অভিযানই প্রথম হিজরী সনে প্রেরিত হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, এ অভিযান তিনটি দ্বিতীয় হিজরী সনে আবওয়া যুদ্ধের পরে প্রেরিত হয়েছিল।[২] ইবন হিশামও তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ মত পোষণ করেছেন যে, প্রথমে আবওয়ার যুদ্ধ, এরপর উবায়দা ইবন হারিসের অভিযান এবং তারপর হযরত হামযার অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। আর এ অধম (লেখক) হাফিয ইবন কায়্যিম, আল্লামা কাসতাল্লানী এবং আল্লামা যারকানীর অনুসরণ করেছেন।

আবওয়ার[৩] যুদ্ধ

এটাই ছিল প্রথম যুদ্ধ, যাতে মহানবী (সা) স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাবূক ছিল তাঁর অংশগ্রহণকৃত শেষ যুদ্ধ।

দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসের প্রারম্ভে নবী সরীম (সা) ষাটজন মুহাজির সঙ্গে নিয়ে, যাদের মধ্যে কোন আনসার সাহাবী ছিলেন না, কুরায়শ কাফেলা এবং বনী যামরার প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে আবওয়ার দিকে যাত্রা করেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মদীনায় হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে নিযুক্ত করেন। এ যুদ্ধের পতাকা ছিল হযরত হামযা (রা)-এর হাতে।

---

১. যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৮৩।

২. ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ৪১।

৩. মদীনা থেকে তেইশ মাইল দূরে জুহফার নিকটে অবস্থিত। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৭, মাগাযী অধ্যায়।

যখন তিনি আবওয়া পৌঁছেন, ততক্ষণে কুরায়শ কাফেলা চলে গিয়েছিল; কাজেই তিনি বনী যামরার সর্দার মাখশী ইবন আমর-এর সাথে সন্ধি করে ফিরে আসেন। সন্ধির শর্তসমূহ এই ছিল যে, বনী যামরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করবে না এবং মুসলমানদের কোন শত্রুকেও সাহায্য করবে না। আর মুসলমানদের সাথে প্রতারণাও করবে না; বরং প্রয়োজনে মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে।[১]

এ যুদ্ধকে ওয়াদ্দানের যুদ্ধও বলে। আবওয়া এবং ওয়াদ্দান দু'টি সন্নিকটবর্তী স্থান, উভয়ের দূরত্ব মাত্র ছয় মাইল।

মহানবী (সা) পনর দিন পর কোন রক্তপাত ছাড়াই এ যুদ্ধ থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। এতে লড়াই করার প্রয়োজন হয়নি (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩২৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২১৭)।[২]

বুয়াতের[৩] যুদ্ধ

ওহীর মাধ্যমে নবী (সা) জানতে পান যে, কুরায়শের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কায় যাচ্ছে। ফলে তিনি দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা রবিউস সানী মাসে দু'শ' মুজাহিদ সঙ্গে নিয়ে কুরায়শের ঐ কাফেলাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বুয়াতের দিকে যাত্রা করেন। এ সময় তিনি প্রথমদিকের মুসলমান এবং আসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবী হযরত সায়িব ইবন উসমান ইবন মাযউন (রা)-কে মদীনা হাকিম নিযুক্ত করেন।

কুরায়শের ঐ কাফেলায় আড়াই হাজার উট ছিল। আর উমায়্যা ইবন খালফসহ এতে লোকসংখ্যা ছিল একশত। বুয়াত পৌঁছে জানা গেল যে, কুরায়শের কাফেলা চলে গেছে। নবী (সা) কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।[৪]

উশায়রার যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরীর ২রা জমাদিউল আউয়াল তারিখে দু'শ' মুহাজির সাহাবীসহ কুরায়শ কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানোর জন্য নবী (সা) উশায়রা অভিযানে বাহন হিসেবে ত্রিশটি উট সঙ্গে নেন, যাতে সাহাবায়ে কিরাম (রা) পালাক্রমে আরোহণ করতেন।

তিনি পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে কাফেলা চলে গিয়েছিল। তিনি জমাদিউল আউয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো এবং জমাদিউস সানী মাসের কয়েক রাত্রি সেখানে অবস্থান করেন এবং বনী মুদলিজের সাথে সন্ধিচুক্তি করে বিনাযুদ্ধে সেখান থেকে মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। সন্ধির বাক্যাবলী ছিল নিম্নরূপ :

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৩।

২. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩২৬।

৩. বুয়াত মানবার সন্নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম, যা মদীনা থেকে কমবেশি আটচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত। যারকানী

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯২।

بِسْــمِ اللّٰهِ الرَّحْــمٰنِ الرَّحِـيْمِ ۰ هٰذَا كِـتَـابُ مِنْ مُـحَـمَّدٍ رَسُـوْلُ اللّٰهِ لَبَنِى ضَـمْرَة بِاَنَّهُمْ امِنُوْنَ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ لَهُمْ النصر على من رامهم ان لاّيحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة وان النبى اذ دعاهم لنصره اجابوه - عليهم بذالك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصر من بر واتقى ۰

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে বনী যামরার জন্য লিখিত চুক্তি যে, তাদের জানমাল সব নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি বনী যামরার সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করবে, তার মুকাবিলায় বনী যামরাকে সাহায্য করা হবে—এ শর্তে যে, বনী যামরা আল্লাহর দীনে কোন প্রকার বাধাদান করবে না। এ চুক্তি সমুদ্র শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ স্থায়ীভাবে থাকবে। নবী করীম (সা) যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করবেন, তারা উপস্থিত হবে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চুক্তি এবং যে ব্যক্তি সৎ ও বিশ্বস্ত থাকবে, তাকে সাহায্য করা হবে।"[১]

সর্বপ্রথম কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও একদল বর্ণনাকারী বলেন, সর্বপ্রথম আবওয়া, তারপর বুয়াত এবং এরপর উশায়রার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর এ ধারাবাহিকতাই ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে অনুসরণ করেছেন এবং হাফিয আসকালানীও তাঁর শারহে বুখারীতে এটাই অনুসরণ করেছেন। আর কোন কোন আলিম এ মত অবলম্বন করেছেন যে, প্রথম যুদ্ধ ছিল উশায়রার যুদ্ধ।[২]

অধিকন্তু সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, প্রথমোক্ত তিনটি অভিযান, অর্থাৎ হযরত হামযা (রা), হযরত উবায়দা (রা) এবং হযরত সা'দ (রা)-এর অভিযান প্রথম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, নাকি দ্বিতীয় হিজরীর আবওয়া যুদ্ধের পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ আলিম এ তিনটি অভিযান প্রথম হিজরী সালে আবওয়া যুদ্ধের পূর্বে বলে উল্লেখ করেছেন। যার অর্থ হলো, অনুমতি লাভের পর যুদ্ধের সূচনা অভিযানের মাধ্যমে শুরু হয়। আর হাফিয ইবন কায়্যিম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে, আল্লামা কাসতাল্লানী মাওয়াহিব গ্রন্থে এবং আল্লামা যারকানী শারহে মাওয়াহিবে প্রথমোক্ত অভিযানসমূহকে অর্থাৎ হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান, হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান এবং হযরত সা'দ (রা)-এর অভিযান প্রথম হিজরীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন। আর এ অধম (লেখক) যুদ্ধ এবং অভিযানের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কাসতাল্লাসী এবং যারকানীর অনুসরণ করেছে। আর মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রমুখের সিদ্ধান্ত হলো, যুদ্ধের সূচনা আবওয়ার যুদ্ধ দ্বারা হয়েছে এবং এর পরে হযরত হামযা (রা)-এর অভিযান এবং হযরত উবায়দা (রা)-এর অভিযান চালানো হয়। যেহেতু রাসূল (সা) এ দু'টি

১. রাউযুল উনূফ, ৩খ. পৃ. ৫৮; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৯৬।
২. তারিখুল খামীস, ১খ. পৃ. ৪০১।

অভিযানের নির্দেশ একই সাথে দিয়েছেন, এজন্যে বর্ণনাকারীদের সন্দেহ হয়েছে যে, কোন অভিযানটি প্রথমে চালানো হয়েছিল। ইবন হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ ধারাবাহিকতার অনুসরণ করেছেন যে, প্রথমে আবওয়ার যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, এর পরে উবায়দা ইবন হারিসের অভিযান, পরে হযরত হামযার অভিযান এবং এরপর বুয়াত যুদ্ধ অতঃপর উশায়রার যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। আর তিনি এ সমুদয় যুদ্ধ ও অভিযানকে দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন।

বদরের প্রথম যুদ্ধ (বদরে সুগরা বা গাযওয়ায়ে সাফওয়ান)

উশায়রার যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবী (সা) সম্ভবত প্রায় দশদিন মদীনায় অবস্থান করেন। ইত্যবসরে কুরয ইবন জাবির ফিহ্‌রী মদীনার চারণভূমিতে নৈশ আক্রমণ চালায় এবং মানুষের উট ও ছাগল নিয়ে পালিয়ে যায়। নবী (সা) এ সংবাদ শুনে তার পশ্চাদ্ধাবন করে সাফওয়ান পর্যন্ত গমন করেন—যা বদরের নিকটবর্তী একটি মৌজা। কিন্তু তিনি এখানে পৌঁছার পূর্বে কুরয চলে গিয়েছিল। ফলে তিনি মদীনার দিকে ফিরে আসেন।

সাফওয়ান যেহেতু বদরের নিকটবর্তী একটি মৌজা এবং নবী (সা) তার পশ্চাদ্ধাবন করে বদর পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন, এজন্যে একে বদরের প্রথম যুদ্ধ এবং সাফওয়ানের যুদ্ধও বলা হয়। এ যুদ্ধে যাত্রাকালে নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন।[১]

কুরয ইবন জাবির ছিল নেতৃস্থানীয় কুরায়শদের একজন। পরবর্তীতে ইনি মুসলমান হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উরাইনীদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বিশজন অশ্বারোহীর এক বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন হযরত কুরয ইবন জাবির (রা)-কে এর নেতা নির্বাচন করেন। ইনি মক্কা বিজয়কালে শাহাদতবরণ করেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর অভিযান

সাফওয়ান যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূল (সা) দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে নাখলার[৩] দিকে প্রেরণ করেন এবং এগারজন মুহাজিরকে তাঁর সঙ্গী হিসেবে প্রেরণ করেন—যাঁদের নাম নিম্নরূপ :

১. হযরত আবূ হুযায়ফা ইবন উতবা (রা),
২. হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা),
৩. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা),
৪. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৬; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২২৭।

২ আল-ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২৯০।

৩. নাখলা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তীস্থানের একটি জায়গার নাম, যা মক্কা থেকে একদিন ও এক রাতের দূরত্বে অবস্থিত। আর এটা ঐ স্থান, যেখানে জিন্নদের একটি দল নবী (সা)-এর নিকট এসেছিল। যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

৫. হযরত আমির ইবন রবীআহ (রা),
৬. হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৭. হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা),
৮. হযরত সাহল ইবন বায়যা (রা),
৯. হযরত আমির ইবন ইয়াস (রা),
১০. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা) এবং
১১. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)।

এ এগারজন মুজাহিদ তাঁর সঙ্গী ছিলেন এবং দ্বাদশতম ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে একটি অভিযানে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, এমন ব্যক্তিকে তোমাদের নেতা বানাব যে ব্যক্তি হবে ক্ষুৎ-পিপাসায় তোমাদের চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী। এরপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে আমাদের আমীর মনোনীত করেন এবং তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম আমীর।[১]

হযরত জুনদুব বাজালী (রা) থেকে হাসান সনদে মু'জামে তাবারানীতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-কে প্রেরণকালে একটি পত্র লিখে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, দু'দিনেরপথ অতিক্রম করার পূর্বে এ পত্র খুলে দেখবে না। দু'দিনের পথ অতিক্রমের পর এ পত্র খুলবে এবং সে মর্মে কাজ করবে। তবে তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করবে না।

কাজেই দু'দিনের পথ অতিক্রমের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) নবী (সা)-এর নির্দেশনামা খোলেন এবং এতে লিখা দেখতে পান যে, তোমরা সামনে অগ্রসর হও, এমনকি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়ে অবতরণ করবে এবং সেখানে কুরায়শদের জন্য অপেক্ষা করবে ও তাদের সংবাদাদি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ পত্র পাঠ করলেন এবং সঙ্গীরা বললেন, শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর তিনি তাঁর সকল সঙ্গীকে এ পত্রের মর্ম অবহিত করলেন এবং এও বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে বাধ্য করব না, শাহাদত যার কাছে প্রিয়, সে আমার সাথে যাবে। সুতরাং সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর সাহচর্য গ্রহণ করলেন এবং অগ্রসর হলেন।

পথিমধ্যে হযরত সা'দ এবং হযরত উতবা (রা)-এর উট হারিয়ে যাওয়ায় উট খুঁজতে গিয়ে তাঁরা পিছনে পড়ে যান এবং হারিয়ে যান। আর অবশিষ্ট সবাই নাখলায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন (ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ১৪৩, مايذكر فى المنابلة এবং كتاب اهل العلم الى البلدان অধ্যায়; উয়ূনুল আসার এবং যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭)।

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

ইসলামে প্রথম গনীমত

কুরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছিল। ঐদিন ছিল রজব মাসের শেষ তারিখ (এ মাসে যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম[১] ছিল)। শা'বান মাস শুরুর পূর্বরাত্রে তাঁরা ঐ কাফেলার ওপর আক্রমণ করে বসেন।

কাফেলার সর্দার আমর ইবন হাযরামীকে হযরত ওয়াকিদ ইবন আব্দুল্লাহ (রা) একটি তীর নিক্ষেপ করেন, যাতে সে নিহত হয়। সে মৃত্যুবরণ করামাত্রই কাফেলার লোকজন হৈ চৈ শুরু করে এবং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে পলায়ন করতে থাকে। আর মুসলমানগণ কাফেলার সমুদয় মালামাল দখল করে নেন এবং উসমান ইবন আবদুল্লাহ ও হাকাম ইবন কায়সানকে গ্রেফতার করেন। ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধলব্ধ মালামাল বন্টনের ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) নিজের চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী প্রাপ্ত মালামালের পাঁচভাগের চারভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং এক-পঞ্চমাংশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য রেখে দেন। যখন মদীনা পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ ব্যাপারে অবহিত করেন, তখন তিনি বললেন, আমি তো তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। আচ্ছা, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত গনীমতের মাল এবং বন্দীদের হিফাযতে রাখ। এতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণ লজ্জিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। অপরদিকে মুশরিক ও ইয়াহূদীরা বলতে থাকে যে, মুহাম্মদ (সা) ও তার সাথীরা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধকে বৈধ করে নিয়েছে। ফলে এ আয়াত নাযিল হয় :

---

১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শরীআতে চারটি মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ (হারাম) ছিল। যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররম, এ তিনমাস পর্যায়ক্রমে এবং অপর একমাস রজব। যিলহাজ্জ হজ্জের মাস, এর পূর্বে একমাস এবং এর পরবর্তী একমাস এজন্যে হারাম করা হয় যে, দূর-দূরান্ত থেকে আগত হাজীগণ যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে হজ্জ করে ফিরে যেতে পারেন। আর রজব মাসে উমরা করার জন্য ঐ সব লোক আসত, যারা মক্কা থেকে দশ-পনের দিনের দূরত্বে বাস করত। এজন্যে রজব মাসকে হারাম করা হয়, যাতে আসতে চৌদ্দ-পনের দিন এবং যেতে চৌদ্দ-পনের দিন নিরাপদে থাকে। আর এ সময়ে খাদ্যশস্যও আসত, ফলে ঐ মাসসমূহ হারাম করা হয় যাতে মানুষের জানমাল লুটতরাজ হতে নিরাপদ থাকে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ "পবিত্র কা'বাগৃহ, পবিত্রও মাস, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ্ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।" (সূরা মায়িদা : ৯৭)। হযরত ইবরাহীম (আ) থেকে শুরু করে ইসলামের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এ বিধান বলবৎ থাকে। এমনকি উক্ত আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয় এবং ঐ মাসসমূহে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় কিন্তু জিহাদ ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ ছাড়া এ মাসসমূহের নিষিদ্ধতা এখনো অবশিষ্ট আছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন : مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ "এ চার মাস হারাম, এ সময়ে নিজেদের ওপর অত্যাচার করো না।" অর্থাৎ আল্লাহর নাফরমানী করবে না। আতা বলেন, ঐ চার মাস যুদ্ধ ও রক্তপাত হারাম হওয়ার বিধান এখনো বলবৎ আছে, রহিত হয়নি। রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৬০।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ط وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌبِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَ كْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ط وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا

"পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে; বল, ওতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে (প্রবেশে) বাধা দেয়া এবং সেখানকার বাসিন্দাকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর কাছে এর চেয়ে বেশি অন্যায়; ফিতনা হত্যার চেয়ে গুরুতর অন্যায়। ওরা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে না নেয়, যদি ওরা সক্ষম হয়।" (সূরা বাকারা : ২১৭)

মোটকথা কোন সন্দেহ বা সংশয়ের ভিত্তিতে বা অজ্ঞতার দরুন হারাম মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হওয়া দূষণীয় কিছু নয়। অবশ্য কুফর ও শিরকের ফিতনা এবং মুসলমানদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে বাধাদান একটা বড় ধরনের ফিতনা, যার চেয়ে বড় অপরাধ আর কিছু নেই। এ পবিত্র আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্টাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের মনে আগ্রহের সঞ্চার হলো। জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ্, আমরা কি এ যুদ্ধের বিনিময়ে কিছু আশা করতে পারি ? ফলে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۔

"যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ্ ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু।" (সূরা বাকারা : ২১৮)

এটা ছিল ইসলামে প্রথম গনীমত এবং আমর ইবন হাযরামী ছিল প্রথম ব্যক্তি, যে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। কুরায়শরা উসমান ইবন আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবন কায়সানের জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করে। নবী (সা) বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সঙ্গী সা'দ এবং উতবা ফিরে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ বন্দীদের ছাড়ছি না। কেননা আমার সন্দেহ হয় যে, তোমরা না জানি তাদের হত্যা করে ফেল। যদি তোমরা আমার সঙ্গীদের হত্যা কর, তা হলে আমিও তোমাদের লোকদের হত্যা করব। এর কয়েকদিন পর সা'দ ও উতবা ফিরে আসেন, তিনিও মুক্তিপণ গ্রহণ করে উসমান ও হাকামকে ছেড়ে দেন। উসমান তো ছাড়া পাওয়ামাত্রই মক্কায় ফিরে যায় এবং মক্কায় গিয়ে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আর হাকাম ইবন কায়সান মুসলমান হয়ে

মদীনায়ই অবস্থান করেন এবং বীরে মা'উনার যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।[১] আর এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ কবিতা আবৃত্তি করেন :

تَعُدُّوْنَ قَتْلاً فِى الْحَرَامِ عَظِيْمَةً * وَاعْظَمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرَّشَدَ رَاشِدُ

صَدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُول مُحَمَّدُ * وَكُفْرُ بِهِ وَاللّٰهُ رَاءٍ وَشَاهِدُ

وَاِخْرَاجِكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللّٰهِ اَهْلَهُ * لَيْلاً يُرى فِى الْبَيْتِ لِلّٰهِ سَاجِدُ

فانا وان عُمَّيْرِ تُمُوْنَا لِقَتْلِهِ * وَاَرْجَفَ بِالْاِسْلَامِ بَاغٍ وحاسد

سَقَيْنَا مِنِ ابْنِ الْحَضرمى رَمَاحَنَا * بِنَخْلَةَ لَمَا اوقد الحرب واقد

دما وابن عبد اللّه عثمان بيننا * ينازعة فُدًّ من القبد عَانِدُ

"তোমরা হারাম মাসে অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধকে বড় মনে কর, অথচ মুহাম্মদ (সা) যা বলেন, তা থামিয়ে দেয়া এবং তাঁকে অস্বীকার করা এর চেয়ে বড় অপরাধ। হায়! যদি কোন বুঝমান ব্যক্তি একটু খেয়াল করত! আর আল্লাহ্ তো সম্যক দ্রষ্টা ও সাক্ষ্যদাতা।

"আর আল্লাহর ঘর থেকে আল্লাহ্ ভক্তদের এজন্যে বের করে দেয়া যে, সেখানে আল্লাহকে সিজদাকারী যেন পরিদৃষ্ট না হয়, এটাও হারাম মাসে যুদ্ধ করা অপেক্ষা বড় অপরাধ।

"তোমরা যদিও এ যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে লজ্জা দাও, আর বিতণ্ডাকারী ব্যক্তি তো ইসলামের ব্যাপারে কতই মিথ্যা বলে, তাতে আমাদের কোনই পরোয়া নেই। নিঃসন্দেহে আমরা আমর ইবন হাযরামীর রক্ত দিয়ে নাখলা নামক স্থানে নিজের তীর রঞ্জিত করেছি। যখন ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা) যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আর উসমান ইবন আবদুল্লাহ আমাদের কাছে বন্দী ছিল, যার গলার বেড়ি এবং শিকল ধরে নিজের দিকে টানছিল।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯; হুসনুস সাহাবা, ১খ. পৃ. ৩০৩)।[২]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭; যারকানী, ১খ. পৃ. ৩৯৭।

২. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯।

বদর[১] যুদ্ধ (বদরে কুবরা)

(রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হিজরী)

এ যুদ্ধ ছিল ইসলামের যুদ্ধসমূহের মধ্যে সবচে' বড় যুদ্ধ। এজন্যে যে, ইসলামের সম্মান ও শৌর্যের সূচনা এবং এইসঙ্গে কাফির ও মুশরিকদের বে-ইযযতী ও লাঞ্ছনার সূচনা উভয়ই এ যুদ্ধের মাধ্যমেই ঘটে। আর আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে প্রকাশ্য ও বস্তুগত প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ ছাড়াই একমাত্র গায়েবী শক্তিবলে মুসলমানদের বিজয় ঘটে। ইসলাম কুফর ও শিরকের মাথায় এমন আঘাত হানে যে, বস্তুত তার হাড়-অস্থি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এর নিরপেক্ষ সাক্ষী হিসেবে বদরের ময়দান আজো বিদ্যমান। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ দিনকে يَوْمُ الْفُرْقَانْ তথা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যের দিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বরং এ পুরো মাসটিই ছিল পার্থক্যকরণের মাস, রমযানুল মুবারকের মাস, যে মাসে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআন নাযিল করে হক ও বাতিল, হিদায়াত ও গুমরাহীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করেছেন। আবার এ মাসেই রোযা ফরয করেছেন—যাতে নিষ্ঠাবান আল্লাহপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ বান্দা আর অন্যদের মধ্যে পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে তাঁর খাঁটি প্রেমিক। কেননা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাঁরই প্রেমে মত্ত হয়ে আল্লাহপ্রেমিকগণ প্রচণ্ড গরমের কষ্ট স্বীকার করে, আর কে ভণ্ড প্রেমিক এবং পেট ও প্রবৃত্তির গোলাম, তা ধরা পড়ে। মোটকথা এ মাসটিই ন্যায়-অন্যায় এবং হক-নাহকের পৃথকীকরণের মাস, এ মাসে বিভিন্নভাবে ও নানান পদ্ধতিতে খাঁটি ও অখাঁটির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ঘটনার সূত্রপাত

রমযানের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (সা) এ সংবাদ পান যে, আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের এমন একটি বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করছে, তাদের সাথে আছে অর্থ-সম্পদ। তিনি (সা) মুসলমানদের একত্রিত করে এ সংবাদ দিলেন এবং বললেন, এটা কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা। তোমরা সেদিকে বেরিয়ে পড়। এ কাফেলা

---

১. বদর একটি গ্রামের নাম যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে চার মনযিল ও আট ফারসাখ অর্থাৎ প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর ইবন ইয়াখলাদ ইবন নাযর ইবন কিনানা কিংবা বদর ইবন হারিসের নামের সাথে সম্পর্কিত, যিনি এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। আর কেউ বলেন, বদর একটি কূপের নাম ছিল এবং কূপের নামেই গ্রামটি প্রসিদ্ধিলাভ করে। যারকানী, ১খ., পৃ. ৪০৬।

তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা গনীমত হিসেবে দান করবেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।[১]

যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ বা খুনোখুনির কোন ধারণাও ছিল না, কাজেই তাঁরা কোনরূপ রণপ্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়েন। আবূ সুফিয়ান এমন কিছু একটা সন্দেহ করছিলেন। কাজেই হিজায এলাকায় পৌঁছে তিনি প্রতিটি মুসাফির পথচারীকে নবী (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। এদের মধ্যে জনৈক মুসাফিরের মাধ্যমে খবর পেলেন যে, মুহাম্মদ (সা) তোমার কাফেলা ধরার জন্য তাঁর সাহাবীদের নির্দেশ দিয়েছেন। আবূ সুফিয়ান সাথে সাথে যমযম গিফারীকে মজুরীর বিনিময়ে এ খবর মক্কায় প্রেরণ করেন যে, তুমি গিয়ে কুরায়শদের মাঝে ঘোষণা করে দেবে যে, যত দ্রুত সম্ভব, তোমরা নিজেদের কাফেলার খবর নাও এবং এ বহর রক্ষা করার চেষ্টা কর। কেননা এ কাফেলা আটক করার উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ তার সাথীদের নিয়ে বের হয়েছেন।[২] হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন :

لم اتخلف من رسول الله ﷺ في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك غير انى تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاقب احد تخلف عنها انما خرج رسول الله ﷺ يريد غير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد .

"যে যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) খোদ অংশগ্রহণ করেছেন, একমাত্র তাবূক যুদ্ধ ছাড়া এমন আর কোন যুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ থেকে পেছনে থাকিনি। বদর যুদ্ধেও আমি পেছনে থেকে গিয়েছিলাম কিন্তু তাবূক যুদ্ধের মত বদর যুদ্ধেও অংশগ্রহণ না করার জন্য কারো প্রতি কোন শাস্তি আরোপিত হয়নি। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল কুরায়শদের কাফেলার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, আর দৈবক্রমে কোন পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী করেন।" (সহীহ বুখারী, কিসসাতু বদর যুদ্ধ অধ্যায়)

দ্রষ্টব্য : হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) তাবূক ও বদর যুদ্ধে পেছনে থাকার বিষয় পৃথক পৃথক শব্দদ্বারা উল্লেখ করেছেন, উভয়টি একই শব্দদ্বারা বর্ণনা করেননি। আর তিনি এভাবে বলেননি যে, الا في غزوة تبوك غير انى تخلفت عن غزوة بدر বরং তাবূক যুদ্ধে অশগ্রহণ না করার জন্য ৮। এবং বদর যুদ্ধের ব্যাপারে غير শব্দ ব্যবহার

---

১. শত্রুর অর্থনৈতিক অবরোধ বা রসদ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়া যুদ্ধের একটি বড় কৌশল। মহানবী (সা)-এর এ নির্দেশ তাঁর বিরাট রণকৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক।

২ এ রিওয়ায়াত সীরাতে ইবন হিশামে এ সনদে বর্ণিত হয়েছে : قال ابن اسحق فحدثنى محمد مسلم الزهرى وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن ابى بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس الخ সনদটি বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ, বরং বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৬।

করেছেন এবং বলেছেন যে, لا فى غزوة تبوك غير انى تخلف من غزوة بدر। দু'টিকে একই না বোধক বাক্য দ্বারা বর্ণনা করেননি। কেননা উভয় পেছনে পড়ার কারণ ও বৈশিষ্ট্য একরূপ ছিল না। তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ছিল নিন্দনীয়, তাবূক যুদ্ধে পেছনে অবস্থানকারীদের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হয়েছিল, আর বদর যুদ্ধে পেছনে অবস্থান করা নিন্দনীয় ছিল না। কাজেই যে ব্যক্তি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদের জন্য কোন ভৎসনা ছিল না। এজন্যে বদর যুদ্ধে পেছনে থাকার বিষয়ে غير শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা ও তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা বিপরীতার্থক ও পরস্পর বিরোধী বলে জানা যায়। অতএব বুঝে নিন, কেননা এটা অতীব সূক্ষ্ম বিষয়।[১]

ইবন সা'দ বলেন, এটা ছিল ঐ কাফেলা, যাতে তিনি দু'শ' মুহাজিরসহ যুল-উশায়রায় গমন করেছিলেন। এ কাফেলা তখন সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল কাফেলাকে ধরা, কাজেই দ্রুততার কারণে স্বল্প সংখ্যক লোকই তাঁর সঙ্গী হতে পেরেছিল। আর এটা যেহেতু যুদ্ধাভিযান ছিল না, সেহেতু এতে না যাওয়ার কারণে কাউকে কোন প্রকার নিন্দা কিংবা ভৎসনা করা হয়নি।

অভিযান : পবিত্র রমযানের বার তারিখে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওয়ারা থেকে অভিযানে বের হন। তিনশ' তের, চৌদ্দ অথবা পনেরজন[২] তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। অস্ত্রশস্ত্রের অভাব এত প্রকট ছিল যে, এত বড় কাফেলায় মাত্র দু'টি ঘোড়া আর সত্তরটি উট ছিল। একটি ঘোড়া ছিল হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-এর, অপরটি ছিল হযরত মিকদাদ (রা)-এর। আর এক-একটি উট দু' অথবা তিনজনের জন্য বরাদ্দ ছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, বদরে যাত্রাকালে একেকটি উট তিনজনের জন্য বরাদ্দ ছিল। তারা পর্যায়ক্রমে এতে আরোহণ করতেন। হযরত আবূ লুবাবা এবং হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে শরীক ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পদব্রজে চলার পালা আসত, তখন হযরত আবূ লুবাবা অথবা হযরত আলী (রা) আরয করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আরোহণ করুন, আমরা আপনার বদলায় পদব্রজে যাচ্ছি। জবাবে তিনি বলতেন, "তোমরা পথ চলার ব্যাপারে আমার চেয়ে শক্তিশালী নও, আর আমিও আল্লাহর পুরস্কারের ব্যাপারে তোমাদের তুলনায় অমুখাপেক্ষী নই।"

বীরে আবূ ইনবায় পৌঁছে (যা ছিল মদীনা থেকে এক মাইল দূরে) তিনি দলের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। দলে যারা অল্পবয়স্ক ছিল, তাদেরকে ফেরত

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ২২৩।

২ মুসনাদে আহমদ, বাযযার ও মু'জামে তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে তিনশ' তেরজন বর্ণনা করেছেন। মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) তিনশ' চৌদ্দজন এবং বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) সূত্রে হাসান সনদে তিনশ' পনেরজন বর্ণিত আছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৭, 'আদাতু আসহাবে বদর' অধ্যায়।

পাঠিয়ে দিলেন। আর-রাওহায় পৌঁছে হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা)-কে মদীনার প্রশাসক মনোনীত করে ফেরত পাঠালেন।

এ বাহিনীতে তিনটি পতাকা ছিল। একটি হযরত আলী (রা)-এর হাতে, দ্বিতীয়টি হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর হাতে এবং তৃতীয়টি জনৈক আনসারী সাহাবীর হাতে।

যখন তাঁরা সাফরার নিকটবর্তী হলেন, তখন হযরত লাব্বাস ইবন আমের জুহানী (রা) এবং আদী ইবন আবূ যুগবা জুহানী (রা)-কে আবূ সুফিয়ানের অনুসন্ধানের জন্য আগাম প্রেরণ করলেন।[১]

অপরদিকে যমযম গিফারী আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা নিয়ে মক্কায় পৌঁছল যে, তোমাদের কাফেলা বিপদের সম্মুখীন, সেদিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং যত শীঘ্র সম্ভব এর সংবাদ লও।

এ সংবাদ কেবল পৌঁছার অপেক্ষা, মক্কায় হুলস্থুল পড়ে যায়। এ কারণে যে, কুরায়শের এমন কোন পুরুষ বা মহিলা ছিল না, যার পুরো মূলধন এ বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হয়নি। সুতরাং এ খবর শোনামাত্র সমগ্র মক্কায় উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল এবং এক সহস্র মানুষ[২] অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়ল, যার নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল।

কুরায়শ বাহিনী অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে আরাম-আয়েশের সরঞ্জামাদিসহ গায়িকা স্ত্রীলোক, ঢোল-তবলা ও বাদ্যকার সঙ্গে নিয়ে অহংকার ও অহমিকার সাথে অগ্রসর হলো। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ ·

"তোমরা (হে মুসলমানগণ) তাদের মত হবে না, যারা অহংকারসহ লোক দেখানোর জন্য নিজেদের গৃহ থেকে বের হয়েছিল।" (সূরা আনফাল : ৪৭)

নেতৃস্থানীয় সমস্ত কুরায়শ এ বাহিনীতে শরীক হয়েছিল, কেবল আবূ লাহাব কোন কারণবশত যেতে পারেনি, তবে তার বদলে আবূ জাহলের ভাই আস ইবন হিশামকে প্রেরণ করেছিল।

আস ইবন হিশামের যিম্মায় আবূ লাহাবের চার হাজার দিরহাম ঋণ ছিল, যা অভাবের কারণে তার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব ছিল না। এজন্যে ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে সে আবূ লাহাবের পক্ষে যুদ্ধে যেতে সম্মত হয়েছিল।[৩]

---

১. ইবন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৬।

২ মুসলিম, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হযরত ইবন আব্বাস (রা) হযরত উমর (রা) সূত্রে ও ইবন সা'দ হযরত ইবন মাসঊদ (রা) সূত্রে এ সংখ্যা বর্ণনা করেছেন। আর মূসা ইবন উকবা এবং ইবন আয়িয-এর মাগাযীর মতে এ সংখ্যা সাড়ে নয়শত ছিল। তবে এতে কোন মতপার্থক্য নেই। প্রকৃত যোদ্ধার সংখ্যা ছিল সাড়ে নয়শত এবং অবশিষ্ট পঞ্চাশজন ছিল খাদিম বা অনুরূপ কিছু। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১০।

৩. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৭।

অনুরূপভাবে উমায়্যা ইবন খালফও প্রথমে বদরে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু আবূ জাহলের চাপের ফলে সে দলে যোগ দেয়।

উমায়্যার অস্বীকৃতির কারণ ছিল এই যে, হযরত সা'দ ইবন মু'আয আনসারী (রা) জাহিলী যুগ থেকেই উমায়্যার বন্ধু ছিলেন। উমায়্যা যখন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যেত, তখন পথিমধ্যে মদীনায় হযরত সা'দ ইবন মু'আযের নিকট যাত্রা বিরতি করত এবং সা'দ ইবন মু'আয মক্কায় এলে উমায়্যার আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। মহানবী (সা) মদীনায় হিজরত করার পর সা'দ ইবন মু'আয উমরা করার উদ্দেশ্যে একবার মক্কায় আগমন করেন এবং নিয়মানুযায়ী উমায়্যার ঘরে উঠেন। আর উমায়্যাকে বলেন, তাওয়াফের জন্য আমাকে এমন সময় নিয়ে যাবে যখন হরম লোকজন থেকে খালি থাকবে। অর্থাৎ যাতে মানুষের ভিড় না থাকে। উমায়্যা দুপুরবেলা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-কে নিয়ে বের হলো। তিনি তাওয়াফ করছিলেন, এমন সময় আবূ জাহল সামনে এলো এবং বলতে লাগল, ওহে আবূ সাফওয়ান! (উমায়্যার ডাকনাম) তোমার সাথে এ ব্যক্তিটি কে ? উমায়্যা বলল, ইনি সা'দ। আবূ জাহল বলল, আমি দেখছি যে, এ ব্যক্তি নিশ্চিন্তে তাওয়াফ করছে। তুমি এ ধরনের বেদীনদের আশ্রয় দাও আর তার সাহায্য-সহযোগিতা কর ? ওহে সা'দ! আল্লাহর কসম, যদি তোমার সাথে আবূ সাফওয়ান (উমায়্যা) না থাকত, তা হলে তুমি এখান থেকে সুস্থ দেহে নিরাপদে ফিরে যেতে পারতে না। সা'দ উচ্চ কণ্ঠে বললেন, যদি তুমি আমাকে তাওয়াফ করতে না দাও, তবে আল্লাহর কসম, আমি মদীনার পথে তোমার সিরিয়া যাওয়া বন্ধ করে দেব। উমায়্যা সা'দকে বলল, তুমি আবুল হাকামের (আবূ জাহলের) সামনে তোমার কণ্ঠস্বর উচ্চ করো না, কেননা তিনি এ উপত্যকার সর্দার। সা'দ সাথে সাথে বলে উঠলেন, হে উমায়্যা, বাদ দাও, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি, তুমি নবী (সা)-এর সঙ্গী-সাথীদের হাতে নিহত হবে। উমায়্যা বলল, আমি কি মক্কায় মারা যাব? সা'দ বললেন, এটা আমার জানা নেই যে, তুমি কখন বা কোন্ স্থানে মারা যাবে। এ কথা শুনে উমায়্য খুব ঘাবড়ে গেল ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। আর ফিরে গিয়ে সে তার স্ত্রী উম্মে সাফওয়ানকে এ কথা খুলে বলল।

অপর এক বর্ণনায় আছে, উমায়্যা বলল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ কখনো মিথ্যা বলেন না। সম্ভবত মৃত্যুভয়ে ঐ সময় উমায়্যার প্রস্রাব-পায়খানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২০)। আর উমায়্যার ভয়-ভীতি এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে, সে সংকল্প করেছিল, কখনো মক্কার বাইরে যাবে না। কাজেই আবূ জাহল যখন লোকজনকে বদরের উদ্দেশ্যে বের হতে বলছিল, তখন উমায়্যাকে মক্কা থেকে বের করা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। তার ছিল প্রাণের ভয়। আবূ জাহল উমায়্যার কাছে এলো এবং তাকে যাওয়ার জন্য তাকিদ দিল। আবূ জাহল যখন দেখল, উমায়্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়, তখন বলল, আপনি নেতা, আপনি যদি বের না হন তা হলে আপনার দেখাদেখি অনেক লোকই যাত্রা থেকে বিরত থাকবে। মোট কথা, আবূ জাহল সব সময় উমায়্যাকে খোঁচাতে ও উৎসাহিত করতে থাকল। পরিশেষে বলল, ওহে আবূ সাফওয়ান, আমি আপনার জন্য একটি উত্তম ও দ্রুতগামী ঘোড়া কিনে দেব

(যেখানেই বিপদ অনুভব করবেন, ওতে আরোহণ করে যাতে ফিরে আসতে পারেন)। উমায়্যা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো এবং ঘরে গিয়ে আপন স্ত্রীকে বলল, আমার সফরের মাল-সামান প্রস্তুত করে দাও। স্ত্রী বলল, ওহে আবূ সাফওয়ান, তোমার ইয়াসরিবী ভাইয়ের কথা কি তোমার স্মরণ নেই ? উমায়্যা বলল, আমার ইচ্ছা কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়া, এরপর ফিরে আসব। অতএব উমায়্যা এ উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রা করল এবং যে মনযিলেই অবতরণ করতো, উটটি নাগালের মধ্যেই রাখত। কিন্তু ভাগ্যের লিখন তাকে পলায়নের সুযোগ দেয় নাই। সে বদরে উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধের ময়দানে সাহাবায়ে কিরামের হাতে নিহত হয় (বুখারী শরীফ, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)। মোটকথা এই যে, নিজের নিহত হওয়ার ব্যাপারে উমায়্যার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আবূ জাহলের জবরদস্তির জন্য সে অংশগ্রহণ করেছিল। ফলে আবূ জাহল নিজেও ধ্বংস হয় এবং অপরকেও ধ্বংস করে।

احلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار

কুরায়শের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ অবহিত হওয়া, নবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ এবং আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ

রাওহা থেকে রওয়ানা হয়ে যখন তাঁরা সুফরায় পৌঁছলেন, তখন লাব্বাস এবং আদী (রা) নবী (সা)-কে কুরায়শদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণকে পরামর্শ করার জন্য একত্র করেন এবং কুরায়শ বাহিনীর জাঁকজমকের সাথে অগ্রসর হওয়ার সংবাদ দেন। এ খবর শোনামাত্র হযরত আবূ বকর (রা) দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে নিজকে উৎসর্গ করার ঘোষণা দিলেন ও নবী (সা)-এর ইঙ্গিতকে আপাদমস্তক গ্রহণ করলেন আর জীবন দিয়ে আনুগত্য করার জন্য কোমর বেঁধে নিলেন। এরপর হযরত উমর (রা) দাঁড়ালেন এবং তিনিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে আত্মোৎসর্গের ঘোষণা দিলেন।

হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ[১]

এরপর হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা) দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন :

امض لها امرك الله (تعالى) فنحن معك والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون .

---

১. মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনাদ্বারা মনে হয় যে, হযরত মিকদাদ (রা) এ ভাষণ সুফরায় দিয়েছিলেন। কিন্তু সহীহ্ বুখারী ও সুনানু নাসাঈর বর্ণনাদ্বারা জানা যায়, তিনি বদরের দিন এ ভাষণ দিয়েছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৩)। তবে এ উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। হযরত মিকদাদ (রা) এ ভাষণ নবী (সা)-এর কথার জবাবে সুফরায় দিয়েছিলেন, এরপর বিভিন্ন স্থানে উপভোগের উদ্দেশ্যে এ বাক্যগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি করেছেন। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনি সেমতে ব্যবস্থা নিন, আমরা সবাই আপনার সাথে আছি। আল্লাহর শপথ, আমরা বনী ইসরাঈলের মত কখনই এ কথা বলব না যে, ওহে মূসা! তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা তো এখানেই বসে থাকব। আমরা বণী ইসরাঈলের বিপরীতে বলব, আপনি এবং আপনার পরোয়ারদিগার যে যুদ্ধ ও লড়াই করবেন, আমরাও আপনার সাথে যুদ্ধ ও লড়াইয়ে শরীক হব।"

এটা ইবন ইসহাক বর্ণিত শব্দমালা।[১] বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে :

ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ·

"আমরা আপনার ডাইনে ও বামে, সামনে ও পিছনে থেকে লড়াই করব।"

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখেছি ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল (বুখারী, পৃ. ৫৬৪, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

উবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সা) হযরত মিকদাদ (রা)-এর কল্যাণ কামনা করে দু'আ করেন।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ দেন এবং বলেন, যদি তোমরা ঐদিকে বের হও, তা হলে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে গনীমত দান করবেন। আমরা আরয করলাম, উত্তম, এরপর রওয়ানা হলাম। যখন এক বা দু'দিনের পথ অতিক্রম করলাম, তখন তিনি আমাদেরকে মক্কা থেকে কুরায়শ বাহিনীর আগমনের সংবাদ দেন এবং যুদ্ধ ও লড়াই করার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। কিছু লোক কিছুটা ইতস্তত করছিল (কেননা তারা ঘর থেকে এ উদ্দেশ্যে বের হয়নি)। তখন হযরত মিকদাদ (রা) দাঁড়িয়ে আত্মোৎসর্গমূলক যে ভাষণ দিলেন, মনে হচ্ছিল যেন এটা আমাদেরই কথার প্রতিধ্বনি (ইবন হাতিম)। অর্থাৎ যেন আমরা সবাই প্রথমেই এমনটি বলেছি এবং পরেও সবাই তাই বলেছে আর আমাদের সবার অন্তরেও তাই ছিল, যা হযরত মিকদ্দ (রা) বলেছিলেন। কাজেই মুসনাদে আহমদে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে :

قال اصحاب رسول الله ﷺ لا نقول كما قالت بنو اسرائيل ولكن انطلق وربك فقاتلا انا معكم ·

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সমস্ত সাহাবীই একমত হয়ে বলেছিলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বনী ইসরাঈলের মত বলব না; আমরা সর্বাবস্থায়ই আপনার সাথে আছি।"

এ প্রেরণাদায়ক ও সন্তোষজনক জবাবে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে রাসূল (সা) বললেন : اشيروا عى ايها الناس "হে লোক সকল! আমাকে পরামর্শ দাও।"

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১২; সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১২।

আনসারদের নেতা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরব ও আজমের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধভাষী নবী করীম (সা)-এর এ পরিষ্কার ইঙ্গিত ও সূক্ষ্ম মন্তব্য বুঝে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সম্ভবত ইঙ্গিতটা আনসারীদের প্রতি ? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ।[১]

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর আত্মোৎসর্গমূলক ভাষণ

এর ফলে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন :

يا رسول الله قد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق واعطيناك على ذالك عهود او مواثيق على السمع والطاعة ولعلك يا رسول الله خرجت لامر فاحدث الله غيره فامض لما شئت وصد حباك من شئت واقطع حبال من شئت وسالم من شئت وعاد من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت وما امرت به من امرنا فامرنا تبع لامرك لنن سرت حتى تاتى برك الغماد لنسيرن معك فوالذى بعثك بالحق لراستعرضت بنا هذا البحر اخضناه وما تخلف منا رجل واحد وما نكره ان نلقى عدونا انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك فسرينا على بركة الله .

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি এবং আপনাকে সত্য নবী বলে জেনেছি। আর এ কথার সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সবই সত্য এবং আমরা আপনার আনুগত্য করার এবং আপনার জন্য আত্মোৎসর্গ করার দৃঢ় শপথ ও মযবূত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি। মদীনা থেকে আপনি ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিলেন, আর এখন আল্লাহ্ আরেক অবস্থার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যে পথে চলা উত্তম মনে করেন, তা অনুসরণ করুন, যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক সৃষ্টি করুন এবং যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক ছিন্ন করুন, আর যার সাথে ইচ্ছা সন্ধি করুন এবং যার সাথে ইচ্ছা দুশমনি করুন। সর্বাবস্থায়ই আমরা আপনার সাথে আছি। আমাদের

১. যেহেতু আনসারিগণ আকাবার বায়আতে নবী (সা)-এর সাথে কেবল এ ওয়াদা করেছিলেন যে, নবী (সা)-এর ওপর কোন শত্রু আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে তারা তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন, মদীনার বাইরে গিয়ে তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের ওয়াদা ছিল না। এজন্যে নবী (সা) বার বার আনসারীগণের প্রতি তাকাচ্ছিলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তাঁর এ ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উত্তর দিয়েছিলেন এবং খুব সুন্দর জবাবই দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৪; দ্র. উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২৪৭।

ধন-সম্পদের মধ্য থেকে যা খুশি নিয়ে নিন এবং যা খুশি আমাদের দিয়ে দিন।[১] আর আমাদের সম্পদের যে অংশ আপনি গ্রহণ করবেন, তা আমাদের জন্য ছেড়ে দেয়া অংশ থেকে আমাদের নিকট বেশি প্রিয় হবে। আপনি যদি আমাদেরকে 'বারকুল গামাদে' যাওয়ারও নির্দেশ দেন, আমরা আপনার সাথে সেখানেই যাব। কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি আমাদেরকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ারও যদি আদেশ করেন, তা হলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত। আমাদের এক ব্যক্তিও এতে পিছপা হবে না। আমরা শত্রুর মুকাবিলা করাকে অন্যায় মনে করি না, আমরা অবশ্যই লড়াইয়ের ময়দানে ধৈর্যশীল ও সম্মুখ সমরে সত্যবাদী। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে এই কামনা করি যে, তিনি আমাদের দ্বারা আপনাকে এমন দৃশ্য দেখান, যাতে আপনার চোখ জুড়িয়ে যায়। সুতরাং আপনি আল্লাহর নামের বরকতে আমাদের নিয়ে চলুন।" (যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৩)

সতর্ক বাণী : কোন কোন বর্ণনায় হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর পরিবর্তে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়, বর্ণনাকারীর ধারণামাত্র। এজন্যে যে, সর্বসম্মতভাবে হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) বদর যুদ্ধে উপস্থিত হননি। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী দেখুন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামের এরূপ আত্মোৎসর্গকারী ভাষণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও, আর তোমাদের জন্য সুসংবাদ, আল্লাহ্ তা'আলা আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, আবূ জাহল এবং আবূ সুফিয়ানের দল দু'টির মধ্যে যে কোন একটি দলের ওপর বিজয়ী হতে তিনি অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর আমাকে কাফির সম্প্রদায়ের পরাজিত হওয়ার স্থানসমূহ দেখানো হয়েছে যে, অমুককে অমুক স্থানে, তমুককে তমুক স্থানে পরাজিত করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ـ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ـ

"স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাদের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছিলে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন, সত্যকে তিনি তাঁর বাণীদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করবেন। এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং অসত্যকে

---

১. এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমাদের সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আপনারই সম্পদ, এর থেকে যদি আপনি আমাদের জন্য কিছু ছেড়ে দেন, তা তো আপনারই দেয়া হলো।

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৪।

অসত্য প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধীগণ এটা পসন্দ করে না।" (সূরা আনফাল : ৭-৮)

আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

এদিকে নবী করীম (সা) সাহাবায়ে কিরামকে এ সংবাদ দেন যে, আমাকে দুশমনদের পরাজিত হওয়ার স্থানসমূহ দেখানো হয়েছে, অন্যদিকে মক্কা মুকাররামায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব যমযম গিফারীর মক্কায় পৌঁছার পূর্বে এ স্বপ্ন দেখেন, জনৈক উষ্ট্রারোহী বাতহায় উট বসিয়ে উচ্চস্বরে এ ঘোষণা দিচ্ছে যে, الا انفقوا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث "ওহে আলে গাদার (সন্ত্রাসী, প্রতারক সম্প্রদায়)[১] তোমরা তিনদিনের মধ্যে নিজেদের নিহত এবং পরাজয় ক্ষেত্র অভিমুখে বের হয়ে পড়ো।"

লোকজন তার চারপাশে জমা হয়ে গেল। এরপর ঐ ব্যক্তি নিজের উট নিয়ে মাসজিদুল হারামের দিকে চলে গেল এবং একই ঘোষণা দিল। অতঃপর সে আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করল এবং সেখান থেকে পাতরের একটি খণ্ড ছুঁড়ে মারল। পাথরের ঐ টুকরাটি যখন পাহাড়ের পাদদেমে পড়ল, তখন চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মক্কার এমন কোন ঘর অবশিষ্ট রইল না, যেখানে ঐ পাথরের টুকরা পড়েনি।

আতিকা তার ভাই হযরত আব্বাস (রা)-এর কাছে এ স্বপ্নটি বর্ণনা করলেন এবং বললেন, ওহে ভাই! আল্লাহর কসম, আজ আমি এ স্বপ্ন দেখেছি। আর আমি আশঙ্কা করছি যে, আপনার সম্প্রদায়ের ওপর কোন বালা-মুসীবত সমাগত। এ স্বপ্নের কথা আর কাউকে বলবেন না। হযরত আব্বাস গৃহ থেকে বের হলেন এবং তার বন্ধু ওলীদ ইবন উতবাকে স্বপ্নটির কথা বললেন। আর বলে দিলেন, এ স্বপ্নের কথা যেন কাউকে বলা না হয়। কিন্তু ওলীদ তার পিতার কাছে এ স্বপ্নের কথা হুবহু বলে দেয়। এভাবে ঐ স্বপ্নের কথা সমগ্র মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন হযরত আব্বাস মাসজিদুল হারামে উপস্থিত হয়ে দেখলেন, আবূ জাহল একদল লোকের মধ্যে বসা। হযরত আব্বাসকে দেখামাত্র আবূ জাহল বলল, ওহে আবুল ফযল! তোমাদের পুরুষ তো নবূওয়াতের দাবিদার ছিল, এখন কি তোমাদের স্ত্রীলোকেরাও নবূওয়াতোর দাবি করা শুরু করল? (হযরত আব্বাস বলেন,) আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? আবূ জাহল আতিকার স্বপ্নের কথা উল্লেখ করল। এরই মধ্যে যমযম গিফারী আবূ সুফিয়ানের বার্তা নিয়ে এ অবস্থায় মক্কায় উপস্থিত হলো যে, তার পোশাক ছিন্নভিন্ন, উটের লাগাম কেটে দেয়া এবং সে চেঁচিয়ে বলছে, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! নিজেদের বাণিজ্য কাফেলার সংবাদ নাও, আবূ সুফিয়ানের কাফেলার সাহায্যার্থে তাড়াতাড়ি উপস্থিত হও।

---

১. যেহেতু এ সমস্ত লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করেছিল, এজন্যে স্বপ্ন জগতে ওদেরকে 'আলে গাদার' বলা হয়েছে। এটাও আশ্চর্য নয় যে, গাদার দ্বারা শয়তান অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আর যেহেতু মুশরিকরা শয়তানের অনুগত, তাই তাদেরকে আলে গাদার বলা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

সংবাদ শোনামাত্র কুরায়শগণ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং বদর প্রান্তে পৌঁছে স্বপ্নের জীবন্ত ব্যাখ্যা সচক্ষে দেখতে পায়।[১] হায়তামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি মুরসাল বর্ণনা করেছেন, তবে এর সনদে ইবন লাহিয়া নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। মাজমুয়াউয-যাওয়ায়েদ একে হাসান বলেছেন। মূসা ইবন উকবার বর্ণনায় আছে, যমযম গিফারী যখন মক্কায় উপস্থিত হলো, তখন আতিকার স্বপ্নদ্বারা কুরায়শদের মনে ভীতির সঞ্চার হলো।[২]

মন্তব্য : আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইবন সা'দ বলেন, আতিকা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং মদীনায় হিজরত করেছেন (ইসাবা, আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের জীবনী অধ্যায়)।[৩]

জুহায়ম ইবন সাল্‌ত-এর স্বপ্ন

মোটকথা এই যে, কুরায়শগণ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা বাজিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা দিল। তারা যখন জুহফায় উপস্থিত হলো, তখন জুহায়ম ইবন সাল্‌ত এ স্বপ্ন দেখল যে, এক ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে আছে এবং তার সাথে একটি উটও আছে। সে এসে দাঁড়ালো এবং বলতে লাগলো, উতবা ইবন রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ, আবুল হাকাম ইবন হিশাম অর্থাৎ আবূ জাহল, উমায়্যা ইবন খাল্‌ফ এবং অমুক অমুক নিহত হয়েছে। একটু পরে ঐ ব্যক্তি উটটিকে বর্শাদ্বারা আঘাত করে সেনাদলের মাঝে ছেড়ে দিল। আর সেনাদলে এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকল না, যার গায়ে ঐ উটের রক্তের ছিঁটা পড়েনি। আবূ জাহল যখন এ স্বপ্নের খবর অবগত হলো, তখন ভীষণ রুষ্ট হয়ে বলল, মুত্তালিবের বংশে দ্বিতীয় নবী জণ্ডগ্রহণ করেছে। কাল যখন মুকাবিলা হবে, তখন বুঝা যাবে আমাদের মধ্যে যুদ্ধে কে নিহত হয়।[৪]

হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা), যাঁদেরকে নবী (সা) আবূ সুফিয়ানের কাফেলার খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা বদরে পৌঁছে টিলার নিচে একটি ঝর্ণায় নিজেদের উট নিয়ে গেলে সেখানে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখা গেল। ওদের একজন অপরজনকে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিচ্ছিল। তখন ঋণ গ্রহীতা মহিলা বলল, কাল অথবা পরশু কুরায়শের কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছে। সে সময় মজুরী করে যা উপার্জন করব, তা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব।

মাজদী ইবন আমর জুহানীও এ সময় ঝর্ণার কাছে উপস্থিত ছিল এবং সমুদয় কথোপকথন শুনছিল। ঋণ গ্রহীতা মহিলা যখন ঋণদাত্রী মহিলার উদ্দেশ্যে বলতে শুনল যে, কাল অথবা পরশু কুরায়শের কাফেলা সিরিয়া থেকে আসছে, সে সময়

---

১. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩খ. পৃ. ১৯; মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৭১।

২. আল-হাদিয়াতুত তাহাতিয়া, ৩খ. পৃ. ২৫৮।

৩. আল-ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৩৫৭।

৪. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৫; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ২৫।

মজুরী করে যা উপার্জন করব, তা দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব, তখন ঋণদাত্রী মহিলা বলল, ঠিক আছে। এরপর দু'জনের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়ে সে চলে গেল। হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা) এ কথা শোনামাত্র উটে আরোহণ করলেন এবং নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন।

হযরত লাব্বাস ও হযরত আদী (রা) চলে যাওয়ার পর আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গতিবিধির সংবাদ নেয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হন এবং মাজদী ইবন আমরকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি কাউকে এখানে আসা যাওয়া করতে দেখেছ ?

মাজদী বলল, কাউকে দেখিনি, কেবল দু'জন আরোহীকে দেখেছি, যারা এ টিলার নিচে এসে উটকে বসায় ও পানি পান করায় এবং মশকে পানি ভরে নিয়ে চলে যায়। আবূ সুফিয়ান দ্রুত ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং কিছু উটের মল পড়ে থাকতে দেখেন। এক টুকরো মল নিয়ে ভেঙে এর মধ্যে একটা খেজুরের বীচি দেখতে পান।

আবূ সুফিয়ান এ বীচি দেখে বললেন, আল্লাহর কসম, এটা ইয়াসরিবের (মদীনার) খেজুর বীচি। তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কাফেলার পথ পরিবর্তন করে দেন। আর আরব উপসাগরের উপকূল পথ দিয়ে কাফেলাকে নিরাপদে নিয়ে যান এবং কুরায়শের নিকট এ সংবাদ প্রেরণ করেন যে, انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم واموالكم قد نجاها الله فارجعوا "তোমরা তো এ উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলে যে, নিজেদের কাফেলা, লোকজন ও ধন-সম্পদকে রক্ষা করবে। আল্লাহ্ সব কিছু রক্ষা করেছেন। কাজেই তোমরা সবাই মক্কায় ফিরে যাও।"

আবূ জাহল বলল, আমরা বদরে পৌঁছে যতক্ষণ না তিনদিন পর্যন্ত খানাপিনা, গান-বাজনা করে ফূর্তি করব, তার আগে কিছুতেই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করব না।

বনী যাহরার সর্দার আখনাস ইবন শুরায়ক বলল, ওহে বনী যাহরা! তোমরা তো কেবল নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্য বের হয়েছিলে। আর আল্লাহ্ তোমাদের মাল রক্ষা করেছেন। এখন আর আমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অপ্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে পড়ার আমাদের দরকার কি ? যেমন এ ব্যক্তি (আবূ জাহল) বলছে। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। বনী যাহরা গোত্র তাদের সর্দার আখনাস ইবন শুরায়কের পরামর্শে ফিরে গেল এবং বনী যাহরার কোন ব্যক্তিই বদরে অংশগ্রহণ করেনি। আর অপর কেউ কেউ এমনটিও বলেছিল যে, আমাদের কাফেলা যখন নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে, তা হলে এখন আর যুদ্ধের প্রয়োজন কি। কিন্তু আবূ জাহল কোন কিছুই শুনল না এবং বদর প্রান্তর অভিমুখে যাত্রা করল।[১]

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবীগণসহ বদরে পৌঁছে গেলেন। কিন্তু কুরায়শগণ তাঁদের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে পানির ঝর্ণা দখল করে নেয় এবং নিজেদের জন্য উপযুক্ত জায়গা বেছে নেয়। মুসলমানগণের অবস্থা ছিল এর বিপরীত। না পানি পেলেন আর না মনমত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। ময়দান ছিল

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৬।

বালুকাময়, যেখানে চলাফেরা করাই দুষ্কর। চলতে গেলেই বালুতে পা বসে যেত। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ফলে সকল বালু জমে গেল। আর মুসলমানগণ ছোট ছোট হাউয বানিয়ে বৃষ্টির পানি ধরে রাখলেন, যাতে তাদ্বারা উযূ-গোসলের কাজ সারতে পারেন। সূরা আনফালে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ অনুগ্রহের উল্লেখ করেছেন :

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ ·

"এবং (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের থেকে শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণ, তোমাদের অন্তর দৃঢ় ও পাসমূহ স্থির রাখার জন্য আসমান থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করেন।" (সূরা আনফাল : ১১)

এ পানি মুসলমানগণ যদিও নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য রেখেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর জন্য রহমত, দয়ার্দ্রচিত্ত মহানবী (সা) এ পানি স্বীয় রক্তপিপাসু শত্রুদের পান করারও অনুমতি দান করেন।

যখন রাত এল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদের অবস্থা জানার জন্য হযরত আলী, হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-সহ কতিপয় সাহাবীকে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে দু'টি গোলাম এসে পড়ে। তাঁরা তাদের বন্দী করে আনেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নামায পড়ছিলেন। ঐ গোলাম দু'টি বলল, আমরা কুরায়শদের পানির দয়িত্বে নিয়োজিত, পানি সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছি। তাঁরা এদের কথা খুব একটা বিশ্বাস করলেন না। কাজেই এদেরকে খানিকটা প্রহার করা হলো, যাতে ভয়ে তারা আবূ সুফিয়ানের সন্ধান দেয়। মার খেয়ে তারা বলল, আমরা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ কথা শুনে তাঁরা মার থেকে বিরত হলেন।

নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ গোলাম দু'টি যখন সত্য বলছিল, তখন তোমরা তাদের মারছিলে, আর যখন মিথ্যে বলল, তখন ছেড়ে দিলে! আল্লাহর কসম, এরা কুরায়শের লোক (অর্থাৎ আবূ সুফিয়ানের সঙ্গী-সাথী নয়)। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কুরায়শরা কোথায় ? গোলাম দু'টি বলল, আল্লাহর কসম, ওরা ঐ মুকানকাস টিলার পেছনে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওদের লোকসংখ্যা কত ? গোলাম দু'টি বলল, ওদের সংখ্যা আমরা জানি না। তিনি বললেন, প্রতিদিন খাওয়ার জন্য ক'টি উট যবেহ করে ? জবাব দিল, একদিন নয়টি, আরেক দিন দশটি। তিনি বললেন, তা হলে ওদের সংখ্যা নয়শত থেকে হাজারের মাঝামাঝি হবে।

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, কুরায়শ সর্দারদের মধ্যে কে কে আছে ? ওরা বলল, রবীআর দুই পুত্র উতবা এবং শায়বা, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম, হাকিম ইবন হিযাম, নাওফেল ইবন খুয়ায়লিদ, হারিস ইবন আমির, তাইমা ইবন আদী, নযর

ইবন হারিস, যামআ ইবন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইবন হিশাম, উমায়্যা ইবন খালফ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া, সুহায়ল ইবন আমর এবং আমর ইবন আবদুদ। এ কথা শুনে তিনি সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, মক্কা নিজের কলিজার টুকরোগুলোকে আজ তোমাদের প্রতি ছুঁড়ে দিয়েছে। মোটকথা, এভাবে তিনি কুরায়শদের অবস্থা জেনে নিলেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর অবস্থানের জন্য টিলার ওপরে একটি ছাউনী প্রস্তুত করালেন।

ان سعد معاذ رضى اللّه عنه قال يا نبى اللّه الانبى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائيك ثم نلقى عدونا فان اعزنا اللّه واظهرنا كان ذالك ما احبينا وان كانت الاخرى جلست على ركانبك فلحقت بمن ورائنا من قومنا فقد نخلف عنك اقوام يا نبى اللّه ما نحن باشد لك حبا منهم ولو ظنوا انك تلقى حرباما تخلفوا عنك يمنعك اللّه بهم يناصحون ويجاهدون معك فاعنى عليه رسول ﷺ اللّه خيرا ودعاله بخير ثم بنى لرسول ﷺ اللّه عريش فكان فيه .

"হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার জন্য টিলার ওপরে একটি ছাউনী প্রস্তুত করব না ?—যাতে আপনি অবস্থান করবেন এবং সওয়ারীসমূহ আপনার কাছাকাছি প্রস্তুত রাখবেন ? আর আমরা গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করব। এরপর যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে সম্মান দান করেন এবং শত্রুর ওপর বিজয়ী করেন, তা হলে সেটাই হচ্ছে আমাদের সুপ্রিয় প্রত্যাশা। আর আল্লাহ্ না করুন, ফলাফল যদি এর বিপরীত হয়, তা হলে আপনি দ্রুত সওয়ারীতে আরোহণ করে আমাদের অবশিষ্ট লোকজনের সাথে গিয়ে মিলিত হবেন। সম্প্রদায়ের যে সমস্ত লোক পেছনে রয়ে গেছে, হে আল্লাহর নবী! তারা যদি কোন প্রকারে এটা বুঝতে পারত যে, আপনাকে আমরা তাদের চেয়ে বেশি মহব্বত করি না,[১] আপনাকে যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে, তা হলে তারা অবশ্যই পেছনে থাকত না। সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মাধ্যমে আপনার হিফাযত করবেন এবং তারা খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সা'দ ইবন মু'আযের প্রশংসা করলেন এবং তাঁর জন্য কল্যাণের দু'আ করলেন। এরপর তাঁর জন্য একটি ছাউনী নির্মাণ করা হলো যাতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করলেন।"

১. এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের নিষ্ঠা যে, সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভালবাসা এবং নিষ্ঠার দরুন কেবল মুখেই নয়, বরং অন্তর দিয়ে ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ। অপরের ভালবাসাকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এটা চরমতম ভালবাসারই প্রমাণ।

এ ছাপড়া ঘর এমন উঁচু এক টিলার ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল, যেখান থেকে সম্পূর্ণ ময়দান নজরে আসত।

হযরত আনাস[১] (রা) হযরত উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যেদিন সকালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা, তার পূর্বরাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে গেলেন, যাতে মক্কাবাসীদের নিহত হওয়ার স্থানসমূহ আমরা সচক্ষে দেখতে পারি। সুতরাং তিনি আমাদেরকে পবিত্র হাত দিয়ে ইশারা করছিলেন এবং বলছিলেন, هذا مصرع فلان غدا انشاء الله "এটা ইনশা আল্লাহ আগামীকাল অমুকের নিহত হওয়ার স্থান।" এভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট স্থানে হাত রেখে প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে সাহাবীগণকে দেখাচ্ছিলেন। আল্লাহর কসম, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এদের কোন একজনও সেই নির্ধারিত স্থানের বাইরে নিহত হয়নি, তিনি যে স্থান স্বহস্তে দেখিয়েছিলেন (মুসলিম, باب ذكر النبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়)।[২]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর গুহার সঙ্গী, নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু, মুহাজির শ্রেষ্ঠ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ঐ ছাপড়া ঘরে[৩] প্রবেশ করলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। আর পরম সত্যনিষ্ঠ আনসারী সাহাবী হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি হাতে ছাপড়া ঘরটির দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন।[৪]

হযরত আলী (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের পূর্বরাত্রে আমাদের কেউই এমন ছিল না– যে ঘুমায়নি। একমাত্র রাসূলুল্লাহ (সা)-ই সারারাতব্যাপী দু'আ এবং কান্নাকাটিতে অতিবাহিত করেন। এমনকি এভাবে প্রভাত হয়ে যায় (তাবারানী, ইবন জারীর, ইবন খুযায়মা প্রমুখ বর্ণিত)।

প্রভাত হওয়ামাত্রই তিনি ঘোষণা করলেন, "ওহে আল্লাহর বান্দাগণ! নামাযের সময় সমাগত।" ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সবাই একত্রিত হয়ে গেলেন। নবী (সা) একটি বৃক্ষের গোড়ায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ালেন এবং নামায শেষে আল্লাহর রাস্তায় বীরত্ব প্রদর্শন এবং আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে উদ্দীপনামূলক ভাষণদান করলেন (ইবন আবূ শায়বা, আহমদ, ইবন জারীর হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং একে সহীহ বলেছেন; মুনতাখাবু কানযুল উম্মাল, ৪খ. পৃ. ৯৮)।

---

১. বিশুদ্ধ সনদে মুসনাদে আহমদ হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, কোন ব্যক্তি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি বদর থেকে কোথায় উধাও হয়ে থাকতে পারতাম? হযরত আনাস (রা) নবী (সা)-এর খিদমত করার জন্য তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন কিন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ার দরুন তাঁকে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এ সময় তাঁর বয়স ছিল দশ অথবা এগার বছর। এর ফলে বদরে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে তাঁকে গণনা করা হয়নি। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৩৪

২ যারকানী, ১খ. পৃ. ৩১০ ও ৪৩৪।

৩. এ ছাপড়া ছিল খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। তাবাকাতে ইবন সা'দ

৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৯।

এরপর তিনি সাহাবীগণকে সারিবদ্ধ করলেন। অপরদিকে কাফিরদের সারি প্রস্তুত ছিল। পবিত্র রমযান মাসের সতের তারিখ জুমুআর দিন একদিকে সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহী দল, অপরদিকে হচ্ছে বাতিলের ধ্বজাধারী বাহিনী, এ দু'টি দল পৃথকীকরণের ময়দানের[১] দিকে অগ্রসর হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পূর্ণ যুদ্ধ প্রস্তুতিসহ কাফিরদের বিশাল বাহিনীকে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হতে দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে এ বলে প্রার্থনা করছিলেন যে,

اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسول لك اللهم فنصرك الذى وعدتنى اللهم احنهم الغداة ‧

"হে আল্লাহ্! এটা কুরায়শের দল, যারা অহংকার ও দাম্ভিকতা সহকারে মুকাবিলা করতে এসেছে। এরা আপনার বিরোধিতা করে, আপনার রাসূলকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করুন, আপনি যার ওয়াদা করেছেন। হে আল্লাহ্! ওদেরকে ধ্বংস করে দিন।" (সীরাতে ইবন হিশাম, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী اذ تستغيثون ربكم ... ... شديد العقاب অধ্যায়)

এরপর তিনি মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত ও সারিবদ্ধ করেন। এ সময় তাঁর হাতে একটি তীর ছিল। সারি থেকে হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা) সামান্য সামনে ছিলেন। তিনি শেখানোর উদ্দেশ্যে সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যার পেটে তীর দ্বারা হালকাভাবে খোঁচা দিয়ে বললেন, استو باسواد "ওহে সাওয়াদ, সারি বরাবর সোজা হয়ে দাঁড়াও।"

সাওয়াদ (রা) আরয করলেন, يا رسول الله ارجعتنى وقد بعثك الله بالحق والعدل فاقدنى "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে আঘাত করেছেন, আর অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সত্য ও ন্যায়সহ প্রেরণ করেছেন। কাজেই আমাকে এর বদলা গ্রহণের সুযোগ দিন।"

নবী (সা) স্বীয় পেট থেকে কাপড় উঠিয়ে বললেন, বদলা নাও।

সাওয়াদ (রা) পবিত্র পেটে গলা লাগান ও চুমো দেন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত এটাই শেষ মুলাকাত। রাসূলুল্লাহ (সা) এতে আনন্দিত হন এবং হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা)-এর জন্য কল্যাণের দু'আ করেন। [ইসাবা, হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা আনসারী (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়]

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা বদরের দিনকে 'ইয়াওমুল ফুরকান' (পৃথকীকরণের দিন) বলেছেন। অর্থাৎ দিনটি ছিল হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। এর অনুকরণে অধম (লেখক) এ ময়দানকে ময়দানে ফুরকান বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা এ ময়দানেই সত্যের আলো এবং অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামী বাহিনীকে বিন্যস্ত এবং তাঁদের কাতারকে ফেরেশতাদের কাতারের মত সুশৃংখল করে ছাপড়া ঘরে গিয়ে প্রবেশ করেন। কেবল আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর সহগামী হন এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি হাতে ছাপড়ার দরজায় দণ্ডায়মান হন।

হযরত আবূ মিহজান সাকাফী বলেন :

وسميت صديقا وكل مهاجر * سواك يسمى باسمه غير منكر

سبقت الى الاسلام والله شاهد * وكنت جليسا بالعريش المشهر

وبالغار اذ سمعيت بالغار صاحب * وكنت رفيقا للنبى المطهر

"আপনার নাম সিদ্দীক রাখা হয়েছে এবং সমস্ত মুহাজিরকে এ নাম ছাড়া অন্যান্য নামে ডাকা হয়। আপনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী এ মর্মে আল্লাহ্ সাক্ষী, আর আপনিই ছাপড়ায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন। অনুরূপভাবে আপনি হেরা গুহায়ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন। এজন্যে আপনাকে 'গুহার বন্ধু' বলা হয়।" [ইবন আবদুল বার প্রণীত আল-ইসতিয়াব, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবন চরিত]

কুরায়শগণ যখন নিশ্চিন্ত হলো, তখন যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে উমায়র ইবন ওহাব জুমাহীকে মুসলিম বাহিনী সম্পর্কে ধারণালাভের জন্য প্রেরণ করল। উমায়র ইবন ওহাব ঘোড়ায় চড়ে মুসলিম বাহিনীর আশেপাশে চক্কর দিয়ে ফিরে এসে বলল, কমবেশি তিনশ' লোক হবে; তবে আমাকে আর একটু সময় দাও, আবার দেখে আসি, মুসলমানদের সাহায্যে আর কোথাও কোন বাহিনী লুকিয়ে আছে কি না। সুতরাং উমায়র পুনরায় ঘোড়ায় সওয়ার হল এবং দূরদরাজ পর্যন্ত চক্কর দিয়ে এসে বলল, কোন ওঁতপাতা গুপ্ত বাহিনী অথবা সাহায্য করার মত কেউ নেই। কিন্তু ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! মদীনার উট নিজেদের নিহত হওয়াকে আবশ্যিক করে নিয়েছে, ওদের নিজেদের তরবারি ছাড়া আর কোন আশ্রয় কিংবা সাহায্যকারীও নেই। আল্লাহর কসম, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ আঘাতকারীকে হত্যা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনো মরতে চাইবে না। আমাদের লোকজনও যদি ওদের মতই মারা যায়, তা হলে জীবনের সাধ-আহলাদ কোথায় রইল ? ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও।

হাকিম ইবন হিযাম বলল, একদম সত্যি কথা। আর সে উঠে উতবার কাছে গেল এবং বলল, ওহে আবুল ওয়ালীদ! আপনি কুরায়শদের সর্দার এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আপনি কি এটা পসন্দ করেন না যে, সব সময় আপনার নাম উত্তম ও কল্যাণকর কাজের সাথে উল্লেখ করা হোক ? উতবা বলল, কি ব্যাপার ? হাকিম বলল, লোকজনকে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন এবং আমর ইবন হাযরামীর রক্তপণ নিজ যিম্মায় নিয়ে নিন। উতবা বলল, আমি আমর ইবন হাযরামীর রক্তপণ বা দিয়াত নিজ

যিম্মাদারীতে নিলাম কিন্তু তোমরা আবূ জাহলের সাথেও পরামর্শ কর। এরপর সে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ দিল :

যুদ্ধের ময়দানে উতবার ভাষণ

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ও তার সাথীদের সাথে যুদ্ধ করে তোমাদের কোন লাভ হবে না। এরা সবাই তোমাদের নিকটাত্মীয়। ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, তোমরা নিজেদের পিতা, ভ্রাতা, চাচাত ভাই ও মামাত ভাইদের দেখতে থাকবে। কাজেই মুহাম্মদ এবং আরবদের ছেড়ে দাও। যদি আরববাসী মুহাম্মদকে খতম করে দেয়, তা হলে তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। আর আল্লাহ্ যদি তাদের বিজয় দান করেন, তা হলে তা-ও তোমাদের জন্য সুনাম ও মর্যাদার কারণ হবে। কেননা তিনি তো তোমাদেরই সম্প্রদায়ের (তাঁর বিজয় তোমাদেরই বিজয়)। দেখ, আমার উপদেশকে গুরুত্ব দাও এবং আমাকে মূর্খ ও নির্বোধ সাব্যস্ত করো না।"

হাকিম ইবন হিযাম বলেন, আমি আবূ জাহলের কাছে এলাম। আর ঐ সময় সে বর্ম পরিধান করে অস্ত্র সজ্জিত হচ্ছিল। আমি বললাম, উতবা আমাকে এ প্রস্তাব দিয়ে প্রেরণ করেছেন।

এ কথা শোনামাত্র আবূ জাহল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল এবং বলল, উতবা এজন্যেও যুদ্ধ পরিহার করতে চাচ্ছে যে, তার পুত্র আবূ হুযায়ফা মুসলমানদের সাথে আছে, তার গায়ে যেন আঁচড় না লাগে। আল্লাহর কসম, আমরা কক্ষণই ফিরে যাব না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিচ্ছেন। আর আমর ইবন হাযরামীর ভাই আমির ইবন হাযরামীকে ডেকে বলল, তোমাদের মিত্র উতবা লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে, আর তোমার ভাইয়ের রক্ত তো তোমার চোখের সামনেই। আমির এ কথা শোনামাত্রই হায় আমর, হায় আমর বলে চিৎকার করতে শুরু করল। ফলে পুরো বাহিনীতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হল এবং সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল।[১]

দ্রষ্টব্য : আমর ইবন হাযরামীর রক্তের বদলার কথা আবূ জাহল কেবল লোকদেরকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্যই বলত। প্রকৃত উদ্দেশ্য, যার জন্য কুরায়শ মক্কা থেকে বের হয়েছিল, তা ছিল বাণিজ্য কাফেলার হিফাযত করা। যখন কাফেলা রক্ষা পেল, তখন লোকজন যুদ্ধের প্রতি উৎসাহী ছিল না এবং পদে পদে প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচনায় আসছিল। কাজেই কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা যে, কুরায়শ শুধু আলা ইবন হাযরামীর রক্তের বদলা নেয়ার জন্যই মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল, এটা নিতান্তই ভুল ধারণা, সমস্ত বর্ণনা এর বিপরীত।

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬; সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৬।

যুদ্ধের সূচনা

আবূ জাহলের তিরস্কারমূলক কথাবার্তার প্রভাব এই দাঁড়াল যে, উতবাও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। মুশরিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম উতবা ইবন রবীআই তার ভাই শায়বা ইবন রবীআ এবং পুত্র ওলীদকে নিয়ে ময়দানে আসে এবং উচ্চস্বরে যুদ্ধের জন্য প্রতিপক্ষকে আহ্বান করে।

ইসলামী বাহিনী থেকে তিন ব্যক্তি, হারিসের পুত্র আওফ ও মাউয[১] এবং আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) মুকাবিলা করতে বের হন।

উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে ? তাঁরা বললেন, رهط من الانصار অর্থাৎ "আমরা আনসার গোত্রের।" উতবা বলল, مالنا بكم من حاجة "তোমাদের সাথে আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, আমরা তো আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করতে চাই।"

সঙ্গীরা ধ্বনি দিয়ে উঠল, يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا "ওহে মুহাম্মদ! আমাদের সাথে লড়াই করার জন্য আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিপক্ষকে প্রেরণ কর।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারদের নির্দেশ দিলেন যে, নিজেদের সারিতে প্রত্যাবর্তন কর এবং হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উসমান ইবন হারিস (রা)-কে ওদের এক-একজনের সাথে মুকাবিলা করার জন্য আদেশ করলেন।

আদেশ অনুযায়ী এ তিনজন মুকাবিলার জন্য বের হলেন। মুখের ওপর যেহেতু পর্দা ছিল, সুতরাং উতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে ? উবায়দা বললেন, আমি উবায়দা, হামযা বললেন, আমি হামযা এবং আলী বললেন, আমি আলী। উতবা বলল, نعم اكفاء كرام "হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সমকক্ষ এবং সম্মানিত ব্যক্তি।"

ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

قوموا يا بنى هاشم بحقكم الذى بعث الله به بنبيكم اذجاؤا بباطلهم ليطفؤا نور الله ·

১. আওফ এবং মাউযের পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম আফরা। আফরাও সাহাবী ছিলেন। হাফিয আসকালানী বলেন, আফরা (রা)-এর মধ্যে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যা আর কোন মহিলা সাহাবীর মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলো, আফরা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হারিসের সাথে হয়েছিল। হারিসের ঘরে তাঁর তিন পুত্র ছিলেন, আওফ, মাউয এবং মু'আয (রা)। এরপর বুকায়র ইবন ইয়ালীলের সাথে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়। সেখানে তাঁর চার পুত্র ইয়াস, আকিল, খালিদ এবং আমির (রা) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর সাত পুত্রের, তিনজন প্রথম স্বামীর এবং চারজন দ্বিতীয় স্বামীর পক্ষের, সবাই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এমন কোনই মহিলা সাহাবী ছিলেন না, যাঁর সাত পুত্রই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন কেবল হযরত আফরা (রা) ছাড়া। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬।

"ওহে বনী হাশিম! ঐ সত্যের জন্য দণ্ডায়মান হও যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে প্রেরণ করেছেন। এরা অসত্য দ্বারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে এসেছে।"

উতবা, শায়বা এবং ওলীদ হত্যার বর্ণনা

অতঃপর যুদ্ধ শুরু হলো। উবায়দা[১] (রা) উতবার বিরুদ্ধে, হামযা (রা) শায়বার বিরুদ্ধে এবং আলী (রা) ওলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন।

হযরত আলী ও হযরত হামযা তো প্রথম আক্রমণেই নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ফেললেন কিন্তু উবায়দা (রা) নিজেও আহত হলেন এবং প্রতিপক্ষকেও আহত করলেন। শেষ পর্যন্ত উতবা হযরত উবায়দাকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করল যে, হযরত উবায়দা (রা)-এর পা কেটে গেল। হযরত আলী এবং হযরত হামযা (রা) নিজ নিজ প্রতিপক্ষকে খতম করে হযরত উবায়দার সাহায্যার্থে উপস্থিত হলেন এবং উতবাকে হত্যা করলেন। তারা উবায়দা (রা)-কে উঠিয়ে নবী (সা)-এর সামনে নিয়ে এলেন। হযরত উবায়দার পায়ের গোছার হাড় থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি শহীদ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উবায়দা (রা) বললেন, আজ যদি আবূ তালিব জীবিত থাকতেন, তা হলে বুঝতেন যে, এ কবিতার আমরাই অধিক হকদার :

ونسلم حتى تصرع حوله * ونذهل عن ابنائنا والحلائل

"আমরা মুহাম্মদ (সা)-কে তখনই শত্রুর হওলা করে দিতে পারি যখন আমাদের সবাইকে তাঁর পূর্বেই হত্যা করা হবে। আর যখন আমরা নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে বেখবর হয়ে পড়ি।"[২]

---

১. এটা মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনা যে, উবায়দা উতবার বিরুদ্ধে এবং হামযা শায়বার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। কিন্তু মূসা ইবন উকবার বর্ণনা এর বিপরীত যে, উবায়দার সঙ্গে শায়বার এবং হামযার সঙ্গে উতবার মুকাবিলা হয়েছিল। সমস্ত সীরাত গ্রন্থের বর্ণনায় এ ব্যাপারে ঐকমত্য পাওয়া যায় যে, হযরত আলী ওলীদের মুকাবিলা করেছেন। কিন্তু আবূ দাউদের এক সহীহ সনদযুক্ত বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত আলী শায়বার প্রতিপক্ষ ছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফাতহুল বারী (৭খ. পৃ. ২২৬) গ্রন্থের 'নবী (সা)-এর দু'আ এবং কাতলে আবূ জাহল' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৭।

২. এক বর্ণনায় আছে, যখন সাহাবায়ে কিরাম হযরত উবায়দার এ অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁকে নবী (সা) সমীপে উপস্থিত করলেন। উবায়দা (রা) আপন গণ্ডদেশ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পায়ে রেখে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ তালিব যদি জীবিত থাকতেন এবং আমাদেরকে দেখতেন, তা হলে জানতে পারতেন যে, তাঁর চেয়ে আমরাই এ কবিতার অধিক হকদার। এরপর তিনি ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اشهد انك شهيد। "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই তুমি শহীদ।" আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৭৪, ইমাম শাফিঈ (র) কর্তৃক বর্ণিত।

এরপর তিনি এ কবিতা পাঠ করেন :

فان يقطعوا رجلى فانى مسلم * ارجى عيشا من الله عاليا

"যদিও কাফিরগণ আমার পা কেটে নিয়েছে, কিন্তু এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ আমি মুসলিম, এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ' তা'আলার কাছে উচ্চতর জীবনের আশা রাখি।" অর্থাৎ পা কেটে যাওয়ায় এ নশ্বর দুনিয়া কেটে গেছে, কিন্তু এর বিনিময়ে এমন অবিনশ্বর জীবন পাওয়া যাবে যা কখনো কর্তিত হবে না।

واليسنى الرحمن من فشل منه * لباسا من الاسلام غطى المساويا

"আর কেনই বা আশা করব না, পরম দয়ালু আল্লাহই তো শুধু তাঁর অনুগ্রহে আমাকে ইসলামের পোশাক পরিয়েছেন, যা সমস্ত কদর্যকে ঢেকে দিয়েছে।"

মনে হয়, যে শরীরে ইসলাম এবং আল্লাহ্-ভীতির পোশাক নেই, তা উলঙ্গ ও বিবস্ত্র। দৃশ্যমান জগদ্বাসী যদিও এ উলঙ্গপনাকে অনুভব করতে না পারে, অদৃশ্য জগতের অধিবাসিগণ এ উলঙ্গপনাকে অবশ্যই অনুভব করতে সক্ষম হবেন। হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, হযরত লবীদ (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন এ কবিতা বললেন :

الحمد لله اذلم ياتنى اجلى * حتى اكتسيْتُ من الاسلام سربالا

এ কবিতাও এরই সমার্থক, যদি দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকা না থাকত, তা হলে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আরো কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সামান্য মনোযোগেই অনুভব করতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : উতবা এবং শায়বা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ থেকে এজন্যে বেঁচে থাকতে চাচ্ছিল যে, প্রথমত তারা আতিকা এবং পরে জুহায়ম ইবন সালতের স্বপ্নের কারণে উদ্বিগ্ন ছিল। এছাড়াও যখন তারা মক্কা থেকে রওয়ানা হচ্ছিল, তখন এ সমস্যার হয়েছিল যে, হযরত আদ্দাস (রা) (যিনি উতবা ও শায়বার গোলাম ছিলেন এবং তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে খৃস্টধর্ম থেকে তওবা করে মুসলমান হয়েছিলেন), যখন উতবা ও শায়বা বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল, তাদের পা ধরে বলেছিলেন : بابى وامى انتما والله انه الرسول الله وما تساقان الا الى مصار عكما "আমার পিতামাতা আপনাদের প্রতি উৎসর্গ হোক, আল্লাহর কসম, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল। আর আপনারা কেবল নিজেদের নিহত হওয়ার স্থানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন।"

এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন। আস ইবন শায়বা হযরত আদ্দাস (রা)-কে কাঁদতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আদ্দাস (রা) বললেন, আমি আমার মুনিবদের কারণে কাঁদছি যে, তারা উভয়ে আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। আস প্রশ্ন করল, সত্যিই কি তিনি আল্লাহর রাসূল ? আদ্দাস কেঁপে উঠলেন এবং বললেন : اى والله انه لرسول الله الى الناس كافة "হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল যিনি সমগ্র মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।"

আদ্দাস (রা)-এর এ বক্তব্য উতবা ও শায়বার মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, এরা সবাই এখানে নিহত হবে। এজন্যে উতবা এবং শায়বা যুদ্ধ থেকে বেঁচে থাকতে চাচ্ছিল। শুধু আবূ জাহলের ভর্ৎসনার কারণে উতবা ও শায়বা সর্বাগ্রে অগ্রসর হয়েছিল। আবূ জাহল বার বার উতবা ও শায়বাকে কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ দিচ্ছিল, ফলে এরা দু'জন সর্বপ্রথম যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হয়, যাতে কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ দূরীভূত হয়। হযরত আবূ উসায়দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য নিজেদের তীর বাঁচিয়ে রাখবে। যখন কাফির তোমাদের ওপর চড়াও হবে এবং নিকটে পৌঁছে যাবে, তখন তীর নিক্ষেপ করবে। (বুখারী শরীফ, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)

মহানবী (সা) কর্তৃক বিজয়লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা

উতবা ও শায়বা নিহত হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ (সা) ছাপড়া ঘর থেকে বের হলেন এবং সারিগুলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত করলেন এবং এরপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে সাথে নিয়ে ছাপড়ায় ফিরে গেলেন। আর হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি নিয়ে ছাপড়ার দরজায় দণ্ডায়মান হলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিজ সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যাল্পতা ও যুদ্ধ-উপকরণ ঘাটতি এবং শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্য দেখলেন, তখন নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং দু'রাকাআত নামায আদায় করে তিনি প্রার্থনায় নিমগ্ন হলেন। তখন তিনি এ দু'আ করছিলেন : اللهم انى انشرك عـهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد "হে আল্লাহ্! আমি আপনার প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদা পূর্ণ করার আবেদন করছি। আয় আল্লাহ্ আপনি কি চান যে, আপনার উপাসনা না করা হোক ?"

নবী করীম (সা)-এর মধ্যে বিনয়নম্রতা ও শিষ্টাচারের এক বিশেষ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। কখনো সিজদায় পড়ে আকুল কণ্ঠে ফরিয়াদ করছিলেন, কখনো বা দু'হাত তুলে সাহায্যপ্রার্থী ও ভিক্ষুকের ন্যায় বিজয় ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তখন তিনি এতই আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর কাঁধ থেকে চাদর বার বার পড়ে যাচ্ছিল।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলাম এবং পরে নবী (সা)-এর নিকট এলাম। দেখলাম, তিনি সিজদারত অবস্থায় 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম' বলছেন। এ অবস্থা দেখে আমি ফিরে এলাম এবং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। কিছুক্ষণ পর আবার তাঁর কাছে এসে একই অবস্থা দেখতে পেলাম। তিনবার তাঁকে একই অবস্থায় পেলাম। চতুর্থবার আল্লাহ্ তাঁকে বিজয় দান করেন। (নাসাঈ ও হাকিম বর্ণিত, ফাতহুল বারী, اذ تستغيثون ربكم ... ... شديد العقاب অধ্যায়)

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, যখন বদরের দিন এলো এবং রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন, মক্কার মুশরিকের সংখ্যা এক হাজার এবং তাঁর সাহাবীর

সংখ্যা তিনশ' থেকে কিছু বেশি, তখন তিনি ছাপড়ায় ফিরে এলেন এবং কিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে প্রার্থনা করতে শুরু করলেন :

اللّهم انجزلی ما وعدتنی اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لاتعبد فی الارض -

"আয় আল্লাহ্! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা পূর্ণ করুন। আয় আল্লাহ্! যদি মুসলমানদের এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে পৃথিবীতে আর আপনার উপাসনা হবে না।"

যেহেতু তাঁর মাধ্যমে নবুওয়াত ধারার পরিসমাপ্তি এবং এ উম্মত সর্বশেষ উম্মত, আল্লাহ্ না করুন, যদি তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ ধ্বংস হয়ে যান, তা হলে এ পৃথিবীতে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য অবশিষ্ট কেউ থাকবে না। অধিকন্তু এ দু'আ থেকে এটাও জানা যায় যে, বিজয় ও সাফল্য অর্জনের জন্য এ দু'আ কেবল মুসলমানদের প্রাণ রক্ষার জন্যই ছিল না, বরং তা ছিল এজন্যে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলার উপাসনার ধারা অব্যাহত থাকুক। এমটি যেন না হয় যে, পৃথিবী আল্লাহর উপাসনা থেকে শূন্য হয়ে যায়।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত হাত তুলে তিনি এ প্রার্থনা করতে থাকেন যে, আয় আল্লাহ! যদি এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত হবে না। এ অবস্থায় চাদর তাঁর ঘাড় থেকে পড়ে যায়।

হযরত আবূ বকর (রা) চাদরটি তাঁর ঘাড়ে উঠিয়ে দেন এবং পেছন থেকে এসে তাঁর কোমর ঝাঁপটে ধরেন। এটা সহীহ মুসলিমের বর্ণনা। বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, আবূ বকর (রা) তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং আরয করলেন, "ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, আপনি আল্লাহর দরবারে খুবই অনুনয় বিনয় করেছেন (দু'আ কবূল হয়েছে)।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি মহান আল্লাহর বিশাল ক্ষমতা, শক্তি, মর্যাদা, ধনাঢ্যতা ও অমুখাপেক্ষিতার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : اِنَّ اللّٰه لغنىٌّ عن العَالَمِيْنَ। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টি জগতের অমুখাপেক্ষী।" আল্লাহ্ আরো বলেছেন : وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ "আর আল্লাহ্ই ধনাঢ্য ও প্রশংসিত, তিনি ইচ্ছে করলে তোমাদের ধ্বংস করতে পারেন।" এর ফলে রাসূল (সা)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর এ ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতাপূর্ণ বিনয়-নম্রতা দেখে হযরত আবূ বকর (রা)-এর এ বিশ্বাস হয়েছিল যে, তাঁর দু'আ কবূল হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ٠

"বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে আর বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব (খিলাফত) প্রদান করেন।" (সূরা নামল : ৬২)

---

১. দু'আর ফলে রণাঙ্গণের অবস্থা অনুকূলে দেখে হযরত আবূ বকর (রা) এ কথা বলেন।

মোটকথা এই যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ছিলেন আশার পর্যায়ে আর রসূল (সা) ছিলেন ভীতির স্তরে।

একটি সন্দেহ ও তার সমাধান : সন্দেহ এই যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলারর পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদাই ছিল, সেক্ষেত্রে মহানবী (সা) কেন এত উদ্বিগ্ন ছিলেন ?

উত্তর : এটা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যকে সাহায্য করা ও সত্যের বিজয়ের ব্যাপারে সামষ্টিক এক ওয়াদা ছিল। বিশেষ কোন স্থান-কাল কিংবা কোন ঘটনা বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার মহান মর্যাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি ছিল। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যা ইচ্ছা তিনি তাই করতে সক্ষম। আল্লাহর দরবারের আদব এটাই যে, তাঁর স্বীকৃত ওয়াদার ক্ষেত্রেও বান্দা তাঁকে ভয় করবে এবং এটা মনে করবে যে, কোন অবস্থায়ই কোন বিষয় তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়; বান্দার কাজ হলো তাঁর কাছে চাওয়া, তিনি যা কিছু দেবেন তা তাঁর অনুগ্রহ ও পুরস্কার স্বরূপ। আর যদি সাহায্যের ওয়াদা কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা হলে তাতেও এ সম্ভাবনা থাকে যে, এ ওয়াদা বাস্তবায়ন এমন একটি গুপ্ত বিষয় ও শর্তের সাথে সম্পর্কিত, যা আল্লাহ্ তা'আলা কোন কৌশল ও বিচক্ষণতার দরুন স্বীয় নবীদেরকেও অবহিত করেননি। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ الاَّ بِمَا شَاءَ "আর আল্লাহ্ তা'আলার ওপর এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, কোন ঘটনা কিংবা ওয়াদা কার্যকর করার কারণ ও শর্ত সম্পর্কে নবী (আ)-গণকে অবহিত করবেন।" কোন কোন সময় পরিপূর্ণ কৌশল ও চাহিদা এরূপ হয়ে থাকে যে, প্রকৃত তাৎপর্য গোপন থাকে, যাতে বান্দার দৃষ্টিতে আল্লাহর ভীতি এবং মর্যাদার গুপ্ত রহস্য প্রকাশিত না হয়ে যায়।

নবী (আ)-গণের এরূপ কাকুতি মিনতি সহকারে দু'আ করা এজন্যে নয় যে, আল্লাহর ওয়াদার প্রতি তাঁরা সংশয় পোষণ করেন, বরং এতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার সার্বভৌমত্বের ভীতি তাঁদের ওপর প্রবল হয় (মাদারিজুন নুবূওয়াত থেকে গৃহীত)।

আর সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) আরয করলেন : كفاك مناشدتك ربك فانه سينجزلك ماو عدك "ব্যাস, আল্লাহর নিকট আপনার এ প্রার্থনা যথেষ্ট হয়েছে, অবশ্যই তিনি তাঁর ওয়াদা পূরা করবেন।"

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ الاَّ بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ الاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

"স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকে জবাব দিয়েছিলেন, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব এক

সহস্র ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে। আল্লাহ্ এটা করেন কেবল শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এবং এ উদ্দেশ্যে, যাতে তোমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে। আর সাহায্য তো কেবল আল্লাহর নিকট থেকেই আসে; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আনফাল : ৯-১০)

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে, এ সময় তিনি ছাপড়া থেকে বের হন এবং তাঁর কণ্ঠে এ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল : سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ "এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।" (সূরা কামার : ৪৫)

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, দু'আ করতে করতে তাঁর চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। একটু পরেই জেগে ওঠেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দক (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন :

ابشر يا ابا بكر اتاك نصر اللّهُ هذا جبرئيل اخذ يعنان فرسه يقوده على شناياه الغبار -

"ওহে আবূবকর! তোমার জন্য সুসংবাদ, তোমার নিকট আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরাঈল আমীন ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, যার দাঁতে ধুলিবালি লেগে আছে।[১]

ইসলামপন্থীদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতরণ

আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য প্রথমে এক হাজার, পরে তিন হাজার এবং এরপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা অবতরণ করান।

দ্রষ্টব্য : এ যুদ্ধে যেহেতু কাফির ও মুশরিকদের সাহায্য করার জন্য অভিশপ্ত শয়তান তার বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়, সেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য হযরত জিবরাঈল, হযরত মিকাঈল এবং হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নেতৃত্বে আসমান থেকে তাঁর ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেন। আর যেহেতু শয়তান স্বয়ং সুরাকা ইবন মালিকের আকৃতিতে এবং তার বাহিনী বনী মুদলিজের পুরুষের বেশ ধারণ করে আগমন করেছিল [যেমনটি দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নু'আইমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে][২] সেজন্য ফেরেশতাগণও পুরুষের বেশে অবতরণ করেন (যেমনটি আল্লামা সুহায়লী এবং ইমাম কুরতুবী বর্ণনা করেছেন)।[৩]

আর যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাহায্য ও সহায়তার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ করেন, তাঁরা যদিও আকৃতিতে মানুষ ছিলেন কিন্তু প্রকৃতিতে তাঁরা ফেরেশতাই ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা নিম্নোক্ত শ্লোকের প্রতিচ্ছবি ছিলেন :

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪২; উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩৫৫।

২ খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৪।

৩. রাউযুল উনূফ, ১খ. পৃ. ৪২৪।

نقش آدم ليك معنى جبرئيل * رسته از جمله هواو قال وقيل

"আকৃতিতে আদম কিন্তু প্রকৃতিতে জিবরাঈল, যাবতীয় কামনা-বাসনা এবং অনর্থক বাক্যালাপ থেকে তিনি মুক্ত।"

হযরত আবূ উসায়দ সাঈদী (রা) (যিনি বদরে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন) বলেন, বদরের দিন ফেরেশতাগণ হলুদ রঙের পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করেন, আর এর প্রান্তদেশ মাথার পেছনে দু'কাঁধের মধ্যভাবে ঝুলানো ছিল [ইবন জারীর হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন; আর ইবন আবূ হাতিম হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন; হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা)-ও বদরের দিন হলুদ বর্ণের পাগড়ি পরিধান করেছিলেন]। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, ফেরেশতাগণের পাগড়ির রং ছিল কালো আর কারো কারো বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, এ রং ছিল সাদা।

হাফিয সুয়ূতী বলেন, বিশদ্ধ বর্ণনামতে এটাই অনুমিত হয় যে, পাগড়ির রং হলুদই ছিল, কালো এবং সাদা রং সম্বন্ধে যত বর্ণনাই থাকুক, এর সবই দুর্বল (যঈফ)।[১]

দ্রষ্টব্য : আশ্চর্য নয় যে, মুসলমানদের আনন্দ ও খুশির জন্য ফেরেশতাগণের পাগড়ির রং হলুদ রাখা হয়েছিল। এজন্যে যে, হলুদ রং দেখলে আনন্দবোধ হয়। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ "উহা হলুদ বর্ণের গাভী, এর রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদের আনন্দ দেয়।" (সূরা বাকারা : ৬৯)

মূল কথা হলো, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সাহায্য করার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করেন। প্রথমত তো ফেরেশতাদের শুধু অবতরণই কল্যাণ ও বরকতময় ছিল। যেমন হুনায়নের যুদ্ধে কেবল ফেরেশতাদের অবতরণই জয়লাভের কারণে পরিণত হয়েছিল। যেনটি এর বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ সামনে আসছে।

দ্বিতীয় পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, তিনি ফেরেশতাদের নিকট এ নির্দেশ দেন, তারা যেন আত্মিকভাবে মুসলমানদের অন্তরে শক্তিদান করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰئِكَةِ اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۔

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা মু'মিনগণকে অবিচলিত রাখ।" (সূরা আনফাল : ১২)

আল্লাহ্ তা'আলা যেমন শয়তানকে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়ার শক্তি দিয়েছেন, অনুরূপভাবে সম্মানিত ফেরেশতাগণকে মানুষের অন্তরে ভাল কথা ঢেলে দেয়ার ক্ষমতা দান করেছেন। যাকে লুম্মা ও ইলহাম বলে। সুতরাং ফেরেশতাগণ মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর অবাধ্যদের বিরুদ্ধে এ মর্মে বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা দেন যে, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মুকাবিলায়

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪২৪।

দৃঢ়পদে অবিচল থাক। উত্তম প্রভু ও উত্তম সাহায্যকারী তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর তাঁর ফেরেশতাদের বাহিনী তোমাদের পৃষ্ঠপোষকরূপে উপস্থিত আছে। কাজেই কিসের চিন্তা, কিসের ভাবনা ? জয়-পরাজয় তো অংশগ্রহণকারীর অন্তরের শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভরশীল। এভাবে তাঁরা মুসলমানদের মনোবল বৃদ্ধি ও তাঁদের অন্তরকে অবিচল করে তোলেন।

তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তিনি মুসলমানদের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন।

চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত জিহাদকারী সাহাবাকে ফেরেশতাগণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, ফেরেশতাগণ ছিলেন তাঁদের অধীন। যেমন ممدكم শব্দটি সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়।

পঞ্চম পুরস্কার, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি কাফিরদের অন্তরে মুসলমান-ভীতির উদ্রেক করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرُّعْبَ "আমি শীঘ্রই কাফিরদের অন্তরে ভীতি ঢেলে দেব।"

ফেরেশতাগণকে জিহাদ ও লড়াইয়ের নিয়ম শিক্ষাদান

ফেরেশতাগণের যেহেতু মানুষের যুদ্ধ করার নিয়ম জানা ছিল না, এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধের নিয়মাবলী শিক্ষা দেন : فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ "সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের ঘাড়ে এবং আঘাত কর তাদের আঙ্গুলের অগ্রভাগে। (সূরা আনফাল : ১২)

রবী ইবন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের দিন ফেরেশতাদের হাতে নিহত ও মানুষের হাতে নিহতদের পৃথকভাবে চেনা যাচ্ছিল। ফেরেশতা কর্তৃক নিহতদের ঘাড়ে এবং আঙ্গুলের অগ্রভাগ আগুনে পোড়া কালো চিহ্নযুক্ত ছিল। (ফাতহুল বারী شهود الملائكة بدر অধ্যায়)

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একজন মুসলিম পুরুষ জনৈক মুশরিককে তাড়া করছিল। তখন উপর থেকে চাবুকের শব্দ ও অশ্বারোহীর আওয়াজ শোনা গেল : ওহে হায়যুম![1] সামনে অগ্রসর হও। অতঃপর তিনি ঐ মুশরিকের প্রতি লক্ষ্য করে দেখেন যে, সে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। চাবুকের আঘাতে তার নাক-মুখ ফেটে নীল হয়ে গেছে।

এ সমুদয় ঘটনা এক আনসারী সাহাবী এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শোনান। তিনি এ কথা শুনে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, এটা ছিল তৃতীয় আসমানের সাহায্য।[2]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : هذا جبرئيل اخذ برأس فرسه عليه اداة الحرب

১. হায়যুম হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার নাম। –যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১৬।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৪৪২।

"ইনি হলেন জিবরাঈল, যিনি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছেন।" (বুখারী শরীফ شهود الملائكة بدر অধ্যায়)

হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন আমরা দেখেছি, আমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যখন কোন মুশরিকের দিকে ইশারা করত, তখন তরবারির নাগালে আসার পূর্বেই তার মাথা ধড় থেকে পৃথক হয়ে যমীনে পড়ত। হাদীসটি হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ছাত্র বায়হাকী, এমনকি আবূ নুয়ায়মও এ হাদীসটি সহীহ বলেছেন।[১]

সাহল ইবন সা'দ বলেন, আমাকে আবূ উসায়দ বলেছেন, ওহে ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি তুমি ও আমি বদরে থাকতাম, তা হলে তোমাকে ঐ ঘাঁটি দেখাতাম, যেখান থেকে ফেরেশতাগণ আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, তবে তাঁর সনদে সালামা ইবন রাওহ নামে একজন (হাদীসের বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে) সন্দিগ্ধ বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইবন হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত এবং অন্যরা যঈফ বলেছেন।

মোট কথা, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যার্থে আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতীর্ণ হওয়া এবং মুসলমানদের সাথে মিলে তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূল (সা)-এর হাদীসসমূহ দ্বারা সরাসরি প্রমাণিত, যা সন্দেহ কিংবা অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই।

ফেরেশতাগণের ঘোড়ায় সওয়ার হওয়াও অগণিত বর্ণনাদ্বারা প্রমাণিত। কতিপয় বর্ণনামতে তাঁরা সাদা-কালোয় মিশ্রিত রংয়ের ঘোড়ায় আরোহী ছিলেন।[২]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কেবল বদর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন স্থানে ফেরেশতাগণ সরাসরি অংশগ্রহণ করেননি। হ্যাঁ, মুসলমানদের কেবল উৎসাহ ও প্রেরণা দান, সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ, চিত্তের প্রশান্তি ও স্বস্তিদানের জন্য ফেরেশতাগণ অন্যান্য স্থানেও অবতরণ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হুনায়নের যুদ্ধে ফেরেশতাগণের অবতরণের কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا "আর তিনি এমন বাহিনী অবতরণ করেছেন যাদের তোমরা দেখতে পাওনি।" (সূরা তাওবা : ১)

অবশ্য বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে উহুদ যুদ্ধেও হযরত জিবরাঈল ও হযরত মিকাঈল (আ)-এর অংশগ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা সামগ্রিকভাবে সকল মুসলমানের জন্য ছিল না, বরং বরকতময় সত্তা (তাঁর প্রতি সর্বোত্তম শান্তি ও প্রশংসা)-এর সাহায্য ও নিরাপত্তার জন্য ছিল।[৩]

দ্রষ্টব্য : যেহেতু এটা পৃথিবী এবং এখানে কার্যকারণ ছাড়া কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না; কাজেই আল্লাহ্ তা'আলাও পার্থিব নিয়মই অনুসরণ করেছেন, ফেরেশতাগণকে

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৭।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৭।

৩. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২৫।

সৈন্যের আকৃতিতে মুসলমানদের সাহায্যার্থে নাযিল করেছেন। অন্যথায় মাত্র একজন ফেরেশতাই সবার জন্য যথেষ্ট ছিলেন। প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী তো আল্লাহ্ই। কিন্তু এ পৃথিবীতে কার্য-কারণের মাধ্যমে তাঁর ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে থাকে। এ জন্যে পার্থিব নিয়মানুসারে ফেরেশতাগণকে সেনাবাহিনীর আকারে মুসলমানদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেছেন।[১]

বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) টিলার উপরস্থ ছাপড়া থেকে বাইরে বের হলেন এবং যুদ্ধে উৎসাহ দান করে বললেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আজ যে ব্যক্তি অটল অবিচল থেকে নিঃস্বার্থভাবে এবং বিশুদ্ধ নিয়্যতে আল্লাহর দুশমনদের সাথে সামনাসামনি মুকাবিলা করবে এবং আল্লাহর পথে নিহত হবে, অবশ্যই তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

হযরত উমায়র ইবন হুমাম (রা)-এর হাতে ঐ সময় কিছু খেজুর ছিল, যা তিনি খাচ্ছিলেন। যখন এ কথাগুলো একাধিক্রমে তাঁর কানে পৌঁছল, তখন তা শোনামাত্র তিনি বলে উঠলেন :

بخ بخ افما بينى وبين ان ادخل الجنة الا ان يقتلنى هؤلاء -

“বাহ বাহ! আমার আর জান্নাতের মধ্যে আর কতটুকুই বা দূরত্ব রয়েছে, শুধু ওরা আমাকে হত্যা করবে এতটুকুই।”

এরপর তিনি হাত থেকে খেজুরগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি নিয়ে ছুটে গিয়ে রণাঙ্গণে জিহাদ শুরু করলেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন।[২] আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।

হযরত আউফ[৩] ইবন হারিস (রা) আরয করলেন : يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده “ইয়া রাসূলাল্লাহ! বান্দার কোন কাজটি আল্লাহ্কে হাসায় ?”[৪] নবী (সা)

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৩।

২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৬।

৩. তাঁর পিতার নাম হারিস এবং মাতার নাম আফরা। অর্থাৎ মু'আয এবং মু'আউয়ায (রা)-এর ভ্রাতা।

৪. অর্থাৎ যে কাজের জন্য বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করে, যে পর্যায়ের সন্তুষ্টির সাথে সুসংবাদ, আনন্দ ও ভালবাসার প্রকাশই উদ্দেশ্য হয়, এক্ষেত্রে 'রিযা' (সন্তুষ্টি) শব্দের পরিবর্তে 'দিহাক' (হাস্য) শব্দ ব্যবহৃত হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের আনন্দ, সর্বোচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশের ওপর নির্ভরশীল, এজন্যে যে, প্রভু কোন কোন সময় স্বীয় দাসের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে থাকে, কিন্তু তা প্রকাশ করে না। 'দিহাক' শব্দটি সন্তুষ্টি ও এর প্রকাশ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত তালহা ইবন বারা (রা) প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : اللهم الق طلحة يضحك اليك وتضحك اليه “হে আল্লাহ্! তালহার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করুন, যেন সে আপনাকে দেখে হাসে এবং আপনিও তাকে দেখে হাসেন।” অর্থাৎ এমনভাবে সাক্ষাত হবে, যাতে অগণিত সন্তুষ্টি এবং অসংখ্য ভালবাসার প্রকাশ ঘটবে। আল্লাহর হাসির অর্থ ভাল করে বুঝে নিন। রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৬৯।

ইরশাদ করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বর্মমুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দুশমনের রক্তে যখন বান্দা তার হাত রঞ্জিত করে, এ কাজটি আল্লাহ্কে হাসায়।

আউফ (রা) এ কথা শোনামাত্র বর্ম খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তরবারি হাতে যুদ্ধ শুরু করলেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।

আবূ জাহলের প্রার্থনা এবং লোকজনকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দান

উতবা, শায়বা এবং ওলীদ নিহত হওয়ার পর আবূ জাহল লোকজনের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধির জন্য বলল :

ওহে লোক সকল! উতবা, শায়বা এবং ওলীদ নিহত হওয়ায় হতোদ্যম হয়ো না, ওরা তাড়াহুড়া করে ফেলেছিল। লাত ও উযযার কসম, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনই ফিরে যাব না, যতক্ষণ না ঐ তিন হত্যাকারীকে বেঁধে নিতে সক্ষম হব।

এরপর আবূ জাহল আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করল : আয় আল্লাহ্! আমাদের মধ্যে যে রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী এবং অজ্ঞাত বিষয়ের প্রবক্তা, তাকে ধ্বংস করুন। আর আমাদের মধ্যে যে আপনার কাছে বেশি প্রিয় ও পসন্দনীয়, তাকে আজ সাহায্য করুন ও বিজয় প্রদান করুন।

তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা মীমাংসা চেয়েছিলে, তা তো তোমাদের কাছে এসেছে, তোমরা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তোমরা যদি পুনরায় যুদ্ধ কর, তবে আমিও তোমাদেরকে আবার শাস্তি দেব এবং সংখ্যায় তোমরা অধিক হলেও তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আনফাল : ১৯)

ইবন ইসহাক এবং হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করে একে সহীহ বলেছেন। বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবন সালাবা ইবন সাঈর সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৬; যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৬৯)। ইবন কাসীর বলেন, ইমাম আহমদ ও নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিমও এটি বর্ণনা করে বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ, যদিও তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৪৮২)।

'দালাইলে বায়হাকী' এবং 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ জাহলের দু'আ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করার জন্য হাত উঠালেন এবং আরয করলেন : "আয় পরওয়ারদিগার! (আল্লাহ্ না করুন)

যদি এ দল ধ্বংস হয়ে যায়, তা হলে এরপর এ পৃথিবীতে আপনার উপাসনা আর কখনই হবে না।"

একদিকে আবূ জাহল দু'আ করছিল, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আয় মশগুল ছিলেন। এরপর উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) এ সময় ছাপড়া থেকে বের হন এবং সাহাবায়ে কিরামকে জিহাদ ও লড়াইয়ে উৎসাহ দান করে বলেন : আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি নিহত হবে, তাকে আল্লাহ্ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[১]

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে একমুষ্ঠি[২] মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখপানে ছুঁড়ে মারলেন এবং সাহাবাদেরকে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিলেন। মুশরিকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার চোখ, নাক ও মুখমণ্ডলে এ মাটি লাগেনি।

আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন, এই একমুষ্ঠি মাটির মধ্যে কি বৈশিষ্ট্য ছিল, যদ্দারা তা ছুঁড়ে মারামাত্রই শত্রুরা পলায়ন করতে শুরু করল! এ প্রসঙ্গেই সামনের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"আর তুমি তা নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করছিলে, বরং আল্লাহ্ই তা নিক্ষেপ করেছেন।" (সূরা আনফাল : ১৭)

অর্থাৎ দৃশ্যত যদিও তুমি একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপ করেছ, কিন্তু এক হাজার যোদ্ধার প্রত্যেক ব্যক্তির চোখে ও নাকে ঐ মাটি পৌঁছে দেয়া তোমার কাজ ছিল না, বরং এটা ছিল আল্লাহর কাজ এবং তাঁরই কুদরতের কারিশমা।

যুদ্ধ যখন প্রচণ্ড আকার ধারণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) একমুষ্ঠি কঙ্কর নিয়ে 'শাহাতিল উজূহ' পাঠ করে কুরায়শদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং সাহাবীগণকে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। এক মুহূর্তও বিলম্ব ঘটেনি, নিক্ষিপ্ত কঙ্করে সত্যি সত্যি আল্লাহর দুশমনদের চেহারায় অপদস্থতার ছোঁয়া লাগল। তারা চোখ ডলতে শুরু করল। এদিকে মুসলমানগণ বীর বিক্রমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ একমুষ্ঠি মাটিতে আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদান করলেন। দুশমনরা প্রত্যেকেই অবনত মস্তক ও দিশেহারা হয়ে পড়ল যে, এখন তারা কোথায় এবং কোনদিকে যাবে। কঙ্করযুক্ত একমুষ্ঠি মাটি কেবল নিক্ষেপের

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪২৭; তারীখে ইবনুল আসীর, ২খ. পৃ. ৪৭।

২ একমুষ্ঠি মাটি নিক্ষেপের ঘটনা হযরত হাকিম ইবন হিযাম এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে মু'জামে তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাফিয হায়সামী বলেন, হযরত হাকিম ইবন হিযাম (রা)-এর বর্ণনার সনদ হাসান পর্যায়ের। আর হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারীর বর্ণনাকারীগণের মতই (মাজমু'আউয যাওয়াইদ, ৬খ. পৃ. ৮৪)।

অপেক্ষা ছিল, তার সাথে সাথে গোটা কাফির বাহিনী বিচলিত হয়ে পড়ল এবং দুঃসাহসী বড় যোদ্ধারা নিহত ও বন্দী হতে শুরু করল। মুসলমানগণ আল্লাহর দুশমনদের হত্যা ও বন্দী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ছাপড়ায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তরবারি সজ্জিত হয়ে রাসূল (সা)-এর হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত হলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) দেখলেন সাহাবীগণ কুরায়শদের গ্রেফতারে ব্যস্ত রয়েছেন, এদিকে হযরত সা'দ ইবন মু'আযের চেহারা বিমর্ষ ও মলিন মনে হচ্ছিল। তাঁর চেহারায় অনভিপ্রেত কিছুর আভাস দেখা যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে সা'দ! সম্ভবত কুরায়শদের গ্রেফতার তোমার কাছে অনভিপ্রেত মনে হচ্ছে ? সা'দ (রা) আরয করলেন :

اجل والله يا رسول الله كانت اول وقعة اوقعها الله تعالى باهل الشرك فكان الا ثخان فى القتل احب الى من استبقاء الرجال -

"হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা প্রথম বিপর্যয়, যা আল্লাহ্ মুশরিকদের প্রতি নাযিল করেছেন। আমার কাছে আল্লাহর সাথে শরীককারীদের জীবিত ছেড়ে দেয়া অপেক্ষা হত্যা করাই বেশি প্রিয়।" (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮)

যাদের অন্তর আল্লাহর একত্ববাদের প্রেরণায় পরিপূর্ণ, তাদের অন্তরে আল্লাহর সাথে শিরককারীদের জন্য কী সহানুভূতি থাকতে পারে ?

অধিকন্তু যারা আল্লাহর চরিত্রে নিজেকে চরিত্রায়িত করেছেন, তাদের দাবিও এটা, যেন শিরককে ক্ষমা করা না হয়।

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَغْفِرُوْاَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وِيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধে যাকে ইচ্ছা, তিনি ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে মহাপাপ করে।" (সূরা নিসা : ৪৮)

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইতোপূর্বে বলে রেখেছিলেন, বনী হাশিম ও অন্যান্য গোত্রের কিছু লোক ইচ্ছা ও আগ্রহে নয়, বরং কুরায়শদের জবরদস্তিতে বাধ্য হয়েই যুদ্ধে এসেছে, তাদের যেন হত্যা করা না হয়। তাদের সাথে আমাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজন নেই। কাজেই তোমাদের মধ্যে কেউ আবুল বুখতারী ইবন হিশাম এবং আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবকে পেলে তাদের যেন হত্যা না করে। সাহাবীগণ এজন্যে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করার চেষ্টা করতে থাকেন।

কাজেই হযরত মুজযির ইবন যিয়াদ আনসারী (রা) যখন আবুল বুখতারীকে দেখলেন, তখন বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে হত্যা করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

আবুল বুখতারীর[১] এক বন্ধু ছিল, যে মক্কা থেকেই তার সাথে এসেছিল, তার নাম ছিল জুনাদা ইবন মুলায়হা। আবুল বুখতারী বলল, আমার বন্ধুকেও ? মুজযির বললেন, অবশ্যই না; তোমার বন্ধুকে আমরা এ নিষেধের আওতায় আনতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল তোমার ব্যাপারেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আবুল বুখতারী বলল, আল্লাহর কসম, আমার সাথীকে পরিত্যাগ করা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হবে না। কাল মক্কার স্ত্রীলোকেরা আমাকে অভিসম্পাত দেবে যে, সে কেবল নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই আপন বন্ধুকে পরিত্যাগ করেছে। এই বলে সে নিচের কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে আক্রমণ করতে অগ্রসর হলো :

لَنْ يُسْلِمُ ابْنُ حَرَّةٍ زَمِيْلَهُ * حَتّٰى يَمُوْتَ اَوْ يَرٰى سَبِيْلَهُ .

"একজন সম্ভ্রান্ত সন্তান কখনো বিপদে তার বন্ধুকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে সঙ্কুচিত হয় না; এজন্যে সে হয় মৃত্যুবরণ করে অথবা ভিন্ন পথ দেখে।"

আবুল বুখতারী কেবল আক্রমণ করতে উদ্যত হচ্ছিল, ইতোমধ্যে হযরত মুজযির (রা)-এর তরবারি তার জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন :

والذى بعثك بالحق لقد جهدت ان يتاسر فآتيك به فابى الا ان يقاتلنى فاتلته فقتلته –

"সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, যাতে আবুল বুখতারীকে গ্রেফতার করে আপনার খিদমতে উপস্থিত করতে পারি। কিন্তু সে তা মেনে নেয়নি; বরং লড়াই ও আক্রমণ করার চেষ্টা করে। ফলে আমি তার সাথে লড়াই করে তাকে হত্যা করেছি।"

উমায়্যা ইবন খালফ ও তার পুত্রকে হত্যা

উমায়্যা ইবন খালফ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরম শত্রুদের একজন। যে সময় বদর যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা কিংবা ধারণাও ছিল না, তখনই সে মক্কায় হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর মুখে তার নিহত হওয়ার আগাম বার্তা শুনেছিল। এ জন্যে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ছিল। আবূ জাহল (আরবী) "নিজেদের কাফেলার খবর

১. আবুল বুখতারী মুসলমান না হলেও মক্কায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী ছিল। আবুল বুখতারীর পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূলের প্রতি কখনো কোন অনভিপ্রেত কাজ করা হয়নি এবং সে নির্যাতনমূলক সম্পর্কচ্ছেদের চুক্তি বাতিলে ভূমিকা রেখেছিল। (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৫; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ২৮৫)

লও" এ কথা বলে মানুষকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছিল। উমায়্যা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। আবূ জাহল বলেছিল, ওহে আবূ সাফওয়ান! আপনি এ উপত্যকার সর্দার, আপনার পাশ কাটানো দেখে অন্যরাও পাশ কাটিয়ে যাবে। আবূ জাহল বার বার তাগিদ দিচ্ছিল। উমায়্যা যখন বাধ্য হয়ে পড়ল, তখন বলল, আল্লাহর কসম, আমি একটি উত্তম জাতের দ্রুতগামী উট ক্রয় করব। যখন সুযোগ পাব, রাস্তা থেকেই প্রত্যাবর্তন করব। অতঃপর নিজ স্ত্রী উম্মে সাফওয়ানকে গিয়ে বলল, আমার জন্য সফরের মাল-সামান প্রস্তুত করে দাও। উম্মে সাফওয়ান বলল, তোমার ইয়াসরিবী ভাইয়ের কথা, 'তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গীদের হাতে নিহত হবে' কি তোমার মনে নেই? উমায়্যা বলল, কেন নয়, খুবই মনে আছে। আমার যওিয়ার ইচ্ছা নেই, কিছু দূর তাদের সাথে যাব, তারপর সুযোগ বুঝে ফিরে আসব। এভাবেই উমায়্যা সমস্ত মনযিল অতিক্রম করে বদরে এসে উপস্থিত হয়। (বুখারী من يقتل ببدر অধ্যায়)[১]

যখন সে বদরে আসে, তখন হযরত বিলাল (রা)-এর নজরে পড়ে। তাঁকে সে উত্তপ্ত পাথরের উপর শুইয়ে শাস্তি দিত। কাজেই বিলাল (রা) উমায়্যাকে দেখেই আনসারদের লেলিয়ে দেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) জাহিলী যুগ থেকেই উমায়্যার বন্ধু ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, উমায়্যা নিহত না হোক, বরং গ্রেফতার হয়ে বন্দী হোক (সম্ভবত আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ উসীলায় হিদায়াত নসীব করবেন এবং পরকালের স্থায়ী আযাব থেকে মুক্তি দেবেন)।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর হাতে কিছু সোনা-দানা ছিল, যা তিনি কাফিরদের থেকে নিয়েছিলেন। তিনি সেসব মাটিতে ফেলে দেন এবং উমায়্যা ও তার পুত্রের হাত ধরেন। তা দেখে হযরত বিলাল (রা) উচ্চস্বরে আওয়াজ দিলেন, কাফিরদের সর্দার উমায়্যাকে ধর, যদি ও বেঁচে যায় তা হলে আমি বাঁচব না। এ আওয়াজ শোনামাত্র আনসার সাহাবীগণ সেদিকে ধাবিত হন। হযরত আবদুর রহমান উমায়্যার পুত্রকে আগে বাড়িয়ে দেন। আনসারগণ তাকে হত্যা করেন এবং উমায়্যার দিকে অগ্রসর হন। আবদুর রহমান (রা) উমায়্যার ওপর শুয়ে পড়েন কিন্তু আনসারগণ এ অবস্থায়ই তাঁর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে তরবারি চালিয়ে তাকে হত্যা করেন। ফলে আবদুর রহমান (রা)-এর পা যখম হয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন এর চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।[২]

আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলতেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিলালের প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার সোনা-দানাও গেছে আর আমার বন্দীও হাতছাড়া হয়ে গেছে। (সহীহ্ বুখারী, উকালা অধ্যায়)

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩২১।

২ এ বর্ণনা সহীহ বুখারীর। দু'পায়ের ফাঁকের বাক্যাবলী মুতওয়াযী ইবন আয়িযের মূল বাক্যের অনুবাদ, যদ্বারা বুখারীর হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ২৩৯)।

আল্লাহর দুশমন, মুসলিম উম্মাহর ফিরআওন আবূ জাহল নিহত

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি সেনা সারিতে দাঁড়ানো, হঠাৎ আমি দেখলাম আমার ডানে ও বামে দুই আনসার যুবক দাঁড়িয়ে। আমার সন্দেহ হলো (যে, দু'টি বালকের মাঝে আমাকে দাঁড়ানো দেখে লোকজন পাছে আমাকে বিদ্রূপ না করে)।

আমি এ চিন্তায় ছিলাম, এমন সময় ওদের একজন আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, চাচা, আবূ জাহল কোনটি, আমাকে দেখান তো। আমি বললাম, বৎস, আবূ জাহলকে তুমি কি করবে ? যুবকটি বলল, আমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, যদি আমি আবূ জাহলকে দেখতে পাই, তাকে হত্যা করব অথবা আমি নিজে শহীদ হব। কারণ আমি জেনেছি, আবূ জাহল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গালি-গালাজ করে। মহান পবিত্র ঐ আল্লাহর কসম, যাঁর কুদরতি হাতে আমার জীবন, আমি যদি তাকে দেখতে পাই, আমার ছায়া তার ছায়া থেকে পৃথক হবে না, যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত, তার মৃত্যু ঘটে।

তার এ কথাবার্তা শুনে আমি দু'জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মাঝে না থেকে দু'টি বালকের মাঝখানে থাকায় যে সংকোচবোধ করছিলাম, তা দূর হয়ে গেল। ইঙ্গিতে আমি আবূ জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। শোনামাত্র তারা শিকারী বাজপাখির ন্যায় আবূ জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে খতম করে দিল। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, من لم يخمس الاسلاب অধ্যায় এবং বুখারী শরীফ, ২খ. বদর যুদ্ধ অধ্যায়)। এ দু' যুবক ছিল হযরত ছিল হযরত আফরা (রা)-এর দু'পুত্র মু'আয এবং মু'আউয়ায (রা)।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর ইবন হাযম, হযরত মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবূ জাহলের খোঁজে ছিলাম, যখন সুযোগ পেলাম, এমন জোরে আঘাত করলাম যে, আবূ জাহলের পা কেটে গেল।

আবূ জাহলের পুত্র ইকরামা, (যিনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন) তার পিতাকে রক্ষায় মু'আযের বাহুতে এত জোরে তরবারির আঘাত হানলো যে, সঙ্গে

১. সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত, যা বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, হযরত আফরা (রা)-এর দু'পুত্র মু'আয ও মু'আউয়ায আবূ জাহলের হত্যাকারী ছিলেন। কিন্তু কিতাবুল জিহাদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তারা ছিলেন মু'আয ইবন আফরা এবং মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহ। হাফিয আসকালানী বলেছেন, আফরার দু'পুত্রের সাথে মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহও হত্যায় শরীক ছিলেন, বরং মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহই এ হত্যায় বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মু'আয ইবন আমর আল-জুমূহকেই পুরস্কার দেয়ান। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩০; বদর যুদ্ধ অধ্যায় এবং ফাতহুল বারী, ৬খ. من لم يخمس الاسلاب অধ্যায় এবং যারকানী,১খ. পৃ. ৪৩০)।

সঙ্গে তাঁর হাত দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। শুধু চামড়াটুকু বাকী থাকায় তা ঝুলে থাকে। কিন্তু আল্লাহরই মরযী, মু'আয (রা) এ অবস্থা নিয়েও সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই করতে থাকেন। হাত লটকে থাকায় অধিক কষ্ট হওয়ায় হাতটি পায়ের নিচে চেপে ধরে তিনি এমন জোরে টান দিলেন যে, চামড়া ছিঁড়ে তা পৃথক হয়ে গেল। এক হাত নিয়েই মু'আয (রা) হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে মু'আউয়ায ইবন আফরা (রা) আবূ জাহলকে হত্যার পর যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন।

বিজয় লাভের পর আবূ জাহলের লাশের অনুসন্ধান

আবূ জাহল গুরুতর আহত হলেও জীবনের কিছুটা তখনো অবশিষ্ট ছিল। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেউ গিয়ে আবূ জাহলের সংবাদ নিয়ে আসতে পার কি? হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) গিয়ে লাশের মধ্যে সন্ধান করলেন এবং আবূ জাহলের লাশ দেখতে পেলেন। তখনো তার জীবনের কিছুটা অবশিষ্ট রয়েছে।

এটা বুখারীর বর্ণনা। ইবন ইসহাক এবং হাকিমের বর্ণনায় আছে যে, ইবন মাসঊদ (রা) আবূ জাহলের ঘাড়ে পা রেখে বললেন : اخزاك الله يا عدو الله "ওহে আল্লাহর দুশমন! আল্লাহ্ তোকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছেন।" এরপর তার শিরোশ্ছেদ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে পেশ করে বললেন : هَذَا رَأْسُ عَدُوِّ اللهِ اَبِىْ جَهْلٍ "এটা আল্লাহর দুশমন আবূ জাহলের মাথা।"[১] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : اَللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ "ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, এটা আবূ জাহলেরই মাথা।" আমি বললাম : نَعَمْ, اللهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ غَيْرُ "হ্যাঁ, ঐ আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই, এটা আবূ জাহলেরই মাথা।" হযরত (সা) আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং নিজ পবিত্র মুখে তিনবার বললেন : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَهْلَهُ "প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারীদেরকে সম্মান দান করেছেন।"[২]

কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি সিজদায়ে শুকরিয়া আদায় করেছেন (উমদাতুল কারী, আবূ জাহল হত্যা অধ্যায়)। আর ইবন মাজাহর বর্ণনায় আছে, (এর শোকরে) তিনি দু'রাকা'আত নামাযও আদায় করেছেন [ইবন মাজাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন]।[৩]

---

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আবূ জাহলকে হত্যা করা হয়, তার মাথা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে নীত হয়। ইবন মাজাহ উত্তম সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ১।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩০।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৮৯।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে, আমি আবূ জাহলের বুকের ওপর চড়ে বসলাম। আবূ জাহল চোখ খুলে বলল, ওহে বকরীর রাখাল, নিশ্চয়ই তুমি অনেক উঁচু স্থানে চড়ে বসেছ। আমি বললাম : اَلْحَمْدُ لله الَّذِىْ مَكَّنَنِى مِنْ ذلكَ "প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে এ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।" আবূ জাহল বলল, কার ভাগ্যে বিজয় সূচিত হয়েছে ? আমি বললাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের। অতঃপর সে বলল, তোমার ইচ্ছা কি ? আমি বললাম, তোমার শিরোশ্ছেদ করা। সে বলল, আচ্ছা, তবে আমার তরবারি দিয়ে কাট, এটা খুবই তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট, এতে শীঘ্রই তোমার উদ্দেশ্য হাসিল হবে। আমার মাথাটি তুমি পেছনের দিক থেকে কাটবে, যাতে দেখতে ভীতিপ্রদ হয়। এরপর যখন মুহাম্মদ-এর নিকট ফিরে যাবে, তখন আমার পক্ষ থেকে তাকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেবে যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে আজ তার প্রতি আমার হিংসা ও শত্রুতা অনেক বেশি।

ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, এরপর আমি তার মাথা কর্তন করলাম এবং তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আল্লাহর দুশমন আবূ জাহলের মাথা এবং তার কথাও আমি তাঁর নিকট পৌঁছে দিলাম। তিনি তাকবীর ধ্বনি দিয়ে বললেন, এ ছিল আমার ও আমার উম্মতের জন্য ফেরাউন। এর অপকর্ম ও ফিতনা হযরত মূসা (আ)-এর ফেরাউনের অপকর্ম ও ফিতনা থেকে বেশিই ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর ফেরাউন তো মৃত্যুকালে ঈমানের কালেমা পাঠ করেছিল, কিন্তু এ উম্মতের ফিরআওন মৃত্যুকালেও কুফরী ও অহংকারের বাক্য উচ্চারণ করেছে। রাসূল (সা) আবূ জাহলের তরবারিটি হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-কে প্রদান করলেন। যেমনটি ইমাম সারাখসী প্রণীত 'শারহুস সিয়ারিল কাবীর'-এ উল্লেখ আছে।[১]

অর্থাৎ যেমনভাবে হযরত নবী করীম (সা) মর্যাদায় ও সকল গুণের পূর্ণতায় সমস্ত নবী-রাসূল (আ) থেকে উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন, অনুরূপভাবে তাঁর উম্মতের ফিরআওনও সমস্ত উম্মতের ফিরআওন অপেক্ষা কুফর ও বৈরীতায় অগ্রগামী ছিল। মৃত্যুকালেও যার জ্ঞানচক্ষু খোলেনি এবং মৃত্যু যন্ত্রণায়ও যার কুফরী ও অহংকারে কাঁপন ধরেনি, বরং কুফর ও অহংকার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এমন অবস্থা থেকে রক্ষা করুন)।

দ্রষ্টব্য : হযরত ইবন আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাতে রাসূলুল্লাহ (সা) জিন্নদের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন বললেন :

ليقم معى من لم يكن فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقام ابن مسعود فحمله رسول الله ﷺ مع نفسه –

---

১. সম্ভবত এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবিঈগণের যুগে কোন পরিচিতি অথবা সম্পর্ক ছাড়াই যখন 'আবদুল্লাহ' বলা হতো, তা হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা)-কেই মনে করা হতো। কেননা তাঁর মধ্যে বান্দাত্বের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।

"আমার সাথে যাওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তি উঠুক, যার অন্তরে বিন্দুমাত্র অহংকার নেই। তাঁর এ কথা বলার পর হযরত ইবন মাসউদ (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান।" (হাফিয আইনী প্রণীত আল-বিদায়ার শরাহ গ্রন্থ আল-বিনায়াহ)।

আশ্চর্য নয় যে, আবূ জাহলকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সৌভাগ্য হযরত ইবন মাসঊদ (রা)-এর এজন্যে অর্জিত হয় যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, যাঁর অন্তর অহংকার-অহমিকা এবং গর্ব থেকে পাক-পবিত্র ছিল। আর আবূ জাহলের গোটা দেহসত্তা ছিল অহংকার ও ঔদ্ধত্যে পরিপূর্ণ। তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও বিনয়-নম্রতা ছিল না।

এ কারণে আবূ জাহলের হত্যাকর্ম এমন পবিত্র ও ভাগ্যবান ব্যক্তির হাতেই সম্পন্ন করান যিনি ছিলেন আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা, যাঁর অন্তরে ছিল না বিন্দুমাত্রও গর্ব ও অহংকার। মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ এবং তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসূত। আল্লাহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদের প্রতি সন্তুষ্ট। ইসলামে তাঁর অবদানের জন্য আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন।

আরেকটি দ্রষ্টব্য : আবূ জাহলের[১] প্রকৃত উপাধি ছিল আবুল হাকাম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে আবূ জহল উপাধি দেন। (ফাতহুল বারী ذكر النبى ﷺ من يقتل ببدر অধ্যায়)। অর্থাৎ নিরেট মূর্খতার পিতা বা মুরব্বী, যতদিন সে জীবিত ছিল, ততদিন পর্যন্ত নবূওয়াত ও রিসালতের বিরোধিতায় সব সময় সব প্রকারের মূর্খতার জন্ম ও লালন সব তারই নেতৃত্বে হয়।

হযরত উক্কাশা[২] ইবন মিহসান (রা)-এর তরবারিটি যুদ্ধ করতে করতে ভেঙ্গে যায়। তখন নবী (সা) তাঁকে একটি ছড়ি প্রদান করেন। হযরত উক্কাশার হাতে ছড়িটি

১. 'আবূ জাহল' শব্দে 'আবূ' উদ্দেশ্য এবং 'জাহল' বিধেয় ও অনির্দিষ্টবাচক শব্দ, যদ্বারা কোন কিছু নির্দিষ্ট করা যায় না। এজন্যে 'জাহল' শব্দদ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২ একবার নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা হবে চতুর্দশী চাঁদের মত উজ্জ্বল। এ কথা শোনামাত্র হযরত উক্কাশা (রা) দাঁড়ালেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, যাতে আল্লাহ্ আমাকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, তুমি তাদের মধ্যেই আছ। এতে একজন আনসারী দাঁড়ালেন এবং তিনিও এরূপ আবেদনই করলেন। তিনি বললেন, উক্কাশা অগ্রগামী হয়েছে। (বুখারী)
এর উদ্দেশ্য না-বোধক ছিল না যে, তুমি ঐ সত্তর হাজারের মধ্যে নও, বরং উদ্দেশ্য ছিল আবেদনের ধারাবাহিকতা শেষ করে দেয়া (এরপর এতে বুঝে নিন এবং স্থির থাকুন)। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে যখন তুলায়হা ইবন খুয়ায়লিদ আসদী মিথ্যা নবূওয়াতের দাবিদার হল এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এ ফিতনা দমনের জন্য হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন, হযরত উক্কাশা (রা)-ও তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং তুলায়হার হাতে শহীদ হয়ে যান। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ৩খ. পৃ. ৬৩, মুহাজিরীন অধ্যায়)।

পৌঁছামাত্র তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি এর দ্বারাই তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন। তরবারিটির নাম ছিল আওন। সকল যুদ্ধেই তিনি এ তরবারি সাথে রাখতেন।[১]

বদরের দিন উবায়দা ইবন সাঈদ ইবন আস লৌহ বর্ম পরিহিত ছিল। চক্ষুদ্বয় ছাড়া তার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হযরত যুবায়র (রা) তার প্রতি তাক করে বর্শা ছুঁড়লে সাথে সাথে তার মৃত্যু ঘটে। হযরত যুবায়র (রা) বলেন, অতঃপর আমি তার শরীরের ওপর পা রেখে সজোরে টান দিলে বর্শাটি বেরিয়ে আসে। তবে তার একপাশ বাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বর্শাটি স্মৃতি হিসেবে হযরত যুবায়র থেকে চেয়ে নেন। তাঁর ওফাতের পর যথাক্রমে এটা হযরত আবূ বকর (রা), এরপর হযরত উমর (রা), তারপর হযরত উসমান (রা), অতঃপর হযরত আলী (রা) এবং পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর কাছে রক্ষিত থাকে।

বদর যুদ্ধে হযরত যুবায়র (রা) আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর কাঁধে একটি আঘাত এতই গভীর ছিল যে, হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) শৈশবে তাতে আঙুল ঢুকিয়ে খেলতেন। একবার আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান উরওয়া ইবন যুবায়রকে বললেন, তুমি কি তোমার পিতার তরবারিটি চেন? উরওয়া বললেন, হ্যাঁ। আবদুল মালিক বললেন, কিভাবে? উরওয়া বললেন, বদরের দিন তা ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। আবদুল মালিক বললেন, ঠিকই বলেছ। অতঃপর এর সমর্থনে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলেন: بهن فلول من قراع الكتائب "বড় বড় সেনাদল হত্যায় এ তরবারি ভোঁতা হয়েছে।" (সহীহ বুখারী, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

বদর যুদ্ধের বন্দিগণ

আল্লাহর অনুগ্রহে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। কুরায়শের সত্তর[২] ব্যক্তি নিহত এবং সত্তরজন গ্রেফতার হয়ে বন্দী হল। নিহতদের লাশের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) বদরের কূপে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু উমায়্যা ইবন খালফের লাশকে তা করা গেল না। সেটা এতই ফুলে উঠেছিল যে, বর্ম খুলে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণে তা টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল। এজন্যে তা যথাস্থানে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ. পৃ. ৯০।

২. যেমনটি হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে সহীহ বুখারী এবং হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে এবং এটাই বিশুদ্ধ। কারণ এর ওপর সমস্ত সীরাত গ্রন্থকার একমত। উহুদ যুদ্ধে যখন সত্তরজন মুসলমান শহীদ হন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এ আয়াত নাযিল করেন: اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩৮, من فضل شهيد بدرا অধ্যায়।

উতবা ইবন রবী'আর লাশ যখন কূপে নিক্ষেপ করা হচ্ছিল, তখন উতবার পুত্র হযরত আবূ হুযায়ফার চেহারায় রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যথা এবং দুঃখের ছাপ প্রত্যক্ষ করলেন। রাসূল (সা) বললেন, ওহে আবূ হুযায়ফা! পিতার এ অবস্থা দেখে কি তুমি কোন প্রতিক্রিয়া অনুভব করছ ? আবূ হুযায়ফা আরয করলেন, আল্লাহর কসম ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ভাবের উদয় হয়নি; কেবল এটুকু মনে হয়েছে যে, আমার পিতা ছিলেন সিদ্ধান্তদাতা, সহিষ্ণু, মীমাংসাকারী এবং সম্মানিত। তাই আশা ছিল, তার এ জ্ঞান ও দূরদর্শিতা তাকে ইসলামের দিকে পথ-নির্দেশ করবে। কিন্তু যখন তাকে কাফির অবস্থায় মরতে দেখলাম, তখন দুঃখ হল। রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুযায়ফা (রা)-এর কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন।

বদর যুদ্ধে নিহতদের লাশ কূপে নিক্ষেপকরণ

হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হযরত আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) চব্বিশজন[১] কুরায়শ সর্দারের লাশ অপবিত্র,[২] নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত কূপে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। যেসব লাশ কূপে নিক্ষেপ করা হয়, সেগুলো ছিল কুরায়শ সর্দারদের লাশ। এছাড়া অন্যান্য নিহতের লাশ অন্যত্র ফেলা হয়।

আর তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল, কোন সম্প্রদায়ের ওপর যখন জয়লাভ করতেন, তখন সেখানে তিনরাত্রি অবস্থান করতেন। এ অভ্যাস অনুযায়ী যখন তৃতীয় দিন আসল, তখন তিনি সওয়ারীর পিঠের ওপর আসন (জিন) বাঁধার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি রওয়ানা দেন এবং সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পিছে পিছে চলতে থাকেন। সাহাবিগণের ধারণা ছিল হযরত (সা) কোনো প্রয়োজনে যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি ঐ কূপের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেকের নাম ধরে অমুকের পুত্র অমুক বলে সম্বোধন করে বললেন, ওহে উতবা, ওহে শায়বা, ওহে উমায়্যা, ওহে আবূ জাহল! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা তোমাদের কাছে ভাল মনে হয়নি। আমাদের সাথে আমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছেন, তা আমরা যথাযথ পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ ?

এটা বুখারীর বর্ণনা, ইবন ইসহাকের বর্ণনায় এর অতিরিক্ত আছে যে, তোমরা নিজেদের নবীর সাথে আচরণে খুবই মন্দ সপ্রদায় ছিলে। তোমরা আমাকে মিথ্যা বলেছ, অথচ লোকেরা আমাকে সত্য বলেছে। তোমরা আমাকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার

১. লাশ ছিল সত্তরটি, তন্মধ্যে চব্বিশটি ঐ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। বাকীগুলো অন্য কোথাও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। –ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩২, আবূ জাহল হত্যা অধ্যায়।

২ ঈমান হলো পবিত্রতা আর কুফর হলো নাপাকী। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন : انما المشركون نجس "নিশ্চয়ই মুশরিকগণ অপবিত্র।" শিরককারীদের জন্য এরূপ কূপই ছিল উপযুক্ত। কুফরের নাপাকী ঈমানের গোসল দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব। কুফর অদৃশ্য জগতে বড় ধরনের অপবিত্রতা এবং ঈমান গোসলের মত বিরাট পবিত্রতা। আর কুফরের সমস্ত শাখা অর্থাৎ গুনাহ, অপরাধ ইত্যাদি ছোট ধরনের অপবিত্রতার মত এবং ঈমানের সমস্ত শাখা অর্থাৎ আনুগত্য, ছোট পবিত্রতা বা উযূর মত। অতএব বুঝে নিন। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ্ বিদায় হজ্জের বর্ণনায় আসবে।

করেছ, আর লোকেরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করেছ, আর লোকেরা আমাকে সাহায্য করেছে। হিফাযতকারীকে তোমরা খিয়ানতকারী বলেছ, আর সত্যবাদীকে বলেছ মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তোমাদেরকে মন্দফল দান করুন। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, আপনি কি প্রাণহীন লাশের সাথে কথা বলছেন ? তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তুমি ওদের চেয়ে আমার কথা বেশি শুনতে পাচ্ছ না। পার্থক্য, ওরা উত্তর দিতে পারে না।[১]

হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা) এক দীর্ঘ কাসীদায় বলেন :

ينـاديـهـم رسـول الله لـمـا * قذفناهم كباكب فى القـليـب
الـم تـجدوا كلامى كان حقا * وامـر الله يـاخـذ بـالقـلوب
فـمانطقوا ولو نطقوا لـقـالـوا * صدقت وكنت ذا رأى مصـيب

"আমরা যখন ঐ দলকে কূপে নিক্ষেপ করি, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের আহ্বান করলেন, তোমরা কি আমার কথা সত্য পাওনি ? আল্লাহ্ অন্তরসমূহের মালিক। তারা কোন উত্তর দেয়নি। ধরে নিলাম, যদি উত্তর দিতও, তাহলে এটাই বলত যে, আপনি সত্য বলেছেন; আপনার সিদ্ধান্তই নির্ভুল ও সঠিক ছিল।"

দ্রষ্টব্য : এ হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মোটামুটিভাবে মৃতব্যক্তিও শুনতে পায়। বিশিষ্ট সাহাবী ও তাবিঈগণের এটাই অভিমত। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-ও মৃত ব্যক্তির শোনার ব্যাপারটি অস্বীকার করেননি। বিস্তারিত জানার জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ এবং মাদারিজুন নুবূওয়াত দেখুন।

বিজয়-বার্তা নিয়ে মদীনায় দূত প্রেরণ

এ প্রকাশ্য বিজয়ের সুসংবাদ দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা মুনাওয়ারায় দূত প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে উচ্চভূমির অধিবাসীদের প্রতি এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে নিম্নভূমির অধিবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন।

হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা) বলেন, এ সুসংবাদ ঠিক এমন সময় আমাদের কানে পৌঁছে, যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা, হযরত উসমান গনী (রা)-এর সহধর্মিণী মরহুমা হযরত রুকায়্যা (রা)-কে দাফন করছিলাম। তাঁর দেখাশোনা করার জন্যই নবী (সা) হযরত উসমান (রা)-কে মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। এ জন্যে হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু নবী (সা)-এর নির্দেশজনিত কারণে উসমান (রা) অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁকে যথারীতি বদর যোদ্ধাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তিনি বলেন,) আমি দেখলাম লোকজন যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে ঘিরে আছে, আর যায়দ (রা) একটি জায়নামাযে দাঁড়িয়ে বলছেন, উতবা ইবন রবীআ, শায়বা ইবন রবীআ, আবূ জাহল ইবন হিশাম, জামআ ইবন

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫২।

আসওয়াদ, আবুল বুখতারী ইবন হিশাম. উমায়্যা ইবন খালফ এবং হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া নিহত হয়েছে।

আমি বললাম, আব্বাজান, এ খবর কি সত্য ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, পুরোপুরিই সত্য।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে মদীনায় প্রেরণের পর তিনি (সা) রওয়ানা হলেন এবং বদরের যুদ্ধবন্দীদের কাফেলা ছিল তাঁর সহগামী। নবী (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন কা'ব আনসারী (রা)-এর কাছে গনীমতের মালামাল সোপর্দ করলেন।

যখন তিনি রাওহায় পৌঁছলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁকে এবং সাহাবিগণকে এ মহাবিজয়ের জন্য মুবারকবাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে এসে মিলিত হন। এতে হযরত সালমা ইবন সালামা (রা) বললেন, তোমরা কি বিষয়ে মুবারকবাদ দিচ্ছ ? আল্লাহর শপথ, নেতাদের দল একত্রিত হয়েছিল, সবাইকে রশিতে বাঁধা উটের মতই হত্যা করে নিক্ষেপ করেছি (অর্থাৎ আমরা কোন বড় কাজ করিনি, যার জন্য মুবারকবাদ পাওয়ার উপযুক্ত)। রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে মুচকি হেসে বললেন, এরাই তো মক্কার নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিল।

গনীমতের মাল বন্টন

বিজয়লাভের পর নবী করীম (সা) তিনদিন বদরে অবস্থান করেন। তিনদিন পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং গনীমতের মালের দায়িত্ব হযরত আবদ ইবন কা'ব (রা)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। 'সফরা' নামক স্থানে পৌঁছে তিনি গনীমতের মাল বন্টন করেন। কারণ এ পর্যন্ত তা বন্টনের সুযোগ হয়নি।

সাহাবিগণ গনীমতের মাল বন্টন প্রশ্নে বিভিন্ন মতে বিভক্ত হয়ে গেলেন। যুবকেরা বললেন, আমরা এ মালের হকদার, কেননা আমরাই কাফিরদের হত্যা করেছি। বৃদ্ধেরা পতাকার নিচে ছিলেন এবং যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে বেশি অংশগ্রহণ করেননি। বৃদ্ধেরা বললেন, গনীমতের মালে আমাদেরকেও অংশীদার করা হোক। কেননা যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তা আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই হয়েছে। আল্লাহ্ না করুন, যদি তোমরা পরাজিত হতে, তা হলে আমাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করতে। অপর দল, যারা নবী করীম (সা)-এর হিফাযতের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তারাও নিজেদেরকে এ মালের হকদার মনে করতেন।

এ অবস্থারই এক পর্যায়ে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, يَسْـئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَـالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلُ "লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ্ এবং রাসূলের।" (সূরা আনফাল : ১) অর্থাৎ মালে-গনীমতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলা এবং রাসূল (সা) তাঁর প্রতিনিধি, যেভাবে তিনি তা বন্টন যথার্থ মনে করবেন, সেভাবেই বন্টন করবেন। সফরায় পৌঁছে তিনি এ মাল মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেন।[১]

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০১।

অধিকন্তু তিনি এ মালে-গনীমত থেকে আরো আট ব্যক্তিকে অংশ দেন, যারা তাঁর নির্দেশে কিংবা অনুমতিক্রমে বদরে উপস্থিত হতে পারেননি।

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা), যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেই উসমান (রা)-এর স্ত্রী ও রাসূল তনয়া অসুস্থা হযরত রুকায়্যা (রা)-কে দেখাশোনার জন্য মদীনায় রেখে যান।

২. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)।

৩. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ (রা)।

৪. হযরত আবূ লুবাবা (রা), রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে মদীনার শাসক হিসেবে রেখে যান।

৫. হযরত আসিম ইবন আদী (রা), তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) উচ্চভূমিতে রেখে যান।

৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), কোন কারণবশত রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বনী আমর ইবন আউফের দিকে ফেরত পাঠান।

৭. হযরত হারিস ইবনুস সাম্মাহ (রা)।

৮. হযরত খাররাত ইবন যুবায়র (রা)।

এ সাহাবিগণ যদিও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবুও রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে গনীমতের অংশ দান করেন এবং বদরের যোদ্ধাদের তালিকায় তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১]

দ্রষ্টব্য : জানা আবশ্যক যে, يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ এ আয়াতে গনীমতের মাল বন্টনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে এবং وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ আয়াতে বিস্তারিতভাবে গনীমতের মাল বন্টনের নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। আবূ উবায়দ এ মত পোষণ করেন যে, বদর যুদ্ধের গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়নি; কিন্তু ইমাম বুখারী এবং ইমাম ইবন জারীর মনে করেন, বদর যুদ্ধলব্ধ গনীমত থেকে এক-পঞ্চমাংশ বের করা হয়েছিল। যেমনটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আলী (রা) বর্ণিত ঐ দু'টি উটনীর হাদীস, হযরত হামযা (রা) যে দু'টির কুঁজ কেটে দিয়েছিলেন, যার একটি উটনী তিনি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে পেয়েছিলেন। হাফিয ইবন কাসীর বলেন,এ বর্ণনাই বিশুদ্ধ এবং অগ্রগণ্য।[২]

আর সফরায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের মধ্য থেকে নযর ইবন হারিসকে হত্যার নির্দেশ দেন। সফরা থেকে অগ্রসর হয়ে যখন 'ইরকুয-যবীয়াহ' নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন উকবা ইবন আবূ মুঈতকে হত্যার নির্দেশ দেন। ফলে সেখানেই উকবাকে হত্যা করা হয়।[৩]

নযর ইবন হারিসকে হযরত আলী (রা) আর উকবা ইবন আবূ মুঈতকে হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা) হত্যা করেন এবং অবশিষ্ট বন্দীদের নিয়ে নবী (সা) মদীনায় যাত্রা করেন।

---

১. ইবনুল আসীর,২খ. পৃ. ১৮।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০১-৩০৩।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪।

নযর এবং উকবা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কট্টর দুশমনদের অন্তর্ভুক্ত। অশ্রাব্য ভাষা এবং দুষ্টবুদ্ধি দিয়ে এরা কথা ও কাজের মাধ্যমে সব সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অপদস্থকরণ ও তাঁর ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন চালানোর কোন উপায় অবশিষ্ট রাখেনি। এজন্যে সমস্ত বন্দীর মধ্য থেকে তিনি কেবল এ দু'জনকেই হত্যার নির্দেশ দেন। মক্কী জীবনে যখন তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়েছিলেন, তখন এই উকবা ইবন আবূ মুঈতই উটের নাড়িভুঁড়ি এনে হযরতের পিঠের ওপর রেখেছিল এবং তাঁর গলা চেপে ধরেছিল। দালাইলে আবূ নুয়াইমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত আছে যে, একবার সে নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারায় থুথু নিক্ষেপ করেছিল।[১] মোটকথা, পবিত্র ও মহান গুণের অধিকারী রাসূল (সা)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা যেন তার খাদ্যস্বরূপ ছিল। আল্লাহর নবীর সাথে মুকাবিলা, যুদ্ধ, মারামারি এবং বাদ-বিতণ্ডা করা মারাত্মক অপরাধ এবং প্রকাশ্য ক্ষতির কারণ তো বটেই, পরন্তু নবীর শানে বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ করা, গালি-গালাজ করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা, যুদ্ধ ও মারামারি করা অপেক্ষাও ঘোরতর অপরাধ। কেননা এটা নবূওয়াতের পদমর্যাদাকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর। এ মাসআলার ওপর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ্ সুযোগমত অন্য কোথাও করা যাবে। ইলমের বিজ্ঞ অধিকারিগণ এ মাসআলা বিশ্লেষণের জন্য শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবন তায়মিয়া প্রণীত 'الصارم المسلول على شاتم الرسول' গ্রন্থটি[২] অধ্যয়ন করতে পারেন। এটি এ বিষয়ের ওপর এক বিরাট গ্রন্থ।

মোটকথা, নবী করীম (সা) মনযিলে মনযিলে থেমে থেমে বন্দীদেরকে কাফেলার সাথে নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছেন।

বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ

মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে তিনি বন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং বলেন : اِسْتَوْصُوْا بِالْأُسَارٰى خَيْرًا "বন্দীদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।" (তাবারানীর 'কাবীর' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং হাফিয হায়সামী বলেন, এর সনদ হাসান)।

সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যার কাছে বন্দী ছিল, তিনি প্রথমে বন্দীতে খেতে দিতেন এবং পরে নিজে খেতেন। আর খাবার যদি না বাচত, তখন খেজুরের উপর সন্তুষ্ট থাকতেন।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ৪০৭।

২ ছয়শত পৃষ্ঠা বিশিষ্ট এ কিতাবটি হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্যের 'দাইরাতুল মাআরিফ' কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে, যাতে বদর যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের নির্দেশ রয়েছে।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর আপন ভাই আবূ আযীয ইবন উমায়র বন্দীদের অন্যতম ছিল। সে বলেছে, আমি যে আনসারীর গৃহে ছিলাম, তাদের অবস্থা ছিল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় তারা কমবেশি যে রুটি বানাতেন, তা আমাকে খাওয়াতেন এবং নিজেরা শুধু খেজুর খেতেন। আমি লজ্জা পেতাম এবং যতই পীড়াপীড়ি করতাম যে, আপনারা রুটি খেয়ে নিন, কিন্তু তারা তা মানতেন না, বরং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। হায়সামী বলেন, তাবারানী হাদীসটি তাঁর 'সাগীর' ও 'কাবীর' গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন (মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৮৬)।

বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ

মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছার কয়েকদিন পর নবী (সা) বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন যে, এদের কি করা উচিত। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী করীম (সা) বদর যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মতামত জানার জন্য তাদের পরামর্শ চাইলেন। তিনি প্রথমে নিজে বললেন : ان الله امكنكم منهم "আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাদের ওপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন।"

হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তাদের সবাইকে হত্যা করাই সঙ্গত। বিশ্ববাসীর জন্য রহমত দয়ালু নবী (সা) এ প্রস্তাব পসন্দ করলেন না এবং দ্বিতীয়বার বললেন : يا ايها الناس ان الله قد امكنكم وانما هم اخوانكم بالامس "ওহে লোক সকল![1] আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের উপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দান করেছেন। এরা ইতোপূর্বে তোমাদেরই ভাই ছিল।"

হযরত উমর (রা) পুনরায় একই আরয করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-ও আবার বললেন, আল্লাহ্ তাদের ওপর তোমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আর ইতোপূর্বে এরা তোমাদেরই ভাই ছিল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমার প্রস্তাব হলো, মুক্তিপণ নিয়ে এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক (আহমদ

---

১. রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমেই ان الله امكنكم منهم বলে 'ক্ষমা এবং অনুগ্রহ' প্রদর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন কিন্তু হযরত উমর (রা) যখন হত্যার পরামর্শ দিলেন, তখন দ্বিতীয়বার অতিরিক্ত তাগিদের সাথে ক্ষমা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শনের শিক্ষা দিলেন যে, শাস্তিদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অপরাধী, বিশেষ করে নিজের ভাইকে ক্ষমা করা চরিত্রের উত্তম গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আর 'ইয়া' শব্দটি আরবী ভাষায় দূরবর্তীতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ওহে লোক সকল! যারা ক্ষমা প্রদর্শন থেকে দূরে আছ, তাদের উচিত ক্ষমা ও অনুগ্রহের নিকটবর্তী হওয়া। আর আল্লাহ্ শব্দের সাথে ইয়া শব্দ ব্যবহার করায় এ অর্থ দাঁড়ায় যে, "আয় আল্লাহ্! আমরা গুনাহগার, নিজেদের অযোগ্যতা ও অন্যায় কাজের কারণে আপনার রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছি। আপন অনুগ্রহ দ্বারা আমাদেরকে নিকটবর্তী করুন।" আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী কিন্তু এতটা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আহ্বানে ইয়া শব্দের ব্যবহার দূরবর্তী আল্লাহকে আহ্বানের মতই, যা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে।

বর্ণিত, আর হায়সামী বলেন, আহমদ হাদীসটি তাঁর শায়খ আলী ইবন আসিম ইবন সুহায়ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু তিনি অনেক ভুল বলতেন বলে কেউ তাকে ভাল বলেননি। তবে আহমদের সনদের অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ সহীহ্)।[১]

সহীহ্ মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজ প্রিয়জনকে হত্যা করে। আলীকে বলুন, তিনি যেন তার ভাই আকীলকে হত্যা করে, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমার প্রিয় অমুককে হত্যা করি। এটা এজন্যে যে, এরা কাফিরদের জন্য অনুকরণীয় সর্দার।[২]

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা সব আপনারই সম্প্রদায়ের লোকজন, আমার প্রস্তাব, তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিন। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এদেরকে ইসলামের পথ দেখাবেন এবং এরাই একদিন কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। রাসূল (সা) এ প্রস্তাবটি পসন্দ করলেন (সহীহ মুসলিম, وابحته الغنائم الا مداد بالملائكة في غزوة بدر অধ্যায়)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-এর প্রস্তাব শুনে ইরশাদ করেন, ওহে উমর! তোমার বৈশিষ্ট্য হযরত নূহ (আ) এবং হযরত মূসা (আ)-এর মত, যাঁরা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জন্য এ দু'আ করেছিলেন। হযরত নূহ (আ)-এর দু'আ ছিল :

رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَايَارًا - اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوْا الاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا .

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্যে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। ওদের তুমি অব্যাহতি দিলে ওরা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির জন্ম দিতে থাকবে।" (সূরা নূহ : ২৬-২৭)

১. মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৭খ. পৃ. ৮৭।

২ হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর বর্ণনায় আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) তাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করার পরামর্শ দেন। আর হযরত উমর (রা) বলেন : يَا رَسُوْلَ اللهِ كَذَّبُوْكَ وَاَخْرَجُوْكَ وَقَاتَلُوْكَ فَاضْرِبْ اَعْنَاقَهُمْ "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! এরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করেছে। কাজেই এদেরকে হত্যা করার আদেশ দিন।" (তিরমিযী, ২খ. পৃ. ৩৪, কিতাবুত তাফসীর; ১খ. পৃ. ২০৪, কিতাবুল জিহাদ, ماجاء فى المشورة অধ্যায়; মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২১০)। এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, মুস্তাদরাক ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে। ইমাম তিরমিযী এ বর্ণনাকে হাসান এবং হাকিম বকে সহীহ বলেছেন (দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০১)। **(সতর্ক বাণী)** এ পরামর্শে হযরত আলী (রা)-ও শরীক ছিলেন, যেমন সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় আছে। কিন্তু কোন বর্ণনায়ই হযরত আলী (রা)-এর কোন প্রস্তাবের উল্লেখ নাই। মহান আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। -যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪১।

আর মূসা (আ) এ দু'আ করেছিলেন :

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ·

"হে আমাদের প্রতিপালক! ওদের সম্পদ বিনষ্ট কর, ওদের হৃদয় কঠিন করে দাও, ওরা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না।" (সূরা ইউনুস : ৮৮)

আর হে আবূ বকর! তোমার বৈশিষ্ট্য হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর মত। যেমন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ ছিল :

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ·

"সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে, সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৬)

আর হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের দিন বলবেন :

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ·

"তুমি যদি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি ওদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা মায়িদা : ১১৮)

নবী (সা) রাহমাতুল লিল আলামীন বিধায় তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর প্রস্তাব পসন্দ করলেন এবং মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ, হাফিয যাহাবীও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২১)

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা), হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং হযরত আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[১] তিনি সাহাবিগণের সাথে পরামর্শরত, এমন সময় ওহী অবতীর্ণ হলো যে, আপনি হত্যা অথবা ফিদয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণের ব্যাপারে সাহাবিগণকে এখতিয়ার দিয়ে দিন। যেমন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আপনি সাহাবিগণকে এখতিয়ার দিয়ে দিন, ইচ্ছা করলে তারা তাদের হত্যা করুক কিংবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিক। তবে শর্ত হলো, আগামী যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে সমপরিমাণ নিহত হবে। সাহাবীগণ কাফিরদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ এবং পরবর্তী বছর নিজেদের নিহত হওয়াকে গ্রহণ করলেন। (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন হিব্বান ও হাকিম সহীহ সনদে হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৯৮।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৯।

'মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক' এবং 'মুসান্নাফে ইবন আবূ শায়বা'-য় হযরত আবূ উবায়দা (রা) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল আমীন (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে এসে আরয করেন, আপনার রব বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে আপনাকে এখতিয়ার দিয়েছেন। তিনি এ বিষয়ে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমরা আজ মুক্তিপণ নিয়ে তাদের মুক্তি দিতে চাই, যাতে করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি একগুণ বৃদ্ধি পায় এবং আগামী বছর আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাঝে যাকে চান শাহাদতের সম্মান ও মর্যাদা দান করে ধন্য করবেন।[১] ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে, আগামী বছর আমাদের সত্তরজনের জান্নাত নসীব হবে (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৪)।[২]

মুক্তিপণ গ্রহণের ব্যাপারে আল্লাহর অসন্তুষ্টি

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের মুক্তিদানের নির্দেশ দেন। অপরাপর সাহাবিগণেরও মুক্তিপণ গ্রহণের পক্ষে মত প্রদানের কারণ এটাই ছিল যে, সম্ভবত এরা পরবর্তীতে মুসলমান হবে এবং ইসলামের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারীতে পরিণত হবে। আর মুক্তিপণ গ্রহণের ফলে নগদে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা জিহাদের জন্য ও অন্যান্য দীনী কাজে সহায়ক হবে। সম্ভবত মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শদাতাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও থেকে থাকবেন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল অর্থ-সম্পদ আহরণ, যার লক্ষ্য দুনিয়ার প্রতি মহব্বত। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ আয়াতে বলা হয় :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ - لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

"দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা কোন নবীর জন্য সংগত নয়। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর আর আল্লাহ্ চান পারলৌকিক কল্যাণ, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ণ বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, এজন্য তোমাদের ওপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।" (সূরা আনফাল : ৬৭-৬৮)

এ অসন্তুষ্টির লক্ষ্য ছিলেন ঐসব ব্যক্তি, যারা বেশি বেশি আর্থিক লাভবান হওয়া ও পার্থিব উপকারিতাকে সামনে রেখে মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا বাক্য দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায়। অবশিষ্ট যে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ

১. দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০৩।

২ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১৪।

শুধুই দীনী ও পারলৌকিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা প্রকৃতপক্ষে এ অসন্তোষের অন্তর্ভুক্ত নন। রাসূলুল্লাহ (সা) কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দয়ার্দ্র-চিত্তের কারণে এ সিদ্ধান্ত পসন্দ করেন—যাতে অপরের আর্থিক লাভ হয়। আর পরের উপকার করার ইচ্ছা ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। নিজের জন্য আর্থিক সুবিধা সংরক্ষণ তাঁর কাছে খুবই অপসন্দনীয় ছিল। এ আয়াতে অসন্তুষ্টি ছিল ঐ লোকদের জন্য, যাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আর্থিক লাভের প্রতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) অসন্তুষ্টির এ আয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। হযরত উমর (রা) কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন :

ابكى للذى عرض على اصحابك من اخذهم القداء لقد عرض على عذاب هم ادنى من هذه الشجرة ·

"তোমার সঙ্গীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান এসেছে, এজন্যে আমি কাঁদছি। তাঁর আযাব আমার সামনে এ বৃক্ষের নিকটে পেশ করা হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ২খ. পৃ. ৯৩)

দ্রষ্টব্য : আযাব কেবল দেখানো হয়েছিল, নাযিল হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল কেবল সতর্ক করা। এরপর তিনি বলেন, এখন যদি এ আযাব আসত তা হলে উমর ছাড়া কেউই রেহাই পেত না। অপর এক বর্ণনায় 'এবং সা'দ ইবন মু'আয ছাড়া'-ও বলা হয়েছে।[১]

কেননা হযরত সা'দ ইবন মু'আযের ও এ পরামর্শই ছিল যে, তাদের হত্যা করা হোক। এজন্যে হযরত উমরের সাথে তাঁকেও পৃথক করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) যদিও মুক্তিপণ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছিল ওদেরকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক, যা শরীআত অপসন্দ করে। ফলে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার উল্লেখ করা হয়নি। যেহেতু এ যুদ্ধ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং কুফরীর মূলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ – لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ·

"আর আল্লাহ্ চাচ্ছিলেন যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন; এটা এজন্যে যে, তিনি সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, যদিও অপরাধিগণ এটা পসন্দ করে না।" (সূরা আনফাল : ৭–৮)

এজন্যই এ যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে হত্যা করার জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২।

فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ·

"সুতরাং তোমরা আঘাত কর তাদের কাঁধে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে।" (সূরা আনফাল : ১২)

অপর আয়াতে আবার ইরশাদ করেছেন :

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوْا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ·

"অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা ওদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন ওদেরকে কষে বাঁধবে, এরপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালাবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ এর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে।" (সূরা মুহাম্মদ : ৪)

এরদ্বারা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল যে, আল্লাহর শত্রুরা যতক্ষণ পর্যন্ত এতটা হতাহত না হবে, যাতে তারা অস্ত্র সমর্পণ না করে এবং সত্যের ভীতি ও প্রাবল্য তাদের মনে কম্পন ধরায়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তিপণ গ্রহণ বৈধ নয়। হ্যাঁ, তাদের মনে ইসলামের বিশালত্ব, ভীতি, প্রাবল্য ও মর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই।

এক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, পর্যাপ্ত রক্তপাত ঘটানো হোক, যাতে তাদের মনে ইসলামের ভীতি ও শান-শওকতের স্থায়ী প্রভাব পড়ে এবং কুফরীর মূল উৎপাটিত হয়ে যায়। আর কুফর যেন ভবিষ্যতের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে না পারে। মুসলমানগণ যেহেতু আল্লাহর দুশমনদের পর্যাপ্ত রক্তপাত করার পূর্বেই মুক্তিপণ গ্রহণ করেছে, এজন্যে আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে তিরস্কার এসেছে।[১] কেননা এটা অনুগ্রহ প্রদর্শনের সময় ছিল না, বরং এটা ছিল নিষ্ঠুরতা ও কঠোরতা প্রদর্শনের সময়। আবূ তায়্যিব বলেন :

ووضع الندى فى موضى السيف بالعلى * مضركوضع السيف فى موضع الندى ·

"তরবারির স্থানে ক্ষমা ও অনুগ্রহ রাখা এতই ক্ষতিকর, যেমন ক্ষতিকর ক্ষমা ও অনুগ্রহের স্থানে তরবারি রাখা। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই সমাজদেহের বিষ ফোঁড়া, সমাজ-দুশমনদের হত্যা এবং রক্তপাত ছাড়া শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।"

لن يسلم الشرف الرفيع من الاذى * حتى يراق على جوانبه الدم

"অর্থাৎ উচ্চতর মর্যাদাও কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না, যতক্ষণ না এর চারপাশে রক্ত প্রবাহিত করা হয়।"

ইসলাম তো কেবল অপরাধীদেরই হত্যার নির্দেশ দেয়। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র সভ্যতা-সংস্কৃতির দাবিদার, তারা কেবল নিজেদের আধিপত্যবাদী প্রভাব প্রতিষ্ঠার

১. আল্লামা জাসসাস প্রণীত 'আহকামুল কুরআন', ৩খ. পৃ. ৭২।

মানসেই অপরাধী ও নিরপরাধের মধ্যে কোনই পার্থক্য করে না। কোন বাছ-বিচার ছাড়াই গণহত্যার নির্দেশ দেয়, যার মধ্যে নিরপরাধ নারী-শিশু-বৃদ্ধ সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর এ সংস্কৃতিবান সৈন্যদের দ্বারা যেসব নির্লজ্জ কার্যকলাপ প্রকাশ পায়, তা আজ পৃথিবীতে গোপন নেই। মেশিনগান, কামান ও বিমান থেকে নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে বোমাবাজি করে পূর্ণ শহরকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে ফেলা হয়।

আলহামদু লিল্লাহ, ইসলাম এ ধরনের কসাইপনা, নির্দয়তা এবং সংকীর্ণতামুক্ত, পাক-পবিত্র। জিহাদে যাত্রাকালে ইসলাম এর অনুসারীদেরকে শিশু, নারী, বৃদ্ধ ও সন্ন্যাসীদেরকে হত্যা করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করে।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব

সন্দেহ এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তো মুক্তিপণ বা হত্যা, যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল, তা হলে তিরস্কার কেন করা হল ? আল্লামা তায়্যিবী (র) শারহে মিশকাতে বলেন, এ অধিকার কেবল দৃশ্যত ও প্রতীকীরূপে দেয়া হয়েছিল, কিন্তু মূলত প্রকৃতিগতভাবে এ অধিকারদান ছিল পরীক্ষাস্বরূপ যে, দেখা যাক ওরা আল্লাহর দুশমনদেরকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়, নাকি পার্থিব সম্পদকে অগ্রাধিকার দেয়। যেমন নবী (সা)-এর সহধর্মিণিগণ একবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট খোরপোষ বৃদ্ধির দাবি জানাতে থাকলে এ আয়াত নাযিল হয় :

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً - وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"হে নবী! আপনি নিজ স্ত্রীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও এর ভূষণই কামনা কর, তবে এসো, আমি তোমাদের ভোগ সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেই এবং তোমাদেরকে সৌজন্যের সাথে বিদায় দিয়ে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও আখিরাত কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ্ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব : ২৮–২৯)

এ আয়াতে দৃশ্যত যদিও নবী-সহধর্মিণিগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছে করলে তাঁরা পার্থিব জীবন ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য গ্রহণ করতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতকে গ্রহণ করতে পারেন; প্রকৃতপক্ষে এটা অধিকার দেয়া নয়, বরং এটা ছিল তাঁদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।

যাদুবিদ্যা শেখার জন্য হারূত ও মারূতের যেমন ব্যাবিলনে অবতরণ করা ছিল কেবল বিপর্যয়, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের জন্য, যাদু শেখা বা না শেখার অধিকার প্রদান সেখানে উদ্দেশ্য ছিল না।

এভাবে শবে মি'রাজে নবী (সা)-এর সামনে শরাব ও দুধের পাত্র উপস্থিত করা হলে তিনি দুধ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি যদি শরাব গ্রহণ করতেন, তা হলে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত।

সার-সংক্ষেপ : সার কথা হলো এই যে, হযরত সিদ্দীকে আকবর ও অপরাপর সাহাবায়ে কিরাম, যাঁরা মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল দীনী ও পরকালীন কল্যাণ চিন্তার ভিত্তিতে তা দিয়েছিলেন। আর অন্যরা আর্থিক লাভকে সামনে রেখে মুক্তিপণ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। এ ভৎসনার আয়াত এজন্যে নাযিল হয়। আর ভর্ৎসনার প্রকৃত লক্ষ্য তারাই ছিল, যারা অধিক আর্থিক চিন্তাকে সামনে রেখেছিলেন। যেমন تُرِدْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا এ বাক্যদ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায়। আর ভর্ৎসনার তাৎপর্য ছিল যে, তোমরা আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর ধ্বংসশীল সম্পদ এবং তুচ্ছ মালামালের প্রতি কেন দৃষ্টিপাত কর ? হে রাসূলের সাহাবিগণ! তোমাদের মত প্রাচীন ও মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চতর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারীর জন্য এটা কখনই সমীচীন নয় যে, পার্থিব হালাল বস্তুর (মুক্তিপণ ও গনীমত) প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আর রাসূল (সা) যে মুক্তিপণের সিদ্ধান্ত পসন্দ করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য ছিল কেবল তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং দয়ার্দ্রচিত্তের অভিব্যক্তি। আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, নবী (সা) এবং সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর সামনে আর্থিক উপকারিতার চিন্তা বিন্দুমাত্রও ছিল না। এজন্যে তাঁরা এ ভর্ৎসনার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। রাসূলের দৃষ্টিতে তো সমস্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা একইরূপ। সেখানে মুক্তিপণের সামান্য কয়েকটি দিরহামের মূল্যই বা কতটুকু ?

তাৎপর্যপূর্ণ উপকারিতা : এ আয়াত দ্বারা কতিপয় আলিম দলীল পেশ করেন যে, নবী (আ)-গণও মানবিক জ্ঞানদ্বারা কোন কোনক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেন এবং সে ইজতিহাদ যদি ভুল হয়ে যায়, মহান আল্লাহ্ তখন তাঁর নবীকে সে ভুল ইজতিহাদের ওপর স্থির থাকতে দেন না, বরং ওহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। তবে নবী (আ)-গণের ইজতিহাদ আর মুজতাহিদগণের ইজতিহাদের মধ্যে আসমান-যমীন পার্থক্য থাকে। তা হলো এই যে, ওহী নাযিল হওয়ার পরও নবীর ইজতিহাদের ওপর আমল করা বাতিল হয়ে যায় না। যেমন রাসূল (সা) যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আয়াত নাযিল হওয়ার পরও তা কার্যকর থাকে এবং এতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়নি। আর নবী (সা)-ও হত্যা করার প্রতি ফিরে যাননি; বরং মুক্তিপণের ওপর স্থির ছিলেন। মুজতাহিদগণের বেলায় এর বিপরীতটি হয়ে থাকে। যদি তার ইজতিহাদের পর প্রকাশ পায় যে, আমার এ ইজতিহাদ অমুক সূত্রটির বিরোধী, তখন তার পূর্বকৃত ইজতিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন তার ওপর আবশ্যিক হয়ে যায়। জানা আবশ্যক যে, নবী-রাসূলগণের ইজতিহাদও এক ধরনের গুপ্ত ওহী। যেমন আল্লাহর বাণী : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ "নবীর অন্তরে

যে ওহী প্রেরণ করা হয়, তা ছাড়া তিনি নিজ থেকে কোন কথা বলেন না।" যদি আল্লাহ্ তা'আলা নবীর ইজতিহাদের ওপর চুপ থাকেন, তা হলে এটা গুপ্ত ওহীর পর্যায়ে এসে যায় এবং এর বিধানও তদ্রুপই, যেমন প্রকাশ্য ওহীর বিধান। আর যদি নবীর ইজতিহাদের বিরোধী কোন ওহী নাযিল হয়, তা হলে এ প্রকাশ্য ওহী সেই গুপ্ত ওহীর (অর্থাৎ নবীর ইজতিহাদ) বাতিলকারীরূপে গণ্য হয়। যেমন এক আয়াত অন্য আয়াতের এবং এক হাদীস অপর হাদীসের বাতিলকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দলীল এবং প্রকাশ্য ওহী গুপ্ত ওহীর (অর্থাৎ নবীর ইজতিহাদ) রদকারী হয়ে থাকে। এ বাতিল করার রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর নবী দলীলহীন কোন ব্যাপারে ইজতিহাদ করলে তা-ও আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ইশারায়ই ছিল। আল্লাহ্ বলেন : انَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرٰكَ اللّٰهُ "(হে নবী) আপনি যে সিদ্ধান্ত ও পরামর্শ দেন, তাও ছিল আল্লাহর ইচ্ছা ও ইঙ্গিতে।" অতঃপর আল্লাহর যে বিধান নাযিল হয়, তা-ও হয় আল্লাহরই নির্দেশে। প্রেক্ষাপট বা অপর কোন অজ্ঞাত কারণে এক নির্দেশ অপর নির্দেশের রহিতকারী। وَيَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ "আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, তা কাজে পরিণত করেন; তিনি যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করেন।" নবীর ইজতিহাদে কোন ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলাই ওহীর সাহায্যে তা শুধরিয়ে দেন। আল্লাহ্ মাফ করুন, কোন মানুষের জন্যই এটা সম্ভব নয় যে, সে কোন নবীর ইজতিহাদে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার মৌনতা ও নিশ্চিতকরণের পর নবীর ইজতিহাদের বিচার বিশ্লেষণ করা সেরূপ কুফরী কাজ, যেমন প্রকাশ্য ওহীর ব্যাপারে এমনটি করা কুফরী। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য এটাই যে,

زبان تاز كردن باقرار تو * نينكيختن علت اركارتو ·

"এটা নবূওয়াতের স্তর এবং রিসালাতের দরবার, যেখানে আত্মপ্রবৃত্তির পক্ষে মাইল ও মনযিলসমূহ অতিক্রম করা অসাধ্য, সেখানে অসাধ্য পদচারণা করা পরিপূর্ণ পাগলামী ও মূর্খতা।"

نه هر جائ مركب توان تاختن * كه جاها سپر بايداند اختن ·

এ মাসআলার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে জ্ঞান পিপাসুগণ অনুগ্রহ করে 'শারহে তাহরীরুল উসূল' এবং বাহরুল উলূম প্রণীত 'মুসাল্লামুস সুবূত' দেখুন।

অধিকন্তু জানা উচিত যে, হযরত নবী (আ)-গণের ইজতিহাদী ভুলের অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ্ মাফ করুন, নবী (আ)-গণ হক ছেড়ে বাতিল গ্রহণের পাপ করে বসেছেন। বরং তাঁদের ভুলের অর্থ হলো, কোন সময়ে যদি ভুলক্রমে ভাল এবং উত্তমের পরিবর্তে নিম্নমানেরটা করে বসেন এবং অত্যাবশ্যকীয় কাজের পরিবর্তে ঐচ্ছিক কাজের ওপর আমল করে বসেন। যেমন হযরত দাঊদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস-এর ক্ষেত্রে দাঊদ (আ)-এর কিয়াসের চেয়ে সুলায়মান (আ)-এর কিয়াসকে অগ্রগামী ও উত্তম ঘোষণা করা। যে প্রকাশ্য ওহী সুলায়মান

(আ)-এর কিয়াসকে উত্তম বলেছে, এর অর্থ এ নয় যে, দাঊদ (আ)-এর কিয়াস ভুল ছিল। বরং এর অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহর নিকট সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস দাঊদ (আ)-এর কিয়াসের তুলনায় বেশি উত্তম ও কল্যাণের অধিক নিকটবর্তী ছিল। এ দু' কিয়াসের মধ্যে আল্লাহ্ মাফ করুন, এমন সম্পর্ক ছিল না, যেমন সম্পর্ক হক ও বাতিলের মধ্যে হয়ে থাকে; বরং এমন ছিল, যেমনটি থাকে পূর্ণ ও পরিপূর্ণ, উত্তম এবং সর্বোত্তম, উন্নত ও সর্বোন্নতের মধ্যে। অথবা আবশ্যিক ও ঐচ্ছিকের মধ্যে হয়ে থাকে। হানাফী ফকিহগণ যেরূপ কিয়াসকে কিয়াসে হুল্লী ও কিয়াসে ইসতিহসান—এ দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ হলো দাঊদ (আ) এবং সুলায়মান (আ)-এর কিয়াস। এর অধম (লিখক) নবী (আ)-গণের ইজতিহাদী ভুলের যে অর্থ বর্ণনা করেছে, তা তার কল্পনা ও নিজস্ব ধারণা মনে করুন। সম্মানিত শিক্ষকগণ মূলের প্রতি মনোনিবেশ করুন, এ অধম তো কেবল মুখপাত্র।

মুক্তিপণের পরিমাণ

মুক্তিপণের পরিমাণ সামর্থ্যের ওপর এক হাজার থেকে চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত ছিল। আর যে ব্যক্তি নিঃস্ব ছিল, মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না, তাকে কোন বিনিময় কিংবা পণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়। আর তাদের মধ্যে যারা লিখা জানত, তাদের জন্য এ শর্ত আরোপ করা হলো যে, প্রত্যেকে দশটি করে শিশুকে লিখা শেখানোর পর তারা মুক্তি পাবে। এটাই তাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) এভাবেই লিখা শেখেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৪, প্রথম অংশ; সীরাতে ইবন হিশাম, দ্র. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২)।[১]

বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে আবূ উয্যা আমর ইবন আবদুল্লাহ ইবন উসমানের মুক্তিপণ দেয়ার সামর্থ্য ছিল না। সে নবী (সা)-এর খিদমতে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার জানা আছে যে, আমি অভাবী এবং অনেক পোষ্যের অভিভাবক। কাজেই আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তিনি অনুগ্রহ করলেন এবং কোন পণ ছাড়াই তাকে মুক্তি দিয়ে দিলেন। তবে এ শর্ত আরোপ করলেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে আর কাউকে সাহায্য করতে যেও না। আবূ উযযা এ শর্ত মেনে নিল এবং নবী (সা)-এর প্রশংসা সূচক কিছু কবিতাও আবৃত্তি করল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করল না। উহুদ যুদ্ধে সে কুফরীর কারণে নিহত হয়। অনুরূপভাবে মুত্তালিব ইবন হানতাব ও সাইফী ইবন আবূ রিফাআকেও বিনাপণে মুক্তি দেয়া হয়।[২]

কুরায়শ বাহিনীর বিপর্যস্ত ও পরাজিত হওয়ার সংবাদ যে সময় মক্কায় পৌঁছল, তখন সারা শহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। মক্কায় সর্বপ্রথম গিয়ে পৌঁছে হায়সামান খুযাঈ; লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল : বল, খবর কি ? সে বলল, উতবা ইবন রবী'আ,

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪২।
২ সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ, ৩১।

শায়বা ইবন রবীআ, আবুল হাকাম ইবন হিশাম (অর্থাৎ আবূ জাহল), উমায়্যা ইবন খালফ, যামআ ইবন আসওয়াদ, হাজ্জাজের দু'পুত্র নবীয়া ও মনীয়া এবং কুরায়শের অমুক অমুক সর্দার এরা সবাই নিহত হয়েছে। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা তখন হাতীমে বসা ছিল। সে এসব শুনে বলল, সম্ভবত এ ব্যক্তি পাগল হয়ে গেছে। পরীক্ষাচ্ছলে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ তো সাফওয়ান ইবন উমায়্যা কোথায়। হায়সামান বলল, এই তো সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, হাতীমে বসে আছে। আমি নিজ চোখে তার পিতা ও ভাইকে নিহত হতে দেখেছি।[১]

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আবূ রাফে আমাকে বলেছেন যে, আব্বাসের পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিল, কিন্তু আমরা নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

কুরায়শ বাহিনী যখন বদর যুদ্ধের জন্য বের হল, তখন থেকে আমরা সংবাদের অপেক্ষায় ছিলাম। হায়সামান খুযাঈ যখন এসে কুরায়শ বাহিনীর পরাজিত হওয়ার খবর শোনাল, তখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জয়লাভের খবরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আমি তখন যমযম কূপের ছায়ায় বসে ছিলাম। আমার স্ত্রী উম্মে ফযলও সেখানে ছিল, এমন সময় আবূ লাহাবও এসে পড়ল।

লোকজন আবূ সুফিয়ান[২] ইবন হারিসকে সামনের দিক থেকে আসতে দেখে আবূ লাহাবকে বলল, এই যে আবূ সুফিয়ান, সে বদর থেকে ফিরে এসেছে। আবূ লাহাব আবূ সুফিয়ানকে ডেকে তার পাশে বসাল এবং বদরের অবস্থা জিজ্ঞেস করল। আবূ সুফিয়ান বলল :

والله ماهو الا ان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤ اوياسروننا كيف شاؤ او ايم الله مع ذلك مالمت الناس لقينا رجالا بيضاء بيض على خيل بلق بين السماء والارض والله ما تلقين شيئا ولايقوم لها شيئ ·

"আল্লাহর কসম, কোন খবর নেই, খবর কেবল একটিই, আমরা এক সম্প্রদায়ের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হই আর নিজেদের মাথাগুলো তাদেরকে দিয়ে দেই। যেভাবে ওরা চেয়েছে, সেভাবেই আমাদের প্রতি অস্ত্র চালিয়েছে, আর যেভাবে চেয়েছে, বন্দী করেছে। আল্লাহর কসম, এতদসত্ত্বেও আমি লোকদের ভর্ৎসনা করিনি। আল্লাহর

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩১।

২. আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম আল-হাশিমী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই এবং দুধভাই ছিলেন। তাঁকে এবং একে হযরত হালিমা সাদিয়া (রা) দুধপান করান। ইনি মক্কা বিজয়ের কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রসঙ্গেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস বেহেশতের যুবকদের সর্দার হবে। বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ মক্কা বিজয় অধ্যায়ে আসবে। ইসাবা, হযরত হারিস ইবন সুফিয়ান (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়।

কসম, বিরাটাকৃতির সাদা-কালো ঘোড়ার আরোহী আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলন্ত বিরাট আকৃতির মানুষ আমাদের মুকাবিলা করেছে। আল্লাহর কসম, তারা কোনকিছুই অবশিষ্ট রাখেনি আর তাদের সামনে কিছুই টিকতে পারেনি।"

قال ابو رافع قلت والله تلك الملائكة .

"আবূ রাফে বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম, ওরা ফেরেশতা ছিল।"

এ কথা শোনামাত্র আবূ লাহাব এতটা রাগান্বিত হল যে, আমাকে একটা থাপ্পড় দিল এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে মারার জন্য বুকের ওপর চড়ে বসল। আর আমি ছিলাম দুর্বল শরীরবিশিষ্ট। উম্মে ফযল উঠে এসে একটা কাঠ দিয়ে আবূ লাহাবের মাথায় এত জোরে আঘাত করল যে, মাথা যখম হয়ে গেল। আর বলল, ওর মুরব্বী আব্বাস উপস্থিত ছিল না বলে তুই একে এত দূর্বল ভেবেছিস।

এক সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়নি, আবূ লাহাব গুটি বসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। তার লাশ এতই দুর্গন্ধযুক্ত হল যে, কেউই তার কাছে যেতে পারছিল না। তিনদিন পর লোকলজ্জার ভয়ে তার ছেলেরা একটি গর্ত খুঁড়ে লাশটি লাঠির সাহায্যে গর্তে ফেলে মাটিচাপা দিল।[১] (হায়সামী বলেন, তাবারানী ও বাযযার হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে হুসায়ন ইবন উবায়দুল্লাহ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন যাকে আবূ হাতিম বিশ্বস্ত বলেছেন এবং অন্যরা যঈফ বলেছেন। সনদের অপরাপর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য)।[২]

বলা হয়ে থাকে যে, আবূ লাহাবের যেখানে মৃত্যু ঘটেছে, ঐ স্থান অতিক্রমকালে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিতেন।[৩]

যেমন নবী করীম (সা) সামূদ জাতি ধ্বংস হওয়ার উপত্যকা অতিক্রম করার সময় চেহারা মুবারক কাপড় দিয়ে ঢেকে নিতেন এবং সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকাতেন। এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, আযাবের স্থান অতিক্রমকালে এরূপই করা উচিত। উম্মুল মু'মিনীন (রা) এ সুন্নতের উপরই আমল করতেন।[৪]

কুরায়শগণ যখন নিজেদের আত্মীয় ও আপনজনের নিহত হওয়ার সংবাদ জানতে পেল, তখন শোকে মাতম শুরু করে দিল। একমাসব্যাপী এ মাতম চলতে থাকল। অবশেষে ঘোষণা করলো যে, কেউ যেন আর মাতম না করে। কেননা মুহাম্মদ ও তার সঙ্গীদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছবে, তখন তারা খুবই আনন্দিত হবে। আর মুহাম্মদকে কেউ মুক্তিপণও দেবে না, যাতে তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়।[৫]

---

১. আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এ হাদীসটি ইবন ইসহাক, ইবন সা'দ, ইবন খুযায়মা, হাকিম, বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম বর্ণনা করেছেন। খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৭।

২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ৮৯।

৩. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ৩০৯।

৪. যারকানী, ১খ. পৃ. ২৫২।

৫. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৩।

কিন্তু এ ঘোষণা ও আহ্বান সত্ত্বেও মুত্তালিব ইবন আবূ ওয়াদা কুরায়শদের লুকিয়ে চার হাজার দিরহাম নিয়ে রাতে মদীনায় যাত্রা করে। মদীনায় পৌঁছে তার পিতা ওয়াদাআর মুক্তিপণ দিয়ে পিতাকে মুক্ত করে এবং মক্কায় নিয়ে আসে। এরপর এ ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি পায় এবং লোকজন মুক্তিপণ প্রেরণ করে নিজ নিজ বন্দীদেরকে মুক্ত করে আনে।[১]

ঐ বন্দীদের মধ্যে সুহায়ল ইবন আমরও ছিল। সে ছিল অত্যন্ত চতুর ও শুদ্ধভাষী। জনসমাবেশে নবী (সা)-এর নিন্দাবাদ করত। হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি সুহায়লের নিচের দু'টি দাঁত উপড়ে ফেলি, যাতে তার সামর্থ্যই না থাকে যে, কোন সুযোগে আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওকে ছেড়ে দাও, এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দ্বারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারেন (বায়হাকী তাঁর দালাইলে এবং ইসাবা সুহায়ল ইবন আমর-এর জীবন চরিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। পরবর্তীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি তারই চেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাকে আল্লাহ্ 'ফাতহুম মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলেছেন। সুহায়ল মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইবন হিশামের বর্ণনায় আছে, নবী (সা) হযরত উমর (রা)-এর জবাবে বলেছিলেন : لا أُمَثِّلُ بِهِ فَيُمَثِّلَ اللّٰهُ بِيْ وَاِنْ كُنْتُ نَبِيًّا "আমি কারো অঙ্গচ্ছেদ করি না, আল্লাহ্ না করুন তিনি আমারও অঙ্গচ্ছেদ করতে পারেন, যদিও আমি নবী।"

ঐ বন্দীদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব-এর পুত্র আমরও ছিল। আবূ সুফিয়ানকে বলা হলো, তোমার পুত্রকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আন। আবূ সুফিয়ান জবাব দিল, এমনও হতে পারে যে, আমার লোকও মারা যাবে এবং মুক্তিপণও দেব। আমার এক পুত্র হানযালা তো নিহত হয়েছে, আর দ্বিতীয় পুত্র আমরের মুক্তিপণ দেব ? যতদিন পারে, ওরা কয়েদ করে রাখুক। ইতোমধ্যে সা'দ ইবন নু'মান আনসারী উমরার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে মক্কায় এলেন। আবূ সুফিয়ান নিজ পুত্রের বদলা হিসেবে তাকে আটক করল। আনসারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নবী (সা) আমর ইবন আবূ সুফিয়ানের বিনিময়ে সা'দকে ছাড়িয়ে আনলেন।[২]

ঐ কয়েদীদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামাতা আবুল আস ইবন রবীও ছিলেন। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-এর গর্ভজাত এবং নবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) আবুল আসের স্ত্রী ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন আবুল আসের খালা। তাকে তিনি নিজ সন্তানের মত মনে করতেন। নবূওয়াত লাভের পূর্বে হযরত খাদীজা (রা) নিজেই নবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে আবুল আসের সাথে হযরত যয়নবকে বিয়ে দেন। আবুল আস ছিলেন ধনী, বিশ্বস্ত ও বড় ব্যবসায়ী। নবূওয়াত

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ২৭।

২. প্রাগুক্ত।

সালের পর হযরত খাদীজা এবং তাঁর কন্যাগণ সবাই ঈমান আনলেও আবুল আস শিরকের ওপরই অবিচল থাকেন।

কুরায়শগণ আবুল আসকে অনেক চাপ দেয় যে, আবূ লাহাবের পুত্রদের মত তুমিও মুহাম্মদের মেয়েকে তালাক দাও। তুমি যেখানে চাইবে, সেখানেই আমরা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। কিন্তু আবুল আস পরিষ্কার অস্বীকার করেন এবং বলে দেন যে, যয়নবের মত সম্ভ্রান্ত মহিলার বিপরীতে আমি দুনিয়ার কোন মেয়েকেই পসন্দ করি না।

কুরায়শগণ যখন বদর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করে, তখন রাসূল-জামাতা আবুল আসও তাদের সহগামী হন এবং অন্যান্য বন্দীদের সাথে তিনিও বন্দী হন। মক্কাবাসী যখন নিজ নিজ বন্দীদের মুক্ত করার জন্য মুক্তিপণ প্রেরণ করতে থাকে, তখন যয়নব (রা)-ও তাঁর স্বামী আবুল আসকে মুক্ত করার জন্য ঐ হারটি প্রেরণ করেন, যা তাঁদের বিয়ের সময় হযরত খাদীজা (রা) তাঁকে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এ হারটি দেখে ব্যথিত হলেন এবং সাহাবীগণকে বললেন, তোমরা ভাল মনে করলে এ হারটি ফিরিয়ে দাও এবং ঐ বন্দীকেও ছেড়ে দাও।

তৎক্ষণাৎ সাহাবীগণ তা মঞ্জুর করেন এবং কয়েদীকে ছেড়ে দেয়া হয় ও হারও ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আবুল আস থেকে এ ওয়াদা নেন যে, মক্কায় পৌঁছে তিনি হযরত যয়নবকে মদীনায় পৌঁছিয়ে দেবেন। আবুল আস মক্কায় পৌঁছে হযরত যয়নবকে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দেন এবং আপন ভাই কিনানা ইবন রবীকে তাঁর সাথে দেন।

কিনান ভরদুপুরে হযরত যয়নবকে উটে আরোহণ করায়, নিজ হাতে তীর-ধনুক নিয়ে নেয় এবং যাত্রা শুরু করে। নবী (সা)-এর কন্যার ন্যায় উচ্চ মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্বের মক্কা থেকে চলে যাওয়া কুরায়শদের কাছে লজ্জাকর মনে হলো। কাজেই আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্যরা যী-তুয়ায় এসে উটের গতি রোধ করল এবং বলল, মুহাম্মদ-এর কন্যার চলে যাওয়ায় আমাদের আপত্তি নেই, তবে এভাবে প্রকাশ্য দিবালোকে চলে যাওয়া আমাদের জন্য অপমানকর। উত্তম হবে, তুমি এখন মক্কায় ফিরে চল এবং রাতের বেলা তাকে নিয়ে চলে যেও। কিনানা এ পরামর্শ গ্রহণ করল। আবূ সুফিয়ানের পূর্বে হাব্বার ইবন আসওয়াদ (যিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন) গিয়ে উটের গতি রোধ করে এবং হযরত যয়নবকে ভয় দেখায়। ভয়ে হযরত যয়নবের গর্ভপাত ঘটে যায়। ঐ সময় কিনানা তার তীর-ধনুক ঠিক করে নেয় এবং বলে, যে ব্যক্তিই উটের নিকটবর্তী হবে, তাকে চালুনীর মত ঝাঁঝরা করে ফেলব। অতঃপর কিনানা মক্কায় ফিরে আসে এবং দু'-তিন রাত পর একদা রাতের বেলা মদীনা রওয়ানা হয়।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) এবং অপর এক আনসারী সাহাবীকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা বাতনে ইয়াজ্জে অপেক্ষা করবে এবং যখন যয়নব আসবে, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

এঁরা বাতনে ইয়াজ্জে পৌঁছেন আর ওদিকে কিনানা ইবন রবী এসে মিলিত হয়। কিনানা সেখান থেকেই ফিরে যায় এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা ও তাঁর সঙ্গী হযরত যয়নবকে নিয়ে মদীনায় যাত্রা করেন। বদর যুদ্ধের একমাস পর তাঁরা মদীনায় পৌঁছেন।

নবীদুহিতা নবীজীর কাছে অবস্থান করেন এবং আবুল আস মক্কায়ই বাস করতে থাকে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। যেহেতু তার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার ওপর মক্কাবাসীর আস্থা ছিল, সুতরাং অন্যান্য লোকের পণ্যও তার বাণিজ্যে শামিল হয়।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুসলমানদের একটি বাহিনীর সাথে সাক্ষাত হয়। তারা তার সকল মাল-মাত্তা, বাণিজ্য সম্ভার আটক করে। আবুল আস চুপিসারে মদীনায় হযরত যয়নবের নিকট এসে উপস্থিত হন।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ফজরের নামাযের জন্য আগমন করেন, তখন হযরত যয়নব (রা) মহিলা চত্বর থেকে আওয়াজ দেন, ওহে লোক সকল! আমি আবুল আস ইবন রবীকে আশ্রয় দিয়েছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নামায শেষ করলেন, তখন লোকজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

اَيُّهَا النَّاسُ هَلْ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ قَالُوا نَعَمْ - قَالَ مَا وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهٖ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمْ اَنَّهٗ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَدْنَاهُمْ ·

“ওহে লোক সকল! যা আমি শুনেছি, তা কি তোমরাও শুনেছ ? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যাঁর পবিত্র হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ ব্যাপারে আমার পূর্বে কিছুই জানা ছিল না, যা এবং যখন তোমরা শুনলে, আমিও তখনই শুনেছি। তবে খুব ভাল করে জেনে রাখ, মুসলমানদের মধ্যে ছোট থেকে ছোট এবং নিম্ন থেকে নিম্ন কোন ব্যক্তিও যে কাউকে আশ্রয় দিতে পারে।”

এ কথা বলে তিনি স্বীয় কন্যার ঘরে গেলেন এবং বললেন, ওহে কন্যা, ওকে সম্মান কর কিন্তু ওর সাথে মিলিত হয়ো না, কেননা তুমি তার জন্য বৈধ নও। অর্থাৎ তুমি মুসলমান আর সে মুশরিক ও কাফির। এছাড়া সেনাদলকে বললেন, আমাদের সাথে এ ব্যক্তির (আবুল আসের) সম্পর্ক কি, তা তোমাদের জানা। যদি তোমরা উপযুক্ত মনে কর, তা হলে তার মাল তাকে ফেরত দাও। অন্যথায় তা দান কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রদান করেছেন এবং তোমরা এর হকদার।

এ কথা শোনামাত্র সাহাবিগণ সমুদয় মাল ফেরত দিয়ে দিলেন। কেউ বালতি নিয়ে আসছিলেন, কেউ রশি, কেউ লোটা আর কেউ চামড়ার টুকরা। মোট কথা, সমুদয় মালই তারা পাই পাই ফেরত দিলেন।

আবুল আস সমুদয় মাল নিয়ে মক্কায় এলেন এবং যার যা অংশ ছিল, তা পুরোপুরি দিয়ে দিলেন। যখন অংশীদারের অংশ দিয়ে দিলেন, তখন বললেন :

يا معشر قريش هل بقى لاحد منكم عندى مال ياخذه قالو الافجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما - قال فاذا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله والله ما منعنى مت الاسلام عنده الا تخوف ان اكل اموالكم فلما اداها الله اليكم وفرغت منها اسلمت .

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়! কারো কোন মালের অংশ কি বাকী রয়েছে যা আমার থেকে গ্রহণ করনি ? কুরায়শগণ বলল, না, আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। অবশ্যই আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত হিসেবে পেয়েছি। তিনি বললেন, এরপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ যাবত আমি কেবল এজন্যে মুসলমান হইনি যে, লোকজন ধারণা করতে পারে, আমি তাদের মালামাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে এমনটি করেছি। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মালামাল তোমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন এবং আমি এ যিম্মা থেকে মুক্ত হয়েছি, তখন মুসলমান হলাম।"

এরপর আবুল আস মদীনায় চলে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যয়নবকে তার স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে দেন।[১]

কিছু কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, প্রথম বিয়েই যথেষ্ট মনে করা হয়, নতুন করে কোন বিয়ে হয়নি। আর কতিপয় বর্ণনায় এর বিপরীত পাওয়া যায়, অর্থাৎ পুনরায় বিয়ে হয়েছে। আর ফকীহগণের কাছে এ বর্ণনাই বিশুদ্ধ। কেননা যদি প্রথম বিয়েই যথেষ্ট হতো, তা হলে তিনি স্বীয় কন্যাকে বলতেন না যে, তুমি তার জন্য বৈধ নও।

ঐ বন্দীদের দলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাসও ছিলেন, যাকে কা'ব ইবন আমর ইবন লুবাবা (রা) গ্রেফতার করেছিলেন। হযরত আব্বাস ছিলেন শক্তিশালী ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী আর আবুল ইয়াসির (রা) ছিলেন খর্বকায়, দুর্বল ও ক্ষীণদেহী। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওহে আবুল ইয়াসির! তুমি কিভাবে আব্বাসকে গ্রেফতার করলে ?

আবুল ইয়াসির (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জনৈক ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করেছেন, যাকে আমি পূর্বে কখনো দেখিনি, আর পরেও নয়। তার আকার-আকৃতি এমন এমন ধরনের ছিল। তিনি বললেন : لقد اعانك عليه ملك كريم "নিশ্চয়ই একজন সম্মানিত ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।"

আর 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' হযরত আলী (রা) থেকে এবং এছাড়া বিভিন্ন সনদেও এটি বর্ণিত হয়েছে। 'মু'জামে তাবারানী'তে স্বয়ং হযরত ইয়াসির (রা) থেকে এবং 'মুসনাদে আহমদে' হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ২৮।

'ফাতহুল বারী'তে شهود الملائكة ببدر অধ্যায়ের পর হাফিয হায়সামী বলেছেন. হাদীসটি আহমদ ও বাযযার বর্ণনা করেছেন। হারিসা ইবন মুযরাব ছাড়া তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য; তবে 'মাজমুয়াউয যাওয়াইদে'র বদর যুদ্ধ অধ্যায়ে তাকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে।

হযরত আব্বাসের বাঁধন কিছুটা শক্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আব্বাসের আওয়াজ শুনলেন, তাঁর নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। আনসারিগণ তা জানতে পেরে তাঁকে বাঁধনমুক্ত করে দিলেন। অধিকন্তু আরয করলেন, নবী (সা) যদি অনুমতি দেন তাহলে আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে[১] মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দেই ? তিনি জবাব দিলেন : والله لا تذرن منه درهما "আল্লাহর কসম, তার থেকে এক দিরহামও ছেড়ো না।"

হযরত আব্বাসের কাছে যখন মুক্তিপণ চাওয়া হলো, তখন তিনি তা পরিশোধে অপারগতা প্রকাশ করলেন। নবী (সা) বললেন, আচ্ছা ঐ মাল কোথায় যা আপনি এবং আপনার স্ত্রী উম্মে ফযল মিলে পুঁতে রেখেছিলেন ?

এ কথা শোনামাত্র হযরত আব্বাস বলে উঠলেন, নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। আমি এবং উম্মে ফযল ছাড়া ঐ মালের সংবাদ কারোই জানা ছিল না। হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ (মুস্তাদরাক, হযরত আব্বাসের জীবন চরিত)। দালাইলে আবূ নুয়াইমে হাসান সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাসের জন্য একশ' উকিয়্যা এবং ফযল ইবন আব্বাসের জন্য আশি উকিয়্যা[২] মুক্তিপণ ধার্য করেন (সমস্ত বন্দীর মধ্যে হযরত আব্বাসের মুক্তিপণ ছিল সবচে' বেশি)।

হযরত আব্বাস আরয করলেন, আপনার নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে কি আমার মুক্তিপণ এত বেশি ধার্য করলেন ? (অর্থাৎ আত্মীয়তার দাবি তো এটাই ছিল যে, আমার মুক্তিপণে কিছুটা ছাড় দেয়া, কিন্তু ছাড় দেয়ার পরিবর্তে আপনি আমার মুক্তিপণ সব থেকে বেশি ধার্য করলেন)। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِمَنْ فِىْ اَيْدِيْكُمْ مِّنَ الْاَسْرٰى اِنْ يَّعْلَمِ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُّؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا اُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

১. আনসারিগণ হযরত আব্বাসকে তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র এজন্যে বলেছিল যে, হযরত আব্বাসের দাদী আবদুল মুত্তালিবের মাতা আনসারীদের মধ্য থেকে ছিলেন (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৮)। আর ভ্রাতুষ্পুত্র বলার মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, তাকে মুক্তিপণ থেকে অব্যাহতি দান করার অনুগ্রহের হক আমাদের ওপর বর্তায়, নবী (সা)-এর প্রতি নয়। এজন্যে যে, আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র হওয়ার কারণে আমরা তার মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে চাই, নবী (সা)-এর চাচা হওয়ার সুবাদে নয়। এটা আনসারীগণের মহানুভবতা ও সদাচরণের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

২ চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়্যা হয়।

"হে নবী, তোমাদের করায়ত্ত যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ্ যদি তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে তোমাদের নিকট থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে উত্তম কিছু তিনি তোমাদেরকে দান করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আনফাল : ৭০)

হযরত আব্বাস (রা) পরবর্তীতে বলতেন, যদি তখন আমার থেকে দ্বিগুণ হারে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হতো, তবে সেটাই ভাল ছিল ![১] আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে যা নিয়েছেন, তার থেকে উত্তম ও অতিরিক্ত আমাকে দিয়েছেন। একশ' উকিয়্যার পরিবর্তে তিনি আমাকে একশ' গোলাম দান করেছেন, যাদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা দুনিয়াতেই পূরা করেছেন। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্ষমা করার ওয়াদা, যার আমি প্রত্যাশী।[২]

এ অধম (গ্রন্থকার) বলে (আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন), আল্লাহর দ্বিতীয় ওয়াদাও অবশ্যই পূর্ণ হবে। انَّ اللّٰهَ لَايُخْلِفُ الْمِيْعَاد "নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।" আর এ বাক্য কেবল বরকত লাভের জন্য বলছি, সম্পৃক্ততার জন্য নয়।

বদরের বন্দীদের মধ্যে নওফেল ইবন হারিসও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন তাকে মুক্তিপণ দিতে বললেন, তখন সে বলল, আমার কাছে এমন কিছুই নেই, যা দিয়ে মুক্তিপণ দিতে পারি।

তিনি বললেন, ঐ বর্শাগুলো কোথায়, যা তুমি জেদ্দায় ছেড়ে এসেছ ? নওফেল বলল, আল্লাহর কসম, কেবল আল্লাহ ব্যতীত আমি ছাড়া আর কেউই এটা জানত না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। নওফেল (রা) ঐ বর্শাগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেন, যার সংখ্যা ছিল এক হাজার। নবী (সা) হযরত আব্বাস এবং হযরত নওফেলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বেঁধে দেন। আর জাহিলী যুগেও এঁরা দু'জন পরস্পর বন্ধু এবং বাণিজ্যের অংশীদার ছিলেন। (মুস্তাদরাক, নওফেল ইবন হারিসের জীবন চরিত)।

উমায়র ইবন ওহাব ছিল ইসলামের চরমতম দুশমনদের একজন। মক্কায় অবস্থানকালে সে রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবীগণকে চরম কষ্ট দিত। বন্দীদের মধ্যে তার পুত্র ওহাব ইবন উমায়রও ছিল।

একদিন ওহাব ইবন উমায়র এবং সাফওয়ান ইবন উমায়্যা হাতিমে উপবিষ্ট ছিল। সাফওয়ান বদর যুদ্ধে নিহতদের স্মরণ করে বলল, এখন আর জীবনের কোন স্বাদই নেই। উমায়র বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, কুরায়শ নেতাদের নিহত হওয়ার পর বাস্তবে জীবনের স্বাদই চলে যাচ্ছে। যদি আমার ধার-দেনা এবং সন্তানদের চিন্তা না থাকত, তা হলে এখনই গিয়ে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করে আসতাম। এতে সাফওয়ান খুবই খুশি হল এবং বলল, তোমার দায়-দেনা এবং সন্তান-সন্তুতির দেখাশোনার ভার

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৪৮।

২. দুররে মানসূর, ৩খ. পৃ. ২০৪।

আমার যিম্মায় রইল। সাফওয়ান তখনই তরবারিতে ধার দিল এবং তাতে বিষ মাখিয়ে উমায়রকে দিয়ে দিল। উমায়র মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হলো এবং মসজিদে নববীর দরজায় গিয়ে উটকে বসিয়ে দিল।

হযরত উমর (রা) উমায়রকে দেখামাত্র বুঝে ফেললেন, এ কোন অপবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর (রা) তার তরবারির খাপ ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে পাকড়াও করে নবী (সা)-এর সামনে হাযির করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। আর উমায়রকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছ ? উমায়র বলল, আমাদের বন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। তিনি বললেন, সত্যি করে বল, তুমি কি কেবল এ উদ্দেশ্যেই এসেছ ? সত্যি করে বল দেখি, তুমি এবং সাফওয়ান হাতিমে বসে কি পরামর্শ করেছিলে ? উমায়র ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি আবার কি পরামর্শ করেছিলাম ! তিনি বললেন, তুমি এ শর্তে আমাকে হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলে যে, সাফওয়ান তোমার সন্তান-সন্তুতির দেখাশোনা করবে এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দিবে। উমায়র বলল :

اشهد انك رسول الله - ان هذا الحديث كان بيني وبين صفوان فى الحجر لم يطلع عليه احد غيرى وغيره فاخبرك به فامنت بالله ورسوله ٠

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। এ ঘটনা তো সাফওয়ান ও আমি ছাড়া আর কেউই জানত না, কাজেই আল্লাহই আপনাকে এ খবর দিয়েছেন। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।"

'মুজামে তাবারানী'তে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে এবং 'দালাইলে বায়হাকী' ও 'দালাইলে আবূ নুয়াইমে' মুরসাল সনদে এটি বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে আছে যে, উমায়র বলেছিল :

والله انى لاعلم ما اتاك به الا الله فالحمد لله الذى هدانى للاسلام وساقنى هذالمساق ثم تشهد ٠

"আল্লাহর কসম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ ছাড়া কেউই আপনাকে এ ঘটনার সংবাদ দেয় নি; সুতরাং আমি সেই আল্লাহর শোকর করছি, যিনি আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং এখানে টেনে এনেছেন। এরপর উমায়র কালেমা শাহাদত পাঠ করেন।"

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের ভাইকে দীন বুঝাও, কুরআন পাঠ করাও এবং তার বন্দীদের ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে বন্দীদেরকে উমায়র (রা)-এর কাছে সমর্পণ করা হলো।

উমায়র (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আল্লাহর নূর নিভিয়ে দেয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি এবং যাঁরা আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের দীন গ্রহণ করেছিলেন

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০৮।

তাদেরকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমাকে এখন অনুমতি দিন, মক্কায় ফিরে গিয়ে আমি লোকদের আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পথে আহ্বান করি এবং ইসলামের দাওয়াত দিই, সম্ভবত আল্লাহ ওদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন এবং আল্লাহর দুশমনদেরকে নির্যাতন করি, যেমন ইতোপূর্বে আল্লাহর বন্ধুদের নির্যাতন করেছি। নবী (সা) তাকে অনুমতি দান করেন।

উমায়র যখন মদীনায় যাত্রা করেন, তখন সাফওয়ান ইবন উমায়্যা লোকদের বলে বেড়াচ্ছিল, লোক সকল, কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুসংবাদ দেব যা তোমাদেরকে বদরের দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। আর সে সকল স্থানীয় অধিবাসী ও বহিরাগতকে উমায়রের খবর জিজ্ঞেস করে আসছিল। এমনকি উমায়রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদও এসে গেল। সাফওয়ান এ সংবাদ শোনামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এবং শপথ করল যে, আল্লাহর কসম, উমায়রের সাথে কোন কথাই বলব না, আর তার কোন উপকারও করব না। উমায়র মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর মাধ্যমে অনেক লোক মুসলমান হলো। আর যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের দুশমন ছিল, তাদেরকে তিনি যথেষ্ট নির্যাতন করলেন।

প্রথম ঈদের নামায

বদর থেকে ফিরে আসার পর পয়লা শাওয়াল নবী ঈদের নামায আদায় করেন। এটা ছিল প্রথম ঈদুল ফিতরের নামায (যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৪)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা

হযরত আলী (ক) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা)-এর ঘটনায় (বিস্তারিত ঘটনা ইনশা আল্লাহ সামনে আসবে) হযরত উমর (রা)-কে সম্বোধন করে বলেন :

لعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعلموا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ٠

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি সুনজর[১] দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, তোমরা যা খুশি কর, জান্নাত তোমাদের জন্য অবধারিত রয়েছে।" (বুখারী শরীফ, فضل من شهد بدر অধ্যায়)।

আল্লাহ ক্ষমা করুন, اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ (যা খুশি কর) আয়াত দ্বারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে গুনাহের কাজের অনুমতি দান করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁদের সত্য পরায়ণতা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার দরবারে বদরে অংশগ্রহণকারীদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, ভালবাসা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী

---

১. মুসনাদে আহমদ, সুনানু আবূ দাঊদ এবং মুসান্নাফে ইবন আবূ শায়বায় لعل الله اطلع পরিবর্তে ان الله اطلع على اهل بدرا বাক্য এর সাথে বর্ণনায় এসেছে। এ জন্যে অর্থ করতে গিয়ে 'অবশ্য' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩৭।

গৃহীত হয়েছিল। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ভালবাসা এবং আনুগত্য থেকে তাঁদের পদস্খলন ঘটেনি, তাঁদের অন্তর ছিল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মহব্বত ও আনুগত্যে আপ্লুত। পাপ ও অবাধ্যতার কোন অবকাশই তাঁদের অন্তরে ছিল না। মানুষ হিসেবে স্বভাবজাত কোন পাপ ঘটে গেলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে প্রত্যাবর্তন করতেন। মোট কথা, বদরে অংশগ্রহণকারিগণ যা কিছুই করুন না কেন, জান্নাত তাঁদের উপর ওয়াজিব হয়ে আছে। আনুগত্য করলে তো জান্নাত অবশ্যম্ভাবী, আর মানবীয় প্রবৃত্তির দরুন কোন পাপকাজ করে বসলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা, ইস্তিগফার, অনুশোচনা ও কান্নাকাটি করবেন, যদ্দরুন তাঁদের জন্য ক্ষমা ও জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। বরং আশ্চর্য নয় যে, এতে তাঁদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পাবে, যেমন হযরত আদম (আ)-এর তাওবার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। (বিস্তারিতের জন্য মাদারিজুস সালিকীন দেখুন)।

আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ -এর সম্বোধন ঐ মহাত্মাগণের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, যাঁদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা, প্রভাব, ভয়-ভীতি, আকর্ষণ ও শংকায় প্রভাবিত। আর জান্নাতের সুসংবাদ তাঁদেরকেই দেয়া হয়, যাঁরা সব সময় অন্তরে নিফাকের আশঙ্কায় শংকিত থাকেন। (হাফিয ইবন কাইয়্যেম তাঁর আল-ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন, এটাই তার সার- সংক্ষেপ)।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "যে ব্যক্তি বদরে অংশগ্রহণ করেছে, সে কখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" (হাদীসটি মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। ফাতহুল বারী, فضل من شهد بدر অধ্যায়)।

হযরত রিফাআ রাফে (রা) বলেন, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের কেমন মনে করেন ? তিনি বললেন, সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ও উত্তম। জিবরাঈল (আ) বললেন, অনুরূপভাবে ঐ ফেরেশতাগণ, যাঁরা বদরে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সমস্ত ফিরিশতা অপেক্ষা মর্যাদাশীল ও উত্তম। (সহীহ বুখারী, شهود الملائكة بدرا অধ্যায়)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত সাহাবী (রা)-এর সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, যার মধ্যে তিনশ' তের সংখ্যাটি প্রসিদ্ধ।

সন্দেহ ও মতভেদের কারণে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস এ সমুদয় মতবাদকে একত্র করে তিনশ' তেষট্টি নাম উল্লেখ করেছেন যাতে কোন মতামতের ভিত্তিতে কারো নাম বাদ পড়ে না যায়। সাবধানতা বশত তিনি এর সবগুলো উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিনশ' তেষট্টিজন। মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে বাযযার এবং মুজামে তাবারানীতে

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল তিনশ' তেরজন।

হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন কিছুদূর গিয়ে সাহাবিগণকে গণনা করার নির্দেশ দেন। গণনা করার পর দেখা গেল এ সংখ্যা ছিল তিনশ' চৌদ্দ। তিনি বললেন, পুনরায় গণনা কর । দ্বিতীয়বার গণনাকালে দেখা গেল, দূর থেকে একটি কৃশ উটে সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি আসছে। তাকে নিয়ে তিনশ' পনেরজন হল। (বায়হাকী কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত)

বর্ণনা এ তিনটি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বর্ণনা একইরূপ। কেননা যদি ঐ শেষে আগত ব্যক্তি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গণনায় শামিল করা হয়, তা হলে এ সংখ্যা ছিল তিনশ' পনর, আর যদি ঐ ব্যক্তি এবং নবী করীম (সা)-কে সাহাবীগণের সাথে গণনা করা না হয়, তা হলে এ সংখ্যা তিনশ' তের ছিল। এ সফরে কিছু সংখ্যক অল্প বয়স্ক বালকও তাঁদের সঙ্গী হয়েছিল, যেমন হযরত বারা ইবন আযিব, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আনাস ইবন মালিক, জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) প্রমুখ, কিন্তু তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি।

যদি এ অল্পবয়স্ক বালকদেরও গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তা হলে এ সংখ্যা তিনশ' উনিশ হয়ে যায়। যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল তিনশ' উনিশ।

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, বদরের দিন আমাকে এবং ইবন উমরকে ছোট মনে করা হয়। ঐ দিন মুহাজির ছিলেন ষাটের কিছু বেশি এবং আনসার ছিলেন দু'শো চল্লিশের কিছু বেশি। (বুখারী)

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) বলেন, আমরা বলতাম বদরে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা তিনশ' দশের কিছু বেশি ছিল, তালূতের সাথে যাঁরা নহর অতিক্রম করেছিলেন, তাঁদের সমসংখ্যক। আর আল্লাহর কসম, নহর তাঁরাই পার হয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন পাক্কা মুমিন এবং নিষ্ঠাবান। (বুখারী)

এ সমুদয় বর্ণনা ফাতহুল বারীতে عدة اصحاب بدر। অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।[১]

আল্লামা সুহায়লী বলেন, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সহায়তার জন্য সত্তরজন জিন্নও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আট ব্যক্তি এমন ছিলেন, যাঁরা কোন কারণবশত বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদেরকে বদরে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে গণনা করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে গনীমতের মালের অংশ দিয়েছেন। (তাঁরা ছিলেন) :

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২২৬।

১. হযরত উসমান ইবন আফফান (রা), হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর পরিচর্যার জন্য রাসূল (সা) তাঁকে মদীনায় রেখে যান।

২-৩. হযরত তালহা এবং হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা), এ দু'জনকে রাসূলুল্লাহ (সা) গোপনে কুরায়শ কাফেলার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।

৪. হযরত আবূ লুবাবা আনসারী (রা), যাঁকে নবী (সা) রুমা নামক স্থান থেকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করে মদীনায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

৫. হযরত আসিম ইবন আদী (রা), যাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার উচ্চাংশের তত্ত্বাবধানের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা), বনী আমর ইবন আউফ থেকে নবী (সা)-এর কাছে কোন গোপন সংবাদ পৌঁছেছিল, এ জন্যে তিনি হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা)-কে বনী আমর ইবন আউফের প্রতি প্রেরণ করেন।

৭. হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা), আঘাত পাওয়ায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) রাওহা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

৮. হযরত খাওয়াত ইবন জুবায়র (রা), পায়ের গোছায় আঘাত পাওয়ায় তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা) সাফরা নামক স্থান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। মুস্তাদরাকে হাকিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জাফর (রা)-কেও অংশ দেন, যিনি সে সময় আবিসিনিয়ায় অবস্থান করছিলেন। আরো বলা হয় যে, হযরত সা'দ ইবন মালিক, অর্থাৎ হযরত সাহল (রা)-এর পিতা পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন এবং হুজ্জার মুক্ত দাস হযরত সুবাইহ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়ার দরুন তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১]

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

হাদীসের ইমাম ও সীরাত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন কিন্তু সর্ব প্রথম ইমাম বুখারী (র)-ই আরবী বর্ণমালা অনুসারে ধারাবাহিকভাবে এ নামসমূহ সন্নিবেশ করেন। আর তিনি বদরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র চুয়াল্লিশজনের নাম তাঁর জামে সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর সহীহ হওয়ার শর্ত ও সনদ অনুযায়ী ছিল।[২]

আল্লামা যারকানী (র) বলেন, আমরা হাদীসের শায়খগণ থেকে শুনেছি যে, সহীহ বুখারীতে উল্লিখিত বদরের সাহাবীগণের নাম উল্লেখকালে দু'আ কবূল হয়ে থাকে, এ পরীক্ষা বার বার করা হয়েছে।[৩]

১. যারকানী, ১খ., পৃ. ৪০৯।
২ ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ২৫।
৩. যুরকানী, ১খ., পৃ. ৪০৯।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুহাজির সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

মুহাজির শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বদরী, সমগ্র সৃষ্টির সেরা, নবী ও রাসূলগণের ধারা সমাপ্তকারী, আমাদের নেতা ও সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তাঁর প্রতি, তাঁর সঙ্গী-সাথী ও আহলে বায়তের প্রতি শেষ দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
২. হযরত আবূ হাফস উমর ইবন খাত্তাব (রা),
৩. হযরত আবূ আবদুল্লাহ উসমান ইবন আফফান (রা)
৪. হযরত আবুল হাসান আলী ইবন আবূ তালিব (রা),
৫. হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা),
৬. হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা),
৭. রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস হযরত আনসা হাবশী (রা),
৮. রাসূল (সা)-এর মুক্ত দাস হযরত আবূ কাবশা ফারিসী (রা),
৯. হযরত আবূ মারসাদ কান্নায ইবন হিসন (রা)
১০. কান্নায ইবন হিসনের পুত্র মারসাদ ইবন আবূ মারসাদ (রা)
১১. হযরত উবায়দা ইবন হারিস (রা), এবং তাঁর দুই ভাই,
১২. হযরত তুফায়ল ইবন হারিস (রা) ও
১৩. হযরত হুসায়ন ইবন হারিস (রা),
১৪. হযরত মিসতাহ আউফ ইবন উসাসা (রা),
১৫. হযরত আবূ হুযায়ফা উতবা ইবন রবীয়া (রা),
১৬. আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালিম (রা),
১৭. আবুল আস উমায়্যার মুক্ত দাস হযরত সুবাইহ (রা),
১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহহাশ (রা),
১৯. হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা),
২০. হযরত শুজা' ইবন ওহাব (রা) ও তাঁর ভাই
২১. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা),
২২. হযরত ইয়াযীদ ইবন রাকিশ (রা),
২৩. হযরত আবূ সিনান ইবন মিহসান (রা), অর্থাৎ উক্কাশা ইবন মিহসানের ভাই,
২৪. হযরত সিনান ইবন আবূ সিনান (রা), আবূ সিনান ইবন মিহসানের পুত্র ও উক্কাশার ভ্রাতুষ্পুত্র,
২৫. হযরত মিহরায ইবন নাযলা (রা),
২৬. হযরত রবীয়া ইবন আকতাম (রা),
২৭. হযরত সাকাফ ইবন আমর (রা), তাঁর দুভাই[১]

---

১. ইনি হযরত উতবা ইবন গাযওয়ানের মুক্ত দাস ছিলেন। প্রথম পর্যায়ের মুসলমান হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)-এর সাথে কেবল নামেই মিল আছে। কিন্তু ইনি অপর ব্যক্তি।

২৮. হযরত মালিক ইবন আমর (রা),
২৯. হযরত মুদলিজ ইবন আমর (রা),
৩০. হযরত সুয়ায়দ ইবন মাখশী (রা),
৩১. হযরত উতবা ইবন গাযওয়ান (রা),
৩২. উতবা ইবন গাযওয়ানের মুক্ত দাস হযরত জান্নাব (রা),
৩৩. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা),
৩৪. হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা),
৩৫. হাতিব ইবন আবূ বালতাআর মুক্ত দাস হযরত সা'দ কালবী (রা),
৩৬. হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা),
৩৭. হযরত সুয়ায়নিত ইবন সা'দ (রা),
৩৮. হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা),
৩৯. হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা), ও তাঁর ভাই,
৪০. হযরত উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),
৪১. হযরত মিকদাদ ইবন আমর (রা),
৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা),
৪৩. হযরত মাসউদ ইবন রবীয়াহ (রা),
৪৪. হযরত যু-শামালাইন ইবন আবদে আমর (রা),
৪৫. হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা),
৪৬. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্ত দাস হযরত বিলাল ইবন রাবাহ (রা),
৪৭. হযরত আমির ইবন ফুহায়রাহ (রা),
৪৮. হযরত সুহায়ব ইবন সিনান (রা),
৪৯. হযরত তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা),
৫০. হযরত আবূ সালমা ইবন আবদুল আসাদ(রা),
৫১. হযরত শাম্মাশ ইবন উসমান (রা),
৫২. হযরত আরকাম ইবন আবূ আরকাম (রা),
৫৩. হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা),
৫৪. হযরত মাতাব ইবন আউফ (রা),
৫৫. হযরত যায়দ ইবন খাত্তাব (রা), হযরত উমর ইবন খাত্তাবের ভাই,
৫৬. হযরত মাহজা (রা), হযরত উমর ইবন খাত্তাবের মুক্ত দাস,
৫৭. হযরত আমর ইবন সুরাকা (রা), ও তাঁর ভাই,
৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুরাকা (রা),
৫৯. হযরত ওয়াকিদ ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৬০. হযরত খাওলা ইবন আবূ খাওলা (রা),
৬১. হযরত মালিক ইবন আবূ খাওলা (রা),

৬২. হযরত আমির ইবন রবিয়াহ (রা),
৬৩. হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা),
৬৪. হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা),
৬৫. হযরত খালিদ ইবন বুকায়র (রা),
৬৬. হযরত আয়াস ইবন বুকায়র (রা),
৬৭. হযরত সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফায়ল (রা),
৬৮. হযরত উসমান ইবন মাযঊন জুমাহী (রা),
৬৯. হযরত সাইব ইবন উসমান (রা),
৭০. হযরত কুদামা ইবন মাযঊন (রা),
৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাযঊন (রা),
৭২. হযরত মা'মার ইবন হারিস (রা),
৭৩. হযরত খুনায়স ইবন খুরাফা (রা),
৭৪. হযরত আবূ সাবরা ইবন রাহম (রা),
৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাখরামা (রা),
৭৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সুহায়ল ইবন আমর (রা),
৭৭. হযরত সুহায়ল ইবন আমরের মুক্তদাস হযরত উমায়র ইবন আউফ (রা),
৭৮. হযরত সা'দ ইবন খাওলা (রা),
৭৯. হযরত আবূ উবায়দা আমির ইবন জাররাহ (রা),
৮০. হযরত আমর ইবন হারিস (রা),
৮১. হযরত সুহায়ল[১] ইবন ওহাব (রা), ও তাঁর ভাই
৮২. হযরত সাফওয়ান ইবন ওহাব (রা),
৮৩. হযরত আমর ইবন আবূ সারাহ (রা),
৮৪. হযরত ওহাব[২] ইবন সা'দ (রা),
৮৫. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা),
৮৬. হযরত ইয়ায ইবন আবূ যুহায়র (রা)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আনসার সাহাবী (রা)-গণের নামের বর্ণনা

১. হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ও তাঁর ভাই
২. হযরত আমর ইবন মু'আয (রা),
৩. হযরত হারিস ইবন আওস ইবন মু'আয (রা) অর্থাৎ হযরত সা'দ ইবন মু'আযের ভ্রাতুষ্পুত্র,

---

১. সুহায়ল এভং সাফওয়ানের পিতার নাম ওহাব এবং মাতার নাম বায়যা। এঁরা বায়যার পুত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

২ ইবন হিশাম বলেন, এঁরা তিনজন, ইবন ইসহাকও তিনই বলেছেন। এছাড়া অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই বলেছেন, এঁরা তিনজনই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শুমার করেছেন।–সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৩২–৩৯।

৪. হযরত হারিস ইবন আনাস (রা),
৫. হযরত সা'দ ইবন যায়দ (রা),
৬. হযরত সালমা ইবন সালমা ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৭. হযরত আব্বাদ ইবন বিশর ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৮. হযরত সালমা ইবন সাবিত ইবন ওয়াক্কাশ (রা),
৯. হযরত রাফি ইবন ইয়াযীদ (রা),
১০. হযরত হারিস ইবন খুযামা (রা),
১১. হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা),
১২. হযরত সালমা ইবন আসলাম (রা),
১৩. হযরত আবুল হায়সাম ইবন তায়হান (রা),
১৪. হযরত উবায়দ ইবন তায়হান (রা),
১৫. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবন সাহল (রা),
১৬. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা),
১৭. হযরত উবায়দ ইবন আওস (রা),
১৮. হযরত নাসর ইবন হারিস (রা),
১৯. হযরত মুয়াত্তাব ইবন উবায়দ (রা),
২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা),
২১. হযরত মাসঊদ ইবন সা'দ (রা),
২২. হযরত আবূ আবস ইবন জুবায়র (রা),
২৩. হযরত আবূ বুরদা হাই ইবন নিয়ায (রা),
২৪. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),
২৫. হযরত মুয়াত্তাব ইবন কুশায়র (রা),
২৬. হযরত আমর ইবন মা'বাদ (রা),
২৭. হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা),
২৮. হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির (রা),
২৯. হযরত রিফাআ ইবন আবদুল মুনযির (রা),
৩০. হযরত সাদ ইবন উবায়দ ইবন নুমান (রা),
৩১. হযরত আওয়াইম ইবন সাঈদা (রা),
৩২. হযরত রাফে ইবন আনজাদা[১] (রা),
৩৩. হযরত উবায়দ ইবন আবূ উবায়দ (রা),
৩৪. হযরত সালাবা ইবন হাতিব (রা),
৩৫. হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা),
৩৬. হযরত হারিস ইবন হাতিব (রা),

---

১. আনজাদা তাঁর মাতার নাম, পিতার নাম ছিল আবদুল হারিস।

৩৭. হযরত হাতিব ইবন আমর (রা),
৩৮. হযরত আসিম ইবন আদী (রা),
৩৯. হযরত উনায়স ইবন কাতাদা (রা),
৪০. হযরত মা'ন ইবন আদী (রা),
৪১. হযরত সাবিত ইবন আরকাম (রা),
৪২ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালমা (রা),
৪৩. হযরত যায়দ ইবন আসলাম (রা),
৪৪. হযরত রিবঈ ইবন রাফে' (রা),
৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা),
৪৬. হযরত আসিম ইবন কায়স (রা),
৪৭. হযরত আবূ যিয়াহ ইবন সাবিত (রা),
৪৮. হযরত আবূ হান্না ইবন সাবিত অর্থাৎ আবূ যিয়াহর ভ্রাতা,
৪৯. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা),
৫০. হযরত হারিস ইবন নুমান (রা),
৫১. হযরত খাওয়াত ইবন জুবায়র ইবন নু'মান (রা),
৫২. হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা),
৫৩. হযরত আবূ আকীল ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৫৪. হযরত সাদ ইবন খায়সামা (রা),
৫৫. হযরত মুনযির ইবন কুদামা (রা),
৫৬. হযরত মালিক ইবন কুদামা (রা),
৫৭. হযরত হারিস ইবন আরফাজা (রা),
৫৮. সা'দ ইবন খায়সামার মুক্ত দাস হযরত তামীম (রা),
৫৯. হযরত জাবির ইবন আতীক (রা),
৬০. হযরত মালিক ইবন নুমায়লা (রা),
৬১. হযরত নু'মান ইবন আসর (রা),
৬২. হযরত খারিজা ইবন যায়দ (রা),
৬৩. হযরত সা'দ ইবন রবী (রা),
৬৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা),
৬৫. হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ (রা),
৬৬. হযরত বাশীর ইবন সা'দ (রা),
৬৭. হযরত সিমাক ইবন সা'দ (রা),
৬৮. হযরত সবী ইবন কায়স (রা), ও তাঁর ভাই
৬৯. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
৭০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবস (রা),
৭১. হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস (রা),

৭২. হযরত খুবায়ব ইবন উসাফ (রা),
৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন সালাবা (রা) এবং তাঁর ভাই
৭৪. হযরত হারিস ইবন যায়দ ইবন সালাবা (রা),
৭৫. হযরত সুফিয়ান ইবন বিশর (রা),
৭৬. হযরত তামীম ইবন ইউয়ার (রা),
৭৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমায়র (রা),
৭৮. হযরত যায়দ ইবন মাযিন (রা),
৭৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আরফাত (রা),
৮০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রবী (রা),
৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন উবাই (রা) অর্থাৎ মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সালূলের পুত্র,
৮২. হযরত আওস ইবন খাওলা (রা),
৮৩. হযরত যায়দ ইবন ওয়াদিয়া (রা),
৮৪. হযরত উকবা ইবন ওহাব (রা),
৮৫. হযরত রিফা'আ ইবন আমর (রা),
৮৬. হযরত আমির ইবন সালমা (রা),
৮৭. হযরত মা'বাদ ইবন আব্বাদ (রা),
৮৮. হযরত আমির ইবন বুকায়র (রা),
৮৯. হযরত নাওফেল ইবন আবদুল্লাহ (রা),
৯০. হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা),
৯১. হযরত আওস ইবন সামিত (রা),
৯২. হযরত নু'মান ইবন মালিক (রা),
৯৩. হযরত সাবিত ইবন হুযাল (রা),
৯৪. হযরত মালিক ইবন ওয়াশাম (রা),
৯৫. হযরত রবী ইবন আয়াস (রা),ও তাঁর ভাই
৯৬. হযরত ওয়ারাকা ইবন আয়াস (রা),
৯৭. হযরত আমর ইবন আয়াস (রা), বর্ণনার মতপার্থক্যে ওয়ারাকা ও রবীর ভাই অথবা আশ্রিত,
৯৮. হযরত মাজযার ইবন যিয়াদ (রা),
৯৯. হযরত আব্বাদ ইবন খাশখাশ (রা),
১০০. হযরত নুহাব ইবন সালাবা (রা), ও তাঁর ভাই
১০১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাবা (রা),
১০২. হযরত উকবা ইবন রবীয়া (রা),
১০৩. হযরত আবূ দুজানা সিমাক ইবন খারাশা (রা),

১০৪. হযরত মুনযির ইবন আমর (রা),
১০৫. হযরত আবূ উসায়দ মালিক ইবন রবীয়াহ (রা),
১০৬. হযরত মালিক ইবন মাসউদ (রা),
১০৭. হযরত আবদে রাব্বিহ ইবন হক (রা),
১০৮. হযরত কা'ব ইবন জাম্মায (রা),
১০৯. হযরত যামরা ইবন আমর (রা),
১১০. হযরত যিয়াদ ইবন আমর (রা),
১১১. হযরত লাব্বাস ইবন আমর (রা),
১১২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমির (রা),
১১৩. হযরত কারাশ ইবন সাম্মা (রা),
১১৪. হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা),
১১৫. হযরত উমায়র ইবন হুমাম (রা),
১১৬. খিরাশের মুক্ত দাস,হযরত তামীম (রা),
১১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা),
১১৮. হযরত মা'আয ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১১৯. হযরত মু'আওয়ায ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১২০. হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ (রা),
১২১. হযরত উকবা ইবন আমির (রা),
১২২. হযরত হাবীব ইবন আসওয়াদ (রা),
১২৩. হযরত সাবিত ইবন সালাবা (রা),
১২৪. হযরত উমায়র ইবন হারিস (রা),
১২৫. হযরত বিশর ইবন বারা (রা),
১২৬. হযরত তুফায়ল ইবন মালিক (রা),
১২৭. হযরত তুফায়ল ইবন নু'মান (রা),
১২৮. হযরত সিনান ইবন সাইফী (রা),
১২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাদ ইবন কায়স (রা),
১৩০. হযরত উতবা ইবন আবদুল্লাহ (রা),
১৩১. হযরত জাব্বার ইবন সাখর (রা),
১৩২. হযরত খারিজা ইবন হুমায়র (রা),
১৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুমায়র (রা),
১৩৪. হযরত ইয়াযীদ ইবন মুনযির (রা),
১৩৫. হযরত মা'কাল ইবন মুনযির (রা),
১৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন নু'মান (রা),
১৩৭. হযরত যাহহাক ইবন হারিসা (রা),

১৩৮. হযরত সাদ ইবন যুরাইক (রা),
১৩৯. হযরত মা'বাদ ইবন কায়স (রা),
১৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা),
১৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন মানাফ (রা),
১৪২. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ ইবন রাবাব (রা),
১৪৩. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা),
১৪৪. হযরত নুমান ইবন সিনান (রা),
১৪৫. হযরত আবুল মুনযির ইয়াযীদ ইবন আমির (রা),
১৪৬. হযরত সুলায়ম ইবন আমর (রা),
১৪৭. হযরত কাতবা ইবন আমির (রা),
১৪৮. সুলায়ম ইবন আমরের মুক্ত দাস হযরত আনতারা (রা),
১৪৯. হযরত আয়াস ইবন আমির (রা),
১৫০. হযরত সালাবা ইবন গানামা (রা),
১৫১. হযরত আবুল ইয়াসার কা'ব ইবন আমর (রা),
১৫২. হযরত সাহল ইবন কায়স (রা),
১৫৩. হযরত আমর ইবন তালক (রা),
১৫৪. হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা),
১৫৫. হযরত কায়স ইবন মিহসান (রা),
১৫৬. হযরত হারিস ইবন কায়স (রা),
১৫৭. হযরত জুবায়র ইবন ইয়াস (রা),
১৫৮. হযরত সা'দ ইবন উসমান (রা), ও তাঁর ভাই,
১৫৯. হযরত উকবা ইবন উসমান (রা),
১৬০. হযরত যাকওয়ান ইবন আবদে কায়স (রা),
১৬১. হযরত মাসঊদ ইবন খালদা (রা),
১৬২. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা),
১৬৩. হযরত আস'আদ ইবন ইয়াযীদ (রা),
১৬৪. হযরত ফাকীহ ইবন বিশর (রা),
১৬৫. হযরত মু'আয ইবন মাইস (রা), ও তাঁর ভাই
১৬৬. হযরত আইয ইবন ইয়াইস (রা),
১৬৭. হযরত মাসঊদ ইবন সা'দ (রা),
১৬৮. হযরত রিফাআ ইবন রাফে (রা), ও তাঁর ভাই
১৬৯. হযরত খাল্লাদ ইবন রাফে (রা),
১৭০. হযরত উবায়দ ইবন যায়দ (রা),
১৭১. হযরত যিয়াদ ইবন লাবীদ (রা),

১৭২. হযরত ফারওয়া ইবন আমর (রা),
১৭৩. হযরত খালিদ ইবন কায়স (রা),
১৭৪. হযরত জাবালা ইবন সালাবা (রা),
১৭৫. হযরত আতিয়্যা ইবন নুয়ায়রা (রা),
১৭৬. হযরত খালীকা ইবন আদী (রা),
১৭৭. হযরত গাম্মারা খারাম (রা),
১৭৮. হযরত সুরাকা ইবন কাব (রা),
১৭৯. হযরত হারিশাহ ইবন নু'মান (রা),
১৮০. হযরত সুলায়ম ইবন কায়স (রা),
১৮১. হযরত সুহায়ল ইবন কায়স (রা),
১৮২. হযরত আদী ইবন যাগবার (রা),
১৮৩. হযরত মাসঊদ ইবন আওস (রা),
১৮৪. হযরত আবূ খুযায়মা ইবন আওস (রা),
১৮৫. হযরত রাফি ইবন হারিস (রা),
১৮৬. হযরত আউফ ইবন হারিস (রা),
১৮৭. হযরত মু'আউয়ায ইবন হারিস (রা),
১৮৮. হযরত মুআয ইবন হারিস (রা),তিনজনই হযরত আফরা (রা)-এর পুত্র,
১৮৯. হযরত নু'মান ইবন উমর (রা),
১৯০. হযরত আমির ইবন মাখলাদ (রা),
১৯১. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কায়স (রা),
১৯২. হযরত উসায়মা আশজাঈ (রা),
১৯৩. হযরত ওয়াদিকা ইবন আমর (রা),
১৯৪. হারিস ইবন আফরার মুক্ত দাস হযরত আবুল হামরা (রা),
১৯৫. হযরত তালিয়া ইবন আমর (রা),
১৯৬. হযরত সুহায়ল ইবন আতীক (রা),
১৯৭. হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা),
১৯৮. হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা),
১৯৯. হযরত আনাস ইবন মু'আয (রা),
২০০. হযরত আওস ইবন সাবিত (রা),
২০১. হযরত আবুশ-শায়খ উবাই ইবন সাবিত (রা), হাসসান ইবন সাবিতের ভাই,
২০২. হযরত আবূ তালহা যায়দ ইবন আসহাল (রা),
২০৩. হযরত হারিশাহ ইবন সুরাকা (রা),
২০৪. হযরত আমর ইবন সালাবা (রা),

২০৫. হযরত সালীত ইবন কায়স (রা),
২০৬. হযরত আবূ সালীত ইবন আমর (রা),
২০৭. হযরত সাবিত ইবন খানসা (রা),
২০৮. হযরত আমির ইবন উমায়্যা (রা),
২০৯. হযরত মিহ্‌রায ইবন আমির (রা),
২১০. হযরত সাওয়াদ ইবন গাযিয়্যা (রা),
২১১. হযরত আবূ যায়দ কায়স ইবন সাকান (রা),
২১২. হযরত আবুল আওয়ার ইবন হারিস (রা),
২১৩. হযরত সুলায়ম ইবন মিলহান (রা),
২১৪. হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা),
২১৫. হযরত কায়স ইবন আবূ সা'সা (রা),
২১৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন কা'ব (রা),
২১৭. হযরত উসায়মা আসাদী (রা),
২১৮. হযরত আবূ দাঊদ উমায়র ইবন আমির (রা),
২১৯. হযরত সুরাকা ইবন আমর (রা),
২২০. হযরত কায়স ইবন মাখলাদ (রা),
২২১. হযরত নু'মান ইবন আবদে আমর (রা),
২২২. হযরত হিমাক ইবন আবদে আমর (রা),
২২৩. হযরত সুলায়ম ইবন হারিস (রা),
২২৪. হযরত জাবির ইবন খালিদ (রা),
২২৫. হযরত সা'দ ইবন সুহায়ল (রা),
২২৬. হযরত কা'ব ইবন যায়দ (রা),
২২৭. হযরত বুহায়র ইবন আবূ বুহায়র (রা),
২২৮. হযরত ইতবান ইবন মালিক (রা),
২২৯. হযরত আলীল ইবন ওয়াবরাহ (রা),
২৩০, হযরত ইসমাত ইবন হুসায়ন (রা),
২৩১. হযরত বিলাল ইবন মুআল্লা (রা)।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতা (আ)-গণের নামের বর্ণনা

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাগণের অবতরণ ও যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও নবী (সা)-এর হাদীসের মাধ্যমে পূর্বেই জানা গিয়েছে। কিন্তু হাদীসের বর্ণনাদ্বারা কেবল তিনজন ফেরেশতার নাম জানা যায়। পাঠকগণকে উপহার স্বরূপ তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. ফেরেশতাকুল শিরোমণি,[১] নবী-রাসূল ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পারস্পরিক সম্পর্কের আমানতদার, সায়্যিদুনা হযরত জিবরাঈল (আ) [হযরত ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বুখারীতে বর্ণিত]।

২. সায়্যিদুনা হযরত মিকাঈল (আ) ও

৩. সায়্যিদুনা হযরত ইসরাফীল (আ)। (আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা ও হাকিম হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম একে সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকীও হযরত আলী (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২০১।

যেহেতু হাদীসের বর্ণনায় প্রথমে হযরত জিবরাঈল (আ), তারপর হযরত মিকাঈল (আ) এবং এরপর হযরত ইসরাফীল (আ)-এর নামোল্লেখ করা হয়েছে, এ জন্যে অবতরণের ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণকারী সাহাবিগণের নাম (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট)

মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ - فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তোমরা কখনও তাদের মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত। তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযকপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য এ কারণে আনন্দ প্রকাশ করে যে, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তিতও নয়।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৯-১৭০)

مکن گریه برگور مقتول دوست * بروخر می کن که مقبول اوست

১. হযরত উবায়দা ইবন হারিস ইবন মুত্তালিব মুহাজিরী (রা) : বদর যুদ্ধে তাঁর পা কেটে গিয়েছিল। সফরা নামক স্থানে এসে ইনতিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে সেখানেই দাফন করেন।

---

১. কুরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রকাশ্যত এটাই মনে হয় যে, হযরত জিবরাঈল (আ)-ই ফেরেশতাগণের মধ্যে সর্বোত্তম। তাবারানী দুর্বল সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : قال رسول الله الا اخبركم بالفضل الملائكة جبرائيل "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম ফেরেশতা সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তিনি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ)।" রুহুল মা'আনী, ১খ., পৃ. ৩০১।

বলা হয়ে থাকে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণের সাথে সফরায় অবতরণ করেন। সাহাবীগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা এখানে মিশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কিছুই নেই, এখানে আবূ মুআবিয়ার কবর আছে (হযরত উবায়দা ইবন হারিসের উপাধি ছিল আবূ মুআবিয়া)। (হাফিয ইবন আবদুল বার প্রণীত আল-ইসতিয়াব, ১খ. পৃ. ৪২৫, ইসাবার পাদটীকাস্থ হযরত উবায়দা ইবন হারিসের জীবন চরিত)।

২. হযরত উমায়র ইবন আবূ ওয়াক্কাস মুহাজিরী (রা) : ইনি হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ছোট ভাই। হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, বদর যুদ্ধের জন্য যখন লোকজন একত্রিত হতে থাকে, তখন আমি দেখলাম, আমার ছোট ভাই এদিক সেদিক লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বললাম, ভাই, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে ছোট ভেবে ফিরিয়ে দেবেন। অথচ আমিও যুদ্ধে যেতে চাই। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আমাকে শাহাদত নসীব করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বাহিনী পর্যবেক্ষণ করছিলেন, তখন উমায়রকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। অল্পবয়স্ক হওয়ার দরুন তাকে তিনি ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এ কথা শুনে সে কেঁদে ফেলে। তার উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে নবীজী তাকে অনুমতি দান করেন। পরিশেষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদতের পেয়ালা পান করেন। হযরত উমায়র (রা)-এর বয়স তখন ছিল মাত্র ষোল বছর।[১]

৩. হযরত যুশ-শামালায়ন ইবন আবদে আমর মুহাজিরী (রা) : ইমাম যুহরী, ইবন সা'দ ও ইবন সামআনী বলেন, যুশ-শামালায়ন এবং যুল-ইয়াদায়ন একই ব্যক্তির দু'টি নাম, কিন্তু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের মতে এঁরা দু'ব্যক্তি। হযরত যুশ-শামালায়ন (রা) তো বদর যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন, আর হযরত যুল-ইয়াদায়ন (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পরও বেঁচে ছিলেন।

৪. হযরত আকিল ইবন বুকায়র মুহাজিরী (রা) : ইনি ছিলেন প্রথম পর্যায়ের মুসলমানগণের মধ্যে একজন এবং আরকামের গৃহে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল গাফিল (অলস), রাসূলুল্লাহ (সা) গাফিলের পরিবর্তে তাঁর নাম রাখেন আকিল (জ্ঞানী)। [ইসাবা, হযরত আকিল ইবন বুকায়র (রা)-এর জীবন চরিত]। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি আখিরাত সম্পর্কে গাফিল (উদাসীন) ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর জ্ঞানী এবং সতর্ক হন, এ কারণে তাঁর জন্য এ নাম নির্বাচন করেন। শাহাদতকালে তাঁর বয়স হয়েছিল চৌত্রিশ বছর।[২]

৫. হযরত উমর ইবন খাত্তাবের মুক্ত দাস হযরত মিহজা' ইবন সালিহ (রা) : হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যুদ্ধকালে হযরত মিহজা'

১. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ১০৬; ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৩৫।

২ তাবাকাতুল কুবরা, ২খ., পৃ. ২৮২।

(রা)-এর মুখে এ কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : اَنَا مـهْـجَعٌ وَاِلٰى رَبِّى اَرْجِعُ "আমি মিহজা' এবং আপন প্রভুর পথে প্রত্যাবর্তনকারী।" (ইবন আবূ শায়বা বর্ণিত)।[১]

৬. হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা মুহাজিরী (রা) : ইনি বদরে অংশগ্রহণ করেছেন, তা সর্বসম্মত, কিন্তু শাহাদত সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক, মূসা ইবন উকবা এবং ইবন সা'দ বলেন, বদর যুদ্ধে তাঈমা ইবন আদীর হাতে তিনি শহীদ হন। ইবন হিব্বান বলেন ত্রিশ হিজরীতে এবং হাকিম বলেন আটত্রিশ হিজরী সনে ইনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন (ইসাবা, হযরত সাফওয়ান ইবন বায়যা (রা)-এর জীবন চরিত)।

৭. হযরত সা'দ ইবন খায়সামা আনসারী (রা) : ইনি সাহাবীর পুত্র সাহাবী এবং শহীদের পুত্র শহীদ। হযরত সাদ (রা) বদর যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর পিতা হযরত খায়সামা (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।

হযরত সা'দ (রা) আকাবার বায়আতে শরীক ছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বনী আমরের ঘোষক মনোনীত করেন (ইসাবা)।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন আবূ সুফিয়ানের কাফেলা আক্রমণের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দেন, তখন হযরত খায়সামা তাঁর পুত্র সাদকে বললেন, বাছা, নারী ও শিশুদের দেখাশোনা করার জন্য আমাদের মধ্যে একজনকে বাড়িতে থাকা দরকার। তুমি আমাকে অগ্রাধিকার দাও, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হওয়ার অনুমতি দাও এবং তুমি এখানে অপেক্ষা কর। এতে হযরত সাদ তা সরাসরি অস্বীকার করেন এবং বলেন : لو كان غـيـر الجنة اشـرتك به انى ارجـو الشـهـادة فى وجـهى هذا "জান্নাতের সওদা না হয়ে যদি আর কোন বিষয় হতো, তা হলে আমি আপনাকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিতাম কিন্তু এ সফরে আমি নিজে শহীদ হওয়ার পূরা ইচ্ছা রাখি।"

এরপর পিতাপুত্রের মধ্যে লটারী করা হলো। লটারীতে হযরত সাদের নাম বের হলো, পিতা থেকে পুত্র অধিক ভাগ্যবান প্রমাণিত হলো এবং তিনি আনন্দিত ও সন্তুষ্ট চিত্তে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহগামী হয়ে বদরের পথে যাত্রা করলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি মারিকা ইবন আবদুদ অথবা তুআঈমা ইবন আদীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৮. হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির আনসারী (রা)।

৯. হযরত ইয়াযীদ ইবন হারিস আনসারী (রা)।

১০. হযরত উমায়র ইবন হুমাম আনসারী (রা) : হযরত আনাস (রা) সূত্রে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, ওহে লোক সকল, ঐ জান্নাতের প্রতি অগ্রসর হও যার পরিধি আসমান-যমীন ব্যাপী। উমায়র

১. কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৬৯।

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) ! আসমান-যমীনের সমান ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ। উমায়র বললেন, বাহ্, বাহ্। নবী (সা) বললেন, ওহে উমায়র, কিসে তোমাকে বাহ্ বাহ্ বলতে উদ্বুদ্ধ করল ? উমায়র বললেন, আল্লাহর কসম, কিছুই না ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), কেবল আমার আশা, আমিও যদি সেই জান্নাতীদের একজন হতাম ! তিনি বললেন : فانك من اهلها "নিঃসন্দেহে তুমি অবশ্যই তাদের একজন।" এরপর তিনি খেজুর বের করে খেতে শুরু করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং বলেন, যদি এগুলো খেতেই থাকি, তা হলে তো দীর্ঘ জীবন পেয়ে গেলাম। খেজুর ফেলে দিয়ে যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে যান। ইবন ইসহাক বলেন উমায়র যখন তরবারি হাতে নেন, তখন তাঁর মুখে এ বাক্যগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল :

ركضا الى الله بغير زاد * الا التقى وعمل المعاد والصبر فى الله على الجهاد

وكل زاد عرضة النفاد * غير التقى والبر والرشاد ·

"আল্লাহর দিকে কোন উপঢৌকন ছাড়াই ধাবিত হও, কিন্তু আল্লাহ-ভীতি, পরকালের আমল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ধৈর্যরূপ উপঢৌকন অবশ্যই সাথে নাও। আর সব উপঢৌকনই ধ্বংসশীল, কিন্তু আল্লাহভীতি, নেককাজ ও সুপথের উপঢৌকন কখনো নষ্ট হয় না এবং ধ্বংসও হয় না।"

(হাফিয ইবন আবদুল বার প্রণীত আল ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ৪৮২, ইসাবার পাদটীকা; ইসাবা, ২খ. পৃ. ৩১, উমায়র ইবন হুমাম (রা)-এর জীবন চরিত; যারকানী, ১খ. পৃ. ১৪৪; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৭৭)।

১১. হযরত রাফে‘ ইবন মুয়াল্লা আনসারী (রা)।

১২. হযরত হারিসা ইবন সুরাকা আনসারী (রা) : হযরত হারিসা ইবন সুরাকা ইবন হারিস (রা) ছিলেন সাহাবীর পুত্র সাহাবী এবং শহীদের পুত্র শহীদ। পুত্র অর্থাৎ হযরত হারিসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন এবং হযরত সুরাকা হুনায়নের যুদ্ধে। ফাতহুল বারীতে (আরবী) অধ্যায়ে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত হারিসা বদর যুদ্ধে শহীদ হন, তিনি তখন যুবক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন হযরত হারিসার মাতা রুবাঈ বিনতে নাযর তাঁর খিদমতে আগমন করলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি ভাল করেই জানেন যে, হারিসা আমার কেমন প্রিয় ছিল। কাজেই যদি সে জান্নাতবাসী হয়ে থাকে তবে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করব। আর অবস্থা যদি ভিন্নরূপ হয়, তা হলে আপনি দেখবেন আমি কি করি। অর্থাৎ খুবই হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি করব। তিনি বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ ? একটি জান্নাত নয়, তার জন্য রয়েছে অনেক জান্নাত। আর অবশ্যই নিঃসন্দেহে সে জান্নাতুল ফিরদাউসে আছে (সহীহ বুখারী, বদর যুদ্ধ অধ্যায়)।

১৩. হযরত আউফ ইবন হারিস আনসারী (রা),

১৪. হযরত মুআউয়ায ইবন হারিস আনসারী (রা) : এঁরা দু'জন পরস্পর ভাই, তাঁদের মাতার নাম হযরত আফরা (রা)। হযরত আউফ ইবন হারিস (রা)-এর শাহাদতের ঘটনা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে সকল সাহাবী বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উপর নূরের তাজাল্লী নিক্ষেপ করেন এবং দর্শন দান করে তাঁদের চোখ জুড়িয়ে দেন, আর বলেন, আমার বান্দাগণ, তোমরা আর কি চাও ?

শহিদগণ আরয করলেন, আয় পরওয়ারদিগার, জান্নাতের যে সমস্ত নিয়ামত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেছেন, এরও অতিরিক্ত আর কোন নিয়ামত আছে কি ? আল্লাহ তা'আলা বলেন, বল, কি চাও ? চতুর্থবার সাহাবাগণ আরয করলেন, আয় পরওয়ারদিগার, আমাদের শরীরে আমাদের আত্মাগুলো দিয়ে দিন যাতে আমরা পুনরায় আপনার রাস্তায় নিহত হতে পারি, যেমন বর্তমানে নিহত হয়েছি। (বিশুদ্ধ সনদে তাবারানী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি শব্দগত দিক দিয়ে মওকূফ হলেও মরফূ হওয়ার মর্যাদা রাখে। আল্লাহই ভাল জানেন)।[১]

বদরের যুদ্ধবন্দীদের নাম

বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহ দ্বারা পূর্বেই জানা গেছে যে, বদর যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হয়েছে এবং বন্দী হয়েছে সত্তরজন। (মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী ইবন হিশাম)। আর হাফিয ইবন সায়্যিদুন-নাস উয়ূনুল আসার গ্রন্থে নিহত ও বন্দীদের নাম উল্লেখ করেছেন। এখানে বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিখ্যাতদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের বিষয়েও বিশদ বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে।

১. আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব : রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য ছিলেন, যিনি বয়সে তাঁর থেকে মাত্র দু'বছরের বড় ছিলেন। মক্কা বিজয়ের কিছু দিন পূর্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

২. আকীল ইবন আবূ তালিব : ইনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাত ভাই ছিলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত আকীল হযরত জাফর থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। আর একইভাবে হযরত জাফরও হযরত আলী থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। আর আবূ তালিবের সবচে' বড় পুত্রের নাম ছিল তালিব (যার নাম অনুযায়ী তার উপাধি হয়েছে), তালিবও হযরত আকীলের দশ বছরের বড় ছিল। সে ছিল ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৪৫।

থেকে বঞ্চিত। অবশিষ্ট তিন ভাই আকীল (রা), জাফর (রা) ও আলী (রা) ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন।

৩. নওফেল ইবন হারিস : তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি খন্দকের যুদ্ধের সময় অর্থাৎ পঞ্চম হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪. সায়িব ইবন উবায়দ,

৫. নু'মান ইবন আমর,

৬. আমর ইবন সুফিয়ান ইবন আবূ হারব,

৭. হারিস ইবন আবূ ওয়াহ্রাহ,

৮. আবুল আস ইবন রবী : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতোপূর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৯. আবুল আস ইবন নওফেল,

১০. আবূ রীশাহ ইবন আবূ উমর,

১১. আমর ইবন আযরাক,

১২. উকবা ইবন আবদুল হারিস,

১৩. আদী ইবনুল খিয়ার,

১৪. উসমান ইবন আবদে শামস,

১৫. আবূ সাওর,

১৬. আযীয ইবন উমায়র আবদারী : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১]

১৭. আসওয়াদ ইবন আমির,

১৮. সায়িব ইবন আবূ হুবায়শ : ইনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন, ইস্তিহাযা রোগিণী হযরত ফাতিমা বিনতে আবূ হুবায়শের ভাই।[২]

১৯. হুয়ায়রিস ইবন আব্বাদ,

২০. সালিম ইবন শাদাখ,

২১. খালিদ ইবন হিশাম : অর্থাৎ আবূ জাহল ইবন হিশামের ভাই, কতিপয় আলিম তাকে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।[৩]

২২. উমাইয়্যা ইবন আবূ হুযায়ফা,

২৩. ওলীদ ইবন ওলীদ ইবন মুগীরা,

২৪. সাইফী ইবন আবূ রিফা'আ,

২৫. আবুল মুনযির ইবন আবূ রিফা'আ,

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৬; প্রাগুক্ত, অধিকন্তু ইসাবা, ২খ. পৃ.৬; উয়ূনুল আসার, পৃ.৩০০।

২ ইসাবা, ১খ. পৃ. ৪১২ ও ৪খ. পৃ. ১৩৩।

৩. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৬; উয়ূনুল আসার, পৃ.৩০৭।

২৬. আবূ আতা আবদুল্লাহ ইবন আবূ সায়িব : ইনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার কারিগণ, মুজাহিদ প্রমুখ তাঁর কাছে ইলমে কিরআত শিক্ষা করেন।

২৭. মুত্তালিব ইবন হানতাব : পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

২৮. খালিদ ইবন আ'লাম,

২৯. আবূ ওয়াদাআ সাহমী : মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৩০. সুরওয়া ইবন কায়স,

৩১. হানযালা ইবন কাবীসা,

৩২. হাজ্জাজ ইবন হারিস : আল্লামা সুহায়লী বলেন, হযরত হাজ্জাজ ইবন হারিস (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের মধ্যে একজন। উহুদ যুদ্ধের পর আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগমন করেন। সুতরাং তাঁর নাম বদর যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে উল্লেখ করা গ্রন্থকারের কল্পনা মাত্র (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৭)।

৩৩. আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন খালফ : ইনি মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উষ্ট্রের যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।

৩৪. আবূ উযযা আমর ইবন আবদুল্লাহ,

৩৫. উমাইয়্যা ইবন খালফের মুক্ত দাস, ফাকীহ,

৩৬. ওহাব ইবন উমায়র : হযরত ওহাব এবং তাঁর পিতা হযরত উমায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বিষয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৩৭. রবীয়া ইবন দাররাজ,

৩৮. সুহায়ল ইবন আমর : ইনি হুদাবিয়ায় কুরায়শের পক্ষে সন্ধির জন্য এসেছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সিরিয়ায় শহীদ হন।

৩৯. আবদ ইবন যাম'আ : ইনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা বিনতে যাম'আর ভাই, পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৪০. আবদুর রহমান ইবন মাশনূর,

৪১. তুফায়ল ইবন আবূ কানী',

৪২. উকবা ইবন আমর,

৪৩. কায়স ইবন সায়িব মাখযুমী : পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন, ইনি জাহিলী যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ব্যবসায়ের অংশীদার ছিলেন, যা পূর্বে বলা হয়েছে।

৪৪. উমায়্যা ইবন খালফের মুক্ত দাস, নুসতাস : ইনি উহুদ যুদ্ধের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

---

১. প্রাগুক্ত।

২ রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১০৭।

ইসলামের বিরুদ্ধে সম্প্রদায় এবং স্বদেশের সহযোগিতা

বদরের যুদ্ধ ছিল ইসলাম এবং কুফরের মধ্যকার সংগ্রাম। এ জন্যে আল্লাহ তা'আলা বদরের দিনকে ইয়াওমুল ফুরকান বা হক ও বাতিলের মধ্যে পৃথকীকরণের দিনরূপে আখ্যায়িত করেছেন।

মক্কায় এমন কিছুলোকও ছিল যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় হিজরত করে চলে যান, তখন তারা নিজেদের গোত্র ও সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে মক্কায়ই থেকে যায়। যখন বদর যুদ্ধের সময় এলো, তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক কাফিরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে এবং বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ قَالُوْا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَاُولٰئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ۔ اِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَسْتَطِعُوْنَ حِيْلَةً وَّلاَ يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً ۔ فَاُولٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۔

"যারা নিজেদের উপর যুলুম করে, তাদের প্রাণ হরণের সময় ফিরিশতাগণ বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলে: দুনিয়ায় আমরা অসহায় ছিলাম। তারা বলে, আল্লাহর যমীন কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে ? এদেরই আবাসস্থল জাহান্নাম, আর তা কতই না মন্দ আবাস ! তবে যেসব অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথও পায় না আল্লাহ অচিরেই তাদের পাপ মোচন করবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল।" (সূরা নিসা : ৯৭-৯৯)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে :

ان ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين على رسول الله ﷺ ياتى السهم فيرمى به فيصيب احدهم فيقتله اويضرب فيقتل فانزل الله اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ ...... ۔

"বদর যুদ্ধে[১] কিছু সংখ্যক মুসলমান মুশরিকদের সংখ্যা ও দল ভারী করার জন্য মক্কার কাফিরদের সাথে বের হয়। যুদ্ধের ময়দানে কোন তীর সেই মুসলমানকে বিদ্ধ

১. বদর যুদ্ধ শীর্ষক কোন শব্দ বুখারী শরীফে নেই, বরং অন্যান্য বর্ণনায় উল্লিখিত আছে। যেমন হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৯৮-তে, কিতাবুত তাফসীরে, এবং কিতাবুল ফিতানে ১৩খ. পৃ. ৩২-এ এবং আল্লামা কাসতাল্লানী তাঁর ইরশাদুস সারী গ্রন্থে ৭খ. পৃ.৯০ এবং ১০খ. পৃ. ১৭৭-এ উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

করে এবং এতে সে নিহত হয় আবার কখনো তরবারির আঘাতে নিহত হয়। সুতরাং বদর যুদ্ধে যে সব মুসলমান কাফিরদের সাথে এসেছে এবং নিহত হয়েছে, তাদের প্রসঙ্গে... ... اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ... আয়াতটি নাযিল হয়েছে। (সহীহ বুখারী, পৃ. ৬৬১, তাফসীরে সূরা নিসা অধ্যায়)।

আর হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর এ বর্ণনাই ইমাম বুখারী কিতাবুল ফিতানে পৃ. ১০৪৯-এ দ্বিতীয়বার এনেছেন এবং এর শিরোনাম দিয়েছেন, 'ফিতনাবাজ ও কাফির-গুনাহগারদের সংখ্যা বৃদ্ধি অপসন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা।' হযরত শাহ ওলীউল্যাহ (র) তাঁর তাফসীরে কুরআনে اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ আয়াতের পাদটীকায় লিখেছেন يعنى بترك هجرت از دار الحرب بدار الاسلامو بتكثير سواد كفار আল্লাহই ভাল জানেন। ফলে জানা গেল যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য কাফির বাহিনীতে শুধু কাফিরদের সংখ্যা বেশি দেখানোর উদ্দেশ্যে যোগ দেয়াটাও অবৈধ (নাজায়েয)। যদিও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইচ্ছা না করে বা যুদ্ধ না করে। মুসলমানদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে কাফির সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়াও হারাম। সম্মানিত জ্ঞান পিপাসুগণ ফাতহুল বারী ১৩খ. পৃ. ১৩২ এবং কাসতাল্লানী দেখুন। আর এর চেয়ে বিস্তারিত জানার প্রয়োজনবোধ করলে তাফসীরে ইবন কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী এবং তাফসীরে দুররে মানসূর ২খ. পৃ. ২০৫ পাঠ করুন।

আর হাদীস শরীফে এসেছে : من كثر سواد قوم فهوم منهم অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের দল ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বদর যুদ্ধের উপর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত

বদর যুদ্ধের বর্ণনা সমাপ্ত হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত কুরআনের আয়াত ও সহীহ এবং সরাসরি বর্ণনা পাঠকদের সামনে এসে গেছে, যদ্দরুন এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বদর যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শদের ঐ কাফেলা আক্রমণ করা যা আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। মক্কার কুরায়শদের কোন আক্রমণ প্রতিহত করা উদ্দেশ্য ছিল না। আল্লামা শিবলীর সীরাতুন-নবী গ্রন্থের ভাষ্য হলো, বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য বাণিজ্য কাফেলাকে আক্রমণ করা ছিল না, বরং মদীনায় থেকেই তিনি এ সংবাদ পেয়েছিলেন যে, কুরায়শগণ এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাণিজ্য কাফেলায় আক্রমণ করাই বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং কুরায়শের আক্রমণের মুকাবিলাই উদ্দেশ্য ছিল। আল্লামা শিবলীর ধারণা এখানে শেষ হলো।

আল্লামা শিবলীর এ ধারণা সমস্ত মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের স্পষ্ট বক্তব্য এবং সমস্ত সহীহ ও সরাসরি বর্ণনার বিপরীত।

روى ابن ابى حاتم عن ابى ايوب قال قال رسول الله ﷺ ونحن بالمدينة انى اخبرت عن عير ابى سفيان فهل لكم ان تخرجوا اليها لعل الله يغنمناها قلنا نعم فخرجنا فلما رسرنا يوما او يومين قال قد اخبر واخبرنا فاستعدوا للقتال فقالوا لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم (ولكنا اردنا العير) فاعاده فقال له المقداد لانقول لك كما قالت بنوا اسرائيل ٠

১. "ইবন আবূ হাতিম হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মদীনায় আমাদেরকে বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আসছে। তোমাদের কি ইচ্ছা হয় যে, তোমরা ঐ বাণিজ্য কাফেলা করায়ত্ব করার জন্য বের হও ? আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা'আলা ঐ কাফেলার মালামাল গনীমত হিসেবে আমাদেরকে দান করবেন। সাহাবাগণ আরয করলেন, হ্যাঁ, এতে আমাদের আগ্রহ আছে। অতঃপর আমরা রওয়ানা হই এবং এক অথবা দু'দিনের মনযিল অতিক্রম করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন যে, মক্কার কাফিরগণ আমাদের অভিযানের সংবাদ পেয়ে গেছে এবং তারা আমাদের সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসছে। তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে মুকাবিলা ও জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। সাহাবাগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), (বাহ্যিক সরঞ্জামের দিক থেকে) আমাদের এ শক্তি নেই যে, আমরা শক্তিশালী কুরায়শের বলিষ্ঠ বাহিনীর মুকাবিলা করি। আমরা তো কেবল আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম। অর্থাৎ আমাদের এ ধরনের কোন চিন্তা কিংবা ধারণাই ছিল না যে, আমাদেরকে কুরায়শের এভাবে মুকাবিলা করতে হবে। তা হলে অন্তত কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে বেরুতে পারতাম।[1] তিনি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন হযরত মিকদাদ (রা) দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা) আমরা আপনাকে বনী ইসরাঈলের মত বলব না যে, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ "আপনি এবং আপনার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ করুন, আমরা এখানেই বসে থাকব।" (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২৪)

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় আছে :

لما سمع رسول الله ﷺ بابى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين اليهم وقال هذه عير قريش فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ان ينفلكموها فانتدب

১. এ বাক্য আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬২ এবং তাফসীরে ইবন কাসীর ২খ. পৃ. ২৮৭ সূরা আনফালের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে। এ জন্যে এ বাক্য সেখান থেকে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।

الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله ﷺ يلقى حربا وكان ابو سفيان قد استنفرحين دنا من الحجاز يتجسس الاخبار ·

"নবী (সা) যখন শুনলেন যে, আবূ সুফিয়ান বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে আসছে, তখন তিনি মুসলমানদেরকে সেদিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানালেন এবং বললেন, কুরায়শের কাফেলা আসছে, যাতে তাদের অগণিত মালামাল রয়েছে। কাজেই তোমরা তাতেআক্রমণ করার জন্য বের হও। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এ সমুদয় মাল তোমাদেরকে গনীমত হিসেবে দান করবেন। কিছু লোক তাঁর সাথে বের হলো আর কিছু বের হলো না। যার কারণ ছিল, লোকদের এমন কোন ধারণা কিংবা চিন্তাও ছিল না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুশমনদের কোন যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। আবূ সুফিয়ান সব সময় এ আশঙ্কায় ছিল। কাজেই সে আগাগোড়াই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিল। এমন কি আবূ সুফিয়ান যখন এ সংবাদ পেয়ে গেল যে, নবী (সা) কাফেলায় আক্রমণ চালানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তাড়াতাড়ি যমযম গিফারীকে দূত হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করল।" ঘটনার শেষ পর্যন্ত। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৬; তাফসীরে ইবন কাসীর, ২খ. পৃ. ২৮৮, সূরা আনফাল; যারকানী, ১খ. পৃ. ৪১১)।[১]

এ জন্যে হাফিয আসকালানী শারহে বুখারীতে লিখেন :

والسبب فى ذلك ان النبى ﷺ ندب الناس الى تلقى ابى سفيان لاخذ ما معه من اموال قريش وكان من معه قليلا فلم يظن اكثر الانصار انه يقع قتال فلم يجز معه منهم الا القليل ولم ياخذوا اهبة الا ستعداد كما ينبغى بخلاف المشركين فانهم خرجوا مستعدين ذابين عن اموالهم ·

"বদর যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে আবূ সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্য বের হওয়ার আহ্বান জানালেন, যাতে তাদের ব্যবসায়ের মালামাল হস্তগত করতে পারেন। কেননা এ কাফেলায় মালামাল ছিল বেশি এবং লোক ছিল কম (ত্রিশ অথবা চল্লিশজন)। কাজেই অধিকাংশ আনসারীর এ চিন্তাও হয়নি যে, যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। সামান্য মানুষই তাঁর সাথে বের হয় এবং তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতিও ছিল না। এর বিপরীতে মুশরিকরা আগমন করেছিল পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে, যাতে তারা নিজেদের মালের হিফাযত করতে এবং হামলা প্রতিহত করতে পারে।"[২]

আবূ সুফিয়ান যখন এ সংবাদ পেয়ে গেল যে, নবী (সা) কাফেলায় আক্রমণ চালানোর জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তাড়াতাড়ি যমযম গিফারীকে দূত হিসেবে এ পয়গামসহ মক্কায় প্রেরণ করল :

---

১. যেমনটি যারকানী কৃত শারহে মাওয়াহিবে আছে, ১খ. পৃ. ৩১০।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২২২।

يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة اموالك مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه لا ارى ان تدركوها الغوث - الغوث ·

"ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, দ্রুত ধাবিত হও এবং ঐ উটগুলোর সংবাদ নাও, যেগুলো কাপড় এবং মালামালে পরিপূর্ণ বোঝাই । আর খবর নাও নিজেদের মালামালের যা মুহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীগণ দখল করার জন্য বেরিয়ে পড়েছেন। আমার ধারণা তোমাদের মাল নিরাপদে নেই। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব, নিজেদের মালের কাছে উপস্থিত হও।" [১]

যমযম গিফারীকে প্রেরণের পর আবূ সুফিয়ান ধীরস্থীরভাবে কাজ করলেন এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী পথে কাফেলাকে নিরাপদে পার করে নিলেন। আর কাফেলা যখন মুসলমানদের লক্ষ্যস্থল থেকে বেরিয়ে গেল, তখন আবূ সুফিয়ান কুরায়শদের নামে অপর একটি সংবাদ প্রেরণ করলেন। তা ছিল এই :

قال ابن اسحاق ولما راى ابو سفيان انه قد احزر عيره ارسل الى قريش انكم انما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالك واموالكم فقد نجاها اللّٰه فارجعوا ·

"মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, আবূ সুফিয়ান যখন দেখল যে, কাফেলা মুসলমানদের আক্রমণস্থল পার হয়ে গেছে তখন কুরায়শদের নামে একটি সংবাদ পাঠাল যে, তোমাদের তো কেবল নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা, মালামাল এবং লোকজনের হিফাযতের উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ তা রক্ষা করেছেন। সুতরাং তোমরা ফিরে যাও।"[২]

আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা কুরায়শদের কাছে ঠিক ঐ সময় পৌঁছলো যখন তারা জুহফা নামক স্থানে উপস্থিত হয়েছিল। লোকজন ফিরে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আবূ জাহল শপথ করল যে, আমরা এ অবস্থায়ই বদর পর্যন্ত যাব এবং যুদ্ধ না করে ফিরব না। কিন্তু আখনাস ইবন শুরায়ক আবূ জাহলের এ কথা শুনল না, সে বনী যুহরাকে উদ্দেশ্য করে বলল :

يا بنى زهرة قد نجى اللّٰه لكم اموالكم وخلص لكم صاحبكم مخرمة ابن نوفل وانما نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا بى جنبها وارجعوا فانه لاحاجة لكم بان تخرجوا فى غير صنعة لاما يقول هذا قال فرجعوا فلم يشهدها زهرى واحد ·

"ওহে বনী যুহরা, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন এবং তোমাদের সঙ্গী মাখরামাকেও রক্ষা করেছেন। আর তোমরা তো কেবল তাকে এবং নিজেদের মালামালকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলে, আর তা রক্ষা পেয়েছে। কাজেই আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা ফিরে যাও, বিনা প্রয়োজনে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৫৮।

২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।

অগ্রসর হওয়ায় কি ফায়দা? আখনাসের কথা অনুসারে বনী যুহরার সমস্ত লোক রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। এমন কি বনী যুহরার একটি লোকও বদর যুদ্ধে অংশ নেয়নি।"[১]

বনী হাশিম তো প্রথম থেকেই যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিল না, আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্নের কারণে অগ্রসর হতেই প্রস্তুত ছিল না। আবার জুহমের স্বপ্ন তাদেরকে আরো নিরুৎসাহিত করে তুলেছিল। যখন আবূ সুফিয়ানের এ বার্তা এসে পৌঁছল যে, বাণিজ্য কাফেলা বিপদমুক্ত হয়েছে, তখন তারা আরো সংশয়াপন্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং তালিব ইবন আবূ তালিব এবং তার সাথে আরো কয়েকজন মক্কায় ফিরে গেল। এরপর যখন আখনাস ইবন শুরায়ক বনী যুহরার লোকজন সাথে নিয়ে ফিরে গেল, তখন তারা আরো দোটানায় পড়ে গেল। কিন্তু আবূ জাহলের জিদ, যুদ্ধোন্মাদনা এবং উৎসাহের দরুন তারা বদরের দিকে রওয়ানা হলো।

উতবা এবং শায়বা প্রথম থেকেই যাত্রায় উৎসাহী ছিল না এবং শেষ পর্যন্তই তারা চাচ্ছিল যে, মক্কায় ফিরে যাবে, যেমনটি পূর্বেই বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

এক্ষণে এ ধরনের বিশদ ও প্রাঞ্জল বর্ণনার পরও কি এ প্রশ্নের অবকাশ আছে যে, রাসূল (সা) ও সাহাবাগণ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বের হননি, বরং কুরায়শের যে বাহিনী মদীনা আক্রমণের জন্য বের হয়েছিল, রাসূল (সা) তা প্রতিহত করার জন্য বদরে গিয়েছিলেন।

নবী (সা) যখন সাহাবাগণ সহ মদীনা থেকে রওয়ানা হন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শুধু কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করা, আবূ জাহল এবং তার বাহিনী সম্পর্কে কোন কল্পনাই তাঁর ছিল না, বরং মনের মধ্যেও এ ধরনের সম্ভাবনার নাম-নিশানাও ছিল না।

যেমন আবূ জাহল ও কুরায়শ বাহিনীর মনেও এ কল্পনা ছিল না যে, তারা কোন বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করবে। বরং যখন আবূ সুফিয়ানের দূত যমযম গিফারী মক্কায় উপস্থিত হয়ে এ সংবাদ শোনাল যে, তোমাদের বাণিজ্য কাফেলা বিপদের মধ্যে আছে, মুসলমানগণ এতে আক্রমণ করতে চাচ্ছে, তখন মক্কায় হুলস্থুল পড়ে গেল এবং কুরায়শগণ আবূ জাহলের নেতৃত্বে পূর্ণ শান-শওকতের সাথে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য বের হয়। জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে কুরায়শগণ আবূ জাহলের পক্ষ থেকে সংবাদ পায় যে, কাফেলা নিরাপদে পার হয়ে এসেছে। আর রাসূল (সা) সফরা নামক স্থানে পৌঁছে খবর পান যে, বাণিজ্য কাফেলা তো পার হয়ে গেছে আর কুরায়শ পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছে। মুসলমানগণ যেহেতু যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হননি, এ জন্যে তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন যে, এখন কি করা উচিত (যার পূর্ণ বিবরণ পূর্বে বলা হয়েছে)। কাজেই আল্লামার এ ধারণা করা যে, রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনই বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের কোন চিন্তাই করেন নি, বরং প্রথম

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩খ. পৃ. ২৬৬।

থেকেই নবী (সা) যে সফর শুরু করেন, তা কুরায়শের ঐ সেনাবাহিনীর মুকাবিলা এবং ধ্বংস করার জন্য ছিল, যারা স্বয়ং মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। এটা এক উদ্ভট ধারণা যা তাঁর স্বপ্রণোদিত বর্ণনা এবং স্বউদ্ভাবিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যা আনা হলে নবী (সা)-এর সমস্ত হাদীসের ভাণ্ডার, কুরআনের বাণীসমূহ, সীরাত রচয়িতাদের বর্ণনা এবং ইতিহাসবিদগণের রচনাসমূহকে অস্বীকার করতে হয়। সেই আল্লাহর দুশমনদের জন্য শত শত আফসোস, যারা আল্লাহর নবী এবং তাঁর অনুসারীগণের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছিল, তাঁদেরকে নিজ ঘরবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিল, তাদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও তাদের পরিকল্পনা এমনটিই ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও তারা ইসলাম এবং মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় আলস্য করেনি। কাজেই মুসলমানগণ যদি তাদের জান বা মালের ক্ষতি করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে, তা হলে একে সভ্যতা বিরোধী ও মানবতা বিরোধী মনে করা এবং যে সকল বর্ণনায় কিছুটা ব্যাখ্যা করার সুযোগ থাকে, সেখানে ব্যাখ্যা করা আর যেখানে ব্যাখ্যার কোন সুযোগ নেই তা উল্লেখই না করা—যাতে নিজেদের স্ব নির্ধারিত মূলনীতির বিপরীত কিছু না হয়, এরূপ বৈশিষ্ট্য জ্ঞান ও বিশ্বস্ততার পরিপন্থি। قراطيس تبدرنها وتخفون كثيرا

বদর যুদ্ধের পূর্বে যত অভিযান প্রেরণ করা হয়েছে, তার কমবেশি সবগুলোই কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। তা হলে কেবল বদর যুদ্ধের ব্যাপারে কেন সমস্যার সৃষ্টি হলো ?

এখন এ দাবি অবশিষ্ট রইল যে, কাফিরদেরকে প্রথমেই আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত কাফির পূর্বে আক্রমণ না করে। অর্থাৎ জিহাদের জন্য প্রথমেই আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়, বরং কাফির যদি প্রথমে আক্রমণ করে বসে, তখন তা প্রতিহত করা যাবে। তবে এর জবাব জিহাদ অধ্যায়ের শুরুতে বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে, সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে। যে মক্কার কাফিরগণ তেরটি বছর ধরে মুসলমানদের দৈহিক ও আর্থিক সব ধরনের ক্ষতি করতে পারে, তাদের ইপর সব ধরনের নির্যাতন চালাতে পারে, আর ভবিষ্যতের জন্য হুমকি ধমকি দিতে পারে, মুসলমানদের অভিসন্ধির ব্যাপারে উদগ্রীব থাকে এবং এর জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করতে থাকে, তাদের জানমালের প্রতি মুসলমানদের অগ্রগামী হয়ে আক্রমণ করা বৈধ না হওয়া যুক্তি ও ঐতিহ্য, উভয়টিরই বিরোধী।

সার সংক্ষেপ

সার কথা হলো এই যে, এতদসমুদয় বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে, মহানবী (সা) ও তাঁর সাহাবিগণ বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণের জন্য মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার কুরায়শ ও আবূ জাহল এ বাণিজ্য কাফেলা রক্ষার জন্যই বেরিয়েছে। মুমিন এবং কাফির সবারই লক্ষ্য ছিল এই বাণিজ্য কাফেলার

প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। আর উভয় পক্ষই এটাই বুঝেছিল, আল্লামা তা বুঝুন আর নাই বুঝুন। অধিকন্তু বদর যুদ্ধের পূর্বে যত যুদ্ধ ও অভিযান এসেছিল, এর সবগুলোই ছিল আক্রমণাত্মক, প্রতিরক্ষামূলক ছিল না। এ সবের সূচনা মহানবী (সা)-এর পক্ষ থেকেই হয়েছিল।

ইয়াহূদী মহিলা আসমাকে হত্যা (২৬ রমযানুল মুবারক, দ্বিতীয় হি.)

আসমা ছিল এক ইয়াহূদী স্ত্রীলোক, যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসামূলক কবিতা রচনা করত এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। মানুষকে নবী (সা) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলত। নবী (সা) বদর থেকে তখনো ফেরেননি, পুনরায় সে এ ধরনের কবিতা বলল। এতে হযরত উমায়র ইবন আদী (রা)-এর জিদ চেপে গেল। তিনি মান্নত করলেন যে, আল্লাহর অনুগ্রহে যদি রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদে বদর থেকে ফিরে আসেন, তা হলে আমি একে হত্যা করব।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহে সুস্থভাবে ও নিরাপদে ফিরে এলেন, তখন উমায়র (রা) রাত্রিকালে তরবারি নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার ঘরে প্রবেশ করলেন। যেহেতু তিনি অন্ধ ছিলেন, সেহেতু হাতড়িয়ে আসমার আশেপাশে থাকা শিশুদের সরিয়ে দিলেন এবং তার বুকের উপর তরবারি রেখে এত জোরে চাপ দিলেন যে, তা পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মান্নত পূর্ণ করে তিনি ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর তিনি তাঁকে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), এ জন্যে আমার কোন জরিমানা তো হবে না? তিনি বললেন, না। لا ينتطح فيها عنزان "এ ব্যাপারে দু'টি মেষও মাথা দিয়ে গুঁতোগুঁতি করবে না।" অর্থাৎ এটা এমন কোন কাজই নয়, যে ব্যাপারে কেউ মতপার্থক্য বা প্রতিবাদ করতে পারে।

সত্যিকারের পয়গম্বরগণের মর্যাদা পরিপন্থী কোন অপরাধকারীকে হত্যা করা কোথায় প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হয়, বরং তা সর্বোচ্চ নৈকট্যলাভ ও উত্তম ইবাদতের মধ্যে গণ্য। কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারে না, পশুও একে বৈধ মনে করে।

মুসান্নাফে হাম্মাদ ইবন সালমায় বর্ণিত আছে যে, এ স্ত্রীলোকটি মহিলাদের ঋতুস্রাব মাখা কাপড় এনে মসজিদে রাখত।

মোটকথা, হযরত উমায়র (রা)-এর এ কাজে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই খুশি হন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন : اذا اجبتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمير بن عدى "যদি কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখতে চায়, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গোপনে সাহায্য করে, তা হলে যেন উমায়র ইবন আদীকে দেখে।"

হযরত উমর (রা) বলেন, ঐ অন্ধকে দেখ, সে কেমন গোপনে আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, ওকে তোমরা অন্ধ বলো না, ও তো চক্ষুষ্মান। অর্থাৎ দৃশ্যত যদিও সে অন্ধ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সে চক্ষষ্মান। পবিত্র রমযানের পাঁচটি রাত বাকী থাকতে এ মহিলাকে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য যুরকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৩ এবং হাফিয ইবন তায়মিয়া প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول গ্রন্থ দেখুন। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৮ ও উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ২৯৩ দ্র.)।

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে একবার হযরত উমায়র (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : انطلقوا ابنا الى البصر الذى فى بنى واقف لعوده "আমাদেরকে ঐ চক্ষুষ্মানের কাছে নিয়ে চল, যে বনী ওয়াকিফে বাস করে। আমরা তার সেবা করব।"

হাফিয ইরাকী বলেন :

فبعثه عميرا الخطميا * لقتل عصما هجت النيا .

কারকারাতুল কুদর-এর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শাওয়াল মাসের প্রারম্ভে বনী সুলায়ম এবং বনী গাতফানের মিলিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে নবী (সা) দু'শ লোক নিয়ে বের হন। 'কুদর' নামক ঝর্ণার কাছে গিয়ে জানতে পান যে, ইসলামের দুশমনেরা পূর্বেই তাঁর আগমনের কথা জানতে পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। তিন দিন সেখানে অবস্থান করে যুদ্ধ ও লড়াই ছাড়াই তাঁরা ফিরে আসেন।

কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, এখান থেকে তিনি একটি ক্ষুদ্র দল তাদের শাস্তি দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন যাঁরা গনীমত হিসেবে পাঁচশত উট নিয়ে ফিরে আসেন।

শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনসমূহ এবং যিলকাদ মাস তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। আর ইত্যবসরে বদর যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাদের মুক্তি দেয়া হয়।[১]

আবূ আফক ইয়াহূদীকে হত্যা

শাওয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ আফক ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য হযরত সালিম[২] ইবন উমায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন।

---

১. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৪।

২. হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা) ছিলেন বদরী সাহাবী। আকাবায়ও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি অত্যধিক কাঁদতেন। কান্নার চিহ্ন বিশেষভাবে তাঁর চেহারায় বিদ্যমান ছিল। (ইসাবা, হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়)। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর সময়ে ইনতিকাল করেন। چون خدا خواهد كه ما يارى كند ثرميل مار اجانب زارى كند

আবূ আফক ছিল ধর্মের দিক থেকে ইয়াহূদী এবং সে ছিল এক'শ কুড়ি বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা বলত এবং লোকজনকে তাঁর শত্রুতা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। যখন তার পশুসুলভ আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, তখন হযরত (সা) তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ইরশাদ করলেন : من لى بهذا الخبيث "কে আছ, যে আমার জন্য অর্থাৎ আমার মান-মর্যাদার খাতিরে এ খবীসকে হত্যা করবে।"

হযরত সালিম ইবন উমায়র (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আগে থেকেই মান্নত করেছি যে, হয় আবূ আফককে হত্যা করব আর না হয় আমি নিজেই নিহত হব। রাসূলের কথা শোনামাত্রই সালিম (রা) তরবারি নিয়ে রওয়ানা দিলেন। গরমের রাত ছিল, আবূ আফক ছিল আলস্যের নিদ্রায় বিভোর। পৌঁছেই তিনি তার কলিজা বরাবর তরবারি রেখে এত জোরে চাপ দিলেন যে, আঘাত তার পিছন পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আল্লাহর দুশমন আবূ আফক জোরে একটা চিৎকার দিল। লোকজন দৌড়ে এলো, কিন্তু ততক্ষণে কাজ শেষ হয়ে গেছে।[১]

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

فبعثه سالما الى عفك * قتله ذى النبى وافك ·

"আর তিনি সালিমকে পাঠালেন আফকের প্রতি, তিনি তাকে হত্যা করেন নবী (সা)-কে কষ্ট দেয়া এবং মিথ্যে দুর্ণাম করার অভিযোগে।" (كذب وافترى على النبى ﷺ পৃ. ২৪)

বনী কায়নুকার যুদ্ধ (১৫ শাওয়াল, শনিবার, দ্বিতীয় হি.)

বনী কায়নুকা ছিল সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা)-এর ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় গোত্র। এরা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সাহসী। স্বর্ণকারের কাজ করত। শাওয়ালের পনের অথবা ষোল তারিখ শনিবারে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের বাজারে গেলেন এবং তাদেরকে একত্র করে ওয়ায করলেন :

يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقرش من النقمة واسلموا فانكم قد عرفتم انى نبى مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله اليكم ·

"ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অন্যথায় বদরের দিন যেভাবে কুরায়শ সম্প্রদায়ের প্রতি আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল, তেমনি তোমাদের উপর এসে না পড়ে। তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, এ জন্যে যে, তোমরা নিশ্চয়ই ভাল করেই জান যে, যেমনটি তোমরা তোমাদের কিতাবে লিখিত পেয়েছ এবং আল্লাহ যার

---

১. ইবন সাদ প্রণীত, তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১৯; ইবন তায়মিয়া প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول পৃ. ১০৩; উয়ূনুল আসার, পৃ. ২১৪ ও ৩১৪; যুরকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৫।

প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের ব্যাপারে তোমাদের ওয়াদা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহর সেই নবী ও রাসূল।"

ইয়াহূদীরা তাঁর কথা শোনামাত্র ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এবং উত্তরে বলল, আপনি এক অখ্যাত ও অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ কুরায়শের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে এতটা গর্ব করবেন না, আল্লাহর কসম, যদি আমাদের সাথে লাগতে আসেন, তা হলে বুঝবেন আমরা কতটা বীর পুরুষ। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْىَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ.

"দু'টি দলের পরস্পরে সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছিল আর অন্যদল ছিল কাফির, ওরা তাদের চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, তখন বনী কায়নুকা, বনী কুরায়যা এবং বনী নাযীরের সঙ্গে এ চুক্তি হয়েছিল যে, আমরা আপনার সাথে যুদ্ধও করব না এবং আপনার কোন শত্রুকে সাহায্যও করব না। কিন্তু সর্বপ্রথম বনী কায়নুকা এ চুক্তি ভঙ্গ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে রূঢ় জবাব দেয় ও যুদ্ধের সংকল্প গ্রহণ করে।

এরা মদীনা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করত। রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির আনসারী (রা)-কে নিযুক্ত করে বনী কায়নুকার উদ্দেশ্যে বের হন। ওরা কিল্লায় প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরই শাওয়াল থেকে পনরই যিলকদ পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা ষোলই তারিখে বেরিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পানি গ্রহণের অনুমতি দান করেন।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের অনুরোধের দরুন তিনি তাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন কিন্তু ধন-সম্পদ দখল করে নিয়ে তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন এবং গনীমতের মালসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মালের এক-পঞ্চমাংশ নিজে গ্রহণ করেন এবং অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ মুজাহিদগণের মধ্যে বিতরণ করে দেন। বদর যুদ্ধের পর এটা ছিল প্রথম এক-পঞ্চমাংশ যা রাসূলুল্লাহ (সা) স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত উবাদা ইবন সামিত (রা) বলেন, বনী কায়নুকার সাথে আমার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। তাদের নষ্টামী এবং অমানবিকতা দেখে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাদের সাথে বৈরী সম্পর্কের ঘোষণা করি :

يا رسول الله اتبرا الى الله والى روسله واتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرا من حلف الكفار وولايتهم ·

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমি আপনার দুশমনদের সাথে বৈরী এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে আমার বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী বানিয়ে নিচ্ছি এবং কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব এবং চুক্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে নিজকে মুক্ত করে নিচ্ছি।"[১]

দ্রষ্টব্য : এ হাদীস দ্বারা প্রকাশ পেল যে, ঈমানের জন্য যেমন আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিন বান্দাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা আবশ্যিক, অনুরূপভাবে আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা, ঘৃণা, অসন্তুষ্টি ও বৈরিতার ঘোষণা দেয়াও জরুরী।[২] ফিরে আসা, সম্পর্ক নয়, কেবল এ স্থানেই সত্যে পরিণত হয়। বিস্তারিতভাবে প্রয়োজন হলে আরিফে রব্বানী, মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)-এর মাকতুবাত দেখুন যে, ঈমানের জন্য কেবল সত্যায়নই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দুশমনদের সাথে বৈরিতা ও অসন্তুষ্টির উদ্রেক না হয়। আর তাই ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন, কুফরীর সাথে শত্রুতা ঈমানের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। তর্কশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে এমনটিই উল্লেখ আছে।

সাবীকের যুদ্ধ (দ্বিতীয় হিজরীর ৫ যিলহজ্জ)

মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় এবং ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ যখন মক্কায় পৌঁছল, তখন আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনা আক্রমণ না করেছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি অপবিত্রতার গোসল করব না।

কাজেই এ শপথ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথমভাগে দু'শ অশ্বারোহী সহ মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। মদীনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী 'উরায়য' নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে একটি খেজুর বাগানে প্রবেশ করে। সেখানে দু'জন মানুষ কৃষিকাজে নিমগ্ন ছিল। একজন আনসার এবং অপরজন ছিল মজুর। সে উভয়কে হত্যা করে এবং খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়ে ধারণা করে আমার শপথ পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর পলায়ন করে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) দু'শ আনসার ও মুহাজির সহ পাঁচই যিলহজ্জ রোববার আবূ সুফিয়ানকে প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায়নি, কেননা তারা পূর্বেই পালিয়েছিল। চলার পথে বোঝা হালকা রাখার জন্য ওরা সঙ্গে আনা ছাতুর থলেগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়। এ ছাতুর থলেগুলো মুসলমানগণ হস্তগত করেন বিধায় এ যুদ্ধের নাম 'গাযওয়াতুস সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ'।[৩]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩।

৩. যারকানী, ১খ. পৃ. ৪৫৮।

ঈদুল আযহা

রাসূলুল্লাহ (সা) নয়ই যিলহজ্জ সাবীক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দশই যিলহজ্জ দু'রাকাআত ঈদের নামায আদায় করেন ও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেন এবং মুসলমানগণকেও কুরবানী করার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল মুসলমানদের প্রথম কুরবানীর ঈদ।[১]

হযরত ফাতিমাতুয যোহরা (রা)-এর বিয়ে

একই বছর[২] রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে হযরত ফাতিমা যোহরার বিয়ে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সুসম্পন্ন করেন।

প্রথমত হযরত আবূ বকর (রা) এবং এরপর হযরত উমর (রা) এ সৌভাগ্য হাসিলের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি চুপ থাকেন। এক রিওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেছিলেন, আমি আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করছি। অতঃপর হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর মিলে হযরত আলী (রা)-কে পরামর্শ দেন যে, তুমি নিজের জন্য নবী-দুহিতাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। হযরত আলী এ নিঃস্বার্থ শুভাকাঙ্ক্ষীদ্বয়ের পরামর্শ অনুযায়ী নবীজীর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ আরয পেশ করেন। তিনি ওহীর নির্দেশ[৩] অনুসারে এ প্রস্তাব মঞ্জুর করেন।

হযরত আলী (রা) বলেন, আমি যখন বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর কসম, আমার কাছে তো কিছুই নেই, অথচ বিয়েতে কিছু না কিছুর প্রয়োজন তো হয়ই। কিন্তু তাঁর অনুগ্রহ, বিবেচনা আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি ও দয়ার ফলে সাহস সঞ্চার করে তাঁর দরবারে এ আবেদন পেশ করলাম।

তিনি বললেন, মোহরানা পরিশোধ করার মত তোমার কাছে কিছু আছে কি ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যে বর্মটি তুমি বদর যুদ্ধ পেয়েছিলে, সেটি কোথায় ? আমি আরয করলাম, তা তো আছে। তিনি বললেন, উত্তম, সে বর্মটিই ফাতিমাকে মোহর হিসেবে দিয়ে দাও। হাদীসটি আহমদ, ইবন সা'দ ও ইবন ইসহাক বর্ণনা করেছেন। [ইসাবা, হযরত ফাতিমা যোহরা (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত আলী বর্মটি হযরত উসমানের কাছে চারশ আশি দিরহামে বিক্রি করেন এবং সমুদয় দিরহাম নবী (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি বললেন, এর মধ্য থেকে সুগন্ধি এবং পোশাক ক্রয় করে নাও।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

২. অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীতেই। তবে মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, কোন মাসে যিলহজ্জ, মুহররম, নাকি সফর মাসে ? আল্লাহই ভাল জানেন।

৩. মু'জামে তাবারানীতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ফাতিমার বিয়ে আলীর সাথে দিয়ে দাও। এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য।–যারকানী, ৫খ. পৃ. ২২০।

৪. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কন্যাকে যেসব দ্রব্য উপহার দিয়েছিলেন, তা ছিল, একটি লেপ, একটি বালিশ, যার মধ্যে তুলার পরিবর্তে কোন গাছের আঁশ ভর্তি ছিল, দু'টি চাক্কি (যাঁতা), একটি মশক এবং দু'টি মাটির কলস। [আল্লামা মুনযিরী প্রণীত আত তারগীব ওয়াত তারহীব, الترغيب فى الاذكار بعد المكتوبات অধ্যায়[১] এবং ইমাম আহমদও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]।

যখন বাসরের সময় এলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলীকে বললেন, একটি ঘরের ব্যবস্থা কর। হযরত আলী ভাড়ায় একটি ঘর নিলেন এবং সেখানে বাসর উদযাপন করলেন। হযরত ফাতিমা পরামর্শ দিলেন যে, হারিসা ইবন নু'মানের ঘর চেয়ে নাও। হযরত আলী বললেন, আমি লজ্জাবোধ করি। যে কোনভাবে এ সংবাদ হযরত হারিসার কাছে পৌঁছে গেল। হারিসা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহর কসম, আপনি আমার জন্য যা পরিত্যাগ করবেন, তার চেয়ে আপনি যা গ্রহণ করবেন, তাই আমার নিকট বেশি প্রিয়। তিনি বললেন, صدقت بارك الله فيك "তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন।"[২] হারিসা নিজে অন্যত্র চলে গেলেন এবং হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমাকে নিজ গৃহে এনে নামিয়ে দিলেন। [ইবন সা'দ বর্ণিত। ইসাবা, হযরত ফাতিমা যোহরা (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়]।

গাতফান যুদ্ধ (তৃতীয় হিজরী)

এ যুদ্ধকে আনমার যুদ্ধ এবং যী আমর-এর যুদ্ধও বলা হয়।

সাবীক যুদ্ধ থেকে ফিরে যিলহজ্জ মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি মদীনাতেই অবস্থান করেন। ইত্যবসরে তিনি এ সংবাদ পান যে, বনী সালাবা এবং বনী মুহারিব (যা গাতফান গোত্রের দুটি শাখা ছিল) নজদ-এ একত্রিত হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদীনার আশেপাশে লুট-তরাজ করা। দাসূর গাতফানী নামক জনৈক ব্যক্তি ছিল তাদের সর্দার। তৃতীয় হিজরীর মুহররম মাসে তিনি গাতফান গোত্রকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে নজদের পথে মদীনা ত্যাগ করেন। হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন এবং চারশ' পঞ্চাশজন সাহাবী তাঁর সঙ্গী হন। গাতফানীরা তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েই পাহাড়ে আত্মগোপন করে, কেবল বনী সালাবার একটি লোক ধরা পড়ে। সাহাবীগণ তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির করে। তিনি লোকটিকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

১. প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ২৬০।

২ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমার সত্তাকে অদৃশ্য বরকত এবং আসমানী কল্যাণের খনি বানিয়ে দিন। এ অর্থ ইসমে যরফের কারণে বুঝা যায়। অতএব বুঝে নিন এবং এর উপর অবিচল থাকুন।

পূর্ণ সফর মাস তাঁরা সেখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু কেউই তাদের মুকাবিলা করার জন্য এলো না। ফলে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

এ সফরে এ ঘটনা সংঘটিত হয় যে, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসে এবং সাহাবাগণের কাপড়-চোপড় ভিজে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের কাপড় শুকানোর জন্য একটি গাছে ঝুলিয়ে দেন এবং ঐ বৃক্ষের নীচে শুয়ে পড়েন। সেখানে এক বেদুঈন তাঁকে দেখছিল। বেদুঈন তাদের সর্দার দাসূর, যে তাদের মধ্যে বড় বীরও ছিল, তাকে গিয়ে সংবাদ দেয় যে, মুহাম্মদ (সা) ঐ বৃক্ষের নীচে একাকী শুয়ে আছেন এবং তাঁর সাহাবীগণ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে আছেন। তুমি গিয়ে তাঁকে হত্যা করে এসো। দাসূর একটি ধারালো তরবারি নেয় এবং খোলা তরবারি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে, ওহে মুহাম্মদ, এবার বল, আজ তোমাকে আমার তরবারি থেকে কে রক্ষা করবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা রক্ষা করবেন। এ কথা বলার অপেক্ষামাত্র ছিল, হযরত জিবরাঈল (আ) তার বুকে জোরে করাঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে তরবারি ছিটকে পড়ে যায় এবং নবী (সা) তরবারিটি উঠিয়ে নেন এবং দাসূরকে বললেন, এবার বল, তোমাকে আমার তরবারি থেকে কে রক্ষা করবে ? সে বলল, কেউই নেই। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কালেমা اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করে। অতঃপর শপথ করে যে, এখন আর আপনার বিরুদ্ধে কোন ফৌজ জমা করব না। তিনি দাসূরকে তার তরবারি ফিরিয়ে দেন। দাসূর কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলো এবং বলল, আল্লাহর শপথ, আপনি আমার চেয়ে উত্তম। দাসূর যখন নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলো, তখন লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি যে কথা বলে গেলে, তা কোথায় গেল ? দাসূর তখন সমুদয় ঘটনা খুলে বলল এবং বলল, এভাবে অদৃশ্য থেকে আমার বুকে জোরে করাঘাত করা হলো, যাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। এভাবে পড়ে যাওয়ায় আমি চিনে ফেললাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, ঐ করাঘাতকারী কোন ফেরেশতা হবেন। এ জন্যে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম, তাঁর রিসালতের সাক্ষ্য দিলাম এবং নিজ সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ .

"হে মু'মিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলন করতে চেয়েছিল, তখন আল্লাহ তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।" (সূরা মায়িদা : ১১)

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২।

ইমাম বায়হাকী বলেন, এ ধরনের ঘটনা ও বর্ণনা যাতুর রিকা যুদ্ধের সময়েও বর্ণিত হয়েছে। ওয়াকিদী এ ঘটনাটিকে গাতফান যুদ্ধের সাথে বর্ণনা করেছেন। যদি তা যথার্থ হয় তবে এ দু'টি ছিল ভিন্ন ঘটনা। একটি গাতফান যুদ্ধের সময় এবং অপরটি যাতুর রিকা যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল, যেমনটি সামনে বর্ণনা আসবে।[১] আল্লামা যারকানী বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো, এ ঘটনা দু'টি ভিন্ন ভিন্ন।[২]

বুহরান যুদ্ধ

গাতফান যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) রবিউল আউয়াল মাস মদীনাতেই কাটান। রবিউস সানী মাসে তাঁর নিকট সংবাদ এলো যে, হিজায ভূমির খনিস্বরূপ, বুহরান নামক স্থানে বনী সুলায়ম[৩] গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে। সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি তিনশ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বুহরানের দিকে যাত্রা করলেন। মদীনার ভার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উম্মে মাকতূমের হাতে সোপর্দ করলেন।

নবী (সা)-এর আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং তিনি লড়াই ছাড়াই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বুহরানে তিনি কত দিন অবস্থান করেছিলেন এ ব্যাপারে সীরাত বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন, মাত্র দশ রাত অবস্থান করেছেন, আর কেউ বলেন, ষোলই জমাদিউল আউয়াল পর্যন্ত অবস্থান করেন।[৪]

ইয়াহূদী কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান (তৃতীয় হিজরীর ১৪[৫] রবিউল আউয়াল রাত্রিতে)

বদর যুদ্ধের বিজয় সংবাদ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছল, তখন ইয়াহূদী কা'ব ইবন আশরাফ খুবই দুঃখিত হলো এবং বলল, যদি এ সংবাদ সত্য হয় যে, মক্কার বড় বড় সর্দার এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিহত হয়েছে, তা হলে জমির উপরিভাগের চেয়ে নিম্নভাগই শ্রেয়। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম—যাতে এ অপমান-অপদস্থতা দেখতে না হয়।

কিন্তু যখন এ সংবাদ সত্য প্রমাণিত হলো, তখন সে বদর যুদ্ধে নিহতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশের লক্ষ্যে মক্কায় যাত্রা করল। নিহতদের স্মরণে শোকগাঁথা রচনা করে ও তা পাঠ করে করে নিজেই ক্রন্দন করছিল এবং অপরকেও কাঁদাচ্ছিল। সে

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২১০; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২।
২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৬।
৩. এ কারণে এ যুদ্ধকে বনী সুলায়মের যুদ্ধ ও বলা হয়।
৪. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৪।
৫. যারকানী, ২খ. পৃ. ৮; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯।

সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে লোকজনকে উৎসাহ দিয়ে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করছিল। একদিন সে কুরায়শদের নিয়ে হরম শরীফে আসে এবং কা'বার গিলাফ ধরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করে। কয়েকদিন পর সে মদীনায় ফিরে আসে এবং মুসলমান মহিলাদের জড়িয়ে প্রেম নিবেদনমূলক অশ্লীল কবিতা বলা শুরু করে।[১]

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবন আশরাফ একজন বড় কবি ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা রচনা করত, মক্কার কাফিরদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সব সময় উস্কানি দিত এবং মুসলমানদেরকে নানা ধরনের কষ্ট দিত।

রাসূলুল্লাহ (সা) সব সময় মুসলমানদেরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার আদেশ দিতেন কিন্তু যখন সে সব ধরনের অপকর্মের কোনটি থেকেই ক্ষান্ত হলো না, রাসূলুল্লাহ (সা) তখন নিজে শরীআতের প্রধান বিচারক হিসেবে কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে হত্যার আদেশ দেন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযীর বরাতে ফাতহুল বারী, কা'ব ইবন আশরাফ হত্যা অধ্যায়)।

এক বর্ণনায় আছে যে, একবার কা'ব ইবন আশরাফ তাঁকে দাওয়াতের বাহানায় আমন্ত্রণ করে এবং কিছু ব্যক্তিকে এ জন্যে মোতায়েন করে যে, যখন তিনি আসবেন, তখন যেন তাঁকে হত্যা করে। হযরত (সা) এসে বসেছেন এমন সময় জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে ওর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জিবরাঈল (আ)-এর পাখার ছায়ায় ফিরে চলে আসেন এবং তাকে হত্যার নির্দেশ দেন।[২]

সহীহ বুখারীতে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তোমাদের মধ্যে কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার জন্য কে প্রস্তুত আছ, সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে খুবই কষ্ট দিয়েছে।[৩] এ কথা শোনামাত্র হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি কি তার হত্যা কামনা করেন? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! তাহলে আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন (অর্থাৎ এমন কিছু দুর্বোধ্য, প্রশংসাসূচক এবং দ্ব্যর্থক বাক্য), যা শুনে সে দৃশ্যত আনন্দিত হয়। তিনি বললেন, অনুমতি রইল।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৯; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭১।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯।

৩. অপর এক বর্ণনায় আছে যে, নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি তার কবিতা দ্বারা আমাদেরকে খুবই কষ্ট ও নির্যাতন করছে এবং মক্কার মুশরিকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি (উৎসাহ) দিচ্ছে। (হাকিম তাঁর আল ইকলীল গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)—ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৯; যারকানী, ৩খ. পৃ. ১০।

মুহাম্মদ[১] ইবন মাসলামা (রা) একদিন কা'বের সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন এবং আলোচনার শুরুতে বললেন, এ ব্যক্তি [রাসূলুল্লাহ (সা)] (ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করার জন্য) আমাদের নিকট থেকে সদকা ও যাকাত চায়। আর এ ব্যক্তি আমাদেরকে কষ্টে ফেলেছে (নিঃসন্দেহে এটা লোভী ও অতৃপ্ত আত্মার জন্য খুবই কষ্টদায়ক কিন্তু নিঃস্বার্থ ও সত্যবাদীদের জন্য সৎ অন্তঃকরণে সদকা দান করা এবং ফকীর-মিসকীনদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা অত্যন্ত প্রিয় ও উন্নতমানের সুস্বাদু বস্তু, বরং আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় না করাটাই তাদের নিকট কষ্টদায়ক)।

আমি এক্ষণে আপনার নিকট ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এসেছি। কা'ব বলল, এখনই কেন, এর পরে দেখ, আল্লাহর কসম, তোমরা তার দ্বারা উত্যক্ত হবে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, এখন তো আমরা তাঁর অনুসারী হয়েছি, তাঁকে ত্যাগ করা আমরা পসন্দ করছি না, পরিণতির অপেক্ষায় আছি। (আর অন্তরে ছিল, পরিণতি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিজয় ও দুশমনের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং নিশ্চিত, যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই)। এ সময় আমরা চাচ্ছি যে, কিছু খাদ্যশস্য আমাদেরকে ঋণ হিসেবে দিন। কা'ব বলল, উত্তম, তবে তোমরা আমার কাছে বন্ধক হিসেবে কিছু রাখ। তারা বললেন, আচ্ছা, কি জিনিস বন্ধক রাখতে চান ? কা'ব বলল, তোমাদের স্ত্রীদেরকে[২] বন্ধক রাখ। তারা বললেন, নিজেদের স্ত্রীদেরকে কিভাবে বন্ধক রাখতে পারি, প্রথমত আত্মমর্যাদা ও সম্ভ্রমবোধ এর পরিপন্থি। আর এটাও সঠিক যে, আপনি অত্যন্ত সুন্দর, সুদর্শন এবং যুবক।[৩] কা'ব বলল, তোমরা তোমাদের কন্যাদেরকে বন্ধক রাখ। তারা বললেন, এটা তো সমস্ত জীবনের জন্য কলঙ্কস্বরূপ, মানুষ আমাদের সন্তানদেরকে এ বলে অভিসম্পাত দেবে যে, তোমরা তো তারাই, যারা দু' অথবা তিন সের খাদ্যশস্যের জন্য নিজ কন্যাদেরকে বন্ধক দিয়েছিলে। তবে হ্যাঁ, আমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি।

হযরত ইকরামা সূত্রে একটি মুরসাল বর্ণনায় আছে যে, তারা বলেছিলেন, আপনি জানেন, আমরা কতটা অস্ত্রের মুখাপেক্ষী এবং তা আমাদের কাছে কতটা প্রয়োজনীয়।

---

১. ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনায় আছে, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ওয়াদা করার পর কয়েকদিন পর্যন্ত চিন্তিত থাকেন। অবশেষে কাব ইবন আশরাফের দুধভাই আবূ নায়েলা সিলকান ইবন সালামা ইবন ওয়াক্কাশ, আব্বাদ ইবন বিশর, হারিস ইবন আওস এবং আবূ আবস ইবন জিবরান প্রমুখের সাথে মিলে পরামর্শ করেন। এতে সবাই ঐকমত্য প্রকাশ করেন এবং সমস্বরে বলে উঠেন, আমরা সবাই মিলে তাকে হত্যা করব। অতঃপর সবাই মিলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা), সেখানে গিয়ে কিছু না কিছু তো বলতে হবে। তিনি বললেন, যা ভাল মনে কর, তাই বলো, এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অনুমতি রইল। ইরশাদুস সারী।

২. এর দ্বারা এ ব্যক্তির অভ্যন্তরীন পাপাচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩. যুবক শব্দটি ইবন ইসহাকের বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।

কিন্তু এমতাবস্থায় আমরা আমাদের অস্ত্র আপনার কাছে বন্ধক রাখতে পারি। কিন্তু নিজেদের স্ত্রী ও কন্যা বন্ধক রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কা'ব তা মেনে নিল এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, রাত্রিকালে এসে শস্য নিয়ে যাবে ও অস্ত্র বন্ধক রেখে যাবে।

ওয়াদামাফিক এরা রাত্রিতে এসে উপস্থিত হলেন এবং কা'বকে ডাকলেন। কা'ব তার ঘর থেকে বের হতে চাইল। তার স্ত্রী বলল, এ সময় কোথায় যাচ্ছ ? কা'ব বলল, মুহাম্মদ ইবন মাসলামা এবং আমার দুধভাই আবূ নায়লা এসেছে, অপর কেউ নয়, তুমি চিন্তা করো না। স্ত্রী বলল, এ আওয়াজ থেকে আমি রক্তের আভাস পাচ্ছি। কা'ব বলল, সম্ভ্রান্ত বংশের কাউকে যদি রাত্রিকালে বর্শাঘাত করার জন্যও ডাকা হয়, তবুও তার যাওয়া দরকার। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা তার সঙ্গীদেরকে বুঝালেন যে, কা'ব এলে আমি তার চুলের ঘ্রাণ নেব। যখন দেখবে যে, আমি মযবূতভাবে তার চুল ধরেছি, তখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য দ্রুত তার মাথাটা কেটে ফেলবে। কাজেই যখন কা'ব এলো, তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুগন্ধি ছড়াচ্ছিল। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আজকের মত এমন সুগন্ধির ঘ্রাণ তো আমি কখনো পাইনি। কা'ব বলল, আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা সুদর্শন, সুন্দরী এবং সবচে' সুগন্ধিযুক্ত স্ত্রীলোক রয়েছে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আপনি কি আমাকে আপনার সুগন্ধিযুক্ত চুলের ঘ্রাণ নেয়ার অনুমতি দেবেন ? কাব বলল, হ্যাঁ, অনুমতি দিলাম। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা অগ্রসর হয়ে নিজেও তার চুল শুঁকলেন এবং সঙ্গীদেরকেও শোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর মুহাম্মদ ইবন মাসলামা বললেন, আপনি কি দ্বিতীয়বার আমাকে চুল শোঁকার অনুমতি দেবেন ? কা'ব বলল, তোমার ইচ্ছেমত। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা উঠলেন এবং চুল শুঁকতে মনযোগী হলেন। যখন মাথার চুল দৃঢ়ভাবে ধরলেন ও সঙ্গীদেরকে ইঙ্গিত দিলেন, তারা সবাই তখন দ্রুত তার মাথা কেটে ফেলল এবং চটজলদি কাজ সমাপ্ত করল।[১]

আর শেষরাতে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাদের দেখামাত্র বললেন : افلحت الوجـوه "ঐ চেহারাগুলো সফল হয়েছে।" তারা উত্তরে বললেন : ووجهـك يا رسـول الله "আর সর্ব প্রথম হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পবিত্র চেহারা।"

এরপ তারা কা'ব ইবন আশরাফের কর্তিত মাথা তাঁর সামনে পেশ করলেন। তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।[২]

ইয়াহূদীরা যখন এ ঘটনার সংবাদ পেল, তখন অত্যন্ত চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়ল এবং প্রভাত হলে ইয়াহূদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করল, আমাদের সর্দারকে এভাবে মারা হয়েছে। তিনি বললেন, সে

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬০।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

মুসলমানদেরকে নানা ধরনের কষ্ট দিত এবং লোকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কানি দিত। ইয়াহূদীরা রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল এবং কোন উত্তর দিতে সক্ষম হলো না। এরপর তিনি তাদের নিকট থেকে এ মর্মে চুক্তিনামা লিখিয়ে নিলেন যে, ভবিষ্যতে ইয়াহূদীদের মধ্যে কেউ এ ধরনের তৎপরতায় লিপ্ত হবে না। (তাবাকাতে ইবন সা'দ)

কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার কারণসমূহ

হাদীসের বর্ণনাসমূহ দ্বারা কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যার যে সমস্ত কারণ পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ :

১. নবী করীম (সা)-এর মর্যাদার পরিপন্থি অমানবিক অপবাদ, গালি গালাজ এবং বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা মুখে উচ্চারণ,

২. তাঁর নিন্দাসূচক কবিতা বলা,

৩. কবিতা এবং চটুল ছড়া কেটে মুসলমান মহিলাদের প্রতি অশালীন অপবাদ আরোপ করা,

৪. বিশ্বাস ঘাতকতা ও চুক্তিভঙ্গ করা,

৫. মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ও উস্কানি দেয়া এবং তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করা,

৬. দাওয়াতের বাহানায় তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা এবং

৭. ইসলাম ধর্মকে বিদ্রূপ করা।

কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ডদানের সবচে' শক্তিশালী কারণ হলো আল্লাহর রাসূলের প্রতি অপবাদ আরোপ, তাঁকে গালি গালাজ করা ও তাঁর নিন্দায় কবিতা রচনা করা ।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া (র) তাঁর الصارم المسلول على شاتم الرسول গ্রন্থে (পৃ. ৭০-৯১) এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইমাম যুহরী বলেন, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُواْ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوا اَذًى كَثِيْراً (তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের এবং মুশরিকদের নিকট থেকে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে।-সূরা আলে ইমরান : ১৮৬) কা'ব ইবন আশরাফ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (উয়ূনুল আসার, ১খ. পৃ. ৩০০)।

হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা) এ প্রসঙ্গে এই কবিতা বলেন :

صرخت به فلم يعرض لصوتى * واوفى طالعا من راس جدم
فعدت له فقال من المنادى * فقلت اخوك عباد بن بشر

وهذای در عنار هنا فخذها * لشهر ان اوفى او نصف شهر
فاقبل نحونا يهوى سريعا * وقال لنا لقد جئتم لامر
وفى ايماننا بيض حداد * مجربه بها الكفار نفرى
فعانقه ابن مسلمة المردى * به الكفار كالليث الهزبر
وشد بسيفه صلتا عليه * فقطره كالليث الهزبر
وشد بسيفه صلتا عليه * فقطره ابو عبس به جبر
وكان الله سادسنا فابنا * بانعم نعمة واعز نصر
وجاء برأسه نفر كرام * هم ناهيك من صدق وبر

হাফিয ইরাকী তার আলফিয়াতুস সিয়ার গ্রন্থে বলেন :

فبعثه محمد بن مسلمة * فى رفعة لقتل كعب الملامة
جاؤا برأسه فاقدموه * قال لهم افلحت الوجوه

হযরত হুয়ায়সা ইবন মাসঊদ (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কা'ব ইবন আশরাফকে মৃত্যুদণ্ডদানের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে এ নির্দেশ দেন যে, এ চরিত্রের ইয়াহূদীদের যেখানে পাও, তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, তাদের হত্যা করো। কাজেই এই দণ্ডাদেশ অনুযায়ী হুয়ায়সা ইবন মাসঊদের ছোট ভাই মুহায়সা ইবন মাসঊদ ইবন সুবায়না নামক জনৈক ইয়াহূদীকে হত্যা করে ফেলেন। সে ছিল ব্যবসায়ী এবং স্বয়ং হুয়ায়সা, মুহায়সা এবং অপরাপর মদীনাবাসীর সাথে শত্রুতা পোষণ করত।

হুয়ায়সা তখনো মুসলমান হননি কিন্তু মুহায়সা পূর্বে থেকেই মুসলমান ছিলেন। হুয়ায়সা যেহেতু বয়সে বড় ছিলেন, ছোটভাইকে ধরে মারতে শুরু করলেন এবং বললেন, রে আল্লাহর দুশমন, তুই তাকে হত্যা করলি ! আল্লাহর কসম, ওর মাল দ্বারা তোর পেটে কতটা চর্বি জমেছে। মুহায়সা বললেন : واللّٰهُ لقد امرنى بقتله من لو امرنى بقتلك لضربت عنقك "আল্লাহর কসম, তাকে হত্যার জন্য আমাকে এমন সত্তার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যদি সে মহান সত্তা তোমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিতেন, তা হলে আমি নিঃসন্দেহে তোমাকেও হত্যা করতাম।

হুয়ায়সা বললেন : اللّٰه لو امرك بقتلى لقتلتنى "আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ যদি আমাকে হত্যার জন্য তোকে নির্দেশ দেন, তা হলে সত্যি সত্যিই তুই কি আমাকে হত্যা করবি ?"

মুহায়সা বললেন : نعم واللّٰه لو امرنى بضرب عنقك لضربتها "হ্যাঁ, আল্লাহ কসম, যদি তোমার মাথা কেটে ফেলারও নির্দেশ দিতেন তবে অবশ্যই আমি তাই করতাম।"

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদেশ পেলে তুমি যে আমার ভাই এ চিন্তাও করতাম না। শুনে হুয়ায়সা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল এবং অবচেতনভাবে বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এটাই প্রকৃত দীন, যা অন্তরে এমনিভাবে দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার সৃষ্টি করে। এরপর হুয়ায়সা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং সাচ্চা দিলে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর অভিযান (তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানীর প্রথমভাগ)

বদর যুদ্ধের ঘটনার পর মক্কার কুরায়শগণ মুসলমানদের প্রতি এতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তাদের আক্রমণের ভয়ে নিজেদের পুরাতন পথে চলাচল পর্যন্ত ছেড়ে দিল। সুতরাং সিরিয়ার পথ বর্জন করে তারা ইরাকের পথ গ্রহণ করল এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে মজুরীর বিনিময়ে ফুরাত ইবন হায়্যান আজালীকে সঙ্গে নিল। আর মক্কা থেকে প্রচুর পণ্য সামগ্রী সহ একটি বাণিজ্য কাফেলা ইরাকের পথে রওয়ানা হলো। এ কাফেলায় আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াও ছিলেন (মক্কা বিজয়ের সময় এ চারজনই ইসলাম গ্রহণে ধন্য হন)।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে একশত সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করলেন। তারা উপস্থিত হয়েই বাণিজ্য বহরে আক্রমণ করে বসলেন। এতে কাফেলা তো দখল করলেন, কিন্তু গোত্রপতি, সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এবং কাফেলার লোকজন পালিয়ে গেল। কেবল ফুরাত ইবন হায়্যান আজালীকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে এলেন। ফুরাত মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। মালে গনীমতের প্রাচুর্য এরদ্বারা বুঝা যায় যে, যখন এ মালের এক-পঞ্চমাংশ পৃথক করা হলো, তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল বিশ হাজার দিরহাম। এতে বুঝা যায়, সমুদয় মালের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ দিরহাম।[১]

আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড (তৃতীয় হিজরীর মধ্য জমাদিউস সানী)

আবূ রাফে' ছিল একজন ধনাঢ্য ইয়াহূদী ব্যবসায়ী। আবূ রাফে' ছিল তার উপাধি, আর তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবন আবুল হুকায়ক। তাকে বাল্লাম ইবন আবুল হুকায়কও বলা হতো। খায়বরের নিকটে এক উপত্যকায় সে বাস করত। সে ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভয়ঙ্কর শত্রু এবং তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সে ছিল কাব ইবন আশরাফের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সাহায্যকারী। এই ব্যক্তিই আহযাব যুদ্ধে মক্কার কুরায়শদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়ে

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭।

তাদেরকে সাহায্য করে। এছাড়া সে সব সময়েই মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করত।[১]

কা'ব ইবন আশরাফের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরকারী হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা এবং তাঁর সঙ্গীগণ (রা) যেহেতু সবাই আওস গোত্রের লোক ছিলেন, সেহেতু খাযরাজ গোত্রের মনে এ ধারণার উদয় হলো যে, আওস গোত্র তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একজন প্রাণঘাতী শত্রু, রাসূলের দরবারের একজন অপরাধী ও উদ্ধত আচরণকারী কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা করে সৌভাগ্য ও মর্যাদা হাসিল করেছে, কাজেই আমাদেরও উচিত রাসূলের অপর শত্রু, অপরাধী ও উদ্ধত আচরণকারী আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে হত্যার উভয় জাহানের সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা। সুতরাং তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবূ রাফে'র মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তিনি অনুমতি দান করেন।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক, মাসঊদ ইবন সিনান, আবদুল্লাহ ইবন উনায়স, আবূ কাতাদা, হারিস ইবন রিবঈ এবং খুযাঈ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে তাকে হত্যার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা)-কে এ দলের নেতা মনোনীত করেন এবং বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, কোন শিশু ও স্ত্রীলোকে যেন কখনই হত্যা না করা হয়।[৩]

তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানী মাসের মাঝামাঝি[৪] সময়ে আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) তাঁর সঙ্গিগণ সহ খায়বরের দিকে যাত্রা করেন (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৬)। সহীহ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মানুষ যখন নিজ নিজ পশুপালকে চারণভূমি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, তখন এঁরা খায়বরে এসে উপস্থিত হন। আবূ রাফে'-এর কিল্লা যখন নিকটবর্তী হলো, তখন আবদুল্লাহ ইবন আতীক (রা) তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এখানেই বসে অপেক্ষা কর। আমি ভিতরে প্রবেশের কোন উপায় খুঁজে বের করি। যখন দরজার একদম নিকটবর্তী হলাম, তখন কাপড় মুড়ি দিয়ে এভাবে বসে পড়লাম, যেমনভাবে মানুষ তার প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বসে থাকে। দারোয়ান আমাকে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩৭।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬২।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৪. এটা ইমাম তাবারীর বক্তব্য, ইবন সাদ বলেন আবূ রাফে' নিহত হওয়ার ঘটনা ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়। কেউ বলেন, এটা চতুর্থ অথবা পঞ্চম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ঘটনা আর কেউ বলেছেন, তৃতীয় হিজরীর রজব মাসে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে ইমাম যুহরী সূত্রে বলেন, আবূ রাফে' কাব ইবন আশরাফের পর নিহত হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৬৩।

তাদের নিজেদের লোক ভেবে বলল, ওহে আল্লাহর বান্দা, ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে তাড়াতাড়ি এসো। আমি দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি। আমি দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করলাম এবং লুকিয়ে একপাশে বসে পড়লাম।

আবূ রাফে' প্রাসাদে বাস করত এবং রাতে সেখানে গল্পের আসর বসত। যখন গল্পের আসর শেষ হয়ে গেল এবং লোকজন নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেল, তখন দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিল এবং চাবির গোছা এনে একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখল।

যখন সবাই নিদ্রা গেল, আমি উঠে খুঁটি থেকে চাবির গোছা নামিয়ে নিয়ে দরজা খুলে প্রসাদের ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমি যে দরজাই খুললাম, ভিতরে প্রবেশ করে তা বন্ধ করে দিলাম যাতে লোকজন আমার আগমন সংবাদ পেলেও আমি আমার কাজ শেষ করতে পারি।

প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তা অন্ধকারাচ্ছন্ন, আর আবূ রাফে' তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে শুয়ে ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে, আবূ রাফে' কোথায় এবং কোনদিকে। আমি ডাক দিলাম, ওহে আবূ রাফে'। আবূ রাফে' বলল, কে ? আমি ভয়ে ভয়ে তার আওয়াজ লক্ষ্য করে তরবারি চালালাম। কিন্তু তা বিফল হলো। আবূ রাফে' একটা চিৎকার দিল। একটু পরে আমি কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে সহানুভূতির সুরে বললাম, আবূ রাফে' এটা কিসের শব্দ ? আবূ রাফে' বলল, এক্ষুণি কোন ব্যক্তি আমার উপর তরবারি চালিয়ে ছিল। শোনামাত্র আমি দ্বিতীয়বার তরবারি চালালাম, যার ফলে সে গুরুতর আহত হলো। এরপর আমি তরবারির সম্মুখভাগ তার পেটের উপর রেখে এত জোরে চাপ দিলাম যে, তা পিঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ফলে আমি বুঝতে পেলাম, আমি তার সমাপ্তি ঘটাতে পেরেছি। এবারে আমি ফিরে চললাম এবং একটি একটি দরজা খুলে অগ্রসর হলাম। যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম, তখন মনে হলো মাটির কাছে এসে পড়েছি। এতে নামতে গিয়ে পড়ে গেলাম এবং আমার পায়ের গোছার হাড় ভেঙ্গে গেল। চাঁদনী রাত ছিল, আমি আমার পাগড়ি খুলে পা বাঁধলাম এবং সঙ্গীদের কাছে এসে বললাম, তোমরা যাও এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সুসংবাদ দাও। আমি এখানেই বসে রইলাম এবং ওর মৃত্যু ও নিহত হওয়ার ঘোষণা শুনে আসব। কাজেই যখন প্রভাত হলো এবং মোরগ বাঁক দিতে শুরু করল, তখন ঘোষণাকারী কিল্লার চূড়ায় উঠে তার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল। তা শুনে আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলাম এবং সঙ্গীদের মিলিত হয়ে বললাম, দ্রুত চল, আল্লাহ আবূ রাফে'কে ধ্বংস করেছেন। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম ও তাঁকে এ সুসংবাদ দিলাম এবং সমুদয় ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। তিনি বললেন, তোমার পা বিছিয়ে দাও। আমি পা বিছিয়ে দিলাম। তিনি তাতে তাঁর পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন। আমার মনে হল যে, পায়ে কোনদিন কোন আঘাতই ছিল না। (সহীহ বুখারী, আবূ রাফে' হত্যা অধ্যায়; ফাতহুল বারী, আবূ রাফে' হত্যা অধ্যায়; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩৮)।

হাফিয ইরাকী (র) বলেন :

فبخثه لابن عتيك معه * قوم من الخروج كى تمنعه
لخيبر لابن ابى الحقيق * لقتله اعين بالتوفيق
واختلفوا فقيل ذا فى السادسه * او ثالث او رابع او خامسه

উহুদ[১] যুদ্ধ
(তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাস)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ "স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট থেকে প্রভাতে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মু'মিনদেরকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করছিলে" (সূরা আলে ইমরান : ১২১)।

মক্কার কুরায়শগণ যখন বদর যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে, তখন জানতে পায় যে, ঐ বাণিজ্য কাফেলা যা আবূ সুফিয়ান সমুদ্রোপকূলবর্তী পথ দিয়ে নিরাপদে নিয়ে এসেছিলেন, তা মূলধন ও লভ্যাংশসহ আমানত হিসেবে দারুন নাদওয়ায় সুরক্ষিত রয়েছে। বদরে এভাবে অত্যন্ত শোচনীয় ও অপমানজনক পরাজয়ের বেদনা তো সবার অন্তরেই ছিল, কিন্তু যাদের পিতা বা পুত্র, ভাই বা ভ্রাতুষ্পুত্র, আত্মীয় বা আপনজন বদরে নিহত হয়েছিল, থেকে থেকে তাদের অন্তর দগ্ধীভূত হচ্ছিল। আর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তো প্রত্যেকের বুকেই ছিল লুক্কায়িত।

অবশেষে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব,[২] আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়া, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশাম, হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা, সাফওয়ান ইবন উমায়্যা এবং অপরাপর নেতৃস্থানীয় কুরায়শগণ এক বৈঠকে একত্রিত হল। এ উদ্দেশ্যে যে, বাণিজ্য কাফেলার মালামাল আমানত হিসেবে সংরক্ষিত আছে, তণ্ধ্যে মূলধন তো অংশীদারদের মধ্যে তাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করা হবে, আর লভ্যাংশ সম্পূর্ণটাই মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যয় করা হবে যাতে আমরা

---

১. মদীনা মুনাওয়ারার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম উহুদ, যা মদীনা থেকে কম-বেশি দু'মাইল দূরে অবস্থিত। উহুদকে এ জন্যে উহুদ বলা হয় যে, এ পাহাড়টি অন্য কোন পাহাড়ের সাথে সংযুক্ত নয়, বরং একক একটি পৃথক পাহাড়। আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৫।

২ বদর যুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের পুত্র হানযালা, ইকরামার পিতা আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশামের ভাই আবূ জাহল ইবন হিশাম এবং সাফওয়ান ইবন উমায়্যার পিতা উমায়্যা নিহত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন উবাই, রবীয়া, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, হারিস ইবন হিশাম, হুয়ায়তিব এবং সাফওয়ান সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন (রা)। যারকানী, ২খ. পৃ. ২০।

মুসলমানদের থেকে নিজেদের পিতা ও পুত্র, আত্মীয় ও আপনজন, নেতা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। একবাক্যে এবং আগ্রহভরে সবাই এ প্রস্তাব সমর্থন করল এবং বাণিজ্যের সম্পূর্ণ লভ্যাংশ, যার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার দীনার, এর সবটাই এ উদ্দেশ্যে জমা দেয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ٠

"আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার জন্য কাফিরগণ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর তা তাদের মনোকষ্টের কারণ হবে, এরপর তারা পরাভূত হবে।" (সূরা আনফাল : ৩৬)

কুরায়শগণ কর্তৃক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া

মোট কথা, কুরায়শগণ যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং স্ত্রীলোকদেরও সঙ্গে নিল যাতে তারা ছড়া (রাজায) ও কবিতা আবৃত্তি করে যোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে পারে এবং পলায়নকারীদের ধিক্কার দেয়। অধিকন্তু যোদ্ধারা স্ত্রীলোকের কাছে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সর্বান্তকরণে প্রাণপণ যুদ্ধ করে পিছনে বসে থাকার চিন্তাও না করে। তারা বিভিন্ন গোত্রের প্রতি দূতও প্রেরণ করে যাতে তারা অংশগ্রহণ করে শক্তি বৃদ্ধি করে। এভাবে তিন হাজার যোদ্ধা জমা হয়ে যায়, যাদের মধ্যে সাতশত ছিল বর্ম পরিহিত। অধিকন্তু দু'শত ঘোড়া, তিন হাজার উট ও পনেরজন স্ত্রীলোক সহযাত্রী ছিল। এই তিন হাজার সুসজ্জিত যোদ্ধা আবূ সুফিয়ান ইবন হারবের নেতৃত্বে খুবই শান-শওকতের সাথে তৃতীয় হিজরী সনের পাঁচই শাওয়াল মক্কা থেকে যাত্রা করল। (তাবাকাতে ইবন সাদ, ২খ. পৃ. ২৫, প্রথম ভাগ; যারকানী, ২খ. পৃ. ২০; তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৯)।

হযরত আব্বাস (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরায়শের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ

হযরত আব্বাস (রা) এ সমুদয় ঘটনা লিখে দ্রুতগামী এক ভৃত্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে প্রেরণ করেন এবং ভৃত্যকে তাগিদ দেন যে, যেভাবেই হোক, তিনদিনের মধ্যেই এ পত্র তাঁর কাছে পৌঁছাবে।[১]

মহানবী (সা) কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ

এ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি হযরত আনাস এবং মূনিস (রা)-কে কুরায়শ বাহিনীর

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১।

সংবাদ নেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা ফিরে এসে সংবাদ দেন যে, কুরায়শের বাহিনী মদীনার অত্যন্ত নিকটে এসে পড়েছে। এরপর তিনি হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা)-কে শত্রুসেনার সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করার জন্য প্রেরণ করেন যে, তাদের সেনা সংখ্যা কত হতে পারে। তিনি এসে সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র এবং হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) সমস্ত রাত মসজিদে নববী পাহারা দেন এবং শহরের চারপাশেও পাহারা বসানো হয় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৫, প্রথম ভাগ)। এটা ছিল জুমুআর রাত, প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে পরামর্শ করেন। প্রবীণ মুহাজির ও আনসারগণ পরামর্শ দেন যে, মদীনাতেই অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ করা হোক। কিন্তু যে সকল যুবক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, এবং শাহাদত লাভের আগ্রহে অস্থিরচিত্ত ছিলেন, তাদের পরামর্শ ছিল মদীনা থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করা হোক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি স্বপ্নে[১] দেখলাম আমি একটি শক্তিশালী বর্ম পরিধান করে আছি এবং একটি গাভী যবেহ করছি। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো, মদীনা একটি শক্তিশালী বর্মের মত আর গাভী যবেহে এদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, এতে আমার সাহাবিগণের মধ্যে কিছু লোক শহীদ হয়ে যাবে। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত হলো, মদীনাকেই দূর্গ হিসেবে অবস্থান করে মুকাবিলা করা হোক। আমি স্বপ্নে আরো দেখেছি যে, আমি তরবারি ঘুরাতেই এর সামনের অংশ ভেঙে পড়ে গেল। আবার ঐ তরবারি দ্বিতীয়বার ঘুরানোর সময় তা পূর্বের চেয়ে উত্তম হয়ে গেল। যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন তরবারি সদৃশ, যাঁদের তিনি শত্রুর প্রতি প্রেরণ করতেন। সাহাবীগণকে জিহাদে নিয়ে যাওয়া ছিল তরবারি ঘুরানোর মত, প্রথমবার ঘুরানো অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধে এর সামনের অংশ ভেঙে পড়ে যায়, অর্থাৎ কিছু সাহাবা শহীদ হয়ে যান। আবার ঐ তরবারিকেই অপর যুদ্ধে ব্যবহার করাকালে তা পূর্বাপেক্ষা উত্তম ও তীক্ষ্ণ প্রমাণিত হয় এবং দুশমনদের উপর ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই থেকেও তার সাবধানতা ও অভিজ্ঞতার দরুন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। সে বলল, আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যখন কোন দুশমন মদীনা আক্রমণ করেছে এবং মদীনাবাসী শহরে অবস্থান করে মুকাবিলা করেছে, তখন বিজয় লাভ হয়েছে, আর যখন বাইরে বেরিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে, তখন পরাজিত হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি মদীনা থেকে বেরুবেন না, আল্লাহর কসম, যখনই আমরা মদীনা থেকে বাইরে বেরিয়েছি, তখনই শত্রুর দ্বারা কষ্ট পেয়েছি। আর যখন আমরা মদীনায় অবস্থান করেছি আর শত্রু আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তখন তারাই আমাদের হাতে কষ্ট পেয়েছে। আপনি মদীনায়ই অবস্থান করুন আর যদি শত্রু একান্তই মদীনায় ঢুকে পড়ে, তখন আমাদের পুরুষেরা

---

১. এ স্বপ্ন তিনি ঐ জুমুআর রাতেই দেখেছিলেন। যেমনটি তাবাকাতে ইবন সা'দে (২খ. পৃ. ২৬) বর্ণিত হয়েছে।

তরবারি দিয়ে তাদের মুকাবিলা করবে আর মহিলা ও শিশুগণ ছাদ থেকে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করবে। আর যদি তারা বাইরে থেকেই অকৃতকার্য হয়ে ফিরে যায়, তবে তা হবে ভিন্ন ব্যাপার।[১]

কিন্তু কতিপয় প্রবীণ এবং যুবক এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখায় যে, মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের উপর আক্রমণ চালানো হোক। আর তারা আরয করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো এ দিনটির কামনা ও আশায় ছিলাম এবং এর জন্যে প্রার্থনা করে আসছিলাম। আল্লাহ ঐ দিন এনেছেন এবং সময়ও সন্নিকটে। হযরত হামযা, হযরত সা'দ ইবন উবাদা ও হযরত নু'মান ইবন মালিক (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! যদি আমরা মদীনায় বসেই তাদের প্রতিহত করি, তাহলে তো তারা আমাদেরকে আল্লাহর পথে কাপুরুষ ভাববে। হযরত হামযা (রা) আরো বললেন : والذى انزل عليك الكتاب لا اطعم اليوم طعاما حتى اجالدهم بسيفى خارج المدينة "ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যতক্ষণ না আমি মদীনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলা করেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি খাদ্য গ্রহণ করব না।"[২]

হযরত নুমান ইবন মালিক আনসারী (রা) আরয করলেন : يا رسول الله لاتحرمنا الجنة فوالذى بعثك بالحق لادخلن الجنة "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা)! আমাদেরকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করবেন না। কসম ঐ সত্তার, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব।"

তিনি বললেন, কিসের ভিত্তিতে ? নুমান (রা) আরয করলেন : لانى اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ولا افر ليوم الزحف "এ জন্যে যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি যুদ্ধ থেকে কখনই পলায়ন করি না।"

অপর এক বর্ণনায় এ বাক্যাবলী রয়েছে : لانى احب الله ورسوله "এ জন্যে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।" তিনি বললেন : صدقت "তুমি সত্যিই বলেছ।"

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন দেখলেন জান্নাতের ভালবাসায় এবং শাহাদতের কামনায় যুবকদের দাবি তো প্রথম থেকেই ছিল যে, মদীনা থেকে বাইরে গিয়ে আক্রমণ করা হোক। অন্যদিকে মুহাজির ও আনসারী প্রবীণ সাহাবীর মধ্যেও কয়েকজন, যেমন হযরত হামযা, হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) প্রমুখ শাহাদতের কামনায় ব্যাকুল এবং অস্থির হয়ে পড়েছেন, তাঁদের রায়ও অনুরূপ। কাজেই তিনিও এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন।

---

১. তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ১০।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৩।

দিনটি ছিল শুক্রবার। জুমু'আর নামায আদায় শেষে তিনি বক্তব্য রাখলেন এবং জিহাদে উদ্বুদ্ধ করলেন ও প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

এ কথা শোনামাত্র নিঃস্বার্থ মহব্বতকারী, আল্লাহর পথে আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ আল্লাহ-প্রেমিকগণের মনে আশার সঞ্চার হলো যে, পার্থিব এ ঝঞ্ঝাটময় জেলখানা থেকে আমাদের মুক্তির সময় সমাগত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রস্তুতি ও অস্ত্র সজ্জা

আসরের নামায শেষে তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং সাহিবায়ন (তাঁর দু' সঙ্গী, যাঁরা পৃথিবীতেও তাঁর সাথে আছেন, আলমে বরযখে তাঁর সঙ্গে থাকবেন, হাশরের ময়দান, কাউসার নহরের পার্শ্বে এবং জান্নাতেও তাঁর সাথে থাকবেন) অর্থাৎ হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-ও তাঁর সাথে হুজরায় প্রবেশ করলেন।

তিনি তখনো হুজরা থেকে বের হননি, ইত্যবসরে হযরত সা'দ ইবন মু'আয এবং হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) লোকজনকে বলছিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে শহরের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করতে বাধ্য করেছ, অথচ তাঁর প্রতি আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়ে থাকে। উচিত কর্ম এটাই যে, তাঁর সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হোক। এমনি সময়ে তিনি বর্ম পরিধান করে, যুদ্ধ সাজ এবং অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমরা ভুলক্রমে আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপ দিয়েছি, যা আমাদের জন্য উচিত ছিল না। এখন আপনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। তিনি বললেন, অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার পর আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ না করে তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য[1] বৈধ নয়। এখন আল্লাহর নাম নিয়ে অগ্রসর হও এবং আমি যা নির্দেশ দিই, তা মান্য কর। আর মনে রেখো, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ধৈর্যধারণকারী ও অবিচল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সাহার্য ও বিজয় তোমাদের জন্যই অবধারিত।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুদ্ধযাত্রা এবং সেনাবাহিনীর বিন্যাস

এগারই শাওয়াল জুমুআর দিন আসরের নামায অন্তে এক হাজার সঙ্গীসহ তিনি মদীনা থেকে যাত্রা করেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয ও হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) বর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁর সামনে ছিলেন। আর অপরাপর মুসলমানগণ তাঁর ডানে-বামে চলছিলেন। (এতদসমুদয় বিবরণ বিস্তারিতভাবে 'তাবাকাতে ইবন সা'দ' এবং 'যারকানী'তে উল্লিখিত আছে)।

---

১. এরদ্বারা বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ কেবল তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং সকল পয়গাম্বর (আ)-এর প্রতিই এ নির্দেশ ছিল যে, অস্ত্র সজ্জিত হওয়ার পর শত্রুর মুকাবিলা না করে তা খুলে ফেলা বৈধ নয়। এর দ্বারা এও জানা গেল যে, নফল ও মুস্তাহাব কাজ শুরু করার পর তার হুকুম ওয়াজিব হয়ে যায়।

মদীনা থেকে বেরিয়ে যখন তিনি শায়খাইন[১] নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন সেনাবাহিনীর পরিসংখ্যান নিলেন। এর মধ্যে যারা অল্পবয়স্ক ও ছোট ছিল তাদের তিনি ফিরিয়ে দিলেন। যাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিল :

১. হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা),
২. হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা),
৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা),
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা),
৫. হযরত উসায়দ ইবন যুহায়র (রা),
৬. হযরত আরাবা ইবন আওস (রা),
৭. হযরত বারা ইবন আযিব (রা),
৮. হযরত যায়দ ইবন আরকাম (রা)।

ইমাম শাফিঈ বলেন, তাঁর খিদমতে সতরজন সাহাবীকে উপস্থিত করা হয়েছিল, যাদের বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর, নবী (সা) তাদেরকে নাবালক বলে ফিরিয়ে দেন। একবছর পর যখন পনর বছর বয়সে উপস্থিত করা হয়, তখন তাদের অনুমতি দান করেন। (যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫)।

এই অল্পবয়স্কদের মধ্যে হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-ও ছিলেন। তিনি সাবধানতার সাথে পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যাতে তাঁকে লম্বা দেখায়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে অনুমতি দান করেন। অধিকন্তু তার ব্যাপারে এও বলা হয় যে, এ একজন দক্ষ তীরন্দাজ।

হযরত উমর ইবন আবদুল আযীয (র) একবার নাফে'-কে জিজ্ঞেস করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) কোন্ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন ? নাফে' বলেন, আমাকে হযরত ইবন উমর নিজেই বলেছেন, যখন বদর যুদ্ধ হলো, তখন আমার বয়স ছিল তের বছর, উহুদ যুদ্ধকালে আমার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। বদর যুদ্ধকালে তো আমি যাওয়ার ইচ্ছাই করিনি, কিন্তু উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আমি নবী (সা)-এর দরবারে প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু অল্পবয়স্ক হওয়ায় তিনি আমার আরযী নাকচ করে দেন। একইভাবে হযরত যায়দ ইবন সাবিত এবং আওস ইবন আরাবা (রা)-কেও বয়সের স্বল্পতার দরুন ফিরিয়ে দেন। কিন্তু হযরত রাফে' ইবন খাদীজ (রা)-কে দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে অনুমতি দেন। যখন খন্দকের যুদ্ধ এসে পড়ল, তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর, সে সময় তিনি আমাকে অনুমতি

১. দু'টি টিলার নাম শায়খাইন, যা মদীনা এবং উহুদের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সেখানে একজন অন্ধ ও বৃদ্ধ ইয়াহূদী পুরুষ এবং একজন অন্ধ ও বৃদ্ধা ইয়াহূদী স্ত্রীলোক বাস করত বলে স্থানটির নাম শায়খাইন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাবারী ৩খ.।

দান করেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হই। উমর ইবন আবদুল আযীয এ হাদীসটি শুনে তৎক্ষণাৎ কাতিবকে ডেকে শীঘ্র হাদীসটি লিখে নেয়ার নির্দেশ দেন।

লোকজন নিজেদের পুত্র এবং ভাইয়ের জন্য বায়তুল মাল থেকে বৃত্তির আবেদন করত বিধায় যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যাদের বয়স পনর বছর সাব্যস্ত হতো,তাদের নাম যোদ্ধাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হতো এবং তাদের জন্য বায়তুলমাল থেকে বৃত্তির ব্যবস্থা রাখা হতো। আর যার বয়স পনর বছরের কম, তার নাম বৃত্তির তালিকায় স্থান পেত না। (উয়ূনুল আসার, পৃ. ২৩৩)

হযরত সামুরা ইবন জুনদুব (রা), যিনি তাদের সমবয়স্ক ছিলেন, তিনি খুবই হতাশাব্যঞ্জক বাক্যে বিপিতা হযরত মুররা ইবন সিনান (রা)-কে বললেন, আব্বা, রাফে‘ তো অনুমতি পেয়ে গেল আর আমি থেকে গেলাম। অথচ আমি তার চেয়ে শক্তিশালী, কুস্তি লড়ে তাকে ফেলে দিতে পারি। হযরত মুররা ইবন সিনান (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি রাফে‘কে অনুমতি দিয়েছেন আর আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। অথচ আমার পুত্র রাফে‘কে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারে।

তিনি রাফে‘ এবং সামুরাকে কুস্তি লড়তে দিলেন। এতে সামুরা রাফে‘কে ফেলে দিলেন। তিনি সামুরাকেও অনুমতি দান করলেন। (তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৩)। শিশু-বৃদ্ধ, যুবক-প্রৌঢ় সবাই যেন একই নেশায় নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, একই নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন, শহীদ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর সমীপে আত্মসমর্পণের ছুরিকাঘাতে ‘শহীদ’ হয়েই ছিলেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

ইসলামী বাহিনী থেকে মুনাফিকদের পৃথক হওয়া এবং ফিরে যাওয়া

যখন তিনি উহুদের সন্নিকটে পৌঁছলেন, তখন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই, যে তিনশত যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, এ কথা বলে ফিরে গেল যে, আপনি তো আমাদের কথা শোনেননি, অকারণে কেন আমরা নিজেদের জীবন ধ্বংস করব। এটা কোন যুদ্ধই নয়, যদি আমরা একে যুদ্ধ মনে করতাম তাহলে আপনাদের সঙ্গী হতাম। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اوادْفَعُوْا قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّ اتَّبَعْنٰكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلاِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ.

“এবং মুনাফিকদেরকে জানার জন্য তাদেরকে বলা হয়েছিল, এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর। তারা বলেছিল, যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীর বেশি

নিকটবর্তী ছিল। যা তাদের অন্তরে নাই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৬৭)

এখন নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে মাত্র সাতশ সাহাবী থাকলেন, যাদের মধ্যে মাত্র একশত ছিলেন বর্ম পরিহিত। আর সমস্ত বাহিনীতে ঘোড়া ছিল মাত্র দু'টি, একটি নবী (সা)-এর এবং অপরটি হযরত আবূ বুরদা ইবন নায়্যার হারিসী (রা)-এর।[১]

খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বনী সালমা এবং আওস গোত্রের মধ্যে বনী হারিসাও ইবন উবাইয়ের মত ফিরে যেতে মনস্থ করেছিল, আর এ দু'টি গোত্র ছিল বাহিনীর দু'পাশে। আল্লাহর ইচ্ছা তাদেরকে বাধা দেয়, আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করেন এবং তারা ফিরে যায়নি। তাদের প্রসঙ্গেই এ আয়াত নাযিল হয় :

اِذْهَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلاَ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ.

"যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল, অথচ আল্লাহ উভয়ের বন্ধু ছিলেন, আল্লাহর প্রতিই যেন মুমিনগণ নির্ভর করে।" (সূরা আলে ইমরান : ১২২)

তিনি তখনো শায়খাইন নামক স্থানেই ছিলেন, সূর্য ডুবে গেল। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং এখানেই রাত্রি যাপন করলেন। আর মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) সারা রাত সেনাবাহিনীর দেখাশোনা, মাঝে মাঝে চক্কর দেয়া এবং নবী (সা)-এর তাঁবু পাহারা দেয়ার দায়িত্ব পালন করতেন।

রাতের শেষ প্রহরে নবী (সা) রওয়ানা হলেন, উহুদের নিকটে পৌঁছলে ফজরের ওয়াক্ত হলো। তিনি বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামত বলেন এবং তিনি সমস্ত সাহাবা সহ নামায আদায় করলেন।

সেনা বিন্যাস

নামায শেষ করে সেনাবাহিনীর প্রতি দৃষ্টি দিলেন। মদীনাকে সামনে এবং উহুদকে পিছনে রেখে যোদ্ধাদের কাতারবন্দী করলেন। যে কাতারগুলো মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই মহামহিম আল্লাহর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছিল, এখন তারাই সেই মহান সত্তার পথে আত্মোৎসর্গ এবং জীবন বাজি রেখে তাঁর পথে লড়াইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেল।[২]

সহীহ্ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে উহুদ পাহাড়ের পিছনের একটি গিরিপথে বসিয়ে রাখেন যাতে কুরায়শ বাহিনী পিছন থেকে আক্রমণ করতে না পারে। তিনি হযরত আবদুল্লাহ

১. তাবারী, ৩খ. পৃ ১২।

২ ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৭৪।

ইবন জুবায়র (রা)-কে তাদের নেতা নির্ধারণ করে নির্দেশ দেন যে, যদি তোমরা আমাদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয়ী হতে দেখ, তবুও এ জায়গা থেকে নড়বে না, আর যদি মুশরিকদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী হতে দেখ, তাহলে আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য হলেও এ জায়গা থেকে সরবে না।

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় আছে, যদি পাখিও আমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে দেখ, তবুও এ স্থান ছাড়বে না।

মুসনাদে আহমদ, মুজামে তাবারানী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা এ জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক এবং পিছনদিক থেকে আমাদেরকে হিফাযত কর। যদি আমাদেরকে নিহত হতেও দেখ, তবুও আমাদের সাহায্যের জন্য আসবে না। আর যদি গনীমত সংগ্রহ করতে দেখ, তবুও তাতে অংশগ্রহণ করবে না।[১]

কুরায়শ বাহিনীর অবস্থা

কুরায়শ বাহিনী বুধবারেই মদীনায় পৌঁছে উহুদ প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে। এদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার, যার মধ্যে সাতশত বর্ম পরিহিত যোদ্ধা, দু'শত ঘোড়া এবং তিন হাজার উট ছিল। এছাড়া তাদের সঙ্গে মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পনরজন স্ত্রীলোক ছিল, যারা কবিতা আবৃত্তি করে যোদ্ধাদেরকে উৎসাহিত করছিল।[২] আত্মপূজারী, প্রবৃত্তির পূজারী এবং শয়তানের পূজারীদের উদ্দেশ্য এমনটিই হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ছিল :

১. হিন্দা বিনতে উতবা, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং হযরত মু'আবিয়ার মাতা;

২. উম্মে হাকাম বিনতে হারিস ইবন হিশাম, আবূ জাহলের পুত্র হযরত ইকরামার মাতা;

৩. ফাতিমা বিনতে ওলীদ, হারিস ইবন হিশামের স্ত্রী;

৪. বারযা বিনতে মাসঊদ, সাফওয়ান ইবন উমায়্যার স্ত্রী;

৫. রায়তা বিনতে শায়বা, হযরত আমর ইবন আসের স্ত্রী;

৬. ইয়ালাফা বিনতে সাদ, হযরত তালহা ইবন আবূ তালহা জুমাহীর স্ত্রী;

৭. খিনাস বিনতে মালিক, হযরত মুস'আব ইবন উমায়রের মাতা;

৮. আমরা বিনতে আলকামা।

আল্লামা যারকানী বলেন, এঁদের মধ্যে কেবল খিনাস এবং আমরা ছাড়া সবাই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

কুরায়শগণ তাদের বাহিনীর ডানদিকে খালিদ ইবন ওয়ালিদকে এবং বামদিকে ইকরামা ইবন আবূ জাহলকে, পদাতিক বাহিনীতে সাফওয়ান ইবন উমায়্যাকে, আর

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭০।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ২৬।

বলা হয় আমর ইবন আসকেও এবং তীরন্দাজদের জন্য আবদুল্লাহ ইবন আবূ রবীয়াকে প্রধান হিসেবে নির্বাচন করে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এ পাঁচ সেনাধ্যক্ষের সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে মহানবী (সা)-এর ভাষণ

যখন উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী বিন্যস্ত করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হাতে একটি তরবারি নিয়ে বলেন : من يأخذ هذالسيف بحقه "কে আছ যে এ তরবারিটির হক আদায়ে সক্ষম ?"

এ কথা শুনে এ মহা সৌভাগ্য লাভের জন্য অনেক হাত সামনে এগিয়ে আসে। কিন্তু নবী (সা) নিজের হাত টেনে নেন। ইতোমধ্যে হযরত আবূ দুজানা (রা) দাঁড়ান এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ তরবারির হক কি ? তিনি বললেন, এর হক এই যে, এটা দ্বারা আল্লাহর দুশমনদের আঘাত করবে এবং এমনকি সে নিহত হবে।

এ রিওয়ায়াত মুসনাদে আহমদ এবং সহীহ মুসলিম হযরত আনাস (রা) থেকে, মুজামে তাবারানী হযরত কাতাদা ইবন নুমান (রা) থেকে এবং মুসনাদে বাযযার হযরত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আবূ বিশর দুলাবী এ হাদীসটি তাঁর কিতাবুল কিনা-তে হযরত যুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এতে আছে, তিনি (সা) বলেছেন তারবারির হক এই যে, এর দ্বারা কোন মুসলমানকে হত্যা না করা এবং কোন কাফিরকে হত্যা করা থেকে পলায়ন না করা।

হযরত আবূ দুজানা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটি এর হকসহ গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ আমি এর হক আদায় করব। তিনি তৎক্ষণাৎ তরবারিটি হযরত আবূ দুজানার হাতে অর্পণ করলেন।

সম্ভবত তিনি আল্লাহর ওহী মারফত জানতে পেরেছিলেন যে, হযরত আবূ দুজানা (রা) ছাড়া কেউই এ তরবারির হক আদায় করতে সক্ষম হবে না, এ জন্যে কেবল আবূ দুজানা (রা)-কেই প্রদান করলেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[২]

দ্রষ্টব্য : হযরত আবূ দুজানা (রা) অত্যন্ত সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর ক্রোধ চেপে যায় এবং চেহারায় অত্যন্ত বেপরোয়া ভাব ফুটে উঠে। যুদ্ধকালে লাল রঙের পাগড়ি পরিধান করতেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন। সম্ভবত এ জন্যেই নবী (সা) তাঁকে এ তরবারি দান করেন, যেমন পরবর্তীতে তাঁর যুদ্ধ ও মুকাবিলা সম্পর্কে জানা যাবে।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৭।

২ ইসাবা, ৪খ. পৃ. ৫৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৮।

যুদ্ধের সূচনা এবং যুদ্ধবাজ কুরায়শগণের এক এক করে নিহত হওয়া

কুরায়শের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম আবূ আমের যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে, যে জাহিলী যুগে আওস গোত্রের সর্দার ছিল এবং তপস্যা ও নির্লোভের কারণে যাকে দরবেশ বলে ডাকা হতো। মদীনায় যখন ইসলামের নূর উদ্ভাসিত হলো, সে এ নূরের ঝলক সইতে পারল না, কাজেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে এলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তার নাম রাহিব-এর স্থলে ফাসিক নির্ধারণ করেন।

এ ফাসিক মক্কায় এসে কুরায়শদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহী করে তোলে এবং উহুদ যুদ্ধে নিজেই তাদের সাথে আগমন করে। আসার কালে সে দাবি করে যে, আওস গোত্রের লোকজন আমাকে দেখলে মুহাম্মদ (সা)-কে ছেড়ে আমার সাথে যোগ দেবে।

প্রথম যুদ্ধবাজ : সুতরাং উহুদ যুদ্ধে এই আবূ আমেরই ময়দানে উপস্থিত হয় এবং চিৎকার দিয়ে বলে, يا معشر الاوس انا ابو عامر "ওহে আওস গোত্রের লোকজন, আমি আবূ আমের।"

আল্লাহ তা'আলা আওস গোত্রের ঐ লোকদের চক্ষু শীতল করুন, যারা সঙ্গে সঙ্গে এ উত্তর দিলেন, لا انعم الله بك عينا يا فاسق "ওহে ফাসিক, নাফরমান, আল্লাহ যেন তোমার চক্ষু কখনই শীতল না করেন।"

আবূ আমের এ দাঁতভাঙ্গা জবাব শুনে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হয়ে ফিরে গেল এবং বলল, আমার অবর্তমানে আমার গোত্রের অবস্থা বদলে গেছে। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৩০; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭৯; তাবারী, ৩খ. পৃ. ১৬; উয়ূনুল আসার, পৃ. ৩৩৬; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৬)।

দ্বিতীয় যুদ্ধবাজ : কিছুক্ষণ পর মুশরিকদের পতাকাবাহী তালহা ইবন আবূ তালহা ময়দানে আসে এবং চিৎকার করে বলল, ওহে মুহাম্মদের সাথিগণ, তোমাদের ধারণা তো এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তরবারি দিয়ে আমাদেরকে শীঘ্রই জাহান্নামে প্রেরণ করেন এবং আমাদের তরবারি দিয়ে তোমাদেরকে দ্রুত জান্নাতে প্রেরণ করেন। কাজেই তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছ কি, যাকে আমার তরবারি জান্নাতে পাঠিয়ে দেবে অথবা তার তরবারি আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করবে?

এ কথা শোনামাত্র হযরত আলী (রা) মুকাবিলার জন্য বেরিয়ে এলেন এবং তরবারি দিয়ে আঘাত করতেই তার পা কেটে গেল, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলে গেল। হযরত আলী (রা) লজ্জা পেয়ে পিছে হটে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আলী, কেন পিছে সরলে? তিনি বললেন, তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ায় আমার লজ্জা পেয়েছে।[১]

ইবন সা'দ বলেন, হযরত আলী (রা) তার মাথায় তরবারির আঘাত হানেন।

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১; ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৮।

ফলে তার মাথা দু'ভাগ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হন এবং আল্লাহু আকবর বলেন। সাথে সাথে মুসলমানগণও আল্লাহু আকবর বলে উঠেন।

সম্ভবত হযরত আলীর তরবারির প্রথম আঘাত তার পায়ের উপর পড়ে, যাতে পা কেটে যায় এবং দ্বিতীয় আঘাত তার মাথায় পড়ে, যা তার মাথার খুলি দু'টুকরা করে ফেলে। ইবন জরীরের বর্ণনায় প্রথম আঘাতের উল্লেখ আছে এবং ইবন সা'দের বর্ণনায় দ্বিতীয় আঘাতের বর্ণনা আছে। কাজেই এ দু' বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই।

তৃতীয় যুদ্ধবাজ : কিছুক্ষণ পর উসমান ইবন আবূ তালহা পতাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এ রাজায আওড়াতে আওড়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে :

ان على اهل اللواء حقا * ان تخضب الصعدة او تندقا

"নিশানবর্দারের জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, যুদ্ধ করতে করতে তার বর্শা শত্রুর রক্তে রঞ্জিত হয় অথবা ভেঙে যায়।"

হযরত হামযা (রা) অগ্রসর হয়ে আক্রমণ চালান এবং তার উভয় হাত ও উভয় কাঁধ কেটে ফেলেন, হাত থেকে পতাকা পড়ে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু ঘটে।

চতুর্থ যুদ্ধবাজ : এরপর আবূ সা'দ ইবন আবূ তালহা পতাকা তুলে নেয়। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) দ্রুত একটি তীর বের করে তার কণ্ঠনালি বরাবর ছোঁড়েন, এতে তার জিহ্বা বেরিয়ে আসে। এগিয়ে গিয়ে সাথে সাথে তাকে হত্যা করেন।

পঞ্চম যুদ্ধবাজ : এরপর মুসাফি ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠিয়ে নেয়। হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা) তাকে এক আঘাতেই হত্যা করে ফেলেন।

ষষ্ঠ যুদ্ধবাজ : এরপর হারিস ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠিয়ে নেয়। তাকেও হযরত আসিম (রা) এক আঘাতেই খতম করেন। অপর এক বর্ণনামতে হযরত যুবায়র (রা) তাকে হত্যা করেন।

সপ্তম যুদ্ধবাজ : এরপর কিলাব ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা তুলে নেয়। হযরত যুবায়র (রা) অগ্রসর হয়ে তাকে হত্যা করেন।

অষ্টম যুদ্ধবাজ : এরপর জুলাস ইবন তালহা ইবন আবূ তালহা পতাকা উঠায়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত তালহা (রা) তাকে হত্যা করেন।

নবম যুদ্ধবাজ : এরপর আরতাত শারজীল পতাকা হাতে নিলে হযরত আলী (রা) তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

দশম যুদ্ধবাজ : এবারে শুরায়হ ইবন কারিয পতাকা তুলে নিয়ে অগ্রসর হয়। সাথে সাথে তাকেও হত্যা করা হয়। শুরায়হ-এর হত্যাকারী কে ছিলেন তা জানা যায়নি।

একাদশতম যুদ্ধবাজ : এরপর এক গোলাম—যার নাম ছিল সওয়াব, সে পতাকা হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে। হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) অথবা হযরত হামযা (রা) কিংবা হযরত আলী (রা) এঁদের যে কোন একজন (বর্ণনায় মতপার্থক্য রয়েছে) তাকেও হত্যা করেন।[১]

এভাবে কুরায়শদের বাইশজন সর্দার নিহত হয়, যাদের নাম আল্লামা ইবন হিশাম বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন যে, অমুক অমুক সর্দার অমুক অমুক সাহাবীর হাতে নিহত হয়েছে।[২]

হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর বীরত্ব

হযরত আবূ দুজানা (রা), যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ তরবারি অর্পণ করেছিলেন, তিনি খুবই শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তিনি একটি লাল রঙের পাগড়ি পরিধান করেন। অতঃপর ধীরে ধীরে ময়দানে এগিয়ে আসেন। তখন তাঁর মুখে ছিল এ কবিতা :

انا الذى عاهد نى خليلى * ونحن بالسفح النخيل
ان لا اقوم الدهر فى الكيول * اضرب بسيف الله والرسول

"আমি ঐ ব্যক্তি যার থেকে আমার সেই বন্ধু শপথ নিয়েছেন (যাঁর ভালবাসা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছে, অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ), এ অবস্থায় যখন আমি ছিলাম পাহাড়ের চূড়ায় এক উদ্যানে—

"ঐ শপথ ছিল এই যে, কখনো পিছনের কাতারে দন্ডায়মান হবো না, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তরবারি দ্বারা দুশমনদের হত্যা করতেই থাকব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ দুজানাকে গর্বভরে বীরদর্পে চলতে দেখে বললেন, এ চলন আল্লাহর নিকট খুবই অপসন্দনীয়, কিন্তু এ অবস্থায় ছাড়া। অর্থাৎ যখন শুধুই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দুশমনের সাথে মুকাবিলা করা হয়, নিজের জন্য না হয়।

হযরত আবূ দুজানা (রা) শত্রু বাহিনীর কাতার ভেদ করে চলতে থাকলেন। যেই বাধা দিচ্ছিল, তারই লাশ মাটিতে পড়ছিল, এমনকি আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা সামনে পড়ে গেল। আবূ দুজানা (রা) তার উপর তরবারি উঠালেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ভেবে নামিয়ে ফেললেন যে, বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারি কোন স্ত্রীলোকের রক্তে রঞ্জিত হবে, এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যখন হযরত আবূ দুজানা (রা) হিন্দার নিকটে পৌঁছে গেলেন, তখন সে লোকদের ডাকাডাকি করল, কিন্তু কেউই তার সাহায্যে এগিয়ে এলো না। হযরত আবূ দুজানা (রা) বলেন, ঐ সময়ে আমার কাছে এটা মোটেই

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২১; ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ২৮।
২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩১।

সমীচীন মনে হলো না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তরবারি কোন আশ্রয়হীনা ও অসহায় স্ত্রীলোকের প্রতি চালনা করি।[১]

হযরত হামযা (রা)-এর বীরত্ব ও তাঁর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আলী (রা)-এর ব্যাঘ্র সদৃশ আক্রমণে কাফিরেরা অত্যন্ত আতঙ্কিত ছিল, তিনি যার উপরই তরবারি উত্তোলন করতেন, তারই লাশ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছিল।

ওয়াহশী ইবন হারব ছিল জুবায়র ইবন মুতইমের হাবশী গোলাম। বদর যুদ্ধে জুবায়রের চাচা তায়মা ইবন আদী হযরত হামযার হাতে নিহত হয়েছিল, এ কারণে জুবায়র অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন। ফলে জুবায়র ওয়াহশীকে বলেছিল, যদি তুমি হামযাকে হত্যা করে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার, তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে। কুরায়শগণ যখন উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হলো, ওয়াহশীও তাদের সাথে রওয়ানা হলো।

যখন ওহুদ প্রান্তরে উভয় দল যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ হলো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, তখন সাবা ইবন আবদুল উযযা 'আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছ কি' বলে আহ্বান করতে করতে ময়দানে এলো।

হযরত হামযা (রা)-ও তখন তার দিকে 'ওহে সাবা, স্ত্রীলোকের খাতনাকারিণী নারীর পুত্র, তুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করতে চাস,' বলতে বলতে তার উপর তরবারির একটি কোপ দিলেন। এতেই সে বিপর্যস্ত হয়ে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল।

হযরত হামযা (রা)-এর উদ্দেশ্যে ওয়াহশী একটা পাথরের চাঁইয়ের পিছনে লুকিয়ে বসেছিল। যখন হযরত হামযা (রা) সেদিক দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, ওয়াহশী তাঁর নাভী বরাবর বর্শা ছুঁড়ে মারল যা তাঁর পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

এ অবস্থায়ও হযরত হামযা (রা) কয়েক কদম অগ্রসর হলেন। কিন্তু গড়িয়ে পড়ে গেলেন এবং শাহাদতের সুধা পান করলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ বর্ণনা সহীহ বুখারীর। মুসনাদে আবূ দাউদ তায়ালিসীতে আছে, ওয়াহশী বলেছে, আমি যখন মক্কায় পৌছলাম, তখন মুক্ত হয়ে গেলাম। আর আমি কেবল হামযা (রা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যেই কুরায়শদের সাথে এসেছিলাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার উদ্দেশ্য ছিল না।[২]

হযরত হামযাকে হত্যার পর আমি সেনাবাহিনী থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে বসে পড়ি। এ জন্যে যে, আমার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কেবল নিজে মুক্তিলাভের জন্যই হযরত হামযাকে হত্যা করি।

দ্রষ্টব্য : মক্কা বিজয়ের পর তায়েফের প্রতিনিধি দলের সাথে ওয়াশীও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনা আগমন করে। লোকজন তাকে দেখে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৬।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮২।

(সা), এই যে ওয়াহশী, আপনার শ্রদ্ধেয় চাচার হত্যাকারী। তিনি বললেন : رجل واحد احب الى من قتل الف كافر "ওকে ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই একজনের ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে সহস্র কাফির হত্যা করার চেয়েও বেশি প্রিয়।"

এরপর তিনি ওয়াহশীর নিকট তাঁর চাচার হত্যার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। ওয়াহশী খুবই বিমর্ষ ও লজ্জিত অবস্থায় কেবল আদেশ পালনহেতু ঘটনার বর্ণনা দিল। তিনি তার ইসলাম গ্রহণকে অনুমোদন করলেন এবং বললেন, তুমি আমার সামনে না এলেই ভাল হয়। কেননা তোমাকে দেখলে আমার চাচার বিয়োগ ব্যথা নতুনভাবে আমার অন্তরে জাগরূক হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা)-কে ব্যথা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল না, তাই ওয়াহশী (রা) যখন নবী দরবারে আসতেন, তখন পিঠ ফিরিয়ে বসে থাকতেন এবং সব সময় ভাবতেন, কিভাবে এর প্রায়শ্চিত্ত করা যায়। সুতরাং এর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি মুসায়লামা কাযযাবকে ঐ বর্শা দিয়েই হত্যা করে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। সে খাতামুন-নাবিয়্যীন (সা)-এর পর মিথ্যা নবূওয়াতের দাবি করেছিল। আর যেভাবে হযরত হামযা (রা)-এর নাভী বরাবর বর্শাঘাত করে শহীদ করেছিলেন, ঠিক একইভাবে মুসায়লামা কাযযাবকেও নাভী বরাবর বর্শা মেরে হত্যা করেন। এভাবেই তিনি একজন উত্তম মানুষের হত্যার প্রায়শ্চিত্তে একটি অধম মানুষকে হত্যা করেন।[১]

সহীহ বুখারীতে আছে, মুসায়লামা কাযযাবের হত্যাকালে ওয়াহশীর সাথে একজন আনসারীও শরীক ছিলেন। ওয়াকিদী, ইসহাক ইবন রাহওয়াই এবং হাকিম বলেন, তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যায়দ ইবন আসিম আল মাযিনী (রা)। এছাড়া কেউ ঐ আনসারীর নাম আদী ইবন সাহল, কেউবা আবূ দুজানা আবার কেউ যায়দ ইবন খাত্তাব বলে থাকেন। আবার কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শন ইবন আবদুল্লাহ, যেমন এ কবিতার মাধ্যমে জানা যায় :

الم ترانـى ووحـشـيـهـم * ضربنا مسليمة المفتتن
ليسائلنى الناس عن قتله * فقلت ضربت وهذا طعن
فـلـسـت بـصـاحـبـه دونـه * وبس بصاحبه دون شن

"তোমার কি জানা নেই যে, আমি এবং ওয়াহশী দু'জনে মিলে ফিতনা সৃষ্টিকারী মুসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করি।

"মানুষ আমাকে মুসায়লামার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে যে, তাকে কে হত্যা করেছে। আমি উত্তর দিয়েছি, আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করেছি আর ওয়াহশী বর্শাদ্বারা;

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩-৩৮৫।

"মোটকথা এই যে, এককভাবে মুসায়লামার হত্যাকারী আমিও নই আর ওয়াহশীকেও শন-এর অংশগ্রহণ ছাড়া একক হত্যাকারী বলা যায় না।"[১]

ওয়াহশী থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমিই কি আমার চাচাকে হত্যা করেছ ? আমি আরয করলাম, نعم والحمد لله الذى اكرمه بيدى ولم يهنى بيده। "হ্যাঁ, সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি হযরত হামযাকে আমার হাত দিয়ে শাহাদতের মর্যাদা ও সম্মান দান করেছেন এবং তাঁর হাত দিয়ে আমাকে অপদস্থ করেন নি।"

কেননা ওয়াহশী যদি ঐ সময় হযরত হামযার হাতে নিহত হতেন, তাহলে কুফরী অবস্থায় তার মৃত্যু হতো, যা অপেক্ষা অধিক কোন অপদস্থতা ও অমর্যাদা নেই। এরপর নবী (সা) বললেন, ওহে ওয়াহশী, যাও এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমনটি করেছিলে আল্লাহর পথে বাধা দিতে। (হাদীসটি তাবারানী হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)।[২]

ফেরেশতা কর্তৃক গোসলদানকৃত হযরত হানযালা (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

আবূ আমের ফাসিক, যার উল্লেখ ইতোপূর্বে করা হয়েছে, তার পুত্র হযরত হানযালা (রা) এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলেন।

আবূ সুফিয়ান ও হযরত হানযালা (রা) মুখোমুখি হলেন। হযরত হানযালা দৌড়ে গিয়ে আবূ সুফিয়ানের উপর তরবারির আঘাত হানতে চাইলেন কিন্তু পিছন থেকে শাদ্দাদ ইবন আসওয়াদ তরবারি দিয়ে আঘাত করায় হযরত হানযালা (রা) শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আমি দেখলাম ফেরেশতাগণ বরফের পানি দিয়ে রৌপ্যের বাসনে করে হযরত হানযালাকে গোসল করাচ্ছে।

তাঁর স্ত্রীকে[৩] জিজ্ঞেস করা হলে জানা গেল যে, তিনি সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থায়ই জিহাদে অংশ-গ্রহণের উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন এবং ঐ অবস্থায়ই শাহাদতবরণ করেন। (ইবন ইসহাক ও হাকিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম একে সহীহ বলেছেন। এছাড়া ইবন সা'দ ও অন্যান্যরাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।[৪]

যেদিন হযরত হানযালা (রা) শহীদ হবেন, ঐদিন রাতে তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেখেন যে, আসমানের একটি দরজা খোলা হল এবং হানযালা সেই দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। তাঁর প্রবেশের পর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হল। স্ত্রী এ স্বপ্ন দেখে বুঝতে

---

১. প্রাগুক্ত।

২. মাজমুয়াউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ ১৩১।

৩. তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জামিলা, যিনি সাহাবী এবং মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের বোন ছিলেন। রাউযুল উনূফ ও ইসাবা।

৪. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২১৬।

পেরেছিলেন যে, হানযালা এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পথে। যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন তাঁর লাশ খোঁজ করা হচ্ছিল, তখন তাঁর মাথার চুল থেকে পানি পড়ছিল। এ জন্যে হযরত হানযালা (রা)-কে ফেরেশতাকর্তৃক 'গোসলদানকৃত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।[১]

হযরত হানযালা (রা)-এর পিতা আবূ আমের ফাসিক যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, সেহেতু হানযালা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আপন পিতাকে হত্যা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি নিষেধ করেন। (ইবন শাহীন হাসান সনদে এবং ইসাবা, হযরত হানযালা ইবন আমের (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

মুসলমানদের এহেন বীরত্বব্যঞ্জক ও দুঃসাহসী আক্রমণের কারণে যুদ্ধের ময়দান থেকে কাফিরদের পা টলে যায়। তারা মুখ লুকিয়ে এদিক সেদিক পলায়নে উদ্যত হয়। মহিলারাও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করতে থাকে এবং মুসলমানগণ গনীমতের মালামাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

মুসলমান তীরন্দাজদের স্থান ত্যাগ এবং যুদ্ধের গতিতে পরিবর্তন

তীরন্দাজদের ঐ দলটি (যাদের গিরিপথের নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল) যখন দেখল যে, বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং মুসলমানগণ গনীমত সংগ্রহে ব্যস্ত, তখন তারাও সেদিকে অগ্রসর হলেন। তাদের নেতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) অনেক নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ করেছিলেন যে, তোমরা এ স্থান থেকে নড়বে না, কিন্তু তারা তা শুনলেন না এবং ঘাঁটি ছেড়ে গনীমত সংগ্রহকারীদের সাথে গিয়ে মিলিত হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র এবং তাঁর দশজন সঙ্গী (রা)-এর শাহাদতবরণ

ঘাঁটিতে কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র এবং তাঁর দশজন সঙ্গী (রা) ছিলেন। নবীর আদেশ অমান্য করার অপেক্ষামাত্র ছিল, সাথে সাথে বিজয় পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেল। খালিদ ইবন ওলীদ, যিনি তখন ছিলেন মুশরিক বাহিনীর ডানদিকের অধিনায়ক, গিরিপথ প্রহরাশূন্য দেখে পেছনদিক থেকে আক্রমণ করে বসলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন জুবায়র (রা) তাঁর সঙ্গিগণসহ শহীদ হয়ে গেলেন।

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর শাহাদতবরণ

মুশরিকদের এ অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আক্রমণে মুসলমানদের শৃঙ্খলাপূর্ণ সারিগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং শত্রু সেনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্নিকটে পৌঁছে গেল।

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৩৩।

মুসলমানদের পতাকাবাহী হযরত মুস‘আব ইবন উমায়র (রা) নবী (সা)-এর নিকটে ছিলেন। তিনি কাফিরদের মুকাবিলা করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর শাহাদতবরণের পরে নবী (সা) পতাকা হযরত আলী (রা)-এর হাতে সোপর্দ করলেন।

হযরত মুস‘আব ইবন উমায়র (রা) যেহেতু দেখতে প্রায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সদৃশ ছিলেন, এ জন্যে কোন শয়তান গুজব ছড়ালো যে, দুশমনদের মূল লক্ষ্য নবী (সা) শহীদ হয়েছেন। ফলে সমস্ত মুসলমানের মধ্যে আতংক ও হতাশা ছেয়ে গেল এবং এ বেদনাদায়ক সংবাদ শোনামাত্র সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় শত্রু-মিত্র পার্থক্য না করেই তারা একে অপরের প্রতি তরবারি চালাতে থাকলেন।

মুসলমানদের হাতে ভুলক্রমে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর পিতার শাহাদতবরণ

হযরত হুযায়ফার পিতা ইয়ামানও এ গোলমালের মধ্যে পড়ে গেলেন। হযরত হুযায়ফা (রা) দূর থেকে দেখলেন যে, মুসলমানগণ তার পিতাকে মেরে ফেলছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দারা, উনি আমার পিতা। কিন্তু এ হট্টগোলের মধ্যে কে শোনে কার কথা, শেষ পর্যন্ত ইয়ামান শহীদ হয়ে গেলেন। মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, ইনি হুযায়ফার পিতা ছিলেন, তখন খুবই লজ্জিত হলেন এবং বললেন, আল্লাহর কসম, আমরা চিনতে পারিনি। হযরত হুযায়ফা (রা) বললেন, يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين "আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি সবচে' বেশি মেহেরবান।"

রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তপণ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু হযরত হুযায়ফা তা গ্রহণ করেন নি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্তরে হযরত হুযায়ফা (রা)-এর মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।[১]

খালিদ ইবন ওয়ালিদের আকস্মিক আক্রমণে ইসলামী বাহিনীর চাঞ্চল্য এবং রাসূল (সা)-এর দৃঢ়তা

খালিদ ইবন ওয়ালিদের ক্ষিপ্রতা ও আকস্মিক আক্রমণে যদিও বড় বড় বীর-বাহাদুরের পা টলে গিয়েছিল, নবী করীম (সা)-এর দৃঢ়তা ও স্থৈর্যে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনি। আর কেনই বা আসবে, আল্লাহর নবী-রাসূলগণ তো আল্লাহ ক্ষমা করুন, কাপুরুষ হতে পারেন না, পাহাড় টলে যেতে পারে, কিন্তু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পা টলতে পারে না। একজন পয়গাম্বরের একক বাহাদুরী কুল মাখলুকের বাহাদুরী অপেক্ষা বেশি ওযনদার ও মযবূত হয়ে থাকে।

---

১. তাবারী, ৩খ.পৃ. ২৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৯; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩২; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৭।

যেমন দালাইলে বায়হাকীতে হযরত মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

فوالذى بعثه بالحق مازالت قدمه شبرا واحدا وانه لقى وجه العدو ولفئى اليه طائفة من اصحابه مرة وتفترق مرة فربما رايته قائما يرمى عن قوسه ويرمى بالحجر حتى انحازوا عنه ·

"কসম ঐ মহান পবিত্র সত্তার, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তাঁর কদম মুবারক নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক চুলও নড়েনি এবং নিঃসন্দেহে তিনি শত্রুর মুকাবিলায় স্থির ছিলেন। সাহাবায়ে কিরামের একটি দল কখনো তাঁর কাছে যেত, আবার কখনো দূরে সরে যেত। কোন কোন সময় আমি দেখতাম তিনি একাকীই তীর ও পাথর নিক্ষেপ করছেন। এমন কি শত্রুরা দূরে সরে যায়। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৪)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিরাপত্তা রক্ষিগণ

ইবন সা'দ বলেন, এহেন চাঞ্চল্য ও হট্টগোলের মধ্যে চৌদ্দজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলেন। এঁদের মধ্যে সাতজন ছিলেন মুহাজির এবং সাতজন ছিলেন আনসার। তাঁদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মুহাজিরগণের নাম

১. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),
২. হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা),
৩. হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা),
৪. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা),
৫. হযরত তালহা (রা),
৬. হযরত যুবায়র ইবন আওয়াম (রা),
৭. হযরত আবূ উবায়দা (রা),

আনসারগণের নাম

১. হযরত আবূ দুজানা (রা),
২. হযরত হুবাব ইবন মুনযির (রা),
৩. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),
৪. হযরত হারিস ইবন সম্মা (রা),
৫. হযরত সুহায়ল ইবন হুনায়ফ (রা),
৬. হযরত সাদ ইবন মু'আয (রা),
৭. হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা)।

মুহাজিরগণের মধ্যে হযরত আলী (রা)-এর নাম এ জন্যে উল্লেখ করা হয়নি যে, হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর শহীদ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম

বাহিনীর পতাকা হযরত আলী (রা)-এর হাতে অর্পণ করেছিলেন। তিনি তখন জিহাদে নিমগ্ন ছিলেন।

এ চৌদ্দজন সাহাবী তাঁর সাথেই ছিলেন। তবে কোন প্রয়োজনে কেউ কেউ অন্যত্রও যেতেন, আবার শীঘ্রই ফিরে আসতেন।

এ জন্যে কখনো তাঁর সাথে বারজনও ছিলেন, যেমনটি সহীহ বুখারীতে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আর কখনো এগারজনও ছিলেন, যেমন নাসাঈ এবং দালাইলে বায়হাকী হযরত জাবির (রা) সূত্রে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবার কখনো সাতজনও ছিলেন, যেমন সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সময়ের পার্থক্যে এবং অবস্থার পার্থক্যের দরুন নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত সাহাবীদের সংখ্যায় মতপার্থক্য ঘটেছে। প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ণনা তাঁদের স্ব স্ব সময়ে সঠিক ও নির্ভুল ছিল। কোন সময় বারজন, কোন সময় এগারজন আর কোন সময় সাত ব্যক্তি তাঁর সাথে ছিলেন। আল্লাহর প্রশংসা, সমস্ত বর্ণনাই সুসমঞ্জস, কোনই বৈপরীত্য নেই।

(বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৭ এবং যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৫ দেখুন)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উপর কুরায়শদের আকস্মিক আক্রমণ এবং সাহাবায়ে কিরামের আত্মত্যাগ

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, কুরায়শরা যখন আকস্মিকভাবে তাঁকে আক্রমণ করে বসে, তখন তিনি বললেন, কে আছ, যে এদেরকে আমার নিকট থেকে সরিয়ে দেবে এবং জান্নাতে আমার বন্ধু হবে ? তখন সাতজন আনসার সাহাবী তাঁর কাছে ছিলেন। একে একে তাঁদের সাতজনই যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। (সহীহ মুসলিম, ২খ. পৃ. ১০৭, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায় এবং আহমদ সূত্রে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৬)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি ইরশাদ করেন : من رجل ليشرى لنا نفسه "কোন্ ব্যক্তি আছে যে আমাদের জন্য নিজের জীবন বিক্রি করবে।" এ কথা শোনামাত্র হযরত যিয়াদ ইবন সাকান ও পাঁচজন আনসার (রা) দাঁড়িয়ে যান এবং বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে একে একে সবাই শহীদ হয়ে যান। আর জান্নাতের মূল্যে নিজেদের জীবনকে বিক্রি করেন।

হযরত যিয়াদ ইবন সাকান (রা)-এর শাহাদতবরণ

হযরত যিয়াদ (রা)-এর এ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল যে, যখন তিনি আহত হয়ে পড়ে যান, তখন নবী করীম (সা) বলেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। লোকজন

তাকে নবী (সা)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি নিজের গণ্ডদেশ নবী (সা)-এর পায়ের উপর রাখেন এবং এ অবস্থায়ই তিনি ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪)

উতবা ইবন আবূ ওয়াক্কাস কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর ভাই উতবা ইবন আবূ ওয়াক্কাস সুযোগ বুঝে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে তাঁর নিচের পাটির দাঁত পড়ে যায় এবং নিচের ঠোঁটে আঘাত পান। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, এ সময় আমি আপন ভাইকে হত্যার জন্য যতটা আগ্রহী ও উৎসাহী হয়ে পড়ি, অপর কাউকে হত্যার জন্য ততটা উৎসাহী ছিলাম না।[১] (ইবন হিশাম)

আবদুল্লাহ ইবন কুমায়্যা কর্তৃক নবী (সা)-এর উপর আক্রমণ

কুরায়শের বিখ্যাত পাহলোয়ান আবদুল্লাহ ইবন কুমায়্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এত জোরে আঘাত করে যে, তাঁর গণ্ডদেশ যখম হয়ে যায় এবং বর্মের দু'টি লৌহখণ্ড তাঁর গণ্ডে ফুটে যায়। আর আবদুল্লাহ ইবন শিহাব[২] যুহরী পাথর মেরে পবিত্র কপাল আহত করে। পবিত্র মুখমণ্ডল বয়ে যখন রক্ত পড়তে থাকে, তখন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর পিতা হযরত মালিক ইবন সিনান (রা) মুখ দিয়ে সমস্ত রক্ত চুষে মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে দেন। তিনি (সা) বলেন, তোমাকে জাহান্নামের আগুন কখনই স্পর্শ করবে না।

মুজামে তাবারানীতে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবন কুমায়্যা তাঁকে আহত করার পর বলে : خذها وانا ابن قمية "এটা গ্রহণ কর, আর আমি ইবন কুমায়্যা।"

নবী (সা) বলেন : اقماك الله "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে অপমান-অপদস্থ এবং ধ্বংস করুন।"

এর পর কয়েকদিনও অতিক্রান্ত হয়নি, আল্লাহ তা'আলা ইবন কুমায়্যার প্রতি একটি পাহাড়ী বকরি প্রেরণ করেন, যে তার শিং দিয়ে তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।[৩]

হযরত আলী (রা) এবং হযরত তালহা (রা) কর্তৃক নবী (সা)-কে সহায়তা দান

পবিত্র দেহে যেহেতু দু'টি লৌহখণ্ডের যন্ত্রণার বোঝা ছিল এ জন্যে নবী (সা) একটি গর্তে পড়ে যান, যেটি আবূ আমের ফাসিক মুসলমানদের জন্য তৈরি করেছিল।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮১।

২ আবদুল্লাহ ইবন শিহাব যুহরী উহুদ যুদ্ধের সময় কাফিরদের সাথে আগমন করেন। পরবর্তীকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা মুকাররমায় ইনতিকাল করেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮।

৩. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮১; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮।

তখন হযরত আলী তাঁর হাত ধরেন এবং হযরত তালহা তাঁর কোমরে ভর দিতে সহায়তা করেন, ফলে তিনি দাঁড়াতে সক্ষম হন।

তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শহীদকে জীবিতাবস্থায় পৃথিবীতে চলাফেরা করতে দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) তাঁর পিতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা)-এর পবিত্র মুখমণ্ডলে বর্মের দু'টি লৌহখণ্ড ঢুকে গিয়েছিল। হযরত আবূ উবায়দা ইবন জাররাহ (রা) তা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টান দেন, এতে তার দু'টি দাঁত ভেঙে যায়। আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের দিন হাস্যোজ্জ্বল দাঁত নিয়ে পুনরুত্থিত করুন। (বর্ণনাটির সনদ বিশুদ্ধ)।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পাহাড়ের ওপর আরোহণ করতে মনস্থ করেন কিন্তু দুর্বলতা, অসামর্থ্য এবং দু'টি লৌহখণ্ডে ভারে উঠতে সক্ষম হচ্ছিলেন না, তখন তালহা (রা) বসে পড়েন এবং তিনি তারপিঠে পা রেখে আরোহণ করেন। হযরত যুবায়র (রা) বলেন, এ সময় আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি, اوجب طلحة। "তালহা নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে।" (ইবন ইসহাক)

কায়স ইবন হাযম বলেন, আমি হযরত তালহার ঐ হাত দেখেছি, যা দিয়ে তিনি উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কাফিরদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন, তা ছিল সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্থ। (বুখারী)

হাকিম তাঁর ইকলীল গ্রন্থে বলেন, ঐ দিন হযরত তালহা (রা) পঁয়ত্রিশ অথবা উনচল্লিশটি আঘাত পান।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন উহুদ যুদ্ধের উল্লেখ করতেন, তখন বলতেন : كان ذلك اليوم كله لطلحة "এ দিনের পুরোটাই ছিল তালহার জন্য।"

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, দুশমনের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে যখন হযরত তালহার হাতের অঙ্গুলীসমূহ কেটে যায়, তখন তিনি অবলীলায় বলে উঠেন, حسن উত্তম হয়েছে।[২] রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন :

لوقلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون اليك حتى تلج بك فى جو السماء .

"যদি তুমি উত্তম না বলে বিসমিল্লাহ বলতে, তা হলে ফিরিশতাগণ তোমাকে নিয়ে যেতেন এবং লোক তোমার প্রতি তাকিয়ে থাকত। এমনকি তারা তোমাকে নিয়ে

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৮; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪।

২ ফাতহুল বারীতে নূন অক্ষর সহ হাসান (উত্তম) বর্ণিত হয়েছে, আর আল্লামা যারকানী নূন অক্ষর বাদ দিয়ে 'হাসা' বলেছেন। যা আমাদের ভাষায় উহ্ আহ্ ইত্যাদি শব্দের মত, যা ব্যথা পেলে মুখ থেকে বের হয়।

আসমানে প্রবেশ করতেন।” (নাসাঈ এবং বায়হাকী হাদীসটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন)।[১]

হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমরা তালহা (রা)-এর শরীরে সত্তরটিরও বেশি যখম দেখেছি। (আবূ দাউদ তায়ালিসী বর্ণিত; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৬৬, হযরত তালহার প্রশংসা অধ্যায়)

হযরত আনাস (রা)-এর বিপিতা হযরত আবূ তালহা (রা) তাঁকে ঢাল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ, ঐ দিন তিনি দুই অথবা তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেন। যে কেউ সেদিক দিয়ে তূণীর নিয়ে যেতেন, তাকেই নবী করীম (সা) বলতেন, এ তূণীর আবূ তালহার জন্য রেখে যাও। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) দৃষ্টি উঠিয়ে লোকদের দেখতে চাইতেন, তখন হযরত আবূ তালহা (রা) বলতেন :

لابابى انت وانى نحرى تشرف يصبك سهم من سهام القوم دون نحرك ·

“আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আপনি মাথা উঠাবেন না, শত্রুর কোন তীর এসে লাগতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের জন্য ঢাল স্বরূপ।” (বুখারী, পৃ. ৫৮১)

হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) তূণীর থেকে সমস্ত তীর তার সামনে ঢেলে দেন এবং বলেন : ارم فداك ابى وامى “তীর নিক্ষেপ কর, তোমার প্রতি আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোক।”

হযরত আলী (রা) বলেন, সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস ছাড়া[২] আর কারো জন্যে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর পিতামাতাকে উৎসর্গ করতে শুনিনি। (বুখারী, পৃ. ৫৮১)

হাকিম থেকে বর্ণিত যে, উহুদের দিন হযরত সা'দ (রা) এক সহস্র তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২)

হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর কুরবানী

হযরত আবূ দুজানা[৩] (রা) স্বয়ং ঢাল হয়ে নবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে যান

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৯।

২. অর্থাৎ উহুদের দিন তিনি হযরত সা'দ (রা) ছাড়া অন্য কারো জন্য এ বাক্য উচ্চারণ করতে শোনেননি। অন্যথায় বনী কুরায়যার যুদ্ধের দিনে তিনি হযরত যুবায়র (রা)-এর জন্যও এ বাক্য উচ্চারণের কথা সহীহ বুখারীর হযরত যুবায়র (রা)-এর প্রশংসা অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৬৬, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর প্রশংসা অধ্যায়।

৩. হাফিয ইবন আবদুল বার বলেন, হযরত আবূ দুজানা (রা) মুসায়লামা কাযযাবের হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এ যুদ্ধকালেই শহীদ হন। ইসতিয়াব।

এবং পিঠ দেন শত্রুদের প্রতি। তীরের পর তীর আসতে থাকে, আর হযরত আবূ দুজানা (রা)-এর পিঠই ছিল এর লক্ষ্যস্থল। কিন্তু পাছে নবী (সা)-কে তীরের আঘাত লাগে, এ ভয়ে তিনি নড়াচড়া পর্যন্ত করছিলেন না। (ইবন ইসহাক)।[১]

সতর্ক বাণী : রাসূলুল্লাহ (সা) যেমনটি শেষ নবী বা নবী আগমনের ধারার সমাপ্তকারী ছিলেন, নবী আগমনের ধারা তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণ হয়, অনুরূপভাবে ভালবাসাও পূর্ণতা পেয়েছিল এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মাধ্যমে এ ভালবাসা চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ণতা লাভ করেছিল। আল্লাহর শপথ, এ কুরবানীর সামনে লায়লী-মজনুর কিসসাও হার মানে।

মহানবী (সা) কর্তৃক মুশরিকদের জন্য দুঃখ প্রকাশ

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বীয় মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন, ঐ সম্প্রদায় কিরূপে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্তাপ্লুত করে অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে। (আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

মহানবী (সা) কর্তৃক কতিপয় কুরায়শ সর্দারের জন্য বদ দু'আ করা এবং এ প্রসঙ্গে ওহী নাযিল হওয়া

সহীহ বুখারীতে হযরত সালিম থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সাফওয়ান ইবন উমায়্যা, সুহায়ল ইবন আমর এবং হারিস ইবন হিশামের প্রতি বদ দু'আ করেন, এ প্রসঙ্গে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ.

"তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন—এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা তো যালিম।" (সূরা আলে ইমরান : ১২৮)

হাফিয আসকালানী বলেন, এ তিন ব্যক্তিই মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বদ দু'আ করতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াত নাযিল করেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যেন আমার দু' চোখের সামনে রয়েছেন, তিনি পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন এবং বলছিলেন : رب اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "আয় পরোয়ারদিগার, আমার কওমকে ক্ষমা করুন, কেননা তারা জানে না।" (সহীহ মুসলিম, ২খ. পৃ. ১০৮, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়)

উদারতা ও দয়া প্রবণতার দরুন তিনি فانهم لا يعلمون 'তারা জানে না' বলেছেন, فانهم لا يجهلون 'ওরা জাহিল' (মূর্খ) বলেন নি।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৩।

আয়াতের প্রকাশ্য বক্তব্য বিশ্লেষণের পর, যদিও অজ্ঞতা এবং না জানা কোন ওজর হতে পারে না, কিন্তু পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ ও দয়ার আধার নবী করীম (সা) পরিপূর্ণ উদারতা ও অনুগ্রহ স্বরূপ মহান দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু, শ্রেষ্ঠতম দাতা ও শ্রেষ্ঠতম সম্মানের অধিকারী আল্লাহ তা'আলার দরবারে না জানা কে ওযর হিসেবে পেশ করেন যাতে আল্লাহর সনাতন অনুগ্রহ তাদেরকে কুফর ও শিরকের আবর্ত থেকে বের করে ঈমান ও ইসলামের নিরাপদ আশ্রয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। নিষ্ঠা ও অনুগ্রহের অমিয় সুধা পান করিয়ে ভালবাসার নেশায় এমন বুঁদ করে দেন যাতে এ নশ্বর পৃথিবীর অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের ইযযত ও নিয়ামত অনুভব ও চাক্ষুস সাক্ষী হতে পারে। আর পাপাচারের জেলখানা থেকে বেরিয়ে চিরকালের জন্য ঈমান ও ইসলাম, নিষ্ঠা ও অনুগ্রহের নিরাপদ প্রাসাদে এসে স্থায়ী হতে পারে, যাতে কোনকালেই সেখান থেকে বের হতে না হয়।

দ্রষ্টব্য : কাফির যখন পর্যন্ত কুফরী অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জন্যে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা বৈধ যে, যাতে করে আল্লাহ তাকে কুফর ও শিরক থেকে তওবা করার এবং ঈমান ও হিদায়েত গ্রহণের তৌফিক দান করেন। যাতে সে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও অনুকম্পার হকদার হতে পারে। হ্যাঁ, যদি কারো জীবনের সমাপ্তি কুফর ও শিরকের উপর হয়ে যায়, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা জায়েয নেই। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۤ اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْاۤ اُولِيْ قُرْبٰى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ·

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, নিশ্চয়ই ওরা জাহান্নামী।" (সূরা তাওবা : ১১৩)

যুদ্ধকালে হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা)-এর চোখের মণি বেরিয়ে যাওয়া এবং নবী (সা) কর্তৃক তা পুনঃস্থাপন ও তা পূর্বাপেক্ষা উত্তম হয়ে যাওয়া

হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি নবীজীর মুখের সামনে দাঁড়ালাম এবং নিজের চেহারা দুশমনদের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম যাতে শত্রুর তীর আমার চেহারায় আঘাত করে এবং তাঁর পবিত্র চেহারা নিরাপদে থাকে। শত্রুর শেষ তীরটি এসে আমার চোখে এভাবে আঘাত করে যে, আমার চোখের মণি বেরিয়ে আসে। সেটি আমি নিজের হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসূলুল্লাহ (সা) তা দেখে অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে আমার জন্য এ বলে দু'আ করলেন যে, আয় আল্লাহ, কাতাদা যেভাবে তোমার নবীর চেহারার

হিফাযত করেছে, অনুরূপভাবে তুমি তার চেহারা নিরাপদ রাখ। আর এ চোখটিকে তার অপর চোখ অপেক্ষা সুন্দর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন বানিয়ে দাও। এ বলে তিনি মণিটিকে যথাস্থানে রেখে দিলেন। তৎক্ষণাৎ চোখটি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পূর্বাপেক্ষা সুন্দর ও জ্যোতির্ময় হয়ে গেল। (তাবারানী ও আবূ নুয়াইম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং দারু কুতনী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন)।[১]

একটি বর্ণনায় আছে, হযরত কাতাদা (রা) চোখের মণিটি হাতে নিয়ে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, যদি তুমি সবর কর, তাহলে তোমার জন্য জান্নাত অবধারিত, আর যদি চাও তা হলে মণিটি যথাস্থানে রেখে তোমার জন্য দু'আ করি। হযরত কাতাদা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার একজন স্ত্রী আছে, যাকে আমি খুবই ভালবাসি। আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি চোখবিহীন থেকে যাই, তা হলে সে আমাকে ঘৃণা করে না বসে। তিনি নিজ হাতে মণিটি চোখের যথাস্থানে রেখে দিলেন এবং এ দু'আ করলেন : اللهم اعطه جمالا। "আয় আল্লাহ তাকে পূর্ণ সৌন্দর্য দান কর।"[২]

নবী (সা) নিহত হওয়ার মিথ্যা সংবাদের প্রসার লাভ

যখন এ খবর রটে গেল যে, শত্রুদের লক্ষ্যস্থল রাসূলুল্লাহ (সা) নিহত হয়েছেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান হতোদ্যম হয়ে বসে পড়লেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তো শহীদ হয়ে গেছেন, এখন আর লড়াই করে কি হবে। হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর চাচা হযরত নযর ইবন মালিক (রা) বললেন, লোক সকল ! মুহাম্মদ (সা) যদি নিহত হয়েই থাকেন তবুও মুহাম্মদের প্রভু তো আর নিহত হন নি। তিনি যে বিষয়ের জন্য জিহাদ ও লড়াই করেছেন, তোমরাও সে বিষয়ে জিহাদ ও লড়াই চালিয়ে যাও এবং এরই ওপর মৃত্যুবরণ কর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর জীবিত থেকে কি করবে ? এ কথা বলেই তিনি শত্রু বাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। (ইবন ইসহাক, তাবারানী এবং যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৪)।

হযরত আনাস ইবন নযর (রা)-এর শাহাদতবরণের ঘটনা

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার চাচা হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় খুবই ব্যথিত ছিলেন। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আফসোস, আমি মুশরিকদের সাথে সংঘটিত প্রথম জিহাদেই অংশগ্রহণ করতে পারিনি। আগামীতে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে কোন জিহাদে শরীক হওয়ার সুযোগ দেন, তা হলে

১. আল ইসাবা, ৩খ. পৃ. ২২৫।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৪২।

আল্লাহ দেখবেন যে, আমি তাঁর রাহে কিরূপ চেষ্টা-সাধনা, বিক্রম প্রকাশ ও আত্মোৎসর্গ করতে সক্ষম। উহুদ যুদ্ধে যখন কিছু লোক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিল, তখন হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বলেন, আয় আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে এ কর্ম থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি যা ঐ মুসলমানগণ করেছে। অর্থাৎ জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটেছে, আর মুশরিকগণ যা করেছে, আমি তাতেও অসন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি তরবারি নিয়ে অগ্রসর হলেন। সামনে থেকে হযরত সাদ ইবন মুআয (রা)-কে আসতে দেখে হযরত আনাস ইবন নযর (রা) বললেন : اين يا سعد انى اجد ريح الجنة دون احد "কোথায় যাচ্ছ ওহে সা'দ,[1] আমি তো উহুদের নিচে থেকে বেহেশতের সুগন্ধি পাচ্ছি।"

এ বাক্যাবলী কিতাবুর মাগাযীর, আর কিতাবুল জিহাদের বর্ণনায় বাক্যাবলী হলো : يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر انى اجد ريحها دون احد "ওহে সা'দ ইবন মু'আয, এই যে, জান্নাত, নযরের প্রভুর কসম,[2] আমি নিঃসন্দেহে উহুদের নিদেশ থেকে জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি।"

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, কোন কোন সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদেরকে রূহানীভাবে নয়, বরং বাস্তবেও পৃথিবীতেই জান্নাতের সুগন্ধি আঘ্রান করান। যেভাবে ঐ মহাত্মাগণ আখিরাতের জীবনে গোলাপ ও চামেলী ফুলের সুগন্ধি লাভ করবেন, অনুরূপভাবে তাঁরা কখনো কখনো আল্লাহর অনুগ্রহে পৃথিবীতেই জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করেন। যার প্রভাব পাঁচশত মাইল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। আশ্চর্য নয় যে, হযরত আনাস ইবন নযর (রা) অনুভূতি দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। যেমনটি 'হাবিল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ' গ্রন্থে (১খ. পৃ. ২৫০) বলা হয়েছে।

যে সমস্ত লোক পার্থিব নেশায় বিভোর এবং আখিরাতের ব্যাপারে সর্দিতে আক্রান্ত, তাদের অস্বীকৃতি গ্রহণযোগ্য নয়, তারা তো ان بیگانه اولیاء ازحواس এর উপাধিযোগ্য। সর্দিতে আক্রান্ত ব্যক্তির গোলাপ ও চামেলী ফুলের সুবাসকে অস্বীকার করা সুস্থ মস্তিষ্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য (যাঁদের ঘ্রাণশক্তি শত মাইল দূরবর্তী ফুলের ঘ্রাণও পেয়ে যায়) প্রমাণ হতে পারে না।

---

১. এ ধরনের বাক্য আরবী ভাষায় দূরবর্তী লোককে আহ্বানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আশ্চর্য নয় যে, হযরত আনাস (রা) কর্তৃক 'ইয়া সা'দ' বলার উদ্দেশ্য ছিল, ওহে সা'দ, তুমি এ সৌভাগ্য থেকে কত দূরে পড়ে আছ। অনুরূপভাবে এখানে 'আয়না' (কোথায়) শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট স্থান উদ্দেশ্য ছিল না, বরং মর্যাদার স্থান উদ্দেশ্য ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

২. নযর ছিল হযরত আনাস (রা)-এর পিতার নাম। নযর শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো চাকচিক্য ও তরতাজা। সম্ভবত হযরত আনাস (রা) নযর শব্দদ্বারা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'নাদরাতুন নাঈম' নামক জান্নাতের চাকচিক্য ও তরতাজা দৃশ্য অবলোকন করেই নযরের প্রভুর কসম বলে থাকবেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মোটকথা হযরত আনাস ইবন নযর (রা) واها الريح الجنة اجده دون احد "বাহ, বাহ, উহুদ থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।" বলতে বলতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢুকে পড়েন এবং জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর শরীরে তীর ও তরবারির আশিটিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর প্রসঙ্গেই এ আয়াতটি নাযিল হয় :

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ

"মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে।" (সূরা আহযাব : ২৩)

صدق جان دادن بود هین سابقوا * ازنبی بر خوان رجال صدقوا

ইমাম বুখারী তাঁর জামে সহীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি তিন জায়গায় বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল জিহাদ, ১খ. পৃ. ৩৯২; কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৫৭৯-তে বিস্তারিতভাবে এবং কিতাবুত-তাফসীরে পৃ. ৭০৫-এ সংক্ষেপে। আরিফ রূমীর বক্তব্য অনুসারে হযরত আনাস ইবন নযর (রা)-এর অবস্থা ছিল এরূপ :

وقت ان امد كه من عريان شوم * جسم بگزارم سراسر جان شوم

بوئ جانان سوئ جانم مى رسد * بوئ يار مهر بانهم مى رسد

মুসলমানদের চিন্তা এবং অস্থিরতার সবচে' বড় কারণ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাদের চোখের সামনে না দেখা। সর্বপ্রথম হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে চিনে ফেলেন। তিনি বর্মাবৃত ছিলেন, পবিত্র মুখমণ্ডলও ছিল অবগুণ্ঠিত। কা'ব বলেন, আমি বর্মের ভিতর থেকে তাঁর উজ্জ্বল চোখ দেখেই তাঁকে চিনেছি। তৎক্ষণাৎ আমি উচ্চস্বরে চিৎকার দিলাম, ওহে মুসলমানগণ, তোমাদের জন্য সুসংবাদ, এই যে রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে। তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত দিলেন যে, চুপ থাক। যদিও তিনি দ্বিতীয়বার বলতে নিষেধ করলেন, কিন্তু সবারই কান এবং মস্তিষ্ক তো এদিকেই নিবদ্ধ ছিল। কাজেই কা'ব (রা)-এর এক চিৎকারের শব্দ শোনামাত্র সবাই পতঙ্গের মত ছুটে এসে তাঁর চারপাশে জমায়েত হলেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বর্ম খুলে আমাকে পরিয়ে দেন এবং আমার বর্ম তিনি পরিধান করেন। শত্রুরা রাসূলুল্লাহ (সা) ভেবে আমার প্রতি তীর বর্ষণ শুরু করে, যাতে আমি বিশটিরও অধিক আঘাত পাই। (হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনাকারিগণ নির্ভরযোগ্য)।

যখন কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁর কাছে জমায়েত হলেন, তখন তিনি পাহাড়ী ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হলেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত তালহা ও হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা) তাঁর সঙ্গী ছিলেন। যখন পাহাড়ে আরোহণ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন দুর্বলতা, অক্ষমতা এবং বর্মের ভারে উঠতে পাচ্ছিলেন

না। ফলে হযরত তালহা (রা) বসে পড়েন এবং নবীজী তাঁর পিঠে পা রেখে আরোহণ করেন।

উবাই ইবন খালফকে হত্যা

ইত্যবসরে উবাই ইবন খালফ ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে পড়ল। ঘোড়াটিকে সে দানাভূষি খাইয়ে এ জন্যে মোটাতাজা করে তুলেছিল যে, এর উপর সওয়ার হয়ে সে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে। নবী (সা) যখন তার উদ্দেশ্য জানতে পেরেছিলেন, তখন বলেছিলেন, ইনশা আল্লাহ আমিই তাকে হত্যা করব।

যখন সে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম অনুমতি চাইলেন যে, আমরা একে খতম করে দিই। তিনি বললেন, কাছে আসতে দাও। যখন সে নিকটে চলে এলো, তখন নবী (সা) হযরত হারিস ইবন সাম্মা (রা)-এর হাত থেকে বর্শা নিয়ে তার ঘাড়ে একটা খোঁচা দিলেন, যাতে সে বিচলিত হয়ে উঠল এবং চিৎকার করতে করতে প্রত্যাবর্তন করল যে, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ আমাকে মেরে ফেলেছেন।

লোকজন বলল, এ তো সামান্য একটু খোঁচামাত্র, কোন গুরুতর আঘাত তো নয়, যার জন্য তুমি এত চেঁচাচ্ছ ! উবাই বলল, তোমাদের কি স্মরণ নেই যে, মুহাম্মদ মক্কায় থাকতেই বলেছিলেন, আমিই তোমাকে হত্যা করব। এ খোঁচার কষ্ট আমার অন্তর টের পাচ্ছে। আল্লাহর কসম, যদি এ খোঁচা সমস্ত হিজাযবাসীর মধ্যেও বন্টন করে দেয়া হয়, তবে সবারই ধ্বংসের জন্য তা-ই যথেষ্ট হবে। এভাবে চেঁচামেচি করতে করতে সরফ নামক স্থানে পৌঁছে সে মৃত্যুবরণ করে।[১]

হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আঘাতের স্থানসমূহ ধৌত করা

যখন তিনি ঘাঁটিতে পৌঁছলেন, যুদ্ধ ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে। তিনি সেখানে পৌঁছে বসে পড়লেন। হযরত আলী (রা) পানি নিয়ে এলেন এবং তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ধুয়ে দিলেন এবং কিছু পানি তাঁর মাথায়ও ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি উযূ করলেন এবং বসে বসে যোহরের নামায আদায় করলেন। সাহাবায়ে কিরামও তাঁর পিছনে বসে বসে ইকতিদা করলেন।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৫।

২. প্রথমে শরীআতের নির্দেশ এরূপই ছিল যে, কোন ওযরবশত ইমাম যদি বসে বসে নামায আদায় করেন, তখন মুক্তাদীগণও তার পিছনে বসে বসে ইকতিদা করবে, যদিও মুক্তাদীগণ সুস্থ থাকেন। পরে এ নির্দেশ রহিত হয়ে যায়। ফলে ইমাম ওযরবশত বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকালীন অসুস্থতার সময়ে তিনি বসে বসে ইমামতি করেন এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করেন। আল্লাহ তা'আলা ভাল জানেন।

কুরায়শগণ কর্তৃক মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করা

মুশরিকগণ মুসলমানদের লাশের অঙ্গচ্ছেদ করা শুরু করে। অর্থাৎ তাঁদের নাক ও কান কেটে ফেলে, পেট চিরে ফেলে এবং গুপ্তাঙ্গ কেটে ফেলে। পুরুষদের সাথে সাথে মহিলারাও এ কাজে অংশগ্রহণ করে।

হিন্দা, যার পিতা উতবা বদর যুদ্ধে হযরত হামযা (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিল, সে হযরত হামযা (রা)-এর অঙ্গচ্ছেদ করে। পেট ও বুক চিরে কলিজা বের করে চিবোয়, কিন্তু গলাধঃকরণ করতে না পেরে ফেলে দেয় এবং এ আনন্দেই সে নিজের অলঙ্কার খুলে ওয়াহশীকে দান করে।

আর সে মুসলমান শহীদদের কর্তিত নাক-কান দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় পরিধান করে।[১]

আবূ সুফিয়ানের প্রশ্ন এবং হযরত উমর (রা)-এর জবাব

কুরায়শগণ যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন আবূ সুফিয়ান একটি পাহাড়ে আরোহণ করে চিৎকার করে বলল, افی القوم محمد "তোমাদের মধ্যে কি মুহাম্মদ (সা) জীবিত আছেন ?" নবী (সা) বললেন, কেউ জবাব দেবে না। এভাবে আবূ সুফিয়ান তিনবার প্রশ্ন করল, কিন্তু কোন জবাব এলো না। কিছুক্ষণ পর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, افی القوم ابن ابی قحافة "তোমাদের মধ্যে কি ইবন আবূ কুহাফা (অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক) জীবিত আছেন ?" নবী (সা) বললেন, কেউ জবাব দেবে না। সে এ প্রশ্নটিও তিনবার করে তারপর চুপ হয়ে গেল। একটু পরে আবার চিৎকার দিল, افی القوم ابن الخطاب "তোমাদের মধ্যে কি উমর ইবন খাত্তাব জীবিত আছেন ?" এ প্রশ্নও সে তিনবার করল, কিন্তু যখন কোন জবাব পেল না, তখন আনন্দিত চিত্তে আপন সঙ্গীদেরকে বলল, اما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احياء لا جابوا "মনে হয় এরা সবাই নিহত হয়েছে। যদি জীবিত থাকত, তা হলে অবশ্যই জবাব দিত।"[২]

এতে হযরত উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না এবং চিৎকার করে বললেন : كذبت والله يا عدو الله ابقى الله عليك ما يحزنك "ওহে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহর

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৪–৪৭।

২. সহীহ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে কেবল (আরবী) এ বাক্য রয়েছে, اما هؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احياء لا جابوا বাক্যের উল্লেখ নেই, কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় ان هؤلاء فقد قتلوا كانوا احياء لا جابونا আছে। এ অধম (লেখক) উভয় রিওয়ায়াত একত্র করে দিয়েছে। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা), হযরত আবূ বকর এবং হযরত উমর (রা)-কে তিনবার করে আহ্বান করার উল্লেখ কিতাবুল জিহাদে আছে, কিতাবুল মাগাযীতে কেবল এক-একবার আহ্বানের উল্লেখ রয়েছে।

কসম, তুই মিথ্যে বলেছিস, তোর চিন্তা ও দুঃখের কারণকে আল্লাহ্ তা'আলা এখনও জীবিত রেখেছেন।"

এরপর আবূ সুফিয়ান (নিজ দেশ ও গোত্রের এক মূর্তির নামে জয়ধ্বনি দিল) এবং বলল, اعل هبل اعل هبل "হে হুবল তুমিই মহান, হে হুবল তুমিই সর্বোচ্চ।"[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, ওর জবাবে বল, الله اعلى واجل। "আল্লাহই সবচে' বড় ও মহান।"

আবূ সুফিয়ান বলল, ان لنا العزى ولا عزى لكم "আমাদের কাছে উযযা আছে, তোমাদের উযযা নেই।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, ওর জবাবে বল, الله مولنا ولا مولى لكم فنعم المولى ونعم النصير "আল্লাহ আমাদের প্রভু, আর আমাদের প্রভু কত উত্তম এবং উত্তম সাহায্যকারী, তোমাদের তা নেই।"

আবূ সুফিয়ান বলল, يوم بيوم بدر والحرب سجال "এ দিনটি বদর যুদ্ধের প্রতিউত্তর প্রদানের দিন, যুদ্ধে তোমরা এবং আমরা একইরূপ, কখনো তোমরা জয়লাভ কর, আর কখনো আমরা।"

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত উমর (রা) এ জবাব দেন : لا سواء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار "আমরা ও তোমরা একইরূপ নই, আমাদের নিহতরা জান্নাত লাভ করেছে, আর তোমাদের নিহতরা গেছে জাহান্নামে।"[২]

আবূ সুফিয়ানের বক্তব্যে এর জবাব দেয়া হয়নি, কেননা তা ছিল সত্য। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী, تلك الايام نداولها بين الناس -এর সমার্থক।

এরপর আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-কে বলল, هلم الى يا عمر "হে উমর, আমার কাছে এসো।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমরকে বললেন, যাও এবং দেখ, সে কি বলে। হযরত উমর (রা) তার কাছে গেলে সে বলল, انشدك الله يا عمر اقتلنا محمدا। "ওহে উমর, তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি সত্য বল দেখি, আমরা কি মুহাম্মদকে হত্যা করেছি?"

হযরত উমর (রা) বললেন, اللهم لا وانه ليسمع كلامك الان। "আল্লাহর কসম, অবশ্যই নয়, তিনি নিশ্চয়ই এক্ষণে তোমার কথা শুনছেন।"

আবূ সুফিয়ান বলল, انت عندى اصدق من ابن قمية وابر "তুমি আমার কাছে ইবন কুমায়্যা থেকে বেশি সত্যবাদী এবং সৎ।"

---

১. কিতাবুল জিহাদের বর্ণনায় اعل هبل اعل هبل দু'বার আছে। আর কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় একবার উল্লেখ করা হয়েছে।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৭; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৭৩।

একটু পর আবূ সুফিয়ান বলল, انه قد كان قتلاكم مثل والله ما رضيت ولا نهيت ولا امرت। "আমাদের লোকদের হাতে তোমাদের নিহতদের অঙ্গচ্ছেদন হয়েছে, আল্লাহর কসম, আমি এ কাজে খুশি-অখুশি কোনটাই নই। না আমি এ কাজের নির্দেশ দিয়েছি, আর না নিষেধ করেছি।"

প্রত্যাবর্তনকালে সে চিৎকার দিয়ে বলল, موعدكم بدر للعام القابل "আগামী বছর বদরে তোমাদের সাথে লড়াইয়ের ওয়াদা রইল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, نعم هو بينا وبينك موعد انشاء الله "হ্যাঁ, এটা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ওয়াদা রইল ইনশা আল্লাহ।"[1] (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ২৪; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৭৯)

মুশরিকদের প্রত্যাবর্তনের পর মুসলমান মহিলাগণ সংবাদ গ্রহণ এবং অবস্থা জানার জন্য মদীনা থেকে বের হন। সায়্যিদাতুন নিসা হযরত ফাতিমা যোহরা (রা) এসে দেখেন, নবীজীর পবিত্র চেহারা থেকে রক্ত ঝরছে। হযরত আলী (রা) ঢালে করে পানি আনলেন এবং হযরত ফাতিমা পবিত্র চেহারা ধুয়ে দিলেন, কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছিল না। তাঁরা যখন দেখলেন রক্ত বেড়েই চলছে, তখন এক টুকরা চাটাই পুড়িয়ে এর ছাই আঘাতের স্থানে লেপে দিলেন, ফলে রক্ত বন্ধ হলো। ইমাম বুখারী ও তাবারানী হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।[2]

দ্রষ্টব্য

১. এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা করা জায়েয।

২. অধিকন্তু চিকিৎসা করাটা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার বিপরীত নয়।

৩. এটাও জানা গেল যে, হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও শারীরিক অসুস্থতা এবং দৈহিক অসুবিধা হয়, যাতে তাঁদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের অনুসারীগণ তাঁদের দেখে ধৈর্য-স্থৈর্য, সন্তুষ্টি ও মেনে নেয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারেন। অধিকন্তু এ মানবীয় বাস্তবতা ও মানুষের জন্য অপরিহার্যতা দেখে বুঝতে পারেন যে, এঁরা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র এবং নিষ্ঠাবান বান্দা, আল্লাহ ক্ষমা করুন, এঁরা আল্লাহ নন। এ মহাত্মাগণের মু'জিযা ও প্রকাশ্য নিদর্শন তাঁদের নবূওয়াত ও রিসালাতের প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণ বলেই মনে করেন, খ্রিস্টান হাওয়ারীদের (হযরত ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারী) মত ফিতনায় জড়িয়ে পড়ে তাঁকে আল্লাহ মনে করে না বসেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই, আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও

---

১. 'ইনশা আল্লাহ' বাক্যটি আল্লামা যারকানী উদ্ধৃত করেছেন, তাবারী এবং ইবন হিশামের বর্ণনায় নেই। যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৮।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি, তাঁর বংশধরগণের প্রতি, তাঁর সাহাবিগণের প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণের ও সন্তানদের প্রতি অযুত অসংখ্য বরকত ও শান্তি বর্ষিত করুন।[১]

৪. অধিকন্তু এ ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টিও সুচারুরূপে প্রকাশ পেল যে, নবী করীম (সা)-এর পরে হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পর হযরত উমর (রা)-এর মর্যাদা। আর এ বিন্যাস এতদূর প্রকাশ্য ও প্রসিদ্ধ ছিল যে, কাফিররাও এটাই মনে করত যে, নবী (সা)-এর পর হযরত আবূ বকর (রা) এবং তাঁর পরে হযরত উমর (রা)-এর অবস্থান। মোট কথা, এ দু'জনের মর্যাদার ক্রমবিন্যাস কাফিরদেরও জানা ছিল। দৃষ্টান্ত দ্বারা কাফিররা এটা বুঝে নিয়েছিল যে, নবী-দরবারে প্রথম স্থান হযরত আবূ বকর (রা)-এর এবং এর পরবর্তী অবস্থান হযরত উমর (রা)-এর, আর এঁরা দু'জনই নবী (সা)-এর প্রধান উপদেষ্টা।

হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

কুরায়শদের চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত[২] (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, সা'দ ইবন রবী আনসারী (রা)-কে খোঁজ কর, সে কোথায় এবং বললেন, ان رأيته فاقرأه منى السلام وقل له يقول رسول الله كيف تجدك "যদি দেখতে পাও, তবে তাকে আমার সালাম বলবে এবং বলবে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেছেন, এখন তুমি কিরূপ অনুভব করছ?"

হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) বলেন, আমি খুঁজে খুঁজে হযরত সা'দ ইবন রবী (রা)-এর নিকটে পৌঁছলাম। তাঁর জীবনের এখনো কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তাঁর শরীরে তীর এবং তরবারির সত্তরটি আঘাত ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী তাঁকে শোনালাম। হযরত সা'দ ইবন রবী (রা) জবাব দিলেন :

على رسول الله السلام وعليك السلام قل له يا رسول الله اجدانى اجد ريح الجنة وقل لقومى الانصارى لاعذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله ﷺ وله وسلم شفر يطرف قال وفاضت نفسه رحمه الله .

"রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিও সালাম এবং তোমাদের প্রতিও ; রাসূলুল্লাহ (সা)-কে গিয়ে বলবে, আমি এখন জান্নাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। আর আমার সম্প্রদায় আনসারগণকে বলবে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যদি কোন কষ্ট হয় আর তোমাদের মধ্যে একটা চোখও

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

২ এটা হাকিমের বর্ণনা যে, হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হাফিয ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনানুযায়ী হযরত উবাই ইবন কাব (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন, আর ওয়াকিদীর বর্ণনানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। আশ্চর্য নয় যে, তিনি একের পর এক তিনজনকেই প্রেরণ করেছিলেন অথবা একই সময়ে তিনজনকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৪৯।

যদি তা দেখার জন্য অবশিষ্ট থাকে, অর্থাৎ যদি তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও জীবিত[১] থাকে, তা হলে মনে রাখবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমাদের কোন ওজরই টিকবে না। এ বলে তিনি ইনতিকাল করলেন।"

হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ সনদবিশিষ্ট এবং হাফিয যাহবীও তাঁর তালখীস গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন।

অপর এক বর্ণনায়, হযরত সা'দ (রা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে বলেছিলেন :

اخبر رسول الله ﷺ انى فى الاموات واقرأه السلام وقل له يقول جزاك الله عنا وعن جميع الامة خيرا ·

"রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলবে যে, এখন আমি মারা যাচ্ছি। আর তাঁকে সালাম দিয়ে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আল্লাহ আপনাকে আমাদের এবং সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। কেননা আপনি আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন।" [মুস্তাদরাকে হাকিম, হযরত সাদ ইবন রবী (রা)-এর জীবন চরিত]

ইবন আবদুল বার-এর বর্ণনায় হযরত উবাই ইবন কাব (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, আমি ফিরে এলাম এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হযরত সাদ (রা)-এর সংবাদ শোনালাম। তিনি বললেন : رحمه الله نصح الله ولرسوله حيا و ميتا "আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন, সে জীবিতাবস্থায় এবং মৃত্যুকালেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত ছিল।" (হাফিয ইবন আবদুল বার কৃত আল ইসতিয়াব, ২খ. পৃ. ৩৫ এবং ইসাবার ফুটনোট)।

হযরত হামযা (রা)-এর লাশ অনুসন্ধান

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং হযরত হামযা (রা)-এর খোঁজে বের হলেন। বাতনে ওয়াদীতে তাঁকে অঙ্গচ্ছেদ করা অবস্থায় পাওয়া গেল। নাক এবং কান ছিল কর্তিত, পেট এবং বুক ছিল ফাঁড়া। এ অন্তর কাঁপানো হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন, তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আমি যতদূর জানি, অবশ্যই তুমি কল্যাণকামী এবং পরোপকারী ছিলে। যদি সাফিয়্যার দুঃখ-বেদনার ব্যাপার না থাকত, তবে আমি তোমাকে এ অবস্থায়ই রেখে দিতাম যাতে তোমাকে পশু-পাখি আহার করত এবং তাদের পেট থেকেই উত্থিত হতে। আর তিনি ঐ স্থানেই দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, যদি তিনি আমাকে কাফিরদের উপর বিজয় দান করেন, তা হলে আমি তোমার প্রতিশোধে সত্তরজন কাফিরের অঙ্গচ্ছেদন করব। তিনি তখনো ঐ স্থান ত্যাগ করেন নি, এমন সময় এ আয়াত নাযিল হলো :

---

১. এক রিওয়ায়াতে شفر স্থলে وفيكم عين تطرف রয়েছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ৩৯।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ - وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ٠

"যদি তোমরা শাস্তি দাওই, তবে ঠিক ততখানি শাস্তি দিবে যতখানি অন্যায় তোমদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই সাহায্যে। ওদের দরুন দুঃখ করো না এবং ওদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুণ্ন হয়ো না। আল্লাহ তাদের সঙ্গেই আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা নাহল : ১২৬-১২৮)

ফলে তিনি ধৈর্যধারণ করলেন এবং শপথের কাফফারা দিয়ে ইচ্ছা পরিত্যাগ করলেন।[১]

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত হামযা (রা)-কে দেখলেন, তখন কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, এমনকি তাঁর হিক্কা এসে গেল। তিনি বললেন, سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة "কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে হামযাই হবেন সমস্ত শহীদের সর্দার।"

হাকিম বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং হাফিয যাহবীও একে সহীহ বলেছেন।[২]

মু'জামে তাবারানীতে হযরত আলী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব সমস্ত শহীদের সর্দার।[৩]

এ কারণেই হযরত হামযা (রা)-কে সাইয়্যেদুশ শুহাদা (শহীদগণের সর্দর) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

এ যুদ্ধেই হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-ও শহীদ হন। মুজামে তাবারানী ও দালাইলে আবূ নুয়াইমে উত্তম সনদে হযরত সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, উহুদের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ আমাকে

---

১. মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ১৯৭।

২. আল্লামা যুরকানী বলেন, এ হাদীসটি হাকিম, বায়হাকী, বাযযার ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। হাফিয আসকালানী তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন, হাদীসটির সনদ যঈফ (যুরকানী, ২খ. প. ৫১)। তবে তিনি এ হাদীসটি উল্লেখের পর বলেন, এটি কয়েকটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, যার কোন কোন সনদ অপর সনদকে শক্তিশালী করেছে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮২।

৩. সহীহ বুখারীর মুতাদাউলের কপিতে 'হযরত হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা)-এর কতল' শীর্ষক একটি অধ্যায় রয়েছে। কিন্তু নাসাফী কপিতে 'কাতলে হামযা সায়্যিদুশ শুহাদা' নামে অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে। সম্ভবত ইমাম বুখারী তাঁর তরজমাতুল বাবে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

একপাশে ডেকে নিয়ে চুপে চুপে বললেন, এসো আমরা দু'জন কোন পৃথক স্থানে বসে দু'আ করি এবং একে অপরের দু'আয় আমিন বলি।

সা'দ (রা) বলেন, আমরা দু'জন সবার থেকে পৃথক হয়ে কোন এক কোণায় বসে পড়লাম। প্রথমে আমি দু'আ করলাম, আয় আল্লাহ, আজ এমন একজন দুশমনের সাথে মুকাবিলা হোক যে অত্যন্ত শক্তিশালী, বীর যোদ্ধা এবং হিংস্র। আমি তার সাথে কিছুক্ষণ লড়াই করব এবং সেও আমার সাথে লড়াই করবে। অতঃপর আয় আল্লাহ, আমাকে তার ওপর বিজয়দান কর। এমনকি আমি যেন তাকে হত্যা করি এবং তার মালামাল ছিনিয়ে নিতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) আমিন বললেন এবং এরপর তিনি এ দু'আ করলেন, আয় আল্লাহ, আজ এমন এক দুশমনের সাথে সংঘর্ষ হোক, যে কঠিন হৃদয়, শক্তিশালী এবং হিংস্র। আমি কেবল তোমারই উদ্দেশ্যে ওর সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি। আর সেও আমার সাথে লড়বে। অবশেষে সে আমাকে হত্যা করুক এবং আমার নাক-কান কাটুক। আয় পরোয়ারদিগার, আমি যখন তোমার সাথে সাক্ষাত করব, আর তুমি জিজ্ঞেস করবে, ওহে আবদুল্লাহ, তোমার নাক এবং কান কোথায় কাটা গেছে ? তখন আমি আরয করব, আয় আল্লাহ, তোমার এবং তোমার পয়গম্বরের পথে। তখন তুমি বলবে, তুমি সত্যই বলেছ। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, তার দু'আ আমার দু'আ অপেক্ষা কতই না উত্তম ছিল ! সন্ধ্যায় দেখলাম, তার নাক এবং কান কর্তিত।[১]

হযরত সা'দ (রা) বলেন, আমার দু'আও কবূল হয়েছিল, আমিও এক শক্তিশালী ভয়ঙ্কর কাফিরকে হত্যা করি এবং তার মালামাল ছিনিয়ে নিই।[২]

হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) এ দু'আ করেছিলেন :

اللهم انى اقسم عليك ان القى العدد فيقتلونى ثم يبقروا بطنى ويجدعوا انفى واذنى ثم قالنى بم ذلك فاقول فيك ·

"আয় আল্লাহ, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে, আমি তোমার শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করি এবং তারা আমাকে হত্যা করুক, আমার পেট ফেঁড়ে ফেলুক, আমার নাক-কান কেটে ফেলুক। এরপর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর যে, এটা কেন হলো ? আমি বলব, কেবল তোমারই জন্যে।"

হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশা রাখি যে, যেরূপে আল্লাহ বিশেষভাবে শাহাদতের ব্যাপারে তাঁর দু'আ কবূল করেছেন, একইভাবে তাঁর অপর দু'আটিও আল্লাহ নিশ্চয়ই কবূল করবেন। অর্থাৎ শাহাদতের পর তিনি এ কথা জিজ্ঞেস করবেন এবং তিনিও ঐ উত্তর দেবেন।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৫১।

২ রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ১৪৩।

হাকিম বলেন, এ হাদীসটি যদি মুরসাল না হতো, তা হলে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ হতো। হাফিয যাহবী বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল সহীহ। (মুস্তাদরাক, ৩খ. পৃ. ২০০)

এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন জাহাশ (রা)-কে مـجـدع فى الله (অর্থাৎ যে ব্যক্তির নাক ও কান আল্লাহর রাস্তায় কাটা গেছে) উপাধিতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।[১]

আল্লাহ্ তা'আলার প্রেমিক এবং নিষ্কলুষ মহব্বতকারীদের অবস্থা এমনটিই হয়ে থাকে যে, আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করাকে তাঁরা সর্বোচ্চ পর্যায়ের সৌভাগ্য বলে মনে করেন। পার্থিব জীবনের চেয়ে মৃত্যুই তাঁদের কাছে বেশি উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় মনে হয়। এ জন্যে যে, মৃত্যুকে তাঁরা প্রকৃত প্রেমাস্পদের (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যম এবং পার্থিব জীবনের জিন্দানখানা থেকে মুক্তিলাভ করে জান্নাতী বাগ-বাগিচায় পৌঁছার উপায় মনে করেন।

تلخ بنو وپیش ایشان مرگ تن * چون روندار چاه زندان درچمـن

تلخ کی باشـد کی راکـش بـرنـد * از میان زهرماران سـوئ قـنـام

দ্রষ্টব্য : আল্লাহ্ তা'আলা যখন মানুষকে খলীফা বানানোর ইচ্ছা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আরয করেন :

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ دِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ·

"তুমি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে ? আমরাই তো তোমার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।" (সূরা বাকারা : ৩০)

মানুষের মধ্যে দু'ধরনের শক্তি থাকে। একটি বাসনার শক্তি, যার মাধ্যমে ব্যভিচার ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে, যাকে ফেরেশতাগণ مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا দ্বারা প্রকাশ করেছেন, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাশবিক শক্তি, যাকে ফেরেশতাগণ وَيَسْفِكُ دِّمَاءَ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। ফেরেশতাগণ মানুষের এ ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু এটা খেয়াল করেন নি যে, এই বাসনা শক্তির লক্ষ্য যদি আল্লাহ তা'আলার প্রতি ফিরিয়ে দেয়া হয়, তা হলে এর ফলাফল যা প্রকাশ পাবে, তাতে ফেরেশতাগণও আফসোস করতে শুরু করবেন। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালবাসার আধিক্য ও তাঁর প্রেমের উন্মাদনা দেখে। অনুরূপভাবে যখন পাশবিক শক্তিকে আল্লাহর কুদরতের কাজে ব্যয় করা হয়, তখন তা থেকেও আশ্চর্য ও অভূতপূর্ব ফলাফল প্রকাশ পায়, যা দেখে ফেরেশতাগণ পর্যন্ত হতবাক হয়ে যান। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পথে আত্মদান, তাঁর দুশমনের সাথে যুদ্ধ করা দেখে।

১. ইসাবা, ২খ. পৃ. ২৮৭; যারকানী, ২খ. পৃ. ৫১।

نشود نصيب دسمن كه شود هلاك تغيت * سردوستان سلامت كه تو خنجر از مائ

ফেরেশতাগণ যদিও দিবারাত্র মহান আল্লাহর তসবীহ-তাহলীল করেন, কিন্তু তাঁর ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গ করেন না, তাঁরা এ সম্পদের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রকৃত প্রেমিকের জন্য জীবন দেয়া, তাঁর পথে শাহাদতবরণ করার সাধ্যই ফেরেশতাদের নেই। মানুষ যদিও ফেরেশতাদের মত নিষ্পাপ নয়, কিন্তু পাপকাজের পর মানুষের অস্থির অনুশোচনা, লজ্জিত অবস্থায় আত্মদহন ও কান্নাকাটি দ্বারা মর্যাদা এতই উচ্চে তুলে দেয়, ফেরেশতাগণের অবস্থান যার অনেক নীচে পড়ে থাকে।

مركب توبه عجائب مركب است * برفلك تازوبيك لحظئ زبست

چون برار نداز پيشمانى انين * عرش لرزد ازانين المذنبين

এ জন্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, নবী-রাসূলগণ পদস্থ ফেরেশতা অপেক্ষা উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন এবং সাহাবী, তাবিঈন, সত্যবাদী, শহীদ ও সৎকর্মশিলগণ আসমান ও যমীনের ফেরেশতাগণ অপেক্ষা মর্যাদাবান। (যেমনটি বাহরুর রায়েক, ১খ. পৃ. ৩৩৩-এ বলা হয়েছে; বিস্তারিত জানতে চাইলে সেখানে দেখুন)। আর সৎকর্মশীল ঈমানদার স্ত্রীলোকগণ জান্নাতের আনত নয়না হূরদের চেয়ে উত্তম, যেমনটি মাওয়াকিতুল জাওয়াহির গ্রন্থে বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত জাবির (রা)-এর শ্রদ্ধাষ্পদ পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম আনসারী (রা) এ যুদ্ধেই শাহাদতবরণ করেন। হযরত জাবির (রা) বলেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। কাফিররা তাঁর অঙ্গচ্ছেদন করে। তাঁর লাশ যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে এনে রাখা হলো, তখন আমি কাপড় উঠিয়ে আমার পিতার মুখ দেখতে চাইলাম, কিন্তু সাহাবিগণ নিষেধ করলেন। আমি আবার তাঁর মুখ দেখতে চাইলাম, কিন্তু সাহাবিগণ আবার নিষেধ করলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে অনুমতি দিলেন।

আমার ফুফু ফাতিমা বিনতে আমর যখন খুবই কাঁদতে শুরু করলেন, তখন তিনি বললেন, কাঁদছ কেন, তার উপর তো ফেরেশতাগণ ছায়া দিয়ে রেখেছেন, এমন কি তারা জানাযাও হয়েছে (বুখারী শরীফ)।[১] অর্থাৎ এ অবস্থা শোক এবং বেদনার নয়, বরং আনন্দ ও খুশির, কেননা ফেরেশতা তোমার ভাইকে ছায়াদান করছেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাকে দেখে বললেন, ওহে জাবির, তোমার কি হয়েছে যে, আমি তোমাকে হতোদ্যম দেখতে পাচ্ছি ? আমি

১. এ হাদীসটি বুখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যেমন, কিতাবুল জানায়েয, পৃ. ১৬৬ ও ১৭২, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ৩৯৫ এবং কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৫৮৪।

আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। আর তিনি অনেক সন্তান-সন্তুতি এবং প্রচুর ঋণ রেখে গেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে একটি সুসংবাদ শোনাব না ? আমি আরয করলাম, কেন নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেন না, কিন্তু তোমার পিতাকে জীবিত করে তিনি খোলাখুলি কথা বলেছেন এবং বলেছেন, ওহে আমার বান্দা, তোমার কোন ইচ্ছা থাকলে আমাকে বল। তখন তোমার পিতা আরয করেছে, আয় পরোয়াদিগার, আমার ইচ্ছা এই যে, আমি পুনরায় জীবিত হই এবং তোমার পথে পুনরায় নিহত হই। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটা তো হবে না, কেননা এটা নির্ধারিত হয়েই আছে যে, মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার কাউকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়া হবে না।[১] (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আলে ইমরান)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা) বলেন, উহুদ যুদ্ধের পূর্বে আমি হযরত মুবাশ্বির ইবন আবদুল মুনযির (রা)-কে স্বপ্নে দেখলাম যে, তিনি বলছেন, ওহে আবদুল্লাহ, তুমিও শীঘ্রই আমাদের কাছে আসছ। আমি বললাম, তোমরা কোথায় ? তিনি বললেন, জান্নাতে, যেখানে ইচ্ছা, ঘুরে বেড়াই। আমি বললাম, তুমি কি বদর যুদ্ধে নিহত হওনি ? মুবাশ্বির (রা) বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু পুনরায় জীবিত করে দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি এ স্বপ্ন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, হে আবূ জাবির, এর ব্যাখ্যা হলো শাহাদত।[২]

হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা)-এর ভগ্নিপতি হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-ও এ যুদ্ধেই শহীদ হন। তাঁর শাহাদত লাভের ঘটনাও আশ্চর্যজনক। হযরত আমর ইবন জমূহ (রা) খোঁড়া ছিলেন এবং তা সামান্য নয়, বরং বেশ খোঁড়া ছিলেন। তাঁর চার পুত্রের সবাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করতেন। উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি তাদের বললেন, আমিও তোমাদের সাথে জিহাদে যাচ্ছি। তাঁর ছেলেরা বললেন, আপনি অপারগ, আল্লাহ আপনাকে অব্যাহতি দিয়েছেন। আপনি এখানেই অবস্থান করুন। কিন্তু কোন কর্তব্যনিষ্ঠ নিবেদিতপ্রাণ মর্যাদা প্রত্যাশী ব্যক্তি কি কখনও অব্যাহতির উপর নির্ভর করেন ? শাহাদত লাভের আগ্রহে তিনি এতই উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলেন যে, ঐ অবস্থায়ই খোঁড়াতে খোঁড়াতে

---

১. হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী নামক গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে একে হাসান বলেছেন এবং হাকিম সহীহ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ২৫, تمنى المجاهد ان يرجع الى الدنيا অধ্যায়।

২ যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৯৬; ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৭২।

নবীজীর দরবারে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার ছেলেরা আমাকে আপনার সাথে যেতে বারণ করে। والله انى لارجو ان اطأبعر حتى هذه فى الجنة "আল্লাহর কসম, আমি আশা করি এ খোঁড়া অবস্থাতেই আমি জান্নাতের যমীনে পদচারণা করব।"

তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে অসমর্থ করেছেন, তোমার ওপর জিহাদ ফরয নয়। আর তিনি তার পুত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন, যদি তোমরা ওকে বাধা না দাও তা হলে অসুবিধা কোথায়, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা এর ভাগ্যে শাহাদত রেখেছেন। কাজেই তিনি জিহাদ করতে বের হলেন এবং শহীদ হলেন।[১]

আর মদীনা থেকে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় তিনি কিবলামুখী হয়ে এ দু'আ করলেন, اللهم ارزقنى الشهادة ولاتردنى الى اهلى "আয় আল্লাহ আমাকে শাহাদত নসীব করো এবং আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনো না।"

এ যুদ্ধেই তাঁর পুত্র হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ-ও শহীদ হন। হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-এর স্ত্রী হযরত হিন্দা বিনতে আমর ইবন হারাম (যিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম-এর ভগ্নী এবং হযরত জাবিরের ফুফু ছিলেন) ইচ্ছা করলেন যে, এ তিন শহীদ অর্থাৎ ভ্রাতা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম, পুত্র হযরত খাল্লাদ ইবন আমর ইবন জমূহ এবং স্বামী হযরত আমর ইবন জমূহ (রা)-কে একটি উটের পিঠে উঠিয়ে নেবেন এবং মদীনায় গিয়ে তিনজনকেই দাফন করবেন। কিন্তু মদীনার দিকে ফিরতেই উট বসে পড়ত আর উহুদের দিকে ফিরলে দ্রুত অগ্রসর হতো।

হিন্দা এসে ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জানালেন। তিনি বললেন, আমর ইবন জমূহ মদীনা থেকে আসার সময় কিছু বলেছিল কি? হিন্দা তখন তার যাত্রাকালের দু'আর কথা নবী (সা)-কে অবহিত করলেন। তখন তিনি বললেন, এ জন্যেই উট যাচ্ছে না। তিনি আরো বললেন :

والذى نفسى بيده ان منكم من لو اقسم على الله لابره منهم عمر بن الجموه ولقد رأيته يطاء بعرجه فى الجنة .

"ঐ পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমনও কেউ কেউ আছে, সে যখন কোন কসম করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তা পূর্ণ করেন। আমর ইবন জমূহও তাদের মধ্যে একজন। আর অবশ্যই আমি তাকে জান্নাতে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেছি।"[২] (আল ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ৫০৪, হযরত আমর ইবন জমূহ-এর জীবন চরিত অধ্যায় এবং ইসাবার ফুটনোট)।

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৭।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ৫০;রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৩৯; উয়ূনুল আসার, পৃ. ৩৪৭।

উহুদের সন্নিকটে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম এবং হযরত আমর ইবন জমূহ (রা) উভয়কে একই কবরে দাফন করা হয়।

হযরত খায়সামা (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত খায়সামা (রা), [রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যার পুত্র শহীদ হয়েছিলেন], নবী-দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আফসোস, আমার বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা হয়নি, যাতে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি খুবই আগ্রহী এবং উদগ্রীব ছিলাম। এমন কি এ সৌভাগ্য অর্জনের লক্ষ্যে আমি আমার পুত্রের সাথে লটারী[১] করলাম, কিন্তু সৌভাগ্য ছিল আমার পুত্র সা'দের নসীবে, লটারীতে তার নাম উঠে এবং সে শাহাদত লাভে ধন্য হয়েছে আর আমি রয়ে গেছি।

আজ রাতে আমি পুত্রকে স্বপ্নে দেখেছি, খুবই সুন্দর ও নিখুঁত দেহে সে জান্নাতের বাগান এবং ঝর্ণায় আনন্দের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সে আমাকে বলল, পিতা, আপনিও এখানে চলে আসুন, উভয়ে মিলে আমরা জান্নাতে একসাথে থাকব। আমার পরোয়ারদিগার আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন, আমি তা সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি।

ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), তখন থেকেই আমি আমার পুত্রের সাহচর্য লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েছি। আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড় দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন আশা একটাই যে, যে কোনভাবে আপন প্রভুর সাথে মিলিত হই। ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমার শাহাদত লাভ এবং জান্নাতে গিয়ে পুত্র সা'দের সাহচর্য নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) খায়সামা (রা)-এর জন্য দু'আ করলেন। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবূল করলেন এবং হযরত খায়সামা (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন।[২]

ইনশা আল্লাহ আমরা আশা রাখি যে, হযরত খায়সামা (রা) তাঁর পুত্র হযরত সা'দ (রা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছেন।

হযরত উসায়রিম (রা)-এর শাহাদতের বর্ণনা

হযরত আমর ইবন সাবিত (রা), যিনি উসায়রিম উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সব সময় ইসলামের বিরোধিতা করতেন। উহুদের দিনে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তরবারি নিয়ে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে অবশেষে আহত হয়ে পড়ে যান। লোকজন উসায়রিমকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তোমাকে এ যুদ্ধে নিয়ে এলো, ইসলামের প্রতি উৎসাহ নাকি সপ্রদায়ের সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন ? হযরত উসায়রিম (রা) জবাব দিলেন :

---

১. এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

২ যাদুল মা'আদ, ২খ. পৃ. ৯৬।

بل رغبة فى الاسلام فأمنت بالله ورسوله فاسلمت واخذت سيفى وقالت مع رسول الله ﷺ حتى اصابنى ما اصابنى - انه لمن اهد الجنة ٠

"বরং ইসলামের প্রতি ভালবাসা এবং উৎসাহ। আমি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি; মুসলমান হয়েছি এবং তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর দুশমনদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছি। এমনকি আমি এভাবে আহত হয়ে পড়েছি। এ কথা শেষ হওয়ামাত্র তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।" (ইবন ইসহাক হাসান সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলতেন, বল দেখি কে ঐ ব্যক্তি, যিনি জান্নাতে দাখিল হয়েছেন অথচ এক ওয়াক্ত নামাযও পড়েন নি ? তিনিই এই সাহাবী (রা)। (ইসাবা, হযরত আমর ইবন সাবিত-এর জীবন চরিত অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিরাপদ ও সুস্থ আছেন কিনা, তা জানার জন্য মদীনার নারী-পুরুষের ভিড় জমানো

যুদ্ধের ব্যাপারে মদীনায় যেহেতু হৃদয় বিদারক খবরই পৌঁছেছিল, এ জন্যে মদীনার পুরুষ-স্ত্রীলোক, শিশু-বৃদ্ধ সবাই নিজ নিজ আপনজন অপেক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সুস্থ ও নিরাপদ দেখতে উৎসুক ও আগ্রহী ছিল।

যেমন হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জনৈক আনসারী মহিলার সাথে সাক্ষাত হয়, যার স্বামী, ভাই এবং পিতা এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যখন তাঁকে তাঁর স্বামী, ভাই এবং পিতার শাহাদতের সংবাদ শোনানো হলো, তখন তিনি বললেন, প্রথমে বলুন, রাসূলুল্লাহ (সা) কেমন আছেন ? লোকজন যখন বলল, আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি ভাল আছেন, তখন ঐ মহিলা বললেন, আমাকে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখিয়ে দিন। তাঁকে স্বচক্ষে দেখে নিশ্চিত হতে চাই। লোকজন ইশারায় বলল, ইনিই তিনি। তখন ঐ মহিলা বললেন, كل مصيبة بعدك جلل "আপনার পরে আর সমস্ত মুসীবত নিতান্তই মূল্যহীন।" (ইবন হিশাম, ১খ. পৃ. ১২)

যুদ্ধের দুশ্চিন্তার মধ্যে নিষ্ঠাবান আল্লাহ-প্রেমিকদের জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, তাঁদের তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া

যখন কোন শয়তান এ সংবাদ রটনা করল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শহীদ হয়েছেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলমান মানবীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে এ সংবাদ শুনে হতভম্ব হয়ে পড়লেন, আর এ হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় যুদ্ধের ময়দানে কিছুক্ষণের জন্য তাদের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে গেল এবং এ সঙ্কটকালে যার নসীবে শাহাদতের সৌভাগ্য বরাদ্দ ছিল, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন, যাদের ভাগ্যে সরে যাওয়া ছিল তারা

সরে গেলেন। আর যারা যুদ্ধের ময়দানে থেকে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে যারা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুমিন, নিশ্চিত বিশ্বাসী এবং আল্লাহর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটা তন্দ্রাভাব এসে তাদের ছেয়ে ফেলল। এঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুতে লাগলেন, যাঁদের মধ্যে হযরত আবূ তালহা (রা)-ও ছিলেন। হযরত আবূ তালহা (রা) বলেন, কয়েকবার আমার হাত থেকে তরবারি মাটিতে পড়ে যায়। তরবারি পড়ে যেত আর আমি উঠিয়ে নিতাম, এ ছিল এক অনুভূতির ব্যাপার। এ এক গুপ্ত প্রশান্তি যা আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের দান করেছিলেন, যার ফলে কাফিরদের ভীতি মু'মিনদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, আর মুনাফিকের যে দলটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তারা কেবল নিজের জান বাঁচানোর চিন্তায় ব্যস্ত ছিল, এ হতভাগাদের চোখে তন্দ্রা আসেনি। এ প্রসঙ্গে নিম্নের আয়াত নাযিল হয় :

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِا اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ... .

"অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং একদল জাহিলী যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল...." (সূরা আলে ইমরান : ১৫৪)

হাফিয ইবন কাসীর[১] বলেন, যে দলটির উপর তন্দ্রা এসেছিল, তারা ছিল ঐ দল যারা ঈমান ও বিশ্বাসে, দৃঢ়তা ও অবিচলতায়, আল্লাহর প্রতি প্রকৃত নির্ভরশীলতার গুণে গুণান্বিত। তাদের এ বিশ্বাস ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন এবং তিনি তাঁর রাসূলের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।

আর অপর দল, যারা ছিল নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত, আর এ চিন্তায়ই তাদের তন্দ্রা উড়ে গিয়েছিল, এটা ছিল মুনাফিকদের দল। তাদের কেবল নিজেদের জীবন রক্ষার চিন্তাই ছিল, ফলে প্রশান্তির নিদ্রা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত।

কতিপয় স্ত্রীলোকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও তাঁদের ব্যাপারে নির্দেশ

এ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমান স্ত্রীলোকও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি হযরত আয়েশা (রা) এবং আমার মা উম্মে সুলায়ম (রা)-কে দেখলাম, তাঁরা পায়জামা পরিধান করে পানির মশক ভর্তি করে করে পিঠে ঝুলিয়ে আনছিলেন এবং লোকজনকে পানি পান করাচ্ছিলেন। যখন মশক শূন্য হয়ে যেত, তখন আবার ভরিয়ে নিয়ে আসতেন।

১. তাফসীরে ইবন কাসীর, ১খ. পৃ. ৪১৮।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর মাতা হযরত উম্মে সালীত (রা)-ও উহুদ যুদ্ধের দিন আমাদের জন্য মশক ভরে ভরে পানি এনেছেন।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত রবী বিনতে মুআউয়ায (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে যেতাম যাতে আমরা লোকজনকে পানি পান করাতে পারি, আহতদের ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে পারি এবং নিহতদের সরিয়ে আনতে পারি।

হযরত খালিদ ইবন যাকওয়ান (রা)-এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এ কথা রয়েছে যে, فلا نقاتل "আমরা যুদ্ধ করতাম না।"

এ তিনটি বর্ণনাই সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল জিহাদে উল্লেখিত আছে। বিস্তারিতের জন্য ফাতহুল বারী, ৬খ. পৃ. ৫৭–৬০ দেখুন।

সুনানু ইবন মাজাহ-এ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলাদের জন্যও কি জিহাদ আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য এমন জিহাদ রয়েছে যাতে লড়াই নেই, অর্থাৎ হজ্জ ও উমরা। (ফাতহুল বারী, কিতাবুল হজ্জ, মহিলাদের হজ্জ অধ্যায়)।

সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল ঈদায়ন-এ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমরা রোগীদের দেখাশোনা এবং আহতদের চিকিৎসা করার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম।

এ সমস্ত স্ত্রীলোক কেবল লোকজনকে পানি পান করাতেন এবং রোগী ও আহতদের দেখাশোনা করতেন, প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ করতেন না। কিন্তু হযরত উম্মে আম্মারা (রা) যখন দেখলেন যে, ইবন কুমায়্যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আক্রমণোদ্যত, তখন তিনি এ অবস্থায় অগ্রসর হয়ে মুকাবিলা করেন, এতে তিনি মাথায় গুরতর আঘাত পান। হযরত উম্মে আম্মারা (রা) বলেন, আমিও অগ্রসর হয়ে ইবন কুমায়্যার উপর তরবারির আঘাত হানি, কিন্তু ঐ আল্লাহর দুশমন বর্ম পরিহিত ছিল।[১]

এ যুদ্ধে কেবল উম্মে আম্মারা (রা) একাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছিলেন। এছাড়া সমস্ত যুদ্ধেই মাত্র দু'একজন মহিলা ছাড়া মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রমাণ হাদীসের ভাণ্ডারের কোথাও নেই। আর রাসূলুল্লাহ (সা) মহিলাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, এমন কোন প্রামাণ্য হাদীসও নেই। এ জন্যে সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হলো, মহিলাদের জন্য জিহাদ ফরয নয়, তবে কাফিরদের সাথে যুদ্ধের ডামাডোলে জড়িয়ে পড়লে প্রয়োজন অনুসারে বাধ্য হলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

মহিলাদের স্বাভাবিক দূর্বলতা ও প্রকৃতিগত অসামর্থ্যই এর প্রমাণ যে, তাদের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যকীয় করা তাদের স্বভাব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৪; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৮৪।

বলেছেন : عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرِيْضِ وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَيَجِدُوْنَ "দুর্বল, অসুস্থ এবং যারা অসমর্থ, তাদের জন্য জিহাদ ফরয নয়।"

সমস্ত যুদ্ধেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাগিদ দিতেন যে, কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না। একবার তিনি একটি স্ত্রীলোককে নিহত দেখতে পান (যাকে ভুলবশত হত্যা করা হয়েছিল) এবং বলেন, এ তো হত্যা করার উপযুক্ত ছিল না।

সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা জিহাদকে সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং মর্যাদাপূর্ণ আমল মনে করি। আমরা মহিলারা কি এতে অংশগ্রহণ করতে পারি না? তিনি বললেন, না, বরং তোমাদের জিহাদ তো কবূলযোগ্য হজ্জ।

মহিলাদের জন্য প্রকৃত নির্দেশ তো, নিজেদের গৃহে অবস্থান কর, বাইরে বেরিও না। (দ্র. শারহে সিয়ারুল কাবীর, ১খ. পৃ. ৯২)।

এ জন্যেই নবী করীম (সা) মহিলাদের নামাযের জামাআতে উপস্থিত হওয়াটাও পসন্দ করতেন না। আর আতর ইত্যাদি সুগন্ধি লাগিয়ে এবং উত্তম পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসতে সরাসরি বারণ করে দিয়েছেন। তিনি উঠানের পরিবর্তে গৃহে এবং গৃহের পরিবর্তে প্রকোষ্ঠে নামায আদায়কে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই শরীয়ত যেহেতু নামাযের কাতারে মহিলাদের উপস্থিত হওয়াকেই অপসন্দ করেছে, সেখানে বিনা প্রয়োজনে যুদ্ধের কাতারে তাদের উপস্থিতি কি করে পসন্দ করতে পারে?

এ জন্যে প্রাচীন ফকিহগণ এ রায় দিয়েছেন যে, নামাযের জামাআতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদের উপস্থিতি অপসন্দনীয়। বরং মুজাহিদগণকে সাহায্য-সহযোগিতা, অসুস্থ ও আহতদের দেখাশোনার উদ্দেশ্যে কেবল ঐ মহিলাদের অংশগ্রহণ জায়েয যাদের কারণে ফিতনার সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ বয়স্কা মহিলা। তাও এ শর্তে যে, তাদের সঙ্গে তাদের স্বামী অথবা মুহরিম পুরুষ থাকবে। যেমনটি হাদীসে এসেছে যে, স্বামী অথবা কোন মুহরিম পুরুষ সঙ্গী ছাড়া মহিলাদের জন্য হজ্জ অথবা অন্য কোন ধরনের সফর জায়েয নেই। এ কারণে কতিপয় ফকীহের বক্তব্য হলো, যে স্ত্রীলোকের উপর শরীয়তের শর্তানুসারে হজ্জ ফরয হয়েছে, অথচ তার স্বামী কিংবা কোন মুহরিম আত্মীয় নেই, তার বিয়ে করা ওয়াজিব, যাতে সে স্বামীসহ হজ্জ আদায় করতে যেতে পারে এবং তাকে মুহরিম পুরুষ আত্মীয় ছাড়া সফর করতে না হয়।

মসজিদে জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মহিলাদের আগমন এ শর্তে জায়েয যে, তাতে কোন ফিতনার সৃষ্টি হবে না, অন্যথায় তা নাজায়েয এবং হারাম।

একইভাবে হাসপাতালসমূহে মহিলাদের পরপুরুষের সেবাযত্ন করাও নিঃসন্দেহে হারাম। হে আমার বন্ধুগণ, বিদ্যমান সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টি দিও না। বিদ্যমান এ

সংস্কৃতি তো প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ এবং শয়তানী উপভোগ্য বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। আর হযরত নবী (আ)-গণের শরীয়ত তো ক্ষমা ও নিষ্কলুষ পবিত্রতার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা যাকে জ্ঞান দিয়েছেন, সে তো ক্ষমা এবং প্রবৃত্তির লালসার পার্থক্য বুঝতে পারবে আর যে প্রবৃত্তি এবং শয়তানের দাসে পরিণত হয়েছে, তাকে বলাটাই বৃথা, তার কাছে তো বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহু আকবর, কেমন সময় এসে পড়ল যে, পবিত্র শরীয়তের ক্ষমা ও নিষ্কলুষতার প্রতি যখন মানুষকে আহ্বান করা হয়, তখন এ প্রবৃত্তি পূজারীরা তাতে ছিদ্রান্বেষণ করে।

উহুদের শহীদদের কাফন-দাফন

এ যুদ্ধে সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আনসার। সরঞ্জামের অপ্রতুলতা এতই প্রকট ছিল যে, কাফনের জন্য চাদরও পুরোপুরি ছিল না। সুতরাং হযরত মুসআব ইবন উমায়র (রা)-এর বেলায় এ ঘটনা ঘটেছিল, তাঁর কাফনের চাদর এতটা ছোট ছিল যে, পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে পড়ত, আর মাথা ঢাকলে পা বের হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা) বললেন, তার মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে দাও এবং পা ইযখির (এক প্রকার ঘাস) দ্বারা ঢেকে দাও। (সহীহ্ বুখারী, উহুদ যুদ্ধ অধ্যায়)

আর একই ঘটনা সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর বেলায়ও ঘটেছিল। যেমনটি মুজামে তাবারানী হযরত আবূ উসায়দ (রা) সূত্রে এবং মুস্তাদরাকে হাকিম হযরত আনাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাবারানীর সনদের সকল বর্ণনাকারীই বিশ্বস্ত।

আর কারো কারো ভাগ্যে তাও জোটেনি, দু'-দু'জনকে একই চাদরে কাফন দেয়া হয়েছে এবং দু' অথবা তিনজনকে[1] একই কবরে দাফন করা হয়েছে। দাফনকালে জিজ্ঞেস করতেন এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে কুরআন কার মুখস্থ ছিল ? যার দিকে ইশারা করা হতো, তাকেই প্রথমে কিবলামুখী করে কবরে রাখা হতো। আর তিনি বলতেন, انا شهيد على هؤلاء يوم القيامة "কিয়ামতের দিন আমি এ লোকদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেব।" এবং তিনি নির্দেশ দেন যে, এদেরকে গোসল ছাড়াই রক্তাপ্লুত অবস্থায় দাফন কর। (সহীহ্ বুখারী, জানাযা অধ্যায়)।

সহীহ্ বুখারীতে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়ান নি। অথচ প্রত্যেক সীরাত বিশেষজ্ঞই এ ব্যাপারে একমত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদের শহীদদের জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। এর সমর্থনে অনেক হাদীসও বিদ্যমান। হাফিয আলাউদ্দীন

১. তিন-তিনজন বাক্যটি সহীহ্ বুখারীতে নেই, বরং সুনানের বর্ণনায় তাই রয়েছে যা ইমাম তিরমিযী সহীহ্ বলেছেন। ফাতহুল বারী, ৩খ. পৃ. ১৬৯, জানাযা অধ্যায়।

মুগালতাঈ তাঁর সীরাত গ্রন্থে আলিমদের ঐক্যমত্যের[১] উল্লেখ করেছেন। অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণের জন্য হাদীসের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে।

কেউ কেউ এ ইচ্ছা করেছিলেন যে, আপন প্রিয়জনকে মদীনায় নিয়ে গিয়ে দাফন করবেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেন এবং নির্দেশ দেন, যে যেখানে শহীদ হয়েছে, সেখানেই দাফন করা হোক। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ৯১)

শহীদ সম্প্রদায়

উহুদ যুদ্ধের দিন কুযমান নামক জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তেজোদীপ্তভাবে যুদ্ধ করে। সে একাই সাত কিংবা আটজন মুশরিককে হত্যা করে এবং পরিশেষে নিজে আহত হয়। যখন তাকে উঠিয়ে ঘরে আনা হয়, তখন কোন কোন সাহাবী তাকে বললেন, والله لقد ابليت اليوم ياقزمان فابشر "আল্লাহর কসম, ওহে কুযমান, আজকের দিনে তুমি বড়ই কৃর্তিত্ব দেখিয়েছ, তোমার জন্য সুসংবাদ।" কুযমান জবাব দিল, اذا ابشر فوالله ان قاتلت الا عن احساب قومى ولولا ذالك ما قاتلت "তোমরা আমাকে কি জন্য সুসংবাদ ও মুবারকবাদ দিচ্ছ, আল্লাহর কসম, আমি তো আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য যুদ্ধ করিনি, আমি কেবল নিজের গোত্রের সম্মানকে সমীহ করে তাকে রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করেছি, আর এ লক্ষ্য সামনে না থাকলে আমি যুদ্ধই করতাম না।"

এরপর আঘাতের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে সে আত্মহত্যা করে বসল। ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বুখারী এবং ফাতহুল বারীর উদ্ধৃতিসহ জিহাদ অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : এ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল, মুসলমানদের সাথে মিশে সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, তা কেবল নিজ গোত্র এবং দেশের প্রতি সহমর্মিতার কারণেই ছিল। আর এতে সে মারা যায়। এ প্রেক্ষিতে নবী করীম (সা) বলেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী। আল্লাহর নিকট শহীদ তারাই, যারা আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদ করে। আর যে ব্যক্তি নিজ গোত্র বা দেশের জন্য যুদ্ধ করে জীবন দান করে, যুগের পরিভাষায় তাকে ঐ জাতির শহীদ বলা যায়, কিন্তু ইসলামের শহীদ সে নয়। এই কুযমানের বিস্তারিত ঘটনা এ অধ্যায়ের শুরুতে জিহাদের তাৎপর্য শিরোনামের অধীনে বলা হয়েছে। সেখানে দেখে নিতে পারেন।

---

১. সুতরাং বর্ণিত হাফিয সাহেব الصلاة على الشهداء من غير غسل এ প্রসঙ্গে বলেন : وصلى على زة والشهداء من غير غسل وهذا اجماع الا شذبه بعض التابعين قال السهيلى لم يرو عنه ﷺ انه صلى على شهيد فى شئى من مغازيه الاف هذه وفيه التظر لما ذكره النسائى من انه صلى على اعرابى فى غزوة اخرى সীরাতে মুগালতাঈ, পৃ. ৫০।

সতর্ক বাণী : আল্লামা ইবন কাসীর বলেন, এ ধরনের একটি ঘটনা খায়বর যুদ্ধেও সংঘটিত হয়েছে, যা ইনশা আল্লাহ সামনে আসবে। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৩৬)

রহস্য এবং কৌশল

আল্লাহ তা'আলা وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ থেকে ষাটটি আয়াত নাযিল করেছেন, যার মধ্যে কিছু আয়াতে মুসলমানদের পরাজয় এবং এর কারণ, রহস্য এবং কৌশলের প্রতিও ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা সংক্ষেপে পাঠকদের উদ্দেশ্যে পেশ করা হলো।

১. যাতে বুঝতে পারে, পয়গম্বরের নির্দেশ অমান্য করলে, উদ্দীপনা হারিয়ে ফেললে এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করলে পরিণাম কি দাঁড়ায়।

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا اَرٰكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস, তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

২. যাতে কাঁচা এবং পাকা, সত্য এবং মিথ্যা পরীক্ষিত হয়ে যায় ও নিষ্ঠাবান এবং মুনাফিক, সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীর নিষ্ঠা এবং কপটতা, সত্য এবং মিথ্যা এভাবে প্রকটরূপে প্রকাশ পায় যাতে কোন প্রকার সংশয় অবশিষ্ট না থাকে।

আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে যদিও পূর্ব থেকেই একনিষ্ঠ মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য চিহ্নিত ছিল, কিন্তু আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, কেবল তাঁরই জানার ভিত্তিতে কাউকে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হয় না। যে বিষয় আল্লাহর জ্ঞানে লুক্কায়িত আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অনুভূত ও প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এতে সওয়াব কিংবা আযাব প্রযোজ্য হয় না।

درمحبت هرکه او دعوی کند * صد هزاران امتحان بردی تند
گبود صادق کشد بار جفا * دربود کاذب گریز وازبلا
عاشقان رادرد دل بسیارمی باید کید * جوریار وغصه اغیار می باید کشید

৩. আল্লাহ তা'আলার বিশেষ ভালবাসার পাত্র, একনিষ্ঠ, তাঁর দর্শন লাভে উন্মুখ ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার মত বিশাল নিয়ামত ও সর্বোৎকৃষ্ট বাসনা পূরণ করে ধন্য হতে পারেন; যার আগ্রহ তারা পূর্বেই পোষণ করতেন। আর বদর যুদ্ধে তারা মুশরিক বন্দীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ এ জন্যেই গ্রহণ করেছিলেন যে, আগামী বছরে আমাদের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তি শাহাদত লাভে ধন্য হবেন। এ বিষয়ে ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে। এ নিয়ামত আল্লাহ তা'আলা আপন বন্ধুদেরকেই দান করেন, যালিম এবং ফাসিকদেরকে নয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ.

"যাতে আল্লাহ মু'মিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ যালিমদেরকে পসন্দ করেন না।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

৪. আর যাতে মুসলমানগণ এ শাহাদত ও বিপর্যয়ের মাধ্যমে গুনাহসমূহ থেকে পাক-পবিত্র হতে পারেন এবং যে পাপ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, এ শাহাদতের বদৌলতে তা মাফ হয়ে যায়।

৫. আর যাতে এর ফলে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। এ জন্যে যে, যখন আল্লাহর বন্ধু, নিঃস্বার্থ ভালবাসার পাত্রদের এভাবে রক্তপাত ঘটানো হয়, তখন আল্লাহর সম্ভ্রমবোধে আঘাত লাগে এবং আল্লাহর বন্ধুদের রক্ত বিচিত্র রং ধারন করে, যার পরিণাম এই হয় যে, যে আল্লাহর দুশমনেরা আল্লাহর বন্ধুদের রক্তপাত ঘটিয়েছে, তারা আশ্চর্যজনকভাবে ধ্বংস ও বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

دیدی که خون ناحق پروانه شمع را * چند ان امان نداد که شب راسحر کند

যেমন আল্লাহ বলেন :

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ.

"এবং যাতে আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪১)

৬. যাতে বুঝা যায়, আল্লাহর নিয়ম এটাই যে, ভালমন্দ পরস্পরের মধ্যে ঘূর্ণায়মান, কখনো তিনি বন্ধুদেরকে বিজয় দান করেন আর কখনো দুশমনদেরকে প্রাধান্য দান করেন। যেমন :

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ .

"আর মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির আমি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটাই।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪০)

কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় বন্ধুদের পক্ষেই থেকে যায়। وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (এবং পরিণাম ফল মুত্তাকীদের জন্য) এ জন্যে যে, সব সময় যদি ঈমানদারগণই বিজয়ী হতে থাকেন, তাহলে অনেক লোক কেবল কপটভাবে ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হবে। ফলে মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য থাকবে না। আর এটা বুঝা যাবে না যে, এদের মধ্যে কে আল্লাহর খাস বান্দা আর কে দীনার ও দিরহামের দাস।

আর যদি ঈমানদারগণ সব সময় পরাজিত হতেই থাকেন, তা হলে উত্থানের উদ্দেশ্য (অর্থাৎ আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা) অর্জিত হবে না। এ জন্যে আল্লাহর কৌশল এভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, কখনো সাহায্য এবং বিজয় দেয়া হবে আর কখনো পরাজিত ও বিপর্যস্ত করা হবে, যাতে আসল ও মেকীর পরীক্ষা হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন :

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ·

"অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ মুমিনদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না এবং যাতে শেষ পর্যন্ত আধিপত্য ও বিজয় অর্জিত হয়। ।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

৭. অধিকন্তু যদি সব সময় বন্ধুদেরই বিজয় অর্জিত হতে থাকে এবং সমস্ত যুদ্ধে সৌভাগ্য এবং সাফল্য তাদেরই সহগামী হয়, তা হলে এ সন্দেহও দেখা দিতে পারে যে, বন্ধুদের পাক-পবিত্র আত্মা ঔদ্ধত্য-অহংকার, আলস্য ও অবহেলায় নিমগ্ন[১] হয়ে না যায়। এ জন্যে উপযুক্ত এটাই যে, কখনো আরাম এবং প্রশান্তিআর কখনো কষ্ট এবং যন্ত্রণা, কখনো কঠোর, কখনো কোমল, কখনো বিতৃতি, কখনো সংকোচন।

چونکه قبضی ایدت ای راهرو * ان صلاح تست آیس دل مشو

چونکه قبض آمدتو دردی بسط بین * تازه باش وچین می فکن بر جبین

৮. আর যাতে পরাজিত হয়ে পরাজয়ের গ্লানিসহ আল্লাহ তা'আলার দরবারে ভীতি ও কাতরতার সাথে, কাকুতি-মিনতি সহকারে দীনহীনভাবে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে এ সময় আল্লাহর দরবার হতে সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হয়। কেননা সম্মাননা ও সাহায্যের উপহার অপদস্থ ও কাতরতার পরই অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেন : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ "আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহই তো তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১২৩)

---

১. নিঃসন্দেহে নবী (আ)-গণের পর শ্রেষ্ঠতম মানব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি উর্ধ্বতন সাহাবায়ে কিরাম এবং বদর যোদ্ধাদের কেন মর্যাদা দিচ্ছেন না ? তখন তিনি বললেন, আমি চাই যে, পৃথিবী যেন এ মহাত্মাগণকে পঙ্কিল ও ময়লাযুক্ত না করে ফেলে। সম্ভবত এ রিওয়ায়াতটি হিলয়াতুল আউলিয়া অথবা অন্য কোন কিতাবে আছে। এক্ষণে আমার মনে আসছে না। আল্লাহ ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

وَيَوْمَا حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا ۔

"এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্যে, কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি।" (সূরা তাওবা : ২৫)

আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর কোন বিশিষ্ট বান্দাকে সম্মান অথবা বিজয় কিংবা সাহায্য করতে চান, তখন প্রথমে তাকে অপদস্থতা, অমর্যাদা, অক্ষমতা এবং কাতরতায় নিমজ্জিত করেন, যাতে আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং অহমিকা ও আত্মগর্বের অলীক বিশ্বাস মূলশুদ্ধো দূরীভূত হয়। এভাবে তিনি অপদস্থতার পর সম্মান, বিপর্যয় ও পরাজয়ের পর বিজয় ও সাহায্য এবং ধ্বংসের পর অস্তিত্ব দান করেন।

আরিফ রূমী বলেন :

بس زیادتها دردن نقصهاست * مرشهیدان راحیات اندر فناست

مرده شوتا مخرج الحی الصمد * زنده زین مرده بیرون آورد

آن کی راکه چنین شاهی کشد * سوئ تخت وبهترین جاهی کشد

نیم جان بتاند وصد جان دهد * آنچه دردهمت نیاید آن دهد

৯. আর যাতে বুঝা যায় যে, বিপুল অধ্যাবসায় এবং পরিপূর্ণ সাধনা ছাড়া সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা লাভের ধারণা অন্তরে বদ্ধমূল করে নেয়া সমীচীন নয়। যেমন আল্লাহ বলেন :

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ۔

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো পরীক্ষার মাধ্যমে জানার ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি ? (সূরা আলে ইমরান : ১৪২)

১০. যাতে তোমাদের পবিত্র আত্মাসমূহ পৃথিবীর নোংরামী থেকে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনো পার্থিব হালাল বস্তু (অর্থাৎ মালে গনীমত) অর্জন সম্পর্কে অন্তরে বিন্দুমাত্র চিন্তাও না করে। বরং খেয়াল করবেন যে, আমরা রাসূলের কথার বিরুদ্ধে গনীমতের মাল দেখে পাহাড় থেকে কেন নিচে অবতরণ করলাম। (আল্লাহ তা'আলা বলেন,) আমি তোমাদের এ বিজয়কে এ জন্যে পরাজয়ে পরিবর্তন করে দিলাম, যাতে তোমাদের অন্তর ভবিষ্যতের জন্য পার্থিব হালাল মালের (মালে গনীমত) প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকেও পাক-পবিত্র হয়ে যায় এবং এ নশ্বর জগতের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব তোমাদের কাছে একইরূপ হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلاً تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ·

"ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৩)

অর্থাৎ এ সাময়িক বিপর্যয় এবং পরাজয় বরণে আমার এক কৌশল ও সিদ্ধান্ত এই যে, যাতে তোমরা চেষ্টা-সাধনা এবং ধৈর্যের ঐ উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হও, যেখানে থেকে পার্থিব বিষয়াদির অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব একইরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন :

مَا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ اِلاَّ فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ - لِّكَيْلاَ تَاْسَوْاْ عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا اٰتٰكُمْ وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ·

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করবার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এ জন্যে যে, তোমরা যা হারিয়েছ, তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন, তজ্জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ পসন্দ করেন না ঔদ্ধত্য ও অহংকারীদেরকে।" (সূরা হাদীদ : ২২-২৩)

পার্থিব বস্তুর আগমনে অন্তরে আনন্দবোধ না করা এবং পার্থিব বস্তুর বিদায়ে অন্তরে দুঃখবোধ না করা, এটা বৈরাগ্যবাদ এবং ধৈর্যের উন্নততর স্তর। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, উহুদ যুদ্ধে বিজয়কে পরাজয়ে পরিবর্তিত করে দিয়ে সাহাবায়ে কিরামকে চিন্তায় নিমগ্ন করেন। এতে আল্লাহর এ কৌশল কাজ করেছিল যে, ভবিষ্যতে পার্থিব বস্তু হারানোর ফলে সাহাবায়ে কিরাম যেন কোন দুঃখবোধ না করেন এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব তাদের দৃষ্টিতে সমান হয়ে যায় এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তে রাযী-খুশি থাকেন, মুনাফিক এবং জাহিলদের মত আল্লাহ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ না করেন যে, আল্লাহ কেন আমাদেরকে সাহায্য করলেন না। আল্লাহর প্রিয় একনিষ্ঠ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য তো এটাই হওয়া উচিত যে,

زنده كنى عطائ تو * دربكشى فدائ تو
جان شده مبتلائ تو * هرچه كنى رضائ تو
سأپر وريم دشمن ويامى كشيم دوست * جرآت كسى كه جرح كندور قضائ ما

১১. অধিকন্তু এ ঘটনা তাঁর ওফাতের পূর্বাভাস ছিল। যদ্বারা এটা বুঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে, যদিও এখন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিহত হওয়ার খবর শুনে মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দরুন তাদের পা টলে গিয়েছিল, যদিও (আল্লাহ ক্ষমা করুন) তা তাদের ভীরুতা কিংবা মুনাফিকী ছিল না, বরং তা ছিল তাদের ঈমান, নিষ্ঠা, নবীর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও নিবিড় সম্পর্ক থাকার কারণে এ অসহনীয় সংবাদ শুনে তাদের অন্তর তা বরদাশত করতে পারেনি। কাজেই এতে তারা এতটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, যুদ্ধের ময়দানে তাদের পা টলে গিয়েছিল। এ জন্যে আয়াত নাযিল হয় :

وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান ও সতর্ক হয়ে যাও যে, তাঁর ওফাতের পর যেন তাঁর দীন, তাঁর সুন্নত, তাঁর প্রবর্তিত রীতি-নীতি থেকে কখনই ফিরে যাবে না। তাঁর ওফাতের পর কিছু লোক তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, যদ্বারা মুরতাদী ফিতনার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, এবং সেই সাথে এ বিষয়ে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল যে, নবী (সা)-এর তরীকার উপর বাঁচো এবং তাঁরই তরীকার ওপর মৃত্যুবরণ কর। মুহাম্মদ (সা) যদি ইনতিকাল করেন কিংবা নিহত হন, তা হলে তাঁর আল্লাহ তো জীবিত। এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُوْلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ.

"মুহাম্মদ একজন রাসূলমাত্র,তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তিরোধানের পর ইয়েমেনের হামদান গোত্র যখন মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হতে শুরু করল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন মালিক (রা) হামদান গোত্রের লোকজনকে একত্র করে এ ভাষণ দেন :

يا معشر همدان انكم لم تعبدوا محمد عليه السلام انما عبدتم رب محمد (عليه سلام) وهو الحى الذى لايموت غير انكم اطعتم رسوله بطاعة الله – واعلموا انه استنقذكم من النار ولم يكن الله ليجمع اصحابه على ضلالة الى اخير الخطبة ... .

"ওহে হামদান গোত্র, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইবাদত করতে না, বরং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রভুর ইবাদত করতে। আর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রভু চিরঞ্জীব, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। হ্যাঁ, তোমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ করতে, যাতে রাসূলের আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে পরিণত হয়। ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আগুন থেকে রক্ষা করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-এর সাহাবীগণকে পথভ্রষ্টতার উপর একত্র করবেন না।"...খুতবার শেষ পর্যন্ত এরপর তিনি নিম্নের কবিতা বলেন :

لعمری لئن مات النبی محمد * لما مات یا این القیل رب محمد

دعـاه الـيـه ربــه فـاجـابــه * فـيـاخـير غـوری ويـا خـير مـنـجـد

"আমার জীবনের শপথ, যদি নবী মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করে থাকেন, ওহে সরদার পুত্র, তা হলে তাঁর পরোয়ারদিগার জীবিত আছেন। তাঁর পরোয়াদিগার তাঁকে নিজের কাছে দাওয়াত দেন, তিনি তাঁর প্রভুর দাওয়াত কবূল করেন। সুবহানাল্লাহ, নবী করীম (সা) প্রাসাদে এবং বস্তিতে বসবাসকারী সবার থেকে উত্তম ছিলেন।" (ইসাবা, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মালিকের জীবন চরিত অধ্যায়, ২খ. পৃ. ৩৬৫ এবং হুসনুস সাহাবা ফী শারহে আশআরিস সাহাবা, ১খ. পৃ. ৩১২)।

সতর্ক বাণী : নবী (আ)-গণের হায়াতের ব্যাপারে নবী (সা)-এর ওফাত অধ্যায়ে ইনশা আল্লাহ কিছু উল্লেখ করব।

উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতার উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য

আল্লাহ তা'আলার ওয়াদামাফিক দিনের শুরুতে মুসলমানগণ কাফিরদের উপর প্রাধান্য বজায় রাখেন কিন্তু যখন তারা ঐ কেন্দ্র থেকে সরে গেলেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গনীমতের মাল আহরণের জন্য পাহাড় থেকে নিচে নেমে এলেন, তখন যুদ্ধের পাশা উল্টে গেল এবং বিজয় পরাজয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আল্লাহ প্রেমিক, একনিষ্ঠ এবং আল্লাহর পথে প্রকৃত নিবেদিতপ্রাণ বান্দাগণের তুচ্ছ তুচ্ছ কথায়ই আল্লাহর দরবারে ধরা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার নিকট এটা অপসন্দনীয় ছিল যে, নিবেদিতপ্রাণ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আল্লাহর রাসূলের আদেশ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হবেন, যদিও তা কোন প্রকার ভুল বুঝার বা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুনেও হয়ে যায়। অধিকন্তু এটা সত্যিকারের প্রেমিকের প্রেমের রীতি বিরুদ্ধ যে, তারা পার্থিব সম্পদ এবং গনীমতের মাল একত্র করার জন্য তারা পাহাড়ী অবস্থান থেকে অবতরণ করে যুদ্ধের ময়দানে আসবেন। যে গনীমতের মাল জমা করার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) পাহাড় থেকে অবতরণ করেছিলেন, যদিও তা পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী : فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاً طَيِّبًا অনুযায়ী হালাল ও পবিত্র ছিল, কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের মত প্রকৃত আল্লাহ-প্রেমিকদের

জন্য এটা উপযুক্ত কাজ ছিল না যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও নির্দেশ ছাড়া এ হালাল ও পবিত্র বস্তুর প্রতি হাত বাড়িয়ে দেন।

موسیا آداب دانه دیگرند * سوخته جانان روانان دیگرند

আল্লাহ তা'আলার মহান সত্তা তাঁর প্রকৃত প্রেমিক ও একনিষ্ঠ বান্দাদের সতর্ক করার জন্য সাময়িকভাবে বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেন; যাতে তারা সতর্ক হয়ে যান যে, গায়রুল্লাহর প্রতি দৃষ্টিপাত জায়েয নয়। আর সৃষ্টির সূচনায় এটা নির্ধারণ করে দেন যে, সাময়িকভাবে যদিও তারা পরাজয়বরণ করবে, কিন্তু শীঘ্রই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এর ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে এবং পরবর্তীতে রোম ও পারস্য সম্রাটদের ধনভাণ্ডার তাদের হাতে দিয়ে দেয়া হবে। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, একনিষ্ঠ প্রেমিকদের অন্তর পার্থিব হালাল বস্তুর আকর্ষণ থেকেও পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা নিম্নে আয়াত নাযিল করেন :

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗٓ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰٓى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَآ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

"আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখানোর পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কতক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কতক পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫২)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এ কথা বলে দিয়েছেন যে, একবারই ঘটনা বিপরীতমুখী হয়ে গিয়েছিল যে, কাফির সেনারা যারা মুসলমানদের হাতে নিহত হচ্ছিল এখন তারা মুসলমানদের হত্যায় মগ্ন হয়ে পড়ল। একে তো তা এ জন্য ঘটল যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ সত্ত্বেও তা অমান্য করেছ, আর তোমাদের মধ্যকার কতিপয় ব্যক্তি ধ্বংসশীল দুনিয়ার মাল-সম্পদের (মালে গনীমত) আগ্রহ ও লোভে পাহাড়ী অবস্থান থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছ, যার খেসারত সবাইকেই দিতে হয়েছে। আর কয়েকজনের ভুলের কারণে সমগ্র ইসলামী বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। কিন্তু এরপরও মুসলমানদের থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ ও কৃপাদৃষ্টি ছিন্ন হয়নি, ফলে

তিনি এ ভালবাসাসিক্ত ভর্ৎসনা সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে বারবার সান্ত্বনা দেন, তোমরা নিরাশ এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ো না, আমি তোমাদের ভ্রান্তি সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিয়েছি। সুতরাং তিনি ক্ষমার ঘোষণা وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ এ আয়াতে দান করেছেন, আবার একই রুকুর শেষে মুসলমানদেরকে অতিরিক্ত সান্ত্বনা দিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমা ঘোষণা করেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَنِ اِنَّمَا اسْتَزَ لَّهُمُ الشَّيْطَنِ بَبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পৃষ্ঠ পদর্শন করেছিল, তাদির কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।" (সূরা আলে ইমরান : ১৫৫)

আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের এ কাজকে ভ্রান্তি আখ্যায়িত করেছেন যা اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়। আর ভ্রান্তি (লাগজেশ) অর্থ এই যে, উদ্দেশ্য তো অন্যকিছু ছিল, কিন্তু ভুলভ্রান্তির কারণে অনিচ্ছায় এবং অজ্ঞাতসারে পা ফসকে পথ থেকে পড়ে গিয়েছে। ইঙ্গিত এদিকে যে, যা কিছু হয়েছে, তা ছিল ভুলক্রমে। জেনেশুনে তোমরা তা করনি, আর উত্তম, যা কিছুই তোমরা করেছ, আমি নিজ অনুগ্রহ ও সহ্যগুণে তা ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে তা অবহিত করেছি এ জন্যে যে, তোমরা হতোদ্যম, দুঃখভারাক্রান্ত ও নিরাশ হয়ে বসে পড়ো না। আর তোমাদেরকে ক্ষমা করার কথা বিশ্বব্যাপী ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দান কিভাবে রাসূল (সা)-এর সাহাবীগণের উপর বিতৃত হয় এবং কিভাবে তাদের ক্ষণে ক্ষণে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সাহাবায়ে কিরামের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য না করতে পারে। কেননা যাদেরকে আল্লাহ স্বয়ং ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং যাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তা হলে এখন আর কেউ তাদেরকে মাফ করুক বা না করুক, তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক বা না হোক, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির পর আর কারো ক্ষমা ও সন্তুষ্টির কোনই প্রয়োজন নেই। রাদি আল্লাহ তা'আলা আনহুম ওয়া রাদূ আনহু।

বদর যুদ্ধে মুক্তিপণ গ্রহণের ফলে যে অসন্তুষ্টির আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তার কারণও এটাই ছিল যে, আল্লাহর দুশমনদেরকে নিধন ও ধ্বংস করার পরিবর্তে অর্থ-সম্পদকে কেন অগ্রাধিকার দেয়া হলো?

একইভাবে উহুদ যুদ্ধে তুচ্ছ ধন-সম্পদের (মালে গনীমত) প্রতি আগ্রহের কারণে এ শাস্তি দেয়া হয় এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়।

উহুদ যুদ্ধে জয়লাভের পর বিপর্যয় ঘটার দর্শন ও যৌক্তিকতা বর্ণনার পর

আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণের সাহাবীদের কার্যক্রম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পথে তাঁদের প্রতি নানা ধরনের কষ্ট এবং নানা প্রকার বিপদাপদ এসেছে, কিন্তু তারা না সাহস হারিয়েছেন, আর না শত্রুর মুকাবিলায় অসমর্থ হয়েছেন; বরং অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে অবস্থান নিয়েছেন।

কিন্তু এ সময় তাঁরা নিজেদের বীরত্ব, শক্তি, সাহস, ধৈর্য ও অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য করেননি; বরং দৃষ্টি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিই রেখেছেন এবং সব সময় নিজেদের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অবিচল থাকার জন্য প্রার্থনা করতে থাকতেন। আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে পৃথিবী ও আখিরাতে আপন অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيِّ قُتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِى اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ. فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"এবং কত নবী যুদ্ধ করেছে, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি এবং নত হয়নি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। এ কথা ছাড়া তাদের আর কোন কথা ছিল না, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সপ্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬-১৪৮)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধ (১৬ই শাওয়াল, রোববার, তৃতীয় হিজরী)

কুরায়শগণ যখন উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করতে থাকে এবং মদীনা থেকে যাত্রা করে রাওহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করে, তখন তাদের এ ধারণা হলো যে, কাজ তো অসম্পূর্ণই থেকে গেল। যখন আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর অনেক সাহাবীকে হত্যা করেছি এবং কয়েক শতকে আহত করেছি, তখন উত্তম কাজ এটাই হবে যে, ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার মদীনা আক্রমণ করি। এ সময়ে মুসলমানগণ সম্পূর্ণ ক্লান্ত ও আহত, কাজেই তারা মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। সাফওয়ান ইবন উমায়্যা বলল, তার চেয়ে উত্তম এটাই হবে যে, তোমরা মক্কায় ফিরে চল।

মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গিগণ পরিপূর্ণ উৎসাহের সাথে আছেন, সম্ভবত দ্বিতীয়বার আক্রমণে তোমরা সফলকাম হতে পারবে না।

১৫ই শাওয়াল, শনিবার রাতে কুরায়শ বাহিনী রাওহায় পৌঁছে এবং রোববার রাতে এ কথাবার্তা হয়। রোববারের এ রাত তখনো বাকী ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংবাদদাতা সুবহে সাদিকের প্রাক্কালে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করে। তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত বিলাল (রা)-কে দিয়ে সমগ্র মদীনায় ঘোষণা করিয়ে দেন যে, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, কেবল তারাই পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছেন। বোনদের দেখাশোনার দরুন আমি উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, এবারে আমি আপনার সাথে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করছি। তিনি তাকে অনুমতি দান করলেন। এ অভিযানে নবীজীর উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যে, দুশমন যেন এ ধারণা করতে না পারে যে, মুসলমানগণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। যদিও মসলমানগণ পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং একটি রাতও আরাম করতে পারেননি, তবুও একবার ঘোষণা শোনামাত্র পুনরায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

رشته در گردنم افگنده دوست * می بردهر جاکه خاطر خواه اوست

১৬ই শাওয়াল রোববার মদীনা থেকে যাত্রা করে তিনি হামরাউল আসাদ নামক স্থানে অবস্থান নিলেন, যা মদীনা থেকে প্রায় আট-দশ মাইল দূরে ছিল। তিনি হামরাউল আসাদে অবস্থানরত ছিলেন, এ সময়ে খুযাআ গোত্রের সর্দার মা'বাদ খুযাঈ উহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের খবর শুনে সমবেদনা জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর ঐ সাহাবিগণের জন্য শোক প্রকাশ করেন যারা উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন। মা'বাদ নবীজীর খিদমত থেকে বিদায় নিয়ে আবূ সুফিয়ানের সাথে মিলিত হলেন। আবূ সুফিয়ান নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করল যে, আমার ইচ্ছা এই যে, দ্বিতীয়বার মদীনায় আক্রমণ করা হোক। মা'বাদ বললেন, মুহাম্মদ (সা) তো বিশাল বাহিনী নিয়ে তোমাদের মুকাবিলা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। আবূ সুফিয়ান তা শোনামাত্র মক্কায় ফিরে চলল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে তিনদিন অবস্থান করে শুক্রবারে মদীনায় ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ.

"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭২)

(ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৮৭, আলস্নাহ তা'আলার বাণী اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ অধ্যায়; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৪৮; যারকানী, ২খ. পৃ. ৫৯)।

বিভিন্ন ঘটনাবলী (তৃতীয় হিজরী)

১. এ বছরেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উমর (রা)-এর কন্যা হযরত হাফসা (রা)-কে শাবান মাসে বিয়ে করেন।[১]

২. এ বছরেই ১৫ই রমযান হযরত ইমাম হাসান (রা) জন্মগ্রহণ করেন এবং এর পঞ্চাশ দিন পর হযরত সায়্যিদা ফাতিমা (রা) ইমাম হুসায়ন (রা)-কে গর্ভে ধারণ করেন।[২]

৩. এ বছরেই শাওয়াল মাসে মদ্যপান নিষিদ্ধের আদেশ নাযিল হয়।[৩]

হযরত আবূ সালমা আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আসাদ (রা)-এর অভিযান (চতুর্থ হিজরী)

চতুর্থ হিজরীর পয়লা মুহররম নবী (সা) এ সংবাদ পেলেন যে, খুয়ায়লিদের পুত্র তুলায়হা[৪] এবং সালমা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করছে। তখন তিনি হযরত আবূ সালমা আবদুল্লাহ ইবন আবদুল আসাদ (রা)-কে একশত পঞ্চাশজন মুহাজির এবং আনসারসহ তাদের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। ওরা এ সংবাদ পাওয়ামাত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মুসলমানগণ গনীমত হিসেবে প্রচুর পরিমাণে উট ও বকরি নিয়ে ফিরে আসেন। মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে গনীমতের মাল বন্টন করা হয়। এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পরও প্রত্যেকের অংশে সাত-সাতটি করে উট ও বকরি পড়ে।[৫]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর অভিযান

পাঁচই মুহররম, সোমবার তিনি এ সংবাদ পান যে, খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালী

---

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ২৯।

২. প্রাগুক্ত।

৩. যারকানী, ৩খ. পৃ. ৬১।

৪. তুলায়হা ইবন খুয়ায়লিদ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এ ইনতিকালের পর ধর্ম ত্যাগ করে এবং নিজেই নুবূওয়াত দাবি করেন। হযরত আবূ বকর (রা) তার মুকাবিলা করার জন্য হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। তুলায়হা পলায়ন করে সিরিয়া চলে যান এবং তওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে মুসলমানদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে কাদিসিয়া এবং নিহাওয়ান্দের যুদ্ধেও শরীক হন। বলা হয় যে, ২১ হিজরীতে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তুলায়হার অপর ভাই সালমা মুসলমান হয় নি। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৬৩।

৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৬১।

লিহয়ানী তাঁর সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনী সংগঠিত করছে। তিনি তাকে হত্যা করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স আনসারী (রা)-কে প্রেরণ করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করেন এবং আলোচনার অজুহাতে সুযোগ বুঝে এক পর্যায়ে তাকে হত্যা করেন। আর তার মাথাটি নিয়ে এক গর্তে লুকিয়ে পড়েন। মাকড়সা গর্তটির মুখে জাল তৈরি করে। লোকজন তাকে খুঁজতে এসে গর্তের মুখে মাকড়সার জাল দেখে ফিরে যায়। এরপর হযরত আবদুল্লাহ (রা) গর্ত থেকে বের হন এবং রাত্রিকালে পথ চলতেন ও দিবাভাগে লুকিয়ে থাকতেন। এভাবে তিনি ২৩শে মুহররম মদীনায় উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে খালিদের মাথা রেখে দেন। এতে তিনি খুবই খুশি হন এবং তাকে একটি ছড়ি উপহার দেন আর বলেন : تَخَصَّرْ بِهٰذِهٖ فِى الْجَنَّةِ فَاِنَّ الْمُتَخَصِّرْ فِى الْجَنَّةِ قَلِيْلَ "এ ছড়ি নিয়ে তুমি জান্নাতে চলাফেরা করবে আর জান্নাতে ছড়ি নিয়ে চলাফেরাকারীর সংখ্যা খুব সামান্যই হবে।"

তিনি আরো বলেন, এটা তোমার ও আমার মধ্যে কিয়ামতের দিনের একটি নিদর্শন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) ছড়িটির হিফাযত করতে থাকেন। মৃত্যুকালে তিনি ওসীয়ত করেন যে, ছড়িটি আমার কাফনের মধ্যে রেখে দিও। সুতরাং তাই করা হলো।[১]

মুজামে তাবারানীর এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, এ ব্যক্তি অপরাধী এবং বাকপটু ছিল। (মাজমুআউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ.২০৪, খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালীর হত্যা অধ্যায়)।

হযরত মূসা ইবন উকবা (রা) বলেন, লোকজন দাবি করে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা) খালিদ ইবন সুফিয়ান হুযালীর নিহত হওয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন।[২]

রাজী'র ঘটনা

সফর মাসে আযাল ও কারা গোত্রের[৩] কতিপয় লোক নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করে যে, আমাদের গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেছে। কাজেই আমাদের সাথে এমন কয়েকজন লোক দিন যারা আমাদেরকে কুরআন পড়াবে এবং ইসলামী শরীয়ত শিক্ষা দেবে। তিনি দশ ব্যক্তিকে তাদের সঙ্গে দিলেন, যাঁদের কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ :

---

১. ইবন সা'দকৃত তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৩৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৩; যাদুর মা'আদ, ২খ. পৃ. ১০৯।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৪।

৩. এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী (সা) ঐ দশজনকে মক্কার কুরায়শদের সংবাদ গ্রহণ এবং তাদের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। এটা আশ্চর্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য এটাই ছিল, ইতোমধ্যে আযাল ও কারা গোত্র এসে পড়ার দরুন তাদেরকে দীন ও কুরআন শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য এতে অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৫।

১. হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা),

২. হযরত মারসাদ ইবন আবূ মারসাদ (রা),

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা),

৪. হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা),

৫. হযরত যায়দ ইবন দাসিনা (রা),

৬. হযরত খালিদ ইবন আবূ বুকায়র (রা),

৭. হযরত মুআত্তাব ইবন উমায়র (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা)-এর বৈপিত্রেয় ভাই। তিনি হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।[১]

এঁরা যখন রাজী' নামক স্থানে উপস্থিত হন, যা মক্কা ও উসফানের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত ছিল, ঐ প্রতারকেরা মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ করে এবং বনী লিহয়ানকে ইঙ্গিত দেয়। বনী লিহয়ান একশত তীরন্দাজসহ মোট দু'শত লোক নিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসর হয়। তারা যখন নিকটবর্তী হলো, হযরত আসিম (রা) আপন সঙ্গীদের নিয়ে একটি টিলায় আরোহণ করেন।

বনী লিহয়ান মুসলমানগণকে বলল, তোমরা নিচে নেমে এসো, আমরা তোমাদেরকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় দিচ্ছি। হযরত আসিম (রা) বললেন, আমি কাফিরদের আশ্রয়ে কখনো নিচে অবতরণ করব না। আর তিনি এ দু'আ করলেন : اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا رَسُوْلَكَ "আয় আল্লাহ্! তোমার পয়গাম্বরকে আমাদের অবস্থা অবহিত কর।"

এ বর্ণনা বুখারীর। আবূ দাঊদ তায়ালিসীর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আসিম (রা)-এর দু'আ কবূল করেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে এ সংবাদ দেন এবং নবী (সা) সাথে সাথে তা সাহাবীগণকে অবহিত করেন।

হযরত আসিম (রা) এ সময় আর একটি দু'আ করেছিলেন যে, اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَحْمِيْ لَكَ الْيَوْمَ دِيْنَكَ فَاحْمِ لِيْ لَحْمِيْ "আয় আল্লাহ, আজ আমি তোমার দীনের হিফাযত করছি, তুমি আমার মাংস অর্থাৎ দেহকে কাফিরদের থেকে হিফাযত কর।"

এরপর হযরত আসিম (রা) সাতজন সঙ্গীসহ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যান।[২] হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা), হযরত যায়দ ইবন দাসিনা (রা)

---

১. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৩৯।

২ যুদ্ধকালে হযরত আসিম (রা) মুখে বলছিলেন :

الـموت حق والـحياة باطل × وكل ماحم الا له نازل

بالـمرء والـمرء اليه آيا × ان لـم اقاتلكم فامى هابل

ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৬১।

এবং হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা) এ তিনজন মুশরিকদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা দানের ওয়াদা ও শপথের ভিত্তিতে টিলা থেকে নিচে নেমে আসেন। মুশরিকেরা তাঁদের মশকগুলো বাঁধতে শুরু করল। হযরত আবদুল্লাহ ইবন তারিক (রা) বললেন, এটা প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতা। প্রথমেই বিশ্বাস ঘাতকতা করছ, না জানি এর পরে কি করবে, এ বলে তিনি তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করেন। মুশরিকেরা তাঁকে টেনে নিয়ে শহীদ করে ফেলল এবং হযরত খুবায়ব ও হযরত যায়দ (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে চলল। মক্কায় পৌঁছে তারা এ দু'জনকেই বিক্রি করে দিল।

সাফওয়ান ইবন উমায়্যা (যার পিতা উমায়্যা ইবন খালফ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল) তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত যায়দ (রা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিনে নিল। হারিস ইবন আমির বদর যুদ্ধে হযরত খুবায়ব (রা)-এর হাতে নিহত হয়েছিল। এ জন্যে হযরত খুবায়ব (রা)-কে হারিসের পুত্ররা ক্রয় করল। (বুখারী শরীফ, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৯৩)।

সাফওয়ান তো তার বন্দীকে হত্যায় বিলম্ব করা সমীচীন মনে করল না এবং হযরত যায়দ (রা)-কে হত্যা করার জন্য স্বীয় গোলাম নিসতাসের সাথে মক্কার বাইরে তানঈমে পাঠিয়ে দিল। আর হত্যা করার তামাশা দেখার জন্য একদল কুরায়শ তানঈমে সমবেত হলো, যার মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবন হারবও ছিল।

হযরত যায়দ (রা)-কে যখন হত্যা করার জন্য সামনে আনা হলো, তখন আবূ সুফিয়ান বলল, ওহে যায়দ, আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যদি তোমার বদলে মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করা হয় এবং তুমি আপন গৃহে আরামে বাস করবে, এটা কি তুমি পসন্দ করবে ?

হযরত যায়দ (রা) দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার কাছে এটাও অসহ্য যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পায়ে কোন কাঁটা ফুটবে আর আমি আমার ঘরে বসে থাকবো।

আবূ সুফিয়ান বললেন, আল্লাহর কসম, আমি কারো প্রতি কারো এমন ভালবাসা, নিষ্ঠা, বন্ধুত্ব ও প্রাণোৎসর্গকারী দেখিনি, যেমনটি মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য তার সঙ্গীরা ভালবাসা ও আত্মত্যাগ ও উৎসর্গ করে থাকে। এরপর নিসতাস হযরত যায়দ (রা)-কে শহীদ করে।[১] পরবর্তী পর্যায়ে নিসতাস ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

হযরত খুবায়ব (রা) নিষিদ্ধ মাস হওয়ার কারণে তাদের বন্দিত্বে থাকেন। যখন লোকজন তাঁকে হত্যার ইচ্ছা করল, তিনি তখন হারিসের কন্যা যয়নবের কাছে (যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিলেন) পবিত্রতা অর্জন ও পরিস্কার হওয়ার জন্য একটি ক্ষুর চাইলেন। যয়নব তাকে ক্ষুর দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন। যয়নব বলেন,

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩১।

২ ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৫৫৩; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৭৩।

কিছুক্ষণ পর আমি দেখলাম, আমার শিশুটি তার কোলে বসে আছে আর তার হাতে ক্ষুর। এ দৃশ্য দেখে আমি ভীত হয়ে পড়লাম। হযরত খুবায়ব (রা) আমাকে দেখে বললেন, তোমার কি এ সন্দেহ হয় যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করব ? কক্ষণই নয়, আমার দ্বারা ইনশা আল্লাহ্ এমন কাজ কক্ষণও হবে না। আমরা প্রতারণা করি না। এ কথা যয়নব বহুবার বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْعَةِ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ ثَمَرَةٌ وَانَّه لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا كَانَ الاَرْزَقُ رَزَقَه اللّٰهُ ·

"আমি খুবায়ব থেকে উত্তম কোন বন্দী দেখিনি, অবশ্যই আমি তাকে আঙুরের থোকা থেকে খেতে দেখেছি, অথচ তখন মক্কার কোথাও এ ফলের নাম-নিশানাও ছিল না। আর সে ছিল লোহার বেড়িতে বাঁধা, ফলে কোথাও গিয়ে তা আনাও সম্ভব ছিল না। তার নিকট এ রিযক কেবল আল্লাহর নিকট থেকেই আসত।"

যখন হত্যা করার জন্য তাঁকে হরম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি বললেন, আমাকে এতটুকু সময় দাও যে, দু'রাকাত নামায পড়ব। লোকেরা অনুমতি দিলে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করলেন এবং মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে নামায বেশি দীর্ঘ করিনি যে, তোমরা ভাবতে পার, আমি বোধ হয় মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে এমনটি করছি। এরপর হাত তুলে এ দু'আ করলেন : اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلاَتُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدًا। "আয় আল্লাহ্! ওদেরকে তুমি এক এক করে হত্যা করো আর কাউকে অবশিষ্ট রেখো না।" এবং এ কবিতা আবৃত্তি করলেন :

مَا اَنَا اُبَالِىْ حَيْنَ اَقْتُلُ مُسْلِمًا * عَلَى اَىِّ شَقٍّ كَانَ اللّٰهُ مَصْرَعِى وَلَسْتُ

وَذٰلِكَ فِى ذَاتَ الاَّ لَه وَانْ يَّشَاُ * يُبَارِكَ عَلَى اَوْصَالِ شِلُوْ مُمَزَّعٍ ·

"আমি মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করলে আমার কোন পরোয়া নেই, যে পার্শ্বেই আমি মৃত্যুবরণ করি না কেন, যখন খালেস আল্লাহর জন্যই কেবল আমার এ মৃত্যু হয়। ইচ্ছা করলে তিনি আমার ছিন্ন ভিন্ন দেহের জোড়ায় বরকত দিতে পারেন।"

এরপর হযরত খুবায়ব (রা)-কে শূলীতে চড়ানো হয় এবং তিনি শহীদ হয়ে যান। তিনি এ সুন্নত চালু করে যান যে, যাকে হত্যা করা হবে, সে দু'রাকাত নামায আদায় করবে।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-ও অনুরূপ ঘটনার সম্মুখীন হন। হযরত যায়দ (রা) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে একটি খচ্চর ভাড়ায় গ্রহণ করেন। খচ্চরের মালিকও সাথে আসছিল। পথিমধ্যে সে একটি নির্জন

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৮।

স্থানে খচ্চরকে দাঁড় করায়, যেখানে অনেক নিহত ব্যক্তির লাশ পড়েছিল, এবং সে তাঁকেও হত্যা করার ইচ্ছা করে। হযরত যায়দ (রা) বললেন, আমাকে দু'রাকাত নামায পড়ার অবকাশ দাও। লোকটি ঠাট্টাচ্ছলে বলল, হ্যাঁ, তুমিও দু'রাকাত নামায পড়ে নাও; তোমার পূর্বে এরাও নামায পড়েছিল, কিন্তু নামায তাদের কোনই উপকারে আসেনি। হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন দু'রাকাত নামায আদায় করে নিলেন, তখন লোকটি তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তাকে অগ্রসর হতে দেখে হযরত যায়দ (রা) বলেন, ইয়া আরহামার রাহিমীন (হে সর্বাধিক অনুগ্রহকারী), এদিকে হযরত যায়দের মুখে এ ইসমে আযম উচ্চারিত হলো, অন্যদিকে অদৃশ্য থেকে লোকটি এক আওয়ায শুনতে পেল, ওকে হত্যা করো না। লোকটি অদৃশ্যের এ আওয়াযে হতচকিত ও ভীত হয়ে এদিকে সেদিকে তাকাল, কিন্তু যখন কাউকে দেখতে পেল না, তখন পুনরায় সেই অসৎ উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলো। হযরত যায়দ (রা) পুনরায় ইয়া আরহামার রাহিমীন বললেন। লোকটি আবার সেই অদৃশ্য আওয়ায শুনতে পেল এবং পেছনে সরে গেল। তারপর আবার সামনে অগ্রসর হলো। তিনি আবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বললেন। তৃতীয়বার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলার অপেক্ষামাত্র ছিল, দেখলেন বর্শা হাতে একজন অশ্বারোহী, যার বর্শার অগ্রভাগ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হচ্ছে, সেই বর্শা দ্বারা লোকটিকে আঘাত করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা পিঠ দিয়ে বের হয়ে গেল ও লোকটি মৃত অবস্থায় তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেল।

এরপর সেই অশ্বারোহী বললেন, যখন তুমি প্রথমবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বললে, তখন আমি সপ্তম আসমানে ছিলাম, দ্বিতীয়বার বলার সময় আমি ছিলাম পৃথিবীর আসমানে এবং যখন তৃতীয়বার বললে, তখন আমি তোমার কাছে এসে উপস্থিত হলাম।

এ বর্ণনাটি আল্লামা সুহায়লী নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় ঘটেছিল।[১]

মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একজন ফিরিশতা নির্দিষ্ট করা আছে, যে কেউ তিনবার ইয়া আরহামার রাহিমীন বলবে, ঐ ফেরেশতা বলেন, অনুগ্রহ তোমার প্রতি ফিরে এসেছে, কাজেই আরো প্রার্থনা কর, আরো চাও।

একই ধরনের ঘটনা হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা)-এর জীবনেও ঘটেছিল। যেমন হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা) এবং হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণের মধ্যে হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা) ছিলেন খুবই নিষ্ঠাবান ইবাদতকারী, মুত্তাকী ও পরহেযগার। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণ করতেন। একবার ভ্রমণকালে তিনি

---

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার ফুটনোট, ৪খ. পৃ. ৬৫।

একটি চোরের কবলে পড়েন, যে ছিল তীর-তরবারি ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সে বলল, তোমার মাল-সামান এখানে রেখে দাও, আমি তোমাকে হত্যা করব।

হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা) বললেন, তোমার তো ধন-সম্পদের প্রয়োজন, যা এখানে মজুদ আছে, আমার জীবনের কি প্রয়োজন ? চোর বলল, না, তোমার জীবনটাই আমার প্রয়োজন। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমাকে এতটুকু অবকাশ দাও যে, আমি নামায আদায় করে নিই। চোর বলল, হ্যাঁ, যতটা ইচ্ছা, নামায পড়ে নাও। হযরত আবূ মুয়াল্লাক (রা) উযূ করে নামায আদায় করলেন এবং নামায শেষে তিনি এ প্রার্থনা করলেন :

يَاوَدُوْدَ يَاذُ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا فَعَّالَ لِمَا تُرِيْدُ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ الَّتِى لاَ تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِى لاَيُضَاءُ وَبِنُوْرِكَ الَّذِى مَلاَءُ اَرْكَانَ عَرْشِكَ اَنْ تَكْفِيَنِىْ شَرَ هٰذَا الدَّصُّ يَامُغِيْثَ اَغْثِنِىْ ٠

তিনবার এ দু'আ পাঠ করলেন। তিনি দেখলেন, এক অশ্বারোহী বর্শা হাতে চোরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং বর্শার আঘাতে চোরের দফারফা করে ফেললেন। এরপর তাঁর দিকে ফিরে বললেন, তুমি কে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার ফরিয়াদ পূরণ এবং সাহায্য করার জন্য প্রেরণ করেছেন। আমি চতুর্থ আসমানের ফেরেশতা, যখন তুমি প্রথমবার এ দু'আ পাঠ কর, তখন আমি আসমানের দরজার কড়া নাড়ার শব্দ পাই। তোমার দ্বিতীয়বারের প্রার্থনায় আমি আসমানবাসীদের চিৎকার এবং ডাকাডাকি শুনতে পাই। যখন তুমি তৃতীয়বার প্রার্থনা করলে, তখন বলা হলো, এটা কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তির ফরিয়াদ। তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আবেদন করি, আমাকে ঐ যালিমকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হোক। এরপর তিনি বললেন, তোমার জন্য সুসংবাদ, এটা মনে রাখবে, যে ব্যক্তি উযূ করে চার রাকাত নামায আদায় করবে এবং এ দু'আ করবে, তার দু'আ কবূল করা হবে, চাই সে যতই কষ্টে কিংবা অস্থিরতায় নিপতিত হোক। (ইসাবা, ৪খ. পৃ. ১৮২, আল-কিনা অধ্যায়, হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী রা-এর জীবন চরিত)।

উহুদ যুদ্ধে হযরত আসিম (রা) সালাফা বিনতে সাঈদের দু'পুত্রকে হত্যা করেছিলেন, এ জন্যে সালাফা মান্নত করেছিল যে, আসিমের মাথার খুলিতে করে অবশ্যই মদপান করব। ফলে হুযায়ল গোত্রের কিছু লোক হযরত আসিমের মাথা নেয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো, যাতে তা সালাফার কাছে বিক্রি করে মোটা অংকের অর্থ উপার্জন করা যায়।

ইমাম তাবারী বলেন, সালাফা ঘোষণা করেছিল, যে ব্যক্তি আসিমের মাথা নিয়ে আসবে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।

হযরত আসিম (রা) তাঁর লাশের সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পূর্বেই প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মর্যাদা ও হিফাযতের ব্যবস্থা এভাবে করলেন যে, তিনি ভীমরুলের একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন, যেগুলো তাঁর লাশকে ঘিরে রাখল, কোন কাফির এর নিকটেও আসতে পারল না। তখন তারা এ বলে চলে গেল যে, সন্ধ্যাবেলায় যখন এগুলো চলে যাবে, তখন মাথা কেটে নেয়া হবে। কিন্তু যখন রাত হলো তখন একটি বন্যা এলো, যা তাঁর লাশকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এবং ওরা নিরুৎসাহিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আসিম (রা) আল্লাহ তা'আলার সাথে এ ওয়াদা করেছিলেন যে, আমি কোন মুশরিককে কখনো স্পর্শ করব না এবং আমাকেও যেন কোন মুশরিক স্পর্শ না করে। হযরত উমর (রা)-এর সামনে যখন হযরত আসিম (রা)-এর কথা স্মরণ করা হতো, তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সময় তাঁর বিশিষ্ট বান্দাকে মৃত্যুর পরেও হিফাযত করেন যেমন জীবিতাবস্থায় তার হিফাযত করতেন।[১]

মক্কার কাফিরগণ হযরত খুবায়ব (রা)-এর লাশ শূলীতে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা)-কে তাঁর লাশ নিয়ে আসার জন্য মদীনা থেকে মক্কায় প্রেরণ করেন। যখন তারা তানঈমে পৌঁছলেন, তখন দেখতে পেলেন লাশটি পাহারা দেয়ার জন্য চল্লিশ ব্যক্তি শূলীর চারপাশে অবস্থান করছে। হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা) তাদেরকে অলস অবস্থায় (তন্দ্রাচ্ছন্ন) দেখে শূলী থেকে লাশ নামিয়ে ঘোড়ায় রাখলেন। লাশ তখনো তরতাজা ছিল, এতে কোনই পরিবর্তন হয়নি, অথচ শূলীতে ঝুলানোর চল্লিশ দিন গত হয়ে গিয়েছিল। মুশরিকগণ চোখ মেলে যখন দেখতে পেল যে, লাশ উধাও হয়ে গেছে, তখন তারা এর অনুসন্ধানে চারদিকে ছুটল। অবশেষে তারা হযরত যুবায়র (রা) এবং হযরত মিকদাদ (রা)-কে ধরে ফেলল। তারা হযরত যুবায়র (রা) লাশটি নামিয়ে মাটিতে রাখলেন, তৎক্ষণাৎ মাটি ফাঁক হয়ে লাশটি গিলে ফেলল। এ কারণে হযরত খুবায়ব (রা) بليع الارض নামে প্রসিদ্ধ।[২]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, কাফিরগণ যখন হযরত খুবায়ব (রা)-কে হত্যা করে, তখন তাঁর মুখমণ্ডল কিবলামুখী ছিল। ওরা তাঁর ঘাড় ঘুরিয়ে দিল, কিন্তু পুনরায় তা কিবলামুখী হয়ে গেল। বারবার তারা এমন করতে থাকল। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ছেড়ে দিল।

দ্রষ্টব্য : ১. নিহত হওয়ার সময় নামায আদায় করা সুন্নত, যাতে জীবনের সমাপ্তি সর্বোত্তম এবং সবচে' ভাল কাজের ওপর ঘটে। যেমন একটি হাদীসে এসেছে : اذا قمت فى صلاتك فصل صلاة مودع "যখন তুমি নামাযে দণ্ডায়মান হবে, তখন

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৩।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৬৭; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৯৫।

পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারীর মত নামায আদায় কর।" [হযরত আবূ আয়্যূব (রা) সূত্রে আহমদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]।[১]

২. হযরত আসিম (রা)-এর লাশকে অলৌকিকভাবে হিফাযত করা, লোকজনের হযরত খুবায়ব (রা)-কে কোন মাধ্যম ছাড়াই আঙ্গুর খেতে দেখা এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ও হযরত আবূ মুয়াল্লাক আনসারী (রা)-এর ঘটনা, এ সবই এর প্রমাণ যে, আল্লাহর ওলীগণের কারামত সত্য। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আলিমগণ এতে একমত। বিস্তারিতের জন্য কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ এবং বিশেষ করে তাবাকাতুশ-শাফিয়াতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৫৯-৭৮ দেখুন।

৩. হযরত খুবায়ব (রা)-এর এ কারামত হযরত মরিয়ম (আ)-এর কারামতের অনুরূপ, যা আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানে উল্লেখ করেছেন :

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"যখনই যাকারিয়্যা তাঁর সাথে কক্ষে সাক্ষাত করতে যেতেন, তখনই তাঁর কাছে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, হে মরিয়ম! এ সব তুমি কোথায় পেলে? মরিয়ম বলতেন, এটা আল্লাহর নিকট থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩৭)

৪. যার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, তার জন্য চুল এবং নখ পরিষ্কার করা মুস্তাহাব এবং উত্তম, যেমন হযরত খুবায়ব (রা) শাহাদতের পূর্বে ক্ষুর চেয়ে নেন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিতির পূর্বে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া জরুরী ও আবশ্যিক।

৫. যদি মুসলমান কাফিরের বন্দী হিসেবে থাকে এবং তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তা হলে মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সুযোগ পেয়ে কাফিরদের শিশুদের হত্যা করা; বরং তাদের সাথে সহানুভূতি ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করবে। যেমন হযরত খুবায়ব (রা) হারিসের পৌত্রকে স্নেহভরে নিজ কোলে বসিয়ে নিয়েছিলেন।

কুররা অভিযান অর্থাৎ বীরে মাউনার ঘটনা

ঐ সফর মাসেই আরেকটি ঘটনা ঘটে গেল যে, আমির ইবন মালিক আবূ বারা নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে হাদিয়া পেশ করে, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি এবং আবূ বারাকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দেন। কিন্তু আবূ বারা ইসলামও গ্রহণ করল না এবং তা অস্বীকারও করল না, বরং বলল, যদি আপনি আপনার কিছু সাহাবীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নজদবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেন, তা হলে আমি আশা রাখি যে, তারা দাওয়াত কবূল করবে। তিনি বললেন, নজদবাসীদের

১. মিশকাত শরীফ, কিতাবুর রিকাক, তৃতীয় অধ্যায়।

ব্যাপারে আমি সন্দেহ ও ভীতি পোষণ করি। আবূ বারা বলল, আমি যামিন থাকছি। রাসূলুল্লাহ (সা) সত্তরজন সাহাবীকে, যাঁদেরকে কারী (বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী) বলা হতো, তার সাথে প্রেরণ করেন এবং হযরত মুনযির ইবন আমির সাঈদী (রা)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন।

এ দলের সবাই ছিলেন অত্যন্ত পাক-পবিত্র। তাঁরা দিনে লাকড়ি সংগ্রহ করে সন্ধ্যায় তা বিক্রি করে সুফফাবাসীদের জন্য খাবার আনতেন। আর রাতের কিছু অংশ কুরআন মজীদের দরসে ও কিছু অংশ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে কাটিয়ে দিতেন।

এঁরা এখান থেকে যাত্রা করে বীরে মাউনায় গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) আমির ইবন তুফায়লের নামে (যে বনী আমির গোত্রের সর্দার ও আবূ বারার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল) একটি পত্র লিখিয়ে হযরত আনাস (রা)-এর মামা হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-এর হাতে দেন।

দলটি বীরে মাউনায়[১] থাকতেই নবী (সা) হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-কে পত্রসহ আমির ইবন তুফায়লের নিকট প্রেরণ করেন। আমির ইবন তুফায়ল পত্র দেখার পূর্বেই তাঁকে হত্যা করার জন্য এক ব্যক্তিকে ইশারা করে। সে লোকটি পিছন থেকে বর্শার আঘাতে তাঁকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়। হযরত হারাম ইবন মিলহান (রা)-এর মুখে তখন এ কথা উচ্চারিত হচ্ছিল : اكبر فزت ورب الكعبة। "আল্লাহু আকবর, কা'বার রবের কসম, আমি সফল হয়েছি।"

সে অবশিষ্ট সাহাবীগণকে হত্যা করার জন্য বনী আমিরকে উস্কানি দেয়। কিন্তু আমিরের চাচা আবূ বারা আশ্রয় দেয়ার কারণে বনী আমির তাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

আমির ইবন তুফায়ল যখন তাদের থেকে নিরাশ হলো, তখন বনী সুলায়মের সাহায্যপ্রার্থী হলো। উসাইয়্যা, রাআল এবং যাকওয়ান গোত্র তার সাহায্যে প্রস্তুত হলো এবং সবাই মিলে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে বিনা অপরাধে হত্যা করল। শুধু হযরত কা'ব ইবন যায়দ আনসারী (রা) বেঁচে যান। তাঁর মধ্যে জীবনের কিছুটা স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। ফলে ওরা তাঁকে মৃত মনে করে পরিত্যাগ করে। এরপর তিনি সংজ্ঞা ফিরে পান এবং দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। অবশেষে তিনি খন্দকের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তিনি ছাড়া আরো দু'ব্যক্তি বেঁচে যান। তাঁদের একজনের নাম ছিল হযরত মুনযির ইবন মুহাম্মদ (রা) এবং অপরজনের নাম হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা)। তাঁরা দু'জন পশু চরাতে জংগলে গিয়েছিলেন, ইত্যবসরে আসমানে অনেক পাখি উড়তে দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে যান এবং বলেন, নিশ্চয়ই কোন ঘটনা ঘটে গেছে। যখন নিকটবর্তী হলেন, তখন দেখতে পেলেন সমস্ত সঙ্গী রক্তে গোসল

১. বীরে মাউনা একটি স্থানের নাম যা মক্কা এবং উসফানের মধ্যে অবস্থিত। হুযায়ল, বনী সুলায়ম এবং বনী আমির এর আশপাশে বসবাস করত। যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৪।

করে শাহাদতের শয্যায় শায়িত। দেখে উভয়ে পরস্পরে পরামর্শ করলেন, এখন কি করা যায়। হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা) বললেন, মদীনায় ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দেয়া হোক। হযরত মুনযির (রা) বললেন, সংবাদ তো হয়েই যাবে, শাহাদতের সৌভাগ্য কেন ছেড়ে দেব। মোটকথা উভয়ে অগ্রসর হলেন। হযরত মুনযির (রা) তো যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন এবং হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা)-কে ওরা বন্দী করল এবং আমির ইবন তুফায়লের নিকটে উপস্থিত করল। আমির তাঁর মাথার চুল কেটে দিয়ে এ বলে ছেড়ে দিল যে, আমার মা একটি দাস মুক্ত করার মান্নত করেছিলেন, কাজেই ঐ মান্নত পূরণার্থে তোমাকে মুক্তি দিলাম। (যারকানী, ২খ. পৃ. ৭৭)।

এ যুদ্ধে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুক্তদাস হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা) শহীদ হন এবং তাঁর জানাযা আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেমন আমির ইবন তুফায়ল লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে :

من الرجل منهم لما قتل رايته رفع بين السماء والارض حتى رأيت السماء من دونه ·

"মুসলমানদের মধ্যে ঐ মৃত ব্যক্তিটি কে, যে নিহত হলে আমি দেখলাম, তাকে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে উঠানো হচ্ছে, এমনকি শেষে আসমান নিচে রয়ে গেল !"

লোকজন বলল, ঐ ব্যক্তি ছিলেন আমির ইবন ফুহায়রা (রা)।[১]

আর বুখারীর বর্ণনায় আছে, আমির ইবন তুফায়ল বলল :

لقد رأيته بعد ما قتل رفع الى السماء حتى انى لانظر الى السماء بينه وبين الارض ثم وضع ·

"ঐ ব্যক্তিকে নিহত হওয়ার পর আমি নিজেই ভালভাবে দেখলাম যে, তার লাশ আসমানের দিকে উঠানো হয় এবং এমনকি তা আসমান এবং যমীনের মধ্যে ঝুলে থাকে, এরপর পুনরায় যমীনে রাখা হয়।"

হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-এর হত্যাকারী জব্বার ইবন সুলামী বলে, যখন আমি আমির ইবন ফুহায়রাকে বর্শাদ্বারা আঘাত করি, তখন তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল, فزت والله "আল্লাহর কসম আমি সফল হয়েছি।" এটা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এবং মনে মনে ভাবলাম, এ সাফল্যের অর্থ কি ! আমি এসে ব্যাপারটি হযরত যাহহাক ইবন সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, এ সাফল্যের অর্থ হলো, আমি জান্নাত লাভ করেছি। এ কথা শুনে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

---

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ৩৫।

ودعا انى ذلك ما رأيت من عمر بن فهيرة من دفعه الى السماء علوا

"আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ হলো, আমি আমির ইবন ফুহায়রাকে দেখলাম, তাঁকে আসমানের দিকে উঠানো হচ্ছে।" (আবদুল্লাহ ইবন মুবারক কর্তৃক বর্ণিত)

হযরত যাহহাক (রা) এ ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে লিখে পাঠান। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন : ان الملائكة وارت جثته فى عليين "ফেরেশতাগণ তার লাশ ইল্লিয়্যীনে লুকিয়ে রেখেছেন।"[১]

আর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, ফিরিশতাগণ তাঁর লাশ লুকিয়ে রাখেন, ফলে মুশরিকরা দেখতে পায়নি তা কোথায় গেল। এ বর্ণনায় ثم وضع শব্দটির উল্লেখ নেই যেমনটি বুখারীর বর্ণনায় ছিল। ইমাম বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, সম্ভবত তাঁর লাশ প্রথমে আসমানে উঠানো হয়েছিল এবং এরপর যমীনে রাখা হয়েছে। আল্লামা সুয়ূতী বলেন, ثم وضع শব্দটি কয়েকটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, অধিকাংশ বর্ণনা ও সনদে এটাই এসেছে যে, তাঁর লাশ আসমানে লুকিয়ে ফেলা হয়। হযরত মূসা ইবন উকবা (রা) বলেন, হযরত উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলতেন, হযরত আমির ইবন ফুহায়রা (রা)-এর লাশ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না, লোকদের ধারণা, তাঁর লাশ ফিরিশতাগণ আসমানে লুকিয়ে ফেলেছেন।[২]

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সম্পর্কে অবহিত হলেন, তখন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন যে, সারা জীবনে যেন তিনি এমন ব্যথা পাননি এবং এক মাস পর্যন্ত তিনি ফজরের নামাযে দু'আ কুনূত (কুনূতে নাযেলা) পাঠ করে তাদের জন্য বদদু'আ করেন। আর তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে এ দুর্ঘটনার সংবাদ দেন যে, তোমাদের সাথীরা শহীদ হয়ে গেছে এবং তারা আল্লাহর কাছে এ আরয পেশ করেছে যে, আমাদের ভাইদেরকে এ সংবাদ পৌঁছে দিন, আমরা আমাদের রবের সাথে মিলিত হয়েছি, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

বনী নাযীরের যুদ্ধ (চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস)

হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা) বীরে মাউনা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বনী আমিরের দুই মুশরিকের সাথে সাক্ষাত হয়। তারা কানাত নামক স্থানের একটি বাগানে যাত্রা বিরতি করে। যখন এ দু'ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়ল, তখন হযরত আমর ইবন উমায়্যা (রা) ভাবলেন, এদের গোত্রের সর্দার আমির ইবন তুফায়ল সত্তরজন মুসলমানকে শহীদ করেছে, সবার প্রতিশোধ গ্রহণ করা তো এ সময়ে অসম্ভব, তবে কিছুটা প্রতিশোধ তো নিয়ে নিই। এ ভেবে তিন ঐ দু'ব্যক্তিকে হত্যা করেন, অথচ তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধিচুক্তি ছিল যা হযরত আমর

১. খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২২৩।

২ প্রাগুক্ত, ১খ. পৃ. ২২৪।

ইবন উমায়্যা জানতেন না। মদীনায় পৌঁছে তিনি এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, ওদের সাথে তো আমাদের সন্ধিচুক্তি ছিল, কাজেই তাদের রক্তপণ দেয়া আবশ্যক। সুতরাং তিনি ঐ দু'ব্যক্তির রক্তপণ পাঠিয়ে দিলেন।[১]

বনী নাযীর যেহেতু বনী আমিরের মিত্র গোত্র ছিল, কাজেই চুক্তির শর্ত অনুসারে রক্তপণের কিছু অংশ বনী নাযীরের প্রদান করা কর্তব্য ছিল। এ ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (সা) রক্তপণের তাদের পক্ষের চাঁদার অংশ আদায়ের জন্য নিজেই বনী নাযীরের নিকটে গেলেন। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত যুবায়র, হযরত তালহা, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র, হযরত সা'দ ইবন উবাদা প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। নবী (সা) গিয়ে একটি দেয়ালের ছায়ায় বসে পড়েন।

বনী নাযীর দৃশ্যত অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথাবার্তা বলে এবং রক্তপণের অংশ প্রদানের অঙ্গীকার করে। কিন্তু গোপনে গোপনে তারা এ মতলব আঁটে যে, এক ব্যক্তিকে ছাদে পাঠিয়ে দেয়া হোক এবং সে উপর থেকে একটি ভারী পাথর গড়িয়ে দিক, যাতে এ দুশমনেরা পাথর চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। সাল্লাম ইবন মিশকাম বলল, لا تفعلوا والله ليخبره ربه وانه لنقض العهد الذى بيننا وبينه "কখনো এমনটি করবে না, আল্লাহর কসম, তাঁর রব তাঁকে এ খবর দেবেন। এছাড়া এটাতো সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘন।"

সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে অবতরণ করেন এবং ওদের সলা-পরামর্শ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি সেখান থেকে দ্রুত উঠে মদীনায় চলে আসেন। আর তিনি সেখান থেকে এভাবে উঠে পড়েন যেভাবে মানুষ প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য উঠে থাকে এবং সাহাবিগণ সেখানেই বসে থাকেন। ইয়াহূদীরা যখন তাঁর চলে যাওয়ার সংবাদ অবগত হলো, তখন খুবই লজ্জিত হলো। ইয়াহূদী কিনানা ইবন হুবায়রা বলল, তোমরা কি জানো না যে, মুহাম্মদ (সা) কেন এখান থেকে উঠে চলে গেছেন ? আল্লাহর কসম, তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তিনি জেনে ফেলেছেন,[২] তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।

যখন তাঁর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব ঘটতে লাগল, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সন্ধানে মদীনায় ফিরে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইয়াহূদীদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে তাঁদেরকে অবহিত করেন এবং বনী নাযীরকে আক্রমণের নির্দেশ দেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মদীনার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে রেখে তিনি বনী

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৪।

২ ইবন উকবা বলেন, এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হয় : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ৪৮।

নাযীরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং গিয়েই তাদেরকে ঘেরাও করেন। বনী নাযীর দূর্গে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তাদের মযবুত দূর্গগুলো সম্পর্কে তাদের কিছুটা আস্থা ছিল, অধিকন্তু আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং অপরাপর মুনাফিকেরা তাদেরকে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়ায় তাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবুও মুসলমানদের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাদের ছিল না। এছাড়া বনী নাযীর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ইতোপূর্বে আরো বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এ বলে যে, আপনার পক্ষ থেকে তিন ব্যক্তিকে প্রেরণ করুন, আমরাও আমাদের তিনজন আলিমকে পাঠাচ্ছি, আলাপ-আলোচনার ফলে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে আমরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করব। অপরদিকে তাদের আলিমদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিল যে, কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ছুরি নিয়ে যাবে এবং আলোচনার মাঝে সুযোগ বুঝে তাদের হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু কোন একটি মাধ্যমে এ ষড়যন্ত্রের কথা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ফাঁস হয়ে যায়। (ইবন মারদুবিয়্যা কর্তৃক সহীহ সনদে বর্ণিত)। মোট কথা এই যে, বনী নাযীরের বারংবার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি তাদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। পনেরদিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং তাদের বাগান ও বৃক্ষগুলো কেটে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে নিরাপত্তার আবেদন করে।

তিনি বললেন, দশদিন অবকাশ দেয়া হলো, মদীনা খালি করে দাও, স্ত্রী-পরিজন, সন্তান-সন্তুতি যেখানে খুশি, চলে যাও। যুদ্ধ সরঞ্জাম ছাড়া যে পরিমাণ সম্পদ উট ও অন্যান্য সওয়ারীতে বহন করতে সক্ষম তা নিয়ে যেতে পার, এ অনুমতি দেয়া হলো।

ধন-সম্পদের লোভ-লালসায় ইয়াহূদীরা ঘরের দরজা এবং চৌকাঠও উটের পিঠে বহন করে নিয়ে যায় এবং মদীনা ত্যাগ করে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ তো খায়বরে গিয়ে অবস্থান নেয় আর কিছু লোক সিরিয়ায় চলে যায়। তবে তাদের নেতা হুয়াই ইবন আখতাব, কিনানা ইবন রবী এবং সাল্লাম ইবন আবুল হুকায়ক তাদের সে সব লোকজনের সাথেই ছিল, যারা খায়বরেই অবস্থান গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের পরিত্যাক্ত ধন-সম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করেন, যাতে আনসারগণের ওপর থেকে তাদের বোঝা হালকা হয়। যদিও আনসারগণ নিজেদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দরুন এটাকে বোঝা মনে করতেন না, বরং চোখের প্রশান্তি ও অন্তর স্বস্তিদায়ক মনে করতেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা) আনসারগণকে একত্র করে ভাষণ দেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা বর্ণনার পর আনসারগণ মুহাজিরগণের সাথে যে সমস্ত সদাচরণ ও অনুগ্রহ করেছেন, তা বর্ণনা দেন এবং এরপর বলেন, যদি তোমরা চাও, তা হলে আমি বনী নযীরের পরিত্যাক্ত সম্পদ আনসার এবং মুহাজিরগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দিই, আর তারা পূর্ববৎ তোমাদের সাথে অংশীদার থাকবে। আর যদি চাও তা হলে এ সম্পদ কেবল মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করি এবং তারা তোমাদের ঘর খালি করে দিক।

আনসারগণের সর্দার হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি সচ্ছন্দচিত্তে এ সম্পদ শুধু মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করুন এবং পূর্বের নিয়মানুসারে মুহাজিরগণ আমাদের আমাদের ঘরেই অবস্থান করুক এবং আমাদের সাথে পানাহারে শরীক হোক।

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, আনসারগণ আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ সম্পদ আপনি স্রেফ মুহাজিরগণের মধ্যেই বন্টন করুন এবং আমাদের মাল-সম্পদের মধ্যেও যতটা ইচ্ছা মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করুন, আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে এতে সন্তুষ্ট আছি।

এ জবাব শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আনন্দিত হন এবং তাদের জন্য এ দু'আ করেন : اللهم ارحم الانصار وابناء لانصار "আয় আল্লাহ, আপনি আনসারদের প্রতি এবং তাদের সন্তান-সন্তুতির প্রতি অনুগ্রহ করুন।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন : جزاكم الله خيرا يا معشر الانصار فوالله ما مثلنا ومثلكم الا كما قال الغنوى "ওহে আনসার সপ্রদায়, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। আল্লাহর কসম, আমাদের ও তোমাদের উদাহরণ এমন, যেমনটি কবি গানাবী বলেছেন :

جزى الله عنا جعفرا حسين از لقت * بنا نعلنا فى الواطئين فزلت

ابرا ان يملون ولو ان امنا * تلاقى الذى يلقون ضالملت

"আল্লাহ্ তা'আলা জা'ফরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, যখন আমাদের পা দৃঢ় হলো এবং তার পদস্খলন ঘটল। তুমি আমাদের সহযোগিতা ও দেখাশোনা করতে অতিষ্ঠ হতে না, সম্ভবত আমাদের মাতারও যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হতো, তা হলে তিনিও অতিষ্ঠ হয়ে পড়তেন।"

তিনি সমুদয় সম্পদ মুহাজিরগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারগণের মধ্যে কেবল হযরত আবূ দুজানা (রা) ও হযরত সাহল ইবন হুনায়ফ (রা)-কে তাঁদের অভাবের কারণে এর অংশ দান করেন।

এ যুদ্ধে বনী নাযীরের মাত্র দু'ব্যক্তি মুসলমান হন। তাঁরা হলেন হযরত ইয়ামীন ইবন উমায়র (রা) এবং হযরত আবূ সাঈদ ইবন ওহাব (রা)। তাঁদের মাল-সম্পদের কিছুই গ্রহণ করা হয় নি; বরং তাঁদের মালামাল তাঁদের অধিকারেই রাখা হলো। আর এ যুদ্ধকালেই সূরা হাশর অবতীর্ণ হয়, এ জন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ সূরাকে বলতেন সূরায়ে বনী নযীর। এ সূরায় আল্লাহ তা'আলা পরিত্যক্ত সম্পদের বিধান এবং তা ব্যয়ের নির্দেশনা দান করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এতদসমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে যারকানী, পৃ. ৮০-৮৬; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৫৪-২৫৫ এবং আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৭৪-৮০-তে উল্লিখিত হয়েছে।

শারাব নিষিদ্ধ হওয়া

ইবন ইসহাক লিখেন, শারাব নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশ এ যুদ্ধের সময়ই অবতীর্ণ হয়।[১]

যাতুর-রিকা‘ যুদ্ধ (চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

বনু নাযীরের যুদ্ধের পর রবীউল আউয়াল মাস থেকে শুরু করে জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথমভাগ পর্যন্ত রাসূল (সা) মদীনায়ই অবস্থান করেন। জমাদিউল আউয়াল মাসের প্রথমভাগে সংবাদ পাওয়া যায় যে, বনু মুহারিব[২] এবং বনু সা‘লাবা নবী (সা)-এর মুকাবিলা করার জন্য সেনা সংগ্রহ করছে। তিনি (সা) চারশ’[৩] সাহাবার একটি দল সাথে নিয়ে নজদ-এর দিকে যাত্রা করলেন। তিনি নজদে পৌঁছার পর বনু গাতফানের কিছু লোক তাঁর সাথে মিলিত হয় কিন্তু যুদ্ধের সুযোগ আসেনি। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে সালাতুল খওফ পড়ান।[৪]

হযরত আবূ মূসা আশ‘আরী (রা) বলেন, এ যুদ্ধকে যাতুর-রিকা‘ এ জন্যে বলা হয় যে, রিকা‘ অর্থ কাপড়ের পট্টি বা তালি। এ যুদ্ধে চলতে চলতে আমাদের পা ফেটে গিয়েছিল। ফলে আমরা পায়ে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছিলাম। এ জন্যে এ যুদ্ধকে যাতুর রিকা‘ বা পট্টিওয়ালা বলা হতো। অর্থাৎ পট্টিওয়ালা যুদ্ধ (বুখারী)।

ইবন সা‘দ বলেন, যাতুর রিকা একটি পাহাড়ের নাম, যেখান থেকে তিনি এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, আর এতে কালো, সাদা এবং লাল চিহ্ন ছিল।[৫]

প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ছায়াদার বৃক্ষের নিচে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং তাঁর তরবারিটি বৃক্ষের ডালে ঝুলানো ছিল। ইত্যবসরে এক মুশরিক এসে তরবারিটি হস্তগত করে দাঁড়িয়ে যায় এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করে, বল, এবারে আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তিনি অত্যন্ত নিরুদ্বেগের সাথে বললেন : আল্লাহ।

এটা বুখারীর বর্ণনা। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে তার বুকে জোরে ঘুষি মারেন। ফলে তার হাত থেকে তরবারিটি পড়ে যায় এবং নবী (সা) সেটি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, বল, এবারে আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? সে বলল, কেউ নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা, যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

---

১. ইবন ইসহাক।

২ বনী মুহারিব এবং বনী সালাবা গাতফান সম্প্রদায়ের দু’টি শাখা। যারকানী, পৃ. ১২।

৩. এক বর্ণনায় সাতশ’ এবং অপর এক বর্ণনায় আটশ’ বলা হয়েছে। যারকানী, পৃ. ১৩।

৪. ইবনসা’দ বলেন, এটাই ছিল প্রথম সালাতুল খাওফ আদায়। উয়ূনুল আসার,২খ. পৃ. ৫২।

৫. তাবাকাতে ইবন সা’দ, ২খ. পৃ. ৪৩।

ওয়াকিদী বলেন, এ ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যান এবং নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। ফলে অনেক লোক তাঁর দাওয়াতে মুসলমান হয়ে যান।

সহীহ্ বুখারীতে আছে, এ ব্যক্তির নাম ছিল গাওস ইবন হারিস।

সতর্ক বাণী : একই ধরনের ঘটনা তৃতীয় হিজরীতে গাতফানের যুদ্ধের বর্ণনায়ও অতিক্রান্ত হয়েছে। কেউ বলেন, এ দু'টি একই ঘটনা, আবার কেউ বলেন, দু'টি পৃথক পৃথক ঘটনা। আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন।[1]

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি একটি ঘাঁটিতে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা)-কে ঘাঁটির নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। তাঁরা দু'জনে পরস্পরে এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাত্রির প্রথমার্ধে হযরত আব্বাদ এবং শেষার্ধে হযরত আম্মার (রা) জেগে থাকবেন। সে মর্মে হযরত আম্মারইবন ইয়সির (রা) তো ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা) ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নামাযের নিয়্যত বাঁধলেন।

এক কাফির তাঁকে দেখে ভাবল যে, ইনিই মুসলমানদের পথ প্রদর্শক এবং একটি তীর নিক্ষেপ করল যা লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত আব্বাদ ইবন বিশর (রা), যাঁর প্রতিটি রগরেশা প্রকৃত প্রভুর আনুগত্য ও দাসত্বে পরিপূর্ণ করে নিয়েছিলেন, যাঁর আপাদ মস্তক প্রকৃত রবের ভালবাসায় ছিল নিমগ্ন এবং ঈমান ও ইহসানের মাধুর্য যাঁর অন্তরকে করেছিল আপ্লুত, পূর্বের মতই নামাযে মশগুল থাকেন এবং তীর খুলে দূরে নিক্ষেপ করেন। কাফিরটি দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপ করে। সেটিও তিনি খুলে নিক্ষেপ করেন এবং নামাযে মগ্ন থাকেন। কাফিরটি তৃতীয় তীর নিক্ষেপ করে। এবারে তাঁর সন্দেহ হলো যে, পাছে দুশমন কোন গুপ্ত স্থান থেকে হামলা না করে বসে এবং যে উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিযুক্ত করেছেন, সে উদ্দেশ্য না ব্যাহত হয়ে যায়! ফলে তিনি নামায সমাপ্ত করেন এবং নামায সমাপ্তির পর নিজ সঙ্গীকে জাগিয়ে দিলেন যে, উঠো, আমি আহত হয়েছি। আর শত্রুটি তাঁকে জাগাতে দেখে পলায়ন করে। হযরত আম্মার ইবন ইয়াসির (রা) জেগে উঠলেন এবং তাঁর শরীর থেকে রক্তপাত হতে দেখে বললেন, সুবহান আল্লাহ, তুমি কেন আমাকে ডাকোনি, কেন জাগাওনি আমাকে ? বললেন, আমি একটি সূরা পাঠ করছিলাম, এর মধ্যে বিরতি দেয়াটা পসন্দ করিনি। যখন একের পর এক তীর আসতে থাকল, তখন আমি নামায সমাপ্ত করলাম এবং তোমাকে জাগালাম। আল্লাহর কসম, যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ স্মরণে না আসত, তাহলে নামায সমাপ্তির পূর্বে আমার জানেরই সমাপ্তি ঘটত।

এ যুদ্ধ সংঘটনের তারিখ নিয়ে খুবই মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক বলেন, যাতুর রিকা যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, ইবন সা'দ বলেন,

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৯১।

পঞ্চম হিজরীর মুহররম মাসে সংঘটিত হয়। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ যুদ্ধ খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়। এ জন্যে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এ যুদ্ধে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-এর অংশগ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) সর্বসম্মতিক্রমে খায়বর যুদ্ধের পর সপ্তম হিজরীতে আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। অধিকন্তু আবূ দাউদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান ইবন হাকাম হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছেন ? তিনি বলেন, আমি নাজদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সালাতুল খাওফ পড়েছি। এ রিওয়ায়াত বুখারীতে তা'লীক হিসেবে উল্লেখিত আছে এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-ও সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের পর নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন।[১]

প্রতিশ্রুত বদর যুদ্ধ (শা'বান, চতুর্থ হিজরী)

যাতুর রিকা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রজব মাসের শেষ পর্যন্ত তিনি মদীনাতে অবস্থান করেন। উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে যেহেতু আবূ সুফিয়ানের সাথে ওয়াদা হয়েছিল যে, আগামী বছর বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে, এ প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (সা) পনেরশ' সাহাবী সঙ্গে নিয়ে শাবান মাসে বদরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বদর পৌঁছে আটদিন পর্যন্ত আবূ সুফিয়ানের অপেক্ষা করেন। আবূ সুফিয়ানও মক্কাবাসীদের সাথে নিয়ে মাওরাউ যাহরান পর্যন্ত পৌঁছে কিন্তু মুকাবিলা করার সাহস হয়নি এবং এ কথা বলে ফিরে যায় যে, এ বছর অকাল ও দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) আটদিন অপেক্ষা করার পর যখন যুদ্ধ সম্বন্ধে নিরাশ হলেন, তখন কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনায় ফিরে আসেন।[২]

আবূ সুফিয়ান যদিও উহুদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেছিল যে, আগামী বছর আবার বদরে লড়াই হবে, কিন্তু অন্তর থেকে আবূ সুফিয়ান ভীত হয়ে পড়েছিল, মনে মনে চাচ্ছিল যে, নবী (সা)-ও যদি বদরে না আসতেন, যাতে আমাকে লজ্জিত ও অপদস্থ না হতে হয় এবং অপবাদটা মুসলমানদেরকেই দেয়া যায়! নাঈম ইবন মাসউদ নামে এক ব্যক্তি মদীনায় যাচ্ছিল। তাকে কিছু টাকা-কড়ি এ জন্যে দেয়া হয়েছিল, সে মদীনায় মুসলমানদের মাঝে গিয়ে এ কথা ছড়িয়ে দেবে যে, মক্কাবাসী মুসলমানদের সমুচিত জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করছে, কাজেই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, তোমরা কুরায়শের মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়ো না। আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল যে, যখন এ ধরনের সংবাদ প্রচারিত হবে তখন মুসলমানগণ ভীত হয়ে

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩৫।
২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৩৬।

যুদ্ধের জন্য বের হবে না (আজকালের ভাষায় যাকে প্রোপাগাণ্ডা বলে)। কিন্তু এ সংবাদ শোনামাত্রই মুসলমানদের ঈমানের জোশ আরো বৃদ্ধি পেল। حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। "আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক।" পাঠ করতে করতে তারা বদরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন এবং ওয়াদামাফিক বদরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে একটি বড় বাজার বসত, (মুসলমানগণ) তিনদিন সেখানে অবস্থান করে ব্যবসা করলেন এবং প্রচুর লাভবান হয়ে কল্যাণ ও বরকতের সাথে মদীনায় ফিরে এলেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় :

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ. اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ. اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"যখম হওয়ার পর যারা আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। এদেরকে লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে রাযী তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল। এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো।" (সূরা আলে ইমরান : ১৭২-১৭৫)

উপকারিতা : এ আয়াতে মিথ্যা সংবাদ রটনাকারীকে আল্লাহ তা'আলা শয়তান বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী : اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ-তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রোপাগাণ্ডার প্রতিষেধক এবং প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সাধ্যমত জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর এবং حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। অর্থাৎ আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। আল্লাহ ক্ষমা করুন, এটা কখনই করণীয় নয় যে, তোমরাও তোমাদের দুশমনদের মত মিথ্যে সংবাদ প্রচার করা শুরু করো। মিথ্যের জবাব সত্য দ্বারা দাও। আল্লাহ মাফ করুন, তোমরাও যদি মিথ্যের

জবাবে মিথ্যেই বল, তা হলে লাভটা কি ? ইসলাম আপন শত্রুদের বেলায়ও মিথ্যে বলার অনুমতি দেয় না।

চতুর্থ হিজরীর বিভিন্ন ঘটনা

১. এ বছরের শা'বান মাসে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) জন্মগ্রহণ করেন।[১]

২. এ বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান ইবন আফফান (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ছয় বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।[২]

৩. এ বছরের শাওয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে বিয়ে করেন।[৩]

৪. এ বছরের রমযান মাসে নবী (সা) উম্মুল মাসাকীন হযরত যয়নব বিনতে খুযায়মা (রা)-কে বিয়ে করেন।[৪]

৫. এ বছরেই নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে ইয়াহূদীদের ভাষা পড়া ও লিখা শেখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, ওদের পাঠে আমি স্বস্তি পাই না।[৫]

৬. প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে পর্দার হুকুমও এ সালেই নাযিল হয়। অবশ্য কেউ বলেছেন, তৃতীয় হিজরীতে এবং কেউ বলেছেন পঞ্চম হিজরীতে এ হুকুম নাযিল হয়েছে।[৬]

পর্দার মাসআলা ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণিগণের আলোচনায় বিশ্লেষণ করা হবে। চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী এখানেই শেষ হলো। এক্ষণে পঞ্চম হিজরীর আলোচনা শুরু হচ্ছে।

দুমাতুল জন্দলের[৭] যুদ্ধ (রবিউল আউয়াল, ৫ হিজরী)

রবিউল আউয়াল মাসে নবী (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, দুমাতুল জন্দল থেকে লোকজন মদীনা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি এক হাজার সাহাবী সঙ্গে নিয়ে ২৫ রবিউল আউয়াল পঞ্চম হিজরী সনে দুমাতুল জন্দল অভিমুখে যাত্রা করেন। ওরা এ সংবাদ পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কাজেই কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই তিনি ২০ রবিউস সানী মদীনায় ফিরে আসেন (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৪; যারকানী, ২খ. পৃ. ৯৫)।

১. তাবারী, ৩খ. পৃ. ৩৯।

২ প্রাগুক্ত।

মুরাইসি[১] বা বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরীর ২০ শাবান, সোমবার)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছল যে, বনী মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবন আবূ যিরার অনেক সৈন্য-সামন্ত যোগাড় করে মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তিনি হযরত বারীদা ইবন হুসাইব সুলামী (রা)-কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রেরণ করেন। বারীদা (রা) ফিরে এসে খবর দেন যে, ঘটনা সত্য। তখন নবী (সা) সাহাবীগণকে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন।

সাহাবিগণ দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং ত্রিশটি ঘোড়া সঙ্গে নেন যার দশটি ছিল মুহাজিরগণের এবং বিশটি ছিল আনসার সাহাবীর। এ যুদ্ধে গনীমতের সম্পদের লোভে মুনাফিকদের একটি বিরাট অংশ শামিল হয়, যারা ইতোপূর্বে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেনি। নবী (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন এবং পবিত্র সহধর্মিণিগণের মধ্য থেকে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালমা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে ২রা শাবান সোমবার মুরাইসির পথে যাত্রা করেন।

দ্রুত অগ্রসর হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ তাদেরকে আক্রমণ করেন। ওরা তখন গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুকে[২] পানি পান করাচ্ছিল। আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম

১. মুরাইসি একটি পুষ্করিণী অথবা ঝর্ণার নাম, যেখানে বনী মুস্তালিকের সাথে মুকাবিলা হয়। বনী মুস্তালিক বনী খুজা সম্প্রদায়ের একটি শাখা। এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ইবন ইসহাক বলেন ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে, কেউ বলেন চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। কাতাদা, উরওয়া ইবন যুবায়র, ইবন শিহাব যুহরী বলেন, পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছে। মূসা ইবন উকবা, ইবন সা'দ, বায়হাকী ও হাকিম এ মতকেই গ্রহণ করেছেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী বলেন, এ বক্তব্যই সঠিক। কেননা হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে এবং বিশুদ্ধ রিওয়ায়াত ও উল্লেখযোগ্য হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর বনী কুরায়যার যুদ্ধকালে ইনতিকাল করেন যা ছিল পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। যদি মুরাইসির যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে এবং বনী কুরায়যার যুদ্ধের এক বছর পর ধরে নেয়া হয়, তা হলে এতে হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর অংশগ্রহণ কিভাবে প্রমাণিত হয় ? বিস্তারিতের জন্য দেখুন, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ২৩২; যারকানী, ২খ. পৃ. ৯৬।

২ এ রিওয়ায়াতটি সহীহ বুখারীর কিতাবুল ইতাক, ১খ. পৃ. ৩২৫-এ নাফি থেকে বর্ণিত। আর নাফি বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর এ হাদীস শুনিয়েছেন যিনি ঐ যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন, সুতরাং নিঃসন্দেহে এ হাদীস মরফূ ও মুত্তাসিল। আর যদি ধরেই নেয়া হয় যে, হাদীসটির সনদ নাফে পর্যন্ত পৌঁছে সমাপ্ত হয়েছে, তা হলেও মুহাদ্দিসগণের রায় অনুযায়ী হাদীসটি মুরসাল হিসেবে গণ্য হবে, যা পূর্ববর্তী জমহূর উলামার নিকট দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য, মুনকাতি' কখনই নয়। আল্লামা শিবলী তাঁর সীরাতুন-নবী ১খ. পৃ. ৩৮২-তে অহেতুক কেন এ উল্লেখযোগ্য হাদীসটিকে মুনকাতি' চিহ্নিত করে অগ্রহণযোগ্য বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, তা বোধগম্য নয়। সীরাতের রিওয়ায়াত এবং সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াতের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই, কেননা সীরাত গ্রন্থে শুধু এটুকু অতিরিক্ত জানা যায় যে, বনী মুস্তালিক তাঁর প্রস্তুতির সংবাদ অবহিত হয়েছিল, কিন্তু এটা জানতে পারেনি যে, তিনি অকস্মাৎ এসে এভাবে আক্রমণ করে বসবেন, যেমনটি সহীহ বুখারীর বর্ণনাদ্বারা জানা যায় যে, যখন তিনি আক্রমণ করেছিলেন তখন ওরা বেখবর ও গাফিল ছিল।

হলো না, ওদের দশ ব্যক্তি নিহত হলো, অবশিষ্ট পুরুষ-স্ত্রীলোক, শিশু-বৃদ্ধ সবাই বন্দী হলো। মাল-সম্পদ সবই কব্জা করা হলো। দু'হাজার উট, পাঁচ হাজার বকরি হস্তগত হলো, দু'শ ব্যক্তি বন্দী হলো। বন্দীদের মধ্যে বনী মুস্তালিকের সর্দার হারিস ইবন যিরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। গনীমতের মাল বন্টনকালে জুয়ায়রিয়া হযরত সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর ভাগে পড়ে। হযরত সাবিত তাকে মুকাতাবা হিসেবে ঘোষণা দেন। অর্থাৎ এত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা শর্তে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি অবগত আছেন যে, আমি জুয়ায়রিয়া, বনী মুস্তালিক অধিপতি হারিস ইবন যিরারের কন্য। আমার বন্দীত্বের কথাও আপনার অগোচরে নেই। বন্টনকালে আমি সাবিত ইবন কায়সের ভাগে পড়ি এবং তিনি আমাকে মুকাতাবা ঘোষণা করেন। মুক্তিপণের ব্যাপারে আমি আপনার সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছি।

রাসূল (সা) ইরশাদ করলেন, আমি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম পরামর্শ দিচ্ছি, যদি তুমি তা পসন্দ কর। তা হলো, তোমার পক্ষ থেকে পরিশোধযোগ্য মুক্তিপণ আমি আদায় করে দিচ্ছি এবং তুমি মুক্ত হওয়ার পর তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বললেন, আমি সম্মত আছি (আবূ দাঊদ, কিতাবুল ইতাক)।

হযরত জুয়ায়রিয়া তো প্রথম থেকেই ইচ্ছা করছিলেন যে, তিনি মুক্ত হবেন। ঘটনাক্রমে তার পিতা হারিসও নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি বনী মুস্তালিক গোত্রের সর্দার, আমার কন্যা দাসী হয়ে থাকতে পারে না। আপনি তাকে মুক্ত করে দিন। নবী (সা) বললেন, এটা উত্তম হবে না যে, আমি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা জুয়ায়রিয়ার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিই ? হারিস ফিরে গিয়ে জুয়ায়রিয়াকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমার মুক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তোমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত জুয়ায়রিয়া (রা) বললেন, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করছি (ইবন মান্দা বর্ণিত এ হাদীসটির সনদ সহীহ)।[১]

আবদুল্লাহ ইবন যিয়াদ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জুয়ায়রিয়ার পিতা হারিস ইবন আবূ যিরার অনেকগুলো উট নিয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় রওয়ানা হন যাতে মুক্তিপণ দিয়ে নিজ কন্যাকে মুক্ত করে আনতে পারেন। এগুলোর মধ্যে দু'টি উট উত্তম ও দর্শনীয় ছিল, পথিমধ্যে সে দু'টিকে কোন এক ঘাঁটিতে লুকিয়ে রাখে যে, ফিরে আসার সময় নিয়ে যাবে। মদীনা পৌঁছে নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হয়ে উটগুলো পেশ করে এবং বলে, ওহে মুহাম্মদ, আপনি আমার মেয়েকে গ্রেফতার করেছেন, এগুলো তার মুক্তিপণ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : ঐ উট দু'টি কোথায় যা

১. ইসাবা, ৪খ. পৃ. ২৬৫।

তুমি অমুক ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে এসেছ ? হারিস বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। কেননা ঐ উট দু'টির কথা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না; আল্লাহই আপনাকে এ ব্যাপারে অবহিত করেছেন [ইসাবা, হযরত হারিস ইবন যিরার (রা)-এর জীবন চরিত]।

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-কে মুক্ত করে নিজ স্ত্রীত্বে বরণ করে নেন। সাহাবায়ে কিরাম যখন এটা জানতে পেলেন, তখন বনী মুস্তালিকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এজন্যে যে, এরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্বশুর কুলের আত্মীয়-স্বজন। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক[1] (রা) বলেন, আমি জুয়ায়রিয়া অপেক্ষা আর কেন মহিলাকে আপন সম্প্রদায়ের জন্য উপকারী দেখিনি। যার বদৌলতে একদিনেই একশ' ঘর লোক মুক্ত হয়েছিল (আবূ দাঊদ, কিতাবুল ইতাক, ২খ. পৃ. ১৯২)।

এ সফরে যেহেতু মুনাফিকদের একটি দল শরীক হয়েছিল, সবক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ফিতনা-ফাসাদ এবং অপকর্ম অব্যাহত রাখল। যেমন একটি ঝর্ণার পাশে এক মুহাজির ও এক আনসারের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল। মুহাজির ব্যক্তিটি আনসারী ব্যক্তিকে একটা লাথি মেরে বসল। তখন মুহাজির 'হে মুহাজির সপ্রদায়' এবং আনসারী 'ওহে আনসার সপ্রদায়' বলে সাহায্যের জন্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ সপ্রদায়কে আহ্বান জানাল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কানে যখন এ আওয়াজ পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, জাহিলী যুগের মত কে ডাকাডাকি করছে ? লোকজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ এ মুহাজির এক আনসারকে লাথি মেরেছে। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ "এসব বাদ দাও, অবশ্যই এগুলো ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত কথাবার্তা।"

মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবন সলূলের কথা বলার সুযোগ জুটে গেল। আর বলল, কী, এরা (মুহাজিরগণ) আমাদের উপর শাসক বনে বসেছে ! আল্লাহর কসম, মদীনায় পৌঁছে সম্ভ্রান্তরা ইতরদেরকে বহিষ্কার করবে।[2] রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন হযরত উমর (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঐ মুনাফিকের গর্দান কেটে ফেলার জন্য আমাকে অনুমতি দিন। তিনি ইরশাদ করলেন : ছেড়ে দাও, লোকজন তো প্রকৃত অবস্থা বুঝবে না, সন্দেহ করে বসবে যে, মুহাম্মদ (সা) আপন সঙ্গীদেরও হত্যা করেন।

আবদুল্লাহ ইবন উবাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ছিল না; বরং কট্টর দুশমনদের মধ্যে ছিল। কিন্তু বাহ্যিক চেহারা-সূরতে তাঁর সাহাবাগণের অনুরূপ ছিল। মুখে সে তাঁর সাহাবী হওয়ার দাবিদার ছিল, এজন্যে তিনি তাকে হত্যা করার অনুমতি

১. স্বীয় পবিত্রতা ও পরিপূর্ণ সততার, সৎ অন্তঃকরণ, সৎ জিহ্বার প্রশংসা করা এটা সিদ্দীকী মর্যাদার দাবি। এজন্যে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর উল্লেখে সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক বলাটাই আমরা উপযুক্ত মনে করেছি।

২. সূরা মুনাফিকূন এ প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয়েছে।

দেননি। নিষ্ঠাবান সাহাবিগণের অনুরূপ বেশ ধারণ করায় তার জীবন রক্ষা পেল। নেককারগণের বাহ্যিক অনুকরণ[১] যদিও মুনাফিকী, তবুও তা বাতিল ও অহেতুক হয় না।

তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী : دَعُوْهَا فَانَّهَا مُنْتِنَةَ "এসব বাদ দাও, অবশ্যই এগুলো ঘৃণ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত কথাবার্তা।" এর দ্বারা বুঝা যায়, উত্তম কথাবার্তা পবিত্র ও সুগন্ধিযুক্ত হয়ে থাকে এবং খারাপ কথা কদর্য ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, যার সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ প্রকাশ্য অনুভূতি দিয়ে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও তাঁদের ওয়ারিসগণ অনুভব করতে পারেন।

وعن جابر رضى الله عنه قال كنا مع النبى ﷺ فارتقت ريح منتنة فقال رسول الله ﷺ اتدرون ما هذه الريح - هذه الريح الذين يغتابون المؤمنين ·

"হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমরা কি বুঝতে পারছ এটা কিসের দুর্গন্ধ ? এ দুর্গন্ধ ঐ সমস্ত মানুষের মুখ থেকে ছড়াচ্ছে, যারা মুসলমানদের নিন্দা করছে।" হাদীসটি ইমাম আহমদ এবং ইবন আবূ দুনিয়া রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদের সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩খ. পৃ. ৩০০, মিসরে মুদ্রিত)।

এ হাদীস দ্বারা প্রকাশ পেল যে, গীবতের দুর্গন্ধ নবী (সা) এবং যারা তাঁর পাশে ছিলেন, সবাই অনুভব করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ঘটনা এই ছিল যে, এটা কিসের দুর্গন্ধ তা তিনি বলে দেয়ার পর সবাই বুঝতে পেরেছিলেন।

হাফিয সুয়ূতী খাসাইসুল কুবরা গ্রন্থে باب ما وقع فى غزوة بنى مصطلق من الايات। শিরোনামের অধীনে[২] আবূ নুয়াইম সূত্রে নিম্নরূপ বাক্যযোগে উদ্ধৃত করেন :

عن جابر رضى الله عنه قال كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فهاجت ريح منتنه فقال النبى ﷺ ان ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المؤمنين فلذلك هاجت هذه الريح ·

---

১. এ ব্যাপারে মাসআলা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম, শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী জনাব কারী মুহাম্মদ তায়্যেব প্রণীত التشبيه فى الاسلام পুস্তকটি পর্যালোচনা করুন। এ বিষয়ে এ পুস্তকটি অতুলনীয়।

২. অর্থাৎ এ অধ্যায়টি হলো বনী মুস্তালিক যুদ্ধে কি কি মু'জিযা সংঘটিত হয়েছিল, সে প্রসঙ্গে। খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ২৩৬।

"হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা এক সফরে নবী করীম (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ করে একটা তীব্র দুর্গন্ধ অনুভূত হয়। সম্ভবত এরূপ দুর্গন্ধ কেউ কখনো অনুভবও করেনি, শোনেওনি। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন : তোমরা এহেন অনভিপ্রেত গন্ধে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। এ সময় কতিপয় মুনাফিক মুসলমানদের গীবত করছে, কাজেই এ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।" অর্থাৎ এটা ঈমানদারদের বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচারণা, কাজেই তা অধিক দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এবং একই ধরনের একটি ঘটনা মদীনার সন্নিকটে পৌঁছার পর সংঘটিত হয়। যেমনটি সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখন আমরা এ সফর (অর্থাৎ বনী মুস্তালিকের যুদ্ধ) থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মদীনার সন্নিকটে পৌঁছলাম, তখন হঠাৎ করেই তীব্র একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। নবী (সা) বললেন : এ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে কোন মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে। যখন আমরা মদীনায় পৌঁছলাম, তখন জানতে পেলাম, একটি দুষ্ট মুনাফিক মৃত্যুবরণ করেছে (খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৩৬)।

খুব সম্ভব ঐ মুনাফিকের দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ রূহ-এর কারণে ময়দানময় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল, যা নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম (রা) অনুভব করেছিলেন।

মানুষের জন্য এটা আবশ্যিক যে, যে সম্মানিত বুযর্গগণকে আল্লাহ তা'আলা কাফির ও মুনাফিকের পরিচিতি উন্মোচিত করে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং উত্তমরূপে বুঝে নেয় যে, যে সমস্ত অনুভূতিহীন ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত ব্যক্তি গোলাপ এবং পেশাবের সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারে না, তাদের অনুভূতির সুস্থতার সপক্ষে তা প্রমাণ হতে পারে না। তারা পবিত্র কালেমার খুশবু এবং অপবিত্র কালেমার দুর্গন্ধ কি করে অনুভব করবে ? অতএব বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, বুঝে নিন।

জামে তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ماجاء به "যখন বান্দা মিথ্যে বলে, তখন ফেরেশতাগণ মিথ্যে কথার দুর্গন্ধে এক মাইল দূরে চলে যান।" (জামে তিরমিযী, ৪খ. পৃ. ১৯)।

মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ, নাসাঈ এবং মুস্তাদরাকে হাকিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : "যে ব্যক্তি কোন মজলিস থেকে আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই (প্রস্থানের উদ্দেশ্যে) দাঁড়িয়ে গেল, সে যেন মৃত গর্দভের পাশ থেকে উঠে গেল।" ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ। হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত একটি হাদীসে কুদসীতে এসেছে : "বান্দা যখন কোন নেককাজের ইচ্ছা করে, তখন ফেরেশতা তার আমল করার পূর্বেই কেবল ইচ্ছা করার কারণেই একটি নেকী লিখে নেন। আর আমলটি করলে এর জন্য দশগুণ থেকে

সাতশ' গুণ পর্যন্ত লিখে নেন। আর বান্দা যখন বদকাজ করার ইচ্ছা করে, তখন কাজটি না করা পর্যন্ত কোন গুনাহ লিখেন না।" হাদীসের শেষ পর্যন্ত।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, সম্মানিত লিখক ফেরেশতাগণ মানুষের অন্তরের ইচ্ছা এবং মনের আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও কিছু কিছু খবর রাখেন। অন্যথায় তারা যদি নাই জানতেন, তাহলে শুধু নেককাজের ইচ্ছে করলেই নেকী কিভাবে লিখতেন ? আবূ ইমরান জূফী বলেন, ঐ সময় ফেরেশতাকে আহ্বান করে বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির আমলনামায় এ নেকী লিখে নাও। ফেরেশতা আরয করেন, আয় পরোয়ারদিগার ! সে তো এখনো এ আমলটি করেই নি। জবাবে বলা হয়, যদিও সে নেককাজটি করেনি, কিন্তু করার ইচ্ছে তো করেছে।

সুফিয়ান ইবন উবায়েদ (র) বলেন, যখন কোন বান্দা কোন নেককাজের ইচ্ছে করে, তখন তার অন্তর থেকে একটি পবিত্র সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। ফলে ফেরেশতা বুঝতে পারেন যে, এ ব্যক্তি নেককাজের ইচ্ছে করেছে। আর যখন খারাপ কাজের ইচ্ছে করে, তখন তার মধ্য থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। ফেরেশতা বুঝতে পারেন যে, এ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছে করেছে। হাফিয আসকালানী বলেন, এ বক্তব্যই তাবারী আবূ মি'শার মাদানী থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আর আমি হাফিয মুগালতাই কৃত শরাহ-এ এ মর্মে একটি মরফূ হাদীসও দেখেছি (ফাতহুল বারী, ১২খ. পৃ. ২৭৮, রিকাক অধ্যায়, পরিচ্ছেদ 'মান হুম বে হাসানাতিন আও বে সায়্যিআতিন')।

যেভাবে প্রতিটি আতরের পৃথক পৃথক সুগন্ধি হয়ে থাকে, আশ্চর্যের কিছু নেই যে, অনুরূপভাবে প্রতিটি নেককাজের পৃথক পৃথক সুগন্ধি হয়ে থাকে। আর আতর বিক্রেতা যেমন গন্ধ শুঁকেই চিনে ফেলে যে, এটা অমুক আতরের খুশবু, সম্ভবত ফেরেশতাগণও খুশবু শুঁকেই বুঝতে পারেন যে, এটা অমুক সৎকর্মের সুগন্ধি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভাল জানেন, তাঁর জ্ঞানই পরিপূর্ণ ও সুবিবেচনা প্রসূত।

আরিফে রব্বানী শায়খ আবদুল ওহাব শা'রানী বলেন :

كان وهب بن منبهة رحمة الله تعالى يقول لايموت عبد حتى يرى الملكين الكاتبين فان كان صحبهما بخير قالا له جزاك الله من صاحب خيرا فنعم الصاحب كنت فكم احضرتنا فى مجالس الخير ولم سممنا منك الروائح الطيبة حال طاعتك الخالصة - وان كان قد صحبهما بسؤ قالا له لا جزاك الله عنا من صاحب خيرانكم احضرتنا معك حال معاصيك وكم سممنا منك رائحة تتبيه المغترين ·

"ওহাব ইবন মুনাব্বিহ (র) বলতেন যে, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ না সে মৃত্যুর পূর্বেই লিখক ফেরেশতাদ্বয়কে দেখে। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যদি কিরামান কাতিবীনের সাথে সৎকাজের সাথে জীবন যাপন করে থাকে, তখন ফেরেশতা তাকে বলেন, 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিফল দিন, আল্লাহ তোমার মঙ্গল

করুন। তুমি বড়ই উত্তম সাথী ছিলে, তোমার কতই না মর্যাদা, তুমি কল্যাণকর মজলিসসমূহে আমাদেরকে সাথে রাখতে, কতবার তোমার একনিষ্ঠ ইবাদতের সুঘ্রাণ আমরা উপভোগ করেছি!' আর যদি ঐ ব্যক্তি 'কিরামান কাতিবীনে'র সাথে মন্দ জীবন যাপন করে থাকে, তা হলে ফেরেশতা তাকে ঐ সময় বলেন, 'আল্লাহ্ তোমাকে উত্তম প্রতিফল থেকে বঞ্চিত করুন, কতবার তোমার কারণে পাপের মজলিসসমূহে তোমার সাথে শরীক হতে হয়েছে, আর কতবার তোমার পাপের দুর্গন্ধ আমাদেরকে শুঁকতে হয়েছে !"

মুহাম্মদ ইবন ওয়াসে (র) আপন সঙ্গীদের বলতেন :

وكان محمد بن واسع رحمة الله تعالى يقول لاصحابه قد غرقنا فى الذنوب ولو احدا منكم يجد منى ريح الذنوب لما استطاع ان يجلس الى ٠

"আমি আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত আছি। তোমদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি যদি পাপের দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারত, তা হলে ঐ দুর্গন্ধের কারণে আমার কাছে কখনই বসত না।"

این سخن رانیست هرگز اختتام * بس سخن کوتاه بائد والسلام ٠

"এ সুখী জীবনই কখনো এভাবেই সমাপ্ত হবে না, এ সুখ শান্তিধাম থেকে অনেক দূরে।"

আশ্চর্যের বিষয় যে, আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই তো ইসলামের দুশমন ও মুনাফিকের সর্দার ছিল, অথচ তার পুত্র যাঁর নামও আবদুল্লাহ্ই ছিল, তিনি ছিলেন ইসলামের অনুগত ও আত্মোৎসর্গকারী, প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্র বান্দা, আর তার পিতা তো ছিল স্রেফ নামে আবদুল্লাহ্। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) যখন তার পিতাকে এ কথা বলতে শুনলেন যে, মদীনা পৌঁছে আমরা সম্মানিতরা মিলে অসম্মানিতদেরকে বের করে দেব, তখন তিনি আপন পিতাকে ধরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে ঐ পর্যন্ত কখনই মদীনায় যেতে দেব না, যে পর্যন্ত না তুমি স্বীকার করছ যে, তুমিই নিকৃষ্ট এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সুতরাং পিতা যখন এ ঘোষণা দিল, তখন পুত্র তাকে ছেড়ে দিলেন। হাফিয আসকালানী বলেন, এ ঘটনাটি ইবন ইসহাক এবং তাবারী উল্লেখ করেছেন। (ফাতহুল বারী, সূরা মুনাফিকূন)।

মদীনা পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) পবিত্র খিদমতে হাযির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান করতে পারেন। যদি অনুমতি হয় তা হলে আমি তাকে হত্যা করে আপনার খিদমতে উপস্থিত করি। পক্ষান্তরে যদি আপনি অপর কাউকে হত্যার আদেশ দেন আর আমি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পিতৃ হত্যার প্রতিশোধে হন্তাকে বধ

করি, তাহলে তো একজন মুসলমানকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হব। তিনি (সা) তাঁকে তাঁর পিতাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন এবং তার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

ইফকের ঘটনা

ইফকের ঘটনা অর্থাৎ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ এ সফর থেকে ফেরার পথেই ঘটেছিল, যা বিস্তারিতভাবে সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত আছে; তা নিম্নরূপ :

এ সফরে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নবী (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। যেহেতু পর্দার হুকুম নাযিল হয়েছিল, এজন্যে হাওদার মধ্যে সওয়ার করানো হতো, যখন অবতরণ করানো হতো, তখনো হাওদাসহ অবতরণ করানো হতো এবং হাওদায় পর্দা লটকানো থাকত। ফিরতি পথে মদীনার সন্নিকটে একস্থানে অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছিল। বাহিনীকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে বাহিনী থেকে দূরে গিয়েছিলেন; ফেরার পথে হারটি ছিঁড়ে যায়—যা অত্যন্ত মূল্যবান পাথরের তৈরি ছিল। পাথরগুলো একত্র করতে গিয়ে বিলম্ব হয়ে গেল। কাফেলা যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিল। হাওদার মুখেও পর্দা দেয়া ছিল। লোকেরা মনে করল যে, উম্মুল মু'মিনীন হাওদার মধ্যেই আছেন। কাজেই তারা হাওদা উটের পিঠে উঠিয়ে দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল। সে সময় মহিলারা সাধারণত হালকা পাতলা হতেন, আর বিশেষত হযরত আয়েশা (রা) অল্পবয়স্কা হওয়ার ফলে আরো বেশি হালকা ছিলেন। কাজেই হাওদা উঠানোর সময় এর ওজন সম্বন্ধে লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ দেখা দেয়নি। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার পর হার পেলেন। যখন হার পেলেন তখন সেনা কাফেলার যাত্রা বিরতির স্থলে ফিরে এলেন কিন্তু তখন সেখানে কেউ ছিল না, সবাই চলে গিয়েছিল। তখন তিনি এ চিন্তা করলেন যে, সামনের বিরতিস্থলে যখন আমাকে পাওয় যাবে না, তখন তো আমাকে খুঁজতে এখানেই লোক পাঠানো হবে। তাই সেখানেই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন।

হযরত সাফওয়ান ইবন মুআত্তাল সুলামী (রা), যিনি কাফেলার কোন জিনিস ফেলে যাওয়া হলে এর তত্ত্ব-তালাশের উদ্দেশ্যে পেছনে থাকতেন, তিনি এসে পড়লেন এবং দেখামাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে চিনে ফেললেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি হযরত আয়েশাকে দেখেছিলেন। দেখামাত্র তিনি 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। তাঁর আওয়াজে আয়েশা সিদ্দীকার নিদ্রা ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে তিনি চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন : والله ما كلمنى كلمه ولا سمعت والله ما منه كلمة غير استرجاعه "আল্লাহর কসম, সাফওয়ান আমার সাথে কোন কথাই বলেন নি এবং না তার মুখ থেকে ইন্না লিল্লাহ ছাড়া আর কোন বাক্য শুনেছি।"

[খুব সম্ভব হযরত সাফওয়ান (রা)-এর উচ্চস্বরে ইন্না লিল্লাহ পাঠ এজন্যে ছিল যে, যাতে উম্মুল মু'মিনীন জাগ্রত হন এবং সম্বোধন কিংবা বাক্যালাপের কোন সুযোগ না ঘটে; কাজেই তা ঘটেওনি]।

হযরত সাফওয়ান (রা) নিজের উট উম্মুল মু'মিনীনের কাছে বসিয়ে দেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, সাফওয়ান (রা) উট সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে সরে যান। উম্মুল মু'মিনীন আরোহণ করলে হযরত সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম ধরে চলতে থাকেন। অবশেষে সেনাদলের সাথে মিলিত হন। সময়টা ছিল ভর দুপুর। আবদুল্লাহ ইবন উবাই এবং মুনাফিকের দল দেখামাত্র ধ্বংস ও বরবাদ ইত্যাদি আবোল তাবোল বকতে শুরু করে দিল। মূলত যাদের ধ্বংস ও বরবাদ হওয়ার কথা ছিল, তারা ধ্বংস ও বরবাদ হলো।

মদীনা পৌঁছে হযরত আয়েশা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একমাস অসুস্থাবস্থায় কেটে গেল আর সুযোগ সন্ধানীরা এ সময় সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিল। তারা কুৎসা গাইতে থাকল কিন্তু হযরত আয়েশা এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাঁর প্রতি আগ্রহ ও অনুগ্রহে ঘাটতির কারণে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দেখা দিণ। যেমন আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে যেরূপ আবেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিত, তা যেন কমে গেছে ! ব্যাপার কি যে, তিনি ঘরে আসতেন এবং অপরকে আমার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে ফিরে যেতেন ! আমাকে জিজ্ঞেস করতেন না। তাঁর এ উদাসীনতা আমার কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিল। এক রাতে আমি এবং উম্মে মিসতাহ[১] প্রাকৃতিক প্রয়োজনে জঙ্গলের দিকে গমন করি। সে সময় আরবে এটা নিয়ম ছিল যে, দুর্গন্ধের কারণে কারো বাড়িতে পায়খানা বানানো হতো না। পথিমধ্যে উম্মে মিসতাহ তার পুত্র মিসতাহকে গালমন্দ করল। হযরত আয়েশা বললেন, এমন ব্যক্তিকে কেন খারাপ বলছ, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন ? উম্মে মিসতাহ বলল, ওহে সহজ সরল, তোমার তো ঘটনা সম্পর্কে খবর নেই। আয়েশা সিদ্দীকা বললেন, কি ঘটনা? উম্মে মিসতাহ সমুদয় ঘটনা খুলে বললেন। শোনামাত্র রোগ যন্ত্রণা আরো বৃদ্ধি পেল। সাঈদ ইবন মানসূর বর্ণিত একটি মুরসাল রিওয়ায়াতে আছে যে, শোনামাত্র কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গেল। মুজামে তাবারানীতে বিশুদ্ধ সনদে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আমি এ ঘটনা শুনলাম, তখন আমার এমন দুঃখ হলো যে, অজ্ঞাতসারে মনে ইচ্ছে হলো যে, নিজেকে কূপে বিসর্জন দেই (আবূ ইয়ালাও এটি বর্ণনা করেছেন)।

---

১. হযরত উম্মে মিসতাহ (রা)-এর মাতা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা ছিলেন এবং উম্মে মিসতাহ ছিলেন খালাতো বোন আর হযরত মিসতাহ (রা) ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ভাগ্নে।

প্রয়োজন পূরণ না করেই[১] আমি পথ থেকেই ফিরে এলাম। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর নিকট আমার মা-বাবার কাছে যাওয়ার অনুমতি প্রর্থনা করলাম, যাতে মা-বাবার মাধ্যমে ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে পারি। তিনি অনুমতিদান করলে আমি আমার মা-বাবার গৃহে আসি এবং আমার মাকে বললাম, মা, তোমার কি জানা আছে যে, লোকজন আমাকে নিয়ে কি বলাবলি করছে? মা বললেন, বাছা, তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না;[২] প্রচলিত নিয়ম এটাই যে, যে মহিলা খুব সুন্দরী ও উত্তম চরিত্রের এবং নিজ স্বামীর কাছে উচ্চ মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়, তখন ঝগড়াটে মহিলারা তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, মানুষের মধ্যে এমনটিও ঘটে! হিশামের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, আমার আব্বাও কি এ ব্যাপারটি জানেন? মা বললেন, হ্যাঁ। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, মা, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন, মানুষে এমনটা বলাবলি করছে আর তুমি আমাকে খবরটিও দাওনি। এ কথা বলতে আমার চোখভরে পানি এলো এবং গলার স্বর উচ্চ হলো।[৩] হযরত আবূ বকর (রা) দোতলায় কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন, আমার চিৎকার শুনে নিচে এসে আমার মাকে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মা বললেন, ঐ অপবাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। এ কথা শুনে আবূ বকর (রা)-এর চোখও অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল।

আর আমার শরীরে এমন কাঁপুনি শুরু হলো যে, আমার মা উম্মে রুমান ঘরের সমস্ত কাপড় নিয়ে এসে আমার গায়ে চাপিয়ে দিলেন। সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পানি বন্ধ হলো না। এভাবেই প্রভাত হয়ে গেল। ওহী নাযিলে যখন বিলম্ব হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা) এবং

১. এটা হিশাম ইবন উরওয়ার রিওয়ায়াত এবং সহীহ, যেমনটি অপরাপর সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়। আর কতিপয় বর্ণনায় এ ধারণা হয় যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ শেষে ফেরার পথে তিনি এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন, কিন্তু এটা সহীহ নয়; প্রথমটাই সহীহ। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৫৪ দেখুন।

২ সহীহ বুখারীর বাক্যাবলী এরূপ : قالت يا بنية هو فى عليك فوالله لقلما كانت امرأة قطه وضئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الاكثرن عليها শব্দটি একবচনে হয় ضرة যার অর্থ সতীন কিন্তু প্রকৃত আভিধানিক অর্থে ঐ স্ত্রীলোককে বলা হয় যে কোন স্ত্রীলোকের ক্ষতি ও লোকসানের কারণে পরিণত হয়। যেহেতু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-এর কোন সতীন অর্থাৎ নবী (সা)-এর অপরাপর সহধর্মিণিগণ হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারে ইশারা ইঙ্গিতেও কোন কথা বলেননি; যা শীঘ্রই আসছে, সেহেতু আমরা শব্দটির এ অর্থ করেছি, যে মহিলারা হিংসার বশবর্তী হয়ে অন্যের ক্ষতির কারণে পরিণত হয়, যেন সে সব স্ত্রীলোক হিংসার কারণে সতীনের মতই কাজ করল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন : যখন আমি এ অপবাদ সম্পর্কে অবহিত হলাম, তখন ইচ্ছা হলো যে, কুয়োয় পড়ে মরে যাই। তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯খ. পৃ. ২৪০।

হযরত উসামা (রা)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। يا رسول الله هم اهلك "হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তো আপনারই পরিবার, যা আপনার নবূওয়াতের মর্যাদা এবং রিসালাতের ইযযতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাঁর পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। আপনার সহধর্মিণিগণের পবিত্রতা তো সূর্য অপেক্ষা দেদীপ্যমান, এ ব্যাপারে ফয়সালা ও পরামর্শের কি প্রয়োজন ? আর যদি রাসূল আমাদের ধারণা সম্পর্কে জানতে চান, তা হলে বলব, وما نعـم الا خيـرا "আমরা তাঁর সম্পর্কে যতদূর জানি, উত্তম বৈ কিছু জানি না।" আপনার পরিবার ও পবিত্র সহধর্মিণিগণের মধ্যে আমরা কখনো ভাল এবং উত্তম, নেকী এবং কল্যাণ ছাড়া কিছুই দেখিনি।

হযরত আলী (ক) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দুঃখ, চিন্তা, শোক ও ব্যথায় ম্রিয়মান দেখে বললেন :

يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وان تسال الـجارية تصدقك ·

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ আপনাকে কোন সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করেননি, তিনি ছাড়া আরো অনেক স্ত্রীলোক আছেন, আপনি যদি আপনার গৃহের দাসীকে জিজ্ঞেস করেন, তবে সে সত্য কথা বলে দেবে।"[১]

অর্থাৎ আপনি নিরুপায় নন, তালাক দেয়ার অধিকার আপনার হাতে, কিন্তু প্রথমে ঘরের দাসীর কাছে অনুসন্ধান করুন। সে আপনার কাছে সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলবে (এ জন্যে যে, দাসী-বাঁদীরা পুরুষ অপেক্ষা পরিবারের অভ্যন্তরের খবর সম্পর্কে বেশি অবহিত থাকে)।

কোন কোন রিওয়ায়াত দ্বারা এ সন্দেহ হয় যে, হযরত আয়েশা (রা) এ পরামর্শের দরুন হযরত আলী (ক)-এর প্রতি বিষন্ন ছিলেন। কাজেই যদি ধরেও নেয়া হয় যে, এ বিষন্নতা ও অভিযোগও তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও পূর্ণ সুসম্পর্কের প্রমাণ। মনোমালিণ্য ও অভিযোগ আপনজনের মধ্যেই হয়ে থাকে, অপরের সাথে নয়। অধিকন্তু হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এ সময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল পর্বত প্রমাণ দুঃখ-বেদনা, এ অবস্থায় মানুষ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর এ অবস্থায় তুচ্ছ কোন কথাও বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত আলী (ক)

---

১. আল্লাহ মাফ করুন, হযরত আলী (ক)-এর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা এবং অমলিনতার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহও ছিল না, এ কথাগুলো কেবল রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সান্ত্বনাদানের জন্যই বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, চিন্তা ও বেদনার দরুন যাতে দ্রুত বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে না বসেন; বরং প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেন এবং প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখার পূর্বে কোন ধারণা আস্থার সাথে গ্রহণ না করেন। আর তাঁকে বাঁদী দাসীর নিকট অবস্থা জিজ্ঞেস করার পরামর্শ এজন্যে দেন যে, তার ব্যাপারে হযরত আলীর এ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি উম্মুল মু'মিনীনের পবিত্রতা ও নিষ্পতার ব্যাপারে তাঁর থেকে বেশি অবহিত। ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ২৮৭।

রাসূল (সা)-এর দুর্ভাবনা দেখে তাঁকে সান্ত্বনাদানের উদ্দেশ্যে এ কথাগুলো বলেছিলেন। প্রকাশ্যত তিনি নবীজীকে অগ্রাধিকার দেন এবং সুপ্তভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারটা এভাবে বলেন যাতে রাসূল (সা) তাঁর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন না হন। শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে পড়বে এবং আপাতত বারীদাকে জিজ্ঞেস করে নিন। তিনি বারীদাকে ডাকান। মিকসামের বর্ণনা অনুযায়ী বারীদাকে ডেকে নিয়ে তিনি বলেন :

اتشهدين انى رسول الله قالت نعم قال فانى سألك عن شىء فلا تكتمينه قال نعم قال هل رأيت من عائشة ما تكر هينه قالت لا ·

"তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল ? বারীদা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই, কিছু লুকোবে না কিন্তু (অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা ওহীর দ্বারা আমাকে জানিয়ে দেবেন)। বারীদা বললেন, হ্যাঁ, গোপন করব না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আয়েশার মধ্যে অপসন্দনীয় কিছু দেখেছ ? বারীদা বললেন, না।

বুখারীতে আছে, তিনি বারীদাকে বললেন : ای بریره هل رأیت من شیء یریبك "ওহে বারীদা, যদি তুমি বিন্দুমাত্রও এমন কিছু দেখে থাক যা তোমাকে সন্দেহ ও সংশয়ে ফেলেছে, তা হলে আমাকে বল।"

বারীদা বললেন :

لا والذى بعثك بالحق ان رأيت عليها امرا اغمصه عليها سوى انها جارية حديثة السمن تنام عن عجين اهلها فتاتى الداجن فتاكله ·

"ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আয়েশার মধ্যে কোন দোষ কিংবা ধর্তব্য কোন অপরাধ কখনো দেখিনি, এটা ছাড়া যে, তিনি এক স্বল্পবয়স্কা বালিকা, আটা খামির করে রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর বকরির বাচ্চা এসে তা খেয়ে যায়।"

অর্থাৎ তিনি এতটাই উদাসীন ও অসতর্ক যে, আটা এবং ডালের খবরও তাঁর নেই, তিনি পৃথিবীর এ চাতুর্যের খবর কিভাবে জানবেন (ইবনুল মুনীর, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাঁর চেহারা নূরান্বিত করুন, উপরোক্ত বাক্যের এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন)।

রাসূলুল্লাহ (সা) বারীদার এ জবাব শুনে মসজিদে যান এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি জ্ঞাপন করেন। এর পর আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের উল্লেখ করে বলেন :

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى اذ الا فى اهل بيتى فوالله ما عامت على اهلى الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الاخيرا ·

"হে মুসলিম সম্প্রদায়, কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়। আল্লাহ কসম, আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে নেকী এবং পবিত্রতা ছাড়া কিছুই দেখিনি। আর এ ব্যাপারে যে ব্যক্তির নাম বলা হচ্ছে, তার মধ্যেও আমি কল্যাণ ও উত্তম ছাড়া কিছু দেখিনি।"

এ কথা শুনে আওস গোত্রের সর্দার হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য উপস্থিত। ঐ ব্যক্তি যদি আমাদের আওস গোত্রের হয়, তাহলে আমি নিজেই তার মাথা কেটে ফেলব। আর যদি খাযরাজ গোত্রের হয়, তবে আপনি আদেশ করুন, আমরা পালন করব।

খাযরাজ সর্দার হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর এ ধারণা হলো যে, সা'দ ইবন মু'আয ইফকের ঘটনায় খাযরাজ গোত্রের প্রতি এ মর্মে ইঙ্গিত করছেন যে, ঐ ব্যক্তি খাযরাজ গোত্রভুক্ত, এতে তার উত্তেজনা এসে যায় (যেমন ইবন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তার বক্তব্য ছিল) :

হযরত সা'দ ইবন মু'আযকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আল্লাহর শপথ, তুমি তাকে কখনই হত্যা করতে পারবে না (অর্থাৎ যদি আমাদের সপ্রদায়ের হয়, তবে আমরা নিজেরাই তাকে হত্যা করার সৌভাগ্য অর্জন করব)।

সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর চাচাতো ভাই হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) দাঁড়ান এবং সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি ভুল বলছ, রাসূল (সা) যখন আমাদেরকে হত্যা করার আদেশ করবেন তখন আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করব, যদিও সে ব্যক্তি খাযরাজ গোত্রের কিংবা অপর কোন গোত্রের হোক, কেউ আমাদেরকে আটকাতে পারবে না। আর তুমি কি মুনাফিক, যে মুনাফিকের পক্ষ নিয়ে বাদানুবাদ করছ ? এভাবে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হতে থাকল, এমনকি উভয় সপ্রদায় পরস্পরে লড়াই বাঁধিয়ে দেয়ার উপক্রম হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন এবং লোকজনকে চুপ করালেন। হযরত আয়েশা বলেন, এদিনও পুরোটাই আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে গেল, এক মুহূর্তের জন্য অশ্রু বন্ধ হয়নি। রাতটাও এভাবেই কাটল। আমার অবস্থা দেখে আমার পিতামাতার ধারণা ছিল যে, এখনি তার কলিজা ফেটে যাবে। যখন প্রভাত হলো, তাঁরা দু'জনই আমার কাছে এসে বসলেন আর আমি কেঁদেই চলছিলাম। ইত্যবসরে এক আনসারী মহিলা এলো এবং সেও আমার সাথে কাঁদতে শুরু করল। এ মুহূর্তে রাসূল (সা) আগমন করলেন এবং সালাম করে আমার পাশে বসে পড়লেন। ঐ ঘটনার পর আর কোন সময়ই তিনি আমার পাশে এসে বসেন নি। ওহীর অপেক্ষায় একমাস কেটে গিয়েছিল। বসে তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করলেন এর পর বললেন :

اما بعد يا عائشة فان بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه ٠

"হে আয়েশা, আমার কাছে তোমার ব্যাপারে এমন এমন সংবাদ পৌঁছেছে। যদি তুমি নির্দোষ হও, তাহলে আল্লাহ অনতিবিলম্বে তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন আর যদি তুমি কোন গুনাগ করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার কর। কেননা বান্দা যখন গুনাহকে স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।"

হযরত আয়েশা বলেন, যখন তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন, তৎক্ষণাৎ আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি একফোঁটাও রইল না। আমি আমার পিতাকে বললাম, আমার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথার জবাব দিন। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে, কি জবাব দেব। এরপর আমি আমার মাকে বললাম। তিনিও একই জবাব দিলেন। এরপর আমি নিজেই জবাব দিলাম, আল্লাহ তা'আলা ভাল করেই জানেন যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, কিন্তু এ কথা তোমাদের অন্তরে এ কারণে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, যদি আমি বলি, আমি নির্দোষ এবং আল্লাহ ভাল করেই জানেন যে, আমি নির্দোষ, তা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করবে না, আর যদি আমি স্বীকার করি, যদিও আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করবে। এরপর কেঁদে ফেলে বললাম, والله لا اتوب مما ذكروا ابدا "আল্লাহর কসম, যে বিষয়ে এরা আমাকে সম্পৃক্ত করছে, সে ব্যাপারে আমি কখনো তাওবা করব না। কাজেই আমি সে কথাই বলি, যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা[১] বলেছিলেন فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ আর এ কথা বলেই বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর ঐ সময় আমার অন্তরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন, কিন্তু এ বিশ্বাস ও ধারণা ছিল না যে, আমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করবেন যা সব সময় তিলাওয়াত ও পাঠ করা হবে।

এক রিওয়ায়াতে আছে, আমার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হবে, যা মসজিদে এবং নামাযে পাঠ করা হবে। তবে হ্যাঁ, এ আশা ছিল যে, আল্লাহ স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার নির্দোষ থাকার কথা বলে দেবেন এবং এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অপবাদ থেকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।

পাক-পবিত্রতায় উম্মতে মুহাম্মদীর মরিয়ম (আ) নবী (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর নির্দোষিতার

১. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, ঐ সময় তাঁর হযরত ইয়াকূব (আ)-এর নামও স্মরণে আসেনি।

ব্যাপারে পবিত্র আয়াতের অবতরণ; তাঁর পিতা, তাঁর মাতা এবং যারা তাঁর নির্দোষ ও পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন তাঁদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, আর তাদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ যারা তাঁর নিষ্পাপ ও পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে,[১] আমীন, সুম্মা আমীন।

রাসূলুল্লাহ (সা) এখনো তাঁর জায়গা থেকে উঠেনও নি, ইত্যবসরে আল্লাহর ওহী নাযিলের চিহ্ন দেখা গেল। ফলে প্রচন্ড শীতের মধ্যেও পবিত্র কপাল থেকে মুক্তাদানার মত ঘাম ঝরতে শুরু করল। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে :

فاما انافو الله ما نزعت قد عرفت انى بريئة وان الله غير ظالمى وما ابواى غما سرى عن رسول الله ﷺ حتى ظننت لتخرجن انفسهما فرقا من ان يأتى من الله تحقيق ما يقول الناس ·

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যে সময় তাঁর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হয়, আল্লাহর কসম, আমি মোটেও ঘাবড়াইনি। কেননা আমি জানতাম যে, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি যুলুম করবেন না। কিন্তু ভয়ে আমার মা-বাবার অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, আমার সন্দেহ হচ্ছিল, তাঁদের প্রাণ বেরিয়ে না যায়! তাঁদের সন্দেহ হচ্ছিল, পাছে লোকজন যা বলছে, সে মর্মে ওহী নাযিল না হয়ে যায়।

আবূ বকর (রা)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি কখনো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে তাকাচ্ছেন আর কখনো আমার দিকে। যখন রাসূলুল্লাহর দিকে তাকাচ্ছিলেন তখন এ সন্দেহ হচ্ছিল যে, না জানি আসমান থেকে কি হুকুম নাযিল হয়ে যায় যা কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে না। আর যখন আমার দিকে দেখছিলেন, তখন আমার নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভাব দেখে তাঁর মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হতো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) ছাড়া ঘরের আর সবাই আশা-নিরাশার দোলায় দুলছিল। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল সমাপ্ত হলো এবং নবীজীর পবিত্র চেহারায় আনন্দ ও খুশির আভা ফুটে উঠল। তিনি মুচকি হাসছিলেন এবং কপাল থেকে ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে হযরত আয়েশার দিকে মনোনিবেশ করলেন। প্রথম যে বাক্য তাঁর পবিত্র মুখ থেকে বের হল, তা হল : ابشرى يا عائشة قد انزل الله براءتك "তোমার জন্য সুসংবাদ হে আয়েশা, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমার নির্দোষ হওয়ার বিষয় নাযিল করেছেন।"[২]

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট আছেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি, তাঁর মাতার প্রতি, তাঁর পিতার প্রতি এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা তাঁর পবিত্রতা ও নির্দোষ হওয়ার প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন। আর অভিশাপ ঐ সমস্ত ব্যক্তির প্রতি, যারা তাঁর নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কিংবা ইতস্তত করে। আমীন।

২ এ বাক্যাবলী সহীহ বুখারীর পৃ. ৭০০-তে বর্ণিত আছে। আর বুখারীর অপর রিওয়ায়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী হলো ঃ يا عائشة اما الله عز وجل برأك

আমার মাতা বললেন, হে আয়েশা, উঠো এবং রাসূলুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, যে আল্লাহ্ আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করে ওহী নাযিল করেছেন, তিনি ছাড়া আমি আর কারো শুকরিয়া আদায় করব না।

দ্রষ্টব্য : হযরত আয়েশা সিদ্দীকার দুঃখ-বেদনার কারণে এ অবস্থা ছিল, যেমন সিদ্দীকা হযরত মরিয়ম (আ)-এর ছিল يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا (হায়, এর পূর্বে যদি আমি মরে যেতাম ! লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতাম!) এহেন নৈরাশ্যের অবস্থায় যখন কুরআন মজীদের দশটি আয়াত تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ উহা পরিপূর্ণ দশ) হযরত আয়েশার পূর্ণ নির্দোষ হওয়া ও পবিত্রতার বর্ণনায় অবতীর্ণ হলো, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার অন্তরে এমন উদ্বেল নিয়ন্ত্রণহীনতার সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু তাঁর দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে পড়ল। অন্যথায় এ কল্যাণকর পুরস্কার এবং আসমানী ওহী সব কিছুই মহানবী (সা)-এর সহধর্মিণী হওয়ার ওসীলা এবং মর্যাদার কারণেই হয়েছিল, আর ওসীলা ও মাধ্যমের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার ঐ উদ্বেলিত অন্তরে নবীর শোকর করতে অস্বীকৃতি ছিল তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ ভালবাসার অবস্থা। আর সর্বোচ্চ ভালবাসার অবস্থা এই হয়ে থাকে যে, অন্তর যার সাথে একাকার হয়ে মিশে যায়, মুখ তার বিপরীতটাই প্রকাশ করে। বাহ্যিকভাবে বিরূপ ও বেপরোয়া ভাব প্রকাশ পায় কিন্তু অন্তর ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে থাকে। বাইরে এক অবস্থা থাকে আর অন্তরে শত-সহস্র ভালবাসা নিহিত ছিল।

এরপর নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেন যে, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেছেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاۤءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - لَوْلاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ - لَوْلاَ جَاۤءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَاۤءِ فَاُولٰۤئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ - وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ - وَلَوْ لاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ - يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ - وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ

الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ - وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ .

"যারা এই অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল; একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর; ওদের প্রত্যেকের জন্য আছে ওদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি।[১] যখন তারা এটা শুনল, তখন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণ আপন লোকদের সম্পর্কে কেন ভাল ধারণা করল না এবং বলল না, এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত, যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ জ্ঞান[২] করছিলে, যদিও আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়। এবং তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনো অনুরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই অব্যাহতি পেতে না এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।" (সূরা নূর : ১১-২০)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নির্দোষিতার আয়াত তিলাওয়াত সমাপ্ত করলেন এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর কম্পিত অন্তরে পবিত্রতা-নিষ্কলুষতা, নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষ্য শুনলেন, তখন উঠলেন এবং আপন নিষ্পাপ নিরপরাধ কন্যার কপালে চুম্বন করলেন। কন্যা বাবাকে বললেন, الا عذرتنى "বাবা, কেন তুমি প্রথম থেকেই আমাকে নির্দোষ ও নিরপরাধ মনে করোনি?"

---

১. অর্থাৎ হে আবূ বকরের পরিবার, তোমরা নিজেদেরকে মন্দ বলো না, কেননা এটা দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের জন্য উত্তম, কিয়ামতের দিনে তোমাদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ থাকবে।

২. কোন ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে কারো মুখ থেকে এরূপ বাক্য বের হওয়া যা সত্য নয়, এটা খুবই গুনাহর ব্যাপার। বিশেষত নবীয়ে উম্মী খাতিমুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীনের সহধর্মিণী এবং মুসলমানদের রূহানী মাতার ব্যাপারে এ ধরনের কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা কঠিনতম গুনাহ। আল্লাহ তা'আলার শান তাঁর প্রিয় নবীর সহধর্মিণীর ব্যাপারে এ অপবাদ কেন সহ্য করবেন? তাফসীরে ইবন কাসীর।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) (সত্যবাদিতা ও সরলতা যাঁর রগ-রেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যিনি সত্য ও সারল্যের বিশাল পাহাড় সদৃশ, বড় থেকে বড় ঘটনা এবং কঠিন থেকে কঠিনতম দুঃখ-বেদনা যাঁকে চুল পরিমাণও সত্য থেকে সরাতে সক্ষম ছিল না) এ সময় কন্যাকে এ জবাব দিয়েছিলেন যা অন্তরের ফলকে উৎকীর্ণ করে রাখার মত। তা ছিল : اَىُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِىْ وَاَىُّ اَرْضٍ تُقِلُّنِىْ اِذَا قُلْتُ مَالَمْ اَعْلَمُ "কোন আসমান আমাকে ছায়াদান করবে আর কোন যমীন আমাকে উঠাবে এবং স্থির রাখবে যখন আমি মুখ দিয়ে ঐ কথা বলব, যে বিষয়ে আমি জানি না।" হাফিয আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৬-তে এ আসার তাবারী ও আবূ আওয়ানার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা আলূসী বলেন, বাযযার সহীহ সনদে এ আসারটি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।–রূহুল মা'আনী, ১৮খ. পৃ. ১০৯, নতুন সংস্করণ।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর গৃহ থেকে মসজিদে গেলেন এবং সাধারণ জনতার উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন ও হযরত আয়েশা (রা)-এর নির্দোষিতার ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াত সবার সামনে তিলাওয়াত করলেন।

এ ফিতনার উদ্ভাবক তো ছিল প্রকৃতপক্ষে মুনাফিকগণ, আল্লাহর প্রশংসা, কোন মুসলমান এতে শরীক ছিলেন না; মাত্র দু'তিনজন মুসলমান সরল বিশ্বাসী ও আত্মভোলা হওয়ার কারণে মুনাফিকদের এ ধোঁকায় পড়ে যান, যাদের নাম নিম্নেপ:

মিসতাহ ইবন উসাসা, হাসসান ইবন সাবিত, হামনা বিনতে জাহাশ (রা), তাঁদের প্রতি মিথা অপবাদ আরোপের শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগ করা হয়; প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। আর তাঁরা নিজেদের ভুলের দরুন তাওবা করে নেন। আবদুল্লাহ ইবন উবাইয়ের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ বক্তব্য এই যে, তাকে শাস্তি দেয়া হয়নি, এজন্যে যে, সে ছিল মুনাফিক। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে জানা যায়, তাকে শরীয়তী শাস্তি দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

মিসতাহ ছিলেন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খালাত ভাই, দারিদ্র্য ও অনটনের কারণে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁকে অর্থ সাহায্য করতেন। এ ঘটনায় মিসতাহের অংশগ্রহণের দরুন আবূ বকর (রা) কসম করেন যে, আমি আর কখনোই মিসতাহকে সাহায্য করব না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের

দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা নূর : ২২)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ আয়াত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে শোনালেন, তখন তিনি বলতে লাগলেন : بلى والله انى لاحب ان يغفر الله لى "কেন নয়, আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই চাই যে, আল্লাহ্ আমার ভুল-ভ্রান্তি মাফ করে দিন।" অতঃপর তিনি মিসতাহকে নিয়মমাফিক খরচ দেয়া শুরু করলেন। আর শপথ করলেন, মিসতাহকে অর্থ সাহায্য দান কখনো বন্ধ করবেন না। মু'জামে তাবারানীতে আছে, পূর্বে যা দিতেন এক্ষণে তার দ্বিগুণ দেয়া শুরু করলেন।

এতদসমুদয় বিস্তারিতভাবে সহীহ বুখারী এবং ফাতহুল বারী-তে সূরা নূরে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে। হাফিয আসকালানী কিতাবুত-তাফসীরে এ হাদীসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। ইফকের ঘটনার শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যত ঘটনা লিখা হয়েছে, এর সবটুকুই সহীহ বুখারী এবং ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে।

দ্রষ্টব্য : এ আয়াত অর্থাৎ ... ... وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে সতর্ক করা, এজন্যে যে, সিদ্দীকের অবস্থান এবং পূর্ণতার বৃত্ত থেকে যেন তাঁর কদম বাইরে না পড়ে। ভুল ও অপরাধের কারণে যদিও হযরত মিসতাহের ভাতা বন্ধ করা বৈধ ছিল, কিন্তু সিদ্দীকিয়তের চাহিদা তো এটাই যে, মন্দের প্রতিদান ভালোর দ্বারা দেয়া হোক। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ ইঙ্গিত বুঝে ফেলেছিলেন, কাজেই মিসতাহের ভাতা পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ করে দেন। মিসতাহর দ্বারা যদিও ভ্রান্তি ও পদস্খলন ঘটেছিল, যে কেবল শোনা কথায় বিশ্বাস করে বসেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি বদরী সাহাবীদের একজন ছিলেন, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল : اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "তোমরা যা ইচ্ছা হয়, কর, তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।" এজন্যে আল্লাহ তা'আলা বদরী সাহাবী হওয়ার কারণে তার জন্য সুপারিশ করেছিলেন যে, ওহে আবূ বকর, তুমি তো কল্যাণ লাভকারীদের মধ্যে আছো আর মিসতাহ বদরী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তুমি তার ভাতা কমিয়ে দিও না এবং মিসতাহ যে ভুল করেছে, তুমি তা ক্ষমা করে দিও, আল্লাহ তা'আলা তোমার ভুলগুলো ক্ষমা করে দেবেন।

ফায়দা : এ আয়াত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মর্যাদার প্রকাশ্য দলীল। এর চেয়ে বেশি আর কি হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে মর্যাদাবান (أُولُوا الْفَضْلِ) বলেছেন।

এ আয়াত তো হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) প্রসঙ্গে ছিল, এরপর আবার কয়েকটি আয়াত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষ প্রমাণ প্রসঙ্গে এসেছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ - يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - يَوْمَئِذٍ يُّوَفِّيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ - اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ .

"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি। যে দিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশক। দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।" সূরা নূর : ২৩-২৬

অন্যান্য ফায়দাসমূহ

১. এ আয়াত দ্বারা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নির্দোষ ও পবিত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর জন্য ক্ষমা ও পবিত্র জীবিকা প্রদানের ওয়াদা করেছেন, যদ্বারা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ক্ষমা ঘোষণা অকাট্য ও নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমার ধারণা ছিল যে, আমার নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি নবী (সা)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে দেখানো হবে, কিন্তু এ ধারণা ও কল্পনা ছিল না যে, আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল করীমের আয়াত নাযিল হবে- যা সব সময় তিলাওয়াত করা হতে থাকবে। অর্থাৎ এ ধারণা ও কল্পনা ছিল না যে, কিয়ামত পর্যন্ত আমার সতীত্ব ও পবিত্রতার বিষয়টি মসজিদসমূহে, মিহরাবসমূহে, মিম্বরসমূহে এবং নির্জন গৃহসমূহে ঘোষিত হতে থাকবে। দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে আমার নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে, আর দশ সংখ্যাটি পূর্ণ সংখ্যা تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর ন্যায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতা অতুলনীয় এবং পূর্ণতায় পৌঁছেছে এবং এ পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রতার ঘোষণাও পরিপূর্ণরূপে হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কারণ এটাই যে, যখন মিসতাহ-এর মাতা মিসতাহকে ভালমন্দ বলছিলেন, তখন আয়েশা সিদ্দীখা মিসতাহর মাতাকে বলেছিলেন, মিসতাহকে মন্দ বলো না, কেননা মিসতাহ প্রথম সারির মুহাজির এবং বদরী সাহাবিগণের অন্তর্ভুক্ত।

২. ...... وَلاَ يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ ... আয়াতটি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ফযীলতের পরিস্কার ও উজ্জ্বল প্রমাণ। আল্লাহ্ যাঁকে সাহিবে ফযল (মর্যাদাবান) বলেছেন, তাঁর মর্যাদা ও পূর্ণতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? আল্লামা রাযী (কু. সি.) তাফসীরে কাবীরে চৌদ্দটি পদ্ধতিতে এ আয়াতের মাধ্যমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর মর্যাদা প্রমাণ করেছেন। সম্মানিত ইলম অন্বেষণকারীগণ তাফসীরে কাবীর দেখে নিন।

৩. ইফকের ঘটনা দ্বারা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর পরিপূর্ণ সংযম, চূড়ান্ত পর্যায়ের পরহেযগারীর খবর পাওয়া যায়। এ ঘটনা এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছিল, কিন্তু এ সময়ে তিনি মেয়ের সহায়তা দানের মত একটি কথাও তাঁর মুখ ফুটে বেরোয়নি; দুঃখ ও বেদনায় কেবল একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মুখ থেকে এ কথা বেরিয়েছিল :

والله ما قيل لنا فى الجاهلية فكيف بعد ما اعزنا الله بالاسلام ·

"আল্লাহর কসম, আমাদের ব্যাপারে এ ধরনের কথা তো জাহিলী যুগেও বলা হয়নি; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন ইসলাম দ্বারা আমাদেরকে ইযযত দান করলেন, তার পরেও এটা কি করে সম্ভব ?" হযরত ইবন উমর (রা) সূত্রে তাবারানী এটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৯)

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, এ ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে বালা ও পরীক্ষা ছিল। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, যাতে করে মু'মিন ও নিষ্ঠাবানের ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা এবং মুনাফিকের নিফাক সুস্পষ্ট ও উন্মোচিত হয়ে যায়। ফলে মু'মিন ও সত্যবাদীর ঈমান ও অবিচলতা এবং মুনাফিকের নিফাক ও অপকর্মে সংযোজন ও বৃদ্ধি ঘটবে। অধিকন্তু যাতে এ ব্যাপারটি প্রকাশ ও উণ্ঘোচিত যায় যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আহলে বায়তের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে আর কে কুধারণা পোষণ করে। নবী (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণিগণের শানে কুধারণা পোষণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে কুধারণা পোষণ করা যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সম্মানিত, সৃষ্টির সেরা, পৃথিবীর জন্য মনোনীত ব্যক্তিকে আল্লাহ ব্যভিচারী ও অসৎ স্ত্রী দিয়েছেন। এ থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহান।

আর যাতে আল্লাহ সম্মানিত রাসূল এবং তাঁর রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেন। এজন্যে তাঁর সহধর্মিণীগণের সচ্চরিত্রতা ও পবিত্রতার সাক্ষ্য তাঁর মুখে প্রকাশ করান নি; বরং মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের অভিভাবক ও যিম্মাদার হয়েছেন এবং নিজের পবিত্র কালামের মাধ্যমে তাঁর নিষ্কলুষতার সনদ অবতীর্ণ করেছেন–যা কিয়ামত পর্যন্ত মাহফিলসমূহে, মজলিসসমূহে, মসজিদসমূহে, খুতবা এবং নামাযে পঠিত হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ তা'আলার অনুপম সম্ভ্রমবোধ এটা সমর্থন করতে পারেনি যে, তাঁর প্রেরিত পূত পবিত্র নবী ও রাসূলের পবিত্র সহধর্মিণিগণের শানে কোন মুনাফিক এবং পাপীষ্ঠ কোন অপবিত্র কথা মুখ থেকে বের করে, এজন্যে প্রায় কুড়িটি আয়াত নাযিল করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও পবিত্র সহধর্মিণিগণের নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষতা, পূত-পবিত্রতার উপর কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁদের পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতায় সন্দেহ পোষণকারীদের উপর এ ধরনের ধিক্কার ও লাঞ্ছনা আরোপ করেছেন যা মূর্তিপূজকদের প্রতিও করেননি। এ জন্যে আল্লাহ-প্রেমিক আলিমগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি পবিত্র নবী-সহধর্মিণিগণের ব্যাপারে একটি বাক্যও মুখে উচ্চারণ করবে, সে মুনাফিক।

আর ওহী নাযিলে যে একমাস বিলম্ব হয়েছে, এতে এ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে যে, যাতে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার ইবাদতের স্তর পূর্ণতালাভ করে, এভাবে যে, যখন অত্যাচারিতের কান্নাকাটি, অসহায়ের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের দরবারে দরিদ্র সুলভ আহাজারি, নিঃস্ব সুলভ ফরিয়াদ ও আত্মনিবেদন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কোন প্রকার আশা অবশিষ্ট না থাকে, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের সম্পর্কে সুধারণা পোষণকারীদের আত্মা আল্লাহর ওহী নাযিলের অপেক্ষায় ডাঙ্গায় উঠানো মাছের মত তড়পাতে থাকে, সে সময় আল্লাহ তা'আলা ওহীরূপ বারি বর্ষণ দ্বারা মহব্বতকারী, নিষ্ঠাবান বান্দাদের মুর্দা দিলে প্রাণের সঞ্চার করেন এবং সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-কে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার মূল্যবান উপঢৌকন দানে ধন্য করেন।

হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারী-তে ইফকের হাদীসের উপকারিতা, এর অন্তর্নিহিত শিক্ষা এবং সে সব মাসআলা ও হুকুম ব্যাখ্যাসহ সবিস্তারে লিখেছেন, যা এ হাদীস থেকে উদ্ভাবন করা যায়, এখানে তা উদ্ধৃত করার অবকাশ নেই। কাজেই সম্মানিত ইলম অন্বেষণকারীগণ ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৩৬৭ থেকে ৩৭১ পর্যন্ত দেখে নিন।

৪. এ আয়াত ও রিওয়ায়াতসমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অদৃশ্যের সংবাদ আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। এ জন্যেই নবী (সা) এক মাসব্যাপী পূর্ণ সন্দেহে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অবহিত না করা পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা জানেন নি।

৫. এ হাদীস দ্বারা এও জানা গেল যে, উৎসাহ এবং ক্রোধের সময় সত্যের মুকাবিলায় গোত্র ও সম্প্রদায়ের সাহায্য ও পক্ষপাতিত্ব করা জায়েয নেই; যেমন হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা) হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে বলেছিলেন, তুমি মুনাফিক যে, মুনাফিকের পক্ষপাতিত্ব করছ।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এবং অপরাপর পবিত্র নবী-সহধর্মিণিগণের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের ব্যাপারে বিধান

কুরআন মজীদের ঐ আয়াত নাযিল হওয়ার পর যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক নবীশ্রেষ্ঠ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী مبرأه من السماء

এর[1] প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, উম্মতের সর্বসম্মত রায়ে সে কাফির ও মুরতাদ। কেননা সে কুরআনুল করীমের প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপকারী ও এর অস্বীকারকারী। যেভাবে হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা বিনতে ইমরান (আ)-এর পবিত্রতা ও নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা কুফরী, অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে উম্মে রুমান (রা)-এর পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করাও কুফরী এবং যেভাবে ইয়াহূদী-অইয়াহূদী হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের দরুন অভিশপ্ত ও আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়েছে, অনুরূপভাবে রাফিযীরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বিনতে সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের কারণে অভিশপ্ত ও আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হয়েছে। হযরত মরিয়ম সিদ্দীকা (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা ঈসা (আ)-এর উম্মতের মধ্যে ইয়াহূদী ছিল আর আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপকারীরা উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যকার ইয়াহূদী।

কোন আহলে বায়তের ইমামের সামনে জনৈক রাফিযী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে কটাক্ষ করলে তৎক্ষণাৎ ইমাম তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং গোলামকে ডেকে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। অতঃপর বলেন :

هذا رجل طعن على النبى ﷺ قال الله تعالى اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ - فان كانت عائشة خبيشة فالنبى ﷺ خبيث وكهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه وانا حاضر - (رواه الالكائ)

"এ ব্যক্তি যখন আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করল, তখন সে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করল, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য, দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য। লোকে যা বলে এরা তা থেকে পবিত্র; এদের জন্য আছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। কাজেই আল্লাহ মাফ করুন, আয়েশা সিদ্দীকা দুশ্চরিত্রা হলে রাসূলুল্লাহ (সা)-ও দুশ্চরিত্র হওয়া আবশ্যিক হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ)। আর যে খবীস রাসূলুল্লাহ (সা)-কে খবীস বলে, সে নিঃসন্দেহে কাফির এবং হত্যাযোগ্য।" এ কথা বলার পর ঐ রাফিযীকে হত্যা করা হয়। (বর্ণনাকারী বলেন) ঐ রাফিযীকে হত্যা করার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম।

---

১. হযরত মাসরূক (র)-এর এ অভ্যেস ছিল যে, যখন হযরত আয়েশা (রা) থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন এরূপ বলতেন : صديقة بنت صديق حبيبة رسول الله ﷺ مبرأه من السماء ـ

অনুরূপভাবে হযরত হাসান ইবন যায়দ (র)-এর সামনে ইরাকের জনৈক ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকার শানে আপত্তিকর কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাসান ইবন যায়দ উঠে একটি লাঠি দিয়ে তার মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মগজ বেরিয়ে গেল এবং সে মারা গেল। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হাফিয ইবন তাইমিয়া (র) প্রণীত الصارم المسلول على شاتم الرسول কিতাবে।

আর একইভাবে নবী-সহধর্মিণিগণের অন্য কারো ব্যাপারে কুধারণাকারীও কাফির এবং হত্যাযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক মিম্বরে প্রদত্ত খুতবায় বলা হয়েছে :

يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى اذاه فى اهل بيتى ·

"হে মুসলিম সম্প্রদায়! কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়।"

এর দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি আহলে বায়তের যে কোন সদস্যের ব্যাপারে, চাই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হোন বা অপর কোন নবী-সহধর্মিণী হোন, এ ধরনের কোন নাপাক কথা মুখ থেকে বের করে, সে নবী (সা)-কে দুঃখ দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে দুঃখ দেয়, সে নিঃসন্দেহে কাফির। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا - وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا - يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا - مَّلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ·

"যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ্ তো তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। যারা মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পীড়া দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য, যা তারা করেনি, তারা অপবাদের ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারিগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে

আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রবল করব; এর পর এ নগরীতে ওরা স্বল্প সময়ই থাকবে অভিশপ্ত হয়ে; ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে।" (সূরা আহযাব : ৫৭-৬১)। বিস্তারিতের জন্য صارم المسلول على شاتم الرسول কিতাবের ৪১ থেকে ৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।

যেমন তাঁর এ কথা, "কে আছো যে আমাকে ঐ ব্যক্তির মুকাবিলায় সাহায্য করবে, যে আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে দুঃখ দেয়।" বলার সাথে সাথে হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা) দাঁড়িয়ে যান যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তাকে হত্যা করার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে উপস্থিত আছি।

এ কারণে সম্মানিত আলিম সমাজের সম্মিলিত রায় হল, যে ব্যক্তি সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, সে ফাসিক ও ফাজির, আর যে খবীস নিজ খবীসীর দরুন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণিগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করবে, সে নিঃসন্দেহে মুরতাদ ও কাফির।

অধিকন্তু কুরআনে করীমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা পয়গাম্বর (আ)-এর স্ত্রীগণকে সমস্ত মু'মিনের মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লা্ বলেন : نَبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ "নবী মু'মিনদের নিকট তাদের জানের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী এবং তাদের স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা।"

আল্লাহ্ ক্ষমা করুন, মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলা কি কোন ব্যভিচারী ও অধার্মিকা নারীকে এহেন বিরাট উপাধি দ্বারা ভূষিত করতে পারেন? আফসোস, শত আফসোস। হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর বাণী হলো : بابغت امرأة نبى قط "কোন নবীর স্ত্রী কখনই ব্যভিচার করেন নি।" (তাফসীরে ইবন কাসীর)

অধিকন্তু যে পয়গাম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে এজন্যে প্রেরিত হয়েছেন যে, প্রকাশ্য এবং গোপনীয় অশ্লীলতা (বেহায়াপনা) দূরীভূত করবেন, যেমন তিনি পৃথিবীতে এসে একটা পূর্ণ জাতি এবং দেশের অন্যায় এবং অশ্লীলতাকে ন্যায় ও সভ্যতা এবং তাদের অপকর্মকে সৎগুণ ও সূচিতায় পরিবর্তিত করে দেন; এহেন পবিত্র, পূণ্যবান, পূত চরিত্রের অধিকারী রাসূলের প্রসঙ্গে এ অপবাদ কি সম্ভব, (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) যে, তাঁর স্ত্রী এখনো পর্যন্ত পবিত্র হননি? হে আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমার, এ এক বিরাট অপবাদ; আল্লাহর শপথ, এ এক প্রকাশ্য অপবাদ।

অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে নবূওয়াত ও রিসালত, ভালবাসা ও উপঢৌকন প্রাপ্তির বিশাল মর্যাদায় ভূষিত করেছেন এবং যাকে স্বীয় মুস্তাফা ও মুজতবা, মুকাদ্দাস ও মুরতাজা পসন্দনীয় এবং নির্বাচিত বান্দায় পরিণত করেছেন, নিষ্পাপ ও পবিত্রতায় পবিত্রতম ফেরেশতা জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ)-কে তাঁর অনুগামী এবং অধীন বানিয়েছেন, এটা তাঁর মর্যাদা এবং পবিত্রতা বিরোধী যে, তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বের

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্বের স্ত্রী এবং সঙ্গী হিসেবে কোন বদকার ও ব্যভিচারীণিকে মনোনীত করবেন। এ জন্যে তিনি ইরশাদ করেন :

وَلَوْ لاَ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۔

"এবং তোমরা যখন এটা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয় ? আল্লাহ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ।" সূরা নূর : ১৬

এ স্থানে 'সুবহানাকা' শব্দটি আনয়ন করা এদিকে ইঙ্গিতবাহী যে, আল্লাহ তা থেকে পাক ও পবিত্র যে, তাঁর পাক-পবিত্র নির্বাচিত রাসূলের স্ত্রী বদকার হবে। এজন্যে তা শোনামাত্র "আল্লাহ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ" বলে দেয়া ফরয এবং আবশ্যিক ছিল। যেমন হযরত সা'দ ইবন মুআয, হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) যখন এ খবর শোনেন, তখন তৎক্ষণাৎ তাঁদের মুখ থেকে এ বাক্যই উচ্চারিত হয়েছিল যে, سُبْحٰنَكَ هذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ (আল্লাহ্ পবিত্র, মহান; এ তো এক গুরুতর অপবাদ)।[১]

ফাতহুল বারী-তে হযরত আবূ আয়্যুব আনসারী এবং হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছাড়া হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর পরিবর্তে হযরত উসামা (রা)-এর নাম উল্লেখ আছে। মোট কথা এই যে, পয়গাম্বর (আ)-গণের স্ত্রীদের শানে যে ব্যক্তি এরূপ অশোভনীয় কথাবার্তা বলবে, তার প্রতি তাকানোই নাজায়েয। কারো স্ত্রীকে পাপী ও দুশ্চরিত্রা বলার অর্থ হলো, সেই স্ত্রীলোকের স্বামীও দায়ূস। যে ব্যক্তি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে কলঙ্কিতা মনে করে, তা হলে বুঝে নিন যে, সে ব্যক্তি রাসূলে পাক (সা)-কে প্রচ্ছন্নভাবে কি বলছে; যা কল্পনা করতেও অন্তর প্রকম্পিত হয়।

তায়াম্মুমের বিধান অবতরণ

কতিপয় বর্ণনায় এটা জানা যায় যে, এ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পুনরায় হযরত আয়েশা (রা)-এর হারটি হারিয়ে যায় এবং হার অনুসন্ধান করতে গিয়ে কাফেলার প্রভাত হয়ে যায় কিন্তু সেখানে পানি ছিল না। ঐ সময় তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং সাহাবিগণ তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করেন।

সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) এতে অত্যন্ত খুশি হন। হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠেন, ওহে আবূ বকরের বংশধর! তায়াম্মুমের এ হুকুম নাযিল হওয়া তোমাদের প্রথম বরকত নয়; বরং তোমাদের বরকতে আরো অনেক সহজ ও সরল বিধান নাযিল হয়েছে।

---

১. দুররে মানসূর, ৫খ. পৃ. ৩৪।

আর অপরাপর বিদগ্ধ আলিমের বক্তব্য হলো, তায়াম্মুমের আয়াত বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়নি, বরং এ যুদ্ধের পর অপর কোন সফর সামনে এসেছে, সেই সফরে তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হয়। যেমনটি মু'জামে তাবারানীতে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সময় আমার হার হারিয়ে গেল। এতে অপবাদ আরোপকারীরা যা বলার তা বলেছে। এর পর দ্বিতীয় সফরে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে গেলাম এবং আমার হার হারিয়ে গেল; তা খোঁজার জন্য থামতে হলো, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে বলেন, আয় মেয়ে, তুমি প্রতিটি সফরেই মানুষের জন্য কষ্ট ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াও। এ সময় আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন যে, পানি না পাওয়ার অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায আদায় কর। তায়াম্মুমের অবকাশ এবং সহজ ব্যবস্থা অবতীর্ণ হওয়ায় হযরত আবূ বকর (রা) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং তিনবার বলেন : অর্থাৎ হে মেয়ে, তুমি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী।

এ রিওয়ায়াত দ্বারা পরিস্কার প্রকাশ পেল যে, তায়াম্মুমের আয়াত বনী মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়নি; বরং এর পরে অপর কোন যুদ্ধ এবং সফরে দ্বিতীয়বার এমনই স্থানে হার হারিয়ে যায়, যেখানে পানি ছিল না এবং ফজর নামাযের সময় এসে পড়েছিল। সে সময় তায়াম্মুমের এ আয়াত নাযিল হয়।

খন্দক ও আহযাবের যুদ্ধ (শাওয়াল পঞ্চম হিজরী)

এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সন ও মাসের ব্যাপারে মতভেদ আছে। মূসা ইবন উকবা বলেন, এ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) এ মতই গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে হয়েছে। সমস্ত যুদ্ধ বিষয়ক আলিম ও সকল সীরাত বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত। হাফিয যাহাবী ও হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, এ বক্তব্যই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। ইবন সা'দ এবং ওয়কিদী বলেন, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এ যুদ্ধ হয়েছিল।[১]

ইমাম বুখারী (র) মূসা ইবন উকবার বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর এ কথার উদ্ধৃতি দেন যে, তিনি বলেছেন, উহুদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আনীত হলাম। এ সময় আমি ছিলাম চৌদ্দ বছর বয়সী। রাসূলুল্লাহ (সা) উহুদ যুদ্ধে আমাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। খন্দক যুদ্ধের সময় আনীত হলাম, তখন আমি ছিলাম পনের বছর বয়সী। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন আমাকে অনুমতি দেন। (বুখারী)

এরদ্বারা পরিস্কাররূপে প্রকাশ পায় যে, উহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধের মধ্যে মাত্র এক বছরের ব্যবধান ছিল। আর এটা সমর্থিত যে, উহুদ যুদ্ধ তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল; কাজেই খন্দকের যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।

---

১. যারকানী, ২০খ. পৃ. ১০৩।

প্রসিদ্ধ মাগাযী বিষয়ক ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এ যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীতে হয়েছে। এ জন্যে ইমাম বায়হাকী বলেন, এটা আশ্চর্য নয় যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) উহুদ যুদ্ধের সময় পূর্ণ চৌদ্দ বছর বয়স্ক ছিলেন না, বরং চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করেছিলেন মাত্র এবং খন্দক যুদ্ধের সময় পূর্ণ পনের বছরে পরিণত হন। এ হিসেবে উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের ব্যাবধান দু'বছর হওয়া সম্ভব।

অধিকন্তু উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আবূ সুফিয়ান এ কথা বলেছিল যে, আগামী বছর বদর প্রান্তরে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মুকাবিলা হবে। এ ওয়াদা করে সে মক্কায় ফিরে যায়। যখন পরবর্তী বছর ওয়াদাকৃত সময় এসে পড়ে, তখন আবূ সুফিয়ান এ কথা বলে রাস্তা থেকে ফিরে যায় যে, এটা দুর্ভিক্ষের বছর, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত নয়। এর এক বছর পর সে দশ হাজার লোকের বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণ করে; যাকে আহযাবের যুদ্ধ বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়।

যদ্বারা বুঝা যায় যে, উহুদ যুদ্ধ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যে দু'বছরের ব্যাবধান ছিল, যা প্রসিদ্ধ সীরাত বিশেষজ্ঞগণের বক্তব্যের সমর্থক। (ফাতহুল বারী, অধ্যায়, খন্দক যুদ্ধ)।

এ যুদ্ধের পটভূমি ও কারণ ছিল এই যে, বনী নাযীরকে দেশ থেকে বহিস্কারের পর হুয়াই[১] ইবন আখতাব মক্কায় আগমন করে এবং কুরায়শগণকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুকাবিলা এবং যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর কিনানা ইবন রবী' গিয়ে নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বনী গাতফানকে প্রস্তুত করে এবং তাদেরকে এ প্রলোভন দেখায় যে, খায়বারের খেজুর বাগানসমূহে প্রতি বছর যে খেজুর উৎপন্ন হবে, তার অর্ধেক তোমাদেরকে দেয়া হবে। এ কথা শুনে উবায়দ ইবন হাসান ফাযারী প্রস্তুত হয়ে গেল। কুরায়শ তো প্রথম থেকেই প্রস্তুত ছিল।

এভাবে আবূ সুফিয়ান দশ হাজার লোকের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মুসলমানদেরকে বিপর্যস্ত এবং ধ্বংস করে দেয়ার মানসে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০১, খন্দক যুদ্ধ অধ্যায়)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যখন তাদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) খন্দক খোঁড়ার পরামর্শ দিলেন, যাতে খন্দকের বেষ্টনীর মধ্যে নিরাপদে থেকে

---

১. এক রিওয়ায়াতে আছে, হুয়াই ইবন আখতাব, ইবন আবিল হুকায়েক, কিনানা ইবনুর রবী', হাওযা ইবন কায়স এবং আবুল আম্মার ওয়ায়লী একদিন মক্কায় যায় এবং কুরায়শগণকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওপর চড়াও হও, আমরা তোমাদেরকে পূর্ণ সহায়তা করব, যাতে তিনি শেষ হয়ে যান। এরপর তারা গাতফান গোত্রে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকেও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। এভাবে কুরায়শ এবং গাতফানী মিলে দশ হাজার লোকের এক বিশাল বাহিনী আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ৫৫।

তাদের প্রতিহত করা যায়। প্রথমেই ময়দানে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া যুক্তিযুক্ত নয়। সবাই এ সিদ্ধান্ত পসন্দ করলেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এর সীমারেখা চিহ্নিত করে দিলেন, চিহ্ন এঁকে প্রতি দশজনকে দশগজ জমি বন্টন করে দিলেন।[২]

খন্দক এতই গভীর করে খোঁড়া হল যে, ভেজা মাটি বেরিয়ে পড়ল।[৩]

ইবন সা'দ বলেন, ছয়দিনেই খন্দক খোঁড়া সমাপ্ত হয়। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৮)।

মূসা ইবন উকবা বলেন, অনেক দিনে খোঁড়ার কাজ শেষ হয়। আল্লামা সামহূদী বলেন, এটাই সত্য যে, খন্দক খননের কাজ ছয় দিনেই শেষ হয়, আর অনেক দিন প্রকৃতপক্ষে ঘেরাও করে রাখার সময় ছিল। (বিস্তারিতের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১১০, পাঠ করে দেখুন)।

সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও খন্দক খননকাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং প্রথমে তিনিই নিজ হাতে জমিতে কোদালের কোপ দেন, তাঁর মুখে তখন উচ্চারিত ছিল এ বাক্য :

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّهِ بَدِيْنَا وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرِهِ شَقِيْنَا حَبَّذَا رَبًّا وَحَبَّذَا دِيْنَا .

"আল্লাহর নামে শুরু করছি প্রথমেই, আর আমরা যদি তাঁকে ছাড়া অপর কারো ইবাদত করি, তবে আমরা বড়ই বদনসীব হয়ে যাব। তিনি কতই না উত্তম প্রভু, আর তাঁর দীন কতই না উত্তম দীন !" (রাউযুল উনুফ, ৩খ. পৃ. ১৮৯; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৪)।

শীতের মওসুম ছিল, হিমেল বাতাস বইছিল, কয়েকদিন পর্যন্ত অনাহার চলছিল; তবুও মুহাজির ও আনসার (রা)-গণ অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খন্দক খননে মগ্ন ছিলেন। মাটি উঠিয়ে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন :

نحن الذين بيعوا محمدا * على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরাই তারা যারা নিজেদেরকে মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে বায়য়াত করেছিল এবং তাঁর জন্য নিজেদের জীবনকে আল্লাহর নিকট বিক্রি করে দিয়েছি, ধড়ে যতক্ষণ প্রাণ আছে, কাফিরের সাথে জিহাদ করতেই থাকব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যুত্তরে বলছিলেন :

اللهم لاعيش الاخره * فاغفر للانصار والمهاجره

"আয় আল্লাহ্, জীবন তো প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবনই, কাজেই আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর।"

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৪৭।
২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৫।
৩. তারীখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৪৫।

আবার কখনো বলছিলেন :

اللهم انه الاخير الاخير الاخره * فبارك فى الانصار والمهاجره

"আয় আল্লাহ্, প্রকৃত কল্যাণ ও মঙ্গল তো আখিরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল, কাজেই আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি বরকত দিন।"

হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খন্দকের দিন রাসূলুল্লাহ (সা) স্বতস্ফূর্তভাবেই মাটি বহন করে নিচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর পবিত্র পেট ধূলি মলিন হয়ে পড়ে। আর তিনি বলছিলেন :

والله لو لا الله ما اهتدينا * ولاتصدقنا ولاصلينا

"আল্লাহর কসম, আল্লাহ যদি তাওফীক না দিতেন তা হলে আমরা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, সদকা দিতাম না ও নামায পড়তাম না;

فانزلن سكينة علينا * وثبت الاقدام ان لا قينا

"আয় আল্লাহ্, আমাদের প্রতি শান্তি ও স্বস্তি নাযিল করুন এবং যুদ্ধের ময়দানে আমাদেরকে অবিচল রাখুন।

ان الالى قد بغوا علينا * اذا ارادوا افتنة ابينا

"এ লোকগুলো আমাদের উপর গুরুতর যুলম করেছে, এরা যখনই আমাদেরকে কোন ফিতনায় জড়াতে চেয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।"

তিনি ابينا ابينا (আমরা তা অস্বীকার করেছি) উচ্চস্বরে এবং বারবার বলতে থাকেন।

হযরত জাবির (রা) বলেন, খনন করতে করতে একটি শক্ত পাথরের খণ্ড এসে গেল। আমরা (অপসারণে অপারগ হয়ে) তাঁর কাছে আরয করলাম। তিনি বললেন, দাঁড়াও, আমি সরিয়ে দিচ্ছি। অথচ ক্ষুধার কারণে তখন তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছিলেন, আর আমরাও তিনদিন যাবত কোন বস্তুই খাইনি। তিনি পবিত্র হাতে কোদাল নিলেন এবং ঐ পাথরখণ্ডে আঘাত করলেন। ফলে তা বালির স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

এ হাদীস সহীহ বুখারীতে রয়েছে। মুসনাদে আহমদ এবং নাসাঈতে এটুকু অতিরিক্ত আছে যে, তিনি যখন বিসমিল্লাহ বলে প্রথমবার কোদাল চালালেন, তখন এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, আমাকে সিরিয়ার চাবিসমূহ প্রদত্ত হলো। আল্লাহর শপথ, সিরিয়ার লোহিত বর্ণের প্রাসাদগুলো আমি এ মুহূর্তে সচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার কোদাল চালালেন, এবারে আরো এক-তৃতীয়াংশ ভেঙে পড়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, পারস্যের চাবিসমূহ আমাকে দেয়া হলো; আল্লাহর শপথ, মাদাইনের শ্বেত প্রাসাদসমূহ এক্ষণে আমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তৃতীয়বার তিনি বিসমিল্লাহ বলে কোদাল চালালেন, তখন পাথরের অবশিষ্ট অংশও ভেঙে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, ইয়েমেনের

চাবিসমূহও আমাকে দান করা হলো। আল্লাহর কসম, সানআর দরজাসমূহ আমি এক্ষণে এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি।

হাফিয আসকালানী বলেন, এ বর্ণনার সনদ হাসান। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রথমবার কোদাল চালানোয় বিদ্যুৎ চমকিত হয়, যাতে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকিত হয়ে উঠে। তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলেন এবং ফেরেশতাগণও তাকবীর বলেন। আর তিনি ইরশাদ করেন, জিবরাঈল আমীন (আ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, এ শহরগুলো এ উম্মত জয় করবে।[১]

তাৎপর্যপূর্ণ ফায়দা

খন্দক খনন করা আরবের প্রথা ছিল না, বরং এ প্রথা ছিল পারস্যের। পারস্য সম্রাটগণের মধ্যে মনুচেহর ইবন আবীরাজ ইবন আফরীদূন প্রথম খন্দক খনন করে যুদ্ধ করার প্রথা চালু করেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এতে জানা গেল যে, জিহাদে কাফিরদের অবলম্বিত যুদ্ধ পদ্ধতি অনুকরণ করা বৈধ এবং এর ওপর কিয়াস করে কাফিরদের ব্যবহৃত মানের কিংবা তার চাইতে শক্তিশালী যুদ্ধাস্ত্রসমূহ ব্যবহার করা বৈধ। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ যুদ্ধে 'মিনজানিক' (দূর থেকে পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র) ব্যবহার করেছেন। হযরত উমর (রা) তুসতার অবরোধকালে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা)-কে মিনজানিক স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং হযরত আমর ইবন আস (রা) যখন ইস্কান্দারিয়া অবরোধ করেন, তখন মিনজানিক ব্যবহার করেন। এর উপর ভিত্তি করে বিষ মাখানো তীর অথবা তরবারি ব্যবহার করাও দুরস্ত আছে। কিন্তু 'তাদখীন'[২] ব্যবহার কেবল ঐ সময় বৈধ হবে যখন শত্রু সেনাকে প্রতিহত করার আর কোন উপায় অবশিষ্ট না থাকে। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন এবং নিরুপায় না হওয়া পর্যন্ত তাদখীন ব্যবহার বৈধ নয়।

বিস্তারিতভাবে এ মাসআলা সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে শারহে সিয়ারুল কাবীর قطع الماء عن اهل العرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها অধ্যায় দেখুন।

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ .

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩০৪-৩০৫।

২. অর্থাৎ বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়া, যাতে লোকজন মৃত্যুবরণ করে, যেমন আজকাল বিষাক্ত গ্যাস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন : "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এরদ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখবে, তোমাদের শত্রুকে..." (সূরা আনফাল : ৬০)

ফলে জানা গেল যে, ঐ সমস্ত বিষয় শেখা জরুরী, যদ্বারা আল্লাহর শত্রু বাহিনী ভীত হয় এবং আল্লাহর দীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

জরুরী সতর্ক বাণী : কিতাব, সুন্নাহ এবং শরীয়ত কোন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে উন্নতি করাকে নিষিদ্ধ করে না, বরং এ ধরনের প্রতিটি আবিষ্কার ও উদ্ভাবন, যদ্বারা দেশের উন্নতি হয়, তাকে ফরযে কিফায়া ঘোষণা করেছে; সকল সম্মানিত ফকীহ এ ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। অবশ্য ইসলামী শরীয়াত ইউরোপীয় বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, কামোদ্দীপক ও প্রবৃত্তি তাড়িত সংস্কৃতির কঠোর বিরোধী। এ জন্যে যে, কামোদ্দীপক ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা স্বাধীনতা, চরিত্র এবং পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়, যা সাম্রাজ্য পতনের কারণ।

মুসলমানগণ খন্দক খনন সমাপ্ত করেছেন এমন সময় কুরায়শ দশ হাজার লোকের বিশাল বাহিনী নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে ছাউনী ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) তিন হাজার মুসলমানের একটি বাহিনী নিয়ে সিলা পাহাড়ের নিকটে অবস্থান গ্রহণ করেন। উভয় বাহিনীর মধ্যবর্তী স্থানে খন্দক ছিল প্রতিবন্ধক। নারী ও শিশুদের তিনি একটি দুর্গে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেন।

বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা তখন পর্যন্ত পৃথক ছিল। কিন্তু বনী নযীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাব তাদের নিজেদের সাথে একীভূত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি সে নিজেই বনী নাযীরের সর্দার কা'ব ইবন আসাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে, যে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। হুয়াই ডাক দিল যে, দরজা খোল। কা'ব বলল :

ويحك يا حيى انك امرء مستوم وانى قد عاهدت محمدا فلست بنا قضى ما بينى وبينه فانى لم ارا منه الا صدقا ووفاءه .

"আফসোস, ওহে হুয়াই, তুমি একজন হতভাগা; আমি মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে চুক্তি করেছি, এখন সে চুক্তি ভঙ্গ করব না; কেননা আমি মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে সত্যবাদিতা ও চুক্তি রক্ষাকরণ ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।"

হুয়াই বলল, আমি তোমাদের জন্য স্থায়ী সম্মানের মালামাল বয়ে এনেছি, কুরায়শ এবং গাতফান সেনাদল নিয়ে আমি এখানে অবতরণ করেছি। আমরা সবাই শপথ করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহম্মদ (সা)-এর পরিসমাপ্তি এবং হিসাব চুকিয়ে না ফেলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে অবশ্যই স্থানচ্যুত হবো না।

কা'ব বলল, আল্লাহর কসম, তুমি সব সময়ের জন্য অপমান ও যিল্লতি নিয়ে এসেছ, আমি মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে কখনই চুক্তি ভঙ্গ করব না। আমি তাঁর মধ্যে

সত্যবাদিতা এবং চুক্তিরক্ষার প্রত্যয় ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। হুয়াই বারবার জেদ করতে থাকল, এমনকি শেষ পর্যন্ত কা'ব চুক্তিভঙ্গে বাধ্য হলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন এর সত্যতা নিরূপণের জন্য হযরত সা'দ ইবন মু'আয, হযরত সা'দ ইবন উবাদা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করলেন এবং বলে দিলেন যে, যদি এ সংবাদ সত্য হয় তাহলে ফিরে এসে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় সংবাদ দেবে যাতে লোকজন বুঝতে না পারে; আর যদি খবর মিথ্যে হয়, তা হলে খোলাখুলি বর্ণনা করতে কোন বাধা নেই।

এঁরা কা'ব ইবন আসাদের কাছে গেলেন এবং তাকে চুক্তির ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিলেন। কা'ব বলল, কেমন চুক্তি আর কে মুহাম্মদ? তার সাথে তো আমার কোন চুক্তি নেই। তাঁরা যখন ফিরে এলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আরয করলেন, 'আযল ওয়া কারা', অর্থাৎ যেমনিভাবে আযল ও কারা নামক গোত্রদ্বয় সাহাবী হযরত খুবায়ব (রা)-এর সাথে গাদ্দারী করেছিল, সেভাবে এরাও গাদ্দারী করেছে। (সীরাতে ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪০; যারকানী, ১২খ. পৃ. ১১১)।

রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের গাদ্দারী ও ওয়াদা ভঙ্গের দরুন ব্যথিত হলেন। কাফিরেরা চারদিক থেকেই মুসলমানদেরকে ঘিরে ফেলেছে। বাইরের শত্রুরা অগণিত সংখ্যায় এগিয়ে আসছিল, অভ্যন্তরীন দুশমন বনী কুরায়যাও তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। মোট কথা মুসলমানদের জন্য এ ছিল অত্যন্ত পেরেশানীর সময়। শীতের রাত ছিল এবং তাঁরা ছিলেন কয়েকদিনের অনাহারী ।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আহযাবে এ যুদ্ধের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন :

اِذْ جَاۤءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا - هُنَالِكَ ابْتُلِىَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا ۔

"যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল, তোমাদের উপরের দিক ও নিচের দিক থেকে, ভয়ে তোমাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে; তখন মু'মিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল।" (সূরা আহযাব : ১০-১১)

এ সময়টা ছিল মুসীবত ও পরীক্ষার। মুসীবতের কষ্টিপাথরে ফেলে মুনাফিক ও নিষ্ঠাবান মু'মিনকে পৃথক করা হচ্ছিল। এ কষ্টিপাথর খাঁটি ও মেকী পৃথক করে দেখায়। সুতরাং মুনাফিকেরা অজুহাত দেখাতে শুরু করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহ সীমানা প্রাচীরের পেছনে থাকার কারণে অরক্ষিত, সন্তান এবং স্ত্রীলোকদের নিরাপত্তা রক্ষা করা প্রয়োজন বিধায় (গৃহে প্রত্যাবর্তনের) অনুমতি চাচ্ছি।

يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۔

"(একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে) বলছিল, আমাদের বাড়িঘর অরক্ষিত; অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না; আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।" (সূরা আহ্যাব : ১৩)

আর মুসলমানগণ, যাদের অন্তর একনিষ্ঠতা ও বিশ্বাসে ভরপূর ছিল, তাদের অবস্থা এরূপ ছিল, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۔

"মু'মিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, ওরা বলে উঠল, এ তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।" (সূরা আহ্যাব : ২২)

মোটকথা এই যে, ইয়াহূদী ও মুনাফিক সবাই এ যুদ্ধে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে আর মুসলমানগণ অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু দ্বারা ঘেরাও ও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। ঘেরাওয়ের কঠোরতা ও প্রচণ্ডতায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ খেয়াল হলো যে, মানবীয় প্রবৃত্তির কারণে পাছে মুসলমানগণ ঘাবড়িয়ে না যায়, এ জন্যে তিনি এ কার্যক্রম গ্রহণ করলেন, বনী গাতফান গোত্রের দু'সর্দার উয়ায়না ইবন হাসান এবং হারিস ইবন আউফকে মদীনার বাগানসমূহের এক-তৃতীয়াংশ খেজুর দানের বিনিময়ে সন্ধি করলেন, যাতে তারা আবূ সুফিয়ানকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকে এবং মুসলমানগণ এ ঘেরাও থেকে মুক্ত হতে পারেন। সুতরাং তিনি হযরত সা'দ ইবন মুআয এবং হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর কাছে তাঁর এ খেয়াল ব্যক্ত করলেন। তাঁরা উভয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ কি আপনাকে এমন নির্দেশ দিয়েছেন ? যদি এমনটি হয়, তা হলে আমরা তা তামিল করার জন্য প্রস্তুত। অথবা এটা আমাদের অন্তরে স্বস্তি ও সান্ত্বনাদানের জন্য আপনি নিজে এমনটি ইচ্ছে করেছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কোন নির্দেশ নয়; বরং কেবল তোমাদের জন্য আমি এমনটি ইচ্ছে করেছি। এ কারণে যে, আরবের সবাই একজোট হয়ে একই তূণীর থেকে তোমাদের প্রতি তীর বর্ষণ করছে, কাজেই এ উপায়ে আমি তাদের শৌর্য ও ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে ভাঙ্গন ধরাতে চাই।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন এরা এবং আমরা সবাই কাফির এবং মুশরিক ছিলাম, মূর্তির পূজা করতাম, আল্লাহ তা'আলাকে চিনতামই না, তখনও ওদের এ শক্তি ছিল না যে, আমাদের কাছ থেকে একটি খুরমাও আদায় করে, তবে মেহমান হিসেবে অথবা ক্রয় করে নেয়া ছাড়া, আর এখন, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিদায়াতের অফুরান ও অতুলনীয় নিয়ামত দানে ধন্য করেছেন এবং ইসলামের দ্বারা আমাদের সম্মান দান করেছেন, তখন আমরা

আমাদের সম্পদ ওদের হাতে দিয়ে দেব, এটা অসম্ভব। আল্লাহর কসম, আমাদের সম্পদ ওদেরকে দেয়ার আমাদের কোনই প্রয়োজন নেই। আল্লাহর কসম, আমাদের পক্ষে ওদেরকে দেবার মত তরবারির আঘাত ছাড়া আর কিছুই নেই। এতে ওদের দ্বারা যা হওয়ার আশঙ্কা, তারা যেন তা করে।

আর এ ব্যাপারে সন্ধির যে মুসাবিদা করা হয়েছিল, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) তা নবী করীম (সা)-এর হাত থেকে নিয়ে এর সমুদয় অক্ষর মুছে দেন।[১]

দু'সপ্তাহ এভাবেই কেটে গেল, কিন্তু হাতাহাতি বা মুখোমুখি লড়াইয়ের সুযোগ এলো না; কেবল উভয় পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপ চলছিল। অবশেষে কুরায়শের কয়েকজন ঘোড় সওয়ার, আমর ইবন আবদুদ, ইকরামা ইবন আবূ জাহল, বাহীরা ইবন আবূ ওহাব, যিরার ইবন খাত্তাব, নওফল ইবন আবদুল্লাহ মুসলমানদের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলো। যখন তারা খন্দকে উপস্থিত হলো, তখন বলল, আল্লাহর কসম, এ ধরনের প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী পূর্বে আরবে ছিল না। একদিকে খন্দকের পরিধি কম ছিল, সেদিক দিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে এসে তারা মুসলমানদেরকে লড়াইয়ের আহ্বান জানাল। আমর ইবন আবদুদ, যে বদর যুদ্ধে আহত হয়ে পড়ে গিয়েছিল, আপাদমস্তক লৌহবর্মে আবৃত হয়ে মুকাবিলার জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানাল। শেরে খোদা হযরত আলী (রা) তার মুকাবিলায় অগ্রসর হলেন এবং বললেন, ওহে আমর, আমি তোমাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আহ্বান করছি; ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আমর বলল, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। হযরত আলী (রা) বললেন, আচ্ছা আমি তোমাকে লড়াই এবং মুকাবিলার আহ্বান জানাচ্ছি। আমর বলল, তুমি তো অল্পবয়স্ক,[২] তোমার চেয়ে বড় কাউকে আমার মুকাবিলার জন্য পাঠিয়ে দাও, আমি তোমাকে হত্যা করা পসন্দ করি না। হযরত আলী (রা) বললেন, আমি তো তোমাকে হত্যা করতে পসন্দ করি। এ কথা শুনে আমরের জিদ চেপে গেল এবং ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে হযরত আলীর প্রতি তরবারি চালিয়ে দিল যা হযরত আলী (রা) ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন কিন্তু কপালে আঘাত পেলেন। এরপর হযরত আলী (রা) তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন এবং এক আঘাতেই তার দফা রফা হয়ে গেল।

হযরত আলী (রা) 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিলেন, যাতে করে মুসলমানগণ বুঝতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে জয়ী করেছেন।

নওফল ইবন আবদুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হলো। সে ছিল ঘোড় সওয়ার এবং খন্দকের ফাঁদ সম্বন্ধে কিছুই জানত না, হঠাৎ করে সে খন্দকে পড়ে গেল এবং তার ঘাড় ভেঙে গেল। তাতে সে মৃত্যুবরণ করল।

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪১।

২ আমর ইবন আবদুদ-এর বয়স তখন নব্বই বছর পেরিয়ে গিয়েছিল। যারকানী।

মুশরিকেরা নবী (সা)-এর খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে তার লাশ ফেরত চাইল। তিনি (সা) ইরশাদ করলেন, সেও খবীস ও অপবিত্র ছিল আর তার মুক্তিপণও খবীস ও নাপাক। তার প্রতিও আল্লাহর অভিশাপ হোক এবং তার মুক্তিপণের প্রতিও। আমাদের না দশ হাজার দিরহামের প্রয়োজন, আর না তার লাশের। আর কোন বিনিময় ছাড়াই তিনি তার লাশ কাফিরদের দিয়ে দিলেন।[১]

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর শাহরগে একটি তীর এসে বিদ্ধ হয়। তখন হযরত সা'দ (রা) এ দু'আ করেন : আয় আল্লাহ্! যদি তুমি কুরায়শের জন্য যুদ্ধ বাকী রেখে থাক, তা হলে আমাকেও জীবিত রাখ। কেননা এর থেকে কোন বস্তুই আমার কাছে প্রিয় নয় যে, আমি সেই সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করব যারা তোমার রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে, তাঁকে মিথ্যা বলেছে, তাঁকে নিরাপদ হেরেম থেকে বের করে দিয়েছে। আর আয় আল্লাহ্! তুমি যদি আমাদের এবং ওদের মধ্যকার লড়াই শেষ করে থাক তা হলে এ যখমকে আমার শাহাদতের উপলক্ষে পরিণত কর এবং ঐ সময় পর্যন্ত আমাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত বনী কুরায়যার অপমান-অপদস্থতা আমার নিজ চোখে দেখে চক্ষু শীতল না করছি।[২]

আক্রমণের এ দিনটি ছিল খুবই কঠিন, সমস্ত দিন তীর ছোঁড়া এবং পাথর ছোঁড়া চলতে থাকে। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চার ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) নারী ও শিশুদেরকে একটি দুর্গে নিরাপদে রেখেছিলেন। ইয়াহূদীদের বসতি ছিল এর নিকটে। রাসূল (সা)-এর ফুফু হযরত সাফিয়া (রা)-ও ঐ দুর্গে ছিলেন এবং দুর্গের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য হযরত হাসসান (রা) আদিষ্ট ছিলেন। হযরত সাফিয়া (রা) দেখলেন, এক ইয়াহূদী দুর্গের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সে গুপ্তচর কিনা, এ সন্দেহে হযরত সাফিয়া (রা) হযযরত হাসসান (রা)-কে বললেন, একে হত্যা কর, যেন এমনটি না হয় যে, সে শত্রুকে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করে। হযরত হাসসান (রা) বললেন, তোমার কি জানা নেই যে, আমি এ কাজের যোগ্য নই ? হযরত সাফিয়া উঠলেন এবং তাঁবুর মধ্য থেকে একটি কাঠের টুকরা এনে ঐ ইয়াহূদীর মাথায় এত জোরে আঘাত করলেন যে, তার মাথা ফেটে গেল এবং বললেন, এ তো পুরুষ মানুষ আর আমি স্ত্রীলোক, এজন্যে আমি তাকে স্পর্শ করব না, তুমি তার শরীর থেকে অস্ত্রশস্ত্র খুলে নাও। হযরত হাসসান (রা) বললেন, তার অস্ত্র এবং মালপত্রে আমার কোন প্রয়োজন নেই। (ইবন হিশাম)।

ঘেরাও থাকাকালে গাতফান গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নাঈম ইবন মাসঊদ আষযাঈ নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আমার সম্প্রদায় আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানে না।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১১৪।

২ ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৩।

যদি অনুমতি দেন, তো আমি একটু চেষ্টা করি, যাতে এ ঘেরাওয়ের অবসান ঘটে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, যদি এমন কোন চেষ্টা সম্ভব হয়, তা হলে করে দেখ। এজন্যে যে, فان الحرب خدعة 'যুদ্ধের অপর নাম ভ্রান্ত ধারণা প্রদান।'

কাজেই হযরত নাঈম (রা) এমন চাল চালেন যে, কুরায়শ এবং বনী কুরায়যার ঐক্যে ফাটল ধরে এবং বনী কুরায়যা কুরায়শকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। (বিস্তারিত ঘটনা ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ.৩০৯; যারকানী, ২খ. পৃ. ১১৬ এবং তারীখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৫০-এ বর্ণিত আছে)।

আমর ইবন আবদুদ এবং নওফল নিহত হওয়ার পর কুরায়শের অবশিষ্ট ঘোড় সওয়ারগণ পরাজিত হয়ে ফিরে যায়।

'মুসনাদে আহমদে' হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা বেষ্টনীর কঠিন ও প্রচণ্ড অবস্থার উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দু'আ করার আবেদন করি। তিনি বললেন, এ দু'আ কর : اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا "আয় আল্লাহ! আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো গোপন কর এবং আমাদের ভীতি দূর করে দাও।"

আর সহীহ বুখারীতে আছে, তিনি এ দু'আ করেন[১] : اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم (সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, لا تمنو القاء العدد অধ্যায়)।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন এবং কুরায়শ ও গাতফানের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রবাহিত করেন, যার ফলে তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে যায়, রশি এবং টানাসমূহ ছিঁড়ে যায়, হাঁড়ি-পাতিল উল্টে যায়, ধুলিবালি উড়ে উড়ে চোখ ভরে যায়; ফলে কাফিরদের সমুদয় সেনা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَاۤءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرًا ۔

"হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু আর এক বাহিনী, যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।" (সূরা আহযাব : ৯)

১. মুসনাদে আহমদ ও ইবন সা'দ-এর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) আহযাব মসজিদে হাত উঠিয়ে এবং দাঁড়িয়ে এ দু'আ করেন। আর আবূ নুআঈমের বর্ণনায় আছে, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪০।

جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে। যারা কাফিরদের অন্তরকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দেন এবং মুসলমানদের অন্তরকে শক্তিশালী ও দৃঢ় করেন। এভাবে কাফিরদের দশ হাজার সৈন্য ভীত-বিহ্বল হয়ে ময়দান ছেড়ে পলায়ন করে। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا ·

"আল্লাহ্ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; আল্লাহ সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা আহযাব : ২৫; যারকানী, ২খ. পৃ. ১২২)।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, গিয়ে দুশমনদের সংবাদ আন। আমি আরয করলাম, পাছে আমি ধরা পড়ে না যাই ? তিনি বললেন : انك لن تؤسر "অবশ্যই তুমি ধরা পড়বে না।" আর এর পর তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন :

اللهم احفظ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ·

"হে আল্লাহ্, একে সম্মুখ থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে, বাম থেকে, উপর থেকে এবং নীচ থেকে হিফাযত কর।"

তাঁর দু'আয় আমার সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায় এবং অত্যন্ত শান্ত ও প্রফুল্ল মনে রওয়ানা হই। যাত্রাকালে তিনি বললেন, হুযায়ফা, নতুন কিছুর সৃষ্টি করো না। আমি তাদের সেনাদলের মধ্যে পৌঁছি, সেখানে বাতাস এতই প্রবল ছিল যে, কোন বস্তুই স্থির থাকতে পারছিল না এবং এতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, কোন কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। ইত্যবসরে হযরত হুযায়ফা (রা) আবূ সুফিয়ানকে বলতে শুনলেন, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, এটা অবস্থানের জায়গা নয়, আমাদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, বনী কুরায়যা আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, আর এ বাতাস আমাদেরকে অন্ধ-বধির ও বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। চলাফেরা ও বসা দুরূহ হয়ে পড়েছে। উত্তম এই যে, দ্রুত ফিরে চল। আর এ কথা বলে আবূ সুফিয়ান উটের পিঠে আরোহণ করল।

হযরত হুযায়ফা বলেন, এ সময় আমার ইচ্ছা হলো যে, তাকে তীর দিয়ে হত্যা করি, কিন্তু তাঁর কথা স্মরণ হলো যে, 'হুযায়ফা, নতুন কিছুর সৃষ্টি করো না', ফলে আমি ফিরে আসি (যারকানী, ২খ. পৃ.১১৮)।

যখন কুরায়শ ফিরে গেল, তখন তিনি এ কবিতা পাঠ করলেন : الآن نغزوهم ولايغزوننا نحن نير اليهم "এবারে আমরা ওদের উপর আক্রমণ চালাব, আর কাফির

আমাদের উপর হামলা করতে সক্ষম হবে না, আমরা ওদের উপর আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হবো।" (বুখারী)

অর্থাৎ কাফির এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, ইসলামের মুকাবিলায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং ইসলামকে ধ্বংস করার কোনো শক্তিই তাদের ছিল না। কারণ এখন ইসলাম এতই শক্তিশালী হলো যে, কাফিরের মুকাবিলায় প্রথমে আক্রমণ করতে এবং অতর্কিত আক্রমণ করতে সক্ষম।

সতর্ক বাণী : যারা ইসলামের প্রথমে আক্রমণ (জিহাদ) করার বিরোধী, তারা বুখারীর রিওয়ায়াতের এ বাক্যাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন।

আর যখন প্রভাত হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তাঁর মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল :

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ .

(বুখারী, পৃ. ৫৯০)।

ইবন সা'দ ও বালাযুরী বলেন, এ ঘেরাও ছিল পনের দিন, ওয়াকিদী বলেন, এ বক্তব্যই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; হযরত সা'দ ইবন মুসায়্যিব (রা) বলেন, তা ছিল চব্বিশ দিন। এ যুদ্ধে মুশরিকদের তিন ব্যক্তি, নওফল ইবন আবদুল্লাহ, আমর ইবন আবদুদ এবং মনিয়া ইবন উবায়দ নিহত হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে ছয় ব্যক্তি শাহাদতবরণ করেন। (তাঁরা ছিলেন) :

১. হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা),
২. হযরত আনাস ইবন আবিস (রা),
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন সাহল (রা),
৪. হযরত তুফায়ল ইবন নুমান (রা),
৫. হযরত সা'লাবা ইবন গানামা (রা),
৬. হযরত কা'ব ইবন যায়দ (রা)।

হাফিয দিময়াতী আরো দু'টি নাম অতিরিক্ত যোগ করেছেন ঃ

৭. হযরত কায়স ইবন যায়দ (রা) এবং
৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আবূ খালিদ (রা)।

বনী কুরায়যার যুদ্ধ (পঞ্চম হিজরীর যিলকদ[১] মাস, বুধবার)

খন্দক যুদ্ধ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) ফজরের নামাযের পর প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি এবং সমস্ত মুসলমান অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেন। যখন যোহরের ওয়াক্ত হলো, হযরত

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১২৬।

জিবরাঈল আমীন (আ) (যে পরিচয় রাসূলের মাধ্যমে পরে জানা গেছে) একটি খচ্চরে আরোহণ করে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় উপস্থিত হলেন।[১] অতঃপর নবী করীম (সা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনি কি অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলেছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিবরাঈল (আ) বললেন, দুশমনেরা তো এখনো অসজ্জিত অবস্থায়। তারা এখন পর্যন্ত গৃহে ফিরে যায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে বনী কুরায়যার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি নিজেও বনী কুরায়যার অবস্থানের দিকে যাচ্ছি এবং গিয়ে ওদেরকে দোদুল্যমান করি।[২]

হযরত আনাস (রা) বলেন, বনী কুরায়যা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি পূর্বে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যখন কুরায়শ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসে, তখন বনী কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে কুরায়শের সাথে গিয়ে মিলিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা যখন এ বাহিনীকে পরাজিত করলেন, তখন বনী কুরায়যা দুর্গসমূহে গিয়ে আত্মগোপন করে। হযরত জিবরাঈল (আ) ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনী সঙ্গে নিয়ে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দ্রুত বনী কুরায়যার দিকে অগ্রসর হোন। তিনি বললেন, আমার সঙ্গীগণ এখনো ক্লান্ত। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি এসবে ভ্রূক্ষেপ না করে রওয়ানা হয়ে যান। আমি এক্ষুণি গিয়ে ওদের অন্তর কাঁপিয়ে দিচ্ছি। এ কথা বলে জিবরাঈল (আ) ফেরেশতা বাহিনী সহকারে বনী কুরায়যার দিকে যাত্রা করলেন। তখন বনী গানামের পল্লী সম্পূর্ণ ধুলিময় হয়ে গেল।

হযরত আনাস (রা) বলেন, ঐ ধুলি, যা হযরত জিবরাঈল (আ) বাহিনীর দ্বারা বনী গানামের পল্লীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তা এখন পর্যন্তও আমার দু'চোখে ভাসছে। মনে হয় ধূলি ধূসরিত সেই দৃশ্য আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি (বুখারী)।

জিবরাঈল (আ) তো চলে গেলেন। আর নবী করীম (সা) হুকুম দিলেন, কোন ব্যক্তিই যেন বনী কুরায়যার অবস্থানে যাওয়া ছাড়া অন্য কোথাও আসরের নামায না পড়ে। পথিমধ্যে যখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেল, তখন মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বললেন, আমরা তো বনী কুরায়যায় পৌঁছে আসরের নামায পড়ব। কেউ বললেন, আমরা নামায পড়ে নিচ্ছি; রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তো এ উদ্দেশ্য ছিল না (যে, নামায কাযা করা হোক), বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যাতে দ্রুত সেখানে পৌঁছা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে যখন এ কথা বলা হলো, তখন তিনি কারো প্রতিই অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না (বুখারী)। এজন্যে যে, প্রত্যেকের নিয়্যতই ছিল কল্যাণকর।

---

১. ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) জানাযার স্থানের (অর্থাৎ ঐ জায়গা, যা তিনি মসজিদ থেকে পৃথক কেবল জানাযার নামায আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন) সন্নিকটে এসে দাঁড়ান (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৩), এতে জানা গেল যে, জানাযার নামায মসজিদে না পড়া উচিত; অন্যথায় জানাযার জন্য মসজিদ থেকে পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করার কি প্রয়োজন ছিল ?

২ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১১৬; ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৫।

ফায়দা : হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, যারা হাদীসের বাহ্যিক শব্দের ওপর আমল করেছেন, তারাও প্রতিদান পেয়েছেন আর যারা চিন্তা-গবেষণা করেছেন, তারাও প্রতিদান পেয়েছেন। কিন্তু যারা বাহ্যিক শব্দের ওপর আমল করে বনী কুরায়যায় না পৌঁছে আসরের নামায আদায় করেন নি, এমনকি আসরের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তারা কেবল একটি কল্যাণ লাভ করেছেন অর্থাৎ নবী (সা)-এর আদেশ পালনের প্রতিদান লাভ করেছেন। আর যারা চিন্তা-গবেষণা দ্বারা কাজ করেছেন এবং ভেবেছেন যে, নবী (সা)-এর আদেশের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আসরের নামায কাযা করা হোক; বরং উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত পৌঁছানোর, এজন্যে আসরের নামায পথেই পড়ে নেন, তারা চিন্তা-গবেষণার বদৌলতে দু'টি কল্যাণ লাভ করেছেন। একটি কল্যাণ নবী (সা)-এর আদেশ পালনের জন্য, আর দ্বিতীয় কল্যাণ 'সালাতুল ওয়াস্তা' (আসরের নামায)-এর হিফাযতের জন্য; যা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য কল্যাণের একীভূত রূপ এবং যার হিফাযতের নির্দেশ কুরআনুল কারীমে এসেছে : حَـافِظُوْا عَلَى الصَّلٰوت وَالصَّـــلاَةِ الْوُسْطٰى (তোমরা নামায এবং মধ্যবর্তী নামাযের হিফাযত কর)। এছাড়া হাদীসে এসেছে, যার আসরের নামায ছুটে গেল, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে গেল; ইত্যাদি ইত্যাদি। বাহ্যিক শব্দের উপর আমলকারীদের প্রতি যদিও তিনি এজন্যে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি যে, তাদের নিয়্যত ছিল ভাল, কিন্তু যারা চিন্তা-গবেষণার দ্বারা কাজ করেছেন, তাদের মর্যাদায় তারা উন্নীত হতে পারবেন না। (ফাতহুল বারী,৭খ. পৃ. ৩১৬)।

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ইসলামের ঝান্ডাসহ রওয়ানা করলেন। হযরত আলী (রা) যখন সেখানে পৌঁছলেন, তখন ইয়াহূদীরা নবী করীম (সা)-কে প্রকাশ্যে এমনভাবে গালি দেয় (যা ক্ষমার অযোগ্য একটি পৃথক অপরাধ)।

অতঃপর রাসূল (সা) সশরীরে সেখানে রওয়ানা হলেন এবং পৌঁছেই বনী কুরায়যাকে অবরোধ করলেন। পঁচিশ দিন পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত থাকল। ইত্যবসরে তাদের সর্দার কা'ব ইবন আসাদ তাদেরকে একত্রিত করে বলল, আমি তিনটি প্রস্তাব তোমাদের সামনে রাখছি, এর মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পার যাতে এ বিপদ থেকে তোমরা মুক্তি পেতে পার।

১. প্রথমটি এই যে, আমরা ঐ ব্যক্তির [অর্থাৎ মুহাম্মাদুর রাসূল (সা)-এর] প্রতি ঈমান আনয়ন করি এবং তাঁর অনুগত ও অনুসারী হয়ে যাই।

فو الله لقد نبين لكم انه لنبى مرسل وانه للذى تجدونه فى كتابكم فتأمنون على مائكم واموالكم وابناءكم ونساءكم ·

"কেননা আল্লাহর কসম, তোমাদের কাছে এ কথা প্রকাশিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে তিনি মহান আল্লাহর নবী ও রাসূল এবং অবশ্যই তিনি সেই নবী যাঁর উল্লেখ তোমরা তাওরাতে দেখ; যদি ঈমান আনয়ন কর তবে তোমাদের জীবন, সম্পদ, শিশু ও নারী সবই নিরাপত্তা লাভ করবে।"

বনী কুরায়যা বলল, এটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আমরা নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করব না।

২. কা'ব ইবন আসাদ বলল, আচ্ছা, যদি এটা গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, নিজেদের সন্তান ও স্ত্রীলোকদেরকে হত্যা করে চিন্তামুক্ত হয়ে যাও এবং তরবারি ধারণ করে পূর্ণ শক্তি ও সাহসের সাথে মুহাম্মদ (সা)-এর মুকাবিলা কর। এতে অকৃতকার্য হলে স্ত্রী ও সন্তানদের কোন চিন্তা থাকবে না। আর যদি জয়লাভ কর, তা হলে স্ত্রীলোক অনেক আছে এবং তাদের দ্বারা সন্তানও পাবে। বনী কুরায়যা বলল, অকারণে স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করা হলে বেঁচে থাকার আনন্দ কোথায় ?

৩. কা'ব বলল, আচ্ছা, এটাও যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তা হলে তৃতীয় প্রস্তাব এই যে, আজ সপ্তাহের (রোববারের) পূর্ব রাত্রি, এটা আশ্চর্য নয় যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সঙ্গিগণ অসচেতন অবস্থায় আছেন এবং আমাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এ দিন ইয়াহূদীদের নিকট পবিত্র, তাই তারা এ দিনে হামলা করবে না। সুতরাং তোমরা এ সুযোগে আজ রাতেই তাদেরকে রক্তে রঞ্জিত করে লাভবান হতে পারো। বনী কুরায়যা বলল, ওহে কা'ব, তোমার তো জানা আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের এ দিনেরই অমর্যাদা করার কারণে বানর এবং শূকরে পরিণত করা হয়েছে; এরপরও তুমি এ কাজেরই নির্দেশ দিচ্ছ ? মোট কথা, বনী কুরায়যা কা'ব-এর একটি কথাও মানল না।

হযরত আবূ লুবাবা ইবন আবদুল মুনযির (রা)-এর সাথে বনী কুরায়যার মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। এ কারণে তাদের মনে এ আশার সঞ্চার হলো যে, সম্ভবত তিনি এ সঙ্কটময় মুহূর্তে আমাদের কোন সাহায্য করতে পারবেন। এ প্রেক্ষিতে বনী কুরায়যা রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে এ আরয করল যে, আবূ লুবাবাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন যাতে আমরা তার সাথে পরামর্শ করতে পারি। তিনি (সা) আবূ লুবাবা (রা)-কে অনুমতি দিলেন। তারা আবূ লুবাবাকে দেখে সবাই একত্রিত হলো। শিশু এবং মহিলারা তাঁকে দেখে কাঁদতে শুরু করে দিল। তা দেখে আবূ লুবাবা (রা)-এর অন্তর আবেগাপ্লুত হয়ে উঠল। বনী কুরায়যা যখন তাঁকে জানাল যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ মেনে নিতে এবং তাঁর সিদ্ধান্তে সম্মত হতে চাই, তখন আবূ লুবাবা বললেন, হ্যাঁ, উত্তম। তবে কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে বললেন, যবেহ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উদ্দেশ্য হলো তোমাদেরকে হত্যা করা। হযরত আবূ লুবাবা তখনো সেখান থেকে উঠেন নি, অকস্মাৎ তাঁর বোধোদয় ঘটলো যে, আমি তো আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আমানত খিয়ানত করেছি! তিনি সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং নিজেকে একটি থামের সাথে বেঁধে নিয়ে শপথ করলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ তা'আলা আমার তাওবা কবূল করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। তিনি আল্লা্ তা'আলার সাথে এ ওয়াদা করলেন যে, কখনো আর বনী কুরায়যায় পা দেব না এবং যে শহরে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আমানতের খিয়ানত করেছি, সে স্থান কখনো দেখব না। রাসূলুল্লাহ

(সা) যখন এ সংবাদ পেলেন, তখন ইরশাদ করলেন, যদি সে সোজাসুজি আমার কাছে চলে আসত, তা হলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম, কিন্তু যখন সে এমনটি করেছে, তখন আমি নিজ হাতে তাকে মুক্ত করব না, যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবূল না করেছেন।[১]

অবশেষে বাধ্য হয়ে বনী কুরায়যা এতে সম্মত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যে আদেশ দেন, তাতে আমরা সম্মত আছি।

খাযরাজ ও বনী নাযীর গোত্রের মধ্যে যেরূপ মিত্রতার সম্পর্ক ছিল, অনুরূপভাবে আওস ও বনী কুরায়যার মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক ছিল। এ জন্যে আওস সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আবেদন জানাল যে, খাযরাজের সুপারিশে হুযূর (সা) বনী নাযীরের সাথে যে আচরণ করেছিলেন, আমাদের সুপারিশে বনী কুরায়যার সাথে অনুরূপ আচরণ করা হোক। তিনি (সা) বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমাদের বিচার-ফয়সালা তোমাদেরই এক ব্যক্তি করে দিক ? তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'দ ইবন মু'আয যে ফয়সালা করবেন, তাতে আমরা সম্মত আছি।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) যখন খন্দক যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর জন্য মসজিদে নববীর সাথে একটি তাঁবু তৈরি করে দিয়েছিলেন যাতে নিকটে থেকে তার দেখাশোনা করতে পারেন। তাঁকে ডাকার জন্য তিনি লোক প্রেরণ করলেন। সা'দ গাধার পিঠে আরোহণ করে এলেন এবং যখন নিকটে পৌঁছলেন, তখন নবী (সা) সবাইকে বললেন, قوموا الى سيدكم "তোমাদের সর্দারের সম্মানার্থে দাঁড়াও।"[২]

যখন অবতরণ করলেন এবং তাঁকে বসানো হলো, তখন নবীজি বললেন, এরা তাদের ফয়সালার ভার তোমার উপর অর্পণ করেছে। হযরত সা'দ (রা) বললেন, আমি তাদের ব্যাপারে এ ফয়সালা করছি যে, তাদের মধ্যকার যুদ্ধে সক্ষম অর্থাৎ পুরুষদের হত্যা করা হোক, আর নারী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে দাস-দাসীতে পরিণত করা হোক। আর তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হোক। নবী (সা) বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর নির্দেশমত ফয়সালা করেছ। এর পর সা'দ (রা) এ দু'আ করলেন :

'আয় আল্লাহ্! তুমি ভাল করেই জানো, আমার কাছে তা অপেক্ষা বেশি কোন বস্তু প্রিয় ছিল না যে, আমি এ সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করব, যে সম্প্রদায় তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং হেরেম শরীফ থেকে বের করে দিয়েছে। আয় আল্লাহ, আমার ধারণা যে, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছ। কাজেই কুরায়শের সাথে যদি আরো যুদ্ধ অবশিষ্ট থেকে থাকে, তা হলে

---

১. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৪৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১১৯।

২ অথবা এ অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে যে, তোমাদের সর্দারকে বাহন থেকে নামানোর জন্য দাঁড়াও, কেননা তিনি অসুস্থ ছিলেন।

আমাকে জীবিত রাখ, যাতে তোমার পথে আমি তাদের সাথে জিহাদ করতে পারি। আর যদি প্রকৃতই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়ে থাক, তা হলে আমার যখমকে বৃদ্ধি করে দাও এবং একে আমার শাহাদত লাভের মাধ্যম বানিয়ে দাও।'

দু'আ করার অপেক্ষা মাত্র, যখম বৃদ্ধি পেল এবং এতেই তিনি ইনতিকাল করলেন। انا لله وانا اليه راجعون

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, সা'দ ইবন মু'আযের মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছে– এ বর্ণনা বুখারীর। অপর এক বর্ণনায় আছে, আসমানের সমস্ত দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং তার রূহের উর্ধ্বারোহণে আসমানের ফেরেশতাগণ খুশি হয়েছেন– এ বর্ণনা হাকিমের। [ফাতহুল বারী, হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর প্রশংসা] এবং সত্তর হাজার ফেরেশতা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেন, যারা এর পূর্বে কখনো আসমান থেকে অবতরণ করেন নি। (ইবন আয়েয বর্ণিত) বাযযার এটি উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।[1]

সুতরাং আনসারগণের মধ্যে কেউ তাঁর স্মরণে এ কবিতা পাঠ করেন :

وما اهتز عرش الله من موت هالك * سمعنا به الا لسعد ابى عمر

[ইবন আবদুল বার মুকৃত আল-ইস্তিয়াব, ২খ. পৃ. ৩২, হযরত সা'দ ইবন মুআয (রা)-এর জীবন চরিত]।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) ছাড়া আমরা আর কোন মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে এ কথা শুনিনি যে, আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছে, আর তাঁর কবর থেকে মিশকের খুশবু আসছিল। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ১৯৩)

বনী কুরায়যার বাহিনীর সবাইকে বন্দী করে মদীনায় আনা হলো এবং এক আনসারী মহিলার বাড়িতে তাদেরকে আটক করে রাখা হলো। 'বাযারে' তাদের জন্য গর্ত খনন করা হলো এবং দু'-দু', চার-চারজন করে তাদেরকে নেয়া হতো এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে ঐ গর্তে পুঁতে ফেলা হতো। হুয়াই ইবন আখতাব এবং বনী কুরায়যার সর্দার কা'ব ইবন আসাদকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। হুয়াই ইবন আখতাবকে [যার বলায় বনী কুরায়যার সর্দার কা'ব ইবন আসাদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিল এবং চুক্তি ভঙ্গ করেছিল] যখন হযরতের সামনে আনা হলো, তখন হুয়াই তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আল্লাহর কসম, আমি আমার প্রবৃত্তিকে আপনার দুশমনির দরুন ধিক্কার দিচ্ছি না কিন্তু সত্য কথা হলো, আল্লাহ্ যাকে সাহায্য না করেন, তার কোন সাহায্যকারী নেই। আবার লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, ওহে লোক সকল, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, বনী ইসরাঈলের জন্য যে শাস্তি নির্ধারিত ছিল এবং যে বিপদ তাদের জন্য লিখা হয়েছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। এ কথা বলে হুয়াই বসে পড়ল। অতঃপর তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। মহিলাদের মধ্যে কেবল

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১২৮।

একজন ছাড়া অপর কাউকে হত্যা করা হয়নি, যার অপরাধ ছিল, সে ছাদের উপর থেকে যাঁতার একটি অংশ নিচে ফেলে দিয়ে হযরত খাল্লাদ ইবন সুয়ায়দ (রা)-কে শহীদ করেছিল (ইবন হিশাম), তার নাম ছিল বুনানা এবং সে হাকাম কুরাযীর স্ত্রী ছিল (উয়ূনুল আসার, পৃ. ৮৭)।

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবন হিব্বানে হযরত জাবির (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, এদের সংখ্যা ছিল চারশত। বনী কুরায়যার বন্দীদেরকে বিক্রির জন্য নজদ ও সিরিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল এবং বিক্রি মূল্য দিয়ে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছিল। যে সমস্ত গনীমতের মাল বনী কুরায়যা থেকে পাওয়া গিয়েছিল, তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

বনী কুরায়যার ঘটনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন :

وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا - وَاَوْرَثَكُمْ اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ·

"কিতাবীদের মধ্যে যারা ওদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ থেকে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা তাদের কতককে হত্যা করছ আর কতককে করছ বন্দী। তিনি তোমাদেরকে ওদের ভূমির অধিকারী করলেন, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যাতে তোমরা এখনো পদার্পণ করোনি। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"(সূরা আহযাব : ২৬-২৭)

সতর্ক বাণী : বনী কুরায়যার ব্যাপারে হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা)-এর ফয়সালা তাওরাতের বিধান অনুযায়ী হয়েছিল, যার প্রতি তাদের ঈমান ছিল। সুতরাং তাওরাতের সফর ইস্তিসনা, বিংশতম অধ্যায়ের দশম আয়াতে আছে ঃ

"যখন তুমি যুদ্ধের জন্য কোন শহরের নিকটবর্তী হও, প্রথমে তাদেরকে সন্ধির প্রস্তাব দাও; তারা যদি সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং তোমাদের জন্য ফটক খুলে দেয়, তা হলে ঐ জনপদে যত নাগরিক পাওয়া যাবে, সবাই তোমাদেরকে খাজনা দেবে এবং তোমাদের সেবা করবে। আর যদি তারা তোমাদের সাথে সন্ধি না করে বরং যুদ্ধ করে, তবে তাদেরকে তোমরা অবরোধ কর, আর যখন আল্লাহ্ তা'আলা তা তোমাদের করতল দেন, তবে সেখানকার সমস্ত পুরুষকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান কর কিন্তু স্ত্রীলোকদেরকে, বালকদেরকে[১] এবং জীবজন্তুসহ যা কিছু ঐ শহরে আছে, সব কিছু তোমাদের জন্য নিয়ে যাও। তোমাদের প্রভুই সেগুলো ভোগের জন্য তোমাদের দিয়েছেন, (সুতরাং) ভোগ কর।"[২]

১. এদের সবাইকে নিজেদের দাস-দাসী বানাও।

২ যেমন আল্লাহর বাণী : ... ... فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ

আর হযরত আবূ লুবাবা (রা) মসজিদের খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন, কেবল নামায এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সময় খুলে দেয়া হতো। খেতেনও না, পানও করতেন না। বলতেন, আমি এ অবস্থাতেই থাকব, এমনকি হয় মারা যাব অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার তাওবা কবূল করবেন। ছয়দিন পর শেষরাতে তাঁর তাওবা অবতীর্ণ হলো। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর ঘরে ছিলেন। হযরত উম্মে সালমা (রা) নবীজির অনুমতি নিয়ে তাকে সুসংবাদ শোনালেন এবং মুবারকবাদ দিলেন। মুসলমানগণ দৌড়ে এলেন তার বাঁধন খুলে দিতে। আবূ লুবাবা (রা) বললেন, আমি শপথ করেছি যে, যখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা) এসে নিজ হাতে আমার বাঁধন না খুলছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধন খুলব না। কাজেই তিনি যখন ফজরের নামাযের জন্য এলেন, তখন আপন পবিত্র হাতে বাঁধন খুলে দিলেন।

দ্রষ্টব্য : হযরত আবূ লুবাবা (রা)-এর মধ্যে অনুশোচনা এসে গিয়েছিল যে, নিজকে নিজেই মসজিদের থামের সাথে বাঁধেন এবং শপথ করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার তাওবা কবূল না হবে এবং রাসূল (সা) এসে স্বহস্তে আমার বাঁধন না খুলবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় থাকব, এতে যদিও আমার মৃত্যু এসে যায়।—এটা ছিল একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ অবস্থা, যা কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ প্রেমাষ্পদ ও একনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। পারিভাষিক অর্থে একে 'হাল' বলা হয়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। হযরত আবূ লুবাবা (রা) প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ, জেনে শুনে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না" (শেষ আয়াত পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল : ২৭)

আর তাঁর তাওবা কবূলের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلاً صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

"এবং অপর কতক লোকে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে, ওরা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে, আল্লাহ হয়ত ওদের অপরাধ ক্ষমা করবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা তাওবা : ১০২)

হযরত আবূ লুবাবা (রা) বিশদিন পর্যন্ত মসজিদের থামের সাথে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। যখন আয়াত নাযিল হলো, তখন নবী করীম (সা) স্বয়ং মসজিদে আসেন এবং আবূ লুবাবাকে সুসংবাদ শোনান ও নিজ হাতে তার বাঁধন খুলে দেন।

এরদ্বারা জানা গেল যে, উৎসাহ ও ভালবাসার দরুন এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট উত্তম ও প্রিয়, একে অস্বীকার করা উচিত নয়; এ হাল সৃষ্টি হওয়া জ্ঞানত ভালবাসা ও প্রণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। যে সমস্ত ব্যক্তি সম্মানিত সূফিগণের 'হাল' ও 'উজদ'-কে অস্বীকার করেন, মনে হয় যে, তাদের অন্তঃকরণ ভালবাসার উন্মাদনা থেকে শূন্য। যখন মানুষের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তখন তার হুঁশ থাকে না; পাত্রের নিচে যখন আগুন বেশি হবে, তখন পাত্রস্থিত বস্তু উথলিয়ে পড়তে বাধ্য। মোট কথা, উজদ ও হাল-কে অস্বীকার করা অসম্ভব ও দুরূহ।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর নির্দোষের ব্যাপারে যখন কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে বললেন, ওহে মেয়ে, উঠো এবং রাসূলুল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা বললেন : انا لا اشكر الا ربى "আমি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শুকরিয়া আদায় করব না।"

এটাও কৃতজ্ঞতা ও উজদের একটা অবস্থা ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত এ অতুলনীয় উপহার দেখে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে এ পর্যায়ের নেশাগ্রস্থ বানিয়ে দেয়া হয় যে, নবী করীম (সা)-এর শোকর আদায় করাকেও তিনি অস্বীকার করে বসলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ (সা) এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এতে জানা গেল যে, হাল অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপারগ, অন্যথায় এ সব কিছুই তো প্রকৃতপক্ষে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হওয়ারই বরকত ছিল। (এ ছাড়া একে খুশিজনিত অভিমানও বলা যায় বৈ কি)। পবিত্রতা বিষয়ক এ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একটা বড় ধরনের অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে মর্যাদার উত্তুঙ্গ চূড়ায় সমাসীন হয়েছিলেন, এ অবস্থায় এমন বাক্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র) তাঁর মাদারিজুন-নবূওয়াতে এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন।

হযরত যয়নব (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর বিবাহ

এ বছরেই অর্থাৎ হিজরী পঞ্চম বর্ষে মহানবী (সা) হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিবাহ করেন।

قال قتادة والواقدى وبعض اهل المدينة بزوجها عليه السلام ينة خمسو زاد بعضهم فى ذى القعدة قال الحافظ البيهقى تزوجها جد بنى قريضة وقال خليفة بن خياط وابو عبيدة ومعمر بن المثنى وابن مندة تزوجها سنة ثلاث والاول اشهر وهو الذى سلكه ابن جرير وغير واحد من اهل التاريخ ·

"কাতাদা, ওয়াকিদী এবং মদীনার কতিপয় আলিমের মতানুযায়ী মহানবী (সা) পাঁচ হিজরী সনে হযরত যয়নব (রা)-কে বিয়ে করেন এবং কেউ কেউ এর সাথে

অতিরিক্ত বৃদ্ধি করেছেন যে, যিলকদ মাসে করেছেন। আর ইমাম বায়হাকী বলেন, হযরত যয়নব (রা)-কে তিনি বনী কুরাইযা যুদ্ধের পর বিয়ে করেছেন। খলীফা ইবন খায়্যাত, আবূ উবায়দা, মা'মার এবং ইবন মান্দাহ বলেন, তৃতীয় হিজরীতে এ বিবাহ হয়েছিল। তবে প্রথম বক্তব্য অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীতে বিবাহ হওয়াই বেশি প্রসিদ্ধ এবং এটাকেই ইবন জারীর ও অপরাপর ইতিহাসবিদ গ্রহণ করেছেন।" (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ৪৫)।

হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র সহধর্মিণিগণের বর্ণনায় আসবে ইনশা আল্লাহ্।

পর্দার বিধান অবতরণ

হযরত যয়নব (রা)-এর বিবাহের ওলীমার সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ সূরা আহযাবের এ আয়াত :

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ·

"তোমরা তার পত্নীদের নিকট থেকে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।" সূরা আহযাব : ৫৩

এ আয়াতকে 'আয়াতে হিজাব' বলে যে, স্ত্রীলোকগণ এমন পুরুষের সামনে আসবে না, যার সাথে তার বিবাহ বৈধ। আর সূরা নূরে যে আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে :

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ ... ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ·

"মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে..যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর : ৩১)

এ আয়াতে দ্বিতীয় দফা সতর সম্পর্কীয় বিধান নাযিল হয়। একে 'আয়াতে সতর' বলা হয়। অর্থাৎ শরীরের কতটুকু অংশ সব সময় ঢেকে রাখা জরুরী এবং শরীরের কতটা অংশ খোলা রাখা জায়েয; যেমন গৃহে মুখমণ্ডল এবং হাতের অগ্রভাগ ঢাকা ওয়াজিব নয়, এ অঙ্গকে যদি গৃহেও সব সময় ঢেকে রাখা ওয়াজিব ও ফরয হতো, তা হলে তা কঠিন হয়ে যেত; তবে তার অর্থ এ নয় যে, যার সামনে ইচ্ছা, খুলে দাও! যদি সবার সামনে মুখমণ্ডল খুলে রাখার অনুমতি থাকত, তা হলে হিজাব ও পর্দার আদেশ অবতরণে কি লাভ হলো। এর বিস্তারিত বিবরণও ইনশা আল্লাহ্ হযরত যয়নব (রা)-এর ঘটনায় আসবে।

ষষ্ঠ হিজরী

হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর কুরতা[1] অভিযান (১০ মুহররম, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর দশই মুহররম রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামা আনসারী (রা)-এর নেতৃত্বে উনিশজন অশ্বারোহীকে কুরতার দিকে প্রেরণ করেন। তাঁরা গিয়ে সেখানে দুশমনদের ওপর আক্রমণ করেন। এতে দশজন নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করে। গনীমত হিসেবে দেড়শত উট ও তিন হাজার বকরি হস্তগত হয়। সব কিছু নিয়ে তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হন। উনিশ দিন পর উনত্রিশে মুহররম তারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এক-পঞ্চমাংশ বের করে নিয়ে অবশিষ্ট গনীমতের মাল যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করা হয়। বন্টনকালে একটি উটকে দশটি বকরির বিনিময় নির্ধারণ করা হয়।[2]

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ বাহিনী বনী হানীফা গোত্রের সর্দার সুমামা ইবন উসালকে গ্রেফতার করে নবী (সা)-এর খিদমতে আনয়ন করে। তিনি তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দেন (যাতে করে মুসলমানদের নামায ও ইবাদত তার দৃষ্টিগোচর হয়, যা দেখে আল্লাহকে স্মরণ এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়, এর নূরের বরকতে তার অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত হয়)।

রাসূলুল্লাহ (সা) তার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি ? সুমামা বললেন, আপনার ব্যাপারে আমার ধারণা উত্তম।

ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل منه ماشئت .

"যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে এক খুনীকে হত্যা করবেন, যে হত্যার যোগ্য; আর যদি পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পুরস্কৃত ও অনুগৃহীত করবেন; আর যদি ধন-সম্পদ উদ্দেশ্য হয়, তা হলে যে পরিমাণ চাইবেন, উপস্থিত করব।"

রাসূলুল্লাহ (সা) এ কথা শুনে নীরবে প্রস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিন আবার তিনি ঐদিক দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং সুমামাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা, আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা কি ? সুমামা তাঁর দয়ার্দ্র চিত্তের বিষয় উপলব্ধি করতে পেরে

---

১. কুরতা বনী বকর গোত্রের একটি শাখা, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে সাত দিনের দূরত্বে যারবা নামক স্থানে তারা বাস করতো। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৪।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৬।

প্রথম ও তৃতীয় বাক্য বিলুপ্ত করে দিলেন এবং শুধু বললেন, ان تنعم على شاكر "যদি (আমার প্রতি) অনুগ্রহ করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন।"

এ কথা শুনে তিনি নীরবে চলে গেলেন। তৃতীয় দিন আবার ঐ পথে গেলেন এবং একই প্রশ্ন করলেন। সুমামা বললেন, আমার ধারণা তাই, যা আমি কাল বলেছি।

আজ সুমামা ان تنعم على شاكر 'যদি (আমার প্রতি) অনুগ্রহ করেন, তবে এক কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন' কথাটিও লুপ্ত করে দিলেন। তার বিষয়টি সুন্দর সৃষ্টি ও দয়ার্দ্র ও ক্ষমাশীল নবীর প্রতি ছেড়ে দিলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি খোদ সুমামাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : قد عفوت عنك يا ثمامة واعتقتك "ওহে সুমামা, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম ও মুক্তি দিলাম।"

সুমামা মুক্ত হওয়া মাত্রই মসজিদের নিকটে অবস্থিত একটি বাগানে গিয়ে গোসল করলেন; অতঃপর পুনরায় মসজিদে ফিরে এসে বললেন : "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল।"

আর নবীজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "হে মুহাম্মদ (সা)! আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার চেহারা অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কোন চেহারা আমাকে এত অধিক ক্রোধান্বিত করত না, আর আজ আমার কাছে পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা প্রিয় আর কোন চেহারা নেই। এর পূর্বে আপনার ধর্ম অপেক্ষা অপর কোন ধর্ম আমাকে এতটা রাগান্বিত করে নি। আজ আপনার ধর্মই আমার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আর আপনার শহর অপেক্ষা কোন শহর আমার নিকট অপ্রিয় ছিল না; আজ আপনার শহর অপেক্ষা আমার কাছে আর কোন প্রিয় শহর নেই। আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় আপনার অশ্বারোহী বাহিনী আমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে। এবারে যা আজ্ঞা হয়।" তিনি তাকে উমরা করার অনুমতি দিলেন এবং সুসংবাদ দিলেন (অর্থাৎ তুমি নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন থাকবে, কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না)।

হযরত সুমামা (রা) যখন মক্কায় এলেন, তখন জনৈক কাফির বলল, সুমামা, তুমি বেদীন হয়ে গিয়েছ। সুমামা বললেন, কখনই নয়, আমি তো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। অর্থাৎ আমি তো বেদীন হইনি, এ জন্যে যে, কুফর ও শিরক তো কোন দীন নয়, বরং অনর্থক ও ফালতু ধারণা, আমি তো আল্লাহর অনুগত ও আজ্ঞাবহ বান্দায় পরিণত হয়েছি এবং নিজেকে তাঁরই হাওলায় সোপর্দ করেছি। আল্লাহর কসম, আমি কখনই আর তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করব না। এ কথা ভাল করে জেনে নাও যে, সুমামার মাধ্যমে যে খাদ্যশস্য তোমাদের কাছে আসত, রাসূলুল্লাহ (সা) অনুমতি না দিলে তার একটি দানাও আর আসবে না। হযরত সুমামা (রা)

ইয়ামামা পৌঁছে খাদ্যশস্য আসা বন্ধ করে দিলেন। কুরায়শরা বাধ্য হয়ে নবী (সা)-এর দরবারে আরযী লিখে পাঠাল যে, আপনি তো আত্মীয়তার হক আদায়ের নির্দেশ দেন, আর আমরা তো আপনারই আত্মীয়-স্বজন। আপনি সুমামাকে লিখে দিন যে, খাদ্যশস্য প্রেরণ পূর্বের ন্যায় বহাল রাখা হোক। তিনি পত্র লিখিয়ে হযরত সুমামা (রা)-এর কাছে প্রেরণ করলেন যে, খাদ্যশস্য বন্ধ করো না। (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৬৮, অধ্যায় : বনী হানীফ প্রতিনিধি)।

মাসআলা : যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব (যেমনটি ফাতহুল কাদীরে বর্ণিত হয়েছে)। হযরত সুমামা ইবন উসাল (রা) বিশিষ্ট সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতের পর যখন ইয়ামামার অধিবাসীরা মুরতাদ এবং মুসায়লামা কাযযাবের অনুসারী হলো, তখন হযরত সুমামা (রা) জনগণের সামনে এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لاَ اِلٰهَ الاَّ هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে– যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তাওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট।" (সূরা মু'মিন : ১–৩)

অতঃপর বললেন, ইনসাফের দৃষ্টিতে বিবেচনা করে দেখ, এ পবিত্র কালামের সাথে মুসায়লামা কাযযাবের কি সম্পর্ক ?

হযরত সুমামা (রা)-এর এ সত্যধর্মী ও একনিষ্ঠতায় ভরপুর কথার প্রভাব হলো; তিন হাজার মানুষ মুসায়লামা কাযযাবের সঙ্গ ত্যাগ করে ইসলামে দাখিল হলো। (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৪)।

ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, যখন ইয়ামামাবাসী মুরতাদ হয়ে যায়, তখন হযরত সুমামা (রা) লোকজনকে মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণ থেকে বিরত রাখেন এবং বলেন :

اياكم وامرا مظلما لانور فيه وانه لشقاء كتبه الله عز وجل على من اخذ به منكم وبلاء على من لم ياخذ منكم يابنى حنيفة ·

"ওহে লোক সকল ! তোমরা নিজেদেরকে এ অন্ধকারাচ্ছন্ন কাজ থেকে রক্ষা কর যেখানে আলোর লেশমাত্র নেই। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এটা বদনসীবি, যা আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকের নসীবে লিখে দিয়েছেন যারা তা গ্রহণ করেছে। আর এটা তাদের জন্য মুসীবত ও পরীক্ষা, যারা তা গ্রহণ করেনি। হে বনী হানীফ, এ উপদেশ ভাল করে বুঝে নাও।"

কিন্তু হযরত সুমামা (রা) যখন দেখলেন যে, উপদেশে কাজ হচ্ছে না এবং মানুষ বেশি বেশি তার অনুসারী হয়ে যাচ্ছে, তখন যে সমস্ত মুসলমান তার সাথে ছিলেন, তাদেরকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এ শহরে অবশ্যই থাকব না; আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ফিতনায় জড়িয়েছেন। যে আমার সাথে যেতে ইচ্ছুক, সে যেতে পারে। সুমামা (রা) মুসলমানদের একটি দল সাথে নিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলেন এবং হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা)-এর সাথে মিলিত হলেন। এ ব্যাপারে হযরত সুমামা (রা) কিছু কবিতার পংক্তি আওড়ালেন :

دعانا الى ترك الديانة والهدى * مسيلمة الكذاب اذجاء يسجع

"মুসায়লামা কাযযাব আমাদেরকে দীন ও হিদায়াত ছেড়ে দিতে আহ্বান করে, যে সময় সে গণকের মত কিছু ছন্দোবদ্ধ কথা বলে,

فيا عجبا من معشر قد تنابعوا * له فى سبيل الغى والفى اشنع

"আশ্চর্যজনক ঐ লোকদের আচরণ যারা তার অনুসরণের মাধ্যমে ভ্রষ্ট পথের অনুসারী হলো, অথচ গুমরাহী খুবই বড় জিনিস।" [যেমনটি ইবন আবদুল বার কৃত আল-ইস্তিয়াব-এ হযরত সুমামা (রা)-এর জীবন চরিত অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে]।

বনী লিহয়ানের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর পয়লা রবিউল আউয়াল নবী করীম (সা) নিজেই হযরত আসিম ইবন সাবিত (রা), হযরত খুবায়ব ইবন আদী (রা) এবং অপরাপর শহীদ সাহাবীগণের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দু'শো সঙ্গী সহ রওয়ানা দেন। বনী লিহয়ান তাঁর আগমন সংবাদ পাওয়ামাত্রই পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। দু'-একদিন এখানে অবস্থানের পর তিনি বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে চারপাশে প্রেরণ করেন। যাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কেও দশজন যোদ্ধাসহ প্রেরণ করেন। এখান থেকে তিনি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মদীনা ফিরে আসেন। তাঁর পবিত্র মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছিল : انبون تائبون عابدون ربنا حامدون اعوذ بالله من وعشاء السفر وكابه المنقلب وسوء المنظر فى الاهل والمال (তাবাকাতে ববিন সা'দ, ২খ. পৃ. ৫৬; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৪৭)।

যী-কারাদের যুদ্ধ (রবীউল আউয়াল, ষষ্ঠ হিজরী[১])

যী-কারাদ একটি ঝর্ণার নাম, যা ছিল গাতফান বসতির সন্নিকটে। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উটের চারণভূমি। উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারী চল্লিশজন

১. এ যুদ্ধের তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইবন সা'দ বলেন, এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়, ইমাম বুখারী (র) বলেন, সপ্তম হিজরীতে খায়বর যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয় কিন্তু সমস্ত আলিম এ ব্যাপারে একমত যে, এ যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫২ দেখুন।

অশ্বারোহীর একটি বাহিনীসহ ঐ চারণ ভূমিতে হামলা করে উট ও বকরিগুলো নিয়ে যায়। এরা ঐ চারণ ভূমিতে উট-বকরিগুলোর তত্ত্বাবধায়ক হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর পুত্রকে হত্যা করে এবং হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যায়।

খবর পাওয়ামাত্র হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) তাদের প্রতিহত করার জন্য রওয়ানা দেন এবং একটি টিলায় উঠে দাঁড়িয়ে "ইয়া সাবাহাহ" বলে তিনবার আওয়াজ দেন, যা মদীনার অলি-গলিতে প্রতিধ্বনিত হয়। হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) ভাল তীরন্দাজ ছিলেন। দৌড়ে গিয়ে তিনি একটি ঝর্ণার কাছে ওদের ধরে ফেললেন। তিনি ওদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলেন এবং মুখে এ কবিতা আওড়াতে থাকলেন : انا ابن الاكوع واليوم ليوم الرضع

"আমি আকওয়ার পুত্র, আজকের দিনে বুঝা যাবে যে, কে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের দুধপান করেছে, আর কে নীচ বংশের।"

এমনকি তিনি সমস্ত উট তাদের থেকে ছিনিয়ে নেন এবং ওদের ত্রিশটি ইয়েমেনী চাদরও ছিনিয়ে নেন। তার যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) পাঁচশ' অথবা সাতশ' লোক নিয়ে রওয়ানা হন এবং দ্রুতবেগে চলে সেখানে পৌঁছেন। তবে তিনি রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই কয়েকজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেছিলেন। তারা পূর্বেই পৌঁছে ওদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন। মুশরিকদের দু'ব্যক্তি নিহত হয়, একজন মুসআদা ইবন হাকামা, যাকে হযরত আবূ কাতাদা (রা) হত্যা করেন এবং অপরজন আবান ইবন উমর, যাকে হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা) হত্যা করেন। মুসলমানদের মধ্যে হযরত মুহরিয ইবন নাযলা (রা) যাঁর উপাধি ছিল আখরাম,[১] আবদুর রহমান ইবন উয়ায়নার হাতে শহীদ হন।

হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) নবীজির খিদমতে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওদেরকে অমুক জায়গায় তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রেখে এসেছি। যদি আমাকে একশ' লোক দেয়া হয় তা হলে আমি ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে আনতে পারি। রাসূল (সা) বললেন : يا ابن الاكوع ملكت فاسجع "ওহে ইবন

১. হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) বলেন, আখরাম (রা) ছিলেন সবার অগ্রভাগে এবং তাঁর পেছনে ছিলেন আবূ কাতাদা (রা), আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে বললাম, এত জোরে যেও না, পাছে ওরা তোমাকে মেরে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সঙ্গীগণের অপেক্ষা কর। আখরাম (রা) বললেন, ওহে সালমা, যদি তুমি আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস রেখে থাক এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকার সম্বন্ধে জেনে থাক, তা হলে আমার এবং আমার শাহাদতের মাঝখানে অন্তরায় হবে না। হযরত সালমা (রা) ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দেন এবং হযরত আখরাম (রা) সামনে অগ্রসর হন ও সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তিনি আবদুর রহমান ইবন উয়ায়নার হাতে শাহাদত লাভ করেন। এর পর হযরত আবূ কাতাদা (রা) অগ্রসর হন এবং আবদুর রহমানকে বর্শা মারেন। এক আঘাতে সেও নিহত হয়। ইসাবা, ৩খ. পৃ. ৩৬৮, হযরত মুহরিয ইবন নাযলা (রা)-এর জীবন চরিত; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬০।

আকওয়া, যখন তুমি কাউকে বেকায়দা অবস্থায় পাও, তখন তার সাথে নরম ব্যবহার কর।"[১]

মুশরিকগণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করল আর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে এক দিবারাত্র অবস্থান করেন এবং সালাতুল খাওফ পড়েন। পাঁচদিন পর তাঁরা মদীনায় ফিরে আসেন (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৩)।

গামরে[২] হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)-এর অভিযান

এ রবিউল আউয়াল মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উক্কাশা ইবন মিহসান (রা)-এর নেতৃত্বে চল্লিশজনের একটি বাহিনী গামর অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু সংবাদ পেয়েই শত্রুরা পালিয়ে যায়। যখন সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না, তখন শুজা ইবন আকওয়া (রা)-কে তাদের সন্ধানে আশেপাশে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তাদের পশুগুলোর সংবাদ পাওয়া গেল না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার হাতে ধরা পড়ে যায়। তাকে সন্ধান জিজ্ঞেস করে সেখানে গিয়ে আক্রমণ করে দু'শো উট গনীমত হিসেবে পাওয়া যায় (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬১)।

যিল-কাসসা[৩] অভিমুখে হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর অভিযান ও একশ' লোকের শাহাদত

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস-সানী মাসে মহানবী (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর নেতৃত্বে দশজনের একটি বাহিনী বনী সা'লাবা এবং বনী উয়ালের মুকাবিলা করার জন্য যিল-কাসসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা রাতে সেখানে পৌঁছেন এবং পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়েন। শত্রুরা পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল। যখন মুসলিম মুজাহিদগণ ঘুমিয়ে পড়েন, তখন রাতের আঁধারে তাদের একশ' ব্যক্তি এসে আক্রমণ চালিয়ে সবাইকে শহীদ করে। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) আহত হন এবং ওরা তাঁকে মৃত ভেবে ছেড়ে যায়। জনৈক মুসলমান ঐ দিক দিয়ে অতিক্রম করাকালে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-কে উঠিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন।

যিল-কাসসা অভিমুখে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর অভিযান

রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নেতৃত্বে চল্লিশজনের একটি বাহিনী যিল-কাসসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনী পৌঁছেই সেখানে আক্রমণ চালান। শত্রুরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাদের পশুপাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানকে দ্বিতীয় যিল-কাসসা অভিযান বলা হয়।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৩।

২. গামর একটি জলাশয়ের নাম।

৩. যিল-কাসসা একটি স্থানের নাম, যা মদীনা থেকে বিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যারকানী

জমূম অভিযান

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস-সানী মাসেই রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে বনী সালিমের মুকাবিলা করার জন্য মদীনা থেকে চার মাইল দূরে জমূম নামক স্থানে প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছে একজন মহিলা পাওয়া যায়, যে তাদের সন্ধান বলে দেয়। কিছু বন্দী, কিছু উট এবং কিছু বকরি নিয়ে তিনি দু'দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।[১]

ঈস অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

রাসূলুল্লাহ (সা) জানতে পারেন যে, কুরায়শের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র তিনি হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে একশ' সত্তরজন অশ্বারোহীর একটি বাহিনী ঈস-এর দিকে প্রেরণ করেন।

স্থানটি মদীনা থেকে চার দিনের দূরত্বে সমুদ্রোপকূলের নিকটে অবস্থিত। এদিক দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করে।

মুসলমানগণ সেখানে পৌঁছে কাফেলার সবাইকে গ্রেফতার করে এবং পণ্য সামগ্রী হস্তগত করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বন্দীদের মধ্যে নবী (সা)-এর জামাতা আবুল আস ইবন রবী'ও ছিলেন। নবী দুহিতা হযরত যয়নব (রা) তাকে আশ্রয় দেন ও তিনিও তাকে আশ্রয় দেন এবং তার মালপত্র ফিরিয়ে দেন।[২]

হযরত আবুল আস (রা)-এর প্রত্যাবর্তন ও তার ইসলাম গ্রহণের বিস্তারিত ঘটনা বদর যুদ্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারিফ অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হিজরী)

তারিফ একটি জলাশয়ের নাম, যা মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। নবী (সা) বনী সা'লাবাকে দমন করার জন্য হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বোব পনেরজনের একটি দল ঐ জলাশয়ের দিকে প্রেরণ করেন। শত্রুরা পলায়ন করে এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) কিছু উট ও বকরি নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

হাসমা[৩] অভিযান (জমাদিউস-সানী, ষষ্ঠ হিজরী)

হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) নবী (সা)-এর পত্র নিয়ে রোম সম্রাট কায়সারের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন, কায়সারের দেয়া উপহার-

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬২; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৫।

২ তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৩।

৩. হাসমা ওয়াদিউল কুরার নিকটবর্তী একটি জনপদ, যেখানে জুযাম গোত্র বাস করত। ইবন সা'দ ও ইবন সায়্যিদুন-নাস বলেন, এ অভিযান ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে চালানো হয়েছিল আর হাফিয ইবন কায়্যিম বলেন, এ ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের। কেননা হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই রোম সম্রাট কায়সারের নিকট পত্র সহ হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৮।

উপঢৌকনও তাঁর সঙ্গে ছিল। তিনি যখন হাসমার নিকটে পৌঁছলেন, তখন হুনায়দ জুযামী তার গোত্রের কয়েক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে এবং মাত্র একটি পুরাতন ও ছেঁড়া চাদর ছাড়া সমস্ত কাপড়-চোপড় এবং মালপত্র ছিনিয়ে নেয়। হযরত রিফাআ ইবন যায়দ জুযামী (রা) (যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) এ সংবাদ পাওয়ামাত্র কয়েকজন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন এবং হুনায়দের নিকট থেকে ছিনতাইকৃত সকল মালপত্র উদ্ধার করে হযরত দাহিয়া (রা)-কে ফিরিয়ে দিলেন। দাহিয়া (রা) মদীনা পৌঁছলেন এবং নবী (সা)-কে এ ঘটনার ব্যাপারে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর নেতৃত্বে পাঁচশত সাহাবীকে হাসমা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এ বাহিনী রাতে পথ চলতো আর দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতো। অতঃপর সেখানে পৌঁছেই তাদের উপর আক্রমণ চালালে এ হামলায় হুনায়দ জুযামী এবং তার পুত্র নিহত হয়। এ অভিযানে একশ' মহিলা ও শিশু বন্দী হয়, এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরি হস্তগত হয়। মুসলিম বাহিনীর সাথে যেহেতু হযরত রিফাআ ইবন যায়দ জুযামী (রা)-এর মুসলিম সঙ্গীরাও থাকতেন, ভুলক্রমে তাদের কিছু সংখ্যক নারী-শিশুও বন্দী হয়। রিফাআ ইবন যায়দ (রা) নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাঁর সাথে দেন এবং বলে দেন, তিনি যেন সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে এবং তাদের সকল মাল-সামান, এমনকি বিছানা-হাওদা পর্যন্ত ফেরত দেয়ার জন্য যায়দ (রা)-কে নির্দেশ দেন।[১]

ওয়াদিউল কুরা[২] অভিযান (রজব মাস, ষষ্ঠ হিজরী)

ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে নবী (সা) বনী ফাযারাকে পরাভূত করার জন্য হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এতে কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন এবং যায়দ ইবন হারিসা (রা) আহত হন।

দুমাতুল জন্দল অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) মসজিদে অবস্থানরত, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ, হযরত মুআয ইবন জাবাল, হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য সকল সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাঁর সামনে উপস্থিত। ইতোমধ্যে এক যুবক আনসারী সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। অতঃপর আরয করলেন, يا رسول الله اى المؤمنين افضل "ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম মুসলিম কে ?" রাসূল (সা) বললেন, احسنهم اخلاقا "যার আখলাক (চরিত্র) সর্বোত্তম।" কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস

১. ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৫৮।

২ ওয়াদিউল কুরা সিরিয়ার পথে মদীনা মুনাওয়ারার নিকটবর্তী একটি জনপদের নাম। যারকানী

করলেন, فاى المؤمنين اكيس "কোন মুসলমান সবচে' অধিক বুদ্ধিমান ও সতর্ক ?" তিনি বললেন, اكثرهم للموت ذكرا واكثرهم استعداد له قبل ينزل به اولئك هم الاكياس "যে ব্যক্তি মৃত্যুকে সবচে' বেশি স্মরণ করে ও তার আলোচনা করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে, এরূপ ব্যক্তিই সবচে' অধিক বুদ্ধিমান ও সতর্ক।"

এ কথা শুনে আনসারী যুবকটি তো চুপ রইলেন, আর হযরত (সা) উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে বললেন : "পাঁচটি বস্তু সবচে' অধিক ভয়ঙ্কর। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এগুলো থেকে হিফাযত করুন এবং সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিদান থেকেও রক্ষা করুন।

১. যে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নির্লজ্জতা বিস্তার লাভ করে, সে সম্প্রদায়ে মহামারী ও এমন ব্যাধির বিস্তার ঘটবে, যা পূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

২. যে সম্প্রদায় ওজন ও মাপে কম দেয়, তারা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হবে এবং তাদের উপর অত্যাচারী যালিম শাসক চেপে বসবে।

৩. যে সম্প্রদায় মালের যাকাত আদায় করে না, তাদের প্রতি বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়; পশুপাখি না থাকলে তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হতো।

৪. যে সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে, তাদের ওপর আল্লাহ্ অজ্ঞাত দুশমন চাপিয়ে দেন এবং ভিন সম্প্রদায়ের লোক তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে তাদের সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেয়।

৫. সমাজের নেতা ও বিচারকগণ যখন আল্লাহর বিধান গ্রন্থের বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং অহংকারী ও দাম্ভিক হয়ে পড়ে, তখন আল্লাহ্ তাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করে দেন।"

পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে আদেশ করলেন যে, তুমি প্রস্তুত হও, আমি আজ অথবা কাল তোমাকে একটি কাজে প্রেরণ করব। পরের দিন তিনি নামায শেষ করলেন এবং হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে ডেকে এনে নিজের সামনে বসালেন। হযরত (সা) একটি কালো রঙের পাগড়ি তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়ে পেছনে চার আঙ্গুল পরিমাণ ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন, ওহে ইবন আউফ! এভাবে পাগড়ি বাঁধবে, এটা উত্তম। এর পর তিনি একটি ঝান্ডা এনে আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে দেয়ার জন্য বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন। তারপর হযরত (সা) মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন ও দরূদ পাঠ করে আবদুর রহমান ইবন আউফকে উদ্দেশ করে বললেন, এ ঝান্ডা নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে যাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, তার সাথে যুদ্ধ করবে, প্রতারণা ও ফাসাদ করবে না, কারো নাক-কান কাটবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না। এটা আল্লাহর অঙ্গিকার এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।

সাতশ' লোক সহ তাঁকে দুমাতুল জন্দলে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন, যদি তারা তোমাদের দাওয়াত কবূল করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে, তা হলে তাদের সর্দারের কন্যাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করবে না।

হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) রওয়ানা হলেন এবং সেখানে পৌঁছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিন দিন পর্যন্ত একাদিক্রমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকলেন। তৃতীয় দিন দুমাতুল জন্দলের প্রধান আসবাগ ইবন উমর ইসলাম গ্রহণ করলেন, যিনি ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান ছিলেন। আর তার সাথে আরো অনেক লোক ইসলাম কবূল করলেন। আর নবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-এর বিবাহ সেখানকার প্রধান আসবাগের কন্যা তুমাযিরের সাথে সম্পন্ন হয়। আবদুর রহমান (রা) তাকে সাথে নিয়ে মদীনায় আসেন এবং বিশিষ্ট তাবিঈ ও বিখ্যাত হাফিয আবূ সালমা ইবন আবদুর রহমান তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[১]

ফিদক অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস)

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে সংবাদ আসে যে, সা'দ ইবন বকর খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে ফিদকের সন্নিকটে সেনা সমাবেশ ঘটিয়েছে। তিনি হযরত আলী (রা)-এর নেতৃত্বে একশত ব্যক্তিকে ফিদক অভিমুখে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে তারা এক ব্যক্তির সাক্ষাত পান। তাকে ভয় দেখিয়ে এবং ধমক দিয়ে জানা যায়, সে ঐ বনী সা'দের গুপ্তচর। তাকে নিরাপত্তা দিয়ে শত্রুর ঠিকানা জিজ্ঞেস করা হলে সে সঠিক ঠিকানা বলে দেয়। তদনুযায়ী পৌঁছে মুসলমানগণ শত্রু দলের উপর হামলা চালায়। বনী সা'দ পালিয়ে যায় এবং মুসলিম বাহিনী মালে গনীমত হিসেবে পাঁচশত উট ও দু'হাজার বকরি নিয়ে ফিরে আসেন।

উম্মে কিরাফা অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাস)

উম্মে কিরাফা ছিল জনৈকা মহিলার উপনাম, যার নাম ছিল ফাতিমা বিনতে রবীয়া। এ মহিলা বনী ফাযারার সর্দার ছিল। একবার হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ব্যবসায়ের পণ্য নিয়ে এ পথে সিরিয়া যাচ্ছিলেন। বনী ফাযারার লোকজন তাঁকে মারপিট করে আহত করে এবং তার অর্থ-সম্পদ, মালামাল ছিনিয়ে নেয়। হযরত যায়দ (রা) মদীনায় ফিরে আসেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দমনের উদ্দেশ্যে হযরত যায়দের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা সাফল্যের সাথে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ৬৩; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ১৫।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৬২।

আবূ রাফে' ইবন হুকায়ক ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উতায়ক (রা)-এর অভিযান

আবূ রাফে ইয়াহূদীকে মৃত্যুদণ্ড দানের বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় হিজরীর ঘটনাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য কেবল এটুকু বলা যে, কোন কোন আলিমের মতে আবূ রাফে'র ঘটনা তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয় এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরীতে আর কারো মতে ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য যারকানী দেখুন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস)

আবূ রাফের মৃত্যুদণ্ডের পর ইয়াহূদিগণ উসায়ের ইবন রিযামকে নিজেদের নেতা ও সর্দার মনোনীত করে। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে এবং গাতফান গোত্র ও অপরাপর গোত্রসমূহকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। রাসূল (সা) এটা জানতে পেরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে তিন ব্যক্তিসহ বাস্তব পরিস্থিতি জানার জন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) ফিরে এসে খবর দেন যে, ঘটনা সত্য। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর নেতৃত্বে এ নিয়ে আলোচনার জন্য তাকে ডেকে আনতে ত্রিশ ব্যক্তি প্রেরণ করেন।

উসায়ের ইবন রিযামও ত্রিশ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে রওয়ানা করে। প্রত্যেক উটে দু'জন করে মানুষ ছিল, একজন ইয়াহূদী ও একজন মুসলমান। পথে এসে তাদের উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। উসায়ের ইবন রিযাম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়েস (রা) এক উটের উপর ছিলেন। উসায়ের দু'বার হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়েস (রা)-এর উপর তরবারি চালাতে চেষ্টা করে কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা) সতর্ক হয়ে যান। দু'বার তো কাটিয়ে দেন, উসায়ের যখন তৃতীয়বার এ প্রচেষ্টা চালায়, তখন দু'পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে সকল ইয়াহূদী নিহত হয়। তাদের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তি বেঁচে যায়, যে পালিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানদের মধ্যে কেউ নিহত হননি, কেবল হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা) আহত হন। অতঃপর তারা যখন মদীনায় ফিরে আসেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, قد نجاكم الله من القوم الظالمين "আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যালিমদের হাত থেকে নাজাত দিয়েছেন।" আর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন উনায়সের আঘাতের স্থানে থু থু লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আঘাত সেরে যায় এবং তিনি তার বুকে হাত বুলিয়ে দু'আ করেন।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

উরায়না গোত্রের লোকদের প্রতি হযরত কুরয ইবন জাবির ফিহরী (রা)-এর অভিযান (ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস)

উকল এবং উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে। কিছুদিন পর তারা নবী (সা) সমীপে এসে আরয করে যে, আমরা পশুপালক সম্প্রদায়ের লোক, দুধই আমাদের খাদ্য, অন্য খাদ্যশস্যে আমরা অভ্যস্ত নই। মদীনার আবহাওয়াও আমাদের অনুকূল নয়, এ জন্যে আমাদেরকে যদি শহরের বাইরে উটের চারণভূমিতে অবস্থান এবং উটের দুধপানের অনুমতি দেন, তা হলে ভাল হতো।

নবী (সা) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং শহরের বাইরে চারণভূমিতে যাকাতের উট থাকত। সেখানে তাদের থাকার ও উটের দুধপানের অনুমতি দেন। কিছু দিনের মধ্যেই তাদের শরীর সবল, সুঠাম ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। আসলে তারা ছিল দুকৃতকারী। একদা তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। তারা নবী (সা)-এর রাখালকে হত্যা করে, তার হাত-পা ও নাক-কান কেটে দেয়, চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং যাকাতের উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) ষষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাসে[১] হযরত কুরয ইবন জাবির ফিহরী (রা)-এর নেতৃত্বে প্রায় বিশজনের একটি দলসহ তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁরা সবাইকে খুঁজে এনে বন্দী করেন। নবী (সা) এ বিশ্বাসঘাতকদের থেকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নির্দেশ দেন। ফলে যেভাবে তারা ঐ রাখালকে হত্যা করে, সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয় যে, কোন অপরাধী, সে যত কঠিন অপরাধেই অপরাধী হোক না কেন, কখনই কাউকে এ ধরনের শাস্তি দেয়া যাবে না। ইসলামে প্রথম থেকেই কঠিন থেকে কঠিনতম অপরাধীরও নাক-কান কর্তন সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কাজেই কোন কাফির যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে অঙ্গচ্ছেদনও করে, তবে এর বদলায় কেবল ঐ কাফিরকে হত্যা করা যাবে, অঙ্গচ্ছেদন করা যাবে না।[২]

হযরত আমর ইবন উমায়্যা যামরী (রা)-এর অভিযান

আবূ সুফিয়ান ইবন হারব একদিন কুরায়শের পূর্ণ সমাবেশে বলল, এমন কোন ব্যক্তি নেই কি, যে গিয়ে মুহাম্মদকে হত্যা করে আসতে পারে ? সেখানে তো তার কোন প্রহরী নেই, মুহাম্মদ তো বাজারেও ঘোরাফিরা করেন। জনৈক বেদুঈন বলল, আমি এ কাজে খুবই দক্ষ। আমাকে সাহায্য করলে আমি এ কাজ করে আসতে

১. এটা ওয়াকিদী, ইবন সা'দ ও ইবন হিব্বানের বক্তব্য, ইমাম বুখারী (র)-এর মতে এ ঘটনা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং খায়বার যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭২ দেখুন।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৬।

পারি। আবূ সুফিয়ান তাকে একটি উটনী ও পথ খরচা দিয়ে দিল এবং সাহায্য করার ওয়াদা করল। ঐ বেদুঈন আপন খঞ্জর নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলো। রাসূল (সা) সে সময় বনী আবদুল আশহাল গোত্রের মসজিদে গিয়েছিলেন, তিনি ঐ বেদুঈনকে সামনে থেকে আসতে দেখে বললেন, লোকটি কোন বদ-নিয়্যতে আসছে। হযরত উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) ঐ বেদুঈনকে ধরে ফেললেন। ফলে হত্যার মতলবে যে খঞ্জর তার কাপড়ের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, তা হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল। নবী (সা) তাকে বললেন, সত্য করে বল, কোন্ উদ্দেশ্যে তুমি এসেছিলে ? বেদুঈন বলল, যদি আমাকে নিরাপত্তা দেয়া হয়, তা হলে বলব। তিনি বললেন, তোমাকে নিরাপত্তা দেয়া হলো। বেদুঈন সমুদয় ঘটনা খুলে বলল। হযরত (সা) তাকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। রাসূলের এ ব্যবহারে বেদুঈনটি মুসলমান হয়ে গেল এবং বলল :

يا محمد والله ما كنت ما افرق الرجال فماهو الا ان رأيتك فذهب عقلى ومنعقت نفسى قم اطلعت على ما هممت به ممالم يعلم احد فعرفت انك ممنوع وانك على الحق وان خزب ابى سفيان حزب الشيطان - فجعل رسول الله ﷺ .

"ওহে মুহাম্মদ, আমি কোন কিছুতে ভীত হওয়ার মত ব্যক্তি নই, কিন্তু আপনাকে দেখামাত্র আমার এমন অবস্থা হলো যে, জ্ঞান লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো, মন দুর্বল হয়ে গেল। অধিকন্তু মনে হলো যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছেন, যা অন্য কারো জানা ছিল না। তাতে আমি বুঝে ফেললাম যে, আপনি নিরাপদ ও সুরক্ষিত। নিঃসন্দেহে আপনি সত্যের উপর রয়েছেন আর আবূ সুফিয়ানের দল শয়তানের দল।" নবী (সা) এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

পরে ঐ বেদুঈন নবীজির খিদমতে কয়েকদিন অবস্থান করে এবং তাঁর অনুমতি নিয়ে চলে যায়। এর পর তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি যে, সে কোথায় গেল। কয়েকদিন পর রাসূল (সা) হযরত আমর ইবন উমায়্যা যামরী ও সালমা ইবন আসলাম আনসারী (রা)-কে এ উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করলেন যে, সুযোগ পাওয়া গেলে যেন তারা আবূ সুফিয়ানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তারা দু'জন মক্কায় উপস্থিত হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, প্রথমে বায়তুল্লাহয় তাওয়াফ করবেন। হেরেম শরীফে প্রবেশ করামাত্র আবূ সুফিয়ান তাদের দেখে ফেলল এবং উচ্চস্বরে বলল, দেখ, ঐ যে আমর ইবন উমায়্যা, নিশ্চয়ই সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে। জাহিলী যুগে আমর ইবন উমায়্য 'শয়তান' নামে খ্যাত ছিলেন। পাছে আমাদের কোন ক্ষতি করে বসেন, এ ভয়ে মক্কাবাসী তার জন্য খেজুর ও পানীয় দ্রব্য উপস্থিত করল। আমর তার সঙ্গীকে বললেন, এ অবস্থায় তো আবূ সুফিয়ানকে হত্যা করা সম্ভব নয়, কাজেই নিজেদের জীবন নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াই উত্তম। চলতি পথে তারা আবদুল্লাহ ইবন মালিক তাইমীকে হত্যা করলেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলেন, বনী দিয়ালের একচক্ষু অন্ধ এক ব্যক্তি শুয়ে শুয়ে এ কবিতা বলছে :

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيًّا * وَلَسْتُ اَدِيْنُ الْمُسْلِمِيْنَا

"যখন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, কখনই মুসলমান হব না, আর কখনো মুসলমানদের দীনকে গ্রহণ করব না।"

আমর[1] (রা) আবূ সুফিয়ানের অনুসারী ঐ কবিতা পাঠকারীকে তরবারির আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে কুরায়শের দু'গুপ্তচরকে দেখতে পেলেন, যাদেরকে কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এ অবস্থা জানার জন্য প্রেরণ করেছিল। মুসলিম বাহিনী তাদের একজনকে হত্যা করলেন এবং অপরজনকে বন্দী করে রাসূলের দরবারে উপস্থিত করলেন। সমুদয় ঘটনা তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি এসব শুনে হেসে ফেললেন এবং আমার জন্য দু'আ ও কল্যাণ কামনা করলেন (যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৭)।

হুদায়বিয়ার উমরা (পয়লা[2] যিলকদ, ষষ্ঠ হিজরী)

হুদায়বিয়া একটি কূপের নাম, যার সন্নিকটে এ নামেই একটা গ্রাম প্রসিদ্ধিলাভ করে। গ্রামটি মক্কা মুকাররমা থেকে নয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত। মুহিব তাবারী বলেন, গ্রামটির অধিকাংশ হেরেমের অন্তর্ভুক্ত এবং অবশিষ্ট অংশ হেরেম বহির্ভূত।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী নিরাপদে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং উমরা করেছেন। অতঃপর কিছু সাহাবী মাথা মুণ্ডন করেছেন এবং কিছু সাহাবী চুল ছেঁটেছেন (বায়হাকী কর্তৃক দালাইলে বর্ণিত)।

এ স্বপ্নবার্তা শোনামাত্রই মুসলমানদের মনে যে বায়তুল্লাহর মহব্বত ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা উস্কে উঠল এবং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের আগ্রহ সবাইকে ব্যাকুল করে তুলল।

ষষ্ঠ হিজরীর পয়লা যিলকদ, সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা) উমরার নিয়্যতে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুয়যযমা রওয়ানা হন। আনসার ও মুহাজির মিলে প্রায়[3] পনেরশত সাহাবী তাঁর সহগামী ছিলেন। যুল হুলায়ফায় পৌঁছে তাঁরা কুরবানীর পশুর গলায় মালা পরান এবং নিজেরা পরিচ্ছন্ন হয়ে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধেন। রাসূল (সা) বুসর ইবন সুফিয়ান (রা)-কে কুরায়শের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গোয়েন্দা

---

১. এক রিওয়ায়াতে আছে, আমর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? সে বলল, আমি বনী বকর গোত্রের। আমর বললেন, মারহাবা (স্বাগতম)। এরপর ঐ ব্যক্তি শুয়ে পড়ল এবং পুনরায় ঐ কবিতা পাঠ করতে শুরু করল। আমর প্রথমে তার দ্বিতীয় চোখটিতে তীর মারলেন যেটি ভাল ও সুস্থ ছিল, এরপর তরবারির কোপে তাকে হত্যা করেন।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৩৯; যারকানী, ২খ. পৃ. ১৭৯।

৩. এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, প্রসিদ্ধ বর্ণনায় চৌদ্দশত বলা হয়েছে, যেমনটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত বারা ইবন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আবার উক্ত সহীহদ্বয়ে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে পনেরশত বলা হয়েছে। বিস্তারিতের জন্য যারকানী, ২খ. পৃ. ১৮০ দেখুন।

স্বরূপ আগে পাঠিয়ে দেন। যেহেতু যুদ্ধ-বিগ্রহ উদ্দেশ্য ছিল না, সেহেতু তারা যুদ্ধ সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সাথে নেননি। একজন মুসাফিরের জন্য যতটুকু আবশ্যক, কেবল ততটুকু অস্ত্র সাথে ছিল। আবার তাও ছিল কোষবদ্ধ অবস্থায় (ফাতহুল বারী,[১] কিতাবুশ শুরূত এবং তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৬৯)।

হযরত (সা) যখন তিনি 'গাদীরে আশতাত' পৌঁছলেন, তখন তাঁর গুপ্তচর তাঁকে এ মর্মে খবর দিলেন যে, হযরতের আগমনের খবর পাওয়ামাত্র কুরায়শগণ সেনা সমাবেশ করেছে এবং মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা শপথ নিয়েছে যে, তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

অধিকন্তু জানা গেল, অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে খালিদ ইবন ওয়ালিদের নেতৃত্বে 'গানীম' নামক স্থানে দু'শ অশ্বারোহী এসে উপস্থিত হয়েছে। এ সংবাদ পাওয়ামাত্র রাসূলুল্লাহ (সা) সে পথ ত্যাগ করেন এবং অন্য পথে অগ্রসর হয়ে হুদায়বিয়ায় এসে উপস্থিত হন। এখান থেকে যখন তিনি তাঁর উটনী মক্কার দিকে চালিত করার ইচ্ছা করেন, তখন উটনী বসে পড়ে। লোকেরা উটনীটি উঠানোর জন্য 'হাল হাল' বলেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা সত্তেবও তাকে উঠাতে পারেননি। কিন্তু উটনী বসেই রইল। লোকেরা বলল, خلات القصواء خلات القصواء 'কাসওয়া (উটনী) বসে পড়েছে, কাসওয়া বসে পড়েছে।' নবী (সা) বললেন, এটা এর অভ্যেস নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই একে থামিয়ে দিয়েছেন। পরে তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, কুরায়শগণ আমার কাছে এমন এক আবেদন জানাবে যদ্বারা আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আমি অবশ্যই তাদের আবেদন মঞ্জুর করব। এ কথা বলে তিনি উটনীকে খোঁচা দিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে উটনী উঠে দাঁড়াল। তিনি সেখান থেকে সরে হুদায়বিয়ায় এসে অবস্থান নিলেন। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, পিপাসা ছিল তীব্র ও পানি ছিল অপ্রতুল। গর্তে যে অল্প-বিস্তর পানি ছিল, তা তুলে নেয়া হলো। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, পানি নেই। তিনি তাঁর তূণীর থেকে একটি তীর বের করে দিলেন যেন ঐ গর্তে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দিয়ে আসে। তাই করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্রবেগে পানি প্রবাহিত হতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে গোটা বাহিনীর পানির সমস্যা দূর হয়ে গেল।[২]

হুদায়বিয়ায় অবস্থান গ্রহণের পর তিনি হযরত খিরাশ ইবন উমায়্যা খুযাঈ (রা)-কে একটি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে মক্কাবাসীকে খবর দিতে পাঠালেন যে, আমরা কেবল বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি, যুদ্ধ করতে আসিনি। মক্কাবাসী খিরাশের উটকে যবেহ করে ফেলল এবং তাকেও হত্যা করতে উদ্যত হলো কিন্তু নিজেদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়ায় তিনি রক্ষা পেলেন। হযরত খিরাশ (রা) প্রাণে

---

১. এ হাদীস সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তবে তা খণ্ড খণ্ড আকারে; বিস্তারিত হাদীস الشروط فى الجهاد والمصالحة مع اهل الحرب অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

২ ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৪২-২৪৫।

বেঁচে ফিরে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন তিনি হযরত উমর (রা)-কে এ প্রস্তাব সহ মক্কাবাসীর কাছে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। তিনি ওযর পেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো জানেন যে, মক্কাবাসী আমার প্রতি কিরূপ ক্ষেপে আছে, আর তারা আমার কোন্ পর্যায়ের শত্রু। মক্কায় আমার গোত্রের এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমাকে আশ্রয় দিতে পারে। কাজেই যদি আপনি হযরত উসমানকে প্রেরণ করেন, ভাল হয়। মক্কায় তাঁর অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে। রাসূল (সা) এ পরামর্শ পসন্দ করলেন। তিনি হযরত উসমান (রা)-কে ডেকে আদেশ দিলেন যে, আবূ সুফিয়ান এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে এ প্রস্তাব পৌঁছিয়ে দাও আর যেসব মুসলমান মক্কায় নিজেদের দীনের কথা প্রকাশ ও প্রচার করতে পারছে না, তাদেরকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, ঘাবড়িও না, শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করবেন। তিনি তাঁর দীনকে প্রকাশ ও বিজয়ী করবেন। হযরত উসমান ইবন আফফান (রা) তাঁর এক প্রিয় ব্যক্তি আবান ইবন সাঈদের নিরাপত্তা হিফাযতে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং মক্কাবাসীর কাছে রাসূল্লাহর প্রস্তাব পৌঁছিয়ে দেন। আর দুর্বল মুসলমানগণকে উক্ত সুসংবাদের ব্যাপারে অবহিত করেন।

মক্কাবাসী সবাই একমত হয়ে জবাব দিল, এ বছর তো মুহাম্মদ মক্কায় প্রবেশ করতেই পারবেন না। তুমি চাইলে একাকী তাওয়াফ করতে পারো। হযরত উসমান বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ছাড়া আমি কখনও তাওয়াফ করব না। কুরায়শগণ এ কথা শুনে চুপ হয়ে গেল এবং হযরত উসমান (রা)-কে আটক করল।

হযরত উসমান (রা) সেখানে আটক হয়ে থাকলেন আর এদিকে প্রচার হয়ে গেল যে, উসমান গনী (রা)-কে হত্যা করা হয়েছে।

বায়'আতুর রিদওয়ান

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং বলেন, যতক্ষণ প্রর্যন্ত আমি এ হত্যার প্রতিশোধ না নিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করব না। আর সেখানেই বাবলা গাছের নিচে, যেখানে লোকজন বসা ছিল। এ শপথের ওপর বায়'আত গ্রহণ শুরু করেন যে, যতক্ষণ ধড়ে প্রাণ থাকবে, কাফিরদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাব, মরে যাব, তবুও পলায়ন করব না।

সর্ব প্রথম হযরত আবূ সিনান আসাদী (রা) বায়'আত করেন। মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে বায়'আত করার জন্য আহ্বান করেন, তখন সর্ব প্রথম হযরত আবূ সিনান (রা) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বায়'আতের জন্য হাত বাড়িয়ে দিন। বললেন, কোন্ বিষয়ের ওপর বায়'আত করতে চাইছ? আবূ সিনান বললেন, ঐ বিষয়ের ওপর, যা আমার অন্তরে আছে। বললেন, তোমার অন্তরে কি আছে? আবূ সিনান (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অন্তরে আছে যে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারি চালাতে থাকব, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ আপনাকে

জয়যুক্ত না করেন কিংবা আমি মৃত্যুবরণ না করি। রাসূল (সা) তাকে বায়'আত করান এবং এ কথার ওপর সবাই বায়'আত হন।

সহীহ্ মুসলিমের বর্ণনায় আছে যে, হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) তিনবার বায়য়াত করেন, প্রথমে, মধ্যবর্তী সময়ে এবং শেষে। যখন বায়য়াত গ্রহণ শেষ হলো, তখন নবীজি তাঁর বাঁ হাতকে ডান হাতে ধারণ করে বললেন, এ বায়য়াত উসমানের পক্ষ থেকে। (বুখারী)

ডান হাত ছিল তাঁর পক্ষ এবং বাঁ হাত ছিল হযরত উসমান (রা)-এর পক্ষ। হযরত উসমান (রা) এ ঘটনার উল্লেখ করে বলতেন, আমার পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-এর বাঁ হাত আমার নিজের ডান হাত অপেক্ষা কতই না উত্তম![1]

এ বায়'আতকে 'বায়'আতুর রিদওয়ান' বলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ফাতহে এর উল্লেখ করেছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّأْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٠

"অবশ্যই আল্লাহ্ মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে আপনার কাছে বায়'আাত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ঠিল, তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলভ্য সম্পদ, যা ওরা হস্তগত করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ : ১৮-১৯)

কিন্তু পরে জানা গেল যে, হযরত উসমান (রা)-এর নিহত হওয়ার খবরটি ছিল গুজব। কুরায়শগণ যখন এ বায়'আত সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল এবং সন্ধির জন্য দূতিয়ালী শুরু করে দিল (ফাতহুল বারী, ৭খ.পৃ. ৩৪৫)।

খুযা'আ গোত্র যদিও তখন পর্যন্ত মুসলমান হয়নি, কিন্তু সব সময় তাঁর সাহায্যকারী, কল্যাণকামী ও সুহৃদ ছিল। মক্কার মুশরিকগণ তাঁর বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র করত, এরা তা নবী (সা)-কে জানিয়ে দিত। এ গোত্রের সর্দার বুদাইল ইবন ওরাকা গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি সাথে নিয়ে নবীরি নিকট উপস্থিত হয়ে খবর দিল যে, কুরায়শগণ হুদায়বিয়ার আশেপাশে পানির বড় বড় উৎসগুলোতে আপনার মুকাবিলার জন্য বড় বড় সেনাদল মোতায়েন করেছে। তারা আপনাকে কোন অবস্থায়ই মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের সাথে দুগ্ধবতী উটনীও আছে (অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন অবস্থানের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে, যাতে যথেচ্ছ পানাহার করে যুদ্ধের জন্য অবস্থান করতে পারে)।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, আমরা কারো সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, আমরা কেবল উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছি। যুদ্ধ কুরায়শদেরকে খুবই কাবু করে

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২০৬-২০৮।

ফেলেছে, ওরা যদি চায়, তা হলে আমি একটা সময় পর্যন্ত তাদের সাথে শান্তি নির্দিষ্ট করে দিতে চাই। এ সময়ের মধ্যে একে অপরের উপর আক্রমণ করবে না। আর আমাকে ও আরবকে ছেড়ে দিক। আল্লাহর অনুগ্রহে যদি আমি বিজয়ী হই, তবে ওরা চাইলে ঐ দিন আমি প্রবেশ করব আর বর্তমানে কয়েকদিনের জন্য তোমাদের শান্তি জুটবে। আর যদি কোনভাবে আরব জয়লাভ করে, তা হলে তো তোমাদেরই আশা পূর্ণ হবে। তবে আমি তোমাদের বলছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্য অবশ্যই তাঁর এই দীনকে বিজয়ী করবেন। আল্লাহ্ যেই দীনের প্রকাশ ও বিজয় এবং সাহায্য-সহযোগিতার ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই তিনি পূর্ণ করবেন। ওরা যদি আমার এ কথা না মানে, তা হলে সেই পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি অবশ্যই ওদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মস্তক ধড় থেকে পৃথক না হয়। বুদায়েল তাঁর নিকট থেকে উঠে কুরায়শদের কাছে গিয়ে বলল, আমি ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কথা শুনে এসেছি। তোমরা যদি তা শুনতে চাও তো বলি। যারা মূর্খ ও আহমক ছিল, তারা বলল, আমাদের প্রয়োজন নেই; আমরা তার কোন কথাই শুনতে চাই না। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা বিবেচক ও বুদ্ধিমান ছিল, তারা বলল, আচ্ছা, বল দেখি।

বুদায়ল বলল, তোমরা তাড়াহুড়া করো না, মুহাম্মদ (সা) যুদ্ধ করার জন্য আসেন নি, বরং উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন। তিনি তোমাদের সাথে সন্ধি করতে ইচ্ছুক। কুরায়শগণ বলল, নিঃসন্দেহে তিনি যুদ্ধ করতে আসেন নি, কিন্তু মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। উরওয়া ইবন মাসঊদ দাঁড়িয়ে বলল, ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আমি কি তোমাদের পিতৃতুল্য এবং তোমরা আমার সন্তানতুল্য নও? লোকজন বলল, নিশ্চয়ই, কেন নয়? উরওয়া বলল, তোমরা কি আমার প্রতি কোনরূপ কুধারণা পোষণ কর? লোকেরা বলল, কখনই নয়। অতঃপর উরওয়া বলল, ঐ ব্যক্তি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)] তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও উত্তম কথাই বলেছে। আমার মতে তা অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। যদি তোমরা আমাকে অনুমতি দাও তা হলে আমি এ ব্যাপারে মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি। লোকেরা বলল, ঠিক আছে, বলুন।

উরওয়া রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে তাই বললেন, যা তিনি বুদাইলকে বলেছিলেন। উরওয়া বলল, ওহে মুহাম্মদ, আপনিও তো শুনে থাকবেন যে, কেন ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়কে নিজেই ধ্বংস ও বরবাদ করেছে। এছাড়া যদি দ্বিতীয় অবস্থা এসে পড়ে (অর্থাৎ কুরায়শ বিজয়ী হয়) তবে আমি দেখতে পাচ্ছি বিশৃঙ্খলা, অর্থাৎ বিভিন্ন গোত্রের লোকজন আপনার সাথে আছে, তারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে বসা ছিলেন। তিনি উরওয়াকে ধমক দিয়ে বললেন, কী, আমরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? উরওয়া বলল, এ ব্যক্তি কে? লোকেরা বলল, ইনি আবূ বকর। উরওয়া বলল, আল্লাহর কসম, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা না হতো, আজো যার বদলা আমি

দিতে পারিনি, তা হলে আমি অবশ্যই এর জবাব দিতাম। এ কথা বলে সে রাসূলুল্লাহ (সা-এর সাথে কথাবার্তা শুরু করল। যখনই সে কথা বলত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়িতে হাত দিত। হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) (অর্থাৎ উরওয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র) খোলা তরবারি নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, নবীর শানে আপন চাচার এ বেয়াদবী তার সহ্য হচ্ছিল না, তৎক্ষণাৎ আপন চাচাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার হাত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাঁড়ি থেকে সরান, একজন মুশরিকের জন্য এটা কখনই গ্রহণযোগ্য নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে স্পর্শ করবে। মুগীরা (রা) যেহেতু ভিন্ন পোশাকে সজ্জিত ছিলেন, এ জন্যে উরওয়া তাকে চিনতে পারে নি, তাই রাগান্বিত হয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করল, এ আবার কে ? তিনি বললেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, মুগীরা ইবন শুবা। এক্ষণে উরওয়া মুগীরাকে চিনতে পেরে বলল, ওরে গাদ্দার, আমি কি তোর গাদ্দারী ও ফিতনাবাজীকে নিষ্পত্তি করিনি ?

হযরত মুগীরা (রা) মুসলমান হওয়ার পূর্বে কতিপয় বন্ধু-বান্ধবসহ মিসর সম্রাট মকৃকাসের দরবারে যান, সেখানে সম্রাট মুগীরা অপেক্ষা তার বন্ধুদের বেশি উপহার দেন। এতে মুগীরা খুবই ব্যথিত হন। ফিরে আসার পথে তারা এক স্থানে দাঁড়ায় এবং বেশি বেশি মদ্যপান করে আলস্যভরে নিদ্রা যায়। মুগীরা এ সুযোগে তাদের সবাইকে হত্যা করেন এবং তাদের মাল-সামান নিয়ে পালিয়ে নবী (সা) সকাশে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী (সা) তাকে বললেন, ইসলাম তো গ্রহণ করলে, কিন্তু এ মালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, কেননা তা অবৈধ পন্থায় অর্জিত। উরওয়া তখন নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ দিয়ে ঘটনার নিষ্পত্তি করে। সে কথারই খোঁটা দিচ্ছিল।

এরপর উরওয়া রাসলুল্লাহ (সা)-এর সাথে তাঁর সাহাবিগণের সুসম্পর্ক, নিষ্ঠা ও সততার অভাবনীয় দৃশ্য দেখে, যা সে পূর্বে কখনো দেখেনি। তা এমন ছিল যে, যখনই হযরত (সা) কোন নির্দেশ দিতেন, তখন সর্বাগ্রে কে তা পালন করবে, এ নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত; তাঁর মুখ থেকে যখন কফ-থুথু বের হতো, তা মাটিতে পড়ার অবকাশ পেত না। সাহাবিগণ হাতে হাতে তা নিয়ে নিতেন এবং নিজের মুখে মেখে নিতেন। তিনি যখন উযূ করতেন, তখন উযূর পানি নিয়েও এভাবে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যেত। মনে হতো তারা এজন্য পরস্পরে লড়াই করবেন। শরীরের কোন চুলেরও মাটিতে পড়ার সাধ্য ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে কেউ না কেউ তা নিয়ে নিতেন। যখন তিনি কথা বলতেন, সবাই তা এমনভাবে শুনতেন, যেন তাদের গোটা শরীরই কানে পরিণত হয়েছে। রাসূল (সা)-এর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও কেউ পেতেন না।

সম্ভবত এটা উরওয়ার সে কথারই জবাব ছিল, যা সে এসে প্রথমেই তাঁর আত্মোৎসর্গকারী সাহাবিগণ সম্পর্কে প্রকাশ করেছিল যে, যদি কুরায়শগণ জয়লাভ করে, তা হলে এরা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এহেন একনিষ্ঠতা, সততা ও বিশ্বাস, ভালবাসা ও ভীতির অভাবনীয় দৃশ্য হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) সম্পর্কে

উরওয়ার কুধারণার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত জবাব ছিল। যাদের শ্রদ্ধা ও শিষ্ঠাচার, ভালবাসা ও বিশ্বাসের অবস্থা এরূপ ছিল, তারা কি তাঁকে ছেড়ে কখনো পালাতে পারেন ?

উরওয়া যখন তাঁর নিকট থেকে ফিরে গেল, তখন কুরায়শদের গিয়ে বলল, "ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আল্লাহ্ কসম, আমি তো কায়সার, কিসরা, নাজ্জাশী প্রমুখ বড় বড় বাদশাহর দরবার দেখেছি, কিন্তু আল্লাহর কসম, বিশ্বাস ও ভালবাসা, সম্মান ও প্রতিপত্তির এমন অভাবনীয় দৃশ্য কোথাও দেখিনি।" (বলা বাহুল্য, এ দৃশ্য না তাঁর পূর্বে দেখা গিয়েছে, আর না তাঁর পরে দেখা সম্ভব হবে, তিনি তো শেষ নবী ছিলেন, কাজেই বিশ্বাস ও ভালসবাসার অভাবনীয় দৃশ্য তাঁর মধ্যমেই শেষ হবে)।

এক রিওয়ায়াতে আছে, উরওয়া বলেছে, "ওহে স্বজাতিবৃন্দ, আমি অনেক বাদশাহকে দেখেছি কিন্তু মুহাম্মদের মত কাউকে দেখিনি; তাঁকে বাদশাহ মনে হয়নি" (ইবন আবূ শায়বা মুরসাল সূত্রে)।[১]

উরওয়া পরিস্কারভাবে এ কথা বলেনি যে, তিনি নবী। তবে ইঙ্গিতে এটা বলে দিয়েছে যে, এ মর্যাদা বাদশাহদের হয় না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম্বরগণেরই হয়ে থাকে। উরওয়ার কথাবার্তা শুনে হাবশীদের সর্দার জুলায়স ইবন আলকামা বুনানী বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আসি।

রাসূলুল্লাহ (সা) দূর থেকে জুলায়সকে আসতে দেখে বললেন, কুরবানীর পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও, এ ব্যক্তি তাদের মধ্যেকার সেসব লোকের একজন, যারা কুরবানীর পশুকে সম্মান করে। জুলায়স কুরবানীর উট দাঁড়ানো দেখে পথ থেকেই ফিরে গেল এবং গিয়ে কুরায়শদের বলল, কা'বাঘরের প্রভুর কসম, এরা তো কেবল উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছে, এদেরকে আল্লাহর ঘর থেকে বাধা দেয়া যেতে পারে না।

কুরায়শগণ বলল, বসে পড়, তুই তো জংলী, কিছুই বুঝিস টুঝিস না। এতে জুলায়স রাগান্বিত হয়ে বলল, ওহে কুরায়শ সম্প্রদায়, আল্লাহর কসম, আমরা তো তোমাদের সাথে এ চুক্তি করিনি যে, যে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে আসলেও তাকে বাধা দেয়া হবে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে জুলায়সের প্রাণ, যদি তোমরা মুহাম্মদকে বায়তুল্লাহ যিয়ারতে বাধা দাও, তা হলে আমি সমস্ত হাবশীকে নিয়ে তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাব। কুরায়শগণ বলল, আচ্ছা, এত চটো না, বসো, আমরা একটু চিন্তা-ভাবনা করে দেখি। একটু পর বৈঠক থেকে মিকরায ইবন হাফস দাঁড়িয়ে বলল, আমি তাঁর নিকট থেকে ঘুরে আসি। রাসূলুল্লাহ (সা) মিকরাযকে দেখে বললেন, এ তো হুদায়বিয়ার 'সেই লোক'। অর্থাৎ একবার মিকরায পঞ্চাশজন সহযোদ্ধা নিয়ে রাতের আঁধারে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালায়। সাহাবাগণ তাদের বন্দী করে ছিলেন কিন্তু মিকরায পালিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিকেই ইঙ্গিত করলেন।

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯২।

মিকরায হযরতের সাথে কথাবার্তা বলেই চলছিল, এমন সময় কুরায়শের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইবন আমর সন্ধি করার জন্য এসে উপস্থিত হলো। রাসূল (সা) সুহায়লকে আসতে দেখে সাহাবীদের বললেন, قد سهل لكم من امركم 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাজ কিছুটা সহজ[১] হয়ে গেল।'

আরও বললেন, কুরায়শগণ সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, এ ব্যক্তিকে তারা সন্ধির জন্য প্রেরণ করেছে। সুহায়ল তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলো এবং দীর্ঘক্ষণ যাবত সন্ধি ও সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। যখন শর্তাবলী সম্পর্কে ঐক্যমত্যে পৌঁছল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে চুক্তিপত্র লিখার নির্দেশ দিলেন। সর্ব প্রথম بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখার নির্দেশ দিলেন।

পূর্বে প্রচলিত নিয়ম ছিল, بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ পত্রারম্ভে লিখা হতো, এর ফলে সুহায়ল বলল, আমি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-কে জানি না, পূর্বের নিয়মানুসারে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আচ্ছা, তাই লিখ। এরপর বললেন, লিখ, هذا ما قضى عليه محمد رسول الله "এটি সেই চুক্তিপত্র, যদ্বারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা) সন্ধি করছেন।"

সুহায়ল বলল, যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূলই মানতাম, তা হলে তো আপনাকে বায়তুল্লাহয় যেতে বাধা দিতাম না, আর আপনার সাথে লড়াইও করতাম না।

'মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ'র পরিবর্তে 'মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ' লিখুন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তুমি তা মিথ্যা মনে কর। তিনি হযরত আলী (রা)-কে বললেন, বাক্যটি মুছে দিয়ে ওর ইচ্ছা অনুযায়ী শুধু আমার নাম লিখ। হযরত আলী (ক) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কখনো আপনার নাম মুছব না। তিনি বললেন, আচ্ছা, কোন জায়গায় তুমি রাসূলুল্লাহ লিখেছ, আমাকে দেখিয়ে দাও। হযরত আলী (রা) আঙ্গুল দিয়ে স্থানটি দেখিয়ে দিলে তিনি নিজ হাতে লিখাটি মুছে দেন এবং হযরত আলীকে 'মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ' লিখার[২] নির্দেশ দেন। সন্ধির শর্তাবলী ছিল নিম্নরূপ :

---

১. অর্থাৎ সম্পূর্ণ সহজ তো হয় নি, বরং কিছুটা সহজ হয়েছে এখানে قد سهل لكم من امركم من এর (আরবী) অর্থ ধরা হলে এ ব্যাখ্যা দাঁড়ায়। যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯৪।

২ কোন কোন রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে লিখেন বলে উল্লেখ আছে, এটা রূপকার্থক, লিখেন অর্থ এখানে লিখার আদেশ করেন। যেমন বলা হয় তিনি কায়সার ও কিসরার কাছে পত্র লিখেন, এটাও রূপকার্থক; কেননা কুরআনের দলীল এবং বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, হযরত (সা)-এর উম্মী হওয়া সুপ্রমাণিত। আর এ ঘটনায় হযরত আলী (রা) দ্বারা সন্ধিপত্র লিখানোর কথা সুপ্রসিদ্ধ। এরদ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁর লিখার কথাটি রূপকার্থক। যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ برئت ممن شرء لى دنيا باخره * وقال ان رسول الله قد كتبا যারকানী, ২খ. পৃ. ১৯৭।

সন্ধির শর্তাবলী

১. দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

২. কুরায়শের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবক ও মুরব্বীর অনুমতি ছাড়া মদীনায় আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, যদিও সে মুসলমান হয়।

৩. আর মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় আসবে, তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না।

৪. এ মধ্যবর্তী সময়ে কেউ কারো প্রতি তরবারি উঠাবে না এবং কেউ কারো প্রতি অবিশ্বস্ত হবে না।

৫. মুহাম্মদ এ বছর উমরা না করেই মদীনায় ফিরে যাবেন, মক্কায় প্রবেশ করবেন না; আগামী বছর থেকে কেবল তিনদিন মক্কায় অবস্থান করে উমরা সম্পন্ন করে ফিরে যাবেন; এ সময় তারা তরবারি ছাড়া আর কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন করবেন না, আর তরবারিও থাকবে কোষবদ্ধ।

৬. অপরাপর গোত্রসমূহের এ অধিকার থাকবে যে, তারা যে পক্ষের সাথে ইচ্ছা চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে।

সুতরাং বনী খুযা'আ রাসূল (সা)-এর সাথে এবং বনী বকর কুরায়শের সাথে সন্ধিবদ্ধ হয়ে গেল। বনী খুযাআ নবী (সা)-এর সাথে মিত্রতা ও চুক্তির অধীন হয়ে গেল আর বনী বকর কুরায়শের মিত্র ও তাদের চুক্তির অধীনে গেল।

সন্ধির শর্তাবলী তখনো লিখা চলছিল, এমতাবস্থায় সুহায়লের পুত্র হযরত আবূ জন্দল (রা) শৃঙখলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দীশালা থেকে পালিয়ে নবীজির খিদমতে উপস্থিত হলেন, যিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফিরগণ তার উপর নানা ধরনের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। সুহায়ল বলল, এই প্রথম ব্যক্তি, যাকে চুক্তি অনুসারে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, চুক্তিনামা তো এখনো পুরোপুরি লিখাই হয়নি, অর্থাৎ পুরোপুরি লিখা এবং স্বাক্ষরের পর তো এর কার্যকারিতা বলবৎ হওয়া উচিত। তিনি বার বার সুহায়লকে বলছিলেন যে, আবূ জন্দলকে আমাদের হাতে দেয়া হোক কিন্তু সুহায়ল তা মানল না। শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত আবূ জন্দল (রা)-কে সুহায়লের হাতে তুলে দিলেন।

মক্কার মুশরিকরা হযরত আবূ জন্দল (রা)-কে নানাভাবে নিপীড়ন করেছিল, তাই তিনি অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে মুসলমানদের উদ্দেশ করে বললেন, ওহে ইসলাম অনুসারীদের দল, আফসোস, আমাকে কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে!

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) আবূ জন্দলকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন :

يا ابا جندل اصبر واحتسب فان لانغرو ان الله جاعل لك فرجا ومخرجا ‧

"আয় আবূ জন্দল, সবর কর এবং আল্লাহর প্রতি আশা রাখ, আমরা চুক্তির বিপরীত কাজ পসন্দ করি না; এ বিশ্বাস রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা শীঘ্রই তোমাদের মুক্তির একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।"

কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে সাধারণ মুসলমানের কাছে তার প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যটি খুবই বেদনাদায়ক মনে হয়েছে। হযরত উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কেন নই ? হযরত উমর বললেন, আমরা কি সত্যের ওপর এবং ওরা কি বাতিলের অনুসারী নয় ? তিনি বললেন, অবশ্যই। হযরত উমর বললেন, তা হলে এ অপদস্থতা কেন বরদাশ্ত করব ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল এবং সত্য নবী, আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি না; আর আল্লাহই আমার সুহৃদ ও সাহায্যকারী। হযরত উমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি না বলেছিলেন যে, আমরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করব ? তিনি বললেন, আমি কবে বলেছি যে, এ বছরেই তাওয়াফ করব?

এর পর হযরত উমর (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নিকট যান এবং গিয়ে তার সাথেও একই ধরনের বাক্যালাপ করেন। আবূ বকর সিদ্দীকও তাকে হুবহু একই জবাব দেন যেমনটি নবী (সা) তাঁকে বলেছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে হযরত উমর (রা) বলেন, এ ধরনের বেয়াদবী করায় আমি পরে খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ি এবং এর কাফফারা হিসেবে অনেক নামায পড়ি, রোযা রাখি, সদকা দিই এবং দাস মুক্ত করি।

گفتگوء عاشقان در گر رب * جوشش عشقت نی ترک آدب

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ শর্তসমূহে কিভাবে সন্ধি করা যায় যে, আমাদের যে লোক তাদের এলাকায় চলে যাবে, তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাদের মধ্য থেকে যে ওদের দিকে চলে যাবে, তার আমাদের প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করবেন। আর ওদের মধ্যকার যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আমাদের দিকে আসবে, তাকে যদিও চুক্তির শর্তানুযায়ী ফিরে দেয়া হবে, কিন্তু নিরাশ হওয়ার কিছু নেই, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উদ্ধারের জন্য কোন না কোন পন্থা অবশ্যই বের করে দেবেন। (উল্লেখ্য, আলহামদু লিল্লাহ, এমন কোন অবস্থার সৃষ্টিই হয়নি যে, কোন মুসলমান পলায়ন করে মক্কায় এসেছে)।

মোটকথা, এ শর্তাবলীসহ সন্ধিপত্র চূড়ান্ত হয় এবং উভয় পক্ষ তাতে স্বাক্ষর দান করে।[১]

পরিপূর্ণ সন্ধির পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে কুরবানী করতে এবং মস্তক মুণ্ডন করার আদেশ দেন। সাহাবায়ে কিরাম সন্ধির শর্তাবলীর দরুন এতই বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার নির্দেশ দেয়ার পরও কেউ উঠলেন না।

এ অবস্থা দেখে তিনি হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর কাছে গেলেন এবং অভিযোগের সুরে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য খুবই দুঃখজনক মনে হয়েছে, যদ্দরুন তারা বিমর্ষ ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন, এ জন্যে আপনার আদেশ পালনে ইতস্তত করছেন। আপনি কাউকে কিছু বলবেন না, বরং বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী ও মাথা মুণ্ডনের কাজ সেরে ফেলুন; তারা আপনা আপনিই আপনার অনুসরণ করবেন। সুতরাং তাই হলো, নবী (সা) আপন কুরবানী করামাত্রই তারা নিজ নিজ কুরবানী করতে শুরু করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন, যাঁর বিজ্ঞোচিত সমাধান দ্বারা এ সমস্যা দূর হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) দ্রুত এ সিদ্ধান্ত কাজে লাগালেন। যেমনিভাবে হযরত শুয়ায়ব (আ)-এর কন্যার পরামর্শ হযরত মূসা (আ)-এর জন্য বিজ্ঞোচিত ও খুবই সঠিক ছিল, তেমনিভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর পরামর্শ বিজ্ঞোচিত এবং কল্যাণ ও বরকতময় ছিল।

[এতদ সমুদয় বর্ণনা আমরা বুখারী ও ফাতহুল বারী থেকে নিয়েছি যা আলহামদু লিল্লাহ্, অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উপযোগী। দীর্ঘ হওয়ার কারণে বরাত ও বর্ণনা বাদ দিয়ে দিয়েছি। যেহেতু এ সমুদয় ঘটনা একই অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে, এ জন্যে আমরা কেবল ফাতহুল বারী-র বরাতই যথেষ্ট মনে করেছি। বিস্তারিত ও বরাত যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে ফাতহুল বারী, কিতাবুশ-শুরূত, ৫খ. পৃ. ২৪৫-২৫৬ দেখুন।

এ সমুদয় ঘটনা অতিরিক্ত বিষয় সহ যারকানী, শারহে মাওয়াহিবেও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর বিন্যাস ফাতহুল বারীর বিন্যাস থেকে আলাদা। আমরা এ বর্ণনায় ফাতহুল বারীর বিন্যাসকে অনুসরণ করেছি, এ জন্যে ফাতহুল বারীর বরাত ও সূত্র উল্লেখ করেছি]।

---

১. মুসলমানদের মধ্যে হযরত আবূ বকর ইবন আবূ কুহাফা, হযরত উমর ইবন খাত্তাব, হযরত উসমান ইবন আফফান, হযরত আলী (চুক্তিনামা লিখক), হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ, হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস, হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং হযরত মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) স্বাক্ষর দান করেন; আর মুশরিকদের পক্ষে বিভিন্ন ব্যক্তি স্বাক্ষর দেয়, এদের মধ্যে হুয়ায়তিব ইবন আবদুল উযযা, মিকরায ইবন হাফস স্বাক্ষর দান করে। সন্ধিপত্রের একটি কপি রাসূল (সা)-এর নিকট এবং এক কপি সুহায়ল ইবন আমরের নিকট থাকে। তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৭১।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সুফল

প্রায় দু'সপ্তাহ অবস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছেন, তখন সূরা ফাতহ নাযিল হয় : انَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا "নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়..." সূরার শেষ পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে সূরা ফাতহ-এর শেষ পর্যন্ত শুনিয়ে দিলেন। সাহাবিগণ এ সন্ধিকে পরাজয় বলে মনে করেছিলেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে ঘোষণা করেন। তাই তাঁরা সূরাটি শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই কি এটা বিজয় ? তিনি বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, নিঃসন্দেহে এটা বিশাল বিজয়। (আহমদ, আবূ দাঊদ, হাকিম)।

ইমাম যুহরী বলেন, হুদায়বিয়ার বিজয় এমন বিশাল বিজয় ছিল যে, এর পূর্বে এত বড় বিজয় কখনই তকদীরে জোটেনি। পারস্পরিক যুদ্ধের কারণে একে অপরের সাথে মেলামেশা করতে পারেনি, সন্ধির কারণে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো; যারা নিজের ইসলাম গ্রহণকে প্রকাশ করতে পারছিলেন না, তারা নির্ভয়ে ইসলামী আহকাম পালন করতে শুরু করলেন, পারস্পরিক মতবিরোধ ও রেষারেষি বন্ধ হয়ে গেল, কথাবার্তা বলার ও মত বিনিময় করার সুযোগ হলো, ইসলামী বিষয়াদি নিয়ে কথা বলার ও তর্ক করার সুযোগ হলো, কুরআনুল কারীম শোনানোর সুযোগ এলো, যার প্রভাব এমন হলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক লোক মুসলমান হলো যে, শুরু থেকে ঐ পর্যন্ত তত সংখ্যক লোক মুসলমান হয়নি।[১]

ইসলাম তো হচ্ছে পরিপূর্ণ চরিত্র ও উত্তম কর্মের খনি কিংবা ঝর্ণাধারা স্বরূপ এবং সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের সমষ্টি। আর সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও ছিলেন কল্যাণ, পরিপূর্ণতা, সদাচরণ ও সৎস্বভাবের মূর্তপ্রতীক। চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত গর্ব, বিভেদ, হিংসা ও শত্রুতার দৃষ্টি এসব উপলব্ধিতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

چشم بد اندیش که برکنده باد * عیب نماید هنریش در نظر

"এক্ষণে সন্ধির কারণে গর্ব অহংকার ও বিভেদের পর্দা যখন চোখের সামন থেকে সরে গেল, তখন ইসলামের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিল।"

مرد حقانی کی پیشانی کانور * کب چھپارهتا هی پیش ذی شعور

সন্ধির পূর্বে মক্কার কাফিরগণ ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল, "এ জন্যে ইসলাম ও মুসলমানের নূর তাদের থেকে ছিল লুক্কায়িত। সন্ধির কারণে যখন শত্রুতা ও

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৫৬; যারকানী, ২খ. পৃ. ২১০।

বিভেদ উভয় পক্ষ থেকে দূর হয়ে গেল, তখন সুযোগ সৃষ্টি হলো এবং হাক্কানী বা আল্লাহপ্রেমিকগণের কপালের নূর তাদের চোখে পড়ল।"

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মদীনায় এসে পৌঁছলেন, তখন মক্কা থেকে হযরত আবূ বাসির (রা) মুশরিকদের বন্দীখানা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসেন। কুরায়শগণ তাড়াতাড়ি তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য দু'জন লোক পাঠায়। নবী (সা) চুক্তি মুতাবিক হযরত আবূ বাসির (রা)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করেন এবং আবূ বাসিরকে বলেন, আমি চুক্তির বরখেলাফ করতে পারি না, ওদের সাথে চলে যাওয়াই তোমার জন্য উত্তম। হযরত আবূ বাসির (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে মুশরিকদের দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন যারা আমাকে ধর্মচ্যুত করতে চায় এবং আমার উপর নানা ধরনের অত্যাচার-নিপীড়ন চালায় ? তিনি বললেন, সবর কর এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আশা রাখ, শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুক্তির কোন ব্যবস্থা করে দেবেন। ঐ দু'ব্যক্তি হযরত আবূ বাসির (রা)-কে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলো। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে তারা বিশ্রাম নেয়ার জন্য থামল এবং যে খেজুর সাথে ছিল, তা খেতে শুরু করল। আবূ বাসির (রা) তাদের একজনকে বললেন, তোমার তরবারিটি তো খুব সুন্দর মনে হচ্ছে ! সে তরবারিটি খাপ থেকে বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, এটা খুবই উত্তম তরবারি, বহুবার আমি এটা পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসির (রা) বললেন, আমাকে একটু দেখাও তো। সে তরবারিটি আবূ বাসির (রা)-এর হাতে দিয়ে দিল। আবূ বাসির (রা) সেটি নিয়ে তৎক্ষণাৎ এক কোপ বসিয়ে দিলেন লোকটির উপর, ফলে সে খতম হয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি এটা দেখামাত্র দৌড়ে পালাল এবং সোজা মদীনায় পৌঁছে রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হলো এবং আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সঙ্গী তো মারা গেছে, আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছি।

হযরত আবূ বাসির (রা) নবী দরবারে ফিরে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তো আপনার ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, আপনি তো আমাকে ওদের হাওয়ালা করে দিয়েছিলেন। এখন আল্লাহ্ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি জানেন, যদি আমি মক্কায় ফিরে যাই, তাহলে ওরা আমাকে ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য করবে। যা কিছু আমি করেছি, কেবল এ জন্যই করেছি। আমার আর ওদের মধ্যে কোনই চুক্তি নেই। রাসূল (সা) বললেন, খুবই যুদ্ধ উস্কে দেয়ার কাজ করেছ। যদি এর কোন সাথী থাকত ! হযরত আবূ বাসির (রা) বুঝে ফেললেন, আমি যদি এখানেই থাকি, তবে তিনি আমাকে আবার কাফিরদের হাতে সোপর্দ করবেন। এ জন্যে মদীনা থেকে বের হয়ে তিনি সমুদ্রোপকূলে গিয়ে অবস্থান নিলেন, যেখান দিয়ে কুরায়শের বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে আসত। মক্কার অসহায় নির্যাতীত মুসলমানগণ যখন এটা জানতে পেলেন, তখন চুপে চুপে এসে হযরত আবূ বাসিরের সাথে মিলিত হতে শুরু করলেন। সুহায়ল ইবন আমরের পুত্র হযরত আবূ জন্দল

(রা)-ও এখানে এসে উপস্থিত হলেন। এভাবে সত্তর জনের[১] একটি দল সেখানে জমা হয়ে গেল। কুরায়শের যে বাণিজ্য কাফেলা সেদিক দিয়ে অতিক্রম করত, তারা তাতে হামলা চালাতেন। এভাবে গনীমতের মাল সংগ্রহ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকলেন। কুরায়শগণ বাধ্য হয়ে রাসূলের দরবারে লোক প্রেরণ করল যে, আমরা আপনাকে আল্লাহ এবং আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আরয করছি, আপনি আবূ বাসির ও তার দলকে মদীনায় নিয়ে আসুন। অতঃপর আমাদের মধ্য থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে আমরা তার ব্যাপারে অভিযোগ করব না।

রাসূল (সা) আবূ বাসির (রা)-এর নামে একটি পত্র লিখে প্রেরণ করেন। পত্রটি যখন সেখানে পৌঁছল, হযরত আবূ বাসির (রা) তৎক্ষণে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছিলেন। পত্রটি আবূ বাসিরকে দেয়া হলো। পত্র পাঠ করতে করতে তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, এমতাবস্থায় তাঁর জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভে গেল। পত্রটি তাঁর বুকের উপরই ছিল। (যেমন সুহায়লী বর্ণনা করেছেন, ২খ. পৃ. ২৩৩)। অপর বর্ণনায় আছে, পত্রটি তাঁর হাতে ছিল। (ফাতহুল বারী)।

হযরত আবূ জান্দল ইবন সুহায়ল (রা) আবূ বাসির (রা)-কে সেখানেই কাফন দাফন করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর পর তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন।

সুহায়ল ইবন আমর যখন ঐ ব্যক্তির নিহত হওয়ার সংবাদ পেল, যাকে আবূ বাসির (রা) হত্যা করেছিলেন, সে ব্যক্তি ছিল সুহায়লের গোত্রের; তাই তখন সে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হত্যার রক্তপণ দাবি করার ইচ্ছা করল। কিন্তু আবূ সুফিয়ান বললেন, তুমি মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে রক্তপণ চাইতে পার না, কেননা তিনি তো ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আবূ বাসিরকে তোমার লোকদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আর আবূ বাসিরও রাসূল (সা)-এর নির্দেশে এ হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি, বরং সে নিজেই হত্যা করেছে। আর এ রক্তপণ আবূ বাসিরের বংশ ও গোত্রের কাছেও দাবি করা যাবে না; কেননা আবূ বাসির তাদের ধর্মে নেই। (ফাতহুল বারী, কিতাবুশ-শুরূত)।

চুক্তি সম্পাদনের পর যে সমস্ত পুরুষ মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনা আসতেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের চুক্তি অনুযায়ী মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এর মাঝে কিছু মুসলমান মহিলা হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় এসে পৌঁছলেন। মক্কাবাসী চুক্তি অনুসারে তাদেরও ফেরত দেয়ার দাবি জানাল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাদের ফিরিয়ে দিতে নিষেধ করলেন এবং এটা প্রকাশ করে দিলেন যে, ফেরত দেয়ার শর্তটি ছিল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, স্ত্রীলোকগণ এ শর্তের অন্তর্ভুক্ত নন। সুতরাং কোন কোন রিওয়ায়াত অনুযায়ী শর্তটি ছিল, "আপনার কাছে কোন পুরুষ আসবে না যাকে আপনি ফেরত পাঠাবেন না"; আরো প্রকাশ থাকে যে, رجل শব্দটির

---

১. আল্লামা সুহায়লী বলেন, সেখানে তিনশত মানুষ একত্রিত হয়েছিলেন, যেমনটি যুহরী এবং মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ২০৩।

অর্থ পুরুষ, এতে মহিলা কিভাবে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ? এটা আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করলেন এবং বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল করলেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ لاَهُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَهُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاٰتُوْهُمْ مَّا اَنْفَقُوْا وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلاَ تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْئَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَا اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ·

"হে মুমিনগণ, তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিও না। মুমিন নারিগণ কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরগণ মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দিও। এরপর তোমরা তাদেরকে মাহর দিয়ে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না। তোমরা কাফির নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না, তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে তারা যা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে ফয়সালা প্রদান করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের মধ্যে থেকে যায় এবং তোমাদের যদি সুযোগ আসে, তখন যাদের স্ত্রীগণ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, তাদেরকে, তারা যা ব্যয় করেছে তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। তোমরা ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।" (সূরা মুমতাহিনা : ১০-১১)

এরপর কাফিররাও চুপ হয়ে গেল এবং মহিলাদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবি করল না।

ফায়েদা, উদাহরণ এবং মাসআলা ও নির্দেশ

১. মুসলিম শাসক ও মতামত দানের অধিকারী মুসলমান কাফিরদের সাথে সন্ধি করা যদি ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ ও মঙ্গলজনক মনে করেন, তবে তা করা জায়েয। এরূপ সন্ধিও জিহাদের অনুরূপ। কেননা জিহাদের উদ্দেশ্য হলো কাফির ও কুফরী শক্তির মন্দকর্মকে নির্মূল করা, যা এ সন্ধি দ্বারাও অর্জিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ "আর

যদি কাফির সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তা হলে তুমিও সন্ধির প্রতি ঝুঁকবে, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখবে[১] (অর্থাৎ সন্ধির ভরসা করবে না)।"

২. সন্ধি দ্বারা যদি ইসলাম ও মুসলমানের উপকার না হয়, তবে এমন সন্ধি করা জায়েয নয়। কেননা এরূপ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমান এবং জিহাদের ফরয আদায় বন্ধ হওয়ার কারণে পরিণত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلاَ تَهِنُوْا وتدْعُوْا الى السَّلْم وانْتُمْ الاعْلوْن واللّهُ معكُمْ ولـنْ يَترِكُمْ اَعْمَالكُمْ ٠

"সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না, তোমরাই প্রবল, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন, তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩৫)

অর্থাৎ জিহাদ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাফিরের সাথে সন্ধি করা জায়েয নয়; আর সন্ধির অর্থ (স্থায়ীভাবে) যুদ্ধ বাদ দেয়া নয়; এ কারণে ফকীহগণ সন্ধির জন্য 'মাওয়াদিআত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর 'মাওয়াদিআত' শব্দের আভিধানিক অর্থ একে অপরকে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেয়া।

৩. প্রয়োজনের সময় কাফিরদের সাথে কোন বিনিময় ছাড়া অথবা অর্থ দিয়ে কিংবা অর্থ নিয়ে, এ তিন ধরনের সন্ধিই জায়েয আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের পর মদীনার ইয়াহূদীদের সাথে কোন বিনিময় লেনদেন ছাড়াই চুক্তি করেছিলেন, আর এ সময় এ সন্ধি চুক্তি করলেন যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। আর নাজরানের খ্রিস্টানদের থেকে মাল গ্রহণ করে সন্ধি করেছেন এবং আহযাব যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারীকে মদীনায় উৎপাদিত খেজুরের অর্ধেক দিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা আহযাব যুদ্ধের বর্ণনাকালে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, এ তিন ধরনের সন্ধিই জায়েয আছে।

৪. মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে যখন কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করার প্রয়োজন হবে, তখন তা লিখে নেয়া উচিত। এ জন্যে যে, যে লেনদেন ও সম্পর্ক একটা (দীর্ঘ) সময় পর্যন্ত চলবে, সতর্কতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তা লিখে নিতে আদেশ দিয়েছেন :

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ٠

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিখে রেখো।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

হ্যাঁ, তবে যে লেনদেন ও যে চুক্তি তাৎক্ষণিক বা সাময়িক, যা ভবিষ্যতের উপর নির্ভরশীল নয়, তা লিখে রাখা জরুরী নয়। যেমন আল্লাহ্ বলেন ;

---

১. সুবহান আল্লাহ, একেই বলে আল্লাহ তা'আলার কালাম, এখানে সন্ধির সাথে সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের মাসআলাও বর্ণনা করা হয়েছে।

اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلاَّ تَكْتُبُوْهَا

"কিন্তু তোমরা পরস্পরে যে ব্যবসার নগদ আদান প্রদান কর, তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই।" (সূরা বাকারা : ২৮২)

জানা গেল, যে লেনদেন এমন তাৎক্ষণিক নয়, তা না লিখায় ক্ষতি আছে, তা লিখে নেয়া জরুরী ও আবশ্যিক। (শারহুস সিয়ারুল কাবীর, ৪খ. পৃ.৬)।

৫. চুক্তিনামার দু'টি কপি হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেক পক্ষের কাছে এক এক কপি সংরক্ষিত থাকে।

৬. আর প্রত্যেক কপিতে উভয় পক্ষের নেতাসহ কয়েক ব্যক্তির স্বাক্ষর নেয়া উচিত, যেমন হুদায়বিয়ায় যে চুক্তিনামা প্রস্তুত করা হয়, তাতে উভয় পক্ষের দস্তখত নেয়া হয় এবং এক কপি নবীজির কাছে এবং আরেক কপি সুহায়ল ইবন আমরের কাছে দেয়া হয়।

৭. সন্ধির শর্তাবলীর মধ্যে কোন শর্তের বিপরীত কাজ করা কুচুক্তি ও চুক্তি ভঙ্গের শামিল; এরই ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ জন্দল ও হযরত আবূ বাসির (রা)-কে এ কথা বলে ফিরিয়ে দেন যে, আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি, এর বিপরীত কাজ করব না।

৮. কোন এক এলাকার অধীন মুসলমান যদি কোন চুক্তি করে, তবে অপর এলাকার অধীন মুসলমানের জন্য এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে না, যে সমস্ত মুসলমান মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আসেন, রাসূলুল্লাহ (সা) চুক্তি অনুযায়ী তাদেরকে মক্কার মুশরিকদের হাতে তুলে দেন। তাঁর উপর কেবল এ সীমা পর্যন্ত বাধ্য-বাধকতা ছিল যে, দারুল ইসলাম অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় এমন ব্যক্তিকে থাকতে দেয়া হবে না।

হযরত আবূ বাসির ও হযরত আবূ জন্দল (রা) যেখানে গিয়ে অবস্থান নেন, তা মদীনা মুনাওয়ারার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। হযরত আবূ বাসির (রা) ও তার দল যা কিছু ঘটনা করেছেন, তা মদীনার সীমারেখার বাইরে করেছেন। অধিকন্তু তা তারা নবী (সা)-এর নির্দেশ বা অনুমতিক্রমে করেন নি। (ফাতহুল বারী, যাদুল মাআদ)।

৯. হযরত আবূ বাসির (রা) আমির গোত্রের যে ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন, তা কেবল তার ঈমান, ধর্ম ও জীবন রক্ষার তাগিদে করেছেন। কেননা আবূ বাসির জানতেন যে, মক্কায় যাওয়ার পর তার প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার করা হবে, এবং কুফরী ও শিরক করতে তাকে বাধ্য করা হবে। এ জন্যে তিনি ঐ আমির গোত্রের ব্যক্তিকে হত্যা করে নিজ ঈমান ও প্রাণ রক্ষা করেছেন। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৩৪)।

১০. যে সমস্ত মহিলা হিজরত করে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসেন, তাদের (পূর্ব) স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং অনুরূপভাবে যদি

কোন পুরুষ মুসলমান হয়ে দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে চলে আসেন, তা—হলে তার কাফির স্ত্রীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

১১. لا تمسكوا بعصم الكوافر, 'কাফির স্ত্রীদের সাথে বিবাহ বন্ধন ধরে রেখো না' অর্থাৎ তাদের ছেড়ে দাও আর তাদের সাথে স্ত্রীত্বের সম্পর্ক ছিন্ন কর। মুসলমানের জন্য এটা উচিত নয় যে, এক মুশরিক স্ত্রীলোককে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে। সুতরাং হযরত উমর (রা) এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর মক্কায় বসবাসরত নিজের দু'জন মুশরিক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। যাদের একজনের নাম ছিল কারিয়া, যে পরে মুয়াবিয়া ইবন আবূ সুফিয়ানের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আর অপরজনের নাম ছিল উম্মে কুলসুম, যে পরে আবূ জুহমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[1]

এ দ্বারা সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর ঈমান ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় যে, আল্লাহর আদেশের সামনে তারা কোন সম্পর্ক বা ভালবাসার বিন্দুমাত্র পরোয়াও করেন নি। আর হবেই না বা কেন, তাদের অন্তরে তো আল্লাহ্ তা'আলার ভালবাসা এতটাই সুদৃঢ় ছিল যে, তাতে অপর কেউ অনুপ্রবেশের কোন সুযোগই ছিল না।

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِه "আল্লাহ তা'আলা কারো দেহাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন নি।"

১২. ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, لا يسقط من شعره الا اخذوه অর্থাৎ "নবী (সা)-এর পবিত্র দেহ থেকে যে চুল পড়ে যেত, সাহাবায়ে কিরাম (রা) তা পূর্ণ ভালবাসা, পূর্ণ পবিত্রতার সাথে হাতে হাতে নিয়ে বরকতের জন্য নিজের কাছে সংরক্ষণ করতেন।" এরদ্বারা জানা গেল যে, পুণ্যবানদের স্মৃতিচিহ্ন বরকতের জন্য সংরক্ষণ করা জায়েয ও বৈধ। (ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ২৫০)।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِه اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ·

"আর তাদের নবী তাদেরকে বলেছিল, তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই তাবূত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে চিত্ত-প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।" (সূরা বাকারা : ২৪৮)

বনী ইসরাঈলগণ যখন তাদের নবীর কাছে তালূতের বাদশাহ হওয়ার প্রমাণ চাইল, তখন তিনি এ আলামত বর্ণনা করলেন যে, তার সাথে একটি সিন্দুক থাকবে, যাতে হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর বরকতময় স্মৃতিচিহ্ন থাকবে; অর্থাৎ হযরত মূসা ও হযরত হারুন (আ)-এর লাঠি, কাপড়, জুতা এবং তাওরাতের কিছু

---

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ৩৬১।

তখতি থাকবে। বরকতের জন্য এ সিন্দুক ফেরেশতাগণ বহন করবেন। যা দেখে তার বাদশাহ হওয়া সম্পর্কে ঈমানদারগণের প্রত্যয় জন্মাবে। আর প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি সম্মান ও ভালবাসা পাওয়ার যোগ্য, তার নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন মূলত তাকেই শ্রদ্ধা করা। সাহাবায়ে কিরাম (রা) কর্তৃক মহানবী (সা)-এর বর্ম, তরবারি, পেয়ালা এবং আংটি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কথা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। যার উপর ইমাম বুখারী পঞ্চম অধ্যায়ে باب ما ذكر من روع النبى ﷺ وعصاب وسيفه وقدحه وخاتمه ومن شعره ونعله নামে একটি পরিচ্ছেদ রেখেছেন, (১১খ. পৃ.৪৩০)। আর যদি নেককার ব্যক্তিগণের চিহ্ন থেকে বরকতের মাসয়ালা অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, তা হলে কাযী ইয়ায কৃত 'জিযবিল কুলূব' ও 'আশ-শিফা' এবং সায়্যিদ সামহুদীর কিতাব দেখুন।

১৩. হুদায়বিয়ার ঘটনায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ফযীলত ও পরিপূর্ণতা দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত, এভাবে যে, এ সন্ধির ফলে সমস্ত সাহাবা, এমনকি হযরত উমর ফারুক (রা) পর্যন্ত বিমর্ষ ও শোকাভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতই নিশ্চিন্ত ছিলেন। দ্বিতীয়ত, হযরত উমর (রা) তার অভিযোগ হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকটে পেশ করলেন। আবূ বকর (রা) প্রতিটি শব্দে ও প্রতিটি অক্ষরে হুবহু ঐ জবাব দিলেন যা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে বেরিয়েছিল।[১]

১৪. ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, হুদায়বিয়ার কিছু অংশ ছিল হেরেমের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু ছিল হেরেম বহির্ভূত এলাকা। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) তো অবস্থান করছিলেন হেরেম বহির্ভূত এলাকায় কিন্তু নামাযাদি আদায় করেছেন হেরেমভুক্ত এলাকায়।

সুতরাং যে ব্যক্তির সামনে এমন অবস্থা আসবে যে, সে হেরেমের নিকটে অবস্থান করছে, তা হলে তার জন্য হেরেমের সীমার অভ্যন্তরে গিয়ে নামায আদায় করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা)-এর আমল এরূপই ছিল।

অধিকন্তু এ ঘটনা দ্বারা জানা গেল যে, নামাযে একলক্ষ গুণ সওয়াব মসজিদুল হারামের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং হেরেমের সীমারেখার মধ্যে যেখানেই নামায আদায় করা হোক, একলক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যাবে।[২]

১৫. রাসূলুল্লাহ (সা) যখন সাহাবিগণকে কুরবানী করতে ও মাথা মুণ্ডন করার আদেশ দেন, সাহাবিগণ এ আদেশ মানতে কিছুটা বিলম্ব করেন। তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা)-এর পরামর্শ অনুসারে কাজ করেন। এতে জানা গেল যে, স্ত্রীলোকের সাথে পরামর্শ করা জায়েয; তবে এ শর্তে যে, তার বুঝ, দৃষ্টিভঙ্গি, পরহেযগারী ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

১. যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১২৮।

২ যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১৪৮।

১৬. সুহায়ল ইবন আমরের জেদের ফলে তিনি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ স্থলে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখা অনুমোদন করেন, যদিও بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখা উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিল; কিন্তু যেহেতু بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখাও সত্য এবং সঠিক, কাজেই রাসূলুল্লাহ (সা) এখানে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্নের জন্য অনমনীয় হননি।

১৭. বায়'আতের মাহাত্ম্য

বায়'আতের তাৎপর্য সম্বন্ধে আকাবার বায়'আতে বলা হয়েছে। যার সার-সংক্ষেপ এই যে, 'বায়'আত' 'বায়উন' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিক্রয় করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় নিজের সত্তাকে জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলার হাতে সোপর্দ করাকে বায়'আত বলে। এখানে নিজের সত্তা হলো পণ্য আর জান্নাত হলো এর মূল্য। মানুষ বিক্রেতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা ক্রেতা। সমস্ত পণ্ডিতের নিকট এটা গ্রহণযোগ্য যে, বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়কৃত মাল বিক্রেতার অধিকার থেকে ক্রেতার অধিকারে চলে যায়। ক্রেতাই এর সমস্ত ভোগের অধিকার লাভ করে। অনুরূপভাবে মু'মিন বায়'আত করার পর আপন আত্মার (নিজের) মালিক থাকে না। এ জন্যে মু'মিনের উচিত যে, নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিজের জীবনের কোন কিছুই অপব্যয় না করা।

কিন্তু এ লেনদেন সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হয় না, বরং নবী (আ)-গণ এবং তাঁদের ওয়ারিশগণের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়'আত হন, তখন প্রকৃত বায়'আত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে হয়েছে; আর রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন উভয়ের মধ্যে উকিল ও মধ্যস্থতাকারী। যেমন আল্লাহ বলেন :

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ـ

"যারা তোমার হাতে বায়'আত করে তারা তো আল্লাহরই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।" (সূরা ফাতহ : ১০)

সহীহ বুখারীতে হযরত সাহল ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : من يضمن لى ما بين لحييه ورجليه اضمن له الجنة "কে আছো, যে তার দু'চোয়ালের মধ্যবর্তী ও দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানের যিম্মাদার হবে, অর্থাৎ জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযতের যিম্মা নেবে, আমি হব তার জান্নাতের যিম্মাদার।"

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেকে মূল্য অর্থাৎ জান্নাতের যামিনদার আখ্যয়িত করেছেন যে, যদি ঈমানদারগণ ঐ সবের যামিন ও যিম্মাদারী নেয়, জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের কোন ব্যয় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না করে, যা আমাদের বিক্রয়কৃত পণ্য, তা হলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিনিময় অর্থাৎ মূল্য– জান্নাত নিয়ে দেয়ার তত্ত্বাবধায়ক ও যামিনদার হবেন।

এ হাদীসে يضمن এবং اضمن শব্দদ্বারা এ বিক্রির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এ জন্যে যে, যামিন এবং তত্ত্বাবধান তো বিক্রির ক্ষেত্রেই হয়; বিক্রিকৃত দ্রব্যে যদি কোন দোষ বের হয়, তা হলে এ দোষের কারণে ক্রেতা ঐ দ্রব্য ক্রয়ের চুক্তি বাতিল করার অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু ক্রেতা যদি বিক্রেয় দ্রব্যের দোষ দেখেও বলে, আমি ক্রয়ে সম্মত আছি, তখন তার বাতিল করার অধিকার নষ্ট হয়ে যায় এবং বিক্রি পূর্ণ হয়ে যায়; ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয় বাতিল করার সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে না।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন বৃক্ষের নিচে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ... .

"আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল...।" (সূরা ফাতহ : ১৮)

এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ক্রয় বাতিলের অধিকার নষ্ট করে দিলেন এবং এটা প্রকাশ করে দিলেন যে,এ মহাত্মাগণ আল্লাহর সাথে যে বিক্রির কারবার করেছেন, তা কখনো বাতিল হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁর ক্রয় বাতিলের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিলেন কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও رضينا بالله (আমরাও আল্লাহতে সন্তুষ্ট) বলে নিজেদের ইচ্ছাকেও বাতিল করে দিলেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন : رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ "আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট।"

যদিও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন দোষের সম্ভাবনা নেই, তবুও সাহাবায়ে কিরাম (রা) رضينا বলে বাতিলের ক্ষীণ সম্ভাবনাকেও দূর করে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, উভয় পক্ষ আপন আপন সন্তুষ্টি ও আগ্রহ প্রকাশ করে স্ব স্ব ইচ্ছাকে নাকচ করে দেন, ফলে বিক্রি পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল, সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের আত্মাকে আল্লাহ্ তা'আলার হাওলায় সোপর্দ করে দেন। আল্লাহর ওয়াদার প্রেক্ষিতে তাঁদের আত্মার মূল্য (জান্নাত) আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদান আবশ্যিক হয়ে গেল।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছাড়া আর সবার লেনদেন বিপদের মধ্যে আছে। জানা নেই যে, কার কার বিক্রয়কৃত মালে দোষের ভিত্তিতে ক্রয় বাতিল করে দেয়া হয়। আর অনেক লোক তো পৃথিবীতেই আল্লাহ্ তা'আলা থেকে মাল ফেরত নিয়ে বসেছে। যেমন জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এসে বলল, اقلنى بيعتى 'আমার বায়'আত ফিরিয়ে নিন।'

ফকীহগণের দৃষ্টিতে বিক্রয়ে অস্বীকৃতি (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয় পক্ষের জন্য চুক্তি বাতিল এবং তৃতীয়পক্ষের জন্য নতুন বিক্রি হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যখন কোন দুর্ভাগা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিক্রয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তখন তার ও

আল্লাহর মধ্যকার চুক্তি তো বাতিল হয়ে যায় এবং তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ শয়তানের জন্য তা নতুন বিক্রি হয়। ইমাম আযম আবূ হানীফা নু'মান (র)-এর সিদ্ধান্ত হলো, لاربوا بين المولى وعبده 'দাস এবং প্রভুর মধ্যে সুদ নেই।'

এজন্যে যে, দাসের নিকট যা কিছু আছে, এর সবকিছুই তো মালিকেরই অধিকারভুক্ত। আমরা যেহেতু দাসানুদাস, শেষ পর্যন্ত ঐ মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলারই দাস, আর এমনই দাস যে, কোনক্রমেই তাঁর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভবই নয়, আর না আলহামদু লিল্লাহ, তাঁর দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাই; এ জন্যে মহামহিম আল্লাহ তা'আলা আমাদের একটা নেকীতে কমপক্ষে দু'গুণ লাভ দিয়ে থাকেন। يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ (আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন)।

সার-সংক্ষেপ

যে মহাত্মাগণ নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়'আত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির ফল্গুধারা বইয়ে দেন, সন্নিকটবর্তী বিজয় ও প্রচুর গনীমত লাভের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন :

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۔

"আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয় ও বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা ওরা হস্তগত করবে' আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ফাতহ : ১৮)

আর সূরা তাওবায় এ বায়'আতকে মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করেন। আল্লাহ্ বলেন :

فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۔

"তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং এটাই তো মহাসাফল্য।" (সূরা তাওবা : ১১১)

১৭. আর রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক কখনো ইসলামের উপর, কখনো হিজরতের উপর, কখনো জিহাদের উপর, কখনো নিষিদ্ধ কাজসমূহের ব্যাপারে যেমন, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার ও চুরি করবে না, সন্তান হত্যা করবে না, কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদ দেবে না, আল্লাহর নাফরমানী করবে

না; আবার কখনো এ কথার উপর যে, আল্লাহর ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকঠিকভাবে আদায় করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করবে, আপন নেতা ও শাসকের আনুগত্য করবে যতক্ষণ না সে আল্লাহর নাফরমানী করার আদেশ করবে, কারো কাছে হাত পাতবে না, পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ করবে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজের ব্যাপারে বায়'আত গ্রহণ করা সহীহ্ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত ও গ্রহণযোগ্য। (বিস্তারিতের জন্য ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৬০-৬৪; কানযুল উম্মাল, ১খ. পৃ.২৫, পঞ্চম অধ্যায় 'ফী আহকামিল বায়'আহ' দেখুন)।

এ সরাসরি আয়াতসমূহ এবং সহীহ্ হাদীসসমূহের প্রমাণের পর বায়'আত সুন্নত, উত্তম এবং কল্যাণ ও বরকত লাভের মাধ্যম হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষক এবং উম্মতের অন্তরের পবিত্রতাকারী ছিলেন, অনুরূপভাবে তিনি আল্লাহর যমীনে আল্লাহর খলীফাও ছিলেন। যে বায়'আত তিনি আল্লাহর খলীফা হিসেবে নিয়েছেন, তা খলীফাগণের জন্য সুন্নত হয়েছে এবং যে বায়'আত তিনি কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষক এবং অন্তরের পবিত্রতাকারী হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তা আল্লাহপ্রেমিক আলিম, আল্লাহর আহল আরিফগণের জন্য সুন্নত হয়েছে।

১৮. হযরত উসমান গনী (রা)-এর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এক হাতে অপর হাত রেখে বায়'আত করা এ ব্যাপারে দলীল যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষে বায়'আত গ্রহণ করাও বৈধ।

১৯. হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) কর্তৃক তিনবার বায়'আত করা দ্বারা এ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বায়'আতের নবায়ন ও পুনরাবৃত্তি উত্তম ও মুস্তাহাব।

২০. হুদায়বিয়ায় যারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বাধা এবং শর্ত ছাড়াই তাঁদের প্রতি সন্তুষ্টি ও আনন্দ প্রকাশ করে বলেছেন : لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ (আল্লাহ্ তো মু'মিনগণের উপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষের তলে তোমার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল, তা তিনি অবগত ছিলেন) বলে তাদের অন্তরের সত্যনিষ্ঠার বর্ণনা দিয়েছেন এবং فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ (তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি) বলে তাঁদের নির্ভরতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার কথা ব্যক্ত করলেন যে, তাঁদের অন্তর সামগ্রিকভাবে প্রশান্ত, সংশয়ের কোন নাম-নিশানা নেই। প্রকাশ থাকে যে, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং যার অন্তরে তিনি প্রশান্তি ও নির্ভরতা নাযিল করেছেন, এমন ব্যক্তির পক্ষে বাস্তবে না মুনাফিক হওয়া সম্ভব, আর না মুরতাদ হওয়া সম্ভব। হাদীসসমূহে তাঁদের অনেক ফযীলতের কথা এসেছে। সুতরাং মুসনাদে আহমদে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

বলেছেন, যে সমস্ত লোক বৃক্ষের নিচে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউই দোযখে যাবে না।

আর لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ এ আয়াত দ্বারা তাঁদের একনিষ্ঠ মু'মিন হওয়া এবং আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী ও পসন্দনীয় হওয়া পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

সম্মানিত শী'আ বন্ধুগণ فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করুন যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের অন্তরের নিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এ আমল কপটতার ভিত্তিতে ছিল না, বরং সৎ নিয়্যতের ভিত্তিতে ছিল। فَعَلِمَ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ এরপর কপটতার অবকাশ অবশিষ্ট থাকে না; যখন আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের অন্তরের নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন, তখন তো মুনাফিকী ও কপটতার সন্দেহ খতম হয়ে গেছে এবং এ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً যদ্বারা এ মহাত্মাগণের সাথে খায়বার বিজয়, وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً বা বিপুল পরিমাণে গনীমত লাভ ও মহাবিজয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। আর এ ওয়াদাও ছিল ঐ একনিষ্ঠগণের (সাহাবী) জন্য। এতে জানা গেল যে, যে মহাত্মাগণের মধ্যে এ গনীমত বন্টন করা হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ এবং তাঁর পসন্দনীয় বান্দা।

পৃথিবীর বিভিন্ন বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতী পত্র

আল্লাহ্ তা'আলা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য বিজয় এবং স্বস্তি ও শান্তিদায়ক বলে অভিহিত করেছেন। নিঃসন্দেহে তা ছিল প্রকাশ্য বিজয় এবং স্বস্তি ও শান্তি-দায়ক। কারণ, 'ফাতহ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন বন্ধ জিনিসকে খুলে দেয়া। আরববাসীর বিরোধিতার কারণে এ যাবত ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের দরজা বন্ধ ছিল। এ সন্ধি সে দরজা খুলে দিল। এবার সময় এলো মহামহিম আল্লাহর বাণী ও পয়গাম তাঁর সকল বান্দার নিকট পৌঁছে দেয়ার। ইসলামের বিশাল দস্তরখানে শরীক হওয়ার জন্য সকলকে দাওয়াত দেয়ার, যাতে এ দস্তরখানের উপাদেয় খাদ্য ও ফল-ফলারীর স্বাদ আস্বাদনে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দাওয়াত কবূল করল এবং ইসলামের দস্তরখানে এসে বসে পড়ল, সে কি দেখতে পেল ? এক এক করে চরিত্রের সব দিকের পূর্ণতা, সমস্ত সুন্দর আদব-কায়দা, ফযীলত ও মর্যাদা, প্রশংসা এবং সৌষ্ঠবের কোন দিক এমন নেই, যা ঐ দস্তরখানে বিদ্যমান নেই। তা এতই পাক-সাফ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দস্তরখান যে, এতে প্রকাশ্য কিংবা গুপ্তভাবে অশ্লীল কিংবা অনভিপ্রেত কোন বস্তুর তাতে একবিন্দু পরিমাণেরও কোথাও নাম-নিশানা নেই। নিছক পার্থিব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর নামে খানা শুরু করে এক-দু' লোকমাতেই জিহ্বা দ্রুত

ইসলামের স্বাদ ও ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করে ফেলল। বুঝতে পেল যে, আত্মার খাদ্য তো এটাই, এ খাদ্য দ্বারাই রূহ বেঁচে থাকতে পারে। কুফর ও শিরকের অপবিত্র ও নোংরা বস্তু খেয়ে আত্মার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব এবং তা অবাস্তব।

মোটকথা, নবী করীম (সা) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে ষষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে বিভিন্ন বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে খুতবা দিলেন :

"ওহে লোক সকল, আমি তো সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। এ পয়গাম বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দাও, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। তোমরা ঈসা (আ)-এর সঙ্গীদের মত কর না। তিনি যখন তাদের নিকটে যেতে বলতেন, তখন তারা সম্মত হতো আর যখন দূরে যেতে বলতেন, তখন মাল-সামান নিয়ে বসে পড়ত।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের আনুগত্য, আত্মোৎসর্গীকরণ, একনিষ্ঠতা ও কুরবানীর কঠিন থেকে কঠিনতম পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার আল্লাহ্ প্রদত্ত সনদ এবং رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট)-এর 'স্বর্ণ পদক' লাভ করেছেন। কাজেই তাঁরা এ কাজে কেন পিছিয়ে পড়বেন ? জানপ্রাণ দিয়ে সবাই নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হলেন এবং নবী দরবারে একটা উপযুক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাজা-বাদশাহগণ তো সিলমোহর ছাড়া কোনো পত্র গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না, এমনকি সিলমোহর ছাড়া কোনো পত্র তারা পড়েনও না। তিনি সাহাবিগণের পরামর্শে এমন একটি আংটি বানালেন, যার রিং ও নাগিনা উভয়েই ছিল রৌপ্যের; কিন্তু নির্মাণ ছিল আবিসিনিয়ার স্টাইলে। এর নাগিনায় খোদিত ছিল 'মুহাম্মদ-রাসূল-আল্লাহ্'। সবচে' নিচে 'মুহাম্মদ' শব্দটি ছিল এবং সবচে' উপরে ছিল 'আল্লাহ্' শব্দটি আর 'রাসূল' শব্দটি ছিল মাঝখানে (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ ৮৪; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৩৪)।

মহানবী (সা) শাসক এবং আমীরগণের নামে পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তিনি তাদেরকে সত্যের প্রতি দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেন যে, প্রজাসাধারণের পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্বও আপনাদের উপরই বর্তাবে।

ওয়াকিদী বলেন, বিভিন্ন শাসকের নামে প্রেরিত এ সমস্ত পত্র ষষ্ঠ হিজরীর শেষে যিলহজ্জ মাসে হুদায়বিয়ার ঘটনার পর প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সীরাত বিশেষজ্ঞের মতে সপ্তম হিজরীতে এ সব পত্র প্রেরণ করা হয়। সম্ভবত পৃথিবীর বিভিন্ন শাসকের নামে পত্র প্রেরণের ইচ্ছা তো নবী (সা) ষষ্ঠ হিজরীর শেষভাগেই করেছিলেন; তবে পত্র প্রেরণের কাজটি সপ্তম হিজরীতে করা হয়।[১]

---

১. মাদারিজুন নুবূওয়াত, ২খ. পৃ. ২৯৪।

ইমাম বায়হাকী বলেন, মুতা যুদ্ধের পর তিনি এসব পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে এসব পত্র প্রেরণ করা হয়। অর্থাৎ এর মধ্যবর্তী সময়ে পত্র প্রেরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

১. রোম সম্রাট কায়সারের নামে পবিত্র পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى هرقل عظيم الرّوم سلام على من اتّبع الهدى أمّا بعد فانّي أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين فان تولّيت فانّما عليك اثم اليرسليين ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاّ نعبد الاّ الله ولا نُشرك به شيئا ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ٠

محمّد
رسول
الله

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হেরাক্লিয়াসের প্রতি,

সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি আপনাকে ঐ কালেমার দাওয়াত দিচ্ছি, যা ইসলামের প্রতি আনয়ন করে (অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যেবার)। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন (أُوْلَئِكَ يُؤْتَوَ اَجْـرَهُمْ مَـرَّتَيْنِ); আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে আপনার প্রজা সাধারণের পাপের বোঝাও আপনার উপরই বর্তাবে। ওহে আসমানী কিতাবের অধিকারিগণ, আসুন এমন বাক্যের প্রতি যা আপনাদের এবং আমাদের মাঝে অভিন্ন। (তা হলো,) এক আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি আপনারা মুখ ফিরিয়ে নেন, তাহলে সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)।"

এ পত্রসহ রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে রোম সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। রোম সম্রাট তখন পারস্য বিজয়ের কৃতজ্ঞতা আদায়ের উদ্দেশ্যে হিমস থেকে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেছিলেন। হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) সপ্তম হিজরীর মুহররম মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছেন এবং বসরার শাসনকর্তার মাধ্যমে রোম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হয়ে পত্রটি হস্তান্তর করেন।[১] পত্র পেশ করার পূর্বে তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, যা নিম্নরূপ :

১. ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩৫।

রোম সম্রাটের দরবারে হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-এর ভাষণ

হে রোম সম্রাট, যিনি আমাকে আপনার সমীপে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি আপনার চেয়ে কত উত্তম, আর যে মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পয়গাম্বর বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তিনি সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ। কাজেই যা কিছু আরয করি, দয়া করে মন লাগিয়ে শুনুন এবং নিষ্ঠার সাথে এব জবাব দিন। যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনেন, তা হলে এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর যদি সততার সাথে জবাব না দেন, তা হলে জবাব ইনসাফপূর্ণ ও সুবিবেচনাপ্রসূত হবে না।

হে রোম সম্রাট! বলুন, দাহিয়াতুল কালবী (রা) বললেন, আপনার কি জানা আছে যে, হযরত ঈসা (আ) নামায পড়তেন ?

রোম সম্রাট : হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি নামায পড়তেন।

দাহিয়াতুল কালবী : আমি আপনাকে ঐ পরম সত্তার দিকে আহ্বান করছি, যাঁর উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ) নামায পড়তেন এবং যাঁর উদ্দেশ্যে কপাল মাটিতে লাগাতেন। যিনি ঈসা (আ)-কে তাঁর মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এ সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আমি আপনাকে ঐ উম্মী নবীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, যাঁর সম্বন্ধে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ দিয়ে গেছেন, যে ব্যাপারে রয়েছে আপনার পর্যাপ্ত জ্ঞান। আপনি যদি এ দাওয়াত কবূল করেন, তা হলে আপনার জন্য ইহ-পরকালে কল্যাণ রয়েছে। অন্যথায় আপনার আখিরাত তো বরবাদ হবেই, দুনিয়াতেও আপনার রাজত্বে অংশীদার সৃষ্টি হবে। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আপনার একজন প্রভু আছেন যিনি অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করেন এবং যাঁর নিয়ামতসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে।

রোম সম্রাট হযরত দাহিয়া (রা)-এর হাত থেকে নবীজির পত্রটি গ্রহণ করে তা চোখে ও মাথায় বুলালেন এবং চুমো খেলেন, খুলে পত্রটি পাঠ করলেন এবং বললেন, চিন্তা-ভাবনা করে আমি আগামীকাল এর জবাব দেব। (রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৩৫৫)।

সম্রাট নিজ কর্মচারীদের বললেন, তাঁর কওমের যে সকল লোক আমার দেশে এসেছে, তাদেরকে উপস্থিত করো। তাদের কাছ থেকে যাতে এ ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থা জেনে নিতে পারি। ঘটনাক্রমে আবূ সুফিয়ান ঐ সময় এক বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ায় এসেছিলেন এবং গাযযায় অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তখনও আবূ সুফিয়ান মুসলমান হননি। কায়সারের লোকজন গাযযায় গিয়ে তাকে নিয়ে আসে এবং দরবারে হাযির করে। বড়ই শান-শওকতের সাথে দরবার বসে। রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ এবং পাদ্রিগণ সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আরবীয় দলকে সম্বোধন করে সম্রাট প্রথম জানতে চাইলেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ নবূয়াতের দাবিদার ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় ? আবূ সুফিয়ান বললেন, আমি। সম্রাট বললেন, তুমি আমার কাছে এসো। আর কুরায়শ দলের অপর ব্যক্তিদের তাঁর

পশ্চাতে বসার[১] আদেশ করলেন। তাদেরকে বললেন, আমি এ ব্যক্তিকে কিছু প্রশ্ন করব, সে যদি মিথ্যে বলে, তাহলে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, যদি আমার এ সন্দেহ না হতো যে, লোকে আমাকে মিথ্যুক বলবে, তবে অবশ্যই আমি মিথ্যে বলতাম। এরপর নিম্নরূপ কথোপকথনের ধারাবাহিকতা শুরু হয় :

সম্রাট : তোমাদের মধ্যে তাঁর বংশ মর্যাদা কিরূপ ?

আবূ সুফিয়ান : উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয়,[২] তাঁর চেয়ে উচ্চ বংশীয় কেউ নেই।

সম্রাট : তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন ?

আবূ সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তাঁর নবূয়াতের দাবি করার পূর্বে তোমরা কি তাঁকে মিথ্যে বলতে দেখেছ?

আবূ সুফিয়ান : না।

সম্রাট : তাঁর অনুসারী কারা হচ্ছে, আমীর এবং ধনবান ব্যক্তি, না কি দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তি ?

আবূ সুফিয়ান : অধিকাংশ দরিদ্র ও দুর্বল ব্যক্তি।

সম্রাট : তাঁর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে ?

আবূ সুফিয়ান : দিন দিন বেড়েই চলছে।

সম্রাট : তাঁর দীন গ্রহণের পর অসন্তুষ্টি ও অবজ্ঞাভরে কেউ কি তাঁর দীন ত্যাগ করেছে ?

আবূ সুফিয়ান : না।[৩]

---

১. কেননা সামনে বসে মুখ দেখতে পাওয়া ও চক্ষু লজ্জা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার অন্তরায়। ফাতহুল বারী।

২. এ বাক্য সহীহ বুখারীর আর দ্বিতীয় বাক্য মুসনাদে বাযযারের অনুবাদ قال هو فى حسب ما لا يفضل عليه احد ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৬২।

৩. ইসলামকে খারাপ ভেবে আজ পর্যন্ত কেউ ইসলাম ত্যাগ করেনি, হ্যাঁ, স্ত্রীলোক এবং অর্থের আকাঙ্ক্ষা করে কোন কোন লোভী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেছে, যা ধর্তব্যের মত নয়। আলহামদু লিল্লাহ, ইসলাম এর থেকে পবিত্র যে, ইসলাম নারী ও অর্থের লোভ দেখিয়ে কাউকে দাওয়াত দেয় না। হায়দারাবাদে জনৈক খ্রিস্টান আমার প্রতিবেশী ছিল, আমার কাছে আসা-যাওয়া করত, তার বয়স ছিল পঁচাশি বছর। একদিন আমি তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে সত্যি করে বল তো, তোমার জীবনে তুমি কি এমন কোন মুসলমান পেয়েছ, যে ইসলামকে খারাপ ভেবে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে? সে জবাব দিল, আল্লাহর কসম, একজন মুসলমানকেও এমনটি দেখিনি। যে ব্যক্তি খ্রিস্টান হয়েছে, সেই নারী এবং অর্থের লোভেই খ্রিস্টান হয়েছে। আর তাও কেবল নামে মাত্র, বাদ বাকী আকীদা-বিশ্বাসে তার কোন পরিবর্তন আসেনি। কেবল অর্থ এবং স্ত্রীলোকের জন্য সে নিজেকে খ্রিস্টান দাবি করে। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এমন ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ।

সম্রাট : তিনি কি কখনো চুক্তিভঙ্গ করেছেন ?

আবূ সুফিয়ান : না, আজ পর্যন্ত তিনি চুক্তিভঙ্গ করেন নি; তবে সম্প্রতি তাঁর সাথে আমাদের একটা মেয়াদের জন্য চুক্তি হয়েছে, জানি না, এতে তিনি কি করবেন। আবূ সুফিয়ান বলে, এ একটি ব্যাপার ছাড়া আমার আর কোন মন্তব্য করার সুযোগ ছিল না। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, فوالله ما التفت اليها منى আবূ সুফিয়ান বলে, "আল্লাহর কসম, আমার নিজের মতামত হিসেবে যা বলেছি, সম্রাট সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করলেন না।"

সম্রাট : তোমরা কি কখনো তাঁর সাথে যুদ্ধও করেছ ?[১]

আবূ সুফিয়ান : হ্যাঁ।

সম্রাট : যুদ্ধে কি হয়েছে ?

আবূ সুফিয়ান : কখনো তিনি জয়লাভ করেছেন, আর কখনো আমরা।

সম্রাট : তিনি তোমাদেরকে কিসের প্রতি আহ্বান করেন ?

আবূ সুফিয়ান : তিনি বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত কর, কাউকে তাঁর সাথে শরীক করো না; আর কুফর-শিরকের যা কিছু তোমাদের পিতা-পিতামহ করেছে, সেসব কিছু সম্পূর্ণ পরিত্যাগ কর। এছাড়া তিনি নামায আদায়, যাকাত দান, সত্য বলা, পবিত্র থাকা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন।

সম্রাট : তাঁর দোভাষীকে উদ্দেশ করে বললেন, তাকে বলে দাও যে, প্রথমে আমি তোমাকে তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তুমি বললে, তিনি উচ্চ বংশীয় এবং সম্ভ্রান্ত খান্দানের। নিশ্চয়ই নবিগণ এরূপ সম্ভ্রান্ত বংশেই প্রেরিত হয়ে থাকেন, যা সম্মান-মর্যাদায় উচ্চতর হয়ে থাকে। এরপর আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর বংশে কি কেউ বাদশাহ ছিলেন ? তুমি বললে, না। যদি তাঁর বংশে কেউ বাদশাহ থাকতেন, তা হলে আমি মনে করতাম এভাবে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের বাদশাহী ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কি তাঁকে মিথ্যে বলতে শুনেছ? তুমি বললে, না। এতে আমি বুঝলাম, যে ব্যক্তি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যে বলেন না, তাঁর পক্ষে আল্লাহ্ মাফ করুন, আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যে বলা কি করে সম্ভব? আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ ধরনের লোক তাঁর অনুসরণ করে? তুমি বললে, গরীব ও দুর্বল লোকেরা। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবিগণের অনুসরণ দরিদ্র

---

১. এ অর্থ فهل قاتلتموه -এর সম্রাট যুদ্ধের সূচনা করার ব্যাপারে কুরায়শদের সম্পৃক্ত করেছেন এবং বলেন নি যে, فهل قاتلكم (তিনি কি কখনো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন ?) সম্রাট নবী (ষা)-এর সম্মান ও মর্যাদাকে স্মরণ করে যুদ্ধের সূত্রপাতকারী হিসেবে কুরায়শদের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন। অধিকন্তু আল্লাহর নবিগণ কোন জাতির সাথে কখনো প্রথমেই যুদ্ধের সূচনা করেন না; প্রথমে তাদেরকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন, যখন তারা তা শোনে না এবং হঠকারিতার সাথে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়, তখন আল্লাহর নবিগণ তাদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করেন। ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৮৩।

ও দুর্বল[১] লোকেরাই করে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছ, না কমে যাচ্ছে ? তুমি বললে, বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিশ্চয়ই ঈমানের অবস্থা এই যে, এর অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। আমি তোমাকে প্রশ্ন করলাম, তাঁর দীন গ্রহণের পর কোন ব্যক্তি কি এ দীনের প্রতি অসন্তুষ্ট, বেজার হয়ে তা পরিত্যাগ করেছে ? তুমি বললে, না। নিশ্চয়ই ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে, যখন এর স্বাদ-মিষ্টতা, এর আনন্দ-খুশি কারো অন্তরে বসে যায়, কোনভাবেই তা বেরিয়ে যায় না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি ওয়াদা খেলাফ বা চুক্তিভঙ্গ করেন ? তুমি বললে, না। নিঃসন্দেহে পয়গাম্বরগণের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তাঁরা কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। আমি তোমাকে যুদ্ধের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি বললে, কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন, কখনো আমরা। নিশ্চয়ই নবী (আ)-গণের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক এমনটিই হয়ে থাকে যে, কখনো তাঁকে বিজয়ী করেন, আর কখনো করেন পরাজিত, যাতে তাঁর অনুসারীদের সততা ও নিষ্ঠার পরীক্ষা হতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত বিজয় তাঁদেরই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি কি বিষয়ে আদেশ করেন ? তুমি বললে, আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের আদেশ দেন, শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিষেধ করেন, নামায, যাকাত, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ইত্যাদির আদেশ করেন। যা তুমি বর্ণনা করেছ, যদি তার সবকিছুই সত্য হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী; শীঘ্রই তিনি এ জায়গারও অধিকারী হবেন, যেখানে আমি আমার এ দু'পা রয়েছে। আমার জানা ছিল যে, একজন নবী প্রকাশ হতে যাচ্ছেন, তবে এ ধারণা ছিল না যে, তিনি তোমাদের মধ্যেই প্রকাশ পাবেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত করার আমার বড়ই আগ্রহ, যদি আমি তাঁর খিদমতে পৌঁছতে পারি, তবে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। এরপর তিনি পত্রটি উপস্থিত সবাইকে পাঠ করে শোনালেন।

পত্রের বক্তব্য কেবল শোনার অপেক্ষা ছিল, দরবারে প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হয়ে গেল এবং চারদিক থেকে আওয়ায উচ্চতর হতে লাগল। আবূ সুফিয়ান বলেন, সে সময় আমাদেরকে বের করে দেয়া হল। বাইরে বেরিয়ে এসে আমি বললাম, আশ্চর্যের কথা, তাঁকে রোমের বাদশাহও ভয় করেন! ঐ দিন থেকে আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হল যে, তাঁর দীন অবশ্যই বিজয়ী হতে থাকবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করলেন। (বুখারী, ফাতহুল বারী)।[২]

---

১. অর্থাৎ যারা আত্মগর্বী ও অহংকারী নয়, তারা ধন-দৌলতের নেশা থেকে নিরাপদ থাকে, তাদের অন্তর অহংকার,গর্ব ও আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত থাকে, কাজেই তারা সত্য কথা শুনতে ও গ্রহণ করতে পারেন।

২ এ হাদীসটি ইমাম বুখারী বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, হাফিয আসকালানী দু'টি অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বাদাউল ওহী অধ্যায়ে, ১খ. পৃ. ৩০-৩৮ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি তাফসীর অধ্যায়ে সূরা আলে ইমরানের তাফসীরে ৮খ. পৃ. ১০০-১৬৮।

ইমাম যুহরী বলেন, খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের সময় ইবন নাতূর নামে খ্রিস্টানদের এক বড় আলিম[১] আমাকে বলেছেন, যিনি সম্রাট কায়সার-এর ঐ দরবারে উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট দরবারের পর যাগাতির রূমী নামক রোমের এক বিখ্যাত পণ্ডিত আলিমের কাছে নবী মুহাম্মদ (সা)-এর ব্যাপারে পত্র লিখেন। এ ব্যক্তি আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাপারে ছিলেন খুবই অভিজ্ঞ। সম্রাট পত্র প্রেরণের পর বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে হিমসের দিকে রওয়ানা হলেন। সম্রাট হিমসে অবস্থানকালে এর জবাব এলো যে, ইনি [মুহাম্মদ (সা)] সেই নবী, আমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলাম এবং ঈসা (আ) যাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে সত্যায়ন করছি এবং তাঁর অনুসরণ করব। তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তুমিও অবশ্যই তাঁকে সত্য মনে করবে এবং তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।

অতঃপর সম্রাট এক বিরাট দরবারের আয়োজন করলেন এবং রোমের গণ্যমান্য শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের সেখানে একত্র করলেন। দরবারের দরজাসমূহ বন্ধ করালেন এবং সম্রাট একটা বিশেষ আসনে বসলেন। তিনি উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে উচ্চস্বরে বললেন :

يا معشر الروم انى قد جمعتكم لـخبر انه قد اتانى كتـاب هذا الرجل يدعنى الى دينه وانه والله لنبى الذى كنا ننتظره ونـجده فى كتبنا فهلم الـمنقبع ولنصدقه فتسلم لنا دينانا واخرتنا .

"ওহে রোমবাসী! আমি নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সংবাদদানের জন্য তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তা হলো, আমার নিকট ঐ ব্যক্তির একটি পত্র এসেছে, তাতে তিনি আমাকে তাঁর দীন গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে তিনিই সেই নবী, আমরা যাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছি। যাঁর বর্ণনা আমরা (আসমানী) কিতাবসমূহে পাচ্ছি। অতএব এসো, আমরা সবাই মিলে তাঁরই অনুসরণ করি, তাঁকে সত্য বলে মেনে নিই, যাতে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই নিরাপদ থাকে।"

এ কথা শোনামাত্র রোমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা চিৎকার দিয়ে উঠলো এবং পলায়নের উদ্দেশ্যে দরজার দিকে ধাবিত হলো, কিন্তু দরজা ছিল বন্ধ। রোম সম্রাট আবার আদেশ করেন, ওদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। এবার বললেন, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম, তোমাদের দীনের প্রতি কঠিন বিশ্বাস, প্রত্যয় ও দৃঢ়তা দেখে আমি আনন্দিত। সম্রাটের এ বক্তব্যে সবাই খুশি হলো এবং তার প্রতি সকলে সিজদাবনত হল। অতঃপর সম্রাট হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি ভাল করেই জানি যে, তোমাদের সঙ্গী আল্লাহ্ প্রেরিত নবী, কিন্তু আমার যদি এ আশঙ্কা না হতো যে, রোমের অধিবাসীরা আমাকে

---

১. এ আলিমের নাম ছিল ইবন নাতূর, যেমন সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে।–ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৩৮।

হত্যা করে ফেলবে, তা হলে আমি অবশ্যই তার অনুসরণ করতাম। তুমি রোমের বড় পাদ্রী যাগাতির রূমীর কাছে যাও। তিনি অনেক বড় আলিম এবং আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। অধিকন্তু রোমবাসীদের উপর আমার চেয়ে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি, তুমি তার কাছে যাও এবং এ পয়গাম্বরের অবস্থা বর্ণনা কর। হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা) যাগাতিরের কাছে গেলেন এবং নবী (সা)-এর সমুদয় অবস্থা বর্ণনা করলেন। যাগাতির বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি প্রেরিত নবী, আমরা তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীর বর্ণনা আসমানী কিতাবসমূহে লিখিত পেয়েছি। এ বলে তিনি হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং নিজের পরিহিত কালো কাপড় পাল্টে সাদা কাপড় পরিধান করলেন। অতঃপর ছড়ি নিয়ে গীর্জায় এলেন ও সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন :

يا معشر الروم انه قد جاءنا كتاب من احمد يدعونا فيه الى الله عز وجل وانى اشهد ان لا اله الا الله وان احمد عبده ورسوله ·

"ওহে রোমবাসী! (আমাদের কিতাবে উল্লিখিত সেই) আহমদ মুস্তাফা (সা)-এর নিকট থেকে একটি পত্র এসেছে। তাতে তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং আহমদ মুজতবা (সা) তাঁরই বান্দা ও রাসূল।"

এ কথা শোনামাত্র লোকজন তার উপর ভেঙ্গে পড়ল, এমনকি তাকে মারধর পর্যন্ত করল। হযরত দাহিয়া (রা) ফিরে এসে সমুদয় ঘটনা সম্রাটকে অবহিত করলেন। সম্রাট বললেন, আমারও তো ভয় এটাই যে, লোকজন আমার সাথেও এমন আচরণই করবে। (তারিখে তাবারী, ৩খ. পৃ. ৮৭-৮৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৬২-২৬৮; আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ৯৪ এবং ফাতহুল বারী, ১খ. পৃ. ৪০)।[১]

মু'জামে তাবারানীতে আছে, রোম সম্রাট হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে বলেন, আমি ভাল করেই জানি যে, তিনি নবী, যেমন যাগাতির বলেছেন। কিন্তু যদি এমনটি করি, তাহলে আমার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং রোমবাসীরা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

কিন্তু রোম সম্রাট তো নবীজির এ বাণীর প্রতি দৃষ্টি দেননি যে, اسلم تسلم "ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে।" তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন, তা হলে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিই তার নিরাপদ থাকত।

পরিসমাপ্তি

রোম সম্রাট নবীজির চিঠিটি অত্যন্ত ইযযত ও সম্মানের সাথে তার স্বর্ণ নির্মিত কলমদানে রাখেন। সাইফুদ্দীন মানসূরের আমীর বলেন, একবার বাদশাহ মানসূর আমাকে কিছু নির্দেশ দিয়ে আল-মাগরিবের বাদশাহর দরবারে প্রেরণ করেন। আল-

১. এতদসমুদয় ঘটনা বিস্তারিতভাবে তাফসীরে তাবারী এবং আল-জাওয়াবুস-সাহীহ গ্রন্থে উল্লেখিত আছে কিন্তু এ ঘটনার খণ্ডিত অংশবিশেষ ফাতহুল বারীতেও বর্ণিত হয়েছে। এ জন্যে বরাতে ফাতহুল বারীর নামও অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

মাগরিবের বাদশাহ একটি সুপারিশের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বাদশাহর নিকট প্রেরণ করেন, যিনি রোম সম্রাটের বংশধরদের একজন ছিলেন। আমি ফ্রান্সের বাদশাহর নিকট থেকে যখন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করলাম, তখন তিনি আমাকে থাকার জন্য জোরাজুরি করলেন এবং বললেন, আপনি থেকে গেলে এক বিরাট দুষ্প্রাপ্য বস্তু আপনাকে দেখাব। আমি থেকে গেলাম। বাদশাহ একটি সিন্দুক চেয়ে আনালেন, সিন্দুকটিতে স্বর্ণের কারুকার্য খচিত ছিল। তার মধ্য থেকে তিনি একটি স্বর্ণের কলমদানী বের করে সেটি খুললেন। তার মধ্য থেকে তখন একটি পত্র বের হলো যা রেশমী কাপড়ে মোড়ানো ছিল। পত্রের অধিকাংশ অক্ষর মুছে গিয়েছিল। বাদশাহ বললেন, এটা আমার দাদা রোম সম্রাট কায়সারের নামে আপনাদের পয়গাম্বরের লিখা সেই পত্র, যা উত্তরাধিকার সূত্রে আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আমাদের দাদা অসীয়ত করেছেন, যে পর্যন্ত এ পত্র তোমাদের কাছে সংরক্ষিত থাকবে, তাবত তোমাদের রাজত্ব অবশিষ্ট থাকবে। কাজেই নিজেদের রাজত্বের খাতিরেই আমরা এ পত্রকে সীমাহীন হিফাযত, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি এবং খ্রিস্টানদের নিকট থেকে গোপন রাখি।[১]

ফায়েদা ও উদাহরণ

১. পত্রের শুরু আল্লাহ্ তা'আলার নাম দিয়ে হওয়া উচিত, যেমন হযরত সুলায়মান (আ) সাবার রাণীর নামে যখন পত্র লিখেছিলেন, তখন بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ দ্বারা এর সূচনা করেছিলেন।

২. পত্র প্রেরক নিজের নাম প্রথমে লিখবেন এবং প্রাপকের নাম পরে, যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে নিজের নাম লিখেন এবং পরে রোম সম্রাটের নাম। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এরও নিয়ম এটাই ছিল যে, পত্র লিখতে হলে প্রথমে নিজের নাম লিখতেন। (যেমন ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, পৃ. ৮৬)।

তবে এটা জরুরী ও আবশ্যিক নয়; রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী এবং হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে কোন এক জায়গায় প্রেরণ করেন। তারা পৌঁছে উভয়ই রাসূলুল্লাহ (সা) সমীপে পত্র লিখেন। হযরত আলী (রা) তো নবী (সা)-এর পবিত্র নাম প্রথমে লিখে পরে নিজের নাম লিখেন, আর হযরত খালিদ (রা) প্রথমে নিজের নাম লিখেন। এতে জানা গেল যে, উভয় কাজই বৈধ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) যখন হযরত মুআবিয়া (রা) এবং আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নামে পত্র লিখতেন, তখন প্রথমে হযরত মুআবিয়া এবং আবদুল মালিকের নাম লিখতেন। অনুরূপভাবে হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রা) যখন হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নামে পত্র লিখতেন, তখন তিনিও হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নাম প্রথমে লিখতেন।[২]

১. যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪২।

২ ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ১৬৮।

৩. তিনি নিজের নামের সাথে অতিরিক্ত 'আবদুল্লাহ' শব্দ যোগ করতেন, এতে হযরত ঈসা (আ)-এর ইলাহিত্ব সম্পর্কে খ্রিস্টানদের অবৈধ বিশ্বাস বাতিল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত থাকত যে, (আল্লাহ্ মাফ করুন) ঈসা (আ) আল্লাহ্ ছিলেন না; বরং আল্লাহর বান্দা ও তাঁর সম্মানিত রাসূল ছিলেন, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। অধিকন্তু এদিকেও ইঙ্গিত ছিল যে, যত পয়গাম্বর এসেছেন, সবাই এ ঘোষণা করেছেন যে, আমরা আল্লাহর বান্দা, (আল্লাহ মাফ করুন) খোদা নই।

৪. الى هرقل عظيم الروم এখানে الى هرقل এর পরে عظيم الروم শব্দ বাড়ানোতে এ ইঙ্গিত ছিল যে, যখন কাফিরদের সাথে পত্রালাপ বা প্রতিনিধি প্রেরণ করে কথা বলা হবে, তখন যেন তার পদমর্যাদা অনুসারে তাকে সম্বোধন করা হয়। (ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারী)।

৫. سلام على من اتّبع الهدى (সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম) অর্থাৎ না তো না-ই, এ ঘটনা হযরত মূসা (আ)-এর বর্ণনায় উল্লেখিত আছে, উদ্দেশ্য এদিকে ইঙ্গিত করা যে, কাফিরকে কোন সময়ই سلام عليك লিখা যাবে না; বরং سلام على من اتّبع الهدى লিখা উচিত যে, তোমাদের প্রতি এ শর্তে সালাম যে, তোমরা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করবে। এ জন্যে পবিত্র কুরআনে এর পরে উল্লিখিত হয়েছে : وَاَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (আর শাস্তি তাদের জন্য, যারা মিথ্যা আরোপ করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে)। আর হাদীসে নববী (সা)-এ سلام على من اتّبع الهدى-এর পর যে فَاِنْ تَوَلَّيْتَ ... ... বাক্য এসেছে, তা আল্লাহর বাণী وَاَنَّ الْعَذَابَ عَلٰى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -এরই স্থলাভিষিক্ত।

৬. أسلم تسلم ٠ يؤتك الله أجرك مرّتين (ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ বিনিময় দান করবেন)। এক বিনিময় পূর্ববর্তী নবীর উপর ঈমান আনার দরুন। অপর বিনিময় শেষনবী (সা)-এর উপর ঈমান আনার কারণে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : اُوْلٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ (ওরা তো তারাই, যাদেরকে দু'বার বিনিময় প্রদান করা হবে)।

৭. فان توليت فان عليك اثم الاريسيين وَلَيَحْمِلُنَّ (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে তোমার প্রজাকুলের গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে)। কারণ, যে ব্যক্তি কারো গুমরাহ হওয়া কিংবা হিদায়াত থেকে বিরত থাকার নিমিত্তে পরিণত হয়, ওদের গুনাহও এ ব্যক্তির উপর বর্তাবে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন : اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالاً مَّعَ اَثْقَالِهِمْ "ওরা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা।" (সূরা আনকাবূত : ১৩)

৮. হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রা)-কে পত্রসহ একাকী প্রেরণ করা এর প্রমাণ যে, পত্রও প্রামাণ্য এবং গ্রহণযোগ্য; অধিকন্তু তা 'খবরে ওয়াহিদে'র পর্যায়ে পড়ে। কাজেই 'খবরে ওয়াহিদ' যদি গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে কেবল হযরত দাহিয়া কালবী (রা)-কে প্রেরণে কি লাভ। (যেমন ইমাম নববী কৃত শারহে বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে)।

৯. অধিকন্তু এর দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মিথ্যে বলা কিংবা ভ্রান্তি সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত না পাওয়া যায়। এখানে হযরত দাহিয়া (রা) রোম সম্রাটের জন্য প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

১০. হিরাক্লিয়াস খুব ভাল করেই জানতেন যে, ইনিই সেই নবী যাঁর সম্বন্ধে হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন নি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জানা-চেনার নাম ঈমান নয়; বরং মেনে নেয়া এবং স্বীকার করার নাম ঈমান। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি তাঁকে নবী বলে জানে কিন্তু না মানে, তবে সে ব্যক্তি কখনই মুসলমান নয়। এ কারণে নির্ভরযোগ্য আলিমগণের বক্তব্য হল, বিশুদ্ধ বর্ণনা এটাই যে. রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলাম গ্রহণ করেন নি। মুসনাদে আহমদ ইবন হাম্বলে আছে, হিরাক্লিয়াস তাবূক থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এক পত্র লিখেন, যাতে লিখেছিলেন, আমি মুসলমান। রাসূল (সা) বলেন, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এখন পর্যন্ত সে নিজ খ্রিস্টধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে।

২. কিসরা, ইরান সম্রাট খসরু পারভেযের নামে পত্র

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - من محمّد رسول اللّه الى كسرى عظيم فارس ، سلام على من اتّبع الهدى وأمن باللّه ورسوله وأشهد ان لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له وان محمّدا عبده ورسوله ، أدعوك بدعاية اللّه عز وجل فانّي انا رسول اللّه الى النّاس كلهم لأنذر من كان حيّا ويحقّ القول على الكافرين ، أسلم تسلم ، فان أبيت فعليك اثم المجوس .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার প্রতি, সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। আপনি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনুন এবং সাক্ষ্য দিন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আর আমি সমগ্র মানব গোষ্ঠীর কাছে প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। যেন আমি (আল্লাহর অবাধ্যদের পরিণতি সম্পর্কে) সতর্ক করতে পারি এবং কাফিরদের প্রতি

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন : قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اَلَيْكُمْ جَمِيْعًا (বলুন, হে লোক সকল, আমি তোমাদের সকলের প্রতি প্রেরিত রাসূল)।

আল্লাহর দলীল পূর্ণ হয়। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন,[১] শান্তিতে থাকবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে সমস্ত অগ্নিপূজকের পাপের বোঝাও আপনার ওপর বর্তাবে।"

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহমী (রা)-কে এ পত্রসহ পারস্য তথা ইরান সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। কিসরা এ পত্র পেয়েই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠে। সে পত্রটি ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল এবং বলল, এ ব্যক্তি আমাকে এ কথা লিখল (আমার প্রতি ঈমান আনুন), অথচ সে আমার দাস! হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) ফিরে এসে নবী (সা)-এর খিদমতে এ ঘটনা বলেন। (শুনে) তিনি বললেন, কিসরার দেশও টুকরা টুকরা, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেল। অতঃপর কিসরা তার ইয়েমেনের গভর্নর বাযানকে লিখল, শীঘ্র দু'জন শক্তিশালী লোক হিজাযে পাঠিয়ে দাও, তাদের যে লোক আমাকে পত্র লিখেছে, তাকে যেন তারা গ্রেফতার করে আমার সামনে নিয়ে আসে।

ইয়েমেনের গভর্নর বাযান কিসরার আদেশ পালনার্থে তাড়াতাড়ি নবী (সা)-এর নামে একটি পত্রসহ দু'ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। বাযানের পত্রসহ ঐ দু'ব্যক্তি যখন নবী (সা) দরবারে উপস্থিত হলো, তারা তাঁর আল্লাহ প্রদত্ত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল; তবুও সে অবস্থায়ই তারা বাযান প্রদত্ত পত্র হযরতের খিদমতে পেশ করল। পত্রের বক্তব্য শুনে আল্লাহর রাসূল মৃদু হাসলেন, এবং আগন্তুকদ্বয়কে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বললেন, আগামীকাল এসো। পরদিন ঐ দু'ব্যক্তি নবী (সা)-এর দরবারে এলে তিনি বললেন, গতরাতের অমুক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা কিসরার উপর তার পুত্র শাহরিয়ারের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং পুত্র শাহরিয়ার তার পিতা কিসরাকে হত্যা করেছে। রাতটি ছিল মঙ্গলবার রাত। সপ্তম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের মাত্র দশ রাত অতিক্রান্ত হয়েছিল। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং (পারস্য সম্রাটের ইয়েমেনস্থ গভর্নর) বাযানকে এ সমস্ত অবস্থা গিয়ে খুলে বলো। তিনি আরো বললেন, আর বাযানকে এ কথাও বলে দিও যে, আমার দীন এবং আমার সালতানাত-খিলাফতও ততদূর পৌঁছবে, কিসরার সালতানাত যতদূর পৌঁছেছে। বাযান সব কথা শুনে বললেন, এ তো বাদশাহ সুলভ কথাবার্তা নয়, যদি এসব কথা সত্যিই হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি নবী। সুতরাং বাযান তাঁর কথা যাচাই করে দেখলেন, সত্য প্রমাণিত। তখন তিনি নিজ পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সহ একযোগে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ইসলাম গ্রহণের খবর নবী (সা)-কে অবহিত করলেন।[২]

---

১. এ পত্রে তিনি يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ লিখেন নি, এ জন্যে যে, কিসরা ছিলেন অগ্নি উপাসক, কোন আসমানী কিতাব কিংবা প্রকৃত পয়গাম্বরের নামেমাত্র অনুসারীও ছিলেন না। এ জন্যে তিনি দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী ছিলেন না। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪১।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ.২৬৮-২৭২; যারকানী, ৩খ. ৩৪২।

৩. আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى النجاشي ملك الحبشه ، سلام عليك اما بعد فاني احمد الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ، واشهد ان عيسى بن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة وحملت بعيسى فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته ، وان تَتبعني وتؤمن بالذي جائني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله تعالى ، فقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি প্রশংসা করছি সেই মহান আল্লাহর, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই প্রকৃত বাদশাহ, সকল দোষত্রুটিমুক্ত। তিনিই নিরাপত্তা দানকারী, সবার প্রতি যত্নশীল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই ঈসা ইবন মরিয়ম (আ) আল্লাহর বিশেষ রূহ এবং তাঁর কালেমা, যা তিনি পবিত্র মরিয়ম (আ)-এর প্রতি নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তাতে মরিয়ম (আ) গর্ভবতী হন এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপন খাস রূহ এবং ফুৎকারের মাধ্যমে ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন, যেমন সৃষ্টি করেছেন আদম (আ)-কে আপন কুদরতী হাত দিয়ে। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি, যিনি একক, অদ্বিতীয়, শরীকহীন। আমি আহ্বান জানাচ্ছি তাঁর আনুগত্য ও আদেশ পালন করার জন্য। আহ্বান জানাচ্ছি ঐ সত্যের দিকে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন মজীদ) আহ্বান জানাচ্ছি তার প্রতি ঈমান আনার জন্য। নিশ্চয়ই আমি তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে এবং আপনার সমস্ত বাহিনীকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর পথে আহ্বান করছি। আমি (আমার দায়িত্ব) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিলাম এবং নসীহত করলাম। কাজেই আমার নসীহত কবূল করুন। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম।"

হযরত আমর ইবন উমায়্যা দামিরী (রা)-কে পত্রসহ রওয়ানা করিয়ে দেন। আমর ইবন উমায়্যা (রা) তাঁর পত্র পৌঁছিয়ে দেন এবং বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আয় আসহাম,[১] আপনার সাথে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আশা করি আপনি মনোযোগ সহকারে তা শুনবেন। আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভরসা ও সুধারণা রয়েছে। আমরা যখনই আপনার নিকট থেকে কোন কল্যাণ ও ভাল কিছু আশা করেছি, আপনার মাধ্যমে সে কল্যাণ অর্জিত হয়েছে। আপনার নিরাপত্তার ছায়ায় আমরা কখনো ভয়-ভীতির সম্মুখীন হইনি। ইঞ্জিল যার প্রমাণ, যা আপনার মুখে

১. এটা ছিল ঐ নাজ্জাশীর নাম।

জেনেছি, তা সম্ভবত আপনার ও আমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী, যার সাক্ষ্য নাকচ করা যায় না। আর তা এমন এক কাযী ও বিচারক, যে নিজ ফয়সালার ব্যাপারে কাউকে তোয়াক্কা করে না। আপনি যদি এ দাওয়াত কবূল না করেন, তা হলে ঐ উম্মী নবীর কাছে এমন দোষী প্রমাণিত হবেন যেমন কোন ইয়াহূদী হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে দোষী হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দূত ও সংবাদ বাহক অন্যদের কাছেও প্রেরণ করেছেন, কিন্তু অন্যদের অপেক্ষা আপনার প্রতি তাঁর আশা অধিক।

নাজ্জাশীর জবাব

নাজ্জাশী বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং শপথ করে বলছি যে, তিনি সেই উম্মী নবী, আহলে কিতাব যাঁর অপেক্ষা করছিল। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ) গর্দভ আরোহীর নিকট হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আ) উষ্ট্রারোহীর কাছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর নবূয়াত ও রিসালাত সম্পর্কে আমার এতই দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, চাক্ষুস দেখার পরও তাতে কোন বৃদ্ধি ঘটবে না। (যেমন কোন বুযর্গের প্রবচন, (আরবী) 'যদি পর্দা উঠিয়ে দেয়া হয়, তবুও আমার বিশ্বাসে বৃদ্ধি ঘটবে না')।

হযরতের পত্রটি সম্রাট নাজ্জাশী তাঁর চোখের সাথে লাগান, সিংহাসন ছেড়ে নিচে বসে পড়েন, ইসলাম গ্রহণ করেন, হকের সাক্ষ্য দেন ও তাঁর পত্রের জবাব লিখেন।

নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে নবী (সা)-এর পত্রের জবাব

بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم – الى محمّد رسول اللّٰه من النجاشى الاصحم بن ابجز سلام عليك يا نبى اللّٰه ورحمة اللّٰه وبركاته – احمد اللّٰه الذى لا اله الا هو الذى هدانى للاسلام اما بعد فقد بلغنى كتابك يا رسول اللّٰه فما ذكرت من امر عيس فورب السماء والارض ان عيسى ما يزيد على ما ذكرت ثغوفا انه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقد قرينا ابن عمك واصحابه فاشهد انك رسول اللّٰه صادق مصدقا وقه بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت على يديه للّٰه رب العالمين – وقد بعثت اليك بانبى ارها ابن الاسهم بن الابجز فانى لا املك الا نفسى وان شت ان ايتك فعلت يا رسول فانى اشهد ان ماتقول حق السلام عليك يا رسول اللّٰه ٠

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি আসহাম ইবন আবজিয-এর পক্ষ থেকে। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ তা'আলার রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমি এক আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ ও হিদায়াত লাভের তাওফীক দান করেছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পত্র পেয়েছি। ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন, আসমান ও যমীনের

স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শপথ, ঈসা (আ) তদপেক্ষা বিন্দুমাত্র বেশি কিছু ছিলেন না, বরং তাঁর মর্যাদা ততটুকুই, যা আপনি উল্লেখ করেছেন। যে দীনসহ আপনি আমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, আমরা তা চিনে নিয়েছি এবং আমি আপনার চাচাত ভাই এবং তাঁর বন্ধু মেহমানদের সামনে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার সত্য এবং সত্যায়নকৃত রাসূল। আমি আপনার পক্ষে আপনার চাচাত ভাইয়ের হাতে বায়'আত হয়েছি এবং তার হাতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম। আমার পুত্র আরহাম ইবন আসহামকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করলাম। আমি কেবল আমার সত্তার অধিকারী, যদি ইঙ্গিত দেন তো আমি নিজে আপনার খিদমতে উপস্থিত হব। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি যা কিছু বলেন, তা সম্পূর্ণ সত্য। আপনার প্রতি সালাম হে আল্লাহর রাসূল।"

নাজ্জাশী তার পুত্রের সাথে ষাটজন হাবশীকে একটি নৌকায় করে তাঁর খিদমতে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নৌকাটি পথিমধ্যে ডুবে যায়।[১]

ইনি ছিলেন সেই নাজ্জাশী, যার আমলে মুসলমানগণ পঞ্চম হিজরীতে হিজরত করে গিয়েছিলেন। তার নাম ছিল আসহামা, যিনি হযরত জাফর (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবম হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর দিনেই রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন এবং সাহাবিগণকে সাথে নিয়ে ঈদগাহ ময়দানে গিয়ে তার গায়েবানা জানাযা পড়েন।

তার পরে যে দ্বিতীয় নাজ্জাশী তার স্থলাভিষিক্ত হলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তার নামেও ইসলামের দাওয়াত দিয়ে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যা ইমাম বায়হাকী ইবন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। পত্রটি নিম্নরূপ :

من النبى محمد ﷺ الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبه ولا ولد واو ان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاية الله فانى انا رسوله فاسلم تسلم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولايتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك ·

"নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নাজ্জাশীর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, আর সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। না তাঁর স্ত্রী আছে আর না তিনি কারো জনক। আরো সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা

১. যাদুল মাআদ, ৩খ. পৃ. ৬০; ইবনুল কায়্যিম কৃত হাদিয়াতুল হায়ারী, পৃ. ৪২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৪৩-৪৫।

ও তাঁর রাসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ওহে কিতাবধারিগণ, এসো এমন শাশ্বত কথার প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের কাছে অভিন্ন (তা হলো,) এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা মুসলমান (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)। হে নাজ্জাশী! যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে আপনার কওমের সমস্ত খ্রিস্টানের পাপের দায়ভার আপনার উপর বর্তাবে।"

আবিসিনিয়ার সম্রাট এ নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা প্রমাণিত হয়নি এবং তার প্রকৃত নামও জানা যায়নি। হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ নাজ্জাশী পূর্ববর্তী নাজ্জাশী থেকে পৃথক, যিনি হযরত জাফর (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাক্য বিভ্রান্তির দরুন কোন কোন লোক ভ্রমবশে উভয়কে একই ব্যক্তি মনে করেন। সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে সরাসরি বুঝা যায় যে, নাজ্জাশী ছিলেন দু'জন। এর দ্বিতীয়জনের পত্রে নাজ্জাশীর সাথে যে আসহাম যুক্ত করা হয়েছে, তা বর্ণনাকারীর ধারণা; আসহাম ছিল প্রথম নাজ্জাশীর নাম। আর বর্ণনাকারী উভয়কে একই ব্যক্তি মনে করে এ পত্রেও আসহাম শব্দটি ভুলক্রমে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। (বিস্তারিত যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৬-তে দেখুন)।

৪. মকূকাস, মিসর সম্রাট ইসকান্দারিয়ার নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم من محمّد بن عبد الله الى المقوقس عظيم القبط ، سلام على من اتّبع الهدى . امّا بعد ، فانّى أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم واسلم يؤتك الله اجرك مرّتين . فان توليت فانّما عليك اثم القبط ويا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الاّ الله ولا نُشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضًا اربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوًا بأنا مسلمون .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে কিবতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি মকূকাসের প্রতি, সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতঃপর, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তা হলে সমস্ত কিবতীর ইসলাম কবূল না করার পাপের বোঝাও আপনা উপর বর্তাবে। ওহে কিতাবধারীগণ, এসো এমন স্বীকৃত কথার প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের মাঝে একইরূপ। (তা হলো,) এক আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না, আল্লাহ ছাড়া পরস্পর পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। তারপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও,

তা হলে সাক্ষ্য থেকো যে, আমরা মুসলমান (অর্থাৎ আমরা আল্লাহর আদেশের অনুগত)।"

পত্রে সিলমোহর লাগিয়ে হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা)-কে দিয়ে বললেন, মিসর সম্রাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। হাতিব (রা) পত্র নিয়ে রওয়ানা হলেন। প্রথমে মিসর পৌঁছে জানতে পেলেন সম্রাট ইসকান্দারিয়াতে আছেন। ইসকান্দারিয়ায় পৌঁছে দেখেন সম্রাট সমুদ্রোপরি এক মঞ্চে বসে আছেন। হাতিব (রা) নীচে থেকে ইঙ্গিতে পত্রের কথা জানালেন। সম্রাট তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। হাতিব (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সম্রাটের হাতে পত্র দিলেন। সম্রাট অত্যন্ত আদব ও সম্মানের সাথে তাঁর পত্র গ্রহণ করলেন এবং পাঠ করলেন। (যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪০)।

হযরত হাতিব (রা) বর্ণনা করেন, এরপর আমাকে মেহমান হিসেবে একটি গৃহে রাখলেন। একদিন সকল আমীর-উমারা ও গণ্যমাণ্য ব্যক্তিকে একত্র করে আমাকে ডাকলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমার সাথে কিছু কথা বলতে চাই, বুঝে-শুনে জবাব দেবে। হাতিব (রা) বললেন, উত্তম। তিনি বললেন, যে ব্যক্তির পত্র নিয়ে তুমি এসেছ, তিনি কি নবী নন ? হাতিব (রা) বললেন, কেন নয়, তিনি তো আল্লাহর রাসূল। মকূকাস বললেন, যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবীই হবেন, তাহলে যখন তার সম্প্রদায় তাকে মক্কা থেকে বের করে দিল তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ-দু'আ কেন করেন নি, যাতে তারা ধ্বংস হয়ে যেত ?

হযরত হাতিব (রা) বললেন, আপনি কি সাক্ষ্য দেন না যে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর রাসূল ছিলেন ? মকূকাস বললেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর রাসূল ছিলেন। হাতিব (রা) বললেন, যদি তিনি আল্লাহর রাসূলই ছিলেন তাহলে যখন শত্রুরা তাঁকে শূলে চড়ানোর ইচ্ছা করলো, তখন হযরত ঈসা (আ) কেন তাদেরকে বদ-দু'আ করেননি, যাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন ? এমনকি আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নেন ? মকূকাস বললেন, নিঃসন্দেহে তুমি বিজ্ঞ এবং একজন বিজ্ঞের কাছে এসেছ।[১]

মকূকাসের দরবারে হযরত হাতিব (রা)-এর ভাষণ

মকূকাস হযরত হাতিবের এ বিজ্ঞোচিত জবাব শুনে চুপ হয়ে যান। এরপর হযরত হাতিব (রা) সম্রাটকে উদ্দেশ করে এই ভাষণ দেন :

আপনার জানা আছে যে, এই মিসরেই এক ব্যক্তি অতীত হয়েছে, যে এ দাবি করতো যে, انا ربكم الاعلى আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা পাকড়াও করে শাস্তি দিয়েছেন, ধ্বংস ও বরবাদ করেছেন। আপনাদের উচিত তার

১. খাসাইসুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৮।

থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। তার অনুরূপ এমন যেন না হয় যে, একই কারণে আপনারাও নিজেদেরকে একই পরিণতির উপযোগী করে বসেন। একটি দীন আছে, যা আপনাদের দীন থেকে অনেক উন্নত। সে দীন হলো ইসলাম, যে সম্পর্কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, "আমি সমস্ত দীনের উপর একে বিজয় দান করব।" সমস্ত দীন এ দীনের সামনে নিপ্রভ হয়ে পড়বে। এ নবী (সা) প্রেরিত হয়ে সকল মানুষকে এ দীনের দাওয়াত দেন। এর বিরোধিতায় কুরায়শ সবচে' কঠোর। ইয়াহূদী সবচে' বেশি শত্রু এবং খ্রিস্টান সবচে' নিকটবর্তী প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর কসম, হযরত মূসা (আ) কর্তৃক হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ দেয়ার তুলনা এরূপ, যেমন হযরত ঈসা (আ) কর্তৃক মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদ দেয়া। দু'য়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর আমাদের দ্বারা আপনাদেরকে কুরআনের প্রতি আহ্বান করা এমন, যেমন আপনারা তাওরাতধারীদেরকে ইনজীলের প্রতি আহ্বান করেন। যে সম্প্রদায় কোন নবীর যুগ পায়, সে সম্প্রদায় ঐ নবীর উম্মত। তাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হয়ে পড়ে ঐ নবীর অনুসরণ করা। হে সম্রাট, আপনিও তাদের মধ্যে, যারা এ নবীর সময় পেয়েছে। আমি আপনাকে ঈসা (আ)-এর দীন থেকে বিরত রাখতে চাই না, বরং তাঁর অনুসরণ করুন।[১]

সম্রাটের জবাব

মকূকাস বললেন, আমি এ নবী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেছি। এতে এই পেলাম যে, তিনি পসন্দনীয় বিষয়ে আদেশ করেন, আর অপসন্দনীয় বিষয় থেকে নিষেধ করেন। ঘৃণার যোগ্য বিষয়ে আদেশ করেন না, আর আগ্রহের বস্তু থেকে নিষেধ করেন না। তিনি যাদুকর ও পথভ্রষ্ট নন। ভবিষ্যদ্বক্তা ও মিথ্যাবাদী নন। তাঁর মধ্যে নবুয়াতের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি, যেমন অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া; এ ব্যাপারে আমি পুনরায় চিন্তা করব। আর-তিনি নবী (সা) প্রদত্ত পত্র হাতির দাঁতদ্বারা নির্মিত কৌটায় ভরে হিফাযতে রাখার জন্য খাজাঞ্চীকে দিলেন। পরে এক লিখক ডেকে আরবী ভাষায় এ পত্রের জবাব লিখতে নির্দেশ দিলেন। জবাবটি ছিল এরূপ :

بسم الله الرّحمن الرّحيم – من محمّد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط ، سلام عليك – اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ماذكرت فيه وما تدعو اليه وقد علمت ان نبيا قد بقى وكنت اظن ان يخرج من الشام وقد اكرمت رسولك وبعثت

১. কেননা হযরত মসীহ (আ) নিজেই শেষনবী (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِىْ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدُ (আমি সুসংবাদদাতা এক রাসূলের, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে আহমদ)। এবং তাঁর আনুগত্য করার আদেশ দেন। কাজেই তাঁর আনুগত্য করা মূলত হযরত মসীহ (আ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা।

اليك بجاريتين لهما من القبط مكان عظيم وكسرة واهديت اليك بعلة لتركبها والسلام .

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহর প্রতি কিবতের সর্দার মকূকাসের পত্র। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর বক্তব্য এই যে, আমি আপনার পত্র পাঠ করেছি এবং তা বুঝেছি যা আপনি উল্লেখ করেছেন এবং যার প্রতি আহ্বান করেছেন। আমার বিশ্বাস ছিল একজন নবীর আগমন অবশিষ্ট রয়েছে। তবে আমার ধারণা ছিল, তিনি সিরিয়ায় আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার প্রেরিত দূতকে সম্মান করেছি এবং তার মাধ্যমে আপনার জন্য কিবতের সম্ভ্রান্ত বংশীয়া দু'জন দাসী এবং আপনার বাহন হিসেবে একটি খচ্চর প্রেরণ করছি। আপনাকে সালাম।"

এক দাসীর নাম ছিল মারিয়া কিবতীয়া (রা), যিনি তাঁর পরিবারভুক্ত হয়ে যান, তারই গর্ভে নবীপুত্র হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। অপর দাসীর নাম ছিল শিরীন, যাকে তিনি হযরত হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে দিয়ে দেন। আর খচ্চরটির নাম ছিল দুলদুল।

মকূকাস নবী (সা)-এর দূতকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন, তাঁর পত্রকে খুবই সম্মান করেন এবং শপথ করে বলেন, নিঃসন্দেহে ইনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্ববর্তী নবী (আ)-গণ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি ঈমান আনয়ন করেন নি, খ্রিস্টধর্মের উপর অবিচল থাকেন। হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতাআ (রা) নবী সকাশে পৌঁছে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করেন। তখন তিনি ইরশাদ করেন, রাজত্ব ও বাদশাহীর কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি; তবে তার রাজত্ব ও বাদশাহী স্থায়ী হওয়ার নয়। সুতরাং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে মুসলমানগণ মিসর জয় করেন। (হাফিয ইবন তাইমিয়াকৃত আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ৯৯-১০০;যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৪৮; রাউযুল উনুফ, ২খ. পৃ. ৩৫৫; হিদায়াতুল হিয়ারী, পৃ. ৩৩)।

ইসলামপূর্ব অবস্থায় মকূকাসের সাথে মুগীরার সাক্ষাত

এর পূর্বে মকূকাস হযরত মুগীরা ইবন শুবা (রা) থেকে নবী (সা) সম্পর্কে অবহিত হন। হযরত মুগীরা (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বনী মালিকের কতিপয় ব্যক্তিসহ মকূকাসের নিকট গিয়েছিলেন। সে সময় তাদের কাছে মকূকাস রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মুগীরা (রা) বলেন, তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্ম নিয়ে এসেছেন, যা আমাদের পিতা-পিতামহের ধর্মের বিরোধী এবং সম্রাটের (মকূকাসের) ধর্মেরও বিরোধী।

মকূকাস : আচ্ছা, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে কী আচরণ করেছে?

মুগীরা : অধিকাংশ যুবক তাঁর অনুসরণ করেছে এবং বৃদ্ধরা বিরোধিতা করেছে। আর বিরোধীদের সাথে যুদ্ধের ঘটনাও ঘটেছে। কখনো তিনি জয়ী হয়েছেন এবং কখনো পরাজিত।

মকৃকাস : তিনি কি বিষয়ের প্রতি তোমাদেরকে আহ্বান করেন ?

মুগীরা : সর্বশক্তিমান এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে, আমাদের পিতা-পিতামহ যে সব মূর্তির পূজা করত, সেগুলো পরিত্যাগ করতে। তিনি মানুষকে নামায ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেন।

মকৃকাস : নামাযের জন্য কি কোন সময় এবং যাকাতের জন্য কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে কি ?

মুগীরা : দিনরাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেন। বিশ মিসকাল স্বর্ণে অর্ধ মিসকাল অর্থাৎ সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেন।

মকৃকাস : যাকাত নিয়ে তিনি কি করেন ?

মুগীরা : ফকীর-মিসকীনের মধ্যে বন্টন করেন। এছাড়া তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে এবং প্রতিশ্রুতি পালনের নির্দেশ দেন। ব্যভিচার, সুদ ও শারাবকে হারাম বলেন। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে যবেহ্‌কৃত জন্তু আহার করেন না।

মকৃকাস : তিনি নিশ্চয়ই প্রেরিত নবী, সারা বিশ্বের জন্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছেন; হযরত ঈসা (আ)-ও এ সব কাজের আদেশ দিতেন এবং তাঁর পূর্বে সমস্ত নবী (আ)-গণও এ সব কাজেরই শিক্ষা দিতেন। পরিশেষে তাঁরই জয় হবে, এমনকি কেউ তাঁর প্রতিবন্ধক থাকবে না, ভূভাগ ও জলভাগের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর দীন পৌঁছে যাবে।

মুগীরা : সারা দুনিয়া যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনে, তবুও আমরা তাঁর উপর ঈমান আনব না।

মকৃকাস : তোমরা নির্বোধ ও বেআক্কেল, আচ্ছা, বল দেখি তাঁর বংশ মর্যাদা কেমন?

মুগীরা : সবার চেয়ে উত্তম।

মকৃকাস : হযরত আম্বিয়া (আ) সব সময় সর্বোত্তম এবং সম্ভ্রান্ত বংশের হয়ে থাকেন। আচ্ছা, তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কিছু বল।

মুগীরা : তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সারা আরব তাঁকে 'আমীন' বলে ডাকে।

মকৃকাস : তোমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা কর, এটা কি করে সম্ভব যে, তিনি বান্দাদেরকে সত্য বলেন অথচ আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলেন; এবারে বল দেখি কোন্ ধরনের লোক তাঁর অনুসরণ করে ?

মুগীরা : যুবক শ্রেণী।

মকৃকাস : তাঁর পূর্বে যে সমস্ত নবী (আ) অতীত হয়েছেন, তাঁদের অনুসরণকারীদের মধ্যে অধিকাংশ যুবকই[১] ছিলেন। এর পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াসরিবের ইয়াহূদীরা তাঁর সাথে কিরূপ আচরণ করেছে, তারা তো তাওরাতের অনুসারী ?

মুগীরা : বিরোধিতা করেছে, তিনি তাদের মধ্যে কাউকে হত্যা করেছেন, কাউকে বন্দী করেছেন আর কাউকে দেশছাড়া করেছেন।

মকৃকাস : ইয়াহূদীরা বিবাদকারী সম্প্রদায়, তারা তাঁর সাথে বিবাদ করেছে; অন্যথায় তারা আমাদের মতই তাঁকে ভালভাবে চিনেছে।

মুগীরা বলল, এ কথা শোনার পর আমরা প্রাসাদের বাইরে এলাম। মনে মনে বললাম, আজমের বাদশাহ পর্যন্ত তাঁকে সত্য বলেন, অথচ তিনি তাঁর থেকে অনেক দূরে। আর আমরা তো তাঁর আত্মীয় এবং প্রতিবেশী, আমরা এখন পর্যন্ত তাঁর দীনে প্রবেশ করলাম না অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের ঘরে এসে আহ্বান জানিয়েছেন। এ কথা আমার মনে প্রভাব ফেলল এবং আমি ইসকান্দারিয়াতেই রয়ে গেলাম। সেখানে এমন কোন গীর্জা ছিল না, যেখানে আমি যাইনি এবং যেখানকার পাদ্রীদেরকে শেষনবীর মর্যাদা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। এমনকি আমি তাদের 'উসকুফে আযম' (বড় পাদ্রী)-র সাথেও সাক্ষাত করেছি, যিনি বড়ই ইবাদতকারী ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। মানুষ রোগীদেরকে দু'আর জন্য বড় পাদ্রীর কাছে নিয়ে আসত। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা কোন নবীর আগমন কি বাকী আছে ? তিনি জবাব দিলেন :

---

১. কেননা বৃদ্ধদের চরিত্র ও অভ্যেস মযবূত ও দৃঢ় হয়ে যায়। তাদের জন্য নিজের অভ্যাস ও চর্চা ত্যাগ করা বড়ই কঠিন হয়। ان الغصون اذا الانيتها اعتدلك ولن يلين اذ الانيته خشب গাছের ডালপালা যতক্ষণ নরম থাকে, ততক্ষণ তাকে সোজা করা যায়, কিন্তু কাঠ (লাকড়ি) হয়ে যাওয়ার পর তাকে সোজা করা অসম্ভব। এটাই কারণ যে, মক্কার বেশির ভাগ যুবক নবূয়াতের প্রারম্ভে ইসলাম গ্রহণ করেন আর কুরায়শের নেতা ও সর্দারেরা মক্কা বিজয়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) একবার আগমন করেন আর নবযুবাদের একটি দল উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁর চারপাশে বসে পড়ে। সে পথে অতিক্রমকারী জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে নব যুবকদের একত্র হওয়া দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনার চারপাশে এ নওজোয়ানদের সমাবেশ কিরূপ ? তিনি বললেন : هل الخير الا فى الشباب (যুবক ছাড়া আর কার মধ্যে কল্যাণ আছে), তারা উপদেশ গ্রহণ করে। একটু পর বললেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনেছ : قالوا سمعنا فانى يذكر هم يقال له ابراهيم انه فتية امنوا بربهم لفتاه اتنا غدا نا "আর আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে কখনই নবী করে প্রেরণ করেন নি, যতক্ষণ না তিনি যুবক হয়েছেন," (অর্থাৎ চল্লিশ বছরে উপনীত না হয়েছেন); যেমন আল্লাহর বাণী : اذا بلغ اشده اربعين سنة (যখন তার বয়স পূর্ণ হলো এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হলো)। যেমনটি ইমাম শা'রানীকৃত তানবীহুল মুফতারীন গ্রন্থে (পৃ. ৩০) রয়েছে।

نعم هو اخر الانبياء ليس بينه وبين عيسى بن مريم احد وهو نبى مرسل وقد امرنا عيسى باتبعه وهو النبى الامى العربى اسمه احمد ليس بالطويل ولابعض ولا بالادم يعض شعره ويليس ما غلظ من الثياب ويجتزئ بما لقى من العلعام سفد على عاتقه ولايبالى بمن لاقى يباشر القتال بنفسه ومعه اصحابه يغدونه بانفسهم هم له اشد حبا من اولادهم يخرج من ارض حرم ويأتى الى حرم يهاجر الى ارض سباخ ونخل بدين ابراهيم عليه السلام ·

"হ্যাঁ, সর্বশেষ নবী, তাঁর এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মাঝে আর কোন নবী নেই, তিনি প্রেরিত নবী। হযরত ঈসা (আ) আমাদেরকে তাঁর অনুসরণের আদেশ দিয়েছেন। তিনিই উম্মী নবী, আরাবী, নাম তাঁর আহমদ; তিনি অতি দীর্ঘও নন, বেঁটেও নন, বরং মধ্যম আকৃতির। চোখে তাঁর লালচে আভা, না পূর্ণ সাদা আর না পূরো হলদেটে। তাঁর কেশ হবে অধিক, তিনি মোটা কাপড় পরিধান করবেন। যতটুকু খাদ্য নসীবে জুটবে, তাতেই সবর ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। তাঁর কাঁধে তরবারি থাকবে। কারো মুকাবিলায় পরোয়া করবেন না। তিনি নিজেই যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশগ্রহণ করবেন। সাহাবিগণ তাঁর সাথে থাকবেন, যাদের জান-প্রাণ থাকবে তাঁর প্রতি নিবেদিত। নিজেদের সন্তান অপেক্ষা তাঁকে ভালবাসবেন। ঐ নবী মক্কার হেরেমে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং খেজুর বাগান শোভিত অপর হেরেমে হিজরত করবেন। তিনি হবেন ইবরাহীম (আ)-এর দীনের অনুসারী।"

মুগীরা (রা) বললেন, আমি তাকে বললাম, তাঁর আরো কিছু গুণ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তিনি স্বাধীন বান্দা হবেন, নিজের চারপাশ এবং অঙ্গসমূহ ধৌত করবেন অর্থাৎ উযূ করবেন। তাঁর পূর্বে যত নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁরা কেবল আপন সপ্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, আর ইনি সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেরিত হবেন, সমগ্র যমীন হবে তাঁর জন্য মসজিদ (নামাযের স্থান) ও পবিত্র। যেখানে নামাযের সময় হবে, পানি না পাওয়া অবস্থায় সেখানে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবেন। বনী ইসরাঈলের মত গীর্জামুখী হবেন না যে, গীর্জা ছাড়া কোথাও নামায শুদ্ধ হবে না।

মুগীরা (রা) বলেন, এ সমুদয় কথাই আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম ও মনে রাখলাম। ফিরে এসে হযরতের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে শামিল হলাম।[১]

---

১. ইবন তাইমিয়াকৃত আল-জাওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ১০১-১০৩; খাসাইসুল কুবরা, ২খ. পৃ. ১২।

৫. বাহরায়নের বাদশাহ মুনযির ইবন সাবীর প্রতি পত্র

রাসূল (সা) হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা)-কে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র[১] সহ মুনযির ইবন সাবীর নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলা ইবন হাযরামী (রা) বলেন, আমি যখন নবীজির পত্র নিয়ে মুনযিরের নিকট উপস্থিত হলাম, তখন তাকে বললাম, ওহে মুনযির, পৃথিবীতে তো আপনি খুবই জ্ঞানী ও চালাক ব্যক্তি, আখিরাতে কেন নির্বোধ ও লজ্জিত হবেন ? মজূসিয়ত (অগ্নিপূজা) খারাপ ধর্ম, না এতে আরবের মত মর্যাদা ও মাহাত্ম আছে, আর না আহলে কিতাবের মত জ্ঞান। এ ধর্মাবলম্বীরা ঐ স্ত্রীলোকদের বিবাহ করে, যাদের উল্লেখ করতেই লজ্জা হয়। তারা ঐ সব জিনিস খায়, যা সুস্থ মেজাজের মানুষ ঘৃণা করে। দুনিয়ায় তারা ঐ আগুনের পূজা করে আখিরাতে যা তাদেরকে জ্বালাবে। ওহে মুনযির, আপনি নির্বোধ ও নাদান নন, আপনি খুব চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, যে সত্তা কখনো মিথ্যে বলেন না, তাঁকে সত্যায়ন করতে ও সত্য বলতে আপনার অসুবিধা কি? যে সত্তা কখনো অপচয় করেন নি, তাঁকে আমীন মানতে এবং যে সত্তা কখনো কথার খেলাফ করেননি, তাঁর প্রতি আস্থা পোষণ করতে ও ভরসা রাখতে ইতস্তত ও ভাবনা কেন? তাঁর বরকতময় সত্তা যদি এমনই হয়, আর নিঃসন্দেহে তা এমনই, তবে আপনি বুঝে নিন যে, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী এবং তাঁর রাসূল (সা)। আর তিনি এমনই রাসূল, যে বিষয়ে তিনি আদেশ করেছেন, সে বিষয়ে এমন কোন বুদ্ধিমান ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এমন নেই, যে বলতে পারবে, আহ, যদি তিনি এ বিষয়ে নিষেধ করতেন! আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেছেন, সে বিষয়ে কোন বুদ্ধিমান ও বোধসম্পন্ন ব্যক্তি এমন নেই, যে বলতে পারবে, আহ্, যদি তিনি এ বিষয়ে আদেশ করতেন! অথবা যে বিষয়ে তিনি যে সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন, তার চেয়ে বেশি মাফ করতেন! অথবা যে অপরাধে তিনি যে শাস্তি নির্ধারণ করেছেন, তাতে কিছুটা কম করতেন! বা এ জন্যে যে, হযরতের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ এবং বাণী প্রত্যেক জ্ঞানবান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চূড়ান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষারই অনুরূপ।

মুনযিরের জবাব

মুনযির বললেন, আমি যে ধর্মে আছি, সে ধর্মের উপর চিন্তা করলাম, তখন এটাকে কেবল পার্থিব ধর্ম হিসেবে পেলাম, আখিরাতের জন্য নয়; আর তোমাদের ধর্ম নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলাম, তখন তা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্যই পেলাম। কাজেই আমার এ দীন গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা কি আছে যে, যা কবূল করলে দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুকালীন আরাম উভয়ই অর্জিত হয় ? এ যাবত আমি

১. রিওয়ায়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, তিনি মুনযির ইবন সাবীর নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র লিখেছেন, কিন্তু অনেক তত্ত্ব তালাশ করেও এ পত্রের বাক্যাবলী জানা যায়নি। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫১।

ঐ ব্যক্তির জন্য আশ্চর্য হয়েছি, যে দীন (ইসলাম) কবূল করেছে ; আর এখন আমি ঐ ব্যক্তির জন্য আশ্চর্যবোধ করি, যে এ সত্য ধর্মকে রদ করে দেয়।

মুনযির সাবীর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রেরিত পত্রের জবাব

মুনযির মুসলমান হলেন এবং নবীজির পত্রের এ জবাব[১] লিখলেন :

اما بعد يا رسول اللّه فانى قرأيت كتابك على اهل البحرين فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه وبارضى يهود ومجوس فاحدث الى فى ذلك امرك ٠

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা), আমি আপনার পত্র বাহরায়নবাসীকে শুনিয়েছি। কেউ কেউ ইসলাম পসন্দ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে আর কেউ কেউ তা অপসন্দ করেছে। আমার দেশে ইয়াহূদী ও অগ্নিপূজক বাস করে, তাদের ব্যাপারে আপনার নির্দেশ জানাবেন।"

জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে এ পত্র লিখিয়ে পাঠালেন :

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم - من محمّد بن عبد اللّه الى المنذر بن ساوى ، سلام عليك فانى احمد اليك اللّه لا اله الا هو واشهد ان محمدا رسول اللّه اما بعد فانى اذكرك اللّه عز وجل فانه من ينصح فانها ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم فقد نصلح لى موافق رسلى قد انثوا عليك خيرا وانى قذشفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليك وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نمز لك عن عهد لك ومن افام على يهوديته او مجوسيج فعليه الجزية ٠

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে মুনযির ইবন সাবী-র প্রতি, আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনাকে ঐ আল্লাহ পাকের প্রশংসা পৌঁছাচ্ছি, যিনি ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণ ও কল্যাণ কামনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে নিজের প্রতিই সুধারণা পোষণ ও কল্যাণ কামনা করল। আর যে আমার দূতদের আনুগত্য করল এবং তার কথার অনুসরণ করল, প্রকৃতপক্ষে সে আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করল। আমার দূত যদি আপনার সুনাম ও প্রশংসা করে, তা হলে আমি আপনাদের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আপনাদের সুপারিশ গ্রহণ করব। কাজেই, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের ব্যাপার তাদের উপরই ছেড়ে দিন, যার ভিত্তিতে তারা

১. আল-জওয়াবুস সাহীহ, ১খ. পৃ. ১১৩।

ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর অপরাধীদের আমি ক্ষমা করে দিয়েছি তাদের নিকট থেকে ইসলাম অথবা তাওবা গ্রহণ করুন। যতদিন আপনি সঠিক পথে থাকবেন, আমি আপনাকে ইপনার পদ থেকে বরখাস্ত করব না। আর যারা ইয়াহূদী অথবা মজূসী ধর্মের অনুসারী, তাদের জন্য জিযয়া।"[১]

৬- আম্মানের বাদশাহর নামে পত্র

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم – من محمّد بن عبد اللّه ورسوله الى جيفر عبد ابنى الجلندى ، سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلما تسلما فانى رسول اللّه الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وانكما ان اقررتها بالاسلام وليتكما وان ايتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما وخيلى تحل باحتكم وتظهر بنوتى على ملككما ۰

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে জালান্দীর পুত্র জায়ফার ও আবদ-এর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি আমার সালাম। অতঃপর, আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। এ জন্যে যে, আমি সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রেরিত রাসূল, যেন আমি জীবিতদের, আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারি,[২] আর কাফিরদের প্রতি আল্লাহর প্রমাণ দৃঢ় হয়। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাদের রাজত্ব অব্যাহত থাকবে। অন্যথায় ধরে নিন আপনাদের রাজত্ব অচিরেই হাতছাড়া হতে পারে এবং আমার বাহিনী আপনাদের গৃহের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। আমার দীন আপনাদের সমস্ত দীনের উপর বিজয়ী থাকবে।"[৩]

অষ্টম হিজরীর যিলকদ মাসে মহানবী (সা) হযরত আমর ইবন আস (রা)-কে এ পত্রসহ জালান্দীর পুত্র আবদ এবং জায়ফারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত আমর ইবন আস (রা) বলেন, আমি হযরতের পত্র নিয়ে আম্মানে গিয়ে উপস্থিত হই । প্রথমে আবদ-এর সাথে সাক্ষাত হয়, যিনি ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহনশীল ও সৎকর্মশীল। তাকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত, রাসূল (সা) আমাকে এ পত্র সহ আপনি এবং আপনার ভাই সমীপে পাঠিয়েছেন। আবদ বললেন, বড় নেতা ও বাদশাহ তো আমার বড় ভাই জায়ফার, আমি তোমাকে তার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেব। এ পত্র তাঁর সামনে পেশ করবে। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, তোমরা আমাদেরকে কোন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছ?

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬১-৬২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫১।

২ অর্থাৎ যাদের অন্তরে জীবিত বা জীবিতের নমুনা অবশিষ্ট আছে; অন্যথায় যাদের অন্তর সম্পূর্ণ মরে গেছে, তাদেরকে সত্যের পথে ভীতি প্রদর্শন করা বা না করা উভয়ই সমান।

৩. যাদুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬১-৬২; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫২।

আমর ইবন আস : এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে এবং মুহাম্মদ (সা)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দিতে।

আবদ : ওহে আমর ইবন আস, তুমি তো তোমাদের কওমের সর্দারের পুত্র, বল, তোমার পিতা কি করেছেন; আমরা তারই অনুসরণ করব।

আমর ইবন আস : আমার পিতা মারা গেছেন, নবীর প্রতি ঈমান আনেন নি। আমার আশা ছিল, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং তাঁকে সত্য রাসূল মানতেন, কতই না ভালো হতো। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলাম, কিন্তু তা হয়নি। এমনকি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই ইসলামের হিদায়াত ও সামর্থ্য দান করে ধন্য করেছেন।

আবদ : তুমি কখন মুসলমান হয়েছ ?

আমর ইবন আস : অল্প কিছুদিন হলো।

আবদ : কোথায় মুসলমান হয়েছ ?

ইমর ইবন আস : আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর হাতে[১]; আর নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছেন।

আবদ : নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণের পর তার প্রজারা তার সাথে কিরূপ আচরণ করেছে?

আমর ইবন আস : পূর্বের মতই তার শাসন অব্যাহত রাখে এবং তার অনুগত ও অনুসারীই থেকেছে।

আবদ : পাদ্রী ও খ্রিস্টান দরবেশেরা কি করেছে ?

আমর ইবন আস : সবাই তার আনুগত্য স্বীকার করেছে।

আবদ : ওহে আমর, চিন্তা-ভাবনা করে বলছ তো, ভাল করে মনে রেখো যে, মিথ্যে বলার চেয়ে বেশি খারাপ আর কোন অভ্যেস নেই এবং মিথ্যে অপেক্ষা মানুষকে অপদস্থকারী আর কোন বস্তু নেই।

আমর ইবন আস : অবাস্তব ও অসম্ভব, আমি মিথ্যে বলছি না, আর আমাদের ধর্মে মিথ্যে বলা অবৈধ।

আবদ : জানি না, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর জানেন কি না।

আমর ইবন আস : নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের খবর হিরাক্লিয়াসের জানা আছে।

আবদ : তুমি জানলে কি করে ?

আমর ইবন আস : নাজ্জাশী রোম সম্রাটকে খাজনা দিতেন, মুসলমান হওয়ার পর খাজনা দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আল্লাহর কসম, রোম সম্রাট যদি

---

১. আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজন সাহাবী তাবিঈর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন ! এজন্যে যে, হযরত আমর ইবন আস সাহাবী ছিলেন আর নাজ্জাশী ছিলেন তাবিঈ। যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫২।

আমার কাছে একটি দিরহামও চান, তবে তাও আমি দেব না। রোম সম্রাটের কাছে যখন নাজ্জাশীর এ বক্তব্য পৌঁছে, তখন তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। রোম সম্রাটের নীরবতা দেখে তার ভাই নিয়াক রাগান্বিত হয়ে বললেন, আপনি কি আপনার ঐ দাস অর্থাৎ নাজ্জাশীকে এমনিতেই ছেড়ে দিচ্ছেন, যে খাজনাও দেবে না এবং আপনার ধর্ম ছেড়ে নতুন দীন গ্রহণ করেছে ? সম্রাট বললেন, নাজ্জাশীর এ অধিকার আছে যে, সে যে ধর্ম ইচ্ছা, গ্রহণ করতে পারে। সে ঐ ধর্ম পসন্দ করেছে। আল্লাহর কসম, আমার যদি নিজ রাজত্বের (হারানোর) ভয় না থাকত, তা হলে আমিও ঐ দীনটি গ্রহণ করতাম।

আবদ : অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে, ওহে আমর, কি বলছ ?

আমর ইবন আস : আল্লাহর কসম, আমি সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

আবদ : আচ্ছা, বল তো, তোমাদের পয়গাম্বর কিসের কিসের আদেশ করেন এবং কোন কোন বিষয়ে নিষেধ করেন ?

আমর ইবন আস : সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ দেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে পাপাচার এবং নাফরমানী করতে নিষেধ করেন; সৎকাজ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন, অন্যায়-অত্যাচার, ব্যভিচার এবং মদ্যপান, মূর্তিপূজা ও ক্রুশ পূজা থেকে নিষেধ করেন।

আবদ : কতই না উত্তম দাওয়াত এবং কতই না সুন্দর শিক্ষা, আহা, যদি আমার ভাই আমার সাথে একমত হতেন, এবং দু'ভাই একত্রে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হতে পারতাম, তাঁর প্রতি ঈমান আনতে ও তাঁকে সত্যায়ন করতে পারতাম ! কিন্তু সম্ভবত আমার ভাই তার রাজত্ব রক্ষার স্বার্থে এ ব্যাপারে ইতস্তত করবেন।

আমর ইবন আস : তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তা হলে রাসূল (সা) তার বাদশাহী যথারীতি বহাল রাখবেন এবং নির্দেশ দেবেন, আপন সম্প্রদায়ের আমীর এবং ধনী ব্যক্তির নিকট থেকে সদকা আদায় করতে আর তা নিজ সম্প্রদায়ের গরীব-মিসকীনদের মাঝে বন্টন করতে।

আবদ : এটা তো খুবই উত্তম কথা; এটা বল যে, সদকার পরিমাণ কত এবং কিভাবে তা আদায় করা হবে?

আমর ইবন আস (বলেন) : আমি বিস্তারিত বললাম, স্বর্ণ ও রৌপ্যে এত এত যাকাত নেয়া হয়, উট এবং বকরিতে এত। এর পর আবদ আমাকে তার ভাই জায়ফারের সামনে উপস্থিত করে। আমি নবী (সা)-এর পত্র আনুষ্ঠানিকভাবে তার হাতে দিলাম। মোহর খুলে তিনি পত্রটি পাঠ করলেন। আমাকে বসতে আদেশ করলেন এবং কুরায়শদের ব্যাপারে কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। দু'একদিন ইতস্তত করার পর জায়ফরও ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং দু'ভাই মিলে একদিন নিজেদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। অনেক লোক তাদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের প্রতি জিযয়া আরোপিত হলো। (যাদুল মা'আদ,[১] ৩খ. পৃ. ৬২; হাফিয ইবন কায়্যিমকৃত হিদায়াতুল হিয়ারী, পৃ. ৩৪)।

হাফিয আসকালানী বলেন, আম্মানের প্রকৃত বাদশাহ ছিলেন এদের পিতা জালান্দী। সম্ভবত তিনি বৃদ্ধ হওয়ার কারণে পুত্রদের হাতে রাজত্ব সোপর্দ করেন। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) জালান্দীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য হযরত আমর ইবন আস (রা)-কে প্রেরণ করেন। সম্ভবত তিনি পিতা এবং পুত্রদ্বয়কে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যেই আমর ইবন আস (রা)-কে প্রেরণ করেছিলেন। (যেমনটি ইসাবায় বর্ণিত হয়েছে, ১খ. পৃ. ২৬২-২৬৪, জালান্দী ও জায়ফারের জীবন চরিত, তৃতীয় ভাগ)।

আল্লামা সুহায়লী লিখেছেন, হযরত আমর ইবন আস (রা) জালান্দীকে উদ্দেশ্য করে বলেন : ওহে জালান্দী, যদিও আপনি আমাদের থেকে অনেক দূরে কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ থেকে দূরে নন। যে পবিত্র সত্তা আপনাকে কোন অংশীদার ছাড়া একাই পয়দা করেছেন, আপনি একাকী তাঁর ইবাদত করুন। আর যে বস্তু আপনাকে সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহর অংশীদার নয়, তাকে আল্লাহর ইবাদতে শরীক করবেন না। আর বিশ্বাস রাখুন, যে আল্লাহ আপনাকে জীবিত করেছেন, তিনিই আপনাকে মৃত্যু দেবেন এবং যিনি আপনার জগুের সূচনা করেছেন, তিনিই আপনাকে মৃত্যুর পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেবেন। সুতরাং ঐ নবী সম্পর্কে খুবই চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন, যিনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ এবং হিদায়াত নিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। যদি তিনি আপনার কাছে কোন প্রকারের বিনিময় বা সম্মানী চাইতেন, তাহলে তা থেকে বিরত থাকুন। আর যদি তাঁর কোন কথা বা কাজে তাঁর প্রবৃত্তির চাহিদা বলে সন্দেহ হয়, তবে তা বাদ দিন। এরপর তাঁর আনীত দীনের ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, তাঁর দীন মানুষের স্বৈরাচারী শক্তির অনুরূপ কি-না। যদি তাঁর শরীয়াত ও তাঁর বাণী মানব রচিত দীনের অনুরূপ হয়, তা হলে বলুন, কার অনুরূপ ? আর যদি তা মানুষের তৈরি দীনের অনুরূপ না হয়, তা হলে জানুন যে, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার দীন। অতএব তা গ্রহণ করুন, যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়, তা পালন করুন এবং যা থেকে বেঁচে থাকতে ভীতি প্রদর্শন করেন, তাকে ভয় করুন।

জালান্দী বললেন, আমি ঐ উম্মী নবী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করেছি। নিঃসন্দেহে তিনি এমন কল্যাণকর ও ভাল কাজেরই নির্দেশ দেন, যা তিনি পালন করেন। আর কোন খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করেন না, যা প্রথমে নিজে ত্যাগ না করেছেন। তিনি যখন আপন দুশমনের বিরুদ্ধে জয়ী হন, তখন ঔদ্ধত হন না, আর যখন পরাজিত

১. এ ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৮-তেও বর্ণিত হয়েছে। যারকানী, ৩খ. পৃ. ২৫৩।

হন, তখন হতোদ্যম হন না। তিনি ওয়াদা পূর্ণ করেন, কথা রক্ষা করেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নবী।[১] অতঃপর তিনি এ কবিতা বলেন :

اتانی عمرو بالتی لیس بعدها * من الحق شیء والنصیح نصیح

فیا عمر وقد اسلمت لله جهرة * ینادی بها فی الوراین فصیح

"আমার নিকট আমর এমন বিষয় নিয়ে এলো, যার উপর কোন উপদেশমূলক বস্তু হতে পারে না; ওহে আমর! আমি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করলাম, যে ব্যাপারে একজন শুদ্ধভাষী পণ্ডিত আমায় আহ্বান জানিয়েছেন।"

৭. ইয়ামামা প্রধান হাওযা ইবন আলীর প্রতি পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحیم - من محمّد رسول الله الی هوذة بن علی سلام علی من اتبع الهدی واعلم ان ینی سیظهر الی منتهی والخف والحافر فاسلم تسلم واجمل لك ما تحت یدیك ۰

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হাওযা ইবন আলীর প্রতি। সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম। জেনে রাখুন, আমার দীন ঐ পর্যন্ত পৌঁছবে, যতদূর পর্যন্ত উট-ঘোড়া পৌঁছতে পারে। ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপদে থাকবেন এবং আপনার অধীনস্থ ভূমির উপর আপনার দখল বজায় থাকবে।"

হযরত সালীত ইবন আমর (রা) এ পত্র নিয়ে রওয়ানা হন। হাওযা তাঁর পত্র পাঠ করেন এবং হযরত সালীত (রা)-কে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন। সালীত (রা) হাওযাকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

ওহে হাওযা! পুরাতন ও জিরজিরে হাড় আপনাকে সর্দার বানিয়ে দিয়েছে। প্রকৃত সর্দার তো তিনিই, যিনি ঈমানের সম্পদে ভরপুর ও আল্লাহভীতির ভাণ্ডারের অধিকারী। আমি আপনাকে একটি উত্তম বস্তুর আদেশ করছি এবং একটি খারাপ বিষয় থেকে নিষেধ করছি। আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার নির্দেশ দিচ্ছি এবং শয়তানের ইবাদত করতে নিষেধ করছি। আপনি যদি তা গ্রহণ করেন, তবে আপনার সমস্ত আশা পূর্ণ হবে এবং আশংকামুক্ত থাকবেন। আর যদি অস্বীকার করেন, তাহলে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য আপনাদের ও আমাদের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেবে।

হাওযা বললেন, আমাকে সুযোগ দিন, একটু ভেবে দেখি। এরপর তিনি পত্রের এ জবাব লিখালেন :

ما احسن ما تدعوا الیه واجمله والعرب تهاب مکانی فاجعل الی بعض الامر اتبعك ۰

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ৩৫৬।

"যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহ্বান করছেন, তা কতই না সুন্দর ও উত্তম ! আরব আমার শান-শওকত ও মর্যাদাকে ভয় পায়। আপনি আমাকে কিছুটা সময় দিন, আমি আপনার অনুসরণ করব।"

ফেরার পথে তিনি হযরত সালীত (রা)-কে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করেন এবং হিজরের তৈরি কিছু কাপড় দেন। মদীনায় ফিরে তিনি নবী (সা)-কে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবীজি পত্রটি পাঠ করে বললেন, আল্লাহর কসম, সে এক বিঘত জমি চাইলে তাও দেব না, সেও ধ্বংস হয়েছে, তার দেশও ধ্বংস হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়শেষে ফিরে আসেন, তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে হাওযার মৃত্যু সংবাদ দেন। তিনি সাহাবীদেরকে এ খবর শুনিয়ে বললেন, শীঘ্রই ইয়ামামায় এক মিথ্যাবাদী আত্মপ্রকাশ করবে যে নবূয়াতের দাবি করবে এবং আমার পরে সে নিহত হবে।[১]

৮. দামেশকের আমীর হারিস গাসসানীর নামে পত্র

بسم الله الرّحمن الرّحيم - من محمّد رسول الله الى الحارث بن ابى شمر ، سلام على من اتبع الهدى وامن بالله وصدق فانى ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لاشريك يبقى ملكك ·

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এ পত্র আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে হ্যারিস ইবন আবূ শামারের প্রতি। সালাম সত্যের অনুসারীদের প্রতি ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আল্লাহর আদেশসমূহের সত্যায়নকারীর প্রতি। আমি আপনাকে ঐ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিচ্ছি যাঁর কোন শরীক নেই। যদি আপনি ঈমান আনয়ন করেন, তা হলে আপনার বাদশাহী অব্যাহত থাকবে।"

হযরত শুজা' ইবন ওহাব আসাদী (রা) এ পত্র নিয়ে দামেশকে উপস্থিত হন। হারিস গাসসানী তখন রোম সম্রাটকে আপ্যায়নের যোগাড়-যন্ত্রে ব্যস্ত ছিলেন। রোম সম্রাট তখন পারস্য বিয়ের শোকরানা আদায়ের জন্য হিমস থেকে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাস এসেছিলেন। কয়েকদিন অপেক্ষায় কেটে গেল কিন্তু হারিসের সাথে সাক্ষাত হলো না। [হযরত শুজা (রা) বলেন,] আমি হারিসের প্রহরীকে বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই। প্রহরী বলল, বাদশাহ দু'-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন, সে সময় দেখা হতে পারে। প্রহরীটি ছিল রোমের বাসিন্দা এবং তার নাম ছিল মুররী। সে আমার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা শুরু করল। আমি তাঁর অবস্থা বর্ণনা করছিলাম আর সে কেঁদে চলছিল। অবস্থাদি শুনে সে বলল, আমি ইঞ্জিল পাঠ করেছি, সেখানে তাঁর নাম

১. যাতুল মা'আদ, ৩খ. পৃ. ৬৩।

ও গুণাবলীর বর্ণনা পেয়েছি। আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁকে সত্য নবী বলে স্বীকার করলাম। আমার ভয় হয় যে, হারিস আমাকে হত্যা করবে। সে আমাকে খুবই শ্রদ্ধার সাথে খাতির যত্ন করল ও মেহমানদারী করল। একদিন হারিস এসে পড়লেন। তিনি মুকুট পরিধান করে বসলেন এবং আমাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। হযরত শুজা' ইবন ওহাব (রা) নবীজির পত্রটি তার সামনে পেশ করলেন। হারিস পত্রটি পাঠ করে রুষ্ট হলেন এবং তাঁর পত্রটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, কে এই ব্যক্তি যে আমার রাজত্ব আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় ? আমি নিজেই তার কাছে যাচ্ছি। এ বলে তিনি ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানোর হুকুম দিলেন এবং এ মর্মে এটি পত্র লিখিয়ে প্রথমে রোম সম্রাটের নিকট প্রেরণ করলেন। রোম সম্রাটের জবাব এলো, তোমার ইচ্ছা মুলতবী করো। রোম সম্রাটের জবাব আসার পর হারিস হযরত শুজা' (রা)-কে ডাকালেনএবং জিজ্ঞেস করলেন, কবে ফিরে যেতে ইচ্ছে কর? তিনি বললেন, আগামীকাল ইচ্ছে করছি। হারিস তাকে একশত মিসকাল স্বর্ণ উপঢৌকন দেয়ার আদেশ করলেন। এছাড়া ঐ প্রহরীও তাকে কিছু নজরানা দিল এবং বলল, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম পৌঁছাবেন। আমি ফিরে এলাম এবং সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, ওর রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেল। এরপর আমি তাঁর খিদমতে মুররীর সালাম বললাম এবং সে যা কিছু বলেছিল, তাও বললাম। তিনি বললেন, সে সত্য বলেছে।[১]

ফায়দাসমূহ

১. বিশ্বের শাসকদের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করা এ বিষয়ের প্রকাশ্য প্রমাণ যে, নবী (সা)-এর নবূয়াত কেবল আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না; বরং তাঁর রিসালাত ছিল আরব-আজম, জিন্ন-ইনসান, ইয়াহূদী-খ্রিস্টান, মুশরিক-অগ্নিপূজক সবার জন্য।

রোম সম্রাট, ধর্মের দিক থেকে যিনি খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি তাঁর নবূয়াত ও রিসালাতকে সত্য বলে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে মিসরের আযীয অর্থাৎ মকূকাসও যিনি ধর্মের দিক থেকে খ্রিস্টান ছিলেন, মহানবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালত সম্পর্কে অবগত থাকলেও ইসলাম গ্রহণ করেন নি। আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী, তিনিও খ্রিস্টান ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কোন কোন গোত্রের ধারণা ছিল, মহানবী (সা) তো নবী ও রাসূল ঠিকই ছিলেন, তবে তা কেবল আরবের জন্যই ছিলেন, ইয়াহূদী-নাসারাদের নবী হিসেবে তাঁকে প্রেরণ করা হয়নি। তাদের এ ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

যদি নবী (সা)-এর নবূয়াত ও রিসালাত শুধু আরববাসীর জন্য নির্দিষ্ট হতো, তা হলে তিনি ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকদেরকে ইসলামের দাওয়াত কেন দিলেন

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ১খ. পৃ. ১৭; যারকানী, ৩খ. পৃ. ৩৫৬।

এবং ইয়াহূদী-খ্রিস্টানদের উপর জিযিয়া কেন আরোপ করলেন? ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সর্বপ্রথম নাজরানের খ্রিস্টানদের উপর জিযয়া ধার্য করেন। যখন তিনি হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন আদেশ দিলেন, ইয়েমেনে যে সব ইয়াহূদী বাস করে, তাদের প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট থেকে বাৎসরিক এক দীনার হিসেবে জিযিয়া আদায় করবে।

২. এ পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধ-বিগ্রহ আরববাসীদের সাথে সংঘটিত হচ্ছিল, এর পরে সপ্তম হিজরীতে তিনি খায়বরের ইয়াহূদীদের সাথে জিহাদ করেন এবং অষ্টম হিজরীতে মুতা নামক স্থানে খ্রিস্টানদের সাথে মুকাবিলার জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যাতে হযরত যায়দ, হযরত জাফর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ করেন, যার বিস্তারিত বর্ণনা শীঘ্রই আসবে। এরপর নবম হিজরীতে তিনি নিজেই রোম সম্রাটের মুকাবিলা করার জন্য তাবূক নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হন, এটি তাবূক যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। এ যুদ্ধ ছিল সিরিয়ার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে, ফলে জানা গেল যে, তাঁর নবূয়াত কেবল আরবের মুশরিকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং ইয়াহূদী, খ্রিস্টান এবং সমগ্র বিশ্ব তাঁর দাওয়াত ও শরীয়াত বাস্তবায়নের ক্ষেত্র ছিল; অন্যথায় যা তাঁর শরীয়াতের ক্ষেত্র ছিল না, তাদের সাথে জিহাদ অর্থহীন প্রমাণিত হতো।

৩. অধিকন্তু পবিত্র কুরআন ও ধারাবাহিকতাসম্পন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিল : يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (ওহে লোকসকল! আমি তোমাদের সবার জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল) এবং يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (ওহে কিতাবধারিগণ, এসো এমন স্বীকৃতবাক্যের প্রতি যা তোমাদের এবং আমাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন) এভাবে তিনি আহলে কিতাবকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

কাজেই খ্রিস্টানদের ঐ সব গোত্রের দৃষ্টিতে যদি তিনি আরবের জন্যও নবীরূপে প্রেরিত হন, তবুও তিনি নবী তো ছিলেন। নবী কোন নির্দিষ্ট সপ্রদায়ের জন্যও প্রেরিত হলেও জ্ঞান এবং প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী (আ)-গণ তাঁদের কথা ও কাজে অবশ্যই সত্যবাদী। এটা অসম্ভব যে, নবী হবেন অথচ কোন ব্যাপারে মিথ্যে বলবেন। কাজেই খ্রিস্টানদের ঐ দলের মতে তিনি আরবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেও তিনি يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (ওহে লোকসকল, আমি তোমাদের সবার জন্য প্রেরিত আল্লাহর রাসূল) এ দাবিতে অবশ্যই সত্যবাদী হবেন। সুতরাং যেহেতু তাঁকে নবী মানাই হচ্ছে, তা হলে তাঁর সাধারণ আহ্বানের বিষয়েও তিনি সত্যবাদীই ছিলেন, এটা মানতে হবে।

খায়বরের যুদ্ধ (সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাস)

وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ ٠

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছেন প্রচুর গনীমতের, যা তোমরা গ্রহণ করবে, এটা আমার নিয়ামত, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শীঘ্রই দেবেন।" (সূরা ফাতহ : ২০)

হযরত (সা) যখন হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে সূরা ফাতহ নাযিল হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণভাবে সমস্ত মুসলমানের জন্য এবং বিশেষভাবে 'বায়'আতে রিদওয়ানে' অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সাথে এ ওয়াদা করেন যে, তোমরা অনেক বিজয় অর্জন করবে এবং প্রচুর গনীমত লাভ করবে। আর কার্যত এ বায়'আতুর রিদওয়ানের পুরস্কার স্বরূপই খায়বর বিজয় দান করেন এবং মক্কা বিজয়, যা এখনো নাগালের বাইরে, মনে করো তাও তোমরা পেয়ে গিয়েছ। আর ভবিষ্যতে আরো বিজয় তোমাদের অর্জিত হবে, যা তোমাদের জানা আছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ বাক্যটি দ্বারা খায়বর বিজয়ই বুঝানো হয়েছে এবং অনুরূপভাবে পূর্বোক্ত আয়াত وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا দ্বারাও খায়বারই উদ্দেশ্য।

কাজেই তিনি হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন এবং যিলহজ্জ ও মুহাররম মাসের প্রথমভাগ মদীনাতেই অবস্থান করেন। এর মধ্যে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়, খায়বারের উপর চড়াও হতে, যেখানে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীদের আবাস ছিল। যারা চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে মক্কাস্থ কাফিরদেরকে মদীনায় আক্রমণ করতে এনেছিল। আর আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-কে এ সংবাদ দেন যে, খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ পেয়ে মুনাফিকরাও আপনার নিকট দাবি করবে, আমরাও আপনার সাথে এ সফরে যাব। আর আল্লাহর আদেশ হলো, তারা যেন কোনমতেই আপনার সাথে সফরে না যেতে পারে। অতঃপর তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয় :

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُّبَدِّلُوا كَلٰمَ اللّٰهِ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا ٠

"তোমরা যখন গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও, ওরা আল্লাহর ওয়াদা পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন : ওরা অবশ্যই বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।" (সূরা ফাতহ : ১৫)

রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় কয়েকদিন অবস্থানের পর সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসের শেষদিকে চৌদ্দশত পদাতিক ও দুইশত অশ্বারোহী বাহিনীসহ খায়বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং পবিত্র সহধর্মিণীগণের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫২ ও যারকানী, ২খ. পৃ. ২১৭)।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমা ইবন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, [(তিনি বলেন) রাত্রিকালে যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে খায়বারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, তখন প্রসিদ্ধ কবি আমের ইবন আকওয়া রাজায ছন্দের এ কবিতা পড়তে পড়তে আমাদের আগে আগে চলছিলেন :

اَللّٰهُمَّ لَوْلاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

“আয় আল্লাহ্, আপনি যদি হিদায়াত দান না করতেন তা হলে আমরা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম না, এবং না আমরা সাদকা প্রদান করতাম আর না নামায আদায় করতাম।

فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا اَلْقَيْنَا * وَاَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

“আয় আল্লাহ, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বস্ত ও আত্মোৎসর্গকৃত, আমাদের দ্বারা অন্যায় যা কিছু হয়েছে, তা মাফ করে দিন এবং বিশেষ নিশ্চিন্ততা ও নির্ভরতা আমাদের প্রতি নাযিল করুন যাতে আত্মার স্বস্তি ও শান্তি অর্জিত হয় এবং সব ধরনের অশান্তি ও অস্থিরতা অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়।

وَثَبِّتِ الْاَقْدَامِ اِنْ لاَقَيْنَا * وَبَالصِّيَاحِ عَوَلُوا علينا انّا اذا صيح بِنَا اتَيْنَا

“আর শত্রুপক্ষের সাথে মুকাবিলার সময় আমাদেরকে অবিচল রাখুন; আমাদেরকে যখন জিহাদ ও লড়াইয়ের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন আমরা দৌড়ে সেখানে উপস্থিত হই। আর আহ্বান করে আমাদের সাহায্য চাওয়া হয়।” (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৭)।

‘মুসনাদে আহমদে’ ঐ রাজাযে এতে আরো কয়েক পংক্তি ছিল, তা এই :

اِذَا اَرَدُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا * اِنَّ الَّذِيْنَ قَدْ بَغُوْا عَلَيْنَا

“নিশ্চয়ই যে সমস্ত লোক আমাদের প্রতি যুলম-অত্যাচার করেছে, যখন তারা আমাদেরকে কুফর ও শিরকের কোন ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার ইচ্ছে করে তখন তা আমরা গ্রহণ করি না।

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

"আয় পরোয়ারদিগার, আমরা আপনার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাসক্ত ও অমুখাপেক্ষী নই।" (এ শেষোক্ত রাজাযটি মুসলিমেও বর্ণিত আছে)।[১]

রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, এ 'হুদি' পাঠকারী কে ? লোকেরা বললেন, আমের ইবন আকওয়া। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন।' আর 'মুসনাদে আহমদে'র বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।' আর রাসূল (সা) যখন খাসভাবে কারো জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতেন, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই শহীদ হয়ে যেতেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা) আরয করলেন, আয় আল্লাহর নবী, তার জন্য তো জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল! আহ, যদি আপনি আরো কিছুদিন আমরের বীরত্ব দ্বারা (ইসলামের উন্নয়নকল্পে) আমাদেরকে সম্পদশালী ও উপকৃত হতে দিতেন! (ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫)।

অতঃপর যখন তারা পথে একটি উচ্চ স্থানে উপনীত হলেন, সাহাবিগণ তখন উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, নিজেদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তোমরা কোন বধির বা অদৃশ্যকে ডাকছ না; তোমরা তো ঐ মহান সত্তাকে ডাকছ, যিনি শ্রোতা ও সন্নিকটবর্তী এবং সব সময় তোমাদের সাথেই আছেন। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) বলেন, আমি তাঁর বাহনের কাছেই ছিলাম, তিনি আমাকে لاحول ولاقوة الا بالله পাঠ করতে শুনে আবদুল্লাহ ইবন কায়স,[২] বলে আহ্বান করলেন। আমি বললাম 'লাব্বইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' (ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি উপস্থিত)। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারের কথা বলব না? আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোন, কেন বলবেন না, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন : لاحول ولاقوة الا بالله[৩] অর্থাৎ এই কালেমা জান্নাতের ভাণ্ডার (বুখারী)।

---

১. আর এক রিওয়ায়াতে ما القينا এর পরিবর্তে مَا اَبْقَيْنَا শব্দ উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যে সমস্ত গুনাহ আমাদের যিম্মায় অবশিষ্ট আছে, যা জন্য আমরা তাওবা করিনি, তা মাফ করে দিন। এ জন্যে যে, সত্যিকারের তাওবা করলে তো আমলনামা থেকে গুনাহ মুছে দেয়া হয়, তাওবার পর গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না; যেমন হাদীসসমূহে এসেছে। আর এক রিওয়ায়াতে ما لقينا শব্দ এসেছে, অর্থাৎ আয় আল্লাহ যে সমস্ত গুনাহ আমরা করেছি, তা মাফ করুন।

২. এটা ছিল তার নাম, আর আবূ মূসা আশআরী ছিল উপনাম।

৩. এর অর্থ এই যে, আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া বান্দা তার গুনাহ থেকে কখনই বাঁচতে পারে না এবং বান্দার কোন প্রকার আনুগত্য ও সৎকর্ম করার কোনই শক্তি নেই বরং আল্লাহ প্রদত্ত সাহায্য ও শক্তিই তার শক্তি। আর প্রকাশ থাকে যে, নিজের সামর্থ্য ও শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আল্লাহর সামর্থ্য, তাঁর শক্তি, তাঁরই সাহায্য-সহযোগিতা, তাঁরই প্রদত্ত সামর্থ্য ও হিদায়াতের প্রতি দৃষ্টি রাখাই উচ্চ পর্যায়ের আত্ম সমর্পণ ও আনুগত্য, যা জান্নাতের ভাণ্ডার। আর যে বস্তু ভাণ্ডারে থাকে, তা লুক্কায়িত ও গোপন হয়ে থাকে। এ কারণে এর বিনিময় ও সওয়াব কোন হাদীসে উল্লেখ নেই। যেহেতু তা ভাণ্ডারের বস্তু ছিল, তাই لاحول ولاقوة الا بالله এর বিনিময়ও গোপন রাখা হয়েছে।

যেহেতু এটা জানা ছিল যে, গাতফান গোত্র খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্যার্থে সেনা সমাবেশ করেছে, এ জন্যে তিনি মদীনা থেকে অগ্রসর হয়ে রাজী' নামক স্থানে তাঁবু ফেললেন, যা ছিল খায়বার এবং গাতফানের মধ্যবর্তী এলাকায়। যাতে গাতফানের ইয়াহূদীরা ভীত হয়ে খায়বারের ইয়াহূদীদের সাহায্য পাঠাতে না পারে। সুতরাং গাতফানের ইয়াহূদীরা যখন বুঝতে পারল যে, তাদের নিজেদের জীবনই আশঙ্কার মধ্যে, তখন তারা ফিরে গেল। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫)।

যখন খায়বারের নিকটে পৌঁছে গেলেন, তখন সাহাবাগণকে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন এবং এ দু'আ করলেন :

اللّهم رب السموت وما الظللن ورب لارضين وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما اذرين فانا نسألك خير هذه القرية وخير اهلها وخير ما فيها ونعوذبك من شرها وشر اهلها وشر ما فيها اقدموا بسم اللّه ٠

তাঁর পবিত্র অভ্যেস ছিল, যখন কোন জনপদে প্রবেশ করতেন, তখন এ দু'আ পড়তেন। (ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫)।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা খায়বারে উপস্থিত হন। তাঁর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি রাত্রিকালে কারো প্রতি আক্রমণ করতেন না, বরং প্রভাত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। যেখানে ফজরের আযান শুনতে পেতেন, সেখানে আক্রমণ চালাতেন না; অন্যথায় আক্রমণ চালাতেন। প্রভাত হতেই ইয়াহূদীরা নিজেদের কোদাল ও অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে নিজেদের কাজে বেরিয়ে পড়ল। তাঁর সেনাবাহিনী দেখেই তারা তারা বলল, محمد والخميس অর্থাৎ 'মুহাম্মদ তাঁর সমস্ত সেনা-সামন্ত নিয়ে এসে পড়েছেন।'

সেনাবাহিনীকে খামীস এ জন্যে বলা হয় যে, এতে পাঁচটি অংশ থাকে مقدمه اميمنه ميسره قلب ساقه। তিনি ওদের দেখে দু'আ করার উদ্দেশ্যে উভয় হাত উঠালেন এবং বললেন : اللّه اكبر خرجت خيبر انا اذا انزلنا الساحة قوم فساء صباح المنذرين (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৯)।[1]

খায়বারে ইয়াহূদীদের অনেকগুলো দূর্গ ছিল। ইয়াহূদীরা তাঁকে দেখামাত্র স্ত্রী-পরিজন নিয়ে দূর্গের নিরাপদ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ল। তিনি দূর্গসমূহের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একের পর এক দখল করে নেন।[2]

---

১. সহীহ বুখারীর কিতাবুস সালাতে তিনবার আল্লাহু আকবর এবং তিনবার এ বাক্যাবলী পাঠ করার কথা উল্লেখ আছে। যারকানী, ২খ. পৃ. ২২৩।

২ ইবনহিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৫; উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ১৩২; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৫৮।

১. নাঈম দুর্গ

সর্ব প্রথম তিনি জয় করেন নাঈম দুর্গ। মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা) ঐ দুর্গের নিচে ছিলেন, ইয়াহূদীরা উপর থেকে তার উপর যাঁতার একটি চাক্কি ফেলে দেয়। এতে তিনি শহীদ হয়ে যান।

২. কামূস দুর্গ

নাঈমের পর কামূস দুর্গ দখল করা হয়। এ দুর্গটি খায়বারের অন্যান্য দুর্গ অপেক্ষা সুরক্ষিত ছিল। যখন এ দুর্গ ঘেরাও করা হল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মাথা ব্যথার কারণে ময়দানে আসতে পারেননি। ফলে পতাকা দিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে প্রেরণ করেন। পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেও দুর্গটি দখল করা গেল না, কাজেই সবাই ফিরে এলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি হযরত ফারুকে আযম (রা)-কে পতাকা দিয়ে প্রেরণ করলেন। হযরত উমর (রা)-ও পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে এলেন। [আহমদ,[১] নাসাঈ, ইবন হিব্বান ও হাকিমে হযরত বুরায়দা ইবন খুসায়ব (রা) সূত্রে বর্ণিত]।

এ দিন হযরত (সা) ইরশাদ করেন, আগামীকাল এমন ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং তাঁরাও তাকে ভালবাসেন। আর তার হাত দিয়েই আল্লাহ এ বিজয় অর্জন করাবেন।

প্রত্যেক ব্যক্তিই উৎসুক ছিলেন যে, দেখা যাক, এ সৌভাগ্য কার নসীবে জোটে। এ কল্পনা জল্পনায় সারা রাত কেটে গেল। প্রভাত হলে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডাকালেন। হযরত আলীর চোখ সে সময় অসুখে আক্রান্ত ছিল। আলী (রা)-কে ডেকে হযরত (সা) তার চোখে মুখের থুথু লাগিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ ভাল হয়ে গেল। মনে হলো তার চোখে কোন সময় কোন অসুখ ছিল না। আর তার হাতে পতাকা দিয়ে এ উপদেশ দিলেন যে, যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেবে আর আল্লাহ্ তা'আলার হকসমূহের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করবে। আল্লাহর কসম, যদি এক ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলা তোমার মাধ্যমে হিদায়াত নসীব করেন, তা হলে তা তোমার জন্য লাল বর্ণের বহু সংখ্যক উট পাওয়া অপেক্ষাও উত্তম হবে। হযরত আলী (রা) পতাকা নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং তার হাতেই দুর্গের পতন ঘটে। (বুখারী)[২]

ইয়াহূদীদের প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত বীর পাহলোয়ান মারহাব নিম্নোক্ত কবিতা আওড়াতে আওড়াতে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে :

---

১. হায়সামী বলেন, হাদীসটি আহমদ রিওয়ায়াত করেছেন এবং তার বর্ণনাকারিগণ বিশুদ্ধ বর্ণনাকারী; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৬খ. পৃ. ১৫০; এ ছাড়া হকিম তার ইকলীলে, আবূ নুয়াইম তার দালাইলে এবং ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৫-তে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৫।

قد علمت خيبر انى مرحب * شاك السلاح بطل مجرب

"খায়বরবাসীদের খুবই জানা যে, আমি মারহাব অস্ত্রবাজ বাহাদুর এবং এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।"

হযরত আমের ইবন আকওয়া (রা) তার মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে এ কবিতা আবৃত্তি করতে করতে বেরিয়ে এলেন :

قد علمت خيبر انى عامر * شاكى السلاح بطل مغامر

আমের (রা) তার পায়ে তরবারির আঘাত করতে উদ্যত হলে তরবারি ফিরে এসে তারই কণ্ঠদেশে আঘাত হানে। ফলে তিনি ইনতিকাল করেন। হযরত সালমা ইবনুল আকওয়া (রা) বলেন, ফেরার পথে আমাকে চিন্তিত দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি আরয করলাম, মানুষের ধারণা আমের-এর সৎকর্ম বরবাদ হয়ে গেছে, কেননা সে আপন তরাবারির আঘাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, ওরা ভুল বলছে, সে বড় মুজাহিদ। এরপর রাসূল (সা) আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, তার জন্য দু'টি বিনিময় রয়েছে। ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, সে তো শহীদ। এরপর তার জানাযা পড়ান।[১]

অতঃপর হযরত আলী (রা) এ বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে তার মুকাবিলায় অগ্রসর হন :

انا الذى سمتنى امى حيدره * كليث غابات كريه المنظره

"আমি ঐ ব্যক্তি, যার মা তার নাম রেখেছে হায়দার (ব্যাঘ্র),[২] আর বাঘের মতই আমি ভীতিপ্রদ।"

এ বলে তিনি এত জোরে তরবারির আঘাত হানেন যে, মাহরাবের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং দূর্গ দখলে আসে। (মুসলিম, ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭)।

অতঃপর মারহাবের ভাই ইয়াসির মুকাবিলায় আসে। এদিক থেকে হযরত যুবায়র (রা) বের হন এবং এক আঘাতেই ইয়াসিরের জীবনের সমাপ্তি ঘটান। (যাদুল মাআদ)।[৩]

---

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮০।

২ বলা হয়ে থাকে যে, মারহাব ঐ রাতে স্বপ্নে দেখে, একটি বাঘ তাকে ফেড়ে ফেলছে। হযরত আলী (রা) কাশফ দ্বারা তা অবগত হন। কাজেই তার বর্ণিত انا الذى سمتنى امى حيدره দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, ওহে মারহাব, যে বাঘকে তুমি স্বপ্নে দেখেছ, আমিই সেই বাঘ। কাজেই হযরত আলীর কবিতা শুনেই তার কম্পন শুরু হয় এবং বাহাদুরী কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন এবং তাঁর জানাই পরিপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত। যারকানী, ৩খ., পৃ. ২২৪।

৩. ইবন হিশাম, ২খ. পৃ. ১৮৭।

এ দুর্গ বিশদিন অবরোধ করে রাখার পর হযরত আলী (রা)-এর হাতে বিজয় অর্জিত হয়। গনীমতের মাল ছাড়া অনেক বন্দীও হস্তগত হয়। যাদের মধ্যে বনী নাযীরের সর্দার হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা এবং কিনানা ইবন রবী'-এর স্ত্রী সাফিয়া-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[১]

দ্রষ্টব্য : নবী করীম (সা) প্রতিদিন যখন কোন দুর্গ আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেন, তখন মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কাউকে মনোনীত করে বলতেন, ইসলামের পতাকা তার হাতে দাও। আর আল্লাহ্ তা'আলা তার হাতেই দুর্গ জয় করিয়ে দিতেন। সুতরাং কামূস দুর্গের জয়ের ব্যাপারে আল্লাহর লিখন ছিল হযরত আলী (রা)-এর হাতে। এ জন্যে রাসূল (সা) হযরত আলীকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করেন। নবী (সা)-এর এটা বলা যে, পতাকা এমন ব্যক্তির হাতে দেব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে মহব্বত রাখে, এটা তাকে মর্যাদা ও সম্মানদানের উদ্দেশ্যে ছিল। আল্লাহ্ মাফ করুন, এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি ছাড়া আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করেন না।

হযরত সাফিয়্যা (রা) এবং তার দু' চাচাত বোন এ কামূস দুর্গ থেকে বন্দী হন, যার বর্ণনা সামনে আসবে। আর হযরত সাফিয়ার স্বামীর নাম ছিল কিনানা ইবন রবী' যে এ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে।[২]

৩. সা'আব ইবন মা'আয দুর্গ

কামূস দুর্গের পতনের পর সা'আব ইবন মা'আয দুর্গ বিজিত হয়, যেখানে খাদ্যশস্য, চর্বি এবং পানাহারের অনেক দ্রব্য ছিল, এর সবই মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এক বর্ণনায় আছে, যখন মুসলমানদের রসদে কমতি দেখা দিল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট দু'আর আবেদন জানালেন। তিনি দু'আ করলেন। তার পরদিনই সাআব ইবন মাআয দুর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং পানাহারের মত অনেক দ্রব্য মুসলমানদের হস্তগত হয়, যা তাঁদের বিরাট সাহায্যে আসে।[৩]

ঐ দিন নবী (সা) চারদিকে আগুন জ্বলতে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি ? লোকেরা বলল, গোশত রান্না করা হচ্ছে। অতঃপর জানতে চাইলেন, কিসের গোশত ? বলল, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বললেন, এ তো অপবিত্র, এ সবই ফেলে দাও এবং পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। কেউ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রগুলো ধুয়ে ফেলি, এটা কেমন হয় ? তিনি বললেন, তাতেও চলবে, পাত্রগুলো ধুয়ে ফেল।

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩২৬।

২ ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬০।

৩. উয়ূনুল আসার, ২খ. পৃ. ১৩৪।

৪. হিসন দূর্গ

অতঃপর ইয়াহূদীরা হিসন দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এটিও একটি অত্যন্ত মযবূত দূর্গ ছিল। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হওয়ায় একে হিসন দূর্গ বলা হতো। কিল্লা অর্থ পাহাড়ের চূড়া, পরে যা কিল্লায়ে যুবায়র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ, গনীমত বন্টনের পর এ দূর্গটি হযরত যুবায়রের ভাগে পড়ে।

তিনদিন পর্যন্ত মুসলমানরা দূর্গটি ঘিরে রাখেন। ঘটনাক্রমে এক ইয়াহূদী নবীজির খিদমতে হাযির হয়ে আরয করে, হে আবুল কাসিম, আপনি যদি মাসব্যাপীও এ দূর্গ অবরোধ করে রাখেন, তাতে তাদের কোন পরোয়া নেই। তাদের কাছে মাটির নিচে পানির নহর আছে। ওরা চুপে চুপে রাতে এসে পানি সংগ্রহ করে দূর্গের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়। আপনি ঐ পানির নহর বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারলে সফল হতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ওদের পানি বন্ধ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে ওরা দূর্গের বাইরে এলো এবং তুমুল সংঘর্ষ হলো। দশজন ইয়াহূদী নিহত হলো, অপরদিকে এবং কয়েকজন মুসলমানও শহীদ হলেন। দূর্গ বিজিত হলো।

হাফিয ইবন কাসীর বলেন, এ দূর্গটিই ছিল সমতল অঞ্চলের সর্বশেষ দূর্গ। রাসূল (সা) এটি জয় করার পর উচ্চ এলাকার দূর্গগুলোর প্রতি অগ্রসর হন। এ অঞ্চলে সর্বপ্রথম জয় করেন উবাই দূর্গটি, যা কঠিন যুদ্ধের পর বিজিত হয়। মুসলমানগণ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তারপর অন্যান্য দূর্গের প্রতি অগ্রসর হন।[১]

৫. অতীহ ও সালালিম দূর্গ

হিসন দূর্গের পতনের পর রাসূলুল্লাহ (সা) অপরাপর এলাকার দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর যখন সকল দূর্গ মুসলমানদের অধিকারে আসে, তখন সবশেষে অতীহ ও সালালিম দূর্গের প্রতি অগ্রসর হন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আল-কিতবাহরও উল্লেখ আছে। এর পেছনের সকল দূর্গ অধিকৃত হয়, মাত্র এ দু'টি দূর্গ বাকী ছিল। ইয়াহূদীদের পুরো সামরিক শক্তি এখানে নিয়োগ করা হয়েছিল। চারদিক থেকে গুটিয়ে এসে ইয়াহূদীরা এখানে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছিল। চৌদ্দদিন অবরোধ করে রাখার পর অগত্যা তারা সন্ধির আবেদন করে। রাসূল (সা) ওদের আবেদন মঞ্জুর করেন। ইয়াহূদীরা ইবন আবুল হুকায়েককে সন্ধির ব্যাপারে কথাবার্তা বলার জন্য প্রেরণ করে। রাসূল (সা) এ শর্তে তাদের প্রাণভিক্ষা দেন যে, তারা খায়বরের ভূমি খালি করে দেবে, অর্থাৎ দেশ ত্যাগ করবে। আর স্বর্ণ-রৌপ্য ও যুদ্ধাস্ত্রসমূহ সবকিছু এখানে ছেড়ে যাবে। কোন কিছু লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এর বরখেলাফ করা হলে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এর যিম্মাদারী নেবেন না।[২]

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯৮।

২ যাদুল মাআদ, ২খ. পৃ. ১৩৬।

কিন্তু ইয়াহূদীরা এ ওয়াদা এবং চুক্তি করা সত্ত্বেও দুষ্টবুদ্ধি থেকে নিবৃত্ত হয়নি এবং হুয়াই ইবন আখতাবের একটা থলে (যার মধ্যে সবার গহনা-গাঁটি নিরাপদে রাখা ছিল) সেটি গায়েব করে ফেলে। তিনি কিনানা ইবন রবী'কে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, ঐ থলেটি কোথায় ? কিনানা বলল, যুদ্ধের সময় ব্যয় হয়ে গেছে। তিনি বললেন, সময় তো খুব বেশি অতিক্রান্ত হয়নি, আর সম্পদ অনেক বেশি ছিল। এটা ইবন সা'দের বর্ণনা। আর আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি হযরত সাফিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বায়হাকী[১] এবং ইবন সা'দের অপর বর্ণনায় আছে যে, কিনানা, তার ভাই ও অন্যান্য লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। সবাই এ কথাই বলে যে, ব্যয় হয়ে গেছে। হযরত (সা) বললেন, যদি সে থলে পাওয়া যায়, তা হলে তোমাদের ভাল হবে না। এ কথা বলে তিনি এক আনসারীকে নির্দেশ দিলেন, অমুক স্থানে যাও এবং সেখানে একটি বৃক্ষের শেকড়ের মধ্যে থলেটি লুকানো আছে। সাহাবী সেখানে গেলেন এবং থলেটি নিয়ে এলেন যার মূল্য ছিল দশ হাজার দীনার। চুক্তিভঙ্গের এ অপরাধে ঐ লোকগুলোকে হত্যা করা হয়,[২] যাদের মধ্যে হযরত সাফিয়ার স্বামীও ছিল। তার নাম ছিল কিনানা ইবন রবী' ইবন আবুল হুকায়েক।[৩]

এছাড়াও কিনানার আর একটি অপরাধ ছিল, সে মুহাম্মদ ইবন মাসলামা (রা)-এর ভাই মাহমূদ ইবন মাসলামা (রা)-কে এ যুদ্ধেই হত্যা করেছিল। এ জন্যে রাসূল (সা) কিনানাকে মুহাম্মদ ইবন মাসলামার হাতে তুলে দেন, যাতে তিনি আপন ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারেন। (সীরাতে ইবন হিশাম)।

সতর্ক বাণী : খায়বরের দূর্গসমূহ বিজয়ের যে ধারাবাহিক বর্ণনা অধম (লিখক) উল্লেখ করেছে, তাতে প্রথমে নাইম দূর্গ জয় হয়েছে, তারপর কামূস দূর্গ, অতঃপর সাআব দূর্গ, শেষে অতীহ ও সালালিম দূর্গ জয় হয়। এ ধারাবাহিকতা সীরাতে ইবন হিশাম এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯২-১৯৪-এ উল্লেখ আছে। হাদীস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে এছাড়া আরো দূর্গের উল্লেখ আছে এবং জয়ের ধারাবাহিকতায়ও কিছুটা বিভিন্নতা রয়েছে। আল্লামা হালাবী তাঁর সীরাতে হালাবিয়ায় লিখেছেন, সমতল এলাকায় তিনটি দূর্গ ছিল, নাইম দূর্গ, কুল্লা দূর্গ , সমতল এলাকায় সর্বপ্রথম যে দূর্গটি জয় করেন, তা ছিল নাইম দূর্গ। যেসব ইয়াহূদী নাইম থেকে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, তারা সমতল এলাকার অপর দূর্গ সাআব ইবন মাআয দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। দুই দিন অবরোধ করে রাখার পর দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই এ দূর্গ বিজিত হয়।

---

১. হাফিয আসকালানী বায়হাকীর এ রিওয়ায়াত সম্পর্কে বলেন, 'হাদীসটি বায়াকী রিওয়ায়াত করেছেন, এর বর্ণনাকারীগণ হযরত ইবন উমর (রা) বর্ণিত হাদীসটিতে নির্ভরযোগ্য। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬৭। ইত্যাদি।

২ যারকানী, ২খ. পৃ. ১২৯।

৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৯৯।

তারপর তিনি কুল্লা দূর্গ অবরোধ করেন। এ দূর্গকে এজন্যে কুল্লা বলা হতো যে, কুল্লা অর্থ পাহাড়ের চূড়া, আর এটি পাহাড় চূড়ায়ই অবস্থিত ছিল। যেহেতু পরবর্তীতে এটি হযরত যুবায়র (রা)-এর ভাগে পড়ে, তাই এটিকে পরে যুবায়রের কিল্লাও বলা হতো। এ তিনটি দূর্গ ছিল সমতল এলাকায়।

এরপর মুসলমানগণ উচ্চ এলাকার দূর্গগুলোর দিকে অগ্রসর হন। এ এলাকায় ছিল দু'টি দূর্গ, একটি উবাই দূর্গ এবং অপরটি বারী দূর্গ। প্রথমে উবাই এবং পরে বারী দূর্গ বিজিত হয়।

যখন এ এলাকাও মুসলমানদের দখলে এলো, তখন ইয়াহূদীরা কিতবার দূর্গসমূহে আশ্রয় নেয়। কিতবা এলাকায় তিনটি দূর্গ ছিল, কামূস, অতীহ এবং সালালিম। সবচে' বড় ছিল কামূস দূর্গ, যা হযরত আলী (রা)-এর হাতে বিজিত হয়। এ দূর্গটিও যখন দখলে এলো, তখন মুসলমানগণ অতীহ এবং সালালিম দূর্গ অবরোধ করেন। চৌদ্দদিন অবরুদ্ধ থাকার পর তারা নবীজির কাছে এ আবেদন জানায় যে, আমাদেরকে এবং আমাদের পরিবার-পরিজনকে ছেড়ে দেয়া হোক, আমরা খায়বর ছেড়ে চলে যাব। তিনি তা মঞ্জুর করেন।[১]

ফিদক বিজয়

ফিদকবাসিগণ যখন সংবাদ পেল যে, খায়বারের ইয়াহূদীগণ এই এই শর্তে সন্ধি করেছে, তখন তারাও রাসূল (সা)-এর নিকট প্রস্তাব পাঠাল যে, আমাদের প্রাণের নিরাপত্তা দেয়া হোক, আমরা আমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করে এ স্থান ছেড়ে চলে যাব। তিনি এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। মুহাইসা ইবন মাসউদের মাধ্যমে কথাবার্তা হয়। কোন আক্রমণ বা সেনা অভিযান ছাড়াই যেহেতু ফিদক অধিকারে আসে, সেখানে না অশ্বারোহী নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, না পদাতিক বাহিনী, এ জন্যে ফিদক নির্ভেজালভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কবজা ও অধিকারে রাখা হয়। খায়বারের ন্যায় গনীমতের অধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হয়নি। (সীরাতে ইবন হিশাম)

ফায়দা : এ যুদ্ধে চৌদ্দ অথবা পনেরজন মুসলমান শহীদ হন এবং তিরানব্বইজন ইয়াহূদী নিহত হয়। বিজয়ের পর যখন গনীমতের মাল এবং বন্দীদের একত্র করা হয়, তাদের মধ্যে হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা ও কিনানা ইবন রবী'র স্ত্রী হযরত সাফিয়্যাও ছিলেন। যিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা ।

হুয়াই ইবন আখতাব হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর ছিল। যুদ্ধের পর বন্দীদের একত্র করা হলে, হযরত দাহিয়া (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে খুশি, নিয়ে যাও। হযরত দাহিয়া হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর হুয়াইর কন্যা ও কিনানার স্ত্রী সাফিয়্যাকে পসন্দ করেন। সাহাবিগণ আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইনি তো ওদের সর্দারের

১. সীরাতে হালাবিয়া, ২খ. পৃ.১৬৪; আউনুল মাবূদ, ৩খ. পৃ. ১২০।

কারণ, তিনি কেবল আপনারই উপযোগী। অতঃপর সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাফিয়্যাকে হযরতের ভাগে এবং সাফিয়্যার চাচাত বোনকে দাহিয়্যার ভাগে প্রদান করা হয়। হযরত (সা) সাফিয়্যাকে মুক্তি দিয়ে নিজে বিবাহ করেন।[১]

হযরত সফিয়্যা (রা) সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণীগণের বর্ণনায় আসবে। যেভাবে বনী মুসতালিক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত জুয়ায়রিয়া (রা)-এর সাথে তাঁর বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্য অনুযায়ী ব্যবহার করেছিলেন, অনুরূপভাবে এ স্থলে হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর সাথে তাঁর বংশ মর্যাদা এবং হযরত হারুন (আ)-এর বংশধর হওয়ার সম্মানকে বজায় রেখে মুক্তি দেন এবং যথার্থ মর্যাদায় নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিষ প্রদানের ঘটনা

বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) কিছুদিন খায়বারেই অবস্থান করেন। এরই মধ্যে একদিন সালাম ইবন মিশকামের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারিস একটি ভুনা বকরি হাদিয়া স্বরূপ তাঁর খিদমতে পেশ করে, যাতে আগেই বিষ মিশিয়ে রাখা হয়। পসন্দনীয় অংশ থেকে এক টুকরা মুখে পুরে চিবানোমাত্র তিনি হাত গুটিয়ে নেন, বিশর ইবন বারা ইবন মা'রূর তাঁর সাথে খানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনিও এ থেকে কিছুটা খেয়ে ফেলেছিলেন। তিনি (সা) বললেন, হাত গুটাও, এতে বিষ মেশানো আছে।

যয়নাবকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে সাক্ষ্য দিল যে, নিঃসন্দেহে এতে বিষ মেশানো হয়েছে। তা এ জন্যে যে, যদি আপনি সত্যিকারের নবী হন, তবে আল্লাহ আপনাকে অবহিত করবেন, আর যদি আপনি মিথ্যে নবী হন, তা হলে মানুষ আপনার থেকে পরিত্রাণ পাবে। যেহেতু মহানবী (সা) নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, এ জন্যে তিনি এ কথার কোন প্রতিবাদ না করে চুপ থাকলেন (এরপর সে মুসলমান হয় কিনা, তা দেখাই নিরবতার কারণ হতে পারে)। কিন্তু পরে যখন বিশর ইবন বারা ইবন মা'রূর (রা) এ বিষক্রিয়ায় ইনতিকাল করেন, তখন যয়নাবকে বিশরের উত্তরাধিকারীদের হাতে তুলে দেয়া হয় এবং তারা তাকে বিশরের হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

বায়হাকীর এক রিওয়ায়াতে আছে, অপরাধ স্বীকার করার পর যয়নাব ইসলাম গ্রহণ করে বলে, আপনার সত্যবাদী হওয়ার বিষয়টি আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে গেছে। এক্ষণে আমি উপস্থিত জনতাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি আপনার দীন গ্রহণ করছি এবং শপথ করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল। যুহরী এবং সুলায়মান প্রথমেই তাকে হত্যা না করার কারণ হিসেবে বলেছেন যে, সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।[২]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৬০।

২. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮০।

সংবাদ

যখন খায়বার বিজয় হলো এবং ঐ ভূখণ্ডটি ইসলামের অনুসারীদের অধিকারে এলো, তখন হযরত (সা) ইচ্ছে করলেন, (চুক্তি অনুসারে) ইয়াহূদীরা দেশত্যাগ করুক। কিন্তু তারা এ বলে আবেদন করল যে, আমাদেরকে এখানে থাকতে দিন; আমরা কৃষিকাজ করব, তাতে যা উৎপাদিত হবে, তার অর্ধেক আপনার সরকারকে দেব। তিনি তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন ও সাথে সাথে এ কথাও স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, نقركم على ذلك ماشئنا "যতদিন ইচ্ছে হয়, তোমাদেরকে বহাল রাখব।"

বুখারী, ১খ. পৃ. ৩১৫, কিতাবুল মুযারিয়াত, اذا قال بر الارض اقرك ما اقرك الله ... ... অধ্যায়; ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৬ এবং ২৩৯, কিতাবুশ শুরূত, اذا اشترط في المزارعة اذا شئت اخر جتك অধ্যায়; এ ধরনের লেনদেন সর্বপ্রথম খায়বারে শুরু হয়, ফলে এ লেনদেনের নাম 'মুখাবারা' হয়ে যায়।

যখন ফসল তোলার সময় আসত, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ অনুমান করার জন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে প্রেরণ করতেন। (বাবুল খারাস, সুনানে আবূ দাঊদ)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) উৎপাদিত ফসলকে দু'ভাগ করে বলতেন, যে ভাগ ইচ্ছে হয়, গ্রহণ কর। ইয়াহূদীরা তার ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ দেখে বলত, এ ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের জন্যই আসমান ও যমীন স্থির আছে। এক রিওয়ায়াতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বলতেন :

يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الى قتلتم انبياء الله وكذبتم على الله وليس يحملنى بغضى اياكم ان احيف عليكم ·

"ওহে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তোমরাই আমার নিকট সবচে' বেশি ক্রোধের বস্তু, তোমরাই আল্লাহর পয়গাম্বরগণকে হত্যা করেছ, তোমরাই আল্লাহর প্রতি মিথ্যে আরোপ করেছ। কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার ক্রোধ কখনই আমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না যে, আমি তোমাদের প্রতি যুলম করি।"[১]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপস্থিতি

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এবং তার কতিপয় সঙ্গী খায়বার বিজয়ের পর নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি (সা) তাদের গনীমতের মালের কোন অংশ দেননি। (বুখারী, খায়বার যুদ্ধ)।

খায়বারের গনীমত বন্টন

খায়বারের গনীমতের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল না, গরু, বকরি, উট এবং কিছু

১. তাহাবীকৃত শারহে মাআনিউল আসার, ১খ. পৃ. ৩১৬।

মালপত্র ছিল। আর সবচে' বড় জিনিস ছিল খায়বারের কৃষিজমি ও বাগানসমূহ। জমি ছাড়া যে সব মাল ছিল, তা কুরআনের নির্দেশ অনুসারে বন্টন করে দেন, আর জমিগুলো কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে বন্টন করেন।[১]

হুদায়বিয়ার উমরার সফরে যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) বেদুঈনদেরকেও তাঁর সহযাত্রী হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আশঙ্কা ছিল যে, বদর, উহুদ ও আহযাব যুদ্ধে নিহতদের কারণে মক্কাবাসীর অন্তর ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ঈর্ষা ও শত্রুতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। মক্কায় প্রবেশকালে তাই যদি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় এবং মক্কাবাসী সরাসরি মক্কায় প্রবেশে বাধা দেয়, এ জন্যে চিন্তা ও জ্ঞানের বিচারে এটাই যুক্তিযুক্ত ছিল যে, তাঁর সঙ্গে বিরাট দল যাবে, যাতে কুরায়শদের দ্বারা ক্ষতির কোন আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু অনেক বেদুঈদ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেনি, আর অনেকেই তুচ্ছ বাহানা ও জরুরী কাজের অজুহাত দেখায়। নিষ্ঠাবান মুসলমান, যাদের আপাদ মস্তক ঈমানী আনন্দে আপ্লুত ছিল, তাঁকে সাহায্য ও সহযোগিতাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মহাসৌভাগ্য মনে করে তাঁর সঙ্গী হন। হুদায়বিয়ার নিকটে বাধা এলো এবং পরাজয়মূলক সন্ধির অবস্থা সামনে এলো, যাতে এ মহাত্মাগণ ধৈর্যধারণ করেন। এ সফরে যখন এঁদের নিষ্ঠা ও একনিষ্ঠতা সুপ্রমাণিত ও উপমাযোগ্য প্রমাণিত হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবার থেকে তাদের অন্তরের পরাজিতভাব দূর করার উদ্দেশ্যে খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ নাযিল হয় যে, শীঘ্রই তোমরা খায়বার জয় করবে এবং এ আদেশ নাযিল করেন যে, খায়বারের গনীমত হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে, অপর কাউকে এতে শরীক করা হবে না।[২] বিস্তারিত বিবরণের জন্য প্রয়োজন হলে তাফসীরের কিতাবসমূহের সূরা আল-ফাতহ-এর তাফসীর দেখুন।

বাকী থাকলো যে, খায়বারের জমিগুলো তিনি কিভাবে বন্টন করেন। এর বিবরণ সুনানে আবূ দাঊদে বর্ণিত হয়েছে যে, এক-পঞ্চমাংশ বের করে নেয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের জমিগুলোকে ছত্রিশ ভাগে বিভক্ত করেন, যার মধ্যে আঠারটি অংশ পৃথক করে নেন অর্থাৎ মুসলমানদের প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য নির্ধারণ করেন এবং মুজাহিদদের মধ্যে তা বন্টন করেন নি। আর অবশিষ্ট আঠার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ করে দেন এবং এর প্রতি অংশ একশত মুজাহিদের অংশ হিসেবে নির্ধারিত হয় যা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে কেবল হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যেই বন্টন করা হয়। খায়বারের জমির ঐ অর্ধাংশ, যা তিনি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেননি, তার মধ্যে নিচু, উঁচু, ঊষর ও মধ্যমমানের জমিও ছিল।

আর অর্ধাংশ তিনি হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করেন, তণ্ডধ্যে পার্বত্য এবং সমতল ভূমিও ছিল। এ রিওয়ায়াত সুনানে আবূ দাউদে সাহাবী হযরত

১. রাউযুল উনূফ, ২খ. পৃ. ২৪৬।

২ শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রণীত ইযালাতুল খাফা, ১খ. পৃ. ৩৮।

সাহল ইবন আবূ হাসমা (রা) থেকে মাওসুল এবং তাবিঈ হযরত বাশীর ইবন ইয়াসার (র) থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।[১]

ইমাম তাহাবী বলেন, নবী করীম (সা) খায়বারের সমস্ত জমি বন্টন করেননি, কেবল পার্বত্য ও সমতল ভূমি আর পার্শ্বস্থিত জমিগুলো বন্টন করেন। অবশিষ্ট সমুদয় জমি মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করেন।[২]

প্রশ্ন থাকলো, ঐ আঠার অংশ কিভাবে বন্টন করা হয়। এতে মতপার্থক্য আছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে যে, সাকুল্যে চৌদ্দশত মানুষ যার মধ্যে দু'শত ছিলেন অশ্বারোহী; চৌদ্দটি অংশ চৌদ্দশত মানুষকে দেয়া হয়, কেননা একেকটি অংশ একশত ভাগের ছিল। আর ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ এবং অপরাপর আলিমের নিকট প্রতি ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ পাওয়া যেত বিধায় দু'শত ঘোড়ার জন্য চারটি অংশ দেয়া হয়। এভাবে চৌদ্দ অংশের সাথে চার অংশ মিলে মোট আঠার অংশ হয়ে যায়।

আর সুনানু আবূ দাউদে হযরত মাজমা' ইবন জারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খায়বারে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল পনরশত, যার মধ্যে তিনশত ছিলেন অশ্বারোহী; সুতরাং তিনি প্রতি অশ্বারোহীকে দু'টি অংশ এবং প্রত্যেক পদাতিককে একটি অংশ দেন।[৩]

এ রিওয়ায়াত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতের সমার্থক। তার মতে আরোহী কেবল দু'টি অংশ পায়, একটি আরোহীর এবং একটি ঘোড়ার। যেমনটি হযরত আলী ও হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

কাজেই এ হিসেবে পনেরশতের মধ্যে তিনশত অশ্বারোহীর জন্য ছয়টি অংশ, আর প্রতিটি অংশ ছিল একশত ভাগের, আর বাদবাকী বারশত ব্যক্তির জন্য বারটি অংশ দেয়া হয় এবং বার ও ছয়ে মিলে আঠার পূর্ণ হয়।

প্রশিক্ষকদের জন্য ফায়েদা

ইবন মালিক এই রিওয়ায়াত (অর্থাৎ হযরত মাজমা ইবন জারিয়া-এর হাদীস) প্রসঙ্গে বলেন, সঠিক মত এটাই যে, প্রতি ঘোড়ার জন্য দু'টি অংশ, কেননা এ রিওয়ায়াত অনুযায়ী পদাতিকের সংখ্যা ছিল বারশত, তাদের জন্য বারটি অংশ, প্রতি অংশ একশত লোকের জন্য, আর ঘোড় সওয়ারদের প্রত্যেকের দু'টি অংশ হিসেবে ছয়টি অংশ, প্রতি অংশ একশত ভাগের; কাজেই সব মিলিয়ে আঠার অংশ হয়। আর যারা বলেন, প্রতি অশ্বারোহীর জন্য তিনটি ভাগ ছিল, এটা দুরূহ; কেননা এতে দাঁড়ায় ঘোড় সওয়ারদের জন্য নয়শত এবং বারশত পদাতিকের জন্য বারশত, মোট একুশ শত অংশ (বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত)।

---

১. আবূ দাউদ, ২খ. পৃ. ৪২৫; অধিকন্তু বাযলুল যুহূদ, ৪খ. পৃ. ১৪৫।

২. শারহে মাআনিউল আসার, ২খ. পৃ. ১৪৪।

৩. বাযলুল যুহূদ, ৪খ. পৃ. ১৪৬।

সারকথা : নবী (সা) খায়বারের অর্ধেক সম্পত্তি হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং তাদের ছাড়া আর কাউকে এতে শরীক করেননি। হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, খায়বার বিজয়ের পর নৌ-আরোহী সাহাবিগণ অর্থাৎ হযরত জাফর, হযরত আবূ মূসা আশআরী এবং তাদের সঙ্গী (রা), যাদের সংখ্যা ছিল একশতেরও বেশি, তারা আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসেছিলেন, রাসূল (সা) তাদেরকেও কিছু অংশ দান করেছিলেন।

এটা জানা নেই যে, তাদেরকে তিনি আসল গনীমত থেকে অংশ দিয়ে ছিলেন নাকি গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে অথবা গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে সমষ্টি থেকে দান স্বরূপ কিছু দিয়েছিলেন। এটাও জানা নেই যে, এ অনুদান তিনি কি কেবল নিজ সিদ্ধান্তেই দিয়েছিলেন নাকি মুজাহিদীন ও গনীমত প্রাপকদের অনুমতিক্রমে দিয়েছিলেন। আল্লাহই ভাল জানেন। (শায়খুল ইসলাম দেহলবী কৃত ফাতহুল বারীর শরাহ থেকে)।[১]

খায়বার যুদ্ধে কিছু বালক এবং স্ত্রীলোকও মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সাহায্যের জন্য অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার থেকে প্রাপ্ত সম্পদের মধ্য থেকে অনুদান হিসেবে কিছু দিয়েছিলেন। অবশিষ্ট জমি থেকে পুরুষদের মত তাদেরকে কোন অংশ দেননি। যেমনটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈর বর্ণনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে।[২]

মুহাজিরগণ কর্তৃক আনসারগণের ক্ষেত-খামার ফেরত দান

হিজরতের প্রথম ভাগে যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন মুহাজিরদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আনসারগণ তাদেরকে কিছু জমি ও ক্ষেত-খামার দান করেন যাতে তা থেকে তারা নিজেরাও উপকৃত হন এবং আনসারগণকেও কিছু মুনাফা দিতে পারেন।

খায়বার বিজয়ের পর সম্মানিত মুহাজিরগণ সাহায্য সহায়তা লাভ করে যখন বিত্তবান হয়ে উঠেন, তখন মুহাজিরগণ আনসারদের জমি-যিরাত ও বৃক্ষাদি ফেরত দিয়ে দেন। হযরত আনাস (রা)-এর দাদী উম্মে সুলায়ম (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কয়েকটি গাছ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা) সেগুলো নিজ ধাত্রী উম্মে আয়মান অর্থাৎ হযরত উসামা ইবন যায়দ (রা)-এর দাদীকে ফিরিয়ে দেন।

খায়বর বিজয়ের পর যখন মুহাজিরগণ সব আনসারের বৃক্ষাদি ফিরিয়ে দেন, তখন উম্মে সুলায়ম (রা)-ও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নিজের বৃক্ষগুলো দাবি করেন। এগুলো ছিল সেই বৃক্ষ যা তিনি উম্মে আয়মানকে দিয়ে দিয়েছিলেন। নবী (সা) উম্মে আয়মানকে বললেন, উম্মে সুলায়মের বৃক্ষগুলো ফিরিয়ে দাও। উম্মে আয়মান সেগুলো

১. উমদাতুল কারী, ৭খ. পৃ. ১৪৭; কাসতাল্লানী, ৫খ. পৃ. ২০০, ২০৯।

২ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২০৪।

ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করেন এবং হযরত আনাসের গলায় কাপড় পেঁচিয়ে টানতে থাকেন ও বলতে থাকেন, আল্লাহর কসম, আমি এ বৃক্ষ কখনই ফিরিয়ে দেব না। যেহেতু উম্মে আয়মান নবী (সা)-এর ধাত্রীমাতা এবং তাঁর পিতার দাসী ছিলেন, এ জন্যে তিনি তাকে অসন্তুষ্ট করতে চাচ্ছিলেন না। রাসূল (সা) বললেন, ওহে উম্মে আয়মান, তুমি এ বৃক্ষগুলো ফিরিয়ে দাও এবং এর পরিবর্তে অন্য বৃক্ষ নাও। তিনি এ কথা বলতেই থাকলেন এমনকি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি থেকে একেকটি বৃক্ষের পরিবর্তে দশ দশটি বৃক্ষ মঞ্জুর করলেন, তখন উম্মে আয়মান রাযী হলেন। রাসূল (সা) তার সাথে এমন উত্তম ও সুন্দর ব্যবহারই করতেন।[১]

মাসআলা ও বিধানসমূহ

এ যুদ্ধে হালাল ও হারামের যে বিধানসমূহ নাযিল হয়েছে অথবা যে সব উদ্ভূত মাসআলা এ যুদ্ধের ঘটনা থেকে সম্মানিত ফকীহগণ নির্ধারণ করেছেন, তা সংক্ষেপে এরূপ :

১. নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ

পূর্বেই জানা গেছে যে, খায়বার যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাররম মাসে বের হয়েছিলেন, এতে জানা গেল যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ নয়। আর যে সমস্ত কুরআনের আয়াত এবং হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বুঝা যায়, তা মানসূখ হয়েছে। বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ এবং সূরা তাওবার مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ এ আয়াতের তাফসীর পর্যালোচনা করুন।

২. ভূমি বন্টন

এটা পূর্বেই জানা গেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের সমুদয় ভূমি গনীমত প্রাপকদের মধ্যে বন্টন করেননি, বরং উচ্চ ভূমি, সমতল ভূমি এবং এর পার্শ্বস্থিত জমিগুলোই কেবল মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করেছিলেন এবং উচ্চ, নিচু, ঊষর এবং এর সংলগ্ন জমিগুলো মুসলমানদের সামগ্রিক সমস্যা ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য সংরক্ষিত রাখেন। এতে জানা গেল যে, রাষ্ট্রের শাসক বিজিত ভূমির ব্যাপারে এ অধিকার রাখেন যে, তিনি যা ভাল মনে করবেন, তা করতে পারবেন। ইচ্ছে হলে তা মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারেন, ইচ্ছে হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বন্দোবস্ত দিয়ে দিতে পারেন এবং তাদের উপর কর নির্ধারণ করে দিতে পারেন। আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, সাহিবাইন (ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম আবূ ইউসুফ) এবং সুফিয়ান সাওরীর মত এটাই।

ইমাম শাফিঈর মাযহাব এই যে, অস্থাবর সম্পত্তির মত জমিও মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করা জরুরী। খায়বারের ভূমি বন্টনের ব্যাপারে শাফিঈ মাযহাবের ব্যাখ্যা হল,

---

১. ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৮০; কাসতাল্লানী, ৪খ. পৃ. ৩৫৪।

এর অর্ধেক অংশ কঠোরতার (যুদ্ধের) মাধ্যমে জয় করা হয়েছে আর অর্ধেক অংশ সন্ধির মাধ্যমে। কাজেই যে অর্ধেক যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, তা রাসূল (সা) মুজাহিদ দের মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন, আর যে অংশ সন্ধির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে, সে অংশ বন্টন করেননি। অথচ সমস্ত হাদীস এবং সীরাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সমগ্র খায়বার এলাকাই কঠোর যুদ্ধ, কঠিন সংঘর্ষ ও শক্ত মুকাবিলার পর জয় করা সম্ভব হয়েছে। যখন ইয়াহূদীরা মুকাবিলা করতে অপারগ হয়ে পড়ে, কেবল তখনই দূর্গ থেকে নেমে আসে এবং সব ধরনের অধিকার ও কর্তৃত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নেয় এবং এ কথায় সম্মত হয় যে, জমি এবং বাগানে তাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা শ্রমিকের মত সেখানে কাজ করবে এবং মুসলমানগণ যখন চাইবেন, তাদেরকে ঐ জমি থেকে বের করে দিতে পারবেন। এর ছিল কেবল মজুর, কোন জমি কিংবা গৃহের মালিক ছিল না। আর রাসূলুল্লাহ (সা) লেনদেনের সময় তাদের সাথে প্রকাশ্যে এ শর্ত করেছিলেন যে, যখন ইচ্ছে, তোমাদের থেকে জমি ফেরত নেয়া হবে। সুতরাং এ শর্তের ভিত্তিতে হযরত ফারুকে আযম (রা) তাঁর খিলাফতকালে সমস্ত জমি তাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন এবং তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে বের করে দেন। এতে জানা গেল যে, সমস্ত খায়বারই যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে দখল হয়েছে। যে বুযর্গগণের যেমন ইমাম মালিক এবং অপরাপরের কথায় জানা যায় যে, খায়বারের অর্ধেক অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বাকী অর্ধেক সন্ধির মাধ্যমে অধিকৃত হয়েছে, সেখানে সন্ধির প্রকৃত অর্থ হলো, ইয়াহূদীরা প্রথমে মুকাবিলা ও সংগ্রাম করে কিন্তু পরে যখন যুদ্ধে অক্ষম হয়ে পড়ল, তখন অস্ত্র সমর্পণ করে এবং যুদ্ধ সমাপ্তির আবেদন জানায়। তাদের যুদ্ধ ও মুকাবিলা না করাটাকেই কতিপয় আলিমের ব্যাখ্যায় সন্ধি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। অর্থাৎ অর্ধেক খায়বার যুদ্ধের মাধ্যমে এবং বাকি অর্ধেক বিনাযুদ্ধে বিজিত হয়েছে। এ মাসআলার বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে শাহ ওয়ালীউল্লাহকৃত ইযালাতুল খাফা, আল্লামা জাসসাসকৃত আহকামুল কুরআন এবং ইমাম তাহাবীকৃত শারহে মাআনিউল আসার, الامام بالارض المفتوحة অধ্যায় পর্যালোচনা করুন; অধিকন্তু তাইসীরুল কারী এবং শারহে শায়খুল ইসলামও দেখুন।[১]

৩. খায়বারে নিষেধকৃত বিষয়সমূহ

খায়বারে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকটি বিষয়ে নিষেধ করেন। ১. গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন; ২. গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে তা থেকে বিক্রি করতে নিষেধ করেন; ৩. (মসজিদে গমনকালে) (কাঁচা) রসুন খাওয়া থেকে নিষেধ করেন এবং ৪. ঘোড়ার গোশত খাওয়ার অনুমতি দেন (যাতে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ আছে)। এতদসমুদয়ের বিস্তারিত বর্ণনা যারকানী, ২খ. পৃ. ২৩৩ থেকে ২৩৯-তে দেখুন।

---

১. তাইসীরুল কারী, ৩খ. পৃ. ১৫৮।

৪. মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়া

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারে মু'তআ থেকে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু কুরআনুল করীমের বিভিন্ন আয়াতে মুত'আর নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

১. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اِلاَّ عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ۔[১]

অর্থাৎ কল্যাণ ও মঙ্গল ওতেই নিহিত যে, ঈমানদারগণ তাদের লজ্জাস্থান দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া পুরোপুরি হিফাযত করবে (ক্ষেত্র দু'টি হলো) নিজেদের স্ত্রী এবং শরীয়তসম্মত দাসী; এ দু'টি ক্ষেত্র ছাড়া সহবাস বৈধ নয়। আর যে ব্যক্তি এ দু'টি পন্থা বৈ অপর কোন পন্থা বের করে, সে শরীয়াতের সীমা রক্ষাকারী নয়,। আর প্রকাশ থাকে যে, মুত'আ স্ত্রী শীআদের নিকটও স্ত্রী নয়, দাসীও নয়। কেননা মুত'আর জন্য না সাক্ষ্য আছে, না ঘোষণা; না ব্যয় আছে, না বাসস্থান, আর না আছে তাদের জন্য তালাক, না আছে লিআন ও যিহার; না আছে ইদ্দত, আর না আছে মীরাস।

২. অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَانْكِحُوْا مَاطَابَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

এতে বিবাহের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, চারের অধিক বিবাহের অনুমতি নেই। কিন্তু মুত'আতে না কোন সীমা নির্দিষ্ট করা আছে, আর না আছে কোন নির্ধারিত সংখ্যা।

৩. অধিকন্তু এ কুপ্রথা প্রচলিত থাকলে বিবাহের প্রয়োজন থাকে না। কেননা অধিকাংশ বিবাহকারী প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণার্থে বিবাহ করে থাকে। আর প্রবৃত্তির চাহিদা যদি মুত'আ দ্বারা পূরণই হয়ে যায়, তা হলে বিবাহের প্রয়োজন কোথায় থাকবে ?

মুত'আ হারাম হওয়া

ইসলামের প্রথমদিকে হালাল ও হারামের বিধান ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই মদ্যপান ও সুদ হারাম হওয়ার নির্দেশ নবূয়াত লাভের কমপক্ষে পনের-বিশ বছর পর নাযিল হয়েছে।

অনুরূপভাবে মুত'আর ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ নাযিল হওয়ার পূর্বে জাহিলী যুগের অভ্যেস ও নিয়ম-নীতি অনুসারে মানুষ মুত'আ বিবাহ করত এবং ততদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন প্রকাশ্য ও সরাসরি নির্দেশ নাযিল হয়নি। খায়বর যুদ্ধের

---

১. সূরা মু'মিনূন ঃ ৫-৬।

সময়, যা ছিল নবুয়াতের সপ্তম বর্ষে, প্রথমবারের মত রাসূলুল্লাহ (সা) মুত'আ বিবাহ এবং গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন। যেমনটি হযরত আলী (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)।

অতঃপর অষ্টম হিজরীর শেষভাগে আওতাসের ঘটনা সংঘটিত হয়, এ সময় মাত্র তিনদিনের জন্য মুত'আর অনুমতি দেয়া হয়। আর অনুমতি এ জন্যে দেয়া হয় যে, যারা পূর্বের প্রথা অনুযায়ী মুত'আ করেছিল এবং খায়বারে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে যাদের জানা ছিল না, আর এ না জানার কারণে যারা মুত'আ করে ফেলেছিল, তাদেরকে ধর্তব্যে আনা হয়নি। কিন্তু এরপরে যখন নবী (সা) উমরা করার উদ্দেশে মক্কা মুয়াযযমা আগমন করলেন, তখন কাবাঘরের উভয় চৌকাঠ হাতে ধরে বললেন, মুত'আ কিয়ামত পর্যন্ত সব সময়ের জন্য হারাম করা হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর যেহেতু হাজার হাজার লোক ইসলামে শামিল হলেন, যাদের (অনেকের) মুত'আ হারাম হওয়া সম্পর্কে জানা ছিল না, সেহেতু না জানার কারণে পূর্বকালীন অর্থাৎ জাহিলী যুগের প্রথা অনুসারে ঐ নও-মুসলিমদের কেউ কেউ অজ্ঞতার কারণে আওতাসে মুত'আ করে। মহানবী (সা) যখন তা জানতে পারেন, তখন কাবার দরজায় দাঁড়িয়ে চিরকালের জন্য মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা দেন।[১]

আবার মহানবী (সা) তাবূক যুদ্ধের সময় কিছু স্ত্রীলোককে মুসলমানদের তাঁবুর কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করেন, এ মহিলারা কারা ? বলা হল, এ স্ত্রীলোকদেরকে কেউ কেউ মুত'আ করেছে (ঐ সময়ে[২] করেছে নাকি পূর্বে, তা জানা যায়নি)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) খুবই অসন্তুষ্ট হলেন, ক্রোধে তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। তিনি খুতবা দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং এর পর মুত'আ করা থেকে নিষেধ করলেন। সাহাবিগণ বলেন, এর পর আমরা আর কখনো মুত'আ করিনি এবং সকল সময়ের জন্য এ অঙ্গীকার করলাম যে, কখনো মুত'আ করব না। (যেমনটি ইমাম হাযিমীকৃত কিতাবুল ই'তিবার,[৩] পৃ. ১৭০-এ বর্ণিত হয়েছে)।

১. بيـن القوسيـن এ ইবারত ফাতহুল বারী থেকে নেয়া হয়েছে।

২. حرم الله المتعة الى يوم القيامة (বুখারী)।

৩. ইমাম হাযিমী হাদীসটি বর্ণনা করেন। তার সনদ ছিল :

عن جابر بن عبد الله الانصارى يقول خرجنا رسول ﷺ الى غزوة تبوك حتى اذا كنا عند العقبة مما بلى الشام حيـن نسوة فذكرنا تـمتعنا وهن يحلبـن غى رحالنا او قال بطفن فى رحالنا فجاءنا رسول الله ﷺ فنظر اليهن فقامن هؤلاء النسوة فقلنا يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه وتغير لونه اشتد غضبه وقام فينا فحمد الله واثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتواو عنا يومئذ الرجال ولم نعد ولا نعودلها ابداه ・

আর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভীষণ অসন্তুষ্ট হওয়া, ক্রোধে চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করা এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, মুত'আর নিষিদ্ধ করা এবং এর বিরোধিতা তিনি প্রথম থেকেই করে আসছিলেন। বরং দু'বার এর হারাম হওয়া সম্পর্কে (মানুষকে) অবহিত করেছিলেন। প্রথমবার খায়বারে এবং দ্বিতীয়বার আওতাস যুদ্ধের সময়। আর দু' দফা নিষেধ করার পরও যখন এ ঘটনা প্রকাশ পেল (যদিও তা না জানা এবং অজ্ঞতার কারণে ছিল) মহানবী (সা)-এর নিকট তা খুবই অপসন্দনীয় হলো এবং এমনকি ক্রোধে তাঁর চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। ফলে তৃতীয়বারের মত তিনি এটা হারাম ঘোষণা করে খুতবা দিলেন। আর তৃতীয়বার তা হারাম করে তাকিদ ঘোষণা করলেন। এর পর আবার বিদায় হজ্জে মুত'আ হারাম হওয়ার সাধারণ ঘোষণা দেন যাতে বিশেষ এবং সাধারণ সবাই এটা হারাম হওয়ার সংবাদ জেনে যায়।

কোন কোন বর্ণনাকারী বলেন, মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা বার বার দেয়ার ফলে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, মুতআ দু' অথবা তিনবার হালাল করা হয় এবং দু' অথবা তিনবার হারাম করা হয়। অথচ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয়বার ঘোষণা কোন নতুনভাবে হারাম করা ছিল না, বরং তা পূর্বতন নিষেধই স্মরণ করানো ও তাকিদ দেয়ার জন্য ছিল। এরপর হযরত উমর ফারুক (রা)-এর খিলাফতকালে অজ্ঞতার কারণে যাদের কাছে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌঁছেনি এবং ঐ কর্ম করে বসেছে, হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনিও খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন ও মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিলেন, যাতে এটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ বাকী না থাকে। আর বললেন, আমার এঘোষণার পর যদি কেউ মুত'আ করে, তবে তার প্রতি আমি ব্যভিচারের শাস্তি আরোপ করব। এর পর থেকে মুত'আ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, আর এর উপরই সমস্ত সাহাবী একমত হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ, যারা অজ্ঞতার কারণে মুত'আর প্রবক্তা ছিলেন, তাঁরা যখন মুত'আ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অবহিত হলেন, তখন নিজ বক্তব্য থেকে ফিরে আসলেন। যেমনটি আবূ বকর জাসসাস তাঁর আহকামুল কুরআনে (২খ. পৃ. ১৪৭) অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করেছেন। সম্মানিত বিজ্ঞগণ, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً -এর তাফসীরে বিস্তারিত দেখে নিন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর জন্ম হয়েছে হিজরতের এক অথবা দু' বছর পূর্বে এবং আট অথবা নয় বছর বয়স পর্যন্ত পিতামাতার সাথে মক্কা মুয়াযযমায় অবস্থান করেন। মক্কা বিজয়ের পর অষ্টম হিজরীতে যখন হযরত আব্বাস (রা) সপরিবারে হিজরত করেন, তখন হযরত ইবন আব্বাস (রা)-ও তাঁর সম্মানিত পিতার সাথে মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিত হন। খায়বর যুদ্ধ (যাতে মুত'আ হারাম ঘোষিত হয়েছিল) সংঘটিত হয়েছিল হযরত ইবন আব্বাসের মদীনা আগমনের পূর্বে। আর এ সময়ের মধ্যে মুত'আর কোন ঘটনা সামনে আসেনি। এ জন্যে হযরত ইবন আব্বাস

(রা) স্বয়ং মুত'আ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কেবল অপর এক সাহাবীর মুখে শোনেন এবং তারই ভিত্তিতে ফাতওয়া দেন যে, নিরুপায় অবস্থায় যেমন মৃত জন্তু এবং শূকর নামেমাত্র বৈধ (মুবাহ) হয়, অনুরূপভাবে নিরুপায় অবস্থায় মুত'আ-ও বৈধ। কিন্তু পরে যখন হযরত আলী (রা) এবং অপরাপর সাহাবীগণ কিয়ামত পর্যন্ত মুত'আর হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি হযরত ইবন আব্বাস (রা)-কে অবহিত করেন, তখন ইবন আব্বাস (রা) নিজ ফাতওয়া থেকে ফিরে আসেন। হযরত আলী (রা) থেকে মুত'আ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে. কিন্তু সম্মানিত শী'আগণ মুত'আর ব্যাপারে এতই আসক্ত যে, হযরত আলীর কথাও শোনেন না।

قال الامام ابو جعفر الطحاوى كل هؤلاء الذين رووا عن النبى ﷺ اطلافها اخبروا انها كانت فى سفرو ان النهى لحقها فى ذلك السفر بعد ذلك فمنع منها وليس احد منهم يخبر انها كانت فى حضور كذلك روى عن ابن مسعود رضى الله عنه ·

"ইমাম তাহাবী বলেন, যত লোকেই মুত'আর অনুমতি ও অবকাশের কথা বলেন, সবাই ঐকমত্যভাবে এ কথাই বলেছেন যে, এ সাময়িক অবকাশ কেবল সফর অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, অতঃপর এ কথাও বলেছেন যে, সে সফরেই এ অবকাশকে অর্থাৎ স্বল্পতম সময়ের ব্যবধানে মুত'আ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। আর এমন একজন বর্ণনাকারীও নেই, যিনি বলেছেন মুত'আর ঘটনা গৃহে অবস্থানকালে সংঘটিত হয়েছে। এমনটিই হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।" (তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ. পৃ. ১৩১)।

অনুরূপভাবে ইমাম হাযিমী (র) বলেন :

وانما كان ذلك فى اسفارهم ولم يبلغا ان النبى ﷺ اباحة لهم وهم فى بيوتهم ·

"মুত'আর অনুমতির যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে সফর অবস্থায় হয়েছে। আর আমাদের কাছে এমন কোন একজন বর্ণনাকারী থেকেও এ সংবাদ আসেনি যে, দেশে এবং গৃহে থাকা অবস্থায়ও রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে এ অনুমতি দিয়েছেন। অর্থাৎ এমনটি কখনই হয়নি যে, দেশে থেকে কেউ মুত'আ করেছেন।" (কিতাবুল ইতিবার, পৃ. ১৭৮)।

ইসলামের শুরুতে কি ধরনের মুত'আ অনুমোদিত ছিল

জানা দরকার যে, মুতআ শব্দের উৎপত্তি متاع থেকে, যার অর্থ সামান্য মুনাফা। যেমন আল্লাহর বাণী : اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الاَّ مَتَاعٌ আর রূপক অর্থে, যে কাপড়কে জোড়া দেয়া হয়, তাকেও মাতা' এ জন্যে বলে যে, জোড়াবিহীন পূর্বাবস্থায় এর

কল্যাণকারিতা অল্পই থাকে; তা বৃদ্ধির জন্য জোড়া। যেমন আল্লাহ্ বলেন : فَمَتِّعُوْهُنَّ আল্লাহ। বলেন : وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ এটাই মুত'আর প্রকৃত অর্থ।

মুত'আর প্রয়োগ দু' অর্থে হয়ে থাকে। একটি এই যে, মুত'আ অর্থ খন্ডকালীন বিবাহ, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীদের সামনে কোন মহিলার সাথে স্ত্রীত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হলে তালাক ছাড়াই পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়া। কিন্তু বিচ্ছেদের পর গর্ভাশয়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য একাধারে একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করা, যাতে তা অপর ব্যক্তির বীর্যের সাথে একীভূত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকে। কেবল এ অবস্থাটি ইসলামের প্রথম যুগে বৈধ ছিল, পরবর্তীতে চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে যায়। অর্থাৎ মুত'আ অর্থ খন্ডকালীন বিবাহ যা বিভিন্ন কারণে ইসলামের প্রথম অবস্থায় বৈধ থাকলেও পরবর্তীতে তা চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যায়।

আর মুত'আর দ্বিতীয় অর্থ হলো, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বলল, আমি একদিনের জন্য তোমার থেকে লাভবান হব এবং এই একদিন কিংবা দুইদিনের বাসনা চরিতার্থের জন্য তোমাকে এ মূল্য দেব; তা হলে এটা সরাসরি ব্যভিচার বা ব্যভিচারের অনুরূপ। মুত'আর এ ধরন কখনই ইসলামে জায়েয কিংবা বৈধ হয়নি যে, তা বাতিল করা হবে। বরং মুত'আর এ ধরন কোন দিনই হালাল হয়নি; কেননা মুত'আর এ ধরন সরাসরি যিনা বা ব্যভিচার আর ব্যভিচার কোনদিন কোন ধর্মেই বৈধ ছিল না।

অবশ্য মুত'আর প্রথম ধরন অর্থাৎ খন্ডকালীন বিবাহ (অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অভিভাবকের অনুমতিক্রমে সম্পর্ক স্থির করা এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করা), এটা একটা দোদুল্যমান বা মধ্যবর্তী অবস্থা অর্থাৎ এটা খন্ডকালীন বিবাহ, প্রকৃত বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যবর্তী একটি অবস্থা, যা কেবল ব্যভিচারও নয় আর প্রকৃত বিবাহও নয়, যাতে তালাক, ইদ্দত ও মীরাস থাকে। মুত'আ বিবাহের এ ধরন প্রকৃত বিবাহ নয়, বরং প্রকৃত বিবাহের সাথে কেবল দৃশ্যত তুলনীয় যে, মুত'আর এ ধরনে সাক্ষী এবং অভিভাবকের অনুমতিও প্রয়োজন হয় এবং এক পুরুষ থেকে পৃথক হওয়ার পর যদি অপর পুরুষের সাথে মুত'আ করতে চায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত একবার ঋতুস্রাব না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অপর পুরুষের সাথে মুত'আ করতে পারবে না। এ জন্যে এ অবস্থাকে ব্যভিচারও বলা যায় না, এ খন্ডকালীন বিবাহে (প্রথমে যাতে সাক্ষী এবং অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যিক এবং শেষে গর্ভাশয় পরিচ্ছন্ন করার জন্য ঋতুস্রাব হওয়া প্রয়োজন) প্রকৃত বিবাহের সাথে কেবল সময় নির্ধারণ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হওয়ার পার্থক্য বিদ্যমান, অপরাপর শর্তাবলীতে উভয়টি একইরূপ।

روى الليث بن سعد عن بكير بن الاشجع عن عمار مولى الشريد قال سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هى ام نكاح قال لاسفاح ولانكاح قلت فما هى قال المتعة كما قال تعالى قلت هل عليها عدة قال نعم حيضة قلت يتوارثان قال لا ٠

"ইমাম লায়স ইবন সা'দ বুকায়র ইবনুল আশাজ্জ থেকে বর্ণনা করেন, শারীদের মুক্তদাস আম্মার বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে মুত'আ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি, মুত'আ কি ব্যভিচার, নাকি বিবাহ ? তিনি বললেন, মুত'আ যিনাও নয় বিয়েও নয়। আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে এটা কি ? তিনি বললেন, এটা মুত'আ, যেমন আল্লাহ তা'আলা এতে মুত'আ শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মুত'আকারী স্ত্রীলোকের কি ইদ্দত আছে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মুত'আর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর তার উপর এক ঋতুস্রাব পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। আমি প্রশ্ন করলাম, তারা কি একে অপরের উত্তরাধিকারী হবে ? তিনি বললেন, না।" এ বাক্যাবলী দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মুত'আ বিবাহ অর্থ খন্ডকালীন, যা এক ঝুলন্ত অবস্থা; অর্থাৎ প্রকৃত বিবাহ এবং ব্যভিচারের মধ্যবর্তী অবস্থা।

ইসলামের প্রথম যুগে কেবল এ ধরনের মুত'আ এমন নিরুপায় অবস্থায় জায়েয ছিল, যেমন নিরুপায় অবস্থায় মৃত জন্তু এবং শূকর হালাল হয়ে যায়। এরপর ইমাম কুরতুবী বলেন :

قال ابو عمر لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح الى اجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق وقال ابن عطية وكانت المتعة ان يتزوج الرجل بشاهدين واذن الولى الى اجل مسمى وعلى الا ميراث بينهما ويعطيها ما الفقا عليه فاذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرى رحمها لا الولد لاحق فيه بملاشك فان لم تحمل حلت يغره فى كتاب المخاس فى هذا خطاء وان الولد لايلحق فى نكاح المتعة (قلت) هذا هو المفهوم من عبارة النحاس فانه فقال انما المتعة يقول لها اتزوجك يوما او شبه ذلك على انه لا عدة عليك ولاميراث بيننا ولاطلاق ولاشاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولم يبع قط فى الاسلام - ولذا قال عمر لا اوتى برجل تزوج متعة الا غيبة تحت الحجارة - (তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ. পৃ. ১৩২)[১]

---

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৫খ., পৃ. ১৩২।

সারকথা

এ হাদীসে নববীসমূহে যে মুত'আ বিবাহের অনুমতি দান ও পরে তা নিষিদ্ধ করার উল্লেখ আছে, তদ্বারা এ প্রতীকী মুত'আ কক্ষণো বুঝানো হয়নি সম্মানিত শী'আগণ যার প্রবক্তা, বরং এর দ্বারা ঐ খন্ডকালীন বুঝানো হয়েছে, যে বিবাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে অভিভাবকের সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে তালাক ছাড়াই বিচ্ছেদ ঘটে; অতঃপর ঐ স্ত্রীলোক এক ঋতুস্রাব না হওয়া পর্যন্ত অপর কোন পুরুষের সাথে মুত'আ করতে পারে না। কেবল এই ধরনটি ইসলামের প্রাথমিক কালে অর্থগতভাবে জায়েয এবং মুবাহ ছিল, যে শরীয়াতে ঐ পর্যন্ত এ বিশেষ ধরনটির নিষিদ্ধ বা হারাম হওয়ার কোন হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। যেমন শারাব ও সুদ ইসলামের প্রথম যুগে মুবাহ ও হালাল হওয়ার অর্থ এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহর পক্ষ থেকে শারাব ও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি। আর যে সমস্ত লোক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে শারাব পান করেছে অথবা সুদ গ্রহণ করেছে, শরীআতের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি আরোপ করা হয়নি আর তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া হয়নি। এমনকি যে পর্যন্ত না শারাব ও সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধান অবতীর্ণ হলো।

ইসলামের প্রথম যুগে শারাব ও সুদ হালাল হওয়ার এ অর্থ ছিল না যে, (আল্লাহ্ মাফ করুন) শরীয়াতের পক্ষ থেকে এ অনুমতি ছিল, যার ইচ্ছে হয়, শারাব পান করুক এবং যার ইচ্ছে হয়, সুদ গ্রহণ করুক। অনুরূপভাবে মুত'আ খন্ডকালীন বিবাহ অর্থে ইসলামের প্রথম যুগে মুবাহ ও বৈধ হওয়ার অর্থ এই যে, ইসলামের প্রথম যুগে খন্ডকালীন বিবাহ অর্থে মুত'আ বিবাহ নিষেধকৃত ছিল না; (আল্লাহ্ মাফ করুন) এ অর্থ ছিল না যে, মহানবী (সা) বাণী দ্বারা মুত'আ বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন। মুত'আ বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার প্রথম ঘোষণা খায়বার যুদ্ধে প্রদান করা হয়, এর পর আওতাস যুদ্ধের সময়, অতঃপর তাবূক যুদ্ধের সময় আর এরও পর বিদায় হজ্জের সময়, যাতে করে সাধারণ ও বিশেষ সব ধরনের মানুষের এ ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জিত হয়। আর মহানবী (সা) কর্তৃক মুত'আ হারাম হওয়ার ব্যাপারে বার বার ঘোষণা ছিল গুরুত্ব দানের জন্য প্রথম ঘোষণার পুনরুক্তি, যা তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় ঘোষণা দিয়েছিলেন; এটা কোন নতুন ঘোষণা ছিল না। শী'আদের অনুসৃত আরেকটি মুত'আ হলো, পুরুষ মহিলাকে একদিন বা দু'দিন, এক ঘন্টা বা দু'ঘন্টা সময়ের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে উপভোগ করে। এটা নির্ভেজাল যিনা এবং প্রকাশ্য অপকর্ম; এ ধরনের ব্যবস্থা কোন দিন ইসলামে জায়েয বা মুবাহ ছিলই না যে, পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে। যেমন ব্যভিচার না কখনো বৈধ ছিল, আর না তা রহিত করা হয়েছে।

বরং সৃষ্টির আদি থেকে শুরু করে এযাবতকাল পর্যন্ত কেবল শী'আ মাযহাব ছাড়া আর কোন ধর্ম বা মাযহাবেই মুত'আ জায়েয ছিল না, আল্লাহ ক্ষমা করুন, শী'আ অনুসৃত মুত'আ যদি জায়েয হয় তবে বংশধারা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সন্তানও ধ্বংস হবে, উত্তরাধিকার ও উত্তরাধিকারী বিবেচিত হবে না, আর এও বুঝা যাবে না যে, কে পুত্র আর কে ভাই। অধিকন্তু মীরাস, তালাক ও ইদ্দতের যে বিধান শরীয়াতে এসেছে, এর সবই বাতিল হয়ে যাবে। আর বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়াত যে চারজন স্ত্রীর সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাও বাতিল হয়ে যাবে। এ জন্যে যে, মুত'আয় না চারের সীমা নির্ধারিত আছে, না আছে ইদ্দত, না আছে তালাক, আর না আছে উত্তরাধিকার। একমাত্র মুত'আর প্রবক্তা হওয়ার দরুন শরীয়াতের এ সমুদয় আদেশ একচোটেই বাতিল হয়ে যাবে। বরং বিবাহেরও প্রয়োজন থাকবে না। পুরুষ মুত'আর মাধ্যমে তার প্রয়োজন সেরে নেবে আর স্ত্রীলোক তার রুটি-রুযী এবং দুঃখ-ব্যথার স্বতন্ত্র একজন অভিভাবকের অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। আর চলাফেরায় সে অনিশ্চিত পথের পথিক হিসেবে দৃষ্টিগোচর হবে। অতঃপর যৌবন চলে যাওয়ার পর কে তার অভিভাবক ও যিম্মাদার হবে ? সম্মানিত শী'আগণ, চিন্তা করে দেখুন যে, এরচেয়ে বেশি কোন অপদস্থতা ও বিপদ দেখা যায় কি ? শী'আদের উচিত মনে-প্রাণে হযরত ফারুকে আযম (রা)-এর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, যিনি নিজ খিলাফতকালে এহেন বেহায়াপনার নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়েছেন।

মুত'আ হারাম হওয়ার বিস্তারিত প্রমাণাদি এবং এর থেকে উদ্ভূত বিড়ম্বনা সম্পর্কে জানতে চাইলে সম্মানিত ইলম অনুসন্ধানীগণ আল্লামা আবূ বকর আল-জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, ২খ. পৃ. ৪৬ থেকে ১১৫ এবং তুহফায়ে ইসনা আশারিয়্যা ও ফাতাওয়ায়ে আযীযিয়া অধ্যয়ন করুন। মহান পবিত্র আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ এবং তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ ও মননশীল।

মুত'আ হারাম হওয়ার একটি বিজ্ঞোচিত প্রমাণ

প্রতিটি সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিই নিজের, আপন কন্যা ও বোনের বিবাহের ঘোষণাকে গৌরবজনক মনে করেন এবং সর্বোচ্চ আনন্দ উল্লাসের সাথে বিবাহের ওলীমায় আপন নিকটজন ও বন্ধুদের দাওয়াত করে থাকেন। কিন্তু মুত'আ এর বিপরীত, একে বরং গোপন রাখার চেষ্টা করেন এবং আপন কন্যা, ভগ্নি ও মাতার প্রতি মুত'আর সপর্কে সম্পর্কিতকরণে লজ্জা অনুভব করেন। আজ পর্যন্ত কোন ন্যূনতম আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, বরং এমন কোন আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তির বেলায়ও এমনটি শোনা যায়নি যে, সে কোন মজলিসে গর্বভরে অথবা কথা প্রসঙ্গে বলেছে যে, আমার কন্যা অথবা ভগ্নি কিংবা মা এতটা মুত'আ করেছে। অধিকন্তু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিই বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীকে এবং তাদের পিতামাতাকে মুবারকবাদ দেন; কিন্তু মুত'আর ব্যাপারে কাউকে কখনো মুবারকবাদ দিতে শোনা যায়নি।

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের প্রত্যাবর্তন

যে সমস্ত মুহাজির মক্কা থেকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে গিয়েছিলেন, যখন তারা জানতে পেলেন যে, মহানবী (সা) মক্কা মুয়াযযমা থেকে হিজরত করে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়েছেন, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় চলে আসেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) ঐ সময় মদীনায় উপস্থিত হন যখন নবী (সা) বদর যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন।[১]

হযরত জাফর (রা) এবং তার সাথে যে মুষ্টিমেয় মানুষ থেকে গিয়েছিলেন, তারা ঐ দিন পৌঁছেন যেদিন খায়বার বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল। মহানবী (সা) হযরত জাফরের সাথে আলিঙ্গন করেন এবং কপালে চুম্বন করেন। এর পর বলেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি না যে, খায়বার বিজয়ে আমি বেশি আনন্দিত হয়েছি নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তনে। [বায়হাকী কর্তৃক হযরত জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত]

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা), (যিনি হযরত জাফরের সাথে এসেছিলেন) বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে ঐ সময় উপস্থিত হই যখন তিনি খায়বার জয় সম্পন্ন করেছিলেন। মালে গনীমত থেকে তিনি আমাদেরকেও অংশ দেন; আমরা ছাড়া খায়বার বিজয়ে অংশগ্রহণ করেনি এমন আর কাউকে তিনি অংশ দেননি।

এটা বুখারীর বর্ণনা, বায়হাকীর বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুসলমানদেরকে বলে এদেরকে গনীমতের মালে শরীক করেন।[২]

ওয়াদিউল কুরা ও তায়মা বিজয়

খায়বার বিজয়ের পর তিনি ওয়াদিউল কুরার প্রতি মনোনিবেশ করেন। চারদিন অবরোধ করে রাখার পর জয় করে নেন। নবীজির দাস মিদআম উটের পিঠ থেকে তাঁর মালামাল নামাচ্ছিলেন, অদৃশ্য একটি তীর এসে তাকে বিদ্ধ করে এবং তিনি শহীদ হন। লোকে বলল, এর শাহাদত কল্যাণকর হোক। তিনি বললেন, না, আল্লাহর কসম, যে চাদর সে গনীমতের মাল থেকে চুরি করেছে, তা আগুনে পরিণত হয়ে তাকে জ্বালাবে। জনৈক ব্যক্তি যখন তাঁকে এ কথা বলতে শুনল, তখন সে একটি জুতার ফিতা নিয়ে এলো। তিনি বললেন, জুতার একটি ফিতাও (যা আত্মসাৎ করা হয়েছে) জাহান্নামের অন্তর্ভুক্ত (বুখারী)।

তায়মাবাসী যখন ওয়াদিউল কুরা জয়ের খবর পেল, তখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে জিযয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে নিল।[৩]

---

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ১৪৫।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৪৬।

৩. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৪৭; ফাতহুল বারী, ৫খ. পৃ. ১৭।

প্রত্যাবর্তন ও তা'রীস রজনীর ঘটনা

ওয়াদিউল কুরা এবং তায়মা জয়ের পর তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছে রাত্রির শেষভাগে এক উপত্যকায় বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি করেন। ঘটনাক্রমে কারো নিদ্রা ছোটেনি, এমনকি সূর্য উপরে উঠে গেছে। সর্বপ্রথম হযরত রাসূল (সা) জেগে উঠেন এবং তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন ও সাহাবিগণকে জাগিয়ে দেন। আর তিনি ঐ উপত্যকা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন যে, এখানে শয়তান আছে। ঐ উপত্যকা পেরিয়ে তিনি অবতরণের আদেশ করেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। উযূ করে ফজরের দু'রাকাত সুন্নত আদায় করেন। এর পর হযরত বিলাল ইকামত বলেন এবং জামাআতের সাথে ফজরের নামায কাযা আদায় করা হয়। [মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে]।

ফায়দাসমূহ

১. নামায এবং ইবাদতে হযরত নবী (আ)-গণের (তাঁদের প্রতি আল্লাহর সহস্র সহস্র শান্তি বর্ষিত হোক) আলস্যের কারণে কখনো ভুল হয় না; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত করা হয় যাতে উম্মত ভুলের মাসআলা সম্পর্কে জানতে পারে। কাজেই যদি তাঁর থেকে এ ভুল ঘটে না যেত, তাহলে ছুটে যাওয়া নামাযের কাযা আদায় সম্পর্কে উম্মত কি করে জানতে পেত ? আবার যদি তিনি যোহর অথবা আসরের নামাযের দু' অথবা তিন রাকাআতে সালাম না ফিরাতেন (যুল-ইয়াদাইনের হাদীসে যেমনটি রয়েছে) তাহলে সাহু সিজদার মাসআলা উম্মত কি করে জানতে পেত ?

সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর কতই না কৌশল আর কতই না অনুগ্রহ, যে হযরতগণকে নবূয়াত ও রিসালাতের রাজ-মুকুট পরিয়ে আল্লাহর আদেশের ব্যাখ্যাকারের মসনদে আসীন করেছেন, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিকেও আহকামে শরীয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। হযরত আদম (আ)-এর যদি ভুল-ভ্রান্তি না হতো, তা হলে তাওবা ইসতিগফারের সুন্নত কোত্থেকে জানা যেত। رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ। (সূরা আ'রাফ : ২৩) বলে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ এবং ইবলীসের অপমান ও অপদস্থ করার পদ্ধতি বলে দেয়া হয়েছে। সত্যিই এগুলো ব্যতিক্রমধর্মী ভুল-ভ্রান্তি, যদ্বারা সব সময়ের জন্য রহমতের দরজা উন্মুক্ত হয়েছে।

সম্মানিত আরিফগণের বাক্যাবলীর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর এ উক্তিটি উদ্ধৃত করা যায় : يا ليتنى كنت سهو محمد ﷺ "আহা, আমি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভুলের কারণ হতাম!"

হযরত নবী (আ)-গণের ভুল-ভ্রান্তি কোন্ পর্যায়ের কল্যাণ ও বরকতময় এবং আল্লাহর দরবারে কোন্ স্তরে গ্রহণযোগ্য হয়, খুব সম্ভব তা বুঝেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) এ কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত।

২. এ হাদীস থেকেই এ মাসআলা জানা গেল যে, যে স্থানে ইবাদতে ভ্রান্তি ও আলস্য এসে পড়ে, সে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র সরে পড়া মুস্তাহাব। দৃশ্যত এ স্থানান্তর বড় হিজরতের নমুনা হিসেবে অনুমিত হয়, কাজিই একে যদি ছোট হিজরত নামকরণ করা হয়, তবে সম্ভবত তা অন্যায় হবে না। যে স্থানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং যে স্থানের পাপের বাজার গরম হয়ে যায়, এরূপ স্থান ত্যাগ করে যেখানে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত-বন্দেগী করা সহজ, এমন স্থানে গিয়ে বাস করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব। আর একেই বড় হিজরত নামে নামকরণ করা হয়েছে।

আর যে স্থানে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে আলস্য এসে পড়ে, এমন স্থান ত্যাগ করে নিকটবর্তী অপর কোন স্থানে গিয়ে ইবাদত করা মুস্তাহাব; একেই আমরা ছোট হিজরত নামে আখ্যায়িত করেছি।

'যখন তোমার কাছে কোন মনযিল অনুপযোগী হয়, তবে সেখান থেকে সরে পড়।' হিজরতের অবশিষ্ট হুকুম-আহকাম বিস্তারিতভাবে ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে জানা যাবে।

হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর সাথে বাসর উদ্‌যাপন

এ বছরেই হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) আবিসিনিয়া থেকে মদীনায় আগমন করেন, যাকে নবী (সা) নাজ্জাশীর মাধ্যমে বিবাহ করেছিলেন। যাকে বিবাহ করার বিস্তারিত বর্ণনা ইনশা আল্লাহ পবিত্র সহধর্মিণিগণের বর্ণনায় আসবে।

উমরাতুল কাযা (সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাস)

হুদায়বিয়ার সন্ধিতে কুরায়শের সাথে এ চুক্তি হয়েছিল যে, এ বছর উমরা না করেই (মুসলমানগণ) প্রত্যাবর্তন করবেন এবং আগামী বছর উমরা করতে আসবেন এবং উমরা সমাপ্ত করে তিনদিনের মধ্যে ফিরে যাবেন। এর ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখে সাহাবীগণকে আদেশ দেন, পূর্ববর্তী বছরের উমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে, যা থেকে মুশরিকগণ হুদায়বিয়াতে বাধা দিয়েছিল। আরো নির্দেশ দেন যে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের কেউ যেন থেকে না যায়। কাজেই তাদের মধ্যে কেবল যারা ইতোমধ্যে শাহাদতবরণ করেছিলেন কিংবা ইনতিকাল করেছিলেন তারা ছাড়া আর কেউই অংশগ্রহণ করা

থেকে বিরত থাকলেন না। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮৭; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫৪)।

এভাবে দু'হাজার মানুষের জামাআতের সাথে তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে ছিল কুরবানীর সত্তরটি উট। যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে তিনি এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইহরাম বাঁধলেন এবং লাব্বায়েক ধ্বনিসহ সামনে অগ্রসর হলেন। সতর্কতামূলকভাবে অস্ত্র সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এ শর্ত ছিল যে, অস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারবেন না, সেহেতু তারা মক্কা থেকে আট মাইলের দূরত্বে অবস্থিত বাতনে ইয়াহুজ নামক স্থানে অস্ত্রশস্ত্র খুলে রাখলেন এবং সেগুলোর হিফাযতের জন্য দু'শো লোকের একটি দল মোতায়েন রাখলেন। আর তিনি সাহাবিগণসহ তালবিয়া পাঠ করতে করতে হেরেমের দিকে অগ্রসর হলেন। (তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২খ. পৃ. ৮৭)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) নবীজির উট কাসওয়ার নাক-রশি ধরে এই রাজায পাঠ করতে করতে সবার সামনে চলছিলেন :

خلوا بنى الكفار عن سبيله * قد انزل الرحمن فى تنزيله

بان خير القتل فى سبيله * نحن قتلناكم على تاويله

كما قتلناكم على تنزيله

"ওহে কাফিরগণ, তাঁর পথ ছেড়ে দাও, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে এ আদেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, উত্তম যুদ্ধ তাই যা আল্লাহর পথে হয়, আমরা তোমাদের

---

১. قال ابن اسحاق خرج النبى ﷺ فى ذى القعدة شد الشهر الذى صدفيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التى صده عنها - وقال الحاكم فى الاكليل تواترت الاخبار انه ﷺ هل ذو القعدة امر اصحابه ان يعتمروا اقضاء عمرتهم وان لايختلف احد منهم شهد الحديبية فخرجوا الا من استشهد وخرج معه اخرون معتمرين فكانت عدتهم الفين سوى النساء والصبيان قال وتسمى ايضا عمرة الصلح ·

হাকীম তাঁর ইকলীলে বলেন, মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যিলকদ মাসের চাঁদ দেখে ঐ উমরার কাযা আদায় করতে আদেশ করেন যা হুদায়বিয়ায় কুরায়শদের বাধার কারণে আদায় করতে পারেন নি। এবং তাগিদ দেন যে, যারা হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে কেউ যেন থেকে না যায়। কাজেই যারা এ সময়ের মধ্যে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, তারা ছাড়া সবাই কাযা উমরা আদায়ের জন্য তাঁর সাথে রওয়ানা হন। এরা ছাড়া আরো কিছু লোক তাঁর সাথে উমরার নিয়্যতে রওয়ানা হন, শিশু এবং স্ত্রীলোক ছাড়া যাদের সমষ্টি ছিল দু'হাজার। এ উমরাকে 'উমরাতুস-সুলহ'-ও বলা হয়। অধিকন্তু এ রিওয়ায়াত দ্বারা এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হলো যে, কোন কারণে যদি উমরা ও হজ্জ করা সম্ভব না হয়, তবে পরবর্তী বছর এর কাযা আদায় করা ওয়াজিব। এটাই ইমাম আযম আবূ হানীফারও মত। বিস্তারিতের জন্য ফিকহের কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে। ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩।

সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছি তাঁর আদেশ[১] না মানার কারণে, যেমন কুরআন পাক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এটা না মানার কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছি।" [হযরত আনাস (রা) সূত্রে আবদুর রাযযাক এটি বর্ণনা করেছেন]।

আর বায়হাকীর রিওয়ায়াতে এর পর অতিরিক্ত আছে :

اليوم نضربكم على تنزيله * ضربا يزيل الهام من مقيله

ويذهل الخليل عن خليله * يارب انى مؤمن بقيله

"আজ আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে এমন মার দেব যে, তোমাদের মাথা থেকে খুলি আলাদা হয়ে যাবে এবং বন্ধু তার বন্ধু সম্বন্ধে বেখবর হয়ে পড়বে। হে আল্লাহ, আমি এ বক্তব্যে বিশ্বাস রাখি।"

আর ইবন ইসহাকের বর্ণনায় আছে :

يارب انى مؤمن بقيله * انى رأيت الحق فى قبوله

"আয় আল্লাহ, আমি এটি গ্রহণ করাকেই যথার্থ মনে করি।"

হযরত উমর (রা) বললেন, ওহে ইবন রাওয়াহা, তুমি আল্লাহর রাসূলের সামনে এবং আল্লাহর হেরেমে কবিতা পড়ছ ? রাসূল (সা) বললেন, হে উমর! বলতে দাও, এ কবিতা কাফিরদের জন্য তীরের আঘাত অপেক্ষা বেশি কঠিন। (ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান-গরীব; এ সমুদয় বর্ণনা বিস্তারিতভাবে ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৮৩- উল্লেখিত আছে)।

ইবন সা'দের বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছিলেন, ওহে উমর! আমি শুনছি। আর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-কে আদেশ করলেন, ওহে ইবন রাওয়াহা, পড় :

لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَّمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর সঙ্গে অপরাপর সাহাবিগণও এ বাক্যাবলী পাঠ করতে থাকলেন। এ মর্যাদার সাথে তারা মক্কায় প্রবেশ করলেন, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করে কুরবানীর পশু যবেহ করলেন ও হালাল হয়ে গেলেন (অর্থাৎ ইহরাম খুললেন)। এর পর তিনি কিছু লোককে বাতনে ইয়াজুজ চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন যাতে সেখানে অস্ত্রের পাহারায় ছেড়ে আসা লোকেরা এসে তাওয়াফ ও সাঈ করতে পারেন। এ কথা বলে তিনি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। যোহর পর্যন্ত ভেতরেই অবস্থান করলেন। তাঁর নির্দেশে হযরত বিলাল (রা) কাবাগৃহের ছাদে উঠে যোহরের আযান দিলেন।[২]

---

১. على تنزيله على تاويله এর এ অর্থ আল্লামা যারকানী বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ واكار تاويله على انكار تنزيله على আর সম্ভবত এর অর্থ এই হবে যে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ ও লড়াই তাঁর আদেশে করে থাকি।

২. তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৮৮।

কুরায়শগণ যদিও চুক্তি অনুসারে তাঁকে উমরা করার অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু কঠিন হিংসা ও চরম ক্রোধের কারণে তাঁকে ও তাঁর সাহাবাগণকে সহ্য করতে পারছিল না। কাজেই কুরায়শের সর্দারও বয়োজ্যৈষ্ঠ ব্যক্তিগণ ও খান্দানী ব্যক্তিবর্গ মক্কা মুকাররামা ছেড়ে পাহাড়ে চলে যায়।[১]

হযরত মায়মূনা (রা)-এর সাথে বিবাহ

উমরা আদায়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) তিনদিন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন এবং হযরত মায়মূনা বিনতে হারিস (রা)-কে বিবাহ[২] করেন। তিন দিন অতিক্রান্ত হলে কুরায়শগণ কয়েক ব্যক্তি পাঠিয়ে তাঁকে জানায় যে, তিনদিন অতিক্রান্ত হয়েছে। তিনি বললেন, যদি তোমরা অবকাশ দাও, তা হলে আমি মক্কায় মায়মূনা বিনতে হারিসের বিবাহের আনন্দ ও ওলীমার দাওয়াতের ব্যবস্থা করি। তারা অত্যন্ত ত্রস্ততার সাথে জবাব দিল যে, আপনার ওলীমার দাওয়াতে আমাদের প্রয়োজন নেই, আপনি চলে যান।

তিনি তৎক্ষণাৎ সাহাবিগণকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং নিজ দাস আবূ রাফে'কে হযরত মায়মূনার কাছে রেখে গেলেন। আবূ রাফে' তাকে সঙ্গে নিয়ে সারিফ নামক স্থানে তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন। এখানে তিনি বাসর যাপন করলেন এবং এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যিলহজ্জ মাসে মদীনায় পৌঁছলেন। আর তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন :

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে, নিরাপদে, তোমাদের কেউ মাথা মুন্ডন করবে আর কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। এ ছাড়াও আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয়।" (সূরা ফাতহ : ২৭)

---

১. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৫৫।

২. সহীহ বুখারীর বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনাকে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) হালাল হওয়ার পর হযরত মায়মূনাকে বিবাহ করেন। তবে সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত সবচেয়ে বিশুদ্ধ। যেমন হাফিয আসকালানী ফাতহুল বারীতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিস্তারিতের জন্য হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করুন।

উমরাতুল কাযা সমাপ্ত করে যখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা মুকাররামা ছেড়ে আসছিলেন, তখন হযরত হামযা (রা)-এর কনিষ্ঠা কন্যা চাচা চাচা[১] বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে আসে। হযরত আলী (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাকে উঠিয়ে নেন। তখন হযরত আলী, হযরত জাফর এবং হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর মধ্যে মতভেদ শুরু হয়। সবাই চাচ্ছিলেন যে, সে আমার তত্ত্বাবধানে থাকুক। হযরত আলী (রা) বললেন, যে আমার চাচার মেয়ে এবং আমি তাকে উঠিয়ে নিয়েছি। হযরত জাফর (রা) বললেন, সে আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার স্ত্রী। হযরত যায়দ (রা) বললেন, সে আমার ইসলামী ও দীনি ভাইয়ের মেয়ে।

মহানবী (সা) সিদ্ধান্ত দিয়ে বললেন মেয়েটি তার খালার কাছে থাকুক এবং আরো বললেন, খালা মায়ের বিকল্প। [হযরত বারা ইবন আযিব (রা) সূত্রে বুখারী কর্তৃক বর্ণিত]।

হযরত আখরাম ইবন আবুল আওজা (রা)-এর অভিযান (সপ্তম হিজরীর যিলহজ্জ মাস)

যিলহজ্জ মাসে নবী (সা) হযরত আখরাম (রা)-কে পঞ্চাশজন সঙ্গী সহ বনী সুলায়ম গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। বনী সুলায়ম বলে, আমাদের ইসলামের প্রয়োজন নেই এবং তীর নিক্ষেপ করে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র বাহিনীকে শহীদ করে দেয়। কেবল হযরত আখরাম (রা)-কে মৃত ভেবে ছেড়ে যায়। তিনি আঘাতজনিত কারণে অর্ধমৃত প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। এর পর সুস্থ হয়ে পয়লা সফর মদীনায় ফিরে আসেন।[২]

হযরত গালিব ইবন আবদুল্লাহ লাইসী (রা)-এর অভিযান

অষ্টম হিজরীর সফর মাসে মহানবী (সা) হযরত গালিস ইবন আবদুল্লাহ লাইসী (রা)-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বনী মালূহকে আক্রমণ করার জন্য কাদীদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। তারা সেখানে পৌঁছে নৈশ অভিযান চালান এবং কিছু উট ধরে নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করেন। বরী মালূহ-এর একটি দল প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দ্রুত ধাবিত হয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে এত জোরে বৃষ্টি হয় যে, মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে যে উপত্যকাটি অন্তরায় ছিল, তা পানিতে ভরে যায় এবং তারা মুসলমানদের কাছে পৌছতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এভাবে মুসলমানগণ নিরাপদে মদীনায় ফিরে আসেন।

কতিপয় অভিযান

খায়বার এবং মুতা যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ছোট ছোট অনেক অভিযান প্রেরণ করেন, আল্লাহর অনুগ্রহে এর সবগুলো সফল হয়ে ফিরে আসে।

---

১. হযরত হামযা ছিলেন তাঁর দুধভাই, এ সম্বন্ধে তিনি চাচা হন।

২ ইবন সা'দ কৃত আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৮৯।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ, হযরত উসমান ইবন তালহা এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের প্রসিদ্ধ সিপাহ সালার হযরত খালিদ ইবন ওলীদ এবং আরবের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি হযরত আমর ইবনুল আস ইসলাম গ্রহন করেন। তাদের ইবলাম গ্রহনের সময় নিয়ে মতভেদ আছে, কেউ বলেছেন অষ্টম হিজরীর সফর মাসে আবার কেউ বলেছেন সপ্তম হিজরীতে খায়বার যুদ্ধের পর তারা মুসলমান হয়েছেন।

এ বিষয়টি বিশুদ্ধ ও প্রকাশ্য যে, হযরত খালিদ ইবন ওলীদ হুদায়বিয়ার যুদ্ধে কাফির বাহিনীতে ছিলেন এবং পরবর্তীতে মুতার যুদ্ধের বর্ণনায় বুখারীর রিওয়ায়াতে জানা যাবে যে, খালিদ ইবন ওলীদ মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরিশেষে সেনাপতি হন ও তারই হাতে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন। এতে বুঝা যায় যে, তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং মুতা যুদ্ধের মধবর্তী সময়ে ইসরাম গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন আমার মঙ্গল করার ইচ্ছা করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার মনে ইসলামের প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলেন। পর্যায়ক্রমে আমার অন্তরে এ ধারণার সৃষ্টি হলো যে, যে যুদ্ধেই আমি কুরায়শের পক্ষে মহানবী (সা)-এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে যেতাম এবং (যুদ্ধ শেষে) ফিরে আসতাম, আসার সময় আমার অন্তরের অবস্থা এই হতো যে, অন্তর যেন আমাকে বলত, তোমার এ সমুদয় প্রচেষ্টা ও সকল কলাকৌশল ফলাফলশূন্য এবং নিরর্থক। অবশ্য অবশ্যই মুহাম্মদ (সা)-ই জয়ী হবেন। সুতরাং হুদায়বিয়ার সময় আমি মক্কার মুশরিকদের অশ্বারোহী সেনাদলের একজন ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি নবী (সা)-কে উসফান নামক স্থানে দেখলাম যে, তিনি সাহাবিগণকে সালাতুল খাওফ পড়াচ্ছেন। আমি ইচ্ছা করলাম, নামায আদায়কালে তাঁর উপর আক্রমণ চালাব। কিন্তু তিনি আমার ইচ্ছা সম্পর্কে জেনে ফেললেন এবং আমি আক্রমণ করতে সক্ষম হলাম না। ঐ সময় আমি বুঝে ফেললাম যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত, অদৃশ্য থেকে তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি বিফল হয়ে ফিরে এলাম।

আর হযরত (সা) যখন কুরায়শদের সাথে সন্ধি করে ফিরে গেলেন, তখন আমার অন্তরে এ ধারণা হলো যে, কুরায়শদের শক্তি ও শৌর্য শেষ হয়েছে এবং আবিসিনিয়ার বাদশাহ অর্থাৎ নাজ্জাশী তাঁর অনুগত হয়েছেন। আর তাঁর সাহাবিগণ আবিসিনিয়ায় শান্তি ও নিরাপদে রয়েছে। এখন এছাড়া আর কি উপায় আছে যে, আমি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে যাই, সেখানে গিয়ে ইয়াহূদী কিংবা খ্রিস্টান হই এবং আজম (অনারব)-এর অনুগত ও অধীন থেকে নিন্দনীয় জীবন যাপন করি। আর কিছুদিন নিজ দেশে থেকে দেখি পর্দার অন্তরাল থেকে কি প্রকাশ পায়, এমন চিন্তাই করছিলাম। পরবর্তী বছর রাসূলুল্লাহ (সা) উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা মুয়াযযমায় এলেন, তখন ঐ সময় আমি মক্কা থেকে বের হয়ে গেলাম এবং আত্মগোপণ করলাম।

মহানবী (সা) যখন উমরা সমাপন করলেন, তখন আমার ভাই ওলীদ ইবন ওলীদ, যে নবী (সা)-এর সহযাত্রী ছিল, সে আমাকে খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু পেল না। এর পর আমার ভাই নিম্নোক্ত ভাষায় আমাকে একটি পত্র লিখল :

بسم الله الرحمن الرحيم - اما بعد فانى لم ارا عجب من ذهاب رابك عن الاسلام وعقلك عقلك ومثل الاسلام جهله احد وقد سألنى رسول الله ﷺ عنك وقال اين خالد فقلت ياتى الله به فقال مثله جهل الاسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين كان خيرا له ولقد مناه على غيره فاستدرك يا اخى ماقد فاتك من مواطن صالحة ٠

"দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অতঃপর আমি এর থেকে আশ্চর্যজনক কোন বস্তু দেখিনি যে, তোমার বিবেক ইসলামের মত একটি পবিত্র দীন কবূল করার বিরোধী। অথচ তোমার জ্ঞান তো সে তোমারই জ্ঞান (যা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ)। আর ইসলামের মত একটি পবিত্র ধর্ম থেকে অজ্ঞ থাকা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। মহানবী (সা) তোমার ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন এবং বলেছেন যে, খালিদ কোথায়? আমি আরয করেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাকে নিয়ে আসবেন। তিনি বলেন, আশ্চর্য, তার মত বিজ্ঞ ব্যক্তি কি ইসলামের মত পবিত্র ধর্ম থেকে অজ্ঞ ও বেখবর থাকতে পারে ? আর বললেন, খালিদ যদি মুসলমানদের সাথে একত্র হয়ে সত্য দীনের সাহায্য করত এবং বাতিলের অনুসারীদের মুকাবিলা করত, তবে তার জন্য ভাল হতো। আর আমরা তাকে অপরের চেয়ে অগ্রগামী রাখতাম। কাজেই ওহে ভাই, তোমার থেকে যে উত্তম অবস্থান বিনষ্ট হয়েছে, তা তুমি প্রতিরোধ কর, এখনো সময় আছে।"

گیا وقت پھر ہاتھ آتانہیں * سداؤ در دوران وکھاتانہیں

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, আমার ভাইয়ের এ পত্র যখন আমার কাছে পৌঁছল, তখন এ পত্র আমার ইসলামের প্রতি অনুরাগ আরো বাড়িয়ে দিল এবং অন্তরে হিজরতের সফরের এক বিশেষ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। আর মহানবী (সা) আমার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তা আমাকে আনন্দিত করল। এ সময়েই আমি একটি স্বপ্নও দেখলাম যে, আমি একটি সংকীর্ণ শহরে আছি, যেখানে দুর্ভিক্ষ চলছে। আমি সেই সংকীর্ণ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত শহর ছেড়ে একটি প্রশস্ত ও সবুজ-শ্যামল শহরে চলে গিয়েছি। আমি মনে মনে বললাম, এ এক বিশেষ স্বপ্ন, যা আমাকে সতর্ক করার জন্য দেখানো হয়েছে। আমি মক্কা মুকাররামায় উপস্থিত হলাম এবং সফরের মাল-সামান সংগ্রহ করে মদীনার দিকে রওয়ানা হলাম। আমি চাচ্ছিলাম যে, আরো কেউ আমার সঙ্গী হোক। আমি সাফওয়ান ইবন উমায়্যার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং বললাম, তুমি কি দেখছ না যে, মুহাম্মদ (সা) আরব ও আজমে বিজয় লাভ করেছেন?

আমরা যদি মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট যাই এবং তাঁর অনুসরণ করি, তা হলে এটা আমাদের জন্য উত্তম হবে; মুহাম্মদ (সা)-এর মর্যাদা আমাদেরও মর্যাদায় পরিণত হবে। সাফওয়ান অত্যন্ত কঠোরভাবে অস্বীকার করল এবং বলল, এ যমীনে যদি আমি ছাড়া আর একটি লোকও মুহাম্মদের অনুসরণ করা থেকে বাকী না থাকে, তবুও আমি তার অনুসরণ করব না। আমি মনে মনে বললাম, এ ব্যক্তির পিতা ও ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে, কাজেই একে কোন দোষ দেয়া যায় না। এরপর আমি ইকরামা ইবন আবূ জাহলের সাথে সাক্ষাত করলাম এবং সাফওয়ানকে যা বলেছি, তাকেও তা বললাম। তখন ইকরামাও আমাকে ঐ জবাব দিল যা সাফওয়া- দিয়েছিল। হযরত খালিদ বলেন, আমি আমার গৃহে ফিরে গেলাম এবং উটনী প্রস্তুত করলাম এবং মনে করলাম যে, উসমান ইবন তালহার সাথে সাক্ষাত করে দেখি, সে তো আমার সত্যিকারের বন্ধু। কিন্তু তার পিতা ও পিতামহের নিহত হওয়ার কথা আমার স্মরণ হলো, ফলে আমি ইতস্তত করতে লাগলাম যে, উসমানকে বলব কি বলব না। আবার মনে হলো যে, বলায় আমার ক্ষতিটা কোথায় ? আমি তো চলেই যাচ্ছি। সুতরাং আমি উসমান ইবন তালহাকে তাই বললাম, যা সাফওয়ানকে বলেছিলাম। উসমান ইবন তালহা আমার পরামর্শ গ্রহণ করল এবং বলল, আমিও মদীনা যাচ্ছি, ইয়াহুজ নামক স্থানে তোমার সাথে মিলিত হব। তুমি যদি আগে পৌঁছে যাও, তবে আমার জন্য অপেক্ষা করবে; আর আমি আগে পৌঁছলেও তোমার অপেক্ষা করব।

খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, আমিও রওয়ানা হলাম এবং ওয়াদামাফিক ইয়াহুজে গিয়ে উসমান ইবন তালহার সঙ্গে মিলিত হলাম। প্রত্যুষে আমরা উভয়ে সেখান থেকে যাত্রা করলাম। আমরা যখন হাদ্দা নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমর ইবনুল আস-এর সাথে সাক্ষাত হল, তিনিও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাচ্ছিলেন। আমর ইবনুল আস আমাদেরকে দেখে মারহাবা বললেন, আমরাও মারহাবা বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন ? বললেন, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। আমরা বললাম, আমরাও ঐ উদ্দেশ্যেই বের হয়েছি।

খালিদ ইবন ওলীদ বলেন, এভাবে আমরা তিনজন একই সাথে মদীনায় প্রবেশ করলাম এবং হাররা নামক স্থানে আমাদের বাহন উটগুলোকে বসালাম। কোন ব্যক্তি মহানবী (সা)-কে আমাদের সংবাদ দিয়েছিল, তিনি আমাদের আগমনের সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, মক্কা তার কলিজার টুকরাকে নিক্ষেপ করেছে। খালিদ বলেন, আমি উত্তম পোশাক পরিধান করলাম এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে চললাম। পথিমধ্যে আমার ভাই ওলীদ এসে মিলিত হল এবং বলল, তাড়াতাড়ি চল, তোমার আগমন বার্তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পৌঁছে গেছে, নবী (সা) তোমাদের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন এবং তোমাদের অপেক্ষায় আছেন। আমরা দ্রুত চললাম এবং নবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। মহানবী

(সা) আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। আমি বললাম, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি বিনম্রভাবে আমার সালামের জবাব দিলেন। আমি আরয করলাম, اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله তিনি বললেন, নিকটে এসো এবং বললেন :

الحمد لله الذى هداك قد كنت ارى لك عقلا رجوت ان لايسلمك الا الى خير –

"প্রশংসা সেই পবিত্র সত্তার, যিনি তোমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন। আমি দেখছিলাম যে, তোমার জ্ঞান আছে আর আশা করছিলাম যে, ঐ জ্ঞান কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে তোমাকে পথ প্রদর্শন করবে।"

খালিদ বলেন, আমি আরয করলাম, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যুদ্ধের ময়দানসমূহে আমি আপনার এবং সত্যের মুকাবিলায় উপস্থিত থাকতাম (যে জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত)। এ জন্যে আমি আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, যাতে আল্লাহ তা'আলা আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি বললেন : الاسلام يجب ما كان قبله "ইসলাম এর পূর্বে কৃত সব কিছু মিটিয়ে দেয়।"

আমি পুনরায় একই আবেদন জানালে তিনি আমার জন্য এ দু'আ করেন :

اللهم اغفر لخالد بن الوليد ما اوضع فيه من صد عن سبيل الله –

"আয় আল্লাহ্, তুমি খালিদের ঐ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও যা খালিদ আল্লাহ তা'আলার পথে বাধাদানের জন্য করেছিল।"

খালিদ বলেন, আমার পরে উসমান ইবন তালহা এবং আমর ইবনুল আস অগ্রসর হলেন এবং মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত হন। এতদ সমুদয়ের বিস্তারিত বিবরণ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়ায় এবং এভাবেই আল্লামা সুয়ূতীকৃত খাসাইসুল কুবরায় বর্ণিত হয়েছে।[১]

আমর ইবনুল আস বলেন, মহানবী (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হওয়ার পর প্রথমে খালিদ ইবন ওলীদ বায়য়াত হন; এরপর উসমান ইবন তালহা বায়য়াত হন। এর পর আমি বায়য়াত হওয়ার জন্য সামনে অগ্রসর হই; কিন্তু আমার অবস্থা তখন ছিল এরূপ :

فوالله ماهو الا ان جلست بين يديه فما استطعت ان ارفع طرفى حياء منه قال فبايعته على ان يغفرلى ما تقدم من ذنبى ولم يحضرنى ما تأخر فقال ان الاسلام يجب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها ·

"আল্লাহর কসম, আমি নবীজির সামনে বসে তো পড়েছিলাম, কিন্তু লজ্জা ও সঙ্কোচে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলাম না। আমর বলেন, অবশেষে আমি

১. ৪খ, পৃ, ২৩৮-২৪০; খাসাইস, ১খ. পৃ. ২৪৮।

তাঁর হাতে বায়য়াত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম এ শর্তে যে, আমার পূর্ববর্তী ভুল-ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আমর বলেন, সে সময় আমার এ খেয়াল হলো না যে, আমার পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হোক। তিনি ইরশাদ করলেন, ইসলাম ঐ সমুদয় গুনাহ লুপ্ত দেয় যা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কাফির অবস্থায় করা হয়েছিল। আর একইভাবে হিজরতও পূর্ববর্তী গুনাহ বিলুপ্ত করে দেয়।"

হযরত আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, সেই অবিনশ্বর প্রভুর শপথ, যেদিন থেকে আমরা মুসলমান হলাম, সেদিন থেকে যত সমস্যাই এসেছে, মহানবী (সা) আমাদের মত আর কাউকেই বলেন নি। আমর ইবনুর আস (রা) বলেন, আমি, খালিদ এবং উসমান অষ্টম হিজরীর সফর মাসের শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ.২৩৮)।

মুতার যুদ্ধ (অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাস)

মুতা একটি স্থানের নাম যা সিরিয়ার বালকা এলাকায় অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বিভিন্ন বাদশাহ এবং আমীরদের নামে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন, তখন শারজীল ইবন আমর গাসসানীর নামেও একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। শারজীল ছিল রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষে সিরিয়ার আমীর। হযরত হারিস ইবন উমায়র (রা) যখন নবীজির পত্র নিয়ে মুতা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তখন শারজীল তাকে হত্যা করে। এজন্যে হযরত (সা) তিন হাজার মুজাহিদের একটি বাহিনী অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে মুতার দিকে প্রেরণ করেন।[১]

হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-কে সেনানায়ক নিযুক্ত করেন এবং বলেন, যদি যায়দ শহীদ হয়ে যায়, তবে জাফর ইবন আবূ তালিব সেনানায়ক হবে; যদি জাফরও শহীদ হয়ে যায়, তবে আবদুল্লাহ ইবন আবূ রাওয়াহা সেনাধ্যক্ষ হবে। আর যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যায়, তা হলে মুসলমানগণ যাকে ইচ্ছা, অধিনায়ক মনোনীত করবে। (বুকারী, আহমদ ও নাসাঈ বিশুদ্ধ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

এ জন্যে এ যুদ্ধকে 'গাযওয়াতু জায়শুল উমারা' বলা হয়। যেমনটি মুসনাদে আহমদ ও নাসাঈতে সহীহ সনদে হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) জায়শুল উমারা প্রেরণ করলেন... হাদীসের শেষ পর্যন্ত।[২]

আর একটি সাদা পতাকা হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)-এর হাতে দিলেন এবং বললেন, প্রথমে ঐ স্থানে যাবে, যেখানে হারিস ইবন উমায়র শহীদ হয়েছেন। আর ঐ লোকদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেবে। যদি তারা সে দাওয়াত কবূল করে, তবে তা যথেষ্ট নিয়ামত; অন্যথায় সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সাহায্য ও সহায়তার আবেদন করে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং সানিয়াতুল ওয়াদা পর্যন্ত তিনি নিজেই পদব্রজে মুজাহিদেরকে সঙ্গ দিলেন। সানিয়াতুল ওয়াদায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে এ

১. ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯২; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২খ. পৃ. ৯২।
২. যারকানী, ২খ. পৃ. ২৬৮।

উপদেশ দিলেন যে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ-ভীতি ও পরহেযগারী বজায় রাখবে, আপন সাথীদের কল্যাণ কামনা করবে, আল্লাহর পথে আল্লাহর নামে আল্লাহকে অস্বীকার কারীদের সাথে যুদ্ধ-জিহাদ করবে, প্রতারণা ও অপব্যবহার করবে না, কোন শিশু, স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। মানুষ যখন সেনাপ্রধানকে বিদায় জানাচ্ছিল, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) কেঁদে ফেলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ওহে ইবন রাওয়াহা, কিসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে ? তখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) জবাব দিলেন :

اما واللّه ما بی حب الدنیا ولاصبابة بکم والکنی سمعت رسول اللّه ﷺ یقرأ ایة من کتاب اللّه عز وجل وَاِنَّ مِنْكُمْ الاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتـمًا مَّقْضِيًّا – فَلَسْتُ ادری کیف لی بالصدر بعد الورود –

“জেনে রাখ, আল্লাহর কসম, আমার না দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা আছে আর না তোমাদের সাথে সখ্যতা, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আল্লাহর কিতাবের এ আয়াত পাঠ করতে শুনেছি যে, ‘এবং তোমাদের প্রত্যেকেই উহা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।’ আর আমি জানি না যে, জাহান্নাম অতিক্রমের পর ফিরব কিভাবে। এ জন্যে আমি কাঁদছি।”

সেনাদল যাত্রা শুরু করলে মসলমানগণ উচ্চকণ্ঠে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে ও সাফল্যের সাথে ফিরিয়ে আনুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) এ কবিতা পাঠ করেন :

لکننی اسأل الرحمن مغفرة * وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
او طعنة بیدی حران مجهزة * بحربة تنفذ الاحشاء الكبدا
حتی یقال اذا مروا علی جدثی * یا ارشد اللّه من غاز وقد رشدا

“আমি প্রত্যাবর্তন চাই না, বরং আমি আল্লাহর ক্ষমার সাথে সাথে তাঁর রাস্তায় এমন আঘাত কামনা করি যা থেকে বুদবুদ উথলে ওঠে; এমন কঠিন আঘাত যা তীক্ষ্ণ বর্শা দ্বারা করা হয়, যা আমার পাকস্থলি ও কলিজা ভেদ করে; এমনকি মানুষ যখন আমার কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন এ কথা বলবে যে, বাহ্ ইনি কেমন চমৎকার গাযী ছিলেন আর কেমন সাফল্য লাভ করেছেন।”

সেনাদল যখন যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) নবী (সা)-এর নিকটে এলেন এবং এ কবিতা বললেন :

انت الرسول فمن یحرم نوافله * والوجه منه فقد ازری به القدر
فثبت اللّه ما اتاك من حسن * تثبيت موسى ونصرا كالذی نصروا
انی تفرست فيك الخير نافله * فراسة خالفت فيك الذی نظروا

"আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল, আর যে ব্যক্তি আপনার ফয়েয ও বরকত, আপনার নূরান্বিত চেহারা দর্শন থেকে বঞ্চিত রইল, তাহলে বুঝে নিন, তার ভাগ্য তাকে নিকৃষ্ট বানালো যে, এ মহাসম্পদ থেকে সে বঞ্চিত থেকে গেল। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যেন মূসা (আ)-এর মত আপনার সৌন্দর্য স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণের মত আপনাকে সাহায্য করেন। আমি তাঁর মধ্যকার কল্যাণ ও মঙ্গলকে বেশি থেকে বেশি অনুভব করেছি, আর আমার অনুভব মুশরিকদের দৃষ্টি ও অনুভূতির বিরোধী।"

রাসূল (সা) বললেন : وانت فثبتك الله يا ابن رواحه "আর তোমাকেও ওহে ইবন রাওয়াহা, আল্লাহ তা'আলা যেন অবিচল রাখেন।"

শারজীল যখন এ সেনা অভিযানের খবর পেলো, তখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক লক্ষেরও অধিক সৈন্য একত্র করল। আর হিরাক্লিয়াস স্বয়ং আর এক লক্ষ সৈন্যসহ শারজীলের সাহায্যার্থে বালকায় এসে উপস্থিত হলো। মা'আন পৌঁছে মুসলমানগণ অবগত হলেন যে, দু'লক্ষের অধিক যুদ্ধবাজ সৈন্য মাত্র আমাদের তিন হাজার মুসলিম সেনার মুকাবিলার জন্য বালকায় একত্র হয়েছে। মুসলিম বাহিনী দু'রাত মা'আনে অবস্থান করলেন আর পরামর্শ চলতে থাকল যে, কি করা যায়। সিদ্ধান্ত হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সংবাদ দেয়া হোক এবং সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করা হোক। হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) বললেন :

يا قوم والله ان التى تكرهون للتى خرجتم اياها تطلبون الشهاده وما تقاتل الناس بعدد ولاقوة ولا كثرة ما نقاتلهم الا بهذا الدين الذى اكرمنا الله به فالطلقوا فانما هى احد الحسينين اما ظهرو واما شهادة -

"ওহে সম্প্রদায়, যে বিষয়টি তোমরা অপসন্দ করছ, তাই শাহাদত, যার সন্ধানে তোমরা বেরিয়েছ। আমরা কাফিরদের সাথে শক্তি ও আধিক্যের কারণে লড়াই করি না, আমাদের লড়াই তো কেবল এ দীন ইসলামের জন্য, যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মর্যাদা দান করেন। কাজেই উঠো এবং অগ্রসর হও, দু'টি কল্যাণের একটি তো অবশ্যই অর্জিত হবে, হয় কাফিরদের উপর বিজয় অর্জিত হবে, না হয় শাহাদতের নিয়ামত অদৃষ্টে জুটবে।"

লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম, ইবন রাওয়াহা সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছেন। আর আল্লাহর উপাসক ও জানবায এ তিন হাজারের দল আল্লাহর দুশমনের দু'লাখ যুদ্ধবাজ সৈন্যের মুকাবিলা করার জন্য মুতার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মুতায় উভয় দল লড়াই করার উদ্দেশ্যে মুখোমুখি হলো। এদিকে হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা) ইসলামের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। তাঁর পর হযরত জাফর (রা) ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিয়ে অগ্রসর হন। যখন দুশমন তাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তার ঘোড়া যখম হয়ে যায়, তখন তিনি ঘোড়া থেকে

নেমে পড়েন এবং ঘোড়ার জিন কেটে বুক টান করে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই শুরু করেন।

ঘোড়ার জিন এ জন্যে কাটেন যাতে আল্লাহর দুশমনরা এর থেকেও কোন ফায়দা হাসিল করতে না পারে। আর আল-বিদায়ার বর্ণনানুযায়ী তিনি লড়াই করছিলেন এবং পাঠ করছিলেন :

يا حبذ الجنة واقترابها * طيبة وباردا شرابها

والروم روم قد دنا عذابها * كافرة بعيده انسابها

على اذ لاقيتها ضرابها

"জান্নাত এবং তার নিকটস্থ এলাকা কতই না পবিত্র ও পসন্দনীয়, আর এর পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা; আর আযাব রোমবাসীর নিকটবর্তী হয়েছে, ওরা কাফির এবং ওদের বংশ মর্যাদা আমাদের মর্যাদা থেকে অনেক দূরে, অর্থাৎ আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন নৈকট্য নেই, মুকাবিলার সময় ওদের হত্যা করা আমার জন্য ফরয ও আবশ্যিক।"

লড়াই করতে করতে যখন তার ডান হাত কেটে গেল, তখন বাঁ হাতে ইসলামের পতাকা নিলেন। যখন বাঁ হাতও কেটে গেল, তখন তিনি পতাকা কোলে নিলেন এবং এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গেলেন। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি পাখা দান করেন যার মাধ্যমে তিনি জান্নাতে ফেরেশতাদের সাথে উড্ডয়ন করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত জাফরের লাশ সন্ধান করা হলো, তখন তাতে নব্বইয়েরও বেশি সংখ্যক তীর ও তরবারির আঘাত ছিল, আর এর সবগুলোই ছিল সামনের দিকে, পিছন দিকে কোন আঘাত ছিল না।

হযরত জাফরের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) পতাকা উঠিয়ে নেন এবং সামনে অগ্রসর হন। তিনি ছিলেন ঘোড়ায় আসীন, কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে ইতস্তত্তভাব দেখা দিলে তিনি নিজ প্রবৃত্তিকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

اقسمت يا نفس لتنزلته * كارهة او لتطاوعنه

ان اجلب الناس وشدوا الرنه * مالى اراك تكرهين الجنة

قد طالما قد كنت مطمئنه * هل انت الا نطفة فى شنه

"ওহে নফস, তোর দোহাই লাগে, তুই ঘোড়া থেকে নেমে আল্লাহর দুশমনদের সাথে লড়াই কর, অনিচ্ছায় নাম, অথবা আনন্দ ও আগ্রহের সাথে; (যেমনটি রয়েছে ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯৩-তে)। যদিও লোকে চিৎকার করে ডাকছে, তো এর কি কারণ, তোকে দেখছি তুই জান্নাতকে অপসন্দ করছিস, অর্থাৎ দ্রুত কদম ফেলছিস না, অগ্রসর হতে অলসতা করে যেন জান্নাতকে অপসন্দ করছিস। এ ছিল কেবল নফসকে ভর্ৎসনা ও অভিযুক্ত করা; তুই তো প্রায়ই প্রশান্তচিত্ত ও স্থির থাকিস, এখন তোর কি হলো, তোর প্রকৃতি কি, তুই তো মাতৃগর্ভে একফোঁটা বীর্যই ছিলি; এ অন্তঃসারশূন্য বীর্য হয়ে আল্লাহর রাস্তায় নিজকে সোপর্দ করতে ইতস্তত করছিস?"

আরো বললেন :

يا نفس الا تقتلى تموتى * هذا حمام الموت قد صليت
وما تمنيت فقد اعطيت * ان تفعلى فعلهما هديت

“ওহে নফস, যদি তুই নিহত না হোস তবে মরবি তো অবশ্যই, এটাই হচ্ছে মৃত্যুর ভাগ্য, যাতে তোর জড়িত হওয়া জরুরী; যে বস্তুর তুই আকাঙ্ক্ষা করছিলি, তা তো তোর মিলে গেছে, অর্থাৎ আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ, যদি তুই যায়দ এবং জাফরের মত কাজ করিস, তা হলে সুপথ পাবি।”

এ কথা বলে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তার চাচাত ভাই এগিয়ে এসে তাকে গোশতের একটি হাড় দিলেন যে, চুষে নাও, যাতে এর শক্তিতে কিছুটা লড়তে পারো। কয়েকদিন যাবত তো তুমি অভুক্তই কাটাচ্ছ। ইবন রাওয়াহা হাড়টি নিলেন এবং একবারমাত্র চুষলেন, এরপর দ্রুত ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, ওহে নফস, মানুষ জিহাদ করছে, আর তুই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত। আর তরবারি নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন এবং এমনকি শহীদ হয়ে গেলেন ও ইসলামের ঝান্ডা হাত থেকে পড়ে গেল। হযরত সাবিত ইবন আখরাম (রা) দ্রুত ইসলামী ঝান্ডা হাতে নিলেন এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ওহে মুসলমানের দল, নিজেদের মধ্যে একজনকে নেতা মনোনীত করতে একমত হয়ে যাও। সবাই বলল, আপনিই আমাদের আমীর, আমরা আপনার আমীর হওয়াতে সম্মত আছি। সাবিত (রা) বললেন, আমি এ কাজে সক্ষম নই। আর এ কথা বলেই তিনি হযরত খালিদ ইবন ওলীদের হাতে ঝান্ডা ধরিয়ে দিলেন এবং বললেন আপনিই যুদ্ধের ব্যাপারে বেশি অভিজ্ঞ। খালিদ ইবন ওলীদ (রা) নেতৃত্ব গ্রহণে কিছুটা ইতস্তত করছিলেন কিন্তু সমস্ত মুসলমান তার আমীর হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে গেলেন। হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) ইসলামী ঝান্ডা নিয়ে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত বীরত্ব ও পৌরুষোচিতভাবে আল্লাহর দুশমনদের মুকাবিলা করেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মুতার যুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আমার হাদে নয়টি তরবারি ভেঙে যায়, কেবল একটি ইয়েমেনী তরবারি আমার হাতে অবশিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয় দিন হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) বাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করেন এবং অগ্রবর্তী বাহিনীকে পার্শ্ববতী, দক্ষিণ বাহু ও বাম বাহুতে বিভক্ত করে দেন। শত্রু বাহিনী এ পুনর্বিন্যস্তকরণ দেখে ভীত হয়ে পড়ে এবং ভাবে, নতুন কোন সাহায্য এসে পৌঁছেছে।

ইবন সা'দ আবূ আমের থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত খালিদ যখন রোমান সেনাদলের উপর আক্রমণ করেন, তখন এমনভাবে পরাজিত করেন যে, এমন পরাজয় আমি কখনো দেখিনি। মুসলমান যেদিকে ইচ্ছা, কেবল নিজের তরবারি রাখতেন।

ইমাম যুহরী, উরউয়া ইবন যুবায়র, মূসা ইবন উকবা, আত্তাফ ইবন খালিদ এবং ইবন আয়িয থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আর সহীহ বুখারীতে রয়েছে, حتى فتح الله عليهم। এমনকি আল্লাহ্ শেষ পর্যন্ত মুসলমানদর বিজয় দান করেন।

হাকিম বর্ণনা করেন, সামান্য পরিমাণ গনীমত পাওয়া গিয়েছিল। রোমক বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পর হযরাত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন না এবং নিজ ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ যুদ্ধে বারজন মুসলমান শহীদ হন, যাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো :

১. হযরত যায়দ ইবন হারিসা (রা)
২. হযরত জাফর ইবন আবূ তালিব (রা)
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)
৪. হযরত মাসঊদ ইবন আওস (রা)
৫. হযরত ওহাব ইবন সা'দ (রা)
৬. হযরত আব্বাদ ইবন কায়স (রা)
৭. হযরত হারিস ইবন নুমান (রা)
৮. হযরত সুরাকা ইবন উমর (রা)
৯. হযরত আবূ কুলায়ব (রা)
১০. হযরত জাবির (রা) (আমর ইবন যায়দের দু'পুত্র)।
১১. হযরত আমর (রা)
১২. হযরত আমের (রা) (সা'দ ইবন হারিসের দু'পুত্র)।

এ সমুদয় বিশদ বর্ণনা যারকানী এবং ফাতহুল বারী, মুতা যুদ্ধ অধ্যায় থেকে নেয়া হয়েছে।

যে দিন ও যে সময়ে মুতা প্রান্তরে ইসলামী গাযীদের শাহাদতের ঘটনা ঘটছিল, আল্লাহ তা'আলা[১] সমস্ত সিরিয়ার প্রান্তর আপন পূর্ণ কুদরতে রাসূলের সামনে এনে

১. كما اخرج الواقدى عن شيوخه قالوا رفعت الارض رسول الله ﷺ حتى نظر الى معركة القوم وقال ابن كثير قال الواقدى حدثنى عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابى بكر بن عمرو بن حزم قال لما التقى الناس بمؤتته جلس رسول الله ﷺ على المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر الى معتركهم فقال خذ الراية ازيد الحديث

যেমনটি ওয়াকিদী তার শায়খগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যমীনকে উঠিয়ে দেয়া হয়, এমনকি তিনি (মুসলিম ও রোমক) কওমের যুদ্ধ দেখতে পান। অনুরূপ বর্ণনা আল্লামা সুয়ূতী কৃত খাসাইসে (১খ. পৃ. ২৬০) রয়েছে। এবং ইবন কাসীর বলেন, ওয়াকিদী বলেছেন, আমাকে আবদুল জব্বার ইবন আম্মারা আবদুল্লাহ ইবন আবূ বকর ইবন হাযম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, যখন মানুষ মুতায় যুদ্ধে লিপ্ত হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে আসীণ হলেন এবং তাঁর ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী সব কিছু উণ্ডুক্ত করে দেয়া হলো, ফলে তিনি তাদের যুদ্ধ দেখছিলেন। অতঃপর বললেন, ইসলামী পতাকা যায়দ গ্রহণ করেছে... হাদীসের শেষ পর্যন্ত। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (৪খ. পৃ. ২৪৬) এবং অনুরূপ খাসাইসে (১খ. পৃ. ২৬০)। আর বায়হাকী এবং আবূ নুয়াইমে মূসা ইবন উকবা থেকে বর্ণিত হয়েছে, [রাসূলুল্লাহ (সা)] বলেছেন, ان الله رفع لى الارض حتى رائيت معتركهم নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার সামনে যমীনকে উঠিয়ে দেন এমনকি আমি তাদের যুদ্ধ দেখতে পাই। অনুরূপ খাসাইসে (১খ. পৃ. ১৫৯)।

দেন, ফলে ময়দানের সমস্ত বিষয় তাঁর চোখের সামনে ছিল। তাঁর এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী সমস্ত অন্তরায় উঠিয়ে দেয়া হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করার জন্য 'আস-সালাতু জামিআ' ঘোষণা করান। সাহাবীগণ একত্র হলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করেন। ময়দানের অবস্থা তাঁর চোখের সামনে ছিল। তিনি বললেন, যায়দ ইসলামী পতাকা হাতে নিল এবং কাফিরদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করল। এমনকি সে শহীদ হয়ে গেল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল। যায়দের পর জাফর ইসলামী পতাকা নেয় এবং আল্লাহর দুশমনদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করে। এমনকি সে শহীদ হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। আর ফেরেশতাদের সাথে জান্নাতে দুটি পাখা নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তার পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ইসলামী পতাকা ধারণ করে। মহানবী (সা) এ কথা বলে চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত নীরবতায় ছেয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে আনসারগণ ঘাবড়ে গেলেন এবং তাদের চেহারায় পেরেশানীর ছাপ দেখা যাচ্ছিল। তাদের ধারণা হলো যে, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা কর্তৃক কোন অপসন্দনীয় কর্ম প্রকাশ পেয়েছে, যার ফলে তিনি চুপ করে আছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাও কাফিরদের সাথে ভীষণ যুদ্ধ করেছে, এমনকি সে শহীদ হয়ে গেছে। এরা তিনজনই এখন জান্নাতে, তাদেরকে জান্নাতে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসনে তারা হেলান দিয়ে আছে। কিন্তু আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সিংহাসন কিছুটা দুলতে[১] দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি যে আমি আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার সিংহাসন দুলতে দেখছি? তখন আমাকে বলা হলো যে, মুকাবিলার সময় আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা সামান্য সময় কিছুটা ইতস্তত করছিল এবং সামান্য দোদুল্যমান থাকার পর সামনে অগ্রসর হয়। আর যায়দ এবং জাফর কোন সংশয় ও ইতস্তত না করেই অগ্রসর হয়।

অপর এক বর্ণনায় আছে :

ثم اخذ الرأية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا فشق ذلك على الانصار فقيل يا رسول الله ما اعترض قال لما اصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتجع فاستشهد فدخل الجنة فسرى عن قومه –

তিনি বলেন, "এর পর আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা পতাকা গ্রহণ করল এবং শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর সে জান্নাতে থামতে থামতে ঢুকে পড়ল। এ কথা শুনে আনসারদের

---

১. قال ابن اسحاق وحدثنى محمد بن جعفر عن عن عروة قال ثم اخذ الرائيته عبد الله بن رواحة فالتقوى بها بعض الاء ثم تقدم على فرسه ثم نزل فقاتل حتى (যেমনটি আছে ফাতহুল বারীতে, ৭খ. পৃ. ৩৯৩); عن سريرى صاحبيه فقلت عم هذا فقيل لى مضيا وتردد عبد الله بعض تردد ثم مضى (সীরাতে ইবন হিশাম)।

দুঃখ হলো। কেউ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এর কারণ কি ? তিনি বললেন, যখন আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত হয়, মানবীয় স্বভাবের কারণে কিছুটা অলস হয়ে পড়ে এবং অগ্রসর হতে কিছুটা ইতস্তত করতে থাকে। অতঃপর সে তার নফসকে অভিসম্পাত ও তিরস্কার করে এবং সাহস ও বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করে ও যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। এ কথা শুনে আনসারগণের পেরেশানী দূর হয়ে যায়।" (বায়হাকী বর্ণিত, অনুরূপ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ১৪৭; খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ২৬০)।

নবী (সা) এসব বলছিলেন এবং তাঁর চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হচ্ছিল। অতঃপর বললেন, তারপর আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি, অর্থাৎ খালিদ ইবন ওলীদ ইসলামের পতাকা ধারণ করে। এমনকি আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন :

اللّهم انه سيف من سيوفك فانت تنصره فمن يومئذ سمى سيف اللّه –

"আয় আল্লাহ্, খালিদ তোমার তরবারিসমূহের একটি তরবারি, কাজেই তুমি তাকে সাহায্য কর। ব্যাস, ঐদিন থেকেই হযরত খালিদ (রা) সাইফুল্লাহ উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।"

প্রকৃত ঘটনা তো সহীহ বুখারীতে উল্লেখ আছে, অবশিষ্ট বিস্তারিত বিবরণ ইবন ইসহাক ও বায়হাকীর বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে।[1]

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন হযরত খালিদকে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন এবং তার হাতে নেতৃত্বের পতাকা তুলে দেন, তখন বলেন :

انى سمعت رسول اللّه ﷺ يقول نعم عبد اللّه واخو العشيرة خالد ابن الوليد سيف من سيوف اللّه سلم اللّه على الكفار –

"নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, কতই না উত্তম ব্যক্তি, আল্লাহর বান্দা এবং গোত্রের ভ্রাতা খালিদ ইবন ওলীদ,আল্লাহর তরবারিসমূহের মধ্যে একটি তরবারি, যা আল্লাহ কাফিরদের উপর চালানোর জন্য কোষমুক্ত করেছেন।" (ইসাবা, হযরত খালিদ ইবন ওলীদের জীবন চরিত)।

দ্রষ্টব্য : অর্থ এই যে, হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) আল্লাহর তরবারি, আর এ তরবারি চালনাকারী এবং কাফিরদের উপর এর ব্যবহারকারী আল্লাহ্ তা'আলা। আর প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলা চালনা করেন, এমন তরবারি থেকে কে বেঁচে পলায়ন করতে পারে ?

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৪৫; ফাতহুল বারী, ৭খ. পৃ. ৩৯৩; খাসাইসুল কুবরা, ১খ. পৃ. ২৬০।

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকূব নানতুবী বলতেন যে, খালিদ ইবন ওলীদ সারা জীবন শাহদত লাভের বাসনা নিয়ে জিহাদ ও লড়াই চালিয়ে যান, কিন্তু তার এ আশা পূর্ণ হয়নি, শাহাদত তার নসীবে জোটেনি। মাওলানা ইয়াকূব সাহেবের মধ্যে কিছুটা জযবার বৈশিষ্ট্য ছিল, সেই জযবার অবস্থায় বলেন, খালিদ ইবন ওলীদ অহেতুক শাহাদত লাভের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, তার এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়া ছিল ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অসাধ্য। যাকে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর তরবারি বানিয়েছেন, তাকে কেউই ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম নয়, অকেজো করতেও অক্ষম; কেননা আল্লাহর তরবারি ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব ও দুঃসাধ্য।

অপর দ্রষ্টব্য : হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ কথা বলা যে, আমি তার সিংহাসন দুলতে দেখেছি, এটা প্রকৃতপক্ষে ছিল হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার দোদুল্যমানতার উদাহরণ। আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহার শাহাদতের কিছু পূর্বে এ দৃশ্যমান জগতে যে ইতস্ততা জন্মায়, অদৃশ্য জগতে তা দোলায়মান সিংহাসনের অবয়বে দেখানো হয়েছে। এখানে যে বস্তু গোপন, সে বস্তুই অদৃশ্য জগতে যে কোন আকার আকৃতিতে দৃশ্যমান হয়।

কাহিনী

সুলতান মাহমূদ গযনবী যখন হিন্দুস্থান জয় করেন এবং সোমনাথ মন্দিরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন, তখন এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে মূর্তিটি ছিল, সেটি যখন ভাঙ্গতে ইচ্ছা করলেন, তখন সোমনাথের পূজারীরা অনুনয়-বিনয়ের সাথে আরয করল, এ মূর্তিটি ওজন করে আমাদের নিকট থেকে সে পরিমাণ স্বর্ণ নেয়া হোক, কিন্তু এ মূর্তিটি ভাঙ্গা না হোক। সুলতান মাহমূদ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শ করলেন। সবাই বলল, জয় তো হয়েছেই, এখন একটামাত্র মূর্তি যদি ছেড়ে দেয়া হয়, তাতে বিশেষ কোন ক্ষতি নেই। আর এর পরিবর্তে যে সম্পদ পাওয়া যাবে, তা ইসলামী সেনাদলের প্রয়োজন মেটাবে। ঐ মজলিসে প্রধান সেনাপতি মাসঊদ গাযীও ছিলেন। তিনি বললেন, এটা তো মূর্তি বিক্রি, এ যাবত বাদশাহ মূর্তি ধ্বংসকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এখন তাকে মূর্তি বিক্রেতা বলা হবে। এ কথা মাহমূদ গযনবীর অন্তর স্পর্শ করল; কিন্তু কিছুটা ইতস্তত ভাব অবশিষ্ট ছিল। দ্বিপ্রহরে নিদ্রা গেলে তিনি স্বপ্নে দেখেন, হাশরের ময়দান বিদ্যমান, আর সেখানে এক ফেরেশতা তাকে এ বলে দোযখের দিকে টেনে নিচ্ছেন যে, এ ব্যক্তি মূর্তি বিক্রেতা। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলছেন, না, ইনি তো মূর্তি ধ্বংসকারী, একে জান্নাতে নিয়ে যাও। ইতোমধ্যে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল এবং তিনি আদেশ করলেন, দ্রুত মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলা হোক। যখন মূর্তিটি ভাঙ্গা হলো, তখন এর পেট মণি-মাণিক্য ভর্তি পাওয়া গেল। তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করলেন যে, তিনি তাকে মূর্তি বিক্রি থেকে রক্ষা করলেন এবং যে সম্পদের আশায় তিনি মূর্তি বিক্রি করতে চাচ্ছিলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সম্পদ তাকে দান করলেন।

ফেরেশতা কর্তৃক দোযখ ও বেহেশতের দিকে টানাটানি করা ছিল তার মনের ইতস্তত ভাবের চিত্র, যা মূর্তি ভাঙ্গার ব্যাপারে মাহমূদ গযনীর মনে উদয় হয়েছিল। জাগ্রত অবস্থায় যা ছিল অন্তরের সংশয়, তা স্বপ্নে এরূপে দেখানো হলো যে, এক ফেরেশতা দোযখের দিকে টানছেন আর অপরজন বেহেশতের দিকে; কখনো চিন্তা মূর্তি ভাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল আর কখনো মূর্তি ছেড়ে দেয়ার দিকে যাচ্ছিল। প্রকৃত অবস্থা হলো, মূর্তি না ভাঙ্গা বাস্তবে মূর্তি বিক্রি ছিল না, কিন্তু মূর্তি বিক্রেতার সাথে তুলনীয় ছিল। এ জন্যে আল্লাহ তাআলা তাকে তা এ অবস্থায় দেখিয়েছেন।

অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা)-এর দোদুল্যমানতা দুলতে থাকা সিংহাসনের অবস্থায় দেখানো হয়েছে। কোন ইবাদতকে সন্দেহ-সংশয় ছাড়াই বাস্তবায়ন করা, এটা নফসে মুতমাইন্নাহর বৈশিষ্ট্য। আর ইতস্তত ভাব এলে নফসকে তিরস্কার করা (যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা করেছেন), এটা নফসে লাওয়ামাহর বৈশিষ্ট্য, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সূরা কিয়ামাহর প্রথমে কসম করেছেন : لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّمَةِ "আমি শপথ করছি কিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।" হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) যুদ্ধকালে যে কবিতা পাঠ করেন, তার উদ্দেশ্য ছিল আপন নফসকে তিরস্কার করা, তিরস্কার সূচক দু'একটি কবিতা পাঠেই নফস স্থির হয়ে যায় এবং তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহর রাহে শহীদ হয়ে যান এবং আপন সঙ্গীদের সাথে জান্নাতে মিলিত হন।

يٰاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي اِلٰى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ·

"হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদেরঅন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"

এ হৃদয় বিদারক দৃশ্য বর্ণনা করার পর নবী (সা) হযরত জাফর (রা)-এর গৃহে গমন করেন। তার সন্তানদের ডাকেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। চোখে তখন অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা) ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, আপনি কেন কাঁদছেন, জাফর এবং তার সঙ্গীদের ব্যাপারে আপনি কি কোন সংবাদ পেয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আজ সে শহীদ হয়েছে। আসমা বিনতে উমায়েস (রা) বলেন, শোনামাত্র আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বেরিয়ে গেল এবং মহিলারা আমার পাশে জমা হয়ে গেল। আর নবী (সা) আপন গৃহে চলে গেলেন ও বললেন, জাফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠাও, আজ তারা তাদের দুখে কাতর হয়ে পড়েছে। আর এ ব্যথার বিরাট প্রভাব

স্বয়ং নবী (সা)-এর ওপরও ছিল। এ ব্যথায় তিনি তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে যেতে থাকেন। (যারকানী)।

হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) ইসলামী বাহিনী নিয়ে মুতা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। মদীনার সন্নিকটে পৌঁছলে মহানবী (সা) ও মুসলমানগণ মদীনার বাইরে গিয়ে তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

যাতুস সালাসিলে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর অভিযান

অষ্টম হিজরীর জমাদিউস সানী মাসে রাসূল (সা) সংবাদ পান যে, বনী কাযাআ গোত্রের একটি দল মদীনা মুনাওয়ারা আক্রমণের ইচ্ছা করছে। এ জন্যে তাদের সমুচিত জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-কে যাতুস সালাসিলের দিকে প্রেরণ করেন। স্থানটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দশ মনযিল দূরে অবস্থিত। তার সাথে তিনশত পদাতিক এবং ত্রিশজন ঘোড় সওয়ার সহগামী হলেন। যখন ঐ স্থানের নিকটে পৌঁছলেন, তখন জানতে পেলেন যে, কাফিরের দল অনেক ভারী। সুতরাং তারা সেখানেই অবস্থান নিলেন এবং অতিরিক্ত লোক প্রেরণের জন্য হযরত রাফে' ইবন মাকীস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করলেন। নবী (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর নেতৃত্বে দু'শো লোক প্রেরণ করলেন, যার মধ্যে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-ও ছিলেন। আর এতাকিদ দিলেন যে, আমর ইবনুল আসের সাথে গিয়ে মিলিত হও। আর পরস্পরে একমত থাকবে, কখনই মতপার্থক্য করবে না। হযরত আবূ উবায়দা (রা) যখন সেখানে পৌঁছলেন এবং নামাযের সময় হলো, তখন হযরত আবূ উবায়দা (রা) ইমামতি করতে চাইলেন। আমর ইবনুল আস বললেন, সেনাধ্যক্ষ তো আমি, তুমি তো আমাকে সাহায্য করতে এসেছ। আবূ উবায়দা বললেন, তোমার দলের আমীর তুমি আর আমার দলের আমীর আমি। এর পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) বললেন, যাত্রা করাকালীন সময়ে নবী করীম (সা) আমাকে শেষ নির্দেশ এটাই দিয়েছেন যে, একে অপরের আনুগত্য করবে এবং মতপার্থক্য করবে না। সুতরাং আমি তোমার আনুগত্য করব যদিও তুমি আমার বিরোধিতা কর। এভাবে হযরত আবূ উবায়দা (রা) হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর নেতৃত্ব ও ইমামতকে গ্রহণ করে নিলেন। কাজেই আমর ইবনুল আস ইমামতি করতেন এবং আবূ উবায়দা তার ইকতিদা করতেন। অবশেষে সবাই মিলে বনী কাযাআ গোত্রে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে আক্রমণ করলেন। কাফিরেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করল এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সাহাবিগণ আউফ ইবন মালিক আশজাঈকে সংবাদসহ মদীনায় প্রেরণ করলেন। বিজয় লাভের পর হযরত আমর ইবনুল আস (রা) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন দিকে অশ্বারোহীদেরকে প্রেরণ করতে থাকেন। জিহাদের মাধ্যমে অর্জিত মালিকানাধীন গনীমতের উট ও বকরি মুসলমানগণ রান্না করে খেতে থাকেন।

এ সফরেই এ ঘটনা ঘটে যায় যে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা)-এর স্বপ্নদোষ হয়ে গেল। ঠাণ্ডার প্রকোপ খুব বেশি ছিল, এ জন্যে আমর ইবনুল আস গোসল করলেন না এবং তায়াম্মুম করে ফজরের নামায পড়ান। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে যখন এ ঘটনার উল্লেখ করা হলো, তখন তিনি বললেন, ওহে আমর, তুমি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের নামায পড়িয়েছ ! আমর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার প্রাণের ভয় ছিল; আর আল্লাহ তা'আলার বাণী হলো : وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا শুনে নবী (সা) মৃদু হাসলেন কিন্তু কিছু বললেন না।[১]

ফায়েদা : হযরত খালিদ ইবন ওলীদ এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা) উভয়ে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এ দু'জনের ইসলাম গ্রহণের পর মুতার যুদ্ধ সামনে আসে, যাতে হযরত খালিদ ইবন ওলীদ (রা) সেনাধ্যক্ষ হয়ে যান । আর মুতা যুদ্ধের পর আসে যাতুস সালাসিল অভিযান। এর নেতা হন হযরত আমর ইবনুল আস (রা)।

সাইফুল বাহারে হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর অভিযান

এর পর অষ্টম হিজরীর রজব মাসে রাসূল (সা) হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তিনশত মুজাহিদের একটি বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে সাইফুল বাহার (সমুদ্রোপকূল) অভিমুখে জুহায়না গোত্র আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ বাহিনীতে হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) এবং হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা)-ও ছিলেন। চলার পথে রসদ হিসেবে নবী (সা) তাদেরকে এক থলি খেজুর দেন। যখন খেজুর শেষ হয়ে গেল, তখন খেজুরের বিচি চুষে চুষে এবং পানি পান করে করে তারা জিহাদ চালাতে থাকলেন। যখন তাও আর থাকল না, তখন গাছের পাতা ছিঁড়ে পানিতে ভিজিয়ে খেতে থাকলেন। এ কারণে এ অভিযানকে 'সারিয়াতুল খাবাত'-ও বলা হয়। কেননা 'খাবাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো গাছের পাতা ছেঁড়া। গাছের পাতা খাওয়ার ফলে মুজাহিদদের ঠোঁট ও মুখ যখম হয়ে যায়।

অবশেষে তারা একদিন সমুদ্রের কিনারে উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার জ্বালায় তখন সবাই তখন অস্থির ও ব্যাকুল। হঠাৎ করে অদৃশ্য সাহায্যের নিদর্শন প্রকাশ পেল, সমুদ্র তার অভ্যন্তর থেকে একটি বিশাল আকৃতির মাছ ছুঁড়ে দিল। যা সব মুজাহিদ মিলে আঠার দিন পর্যন্ত খেয়েছেন। সাহাবী বলেন, এ মাছ খেয়ে আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল হলো। মাছটির নাম ছিল আম্বর। এর পর হযরত আবূ উবায়দা (রা) মাছটির পাঁজরের একটি হাড় নিয়ে দাঁড় করান এবং বাহিনীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লোকটিকে বাছাই করে সবচে' বড় উটটির পিঠে বসিয়ে আদেশ দেন ঐ হাড়টির নিচ দিয়ে যেতে। তখন সে কোন চেষ্টা ছাড়াই অবলীলায় হাড়টির নিচ দিয়ে চলে গেল। অথচ আরোহীর মাথাও হাড়ের সাথে লাগল না।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৭৩; যারকানী, ২খ. পৃ. ২৭৭।

আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম, তখন রাসূল (সা) সমীপে এ ঘটনার উল্লেখ করলাম। তখন তিনি বললেন, এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক, যা তিনি তোমাদের জন্য প্রেরণ করেছিলেন, যদি এর থেকে কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তো আনো। সুতরাং তা থেকে কিছু পরিমাণ তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তা থেকে কিছুটা খেলেন। এ অভিযানে কোন সংঘর্ষ হয়নি, ইসলামী বাহিনী বিনাযুদ্ধে মদীনায় ফিরে আসে।[১]
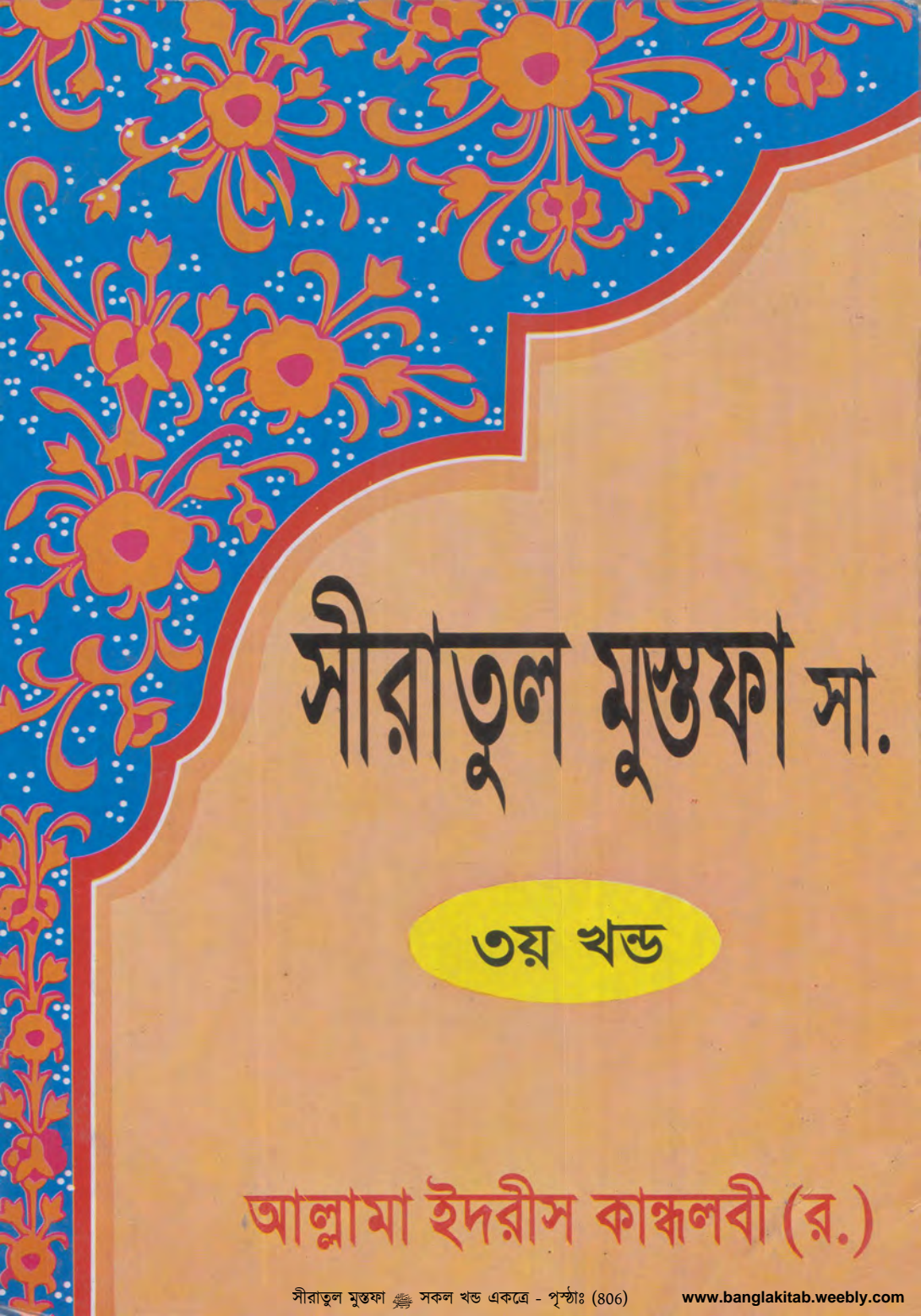
দ্রষ্টব্য : যে রিযক আল্লাহর তরফ থেকে সরাসরি আসে, যাতে বান্দার কোন কাজ বা চেষ্টা-পরিশ্রম না থাকে, তবে ঐ রিযক অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও পবিত্র হয়ে থাকে। এ জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বরকত ও পবিত্রতার অংশ লাভের জন্য চেয়ে নেন এবং কিছুটা খেয়ে নেন। رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

ফায়েদা : কতিপয় আলিম এমন বলেন যে, এ অভিযান হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে প্রেরণ করা হয়েছিল; কেননা রাসূল (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কুরায়শের উপর আক্রমণ করার জন্য কোন অভিযান প্রেরণ করেননি। আর প্রসিদ্ধ বক্তব্য এটাই যে, এ অভিযান কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের পর এবং মক্কা বিজয়ের সামান্য কিছু দিন পূর্বে প্রেরণ করেছিলেন। এ জন্যে যে, নবী (সা) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে পবিত্র রমযান মাসে রওয়ানা হয়েছিলেন আর এ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন রজব মাসে। মাঝে শুধু শাবান মাসই থাকে। আশ্চর্যের কিছু নয় যে, কুরায়শদের চুক্তি ভঙ্গের দরুন রজব মাস থেকেই মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন; আর এ অভিযান ছিল তারই সূচনা।

মাসয়ালা : নিষিদ্ধ রজব মাসে অভিযান প্রেরণ এ বিষয়ের প্রমাণ যে, পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিষিদ্ধ মাসে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ জায়েয।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৪২(উ)—৩২৫০

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ. পৃ. ২৭৬।

সূচিপত্র
সীরাতুল মুস্তফা সা.
৩য় খন্ড
আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.)

সীরাতুল মুস্তাফা

তৃতীয় খণ্ড

মূল

আল্লামা মুহাম্মদ ইদ্‌রীস কান্ধলবী

মাওলানা মোঃ সিরাজুল হক
ও
ডঃ মোঃ আবদুল হক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

সীরাতুল মুস্তাফা (সা) তৃতীয় খণ্ড
মূল: হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র)
কালাম আযাদ অনূদিত
[ইসলামী প্রকাশনা প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত]
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮৮
ইফা প্রকাশনা ২২৮৮/২
ইফা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0950-5

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৭

দ্বিতীয় প্রকাশ (উন্নয়ন)
আগস্ট ২০১৩
ভাদ্র ১৪২০
শাওয়াল ১৪৩৪

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক, ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মু. হারুনুর রশিদ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য : ২১৬.০০ (দুইশত ষোল) টাকা।

SEERATUL MUSTAFA (SM) : written by Hazrat Allama Idris Kandlavi in Urdu, translated by Kalam Azad in Bangla and published by Abu Hena Mustafa Kamal, Project Director, Islamic Publication Project, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone: 8181535, August 2013.

E-mail : Directorpubif@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation-bd.org.

Price : Tk 216.00 ; US Dollar : 9.00

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি। মহানবী হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর পূত-পবিত্র কর্মময় জীবনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেই নয়, বরং অমুসলিম লেখক ও গবেষকদের মধ্যেও অনেকেই নবী জীবনী রচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। দুনিয়ার বুকে যতদিন মানব জাতির অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন সীরাতচর্চাও অব্যাহত থাকবে।

আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র) প্রণীত 'সীরাতুল মুস্তাফা' গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি প্রামাণ্য সীরাত গ্রন্থ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন -এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ করেছেন জনাব মাওলানা মোঃ সিরাজুল হক ও ডঃ মোঃ আবদুল হক। সম্পাদনা করেছেন হাফেয মাওলানা আকরাম ফারুক এবং প্রুফ সংশোধন করেছেন জনাব এম.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম। তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের চেষ্টায় আমরা কোন ত্রুটি করিনি। তারপরেও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ্।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আমরা লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকসহ অনুবাদকর্মের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাই।

পবিত্র সীরাতে রাসূল (সা) সম্পর্কিত জ্ঞানের চর্চা ও বিকাশে আমাদের এই প্রয়াস মহান আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

আবু হেনা মোস্তফা কামাল
প্রকল্প পরিচালক
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মক্কা মুকাররমা বিজয় (রমযানুল মুবারক ৮ হিজরী)	১৩
চুক্তি নবায়নের জন্য আবূ সুফিয়ানের মদীনা গমন	১৬
হাতিব ইবন আবূ বালতা'আর ঘটনা	১৮
হযরত হাতিব (রা)-এর পত্রের বিষয়বস্তু	২২
মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা	২৩
মাররায যাহ্রান নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন	২৭
আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ	২৯
মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ	৩৩
মসজিদে হারামে প্রবেশ	৩৬
কা'বা শরীরের দরজায় খুতবা প্রদান	৩৭
বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করানো	৩৯
কা'বা শরীফের দরজায় আযান	৪২
পুরুষ ও নারীদের বায়'আত গ্রহণ	৪৪
দ্বিতীয় খুতবা	৪৬
মুহাজিরগণের পরিত্যক্ত বাড়িঘর ফেরত প্রদানের বিষয়	৪৬
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বিশেষ অপরাধীদের সম্পর্কে বিধান	৪৬
আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণ	৫৫
সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যার ইসলাম গ্রহণ	৫৬
সুহায়ল ইবন আম্রের ইসলাম গ্রহণ	৫৭
আবূ লাহাবের পুত্র উতবা ও মাতাবের ইসলাম গ্রহণ	৫৮
হযরত মু'আবিয়ার ইসলাম গ্রহণ	৫৯
মন্দির ধ্বংস করার জন্য সারীয়া প্রেরণ	৫৯
উয্যা ও সুওয়া নামক মূর্তি ধ্বংস	৬০
মানাত নামক মূর্তি ধ্বংস	৬০
গাযওয়ায়ে হুনায়ন, আওতাস ও তায়েফ	৬১
তায়েফ অবরোধ	৬৭
হুনায়নের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন	৬৯

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
উমরায়ে যি'রানা	৭২
মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়া	৭২
বিভিন্ন ঘটনাবলী	৭২
প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী	৭৩
গভর্নর ও শাসক নিয়োগ	৭৬
হিজরী ৯	৭৬
সারীয়ায়ে উয়াইনা ইবন্ হাসন ফাযারীকে বনী তামীম গোত্রের নিকট প্রেরণ	৭৭
আতারিদ ইবন হাজিব তামীমির খুতবা	৭৮
সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর খুতবা	৭৯
বনী মুসতালিক-এর নিকট ওয়ালীদ ইবন উকবা ইবন আবূ মুয়াইতকে প্রেরণ	৮০
সারীয়া আবদুল্লাহ ইবন আওসাজা (রা)	৮২
সারীয়া কুতবা ইবন আমির (রা)	৮২
দাহহাক ইবন সুফিয়ান (রা)-এর সারিয়া	৮২
সারীয়া আলকামা ইবন মুজাযায মুদলাজীকে হাবশার দিকে প্রেরণ	৮২
সারীয়া আলী ইবন আবূ তালিবকে মূর্তি পূজারী তায় গোত্রের নিকট প্রেরণ॥ হাতিম তাঈ-এর পুত্র ও কন্যার ইসলাম গ্রহণ	৮৩
কা'ব ইবন যুহায়র (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ	৮৪
গাযওয়ায়ে তাবূক (৯ হিজরী)	৮৭
হাদীস– أنت منى بمنزلة هارون من موسى -এর ব্যাখ্যা	৮৯
সামূদ জাতির আবাসভূমি অতিক্রম, সেখানকার পানির বিষয়ে নির্দেশ এবং এর রহস্য	৯১
মসজিদে দিরার বা ক্ষতিকর মসজিদ	৯৪
অভিযান থেকে পশ্চাদগামীদের বর্ণনা	৯৫
হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে হজ্জের আমীর নির্বাচন	৯৯
বিভিন্ন ঘটনাবলী (৯ম হিজরী)	১০০
দশম হিজরী বিভিন্ন প্রতিনিধির আগমন	১০২
হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল	১০৩
নবী (স)-এর জবাব	১০৪
সাকীফ প্রতিনিধি দল	১০৫
বনূ আমির ইবন সা'সা' গোত্রের প্রতিনিধি দল	১০৭

সূচিপত্র

[সাত]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল	১০৮
বনু হানীফার প্রতিনিধি দল (৯ হিজরী)	১০৯
তায় প্রতিনিধি দল	১১১
কিন্দাহ্ প্রতিনিধি দল	১১১
আশআ'রীয়ীন প্রতিনিধি দল	১১২
ইযদ গোত্রের প্রতিনিধি দল	১১৩
বনূ হারিস প্রতিনিধি দল	১১৪
হামদান প্রতিনিধি দল	১১৪
মুযায়না প্রতিনিধি দল	১১৫
দাওস প্রতিনিধি দল	১১৬
নজরানের নাসারাদের প্রতিনিধি দল	১১৬
মুবাহালা	১১৯
একটি জরুরী জ্ঞাতব্য	১২১
ফারওয়া ইবন আমর জাযামীর দূতের বর্ণনা	১২২
যিমাম ইবন সা'লাবার আগমন	১২২
তারেক ইবন আবদুল্লাহ মাহারীবি ও বনু মাহারিব প্রতিনিধি দল	১২৩
তুজীব প্রতিনিধি দল	১২৪
হুযায়ম প্রতিনিধি দল	১২৬
বনী ফাযারার প্রতিনিধি দল	১২৬
বনী আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন (৯ম হিজরী)	১২৭
বাহ্রায়া প্রতিনিধি দল	১২৭
উযরাহ্ প্রতিনিধি দল	১২৮
বাল্লী প্রতিনিধি দল	১২৮
বনী মুর্‌রা প্রতিনিধি দল	১২৯
খাওলান প্রতিনিধি দল	১২৯
মুহারিব প্রতিনিধি দল	১৩০
সুদা'আ প্রতিনিধি দল	১৩০
গাস্‌সান প্রতিনিধি দল	১৩১
সালমান প্রতিনিধি দল	১৩১
বনী আবস প্রতিনিধি দল	১৩২
গামিদ প্রতিনিধি দল	১৩২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
আযদ প্রতিনিধি দল	১৩২
বনী মুনতাফিক প্রতিনিধি দল	১৩৪
নাখা‘ প্রতিনিধি দল (১১ হিজরী)	১৩৪
ইয়ামানে ইসলামের তালীম	১৩৫
নাজরানে সারীয়ায় খালিদ ইবন ওয়ালীদ প্রেরণ	১৩৫
ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর সারীয়া	১৩৯
বিদায় হজ্জ	১৪০
গাদীরে খুমের খুতবা	১৪২
বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন	১৪৪
জিবরাঈল আমীনের আগমন	১৪৪
সর্বশেষ প্রেরিত সারীয়া উসামা ইবন যায়িদ (রা) (১১ হিজরী)	১৪৫
আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি	১৪৬
রোগের সূচনা	১৪৮
সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত ফাতিমা (রা) ক্রন্দন ও হাসি	১৪৯
কাগজ আনতে বলার ঘটনা	১৫০
নবী (সা)-এর সর্বশেষ খুতবা	১৫৩
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ জামা‘আতে নামায আদায় এবং হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ	১৫৬
নবী (সা)-এর ইনতিকাল দিবস	১৫৯
মৃত্যু কষ্ট	১৬০
ইনতিকালের তারিখ	১৬১
বয়স	১৬২
সাহাবায়ে কিরামের অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তি	১৬২
হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খুতবা	১৬৪
খুতবার অবশিষ্ট অংশ	১৬৭
সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আনসারগণের সমাবেশ	১৭০
নবী (সা)-এর দাফন-কাফন ও গোসল	১৭৩
জানাযার নামায	১৭৪
দাফন	১৭৬
জ্ঞানের কয়েকটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য বিষয়	১৭৬
কাগজ চাওয়ার ঘটনা	১৭৮

সূচিপত্র

[নয়]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	১৮২
হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতের সময়কাল	১৮২
ইনতিকালের তারিখ	১৮৩
সাকীফায়ে বনু সায়েদা এবং খিলাফতের বায়'আত	১৮৪
হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর বক্তৃতা	১৮৫
হযরত সিদ্দীক আকবরের ভাষণ	১৮৭
হযরত সা'দ ইবন উবাদার স্বীকৃতি	১৯১
বিশেষ বায়'আতের পর সাধারণ বায়'আত	১৯৬
সাধারণ বায়'আতের পূর্বে মসজিদে নববীতে হযরত উমরের বক্তৃতা	১৯৬
হযরত সিদ্দীকে আকবরের নিকট বায়'আত নেয়ার আবেদন	১৯৮
সাধারণ বায়'আতের পর হযরত সিদ্দীকে আকবরের প্রথম খুতবা	১৯৮
হযরত আলী (রা)-এর বায়'আত গ্রহণ	২০১
হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর বায়'আত	২০৭
খিলাফতের দায়িত্ব থেকে হযরত সিদ্দীক আকবরের অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়	২০৭
কাহিনী	২০৮
ওসীয়তের মাসয়ালা	২১২
স্বয়ং নবী করীম (সা) কেন আমীর বা খলীফা মনোনীত করেন নি	২১৬
খিলাফতের বিষয় আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা	২১৭
নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ	২১৯
ফিদাকের বাগানের হাকীকত	২২৫
একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন	২২৬
আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জবাব	২২৮
একটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	২৩০
নবী করীম সা)-এর মীরাস	২৩১
হায়াতুন্নবী (সা)	২৩২
একটি সন্দেহ ও এর জবাব	২৪১
হায়াতুন্নবী (সা) সম্পর্কে হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবীর সমাধান ও সমন্বয় সূচক বক্তব্য	২৪৪
মহানবী (সা) পবিত্র স্ত্রীগণ	২৫৬

সূচিপত্র

[দশ]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রয়োজনীয় কতিপয় সূক্ষ্ম বিষয়	২৫৭
উম্মুল মু'মিনীন বা পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা এবং বিবাহের ক্রমধারা	২৬০
উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ	২৬০
উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)	২৬৭
উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা)	২৬৯
উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতে ফারূকে আযম (রা)	২৭৫
উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা)	২৭৬
উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা বিনতে আবূ উমাইয়া (রা)	২৭৬
উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা)	২৭৮
নবীর দৃষ্টির পবিত্রতা	২৮৩
যুহদ, ভোগ-বিলাস ও দুনিয়া বিমুখতা	২৮৯
পর্দার উপর সামগ্রিক পর্যালোচনা	২৯১
পর্দার সুফল ও পর্দাহীনতার কুফল	২৯৩
উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস ইবন যিরার (রা)	৩০০
উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)	৩০১
উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়্যি (রা)	৩০৪
উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রা)	৩০৭
দাসীগণ	৩০৮
হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)	৩০৮
হযরত রায়হানা বিনতে শামঊন	৩০৮
নাফিসা	৩০৮
বহুবিবাহ প্রসঙ্গ	৩০৮
একটি কাহিনী	৩১২
মহানবী (সা) একাধিক বিয়ে কেন করেছিলেন	৩১৪
মানব জীবনের দু'টি দিক	৩১৫
মহানবী (স)-এর সন্তানবৃন্দ	৩১৬
হযরত কাসেম (রা)	৩১৭
হযরত রুকাইয়া (রা)	৩১৮
হযরত উম্মু কুলসুম (রা)	৩১৯
হযরত ফাতিমা (রা)	৩২০
হযরত ইবরাহীম (রা)	৩২১

সূচিপত্র

[এগার]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
রাসূলুল্লাহ (সা) এর হুলিয়া মুবারক (আকৃতি)	৩২২
মুহরে নবুওয়াত	৩২২
দাড়ি মুবারক	৩২৩
পুরুষের জন্য দাড়ি এবং নারীদের জন্য বেণী	৩২৪
মহানবী (সা)-এর পোশাক	৩২৮
হযরত নবী (সা)-এর পোশাক হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুরূপ ছিল (নাউযুবিল্লাহ, তা জাতীয় ও দেশীয় পোশাক ছিল না)	৩৩১
কাফিরদের মত হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা, অর্থাৎ কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন জনিত সমস্যার বিষয়ে সাধারণ আলোচনা	৩৩৩
অনুকরণের স্বরূপ	৩৩৮
জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা	৩৩৯
অনুকরণের পরিচিতি ও সংজ্ঞা	৩৩৯
কাফিরদের অনুকরণের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ	৩৪০
কাফিরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ	৩৪২
অনুকরণের ভয়াবহতা ও ফলাফল	৩৪৫
উন্নয়নের রাজপথ	৩৪৮
ইংরেজি পোশাকের অর্থনৈতিক ফলাফল	৩৫১
অনুকরণের ক্ষতি সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সতর্কতা	৩৫২
মুসলমানদের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ফরমান	৩৫৩
কাফিরদের প্রতি হযরত উমর ফারুক (রা)-এর নির্দেশ	৩৫৩
একটি বিভ্রান্তির জবাব	৩৫৬
ইসলামী পোশাকের পরিচিতি	৩৫৮
দালায়েলে নবুওয়াত ও রিসালাতের দলীলসমূহ অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর মু'জিযাসমূহ	৩৬০
মু'জিযার সংখ্যা	৩৬৩
মু'জিযার শ্রেণী বিভাগ	৩৬৩
বৃদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা	৩৬৪
পৃথিবীতে দীন ইসলামের আগমন	৩৭০
অনুভূত মু'জিযাসমূহ	৩৭১
নবীর মু'জিযার ব্যাখ্যা	৩৭৩

সূচিপত্র

[বার]

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মু'জিযার সংজ্ঞা	৩৭৩
ইলমি মু'জিযা ও আমলী মু'জিযা	৩৭৪
কুরআনুল হাকীম শ্রেষ্ঠ মু'জিয়া	৩৭৪
কুরআন মু'জিযা হওয়ার বিভিন্ন কারণ	৩৭৫
নবী (সা)-এর হাদীস আরেকটি মু'জিযা	৩৭৯
মুসলিম উম্মার উলামায়ে কিরাম নবী (সা)-এর তৃতীয় মু'জিযা	৩৮৩
হযরত নবী (সা) সম্পর্কে পূর্ববতী আম্বিয়ায়ে কেরামের ভবিষ্যদ্বাণী	৩৮৫
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী	৩৮৭
আহলে কিতাবের একটি বিকৃতির উল্লেখ	৩৯৩
আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন	৪৩৬
ফারকালীত শব্দের তাহকীক	৪৪১
খ্রিস্টানদের কতিপয় সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন	৪৫২
গায়েবের সংবাদ ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী	৪৫৮
বরকতময় মু'জিযার দান	৪৭১
দু'আ কবূল হওয়া	৪৭২
রোগীকে সুস্থ করার মু'জিযা	৪৭৪
দশটি পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা	৪৭৫
হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা	৪৭৯
নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	৪৮০
নাসারাদের গুমরাহ হওয়ার কারণ	৪৮১
দীনের তিনটি বুনিয়াদী নীতিমালা	৪৮৩
মহানবী (সা)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ	৪৮৬

بسم الله الرحمن الرحيم

মক্কা মুকাররমা বিজয় (রমযানুল মুবারক, ৮ হিজরী)

হযরত রাসূল করীম (সা) এবং মক্কার কুরায়শদের মধ্যে যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে সন্ধির চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন অন্যান্য গোত্রকে এ সুযোগ প্রদান করা হয় যে, তারা যে কোন গোত্রের সাথে স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে। তদনুসারে বনূ বকর কুরায়শদের সাথে এবং বনূ খুযা'আ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

এ দু'টো গোত্রের মধ্যে জাহিলিয়াতের যুগ থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। এর কারণ ছিল এই যে, মালিক ইবন ইবাদ হাযরামী একবার ব্যবসার মালপত্র নিয়ে বনূ খুযা'আর এলাকায় প্রবেশ করে। খুযা'আ গোত্রের লোকজন তাকে হত্যা করে তাদের সমস্ত মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। বনূ বকর সুযোগ পেয়ে হাযরামীর বদলায় বনূ খুযা'আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে। বনূ খুযা'আ তাদের এক ব্যক্তির পরিবর্তে বনূ বকরের তিন নেতা যুওয়াইব, সালমা এবং কুলসূমকে আরাফাতের ময়দানে হেরেমের সীমানার নিকটে হত্যা করে।

আইয়্যামে জাহিলিয়াত থেকে নবী করীম (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত এ ক্রমধারা অব্যাহত থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলামী বিধি-বিধান পালন করার ফলে এ ক্রমধারা বন্ধ হয়ে যায়।

হুদায়বিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুক্তি হওয়ার কারণে উভয় পক্ষ পরস্পর থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। বনূ বকর তাদের শত্রুতা সাধনের জন্য এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। সুতরাং বনূ বকর গোত্রের নওফেল ইবন মু'আবিয়া দায়লমী তার দলবল সহ 'ওয়াতির' (وتير) নামক একটি কূপের নিকট শায়িত বনূ খুযা'আর কতিপয় লোকের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করে।

কুরায়শদের মধ্যে সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, শায়বা ইবন উসমান, সুহায়ল ইবন আম্র, হুওয়াইতাব ইবন আবদুল উয্যা, মাকরায ইবন হাফস গোপনে বনূ বকরকে সাহায্য করে। বনূ খুযা'আ পলায়ন করে হেরেমে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু তাদেরকে সেখানে হত্যা করা হয়।

কুরায়শগণ বনূ বকরকে অস্ত্র এবং যোদ্ধা সরবরাহ করে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। বনু খুযা'আর লোকজন মক্কায় বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা খুযাঈর বাড়িতে আত্মগোপন করে কিন্তু বনূ বকর ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে হত্যা করে এবং মালামাল লুট করে। তারা এটা ধারণা করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছবে না। ভোরে কুরায়শদের মনে এ ব্যাপারে অনুতাপ সৃষ্টি হয় এবং এটা উপলব্ধি করে যে, আমরা চুক্তিভঙ্গ করেছি। আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে হুদায়বিয়ায় যে সন্ধি করেছি তা ভুলক্রমে ভঙ্গ করেছি।

আমর ইবন সালিম খুযাঈ চল্লিশজনের একটি দল নিয়ে মদীনায় নবী করীম (সা) এর দরবারে উপস্থিত হন। নবী (সা) এ সময় মসজিদে নববীতে উপস্থিত ছিলেন। আম্র ইবন সালিম দাঁড়িয়ে আরয করলেন ঃ

يارب انى ناشد محمداً * حلف ابينا وابيه الا تلدا

"হে আমাদের রব! আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ও দাদা আবদুল মুত্তালিব এর প্রাচীন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এসেছি।" জাহেলিয়াতের যুগে বনূ খুযা'আ আবদুল মুত্তালিব -এর সাথে চুক্তিবদ্ধ (حليف) ছিল।[১]

انَّ قريشا اخلفوك الموعدا * ونقضوا ميثاقك المؤكدا

"নিশ্চয়ই কুরায়শগণ আপনার সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং আপনার শক্তিশালী ও কঠোর অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে।"

هم بيتونا بالوتير هجدا * وقتلونا ركعًا وسجداً

"তারা ওয়াতীর (وتير) নামক স্থানে শায়িত অবস্থায় রাতে আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং রুকূ' ও সিজ্‌দার সময় তারা আমাদেরকে হত্যা করে। "(তাদের মধ্যে কিছু মুসলমান ছিল, নতুবা তারা নিজেরা মুসলমান ছিল না)।

وجعلوا لى فى كداءٍ رصدا * وزعموا ان لستُ ادعو احدا ـ

"কাদা নামক স্থানে লোকজন আমাদেরকে গুপ্তভাবে ঘাঁটির মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে এবং তাদের ধারণা ছিল এই যে, আমি কাউকে আমার সাহায্যের জন্য আহবান করব না।"

وهم اذل واقل عددا * قد كنتم ولداً وكنا والدا

"তারা সবাই ছিল হীন ও অপদস্থ এবং সংখ্যায়ও ছিল কম। আমরা হলাম পিতার স্থানে এবং আপনি সন্তানের স্থানে।"

---

১. এই প্রাচীন চুক্তির বিস্তারীত বর্ণনা আশ আরুস সাহাবা (اشعار الصحابه) এর শরাহ হুসনুস সাহাবা (حسن الصحابه) এর ১ম খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

ووالدا كنا وكنت الولدا * تمت اسلمنا ولم ينزع يدا

"কেননা আবদ মান্নাফ এর মাতা ছিল খুযা'আ গোত্রের এবং কুসাই এর মাতা ফাতিমা বিনতে সা'দও ছিল খুযা'আ গোত্রের। এ সম্পর্কের কারণে আমাদেরকে সাহায্য করা আপনার উপর অবশ্য কর্তব্য, তা ছাড়া আমরা সর্বদা আপনার অনুগত ছিলাম। কখনো আপনার আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়নি। সুতরাং আপনার নিকট আমাদের আশা এই যে, আপনার জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও অঙ্গীকার রক্ষাকারীদেরকে সাহায্য করুন।"

فانصر هداك الله نصرا اعتدا * وادع عباد الله يأتوا مددا

"অতএব আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে সাহায্য করুন, আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন, আল্লাহর খাস বান্দা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামদেরকে নির্দেশ প্রদান করুন, যেন তাঁরা অবশ্যই আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে।"

অন্য এক সংস্করণে আছে فانصر رسول الله نصرا اعتدا "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গভাবে সাহায্য করুন।"

فيهم رسول الله قد تجردا ١* ان سيم خسفا وجهه تربدا

"যখন আল্লাহর বান্দা অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম (রা) আমাদের সাহায্যে আগমন করেন, তখন এই দলে রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্যই থাকবেন যিনি যালিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তৈরি রয়েছেন।" অর্থাৎ শুধু সারীয়া প্রেরণ করবেন না, বরং তিনি স্বয়ং আগমন করবেন। যদি ঐ যালিম আপনাকে কষ্ট দেয়, তাহলে নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারা মর্যাদাবোধের কারণে রক্তিম হয়ে ওঠে।

فى فيلق كالبحر يجرى مزبدا

"এরূপ বাহিনী নিয়ে আগমন করেন যা সাগরের মত গর্জন করতে থাকে।"

এ বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে ইমাম তাহাভীর 'শারহে মা'আনীল আসার' সীরাতে ইবন হিশাম ও রওযুল উনূফ এবং যারকানীর শারহে মাওয়াহিবে উল্লেখ রয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে ফাতহুল বারী গ্রন্থেও উল্লেখ রয়েছে।[২]

মাগাযী ইবন আয়েযে হযরত ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সা) এ ঘটনা শ্রবণ করে বলেন ঃ نصرتَ ياعمرو بن سالم (হে আমর ইবন সালিম, তোমাকে সাহায্য করা হবে)। অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে সাহায্য করা হবে না, যদি তোমাকে সাহায্য না করি। অতঃপর নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন, সমস্ত বনূ বকর কি এতে অংশগ্রহণ করেছে? আমর ইবন সালিম বললেন, সবাই নয়, তবে বনূ বকর থেকে শুধু বনু নাফাসা এবং তাদের সর্দার নওফল এতে

---

১. কোন কোন গ্রন্থে قد تحددا হা মুহমিলার (حاء محملة) সাথে এসছে যার অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া
২. ফাতহুল বারী, ৭ম খ. পৃ. ৩৯৯

অংশগ্রহণ করে। নবী করীম (সা) তাদেরকে সাহায্য করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। অতঃপর এ দলটি ফিরে যায়। এদিকে নবী (সা) মক্কার কুরায়শদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করেন এবং তাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে এই সংবাদ অবহিত করবে যে, তাদেরকে তিনটি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলো ঃ

১. খুযা'আ গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের দিয়ত (মুক্তিপণ) আদায় করতে হবে।

২. অথবা বনূ নাফাসার চুক্তি ও অঙ্গিকার ছিন্ন করতে হবে।

৩. অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি বাতিলের ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

এ সংবাদ নিয়ে দূত তাদের নিকট পৌঁছলে কুরায়শদের পক্ষ থেকে কারতা ইবন আমর এই জবাব প্রদান করে যে, আমরা খুযা'আ গোত্রের নিহতদের মুক্তিপণ আদায় করব না এবং বনূ নাফাসা গোত্রের সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করব না, তবে হুদায়বিয়ার সন্ধি আমরা বাতিল করতে সম্মত আছি। কিন্তু দূত রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কুরায়শদের অনুশোচনা হয় এবং সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ানকে সন্ধির সময় বৃদ্ধির জন্য মদীনায় প্রেরণ করে।[১]

চুক্তি নবায়নের জন্য আবূ সুফিয়ানের মদীনা গমন

আবূ সুফিয়ান চুক্তি নবায়নের জন্য মক্কা থেকে মদীনা যাত্রা করে। এদিকে নবী (সা) সাহাবাগণকে এ সংবাদ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ান সন্ধির সময় বৃদ্ধি ও চুক্তি নবায়নের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনায় আসছে। মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর উসফান নামক স্থানে খুযা'আ গোত্রের বুদাইল ইবন ওয়ারাকার সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাত হয়। আবু সুফিয়ান বুদাইলকে জিজ্ঞাসা করেন, কোথা থেকে আগমন করছো? তিনি বলেন, নিকটবর্তী এক এলাকা থেকে আসছি। এটা বলেই তিনি মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে যান। এরপর আবূ সুফিয়ানের ধারণা হলো, বুদাইল নিশ্চয়ই মদীনা থেকে ফিরে আসছে। সুতরাং যে স্থানে বুদাইলের উট বসেছিল, সেখানে গিয়ে আবূ সুফিয়ান পর্যবেক্ষণ করল। বুদাইলের উটের মল ভাঙ্গার পর তার থেকে যে খেজুর বিচি বের হল তা মদীনার খেজুরের বিচি। আবূ সুফিয়ান বলল, আল্লাহর শপথ! বুদাইল নিশ্চয়ই মদীনা থেকে আগমন করেছে। আবূ সুফিয়ান মদীনা পৌছে প্রথমে তার কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে বলল, হে কন্যা! তুমি বিছানা উল্টে দিয়েছ। বিছানা কি আমার উপযুক্ত মনে করনি অথবা আমাকে বিছানার উপযুক্ত মনে করনি? হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, এটা হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিছানা। যে মুশরিক শিরকের মত অপবিত্রতার সাথে জড়িয়ে রয়েছে, সে এ বিছানায় বসতে পারে না। আবূ সুফিয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, হে কন্যা! আল্লাহ্র শপথ! তুমি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনিষ্টতার মধ্যে মগ্ন রয়েছ। উম্মে হাবীবা (রা) বললেন, অনিষ্টতার

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪; যারকানী, ২ খ. পৃ. ২৯২।

মধ্যে নয়, বরং কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলো ও হিদায়াতের পথে প্রবেশ করেছি। আপনার প্রতি অবাক লাগে যে, আপনি কুরায়শদের সর্দার হওয়া সত্ত্বেও এরূপ পাথর পূজা করেন, যা না শ্রবণ করে, না দেখতে পায়।

আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে উঠে মসজিদে নববীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আমি কুরায়শদের পক্ষ থেকে চুক্তি নবায়ন ও সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য আগমন করেছি। রাসূল (সা) কোন জবাব প্রদান করলেন না। আবূ সুফিয়ান এবার হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গমন করে তাঁকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারব না। অতঃপর আবূ সুফিয়ান হযরত উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করেন। হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহু আকবার। আমি তোমার সুপারিশের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট গমন করব? দুনিয়ায় যদি একটি লোকও পাওয়া না যায়, তবুও আমি একাই জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত আছি। এটা শ্রবণ করে আবূ সুফিয়ান নীরবে হযরত আলী (রা)-এর নিকট গমন করেন। এ সময় তাঁর নিকট হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা) এবং হযরত হাসান (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আবুল হাসান! আমি আপনার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়। আমি একটি জরুরী কাজ নিয়ে এসেছি। আশা করি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাব না। সুতরাং আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট সুপারিশ করুন। হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল (সা) এ ব্যাপারে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কাজেই এ বিষয়ে রাসূল (সা) এর খেদমতে কিছু বলার সাহস কারো নেই। আবূ সুফিয়ান এটা শুনে এবং হযরত ফাতিমা (রা)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)-এর কন্যা! যদি আপনি হযরত হাসানকে এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তিনি যেন এ আহ্বান রাখেন যে, আমি কুরায়শদেরকে নিরাপত্তা দান করলাম। তা হলে আরবের সর্দার হিসেবে তাঁকে সর্বকালের জন্য মেনে নেয়া হবে। হযরত ফাতিমা (রা) বলেন, প্রথমত, হাসান অপ্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ নিরাপত্তা প্রদান করা বয়স্কদের কাজ। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মতের বিরুদ্ধে কে নিরাপত্তা প্রদান করতে পারবে? আবূ সুফিয়ান হযরত আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলল, ঘটনা অত্যন্ত জটিল ও কঠোর হয়ে গিয়েছে। তবে আমাকে কিছু পন্থা শিখিয়ে দিন। হযরত আলী (রা) বলেন, যদি আপনি নিজের জন্য এটা ফলপ্রসূ ও কার্যকর মনে করেন, তাহলে মসজিদে গিয়ে এ ঘোষণা দিতে পারেন যে, আমি হুদায়বিয়ার চুক্তি নবায়ন ও সময়সীমা বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। এটা বলে আপনি নিজ শহরে গমন করুন। সুতরাং আবূ সুফিয়ান সেখান থেকে মসজিদে উপস্থিত হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, আমি চুক্তি নবায়ন এবং সময়সীমা বর্ধিত করার জন্য এসেছিলাম। অতঃপর তিনি মক্কা ফিরে যান।

আবূ সুফিয়ান মক্কা পৌছার পর নেতৃবৃন্দের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। কুরায়শরা বলল, হযরত মুহাম্মদ (সা) কি তোমার ঘোষণাকে বৈধতা দান করেছেন? আবূ সুফিয়ান বলল, না। তারা বলল, হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সন্তুষ্টি ও সম্মতি ব্যতীত তুমি কিভাবে সম্মত হলে এবং নিরাপদ হয়ে গেলে? এরূপ বাতিল ও নিষ্ফল বস্তু নিয়ে ফিরে এসেছ যা ভঙ্গ করা তাঁর জন্য কঠিন নয়। আল্লাহর শপথ! হযরত আলী (রা) তোমার সাথে ঠাট্টা করেছে। তুমি সন্ধির এমন সংবাদ নিয়ে আগমন করনি যার ফলে নিরাপদ হওয়া যায় এবং এরূপ যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে এসেছ যার জন্য আসবাবপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করা যায়। আবূ সুফিয়ানের ফিরে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবাগণকে গোপনে মক্কা গমনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং এই তাকীদ ও সতর্ক করেন যে, বিষয়টি যাতে গোপন রাখা হয়, প্রকাশ করা না হয়। এছাড়া আশেপাশের গোত্রসমূহকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়।[১]

হাতিব ইবন আবূ বালতা'আর ঘটনা

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, ইতোমধ্যে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা) মক্কাবাসীর নিকট এটা বলে একটি পত্র প্রেরণ করেন যে, নবী (সা) মক্কা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। গোপনে একজন মহিলার হাতে এই পত্র দিয়ে তাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-কে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তিনি হযরত আলী, হযরত যুবায়র ও হযরত মিকদাদকে এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেন যে, তোমরা সোজা রওযায়ে খাক নামক স্থানে গমন করে উটের উপর আরোহী অবস্থায় একজন মহিলাকে দেখতে পাবে। তার সাথে মক্কার মুশরিকদের নামে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ কর্তৃক প্রেরিত একটি পত্র পাবে। তা ঐ মহিলার কাছ থেকে নিয়ে আসবে। হযরত আলী (রা) বলেন, সুতরাং রওযায়ে খাখে পৌঁছে আমরা মহিলাকে পেলাম। তার উট বসিয়ে আমরা খোঁজ করেও কোন পত্র পেলাম না। আমরা বললাম, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো ভুল বলতে পারেন না।

আমরা ঐ মহিলাকে বললাম, উত্তম হবে যে, স্ব-ইচ্ছায় ঐ পত্রটি আমাদের নিকট হস্তান্তর কর। অন্যথায় প্রয়োজনে যে কোন উপায়ে খোঁজ করে তা বের করব। ফলে ঐ মহিলা তার কোমর থেকে পত্র বের করল, আমরা তা নিয়ে নবী (সা)-এর নিকট হাযির হলাম। তিনি হাতিব ইবন আবূ বালতা'আকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি যে কাজ করেছ এর কারণ কি? হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! দ্রুত শাস্তি প্রদান করবেন না। কুরায়শদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তার বন্ধন নেই; শুধু চুক্তির সম্পর্ক রয়েছে। আমার পরিবারবর্গ বর্তমানে মক্কায় রয়েছে কিন্তু সেখানে তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। পক্ষান্তরে মক্কায় মুহাজিরগণের আত্মীয়-স্বজন থাকায়

১. যারকানী, ২ খ. পৃ. ২৯৩।

তাদের পরিবারবর্গ নিরাপদে রয়েছে। যেহেতু কুরায়শদের সাথে আমার কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, তাই আমি তাদের জন্য এমন কিছু কল্যাণকর কাজ করতে চেয়েছি যার ফলে তারা আমার পরিবারবর্গকে হিফাযত করবে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি দীন থেকে মুরতাদ হয়ে এবং ইসলামের পর কুফরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একাজ করিনি। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যা আমি উল্লেখ করেছি। (সহীহ বুখারী)।

ইবন মারদুবিয়ার রিওয়ায়াতে হযরত উমর (রা) থেকে হযরত ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেনঃ فكتبت كتابًا لايضر الله ورسوله

"অতঃপর আমি একটি পত্র লিখেছি (যাতে আমার এই ফায়দা রয়েছে) এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কোন ক্ষতি নেই।"

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ঘটনা শুনে বলেনঃ اما انه قد صدقكم "সাবধান! নিশ্চয়ই সে তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।"

হযরত উমর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ মুনাফিককে হত্যার অনুমতি প্রদান করুন। নবী করীম (সা) বলেনঃ

انه قد شهد بدرًا ومايدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ماشئتم قد غفرت لكم۔

"নিঃসন্দেহে হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। হে উমর! তুমি কি অবগত নও যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের দৃষ্টিতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণকে উদ্দেশ্য করে এই ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, "তোমাদের যা ইচ্ছা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এ কথা শুনে হযরত উমর (রা)-এর চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি আরয করলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল অধিক জ্ঞাত আছেন।

অর্থাৎ যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, তিনি কখনো মুনাফিক হতে পারেন না। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমন জীবনবাজী ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন যে, আরশ উত্তোলনকারী এবং নৈকট্যলাভকারী ফিরিশ্‌তাগণও আশ্চর্য এবং হতবাক হয়ে পড়েন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে, হোক সে পিতা, পুত্র, ভাই অথবা বন্ধু, নির্বিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে তাদেরকে হতাহত করেছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বতে তাঁরা এরূপ বিভোর ও মগ্ন ছিলেন যে, আপনজনও তাদের নিকট পর হয়ে গিয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কুফর ও শিরকের মূলে এরূপ আঘাত করেন, যার ফলে কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটিত হয়।

এই বিমল কর্মকাণ্ডের ফলে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ এবং أُولٰئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ এই অমূল্য খেতাব তাঁদেরকে

দান করা হয় এবং ভবিষ্যতে যে পাপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার অর্থ صيغه فماغفرت لكم صيغه مستقبل কিন্তু দ্বারা বর্ণনা করেছেন ماضى فقد غفرت لكم দ্বারা বর্ণনা করা হয়নি। যাতে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের গুনাহ মাফ হওয়া অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, তাঁদের মাগফিরাত অতীতকালের মত নিশ্চিত হয়ে যায়।

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ এর সম্বোধন দ্বারা মার্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এর দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সমস্ত লোক যা কিছু করুক না কেন কিন্তু কোন অবস্থাতেই ক্ষমা ও মাগফিরাতের সীমা অতিক্রম করবে না। اعملوا ماشئتم -এর খেতাব গুনাহ্ -এর বৈধতা ও অনুমতির জন্য ছিল না। এরূপ সম্বোধন ঐ সমস্ত প্রিয়ভাজন ও অন্তরঙ্গ লোকজনের জন্য হয়ে থাকে যাঁদের দ্বারা স্বীয় মাহবুবের নাফরমানী সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাহ্যিকভাবে ছিল একটি নেককাজ কিন্তু বাস্তবে তা হলো অসংখ্য নেককাজের মুখবন্ধ বা উৎস এবং ঈমান ও ইহসান, সত্য ও ইসলামের একটি সনদ। সুতরাং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর পক্ষ থেকে মানুষ হিসেবে যদি কোন ত্রুটি প্রকাশ পায় তা হলেও এটা رضى الله عنهم ورضوا عنه এবং اولئك كتب فى قلوبهم الايمان এ দু'টো আয়াতের মর্মবাণীর সীমা অতিক্রম করতে পারে না। কেননা, এটা ঐ সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সংবাদ, যাতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত আছেন যে, তাঁদের থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে। কিন্তু এই চিরন্তন জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদেরকে (সাহাবায়ে কিরামকে) رضى الله عنهم ورضوا عنه আয়াতের খেতাব দ্বারা সম্মানিত করেছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বিরাট হাসানা ও উত্তম কাজের পর তাঁদের থেকে এমন কোন ত্রুটি প্রকাশিত হবে না, যা তাঁদের উক্ত নেক ও হাসানাকে মিটিয়ে দিতে পারে বরং এই মর্যাদা ও হাসানাই ভবিষ্যতের ত্রুটির কাফ্ফারা হয়ে যেতে পারে। যেমন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ "নিশ্চয়ই নেকীসমূহ গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়"। জনৈক কবি খুবই উত্তম কথা বলেছেন ঃ

اذ الحبيب اتى بذنب واحدٍ * جَاءت محاسنه بالف شفيع

"যদি বন্ধু থেকে কোন একটি ত্রুটি প্রকাশ হয়ে যায়, তা হলে তার পূর্ববর্তী উত্তম কাজসমূহ অসংখ্য সুপারিশ নিয়ে সামনে উপস্থিত হয়।"

অন্তরে যদি কোন অনিষ্ট ও ক্ষতিকর কিছু না থাকে, তা হলে নাফরমানি তেমন কোন ক্ষতি করতে পারে না বরং অন্তরের ঈমানী শক্তি তাকে তাওবা ও ইসতিগফার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যার ফলে তার পাপই শুধু ক্ষমা হয় না, বরং পাপ পূণ্যে পরিণত হয়ে যায়। আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ـ

"কিন্তু যারা কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও নেক আমল করেছে, আল্লাহ এ সমস্ত লোকদের গুনাহ্‌কে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭০)

বান্দা যখন তাওবা ও ইসতিগফার করেন তখন আল্লাহ তা'আলা তার পাপকে নেক দ্বারা এবং মন্দকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তন করে দেন।

مرکب توبه عجائب مرکبست * برفلك تازدیهبه یك لحظه زپست
چون برارنزاز پشیمانی اهنں * عرش لرزدازانین المذنبین

"তাওবা নামক বাহনটি এমন বিস্ময়কর বাহন যার গন্তব্য আকাশ পানে এবং নিমিষেই জিরো থেকে হিরোতে পৌঁছিয়ে দেয়।"

"যখন লজ্জিত হয়ে (তাওবাকারী ব্যক্তি) অশ্রু প্রবাহিত করে; পাপীদের সেই অশ্রুতে মহান সত্তার আরশ বিগলিত হয়ে যায়।"

উপরোক্ত আয়াত সাধারণভাবে সমস্ত মু'মিনের জন্য প্রযোজ্য। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ এজন্য সর্বাধিক যোগ্য ও হকদার। যার অন্তরে কোন অনিষ্টতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রবণতা বিদ্যমান থাকে কোন আনুগত্য ও ইবাদতই তার জন্য কোন ফলদায়ক হবে না। যেমন, অভিশপ্ত ইবলিস, খারেজী ও রাফিযী দল যতই নামায-রোযা ও ইবাদত করুক না কেন, যতক্ষণ অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত না হবে এবং ফাসাদ সৃষ্টির প্রবণতা দূরীভূত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আনুগত্য ও ইবাদত ফলদায়ক ও উপকারী হবে না।

পিত্তজনিত রোগীকে অতি উত্তম খাদ্য প্রদান করা হলেও তার জন্য এটা বিষতুল্য বলে প্রতীয়মান হবে। যেমন, আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

"তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ১০)

সৎ ও সুস্থ মস্তিষ্কের কোন লোক যদি ভুলক্রমে কোন ত্রুটি করে, তা হলে এর জন্য কোন বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তার স্বভাব বা চরিত্রই ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি দূর করতে পারে।

হযরত উমর (রা) হযরত হাতিব (রা)-এর ত্রুটিকে ষড়যন্ত্রমূলক মানসিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং নিফাকের দোষে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে হত্যার অনুমতি কামনা করেন। মহানবী (সা) জবাবে বলেন, হে উমর! হাতিবের অন্তর নিফাকের ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এটা নিফাক নয় বরং উদাসীনতার কারণে

ত্রুটি হয়ে গিয়েছে। রূহানী মেযাজ বা অভ্যন্তরীণ মানসিকতা স্বাভাবিক আছে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাঁদেরকে খাঁটি স্বর্ণে পরিণত করেছে। ঘটনাক্রমে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটে গিয়েছে। সুস্থ মানুষেরও কখনো কখনো সর্দি-কাশি হয়ে থাকে কিন্তু এটা থেকে আরোগ্য লাভের জন্য তেমন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। স্বাভাবিক প্রকৃতিই এই ক্ষণস্থায়ী ব্যাধি দূরীভূত করতে পারে।

নবী করীম (সা) হযরত হাতিব (রা)-কে ডেকে শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, হে হাতিব! এটা কিরূপ ঘটনা? এই আকস্মিক ঘটনা ও অভিযোগ এরূপ ফলদায়ক হলো যে, মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর ব্যাপারে আর কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) ইসকান্দরিয়ার বাদশাহ্র নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র দিয়ে হযরত হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-কে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন। সুবহানাল্লাহ! নবী করীম (সা)-এর দরবার কত মহান ছিল। একদিকে হযরত হাতিব (রা)-কে ভুল সংশোধনের তালীম দেয়া হচ্ছে, অপরদিকে হযরত উমর (রা)-কে রূহানী চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দান করা হচ্ছে, যাতে প্রয়োজনানুযায়ী হযরত উমর (রা) অপরাধ নির্ধারণ ও সংশোধনে ভুল না করেন।

হযরত হাতিব (রা) এর পত্রের বিষয়বস্তু

হযরত হাতিব (রা)-এর পত্রের বিষয়বস্তু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উদ্দেশ্য মুনাফেকী ছিল না। পত্রটি হলো ঃ

أما بعد يامعشر قريش فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فو الله لوجاءكم وحده لنصره الله وانجزله وعده فانظروا لانفسكم والسلام ـ

"হে কুরায়শ গোত্র! রাসূলুল্লাহ (সা) অন্ধকার রাতের মত ভয়াবহ এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করবেন যা বন্যার মত প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্র শপথ! যদি রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং একাকীও তোমাদের নিকট আগমন করেন তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং বিজয় ও সাহায্যের জন্য যে ওয়াদা আল্লাহ পাক তাঁকে দিয়েছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন।

অর্থাৎ তাঁর বিজয় সৈন্যসামন্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। অতএব, তোমাদের পরিণাম তোমরাই ভেবে দেখ। ওয়াস সালাম।"

এই পত্রটি ইয়াহ্ইয়া ইবন সালাম স্বীয় তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, আল্লামা কাসতাল্লানী (র) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যায় কিতাবুল জিহাদে 'গুপ্তচরের বিধান অধ্যায়ে' পত্রটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ফাতহুল বারী গ্রন্থে 'গাযওয়াতুল ফাতহ' অধ্যায়ে এবং 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ২০৪।

এই পত্রের বিষয়বস্তু فكتبت كتاباً لايضر الله ورسوله (আমি এরূপপত্র লিখেছি যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য অনিষ্টকর নয়) হযরত হাতিব (রা)-এর ওজরের স্পষ্ট ও সত্যতা প্রমাণ করছে।

ওয়াকিদীর রিওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, পত্রটি সুহায়ল ইবন আমর, সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা এবং ইকরামা ইবন আবূ জাহলের নামে প্রেরণ করা হয়েছিল। এই তিনজনই মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

অপর এক রিওয়ায়াতে পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ উল্লেখ রয়েছে–

أن محمدا قد نفر فاما اليكم واما الى غيركم فعليكم الحذر .

"নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সা) গাযওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করবেন। এটা জানা নেই যে, তিনি কোনদিকে গমন করবেন। তোমাদের দিকে, না অন্য দিকে। সুতরাং তোমরা তোমাদের নিজেদের নিয়ে চিন্তা কর।" (যারকানী, ২য় খ, পৃ. ২৯৮)

আল্লাহ তা'আলা হাতিব (রা)-এর ঘটনাকে উল্লেখ করে সূরা মুমতাহিনা নাযিল করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ কর, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে, তা তারা অস্বীকার করছে।" (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১)

আল্লাহ পাক এ আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের পদ্ধতি সংক্রান্ত বিধান পেশ করেছেন।

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা

মহানবী (সা) ৮ হিজরীর ১০ রমযান বাদ আসর ১০ হাজার মুসলমানের এক বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যাত্রা করেন। উম্মুল মু'মিনীনগণের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা ও হযরত মায়মূনা (রা) তাঁর সাথে ছিলেন। (বুখারী ও ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ২)

নবী করীম (সা) যখন যুল-হুলায়ফা অথবা জুহফা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত আব্বাস (রা) স্বীয় পরিবারবর্গসহ মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করে যাওয়ার পথে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। নবী (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আব্বাস (রা) তাঁর আসবাবপত্র মদীনায় প্রেরণ করেন এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-এর মুসলিম বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। হযরত আব্বাস (রা) পূর্বেই

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ২৯৭।

ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা কুরায়শদের নিকট গোপন রেখেছিলেন। নবী (সা) বললেন, হে আব্বাস! তোমার হিজরত হলো সর্বশেষ হিজরত, যেমন আমার নবুওয়াত হলো সর্বশেষ নবুওয়াত। নবী করীম (সা)-এর নির্দেশেই হযরত আব্বাস (রা) মক্কায় অবস্থান করেন, মক্কা থেকে নবী (সা)-কে কুরায়শদের সংবাদ প্রেরণ করতে থাকেন।

মুসনাদে আবু ইয়ালা এবং মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় অবস্থানকালে হযরত আব্বাস (রা) রাসূল (সা)-এর নিকট মদীনায় হিজরতের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন।

নবী (সা) এর জবাবে লিখেন, হে চাচা! আপনি আপনার স্থানে অবস্থান করুন, আল্লাহ পাক আপনার মাধ্যমে হিজরত সমাপ্ত করবেন, যেমন আমার উপর নবূওয়াত সমাপ্ত করেছেন। (যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩০০)

আবওয়া[১] নামক স্থানে আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস[২] এবং আবদুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়া ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনা যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মুসলিম বাহিনীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিব নবী (সা) এর চাচাত ভাই ব্যতীত তাঁর দুধ ভাইও ছিলেন। হযরত হালীমা সা'দীয়ার দুধ পান করেছিলেন, নবুওয়াতের পূর্বে নবী (সা) এর বন্ধু ছিলেন। কোন সময়ই নবী (সা) থেকে আলাদা হতেন না। নবুওয়াতের পর দোস্ত দুশমনে পরিণত হয়ে গেল। নবী (সা) এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করেন। হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) তার কবিতার জবাবে কবিতা রচনা করেন। আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস এর সাথে ছিলেন তার পুত্র জা'ফর।

আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়া রাসূল (সা)-এর ফুফাত ভাই ছিলেন। অর্থাৎ তিনি নবী (সা)-এর ফুফু আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব-এর পুত্র ছিলেন। তিনিও রাসূল (সা) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন, উভয়েই রাসূল (সা) এর মহান দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করেন, এ দু'ব্যক্তি দ্বারা রাসূল (সা) অনেক কষ্ট পেয়েছেন, ফলে তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেননি। উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) সুপারিশ করে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! একজন হলো আপনার চাচাত ভাই আর অপরজন হলো আপনার ফুফাত ভাই। নবী (সা) বললেন, আমার চাচাত ভাই আমার অনেক অনিষ্ট করেছে। আর ফুফাত ভাই হলো এরূপ ব্যক্তি, যে মক্কায় এ কথা বলত যে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনই তোমার উপর ঈমান আনয়ন করব না এমন কি তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে না চড়বে এবং আমি স্বয়ং চোখে প্রত্যক্ষ করব যে, তুমি আকাশ থেকে এক দস্তাবিজ নিয়ে চারজন ফিরিশতাসহ অবতরণ করছ এবং তারা সাক্ষ্য

---

১. ابواء। হামযার উপর যবর এবং باء এর উপর সাকিন মক্কাও মদীনার মধ্যবর্তী একটি গ্রামের নাম।
২. ইনি হলেন আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস যিনি প্রখ্যাত আবু সুফিয়ান ব্যতীত অন্যজন।

দিচ্ছে যে, তোমাকে আল্লাহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন কিন্তু তবুও তোমার উপর আমি ঈমান আনয়ন করব না।

হযরত উম্মে সালামা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মহান চরিত্রের নিকট এ আশা পোষণ করা হচ্ছে যে, আপনার করুণা ও সহানুভূতি থেকে আপনার চাচাত ও ফুফাত ভাই কিছুতেই বঞ্চিত হবে না। কেননা আপনার করুণা ও দয়া যেহেতু সার্বজনীন, সুতরাং তারা কেন বঞ্চিত হবে।

اقربارا كجاكنى محروم * توكه بادشمنان نظردارى

"(হে মহান বনী) আপনি শত্রুদের যেখানে করুণা করে থাকেন, সেখানে আপন জনদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করবেন।"

এদিকে আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস এই ঘোষণা করে যে, যদি আপনি (রাসূল সা.) আপনার মহান দরবারে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান না করেন তাহলে আমি আমার পুত্র জা'ফরকে নিয়ে কোন মরুভূমিতে চলে যাব এবং সেখানে ক্ষুধা ও পিপাসায় অভুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করব। রাসূল (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সালামা (রা)-এর সুপারিশ এবং এই দু'ব্যক্তির অনুতাপ ও অনুশোচনা দেখে তাদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করেন। উপস্থিত হয়েই তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলিম বাহিনীর সাথে মক্কা রওয়ানা হন।

হাফিয ইবন আবদুল বার এবং তাবারী কর্তৃক বর্ণিত, হযরত আলী (রা) আবূ সুফিয়ান ইবন হারিসকে এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারার সামনে দাঁড়িয়ে ঐ কথা বলবেন যা হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণ তাঁকে বলেছিলেন। অর্থাৎ তাঁর ভাইগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে বলেছিলেন ঃ

تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ

"আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে আমাদের উপর ফযীলত দান করেছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৯১)

হযরত আলী (রা) সামনে আসার পরামর্শ এজন্য দিয়েছেন যাতে নূরানী চেহারার প্রভাবে নবী (সা) এবং অসন্তোষের মধ্যে এক পর্দা বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। বস্তুত ঘটনা এরূপ হলো যে, রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে বের হলো ঃ

لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাময়।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৯২)

আবূ সুফিয়ানের ওজর ও প্রার্থনা গৃহীত হয় এবং হাদীসের বাণী الاسلام يهدم ماكان قبله (ইসলাম পূর্ববর্তী অপরাধ ও পাপ মিটিয়ে দেয়) অর্থাৎ ইসলামের আলো

আবূ সুফিয়ান ইবন হারিসের অন্তরকে এরূপ নির্মল ও পরিচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার মধ্যে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কোন ক্রোধ ও অসন্তোষ বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রইল না, বরং ঈমান, ইহসান ও ইখলাসে তাঁর অন্তর এরূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল যার ফলে কুফরের কোন ধূলিকণা তথা বৈশিষ্ট্য তাঁর অন্তরে পৌছতে পারল না এবং তখন থেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির পথে জীবন উৎসর্গ ও বিলিয়ে দেয়ার জন্য নবী (সা)-এর সাথীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

কথিত আছে, আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) লজ্জার কারণে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রাসূল (সা)-এর দিকে চোখ উঠিয়ে তাকাননি এবং নবী (সা) তাঁর জন্য বেহেশতের সুসংবাদ দান করতেন। (যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩০০-৩০২)

আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) অতীত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لعمرك انى يوم أحمل رأية * لتغلب خيل اللات خيل محمد

"শপথ আপনার পবিত্র জীবনের, নিশ্চয়ই আমি লাতের (দেবতার) বাহিনীকে মুহাম্মদ (সা)-এর বাহিনীর উপর বিজয় লাভের জন্য যে দিন ঝাণ্ডা উড়িয়েছিলাম।"

لكا لمدلج الحيران اظلم ليله * فهذا اوانى حين اهدى واهتدى

"ঐ দিন আমি অন্ধকার রাতের পথচারীদের মত হয়রান পেরেশান ছিলাম, আল্লাহ পাকের প্রশংসা, তখন এমনি মুহূর্ত যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রদান করা হচ্ছে এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হচ্ছি।"

এ ছাড়াও তিনি অনুতপ্ত হয়ে আরো কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। (দেখুন সীরাতে ইবন হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩)

আবদুল্লাহ ইবন আবূ উমাইয়ার (রা) ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থা এই হলো যে, লজ্জা ও অনুশোচনার কারণে চোখ উঠিয়ে রাসূল (সা)-এর দিকে তাকাতে পারতেন না।

নবী (সা) মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় সাহাবায়ে কিরামসহ সবাই রোযা অবস্থায় ছিলেন। কাদীদ[১] নামক স্থানে পৌছে সাহাবাদের কষ্ট অনুভব করে রাসূল (সা) রোযা ভঙ্গ করেন। সাহাবাগণও তাঁর অনুসরণ করে রোযা ভঙ্গ করেন।

প্রথমত, সফর তো এমনিতেই কষ্টকর। অন্যদিকে এই ছিল জিহাদের জন্য কিন্তু সময় হলো গ্রীষ্মকাল। ফলে দুর্বলতার কারণে আল্লাহর পথে জিহাদের ফরয যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। এ কারণে হাদীসে বর্ণিত আছে ليس من البر الصيام فى السفر (সফরে রোযা রাখায় কোন নেকী নেই) হ্যাঁ, সফর যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে না হয় এবং সফরে কোন কষ্ট না হয়, তাহলে রোযা রাখাই উত্তম। রমযানের রোযা যদিও কাযা করা সম্ভব কিন্তু রমযানের নূর ও তাজাল্লী, সর্বদা ফিরিশ্‌তাগণের উঠা

১. এ স্থানটি মক্কা মুকাররমা থেকে ৭২ মাইল দূরে অবস্থিত।

ও নাযিলের বরকত, শয়তানদের পায়ে বেড়ী লাগানো, বেহেশত ও রহমতের দরযাসমূহ খুলে দেয়া, দোযখের দরযা বন্ধ করে দেয়া, কুরআনে হাফিযদের দিবারাত্র আল্লাহর কালাম কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকা, ফিরিশ্তাগণের যিকিরের মজলিস এবং তাসবীহ্-তাহলীল এবং তিলাওয়াতে কুরআনের মাহফিল তালাশ করা– এ সমস্ত রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে কিভাবে পাওয়া যাবে। এ জন্য আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অসুস্থ ও সফরকারীর জন্য যদিও রোযা ভঙ্গ করা জায়েয কিন্তু রোযা রাখাই উত্তম। ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে সফরে রোযা রাখা উত্তম।

মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যে দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীর বাহিনী আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাওহীদের বাণী প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সফর করছিল, তাঁদের জন্য প্রয়োজনে নামায বিলম্বও করা যেতে পারে যা রোযা থেকে নিঃসন্দেহে উত্তম, যা দীনের জন্য স্তম্ভ স্বরূপ এবং ঈমানের পর সবচেয়ে উত্তম আমল। সুতরাং জিহাদের সফরে রোযা না রাখা উত্তম, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে জীবন উৎসর্গ করে জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া এরূপ নিয়ামত, যার উপর আসমান ও যমীনের ফিরিশ্তাগণ ঈর্ষা করেন, এ অবস্থায় রোযা ভঙ্গের কারণে যদিও তাসবীহ্-তাহ্লীল, তাহ্মীদ এবং ফিরিশ্তা অবতরণের বরকত থেকে অধিক ফায়দা অর্জিত নাও হতে পারে কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রফুল্লচিত্তে সকাল-সন্ধ্যা চলার মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের লাখো মনযিল অতিক্রম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হাজার বছর অব্যাহতভাবে তাসবীহ্-তাহলীল করেও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের এই স্তর সে অতিক্রম করতে পারবে না, যা জিহাদের উদ্দেশ্যে সামান্য পদক্ষেপে অর্জিত হয়ে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে (একজন মুজাহিদ) সাত মাইল অতিক্রম করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তম আকাশের উপর পৌছে। এদিকে বিক্ষিপ্ত ও জীর্ণ মাথার চুল, খোলা মাথা এবং অনাবৃত পা, নিজের প্রিয় জীবনকে বেহেশতের বদলে আল্লাহ পাকের হাতে বিক্রি ও সোপর্দ করার জন্য যাচ্ছে, যাতে দ্রুত ক্রেতার (আল্লাহ তা'আলার) নিকট অর্পণ করে এর মূল্য বাবদ বেহেশত আদায় করতে পারে। আল্লাহ না করুন, কোন দস্যু (শয়তান) যাতে এই ক্রয়-বিক্রয়ে (জিহাদে অংশগ্রহণ ও বেহেশত লাভ) বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। নতুবা আফসোসের সম্মুখীন হতে হবে এবং আসমান ও যমীনের ফিরিশতাগণ ঈর্ষা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকবেন।

মাররায যাহ্রান নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন

নবী (সা) কাদীদ নামক স্থান থেকে রওয়ানা হয়ে ইশার সময় মাররাযযাহ্রান নামক স্থানে পৌছেন। সেখানে তাঁবু স্থাপন করার পর প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় তাঁবুর সামনে অগ্নি প্রজ্বলিত করার জন্য মুসলিম বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন। অগ্নি প্রজ্বলিত করা ছিল আরবের একটি প্রাচীন রীতি। তদনুযায়ী তিনি এ নির্দেশ প্রদান করেন। চুক্তিভঙ্গ

করার ফলে কুরায়শদের মধ্যে এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ (সা) কখন তাদের উপর আক্রমণ করে বসেন। সুতরাং আবূ সুফিয়ান ইবন হারব, বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা এবং হাকীম সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়। মাররায যাহরান (مَرَّ الظهران) নামক স্থানের নিকট পৌঁছলে মুসলিম বাহিনী তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এতে তারা ভয় পেয়ে যায়। আবূ সুফিয়ান বলল, এ আগুন কাদের প্রজ্বলিত ? বুদায়ল বলল, এ আগুন হলো খুযা'আ গোত্রের। আবূ সুফিয়ান বলল, এত বিশাল বাহিনী খুযা'আ গোত্রের কোথা থেকে আসবে, তারা তো খুবই নগণ্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রহরীগণ তাদের দেখামাত্র গ্রেফতার করলো। প্রহরীদেরকে তারা জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে ইনি কে? তারা বলল, ইনি হলেন আল্লাহ্র রাসূল, আমরা তাঁর সাহাবা, তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। এ সময় হযরত আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খচ্চরের উপর আরোহণ করে এদিকে আসেন। আবূ সুফিয়ানের কণ্ঠের আওয়ায শুনে তিনি তাকে বললেন, আফসোস! হে আবূ সুফিয়ান! এ সমস্ত হলো নবী করীম (সা) এর বাহিনী। আল্লাহ্র শপথ! যদি তিনি তোমাদের ওপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে তোমাকে হত্যা করবেন। সুতরাং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁর নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করা কুরায়শদের জন্য উত্তম হবে।

আবূ সুফিয়ান বলল, আমি আওয়ায শুনে খোঁজ করে হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আবুল ফযল! (হযরত আব্বাসের উপাধি) আমার পিতামাতা তোমার উপর উৎসর্গ হোক, এখন আমাদের মুক্তি পাওয়ার উপায় কি? হযরত আব্বাস (রা) বললেন, আমার পিছনে খচ্চরের উপর আরোহণ কর। তোমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হব। এবং তোমার জন্য নিরাপত্তার আবেদন করব। হযরত আব্বাস (রা) আবূ সুফিয়ানকে সাথে নিয়ে মুসলিম বাহিনী পরিদর্শন করে চলেছেন, তারা হযরত উমর (রা)-এর নিকট দিয়ে গমনের সময় তিনি আবূ সুফিয়ানকে দেখেই তার পিছনে ছুটে এসে বলেন, এ হলো আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের দুশমন আবূ সুফিয়ান। আল্লাহর প্রশংসা, কোন অঙ্গীকার ব্যতীত আমাদের হস্তগত হয়েছে। হযরত উমর (রা) পায়ে হেঁটে চলছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) খচ্চরের উপর আরোহণ করে আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে খুব দ্রুত নবী হযরত (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এদিকে হযরত উমর (রা) পিছনে পিছনে তলোয়ার উত্তোলন করে নবী (সা)-এর নিকট হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ ব্যক্তি হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের দুশমন আবূ সুফিয়ান। আল-হামদুলিল্লাহ, কোন অঙ্গীকার ব্যতীত আজ হস্তগত হয়েছে। আমাকে অনুমতি দান করুন, আমি তাকে হত্যা করব। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে নিরাপত্তা দান করেছি। হযরত উমর (রা) তলোয়ার

নিয়ে দাঁড়িয়ে বার বার একই আরয করছিলেন এবং আবূ সুফিয়ানকে হত্যার জন্য নবী (সা)-এর ইশারার অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, হে উমর! একটু থাম। যদি এ ব্যক্তি বনূ আদী গোত্রের হতো তাহলে তুমি তাকে হত্যার জন্য এভাবে জোর তাকিদ করতে না। যেহেতু তুমি অবগত আছ যে, এ ব্যক্তি হলো বনূ আবদ মান্নাফ গোত্রের, তাই তাকে হত্যার জন্য তুমি বারবার চেষ্টা করছ। হযরত উমর (রা) বললেন, হে আব্বাস! আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। যদি আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করতো তাহলে আমি এত আনন্দিত হতাম না, যতটুকু তোমার ইসলাম গ্রহণের জন্য আনন্দিত হয়েছি। কেননা এটা আমি খুব ভালভাবে জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল। তোমার ব্যাপারে আমার হলো এই ধারণা, সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা তা মনে কর।

রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ানকে তোমার তাঁবুতে নিয়ে যাও, ভোরে আমার নিকট নিয়ে এস। আবূ সুফিয়ান সারা রাত হযরত আব্বাস (রা)-এর তাঁবুতে ছিলেন। হাকীম ইবন হিযাম এবং বুদায়ল ইবন ওয়ারাকা ঐ সময় নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রাসূল (সা) তাঁদের সাথে মক্কার অবস্থা নিয়ে আলাপ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁরা উভয়ে মক্কায় গিয়ে মক্কাবাসীদেরকে নবী (সা) আগমনের সংবাদ প্রচার করেন।

আবূ সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্বাস (রা) ভোর হওয়ার সাথে সাথেই আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা) আবূ সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আফসোস হে আবূ সুফিয়ান! এখনো কি সময় আসেনি যে, তুমি এটা বিশ্বাস করবে যে, لا إله إلا الله "আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই।"

আবূ সুফিয়ান বললেন! আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, আপনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং আত্মীয়দের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ থাকত তাহলে আজ আমাদের কিছু উপকার হতো এবং আপনার বিপক্ষে তার কাছে সাহায্য কামনা করতাম।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আফসোস হে আবূ সুফিয়ান! তোমার কি এখনো সময় আসেনি যে, তুমি আমাকে আল্লাহ তা'আলার রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করবে? আবূ সুফিয়ান বললো, আমার মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত

ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল এবং আত্মীয়দের প্রতি সবচেয়ে বেশি দরদী ও ক্ষমাশীল, এখনো আপনি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে যাচ্ছেন যে, আমার এত মারাত্মক শত্রুতা সত্ত্বেও আমার উপর দয়া প্রদর্শন করছেন, আপনি প্রকৃতই নবী কিনা এ বিষয়ে এখনো আমার সন্দেহ রয়েছে।

অতঃপর হযরত আব্বাস (রা)-এর উপদেশে আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করে। আবূ সুফিয়ান মুসলমান হয়ে যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান হলো মক্কার সর্দার, গর্ব পসন্দ করে। সুতরাং আপনি তাঁর জন্য এমন কিছু করুন যা তাঁর জন্য সম্মান ও গৌরবের কারণ হবে। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, ঘোষণা করে দাও! যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঘরে কিভাবে এত অধিক সংখ্যক লোক সংকুলান হবে। নবী (সা) বললেন, যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, ঐ ব্যক্তিও নিরাপদ।

আবূ সুফিয়ান বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মসজিদও যথেষ্ট হবেন না। নবী (সা) বললেন, সে ব্যক্তি তার নিজ গৃহের দরযা বন্ধ করে থাকবে ঐ ব্যক্তিও নিরাপদ হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, হ্যাঁ এতে সংকুলানের ব্যবস্থা হবে। অতঃপর রাসূল (সা) যখন মাররায্ যাহ্‌রান থেকে রওয়ান হলেন, তখন হযরত আব্বাস (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে পাহাড়ের উপর দাঁড়াও, যাতে সে বিশাল মুসলিম বাহিনী প্রত্যক্ষ করতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন গোত্রের বাহিনী যখন আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করে বীরদর্পে রাস্তা অতিক্রম করতে লাগল, তখন আবূ সুফিয়ান হতবাক হয়ে বললেন, তোমার ভাতিজার সাম্রাজ্য বিশাল হয়ে গিয়েছে। হযরত আব্বাস (রা) বললেন, এটা বাদশাহী নয়; বরং এটা হলো নবুওয়াত। অর্থাৎ হযরত দাঊদ (সা) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর শান-শওকত বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা ছিল নবুওয়াত। কেননা তা ছিল অলৌকিক। বাহ্যিক আসবাব ও ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল না। উড়োজাহাজ যন্ত্রপাতির শক্তি দ্বারা উড়ে থাকে, কিন্তু হযরত সুলায়মান (আ)-এর সিংহাসন কোন যন্ত্রপাতি বা বাহ্যিক শক্তি ব্যতীত স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে উড়ে চলত। এটা ছিল তাঁর নবুওয়াতের দলীল। মু'জিযা হিসেবে তাঁকে এ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল, যাতে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্রাটগণ তাদের যান্ত্রিক শক্তিকে এই গায়বী ও অদৃশ্য শক্তির বিপরীতে খুবই হীন ও ক্ষুদ্র মনে করে এবং আল্লাহ্র নবীর সামনে আত্মসমর্পণ করে। এমনিভাবে নবী (সা)-এর এই শান-শওকত ও মর্যাদাকে উপলব্ধি কর যে, বাহ্যিকভাবে বাদশাহী প্রতীয়মান হলেও মূলত এটাও নবুওয়াত ও পয়গাম্বরী।

যে গোত্র সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল তাদের সম্পর্কে আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, এটা কোন গোত্র? সর্বপ্রথম হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ এক হাজার লোক নিয়ে রাস্তা অতিক্রম করেন। সর্বশেষে নবী করীম (সা) শান-শওকত ও অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মুহাজির ও আনসারের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত দল নিয়ে বীরদর্পে অগ্রসর হন। মুহাজিরগণের পতাকা হযরত যুবায়র (রা)-এর হাতে এবং আনসারগণের পতাকা হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর হাতে ছিল। আর সা'দ ইবন উবাদা (রা) এদিক দিয়ে গমনের সময় আবেগ ও উত্তেজনায় বলেন,

اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة

"আজ হলো যুদ্ধের দিবস, আজ কা'বায় হত্যা করা হালাল হবে।"

আবূ সুফিয়ান ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এই ব্যক্তি কে? হযরত আব্বাস (রা) বলেন, এটা হলো মুহাজির ও আনসারের বাহিনী, এ বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) অবস্থান করছেন। সম্মুখ দিয়ে যখন রাসূল (সা) গমন করছিলেন, তখন আবূ সুফিয়ান আরয করেন, যে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি হযরত সা'দ ইবন উবাদাকে আপনার গোত্রের লোকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং সা'দ ইবন উবাদার উচ্চারিত বাক্যও উল্লেখ করেন। আবূ সুফিয়ান আরো উল্লেখ করেন যে, আমি আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছি, আপনি নেকী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণের ব্যাপারে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি বললেন,

يا ابا سفيان اليوم يوم المرحمه يعز الله فيه قريشا

"হে আবূ সুফিয়ান। আজ সহানুভূতির দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা কুরায়শদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন।"

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ

كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة

"সা'দ ভুল বলেছে, আজ খানায়ে কা'বার মর্যাদার দিন এবং আজ কা'বায় গিলাফ পরিধান করানো হবে।" এবং এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, (মুসলিম বাহিনীর) পতাকা সা'দ ইবন উবাদার হাত থেকে নিয়ে তাঁর পুত্র কায়সকে দেয়া হোক।[১]

ইবন আসাকির-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যখন নবী (সা) সম্মুখ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন, তখন কুরায়শ গোত্রের এক মহিলা এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

১. আবেগ ও উত্তেজনায় হযরত সা'দের মুখ থেকে এরূপ বাক্য উচ্চারিত হয়, যা ছিল অনুচিত। ফলে নবী (সা) তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের সান্ত্বনার জন্য তাঁর পুত্রের হাতে তা অর্পণ করেন। তবে মূলত তাঁর হাতেই রয়ে যায়। যে ধরনের ভুল ছিল, তেমনি ধরনের হুশিয়ারী প্রদান করেন। মূল থেকে নিয়ে শাখায় প্রদান করেন এবং শাখা মূলের প্রতিপক্ষ হয় না।

يَانبى الهدى اليك لجاحى قريش ولاتحسن الجاء حين

"হে হিদায়াত বা পথ প্রদর্শনকারী নবী! কুরায়শ গোত্রের লোকজন আপনার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অথচ এটা আশ্রয় প্রদানের সময় নয়।"

ضاقت، عليهم سعة الارض وعاداهم اله السماء

"যে সময় প্রশস্ত জমি তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে গেলেন।"

ان سعدا يريد قاصمة الظهر باهل الحجون والبطحأ ـ

"নিশ্চয়ই সা'দ ইবন উবাদা আহলে হজ্জুন এবং আহ্লে বাতহার (মক্কার) বাসিন্দাগণদের কোমর ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে।"

অতঃপর আবূ সুফিয়ান নবী (সা)-এর দরবার থেকে বিদায় হয়ে দ্রুত মক্কায় ফিরে এসে উচ্চস্বরে এ ঘোষণা প্রদান করেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) মুসলিম বাহিনী নিয়ে মক্কা আগমন করছেন। আমার মতে, তাঁর সাথে কারো মুকাবিলা করার ক্ষমতা নেই। ইসলাম গ্রহণ করো নিরাপদে থাকবে। অবশ্য যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে, অথবা যে ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদে থাকবে, অথবা যে ব্যক্তি নিজের ঘরে দরযা বন্ধ করে থাকবে অথবা অস্ত্র সমর্পণ করবে; তারা নিরাপদ থাকবে। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা তাঁর গোঁফ ধরে বলে, হে বনী কিনানা! এ বৃদ্ধ বেকুব হয়ে গিয়েছে। সে উপলব্ধি করছে না যে, সে কি বলছে। আরো অনেক গালি গালাজ করে। ফলে অনেক লোক জমা হয়ে যায়। আবূ সুফিয়ান বললেন, বর্তমানে এ সমস্ত কথায় কোন ফল হবে না, হে লোক সকল! তোমরা এ মহিলার ধোঁকায় কখনো পড়বে না।

কোন ব্যক্তিই আজ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মুকাবিলা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে এবং আমার ঘরে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ থাকবে। লোকজন বলল, রে দুর্ভাগা! আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! তোমার ঘরে কতজন লোকের সংকুলান হবে। আবূ সুফিয়ান বললেন, যে ব্যক্তি তার ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।[১]

অতঃপর আবূ সুফিয়ান তাঁর স্ত্রী হিন্দাকে বললেন, মৃত্যুর মুখে পতিত না হয়ে ইসলাম গ্রহণ করাই তোমার জন্য কল্যাণকর। যাও, তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাক। আমি সত্য ও সঠিক বলছি। লোকজন এ ঘোষণা শুনেই কেউ মসজিদে হারামের দিকে ছুটলো আবার কেউ নিজ ঘরের দিকে।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ২৯০।

মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ

অতঃপর নবী (সা) কাদার (كداء) দিক থেকে মক্কা প্রবেশ করেন। মক্কা প্রবেশের সময় তিনি কা'বা ঘরের আদব ও মর্যাদার প্রতি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। বিনয়ের সাথে মাথা নত করে প্রবেশ করেন, গর্ব ও অহংকারের সাথে নয়।

বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি উটের আরোহণ করে সূরা انا فتحنا لك فتحا তিলাওয়াত করছেন।

এ মহান বিজয়ের সময় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সাথে সাথে বিনয় ও নম্রতার আভা তাঁর পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠে। উটের উপর আরোহণ অবস্থায় বিনয়ের কারণে পবিত্র গর্দান এমনিভাবে ঝুলে ছিল যে, উটের হাওদার কাঠের সাথে পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করছিল। (ইবন ইসহাক) এবং নবী (সা)-এর খাদেম উসামা ইবন যায়িদ (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। (বুখারী শরীফ)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, যখন তিনি বিজয়ীর বেশে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন তখন সমস্ত লোকজন নবী (সা)-কে দেখছিল। কিন্তু বিনয়ের কারণে তিনি মাথা নত করেছিলেন। (উত্তম সনদে হাকীম)

মু'জামে তাবারানীতে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, আজ হলো ঐ দিন যার অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে করেছেন। অতঃপর তিলাওয়াত করেন ঃ اذا جاء نصر الله والفتح (যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩২০)

নবী (সা)-এর দৃষ্টি এ বিষয়ের উপর নিবদ্ধ ছিল যে, এমন একটি সময় ছিল যখন আমি নিরাশ ও অসহায়ভাবে এ শহর থেকে হিজরত করেছি এবং শত্রুদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে একাকী বের হয়েছি। আজ এমন এক সময় এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে বিজয়ী বেশে এই শহরে প্রবেশ করছি। وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (এটা আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণা, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি দান করেন) এজন্য বিনয়ের কারণে রাসূল (সা)-এর পবিত্র মাথা নত ছিল এবং উটের গদিতে মাথা রেখে শোকর আদায়ের সিজ্‌দা করছিলেন ও আনন্দের আতিশয্যে সুমিষ্ট সুরে انا فتحنا এবং اذا جاء نصر الله পাঠ করছিলেন। এটাও উচ্চারণ করছিলেন যে, নিশ্চয়ই এটা প্রকাশ্য বিজয় ও বিরাট মর্যাদাপূর্ণ সাহায্য। এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও পুরস্কার। ন্যায় ও সত্যকে রাজ্য দান করা হয়েছে এবং বাতিল পরাজয় বরণ করে মাথা নত করেছে। ইসলাম ও ঈমানের নূর প্রজ্বলিত হয়েছে এবং কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। সমস্ত দুনিয়া হারাম, কুফর ও শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হয়েছে।

নবী (সা) কাদা [১] নামক স্থান অতিক্রম করে উপর দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে কুদা [২] থেকে নিম্নদিক দিয়ে এবং যুবায়র (রা) কে মক্কার উপর অর্থাৎ কাদা নামক স্থান দিয়ে প্রবেশ করার নির্দেশ দান করেন। সাথে সাথে এই তাকিদ প্রদান করেন যে, তোমরা নিজেরা কখনো হত্যাকাণ্ডের সূচনা করবে না। যারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে শুধু তাদের সাথে জিহাদ করবে। অতঃপর অত্যন্ত আদব বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে তিনি পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন।

মক্কায় প্রবেশের পর তিনি সর্বপ্রথম উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করেন এবং গোসল করার পর আট রাক'আত নামায আদায় করেন। এটা ছিল চাশতের নামাযের সময়। (বুখারী)

'ওলামায়ে কিরামের পরিভাষায় এ নামাযকে 'সালাতুল ফাত্‌হ' (صلوة الفتح) বলা হয়। মুসলিম সমাজপতিগণের এ পদ্ধতি ছিল যে, যখন তারা কোন শহর জয় করতেন, তখন বিজয়ের কৃতজ্ঞতা হিসেবে আট রাক'আত নামায আদায় করতেন। হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) যখন মাদায়েন জয় করে ইরানের রাজধানীতে প্রবেশ করেন তখন এক সালাতে আট রাক'আত নামায আদায় করেন। (রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ ২৭৩)

---

১. كَدَاْ (بفتح كاف والف ممدوده) মক্কার উঁচু স্থানকে বলা হয় এবং (ضم كاف الف مقصوره) كُدَا মক্কার নিম্নভূমিকে বলা হয়। كَدَاْ ঐ স্থানকে বলা হয় যে স্থানে দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) লোকজনকে হজ্জের জন্য আহ্বান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

"এবং মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রসমূহের পিঠে চড়ে, এরা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে।" (সূরা হজ্জ : ২৭)

হযরত ইবরাহীম (সা)ঐ স্থানেই তাঁর বংশধরদের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করেন এবং আল্লাহ পাক ঐ দু'আ কবুল করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়–

رَبَّنَا اِنِّىْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কিছু লোককে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট অনুর্বর এক স্থানে বসবাসের জন্য রেখেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তা এজন্য যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলমূল দ্বারা তাদের রিযকের ব্যবস্থা কর যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

প্রেক্ষিতে, নবী ঐ স্থান দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন, যেখান থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেন। (রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ২৭০)

২. হযরত খালিদকে (রা) নিম্নভাগ থেকে প্রবেশের জন্য এ জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, এদিকে থেকেই মুকাবিলা ও যুদ্ধের আশংকা ছিল। (যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩০৯)।

সম্ভবত এ কারণেই ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে এক সালামে আট রাক'আতের অধিক নামায আদায় করা মাকরূহ। উম্মে হানী (রা) রাসূল (সা) এর নিকট আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার স্বামীর দু'জন আত্মীয় পলায়ন করে আমার ঘরে আগমন করলে আমি তাদেরকে আশ্রয় দান করেছি। কিন্তু আমার ভাই আলী তাদেরকে হত্যা করতে চায়। রাসূল (সা) বলেন, উম্মে হানী যাদেরকে আশ্রয় দান করেছে, আমরাও তাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি। আলীর উচিত তাদেরকে হত্যা না করা।[১]

নবী (সা) নামায সমাপ্ত করে শি'আবে আবূ তালিব নামক স্থানে গমন করেন। সেখানেই রাসূল (সা) এর জন্য তাঁবু স্থাপন করা হয়েছিল। মক্কা প্রবেশের পূর্বেই সাহাবায়ে কিরাম (রা) নবী (সা) কোথায় অবস্থান করবেন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন। নবী করীম (সা) বলেন, সেখানে কুরায়শ এবং বনূ কিনানা, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তালিবকে অবরোধ করে। এছাড়া পরস্পর এর অঙ্গীকার করে যে, বনূ হাশিম ও বনূ আবদুল মুত্তলিব -এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়, শাদী-বিবাহ সহ সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে আমাদের নিকট সোপর্দ না করে। শি'আবে আবূ তালিব ঐ স্থানকেই বলা হয়।[২]

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল্লাহ (সা) আনসারগণকে ডেকে বললেন, কুরায়শগণ তোমাদের মুকাবিলায় কঠোর প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। যদি তারা মুকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়, তাহলে তাদেরকে ফসলের মত কেটে রেখে দিবে।

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা, ইকরামা ইবন আবূ জাহল এবং সুহায়ল ইবন আমর খানদামা নামক স্থানে মুকাবিলার জন্য কয়েকজন দুষ্কৃতকারীকে একত্র করে। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের সাথে মুকাবিলা হলে মুসলমানদের মধ্যে খুনাইস ইবন খালিদ ইবন রাবীয়া এবং কুরয্ ইবন জাবির ফিহ্রী (রা) দু'জন শাহাদাত বরণ করেন। মুশরিকদের মধ্যে বার অথবা তেরজন নিহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। এটা ইবন ইসহাক রিওয়ায়াত করেন।[৩]

মূসা ইবন উকবার মাগাযীতে বর্ণিত আছে, খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা) যখন মক্কার নিম্ন দিক থেকে প্রবেশ করেন, তখন বনূ বকর, বনূ হারিস ইবন আবদ মানাফ, হুযায়ল গোত্রের কিছু লোক এবং কিছু দুষ্কৃতকারী মুকাবিলার জন্য একত্র হয়েছিল। হযরত খালিদ (রা) পৌঁছা মাত্র তারা শোরগোল শুরু করে। খালিদ (রা) তাদের উপর আক্রমণ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ২৯৯-৩০০।
২. যারকানী, ২ খ. পৃ. ৭২, ৩২৪; ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১৬।
৩. এই রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মক্কা বিজয়ের দিন মাত্র ১২/১৩ জন নিহত হয়। কিন্তু মূসা ইবন উকবা, ইবন সা'দ এবং ওয়াকিদীর বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ২৩ অথবা ২৪ জন নিহত হয়। এ বর্ণনাটিই অধিক নির্ভরযোগ্য। কম অধিকের পরিপন্থী নয়। সম্ভবত নিহতদের মোট সংখ্যা ২৪ হবে এবং খান্দামা নামক স্থানে ১২/১৩ জন নিহত হয়, অবশিষ্টরা অন্য স্থানে নিহত হয়।

করেন। তারা মুকাবিলা করতে না পেরে পরাজয় বরণ করে পলায়ন করে। বনূ বকর থেকে বিশজন এবং হুযায়ল গোত্রের তিন অথবা চারজন নিহত হয়। অবশিষ্টরা পলায়ন করে। কেউ বাড়ি গিয়ে আত্মগোপন করে, কেউ পাহাড়ে চড়ে। আবূ সুফিয়ান চিৎকার করে বললেন, যে ব্যক্তি নিজ ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ অথবা যে কোন আক্রমণে উদ্ধত না হবে সে নিরাপদ থাকবে। নবী (সা)-এর দৃষ্টি তলোয়ারের চমকানীর উপর নিবন্ধ হয়েছিল। ফলে তিনি হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, ঘটনা কি? আমি তোমাদেরকে তো হত্যাকাণ্ড থেকে নিষেধ করেছি। হযরত খালিদ (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হত্যাকাণ্ডের সূচনা করিনি। আমি সর্বদা আমার হাত নিয়ন্ত্রণে রেখেছি। আমার উপর যখন তলোয়ার চলতে থাকে, তখন আমি বাধ্য হয়ে তাদের মুকাবিলা করেছি। রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা যা নির্ধারণ করেছেন এতে কল্যাণ রয়েছে।[১]

এরপর শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লোকজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। লোকজন শান্ত হয় এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বিজয় অর্জিত হয়। অতঃপর তিনি (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন।

মসজিদে হারামে প্রবেশ

মক্কা বিজয়ের পর নবী (সা) মসজিদে হারামে প্রবেশ করে খানায়ে কা'বা তাওয়াফ করেন। দালাইলে বায়হাকী এবং দালাইলে আবূ নুয়াঈম গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পবিত্র হেরেমে প্রবেশ করেন, তখন কা'বার চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি রক্ষিত ছিল। রাসূল (সা) এক একটি মূর্তির দিকে ছড়ি দিয়ে ইঙ্গিত করে পাঠ করছিলেন ঃ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (সত্য সমাগত এবং বাতিল দূরীভূত) সাথে সাথে মূর্তিগুলো মাথা নত করে পতিত হতে লাগলো।

ইমাম বায়হাকী (র)বলেন, ইবন উমরের হাদীসটি যদিও দুর্বল কিন্তু ইবন আব্বাসের হাদীস এ সম্পর্কে সমর্থন[২] প্রদান করেছে। হাফিয আসকালনী বলেন, ইবন হিব্বান আবদুল্লাহ ইবন উমরের হাদীসকে সহীহ বলেছেন।[৩]

হাফিয হায়সামী (র)বলেন, ইবন আব্বাসের হাদীসকে তাবারানী রিওয়ায়াত করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য এবং এই হাদীস বায্যার সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন।[৪] ইবন ইসহাক এবং আবূ নুয়াঈম এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, ঐ মূর্তি গুলো সিসা দ্বারা আটকানো ছিল।[৫]

১. ফাতহুল বারী, ৮খ. পৃ. ৯।
২. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৬৪।
৩. ফাতহুল বারী, ১৪ খ পৃ. ৮।
৪. মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫ খ, পৃ. ১৭৬।
৫. যারকানী, ২ খ. পৃ. ৩৩৪।

এ সম্পর্কে তামীম ইবন আসাদ খুযাঈ বলেন–[১]

وفى الاصنام معتبر وعلم - لمن يرجو الثواب او العقابا

নবী (সা) উটের উপর সাওয়ার হয়ে হেরেম শরীফে প্রবেশ করেন এবং এ অবস্থায় তাওয়াফ সম্পন্ন করে উসমান ইবন তালহা (রা)-কে ডেকে খানায়ে কা'বার চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহ খোলার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তিনি অনেক ছবি দেখতে পেলেন এবং এগুলো মুছে ফেলার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সমস্ত ছবি মুছে ফেলার পর তা যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করা হয়। অতঃপর রাসূল (সা) বায়তুল্লাহর প্রবেশ করেন এবং নামায আদায় করেন।[২]

বায়তুল্লাহ্র চতুর্দিকে ফিরে ফিরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে তা মুখরিত করে তুলেন। এ সময় হযরত বিলাল ও হযরত উসামা (রা) রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। অতঃপর দরজা খুলে বাইরে এসে দেখেন, মসজিদে হারাম লোকজনে পরিপূর্ণ। সবাই এ বিষয়ে অপেক্ষমান যে, অপরাধী ও শত্রুদের ব্যাপারে কি নির্দেশ প্রদান করা হয়। এটা ছিল পবিত্র রমযান মাসের ২০ তারিখ। চাবি হাতে নবী (সা) কা'বা ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় এ খুতবা পাঠ করেন।

কা'বা শরীফের দরজায় খুত্বা প্রদান

لا اله الا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده - الا كل ماثرة اودم اومايدعى فهوتحت قدمى هاتين الاسدانة البيت وسقاية الحاج الاوقتيل الخطاء شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة من الابل اربعون منها فى بطونها اولادها - يامعشر قريش ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء الناس من ادم وادم من تراب - ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَا كُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ - ثم قال يامعشر قريش ماترون انى فاعل بكم قالوا خير اخ كريم وابن اخ كريم قال فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ৩০২।

২. যারকানী, ২ খ.

"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, শত্রুদের সমস্ত দলবলকে একা পরাজয় করেছেন। সাবধান! অতীতের যে কোন ক্ষতিপূরণের দাবি-চাই সেটা জান বা মালের হোক এবং যে কোন প্রথা বা রীতি তা সমস্ত আমার পদতলে (সব কিছুই আজ বাতিল) কিন্তু বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং হাজীগণকে যমযমের পানি পান করানো এটা পূর্বের মত অব্যাহত থাকবে। সাবধান! যদি কোন ব্যক্তিকে চাবুক বা লাঠি দ্বারা ভুলক্রমে হত্যা করা হয়। তাহলে দিয়াত বা রক্তপণ হিসেবে একশত উট প্রদান করতে হবে, এর মধ্যে চল্লিশটি গর্ভবতী উট হতে হবে। হে কুরায়শ গোত্র! আল্লাহ তা'আলা জাহেলিয়াতের অহংকার এবং বাপদাদার উপর গৌরব করা বাতিল করে দিয়েছেন। সমস্ত মানুষ আদম হতে সৃষ্ট এবং আদম মাটি থেকে। অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন- يايها الناس الاية

"হে লোক সকল! আমরা তোমাদেরকে একজন নর ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং পরস্পরের পরিচয়ের জন্য তোমাদেরকে বিভিন্ন শাখা ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান যে আল্লাহ্‌কে অধিক ভয় করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে জ্ঞাত।"

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, হে কুরায়শ গোত্র! আমার ব্যাপারে তোমাদের কি ধারণা যে, আমি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করব? তারা বললো, আমরা উত্তম ব্যবহারের আশা করি। কেননা আপনি দয়ালু[১] ভাই এবং দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ভাই-এর পুত্র। নবী (সা) বললেন, আমি তোমাদেরকে ঐ কথা বলব, যা ইউসুফ (আ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেন, "তোমাদের উপর আজ কোন অভিযোগ ও প্রতিশোধ নেই। যাও তোমরা সবাই মুক্ত।" (যাদুল মা'আদ; সীরাতে ইবন হিশাম; যারকানী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ. পৃ. ৩০০-৩০১)।

আরবে বংশ ও অভিজাত্য নিয়ে গৌরব করার যে প্রবণতা চলে আসছিল, নবী (সা) এই খুতবার মাধ্যমে তা চিরতরে বিলুপ্ত করে দেন এবং ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে এটাও ঘোষণা করে দেন যে, সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হলো শুধু তাক্‌ওয়া। নবী করীম (সা) বিশ্ব জগতের জন্য শান্তির দূতও হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হিদায়াত প্রদান করা; শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হলো রাজ-বাদশাহ্‌দের কাজ।

---

১. সুহায়ল ইবন আমর এটা বলেছিলেন। রাসূল (সা) তার সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী সম্পন্ন করেছিলেন। পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, হে কুরায়শগণ! আমার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা? সুহায়ল ইবন আমর তৎক্ষণাৎ বলেন ঃ نقول خيرا ونظن خيرا اخ كريم ابن اخ كريم وقد قدرت (ভাল বলছি,.ভাল ধারণা করছি, আপনি দয়ালু ও সহানুভূতিশীল ভাই এবং সহানুভূতিশীল ভাই -এর পুত্র এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উপর সম্পূর্ণ সক্ষম। (আল-ইসাবা সুহায়ল ইবন আমর প্রবন্ধ)।

বায়তুল্লাহর রক্ষণা-বেক্ষণ ও হাজীদের পানি পান করান

নবী (সা) খুতবা সমাপ্ত করে মসজিদে উপবেশন করেন। এ সময় বায়তুল্লাহর চাবি নবী (সা)-এর হাতে ছিল, হযরত আলী[১] (রা) দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ চাবি আমাদেরকে প্রদান করুন। যাতে হাজীদেরকে যমযমের পানি করানোর[২] সাথে সাথে বায়তুল্লাহর পাহারাদারী তথা নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের মর্যাদাও আমরা হাসিল করতে পারি। তখন আল্লাহ নাযিল করেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পন করতে।" (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

নবী (সা) উসমান ইবন তালহাকে ডেকে তাঁর নিকট চাবি হস্তান্তর করে বলেন, চিরদিনের জন্য এ চাবি গ্রহণ কর অর্থাৎ সর্বযুগে তোমাদের বংশের নিকট এই চাবি আমানত থাকবে। আমি নিজে প্রদান করিনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যালিম ও জোরপূর্বক ছিনতাইকারী ব্যতীত তোমাদের কাছ থেকে কেউ তা নিতে পারবে না।[৩]

কা'বা শরীফের দরজায় আযান

যুহর নামাযের সময় হলো। নবী (সা) বিলাল (রা)-কে কা'বা ঘরের ছাদের ওপর চড়ে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন। মক্কার কুরায়শগণ সত্য দীনের প্রকাশ্য বিজয়ের এই বিস্ময়কর দৃশ্য পাহাড়ের চূড়া থেকে প্রত্যক্ষ করছিলো।

যে সমস্ত কুরায়শ সরদার কুফর ও শিরকের অপমান ও অমর্যাদা এবং দীনে হকের মর্যাদার এ দৃশ্য অবলোকন করতে পারেনি, তারা আত্মগোপন করেছে। আবূ সুফিয়ান, ইতাব ও খালিদ (উসায়দের পুত্র) হারিস ইবন হিশাম (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং অন্যান্য কুরায়শ সরদারগণ কা'বা ঘরের উঠানে বসা ছিল। ইতাব ও খালিদ বলেন, আল্লাহ আমাদের পিতার সম্মান রক্ষা করেছেন। এ আওয়ায শোনার পূর্বেই তারা মৃত্যুবরণ করেছে। হারিস বলে, আল্লাহ্র শপথ! যদি এটা আমি নিশ্চিত হতাম যে, তিনি সত্য নবী, তাহলে আমি তাঁর আনুগত্য করতাম। আবূ সুফিয়ান বলল, আমি কিছু বলব না। আমি যা কিছু মুখে উচ্চারণ করব, তা পাথরও তাঁর নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। নবী (সা) ওহীর মাধ্যমে তাদের এ কথাবার্তা অবগত হয়েছেন। যখন নবী (সা) এদিক দিয়ে গমন করেন, তখন তাদেরকে বলেন, তোমরা যা কিছু বলেছ তা আমাকে

---

১. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) থেকে বর্ণিত হযরত আব্বাস (রা) এ ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু রাসূল (সা) তা মঞ্জুর করেননি।

২. অর্থাৎ হজ্জের সময় হাজীগণকে যমযমের পানি পান করানোর খেদমত হযরত আব্বাস এবং বনূ হাশিমের উপর ন্যাস্ত ছিল।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১৫; যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৩৭-৩৪০

জানানো হয়েছে এবং তারা যা কিছু আলাপ করেছে ঐ সমস্ত বর্ণনা করেন। হারিস ও ইতাব বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল। কেননা, আমাদের মধ্যে কেউ তো আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করিনি। (মনে হয় আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রাসূলকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন)। আবূ ইয়ালা হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীসটি এবং ইবন আবূ শায়বা হযরত আবূ সালমা (রা) থেকে বর্ণনা করেন।[১]

ইতাব ইবন উসায়দ (রা) ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) তাকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইতাব ইবন উসায়দ (রা) এর বয়স ছিল তখন ২১ বছর এবং দৈনিক এক দিরহাম মাহিনা নির্ধারণ করেন। এ ব্যাপারে উসায়দা (রা) বলেন ايها الناس اجاع الله كبد من جاع على درهم "হে লোক সকল! আল্লাহ ঐ ব্যক্তির কলিজা ক্ষুধার্ত রাখবেন, যে এক দিরহামেও ক্ষুধার্ত থাকে।" (রাওযুল উনুফ, ২ খ. পৃ. ২৭৬)

ইতাব ইবন উসায়দ (রা) নবী করীম (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত মক্কার গভর্নর ছিলেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) খলীফা হওয়ার পরও তা অব্যাহত থাকে। যে দিন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ইনতিকাল করেন ঐ দিন ইতাব ইবন উসায়দও ইনতিকাল করেন। (আল-ইসতি'আব লি ইবন আবদুল বার, ইতাব ইবন উসায়দ প্রবন্ধ।

হযরত বিলাল (রা) যখন কা'বার ছাদে চড়ে আযান দেয়া শুরু করে তখন আবূ মাহযূরা জুমাই এবং তাঁর সাথী কয়েকজন যুবক ঠাট্টা করে আযানের নকল করে উচ্চারণ করছিলে। আবূ মাহযূরা অত্যন্ত সুমিষ্ট স্বর ও উচ্চ আওয়াযের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আওয়ায রাসূল (সা) পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে হাযির করানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মধ্যে কার আওয়ায আমি শুনতে পেয়েছি? সবাই আবূ মাহযূরার দিকে ইঙ্গিত করলো। তখন তিনি সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাকে থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

আবূ মাহযূরা (রা) নবী (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে এ ধারণা পোষণ করছিলেন যে, হয়ত আমাকে হত্যা করা হবে। কিন্তু তিনি আমাকে আযান দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। ভাগ্যক্রমে আমি আযান দিলাম। আযানের পর রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে একটি থলি দান করেন যাতে কিছু দিরহাম ছিল এবং আমার মাথা ও কপালে পবিত্র হাত বুলিয়ে দেন, বুক, কলিজা, পেট ও নাভী পর্যন্ত পবিত্র হাত ফিরালেন, অতঃপর এ দু'আ করেন ঃ بارك الله فيك وبارك الله عليك

হযরত আবূ মাহযূরা (রা) বলেন, রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাত বুলানোর সাথে সাথে আমার অন্তরের সমস্ত ঘৃণা ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেল এবং অন্তর নবী (সা)-এর মহব্বতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এবার আমি নিজেই আরয করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে মক্কার কা'বাঘরের মু'আযযিন নিয়োগ করুন। রাসূল (সা) বললেন, আমি

---
১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৪৬।

তোমাকে মক্কার মু'আযযিন[১] নিয়োগ করলাম। আমি মক্কায় আগমন করে মক্কার গভর্নর ইতাব ইব্ন উসায়দকে এ ব্যাপারে অবহিত করলাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আযান দিতে থাকলাম। আজীবন তিনি মক্কায় অবস্থান করেন এবং আযানের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ৫৯ হিজরীতে মক্কায় ইনতিকাল করেন। (ইসতি'আব লি ইবন আবদুল বার প্রবন্ধ আবূ মাহযূরা রা)

সুহায়লী বর্ণনা করেন, আবূ মাহযূরা (রা) সে সময় মু'আযযিন হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন, ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল বছর। ইনতিকাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন। তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর বংশধরগণ বংশানুক্রমে মু'আযযিনের দায়িত্ব পালন করেন।

একজন কবি আবূ মাহযূরার আযান সম্পর্কে বলেন ঃ

اما ورب الكعبة المستوره * وما تلا محمد من سوره

"শপথ কা'বা ঘরের প্রতিপালকের যার উপর গিলাফ পরিধান করা হয়েছে এবং শপথ পবিত্র কুরআনের সূরার যা হযরত মুহাম্মদ (সা) তিলাওয়াত করেছেন।"

والنغمات من أبى محذوره * لافعلن فعلة مذكورة

"শপথ আবূ মাহযূরার আযানের সুর মাধুর্যের, আমি অবশ্যই অমুক কাজ করব।"[২]

নবী করীম (সা) তাওয়াফ সম্পন্ন করে সাফা পাহাড়ে গমন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরিয়ে দু'আ ও আল্লাহ পাকের প্রশংসায় নিমগ্ন থাকেন। কাছেই আনসারদের একটি সমাবেশ ছিল। এ সময় একজন আনসার নবী (সা) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার শহর ও মাতৃভূমির উপর আপনাকে বিজয় দান করেছেন। এমন যেন না হয় যে, মদীনায় গমন না করে আপনি মক্কায়ই থেকে গেলেন। অতঃপর তাঁরা পরস্পরে কথাবার্তা বলতে লাগলেন, ইতোমধ্যে নবী (সা) এর উপর ওহী নাযিল হতে লাগলো। কিন্তু ওহী নাযিলের সময় রাসূল (সা)-এর পবিত্র চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করা সাহাবাগণের অভ্যাস ছিল না। ওহী নাযিল শেষ হওয়ার পর নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি এটা বলেছ? তাঁরা আরয করলেন, হাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, মনে রেখ এরূপ কখনো হবে না। আমি আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ্র নির্দেশে হিজরত করেছি। তোমাদের জীবন আমার জীবন, তোমাদের মৃত্যু আমার মৃত্যু। এটা শুনে জীবন উৎসর্গকারী আনসারদের চোখে অশ্রু প্রবাহিত হলো এবং আরয করলেন, হে আল্লাহর

১. কোন কোন বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ মাহযূরা (রা) মক্কা বিজয়ের পর মু'আযযিন নিয়োজিত হন এবং অধিকাংশ রিওয়ায়তে দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুনায়ন যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল (সা) তাঁকে মু'আযযিন নিয়োগ করেন।

২. রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ২৭৭

রাসূল! আমাদের মধ্যে এই আশংকার সৃষ্টি হয় যে, আপনার নিকট আগত আলো যাতে আমাদের মধ্যে থেকে উঠিয়ে নেয়া না হয়। আমরা জীবন উৎসর্গকারী গোলাম, প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারী খাদেম যে কোন কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রয়েছি। কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ব্যাপারে আমরা অত্যধিক কৃপণ (অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলকে ত্যাগ করতে প্রস্তুত নই।)

باسایه ترانمی پندم + عشق است وهزار بدگمانی

"আপনার পরশে ধন্য হবার সুযোগ্য কি আমরা আর পাবো (যেহেতু মক্কা বিজয় হলে গেছে) প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে বিরহের তেমন দুঃশ্চিন্তা হয়েই থাকে।"

নবী (সা) বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদেরকে অসহায় ও সত্য মনে করে। (মুসলিম, আহমাদ প্রমুখে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৩৩; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ৩০৬-৩০৭।

পুরুষ ও নারীদের বায়'আত গ্রহণ

নবী (সা) দু'আ সম্পন্ন করে সাফা পাহাড়ে উপবেশন করেন। লোকজন বায়'আত গ্রহণের জন্য সেখানে একত্র হয়। নবী (সা) ইসলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। পুরুষদের নিকট থেকে শুধু ইসলাম ও সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর বায়'আত গ্রহণ করতে থাকেন। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, পুরুষদের থেকে ইসলাম এবং জিহাদের উপর বায়'আত গ্রহণ করেন। পুরুষদের থেকে বায়'আত গ্রহণের পর মহিলাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ করতে থাকেন। মহিলাদের থেকে ঐ বিষয়ে বায়'আত গ্রহণ করেন যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰى اَنْ لاَّيُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلاَيَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِيْنَ وَلاَيَقْتُلْنَّ اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلاَيَعْصِيْنَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ، اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-١

"হে নবী! মু'মিন নারীগণ যখন আপনার কাছে এসে এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, তারা কোন অপবাদ রটাবে না এবং সৎকাজে আপনাকে অমান্য করবে না তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"[১]

১. সূরা মুমতাহিনা ঃ ১২।

নবী (সা) মহিলাদের থেকে মুখে মুখে বায়'আত গ্রহণ করতেন। তিনি স্বীয় পবিত্র হাত দ্বারা কখনো কোন মুহরিম নয় এমন মহিলার হাত স্পর্শ করেননি, কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেন নি; বরং কাপড়ের এক কোণ রাসূল (সা)-এর হাতে থাকত এবং এক কোন মহিলাদের হাতে রেখে বায়'আত গ্রহণ করতেন। কখনো মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের সময় পানির একটি পেয়ালা নিয়ে এতে স্বীয় পবিত্র হাত চুবিয়ে আবার বের করতেন। অতঃপর মহিলাদেরকে ঐ পেয়ালায় হাত রেখে ভিজিয়ে নেয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন। এভাবে বায়'আত মজবুত হতো।

অধিক জানতে হলে দেখুন তাফসীরে কুরতুবী সূরা মুমতাহিনা ১৮ খ. পৃ. ৭১ এবং কোন কোন মহিলা বায়'আত নিয়েছিলেন, তা জানতে হলে তারীখে ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ৬৬ দ্র.।

ইবন আসীর জাযরী 'তারীখে ইবন আসীর' এ বর্ণনা করেন, নবী (সা) যখন পুরুষদের বায়'আত গ্রহণ সম্পন্ন করে মহিলাদের বায়'আত গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কুরায়শ গোত্রের যে সমস্ত মহিলা এ সময় বায়'আত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হন তাঁদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১. উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব অর্থাৎ হযরত আলী (রা) বোন,

২. উম্মে হাবীবা বিনত আ'স ইবন উমাইয়া আমর ইবন আবদ আমরীর স্ত্রী,

৩. আরওয়া বিনত আবিল আইস অর্থাৎ ইতাব ইবন উসায়দ এর ফুফু,

৪. আতিকা বিনত আবিল আইস অর্থাৎ আরওয়ার বোন,

৫. হিন্দা বিনত উতবাহ, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী এবং আমীর মু'আবিয়ার মা,

হিন্দা চেহারার উপর অবগুণ্ঠন দিয়ে বায়'আতের জন্য রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। যেহেতু হিন্দা হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পরিকল্পনাকারী এবং হত্যার পর বুক চিরে কলিজা চিবিয়েছিল, ফলে লজ্জা ও অনুতপ্ত হওয়ার কারণে মুখ লুকিয়ে বায়'আতের জন্য হাযির হন– যাতে তিনি তাকে চিনতে না পারেন। তাঁর বায়'আতের ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

হিন্দা ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের থেকে কি কি বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন?

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না।

হিন্দা ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমাদের নিকট ঐ বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন, যা আপনি পুরুষদের থেকে গ্রহণ করনেনি। কিন্তু আমরা তা মেনে নিচ্ছি।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ চুরি করবে না।

হিন্দা ঃ আমি স্বামী আবূ সুফিয়ানের সম্পদ থেকে কিছু নিয়ে থাকি। জানি না এটা চুরি হয় কিনা। আবূ সুফিয়ান এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবূ সুফিয়ান বললেন,

অতীতে যা হয়েছে তা ক্ষমা করা হলো। রাসূল (সা) বললেন, প্রচলিত নিয়ম ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বামীর সম্পদ থেকে তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজনে সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে পার।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ ব্যভিচার করবে না।

ভদ্র মহিলাগণ কি ব্যভিচার করতে পারে ?

নবী (সা) ঃ সন্তানদেরকে হত্যা করবে না।

হিন্দা ঃ ربناهم صغاراً وقتلتهم يوم بدرٍ كباراً فانت وهم اعلم

"আমরা শিশুকালে তাদেরকে লালন-পালন করেছি এবং আপনি তাদেরকে বদর যুদ্ধে হত্যা করেছেন। সুতরাং আপনি এবং তারা অধিক জানবেন।" হযরত উমর (রা) এটা শুনে হেসে ফেলেন।

রাসূল (সা) ঃ কারো উপর অপবাদ লাগাবে না।

হিন্দা ঃ والله ان اليان البهتان قبيح ومانامرنا الابالرشد ومكارم أخلاق

"আল্লাহ্র শপথ! কারো উপর অপবাদ রটানো অত্যন্ত মন্দকাজ এবং আপনি তো হিদায়াত ও উন্নত চরিত্র ব্যতীত অন্য কিছুর নির্দেশ প্রদান করেন না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ কোন নেককাজে নাফরমানী করবে না এবং কোন বিধি-বিধান অমান্য করবে না।[১]

হিন্দা ঃ এই মজলিসে আমরা আপনার নাফরমানীর ইচ্ছা ও খেয়াল নিয়ে আসিনি। রাসূল (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, তাদের থেকে বায়'আত গ্রহণ কর। বায়'আতের পর নবী (সা) তাঁদের মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন।[২]

হিন্দা ইসলাম গ্রহণের পর আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমার নিকট আপনার চেহারার চেয়ে অধিক ঘৃণিত আর কোন চেহারা ছিল না এবং আপনার চেয়ে আর কাউকে অধিক শত্রু মনে করতাম না। কিন্তু এখন থেকে আপনার চেহারা ব্যতীত আমার নিকট অধিক প্রিয় আর কেউ নেই। নবী (সা) ইরশাদ করেন, এখন মহব্বত আরো বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় খুত্বা

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন খুযাঈ গোত্রের এক ব্যক্তি হুযাইলী গোত্রের এক মুশরিককে হত্যা করে। নবী (সা) এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর সাহাবাগণকে সাফা পাহাড়ে একত্র করে নিম্নলিখিত খুতবা প্রদান করেন ঃ

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৬।

২. আল-কামিল লি ইব্ন আসীর, ২ খ, পৃ. ৯৬।

يأيها الناس ان الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض فهى حرام الى يوم القيامة - فلايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك فيها دما ولايعضدفيها شجرة ولم تحلل لاحد كان قبلى ولاتحل لاحد يكون بعدى ولم تحلل لى الا هذا الساعة غضباً على اهلها الاثم قد رجعت كحرمتها بالامس - فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل فيها فقولوا ان الله قد أحلها لرسوله ولم يحللها لكم يامعشر خزاعة ارفعوا ايديكم عن القتل فلقد كثر القتل لقد قتلتم قتيلا لادينه فمن بعد مقامى هذا فاهله بخير النظرين ان شاء فدم قاتله وان شاءوا فعقله -

"হে লোক সকল! যে দিন আল্লাহ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন সেই দিন মক্কাকে হারাম ও সম্মানিত করেছেন। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম ও সম্মানিত থাকবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, মক্কা মুকাররমায় রক্তপাত ঘটাবে, এখানে কোন বৃক্ষ কর্তন করাও বৈধ নয়। আমার পূর্বে মক্কা কারো জন্য হালাল হয়নি, আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবে না। আমার জন্যও শুধু একটি মুহূর্তের জন্য হালাল করা হয়েছে মক্কাবাসীদের নাফরমানী ও অবাধ্যতার কারণে। অতঃপর এর মর্যাদা পূর্বের মতই বহাল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা আজ উপস্থিত রয়েছ, তারা অনুপস্থিত লোকদের নিকট আমার এ পয়গাম পৌঁছিয়ে দিবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এটা বলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় হত্যাকাণ্ড করেছেন। তোমরা তাদেরকে এটা বলে দাও যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু তাঁর রাসূলের জন্য কিছু সময়ে মক্কাকে হালাল করেছিলেন কিন্তু তোমাদের জন্য হালাল করেননি। হে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা! তোমরা হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাক। তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ আমি তার রক্তপণ পরিশোধ করব। যে ব্যক্তি এই দিনের পর কাউকে হত্যা করবে, তখন নিহত ব্যক্তির স্বজনদের দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের অধিকার থাকবে। হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীদেরকে একইভাবে হত্যা করবে অথবা নিহত ব্যক্তির রক্তপণ গ্রহণ করবে।"

অতঃপর রাসূল (সা) নিজের পক্ষ থেকে এক শ' উট ঐ ব্যক্তির রক্তপণ হিসেবে আদায় করেন যাকে খুযা'আ গোত্রের লোকেরা হত্যা করেছিল।[১]

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ৫৮।

মুহাজিরগণের পরিত্যক্ত বাড়িঘর ফেরত প্রদানের বিষয়

মক্কার কাফিররা মদীনায় হিজরতকারী সমস্ত মুহাজিরগণের বাড়িঘর, ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র দখল করে নিয়েছিল। নবী (সা) খুতবা সম্পন্ন করে কা'বা শরীফের দরজায় দণ্ডায়মান হয়েছেন, এমনি সময় আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ (রা) তাঁর ঐ বাড়ি ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে কিছু আরয করার জন্য দাঁড়ালেন, যা তাঁর হিজরতের পর আবূ সুফিয়ান চারশ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিল। রাসূল (সা) তাঁকে ডেকে আস্তে কিছু বলে দেন। শুনেই আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ চুপ হয়ে গেলেন। অতঃপর যখন আবূ জাহাশকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে কি ইরশাদ করলেন ? আবূ আহমদ বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেন, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য উত্তম হবে এবং এর পরিবর্তে বেহেশতে তুমি একটি বাড়ি পেয়ে যাবে। আমি আরয করলাম, আমি ধৈর্যধারণ করব।

আবূ আহমাদ ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাগণ তাঁদের পরিত্যক্ত বাড়ি ফেরত প্রদানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। নবী (সা) বললেন, তোমাদের যে সম্পদ আল্লাহর পথে চলে গিয়েছে (দখল করা হয়েছে) তা ফেরত নেয়া আমি প্রসন্দ করছি না। এটা শ্রবণ করে সাহাবায়ে কিরাম চুপ হয়ে গেলেন এবং যে বাড়িঘর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করেছেন। অতঃপর তা ফেরত প্রদানের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। যে বাড়িতে নবী (সা) জন্মগ্রহণ করেন এবং যে বাড়িতে হযরত খাদীজা (রা) -এর সাথে বিবাহ সম্পন্ন হয় রাসূল (সা) ঐ বাড়ির কথা উল্লেখ করেন নি।[১]

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বিশেষ অপরাধীদের সম্পর্কে বিধান

মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। যারা তাঁর পথে কাঁটা বিছিয়ে রেখেছে, যারা তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করেছে, যারা তাঁর সাথে সর্বদা সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে এবং যারা তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, সবাইকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তি যারা নবী (সা)-এর সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের ঔদ্ধত্য অভদ্রতা ও তাঁকে গালি-গালাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই নির্দেশ জারী করা হয় যে, যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে, হত্যা করবে। এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ রয়েছে ঃ

مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلاً سُنَّةَ اللّٰهِ فِىْ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلاً ـ

“এ সমস্ত অভিশপ্ত ব্যক্তিকে সেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। পূর্বে যারা (বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী) অতীত হয়ে গিয়েছে,

১. আস-সারেমুল মাসলূল, পৃ. ১৫৪।

তাদের জন্য এটাই ছিল আল্লাহ্র রীতি ও বিধান। তুমি কখনো আল্লাহ্র বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৬১-৬২।)

আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত পয়গাম্বরের সম্মান ও মর্যাদা এবং তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা করা সমস্ত উম্মাতের উপর ফরয। তাঁর অমর্যাদা করা হলো আল্লাহ্র দীনের অমর্যাদা করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ "নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো নির্বংশ।" (সূরা কাওসার ঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

وَاِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ - اَلَاتُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ -

"যদি চুক্তির পর তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে বিদ্রূপ করে, তাহলে কাফিরগণের প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। তারা এরূপ লোক যাদের কোন প্রতিশ্রুতি রইল না; যেন তারা নিবৃত্ত হয়। তোমরা কি সেই সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে এবং রাসূলের বহিষ্করণের জন্য সংকল্প করেছে? তারাই প্রথম তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? আল্লাহকে ভয় করাই তোমাদের পক্ষে অধিক সমীচীন যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা তাওবা ঃ ১২-১৩।)

অর্থাৎ যারা নবী করীম (সা)-কে বিতাড়িত করার সংকল্প করেছে, তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে ঈমানদারগণের সামান্যতম দ্বিধা বা সংশয় থাকা উচিত নয়। তাদের বাহ্যিক শক্তি-সামর্থ্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রত্যক্ষ করে ভয় না পেয়ে একমাত্র আল্লাহ্কে ভয় করা উচিত এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য-সহযোগিতার জন্য জীবন ও ধন-সম্পদ যা কিছু প্রয়োজন তা উৎসর্গ করতে অনীহা না করবে। এ বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, গালি-গালাজ, ঠাট্টা, কটুকথা ইত্যাদির অপরাধ বিতাড়িত করার অপরাধের চেয়ে অধিক জঘন্য ও কঠোর। সরকার যে কোন কঠোর অপরাধ ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে কটুকথা গালি-গালাজকারীর ব্যাপারে এক মুহূর্তের জন্য সুযোগ দেয়া যায় না। এতে রাষ্ট্রের অবমাননা করা হয়।

এছাড়া নবী (সা)-এর অবমাননা সমস্ত উম্মাতের অবমাননা ও অপমান করারই নামান্তর। সুতরাং সমস্ত উম্মাতের উপর ফরয ও কর্তব্য হলো এই যে, যখনই নবী (সা)-এর শানে কোন অবমাননাসূচক কথা শুনবে, তখন সাথে সাথে তাকে হত্যা করবে অথবা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করবে।

تشتم ايدينا ويحلم رأينا * ونشتم بالافعال لابالتكلم

"আমাদের হাত গালি দিচ্ছে, আমাদের বিবেক ধৈর্যধারণ করছে। আমরা কাজের দ্বারা গালি দিচ্ছি, মুখ দ্বারা নয়।"

কাযী ইয়াযের শিফা নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ যখন ইমাম মালিক-এর নিকট রাসূল (সা)-এর শানে অবমাননাকারীর বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, مابقاء الامة بعد شتم نبيها "এই উম্মাতের জীবনের কি মূল্য আছে যাদের নবীকে গালি দেয়া হয়।"

শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবন তায়মিয়ার যুগে একজন খ্রিস্টান নবী (সা)-এর শানে অবমাননা ও অবজ্ঞাসূচক কথা বলে। তখন ইবন তায়মিয়া এ বিষয়ে ছ'শ পৃষ্ঠার এক বিরাট কিতাব রচনা করেন। এই গ্রন্থের নাম রাখেন– الصارم المسلول على شاتم الرسول। এই গ্রন্থে পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীস, সাহাবা ও তাবেঈদের ইজ্‌মা, খুলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম এবং যুক্তি ও দলীল দ্বারা রাসূল (সা)-কে গালি প্রদানকারীকে হত্যা করা ওয়াজিব বলে প্রমাণ করেছেন।[১]

সারকথা ঃ নবী (সা) যে সমস্ত লোকের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের দিন এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে হবে। এরূপ ব্যক্তি ছিল মাত্র পনের-ষোলজন। এখানে তাদের বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

প্রথম ঃ আবদুল্লাহ ইবন খাত্তাল, এ ব্যক্তি প্রথমত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে সাদাকা আদায় করার জন্য নিয়োগ করেন। একজন গোলাম ও একজন আনসার তার সাথে ছিল। এক মঞ্জিলে পৌঁছার ইব্‌ন খাত্তাল গোলামকে খাবার তৈরি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। গোলাম কোন কারণে ঘুমিয়ে পড়ে। জাগ্রত হওয়ার পর ইবন খাত্তাল দেখতে পায় যে, সে এখনো খাবার তৈরি করেনি। ক্রোধান্বিত হয়ে সে গোলামকে হত্যা করে। অতঃপর তার খেয়াল হয় যে নবী (সা) তার কিসাস হিসেবে আমাকে হত্যা করবেন, অবশেষে মুরতাদ হয়ে মক্কা গিয়ে মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। যাওয়ার সময় সাদাকার উটও সাথে নিয়ে যায়। সে রাসূল (সা)-এর কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করত এবং বাঁদীদেরকে এ সমস্ত কবিতা দ্বারা গান গাওয়ার নির্দেশ প্রদান করত। ফলে তার দ্বারা তিনটি অপরাধ সংঘটিত হয় ঃ (১) অন্যায়ভাবে রক্তপাত করা; (২) মুরতাদ হওয়া বা ধর্ম ত্যাগ করা এবং (৩) নবী (সা)এর দুর্নাম ও কুৎসা রটনা করে কবিতা আবৃত্তি করা। ইবন খাত্তাল মক্কা জয়ের দিন কা'বা ঘরের পর্দার মধ্যে নিজকে জড়িয়ে রাখে। নবী (সা)-এর খেদমতে আরয করা হয় যে, ইবন খাত্তাল খানায়ে কা'বার পর্দা আকড়িয়ে রয়েছে। রাসূল (সা) নির্দেশ করেন, তাকে সেখানেই হত্যা কর। সুতরাং আবূ বারযা আসলামী এবং সা'দ ইবন হুরায়স তাকে

১. কিতাবটি দায়িরাতুল মা'আরিফ, হাযদরাবাদ (দক্ষিণাত্য) থেকে মুদ্রিত হয়।

হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করেন। (আস-সারিমুল মাসলূল, পৃ. ৬৩৩; যারকানী, ২য় খ, পৃ. ৩১৪)

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঃ কমরতানা[১] এবং কুরায়বা নাম্নী দু'মহিলা ইবন খাত্তালের দাসী ছিল। দিবারাত্র নবী (সা)-এর কুৎসা রটনা করত। মক্কার মুশরিকরা যখন কোন মজলিসে একত্র হত, তখন মদ্যপানের মহড়া চলত এবং এ দু'জন নবী (সা)-এর দুর্নাম করে কবিতা আবৃত্তি করত, গান-বাজনা করত। এদের একজনকে হত্যা করা হয়। অপরজন নিরাপত্তার জন্য আবেদন করলে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। এরপর রাসূল (সা)-এর দরবারে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

চতুর্থ ঃ সাররাহ, বনী আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে কারো দাসী ছিল। সে রাসূল (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে গান করত। কেউ কেউ বলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং হযরত উমর (রা) খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিল। সে ছিল ঐ মহিলা যে হাতিব ইবন আবূ বালতা'আ (রা)-এর পত্র নিয়ে মক্কা রওয়ানা হয়েছিল।

পঞ্চম ঃ হুয়াইরিস ইবন নাকীদ ছিল একজন কবি এবং নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে সে কবিতা আবৃত্তি করত। তাই তাকে হত্যা করা বৈধ করা হয়। হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন।[৩]

ষষ্ঠ ঃ মুকাইস ইবন সাবাবা প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। গাযওয়ায়ে যি'কাদে একজন আনসারী শত্রু মনে তার ভাই হিশামকে ভুলে হত্যা করে। নবী (সা) রক্তপণ আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। মুকাইস রক্তপণ গ্রহণের পর উক্ত আনসারীকে হত্যা করে এবং মুরতাদ হয়ে মক্কা গমন করে। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) তাকে হত্যা বৈধ করেন। মুকাইস বাজারে যাওয়ার পথে তাকে গ্রেফতার[১] করা হয় এবং গায়লাতা আবদুল্লাহ লায়সী তাকে হত্যা[৪] করেন।

সপ্তম ঃ আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবূ সারাহ প্রথমে ওহী লিখক (كاتب الوحى) ছিল। মুরতাদ হয়ে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। হযরত উসমানের দুধভাই ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন সে জীবন রক্ষার জন্য লুকিয়ে থাকে। হযরত উসমান (রা) তাকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। নবী (সা) ঐ সময় লোকজনের বায়'আত গ্রহণ করছিলেন। তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আবদুল্লাহ উপস্থিত হয়েছে, তার থেকেও বায়'আত গ্রহণ করুন। রাসূল (সা) কিছুক্ষণ চুপ

---

১. আস-সারিমল মাসলূল, পৃ ১২৬।

২. যারকানী, ২খ. পৃ. ৩১৫।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ম, পৃ. ৯

৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪ খ, পৃ. ২৯৮।

থাকলেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা) যখন আবদেন-নিবেদন করলেন, তখন তিনি আবূ সারাহ থেকে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে তার জীবন রক্ষা পায়। পরে নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন বুদ্ধিমান ছিল না যে, যখন আমি আবদুল্লাহ্র বায়'আত গ্রহণ থেকে হাত থামিয়ে রেখেছি এসময় তাকে হত্যা করে ফেলতে? একজন আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ সময় কেন আপনি একটু ইঙ্গিত করলেন না, রাসূল (সা) বললেন, নবীদের জন্য ইশারা প্রদান করা উচিত নয়।

আবদুল্লাহ ইবন আবূ সারাহ (রা) এবার অত্যন্ত ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তার সম্পর্কে অন্য কোন কথা উঠেনি। হযরত উমর (রা) ও হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে মিসর ও অন্যান্য দেশে গভর্নর ও বিচারক নিযুক্ত হয়েছেন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ২৭ অথবা ২৮ হিজরীতে আফ্রিকা বিজয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতের সময় সমস্ত গোলযোগ থেকে আলাদা ও দূরে ছিলেন। হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়ার মধ্যে কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন নি। হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতের শেষদিকে আসকালানে ইনতিকাল করেন। ইনতিকাল সম্পর্কে বিস্ময়কর ঘটনা হলো এই যে, একবার ভোরে উঠে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই দু'আ করেন, اللهم اجعل اخر عملى الصبح (হে আল্লাহ! আমার সর্বশেষ আমল ভোরে কর) ওযূ করলেন এবং নামায পড়ালেন। ডান দিকে সালাম ফিরানোর পর বামদিকে সালাম ফিরাবেন, এমনি মুহূর্তে তাঁর রূহ নশ্বর দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে চলে গেল।[১]

انا لله وانا اليه راجعون

অষ্টম ঃ ইকরামা ইবন আবূ জাহল ঐ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো, মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা করা বৈধ করা হয়েছিল। ইকরামা আবূ জাহলের পুত্র ছিলো। পিতার মত সে ও নবী (সা) ঘোরতর শত্রু ছিলো। মক্কা বিজয়ের পর পলায়ন করে ইয়ামন গমন করে। ইকরামার স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারিস ইবন হিশাম ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী করীম (সা)-এর দরবারে এসে স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। শান্তির দূত মহানবী (সা) আবূ জাহলের পুত্র ইকরামার নিরাপত্তার আবেদন সাথে সাথেই গ্রহণ করেন।

ইকরামা পলায়ন করে ইয়ামনের সমুদ্রের কিনারায় পৌছে নৌকায় আরোহণ করে। প্রচণ্ড বায়ু নৌকাটি ঘিরে ফেলে। ইকরামা লাত ও ওয্যা দেবতাকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকে। নৌকার লোকজন বলে, এ সময় লাত-ওয্যা দ্বারা কোন কাজ হবে না। এক আল্লাহকে স্মরণ কর। ইকরামা বলল, আল্লাহ্র শপথ! যদি দরিয়ার মধ্যে

---

১. আল-ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৩১৬; যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৩

আল্লাহ ছাড়া কোন কাজ ও সাহায্য না হয়, তাহলে স্থলে ও আল্লাহ ব্যতীত কেউ কাজে আসবে না। তখনই সঠিক অন্তরে আল্লাহর সাথে এই অঙ্গীকার করলেন ঃ

أللهم لك عهد ان عافيتني مما انافيه ان اتى محمدا حتى اضع يدى فى يده فلاجدنه عفوا غفورا كريما

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করছি যে, যদি তুমি আমাকে এই বিপদ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দাও, তাহলে আমি অবশ্যই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আমার হাত তাঁর হাতে রাখব। আমি নিশ্চয়ই তাঁকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান হিসেবে পাব।" (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

এদিকে ইকরামার স্ত্রী সেখানে গিয়ে পৌছেন এবং তাকে বলেন ঃ

يا ابن عم جئتك من عند ابر الناس واوصل الناس وخير الناس لاتهلك نفسك انى قد استأمنت لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

"হে আমার চাচার পুত্র (চাচাত ভাই)! আমি সর্বাধিক নেককার, সর্বাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে আগমন করেছি। তুমি নিজকে ধ্বংস করো না। আমি তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে নিরাপত্তা গ্রহণ করেছি।"

এটা শুনে ইকরামা উম্মে হাকীমের সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে সহবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করে। উম্মে হাকীম বলেন, এখনো তুমি কাফির আর আমি হলাম মুসলমান, ইকরামা বলল, কিরূপ বিরাট বস্তু তোমাকে বাঁধা প্রদান করছে? এটা বলেই মক্কা রওয়ানা হল। ইকরামা পৌঁছার পূর্বেই নবী (সা) সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

يأتيكم عكرمة مؤمنا فلاتسبوا اباه فان سب الميت يؤذى الحى

"ইকরামা মু'মিন হয়ে আগমন করছে। সুতরাং তার পিতাকে গালি দিও না। কেননা মৃত ব্যক্তিকে গালি দেওয়ায় জীবিত ব্যক্তি কষ্ট পেয়ে থাকে।"

ইকরামা নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার স্ত্রীও ঘোমটা দিয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকেন। ইকরামা আরয করে, আমার স্ত্রী এখানে হাযির রয়েছে। সে আমাকে বলেছে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন। রাসূল (সা) বললেন, সে সত্য বলেছে, তোমাকে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। ইকরামা বলল, আপনি কোন্ বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন? নবী (সা) বললেন, তুমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, নামায আদায় কর, যাকাত দান কর। এছাড়া ইসলামের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাকে শিক্ষা দেন। ইকরামা বলল ঃ

قد كنت الا الى خير وامر حسن جميل قد كنت فينا يارسول الله قبل ان تدعونا وانت اصدقنا حديثًا وابرنا ـ

"নিশ্চয়ই আপনি উত্তম, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য বিষয়ের দিকে আহ্বান করেছেন। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই সত্যের দিকে দাওয়াতের পূর্বেও আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী ও নেককার ছিলেন।"

অতঃপর বলেন ঃ أشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের পর ইকরামা বলেন, আমি আল্লাহ্ এবং উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এখন একজন মুসলমান, মুজাহিদ ও মুহাজির।[১]

অতঃপর তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার খেদমতে আমার আরয এই যে, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করবেন। রাসূল (সা) ইকরামার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। ইকরামা আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহ্‌র পথে বাধা প্রদানের জন্য আমি যা ব্যয় করেছি এখন আমি আল্লাহর পথে আহ্বানের উদ্দেশ্যে তার চেয়ে দ্বিগুণ ব্যয় করব। আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে আমি যে পরিমাণ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড করেছি, এখন থেকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে তার চেয়ে দ্বিগুণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করব। যে সমস্ত স্থানে আমি লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করেছি, ঐ সমস্ত স্থানে গিয়ে আমি লোকজনকে আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করব। সুতরাং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) যখন ধর্মত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে মুকাবিলার জন্য বাহিনী প্রেরণ করেন, তখন একটি বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন হযরত ইকরামা (রা)। মূলত জীবনের বাকী অংশ তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে জিহাদ ও সংগ্রাম করে অতিবাহিত করেছেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে আজনাদাইনের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। দেহের মধ্যে তীর ও তলোয়ারের সত্তরটির চেয়ে অধিক ক্ষত বিদ্যমান ছিল।[২]

উম্মুল মু'মিনীর হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার এইকথা বলেন যে, আমি স্বপ্নে আবূ জাহলের জন্য বেহেশতে একটি বাসস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। ইকরামা যখন ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন নবী (সা) উম্মে সালামা (রা)-কে বলেন, আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা হলো এটাই। (ইসাবা)

---

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩১৪।

২. আল-ইসতি'আব লি ইবনি আবদুল বার, ৩ খ, পৃ. ১৪৮।

ইকরামা মুসলমান হওয়ার পর অবস্থা হয় এই যে, যখনই তিনি তিলাওয়াতের জন্য বসতেন এবং কুরআন মজীদ খুলতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন এবং বারবার বলতেন هٰذَا كَلَامُ رَبِّىْ –"এটা আমার প্রতিপালকের কালাম।"[১]

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন ইকরামার হাতে একজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রাসূল (সা)-কে যখন এ সংবাদ অবহিত করা হয়, তখন তিনি মুচ্‌কি হেসে বললেন, হত্যাকারী এবং নিহত উভয়েই বেহেশতী।[২] ভবিষ্যতের জন্য এই ইঙ্গিত ছিল যে, ইকরামা বর্তমানে যদিও কাফির, কিন্তু অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

নবম ঃ হিবার ইবন আসওয়াদের অপরাধ ছিল এই যে, সে মুসলমানদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিত। নবী (সা)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) (আবুল আস ইবন রাবী-এর স্ত্রী) যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা যাচ্ছিলেন, তখন হিবার ইবন আসওয়াদ কয়েকজন লম্পট ও দুষ্কৃতিকারীকে নিয়ে পথিমধ্যে হযরত যমনাবের উপর বর্শা নিক্ষেপ করে। যার ফলে তিনি একটি পাথরের উপর পড়ে যান। তিনি গর্ভবতী ছিলেন, গর্ভপাত হয়ে গেল এবং তিনি এই রোগে ইনতিকাল করেন। انا لله وانا اليه راجعون

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সা) হিবারকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করেন। যখন নবী (সা) জি'রানা থেকে ফিরে আসেন, তখন হিবার রাসূল (সা)-এর খেদমতে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। সাহাবাগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই ব্যক্তি হলো হিবার ইবন আওসয়াদ। নবী (সা) বললেন, আমি দেখেছি। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে একজন হিবারকে আক্রমণ করার জন্য যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইশারা দিয়ে বললেন, বস। হিবার ইবন আসওয়াদ দাঁড়িয়ে আরয করেন ঃ

السلام عليك يانبى الله أشهد ان لا اله الله وأشهد ان محمداً رسول الله وقد هربت منك فى البلاد واردت اللحاق بالاعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وكنا يانبى الله اهل شرك فهدانا الله بك وانقذنا من الهلكة فاصفح عن جهلى وعما كان يبلغك عنى فانى مقر بسوء فعلى معترف بذنبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنك وقد احسن الله اليك اذهداك للاسلام والاسلام يجب ماقبله ـ

১. ইহইয়া উলূমুদ্দীন, ১ খ, পৃ, ২৫৩।

২. মাদারিজুন নবুওয়াত, ২ খ, পৃ. ৩৯৩।

হিবার রাসূল (সা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং অতীত দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা চান। রাসূল (সা) তাকে ক্ষমা করে দেন।

দশম ঃ ওয়াহ্শী ইবন হারব ছিল সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত হামযা (রা)-এর হত্যাকারী। (এর বিস্তারিত বর্ণনা গাযওয়ায়ে ওহুদের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে)। মক্কা বিজয়ের পর সে পলায়ন করে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন (নবুওয়তের দাবিদার) মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন, ওয়াহ্শীও বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যে বর্শা দিয়ে হযরত হামযা (রা)-কে শহীদ করেন, ঐ বর্শাও তার সাথে ছিল। যে বর্শা দ্বারা সর্বোত্তম ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন, একই বর্শা দ্বারা সে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেন। (ইসতি'আব ইবন্ আবদুল বার)[১]

একাদশ ঃ কা'ব ইবন যুহায়র একজন বিখ্যাত কবি ছিল। নবী (সা)-এর কুৎসা রটনায় কবিতা আবৃত্তি করত। সে ঐ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা করা বৈধ ঘোষণা করা হয়। মক্কা বিজয়ের দিন সে পলায়ন করে। অতঃপর মদীনা গমন করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (সা)-এর প্রশংসায় কাব্য রচনা করে যা আরবী ভাষার কাব্য জগতে বানাত সু'আদ (بانت سعاد) নামে খ্যাত।[২] নবী (সা) তাঁর কবিতা শুনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে স্বীয় চাদের উপহার দেন।

দ্বাদশ ঃ হারিস ইবন তলাতিল, নবী (সা)-এর কুৎসা রটনা করত। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আলী (রা) তাকে হত্যা করেন।[৩]

ত্রয়োদশ ঃ আবদুল্লাহ ইবন যিব'আরা (عبد الله بن زبعرى) অত্যন্ত উচ্চমানের কবি ছিল। নবী (সা)-এর নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা আবৃত্তি করত। হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যেব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কা বিজয়ের দিন ইবন যিব'আরাকে হত্যা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সে পলায়ণ করে নজরান গমন করে। অবশেষে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন।[৪]

يارسول المليك ان لسانى * راتق ما فَتَقْتُ اِذَا اَنَا بُوْرٌ ـ

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার যবান ও মুখ ঐ অনিষ্টতার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে যা আমি স্বীয় গোমরাহীর অবস্থায় সম্পন্ন করেছি।"

---

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ২১৬।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০; আল ইসতি'আব, পৃ. ২৯৭।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০।

৪. সীরাতে ইবন হিশাম; ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪২৫।

امن اللحم والعظام بربى * ثم قلبى الشهيد انت النذير ـ

"আমার গোশত ও হাড় আমার প্রতিপালকের উপর ঈমান আনয়ন করেছে। অতঃপর আমার অন্তর সাক্ষী প্রদান করছে যে, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার (পক্ষ থেকে সুসংবাদদাতা) ও ভয় প্রদর্শনকারী।" (সীরাতে ইবন হিশাম)

চতুর্দশ

হিরাত ইবন আবু ওয়াহ্হাব মাখযুমীও ঐ সমস্ত কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা নবী (সা)-এর নিন্দা করে কবিতা আবৃত্তি করত। মক্কা বিজয়ের দিন পলায়ণ করে নজরান গমন করে এবং সেখানেই কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। (সীরাতে ইবন হিশাম) ইসাবা হিন্দ বিনত আবূ তালিব প্রবন্ধ যিনি উম্মে হানী উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিল। হিরাতা ইবন আবূ ওয়াহ্হাবের স্ত্রী ছিল।[১]

পঞ্চদশ

হিন্দা বিনতে উতবা, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী, সে ঐ হিন্দা, যে মহিলা ওহুদ যুদ্ধে হযরত হামযার (রা) কলিজা বের করে চিবিয়েছিল! হিন্দা ঐ সমস্ত মহিলার অন্তর্ভুক্ত ছিল মক্কা বিজয়ের দিন যাদেরকে হত্যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। হিন্দা নবী (সা)-কে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। হিন্দা রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। ঘরে ফিরে সমস্ত মূর্তিকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে বলেন, তোমাদের কারণেই আমরা ধোকার মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম।[২]

এ পনের ব্যক্তি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী ছিল। তাদের অপরাধ ছিল অত্যন্ত জঘন্য এদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়েছে। যে বিদ্রোহ ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে তাকে হত্যা করা হয়।

এবার কয়েকজন সম্মানিত কুরায়শ ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করা হবে যাঁরা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণ

আবূ কুহাফা (রা) ছিলেন হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর পিতা। মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা) মসজিদে হারামে তশরীফ রাখেন। হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে নবী (সা)-এর দরবারে হাযির হলেন এবং সামনে বসিয়ে দিলেন, রাসূল (সা) বললেন ঃ هلا تركت الشيخ فى بيته حتى اكون أنا أتيه فيه

---

১. সীরাতে ইবন হিশাম; ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪২৫

২. প্রাগুক্ত

"হে আবূ বকর। তুমি এই বৃদ্ধকে কেন ঘরে রেখে আসলে না, আমি নিজেই তাঁর নিকট গমন করতাম।"

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করেন ঃ

يارسول الله هو أحق ان يمشى اليك من ان تمشى انت

"হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আমার পিতার নিকট গমন করার চেয়ে আমার পিতা নিজে পদব্রজে আপনার খেদমতে হাযির হওয়া অধিক উত্তম।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ কুহাফার বুকে পবিত্র হাত ফিরালেন এবং ইসলামের কিছু বাণী তালীম দান করেন। আবূ কুহাফা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। বয়স্ক হওয়ার কারণে সমস্ত চেহারা এবং মাথা সাদা ছিল। রাসূল (সা) তাঁকে খেযাব ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন কিন্তু কাল খেযাব ব্যবহার করতে নিষেধ করেন।[১]

আল্লামা হালাবী (রা) সীরাতে হালাবিয়াতে উল্লেখ করেন যে, আবূ কুহাফার ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (সা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে মুবাকবাদ জানালেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে হক প্রদান করে প্রেরণ করেছেন, যদি আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করতেন তাহলে আমার চোখ অধিক ঠাণ্ডা হতো।[২]

সাফ্ওয়ান ইবন উমাইয়ার ইসলাম গ্রহণ

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা কুরায়শদের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। দানশীলতা মেহমানদারী ও অতিথি সেবায় তিনি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা উমাইয়া ইবন খালফ বদর যুদ্ধে নিহত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন জিদ্দা পলায়ন করেন। তার চাচাত ভাই উমায়র ইবন ওয়াহ্হাব নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে সাফওয়ানের নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেন। তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন এবং আলামত হিসেবে স্বীয় পাগড়ী অথবা চাদর দান করেন। উমায়র জিদ্দা গমন করে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। নবী করীম (সা)-এর দরবারে আগমন করে আরয করেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন বলে উমায়র বলছে। রাসূল (সা) বলেন, হাঁ। সাফওয়ান আরয করে, চিন্তা করার জন্য আমাকে দু'মাস সময় দিন। নবী (সা) বললেন, তোমাকে চার মাস সময় দেয়া হলো। ঐ সময় সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। হুনায়ন যুদ্ধে সাফওয়ান রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলেন। তার কাছ থেকে রাসূল (সা) লোহার বর্ম ও কিছু যুদ্ধের পোষাক ধার হিসেবে গ্রহণ করেন। হুনায়ন পৌঁছে সে বলে ঃ

১. রওযুল উনুফ, ৭ খ, পৃ. ২৭০

২. সীরাতে হালবীয়া, ২ খ, পৃ. ২১২

كان يربنى رجل من قريش احب الى من ان يربنى رجل من هوازن

"কুরায়শদের কোন ব্যক্তির উপদেশ আমার নিকট অধিক প্রিয় হাওয়াযিনের কোন ব্যক্তির উপদেশের চেয়ে।"

হুনায়ন থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) সাফওয়ানকে অসংখ্য বকরী দান করেন সাফওয়ান ঐ বকরী দেখে বলেন, আল্লাহর শপথ! নবী ব্যতীত এত বিপুল পরিমাণ দান আর কেউ করতে পারে না এবং সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। (ইসতি'আব ও ইসাবা)

সুহায়ল ইবন আম্‌রের ইসলাম গ্রহণ

সুহায়ল ইবন আম্‌র মক্কার মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ও নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন। কুরায়শদের মুখপাত্র ও বক্তা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তাকে আগমন করতে দেখে নবী (সা) বলেন ঃ قد سهل من أمركم (এবার তোমাদের কাজ সহজ হয়ে গেল)।

মক্কা বিজয়ের দিন সুহায়ল তার পুত্র আবদুল্লাহকে নবী করীম (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করে বলেন, তুমি সেখানে গিয়ে রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে আমার জন্য নিরাপত্তা গ্রহণ কর। তিনি তাকে নিরাপত্তা দান করেন এবং সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

من لقى سهيل بن عمرو فلايحد اليه النظر فلعمرى ان سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الاسلام -

"যে ব্যক্তি সুহায়লের সাথে সাক্ষাত করবে, সে যেন তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে না দেখে। আমার জীবনের শপথ! নিশ্চয়ই সুহায়ল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ভদ্র। সুহায়লের মত লোক ইসলাম থেকে জাহিল ও বেখবর থাকতে পারে না।"

সুহায়ল তাৎক্ষণিক ইসলাম গ্রহণ করে নি। হুনায়নের যুদ্ধে নবী (সা)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] এবং শপথ গ্রহণ করেন যে, মুশরিকদের সাথে মিলে যত যুদ্ধ করেছি, এখন মুসলমানদের সাথে মিলে তত পরিমাণ যুদ্ধ করব। মুশরিকদের জন্য যে পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছি, সে পরিমাণ সম্পদ মুসলমানদের জন্য ব্যয় করব।[২]

একদিন হযরত উমর (রা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর দরজায় লোকজন অপেক্ষমান ছিল। সুহায়ল ইবন আমর, আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং অন্যান্য কুরায়শ

১. সীরাতে হালবীয়া, ২ খ, পৃ. ২২৬।
২. ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৯৪।

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দারোয়ান সংবাদ পৌছানোর পর সুহায়ব, হযরত বিলাল ও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ভিতরে ডেকে নেয়া হলো। এবং সুহায়ল, আবূ সুফিয়ান এবং কুরায়শ নেতাদেরকে ডাকা হলো না। আবূ সুফিয়ান বলল, আজকের এই দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি। গোলামদেরকে ডাকা হলো কিন্তু আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হলো না। এ সময় সুহায়ল সে বুদ্ধিদীপ্ত জবাব প্রদান করেছেন, তা অন্তরে গেথে রাখার মত। সুহায়ল আবূ সুফিযান ও অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ "হে আমার গোত্রের নেতৃবৃন্দ! আল্লাহ্র শপথ, তোমাদের চেহারায় অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের আলামত পরিদৃশ্য হচ্ছে। অথচ অন্যের উপর ক্রোধ প্রকাশের চেয়ে নিজেদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করা উচিত। কেননা সত্য দীনের দাওয়াত তাঁদেরকে দেওয়া হয়েছে, তোমাদেরকেও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শোনামাত্র তা গ্রহণ করেছেন আর তোমরা গ্রহণ না করে পিছনে রয়েছ। আল্লাহর শপথ! এ সমস্ত লোক যে মর্যাদা ও ফযীলত অর্জন করেছে, ঐ মর্যাদা থেকে তোমাদের বঞ্চিত থাকা আমার নিকট এই দরজার বঞ্চিত হওয়া থেকে অনেক বেশি কঠোর যার উপর তোমরা ঈর্ষা করছ। এ সমস্ত লোক তোমাদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। এ মর্যাদা ও ফযীলত অর্জন করার জন্য এখন আর তোমাদের কোন পথ বা সুযোগ নেই। এই হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই, তৈরি হয়ে যাও, এটা কোন অবাক বিষয় নয় যে, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শাহাদাতের নি'আমত দ্বারা অভিষিক্ত করে দেবেন।"

সুহায়ল যখন তাঁর মনোমুগ্ধকর ও আকর্ষণীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করেন, তখনই তাঁর গোত্র ও পরিবারের লোকজন আল্লাহর পথে রোমকদের মোকাবিলার জন্য জিহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। কেউ কেউ বলেন, আমওয়াসের মহামারীতে (طاعون أمواس) তিনি ইনতিকাল করেন। মোটকথা, যে কোন অবস্থায় তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। (ইস্তি'আব লি ইবন আবদুল বার)

আবূ লাহাবের পুত্র উতবা ও মা'তাবের ইসলাম গ্রহণ

হযরত আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা বিজয়ের জন্য এখানে আগমন করেন, তখন আমাকে বললেন, তোমার দু'ভাতিজা এবং আবূ লাহাবের পুত্র উতবা ও মা'তাব কোথায়? তারা তো আমার সাথে সাক্ষাত করেনি। আমি আরয করলাম, কুরায়শ গোত্রের মুশরিকরা আত্মগোপন করেছে। তাদের সাথে এ দু'জন ও দূরে কোথাও পলায়ন করেছে। রাসূল (সা) বললেন, তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি নবী (সা) এর নির্দেশ অনুযায়ী সাওয়ার হয়ে উরনা নামক স্থানে গিয়ে তাদেরকে নিয়ে আসি এবং রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হই। নবী (সা) তাদের

নিকট ইসলামের মূলনীতি পেশ করেন। তাঁরা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নবী (সা)-এর বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁদের উভয়ের হাত ধরে কা'বা ঘরের সন্নিকটে মুলতাযম এ আগমন করেন এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দু'আ করেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসেন। এ সময় রাসূল (সা)-এর পবিত্র চেহারায় আনন্দের আভা পরিস্ফুটিত হচ্ছিল।

হযরত আব্বাস (রা) বলেন, আমি আরয করলাম। আল্লাহ আপনাকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখুন। আপনার পবিত্র চেহারা আজ আনন্দিত মনে হচ্ছে। রাসূল (সা)-এর (সা) বললেন, আমি আমার পরওয়াদিগারের নিকট এই আবেদন করেছি যে, আমার চাচার এই দু'পুত্র উতবা ও মা'তাব আমাকে দান করুন। আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং আমার জন্য এদু'জনকে হেবা করে দিয়েছেন।[১]

হযরত মু'আবিয়ার ইসলাম গ্রহণ

কেউ কেউ বলেন, মু'আবিয়া (রা) মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু সঠিক কথা হলো এই যে, তিনি হুদায়বিয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু এটা গোপন রাখেন এবং মক্কা বিজয়ের পর তা প্রকাশ করেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) ছিলেন হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর বোন। মা এর ভাই মামা হয়ে থাকেন। ফলে হযরত মু'আবিয়া (রা) হলেন সমস্ত মু'মিনের মামা। সুতরাং আহ্‌লি বায়ত ও নিকটাত্মীয়দের প্রতি মহব্বত রাখা মু'মিনদের উপর কর্তব্য, রাসূল (সা)-এর শ্বশুর পক্ষের লোকদের প্রতি মহব্বত রাখাও তেমনি কর্তব্য।

আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (রা) নবী (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবার পিতা এবং মু'আবিয়া (রা) উম্মে হাবীবার ভাই, তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম। ইসলামের পূর্বে যা কিছু ঘটেছে, তা সবই ক্ষমা করা হয়েছে। ইসলাম পূর্বের ঘটনাবলী উল্লেখ কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

মন্দির ধ্বংস করার জন্য সারিয়া প্রেরণ

নবী (সা) মক্কা বিজয়ের পর প্রায় পনের দিন মক্কায় অবস্থান করেন। কা'বা ঘরে যে সমস্ত মূর্তি ছিল, তা ধ্বংস করান এবং সবার উদ্দেশ্যে এই আহ্বান করেন ঃ

من كان مؤمن بالله واليوم الاخر فلايدع فى بيته صنما -

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালে বিশ্বাস করে, সে যেন তার ঘরে কোন মূর্তি অবশিষ্ট না রাখে।"

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৬৪।

২. ইসাবা, ৩ খ, পৃ. ৪৩৩।

যখন মক্কা মুকাররমা মূর্তি থেকে পবিত্র হয়ে যায় এবং কা'বা ঘরের সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করা হয়, তখন মক্কার চতুর্দিকে মূর্তিসমূহ ধ্বংস করার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল প্রেরণ করা হয়।

উয্‌যা ও সুওয়া নামক মূর্তি ধ্বংস

৮ম হিজরীর ২৫ রমযান হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে ত্রিশজন অশ্বারোহীসহ উয্‌যা নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য নাখ্‌লা নামক স্থানে প্রেরণ করেন। মক্কা থেকে ঐ স্থানের দূরত্ব এক রাতের পথ। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা)-কে সুওআ নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে প্রেরণ করেন। আমর ইবনুল আ'স (রা) সেখানে পৌঁছলে মন্দিরের রক্ষী তাঁকে বলল, তুমি কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশে এই মূর্তি ধ্বংস করার জন্য এসেছি। এ জবাব শুনে রক্ষী বলল, তুমি কখনো এটা করতে সক্ষম হবে না, সুওয়া খোদা তোমাকে প্রতিহত করবে। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা) বললেন, আফসোস! তোমরা এখনো ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছ। আমাকে কিসে প্রতিহত করবে তা কি শুনতে ও দেখতে চাও? এ বলেই এমনি এক আঘাত করেন যার ফলে সুওয়া ধ্বংস হয়ে যায় এবং রক্ষীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি তো দেখতে পেয়েছ। রক্ষী এ দৃশ্য দেখে সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে এবং বলে اسلمت لله (আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি)।

মানাত নামক মূর্তি ধ্বংস

৮ম হিজরীর ২৬ রমযান হযরত সা'দ ইবন যায়দ আশহালী (রা)-কে বিশজন অশ্বারোহী সহ মানাত নামক মূর্তি ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ[১] করা হয়। মূলত পবিত্র রমযানের মাসব্যাপী এই মূর্তি ধ্বংস অর্থাৎ আল্লাহর দুনিয়া থেকে কুফর ও শিরকের অপবিত্রতাকে ধৌত করে পবিত্র করা হয়।

শাওয়াল মাসে ইসলামের প্রচার এবং দীনে হকের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য মুহাজির ও আনসারের ৩৫০ জনের একটি দল হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদের নেতৃত্বে বনূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করেন। এ সমস্ত লোক ইয়ালামলামের কাছে একটি কূপের পার্শ্বে গামীসা নামক স্থানে বাস করত। খালিদ (রা) সেখানে গমন করে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তারা ভয় পেয়ে সঠিকভাবে এটাও বলতে পারেনি যে, আমরা মুসলমান। তারা বলতে থাকে صَبَأْنَا صَبَأْ (আমরা আমাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করেছি)। হযরত খালিদ (রা) এটা যথেষ্ট মনে না করে কিছু লোককে হত্যা করেন এবং কিছু লোককে গ্রেফতার করেন। যখন নবী (সা)-এর খেদমতে পৌঁছে

---

১. যারকানী, ২ খ, পৃ. ৩৪৭।

ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন তিনি হাত উঠিয়ে দু'বার এই কথা বলেন ঃ أللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد। (হে আল্লাহ্! খালিদ যে কাজ করেছে আমি তা থেকে মুক্ত)। (বুখারী ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪৫)

অতঃপর রক্তপণ আদায়ের জন্য হযরত আলী (রা)-কে টাকা-পয়সাসহ বনূ জাযীমার নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আলী (রা) সেখানে গমন করে নিহত ব্যক্তিদের রক্তপণ আদায় করেন। জিজ্ঞাসা করে যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কারো রক্তপণ বাকী নেই, তখন অবশিষ্ট টাকাও সতর্কতাবশত তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। ফিরে এসে যখন রাসূল (সা)-এর নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বলেন أصبت، أحسنتَ [১] (তুমি উত্তম কাজ করেছ)।

গাযওয়ায়ে হুনায়ন, আওতাস ও তায়েফ

(৮ম হিজরী, শনিবার, ৬ শাওয়াল)

মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম হলো হুনায়ন। সেখানে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের লোকজন বাস করত। এ গোত্রের লোকজন অত্যন্ত দক্ষ যুদ্ধবাজ ও তীরন্দাজ ছিল। মক্কা বিজয়ের পর তাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হয় যে, নবী (সা) পুনরায় তাদের উপর আক্রমণ করতে পারেন। সুতরাং পরামর্শ করে তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, আমাদের উপর আক্রমণ করার পূর্বে আমরাই মুসলমানদের উপর আক্রমণ করব। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের নেতা মালিক ইবন আউফ নসরী বিশ হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী নিয়ে মুসলমানের উপর হামলা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

বনী জুশমের নেতা দুরায়দ ইবন সুম্মা বয়স্ক হওয়ার কারণে যদিও চলাফিরা করতে সক্ষম ছিল না কিন্তু বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার কারণে উপদেশ ও পরামর্শের জন্য তাকেও সাথে নিয়ে যায়।

মালিক ইবন আউফ তার বাহিনীর সবাইকে তাদের পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, যাতে মরণপণ যুদ্ধ করতে পারে এবং কেউ তার পরিবারবর্গ ত্যাগ করে পলায়ন করতে না পারে। আওতাসের ময়দানে পৌঁছার পর দুরায়দ জিজ্ঞাসা করে এটা কোন জায়গা? লোকজন বললো, এ স্থানের নাম হলো আওতাস। দুরায়দ বললো, এটা যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত স্থান। এখানে মাটি অত্যন্ত শক্তও নয়, আবার অত্যন্ত নরমও নয় যাতে পা ধসে যাবে। অতঃপর বলে,

مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير ويعار الشاء وبكاء الصغير

"এটা কিরূপ অবস্থা যে, আমি উটের, গাধার এবং বকরী ও শিশুদের চিৎকার শুনছি।"

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৩।

লোকজন বললো, মালিক ইবন আউফ লোকজনকে তাদের পরিবারবর্গ ও ধন সম্পদসহ এখানে নিয়ে এসেছে, যাতে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করতে পারে।"

দুরায়দ বলল, সে বিরাট ভুল করেছে। পরাজিত দল কি কিছু ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যুদ্ধে বর্শা ও তলোয়ার ব্যতীত কোন কিছুই কাজ হয় না। যদি তোমাদের পরাজয় হয় তাহলে পরিবারবর্গের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই পরিবার-পরিজন পিছনে রাখাই উত্তম হবে। যদি বিজয় হয়, তাহলে সবাই এসে মিলিত হবে। আর যদি পরাজয় হয় তাহলে শিশু ও মহিলাগণ শত্রুদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু মালিক ইবন আউফ যৌবনের উম্মাদনায় এদিকে দৃষ্টিপাত না করে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি কখনো আমার সিদ্ধান্ত থেকে বিচ্যুত হব না। বার্ধক্যজনিত কারণে তার জ্ঞান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্র যদি আমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলে তা হলে ভাল, নতুবা আমি এখনই আত্মহত্যা করব। অতঃপর সবাই বললো, আমরা তোমার সাথে আছি।

নবী (সা) যখন তাদের ঐ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবন হাদরাদ আসলামীকে সংবাদ সংগ্রহ ও অনুসন্ধানের জন্য প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহ সেখানে দু'একদিন অবস্থান করে, সার্বিক অবস্থা অবগত হয়ে নবী (সা)-কে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূল (সা)-ও মুকাবিলার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। সাফওয়ান ইবন উমাইয়া থেকে এক শ' বর্শা ও অন্যান্য আসবাবপত্র ধার হিসেবে গ্রহণ করেন।

৮ম হিজরীর ৮ শাওয়াল শনিবার বার হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী মক্কা থেকে হুনায়নের দিকে রওয়ানা হলো। দশ হাজার জীবন উৎসর্গকারী যোদ্ধা মদীনা থেকে রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন। বাকী অমুসলিম যোদ্ধাও এই বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। (সীরাতে ইবন হিশাম) বার হাজার নির্ভিক যোদ্ধার এই বাহিনী হুনায়নের দিকে এগিয়ে চললো। তখন এদের মধ্যে একজন বললো, لن نغلب اليوم من قلة (অদ্য আমরা সংখ্যা অল্প হওয়ার কারণে পরাজিত হব না)। এতে অহংকার ও আত্মম্ভরিতা বিদ্যমান ছিল যা আল্লাহ তা'আলা অপসন্দ করেন। দুনিয়ায় যেহেতু স্বল্পতাও পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। ফলে শত্রুপক্ষের আধিক্য প্রত্যক্ষ করে কোন কোন সাহাবার মুখে এ বাক্য উচ্চারিত হয় যে, অদ্য আমরা সংখ্যাল্পতার কারণে পরাজিত হব না। অর্থাৎ যদি আজ আমরা পরাজিত হই তা হলে এটা সংখ্যা অল্প হওয়ার কারণে হবে না বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হবে। কেননা বিজয় ও সাহায্য আল্লাহ পাকের হাতে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে এ বাক্য পসন্দনীয় হয়নি। কেননা এ কথার মধ্যে বিভ্রান্তিমূলক ধারণা এই ছিল যে, বিজয়ের কারণ হলো সংখ্যাধিক্য বিশেষ করে যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে তাওহীদের শিক্ষা

লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কারো মুখ থেকে এরূপ কাল্পনিক কথা উচ্চারিত হওয়া তাঁদের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। এটাও হতে পারে যে, মক্কা বিজয়ের দিন যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (সা)-এর সাথী হয়েছে এবং এখনো ইসলামের মহত্ব তাঁদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি, এটা তাঁদের সাহচর্যের প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

সুনানে নাসাঈ শরীফ বর্ণিত আছে, একবার ফজর নামাযে নবী (সা) সূরা রূম তিলাওয়াত শুরু করেন। তিলাওয়াতের মধ্যে রাসূল (সা)-এর কিছু সন্দেহ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। তিনি নামায শেষ করে ইরশাদ করেন ঃ

مابال أقوام يصلون معنا لايحسنون الطهور وانما يلبس علينا القران -

"লোকজনের কী হয়েছে যে, আমাদের সাথে নামায আদায়ের জন্য দাঁড়ায় অথচ সঠিকভাবে অযূ সম্পন্ন করে না। সম্ভবত এ সমস্ত লোকই আমার তিলাওয়াতে সন্দেহ ও জটিলতার সৃষ্টি করেছে।"

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবী (সা)-এর মনের অসন্তুষ্টি ও তিলাওয়াতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ঐ সমস্ত লোকের (নামাযে) অংশ গ্রহণের কারণে হয়েছিল যারা অযূর আদব ও মুস্তাহাব যথাযথভাবে আদায় করেনি। নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে সবাই অযূ করেছিল কিন্তু কোন কোন নামাযীর অযূ উত্তমভাবে করা হয়নি। যার ফলে রাসূল (সা)-এর অন্তরে এর প্রভাব পড়ে। এর দ্বারা মুশরিক, কাফির, যিন্দীক ও বিদ্‘আতীদের সংসর্গের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কত অনিষ্টকর হতে পারে তা অনুমান করা যায়। আল্লামা তাইয়্যেবী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, সুন্নাত ও আদবের নূর ও বরকত অন্যজনের প্রতি অনুপ্রবেশ করে থাকে এবং এগুলো পরিত্যাগ করার কারণে অদৃশ্য দয়া ও অনুগ্রহের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। কোন কোন সময় এর প্রতিক্রিয়া অন্যজনের প্রতি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই ব্যক্তির কারণে অন্য ব্যক্তিও কল্যাণ, বরকত এবং নূর ও তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। হযরত সাহাবায়ে কিরামের যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র সাহচর্য ও সান্নিধ্যের কারণ ও প্রভাবে অর্জিত হয়েছিল কিন্তু এই যুদ্ধের সময় নবদীক্ষিত লোকদের সান্নিধ্যের কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়।

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسیدم * کہ دل آزردہ شوی ورنہ سخن بیمارست

"আপনার সকাশে সামান্য ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ভীত অন্তকরণে জড়সড় হয়ে পড়েছি, বিষণ্ন হৃদয়ে কালাতিপাত করছি, নতুবা আরো কিছু বলার ছিল।"

মোটকথা এই বাক্য আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন নি এবং বিজয়ের পরিবর্তে প্রথমবারেই পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এ ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا - وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ، ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَ عَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ذَالِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ -

"আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে প্রফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেছেন কাফিরদেরকে এবং এটা হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা ঃ ২৫-২৬।)

মুসলিম বাহিনী সোমবার বিকালে হুনায়ন প্রান্তরে উপস্থিত হয়। হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের উভয় দল দু'দিকে ওঁৎপেতে বসেছিল। মালিক ইবন আউফ তাদেরকে পূর্ব থেকেই এ নির্দেশ দান করে যে, তলোয়ারের খাপ ভেঙ্গে ফেল এবং মুসলিম বাহিনী যখন এদিক দিয়ে আগমন করবে, তখন বিশ হাজার তলোয়ার দিয়ে একত্রে আক্রমণ করবে। তদনুসারে ভোরের অন্ধকারে যখন মুসলিম বাহিনী এই গিরিপথ দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে, তখন বিশ হাজার তলোয়ার নিয়ে কাফেররা হঠাৎ করে আক্রমণ করে যার ফলে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মাত্র দশ-বার জন জীবন উৎসর্গকারী নবী করীম (সা)-এর চতুর্দিকে ঘিরে থাকে। এ সময় রাসূল (সা)-এর সাথে হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ফযল ইবন আব্বাস, উসামা ইবন যায়দ (রা)-সহ আরো কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। হযরত আব্বাস (রা) রাসূল (সা)-এর খচ্চরের লাগাম এবং আবূ সুফিয়ান ইবন হারিস (রা) রিকাব ধরে রেখেছিলেন।

যারা মক্কা থেকে নবী (সা)-এর সাথে এসেছিল তারা হঠাৎ পরাজয়ের কারণে সমালোচনা শুরু করে। আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (আমির মু'আবিয়ার পিতা) বলেন, এ পরাজয় সাগর থেকে মুক্তা আহরণ করতে পারবে না। কালাদা ইবন হাম্বল আনন্দে চীৎকার করে বলে, আজ যাদুর সমাপ্তি ঘটেছে।

সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা তখনো ইসলাম গ্রহণ করে নি, তিনি বলেন, চুপ! আল্লাহ তোমাদের মুখ বন্ধ করুন। হাওয়াযিন গোত্রের কোন ব্যক্তি আমার লালন-পালন করার চেয়ে আমার নিকট এটা সবচেয়ে পসন্দনীয় যে, কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তি আমার অভিভাবক ও মুরুব্বী হোক। শায়বা ইবন উসমান ইবন আবূ তালহা বলে, আজ আমি আমার পিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করব। তার পিতা ওহুদ যুদ্ধে নিহত হয়। যখন সে নবী (সা)-এর দিকে অগ্রসর হয় তখন হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং রাসূলের (সা) নিকট যেতে সক্ষম হয়নি। সে উপলব্ধি করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে রাসূল (সা) পর্যন্ত যেতে প্রতিহত করা হয়েছে। পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে।

মোটকথা হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের বাহিনী ওঁৎপেতে থাকার স্থান থেকে রেব হয়ে যখন একত্রে হামলা করে এবং চতুর্দিক থেকে বৃষ্টির মত মুসলমানদের উপর তীর বর্ষণ হতে থাকে তখন মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শুধু একান্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন লোক নবী (সা)-এর সাথে রয়ে গেলেন। রাসূল[১] (সা) তিনবার আহ্বান করে বললেন, হে লোক সকল! এদিকে আস। আমি হলাম আল্লাহ্র রাসূল এবং মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ।[২]

أنا النبى لاكذب * انا ابن عبد المطلب -

"আমি হলাম সত্য নবী। আল্লাহ আমাকে যে বিজয় ও সাহায্য এবং আমার পবিত্রতা[৩] ও সম্মান রক্ষা ও সাহায্যের অঙ্গীকার করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। অধিকন্তু আমি হলাম আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।"

হযরত আব্বাস (রা)-এর আওয়ায ছিল খুব উঁচু। মুহাজির ও আনসারগণকে ডাকার জন্য তাঁকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। তিনি উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বললেন ঃ يامعشر الانصار يا أصحاب السمرة। (হে আনসারের দল, হে ঐ সমস্ত লোক যারা বাবলা গাছের নিচে বায়'আত গ্রহণ করেছ)

আওয়ায পৌছামাত্র মুহূর্তের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সাহাবীগণ নবী করীম (সা)-এর চতুর্দিকে একত্র হলেন। নবী (সা) মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ প্রদান করেন। যখন জীবনপণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় এবং যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন রাসূল (সা) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফির-মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ شاهت الوجوه (তাদের চেহারা নষ্ট হোক) সহীহ মুসলিম শরীফের অন্য

---

১. তারীখে ইবনুল আসীর।

২. বুখারী ও মুসলিম।

৩. এটা ইঙ্গিত হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ والله يعصمك من الناس

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) মাটি নিক্ষেপ করার সংগে সংগে বলেন ঃ

انهزموا ورب محمد। (শপথ মুহাম্মদের প্রতিপালকের, তারা পরাজিত হয়েছে)।

কাফির-মুশরিকদের এমন কোন লোক বাকী ছিল না যাদের চোখে এই মুষ্টি মাটির ধূলা পৌঁছেনি, মুহূর্তের মধ্যে শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। অনেকে পলায়ন করলো। অনেককে গ্রেফতার করা হলো। এ ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেছেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ الاية (সূরা তাওবা ঃ ২৫-২৬)

এদিকে রাসূল (সা) এক মুষ্টি মাটি নিক্ষেপ করেন অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা করে আক্রমণ করে। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তিত হতে লাগলো। হাওয়াযিনদের বীর যোদ্ধাদের শক্তি-সামর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী তাদেরকে গ্রেফতার শুরু করে। যুদ্ধে শত্রুদের সত্তরজন নিহত হয়, অনেক গ্রেফতার হয় এবং প্রচুর সম্পদ ও আসবাবপত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়।[১]

হযরত জুবায়র ইবন মুত্ঈম (রা) বর্ণনা করেন, হাওয়াযিনদের পরাজয়ের কিছুক্ষণ পূর্বে আমি আকাশ থেকে একটি কাল চাদর পতিত হতে দেখেছি। চাদরটি আমাদের ও শত্রুদের মধ্যবর্তী স্থানে পতিত হয়। ঐ চাদর থেকে হঠাৎ অসংখ্য পিপীলিকা বের হয়ে সম্পূর্ণ যুদ্ধের ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলো ফিরিশতা হওয়া সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুদল পরাজয় বরণ করে।[৩]

পরাজয়ের পর হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের নেতা ও সেনাপতি মালিক ইবন আউফ নসরী একটি দল নিয়ে পলায়ন করে তায়েফ গমন করে। দুরায়দ ইবন সাম্মা কিছু লোকসহ পলায়ন করে আওতাস নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং কিছু লোক পলায়ন করে নাখলায় পৌছে। নবী (সা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর চাচা আবূ আমির আশ'আরীকে অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ আওতাসের দিকে প্রেরণ করেন। মুকাবিলা হওয়ার পর দুরায়দ রাবী'আ ইবন রুফায় (রা)-এর হাতে নিহত হয়।

সালমা ইবন দুরায়দ হযরত আবূ আমির আশ'আরী (রা)-এর হাঁটুতে তীর নিক্ষেপ করে। যার ফলে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীর পতাকা হাতে নিয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুকাবিলা করেন এবং চাচার হত্যাকারীকে হত্যা করেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন।[৩]

---

১. উয়ূনুল আসার, ২য় খ, পৃ. ১৯২।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৪।

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৪।

হযরত আবূ আমির আশ'আরী (রা) মৃত্যুর সময় হযরত আবূ মূসা আশ'আরীকে বলেন, হে ভাতিজা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে আমার সালাম বলবে এবং আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করতে বলবে। হযরত আবূ মূসা (রা) বলেন, আমি রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম এবং আমার চাচার সালাম পৌছালাম। নবী (সা) সাথে সাথেই পানি চেয়ে অযূ করলেন এবং হাত উঠিয়ে এই দু'আ করেন : اللهم اغفر لا أبى عامر (হে আল্লাহ আবূ আমিরকে ক্ষমা করুন) অতঃপর এই দু'আ করেন–

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس

"হে আল্লাহ, কিয়ামতের দিন তাকে অনেকের চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করুন।"

হযরত আবূ মূসা (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করুন। রাসূল (সা) দু'আ করেন–

اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلاً كريما

"হে আল্লাহ্! আবদুল্লাহ ইবন কায়স এর পাপ মার্জনা করুন এবং কিয়ামতের দিন তাকে (আবূ মূসাকে) মর্যাদাসম্পন্ন স্থানে প্রবেশের সুযোগ দিন।" (বুখারী, পৃ. ৬১৯, গাযওয়ায়ে আওতাস)

তায়েফ অবরোধ

নবী (সা) হুনায়নের গণীমতের মাল ও কয়েদীদের জি'রানা নামক স্থানে জমা করার নির্দেশ দান করেন এবং স্বয়ং তায়েফ রওয়ানা করেন। তায়েফ গমনের পূর্বে তুফায়ল ইবন আমর দাওসীকে কয়েকজন মুসলিমসহ একটি মূর্তি (যার নাম ছিল যুল কাফফাইন) জ্বালিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। নবী (সা) তায়েফ পৌঁছার চারদিন পর হযরত তুফায়ল ইবন আমর একটি কামান ও মিনজানিখ নিয়ে সেখানে হাযির হন। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৮; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২০০)।

পৌঁছার পূর্বেই হাওয়াযিনদের সেনাপতি মালিক ইবন আউফ নসরী তার বাহিনী নিয়ে তায়েফের দূর্গে প্রবেশ করে প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয় এবং কয়েক বছরের খাদ্য-পানীয় ও আসবাবপত্র দূর্গের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে। রাসূল (সা) তায়েফে পৌছে তাদের দূর্গ অবরোধ করে ফেলেন। কামান দিয়ে তাদের উপর পাথর বর্ষণ করে। তারা দূর্গের প্রাচীরের উপর তীরন্দায বাহিনী প্রস্তুত রেখেছিল। তারা এমন কঠোরভাবে তীর নিক্ষেপ করে যার ফলে অনেক মুসলমান আহত হন এবং বারজন শাহাদাত বরণ করেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাদেরকে সামান সামনি যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু জবাবে তারা বলে যে, দূর্গ থেকে বের হওয়ার

আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কয়েক বছরের খাদ্যদ্রব্য আমাদের নিকট মওজুদ রয়েছে। যখন এগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন আমরা তলোয়ার নিয়ে অবতীর্ণ হব। মুসলমানগণ দূর্গের পাশে বসে প্রাচীর ভেঙ্গে সুড়ঙ্গ করার চেষ্টা করেন। শত্রুগণ দূর্গের উপর থেকে তপ্ত লৌহদণ্ড বর্ষণ করতে থাকে। যার ফলে মুসলমানদের পিছু হটে আসতে হয়। এটা দেখে নবী (সা) বাগান ধ্বংসের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। দূর্গের অধিবাসীগণ রাসূল (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দেয়। নবী (সা) বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'আলা ও আত্মীয়তার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি। অতঃপর দূর্গের প্রাচীরের নিকট থেকে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, যে গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে আমাদের নিকট আগমন করবে, সে আযাদ হয়ে যাবে। ফলে বার-তেরজন গোলাম দূর্গ থেকে বের হয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়। এ সময় নবী (সা) স্বপ্নে দেখতে পান যে, এক পেয়ালা দুধ রাসূল (সা)-এর সামনে পেশ করা হয়। একটি মোরগ এসে ঐ দুধের মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করে দেয়ায় দুধ পড়ে যায়। রাসূল (সা) এ স্বপ্ন হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত এই দূর্গ এখনই জয় করা যাবে না, রাসূল (সা) নাওফেল ইবন মু'আবিয়া দায়লামীকে ডেকে এ সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! শিয়াল আপনার নিয়ন্ত্রণে, যদি অবস্থান করেন তাহলে ধরে ফেলবেন, যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।[১]

ইবন মা'সাদের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা) আগমন করে আরয করেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বদ দু'আ করুন। নবী (সা) বলেন, বদ দু'আ করার জন্য আল্লাহ আমাকে অনুমতি প্রদান করেন নি। হযরত উমর (রা) বললেন, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন রয়েছে? নবী (সা) ঐস্থান ত্যাগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং গমনের সময় এই দু'আ করেন —[২]

أللهم اهد ثقيفا وأئت بهم

"হে আল্লাহ সাকীফ গোত্রকে হিদায়ত দান কর এবং তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দাও।"

সুতরাং এই দূর্গ পরে এমনিতেই হস্তগত হয়ে যায়, সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করে। মালিক ইবন আউফ স্বয়ং নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

---

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৮।

২. আত-তাবাকাতিল কুবরা লি ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ১১৫।

হুনায়নে যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন

নবী (সা) তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে ৫ যিলকাদা জি'রানা পৌঁছেন। সেখানে গনীমতের মালসমূহ জমা করা হয়েছিল। গনীমতের মালের মধ্যে ৬ হাজার কয়েদী, ৩৪ হাজার উট, ৪০ হাজার বকরী এবং ৪ হাজার উকিয়া রৌপ্য ছিল। এখানে পৌঁছার পর নবী (সা) দশ দিনের অধিক হাওয়াযিন গোত্রের অপেক্ষা করেন। হয়ত তারা স্বীয় আপনজন, শিশু ও মহিলাদেরকে মুক্ত করে নেয়ার জন্য আগমন করবে। কিন্তু দশ দিন অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ আগমন করেনি, তখন নবী (সা) গনীমতের মালামাল যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৮; উয়ূনুল আসার, ২ খণ্ড, পৃ. ১৯৩)

গনীমতের মাল বণ্টনের পর হাওয়াযিন গোত্রের নয়জনের একটি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করার পর নবী (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। অতঃপর তাঁরা তাঁদের ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আবেদন পেশ করেন। রাসূল (সা)-এর দুধ মা হযরত হালীমা সাদীয়া ছিলেন ঐ গোত্রের। এই গোত্রের খতীব বা বক্তা যুহায়র ইবন সরদ দাঁড়িয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ সমস্ত কয়েদী মধ্যে আপনার ফুফু, খালাও রয়েছেন। যারা আপনাকে কোলে নিয়ে খেলা করেছেন এরূপ লোক রয়েছেন। যদি কোন বাদশাহ্ অথবা আমীরের সাথে আমাদের এ ধরনের সম্পর্ক থাকত, তা হলে আমরা অনেক সহানুভূতি পেতাম, অথচ আপনার শান ও মর্যাদা তাদের চেয়ে অনেক উন্নত। আমাদের উপর যে মুসীবত আগমন করেছে, এ সম্পর্কে আপনার নিকট কিছুই গোপন নেই। আপনি আমাদের উপর ইহসান করুন। আল্লাহ্ আপনার উপর ইহসান করবেন। অতঃপর এই কবিতা আবৃত্তি করেন–

امن علينا رسول الله فى كرم * فانك المر نرجوه وندخر -

কবিতার শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কবিতা ইনশা'আল্লাহ প্রতিনিধি অধ্যায় আসবে।

নবী (সা) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা করেছি। এখন তো গনীমত বণ্টন হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে দু'টোর মধ্যে একটি গ্রহণ করতে পার, কয়েদী অথবা মাল। তারা আরয করল, আমরা গোত্রের কয়েদীদের মুক্তি কামনা করছি। উট ও বকরীর ব্যাপারে কিছু বলব না।

নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমার এবং বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের অংশে যা কিছু বণ্টন করে দেয়া হয়েছে, এ সমস্ত তোমাদের। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে যা কিছু বণ্টন করা হয়েছে এ সম্পর্কে তোমরা যোহর নামাযের পর দাঁড়িয়ে বলবে, আমি তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। সুতরাং যোহর নামাযের পর

হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের কয়েদীদের মুক্তির জন্য মুসলমানদের নিকট আবেদন পেশ করেন। অতঃপর রাসূল (সা) দাঁড়িয়ে প্রথমত আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। এরপর বলেন, তোমাদের এই ভাই হাওয়াযিন ইসলাম গ্রহণ করে আগমন করেছে। আমি নিজের ও আমার গোত্রের অংশ তাদেরকে ফেরত দিয়েছি। অন্যান্য মুসলমানগণও তাদের কয়েদীদেরকে ফেরত দেয়াটাকে আমি যথার্থ মনে করছি। যে ব্যক্তি আগ্রহে সন্তুষ্টি ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ করবে, এটা তাদের জন্য উত্তম হবে। অন্যথায় আমি তাদের বিনিময় প্রদানের জন্য প্রস্তুত আছি। সবাই বললো, আমরা কল্যাণের জন্য এতে সম্মত ও সন্তুষ্ট আছি। এভাবে ৬ হাজার কয়েদী একবারে আযাদ ও মুক্ত করে দেয়া হয়।[১]

যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত কয়েদীদের মধ্যে নবী (সা) এর দুধ বোন হযরত সায়মাও ছিলেন। লোকজন তাকে যখন গ্রেফতার করে, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদের পয়গাম্বরের বোন, প্রমাণ হিসেবে এই বর্ণনা প্রদান করেন যে, শিশুকালে তুমি আমাকে দাঁত দিয়ে কামড় দিয়েছিলে যার চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। হুযুর (সা) তাকে চিনতে পেরে বললেন, মারহাবা এবং বসার জন্য চাদর বিছিয়ে দিলেন। আনন্দে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বের হয়ে আসলো। নবী (সা) বললেন, যদি তুমি আমার নিকট থাকতে চাও তাহলে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সাথে তোমাকে রাখব। আর যদি তুমি তোমার গোত্রের মধ্যে ফিরে যেতে চাও, তাহলে তোমাকে এর জন্য সুযোগ দেয়া হলো। সায়মা বললেন, আমি আমার গোত্রের নিকট যেতে চাই। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) যাওয়ার সময় তাকে কিছু সংখ্যক উট, বকরী, তিনটি গোলাম ও একটি বাঁদী প্রদান করেন। (ইসাবা, ৪ খ. পৃ. ৩৪৪)

মক্কা বিজয়ের দিন কুরায়শদের যে সমস্ত সম্মানিত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁরা এখন পর্যন্ত বিশ্বাসের দিক দিয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। অন্তরে ঈমান দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি। যাদেরকে কুরআনের প্রচলিত ভাষায় مؤلفة القلوب বলা হয়েছে। গনীমতের মাল বণ্টনের সময় নবী (সা) তাদেরকে অধিক পরিমাণে মাল প্রদান করেন। কাউকে একশ', কাউকে দু'শ আর কাউকে তিনশ' উট দান করেন।

মোটকথা যা কিছু দেন কুরায়শ নেতাদেরকেই দেন কিন্তু আনসারদেরকে কিছুই দেননি। ফলে আনসার যুবকদের মধ্যে এই সমালোচনা হতে থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কুরায়শদেরকে মালামাল প্রদান করেছেন এবং আমাদেরকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ আমাদের তলোয়ারসমূহ থেকে তাদের রক্ত ঝরছে। কেউ কেউ বলেন, বিপদ ও সংকটকালে আমাদেরকে আহ্বান করা হয় অথচ গনীমতের মাল অন্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। নবী (সা)-কে যখন এ বিষয়ে অবহিত করা হয়, তখন তিনি আনসারগণকে

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ২৬

একত্র করে ইরশাদ করেন, হে আনসারগণ! আমি এসব কী শ্রবণ করছি? আনসারগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কোন নেতৃত্ব স্থানীয় এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটা বলেনি। অবশ্য কোন কোন যুবক হয়ত এরূপ বলেছে।

নবী (সা) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা কি পথভ্রষ্ট ছিলে না। আল্লাহ্ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আল্লাহ্ তা'আলার আমার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা দরিদ্র দুঃস্থ ছিলে, আল্লাহ্ পাক আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছেন। আনসারগণ আরয করলেন, আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য। নিঃসন্দেহে আমাদের উপর আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের বিরাট ইহ্সান ও করুণা রয়েছে। নবী (সা) বলেন, তোমরা আমার বক্তব্যের এ জবাব প্রদান করতে পার যে, হে মুহাম্মদ (সা)! যখন আপনাকে লোকজন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তখন আমরা আপনার সত্যতার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। যখন আপনার কোন সাহায্যকারী ছিল না তখন আমরা আপনার সাহায্য করেছি। যখন আপনি উপায়হীন ও ঠিকানাবিহীন ছিলেন, তখন আমরা ঠিকানা দিয়েছি। যখন আপনি দরিদ্র ছিলেন, তখন আমরা আপনাকে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করেছি। হে আনসারগণ! তোমাদের অন্তর কি এজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছে, যে দুনিয়ার এমন কিছু সম্পদ ও আসবাবপত্র-যার হাকীকত দুনিয়ার দৃষ্টিতে মরীচিকার চেয়ে অধিক নয়, তা আমি কিছু লোকের অন্তর জয় করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে দিয়েছি এবং তোমাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর ভরসা করে তোমাদেরকে বাদ দিয়েছি। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী (সা) ইরশাদ করেন, কুরায়শদের উপর হত্যা ও গ্রেফতারীর বিপদ আপতিত হয়েছে। মুসলমানদের বিপরীতে তাদের জান ও মালের বিভিন্নমুখী ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে তাদের এই ক্ষতিপূরণ এবং তাদের অন্তরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার আমি ইচ্ছা পোষণ করছি। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধে তাদের ভাই-বন্ধু আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে এবং গ্রেফতার হয়েছে। এভাবে তাদের নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এ সমস্ত থেকে নিরাপদ রেখেছেন। সুতরাং তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করার জন্য গনীমতের মাল প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তোমরা ঈমানদার ও বিশ্বাসী, ঈমান ও ইয়াকীনের তুলনাহীন এবং চিরস্থায়ী সম্পদের দ্বারা বিভূষিত। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন উট ও বকরী নিয়ে ঘরে ফিরবে এবং তোমরা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলকে নিয়ে ঘরে ফিরবে? শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যদি হিজরত নির্ধারিত বিষয় না হত, তাহলে আমিও আনসারদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। যদি মানুষ এক ঘাঁটির দিকে চলে এবং আনসার অন্য ঘাঁটির দিকে, তা হলে আমি আনসারদের ঘাঁটি গ্রহণ করব। হে আল্লাহ্! তুমি আনসার, তাদের সন্তান এবং সন্তানদের সন্তানের উপর রহম ও অনুগ্রহ কর।

একদিকে নবী (সা) বলে যাচ্ছেন অপরদিকে জীবন উৎসর্গীকৃত আনসারগণ ক্রন্দন করতে করতে তাঁদের দাঁড়ি ভিজে উঠে এবং তাঁরা বলে উঠেন, আমরা অন্তর দিয়ে এই বণ্টনের উপর সন্তুষ্ট আছি যে,আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) বণ্টনে আমাদের অংশে এসেছেন। এর পর সভার সমাপ্তি হয়ে যায়। (তারীখে[১] ইবনুল আসীর, ২ খ. পৃ. ১৩১)

উমরায়ে জি'রানা

নবী (সা) ৮ যিলকা'দ রাতে জি'রানা থেকে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। সেখানে পৌছে ইতাব ইবন উসায়দকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং হযরত মু'আয ইবন জাবালকে দীনের তালীম প্রদানের জন্য মু'আল্লিম নিয়োগ করেন। দু'মাস ষোল দিন পর ২৭ যিলকা'দ সাহাবাগণকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনায় আগমন করেন।[২]

মুত'আ বিয়ে হারাম হওয়া

নবী (সা) যখন আওতাস থেকে উমরা করার জন্য মক্কা আগমন করেন, তখন তিনি কা'বা ঘরে দাঁড়িয়ে কা'বার উভয় দরজা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ইরশাদ করেন, "কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ীভাবে মুত'আ হারাম করা হয়েছে।" যেহেতু এই ঘোষণা রাতে হয়েছিল এবং শ্রোতার সংখ্যা ছিল কম, ফলে সবাই এ সংবাদ অবগত হতে পারেনি, তাই কেউ কেউ বেখবর হওয়ার কারণে মুত'আ বিয়েতে জড়িয়ে পড়ে। এ জন্য নবী (সা) তবুক অভিযানকালে পুনরায় মুত'আ হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেন। অতঃপর হযরত উমর (রা)-খিলাফতের সময় কোন কোন লোক অজ্ঞতার কারণে মুত'আ বিয়েতে জড়িয়ে পড়ে। এ সংবাদ অবগত হওয়ায় খলীফা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেন, নবী করীম (সা) মুত'আ হারাম করেছেন। নবী (সা)-এর কোথাও কোথাও (অজ্ঞতার কারণে মুত'আ হয়েছে) কিন্তু তিনি এ জন্য কাউকে শাস্তি প্রদান করেন নি। অবশেষে মুত'আ হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই আমার এই ঘোষণার পর যে মুত'আ করবে, আমি তার উপর যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করব। হযরত উমরের (রা) এই অকাট্য ঘোষণার পর মুত'আ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

বিভিন্ন ঘটনাবলী

১. এ বছর (৮ম হিজরী) ইতাব ইবন উসায়দ (রা) আরবের নিয়মানুযায়ী সমস্ত মুসলমানকে হজ্জ করিয়েছেন।

২. এ বছরই যিলহাজ্জ মাসে হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) জন্ম গ্রহণ করেন।

---

১. নবী (সা)-এর মূল বক্তব্যের অধিকাংশ ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৪০ এবং যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৩৮ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারতীব অনুযায়ী তারীখে ইবনুল আসীরে উল্লেখ রয়েছে।

২ যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪১।

৩. এ বছরই নবী (সা) হযরত আমর ইবনুল আ'সকে (রা) সাদাকা আদায় করার জন্য আমিল হিসেবে আম্মান প্রেরণ করেন।

৪. এ বছর নবী (সা) কা'ব ইবন উমায়রকে সিরিয়ার অন্তর্গত 'যাতে ইত্তিলা' নামক এলাকায় ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। পনের ব্যক্তি তাঁদের সাথে ছিল। সেখানের লোকজন সমস্ত মুসলমানকে হত্যা করে। মাত্র একজন প্রাণে রক্ষা পেয়ে মদীনা ফিরে আসেন। (তারীখে ইবনুল আসীর, পৃ. ১৩২)

প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী

আরবের গোত্রসমূহ মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা এই ধারণা পোষণ করত যে, যদি হযরত মুহাম্মদ (সা) মক্কাবাসীর উপর বিজয় লাভ করেন, তাহলে তিনি হবেন সত্য পয়গাম্বর। সুতরাং মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। উক্ত ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন ঃ

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।"

(সূরা নাসর ঃ ১-৩)

কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, চৌকশ ও দক্ষ তীরন্দাজ হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রের লোকদের অন্তর আপাতত থামিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে সমস্ত আসবাবপত্র এমন কি নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, উট-বকরী, গবাদিপশু সহ সর্ব প্রকার মাল আল্লাহ তা'আলার বাহিনীর জন্য গনীমতের মাল হিসেবে এক স্থানে জমা হয় এবং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মযবূত দ্বীনের প্রকাশ্য বিজয়ের এক বিস্ময়কর দৃশ্য দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করাতে পারেন।

বদর যুদ্ধ থেকে আরবের যুদ্ধসমূহের সূচনা হয় যা তাদেরকে ভড়কে দিয়েছিল এবং হুনায়নের যুদ্ধ দ্বারা এর সমাপ্তি হয়েছে যার দ্বারা আরবদের শক্তি-সামর্থ্য ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে আরব উপদ্বীপে কারো এই ক্ষমতা থাকেনি যে, সত্যের মুকাবিলায় মাথা উঁচু করতে পারে। কিন্তু কোন কোন মুসলমানের মুখ থেকে যেহেতু এই বাক্য বের হয়েছে। لَنْ نَغْلِبَ الْيَوْمَ عَنْ قِلَّةٍ (আজ আমরা বাহিনীর স্বল্পতার জন্য পরাজিত হব না)। এটা আল্লাহ তা'আলার দরবারে পসন্দনীয় হয়নি। সুতরাং প্রথম আক্রমণে মুসলমানদের পরাজয় বরণ করতে হয়। যাতে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে বিজয় ও সাহায্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। স্বল্পতা বা আধিক্যের উপর নির্ভর করে না। যাকে আল্লাহ সাহায্য করেন, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে

না। যার সাহায্য থেকে তিনি বিরত থাকেন, তার কোন সাহায্যকারী নেই এবং যাতে লোকজন এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও দ্বীনের সাহায্যকারী। তোমাদের আধিক্যের উপর এটা নির্ভর করে না। তোমরা তো সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পলায়ন করেছ। সুতরাং যখন তোমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছ যে, তোমাদের আধিক্য ও তোমাদের শক্তি দ্বারা কোন ফল হবে না, শুধু আল্লাহ পাকের শক্তিই তোমাদের জন্য কার্যকর ও ফলদায়ক হতে পারে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর এই সাহায্য প্রেরণ করেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكَافِرِيْنَ ـ

"অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের উপর সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং অবতীর্ণ করেন এমন বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফিরদেরকে। এটা হলো কাফিরদের কর্মফল।" (সূরা তাওবা ঃ ২৬)

আল্লাহ তা'আলার বিধান ও নীতি হলো এই যে, বিজয় ও সাহায্য বিনয়ী ও অনুগতদেরকে দান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِيْنَ - وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّاكَانُوْا يَحْذَرُوْنَ.

"আমার ইচ্ছা হলো যাদেরকে দেশে দুর্বল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করব, তাদেরকে নেতা বানাব, তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করব, তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করব এবং ফিরাউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেব যা তারা সেই দুর্বল দলের পক্ষ থেকে আশংকা করত।" (সূরা কাসাস ঃ ৫-৬)

বস্তুত বদর যুদ্ধে বিজয় এবং ওহুদ যুদ্ধে পরাজয়ের এটাই ছিল রহস্য। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন ঃ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বদরের দিন তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা তখন দুর্বল ও অস্ত্রশস্ত্রহীন অবস্থায় ছিলো।"

গাযওয়ায়ে ওহুদ বা ওহদ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে গাযওয়ায়ে বদরের (বদর যুদ্ধের) পরিসমাপ্তি ছিল। যেমন ঘটনার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গাযওয়ায়ে বদর ও গাযওয়ায়ে ওহুদ মিলে একটিই গাযওয়া ছিল। এই দু'টি আরব গোত্রের সাথে প্রথম গাযওয়া ছিল এবং গাযওয়ায়ে হুনায়ন সর্বশেষ গাযওয়া ছিল। ফলে প্রথম গাযওয়ায়ে

বদরে প্রথমত বিজয় এবং পরিসমাপ্তিতে (ওহুদে) পরাজয় হয়। পক্ষান্তরে গাযওয়ায়ে হুনায়নে প্রারম্ভে পরাজয় এবং পরে বিজয় হয় যাতে আরবের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে বিজয় হয়। যেভাবে গাযওয়ায়ে বদরে মুসলিম বাহিনীর সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়, তেমনিভাবে গাযওয়ায়ে হুনায়নেও ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয়েছিল।

মালে গনীমত থেকে অধিকাংশ নবী (সা) ঐ সমস্ত লোককে প্রদান করেছেন যাদের অন্তরে ঈমান এখনো দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়নি। যাতে দান ও মহানুভবতা দ্বারা রাসূল (সা)-এর মহব্বত তাদের অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায়। কেননা দাতার প্রতি মহব্বত হলো স্বাভাবিক, একজন কবি বলেছেন ঃ

واحسن وجه فى الورى وجه محسن * وايمن كف فيهم كف منعم

"এবং যখন নবী (সা)-এর মহব্বত অন্তরের মধ্যে দৃঢ় হয়ে যাবে, তখন ঐ অন্তর থেকে দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার মহব্বত আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে যাবে।"

একই অন্তরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মহব্বত এবং দুনিয়ার মহব্বত উভয় একত্র হয়ে যাওয়া। مَاجَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ (আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের সিনার মধ্যে দু'টি অন্তর তৈরি করেন নি)

আনসারদের অভিযোগ মালের প্রতি মহব্বতের কারণে ছিল না। যাদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহর রাসূল এই সাক্ষী প্রদান করছেন যে, আমি তোমাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর ভরসা করে তোমাদেরকে (মালে গনীমতের) অংশ দেইনি। তাদের এই পবিত্র অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে কিভাবে, বরং আনসারগণ এই বাহ্যিক দান ও বন্টনকে সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক এবং দলীল মনে করেছেন। ফলে মর্যাদাবোধের চাহিদার প্রেক্ষাপটে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ অবস্থায় নবী (সা) আমাদের মত জীবন উৎসর্গকারীদের সম্মান বৃদ্ধি করার বিষয়টি কেন উপেক্ষা করলেন?

باسايه ترانمى پسندم * عشقست وهزار بد گمانى

"আপনার করুণার দৃষ্টি আমাদেরকে অপসন্দ করছে? প্রেমের ও ভালবাসার ক্ষেত্রে অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকে।"

অথচ এই উপেক্ষা ছিল ঐ দানের চেয়ে লাখো-কোটি গুণ উত্তম। উত্তম উপেক্ষা ছিল আনসারগণের ঈমান ও ইখ্‌লাসের সনদ এবং ঐ দান নতুন মুসলমানদের দোদুল্যমান হওয়ার দলীল। যাদের ঈমান ও ইয়াকীনের উপর প্রশান্তি ও বিশ্বাস ছিল শুধু তাঁদেরকেই গনীমত প্রদান করা হয়নি। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৩৯)

গভর্নর ও শাসক নিয়োগ

মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং সর্বত্র ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন জরুরী হয়ে পড়ে। তাই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক শাসক নিযুক্ত করেন। বাযান ইবন সাসানকে ইয়ামনের শাসক নিযুক্ত করেন। বাযান কিস্‌রার পক্ষ থেকে ইয়ামনের শাসক ছিলেন। কিসরার নিহত হওয়ার পর বাযান ইসলাম গ্রহণ করেন। ফলে রাসূল (সা) বাযানকে পূর্বের ন্যায় ইয়ামনের শাসক হিসেবে নিয়োজিত রাখেন এবং যতদিন পর্যন্ত বাযান জীবিত ছিলো ততদিন পর্যন্ত তাকে একই পদে বহাল রাখেন। বাযানের ইনতিকালের পর তাঁর পুত্র শাহর ইবন বাযানকে সান'আর শাসক নিযুক্ত করেন। শাহরের মৃত্যুর পর খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল আ'স উমূভী সান'আর শাসক নিযুক্ত হন। এছাড়া যিয়াদ ইবন লবীদ আনসারী মূতার, আবূ মূসা আশ'আরীকে যবীদ ও আদনের, মু'আয ইবন জাবালকে ইয়ামনের শহর জুনুদের, আবূ সুফিয়ান ইবন হারবকে নজরানের, তার পুত্র ইয়াযীদ ইবন আবূ সুফিয়ানকে ইয়াতামামীর, ইতাব ইবন উসায়দকে মক্কার শাসক এবং হযরত আলী (র)-কে ইয়ামনের কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করেন।[১]

হিজরী ৯

৯ হিজরীর প্রারম্ভে নবী (সা) বেশ কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় যাকাত ও সাদাকা আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন।

আদায়কারীর নাম	যে গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হয়
উয়ায়না ইবন হাসান ফাযারী (রা)	বনী তামীম
বুরায়দা ইবনুল হাসীব (রা)	আসলাম ও আক্কার
ইবাদ ইবন বিশর আশহালী (রা)	সালীম ও মুযায়না
রাফি' ইবন মাকীস (রা)	জুহায়না
আমর ইবনুল আ'স (রা)	বনী ফাযারাহ
দিহাক ইবন সুফিয়ান কিলাবী (রা)	বনী কিলাব
বিসর ইবন সুফিয়ান কা'বী (রা)	বনী কা'ব
ইবনুল লুতাবীয়া আযদী (রা)	বনী যুবইয়ান[২]
আলা' ইবনুল হাযরামী (রা)	বাহরাইন
হযরত আলী মুরতাযা (রা)	নাজরান

১. যাদুল মা'আদ, ১ খ. পৃ. ৩১

২. তাবাকাত ইবন সা'দ, খ, পৃ. ১১৫।

আদী ইবন হাতিম (রা)	তায় ও বনী আসাদ
মালিক ইবন নুওয়ায়রাহ (রা)	বনী হানযালা[১]

সারীয়া উয়াইনা ইবন হাসান ফাযারীকে বনী তামীম গোত্রের নিকট প্রেরণ

মুহাররম ৯ হিজরী। নবী (সা) বিশর ইবন সুফিয়ান আদাবীকে সাদাকা আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। লোকজন যাকাত প্রদানের জন্য তৈরি হয়ে যায় কিন্তু বনী তামীম এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বলে, আল্লাহর শপথ! এখান থেকে একটি উটও যাকাত হিসেবে প্রেরণ করা হবে না এবং তলোয়ার উত্তোলন করে তারা লড়াই করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। বশর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে ফিরে আসেন। নবী (সা) উয়াইনা ইবন হাসান ফাযারীকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহীর এক বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে বনূ তামীমের আবাসস্থল সাকীয়া নামক স্থানে প্রেরণ করেন। এ স্থানটি ছিল জুহফা থেকে সতের মাইল দূরে অবস্থিত। রাতে পৌঁছেই তাদের উপর আক্রমণ চালান এবং এগারজন পুরুষ, একুশজন নারী ও ত্রিশজন শিশু গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসেন। বনী তামীম বাধ্য হয়ে দশজনের একটি দল নবী (সা)-এর দরবারে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে আতার ইবন হাজিব, যিবর কান, কায়স ইবন আসিম ও আকরা' ইবন হাবিস অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। মদীনা পৌছার পর তারা নবী (সা)-এর পবিত্র হুজরার পিছনে দাঁড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা) বাইরে এসো, আমরা তোমার সাথে আত্মগৌরব ও কাব্যের মাধ্যমে মুকাবিলা করব। আমাদের প্রশংসা সৌন্দর্যময় এবং তিরস্কার ও অপবাদ হলো কলংকময়। নবী (সা) বললেন, এই শান ও মর্যাদা তো আল্লাহর। আমি কবিও নই এবং আমাকে অহংকার করার নির্দেশও দেয়া হয়নি। তখন এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۤءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُ لَايَعْقِلُوْنَ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"নিশ্চয়ই যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। যদি তারা আপনার তাদের কাছে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করত, তাহলে এটা তাদের জন্যই কল্যাণকর হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৪-৫)

সমীক্ষা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উলূমুল কুরআন শিক্ষা লাভের জন্য প্রখ্যাত কিরা'আত বিশারদ হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা)-এর বাড়ি গমন করতেন কিন্তু আদব রক্ষার্থে কখনো দরজায় খটখট করতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি বাইরে না আসতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষায় বসে থাকতেন। একবার হযরত উবাই ইবন

১. যাদুল মা'আদ, ২ খ, পৃ. ২০১।

কা'ব (রা) বললেন, তুমি দরজার মধ্যে খটখট করবে। তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন ঃ

العالم فى قومه كَالنَّبِىْ فِى اُمَّةٍ وَ قَدْ قَالَ اللّٰه تعالى فى حق نبيّه عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ -

একজন আলিম তার কাওমের মধ্যে এরূপ যেমন নবী তার উম্মাতের মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর শানে ইরশাদ করেন, নবী করীম (সা) তাদের নিকট বাইরে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত তাহলে এটা তাদের জন্য উত্তম হত। আবূ উবায়দ বলেন, আমি কোন আলিমের দরজা কখনো খটখট করিনি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে তার সময় মত বাইরে না এসেছেন। আল্লামা আলূসী (র) বলেন, যখন থেকে আমি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, তখন থেকে উস্তাদবৃন্দ ও মাশায়েখ দলের সাথে আমার এই ব্যবহার অব্যাহত ছিল।[১]

অতঃপর নবী (সা) বাইরে আগমন করেন এবং যোহরের নামায আদায় করেন। জামা'আত থেকে অবসর হয়ে মসজিদের চত্ত্বরে উপবেশন করেন। প্রতিনিধি দল আরয করলো, আমরা গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কবি ও বক্তাদের কিছু বলার অনুমতি দিন। রাসূল (সা) বললেন, অনুমতি দেয়া হলো।

আতারিদ ইবন হাজিব তামীমির খুতবা

বনী তামীম গোত্রের বাগ্মী আতারিদ ইবন হাজিব নিম্নে বর্ণিত খুতবা প্রদান করেন ঃ

ألحمد للّه الذى له عَلَيْنَا الْفَضْلِ وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلْنَا ملوكًا وَهَبَ لنا أموالا عظاما نفعل فيها لمعروف وجعلنا أعز أهل المشرق واكثر عددا وعدة فمن مثلنا فى الناس - السنا بروس الناس وأفضلهم فمن فاخرنا فليعبدد مثل ماعددنا وانا لوشئنا لاكثرنا الكلام ولكنا نستحى من الاكثار وانا نعرف بذالك أقول هذا لان تاتوا بمثل قولنا وامر أفضل من أمرنا -

"সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার জন্য যিনি আমাদেরকে ফযীলত দান করেছেন, বাদশাহ বানিয়েছেন, ধন-সম্পদ দান করেছেন, যা আমরা উত্তম কাজে ব্যয় করে থাকি, প্রাচ্যের লোকদের মধ্যে আমাদেরকে সর্বাধিক সম্মানিত, সবচেয়ে অধিক সংখ্যক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী বানিয়েছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমাদের মত কে আছে? আমাদের নেতৃবৃন্দ কি তাদের চেয়ে উত্তম নয়? সুতরাং যারা আমাদের সাথে গৌরব

১. রূহুল মা'আনী, ২৬ খ. পৃ. ১৩১

প্রকাশে প্রতিযোগিতা করতে ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের উচিত হবে আমাদের মত গৌরবের বিষয় উপস্থাপন করা। যদি আমার ইচ্ছা করতাম তাহলে আমাদের গৌরব ও প্রশংসার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করতে সক্ষম ছিলাম। কিন্তু এতে আমাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে। আমি এটা এজন্যই উল্লেখ করছি যে, যদি কেউ এর মত বা এর চেয়ে উত্তম কিছু উপস্থাপন করতে পারে তবে করুক।"

আতারিদ ভাষণ সমাপ্ত করে বসে পড়ে। নবী (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাস আনসারীকে জবাব দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত সাবিত ইবন কায়স (রা) সাথে সাথেই দাঁড়িয়ে এ ভাষণ পেশ করেন ঃ

সাবিত ইবন কায়স (রা)-এর খুতবা

ألحمد لله الذى السموات والارض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يكن شيئ قط الامن فضله ثم كان من قدرته ان جعلنا ملوكا واصطفى خير خلقه رسولا أكرمة نسبا وأصدقه حديثا وافضله حسبا وأنزل عليه كتابا وأئتمنه على خلقه فكانَ خيرة اللّٰهِ فى العالمين ثم دعا الناس الى الايمان به فامن برسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون من قومه وذوى رحمه أكرم الناس احسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا ثم كنا أول الخلق اجابة واستجابة الله حين دعا رسول الله فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله فمن امن بالله ورسوله منع ماله ودمه ومن كفر جاهدناه فى للّه ابدًا وكان قتله علينا يسيرا أقول قولى هذا واستغفر الله و للمُؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ـ

"সমস্ত প্রশংসা ঐ পবিত্র সত্তার জন্য, যিনি সমস্ত আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় বিধান এতে জারী করেছেন। বিশ্বজগতের সব কিছুই তাঁর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর ফসল ও করুণার দ্বারা সব কিছু হচ্ছে। অতঃপর তাঁর কুদরত ও ক্ষমতা আমাদেরকে বাদশাহ্ বানিয়েছে এবং উত্তম সৃষ্টিকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে বংশ মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ, কথাবার্তায়ও সবচেয়ে সত্যবাদী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং সমস্ত সৃষ্টির জন্য আমীন বানিয়েছেন। বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা। অতঃপর তিনি মানুষকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য আহবান করেন, ফলে রাসূলুল্লাহ

(সা)-গোত্রের মুহাজিরগণ, তাঁর আত্মীয় স্বজন ঈমান আনয়ন করেন। তাঁরা বংশ মর্যাদায় সবচেয়ে মর্যাদাবান এবং কাজকর্ম ও আমলের দিক দিয়েও সর্বোত্তম। অতঃপর আমরা সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছি। মুহাজিরদের পর আমরা আনসারগণ হলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাওয়াত কবূল করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং রাসূলুল্লাহর ওযীর। আমরা লোকজনের সাথে ঐ সময় পর্যন্ত জিহাদ করে থাকি যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। যারা ঈমান আনয়ন করে, তারা তাদের জীবন ও মাল-দৌলত নিরাপদ করে নেয় এবং যারা কুফরী করে, তাদের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করা ও তাদেরকে হত্যা করা আমাদের জন্য সহজ। এটা আমার বক্তব্য। আমি আমার জন্য এবং সমস্ত মু'মিন নর-নারীর জন্য আল্লাহর দরবারে মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করছি। আল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।"

এরপর যবরকান ইবন বদর তাদের গৌরবময় কীর্তি সম্পর্কে প্রশংসাসূচক এক কবিতা আবৃত্তি করে। নবী (সা) হাসসান ইবন সাবিত (রা)-কে এর জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত হাস্সান ইবন সাবিত (রা) এর জবাবে তাৎক্ষণিকভাবে এক কবিতা আবৃত্তি করেন। আকার ইবন হাবিস বলেন, আল্লাহর শপথ! আপনার খতীব আমাদের খতীব থেকে এবং আপনার কবি আমাদের কবি থেকে বড় ও মর্যাদাবান এবং সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। নবী (সা) তাদেরকে উপহার প্রদান করেন এবং তাদের সব কয়েদীকে ফেরত দান করেন।[১]

বনী মুসতালিকের নিকট ওয়ালীদ ইবন উকবা ইবন আবূ মুয়াইতকে প্রেরণ

নবী (সা) ওয়ালীদ ইবন উকবাকে সাদাকা আদায় করার জন্য বনী মুসতালিকের নিকট প্রেরণ করেন। তারা এ সংবাদ শুনে অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সৈন্যদের মত শান-শওকতের সাথে ওয়ালীদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য গমন করে। আইয়্যামে জাহিলিয়াত থেকে ওয়ালীদের গোত্র ও বনী মুসতালিকের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল। দূর থেকে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে ওয়ালীদ এই ধারণা করে যে, পূর্ব শত্রুতার কারণে এ সমস্ত লোক মুকাবিলার জন্য এগিয়ে আসছে। ফলে ওয়ালীদ রাস্তা থেকে ফিরে যায় এবং নবী (সা)-এর দরবারে এসে বর্ণনা করে যে, তারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। তারা যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছে। নবী (সা) এ সংবাদ শুনে অবাক হয়ে গেলেন। রাসূল (সা) বিষয়টি নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন। এ সংবাদ বনী মুসতালিকের নিকট পৌছে। তারা সাথে সাথে একটি প্রতিনিধি রাসূল (সা) দরবারে প্রেরণ করেন। তারা নবী করীমের (সা) দরবারে এসে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

---

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৪২-৪৫

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ! যদি কোন ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৬)

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এ আয়াতে "فسق" শব্দের আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া, তা যত ক্ষুদ্র হোক না কেন। আয়াতে প্রচলিত বা শরঈ অর্থ গ্রহণ করা হয়নি। গুনাহ্ কবীরার ইচ্ছা পোষণ করা এবং এতে জড়িয়ে পড়াকে শরী'আতের দৃষ্টিকোণে "فسق" বলা হয়। ওয়ালীদ ইবন উকবা (রা) নবী (সা)-এর নিকট যা কিছু বর্ণনা করেছে, তার মূল ছিল ভুল বুঝা বা ভুল মনে করা। তাই আয়াতে ফিস্ক (فسق) দ্বারা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঘটনা যেহেতু বাস্তবতার পরিপন্থি ছিল ফলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে ফাসিক বলা হয়েছে। এ অর্থে কোন সাহাবীকে ফাসিক বলাতে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক হওয়া জরুরী নয়। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪৬)।

হাদীসে বর্ণিত আছে, ঈমানের ৭৭টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর সবচেয়ে নিম্নতম হলো রাস্তা থেকে কাঁটা বা কোন কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। এর মধ্যবর্তী হলো অন্যান্য শাখা এবং প্রত্যেক শাখার উপর ঈমান শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এমনিভাবে কুরআন ও হাদীসে فسق এবং معصيت ও ظلم শব্দের প্রয়োগ কুফর থেকে সগীরা গুনাহ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেভাবে ঈমানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, তেমনি কুফর ও নাফরমানীরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হযরত আদম (আ)-এর ভুলের উপরও معصيت এর প্রয়োগ হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ وعصى ادم ربه فغوى (আদম তার প্রতিপালকের নাফরমানী করলো) কুফরের উপরও معصيت প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا (যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে, তার শাস্তি হবে দোযখের আগুন, সে অনন্তকালের জন্য সেখানে থাকবে)। প্রকাশ থাকে যে, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। শব্দ একটি হলেও অর্থ ভিন্ন রয়েছে।

এমনিভাবে বর্ণিত আয়াতে যে فاسق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, এটা অভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করতে হবে, শরঈ অর্থে প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা সাহাবায়ে কিরাম (রা)

হলেন সবচেয়ে ন্যায়বান ও নির্ভরযোগ্য। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ (আল্লাহ পাক তাঁদের উপর সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহ উপর সন্তুষ্ট)। যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে তাঁরা ফাসিক হতেন (معاذ اللّٰه) তাহলে আল্লাহ তাদের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট হতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক কাওমের উপর রাযী ও সন্তুষ্ট নন।"

সারীয়া আবদুল্লাহ ইবন আওসাজা (রা)

৯ হিজরীর সফর মাসে নবী (সা) আবদুল্লাহ ইবন আওসাজাকে (র) বনী আম্‌র ইবন হারিসাকে ইসলামে দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে এবং প্রেরিত পত্র ডোলের তলে বেধে রাখে। আবদুল্লাহ ইবন আওসাজা (রা) ফিরে এসে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন রাসূল (সা) বলেন, ঐ সমস্ত লোকের জ্ঞান ও বিবেক কি শেষ হয়ে গিয়েছে? তখন থেকে অদ্যাবধি ঐ গোত্রের লোকজন আহম্মক, অজ্ঞ ও জাহিল রয়েছে।

সারীয়া কুতবা ইবন আমির (রা)

৯ হিজরীর সফর মাসে রাসূল (সা) বিশজনের একটি দল কুতবা (রা) ইবন আমিরের নেতৃত্বে খাশ'আম গোত্রের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। কুতবা (রা) ইবন আমির সেখানে গমন করে তাদের মুকাবিলা করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করেন। অতঃপর গনীমতের মাল কিছু উট, বকরী এবং কয়েদী নিয়ে ফিরে আসেন। এতে এক-পঞ্চমাংশ বের করার পর প্রত্যেকেই চারটি করে উট পেয়েছিল। একটি উট দশটি বকরীর বিনিময় হিসেবে ধরা হয়েছিল।[১]

দাহহাক ইবন সুফিয়ান (রা)-এর সারিয়া

রবিউল আউয়াল মাসে নবী (সা) বনী কিলাবকে ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে দাহহাক ইবন সুফিয়ান কিলাবী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তাঁকে এবং ইসলামকে গালাগাল দেয়। উপরন্তু তাঁদের উপর আক্রমণে উদ্ধত হয়। অবশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। তারা পরাজিত হয়। দিহাক (রা) বিজয়ী বেশে প্রফুল্ল চিত্তে গনীমত সহ মদীনা শরীফে ফিরে আসেন।[২]

সারীয়া আলকামা ইবন মুজায্যায মুদলাজীকে হাবসার দিকে প্রেরণ

নবী (সা)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌছে যে, কিছু হাবশী লোক জেদ্দা আগমন করেছে, তখন তিনি আলকামা ইবন মুজাযযায মুদলাজীকে তিনশ' আরোহীর সাথে

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ.১১৭।

২. প্রাগুক্ত।

তাদেরকে পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য প্রেরণ করেন। তারা সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে দ্বীপের মধ্যে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী যখন সেখান থেকে ফিরে আসেন তখন সৈন্যবাহিনীর কিছু লোক জলদী করে এবং সবার আগে বাড়ি পৌঁছার ইচ্ছা করে। আলকামা অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাদের নির্দেশ প্রদান করেন যে, এই অগ্নির উপর লাফ দিয়ে যাও। কিছু লোক প্রস্তুত হয়ে যায়। আলকামা বলেন, থামো! আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করেছি। এই সমস্ত লোক মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, কেউ যদি তোমাদেরকে নাফরমানীর নির্দেশ প্রদান করে, তাহলে তার নির্দেশ পালন করবে না। সহীহ বুখারী, মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবন মাজার রিওয়ায়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই সারীয়ার আমীর ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা সাহ্‌মী এবং অগ্নিতে ঝাঁপ বা লম্প দেয়ার নির্দেশ তিনিই দিয়েছিলেন। এই পার্থক্যের কারণে ইমাম বুখারী (র) এই সারীয়ার বর্ণনায় অধ্যায়ের নাম রেখেছেন ঃ

باب سرية عبد الله بن حذافة السهمى وعلقمة بن مجزز المدلجى ويقال انها سرية الانصارى -

(ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৪৬; যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৪৯)।

সারীয়া আলী ইবন আবূ তালিবকে মূর্তি পূজারী তায় গোত্রের নিকট প্রেরণ

হাতিম তাঈ এর পুত্র ও কন্যার ইসলাম গ্রহণ

৯ হিজরীর রবিউস সানী মাসে নবী (সা) হযরত আলীকে (রা)-কে ১৫০/২০০ শ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে তায় গোত্রের ফুলস[১] মন্দির ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। সেখানে পৌঁছার পর তারা তায় গোত্রের উপর আক্রমণ করে। কিছু লোক গ্রেফতার হয় এবং কিছু গবাদিপশু হস্তগত হয়। মন্দির ধ্বংস করে এবং দু'টি তলোয়ার মন্দির থেকে পাওয়া যায়। হারিস ইবন শিমার এগুলো সেখানে রেখেছিল। কয়েদীদের মধ্যে বিখ্যাত দানশীল হাতিম তাঈ-এর কন্যা সাফ্‌ফানা (سفّانه) ছিল এবং তার পুত্র আদী ইবন হাতিম মুসলিম বাহিনীর সংবাদ পেয়েই সিরিয়ায় পলায়ন করে। সেখানে একই ধর্মের অনুসারী অসংখ্য খ্রিস্টান বাস করত। কয়েদীদের গ্রেফতার করে মদীনায় নেয়ার পর মসজিদের নিকট তাদেরকে জমা করা হয়। নবী (সা) এদিক দিয়ে গমন করার সময় হাতিম-এর কন্যা দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং যিনি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, তিনি পলায়ন করেছেন। আপনি আমাদের উপর ইহসান (মহানুভবতা প্রদর্শন) করুন, আল্লাহ আপনার উপর ইহসান করবেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ ব্যক্তি কে? সাফ্‌ফানা বললো, আমার ভাই আদী ইবন হাতীম। নবী (সা) বললেন, ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ এবং রাসূল থেকে

১. فُلْسُ (ف এর উপর পেশ এবং ل সাকিন)

পলায়ন করেছে? আমি তোমার উপর ইহসান করব কিন্তু তুমি যাওয়ার ব্যাপারে জলদি করবে না। আমার অভিপ্রায় হলো, তোমার গোত্রের এমন কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যদি পাওয়া যায়, তাহলে তার সাথে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। বস্তুত দু'তিন দিন পর তায় গোত্রের কিছু লোক সিরিয়া গমনেচ্ছু পাওয়া যায়, নবী (সা) দয়া ও সহানুভূতির কারণে সাওয়ারী এবং কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে তাকে বিদায় করেন। সাফফানা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিত বাক্যের দ্বারা নবী (সা)-এর শুকরিয়া আদায় করেন ঃ

شكرتك يدا فتقرت بعد غنى ولاملكتك يد استغنت بعد فقروا اصاب الله بمعروفك مواضعه ولاجعل لك الى لئيم حاجة ولاسلب نغمة عن كريم الاوجعلك سببا لردها عليه ـ

সাফ্ফানা নবী (সা) থেকে বিদায় নিয়ে সিরিয়ায় পৌঁছে তার ভাই-এর সাথে মিলিত হন এবং তাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। আদী তার বোনকে জিজ্ঞাসা করে, এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি? সাফ্ফানা জবাবে বলেন ঃ

ارى والله ان تلحق به سريعًا فان يك نبيا فللسابق اليه فضيلة وان يك ملكافلن تزال فى عز وانت انت ـ

"আল্লাহর শপথ! আমি এটা যথাযথ মনে করি যে, তুমি খুব দ্রুত নবী (সা)-এর সাথে মিলিত হও। যদি তিনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর নিকট দ্রুত গমন করা ফযীলতের কারণ। যদি তিনি বাদশাহ হন, তাহলে সর্ব সময়ের জন্য মর্যাদার বিষয় হবে। আর তুমি তো তুমিই।"

আদী এটা শুনে বলেন ঃ والله ان هذا هو الراى "আল্লাহ শপথ! উত্তম মতামত তো এটাই।"

অতঃপর নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। (যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৫০; আল-আসাবা)

কা'ব ইবন যুহায়র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

কা'ব ইবন যুহায়র নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করে কবিতা আবৃত্তি করত। মক্কা বিজয়ের দিন কা'ব ইবন যুহায়র এবং তার ভাই বুজায়র ইবন যুহায়র প্রাণ নিয়ে মক্কা থেকে পলায়ন করে আবরাকুল গারাফ নামক স্থানে গিয়ে থামে। বুযায়র কা'বকে বলে, তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করব, তাঁর দ্বীন সম্পর্কে অবগত হব। যদি তাঁর সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি, তাহলে তাঁর অনুসরণ করব, অন্যথায় তা পরিত্যাগ করব। কা'ব সেখানেই অবস্থান করে। বুজায়র রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর কথাবার্তা শ্রবণ করা মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ৫৩

নবী (সা) যখন তায়েফ থেকে মদীনা আগমন করেন, তখন বুজায়র তাঁর ভাই কা'ব ইবন যুহায়রকে একটি পত্র লিখে বলেন যে, নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রচনা করে যে ব্যক্তি কবিতা আবৃত্তি করেছে, মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করা হয়েছে এবং যে পলায়ন করেছে এত সে প্রাণে বেঁচে গেছে। যদি তোমার জীবন তোমার নিকট প্রিয় হয় তা হলে দ্রুত রাসূল (সা) খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর নিকট ফিরে আসে, তিনি তাকে হত্যা করেন না। যদি তুমি এটা না কর তাহলে কোথাও দূরদেশে চলে যাও, যেখানে গিয়ে তুমি প্রাণে রক্ষা পেতে পার।

কা'ব ইবন যুহায়রের এটা পছন্দ হল না যে, কোন পরামর্শ ব্যতীত তার ভাই বুজায়র ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং নিম্নলিখিত কবিতা লিখে তার ভাই-এর নিকট প্রেরণ করে ঃ

الا ابلغا عنى بجيراً رسالة * فهل لك فيما قلت ويحل هل لكا

"হে বন্ধু! বুজায়রকে আমার এই সংবাদ পৌছিয়ে দাও, আমি যা বলছি এ ব্যাপারে তোমার কি মতামত। আফসোস তুমি এটা করলে।"

فبين لنا ان كنت لست بفاعل * على اى شيئ غير ذالك دلكا ـ

"তুমি এটা বল, যদি তুমি তোমার বাপ-দাদার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে না পার, তাহলে এটা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা তুমি গ্রহণ করেছ।"

عَلٰى خُلُقٍ لَمْ تُلْفِ اُمًّا وَلاَ اَبَا * عَلَيْهِ وَتُلْفِى عَلَيْهِ اَخًالَكَا

"তুমি এরূপ পথ গ্রহণ করেছ, না এর উপর মাকে পেয়েছ, না বাপকে এবং না তোমার ভাইকে এর উপর পাবে।"

فَاِنْ اَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِاسِفٍ * وَلاَ قَائِلٍ اِمَّا عَثَرْتَ لعًا لَكَا

"অতঃপর যদি তুমি আমার কথার উপর আমল না কর তাহলে আমার কোন চিন্তা নেই। আর আমি তোমার বিচ্যুতির সময় তোমাকে (لعالك) (কারো পদস্খলনের সময় বলা হয়, যার অর্থ সাবধান, সর্তক হও।) বলবও না।"

سَقَاكَ بِهَا الْمَامُوْنَ كَاسًا رَوِيَّةً * فَانْهَلَكَ الْمَامُوْنُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

"মামূন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) যেহেতু কুরায়শ তাঁকে আমীন ও মামূন মনে করত। তোমাকে তিনি নির্মল পানীয় পান করিয়েছেন।"

বুজায়র এ ঘটনা রাসূল (সা)-এর নিকট গোপন করা পসন্দ করলেন না। ফলে এই কবিতাসমূহ নবী (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। রাসূল (সা) বললেন, কা'ব সত্য

বলেছে। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপদ ও নির্দেশিত[১] এবং على خلق لم تلف اما ولا ابا শুনে তিনি বলেন, এটাও সত্য, সে বলেছে, মা-বাপকে ঐ দীনের উপর দেখেছে।

বুজায়র এর জবাবে নিম্নলিখিত কবিতা লিখে কা'বের নিকট প্রেরণ করেন-

مَنْ مُبلِغٌ كَعبًا فَهَلْ لَكَ فِى الَّتِى * تَلُوْمَ عَلَيْهَا بَاطِلاً وَهِىَ اَحْزَمُ

"এমন কেউ আছে কি যে, কা'ব-এর নিকট এই সংবাদ পৌছিয়ে দেবে, তোমার কি এই দ্বীন ও মিল্লাত গ্রহণে আগ্রহ বা উৎসাহ রয়েছে? তুমি আমাকে নাহক তিরস্কার করছ, অথচ এটাই অত্যন্ত সঠিক।"

اِلَى اللّٰهِ لاَ العُزّى وَلا اللاتِ وَحده * فَتَنْجُوْا اِذَا كَانَ النَّجَاءُ وَتَسْلَمُ

"লাত ও ওযযা দেবতার দিকে নয়, বরং এক আল্লাহ তা'আলার দিকে এসো। তাহলে যে সময় তাওহীদবাদীগণ আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাবে, তখন তুমিও মুক্তি পাবে এবং আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে।"

لَدَى يَوْمَ لاَيَنْجُوْ وَلَيْسَ بِمُفْلِتٍ * مِنَ النَّاسِ اِلاَّ طَاهِرُ الْقَلْبِ مُسْلِمُ

"ঐ দিন কোন ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পাবে না, শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার অন্তর কুফর ও শিরকের নাপাক থেকে মুক্ত ও অনুগত।"

فَدِيْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ لاَشَئُ دِيْنُهُ * وَدِيْنٌ اِلٰى سُلْمٰى عَلَىَّ مُحَرَّمُ

"যুহায়র-এর দ্বীন নিঃসন্দেহে মূল্যহীন। আমার পিতা যুহায়র এবং দাদা আবূ সালমার দীন আমার উপর হারাম। কেননা আমি হক অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

বুজায়র-এর এই পত্র কা'বের উপর বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে নবী (সা)-এর প্রশংসাসূচক কবিতা লিখে মদীনা রওয়ানা হন। মদীনা পৌঁছে ফজর নামাযের পর নবী (সা)-এরখেদমতে হাযির হয়ে অপরিচিত ব্যক্তি হিসেবে জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কা'ব ইবন যুহায়র তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করে আপনার খেদমতে হাযির হয়, তাহলে আপনি কি তাকে নিরাপত্তা দান করবেন? রাসূল (সা) হ্যাঁ। কা'ব আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ পাপী ব্যক্তিটি হলাম আমি। হে রাসূল! পবিত্র হাত প্রসারিত করুন। আমি বায়'আত গ্রহণ করব। এ সময় একজন আনসারী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে হত্যা করার অনুমতি দান করুন। নবী (সা) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, সে তাওবাকারী হিসেবে আগমন করেছে। অতঃপর কা'ব ইবন যুহায়র রাসূল (সা)-এর শানে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

১. কোন কোন মুদ্রণে سقاك بها المأمون এর পরিবর্তে سقاك بها المامور রয়েছে।

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول * ميم اثرها لم يفد مكبول

"সু'আদ চলে গিয়েছে ফলে তার বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর আজ বিদীর্ণ। আমি প্রেমের বন্দী, শৃংখলাবদ্ধ, আমার মুক্তিপণ দেয়া হয়নি।"

কা'ব ইবন যুহায়র যখন এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

ان الرسول لسيف يستضاء به * مهند من سيوف الله مسلول[১]

১. হাকীম এর বর্ণনায় রয়েছে যে কা'ব من سيوف الهند পাঠ করেন। নবী করীম (সা) বলেন, তুমি এভাবে من سيوف الله سلول

"নিশ্চয়ই রাসূল হলেন আলোকরশ্মি। তাঁর থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্লাহর তরবারিসমূহ হতে একখানা কোষমুক্ত ধারালো তরবারি।"

তখন নবী (সা) এ সময় যে ইয়ামানী চাদর পরিহিত ছিলেন কা'ব ইবন যুহায়রকে দান করেন। পরবর্তীতে হযরত মু'আবিয়া (রা) হযরত কা'ব ইবন যুহায়রের বংশধরদের থেকে বিশ হাজার দিরহাম মূল্য দিয়ে ঐ চাদর ক্রয় করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই চাদর মুসলিম খলিফাগণের নিকট রক্ষিত ছিল। পবিত্র ঈদের দিন বরকতের জন্য তাঁরা এটা পরিধান করতেন। তাতারীদের বাগদাদ আক্রমনের সময় তা হারিয়ে যায় (শারহে মাওয়াহিব)।

গাযওয়ায়ে তাবূক (৯ হিজরী রজব মাসের বৃহস্পতিবার)

মু'জামে তাবারানী গ্রন্থে হযরত ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত আরব কাফিরদের পক্ষ থেকে রোম দেশের সম্রাট হিরাকলের নিকট এই পত্র লিখে প্রেরণ করা হয় যে, মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং লোকজন দূর্ভিক্ষে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করছে। আরব তথা মুসলমানদের উপর হামলা করার এটাই উপযুক্ত সময়। হিরাকল সাথে সাথেই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। চল্লিশ হাজার যুদ্ধবাজ রোমক সৈন্যের এক বাহিনী মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।[১]

সিরিয়ার বণিকগণ যায়তুনের তৈল বিক্রয়ের জন্য মদীনায় যাতায়াত করে থাকে, তাদের মাধ্যমে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, হিরাকল এক বিরাট বাহিনী নিয়ে নবী (সা)-এর মুকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের অগ্রগামী দল বালকা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। হিরাকল সমস্ত সেনা বাহিনীর সারা বছরের বেতনভাতা বন্টন করে দিয়েছে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূল (সা) সাথে সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, যাতে শত্রুদের সীমানা (তাবুক) পৌঁছে তাদের মুকাবিলা করা যায়। সফরের দূরত্ব, গ্রীষ্মকাল, দূর্ভিক্ষ, অর্থ ও আসবাবপত্রের অভাব মিলিয়ে এরূপ সংকটপূর্ণ সময়ে

১. মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬ খ, পৃ. ১৯১।

জিহাদের নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, যে সমস্ত মুনাফিক নিজদেরকে মুসলমান বলে দাবি করত তারা ভয় পেয়ে যায়। কেননা এবার তাদের মুখোশ খুলে পড়বে। তারা নিজেদের জীবন রক্ষার চেষ্টা করে এবং অন্যদেরকেও এরূপ গরমে জিহাদের গমন না করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। (لاتنفروا فى الحر) (এমন গ্রীষ্মে বেরিওনা)।

এক উপহাসকারী বলে, লোকজন এটা অবগত আছে যে, আমি সুন্দরী নারী দর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়ি। আমার আশংকা হয় যে, পরীর মত সুন্দরী রোমের নারীদেরকে প্রত্যক্ষ করে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে না পড়ি।

সত্যিকার মু'মিনগণ আনুগত্য প্রকাশ করে জীবন ও ধন-সম্পদ নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন। সর্বপ্রথম হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সমস্ত সম্পদ নবী (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন। এর পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। নবী ((স) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পরিবারবর্গের জন্য কি রেখে এসেছে, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

হযরত উমর ফারূক (রা) সমস্ত মালের অর্ধাংশ হাযির করেন, হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) দু'শ উকিয়া রৌপ্য এবং হযরত আসিম ইবন আদী (রা) সত্তর ওসক খেজুর রাসূল (সা)-এর খেদমতে পেশ করেন।[১]

হযরত উসমান গনী (রা) আসবাবপত্রসহ তিনশ' উট এক হাজার দীনার পেশ করেন। নবী (সা) এতে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বার বার তাকে প্রত্যক্ষ করে বলেন, এই নেককাজের পর উসমানকে কোন আমল অনিষ্ট করতে পারবে না। হে আল্লাহ! আমি উসমানের উপর সন্তুষ্ট, তুমিও উসমানের উপর সন্তুষ্ট থাক।[২]

অধিকাংশ সাহাবা (রা) স্বীয় সাধ্য অনুযায়ী এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহযোগিতা করেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাওয়ারী ও আসবাবপত্র পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কয়েকজন সাহাবা রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খুবই দরিদ্র। যদি আমাদের জন্য সাওয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমরা এই পূণ্যকাজ থেকে বঞ্চিত থাকব না। নবী (সা) বললেন, আমার নিকট কোন সাওয়ারী নেই। ফলে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যা, তঁদের শানে কুরআন মাজীদের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا مَآ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ اَجِدُمَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الاَّيَجِدُوْا مَايُنْفِقُوْنَ ـ

"ঐ সমস্ত লোকের জন্যও বাধ্যবাধকতা বা অপরাধ নেই যারা এসেছে আপনার নিকট যাতে আপনি বাহন দান করেন (কিন্তু) আপনি বলেন, আমার নিকট এমন কোন জন্তু নেই যার উপর তোমাদেরকে আরোহণ করাব। তখন তারা ফিরে গিয়েছে এ

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ৬৪

২. প্রাগুক্ত

অবস্থায় যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছিল। এই দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে।" (সূরা তাওবা ঃ ৯২)

হযরত আবদুল্লাহ মুগাফ্‌ফাল ও আবূ লায়লা, আবদুর রহমান ইবন কা'ব (রা) যখন নবী (সা)-এর নিকট থেকে অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, এমন সময় পথে ইয়ামীন ইবন আমর নযরীর সাক্ষাৎ হলে তিনি ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নিকট বাহন নেই এবং আমাদেরও আসবাবপত্র ক্রয় করার ক্ষমতা নেই। এখন অনুতাপের বিষয় হলো আমরা এই গাযওয়ায় অভিযানে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে ইয়ামীনের অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি উট ক্রয় করেন এবং তাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করেন।[১]

সাহাবায়ে কিরাম রওয়ানার জন্য প্রস্তুত হলে নবী (সা) মুহাম্মদ ইবন মুসলিমকে স্বীয় প্রতিনিধি এবং মদীনার প্রশাসক বা গভর্নর নিয়োগ এবং হযরত আলীকে পরিবারবর্গের হিফাযত ও দেখাশুনার জন্য মদীনায় থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে শিশু মহিলাদের নিকট রেখে যাচ্ছেন? তখন নবী (সা) বললেন, তুমি কি এর উপর সন্তুষ্ট নও যে, আমার সাথে তোমার ঐ সম্পর্ক হোক যা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে হযরত হারূন (সা)-এর ছিল? কিন্তু আমার পর কোন নবী হবে না। (বুখারী)

হাদীস أنت منى بمنزلة هارون من موسى -এর ব্যাখ্যা

এ হাদীস দ্বারা শী'আ সম্প্রদায় হযরত আলীর (রা) খিলাফত সম্পর্কে দলীল পেশ করে বলেন, রাসূল (সা)-এর পর খিলাফতের হকদার ও অধিকারী হলেন হযরত আলী (রা)। আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলেন, নবী (সা)-এর সফরে গমনের সময় হযরত আলী (রা)-কে স্বীয় পরিবারবর্গের হিফাযতের দায়িত্বে রেখে যাওয়ার দ্বারা হযরত আলীর আমানতদারী, সততা ও বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। কেননা স্বীয় পরিবারবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত করা হয় যার আমানতদারী, সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, স্নেহ মহব্বতের উপর আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকে এ কাজে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু 'ইনতিকালের পর তুমিই আমার খলীফা নিযুক্ত হবে', হাদীসে এ বিষয়ের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

এছাড়া হযরত আলী (রা)-কে এ স্থলাভিষিক্ত করা শুধু পরিবারবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা গাযওয়ায় গমনের সময় রাসূল (সা) মুহাম্মদ ইবন মাসলামাকে মদীনার শাসনকর্তা, সাবা ইবন আরফা (রা)-কে মদীনার কোতওয়াল এবং আবদুল্লাহ ইবন উম্মে মাকতূম (রা)-কে মসজিদে নব্বীর ইমাম নিযুক্ত করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী খিলাফত উদ্দেশ্য ছিল না, বরং পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যদি ধরে

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

নেয়া হয়, তবুও তা গাযওয়া থেকে ফিরে আসার সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন কোন বাদশাহ্ সফরে গমনের সময় কাউকে রাজধানীর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে থাকেন এবং এই প্রতিনিধিত্ব ফিরে আসার সময় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। ফিরে আসার পর নিজে থেকেই তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এই কিছু সময়ের প্রতিনিধিত্ব এই বিষয়ের দলীল নয় যে, বাদশাহর ইনতিকালের পর এই ব্যক্তিই বাদশাহর খলীফা হবে। অবশ্য এই দায়িত্ব প্রদানের দ্বারা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমরা এ কথা বলছি না যে, হযরত আলী (রা)-এর মধ্যে খিলাফতের যোগ্যতা ছিল না, বরং সমস্ত আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হযরত আলীর (রা) যোগ্যতা ও দক্ষতার কথা একান্ত আন্তরিকভাবে স্বীকার করেন। তবে এর দ্বারা অন্যান্য খলীফাদের যোগ্যতাকে অস্বীকার করা হয়না। অন্য হাদীস দ্বারা তাঁদের পরিপূর্ণ যোগ্যতার বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

সুতরাং বাদশাহ যদি রাজধানী থেকে বাইরে গমনের সময় কাউকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান, তবে তা এ বিষয়ের দলীল নয় যে, বাদশাহর ইনতিকালের পরও ঐ ব্যক্তিই বাদশাহ হবে। কাজেই বাড়িঘর ও পরিবারবর্গের হিফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে যে দায়িত্ব সম্পর্কিত, তা মহান খিলাফতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নবী (সা)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি কোন গাযওয়ায় গমন করতেন, তখন মদীনায় কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন ঐ প্রতিনিধিত্ব নিজে নিজেই শেষ হয়ে যেত। কোন ব্যক্তিই এ ধারণা পোষণ করত না যে, কিছু সময়ের জন্য কোন সাহাবার প্রতিনিধিত্বকে মহান খিলাফতের ধারাবাহিকতার দলীল হিসেবে মনে করা হবে।

এবার বাকী রইল এ বিষয় যে, নবী (সা) এ হাদীসে হযরত আলী (রা)-কে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে আমরা আরয করব যে, এই সাদৃশ্য দ্বারা নিশ্চয়ই এক প্রকার ফযীলত প্রমাণিত হবে কিন্তু সাদৃশ দ্বারা সমস্ত বিষয়ে সমতা জরুরী নয়। এ হাদীসে যদিও হযরত আলী (রা)-কে হযরত হারূন (আ) সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে, পক্ষান্তরে বদরযুদ্ধে গ্রেফতারকৃত কয়েদীদের সম্পর্কে যখন রাসূল (সা) সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করেন, তখন তিনি হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর হযরত ইবরাহীম (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। হযরত উমর (রা)-কে হযরত নূহ (আ) ও হযরত মূসা সাথে সাদৃশ প্রদান করেছেন। কাউকে হযরত নূহ (আ) ও হযরত মূসা (আ)-এর সাথে সাদৃশ প্রদান করা انت منى بمنزلة هارون من موسى বলা থেকে অনেক উত্তম।

মোটকথা নবী (সা) ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন, এ বাহিনীতে ছিল দশ হাজার ঘোড়া।[১] (যারকানী, শারহে মাওয়াহিব)

১. উয়ূনুল আসার, ২ খ. পৃ. ২১৬।

সামূদ জাতির আবাসভূমি অতিক্রম, সেখানকার পানির বিষয় নির্দেশ এবং এর রহস্য

পথিমধ্যে ঐ দৃষ্টান্তমূলক ও বিপদজনক স্থান পড়ে যেখানে সামূদ গোত্রের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছিল। যখন নবী (সা) ঐ স্থান অতিক্রম করছিলেন, তখন পবিত্র চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন, উটকে গতিশীল করেন এবং সাহাবাগণকে এই নির্দেশ প্রদান করেন যেন, কোন ব্যক্তি এ যালিমদের বাড়ি ঘরে প্রবেশ না করে, এখানের পানি পান না করে। অযূ না করে এবং মাথা নত করে ক্রন্দন করতে করতে রাস্তা অতিক্রম করে। যারা ভুলে অথবা অজ্ঞতার কারণে পানি নিয়েছে অথবা ঐ পানি দ্বারা আটা গুলিয়েছে, তাদেরকে এই নির্দেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন পানি ফেলে দেয় এবং ঐ আটা উটকে খাইয়ে দেয়। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আম্বিয়া; ফাতহুল বারী, ৬ খ, পৃ. ২৬৮; শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৭৩)

মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং মসজিদে নব্বী, যা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতে আবাদ থাকে, সেখানে গমন করা, অবস্থান করা নৈকট্য লাভ এবং কল্যাণ ও বরকতের কারণ এবং রহমত নাযিলের উপায়। পক্ষান্তরে যে স্থানে দীর্ঘকাল আল্লাহপাকের নাফরমানীর কেন্দ্র ছিল এবং আল্লাহ তা'আলার গযব ও শাস্তি নাযিল হয়েছিল, সেখানে ইচ্ছাকৃত প্রবেশ করা অত্যন্ত বিপদজনক ছিল। যেভাবে আল্লাহ তা'আলার হেরেমে প্রবেশকারীর জন্য নির্দেশ রয়েছে ঃ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا (যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে।)

এমনিভাবে আযাবের স্থানে প্রবেশ করলে আযাব নাযিল হওয়ার আশংকা থাকে। পবিত্র কা'বার তাওয়াফ কেউ করুক বা না করুক, তা কল্যাণ, বরকত ও নূরের তাজাল্লীর উৎস এবং তা দর্শনের মাধ্যমে অন্তরের কালিমা ও পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে যায়। এ অঞ্চলের আবহাওয়াই অন্তরের রোগের শিফা। সুতরাং এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, অন্তরের চিকিৎসকের দৃষ্টিতে আযাবের স্থানের আবহাওয়া বিষাক্ত এবং সেখানের বিষাক্ত কীট আত্মার জন্য অনিষ্টকর হতে পারে। ফলে তিনি ঐ স্থানের পানি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং যে কূপ থেকে হযরত সালিহ (আ)-এর উট পানি পান করেছিল, সেখান থেকে পানি নেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা ঐ কূপ নাফরমানী এবং আল্লাহর গযব থেকে পবিত্র ছিল। যমযমের পানি যেহেতু পবিত্র এবং যাহিরী ও বাতেনী রোগের মহৌষধ, ফলে এ পানি পান করার জন্য তাগিদ করেছেন যে, যে পরিমাণ সম্ভব পান কর। যে বদ-নসীব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীর মধ্যে ডুবে রয়েছে, যার ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়েছে, তারা প্রকৃতপক্ষে চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তাদের চেয়েও অধিক নিকৃষ্টতর। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ (তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর)

এ জন্য নবী (সা) সামূদ গোত্রের পানি দ্বারা যে আটা গোলান হয়েছে, তা উটগুলোকে খাওয়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এরূপ পানি জন্তুর মেযাজের উপযুক্ত, মানুষের জন্য নয়। অধিকন্তু নবী (সা) যখন এই আযাবের এলাকা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি এই আশংকা করেছেন যে, আল্লাহ না করুন, এ অঞ্চলের বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া সাহাবাদের উপর পতিত না হয়। এর থেকে হিফাযতের জন্যই তিনি প্রতিষেধক হিসেবে পরামর্শ প্রদান করেন যে, মাথা নত করে ক্রন্দন করে অর্থাৎ স্বীয় পাপের কথা স্মরণ করে ভয় ও বিনয়ের সাথে ঐ স্থান অতিক্রম করবে। ইনজেকশন নেয়ার পর যদি কেউ প্লেগ বা মহামারীর এলাকা অতিক্রম করে, তাহলে তার রোগের কোন আশংকা থাকে না। হে বন্ধুগণ! আল্লাহর দরবারে ক্রন্দন, তাওবা এবং বিনয় পাপের এরূপ প্রতিষেধক ইনজেকশন, সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থও এরপর অবশিষ্ট থাকে না।

سبحانك أللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا انت أستغفرك وأتوب اليك قال تعالى وَلاَتَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

"হে আল্লাহ! তোমার জন্য পবিত্রতা এবং তোমার জন্যই প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট তাওবা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা যুলূম করেছে তাদের প্রতি তোমরা ঝুঁকে পড়বে না। তাহলে অগ্নি তোমাদেরকে স্পর্শ করবে।" (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

وَسَكَنْتُمْ فِىْ مَسَاكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَكُمْ -

"এবং তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে, যারা নিজেদের প্রতি যুলম করেছে।" (সূরা ইব্‌রাহীম ঃ ৪৫)

যালিমদের প্রতি মনোযোগী হওয়া এবং তাদের বাড়িতে অবস্থান করাও ক্রোধ বা অসন্তোষের কারণ।

হিজর (حجر) নামক স্থানে পৌঁছে নবী (সা) এ নির্দেশ প্রদান করেন, যেন কেউ একাকী বের না হয়। ঘটনাক্রমে দু'ব্যক্তি একাকী বের হয়ে পড়ে। একজনের দমবন্ধ হয়ে যায় যা রাসূল (সা)-এর দম করে দেয়ায় সুস্থ হয়ে যায়। অপর ব্যক্তিকে বায়ু তায় পাহাড়ে নিক্ষেপ করে। তিনি দীর্ঘ দিন পর মদীনায় পৌঁছেন।

এটা হলো বায়হাকী ও ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াত। সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাবূকে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত ঘটনা দু'টি ছিল। অথবা ইবন ইসহাক ও বায়হাকীর রিওয়ায়াতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ ছিল। আল্লাহই ভাল জানেন।

সামনে অগ্রসর হয়ে এক মনযিলে থামেন, সেখানে পানি ছিল না। খুবই পেরেশান ছিলেন। আল্লাহপাক নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যার ফলে সবাই

পানি পান করে তৃপ্ত হয়। সেখান থেকে রওয়ানা হওয়ার পর রাসূল (সা)-এর উট হারিয়ে যায়। এক লোক বলে, তিনি আসমানের খবর বর্ণনা করেন কিন্তু নিজের উটের খবর নেই যে, এটা কোথায়? নবী (সা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার কোন বিষয়ের ইল্‌ম নেই, তবে আল্লাহ আমাকে যা কিছু অবহিত করেন। এখন আল্লাহ্‌পাকের ইলহামের মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, আমার উট অমুক ময়দানে রয়েছে এবং এর মিহার (নাসারন্দ্রের রশি) এক বৃক্ষের সাথে আটকে গিয়েছে, যার ফলে এটা সেখানে আটকিয়ে আছে। ফলে সাহাবাগণ সেখানে গমন করে ঐ উট নিয়ে আসেন। (বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম)

তাবুক পৌছার একদিন পূর্বে রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আগামীকাল চাশতের সময় তোমরা তাবূকের কূপের নিকট পৌঁছবে। কেউ যেন ঐ কূপ থেকে পানি সংগ্রহ না করে। যখন ঐ কূপের নিকট পৌছে, তখন সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি নির্গত হচ্ছিল। একটি পাত্রে কিছু পানি জমা করা হলো। নবী (সা) ঐ পানি দ্বারা স্বীয় হাত-মুখ ধৌত করে ঐ পানি কূপের মধ্যে ঢেলে দেন। ফলে ঐ কূপ পানিতে কানায় কানায় ভর্তি হয়ে ফোয়ারা জারী হয়ে যায়, যার ফলে সমস্ত সৈন্য তৃপ্তি সহকারে পানি পান করে। নবী (সা) মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে মু'আয! যদি তুমি জীবিত থাক, তাহলে এ এলাকা বাগানের দ্বারা সবুজ ও সতেজ দেখতে পাবে। (মুসলিম)

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, অদ্যাবধি ঐ ফোয়ারা জারী আছে এবং দূর থেকে এর আওয়ায শুনা যায়। (খাসাইসে কুবরা, ১ খ, পৃ. ২৭৩)

তাবূক পৌছার পর রাসূল (সা) সেখানে বিশদিন অবস্থান করেন। কিন্তু কেউ মুকাবিলার জন্য আসেনি। কিন্তু নবী (সা)-এর আগমন ব্যর্থ হয়নি। শত্রুরা ভীত হয়ে পড়ে এবং আশেপাশের গোত্রের লোকেরা হাযির হয়ে আত্মসমর্পণ করে। জিরবা, আযয়খ এবং আমলার শাসকগণ রাসূল (সা) -এর খিদমতে হাযির হয়ে সন্ধি করে জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। রাসূল (সা) সন্ধিপত্র লিখিয়ে তাদের নিকট হস্তান্তর করেন।

ঐ স্থান থেকেই নবী (সা) হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-কে চারশ' বিশজন আরোহীর সাথে হিরাকল কর্তৃক নিয়োজিত দাওমাতুল জান্দালের শাসক একীদরের মুকাবিলার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদকে রওয়ানা করার সময় রাসূল (সা) এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, শিকার করার অবস্থায় তোমরা তাকে পাবে তাকে হত্যা করবে না, বরং গ্রেফতার করে আমার নিকট নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, যদি সে বিদ্রোহ করে, তাহলে তাকে হত্যা করবে। হযরত খালিদ (রা) চাঁদনী রাতে সেখানে পৌছেন। গ্রীষ্মকাল ছিল। একীদর এবং তার স্ত্রী দূর্গের ছাদে বসে গান শুনছিল। হঠাৎ একটি নীল গাভী দূর্গের ফটকে এসে ধাক্কা দেয়। একীদর সাথে সাথেই তার ভাই ও কয়েক বন্ধুকে নিয়ে শিকারে বের হয় এবং ঘোড়ায় আরাহণ করে এর পিছনে দৌড়াতে

থাকে। কিছু দূর যাওয়ার পর খালিদ ইবন ওয়ালীদ তাদের সামনে এসে পৌছেন। একীদরের ভাই হাসান মুকাবিলা করে নিহত হয় এবং একীদর খালিদ ইবন ওয়ালীদের হাতে গ্রেফতার হয়।

হযরত খালিদ (রা) বলেন, আমি তোমাকে হত্যা থেকে রক্ষা করতে পারি যদি তুমি আমার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হতে সম্মত হও। একীদর এতে সম্মত হয়। হযরত খালিদ (রা) তাকে নিয়ে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। একীদর দু'হাজার উট, আট'শ ঘোড়া, চার'শ লৌহ বর্ম এবং চার'শ বল্লম প্রদান করে সন্ধি করে।[১]

মসজিদে দিরার বা ক্ষতিকর মসজিদ

বিশ দিন অবস্থানের পর নবী (সা) তাবূক থেকে মদীনার পথে যাত্রা করেন। মদীনা থেকে এক ঘন্টার পথ দূরে যী'আওয়ান (ذى أوان) নামক স্থানে পৌছার পর রাসূল (সা) মালিক ইবন দুখশুম এবং মা'আন ইবন আদীকে দেরার মসজিদ ধ্বংস করা ও জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। মুনাফিরা-রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরুদ্ধে এখানে বসে পরামর্শ করার জন্য এই মসজিদ নির্মাণ করেছিল। যখন রাসূল (সা) তাবূক যাচ্ছিলেন তখন মুনাফিকরা এসে আরয করে যে, আমরা রুগ্ন ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য একটি মসজিদ তৈরি করেছি। আপনি সেখানে গমন করে একবার নামায পড়িয়ে দিলে তা মাকবূল ও বরকতময় হয়ে যাবে। নবী (সা) বললেন, এখন আমি তাবূক যাচ্ছি ফেরার পথে দেখা যাবে। ফেরার সময় রাসূল (সা) ঐ দু'ব্যক্তিকে মসজিদে দেরার জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ مِنْ قَبْلُ - وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَا اِلاَّ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ -لاَتَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ - فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

"যারা মসজিদ নির্মাণ করেছে মুসলমানদের অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে, কুফরী করা এবং মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা এবং ঐ লোকের জন্য ঘাঁটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা শুধু কল্যাণই কামনা করছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী প্রদান করছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। আপনি কখনো সেখানে (মসজিদে দিরারে) দাঁড়াবেন

১. উয়ূনুল আসার, ২ খ. পৃ. ২২।

না। তবে যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই তাক্ওয়ার উপর রাখা হয়েছে, ঐ মসজিদ (মসজিদে কুবা) আপনার দাঁড়াবার উপযুক্ত স্থান। সেখানে রয়েছে, এমন লোক যারা পবিত্রতা ভালবাসে এবং আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালবাসেন।"

(সূরা তাওবা ঃ ১০৭ -৮)

ইবন হিশামের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) সুওয়াইলাম নামক ইয়াহূদীর বাড়িও জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা এ বাড়িতে বসেই মুনাফিকরা নবী (সা)-এর বিরুদ্ধে পরামর্শ করত। হযরত তালহা (রা) কয়েক ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে গিয়ে ঐ বাড়ী জ্বালিয়ে দেন।

যখন রাসূল (সা) মদীনার নিকট পৌঁছেন, তখন নবুওয়াত ও রিসালাতের সূর্য মহানবী (সা)-কে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য মদীনাবাসী বের হয়ে আসেন। এমন কি উৎসাহের আতিশয্যে পর্দানশীন মহিলাগণও ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। শিশু কিশোরীরা এই কবিতা আবৃত্তি করে।

طلع البدر علينا * من ثنيات الوداع

وجب الشكرَ عَلَيْنا * مادعاء الله داع

ايُّهَا المبعوث فينا * جئت بالامر المطاع

"পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের উপর উদিত হয়েছে সানিয়াতিল বিদা থেকে, শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর ওয়াজিব যে আহবানকারী আল্লাহর দিকে আহবান করে। হে মহান ব্যক্তি (নবী সা) আপনি আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন, এবং এমন বস্তু নিয়ে এসেছেন যা অনুসরণ করার যোগ্য।"

যখন মদীনার বাড়িঘর দৃষ্টিগোচর হয় তখন তিনি বলেন, هذه طابة (এই হলো পবিত্র মদীনা) এবং ওহুদ পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তিনি বলেন, هذا جبل يحبنا ونحبه "এ পাহাড় আমাদেরকে মহব্বত করে এবং আমরা এটাকে মহব্বত করি।"

শা'বান মাসের শেষ অথবা রমযান মাসের প্রথমে মদীনায় প্রবেশ করে। তিনি মসজিদে নব্বীতে গমন করে সেখানে কয়েক রাক'আত নামায আদায় করেন। নামায সম্পন্ন করার পর লোকজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য কিছুক্ষণ মসজিদে অবস্থান করেন। অতঃপর বিশ্রামের জন্য ঘরে প্রবেশ করেন। (শারহে মাওয়াহিব)

এটা ছিল সর্বশেষ গাযওয়া, যাতে নবী (সা) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন।[১]

অভিযান থেকে পশ্চাদগামীদের[২] বর্ণনা

নবী (সা) যখন তাবূক রওয়ানা হন তখন খালিস মু'মিনগণও নবী (সা)-এর সাথে গমন করেছিলেন। মুনাফিকদের একটি দল অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু

১. ইবন হিশাম, শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৮০।

২. গাযওয়ায়ে তাবূক গমন থেকে যারা বিরত ছিলেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট মু'মিনও নিফাকের কারণে নয়, বরং কোন ওযর এবং কেউ গরম ও লু হাওয়ার কষ্ট থেকে ভীত হয়ে গাযওয়ায় অংশগ্রহণ থেকে পিছনে থেকে যান।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর উট ছিল দুর্বল। ফলে তিনি এই চিন্তা করেন যে, দু'চার দিনে এই উট পানাহার করে চলার যোগ্য হবে, তখন আমি রাসূল (সা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হব। কিন্তু যখন এই উট থেকে নিরাশ হলেন, তখন স্বীয় আসবাবপত্র পিঠে বহন করে রওয়ানা হয়ে একাকী তাবূক পৌঁছেন। নবী (সা) তাঁকে দেখে বলেন, আল্লাহ আবূ যরের উপর রহম করুন। একা এসেছে, একাই মৃত্যুবরণ করবে, একাই পুনরুত্থিত হবে। মূলত এরূপই ঘটেছে। রাবযাহ্ নামক স্থানে তিনি একাকী অবস্থায় ইনতিকাল করেন। দাফন-কাফনের কেউ ছিল না। ঘটনাক্রমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) কূফা থেকে ফিরে আসছিলেন, তিনি দাফন কাফনের ব্যবস্থা করেন।[১]

'মু'জামে তাবারানী' গ্রন্থে আবূ খায়সামা থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মদীনা রওয়ানা হওয়া সত্ত্বেও আমি মদীনায় থেকে গেলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে আমার পরিবারবর্গ ছাউনিতে ঠাণ্ডা পানিসহ সুস্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করল। এ দৃশ্য দেখে সহসা আমার অন্তরে দুঃখবোধের সৃষ্টি হলো যে, এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) লু হাওয়া এবং গরমের মধ্যে অবস্থান করছেন, আর আমি ছায়ায় উপবেশন করছি, আরাম করছি। তৎক্ষণাৎ উঠে কিছু খেজুর নিয়ে উটে আরোহণ করেন এবং দ্রুতগতিতে রওয়ানা হয়ে যখন মুসলিম বাহিনীর সামনে পৌঁছেন। তখন নবী (সা) দূর থেকে তাঁকে দেখে বলেন, আবূ খায়সামা আসছে। আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। তিনি আমার কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন।[২]

যারা যুদ্ধে যোগদান করেনি তাদের মধ্যে নেককার মু'মিন হিসেবে হযরত কা'ব ইবন মালিক, হযরত মুররা ইবন রাবী' এবং হিলাল ইবন উমাইয়্যাও ছিলেন।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) গাযওয়ায়ে তাবূকের পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। ধারণা ছিল এই যে, দু'-এক দিন পর আসবাবপত্র প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন রাসূল (সা)-এর সাথে মিলিত হব। ইতিমধ্যে বিলম্ব হয়ে গেল এবং কাফেলা অনেক দূর চলে যায়। মদীনায় অক্ষম ব্যক্তিগণ ও মুনাফিক ব্যতীত কেউ বাকী রইল না। যখন আমি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতাম তখন আমার অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ হত। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাবূক থেকে ফিরে আসেন, তখন মুনাফিকরা মিথ্যা ওযর বর্ণনা করে। রাসূল (সা) বাহ্যিকভাবে তাদের ওযর কবূল করেন এবং অন্তরের বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করেন।

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৭১।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৮৮।

মাগাযী ইবন আয়েযে বর্ণিত, হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) বলেন, আমি এই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি কখনো এরূপ করব না যে, গাযওয়া থেকে বিরত থাকব এবং মিথ্যা কথাও বলব। সুতরাং আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করলাম। তিনি অন্যদিকে ফিরে থাকলেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন আমার থেকে ফিরে আছেন? আল্লাহর শপথ! আমি মুনাফিক নই, না আমার মধ্যে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং না আমি দ্বীন থেকে ফিরে গিয়েছি। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে যুদ্ধ থেকে কেন বিরত রয়েছ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি কোন দুনিয়াদার ব্যক্তির সামনে বসতাম, তাহলে কথাবার্তা বানিয়ে মিথ্যা বলে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা পেতাম। কিন্তু আপনি হলেন আল্লাহর রাসূল যদি আজ মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করি তা হলে হয়ত আল্লাহপাক কাল আপনাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট করে দিবেন। আর যদি আপনার নিকট সত্য বলি যার ফলে আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতে পারেন কিন্তু আল্লাহর ফযলে আমার আশা এই যে, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। মূলত আমার কোন ওযর নেই, আমি অপরাধী। নবী (সা) বললেন, এই ব্যক্তি সত্য কথা বলেছে। এখন তুমি যাও, আল্লাহ হয়ত তোমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল করবেন। এমনিভাবে মুররা ইবন রাবী এবং হিলাল ইবন উমাইয়্যা (রা) নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করলেন। রাসূল (সা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, কেউ যেন এ তিন ব্যক্তির সাথে পঞ্চাশ দিন কথাবার্তা না বলে। সুতরাং সবাই আমাদের সাথে সালাম ও কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে অনাত্মীয় মনে হতে লাগল। হযরত কা'ব (রা) বলেন, আমার দু'সাথী শারীরীক দুর্বলতার কারণে ঘরে অবস্থান করতে থাকে। দিবারাত্র কাঁদাকাটির মধ্যে অতিবাহিত করে। আমি জওয়ান ছিলাম বিধায় নামাযের জামা'আতে হাযির হতাম। মোটকথা এমনি পেরেশানীর মধ্যে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হলো। আল্লাহর যমীন আমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল। সবেচেয়ে বেশি চিন্তা হলো এই জন্য যে, যদি এ অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায় তা হলে রাসূল (সা) এবং মুসলমানগণ আমার জানাযা পড়বে না। পঞ্চাশ দিন পর হঠাৎ সালা পাহাড় থেকে এই বহু আকাঙ্ক্ষিত এই সুসংবাদ শোনা গেল ঃ ياكعب بن مالك أبشر (হে কা'ব ইবন মালিক, তোমাকে সুসংবাদ)

এ সুসংবাদ শুনেই আমি আমি সিজ্‌দাবনত হয়ে পড়ি এবং উপলব্ধি করলাম যে, বিপদ দূর হয়ে গিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন যে, এ সমস্ত লোকের তাওবা কবূল হয়েছে। চতুর্দিক থেকে লোকজন আমাকে এবং আমার দু'জন সাথীকে সুসংবাদ ও মুবারকবাদ জানানোর জন্য আগমন করে। ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত, তারা বলছেন لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰه عَلَيْكَ (আল্লাহপাক তোমার তাওবা কবূল করার কারণে

তোমাকে মুবারকবাদ)। যে ব্যক্তি আমার নিকট সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছে আমি সাথে সাথে আমার দু'টি কাপড় তাকে পরিধান করিয়ে দিয়েছি। অতঃপর আমি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি মসজিদে উপস্থিত হওয়া মাত্রই তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। হযরত কা'ব (রা) বলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের অন্য কেউ উঠে আসেনি। আল্লাহর শপথ! তালহার এই ইহ্সান ও করুণা আমি কখনো ভুলব না। নবী (সা)-এর চেহারা মুবারক থেকে চাঁদের মত আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। আমি তাঁকে (সা) সালাম পেশ করলাম। তিনি বলেন,

أبشر بخير يوم مرعليك منذ ولدتك امك

"তোমাকে মুবারকবাদ ঐ দিনের জন্য যা সমস্ত দিনের থেকে উত্তম, ঐ দিন থেকে যেদিন তোমার মা তোমাকে প্রসব করে।"

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রা) যে দিন ইসলাম গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই ঐ দিন সমস্ত দিন থেকে উত্তম কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দিন ঐ দিন থেকেও অধিক উত্তম। কেননা এই দিন আল্লাহর দরবারে তাঁর তাওবা কবূল হয়। যার ফলে তার ঈমান ও ইখলাসের ব্যাপারে চিরদিনের জন্য মোহর অঙ্কিত হয়ে যায়। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ - اِنَّهٗ بِهِمْ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ - وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ - وَظَنُّوْا اَنْ لَّامَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ - ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا - اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ - يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

"আল্লাহ ক্ষমাশীল নবীর প্রতি, মুহাজির ও আনসারগণের প্রতি, যারা কঠিন মূহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিলেন, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময় এবং অপর তিনজন, যাদেরকে পিছনে রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী সুপ্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠল আর তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হল যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি-যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ,আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা তাওবা ১১৭-১১৯)

আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ তাওবা কবূল হওয়ার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ দান করার ইচ্ছা পোষণ করছি। নবী (সা) বললেন, কিছু রেখে দাও। হযরত কা'ব (রা) বলেন, খায়বারে আমি যা অংশ পেয়েছিলাম, তা আমি রেখে দিয়েছ এবং বাকী সমস্ত দান করে দিয়েছি। তিনি আরো আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আমাকে শুধু সত্য বলার কারণে নাজাত দিয়েছেন। সুতরাং তাওবার ফায়দা হিসেবে আমি আমরণ সত্য কথা ব্যতীত অন্য কিছু বলব না। (বুখারী, ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৮৬)

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) কে হজ্জের আমীর নির্বাচন

৯ম হিজরীর যিলকা'দ মাসে নবী (সা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে হজ্জের আমীর নির্বাচন করে মক্কা মুকাররমা প্রেরণ করেন। মদীনা থেকে তিন'শ লোক এবং কুরবানীর জন্য বিশটি উট তাঁর সাথে প্রদান করেন, যাতে তিনি শরী'আতের বিধান অনুযায়ী লোকজনের হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে সূরা তাওবার যে চল্লিশ আয়াত নাযিল হয়েছে, তা ঘোষণা করবেন। আয়াতসমূহে এ বিষয়ে বর্ণনা ছিল যে, এ বছরের পর মুশরিকরা মসজিদে হারামে যেতে পারবে না এবং উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না, যার সাথে নবী (সা) কোন চুক্তি করেছেন তা ঐ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণ করা হবে। যাদের সাথে কোন চুক্তি করা হয়নি, তাদেরকে 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর দিন থেকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হলো।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রওয়ানা হওয়ার পর নবী (সা)-এর এটা খেয়াল হলো যে, চুক্তি এবং চুক্তি ভঙ্গ সম্পর্কে এরূপ ব্যক্তির দ্বারা ঘোষণা হওয়া উচিত যিনি চুক্তিকারীর গোত্র এবং আহ্‌লি বায়তের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আরবগণ এরূপ বিষয়ে গোত্র ও আত্মীয়দের কথা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে ডেকে স্বীয় 'আদবা' (عضباء) নামক উটে সাওয়ার করে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিছনে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ প্রদান করেন যে, হজ্জের সময় তুমি সূরা বারা'আতের আয়াতসমূহ লোকজনকে শুনাবে। কোন কোন রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বারা'আতের আয়াত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রওয়ানা হওয়ার পর নাযিল হয়, এজন্য পরে হযরত আলীকে (রা) পয়গাম শোনানোর জন্য প্রেরণ করা হয়। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) উটের আওয়ায শুনেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন যে, স্বয়ং হুযুর (সা) আগমন করেছেন। থেমে গেলেন এবং আলী (রা)-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন أمير أو مامور অর্থাৎ আমীর হয়ে এসেছেন অথবা অধীন হয়ে? হযরত আলী (রা) বললেন, আমি শুধু সূরা বারা'আতের কিছু আয়াত শোনানোর নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। বস্তুত হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) লোকজনকে হজ্জ করালেন এবং হজ্জের খুতবাও তিনিই পেশ করেন। হযরত আলী (রা)-কে সূরা বারা'আতের

আয়াতসমূহ এবং এর বিষয়বস্তু 'ইয়াওমুন নাহরে' (কুরবানীর দিন) জামারায়ে আকাবার নিকট দাঁড়িয়ে লোকজনকে শোনালেন। হযরত আবূ বকর (রা) কিছু লোককে হযরত আলী (রা) সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করেন, যাতে তারা বারবার ঘোষণা দিতে পারে।

তদনুসারে কুরবানীর দিন এই ঘোষণা দেয়া হয় যে, বেহেশতে কোন কাফির প্রবেশ করতে পারবে না, আগামী বছর থেকে কোন মুশরিক হজ্জ আদায় করতে পারবে না, এবং কেউ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যার কোন চুক্তি রয়েছে, তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পূর্ণ করতে হবে। যার সাথে কোন চুক্তি নেই অথবা অনির্ধারিত সময়ের জন্য চুক্তি রয়েছে, তার জন্য চার মাসের নিরাপত্তা রয়েছে। যদি এ সময়ে ইসলাম গ্রহণ না করে, তাহলে এ সময়ের পর যেখানে পাওয়া যাবে, তাকে হত্যা করা হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা)-কে যুল-হুলায়ফা পৌঁছে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সাথে মিলিত হয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে এ আয়াত সমূহের ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ ধারণা হলো যে, সম্ভবত আমার সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে। ফলে তিনি সাথে সাথেই মদীনা আগমন করে রাসূল (সা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পর্কে কি কোন আয়াত নাযিল হয়েছে? নবী (সা) বললেন, না, তুমি তো আমার হেরা গুহার সাথী, সাওর গুহার সাথী এবং হাউযে কাওসারেও তুমি আমার সাথী হবে। কিন্তু সূরা বারা'আতের ঘোষণা আমি অথবা আমার গোত্রের কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যার কারণে বারা'আতের আয়াত ঘোষণা ও শোনানোর জন্য আমি আলীকে প্রেরণ করেছি।[১]

বিভিন্ন ঘটনাবলী (৯ম হিজরী)

১.এ বছর যিল-কা'দ মাসে মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহর ইবন উবায় ইবন সুলূল মৃত্যুবরণ করে। তার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَاتَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ

"এবং আপনি এ সমস্ত মুনাফিকের মধ্যে কারো জানাযার নামায পড়বেন না এবং তাদের কবরে দাঁড়াবেন না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৯৫)

মাসয়ালা ঃ কাফিরদের জানাযায় অংশগ্রহণ এবং তাদের কবরে গিয়ে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। ঐ জানাযা হিন্দুর হোক অথবা খ্রিস্টানের, উভয়ই কুফরীর মধ্যে

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৬৫

রয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে মুশরিক এবং মূর্তি পূজারী কাফির আহলি কিতাবের চেয়েও মারাত্মক কাফির। (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

২. এ বছর হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী ইনতিকাল করেন। ওহীর মাধ্যমে ঐ দিনই রাসূল (সা)-কে তাঁর ওফাতের খবর অবহিত করা হয়। নবী (সা) সাহাবাগণকে একত্র করে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

৩. এ বছরই সুদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। এক বছর পর নবী (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে এ বিষয়ে সাধারণ ঘোষণা প্রদান করেন।

৪. এ বছরই স্ত্রীদের সাথে লি'আন (لعان) সংক্রান্ত বিধান নাযিল হয়। এ সম্পর্কে সূরা নূরে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৫. যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তবে শুধু ইসলামী শাসনের অধীনে থাকতে সম্মত হয়েছে তাদের জিযিয়া প্রদান সম্পর্কে এ বছরই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়।

وَقَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَيُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَلاَيَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُو الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ -

" তোমরা যুদ্ধ কর আহ্‌লি কিতাবের ঐ লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম হিসেবে মানে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে।" (সূরা তাওবা ঃ ২৯)

جزيه শব্দটি جزاء থেকে আগত অর্থাৎ এই প্রতিফল বা শাস্তি হলো কুফরীর। অসম্মান ও ঘৃণা হিসেবে আযাদ, জ্ঞানবান ও প্রাপ্তবয়স্ক থেকে তা আদায় করা হয়। জিযিয়া আদায়ের উদ্দেশ্য হলো যাতে এর দ্বারা কাফিরদের শক্তি-সামর্থ্য দুর্বল এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং শাসকদের সামনে তাদের মাথা নত হয়ে যায়। শরী'আতের পরিভাষায় এদেরকে 'যিম্মী' বলা হয়। ذمى – ذمة থেকে এসেছে অর্থাৎ যাদের জীবন, ধন সম্পদ ও সম্মান মর্যাদা এ সব কিছুর যিম্মাদার হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআন ও হাদীসে কাফিরদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা প্রাণ রক্ষার বদলে নয় অর্থাৎ জিযিয়ার কারণ এটা নয় যে, যিম্মী স্বয়ং নিজকে হিফাযত করতে পারবে না এবং আমরা শত্রুদের থেকে তাদেরকে হিফাযত করছি। কেননা যিম্মীদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ , পঙ্গু ও সন্ন্যাসীদেরকেও হিফাযত করা হয় কিন্তু তাদের উপর জিযিয়া নেই, বরং জিযিয়া ঐ লোকদের থেকে আদায় করা হয় যারা জিহাদে হত্যার উপযুক্ত হয়েছিল। এ জন্য ফকীহ্‌গণ বলেছেন, জিযিয়া হলো হত্যার বদলা, যা শুধু স্বাধীন, সুমস্তিষ্ক ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের থেকে গ্রহণ

করা হয়। যাদের সাথে এই ভিত্তির উপর চুক্তি হয় যে, উভয় পক্ষের স্বাধীনতাকে সংরক্ষণে করা হবে। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের লোককে মু'আহিদ (معاهد) অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ বলা হয়।

দশম হিজরী বিভিন্ন প্রতিনিধির আগমন (عام الوفود)

আরবে সবচেয়ে বৃহৎ ছিল কুরায়শ গোত্র। এই গোত্রের নেতৃত্ব সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। জ্ঞানবুদ্ধি, বিচক্ষণতা, দানশীলতা এবং বীরত্বে তাঁরা খ্যাত ছিল। বায়তুল্লাহ এবং হেরেমের রক্ষক ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণে কঠোর ছিল। আরবের গোত্রসমূহের দৃষ্টি কুরায়শদের উপর এ জন্য নিবদ্ধ ছিল যে, তাদের হাতে রাসূল (সা) এর কী পরিণতি হয়।

কুরায়শদের যুবকগণ শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে কিন্তু বৃদ্ধরা বাকী ছিল। যখন বিজয় হয় এবং বৃদ্ধগণও ইসলাম গ্রহণ করে না তখন আরবগণ এটা উপলব্ধি করে যে, দ্বীন ইসলাম হলো দ্বীনে ইলাহী বা আল্লাহর দ্বীন। এই দ্বীন অবশ্যই সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কোন শক্তিই এর বিরোধিতা করে সফল হতে পারবে না। এ জন্যই মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই চতুর্দিক থেকে দূতগণ আগমন করতে থাকে এবং প্রত্যেক গোত্রের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রাসূল (সা)-এর দরবারে হাযির হতে থাকে। ইসলামের হাকীকত উপলব্ধি করে নিজেও ইসলাম গ্রহণ এবং স্বীয় গোত্রের সবাইকে ইসলাম গ্রহণ করানোর অঙ্গীকার করে ফিরে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি লোকজনকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, তখন আপনি আপনার রবের পবিত্রতা বর্ণনা ও প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।" (সূরা নাসর ঃ ১-৩)

৮ হিজরীর শেষ ভাগ থেকে ১০ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়। কিন্তু ১০ হিজরীতে এই প্রতিনিধি দলের আগমন অধিক হারে অব্যাহত থাকে। এ জন্য এই দু'টি সালকে عام الوفود বলা হয়। ইবন সা'দ, দিময়াতী, মুগলাতাঈ এবং ইরাকী প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ষাট থেকে কিছু অধিক বর্ণনা করেছেন। আল্লামা কাস্‌তাল্লানী মাওয়াহিবে পঁয়ত্রিশটি প্রতিনিধির কথা উল্লেখ করেছেন।[১]

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ২।

১. হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল

মক্কা বিজয়ের পর হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল সর্বপ্রথম নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হুনায়নের যুদ্ধের বর্ণনা অতিক্রান্ত হয়েছে। যখন রাসূল (সা) জিরানা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। ঐ সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ ব্যক্তির একটি দল তাদের মাল ও কয়েদীদেরকে মুক্ত করার জন্য রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই দলে হুযুর (সা)-এর রিযাঈ (رضاعى) চাচা ছিলেন। হযরত হালিমা সা'দীয়া ছিলেন এই গোত্রের। যুহায়র ইবন সুরাদ সাদী ও জাশমী এ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন। তারা দাঁড়িয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সমস্ত কয়েদীদের মধ্যে আপনার খালা ও রিযাঈ ফুফু এবং লালন পালনকারী রয়েছে। যারা কোন কোন সময় আপনাকে বুকে (শিশুকালে) নিয়েছেন। যদি আমরা হারিস গাস্সানী এবং নু'মান ইবন মুনযিরকে দুধ পান করাতাম, তা হলে এ ধরনের বিপদে তার নিকট মুক্তির আশা করতাম। আপনি তো সবচেয়ে উত্তম দায়িত্ব গ্রহণকারী। অতঃপর এ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

أُمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِيْ كَرَمٍ * فَاِنَّكَ الْمَرْءُ نرجوه وننتظر

" হে আল্লাহর রাসূল, স্বীয় করুণা ও দয়া দ্বারা আমাদের প্রতি ইহসান (সদ্ব্যবহার) করুন। নিশ্চয়ই আপনি এরূপ ব্যক্তি যার থেকে আমরা মেহেরবানী ও সহানুভূতির আশা এবং অপেক্ষায় রয়েছি।"

أُمْنُنْ عَلٰى بَيْضَةٍ قَدْ عَاقَهَا قَدَرٌ * مُمَزَّنٌ شَمْلُهَا فِيْ دَهْرِهَا غَيْرُ -

"ঐ গোত্রের প্রতি ইহ্সান করুন যাদের প্রয়োজনকে ভাগ্য থামিয়ে দিয়েছে। যুগের পরিবর্তনে তাদের শৃংখলা বিনষ্ট হয়েছে।"

يَاخَيْرَ طِفْلٍ وَمَوْلُوْدٍ وَمُنْتَخَبٍ * فِيْ الْعَالَمِيْنَ اِذَا مَا حَصَّلَ الْبَشَرُ

" এবং সারা বিশ্বের জন্য আপনি উত্তম ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত। হে সর্বোত্তম জাতক, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান"

اِنْ لَمْ تَدَارِكُهُمْ نَعْمَاءُ تَنْشُرُهَا * يَا اَرْجَعَ النَّاسِ حِلْمًا حِيْنَ تُخْتَبَرُ

"যদি আপনার নিয়ামত ও ইহ্সান তথা সাহায্য তারা না পায় তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। হে ঐ সত্তা যার ধৈর্য সর্বাধিক এবং পরীক্ষার সময় তাঁর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, আমাদের উপর ইহসান করুন।"

أُمْنُنْ عَلٰى نِسْوَةٍ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهَا * اِذْفُوْكَ تَمْلَؤُهُ مِنْ مَحْضِهَا الدَّرُّ -

"ঐ সমস্ত মহিলার প্রতি ইহ্সান করুন যাদের দুধ আপনি পান করেছেন এবং তাদের খালিস ও প্রবাহিত দুধ দ্বারা আপনি স্বীয় মুখ ভর্তি করেছেন।"

لاتَجْعَلَنَّا كَمَنْ شَالَتْ نَعَامَتُهُ * وَاسْتَبِقْ مِنَّا فَانَّا مَعْشَرُ زُهُرُ

"আমাদেরকে ঐ সমস্ত লোকের মত করবেন না যাদের পদস্খলন হয়েছে এবং আপনার দান ও দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ দিন। কেননা আমরা ভদ্র পরিবারের লোক হওয়ায় কারো দয়া ও করুণার কথা ভুলে যাইনি।"

انَّا لَنَشْكُرُ لِلنَّعْمَاءِ اذْ كُفِرَتْ * وَعِنْدَنَا بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ مَدَّخَرُ

"নিশ্চয়ই আমরা নিয়ামত ও ইহ্‌সানের অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকি যখন মানুষ এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। আজকের দিনের পর আমাদের নিকট অনেক সঞ্চিত ধন থাকবে।"

فَالْبِسِ الْعَفْوَ مِنْ قَدْ كُنْتَ تَرْضَعُهُ * مِنْ أُمَّهَاتِكَ انَّ الْعَفْوَمُشْتَهَرَ

"সুতরাং আপনি যাদের দুধ পান করেছেন ঐ মায়েদেরকে ক্ষমা করুন। কেননা আপনার ক্ষমা তো খুবই প্রসিদ্ধ।"

يَاخَيْرَ مَنْ مَرِحَتْ كُمْتُ الجِيَادِ بِهِ * عِنْدَ الهِيَاجِ اذَا مَا اسْتُوْقِدَ الشَّرَرُ

"আপনি এরূপ উত্তম ব্যক্তি যার আরোহণে কুমিত ঘোড়া (কাল মিশ্রিত লাল রং এর ঘোড়া) আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে, ঐ সময়, যখন যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে।"

انَّا نُؤَمِّلُ عَفْوًا مِنْكَ تُلْبِسُهُ * هٰذِى الْبَرِيَّةَ اذْ تَعْفُوا وَتَنْتَصِرُ

"আমরা আপনার নিকট এরূপ ক্ষমার আশা করছি যে, ক্ষমা ও সাহায্যের গুণাবলী আপনার মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে।"

فَاغْفِرْ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا انْتَ رَاهِبُهُ * يَوْمَ الْقِيَامَةِ اذْ يُهْدِى لَكَ الظَّفَرُ

"সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ আপনাকে কিয়ামতের বিপদাশংকা থেকে হিফাযত করবেন এবং আপনাকে সফলতা দান করবেন।"

কোন কোন রিওয়ায়াতে কিছু আরো অতিরিক্ত কবিতা রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখা যেতে পারে, (আর রওযুল উনুফ, ২ খ, পৃ. ৩০৬, উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ১৯৬, যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩)।

নবী (সা)-এর জবাব

নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি। তোমরা আগমন না করায় আমি মাল আসবাব এবং কয়েদীদেরকে বন্টন করে দিয়েছি। এখন দু'টির মধ্যে একটি গ্রহণ করতে পার। মাল ও আসবাব নিয়ে যাও অথবা পরিবারবর্গকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পার। প্রতিনিধি দল বললো, পরিবার-পরিজন আমাদের নিকট অধিক প্রিয়। রাসূল (সা) বললেন, আমার এবং গোত্র বনূ আবদুল মুত্তালিবের অংশ আমি তোমাদেরকে প্রদান করলাম। বাকী অন্যান্য মুসলমান যে অংশ পেয়েছে, তা পাওয়ার

জন্য আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করব। সুতরাং তিনি সুপারিশ করেন। সবাই আনন্দচিত্তে সমস্ত কয়েদী আযাদ করে দেন। দু'চারজন কিছুটা অনীহা প্রকাশ করেন। নবী (সা) তাদের বদলা প্রদান করে দেন। এভাবে প্রতিনিধি দল তাদের ছয়হাজার শিশু-কিশোর এবং নারীকে মুক্ত করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত ঘটনা গাযওয়ায়ে হুনায়নে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. সাকীফ প্রতিনিধি দল

৯ হিজরীর রমযান মাসে সাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ এবং রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এটা ঐ সাকীফ গোত্র যাদের দ্বারা রাসূল (সা) এবং সাহাবায়ে কিরাম তাফে অবরোধের সময় অত্যন্ত কষ্টভোগ করেন এবং তায়েফের দূর্গ বিজয় না করে ভগ্ন হৃদয়ে মদীনা ফিরে আসেন। নবী (সা) যখন অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে আসেন, তখন কোন একজন আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)-আপনি তাদের জন্য বদ্‌দু'আ করুন, তাদের তীর আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। নবী (সা) বলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِهْدِ ثَقِيْفًا وَاٰتِ بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ

"হে আল্লাহ সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং মুসলমান হিসেবে আমার নিকট প্রেরণ কর।" (তিরমিযী)।

নবী (সা)-এর দু'আ কবূল হয় এবং উরওয়া ইবন মাসঊদ সাকাফীর শাহাদাতের আট মাস পর এবং রাসূল (সা)-এর তাবূক থেকে ফিরে আসার পর মদীনা শরীফে হাযির হয়ে সাকীফ প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করে নবী (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। আব্‌দ ইয়ালীল-এর নেতৃত্বে ছয় ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল মদীনা রওয়ানা হয়। হয়ত তারা বিদ্রোহী ছিল অথবা জোশ ও জযবা ও ইসলামের আকর্ষণেই নবী করীম (সা)-কে দরবারে স্বইচ্ছায় হাযির হয়। ফলে তাদের আগমনে মুসলমানগণ অত্যন্ত আনন্দিত হন। হযরত মুগীরা ইবন শু'বা (রা) সর্বপ্রথম তাঁদেরকে দেখতে পান এবং সাথে সাথে রাসূল (সা)-কে অবহিত করার জন্য দ্রুত গমন করেন। পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হয়, সংবাদ অবহিত হয়ে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত মুগীরা ইবন শু'বাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি নবী (সা)-কে এ সুসংবাদ অবহিত করি। হযরত মুগীরা (রা) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) রাসূল (সা)-এর দরবারে গিয়ে এই প্রতিনিধি দলের আগমনের সুসংবাদ অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের অবস্থানের জন্য মসজিদে নব্বীতে এক বিশেষ তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়ে দেন, (যাতে পবিত্র কুরআন শ্রবণ করতে পারে এবং নামায ও মুসল্লীদেরকে দেখতে পারে)। তাদের সেবা

যত্নের দায়িত্ব খালিদ ইবন সাঈদ ইবনুল আ'স-এর উপর অর্পণ করেন। যতক্ষণ পর্যন্ত খালিদ ইবন সাঈদ ঐ খাদ্য থেকে না খেতেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিনিধি দলের লোকজন ঐ খাদ্য আহার করত না এবং নবী (সা)-এর নিকট প্রতিনিধি দলের যা কিছু বলার থাকত, তারা এটা খালিদ ইবন সাঈদের মাধ্যমে বলত। প্রতিনিধি দল খালিদের মাধ্যমে আশ্চর্যজনক শর্তাবলী পেশ করে।

১. তাদের জন্য নামায মওকুফ করে দিতে হবে।

২. লাত (যা তাদের বড় দেবতা)-কে তিন বছর পর্যন্ত ধ্বংস করা যাবে না। শিশু ও নারীরা এর উপর অত্যন্ত আসক্ত।

৩. আমাদের দেবতা স্বয়ং আমাদের হাতে ভাঙ্গা যাবে না।

নবী (সা) প্রথম দু'টি শর্ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ لاخير فى دين لاصلوة فيه (ঐ দ্বীনে কোন কল্যাণ নেই যাতে নামায নেই)। তৃতীয় শর্ত সম্পর্কে বলেন, এটা গ্রহণ করা যেতে পারে, অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং দেশে ফিরে যায়। ঐ প্রতিনিধি দলের মধ্যে উসমান ইবন আবুল আ'স সর্ব কনিষ্ঠ ছিল। তাকে আমীর ও হাকিম নিযুক্ত করা হয়। ইল্‌ম দ্বীন, কুরআন ও ইসলামী মাসায়েল শিক্ষার তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। ফলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইঙ্গিতে তাকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। তার সাথে আবূ সুফিয়ান ইবন হারব এবং মুগীরা ইবন শু'বা (রা)-কে লাত নামক দেবতা ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। আবূ সুফিয়ান কোন কারণে পিছনে থেকে যান। হযরত মুগীরা (রা) সেখানে গিয়ে দেবতার উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন। সাকীফ গোত্রের নারীগণ খোলা মাথা ও খোলা পায়ে এ দৃশ্য দেখার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে পড়ে। মুগীরা (রা) দেবতা ভেঙ্গে ফেলেন এবং মন্দিরে যে মাল-আসবাব ও অলংকার ছিল, সমস্ত নিয়ে আসেন। প্রথমত ঐ সম্পদ থেকে উরওয়া ইবন মাসঊদ সাকাফীর পুত্র আবূ ফালীহ এবং উরওয়ার ভাতিজা কারিব ইবন আসওয়াদ-এর ঋণ পরিশোধ করেন। অবশিষ্ট মালামাল রাসূল (সা) খেদমতে হাযির করেন। নবী (সা) তখনই ঐ মাল মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন যে, তিনি তাঁর সাহায্য করেছেন, স্বীয় নবীকে মর্যাদা দান করেছেন। উরওয়া ইবন মাসঊদের শাহাদাতের পর তায়েফের বাসিন্দাগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন সাকীফ প্রতিনিধি দলের উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আবূ ফালীহ ইবন উরওয়া এবং কারিব ইবন আসওয়াদ নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! লাত দেবতার মন্দির থেকে প্রাপ্ত মাল হতে আমাদের পিতা উরওয়া ও আসওয়াদের ঋণ পরিশোধ করে দিন। উরওয়া ও আসওয়াদ ছিল সহোদর ভাই। উরওয়া ইসলাম গ্রহণের পর শাহাদাত বরণ করেন। আবূ ফলীহ হলেন উরওয়ার পুত্র এবং আসওয়াদ কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কারিব

হলো আসওয়াদের পুত্র। তারা উভয়ে তাদের পিতার ঋণ আদায়ের আবেদন করেন। নবী (সা) বললেন, আসওয়াদ মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, কারিব ইবন আসওয়াদ বলেন, নিঃসন্দেহে সে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু ঋণ আদায়ের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। নবী (সা) আবূ সুফিয়ানকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, লাত দেবতার মন্দির থেকে প্রাপ্ত মালামাল থেকে আবূ ফালীহ এবং কারিব ইবন আসওয়াদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা কর।[১]

৩. বনূ আমির ইবন সা'সা গোত্রের প্রতিনিধি দল

তাবূক থেকে ফিরে আসার পর বনূ আমির ইবন সা'সার প্রতিনিধি দল নবী (সা) এর খেদমতে হাযির হয়। এই দলে আমির ইবন তুফায়ল এবং ইরবাদ ইবন কায়সও ছিল। কথাবার্তার সময় তারা রাসূল (সা)-কে এভাবে সম্বোধন করে اَنْتَ سَيِّدُنَا (আপনি আমাদের সরদার বা নেতা)। নবী (সা) বললেন, তোমরা নিজের কথা বলো। শয়তান যেন তোমাদের সাথে ঠাট্টা করতে না পারে। সরদার হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। প্রকাশ্যে তারা সুমিষ্ট বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু গোপনে আমির ইরবাদকে এই পরামর্শ দান করে যে, যখন আমি মুহাম্মদকে কথার মধ্যে নিমগ্ন করে ফেলব, তখন তুমি খুব দ্রুত তলোয়ার দ্বারা তাঁর কাজ শেষ করবে (অর্থাৎ হত্যা করবে)।

আমীর রাসূল (সা)-এর সাথে কথা আরম্ভ করে বলে, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আমাকে আপনার বিশেষ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করুন। নবী (সা) বললেন, কখনো নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এক আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন না করবে। আমীর বললো, যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই তা হলে আপনি আমাকে কি প্রদান করবেন? নবী (সা) বললেন, ইসলাম গ্রহণের পর অন্যান্য মুসলমানদের মতই তোমার অধিকার ও বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে। আমীর বললো, আপনার পর হুকুমত ও খিলাফত আমাকে দান করবেন। রাসূল (সা) বললেন, কখনো নয়। আমীর বললো, আচ্ছা মরুভূমি এলাকা আপনি শাসন করুন এবং শহর ও আবাদি এলাকার শাসনভার আমাকে প্রদান করুন, নতুবা আমি গাতফান গোত্রের লোকজন নিয়ে আপনার উপর আক্রমণ করব এবং মদীনা আরোহী ও পদাতিক দিয়ে ভর্তি করে দিব।

নবী (সা) বললেন, আল্লাহ তোমাকে এ ক্ষমতা দিবেন না কথা শেষ হওয়ার পর যখন উভয়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন নবী (সা) দু'আ করেন, হে আল্লাহ! আমীর ইবন তুফায়লের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং তার কাওমকে হিদায়াত দান কর। বাইরে আমীর ইরবাদকে বললো, আফসোস! আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু তুমি কোন শব্দই করলে না! ইরবাদ বললো, আমি যখনই তলোয়ার কোষমুক্ত করেছি তখনই কিছু একটা দৃষ্টিগোচর হতো। একবার লোহার প্রাচীর, আর একবার এক উট দৃষ্টিগোচর হয় যা আমার মাথা গিলে ফেলার উপক্রম করে।

---

১. যারকানী, ৪ খ., পৃ. ৫-৬

এই প্রতিনিধে দল যখন রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে ফিরে যায়, তখন আমীর ইবন তুফায়ল পথে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। আরবে যেহেতু বিছানার উপর মৃত্যু হওয়া অসম্মানজনক মনে করা হয়, ফলে আমীর বললো, আমাকে ঘোড়ার উপর বসিয়ে দাও। ঘোড়ার উপর আরোহণ করে হাতে বর্শা নিয়ে বললো, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমার নিকট এসো। এটা বলতে বলতে সে ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকিয়ে পড়ে। ঐ স্থানেই তাকে দাফন করা হয়। প্রতিনিধিদল যখন বনূ আমীরের এলাকায় পৌঁছে, তখন লোকজন ইরবাদের নিকট অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে। ইরবাদ জবাবে বলে, নবী (সা)-এর দ্বীন খুবই খারাপ। আল্লাহর শপথ! যদি ঐ ব্যক্তি (নবীজীর দিকে ইঙ্গিত করে) এ মুহূর্তে আমার সামনে থাকত, তাহলে আমি তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করতাম। দু'দিন পর সে উটে আরোহণ করে বের হয়। হঠাৎ আকাশ থেকে তার উপর বিদ্যুৎ পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আমীর ও ইরবাদ এমনই দুর্ভাগ্য যে, ইসলাম গ্রহণ না করে ফিরে আসে। কিন্তু প্রতিনিধি দলের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করে বাড়ি ফিরে আসে।[১]

৪. আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল

আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল বাহরাইনের বাসিন্দা ছিল। এ গোত্র ছিল অত্যন্ত বিশাল। এ গোত্রের প্রতিনিধি দল দু'বার নবী (সা)-এর খেদমতে আগমন করেছিল। প্রথমত, মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৫ম হিজরী অথবা এর পূর্বে আগমন করেছিল। এ সময় প্রতিনিধি দলে তের বা চৌদ্দ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাসূল (সা) তাদের উদ্দেশ্য বলেন, مرحبا بالقوم غير خزايا ولاندامى (মুবারকবাদ এই কাওমকে যারা অপদস্থ হবে না, লজ্জিতও হবে না। অর্থাৎ স্বইচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, যুদ্ধ করে মুসলমান হয়নি, যার ফলে তাদের অপদস্থ ও লজ্জিত হতে হত)।

প্রতিনিধি দল আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ও আপনাদের মধ্যে মুযির গোত্রের কাফির সম্প্রদায় প্রতিবন্ধক রয়েছে। শুধু হারাম মাস (৪টি)-সমূহে আমরা আপনার খেদমতে হাযির হতে পারি, যে মাসে আরবগণ লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড হারাম মনে করে। কাজেই আপনি আমাদেরকে কিছু পূর্ণাঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত আমল শিক্ষা দিন, যা আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব এবং শহরবাসীকেও আমরা দাওয়াত প্রদান করতে পারব। নবী (সা) ইরশাদ করেন, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর এবং সাক্ষী প্রদান কর যে, আল্লাহ এক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নামায আদায় কর, যাকাত দান কর, গনীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য রেখে দাও। এছাড়া চারটি বস্তু ব্যবহার করা নিষেধ করেছেন। এগুলো হলো-দুব্বা

১. যাদুল মা'আদ। ৩ খ. পৃ. ২৯।

(লাউয়ের শুষ্ক খোল), নাকীর (কাষ্ঠ নির্মিত পাত্র), হানতাম (তৈল মালিশ করা সবুজ রঙের কলসী) এবং মুযাফ্ফাত (মেটে তৈল মালিশ করা মাটির পাত্র)। (সহীহ বুখারী)

মুসনাদে আহমাদ এবং আবু দাঊদের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যখন এই প্রতিনিধি দল মদীনায় পৌছে, তখন নবী করীম (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের তীব্র আকাঙ্খায় এ সমস্ত লোক সাওয়ারী থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং নবী (সা)-এর খেদমতে দ্রুত হাযির হয়ে পবিত্র হাতে চুমু দেয়। এই দলে আশাজ্জ আবদুল কায়সও ছিলেন, তাঁর নাম ছিল মুনযির। তিনি ছিলেন সবচেয়ে কম বয়স্ক । তিনি সেখানে পৌছার পর প্রথমত, সমস্ত উট বাঁধলেন এবং সমস্ত সামান এক স্থানে জমা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর থলে থেকে দু'টি পরিষ্কার সাদা কাপড় বের করে তা পরিধান করে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে প্রথমত তাঁর সাথে মুসাফাহা করেন এবং নবী (সা)-এর পবিত্র হাতে চুমা দেন। নবী করীম (সা) বললেন, তোমার মধ্যে এমন দু'টি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল পসন্দ করেন। একটি ধৈর্যশীলতা অপরটি ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য। আশাজ্জ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ দু'টি গুণ কি আমার মধ্যে কৃত্রিম? অথবা প্রকৃতিগত রাসূল (সা) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এই গুণ ও স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন। আশাজ্জ বললেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি আমাকে এমন দু'টি গুণ দান করেছেন, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা) পসন্দ করেন।

এটা ছিল প্রথমবারের ঘটনা। ৮ম অথবা ৯ম হিজরীতে আবদুল কায়স প্রতিনিধি দল চল্লিশ ব্যক্তির সমন্বয়ে দ্বিতীয়বার নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিল। সহীহ ইবন হিব্বানের রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। তিনি তখন বলেছিলেন ঃ مالی اری الوانکم تغیرت। কি হয়েছে যে, আমি তোমাদের রং পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। যার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত লোক প্রথমবারও আগমন করেছিল।[১]

৫. বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল (৯ হিজরী)

৯ হিজরীতে বনূ হানীফার এক প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই দলে অত্যন্ত চতুর ও ফিতনাবাজ মুসায়লামা কায্যাব ছিল। কিন্তু অহংকারের কারণে সে নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়নি। স্বয়ং রাসূল (সা) সাবিত ইবন কায়স ইবন শাম্মাসকে সাথে নিয়ে তার নিকট গমন করেন। মুসায়লামা বলে, যদি আপনি আমাকে খিলাফত দান করেন এবং আপনার পর আমাকে আপনার প্রতিনিধি মনোনীত করেন, তাহলে আমি বায়'আতের জন্য প্রস্তুত আছি। রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে তখন খেজুরের এক ছড়ি ছিল। তিনি বলেন, যদি তুমি এই ছড়িটিও চাও তবুও তোমাকে তা দেব না। আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তুমি এর

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৬৭; যারকানী, ৪ খ, পৃ. ১৩

থেকে সামান্য পরিমাণ অতিক্রম করতে পারবে না। খুব সম্ভব তুমিই ঐ ব্যক্তি যা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এবং এই সাবিত ইবন কায়স তোমার জবাব দেবে। এটা বলে তিনি (সা) ফিরে আসেন।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (সা)-কে স্বপ্নে কি দেখানো হয়েছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই যে, আমার হাতে স্বর্ণের দু'টি চিরুনী রাখা হয়েছে। যার ফলে আমি একটু ভয় পেয়ে যাই। স্বপ্নেই আমাকে বলা হয় যে, এতে ফুঁ দাও। আমি ফুঁ দেয়ার সাথে সাথেই তা উড়ে গেল। এর ব্যাখ্যা হলো এই যে দু'জন মিথ্যাবাদী প্রকাশ হবে। এ দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যাবাদী হলো মুসায়লামা[১] আর অপরজন হলো আসওয়াদ আনসী।[২] আসওয়াদ আনসী হুযুরের জীবিত কালেই নিহত হয় এবং মুসায়লামা কায্যাব হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতকালে নিহত হয়।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ৩

---

১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবার থেকে ফিরে যাওয়ার পর মুসায়লামা নবুওয়াতের দাবি করে এবং লোকজনের নিকট মিথ্যা বলে যে, নবী (সা) আমাকে তাঁর অংশীদার করে নিয়েছেন।

২. আসওয়াদ আনসী যখন নবুওয়াতের দাবি করে তখন নবী (সা) ফিরোয দায়লামী (রা)-কে কয়েকজন অশ্বারোহী সহ তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন এবং মৃত্যু রোগের সময় তার হত্যার সংবাদ পৌঁছে। আবদুর রহমান সুমালী এ বিষয়ে নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

لعمرى وماعمرى على بهلين * لقد جرعت عنس لقتل الاسود

"আমার জীবনের শপথ এবং আমার শপথ সাধারণ শপথ নয়। আনস গোত্র আসাওয়াদ আনসীর হত্যায় ভীত হয়ে পড়েছে।"

وقال رسول الله سيروا لقتله * على خير موعود واسعد اسعد

"রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গমন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং উত্তম ওয়াদা ও সৌভাগ্যের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।"

فسرنا اليه فى فوارس بهمة * على حين امر من وصاة محمد ـ

"অতঃপর আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নির্দেশ ও ওসীয়্যত অনুযায়ী তাকে (আসওয়াদ আনসী (রা)-কে হত্যার জন্য রওয়ানা হয়ে যাই।"

হযরত উরওয়া (রা) বলেন, নবী (সা)-এর ওফাতের একদিন ও এক রাত পূর্বে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়। ঐ সময়ই রাসূলকে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ অবহিত করা হয়। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর হযরত আবূ বকর (রা) যখন খলীফা মনোনীত হন তখন দূত এ সংবাদ নিয়ে আসে। কেউ কেউ বলেন, নবী (সা)-এর দাফনের দিন দূত এ সংবাদ নিয়ে আগমন করে। (ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৭৩)

৩. ফাতহুল বারী, ৮ খ. পৃ. ৭০; যারকানী, ৪খ, পৃ. ১৯।

অতঃপর ১০ম হিজরীতে মুসায়লামা কাযযাব নবী (সা)-এর নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখে প্রেরণ করে ঃ

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله أما بعد فانى قد أشركت معك فى الامر وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا لاينصفون والسلام ـ

" আল্লাহর রাসূল মুসায়লামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নিকট আমাকে আপনার কাজের সাথে শরীক করা হয়েছে। অর্ধেক যমীন আমার জন্য, আর অর্ধেক যমীন কুরায়শদের জন্য। কিন্তু কুরায়শগণ ইনসাফ করে না, ওয়াসসালাম।

নবী (সা) উক্ত পত্রের জবাবে লিখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فالسلام على من اتبع الهدى فان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ـ

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুসায়লামা কাযযাবের নিকট যারা হিদায়তের অনুসরণ করে, তাদের উপর সালাম। নিশ্চয়ই যমীন আল্লাহর, স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে দান করেন। উত্তম পরিণতি তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।"

এ ঘটনা বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর সংঘটিত হয়।[১]

৬. তায় প্রতিনিধি দল

তায় গোত্রের পনের ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ১০ম হিজরীতে রাসূল (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের নেতা ছিল যায়দুল খায়ল (زيد الخيل)। নবী (সা) তাদের নিকট ইসলাম পেশ করেন। সবাই আনন্দ চিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে এবং যায়দুল খায়ল-এর নাম যায়দুল খায়র রাখেন। সে এটা বলে যে, আরবের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির আমি প্রশংসা শুনেছি একমাত্র আপনাকে ব্যতীত আর সবাইকে এর চেয়েও কম পেয়েছি।[২]

৭. কিনদাহ্ প্রতিনিধি দল

কিনদাহ্ ইয়ামনের একটি গোত্রের নাম। ১০ম হিজরীতে আশিজন অশ্বারোহীর একটি প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের নেতা ছিল

---

১. ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ১৪৫

২. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৩৬

আশ'আস[১] ইবন কায়স। যখন তারা রাসূল (সা) দরবারে হাযির হয় তখন তারা সানজাফ রেশমের জুব্বা পরিহিত ছিল। নবী (সা) বললেন, তোমরা কি মুসলমান নও? তারা আরয করলো, নিঃসন্দেহে আমরা মুসলমান। রাসূল (সা) বলেন, তাহলে তোমাদের গর্দানে এই রেশমের বস্ত্র কেন? তৎক্ষণাৎ তারা ঐ সমস্ত পোশাক ছিঁড়ে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়।

মাসয়ালা ঃ সানজাফ (রেশম) যদি অল্প পরিমাণ হয়, যেমন চার অঙ্গুলী পরিমাণ ব্যবহার জায়িয আছে। স্বয়ং নবী করীম (সা), হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ফারূকে আযম (রা) থেকে এটা পরিধান করার দলীল রয়েছে। খুব সম্ভব ঘটনার সময় সানজাফ রেশমের পরিমাণ পরিমাণের চেয়ে অধিক ছিল।, ফলে এটা ব্যবহারে নিষেধ করেন।[২]

৮. আশ'আরীঈন প্রতিনিধি দল

আশ'আরীঈন ইয়ামানের একটি মর্যাদাবান ও বিরাট গোত্র। তারা তাদের প্রপিতামহসহ ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের দিকে নিজদেরকে সম্বন্ধ করে থাকে। আশ'আর (اشعر)-কে এ জন্য আশ'আর বলা হয় যে, যখন তারা ভূমিষ্ট হয়, তখন তাদের দেহে অনেক লোম হয়ে থাকে এবং আশ'আর সিফাতের সিগাহ, شعر এর অর্থ অসংখ্য লোম। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ছিলেন এই গোত্রের। এ সমস্ত লোক অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই পংক্তিপাঠ করতে করতে রওয়ানা হয় ঃ

غدا نلقى الاحبه * محمد او جف به

"আগামীকাল আমরা বন্ধুর সাথে মিলিত হব অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা) তার দলের সাথে।"

এ দিকে নবী (সা) এ সংবাদ প্রদান করেন যে, একটি দল আগমন করেছে যাদের অন্তর অত্যন্ত নরম। ইতোমধ্যে আশ'আরীঈন দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে এসে পৌঁছে। তিনি সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইয়ামনের বাসিন্দাগণ আগমন করেছে যাদের অন্তর অত্যন্ত নরম ও কোমল (অর্থাৎ কঠোরতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র), দ্রুত সত্যকে গ্রহণ করে। এমন কঠোর নয় যে, কোন উপদেশ ও হিকমতের তাদের উপর প্রতিক্রিয়া না হয়। তাদের অন্তর কোমল হওয়ার ফল হলো এই যে, তাদের অন্তর ঈমান ও ইরফানের খনি এবং ইল্‌ম ও হিকমতের উৎস হয়ে দাঁড়ালো। নবী করীম (সা) সত্য বলেছেন, কোমল অন্তর সমস্ত কল্যাণের উৎস এবং অন্তরের কঠোরতা সমস্ত অনিষ্টতার মূল।

১. আশ'আস ইবন কায়স রাসূল (সা)-এর ওফাতের পর মুরতাদ হয়ে যায় কিন্তু হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) হাতে তাওবা করে ফিরে আসে এবং কাদেসীয়া, মাদায়ন, জলুলা এবং নাহাওন্দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। ৪০ অথবা ৪২ হিজরীতে কূফায় ইনতিকাল করেন। (উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৪২)

২. যাদুল মা'আদ ৩ খ, পৃ. ৩৪।

যেহেতু ইয়ামনের বাসিন্দাগণ অধিকাংশ বকরী চরাত, তাই রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন, শান্তি ও বিনয় বকরীওয়ালাদের মধ্যে এবং গৌরব ও অহংকার উট পালনকারীদের মধ্যে বিরাজমান। অতঃপর পূর্বদিকে ইশারা করেন।

প্রতিনিধি দল আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দীনের জ্ঞান হাসিল করাও বিশ্ব জগতের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। নবী (সা) বলেন, সর্ব প্রথম আল্লাহ ব্যতীত কেউ ছিল না এবং তাঁর আরশ পানির উপর ছিল অর্থাৎ পৃথিবীর[১] সৃষ্টির সূচনা পানি ও আরশ থেকে হয়েছে। প্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশ, অতঃপর আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন এবং সমস্ত কিছু লোওহ্ মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

টিকা ঃ ইবন আসাকির বলেন, তাওহীদ ও দ্বীনের মূলনীতি, দুনিয়া সৃষ্টি সম্পর্কে কথা বলা দর্শন ও যুক্তি নিয়ে গবেষণা করা আশ্‌'আরী গোত্রের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে অব্যাহত চলে আসছে। এটি ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর [তিনি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বংশধর ছিলেন] যুগে খুব বেশি প্রসারিত হয়েছিল। ইলম কালামে আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যে তাঁকে নেতা হিসেবে গণ্য করা হয়।[২]

৯. ইয্দ গোত্রের প্রনিনিধি দল

ইয্দ গোত্রের পনের ব্যক্তি সূরাদ ইবন আবদুল্লাহর নেতৃত্বে নবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) সুরাদ ইবন আবদুল্লাহকে আমীর নিযুক্ত করেন এবং আশেপাশের এলাকার মুশরিকদের সাথে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন। সূরাদ মুসলমানদের একটি দল নিয়ে জরশ শহর অবরোধ করেন। এভাবে যখন এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও শহর বিজয় হয়নি, তখন সূরাদ অবরোধ পরিত্যাগ করে ফিরে আসেন। জরশের বাসিন্দারা তাদের ফিরে আসাকে পরাজয় মনে করে পশ্চাদ্বাবণ করে। যখন তারা জাবালে শকরের নিকট পৌঁছে, তখন মুসলমানগণ ঘুরে তাদের উপর আক্রমণ করে, ফলে জরশবাসী পরাজয় বরণ করে।

জরশবাসী ইতিপূর্বে প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দু'ব্যক্তিকে মদীনা প্রেরণ করেছিল। নবী (সা) তাদেরকে ঐ দিনই জাবালে শকরের ঘটনা অবহিত করেন, যে দিন তারা পরাজয় বরণ করে। যখন তারা ফিরে আসে, তখন তারা তাদের গোত্রের লোকদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর জরশ গোত্রের একটি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে।[৩]

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য বুখারী ও ফাতহুল বারী باب بدء الخلق এবং হাফিয ইবন আসীরের 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দেখা যেতে পারে।

২. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৭৫

৩. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৩।

১০. বনূ হারিস প্রতিনিধি দল

বনী হারিস ছিল নজরানের একটি মর্যাদাবান গোত্র। ১০ম হিজরীর রবিউস সানী অথবা জুমাদাল উলা মাসে নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে এ নির্দেশ প্রদান করে তাদের নিকট প্রেরণ করেন যে, তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে। এরপরও যদি তা গ্রহণ না করে তাহলে যুদ্ধ করবে। তারা সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত দানের উদ্দেশ্যে মুবাল্লিগ প্রেরণ করেন। সর্বত্র কোন যুদ্ধ ব্যতীতই লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) এ সুসংবাদ লিখে রাসূল (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। নবী (সা) ঐ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনা আসার জন্য খালিদ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত খালিদ (রা) তাদের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে রাসূল খেদমতে উপস্থিত হন। এই দলে ছিল কায়স ইবন হুসায়ন, ইয়াযীদ ইবন মাহজাল এবং শাদ্দাদ ইবন আবদুল্লাহ। যখন এ সমস্ত লোক রাসূল খেদমতে উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন: من هؤلاء القوم الذيْن كانهم رجال الهند

"(এ সমস্ত লোক কোন গোত্রের, সম্ভবত তারা হিন্দুস্থানের)।"

তারা আরয করলো, আমরা হলাম বনূ হারিস। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। যেহেতু তারা বীর বাহাদুর ছিল এবং যে কোন মুকাবিলায় তারা জয়ী হতো। তাই রাসূল (সা) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কিভাবে মানুষের উপর জয় লাভ কর। তারা আরয করলো, আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ থাকি, পরস্পর মতানৈক্য করি না, পরস্পরে হিংসা করি না, কারো উপর অগ্রগামী হয়ে যুলম করি না, বিপদ ও দরিদ্রতার সময় ধৈর্যধারণ করি। নবী (সা) বললেন, তোমরা সত্য বলেছ এবং কায়স ইবন হুসায়নকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাদের চলে যাওয়ার পর আমর ইবন হাযমকে তা'লীম প্রদান করে সাদাকা আদায়ের জন্য এ গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। এবং সাদাকা ও যাকাতের আহকাম লিখে তাঁকে প্রদান করেন।

এ প্রতিনিধি দল শাওয়াল অথবা যিলকা'দ মাসে তাদের গোত্রের নিকট ফিরে যায়। তাদের ফিরে যাওয়ার চার মাসের মধ্যে নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন।[১]

১১. হামদান প্রতিনিধি দল

হামদান হলো ইয়ামনের এক বিরাট গোত্র। নবী (সা) প্রথমত, খালিদ (রা) -কে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে ছ'মাস অবস্থান করেন কিন্তু কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। অতঃপর রাসূল (সা) হযরত আলী (রা)-কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পর্যায়ের পত্র দিয়ে প্রেরণ করেন এবং খালিদ

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩২।

(রা)-কে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত আলী (রা) সেখানে গমন করে সবাইকে একত্রিত এবং নবী (সা)-এর পত্র পাঠ করে শুনালেন, ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এক দিনেই সমস্ত লোক ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা) পত্রের মাধ্যমে রাসূল (সা)-কে এ ঘটনা অবহিত করেন। এ সংবাদ শুনে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সিজ্‌দা আদায় করেন এবং আনন্দে কয়েকবার বলেন ঃ السلام على همدان (হামদান গোত্রের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) সহীহ্ সনদে হযরত বারা'আ ইবন আযিব (রা) থেকে বায়হাকী এ রিওয়ায়াত করেন।

এটা ছিল ৮ হিজরীর ঘটনা, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) তায়েফ থেকে ফিরে আসেন। এর এক বছর পর যখন রাসূল (সা) তাবূক থেকে ফিরে আসনে, ঐ সময় হামদানের একটি প্রতিনিধি দল মদীনা পৌঁছে। তাদের পরিধানে ছিল ইয়ামনের নকশী করা চাদর আদনের পাগড়ী এবং মোহরকৃত উটে আরোহণ করে অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়। এরূপ সহীহ ও বাক্যালংকারের সাথে রাসূল সাথে আলাপ করেন, যার ফলে তারা যে আবেদন করে, নবী (সা) তা মঞ্জুর করেন এবং একটি পত্র লিখিয়ে দেন। এরপর প্রতিনিধি দলের সদস্য মালিক ইবন নমতকে সেখানের আমীর নিযুক্ত করেন। এটা হলো ইবন হিশামের রিওয়ায়াত। এর সনদ দুর্বল। হাসান ইবন ইয়াকূব হামদানী উল্লেখ করেন যে, ঐ প্রতিনিধি দলে একশ বিশজন ছিল।[১]

১২. মুযায়না প্রতিনিধি দল

৫ হিজরীতে মুযায়না গোত্রের চার'শ লোক নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। যাওয়ার সময় রাসূল (সা)-এর নিকট এই আবেদন করে যে, আমাদের কাছে কোন খাদ্য দ্রব্য নেই, আমাদেরকে কিছু খাদ্য দান করুন। নবী করীম (সা) হযরত উমর (রা)-কে বললেন, তাদেরকে কিছু খাদ্য দ্রব্য ও পথ খরচ দিয়ে দাও উমর (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট এত অধিক পরিমাণ খেজুর নেই যা তাদেরকে চাহিদা অনুযায়ী দেয়া যাবে। রাসূল (সা) বললেন, যাও, তাদেরকে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে দাও। হযরত উমর (রা) তাদেরকে স্বীয় ঘরে নিয়ে যান। সবাই তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী খেজুর নিয়ে যায় এবং এর মধ্যে একটি খেজুরও কম হয়নি। (আহমাদ, তাবারানী ও বায়হাকী)।

কাসীর ইবন আবদুল্লাহ আল-মুযানী স্বীয় পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে রিওয়ায়াত করেন, সর্বপ্রথম মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল (সা)-এর খেদমতে আগমন করেন। এ দলে চার'শ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিল। হাফিয ইরাকী বলেন ঃ

اولّ وفدٍ وذل والمدينة * سنة خمس وفدوامزينة -

---

১. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৭০।

"সর্বপ্রথম মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দল মদীনা আগমন করে। এ দল ৫ম হিজরীতে মদীনায় আসে।"

১৩. দাওস প্রতিনিধি দল

৭ হিজরীতে দাওস গোত্রের সত্তর/আশিজন লোক খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে আগমন করে। বিস্তারিত তুফায়ল ইবন আম্র দাওসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। (যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৩৭)

১৪. নজরানের নাসারাদের প্রতিনিধি দল

নজরান ইয়ামনের একটি বিরাট শহর। মক্কা মুকাররমা থেকে সাত মনযিল দূরে অবস্থিত। ৭৩টি ছোট শহর ও গ্রাম নিয়ে এ শহর গঠিত। সর্ব প্রথম নজরান ইবন যায়দ ইবন ইয়াশজাব ইবন ইয়ারাব ইবন কাহ্তান এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তার নামেই এ শহরের নাম নজরান হিসেবে আখ্যায়িত হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা বুরূজে যে قُتِلَ اَصْحَابُ الْاُخْدُوْد উল্লেখ রয়েছে, ঐ এলাকা নজরানের কোন শহর বা গ্রামে অবস্থিত।[১]

নবম[২] হিজরীতে ৬০ ব্যক্তির সমন্বয়ে নজরানের খ্রিষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল (সা) খেদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিল ১৪ জন। প্রতিনিধি দলের আমীর ও নেতা ছিলেন আবদুল মাসীহ[৩] আকিব। সাইয়্যেদ[৪] আয়হাম ছিলেন পরামর্শদাতার মন্ত্রীর ন্যায় এবং দলের ব্যবস্থাপনাকারী। আবু হারিসা ইবন আলকামা ছিলেন তাদের পাদ্রী, যাকে হাব্র ও আসকাফ বলা হতো। আবূ হারিসা মূলত আরবের বকর ইবন ওয়ায়েল গোত্রের ছিল। কিন্তু সে খ্রিস্টান হয়ে যায়। রোমের বাদশাহ তার ইলম ও ফযীলত এবং ধর্মীয় যোগ্যতা ও দৃঢ়তার কারণে তাকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত এবং তাকে বিরাট জায়গীর দান করেন। সাথে সাথে গীর্জার নেতা নিযুক্ত করেন। এ প্রতিনিধি দল অত্যন্ত শান-শওকতের সাথে মদীনা পৌছে। নবী করীম (সা) তাদেরকে মসজিদে নব্বীতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। আসর নামাযের সময় হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর যখন তাদের নামাযের সময় হয় তখন তারা নামায পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। সাহাবাগণ বাধা প্রদান করেন কিন্তু রাসূল (সা) বললেন, তাদেরকে নামায পড়তে দাও। অতঃপর তারা পূর্বদিকে মুখ করে নামায আদায় করে। এখানে অবস্থানের সময় বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাদের সাথে বেশ কিছু আলোচনা হয় (ফাতহুল বারী, কিস্সায়ে আহলি নজরান ,৮ খ, পৃ.৭৩; শারহে মাওয়াহিব, ৪, পৃ. ৪১)।

---

১. শারহে মাওয়াহিব, ৪ খ, পৃ. ৪১।

২. এ বর্ণনা ইবন সা'দের, ৭ খ, পৃ.৭৪।

৩. আবদুল মাসীহ হলো নাম, উপাধি হলো আকিব। আয়হাম হলো নাম, অন্যান্যগুলো হলো উপাধি।

সর্বপ্রথম হযরত ঈসা (আ)-এর ঈশ্বরত্ব ও পুত্র হওয়ার ব্যাপারে বিতর্ক ও কথাবার্তা শুরু হয়।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ যদি হযরত মাসীহ (আ) ইবনুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র না হন তা হলে তাঁর পিতা কে?

নবী (সা) ঃ তোমাদের এটা ভালভাবে জানা আছে যে, পুত্র পিতার সাদৃশ হয়ে থাকে।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ কেন হবে না, নিশ্চয়ই এরূপই হয়ে থাকে।

ফল হলো এই যে, যদি হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র হন তাহলে আল্লাহর সদৃশ হতে হবে। অথচ সবাই এটা অবগত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হলেন উপমাবিহীন।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ – وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ

"(তাঁর কোন উপমা নেই এবং তাঁর কোন সমকক্ষও নেই)"।

নবী (সা) ঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ حى لايموت অর্থাৎ তিনি জীবিত, কখনো তাঁর উপর মৃত্যু আসবে না। وان عيسى يأتى عليه الفناء অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) উপর মৃত্যু এবং লয় ও বিলুপ্তি আসবে।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে এটা সঠিক।

সতর্কবাণী ঃ নবী (সা) এর এ জবাবের দ্বারা (ان عيسى يأتى عليه الفناء) স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা (আ) এখনো জীবিত ইন্‌তিকাল হয়নি। ভবিষ্যতে তিনি ইনতিকাল করবেন, অন্যথায় খ্রিস্টানদের আকীদা অনুযায়ী অভিযোগ হিসেবে এ জবাব দেয়া যেত যে, তোমাদের ধারণা ও আকীদা অনুযায়ী নিহত ও শূলীতে চড়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবেন? যেহেতু হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র মুখ থেকে এমন কোন বাক্য বা অক্ষর বের হতে পারে না যা সত্য ও বাস্তবতা বিরোধী, সুতরাং জবাবে তিনি এটাই বলেছেন যা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব। আর তা হলো, হযরত ঈসা (আ)-এর উপর ভবিষ্যত মৃত্যু আসবে। এখনো তাঁর উপর মৃত্যু আগমন করেনি, বরং তিনি জীবিত।

নবী (সা) ঃ তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, আমাদের প্রতিপালক প্রতিটি বস্তু প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় রাখেন, তিনিই সমস্ত বিশ্ব জগতের হিফাযতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। সবার রিযিকদাতা, এগুলো মধ্যে হযরত ঈসা (আ) কি কোন বস্তুর মালিক?

নজরানের খ্রিস্টান ঃ- না।

নবী (সা) ঃ তোমরা ভালভাবেই অবগত রয়েছ যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অভিপ্রায় অনুযায়ী মায়ের গর্ভে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের এটাও জানা আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পানাহার করেন না এবং না তাঁর মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিশ্চয়ই।

নবী (সা) ঃ তোমাদের ভালভাবেই জানা আছে যে, হযরত মরিয়াম (আ) অন্যান্য নারীদের মত হযরত ঈসা (আ)-কে জন্য গর্ভে ধারণ করেন এবং মরিয়ম সিদ্দীকা তাঁকে এমনিভাবে ভূমিষ্ট করেন, যেভাবে অন্যান্য নারী সন্তান প্রসব করে। অতঃপর অন্যান্য শিশুদের মত তাকে খাদ্য দেয়া হয়েছে, তিনি পানাহার করতেন, মলমূত্র ত্যাগ করতেন।

নজরানের খ্রিস্টান ঃ নিঃসন্দেহে তিনি এরূপেই ছিলেন।

নবী (সা) ঃ তা হলে এর পরও তিনি কিভাবে আল্লাহ হবেন? অর্থাৎ যার জন্ম ও আকৃতি মায়ের গর্ভে হয়েছে, জন্মের পর তাঁর খাদ্যের এবং মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে তিনি আল্লাহ হবেন কিভাবে?

নজরানের খ্রিস্টান সত্য বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সত্য অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেনঃ

الٓـمٓ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ - نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ - اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ - وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ - اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ - هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আলিফ-লাম-মীম। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা মা'বূদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সবকিছুর ধারক-বাহক। তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন সত্যতার সাথে, যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল, এ কিতাবের পূর্বে মানুষের হিদায়াতের জন্য এবং নাযিল করেছেন ফুরকান (পার্থক্য বা মীমাংসাকারী) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনি সেই আল্লাহ যিনি তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী মায়ের গর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১-৬)

এ সমস্ত বিতর্ক তাফসীরে দূররে মনসূর, ২ খ, পৃ. ৩, ইবন জারীর ও ইবন আবি হাতিমের সূত্রে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

নবী (সা) নজরানের খ্রিস্টানদের নিকট ইসলাম পেশ করেন। তারা বলে, আমরা তো প্রথম থেকেই মুসলমান। রাসূল (সা) বললেন, তোমাদের ইসলাম কিভাবে সঠিক

হতে পারে, যেখানে তোমরা আল্লাহর পুত্র থাকার কথা ঘোষণা ও দাবি করছ, ক্রুশের পূজা করছ এবং শূকর ভক্ষণ করছ। খ্রিস্টানগণ বললো, আপনি তো হযরত মাসীহ্কে আল্লাহর বান্দা বলেন। আপনি কি মাসীহ্ এর মত কাউকে দেখেছেন অথবা এরূপ ঘটনা শুনেছেন?

এতে এ আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ - ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَاتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ - فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ - ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো। তিনি তাকে মাটি দিয়ে তৈরি করেন। অতঃপর তাঁকে বলেন, হয়ে যাও, সাথে সাথে হয়ে গেলেন। তোমার পালনকর্তার কথাই হলো যথার্থ ও সত্য। সুতরাং তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। অতঃপর তোমার নিকট সত্য সংবাদ এসে যাওয়ার পর যদি এই বিষয় সম্পর্কে তোমার সাথে কেউ বিবাদ করে, তা হলে বল, এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের স্ত্রীদের এবং তোমাদের স্ত্রীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর চল আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করি এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত করি যারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬০-৬১)

মুবাহালা

উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) মুবাহালার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ইমাম হাসান, ইমাম হুসায়ন, হযরত ফাতিমা (রা) এবং হযরত আলী (রা)-কে সাথে নিয়ে বাইরে আগমন করেন। খ্রিস্টানগণ রাসূল (সা)-এর পবিত্র ও নূরানী চেহারা প্রত্যক্ষ করে ভীত হয়ে পড়ে এবং নবী (সা)-এর নিকট কিছু সময়ের জন্য আবেদন করে বলেন, আমরা পরস্পর আলোচনা ও পরামর্শ করে আপনার নিকট উপস্থিত হব। আলাদা হয়ে তারা পরামর্শের জন্য বসে। সাইয়্যেদ আয়হাম আকিব আবদুল মাসীহর নিকট বলে, আল্লাহর শপথ! তোমরা খুব ভালভাবেই অবগত আছ যে, ইনি হলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল। তোমরা যদি তাঁর সাথে মুবাহালায় অংশগ্রহণ কর তাহলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! আমি এমন আকৃতি প্রত্যক্ষ করছি যে, তিনি যদি এ পাহাড় স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য দু'আ করেন, তাহলে পাহাড়ও স্থানচ্যুত হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ! তোমরা তাঁর নবুওয়াত ও পয়গাম্বরীকে ভালভাবেই জেনেছ। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তিনি বলেছেন তা সম্পূর্ণ সঠিক। আল্লাহর শপথ! যে কোন জাতি

কোন নবীর সাথে মুবাহালা করেছে, তারা ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং তোমরা মুবাহালা করে নিজকে ধ্বংস করো না। যদি তোমরা স্বীয় ধর্মে স্থির থাকতে ইচ্ছা কর, তাহলে সন্ধি করে ফিরে যাও। অবশেষে তারা মুবাহালা থেকে পশ্চাদাপসরণ করে এবং বাৎসরিক জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়। নবী করীম (সা) বললেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন-নজরানবাসীর মাথার উপর শাস্তি এসে গিয়েছিল। যদি তারা মুবাহালায় অংশগ্রহণ করত, তাহলে তাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করা হতো এবং সমস্ত ময়দান ও উপত্যাকা আগুন হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হতো, এতে সমস্ত নজরানবাসী ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে বৃক্ষের উপর কোন পাখিও অবশিষ্ট থাকত না।[১]

দ্বিতীয় দিন মহানবী (সা) নিম্নে বর্ণিত শর্তসহ একটি চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করালেন ঃ

১. নজরানবাসীকে প্রতি বছর দু' হাজার হিল্লাহ্ আদায় করতে হবে। এক হাজার রজব মাসে এবং এক হাজার সফর মাসে। প্রত্যেক হিল্লাহর মূল্য হবে এক উকিয়া অর্থাৎ চল্লিশ দিরহাম।

২. নজরানবাসীর উপর নবী করীম (সা)-এর প্রেরিত দূতের এক মাস পর্যন্ত মেহমানদারী বাধ্যতামূলক।

৩. ইয়ামনে যদি কোন ফিতনা সৃষ্টি হয় তাহলে নজরানবাসীকে ত্রিশটি লৌহ বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি উট ফেরত দেয়া সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে। যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায়, তাহলে এর দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পিত হবে।

৪. আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তাদের জীবন ও সম্পদের হিফাযতের যিম্মাদার। তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সম্পত্তি, তাদের অধিকার, তাদের ধর্ম ও উপাসনালয়, তাদের বংশ ও অনুসারীদের কোন ক্ষতি করা হবে না। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের কোন রক্তপণ তাদের থেকে আদায় করা হবে না। তাদের ভূখণ্ডে কোন সৈন্য প্রবেশ করবে না।

৫. যদি কেউ তাদের নিকট অধিকার আদায়ের দাবি করে, তাহলে অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের (ظالم ومظلوم) মধ্যে ইনসাফ করা হবে।

৬. যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করবে তার কোন যিম্মা আমার উপর থাকবে না।

৭. যদি কোন ব্যক্তি যুলম ও সীমাতিক্রম করে, তাহলে তার পরিবর্তে অপর ব্যক্তি ধৃত হবে না।

এটা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা ও দায়িত্ব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আবু সুফিয়ান ইবন হারব, আয়লান ইবন আম্র, মালিক ইবন আউফ, আকরা ইবন হাবিস এবং মুগীরা ইবন শু'বা (রা) এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন।[২]

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ৪৩।

২. যাদুল মা'আদের ৩ খ,পৃ. ৪০ এবং হিদায়াতুল হাওয়ারী ফী রাদ্দিল ইয়াহূদ ওয়ান নাসারা, পৃ. ৪৪ এ ঘটনা এভাবে উল্লেখ রয়েছে। মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনা নজরান থেকে আসার সময় ঘটেছে এবং ইসাবা, ৩য় খ, পৃ. ২৯২ কুরয ইবন আলকামা নাজরানীর মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের রিওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণিত আছে।

নজরানের খ্রিস্টানগণ এই চুক্তিনামা নিয়ে দেশে গমন করে। গমনের পূর্বে নবী (সা)-এর নিকট এ আবেদন পেশ করে যে, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন যাতে সে সন্ধির মাল আমাদের থেকে নিয়ে আসতে পারে। রাসূল (সা) বললেন, একজন সঠিক আমানতদার ব্যক্তিকে তোমাদের সাথে প্রেরণ করব। এটা বলেই তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে তাদের সাথে গমনের নির্দেশ প্রদান করেন এবং বলেন, তিনি হলেন এই উম্মাতের আমীন বা আমানতদার।[১]

এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর ফরমান নিয়ে নজরান ফিরে যায়। নজরান এক মনযিল দূরে থাকতেই সেখানের পাদ্রী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ তাদেরকে স্বাগত জানান। প্রতিনিধি দল রাসূলের প্রেরিত পত্রটি পাদ্রীদের নিকট অর্পণ করে। পাদ্রীগণ তা পাঠ করতে মগ্ন হয়ে পড়ে। এ সময় আবূ হারিসার খচ্চর, যার উপর সে সওয়ার ছিল, হোঁচট খায়। তার চাচাত ভাই কুরয ইবন আলকামার মুখ থেকে বের হয় تعس الابعد (ঐ কমবখত ধ্বংস হোক) অর্থাৎ নবী (সা) (নাউযুবিল্লাহ)। আবূ হারিসা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, তুমিই কমবখত। আল্লাহর শপথ! তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তিনিই ঐ নবী তাওরাত ও ইঞ্জিলে যাঁর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কুরয বললো, তাহলে কেন ঈমান গ্রহণ করনি? আবূ হারিসা বললো, ঐ বাদশাহগণ আমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা সমস্তই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কুরয বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তো স্বীয় উটের রশি মদীনায় গমন করেই খুলব এবং অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নিম্নের কবিতা পাঠ করতে করতে মদীনা রওয়ানা হয় ঃ

اليك تعدو قلقا وضينها * معترض فى بطنها جينتها
مخالفا دين النصارى دينها -

অবশেষে নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর কোন যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

কয়েকদিন পর সাইয়্যেদ আয়হাম এবং আবদুল মাসীহ আকীব ও মদীনা গমন করে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সা) উভয়কে হযরত আবূ আইউব আনসারীর বাড়িতে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন।[২]

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য

নজরানবাসীদের মধ্যে দু'টি দল ছিল। একটি উম্মিইন (اميين) অপরটি হলো আনসারীদের। প্রথম দলটি ইসলাম গ্রহণ করে। যেমন বনী হারিস প্রতিনিধি দল। দ্বিতীয় দলটির সাথে জিযিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি হয়। নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে নজরানের প্রথম দলটি থেকে সাদাকা আদায় এবং দ্বিতীয় দলটি থেকে জিযিয়া

---

১. শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, প: ৪৩

২. প্রাগুক্ত।

আদায় করার জন্য প্রেরণ করেন। এটা নয় যে, একই দল থেকে জিযিয়া ও সাদাকা উভয়ই আদায় করবে। তাহলে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, একই দল থেকে সাদাকা ও জিযিয়া উভয় কিভাবে আদায় করা হবে।[১]

১৫. ফারওয়া ইবন আম্র জাযামী দূতের বর্ণনা

রোম সম্রাটের পক্ষ থেকে ফারওয়া ইবন আম্র জাযামী মা'আন ও সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত একটি পত্র তার নিকট প্রেরণ করেন তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন দূতকে কিছু নির্দেশ দিয়ে রাসূল (সা)-এর নিকট প্রেরণ করেন। রোমীয়গণ ফারওয়া ইবন আমরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ শোনার পর তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেয়। যখন তাঁকে ফাসিতে ঝুলাতে থাকে, তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

بلغ سراه المسلمين بانني * سلم لربى اعظمى ومقامى

"মুসলমানদের নেতার [নবী (সা)]-নিকট এ সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, আমি হলাম মুসলমান আমার হাড় ও আমার দাঁড়ানোর স্থান সমস্ত আল্লাহর অনুগত।"[২]

১৬. যিমাম ইবন সা'লাবার আগমন

৯ম হিজরীতে বনূ সা'আদের পক্ষ থেকে দিমাম ইবন সা'লাবা নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। মসজিদের দরযার নিকট উট বেঁধে রেখে নিজে মসজিদে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করেন, মুহাম্মদ (সা) কে? নবী (সা) তখন মসজিদে ঠেশ দিয়ে উপবেশন করেছিলেন। সাহাবাগণ বললেন, এই মহান ও পবিত্র যিনি ঠেস দিয়ে বসে আছেন। যিমাম ইবন সা'লাবা বললেন, হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। নবী (সা) বললেন, আমি শুনতে পেয়েছি। সে বললো, আমি আপনাকে কিছু কঠোর প্রশ্ন করবো, আপনি মনে কোন কষ্ট নেবেন না। নবী (সা) বললেন, তুমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাও, বলো। তিনি বললেন, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে সমস্ত মানুষের নিকট পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করেছেন? রাসূল (সা) বললেন, হ্যাঁ। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অত:পর তিনি পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তা'আলা কি দিবারাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায, সারা বছর এক মাস রোযা এবং মালদার থেকে যাকাত ও সাদাকা আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের নির্দেশ প্রদান করেছেন? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ! হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এবার ঐ ব্যক্তি বললেন, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমি এ সমস্ত কিছুর ওপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আমি হলাম আমার কাওমের দূত, আমার নাম যিমাম ইবন সা'লাবা। এটা হলো সহীহ বুখারীর রিওয়ায়াত।

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩য় খ, পৃ. ৪৪।

২. প্রাগুক্ত।

সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে হক ও সত্য প্রদান করে প্রেরণ করেছেন, আমি এতে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করব না। নবী (সা) বললেন, যদি এ ব্যক্তি সত্য বলের থাকে, তাহলে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

মাসয়ালা ঃ এই হাদীস দ্বারা এ মাসয়ালা জানা যায় যে, কোন আলিম বা সম্মানিত ব্যক্তির জন্য মজলিসে ঠেস দিয়ে বসা জায়েয।[১]

যিমাম ইবন সা'লাবা রাসূল (সা) নিকট থেকে বিদায় হয়ে স্বীয় কাওমের নিকট হাযির হলেন এবং সবাইকে একত্র করে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্বপ্রথম তিনি বলেন, লাত এবং ওয্যা অত্যন্ত খারাপ।

লোকজন বললো, হে যিমাম, এরূপ কথা মুখে উচ্চারণ করো না, তাহলে তুমি পাগল এবং কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে যেতে পার। যিমাম বললো, শত শত আফসোস! আল্লাহর শপথ, লাত এবং ওয্যা তোমাদের না কোন উপকার করতে পারবে এবং না কোন অনিষ্ট করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর উপর একখানা কিতাব নাযিল করেছেন। যিনি তোমাদেরকে এ সমস্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে মুক্ত করেছেন। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) হলেন আল্লাহর রাসূল। আমি নবী করীম (সা) থেকে এ সমস্ত আহকাম শিখে এসেছি। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই সমস্ত নারী পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত উমর (রা) এবং হযরত ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা কোন কাওমের কাসেদকে যিমাম ইবন সা'লাবার চেয়ে উত্তম পাইনি। (ইবন ইসহাক)[২]

১৭. তারেক ইবন আবদুল্লাহ মাহারিবী ও বনূ মাহারিব প্রতিনিধি দল

তারেক ইবন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি যিল-মাজায বাজারে ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তিকে এটা বলতে দেখলাম ঃ أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلح

"হে লোক সকল! তোমরা লা-ইলাহা ইল্লাহ বলো, সফলতা অর্জন করবে।"

অপর এক ব্যক্তি তার পিছনে পিছনে পাথর নিক্ষেপ করছে এবং বলছে ঃ

يايها الناس انه كذاب فلاتصدقوه

"হে লোক সকল! এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে, তাকে বিশ্বাস করো না।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যক্তি কে? লোকজন বললো, এ ব্যক্তি হলো বনূ হাশিম গোত্রের যিনি এটা বলেন যে, "আমি আল্লাহর রাসূল এবং এই পাথর নিক্ষেপকারী হলো তাঁর চাচা আবূ লাহাব।

---

১. ফাতহুল বারী, ১ খ, পৃ. ১৩৯।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪।

তারেক ইবন আবদুল্লাহ বলেন, মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে এবং নবী (সা) মদীনায় হিজরত করেন, তখন আমি মদীনার খেজুর ক্রয় করার জন্য যাবদাহ্ থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনার নিকট একটি বাগানে অবস্থানের ইচ্ছা করছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি দু'টি পুরাতন চাদর পরিধান করে সম্মুখ দিয়ে আগমন করে আমাকে সালাম প্রদান করে এবং জিজ্ঞাসা করে কোথা থেকে আগমন করছ? আমি বললাম, যাবদাহ্ থেকে। ঐ ব্যক্তি বললো, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা?

আমি বললাম, মদীনায়। সে বললো, কি উদ্দেশ্যে? আমি বললাম, খেজুর ক্রয় করার জন্য। আমাদের নিকট একটি লাল রঙের উট ছিল। ঐ ব্যক্তি বললো, এত পরিমাণ খেজুরের বিনিময়ে উটটি কি আমার নিকট বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। ঐ ব্যক্তি এই মূল্যে সম্মত হলো এবং মূল্য হ্রাসের জন্য কিছুই বললো না এবং উট নিয়ে চলে গেল। আমরা পরস্পর বলতে লাগলাম, মূল্য না নিয়ে এমন ব্যক্তিকে আমরা উট সোপর্দ করলাম, যার পরিচয় আমরা জানি না। এদের মধ্যে হাওদায় আরোহণকারী এক মহিলা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি ঐ ব্যক্তির চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের মত প্রত্যক্ষ করেছি। এ চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর হতে পারে না ভয় পেও না। আমি মূল্য আদায়ের যিম্মাদার হলাম।

আলাপকালে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি হলাম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দূত। তিনি এ খেজুর প্রেরণ করেছেন, এগুলো খাও এবং বাকীগুলো মেপে নাও। আমি প্রয়োজন অনুযায়ী খাওয়ার পর মেপে দেখলাম, ঐ খেজুর পরিপূর্ণ রয়েছে।

পরের দিন আমি মদীনা প্রবেশ করলাম। এ সময় রাসূল (সা) মিম্বরের উপর খুতবা প্রদান করছিলেন (সম্ভবত এটা জুমু'আর দিন ছিল)। খুতবায় তিনি এ বক্তব্য পেশ করছিলেন:

تصدقوا فان اليد العليا خير من اليد السفلى امك واباك واختك واخاك وادناك ادناك -

"সাদাকা দান কর। নিশ্চয়ই উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাতের চেয়ে (গ্রহণকারীর হাত) উত্তম। মাতা পিতা, বোন ভাই এবং নিকট-আত্মীয়ের প্রতিদান করার ব্যাপারে খেয়াল রাখবে।"[১] (বায়হাকী ও হাকেম প্রমূখ)

১৮. তুজীব প্রতিনিধি দল

ইয়ামনের কান্দাহ্ গোত্রের একটি শাখা হলো তুজীব গোত্র। এই গোত্রের তের ব্যক্তি সাদ্কার মালামাল নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। রাসূল (সা) বললেন, এই মালামাল ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং ঐ এলাকার দরিদ্র লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দাও। তারা আরয করলো, আমরা শুধু ঐ মালামাল নিয়ে এসেছি যা ঐ

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৬

এলাকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট রয়েছে। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। তুজীবের মত অন্য কোন প্রতিনিধি দল আগমন করেনি। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে ! হিদায়াত আল্লাহর হাতে। যার জন্য আল্লাহ্ কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার অন্তর ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর নিকট বিভিন্ন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এগুলো তাদেরকে লিখিত আকারে প্রদান করেন। এবং উত্তমভাবে তাদের মেহমানদারী করার জন্য হযরত বিলালকে নির্দেশ প্রদান করেন। কয়েকদিন অবস্থানের পর তারা ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাসূল (সা) বললেন, এত জলদী করার কারণ কি? তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল, অন্তরের এটা ইচ্ছা যে, আপনার সাহচর্য ও প্রেরণা এবং বরকত যতটুকু হাসিল করেছি, তা স্বীয় কাওমের মধ্যে প্রচার করি। নবী (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় দেন। রওয়ানা হওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ বাকি রয়েছে? তারা বললো, একজন যুবক বাকী রয়েছে যাকে আমরা আমাদের মাল-আসবাবের সংরক্ষণের জন্য রেখে এসেছি। রাসূল (সা) বললেন, তাকেও ডেকে নিয়ে এসো। যুবক হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমার গোত্রের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন, আমার একটি প্রয়োজন ও চাহিদা রয়েছে। নবী (সা) বললেন, সেটা কি? যুবকটি বললো, আমি এ জন্য ঘর থেকে বের হয়েছি যে, আপনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমার জন্য এই দু'আ করবেন, যেন, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করেন, আমার উপর রহম করেন এবং আমার অন্তরকে সম্পদশালী তথা অমুখাপেক্ষী করে দেন। রাসূল (সা) দু'আ করলেন ঃ أللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه فى قلبه "হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর, তার উপর রহম কর এবং তার অন্তরকে সম্পদশালী ও অভাবমুক্ত করে দাও।"

অতঃপর এই যুবককে কিছু হাদিয়া প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

১০ম হিজরীতে ঐ গোত্রের লোকজন যখন হজ্জের জন্য আগমন করে এবং রাসূল (সা) এর সাথে সাক্ষাত করে, তখন তিনি ঐ যুবকের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল। তাঁর যুহদ ও কিনায়াতের (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি ও অল্পে তুষ্টি) অবস্থা খুবই বিস্ময়কর। আমরা তাঁর মত যাহেদ এবং কানে' (زاهد وقانع) আর দেখিনি। এত মালদৌলত তাঁর সামনে বিতরণ করা হয় কিন্তু তিনি তার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। রাসূল (সা)-এর ইন্তিকালের পর যখন ইয়ামানবাসী ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যায়, তখন এ যুবক লোকজনের মধ্যে ওয়ায ও নসীহত করেন, যার ফলে সবাই ইসলামের উপর অটল থাকে এবং আল-হামদুলিল্লাহ, কোন ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করেনি। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যাতায়াতকারীদের নিকট তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। এমনকি তাঁর সম্পর্কে উল্লেখিত ঘটনা অবহিত হওয়ার পর

সিয়াদ ইবন ওয়ালীদকে ঐ যুবকের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য পত্রের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করেন।[১]

১৯. হুযায়ম প্রতিনিধি দল

হুযায়ম গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন মসজিদে নব্বীতে উপস্থিত হয়, তখন নবী (সা) জানাযার নামায আদায় করছিলেন। এই লোকজন আলাদা বসে রইল, নবী (সা) তাদেরকে ডেকে বললেন, তোমরা কি মুসলমান নও? তারা আরয করলো, আমরা মুসলমান। তিনি বললেন, তাহলে তোমার ভাই-এর জানাযায় কেন অংশগ্রহণ করনি তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা এ ধারণা পোষণ করেছিলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্য জানাযা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে না। রাসূল (সা) বললেন, তোমরা মুসলমান, যেখানেই অবস্থান কর। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাদের এলাকায় ফিরে যান। সর্বকনিষ্ঠ এক যুবককে তারা তাদের আসবাবপত্র হিফাযতের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। নবী (সা) তাঁকে ডাকলেন, সে সামনে আগমন করে নবী করীম (স)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। তাঁরা আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ছেলেটি আমাদের মধ্যে কনিষ্ঠ এবং আমাদের খাদিম। নবী (সা) বললেন, اصغر القوم خادمهم بارك الله عليك (কাওমের সর্ব কনিষ্ঠ খাদিম হয়ে থাকে, আল্লাহ তোমার উপর বরকত নাযিল করুন)।

বস্তুত নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে ঐ যুবকই সবচেয়ে উত্তম এবং পবিত্র কুরআনের আলিম হয়েছিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তাঁকেই ঐ গোত্রের আমীর ও ইমাম নিযুক্ত করেন। নবী (সা)-এর অনুমতিক্রমে রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর গোত্রের সবাই ইসলাম গ্রহণ করে।[২]

২০. বনী ফাযারার প্রতিনিধি দল

গাযওয়ায়ে তাবূক থেকে ফিরে আসার পর বনী ফাযারার চৌদ্দ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের শহরের অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করেন, লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! দুর্ভিক্ষের কারণে জনগণ চরম সমস্যা ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে। নবী (সা) আল্লাহ পাকের দরবারে রহমতের জন্য দু'আ করেন।[৩]

---
১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৪৬।
২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৭।
৩. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৫৪।

২১. বনী আসাদ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন (৯ম হিজরী)

বনী আসাদ গোত্রের দশ ব্যক্তি নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এ সময় তিনি মসজিদে অবস্থান করছিলেন। তারা প্রথমে রাসূলকে সালাম করে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আপনার আহবান ব্যতীত আমরা আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ـ

"তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে এটা মনে করে। আপনি বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না; বরং আল্লাহ ঈমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১৭)

منت من كه خدمت سلطان همى كنى * منت شناس ازدكه بنيرصت بداشتت

"বাদশাহ্র দরবারে সেবা করছ বলে খোঁটা দিতে যাবে না; বরং বাদশাহ্ যে তোমাকে সেবা করার সুযোগ দান করেছেন তাঁর সেই অনুগ্রহ স্মরণ রেখো।"

অতঃপর জ্যোতিষ্ক বিদ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী (সা) ঐ বিদ্যা চর্চা করা নিষেধ করেন।[১]

২২. বাহ্রায়া প্রতিনিধি দল

ইয়ামানের বাহ্রায়া গোত্রের তের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা হযরত মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান করেন। হযরত মিকদাদ (রা) তাদের আগমনের পূর্বেই একটি বিরাট পেয়ালার মধ্যে হায়স (حيس) তৈরি করেছিলেন। মেহমান আগমনের পর তা তাদের সামনে পেশ করেন। সবাই খুব তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট রয়ে যায়। হযরত মিকদাদ (রা) স্বীয় বাঁদী সিদরার মাধ্যমে এই পেয়ালা নবী (সা)-এর সমীপে প্রেরণ করেন। তিনি এবং নবী গৃহের সবাই আহার করার পর পেয়ালা ফিরিয়ে দেন। মেহমান যতদিন অবস্থান করেন ততদিন তারা ঐ পেয়ালা থেকে তৃপ্ত সহকারে আহার করতে থাকে। একদিন মেহমানগণ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হে মিকদাদ! আমরা শুনেছি, মদীনাবাসীদের পানাহার অত্যন্ত সাধারণ, অথচ তুমি আমাদেরকে প্রত্যহ এত

১. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫।

পরিমাণ মজাদার ও উত্তম খানা পরিবেশ করছ যা আমরা আমাদের ঘরে প্রত্যহ তৈরি করতে সক্ষম নই। মিকদাদ (রা) বলেন, এ সমস্তই হলো নবী (সা)-এর পবিত্র হাতের বরকত এবং তাঁদেরকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। এতে ঐ লোকদের ঈমান আরো দৃঢ় হয় এবং কিছু দিন অবস্থান করে মাসায়েল ও আহকাম শিক্ষা লাভ করে বাড়ি গমন করে। রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে পথ খরচ ও উপঢৌকন প্রদান করেন।[১]

২৩. উয্‌রাহ প্রতিনিধি দল

৯ম হিজরীতে ইয়ামনের উয্‌রাহ গোত্রের ১২ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। তিনি তাদেরকে আহ্‌লান ও মারহাবা বলেন, তারা আরয করলো, আপনি কোন বিষয়ের দিকে আহবান করেন? রাসূল (সা) বললেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তারা ইসলামের ফরয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। নবী (সা) তাদেরকে ইসলামের ফরয বিধান সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন প্রতিনিধি দলের লোকজন বললো, আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, আমরা তা কবূল করেছি। আমরা আন্তরিকভাবে অনুসারী ও সহযোগী সাহায্যকারী। হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করছি সেখানে হিরাকল রাজত্ব করেন। আপনার উপর কি এ ব্যাপারে কোন ওহী নাযিল হয়েছে?

রাসূল (সা) বললেন, অচিরেই সিরিয়া বিজয় হবে এবং হিরাকল সেখান থেকে পলায়ন করবে। জ্যোতিষ বা যাদুকরের নিকট ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করা এবং তাদের যবেহকৃত খাদ্য গ্রহণ থেকে নিষেধ করেন এবং বলেন, তোমাদের উপর শুধু কুরবানী ওয়াজিব। কয়েকদিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া দিয়ে বিদায় করেন।[২]

২৪. বাল্লী প্রতিনিধি দল

৯ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে বাল্লী প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূল (সা) বলেন ঃ

ألحمد لله الذى هداكم للاسلام فكل من مات على غير الاسلام فهو فى النار

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ. পৃ. ৪৮-৪৯।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৪৮-৪৯।

"সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য, যিনি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের হিদায়ত দান করেছেন, যে ব্যক্তি অনৈসলামিক ও অমুসলিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, সে হবে দোযখবাসী।"

প্রতিনিধি দলের নেতা আবূ দাবীব আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অন্তরে মেহমানদারী করার খুব স্পৃহা রয়েছে, এতে কি কোন সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ধনী দরিদ্র যার উপরই ইহ্সান কর, তা হবে সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। এর পর তিনি বললেন, হে রাসূল মেহমানদারীর সীমা কতদিন? রাসূল (সা) বললেন ঃ তিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা কর্তব্য। অতঃপর মেহমানদারী হবে সাদাকার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর মেযবানের মনে কষ্ট দিয়ে অতিরিক্ত অবস্থান করা মেহমানের জন্য জায়েয নয়। তিন দিন অবস্থানের পর প্রতিনিধি দল ফিরে যায়। যাওয়ার সময় নবী করীম (সা) তাদেরকে কিছু হাদিয়া প্রদান করেন।[১]

২৫. বনী মুররা প্রতিনিধি দল

গাযওয়ায়ে তাবূকের পর ৯ম হিজরীতে বনী মুররার তের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এ দলের নেতা ছিলেন হারিস ইবন আউফ। তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনারই বংশধর। আমরা আপনার পূর্ব পুরুষ লুওয়াই ইবন গালিব-এর আওলাদ। এটা শুনে রাসূল (সা) মৃদু হাসলেন এবং তাদের শহরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! দূর্ভিক্ষের কারণে শহরের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। নবী (সা) তখনই বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। যখন তারা বাড়ি ফিরে আসে তখন এটা প্রতীয়মান হলো যে, যেদিন রাসূল (সা) দু'আ করেন। ঐ দিনেই বৃষ্টি হয়েছে। সমস্ত দেশ ফলে-ফুলে শস্য-শ্যামল হয়ে উঠেছে। দেশে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া রৌপ্য এবং হারিস ইবন আউফকে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেন।[২]

২৬. খাওলান প্রতিনিধি দল

১০ হিজরীর শা'বান মাসে ইয়ামন থেকে দশ ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তারা আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আমাদের উপর আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের বিরাট ইহ্সান রয়েছে। অনেক দূরের পথ অতিক্রম করে সাক্ষাতের আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে আপনার দরবারে হাযির হয়েছি। নবী (সা) বললেন, তোমাদের এ সফর বিফল হবে না। প্রতিটি পদক্ষেপে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। যে ব্যক্তি আমার যিয়ারতের জন্য মদীনা আগমন করে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশ্রয়ে এবং

---

১. উয়ুনল আসার, ২ খ. পৃ. ২৫১-১৫২

২. উয়ুনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫১-২৫২

নিরাপদে থাকবে। অতঃপর খাওলান গোত্রের মূর্তি যার নাম ছিল আম্মে আনস, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তারা আরয করলো, আল-হামদু লিল্লাহ, আপনার হিদায়ত ও তালীমের কারণে ঐ মূর্তিপূজা দূরীভূত হয়েছে। মাত্র কয়েকজন প্রাচীন নর-নারী এখানো আম্মে আনসের পূজা করে। এবার ফিরে যাবার পর ঐ মূর্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলব ইনশা'আল্লাহ।

নবী (সা) তাদেরকে ইসলামের ফরয ও কর্তব্যসমূহ শিক্ষা দিলেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

ক. অবশ্যই অঙ্গীকার পূরণ করবে।

খ. আমানত আদায় করবে।

গ. প্রতিবেশীর প্রতি দৃষ্টি রাখবে।

ঘ. কারো উপর যুলম করবে না।

ফিরে যাওয়ার সময় দলের প্রত্যেককে বার উকিয়া রৌপ্য প্রদান করেন। দেশে ফিরে প্রথমেই তারা 'আম্মে আনস' নামক মূর্তি ধ্বংস করে।[১]

২৭. মুহারিব প্রতিনিধির দল

মুহারিব গোত্রের লোকগুলো ছিল অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের। মক্কায় হজ্জের সময় যখন নবী করীম (সা) লোকজনকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতেন, তখন এ সমস্ত লোক নবী (সা) এর সাথে অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করত। ১০ম হিজরীতে এ গোত্রের দশজনের একটি প্রতিনিধি দল তাদের গোত্রের পক্ষ থেকে খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথীদের মধ্যে আপনার বিরুদ্ধে আমার চেয়ে অধিক কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহার এবং ইসলাম থেকে দূরে কেউ ছিল না। আমার সাথীরা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে জীবিত রেখে আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের সৌভাগ্য দান করেছেন। নবী (সা) বলেন, অন্তর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করুন, আপনার সাথে আমি অন্যায় করেছি, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। রাসূল (সা) বলেন, কুফরীর অবস্থায় যা কিছু করা হয় ইসলাম গ্রহণের ফলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। অতঃপর রাসূল (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করে।[২]

২৮. সুদা'আ প্রতিনিধি দল

৮ম হিজরীতে জি'রানা থেকে ফিরে আসার পর নবী (সা) মুহাজির ইবন আবূ উমাইয়্যাকে সান'আ, যিয়াদ ইবন লাবীদকে হাদ্রামাউত এবং কায়স ইবন সা'আদ ইবন

১. যাদুল মা'আদ, ৩১ খ, পৃ. ৫০; উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫৩।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫০।

উবাদা খাযরাজীকে চারশ' আরোহীর সাথে কানাতের দিকে প্রেরণ করেন। কায়স ইবন সা'আদকে ইয়ামনের সুদা' আ এলাকার গমন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যিয়াদ ইবন হারিস সুদাঈ এ সংবাদ পেলে তিনি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার বাহিনী ফিরিয়ে নিন। আমি আমার কাওমের ইসলাম গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। নবী (সা) কায়স ইবন সা'আদকে ফিরে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। যিয়াদ ইবন হারিস সুদাঈ পনের ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে নবী (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং রাসূল (সা)-এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। নবী করীম (সা) যিয়াদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে যিয়াদ! তোমার কাওম তোমার খুবই অনুগত। যিয়াদ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ইহসান। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলামের প্রতি হিদায়ত দান করেছেন। বায়'আত গ্রহণ করে এ সমস্ত লোকই দেশে গমন করে। সমস্ত গোত্রের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। বিদায় হজ্জে এক'শ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে।[১]

২৯. গাস্সান প্রতিনিধি দল

১০ হিজরীর রমযান মাসে গাস্সান গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আরয করেন, আমাদের কাওম আমাদের অনুসরণ করে কিনা, আমাদের জানা নেই। তাঁদের ফিরে যাওয়ার সময় রাসূল (সা) তাদেরকে কিছু অর্থ ও উপহার প্রদান করেন। যেহেতু তাদের কাওম ইসলাম গ্রহণ করেনি, ফলে তাঁরা নিজেদের ইসলাম গোপন রাখেন। এমনি অবস্থায় তাঁদের দু'ব্যক্তি ইনতিকাল করেন। তৃতীয় ব্যক্তি ইয়ারমুকের যুদ্ধে হযরত আবূ উবায়দার সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে স্বীয় ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবহিত করেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন।

৩০. সালমান প্রতিনিধি দল

১০ম হিজরীর শাওয়াল মাসে সালমান গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজ এলাকার অনাবৃষ্টি ও দূর্ভিক্ষের কথা বলেন। নবী (সা) পবিত্র হাত উঠিয়ে দু'আ করেন, অতঃপর তাদেরকে কিছু অর্থ ও উপহার দিয়ে বিদায় করেন। বাড়ি গিয়ে তারা এটা উপলব্ধি করে যে, যে দিন এবং সে সময় নবী (সা) দু'আ করেছেন, ঐ দিনেই তাদের এলাকায় বৃষ্টিপাত হয়েছে।[৩]

---

১. উয়ুনুল আসার, ২ খ, পৃ. ২৫৪।

২. যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৬১।

৩. প্রাগুক্ত,

৩১. বনী আবস্ প্রতিনিধি দল

বনী আবস্ এর তিন ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা এটা অবগত হয়েছি যে, হিজরত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য হয় না। আমাদের নিকট কিছু মাল ও গবাদিপশু রয়েছে এবং এগুলোর উপর আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। যদি হিজরত ব্যতীত ইসলাম গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে এরূপ মাল দ্বারা কি কল্যাণ ও বরকত হবে ? আমরা সমস্ত বিক্রি করে আপনার দরবারে হাযির হয়ে যাব। রাসূল (সা) তাদেরকে বলেন ঃ

اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئًا

"আল্লাহকে ভয় কর যেখানেই থাক না কেন। আল্লাহ তোমাদের আমলের সাওয়াবে কোন হ্রাস করবেন না।"[১]

৩২. গামিদ প্রতিনিধি দল

১০ম হিজরীতে ইয়ামনের গামিদ গোত্রের দশ ব্যক্তির এক প্রতিনিধি মদীনা আগমন করে বাকী নামক স্থানে অবতরণ করে এবং আসবাবপত্রের নিকট একটি কিশোরকে রেখে তারা নবী করীম (সা)-এর দরবারে হাযির হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আসবাবপত্রের নিকট কোন ব্যক্তিকে রেখে এসেছে? তারা আরয করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! একটি কিশোরকে। তিনি বললেন ঃ একটি থলে চুরি হয়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, ঐ থলে ছিল আমার। তিনি বললেন, ভয় করো না, তা পাওয়া গেছে। এ লোকজন যখন তাদের আসবাবপত্রের নিকট উপস্থিত হয়, তখন দেখতে পায় যে, কিশোরটি ঘুমিয়ে পড়েছে। জাগ্রত হওয়ার পর দেখতে পায় যে, থলেটি নেই। তখন এর খোঁজে বের হয়। দূরে একটি লোককে উপবিষ্ট দেখে তার নিকট গমন করলে সে পলায়ন করে। সেখানে পৌঁছে মাটির মধ্যে গর্ত দেখতে পায়। সেখানে থলেটি পাওয়া যায়। আমরা বললাম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র সত্য নবী ।

নবী (সা) উবাই ইবন কা'ব (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাদেরকে তুমি কুরআন শিক্ষা দাও। রওয়ানা হওয়ার সময় তাদেরকে শরী'আতের বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ আকারে প্রদান করেন এবং প্রথামত তাদেরকে উপঢৌকনও প্রদান করেন।[২]

৩৩. আয্দ প্রতিনিধি দল

আযদ গোত্রের সাত ব্যক্তির একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের স্বভাব-চালচলন ও ব্যক্তিত্ব নবী (সা)-এর পসন্দ হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে ? প্রতিনিধি দলের লোকজন আরয করলেন, আমরা হলাম মু'মিন। রাসূল (সা) মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক কথার মধ্যেই একটি হাকীকত

---

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৩।

২. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৩; যারকানী, ৪ খ, পৃ. ৬৩।

থাকে। তোমাদের ঈমানের হাকীকত কি? তাঁরা আরয করলেন ঐ পনের খাসলত বা বিষয়, যার মধ্যে পাঁচটির উপর ঈমান ও ইতিকাদ রাখার জন্য আপনার দূতগণ নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁরা আমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া পাঁচটি এরূপ বিষয় রয়েছে, যেগুলো আমরা জাহেলিয়াতের যুগেও পালন করে আসছি। নবী (সা) বললেন, ঐ বিষয়গুলো কি, যার উপর ঈমান আনার জন্য আমার মুবাল্লিগগণ তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন। তাঁরা আরয করেন, এগুলো হলো ঃ (১) আল্লাহ্ তা'আলার উপর; (২) তাঁর ফিরিশতাগণের; (৩) তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের; (৪) তাঁর পয়গাম্বরগণের; (৫) মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার উপর অর্থাৎ কিয়ামত ও আখিরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, ঐ পাঁচটি কি, যেগুলোর উপর আমল করার জন্য আমার দূতগণ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন? তাঁরা আরয করলো, এগুলো হলো ঃ (১) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বল; (২) নামায আদায় কর; (৩) যাকাত প্রদান কর; (৪) রমযানের রোযা রাখ; (৫) সক্ষম হলে বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় কর।

নবী (সা) বলেন, ঐ পাঁচটি বিষয় বা খাসলত কি, যা তোমরা জাহেলিয়াতের যুগে পালন করেছ? তাঁরা আরয করলো ঃ

الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضابم القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالاعداء فقال صلى الله عليه وسلم حكما وعلما كادوا من قههم دان يكونوا أنبياء ثم قال وانا ازيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما تقولون فلاتجمعوا مالاتاكلون ولاتنبوا مالاتسكنون ولاتنافسوا في شئٍ انتم عنه غدا زائلون - واتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون -

"আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা; (২) বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা (৩) ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা; (৪) মুকাবিলার সময় অটল থাকা; (৫) শত্রুর বিপদে উৎফুল্ল না হওয়া।

নবী (সা) ইরশাদ করেন, বিরাট হাকীম ও আলিম (হলে তোমরা) ফিকহ্ ও জ্ঞানের কারণে নবুওয়াতের মর্যাদার অতি নিকটবর্তী।[১] অতঃপর নবী করীম (সা)

১. নবী (সা)-এর এ কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসের হাফেয নবুওয়াতের মর্যাদার এত নিকটবর্তী নন যতটুকু ফকীহ্ নবুওয়াতের মর্যাদার নিকটবর্তী হয়ে থাকেন। হাদীসের হাফেযের উদাহরণ ঐ আশিকের মত যে মাহবুবের কথা হুবহু মুখস্থ করে নিয়েছে। আর ফকীহর উদাহরণ ঐ বুদ্ধিমান বোধশক্তিসম্পন্ন জীবন উৎসর্গকারী মাহবুবের মত, যিনি তাঁর মাহবুবের ইঙ্গিতে তার গোপন রহস্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে থাকেন।

বলেন, আমি তোমাদেরকে আরো পাঁচটি খাসলতের কথা বলব, যাতে শ খাসলত পূর্ণ হয়ে যায়। (১) যে বস্তু খাওয়া হয়না তা জমা রেখ না; (২) যেখানে থাকবে না তা নির্মাণ করো না; (৩) যে বস্তু আগামীকাল ছেড়ে যাবে তা নিয়ে পরস্পর হিংসা করো না; (৪) ঐ আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর যাঁর দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে এবং তাঁর সামনে হাযির হতে হবে (৫) ঐ বস্তু কামনা কর; যাতে তোমরা অনন্তকাল থাকবে অর্থাৎ আখিরাত।"

এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর উপদেশ নিয়ে দেশে ফিরে যায় এবং তা স্মরণ রেখে আমল করতে থাকে।[১]

৩৪. বনী মুনতাফিক প্রতিনিধি দল

বনী মুনতাফিক প্রতিনিধি দল ফজর নামাযের পর নবী করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়। ঘটনাক্রমে ঐ দিন নবী (সা) সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করে তাঁদের সামনে এক দীর্ঘ খুতবা পেশ করেন। এতে হাশর-নশর ও বেহেশত-দোযখের অবস্থা বর্ণনা করেন। খুতবা শেষ হওয়ার পর তারা রাসূল (সা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং দেশে গমন করেন। বিস্তারিত খুতবা দু'পৃষ্ঠার মত। হাফেয ইবন কাইয়্যেম যাদুল মা'আদে তা উল্লেখ করেছেন।

৩৫. নাখা' প্রতিনিধি দল (মাহে মুহাররম ১১ হিজরী)

নাখা' ইয়ামনের একটি গোত্র। ১১ হিজরীর মুহাররম মাসের মধ্য দশকে এ গোত্রের দু'শ ব্যক্তি নবী করীম (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে যুরারাহ্ ইবন আম্র নামক এক ব্যক্তিও ছিলেন, এ সফরে তিনি অনেক স্বপ্ন দেখেন এবং রাসূল নিকট তা বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন। যুরারাহ্ ইবন আমর তাঁর স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পাই যে, যমীন থেকে একটি অগ্নি বের হয়ে আমার এবং আমার পুত্রের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ঐ অগ্নি আহ্বান করছে ঃ

لظى لظى بصيروا عمى اطعمونى اكلكم اهلكم ومالكم

"আমি হলাম আগুন, আমি হলাম আগুন। কোন চক্ষুষ্মান ও কোন অন্ধ আমাকে আহার করতে দাও। আমি তোমাদেরকে, তোমাদের পরিবারবর্গকে এবং সম্পদকে খেয়ে ফেলবো।"

নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ একটি ফিত্না সৃষ্টি হবে, যার ফলে লোকজন তাদের ইমাম ও খলীফাকে হত্যা করবে। বদকার লোক নিজেদেরকে নেককার মনে করবে। মু'মিনদেরকে হত্যা করা পানি পান করা থেকে অধিক স্বাদের হবে। যদি তোমার পুত্র তোমার আগে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তুমি এ ফিতনার সম্মুখীন হবে। আর যদি তুমি

১. যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৪

প্রথমে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তোমার পুত্র ঐ ফিতনার সম্মুখীন হবে। হযরত যুরারাহ্ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি দু'আ করুন যেন, আমি ঐ ফিতনায় পতিত না হই। নবী (সা) দু'আ করলেন হযরত যুরারাহ্ (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত উসমান গণী (রা)-এর শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হয়। হযরত যুরারাহ্র পুত্র বিদ্রোহীদের দলভুক্ত ছিল। (والله اعلم) (যাদুল মা'আদ, ৩ খ, পৃ. ৫৯; যারকানী ৪ খ, পৃ. ৬৭)।

ইয়ামনে ইসলামের তালীম (১০ম হিজরী)

৯ অথবা ১০ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী ও হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনের লোকদের দীন ইসলামের তালীম প্রদানের জন্য প্রেরণ করেন। তবে দু'জনকে এক যায়গায় প্রেরণ করেন নি। আবূ মূসাকে (রা)-কে ইয়ামনের পূর্ব প্রান্তে এবং মু'আয (রা)-কে পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ আদন ও জানুদ-এর বিভিন্ন এলাকায় তালীম ও তাবলীগের কাজ করার নির্দেশ দান করেন।

নাজরানে সারীয়ায়ে খালিদ ইবন ওয়ালীদ প্রেরণ

১০ হিজরীর রবিউস সানী অথবা জুমাদাল উলা মাসে নবী (সা) খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা)-কে একটি সারীয়ার নেতা নির্ধারণ করে নজরান এবং এর আশেপাশের এলাকায় প্রেরণ করেন এবং এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, যুদ্ধের পূর্বে তিনবার ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা দাওয়াত কবূল করে, তাহলে তোমরা তাদের ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যদি ইসলামের কবুল করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। কিন্তু খালিদ (রা) যখন নজরান পৌঁছেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন, তখন তারা কোন প্রশ্ন ছাড়াই শোনামাত্র ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত খালিদ (রা) সেখানে অবস্থান করে তাদেরকে ইসলামের তা'লীম দিতে থাকেন এবং এক পত্রের মাধ্যমে নবী (সা)-কে এ সংবাদ অবহিত করেন। নবী করীম তাঁর পত্রের জবাবে নজরানের বনী হারিস ইবন কা'ব গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় আগমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এ পত্রের মর্মানুযায়ী খালিদ (রা) বনী হারিসের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলেন। নবী (সা) তাদেরকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে সেখানে অবস্থানের ব্যবস্থা করেন। ১০ হিজরীর যিলকা'দ মাসে যখন তারা মদীনা থেকে নজরান গমন করেন, তখন নবী (সা) কায়স ইবন হাসানকে তাদের নেতা নিয়োগ করেন এবং প্রতিনিধি দল ফিরে যাওয়ার পর আমর ইবন হাযমকে ফরয ও সুন্নাতের এবং ইসলামের বিধি-বিধান তালীম প্রদান ও সাদাকা আদায়ের আমিল নিয়োগ করে প্রেরণ করেন। সাথে একটি ফরমান বা প্রজ্ঞাপন লিখে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিটি হলো এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله يايها الذين امنوا أوفوا بالعقود عهد من محمد النبى رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن أمره بتقوى الله فى أمره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - وأمره أن ياخذ بالحق كما أمره الله وان يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القرآن ويفقهم فيه وينهى الناس فلا يمس القران انسان الاوهو طاهر - ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم ويلين للناس فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم فان الله كره الظلم ونهى عنه فقال الا لعنة الله على الظالمين - ويبشر الناس بالجنة وبعملها وينذر الناس النار وعملها ويستائف الناس حتى يفقهوا فى الدين ـ ويعلم الناس معالم الحج وسنة وفريضة وما أمر الله به والحج الاكبر والحج الاصغر هو العمرة وينهى الناس ان يصلى احد فى ثوب صغير الا ان يكون ثوبًا تبنى طرفيه على عاتقيه وينهى الناس ان يحتبى احد فى ثوب واحد بفضى بفرجه الى السماء وينهى ان يعقص احد شعر راسه فى فقاه وينهى اذا كان بين الناس هيج عن الدُّعا الى القبائل والعشائر ويكن دعواهم الى الله عز وجل وحده لاشريك له فمن لم يدع الى الله ودعا الى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم الى الله وحده لاشريك له ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق وأرجلهم الى الكعبين ويمسحون برؤسهم كما أمرهم الله وأمر بالصلواة لوقتها واتمام الركوع والسجود والخشوع ويغلس بالصبح ويهجر بابها جهرة حين تميل الشمس وصلاة العصر والشمس فى الارض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لايؤخر حتى تبدو لنجوم فى السماء والعشاء اول الليل وامر بالسعى الى الجمعة اذا نودى لها والغسل عند الرواح اليها وامره ان يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين فى الصدقه من العقار عشر ماسقت العين وسقت السماء على ماسقى الغرب نصف العشر وفى كل من الابل شاتان وفى عشرين اربع شياه وفى كل ثلاثين من البقر تبيع جزع أو جذعة وفى كل أربيعن من

الغنم سائمة وحدها شاة فانها فريضة الله التى افترض على المؤمنين فى الصدقة فمن زاد خيرا فهو خيرًا له وانه من اسلم من يهودى او نصرانى اسلامًا خالصا من نفسه ودان بدين الاسلام فانه من المؤمنين له مثل مالهم وعليه مثل ماعليهم ومن كان على نصرانية او يهودية فانه لايرد عنها وعلى كل حالم ذكر او انثى حرا وعبد دينار وافرٍ او عوضه ثيابًا فمن ادى ذلك فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منع ذالك فانه عدوٌ لله ورسوله وللمؤمنين جميعا صلواة الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته ـ

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম এটা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ফরমান। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ কর। এ অঙ্গীকারনামা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে আম্‌র ইবন হাযমকে প্রদান করা হয়, যখন তাঁকে ইয়ামনের প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করে সেখানে প্রেরণ করা হয়। সমস্ত কাজে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী ও নেককারদের সাথে রয়েছেন। তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন হক ও সত্যকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে এবং লোকজনকে কল্যাণের নির্দেশ এবং কল্যাণের সুসংবাদ দিবে। লোকজনকে কুরআনের তা'লীম এবং এর অর্থ উপলব্ধি করার পদ্ধতি বলে দিবে। কুরআন পবিত্রতা ব্যতীত স্পর্শ না করার নির্দেশ প্রদান করবে এবং লোকজনকে এর উপকারিতা ও অনিষ্টতা সম্পর্কে অবহিত করবে। হক ও সঠিক পথে চলার ব্যাপারে লোকজনের সাথে কোমল ব্যবহার করবে এবং যুল্‌ম করার সময় যালিমের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যুলম হারাম করেছেন এবং এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক।

লোকজনকে বেহেশতের সুসংবাদ এবং বেহেশতের আমল সম্পর্কে অবহিত করবে। দোযখের ভয় প্রদর্শন করবে এবং দোযখের আমল সম্পর্কে অবহিত করবে। লোকজনের সাথে তোমার আন্তরিকতা সৃষ্টি করবে যাতে তারা তোমার থেকে দ্বীন শিখতে পারে। লোকজনকে ফরয, সুন্নাত, হজ্জ ও উমরার তা'লীম দিবে এবং নামায সম্পর্কে তাদেরকে এটা অবহিত করবে যে, কোন ব্যক্তি যেন ক্ষুদ্র কাপড় পরিধান করে তা পিঠের উপর রেখে নামায না পড়ে, তবে কাপড় এতটুকু প্রশস্ত হতে হবে, যাতে এর দ্বারা উভয় কাঁধ ঢেকে যায়। লোকজনকে এভাবে কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করবে, যার ফলে আকাশের নিচে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে যায়। লোকজনকে তাদের গর্দানের পাশে চুল না বাঁধার জন্য নিষেধ করবে। যখন পরস্পর যুদ্ধ হবে তখন গোত্র ও

গোত্রের লোকজন ও দেশের নামের উপর সাহায্য বা সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে আহবান জানাবে না; বরং এক আল্লাহ ও তাঁর বিধানের প্রতি লোকজনকে আহবান করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবান না করে গোত্র, কাওম ও দেশের দিকে আহবান করে, তাহলে তরবারি দ্বারা তার গর্দান কেটে দিবে, যাতে তার আহবান এক আল্লাহ তা'আলার দ্বীনের দিকে হয়ে যায়। অর্থাৎ গোত্র, কাওম ও দেশের প্রতি আহবান থেকে বিরত হয়ে যায়।

লোকজনকে পরিপূর্ণভাবে অযূ করা, নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা, নামাযে পরিপূর্ণভাবে রুকূ'ও সিজ্‌দা করা, বিনয় ও নম্রতার সাথে নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করবে। এ ছাড়া ফজর নামায কিছুটা অন্ধকার থাকতে এবং যোহর নামায সূর্য একটু ঢলে যাওয়ার পর আদায় করা, আসর নামায ঐ সময় পড়া যখন সূর্য পৃথিবীতে তাপ ছড়াতে থাকে এবং অস্ত যেতে থাকে, সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে এবং রাত শুরু হলেই মাগরিব নামায আদায়, এরূপ বিলম্ব করা যাবে না, যার ফলে নক্ষত্রসমূহ উদিত হয়ে যায়। রাতের প্রথম এক -তৃতীয়াংশে ইশার নামায আদায় করার নির্দেশ দিবে।

জুমু'আর নামাযের জন্য যখন আযান দেয়া হবে তখন দৌড়ে জুমু'আর নামাযের জন্য মসজিদে গমন করা এবং জুমু'আর নামাযের পূর্বে গোসল করার জন্য নির্দেশ দিবে। এ ছাড়া গনীমতের মাল থেকে আল্লাহর হক এক-পঞ্চমাংশ বের করে রাখবে। মুসলমানদের জমি থেকে উৎপাদিত শস্য থেকে সাদাকা আদায় করা, যে জমি ঝর্ণার পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা চাষাবাদ করা হয়, ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের এক-দশমাংশ ওয়াজিব হিসেবে দান করা, যে জমির চাষাবাদ কুয়ার পানি দ্বারা করা হয়, ঐ জমির উৎপাদিত শস্যের বিশ ভাগের এক অংশ ওয়াজিব হিসেবে আদায় করার নির্দেশ প্রদান করবে।

(এছাড়া যাকাতের আরো বিধান হলো এই যে,) দশটি উটের জন্য দু'টি বকরী, বিশটি উটের জন্য চারটি বকরী, ত্রিশটি গাভীর জন্য একটি গাভী, চল্লিশটি বকরীর জন্য একটি বকরী যাকাত হিসেবে আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ পাক এটা ঈমানদারগণের উপর ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি ফরযের চেয়ে অতিরিক্ত দান করবে এটা তার জন্য উত্তম হবে।

যে ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান খাঁটি অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করবে, সে ঈমানদারগণের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের অধিকার ও বিধান মুসলমানদের মত হবে। যে তার ইয়াহূদী অথবা খ্রিস্টান ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বা অটল থাকবে এবং ইসলামী হুকুমতের প্রজা হিসেবে বাস করতে সম্মত হবে, পুরুষ অথবা নারী, আযাদ অথবা দাস প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্কের উপর জিযিয়া প্রদান করা অথবা এর পরিবর্তে কাপড় দান করা তার উপর জরুরী হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জিযিয়া আদায় করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

দায়িত্বে থাকবে। অর্থাৎ তার জীবন ও সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা নিরাপদ ও হিফাযতে থাকবে। যে ব্যক্তি তা প্রদান করতে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং সমস্ত মু'মিনের শত্রু। আল্লাহ পাকের সালাত, সালাম, রহমত ও বরকত হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বর্ষিত হোক।"[১]

ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর সারীয়া প্রেরণ

বিদায় হজ্জের পূর্বে ১০ম হিজরীর রমযান মাসে নবী (সা) হযরত আলী (রা)-কে তিন'শ লোকের নেতা নিয়োগ করে ইয়ামান প্রেরণ করেন এবং পবিত্র হাতে হযরত আলীর মাথায় পাগড়ী বেঁধে দেন। এর তিনটি অংশ ছিল। পাগড়ীর একটি অংশ এক হাত পরিমাণ সামনে ঝুলিয়ে দেন এবং এক বিঘত পরিমাণ পিছনে ছেড়ে দেন। নির্দেশ করেন, সোজা চলে যাও, অন্য কোনদিকে দৃষ্টিপাত করবে না। সেখানে পৌঁছে প্রথমে যুদ্ধ করবে না বরং তাদেরকে প্রথম ইসলামের দাওয়াত প্রদান করবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তাদের সাথে মুকাবিলা করবে না। আল্লাহর শপথ, যদি তোমার হাতে এক ব্যক্তি হিদায়তপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এটা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে এর চেয়ে উত্তম।

হযরত আলী তিন'শ আরোহীকে সাথে নিয়ে কানাত নামক স্থানে গিয়ে তাঁবু স্থাপন করেন। সেখান থেকে সাহাবাদের এক-একটি দল বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করেন। মুসলিম বাহিনীর একটি দল সর্বপ্রথম মায্‌জাজ এলাকায় প্রবেশ করে এবং অনেক শিশু, নারী এবং উট ও বকরী ধরে নিয়ে আসে। এ সমস্ত গনীমতের মাল এক স্থানে জমা করা হয়। অতঃপর অন্য একটি দলের সাথে মুকাবিলা হয়। হযরত আলী (রা) তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং মুসলমানদের উপর তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করে। তখন হযরত আলী (রা) তাদের উপর হামলা করেন। ফলে তাদের বিশ ব্যক্তি নিহত হয় এবং অন্যান্যরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কিছু বিরতির পর হযরত আলী (রা) পুনরায় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং দ্বিতীয়বার তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। এবার তারা নিজেদের এবং কাওমের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর অঙ্গীকার করেন যে, আল্লাহর হক সাদাকা আমরা আদায় করব।

এরপর হযরত আলী (রা) গনীমতের মাল একত্র করেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বের করে বাকী পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করেন। এ সময় তিনি অন্য একজনকে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করে দ্রুত অন্য সাথীদের পূর্বেই মক্কা গমন করেন। কেননা হযরত আলী (রা) এ সংবাদ অবহিত হয়েছিলেন যে, নবী (সা)

১. সীরাতে ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ২৪১।

মদীনা থেকে হজ্জের জন্য রওয়ানা হয়েছেন। ফলে হযরত আলী (রা) ইয়ামন থেকে সোজা মক্কা পৌঁছেন এবং বিদায় হজ্জে নবী (সা)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।[১]

বিদায় হজ্জ

আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে মক্কা মুকাররমা বিজয় হয়। লোকজন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করা হয়। বিভিন্ন গোত্রসমূহ দূর-দূরান্ত থেকে এসে কুফর ও শিরক থেকে তাওবা করে এবং তাওহীদ ও রিসালাতকে খাঁটি অন্তরে স্বীকার করেছে, নবুওয়াতের ফরয (দায়িত্ব) আদায় হয়েছে। বর্ণনা ও আমলের মাধ্যমে ইসলামী আহকামের তা'লীম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। ৯ম হিজরীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে প্রেরণ করে কা'বা ঘরকে জাহেলিয়াতের রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করা হয়।

এবার নবী (সা)-এর স্বয়ং হজ্জের ফরয বাস্তবে সম্পন্ন করার সময় এসেছে, যাতে উম্মাতগণ সর্বকালের জন্য উপলব্ধি করতে পারে যে, কিরূপ মর্যাদার সাথে হজ্জ আদায় করতে হয় এবং হজ্জ আদায়ের জন্য হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কি পদ্ধতি ছিল। হজ্জের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাওহীদের তা'লীম ছিল এবং শিরকের কথা ও জাহেলিয়াতের রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। এ জন্য রাসূল (সা) তালবীয়ার মধ্যে لاشريك শব্দটি বিশেষভাবে বলতেন, যাতে শিরকের কোন প্রকার চিহ্ন বাকী না থাকে। রাসূল (সা) এভাবে তালবীয়া বলতেন ঃ

لبيك أللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك -

হিজরতের পূর্বে নবী (সা) কয়েকবার হজ্জ আদায় করেন। জামি 'তিরমিযীতে হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) হিজরতের পূর্বে দু'বার হজ্জ আদায় করেন। ইবনু আলী নিহায়া নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল (সা) প্রতি বছর হজ্জ আদায় করতেন। ইবন জাওযী বলেন, এটা সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, তিনি কতবার হজ্জ আদায় করেছেন। তবে এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, হিজরতের পর তিনি মাত্র একবার হজ্জ আদায় করেছেন।

৯ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার আয়াত নাযিল হয়। এ বছর নবী (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে হজ্জের আমীর নিযুক্ত করে মক্কা মুকাররমায় প্রেরণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ হজ্জ আদায় করেন। ১০ম হিজরীর যিলকা'দ মাসে নবী করীম (সা) স্বয়ং হজ্জে গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং চতুর্দিকে এ ঘোষণা দেয়া হয় যে, এ বছর রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জে গমন করবেন। অতঃপর ১০ম হিজরীর ২৫ যিলকা'দ মাসের শনিবার দিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নবী (সা) মদীনা

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১০৩

থেকে রওয়ানা হলেন। মুহাজির, আনসার এবং আত্মনিবেদিত সাহাবায়ে কিরামসহ অনেক দল রাসূল (সা)-এর সঙ্গী হলেন। নবুওয়াতের উজ্জ্বল প্রদীপ মহানবী (সা)-এর সাথে নব্বই হাজার অথবা এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার অথবা এর চেয়েও অধিক সাহাবা (রা) সফরসঙ্গী ছিলেন। যিলহজ্জ মাসের ৪ তারিখ রবিবার নবী (সা) মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। (শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ. ১০৫)।

নয়জন উম্মুল মু'মিনীন এবং সাইয়্যেদাতুন্ নিসা হযরত ফাতিমাতুয যাহ্‌রা (রা) সাথে ছিলেন। এ ছাড়া বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষ খাদেমগণ সঙ্গী ছিলেন। ইতিপূর্বে রমযান মাসে হযরত আলী (রা)-কে সাদাকা আদায়ের জন্য ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তিনি ও সেখান থেকে মক্কায় এসে নবী করীম (সা) সাথে মিলিত হন। অতঃপর রাসূল (সা) হজ্জের রুকনসমূহ আদায় করেন এবং আরাফাতের ময়দানে এক দীর্ঘ খুত্‌বা পেশ করেন। প্রথমত তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর ইরশাদ করেন, হে মানব মণ্ডলী! আমি যা বলছি তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর, আমি হয়ত আগামী বছর এখানে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না। হে লোক সকল! তোমাদের জীবন-সন্মান, ধন-সম্পদ আজ থেকে পরস্পরের জন্য হারাম করা হলো। যেমন- আজকের এই পবিত্র দিন, এ মাস এবং এ শহর সবার জন্য (হত্যাকাণ্ড ও অপরাধ থেকে) হারাম ঘোষণা করা হলো। অন্ধকার যুগের সমস্ত রীতিনীতি আমার পদতলে পদদলিত। অন্ধকার যুগের সমস্ত খুন অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম (আমার নিজ গোত্রের) রাবী'আ ইবন হারিস ইবন আবদুল মুত্তালিবের খুন যা হুযায়ল গোত্রের উপর ছিল, এর প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম। অন্ধকার যুগের সমস্ত সুদ বাতিল করা হলো। তোমাদের শুধু ঋণের মূল অংশ প্রদান করতে হবে। সর্বপ্রথম আমি (আমার চাচা) আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিবের সুদ বাতিল করলাম।

অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের কথা বর্ণনা করেন। তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের নিকট এমন সুদৃঢ় বস্তু রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে অনুসরণ কর তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত (হাদীস)। কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, বলো, তোমরা কি জবাব দেবে? সাহাবাগণ আরয করলেন, আমরা সাক্ষী দেব যে, আপনি আমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহর আমানত আদায় করেছেন, উম্মাতের কল্যাণ করেছেন। নবী (সা) তিনবার শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলেন ঃ اللهم اشهد (হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক)।

নবী (সা) খুতবা সমাপ্ত করলেন। হযরত বিলাল (রা) যোহর নামাযের আযান দেন। যোহর ও আসর একই সময় আদায় করা হয়। অতঃপর রাসূল (সা) আল্লাহ

তা'আলা হামদ্ যিকর, শোকর, ইসতিগফার ও দু'আয় নিমগ্ন হলেন। ঐ মুহূর্তে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামত তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" সূরা মায়িদা ঃ ৩ (ফাতহুল বারী ও শারহে মাওয়াহিব)

১০ যিলহজ্জ মিনায় পৌঁছে নবী (সা) (৬৩ বছর বয়সে) তাঁর পবিত্র হাতে কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পক্ষ থেকে ৩৭টি কুরবানী করেন। নবী (সা) মিনাতেও আরাফাতের অনুরূপ খুতবা প্রদান করেন। অবশেষে বিদায়ী তাওয়াফ শেষ করে যিলহজ্জ মাসের শেষদিকে মদীনায় গমনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। মিনায় পবিত্র মাথা মুণ্ডন করার পর পবিত্র কেশ সাহাবাগণের মধ্যে বন্টন করে দেন, যাতে সাহাবায়ে কিরাম বরকত হিসেবে তাঁদের নিকট তা সংরক্ষণ করেন। যেহেতু এই হজ্জের পর দ্বিতীয়বার রাসূল (সা)-এর হজ্জ আদায়ের সুযোগ আসেনি এবং মিনা ও আরাফাতের খুতবায় এদিকে ইঙ্গিতও করেছেন এ কারণে এই হজ্জকে 'বিদায়ী হজ্জ' (حجة الوداع) বলা হয়। কেননা নবী (সা) এই হজ্জের মাধ্যমে স্বীয় উম্মাত থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই হজ্জকে হুজ্জাতুল ইসলামও বলা হয়। কেননা হজ্জ ফরয হওয়ার পর ইসলামে এটাই ছিল প্রথম হজ্জ।

বিদায় হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য যাদুল মা'আদ ও শারহে মাওয়াহিব (৭খ. পৃ. ১৩) দেখা যেতে পারে।

গাদীরে [১] খুমের খুতবা

নবী (সা) যখন হজ্জ থেকে আগমন করেন তখন পথে হযরত বুরায়দা আসলামী হযরত আলী (রা) সম্পর্কে কিছু অভিযোগ করেন। রাসূল (সা) গদীরেখুমে (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানে নাম) এক খুতবা পেশ করেন এবং ইরশাদ করেন, আমিও একজন মানুষ, অচিরেই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন দূত বা বাহক আমাকে ডাকার জন্য আগমন করবেন। আমি ঐ দাওয়াত কবূল করব। ইশারা ছিল এই দিকে যে, ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী হয়েছে। অতঃপর আহ্লে বায়ত বা নবী পরিবারের প্রতি মহব্বতের তাগীদ করেন। হযরত আলী সম্পর্কে ইরশাদ করেন من كنت مولاه فعلى مولاه (আমি যার দোস্ত আলীও তার দোস্ত)।

১. দ্রষ্টব্য, শারহে মাওয়াহিব, ৭খ. পৃ. ১৩

খুতবার পর হযরত উমর (রা) হযরত আলী (রা)-কে মুবারকবাদ জানান। হযরত বুরায়দার অন্তরও পরিষ্কার হয়ে যায়। যে বিষন্নতা ছিল তা দূর হয়ে যায়। এই খুতবার দ্বারা এটা বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, হযরত আলী (রা) তাঁর প্রিয় ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সাথে এবং আমার পরিবারবর্গের সাথে মহব্বত রাখা ঈমানের দাবি। তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি ঈমানের দাবির পরিপন্থি।

হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু হযরত আলী (রা)-এর মহব্বতের গুরুত্ব বর্ণনা করা। ইমামত ও খিলাফতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে, মহব্বত ও খিলাফতের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। মহব্বত ও খিলাফতের জন্য এটি জরুরী নয় যে, যার সাথে মহব্বত থাকবে, তিনি কোন বিরতি ছাড়াই খলীফা হবেন। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী ও বন্ধুদের সাথে মহব্বত থাকে, এর ফলে কি সবাই খলীফা হয়ে যাবে? হযরত আব্বাস, হযরত ফাতিমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা) সবাই নবী (সা)-এর প্রিয় হওয়া ব্যতীত কলিজার টুকরাও ছিলেন। যদি মহব্বত খিলাফতের দলীল হয়, তাহলে ইমাম হাসান (রা) প্রথম খলীফা হওয়া উচিত। যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটা বলা হয় যে, খিলাফত ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়ার উপর নির্ভর করে, তাহলে সর্বাগ্রে হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রা) ক্রমান্বয়ে ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন এবং চতুর্থ স্তরে হবেন হযরত আলী (রা)। শী'আ সম্প্রদায়ের মাযহাব অনুযায়ীও হযরত আলী (রা) চতুর্থ খলীফা হওয়ার অধিকারী। যদি আহ্‌লি সুন্নাত তাঁকে চতুর্থ খলীফা নির্বাচন করে, তাহলে অভিযোগ করা হবে কেন? এছাড়া গাদীরে খুমে যখন নবী (সা) খুতবা প্রদান করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং নবীর পরিবারবর্গও উপস্থিত ছিলেন। কেউ খুতবার এই অর্থ মনে করেনি যে, রাসূল (সা)-এর পর কোন বিরতি ছাড়াই হযরত আলী (রা) খলীফা হবেন। অতঃপর দু'মাস পর নবী (সা) ইনতিকাল করেন এবং সাকীফায়ে বনী সায়েদায় খিলাফতের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ঐ সমস্ত সাহাবাও উপস্থিত ছিলেন যাঁরা গাদীরে খুমের খুতবার সময় উপস্থিত ছিলেন। কেউ এই হাদীসকে হযরত আলীর ইমামত বা খিলাফতের দলীল হিসেবে পেশ করে নি। হযরত আলী, হযরত আব্বাস, বনী হাশিমের কেউ কোন সময় হযরত আলীর খিলাফতের অধিকারের জন্য এই হাদীস পেশ করে নি।

বস্তুত গাদীরে খুমের খুতবায় নবী (সা) হযরত আলী, আহলি বায়ত এবং বংশধরগণের প্রতি মহব্বতের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁদের প্রতি শত্রুতা করতে নিষেধ করেছেন। আল-হামদু লিল্লাহ, সমস্ত আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নবী পরিবারের প্রতি একান্ত আন্তরিকভাবে মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন করা স্বীয় দ্বীন ও ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করে। কিন্তু শী'আদের মত এত অবুঝ ও অতি উৎসাহী নয়

যে, মহব্বতকে ইমামতের দলীল হিসেবে গ্রহণ করবে। নবী পরিবারের প্রত্যেকের জন্যই মহব্বত জরুরী কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল (সা)-এর সমস্ত নিকট আত্মীয়কে ইমাম ও খলীফা মনোনীত করতে হবে।

বিদায় হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন

নবী (সা) বিদায় হজ্জ সম্পন্ন করে যিলহজ্জ মাসের শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছেন। কয়েকদিন পর ১০ম হিজরী শেষ হয়ে ১১ হিজরী শুরু হয়।

জিব্‌রাঈল আমীনের আগমন

বিদায় হজ্জ থেকে আগমনের কিছুদিন পর হযরত জিব্‌রাঈলী আমীন সাদা পোষাক পরিধান করে একজন অপরিচিত ব্যক্তির আকৃতিতে নবী করীমের (সা) দরবারে আগমন করেন, এবং অত্যন্ত আদবের সাথে দু'হাটু ভেঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপবেশন করেন। অতঃপর ঈমান, ইসলাম, ইহ্‌সান, কিয়ামত এবং কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। রাসূল (সা) জবাব প্রদান করেন। যখন তিনি উঠে চলে গেলেন, তখন সাহাবাগণকে বলেন, দেখ ইনি কে? সাহাবাগণ দেখার জন্য বের হয়ে কাউকে দেখতে পাননি। নবী (সা) তখন বলেন, ইনি ছিলেন জিব্‌রাঈল আমীন। ইনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। আমি সর্বদা তাঁকে চিনলেও আজ প্রথম তাঁকে চিনতে পারিনি।

সমীক্ষা ঃ নবী করীম (সা) জিব্‌রাঈল আমীনকে সিদ্‌রাতুল মুনতাহা এবং উফ্‌কে মুবীনে (افق مبين) মূল আকৃতির সাথে প্রত্যক্ষ করেছেন। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنُ [এবং তিনি তাঁকে অর্থাৎ রাসূল (সা) জিব্‌রাঈল আমীনকে উফ্‌কে মুবীনে দেখেছেন] وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (এবং নিশ্চয়ই তাকে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার রাসূল (সা) তাঁকে সিরাতুল মুনতাহায় দেখেছেন এছাড়া তিনি অসংখ্যবার নবী (সা)-এর দরবারে আগমন করেছেন। জিবরাঈল আমীন যে পোশাক ও যে আকৃতি নিয়েই রাসূল (সা)-এর দরবারে আগমন করতেন তখন তিনি তাঁকে চিনতে পারতেন।

بهر رنگ کے خواهی جامه می پوش * من انداز قدرت رامی شناسم تو خواهی جامه خواهی قباپوش * بهر رنگے ترامن می شناسم

"(হে জিব্রাঈল!) আপনি যে রঙের পোষাকই ইচ্ছে হয় পরিধান করুন অর্থাৎ যে আকৃতিই ধারণ করুন আপনার পরিচয় আমার জানা আছে। আপনি যে কোন পোশাক পরিধান করেন না কেন আমি সবরূপেই আপনাকে চিনি।"

কিন্তু এবার একজন বেদুঈনের আকৃতিতে মাসয়ালা জানার উদ্দেশ্যে প্রশ্নকারী হিসেবে আগমন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন পয়গাম নিয়ে আগমন করেননি। ফলে প্রথমত তিনি জিব্রাঈল আমীনকে চিনতে পারেন নি। জিব্রাঈল আমীন মজলিস থেকে উঠার পর রাসূল (সা) জিব্রাঈল আমীনকে চিনতে পারেন।

جبریل ازدست اوشر خرقه دار * درلباس وجبه شدزان اشکار

"জিব্রাঈল (আ) নিজের মত করে জুব্বা পরিহিত (বেদুইনরূপ) উপস্থিত। এ পোষাকে আবৃত হয়ে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন।"

সর্বশেষ প্রেরিত সারীয়া উসামা ইবন যায়িদ (রা) (১১ হিজরী)

২৬ সফর ১১ হিজরী সোমবার নবী (সা) রোমকদের মুকাবিলা করার উদ্দেশ্যে 'উবনা' নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ প্রদান করেন। এটা হলো ঐ স্থান যেখানে গাযওয়ায়ে মূতা সংঘটিত হয় এবং যে যুদ্ধে হযরত উসামা (রা)-এর পিতা হযরত যায়দ ইবন হারিসা, হযরত জা'ফর তায়্যার এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা) প্রমুখ শাহাদাত বরণ করেন।

এটা ছিল সর্বশেষ সারীয়া এবং নবী (সা) কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ বাহিনী। হযরত উসামা ইবন যায়িদকে রাসূল (সা) এ বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। এ বাহিনীতে প্রথম দিকের মুহাজিরগণ এবং উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামকে গমনের নির্দেশ প্রদান করেন।

বুধবার থেকে নবী করীম (সা)-এর রোগের কষ্ট বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বৃহস্পতিবার অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং পবিত্র হাতে পতাকা তৈরি করে উসামাকে দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

اغز باسم الله وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله -

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে জিহাদ কর এবং আল্লাহর সাথে যে কুফরী করে তার সাথে মুকাবিলা ও যুদ্ধ কর।"

হযরত উসামা (রা) পতাকা নিয়ে বাইরে আগমন করেন এবং বুরায়দা আসলামীর নিকট অর্পণ করেন। বাহিনীকে 'জুরুফ' নামক স্থানে সমবেত করেন। সমস্ত উঁচু মর্যাদা-সম্পন্ন মুহাজির ও আনসারগণ দ্রুত সেখানে একত্র হন। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা) রাসূল (সা)-এর সেবা করার জন্য মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) হযরত উসামা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে নবী (সা)-কে দেখার জন্য আসতেন। বৃহস্পতিবার যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং রাসূল (সা) ইশার নামাযের জন্য মসজিদে গমন করতে সক্ষম হলেন না, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-কে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং নিজের জায়গায়

তাঁকে ইমাম নিয়োগ করেন। মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে জুরুফ নামক স্থানে সৈন্যবাহিনীকে সমবেত করা হয়েছিল। সোমবার সকালে যখন নবী (সা)-এর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয় এবং তিনি কিছু সুস্থবোধ করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম এটা মনে করেন যে, রাসূল (সা) সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। এ সময় হযরত উসামা (রা) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করেন। এমনি মুহূর্তে হযরত উসামার আম্মা উম্মে আয়মান লোক মারফত এটা অবহিত করেন যে, রাসূল (সা) অন্তিমকাল ও মৃত্যু কষ্টে রয়েছেন। সুতরাং কোন বিলম্ব করবে না। পরক্ষণেই এ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। انا لله وانا اليه راجعون

সমগ্র মদীনায় আকস্মিক ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। সবাই দ্রুত মদীনায় ফিরে আসেন। বুবায়দা (রা) পতাকা নিয়ে এসে পবিত্র হুজরার দরজায় স্থাপন করলেন। নবী (সা)-এর ওফাতের পর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) খলীফা মনোনীত হওয়ার পর বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রথম কাজ হিসেবে তিনি হযরত উসামার বাহিনী প্রেরণ করেন এবং 'জুরুফ' নামক স্থান পর্যন্ত স্বয়ং বিদায় দেবার জন্য গমন করেন। এভাবে উসামা বাহিনী রওয়ানা হয় এবং চল্লিশ দিন পর বিজয় লাভ করে ফিরে আসেন। যারা মুকাবিলার জন্য এগিয়ে এসেছে, তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। স্বীয় পিতা যায়িদ ইবন হারিসা (রা)-এর হত্যাকারীকে হত্যা করেন এবং তাদের বাড়ি-ঘর ও বাগান আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মদীনার বাইরে গিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। যখন মদীনায় প্রবেশ করেন তখন মসজিদে নব্বীতে দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। অতঃপর স্বীয় ঘরে গমন করেন।[১]

আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল (সা) আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং তাসবীহ, তাহমীদ, তাওবা ও ইসতিগফারে নিমগ্ন হন।

সর্বপ্রথম যার দ্বারা নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল নিকটবর্তী হওয়া প্রকাশ পায় তা হলো আল্লাহপাকের নাযিলকৃত আয়াত ঃ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا- فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ - اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا -

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি তো তাওবা কবূলকারী।" (সূরা নাস্‌র)

---

১. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ২ খ, পৃ. ১৩৭।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন বিজয় ও সাহায্য এসে গিয়েছে, কুফর ও শিরকের মূলোৎপাটন করা হয়েছে, তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের স্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয়। দলে দলে লোক সত্য দ্বীনে প্রবেশ করছে। দুনিয়ায় আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে যায় এবং দ্বীন পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায়, তখন নবী (সা)-কে (সা) দুনিয়ায় প্রেরণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়ে যায়, রাসূল যা কাজ ও দায়িত্ব ছিল তা সম্পন্ন হয়। এবার আমার (আল্লাহর) নিকট আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করেছেন, এখন ঘরের মালিকের হজ্জের (যিয়ারত) প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহ তা'আলা নবী (সা)-কে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তা সম্পন্ন হয়েছে। যিনি আপনাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, এখন তাঁর নিকট গমন করুন। এ ধ্বংসশীল পৃথিবী আপনার থাকার স্থান নয়। আপনার মত পবিত্র সত্তার জন্য মালায়ে আ'লা এবং রফিকে আ'লার সাথে মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সুতরাং নবী (সা) উঠা-বসা ও আসা-যাওয়ার সময় পাঠ করেন ঃ

سبحنك أللهم ربنا وبحمدك أللهم اغفرلى وتب على انك أنت التواب الرحيم -

আবার কখনো পাঠ করতেন ঃ

سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب اليه

কখনো পাঠ করতেন ঃ

سبحانك أللهم وبحمدك استغفرك وأتوب اليك

(দুররে মনসূর, ৬ খ. পৃ. ৪০৮)।

নবী (সা) একবার হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলেন, জিবরাঈল আমীন প্রতি রমযানে আমার সাথে কুরআন করীম শুধু একবার খতম করতেন কিন্তু এই রমযানে দু'বার খতম করেছেন। আমার মনে হয়, আমার রওয়ানা হওয়ার সময় অর্থাৎ ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী রয়েছে।

প্রতি বছর পবিত্র মাহে রমযানে তিনি দশ দিন ইতিকাফ করতেন, কিন্তু এ বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করেন।

বিদায় হজ্জে যখন এ আয়াত ঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الاية নাযিল হয়, তখনই নবী (সা) আল্লাহ পাকের ইঙ্গিত উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

منتهائے کمال نقصان است * گل بر بردلوقت سیرابی

“চূড়ান্ত পরিপূর্ণতাই অশনি-সংকেত বহন করে; যেমন কিনা ফুল পূর্ণরূপে ফুটেই ঝরে যায়।”

এ জন্য বিদায় হজ্জের খুতবায় এ ঘোষণা প্রদান করেন যে, সম্ভবত আমি এরপর তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারব না, হয়ত তোমাদের সাথে হজ্জ করতে পারব না।. অত:পর গাদীরে খুমের বক্তৃতায় বলেছেন, আমিও একজন মানুষ। মানুষের জন্য দুনিয়া চিরস্থায়ী নয়। وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (আপনার পূর্বে কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করা হয়নি)। সম্ভবত অচিরেই আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দূত আগমন করবে। এ কারণে বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর একদিন নবী (সা) জান্নাতুল বাকীতে গমন করেন এবং আট বছর পর ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের উপর জানাযার নামায আদায় করেন, তাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করেন। যেমন কেউ কারো থেকে বিদায় নেয়ারকালে করে থাকে।

জান্নাতুল বাকী থেকে আগমনের পর মসজিদে নব্বীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে খুতবায় বলেন ঃ আমি তোমাদের পূর্বে চলে যাচ্ছি যাতে আমি তোমাদের জন্য হাউসে কাওসার ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। হাউসে কাওসারের নিকট তোমাদের সাথে মিলিত হবার অঙ্গীকার রইল, আমি এখান থেকে হাউযে কাওসার প্রত্যক্ষ করছি। নিশ্চয়ই আমাকে যমীনের ভাণ্ডারের চাবি দেয়া হয়েছে। আমার পর তোমাদের উপর এই আশংকা নেই যে, তোমরা সবাই শিরকে মগ্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ পূর্বের মত সবাই মুশরিক হয়ে যাবে। তবে ভয় ও আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে মগ্ন হয়ে যাবে এবং পরস্পর যুদ্ধ করবেও ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

রোগের সূচনা

সফর মাসের শেষ দশ দিনের কোন এক রাতে নবী (সা) উঠেন এবং গোলাম আবূ মুইহাবাকে জাগ্রত করে বললেন, জান্নাতুল বাকীর লোকদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আমাকে দু'আ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে গিয়ে দু'আ করে ফিরে আসলেন, হঠাৎ শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। মাথা ব্যথা ও জ্বর শুরু হয়ে গেল।

এটা বুধবার দিন উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে রাসূল (সা)-এর অবস্থানের নির্ধারিত দিন ছিল। এ অবস্থায়ও নবী (সা) পর্যায়ক্রমে উম্মুল মু'মিনীনগণের ঘরে গমন করতেন। যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন উম্মুল মু'মিনীনদের অনুমতিক্রমে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে গমন করেন এবং সোমবার দিন হযরত আয়েশা (রা)-এর হুজরায় ইনতিকাল করেন। তের অথবা চৌদ্দ দিন রাসূল (সা) অসুস্থ ছিলেন। শেষ সপ্তাহ সেবাযত্ন হযরত আয়েশা (রা) করেছিলেন।[২]

১. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৫১, ২৫০, ২৫৫।

২. প্রাগুক্ত।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল আমীন যখন সূরা নাসর অর্থাৎ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ الاية নিয়ে নাযিল হলেন, তখন নবী করীম (সা) বললেন, এ সূরায় আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করা হয়েছে। জিবরাঈল আমীন বললেন, وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰى (আখিরাত আপনার জন্য এ দুনিয়ার থেকে উত্তম)। (তাবারানী হাদীসে জাবির (রা) থেকে)[১]

অসুস্থতার মধ্যে নবী (সা) আসওয়াদ আনসী, মুসায়লামা কায্যাব এবং তুলায়হার নবুওয়াতের দাবি এবং কিছু লোকের মুরতাদ হওয়ার সংবাদ অবগত হলেন। তিনি মুরতাদদের সাথে জিহাদের ওসীয়্যত ও তাকীদ করেন এবং আসওয়াদ আনসীর বিদ্রোহ দমন করার জন্য আনসারগণের একটি দল প্রেরণ করেন। নবী (সা)-এর ইনতিকালের একদিন পূর্বে আসওয়াদ আনসীকে হত্যা করা হয়।[২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) মৃত্যু রোগের সময়টা এটা বলতেন যে, এই কষ্ট ঐ বিষের প্রতিক্রিয়া, যা আমি খায়বারে খেয়েছিলাম। বুখারী শরীফের অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা)-এর অভ্যাস ছিল এই যে, যখন তিনি অসুস্থ হতেন তখন সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস তিলাওয়াত করে নিজের উপর ফুঁ দিতেন।

অতঃপর স্বীয় হাত মুবারক সমস্ত দেহের উপর ফিরাতেন। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা)-এর অসুস্থতার শেষের দিকে معوذات পাঠ করে তাঁর উপর ফুঁ দিতাম কিন্তু বরকতের জন্য নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হাত তাঁর দেহ মুবারকে ফিরাতাম।

সাইয়্যেদাতুন নিসা হযরত ফাতিমার (রা) ক্রন্দন ও হাসি

ইনতিকালের পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় নবী করীম (সা) হযরত ফাতিমাকে ডাকলেন এবং কানে কানে কিছু কথা বললেন। এতে হযরত ফাতিমা (রা) কেঁদে ফেললেন। অতঃপর তিনি পুনরায় হযরত ফাতিমার কানে কানে কিছু কথা বললেন। এবার হযরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর ইন্‌তিকালের পর আমি হযরত ফাতিমাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বলেছেন, প্রথমত রাসূল (সা) আমাকে বলেন যে, জিবরাঈল প্রত্যেক রমযান মাসে একবার সম্পূর্ণ কুরআন শুনাতেন। এ বছর দু'বার শুনিয়েছেন। এতে আমার ধারণা হয় যে, এই রোগেই আমার ইনতিকাল হবে। এটা শুনে আমি কেঁদে ফেলি। অতঃপর তিনি ইরশাদ

১. প্রাগুক্ত

২. ইবন আসীর, ২ খ, পৃ. ১৫৩

করেন যে, আমার পরিবারবর্গের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সাথে মিলিত হবে। এটা শুনে আমি হেসে ফেলি। বস্তুত রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের ছ'মাস পর হযরত ফাতিমা (রা) ইনতিকাল করেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) দ্বিতীয়বার বলেছেন, তুমি বেহেশতের সমস্ত নারী নেত্রী হবে।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, নবী (সা) যখন জান্নাতুল বাকী থেকে আগমন করেন, তখন আমার মাথায় ব্যথা ছিল। এ অবস্থায় আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো- وارأساه (হায় আমার মাথা অর্থাৎ এ কষ্টের কারণে আমার মৃত্যু হতে পারে) রাসূল (সা) বললেন ঃ بل أنا أقول ورأساه (বরং আমি বলছি, হায় আমার মাথা)। অর্থাৎ আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সম্ভবত এই ব্যথা আমার মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ। অতঃপর তিনি বলেন, হে আয়েশা! যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর তাহলে এতে আমার কি ক্ষতি হবে। আমি কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করব এবং তোমার জানাযা পড়াব, তোমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করব। হযরত আয়েশা (রা) (অভিমানের সুরে) বললেন, সম্ভবত আপনি আমার মৃত্যু কামনা করছেন। যদি আমি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আপনি ঐ দিনই আমার ঘরে অন্য একজন স্ত্রীর সাথে আরাম করবেন। অর্থাৎ আমার মৃত্যুর পর আপনি আমাকে ভুলে যাবেন এবং অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে মগ্ন হয়ে যাবেন। নবী (সা) এটা শুনে মৃদু হাসলেন। কেননা এ হলো সরলা মু'মিনা নারী। তাঁর খবর নেই যে, আমিই এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি এবং সে আমার পর জীবিত থাকবে।[২]

কাগজ আনতে বলার ঘটনা

ইনতিকালের চার দিন পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, তখন যাঁরা নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরকে বলেন, কাগজ কলম নিয়ে এসো, যাতে আমি তোমাদের জন্য একটি ওসীয়তনামা লিখে দিতে পারি। ফলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। অনেকেই মতানৈক্য শুরু করেন। হযরত উমর (রা) বলেন, নবী (সা) এখন অসুস্থ, প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন। এমনি অবস্থায় আরো কষ্ট দেয়া সমীচীন হবে না। আল্লাহর কিতাব সামনে রয়েছে যা আমাদেরকে গুমরাহী থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট। কেউ কেউ হযরত উমরের সমর্থন করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দোয়াত-কলম এনে লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং বলেন اهجر استفهموه। নবী (সা) রোগের প্রচণ্ডতার কারণে বেহুশ অবস্থায় معاذ الله কোন প্রলাপ বা অর্থহীন কথা বলেছেন? স্বয়ং রাসূল (সা) কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও। অর্থাৎ নবী (সা) হলেন

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০৩।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৪।

আল্লাহর নবী ও রাসূল। তাঁর মুখ ও অন্তর ভুল-ত্রুটি থেকে পবিত্র ও নিরাপদ। معاذ الله। অন্যান্যদের মত এরূপ নয় যে, অসুস্থতার কারণে প্রলাপ বা বেহুদা কথা বলবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা) একবার স্বীয় পবিত্র মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, শপথ ঐ পবিত্র সত্তার যাঁর নিয়ন্ত্রণ ও অধীনে আমার জীবন, এ মুখ থেকে কোন অবস্থায় সত্য ও ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।

اَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ এটা হযরত উমরের বাক্য নয়, বরং এটা তাদের কথা, যাদের মতামত হযরত উমরের মতের বিরোধী ছিল। হযরত উমরের মত ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যাতে লিখার জন্য কষ্ট দেয়া না হয়। কোন কোন লোকের মত ছিল এই যে, দোয়াত-কলম হাযির করে লিপিবদ্ধ করিয়ে নেয়া উচিত। তারা হযরত উমরের জবাবে বলেন, اهجر استفهموه। এর অর্থ হলো এই যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন, তখন কেন লিখিয়ে নেয়া হবে না? কেননা নবী (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে কখনো কোন প্রলাপ ও অর্থহীন কথা বের হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। এ জন্য ঐ সমস্ত লোক اهجر শব্দটি استفهام انكارى, বা না প্রশ্নবোধক অভিযোগ বলেছেন। স্বয়ং এর বক্তা ছিলেন না। যে রিওয়ায়াত এ বাক্য প্রশ্নবোধক ব্যতীত বর্ণিত হয়েছে এটাও প্রশ্নবোধক (استفهام)-এর উপর আরোপিত এবং সেখানে প্রশ্নবোধকের হরফ উহ্য রয়েছে।

মজলিসে মতানৈক্য শুরু হয়ে যখন হট্টগোল বৃদ্ধি পায়, তখন নবী (সা) বলেন, তোমরা আমার এখান থেকে উঠে যাও, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যেদিকে আহবান করছ, তার চেয়ে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি এটা অধিক উত্তম। রোগের এত কষ্ট সত্ত্বেও নবী (সা) লোকজনকে পবিত্র যবানে তিনটি বিষয়ে ওসীয়্যত করেন ঃ

১. আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদেরকে বের করে দাও অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে কোন মুশরিক থাকতে পারবে না।

২. প্রতিনিধি দল বিদায়ের সময় কিছু হাদিয়া তোহফা প্রদান কর, যেভাবে আমি তাদেরকে প্রদান করে থাকি।

৩. তৃতীয় বিষয় সম্পর্কে নবী (সা) চুপ থাকেন অথবা বর্ণনাকারী ভুলে গিয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

কেউ কেউ বলেন, তৃতীয় ওসীয়্যত ছিল কুরআনের উপর আমল করা অথবা উসামা বাহিনী প্রেরণ করা অথবা আমার কবরকে মূর্তি-পূজা ও সিজ্দার স্থান নির্বাচন না করা অথবা নামাযের পাবন্দী করা এবং গোলামদের প্রতি খেয়াল রাখা।[১]

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১০৩।

উপসংহার ঃ জানা নেই যে, নবী (সা) যে সমস্ত বিষয়ে মৌখিকভাবে ওসীয়্যত করেন এগুলোই লিখিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কাগজ কলম চেয়েছিলেন। অথবা অন্য বিষয় হতে পারে। আল্লাহ ভাল জানেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) অসুস্থতার সময় বলেছেন যে, আমার ইচ্ছা ছিল, আবূ বকর এবং তাঁর পুত্রকে (আবদুর রহমান) কারো মাধ্যমে ডেকে এনে তাদেরকে কিছু ওসীয়্যত করব, তাদেরকে আমার উত্তরাধিকার নিযুক্ত করব। যাতে কেউ কোন কিছু বলতে না পারে এবং আশা পোষণকারী কোন আশা করতে না পারে। কিন্তু আমি আমার এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছি এবং বলেছি এ ওসীয়্যতের প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার এটা অভিপ্রায় নয় যে, আবূ বকর ব্যতীত অন্য কেউ খলীফা হোক এবং মু'মিনগণও আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে খলীফা হিসেবে গ্রহণ করবে না। অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে ঃ معاذ الله ان يختلف الناس على أبى بكر (আল্লাহ রক্ষা করুন যে, লোকজন আবূ বকরের খিলাফতের ব্যাপারে মতানৈক্য করবে)।

এ সমস্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে,নবী (সা)-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল আবূ বকর (রা) তাঁর পর খলীফা মনোনীত হোক কিন্তু তিনি বিষয়টি তাক্দীর ও সাহাবাগণের ইজ্মার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাক্দীর বা আল্লাহর অভিপ্রায় অনুযায়ী আবূ বকরই খলীফা হবেন। মুসলমানদের ঐকমত্য অনুযায়ী তাঁর খিলাফত সম্পাদিত হবে এবং সমস্ত মুসলমান তাঁর খিলাফতের উপর ঐকমত্য পোষণ করবে। ইমাম বুখারীর কথার দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, এ হাদীস দ্বারা হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফত সম্পর্কে লিখিয়ে দেয়ার বিষয় ছিল। কেননা ইমাম বুখারী এ হাদীসে কিতাবুল আহ্কামের তরজমায় লিখেছেন, باب الاستخلاف এ হাদীস দ্বারা খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (যারকানী, পৃ. ২৫৭; কাস্তাল্লানী, ১ খ, পৃ. ২৬০; ফাতহুল বারী, ১৩ খ, পৃ. ১৭৭)

যে মজলিসে কাগজ আনতে বলার ঘটনা সংঘটিত হয় এবং লোকগণের মতানৈক্য ও শোরগোলের কারণে নবী (সা) এ নির্দেশ প্রদান করেন যে, আমার নিকট থেকে উঠে যাও, আল্লাহর নবীর সামনে মতানৈক্য এবং হৈ চৈ করা সমীচীন নয়। লোকজন তখন উঠে চলে যায়।

লোকজন চলে যাওয়ার পর নবী (সা) একটু আরাম করেন। যোহর নামাযের সময় যখন দৈহিক ও মানসিকভাবে একটু সুস্থবোধ করেন এবং রোগের প্রচণ্ডতা কিছুটা হ্রাস পায়, তখন তিনি নির্দেশ প্রদান করেন যে, সাত মশক পানি আমার মাথায় ঢাল। হয়ত কিছু আরাম হতে পারে এবং আমি লোকজনকে ওসীয়্যত করতে পারব। সুতরাং

নির্দেশ অনুযায়ী সাত মশক[১] পানি ঢালা হয়। এভাবে গোসলের দ্বারা তিনি একটু আরাম বোধ করেন। অতঃপর হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর সাহায্যে মসজিদে গমন করেন এবং যুহর নামাযে ইমামতি করেন। নামাযের পর তিনি খুতবা পেশ করেন এবং এটা ছিল রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ খুতবা[২] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, এ খুতবা তিনি ইনতিকালের চারদিন পূর্বে পেশ করেছিলেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন, এ হিসাবে এ খুতবা বৃহস্পতিবার দিন পেশ করেছিলেন।[৩]

নবী (সা) এর সর্বশেষ খুতবা

নবী (সা) নামায সমাপ্ত করে মিম্বরের উপর উপবেশন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পর সর্বপ্রথম ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারীদের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করেন। অতঃপর মুহাজিরগণকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা অধিক হবে এবং আনসার কম হবে। তোমরা লক্ষ্য কর আনসারগণ আমাকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা নেককার তাদের সাথে ইহ্সান (সদাচার) কর এবং যারা ভুল করেছে, তাদেরকে তোমরা ক্ষমা কর।

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, হে লোক সকল! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এক নেক বান্দাকে অধিকার দিয়েছেন যে, সে হয়ত দুনিয়ার নিয়ামত গ্রহণ করবে অথবা আল্লাহর

---

১. দারেমীর রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, এই সাত মশক পানি মদীনার বিভিন্ন কূপ থেকে ভর্তি করা হয়েছিল। আল-ইত্তিহাফ শারহিল ইহ্য়া, ২ খ, পৃ. ২৮৮।

وقد خطب عليه الصلواة والسلام فى يوم الخميس قبل ان يقبض عن السلام بخميس ايام خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة مع ماكان قد نص عليه ان يؤم الصحابة أجمعين كما سيأتى بينانه حضورهم كلهم ولعل خطبة هذه كانت عوضا عما اراد ان يكتب فى الكتاب وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام بين يدى هذه الخطبة كريمة فصوا عليه من سبع قرب لم تحلل او كيتهن وهذا من باب الاستباء بالسبع كما وردت بها الاحايث فى غير هذا الموج والمقصود انه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثم خرج فصلى بالناس ثم خطبهم كما تقدم فى حديث عائشة كذا فى البداية والنهاية صفحه ٢٢٨ ج٥

২. হযরত সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, মসজিদের দিকে যতগুলো দরজা রয়েছে এগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক, একমাত্র আলীর দরজা খোলা রাখা হোক। (আহমাদ ও নাসাঈ) এটা ঐ সময়ের নির্দেশ ছিল যখন মসজিদে নব্বীর নির্মাণ কাজ চলছিল অর্থাৎ হিজরতের প্রারম্ভে। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা)-এর দরজা ব্যতীত সমস্ত দরযা বন্ধ হওয়ার নির্দেশ ছিল মৃত্যু রোগের সময়ের ঘটনা। এটাই ছিল সর্বশেষ নির্দেশ। সর্বশেষ নির্দেশ প্রথম নির্দেশের রহিতকারী হয়ে থাকে।

৩. আল-বিদায়া ওয়াল নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৯; ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ১০; ইত্তিহাফ শারহে ইহইয়াউল উলূমুদ্দীন, ১০ খ, পৃ. ২৮৭।

নি'আমত অর্থাৎ আখিরাতের নি'আমত গ্রহণ করবে। কিন্তু ঐ বান্দা আল্লাহর নি'আমত অর্থাৎ আখিরাত গ্রহণ করেছে।

হযরত আবূ বকর (রা) যেহেতু অধিক জ্ঞানী ও আলিম ছিলেন। ফলে তিনি এটা উপলব্ধি করেন যে, ঐ বান্দার দ্বারা রাসূল (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা শুনেই তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। নবী (সা) বলেন, হে আবূ বকর! একটু থাম এবং ধৈর্যধারণ কর। অতঃপর মসজিদের দিকে লোকজনের জন্য যতটি দরজা উন্মুক্ত ছিল, এগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, এ সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়ে [১] শুধু আবূ বকরের দরজা খোলা রাখা হোক। জান-মাল, মহব্বত ও বন্ধুত্বের দৃষ্টিতে আমার উপর সবচেয়ে বেশি ইহসানকারী (উপকারী) ব্যক্তি হলেন আবূ বকর। যে ব্যক্তি আমার উপর ইহসান করেছেন আমি তাঁর প্রতিদান দিয়েছি। একমাত্র আবূ বকরের, ইহসানের প্রতিদান দেইনি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান প্রদান করবেন। যদি আমি স্বীয় প্রভু ব্যতীত অন্য কাউকে প্রিয় বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবূ বকরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে আমার রয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব। এতেও তিনি সবচেয়ে উত্তম। এই ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[১]

বস্তুত এই খুতবায় নবী (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এর ফযীলত ও মর্যাদার বর্ণনা করেন, যাতে অন্য কেউ তাঁর সমপর্যায়ের ছিল না। সাথে সাথে জনগণের সামনে তাঁর ফযীলত ও মর্যাদা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং রাসূল (সা)-এর খিলাফত সম্পর্কে কেউ মতানৈক্য না করে। এ বিষয়ে তাকিদের জন্য উত্তম ইবাদত নামাযের ইমামতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেন। এ কারণেই সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণের সময় এটাই বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল যাঁকে আমাদের দ্বীনের (নামাযের) জন্য পসন্দ করেছেন, আমাদের দুনিয়ার (খিলাফত ও ইমারত) জন্য আমরা তাঁকে কেন নির্বাচন ও পসন্দ করব না।[২]

অতঃপর ঐ খুতবার মধ্যে এই ঘোষণা প্রদান করেন যে, উসামা বাহিনীকে দ্রুত প্রেরণ কর এবং তিনি আরো বলেন, আমি জানি যে, কিছু লোক (ইবন সা'দ বলেন, এরা ছিল মুনাফিক) উসামার নেতৃত্বের বিরোধিতাকারী রয়েছে। এই বলে যে, প্রধান ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও যুবককে কেন এ পদ দেয়া হয়েছে। সাবধান! এ সমস্ত লোক, এর পূর্বেও উসামার পিতার (যায়দের) নেতত্বের বিরোধিতা করেছিল। আল্লাহ শপথ! উসামার পিতাও অধিনায়ক বা নেতা হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তার পর তার পুত্রও অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য এবং আমার প্রিয়ভাজন ব্যক্তির মধ্যে সেও একজন।

---

১. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৫৪।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২২৯।

তিনি আরো বলেন, ইয়াহূদী ও নাসারাদের উপর লা'নত হোক, যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে সিজ্‌দার স্থান বানিয়েছে। এর দ্বারা স্বীয় উম্মাতকে সতর্ক করা উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত আমার কবরকে সিজ্‌দার স্থান নির্ধারণ করনা।

নবী করীম (সা) আরো ঘোষণা করেন, হে লোক সকল! আমি এ খবর অবগত হয়েছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুতে ভীত হয়ে পড়েছ। আমার পূর্বে কোন নবী কি তাঁদের উম্মতের মধ্যে চিরকালের জন্য জীবিত ছিলেন। যার কারণে আমিও তোমাদের মধ্যে চিরদিন থাকব? যেমন আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ، وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

"আপনার পূর্বে আমি কোন মানুষকে চিরঞ্জীব করিনি। মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন, নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল ইহলোক ত্যাগ করেছেন।"

তোমরা জেনে রাখ, আমি আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অচিরেই মিলিত হতে যাচ্ছি, তোমরাও আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিলিত হবে। আমি সমস্ত মুসলমানকে ওসীয়্যত করছি যে, পূর্ববর্তী মুহাজিরগণের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং পূর্ববর্তী মুহাজিরগণকে ওসীয়্যত করছি যে, তারা যেন তাক্‌ওয়া ও নেক আমলের উপর অটল থাকে। কেননা আল্লাহপাক এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ - اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ -

"মহাকালের শপথ। নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য্যের উপদেশ দান করে।" (সূরা আসর ঃ ১-৩)

হে মুসলমান! আমি তোমাদেরকে আনসারগণের সম্পর্কে ওসীয়্যত করছি যে, তাঁদের সাথে উত্তম ও সদ্ব্যবহার কর। আনসারগণ ইসলাম ও ঈমান গ্রহণ করেছে এবং তাঁদের বাড়ী ঘর, জমি, বাগান ও ফলের মধ্যে তোমাদেরকে অংশীদার বানিয়েছে। দারিদ্রতা ও ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্ত্বেও তোমাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমন-আল্লাহপাক বলেছেন ঃ وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

তিনি আরো ইরশাদ করেন তোমরা জেনে রাখ! আমি তোমাদের আগে যাচ্ছি এবং তোমরাও এসে আমার সাথে মিলিত হবে। হাউযে কাউসারে নিকট মিলিত হবার ওয়াদা রইল। অত:পর মিম্বর থেকে অবতরণ করে পবিত্র হুজরায় গমন করেন।[১]

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২২৯।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ জামা'আতে নামায আদায় এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ (সা)-যতক্ষণ দৈহিক শক্তি বিদ্যমান ছিল ততক্ষণ মসজিদে গমন করে নামায পড়াতেন। সর্বশেষ তিনি বুধবারে মাগরিবের নামায পড়িয়েছিলেন। এর চারদিন পর সোমবার তিনি ইন্তিকাল করেন। সহীহ বুখারী শরীফে উম্মে ফযল (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা) আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন। নামাযে তিনি সূরা ওয়াল মুরসালাত তিলাওয়াত করেন। এরপর তিনি ইনতিকাল পর্যন্ত আর কোন নামায পড়ান নি। যখন ইশার সময় হয়, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, লোকজন কি নামায পড়েছে? আরয করা হয়, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজন আপনার অপেক্ষা করছে। রাসূল কয়েকবার উঠার চেষ্টা করেন কিন্তু রোগের তীব্রতার কারণে বার বার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তিনি ইরশাদ করেন, আমার পক্ষ থেকে আবূ বকরকে নামাযে ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য বলে দাও। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বকর অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। যখন তিনি আপনার জায়গায় দাঁড়াবেন তখন (তাঁর উপর এরূপ ভাবের সৃষ্টি হবে যে,) তিনি নামায পড়াতে সক্ষম হবেন না এবং ক্রন্দনের কারণে লোকদেরকে স্বীয় কিরা'আত শোনাতে পারবেন না। সুতরাং আপনি হযরত উমরকে নামায পড়ানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করুন। হযরত আয়েশা (রা) প্রকাশ্যে এটা বলেছেন কিন্তু অন্তরে এ ধারণাও ছিল যে, যে ব্যক্তি জায়গায় দাঁড়াবে, মানুষ তাকে অশুভ মনে করবে। ফলে রাসূল (সা) রাগত স্বরে বললেন, তুমি ইউসুফের ভাইদের মত, মুখে এক কথা বলছ, অন্তরে অন্য খেয়াল পোষণ করছ। আবূ বকরকে নির্দেশ প্রদান কর, তিনিই নামায পড়াবেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা)-এর নির্দেশ প্রদানের পর হযরত আয়েশা (রা) তিনবার বিরোধিতা করেন, কিন্তু রাসূল (সা) প্রত্যেকবার একই নির্দেশ প্রদান করেন যে, আবূ বকরকে বল, তিনিই যেন নামায পড়ান। সুতরাং হযরত আবূ বকর (রা) ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন।

ইমাম গাযালী (র) 'ইহ্ইয়াউল উলূম' গ্রন্থে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার কথার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন। এতে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর অন্তরের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেছেন, কেন তিনি স্বীয় মর্যাদাসম্পন্ন পিতার ইমামতকে অপসন্দ করেছেন।

قالت عائشة رضى اللّه عنها ماقلت ذالك ولاصرفته عن أبى بكر الارغبة عن المخاطرة والهلكة الا ماسلم الله وخشيتُ ايضًا ان لايكون الناس رجلا صلى فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم وهو حى الا أن يشاء الله يحسدونه ويبغون عليه ويتشاءمون به فاذا

الامر امر الله والقضاء قضاءه وعصمه الله من كل ماتخوفت عليه من امر الدنيا والدين -

"হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, আমি আমার পিতার ইমামতের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছি, যাতে আমার পিতা বস্তু জগত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও দূরে অবস্থান করেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা বিপদ থেকে মুক্ত নয়। এতে ধ্বংস হওয়ার আশংকা রয়েছে। তবে আল্লাহ পাক যাকে সঠিক ও নিরাপদ রাখেন তিনিই দুনিয়ার ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে পারেন। এছাড়া এটাও আশংকা ছিল যে, যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় তাঁর স্থানে দাঁড়াবে, মানুষ তাঁকে অশুভ মনে করতে পারে। অবশ্য যখন আল্লাহর নির্দেশ হয়েছে এবং ভাগ্যেও এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, আমার পিতা রাসূলুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হবেন, তাঁর জায়গায় ইমামতি করবেন। সুতরাং আমি এই দু'আ করছি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার পিতাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে হিফাযত করুন।

সুবহানাল্লাহ ! এটা হলো সিদ্দীকা বিন্‌তে সিদ্দীক-এর উপলব্ধি ও দুরদর্শিতা। তিনি এ ইমামত ও প্রতিনিধিত্বকে ভবিষ্যতের খিলাফত ও ইমারতের সূচনা মনে করেছেন এবং আন্তরিকভাবে এ চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর পিতা ইমাম ও আমীর নির্বাচিত না হোক। এই ক্ষুদ্র নেতৃত্ব ও বৃহত্তর নেতৃত্বকে তাঁর পিতার পরিবর্তে অন্য কারো উপর অর্পণ করা হোক, যাতে তাঁর পিতা দ্বীন ও দুনিয়ার ফিতনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যান। এটা হলো কন্যার বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে পিতা হযরত আবূ বকর (রা)-এর বৈশিষ্ট্য বায়'আতের সময় প্রদত্ত খুতবা থেকে অনুধাবণ করা যায়।

তিনি খুতবায় বলেছেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো অন্তরে এই ইমামত ও খিলাফতের আশা পোষণ করিনি এবং কখনো প্রার্থনা করিনি। মুসলমানদের মধ্যে ফিতনার ভয়ে আমি এটা গ্রহণ করেছি।

সিদ্দীক ও সিদ্দীকাহ্‌র এটাই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁদের অন্তর ধন-সম্পদ ও উচ্চ পদের লোভ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। তবে এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহর নবী ও তাঁর রাসূল, যাঁকে ইমাম নির্বাচিত করার জন্য অনমনীয় ছিলেন, তিনি নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণের ইমাম হবেন এবং তাঁর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন মন ইমারত এবং খিলাফতের লোভ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। কোন প্রকার ফিতনা তাঁকে স্পর্শ করার সুযোগ পাবে না।

এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ পাকের যে অনুগ্রহ ও আসমানী সাহায্য নবীর সাথে ছিল এবং নবী যাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তাঁর সাথে ঐ অনুগ্রহ ও সাহায্য বিদ্যমান থাকবে। কেননা আল্লাহর রাসূল (সা) কখনো আল্লাহর নির্দেশ ও ইঙ্গিত ব্যতীত স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে পারেন না। যেমন কোন বাদশাহ তাঁর জীবিতকালে

কাউকে তাঁর সিংহাসন অর্পণ করা তাঁকে (বাদশাহ্র) যুবরাজ হিসেবে ঘোষণা করার নামান্তর। এমনিভাবে 'ইমামুল মুত্তাকীন' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং কাউকে স্বীয় মুসাল্লার উপর ইমামতের জন্য দাঁড় করানোর মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, এ ব্যক্তি হলেন আল্লাহর রাসূলের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি।

শনিবার অথবা রোববার রাসূল (সা)-এর শরীর কিছুটা সুস্থবোধ হওয়ায় তিনি হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা)-এর সহযোগিতায় মসজিদে আগমন করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ সময় যোহরের নামাযে ইমামতি করছিলেন। তিনি আবূ বকরের বামদিকে উপবেশন করলেন এবং বাকী নামায ইমাম হিসেবে রাসূল (সা) পড়ালেন। হযরত আবূ বকর (রা) (সা)-এর পেছনে নামায পড়তে থাকেন এবং মুসল্লীগণ হযরত আবূ বকরের তাকবীরের অনুসরণে নামায আদায় করেন। (বুখারী)

এটা ছিল যোহরের নামায এবং রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ ইমামত। এরপর মসজিদে উপস্থিতি নবী (সা)-এর জন্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। উম্মে ফযলের রিওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা)-এর সর্বশেষ নামায ছিল মাগরিবের নামায। এর দ্বারা স্বতন্ত্র ইমামতের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়েছে যে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে নামাযের মধ্যে ইমামত ও তিলাওয়াত করেছেন তা ছিল মাগরিবের নামায। সপ্তাহের প্রথম দিন হযরত উসামা এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম যাঁদেরকে জিহাদের গমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন তাঁরা নবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। তাঁরা সাক্ষাতের পর রওয়ানা হয়ে মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে 'জুরুফ' নামক স্থানে তাঁবু স্থাপন করেন। নির্দেশ পালন করার জন্য সাহাবাগণ রওয়ানা হয়ে গেলেও নবী (সা)-কে অসুস্থতার কারণে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে কারো আগ্রহ হচ্ছিল না। রবিবারে নবীজী (সা)-এর রোগের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি পায়। এ সংবাদ পেয়ে হযরত উসামা (রা) নবী (সা) দেখার জন্য মদীনায় ফিরে আসেন। এ সময় রাসূল (সা) রোগের তীব্রতার কারণে কথা বলতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। হযরত উসামা (রা) ঝুঁকে পবিত্র কপালে চুমো খেলেন, নবী (সা) উভয় হাত আকাশের দিকে উত্তোলন করেন অতঃপর উসামার উপর রাখেন। হযরত উসামা (রা) বলেন, আমি ধারণা করছি যে, রাসূল (সা) আমার জন্য দু'আ করছেন। অতঃপর হযরত উসামা (রা) জুরুফ নামক স্থানে যেখানে তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে গমন করেন।[১]

ইবন সা'দ তাবাকাতে এবং যারকানী শারহে মাওয়াহিবে উল্লেখ করেন যে, ঐ দিন অর্থাৎ রোববার লুদূদ (لدود) -এর ঘটনা সংঘটিত হয়।

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে রোগের তীব্রতার কারণে আমরা পবিত্র মুখে ঔষধ দিলে রাসূল (সা) ইঙ্গিতে নিষেধ করেন। কিন্তু আমরা

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ১৩৬।

মনে করি যে, এটা রোগের কারণে হতে পারে। কারণ রোগী সাধারণত ঔষধ অপসন্দ করে থাকে। পরে যখন রাসূল (সা)-এর জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি? সুতরাং তোমাদের শাস্তি হলো এই যে, হযরত আব্বাস (রা) ব্যতীত তোমাদের সবার মুখে ঔষধ ঢেলে দেয়া হবে। কেননা। তিনি একাজে অংশগ্রহণ করেন নি।[১]

নবী (সা)-এর ইনতিকাল দিবস

সোমবার দিন নবী (সা) এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে অনন্তকাল তথা পরলোক গমণ করেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু তথা আল্লাহপাকের সাথে মিলিত হন। সোমবার দিন ফজরের সময় রাসূল (সা) হুজরার পর্দা উঠিয়ে প্রত্যক্ষ করেন যে, লোকজন কাতারবন্দী হয়ে ফজর নামায আদায় করছেন। সাহাবাগণকে এ অবস্থায় দেখে নবী (সা) মৃদু হাসলেন। নূরের আলোকে পবিত্র চেহারা শ্বেত-শুভ্রস্ফটিকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এদিকে আনন্দে সাহাবাগণের অবস্থা হলো এই যে, নামায যেন ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলো।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এ অবস্থায় পিছনে চলে আসার ইচ্ছা করেন কিন্তু নবী (সা) তাঁকে নামায সম্পন্ন করার ইঙ্গিত করেন। দুর্বলতার কারণে নবী (সা) বেশিক্ষণ দাঁড়াতে সক্ষম ছিলেন না। হুজরার পর্দা নামিয়ে তিনি ভিতরে গমন করেন। (বুখারী)

নবী (সা)-এর পর্দা উঠিয়ে নামাযীদেরকে প্রত্যক্ষ করা এটা ছিল পবিত্র চেহারার নূরের দ্যুতির সর্বশেষ বিকাশ এবং সাহাবায়ে কিরামের জন্য ছিল নবুওয়াতের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনের সর্বশেষ সুযোগ। রাসূল প্রেমিকগণ তখন এ কবিতা আবৃত্তি করেছিলেনঃ

وكنت ارى كالموت من بين ساعة * فكيف ببين كان موعده الحشر

“আমি তো এক ঘন্টার বিচ্ছেদকে মৃত্যু মনে করেছি। সুতরাং এই বিচ্ছেদ সম্পর্কে কি জিজ্ঞাসা কর যাঁর সাথে হাশরে সাক্ষাতের অঙ্গীকার রয়েছে।”

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) ফজর নামায সম্পন্ন করে সরাসরি পবিত্র হুজরায় গমন করেন এবং নবী (সা)-কে দেখার পর হযরত আয়েশা সিদ্দীক (রা)-কে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এখন সুস্থ প্রত্যক্ষ করছি। যে কষ্ট ও ব্যাকুলতা পূর্বে বিদ্যমান ছিল, তা এখন হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু এ দিনটি হযরত সিদ্দীকে আকবরের দু'জন স্ত্রীর মধ্যে যিনি মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে বাস করতেন, তাঁর পালা ছিল, ফলে রাসূল (সা)-এর অনুমতি নিয়ে তিনি সেখানে গমন করেন।[২]

ইবন ইসহাকের রিওয়ায়াতে বর্ণিত, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) আরয করেন ঃ

يانبى الله انى اراك قد اصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة افاتيها قال نعم -

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ১১২।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৪।

"হে আল্লাহর নবী! আমি প্রত্যক্ষ করছি, আপনি আল্লাহর নি'আমত ও ফযলে ভাল ও সুস্থ অবস্থায় সকালবেলা অতিক্রম করেছেন। আজ আমার স্ত্রী হাবীবাহ্ বিনত খারিজার পালা, যদি অনুমতি প্রদান করেন তাহলে সেখান থেকে ঘুরে আসি। রাসূল (সা) বলেন, হ্যাঁ, চলে যাও।"

অন্যান্য লোকজনও যখন অবগত হলেন যে, নবী (সা) সুস্থবোধ করছেন, তখন তারা নিজ নিজ বাড়িতে গমন করেন।[১]

হযরত আলী (রা) পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন। লোকজন তাঁকে নবীজীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। হযরত আলী (রা) বলেন, আল-হামদু লিল্লাহ। তিনি সুস্থ রয়েছেন। লোকজন শান্ত হয়ে চলে যায়। হযরত আব্বাস (রা) হযরত আলী (রা)-এর হাত ধরে বললেন, হে আলী, আল্লাহর শপথ! তিন দিন পর তুমি লাঠির গোলাম হবে, অর্থাৎ অন্য কেউ হাকিম বা শাসক হবে এবং তুমি তার অনুগত হবে। নির্দেশ পালন করবে। আল্লাহর শপথ, আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ (সা) এ রোগেই ইনতিকাল করবেন। সুতরাং উত্তম হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করি, আপনার পর কে খলীফা হবেন যদি আমাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হয়, তাহলে জানতে পারব। নতুবা তিনি এ ব্যাপারে আমাদের সম্পর্কে ওসীয়্যত করবেন। হযরত আলী (রা) বলেন, সম্ভবত রাসূল (সা) আমাদের ব্যাপারে অস্বীকার করবেন। অতঃপর আমরা চিরকালের জন্য এ পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব। আল্লাহর শপথ, আমি এ ব্যাপারে তাঁর সাথে একটু কথাও বলব না।[২]

মৃত্যুকষ্ট

লোকজন রাসূল (সা)-কে সুস্থ মনে করে চলে যান। কিছুক্ষণ পরই মৃত্যু কষ্ট আরম্ভ হয়। হযরত আয়েশার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েন। এ সময় হযরত আয়েশার ভাই আবদুর রহমান ইবন আবূ বকর (রা) হাতে মিসওয়াক নিয়ে আগমন করেন। নবী (সা) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করেন। হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনাকে মিসওয়াক দেব? তিনি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি বললাম, এটা নরম করে দেব? তিনি ইঙ্গিতে হ্যাঁ বললেন। আমি চিবিয়ে ঐ মিস্ওয়াক রাসূলুল্লাহকে প্রদান করি। এ কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) গৌরব ও নিয়ামতের উল্লেখ করে বলতেন, আল্লাহ তা'আলা শেষ সময়ে আমার মুখের লালা নবী (সা)-এর মুখের লালার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সা)-এর ইনতিকাল আমার হুজরায়, আমার পালার দিন এবং আমার মধ্যে হয়েছে।

১. ইবন হিশাম, ৪ খ, পৃ. ৩০২।

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২২৭।

মন্তব্য ঃ মোল্লা আলী-কারী তরীকতের শায়খগণ থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ মিসওয়াক ব্যবহার করে, মৃত্যুর সময় তার মুখে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারিত হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আফিম খায় তার মুখে কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারিত হবে না।

নবী (সা)-এর নিকট পানির একটি পেয়ালা রাখা হয়েছিল। ব্যথায় অস্থির হয়ে তিনি ঐ পেয়ালায় হাত ভিজিয়ে মুখ মুছতেন এবং বলতেন ঃ لا اله الا الله ان للموت سكرات (আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যু অত্যন্ত কষ্টকর) অতঃপর ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন ঃ أللهم يارفيق الاعلى (হে আল্লাহ, আমি রফীকে আ'লার নিকট যেতে চাই), অর্থাৎ হাযিরাতুল কুদ্স যা আম্বিয়ায়ে মুরসালীনের বাসস্থান, আমি সেখানে যেতে চাই।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেন, আমি অনেকবার রাসূল (সা) থেকে শুনেছি যে, কোন পয়গাম্বরের রূহ্ ঐ সময় পর্যন্ত কবয করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে তাঁর স্থান দেখানো না হয় এবং তাকে এ অধিকার দেয়া না হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করবেন। যখন রাসূল (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে এই বাক্য উচ্চারিত হয়, তখনই আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, তিনি আর আমাদের মধ্যে থাকবেন না। তিনি মালায়ে আ'লা ও আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভ করেছেন। মূলত নবী (সা)-এর পবিত্র যবান থেকে اللهم فى الرفيق الاعلى উচচারিত হতে থাকে এবং পবিত্র রূহ নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট গমন করে। انا لله وانا اليه راجعون

ইনতিকালের তারিখ

যে হৃদয় বিদারক ঘটনা দুনিয়াকে নবুওয়াত ও রিসালাতের ফয়েয, বরকত ও নূরের তাজাল্লী থেকে বঞ্চিত করে এবং নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন, ঐ তারিখ হলো ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার দ্বিপ্রহরের সময়। এতে কারো মত পার্থক্য নেই যে, তিনি রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার ইনতিকাল করেন। তবে দু'টি বিষয়ে মত-পার্থক্য রয়েছে। একটি হলো কোন্ সময়ে ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয়টি হলো রবিউল আউয়াল মাসের কোন তারিখে।

মাগাযী ইবন ইসহাকে বর্ণিত আছে, চাশতের সময় নবী (সা) ইনতিকাল করেন। মাগাযী মূসা ইবন উকবায় যুহরী এবং উরওয়া ইবন যুবায়র থেকে বর্ণিত হয়েছে দ্বিপ্রহরের (زوال) সময় তিনি ইনতিকাল করেন। এ রিওয়ায়াতেটি অধিক সহীহ। এটা সামান্য মতপার্থক্য। চাশত এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। অবশ্য ইনতিকালের তারিখ নিয়ে বিরাট মতপার্থক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ বর্ণনার ভিত্তিতে ১২ রবিউল আউয়াল তিনি ইনতিকাল করেন। মুসা ইবন উকবা, লাইস ইবন সা'দ এবং

খাওয়ারিযমী রবিউল আউয়ালের ১ তারিখে ইন্তিকালের কথা বর্ণনা করেছেন। কালবী এবং আবূ মাখনাফ রবিউল আউয়ালের ২ তারিখে ইন্তিকালের কথা উল্লেখ করেছেন বুখারীর শরাহ এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।[১]

বয়স

ইনতিকালের সময় নবী (সা) এর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। এটাই হলো জমহুরের (সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত) মতামত। এটাই হলো সহীহ। আবার কেউ বলেছেন ৬৫, কেউ বলেছেন ৬০ বছর।[২]

সাহাবায়ে কিরামের অস্থিরতা ও মানসিক অশান্তি

নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালে সমগ্র মদীনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এ মর্মান্তিক সংবাদ শুনেই সাহাবা কিরামের হুঁশ-জ্ঞান ও বিবেক শূন্য হয়ে পড়েন। দুঃখ ও শোকে হযরত উসমান (রা) দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকেন এবং অত্যধিক শোকের কারণে কথা বলতে পারছিলেন না। হযরত আলী (রা) শোকে ক্রন্দন করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা ও উম্মুল মু'মিনীনগণের উপর সীমাহীন কষ্ট ও শোকের পাহাড় পতিত হয়। হযরত আব্বাস (রা) অত্যন্ত শোক ও পেরেশানীর কারণে অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত উমরের কষ্ট ও বেদনার মাত্রা সীমাতিক্রম করে। তিনি তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, মুনাফিকদের ধারণা হলো রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। তিনি কখনো ইনতিকাল করেননি, বরং তিনি তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গমন করেছেন। তিনি ফিরে আসবেন। আল্লাহর শপথ! তিনি অবশ্যই ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের হঠকারিতা ও বিদ্রোহ দমন করবেন। হযরত উমর (রা) আবেগ ও উত্তেজনায় কোষ থেকে তলোয়ার বের করেন। কারো সাহস ছিল না যে, তাঁকে বলে, রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) ইন্তিকালের সময় উপস্থিত ছিলেন না। সোমবার সকালে তিনি যখন দেখলেন রাসূল (সা) সুস্থ রয়েছেন, তখন তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি পেলে ঘর থেকে ঘুরে আসি। নবী (সা) অনুমতি প্রদান করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা) অনুমতি নিয়ে মদীনা থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত বাড়ি চলে গেলেন। এদিকে দ্বিপ্রহরের সময় রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবূ বকর (রা) এ হৃদয় বিদারক সংবাদ পাওয়ামাত্র ঘোড়ায় আরোহণ করে দ্রুত মদীনায় পৌঁছেন। মসজিদে নব্বীর দরযায় ঘোড়া থেকে নেমে শোকে বিহবল পবিত্র হুজরার দিকে অগ্রসর হন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। রাসূল (সা) পবিত্র

---

১. ফাতহুল বারী, ৮ খ, পৃ. ৯৮;

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১১০

বিছানায় শায়িত এবং সমস্ত উম্মুল মু'মিনীন চতুর্দিকে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের আগমনে হযরত আয়েশা (রা) ব্যতীত সবাই মুখ ঢেকে ফেলেন এবং পর্দা করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) নূরানী চেহারা থেকে চাদর উঠিয়ে পবিত্র ললাটে চুমো খেলেন এবং ক্রন্দন করে বলেন ঃ وابنياه واخليلاه اصفياه তিনবার এরূপ বললেন। (আহমাদ, ইত্তিহাফ শরাহ আল ইহ্ইয়া, ১০ খ, পৃ. ৩০০)।

অতঃপর তিনি বলেন, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আল্লাহর শপথ! দু'বার [১] আপনাকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না। যে মৃত্যু আপনার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল তা এসে গিয়েছে। এটা বলেই তিনি পবিত্র হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন।

তিনি হযরত উমরকে আবেগ ও উত্তেজনা পূর্ণ দেখতে পেলেন। হযরত সিদ্দীক আকবার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেছেন। হে উমর! তুমি কি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শোননি إنك ميت وإنهم ميتون এবং وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

তখন সমস্ত লোক হযরত উমরকে ছেড়ে হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট একত্রিত হন।

---

১. হযরত সিদ্দীক আকবরের (রা) উদ্দেশ্য ছিল ঐ লোকদের ধারণা বাতিল করা, যারা এটা বলে যে, নবী (সা) দ্বিতীয়বার জীবিত হবেন এবং মুনাফিকদের হাত পা কর্তন করবেন। কেননা যদি এরূপ হয় তাহলে রাসূল (সা)-এর ইনতিকাল দু'বার হবে। এ জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, সে মৃত্যু আপনার জন্য লিপিবদ্ধ ছিল তা আগমন করেছে। সুতরাং দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার মৃত্যু আগমন করবে না। আল্লাহপাক দু'টি মৃত্যু আপনার উপর জমা করবেন না। যেমন-পূর্ববর্তী উম্মাতের মধ্যে বনী ইসরাঈলের লোকজন মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর থেকে বের হয় এবং মঞ্জিলে পৌছার পর আল্লাহর গযবে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তাদের নবীর দু'আয় জীবিত হয় এবং নির্ধারিত সময় পুনরায় মৃত্যুবরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ায় দু'বার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করান। তাদের কাহিনী কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে -

اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ

আরো এক ব্যক্তি দু'বার মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করেছে। সে একটি গ্রামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে এক'শ বছরের জন্য মৃত হিসেবে রেখে দেন। অতঃপর তাকে জীবিত করেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা উল্লেখ করে বলেন ঃ

اَوْكَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ

সারকথা হলো, যেভাবে এ সমস্ত লোক দুনিয়ায় দু'বার মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর উপর দু'বার মৃত্যু জমা করবেন না। (ফাতহুল বারী, ৩ খ, পৃ. ৯১; যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৭৮; মাদারিজুন নবুওয়াত, ২ খ, পৃ. ৫৫৮; শারহে কাসতাল্লানী, ২ খ, পৃ. ৩৬১।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খুতবা

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী করীম (সা) এর মিম্বরের দিকে অগ্রসর হয়ে উচ্চস্বরে বলেন, চুপ কর, বসে যাও। সবাই বসে পড়েন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসার পর এ খুতবা পেশ করেন ঃ

أما بعد، من كان يعبد الله فان الله حى لايموت ومن كان منكم يعبد محمداً صلى الله عليه وسلم فان محمداً قد مات قال الله تعالى وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ـ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ـ وقد قال الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ وقال الله تعالى كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ وقال الله تعالى : كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ وقال الله تعالى : كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وقال ان الله عمَّرَ محمد صلى الله عليه وسلم وابقاه حتى اقام دين الله واظهر امر الله وبلغ رسالة الله وجاهد فى سبيل الله ثم توفاه الله على ذالك وقد ترككم على الطريقة فلن يهلك هالك الامن بعد البينة والشقاء فمن كان الله ربه فان الله حى لايموت ومن كان يعبد محمداً وينزله الها فقد هلك الهه فاتقوا الله ايها الناس واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم فان دين الله قائم وان كلمة الله تامة وان الله ناصر من نصره ومعز دينه وان كتاب الله بين اظهرنا وهو النور والشفاء وبه هدى الله محمداً صلى الله عليه وسلم وفيه حلال الله وحرمه الله لانبالى من اجلب علينا من خلق الله ان سيوف الله لمسلولة ما وضعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلايبغين احد الاعلى نفسه۔

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে সে এটা জেনে নিক যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চিরঞ্জীব। তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না। (যদি ধরে নেয়া হয় যে,) তোমাদের মধ্যে কেউ মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করে, তা হলে সে এটা

জেনে নিক যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ " আর মুহাম্মদ (সা) রাসূল ভিন্ন অন্য কিছু নন, তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি ইনতিকাল করেন অথবা তিনি শাহাদাত বরণ করেন, তাহলে তোমরা কি (দ্বীন ইসলাম থেকে) পশ্চাদপসরণ করবে? আর কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে তাহলে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, এবং অচিরেই আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।" (আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন ঃ

"নিশ্চয়ই আপনিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সূরা যুমার : ৩০)

"প্রত্যেক বস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই নশ্বর বা ধ্বংসশীল, একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা অবিনশ্বর।" (সূরা আর রাহমান : ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন ঃ

"প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)-এর হায়াত দীর্ঘ করেছেন এবং তাঁকে বাকী রেখেছেন– ফলে তিনি আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেন, আল্লাহর বিধান প্রকাশ করেন, আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়ে দেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে ওফাত দান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদেরকে একটি সরল ও সুস্পষ্ট পথে উপর রেখে গিয়েছেন। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হবে সে হক ও সত্য প্রকাশ হওয়ার পর পথভ্রষ্ট হবে। অতএব আল্লাহ তা'আলা যার রব সে এটা জেনে নিক যে, তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা)-এর ইবাদত করবে এবং তাঁকে মা'বূদ মনে করবে, সে এটা জেনে নিক যে, তার মা'বূদ বিলীন হয়ে গিয়েছে।

হে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহর দীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধর এবং স্বীয় প্রতিপালকের উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর দ্বীন চির প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আল্লাহর অঙ্গীকার ও কালেমা পরিপূর্ণ হবে। আল্লাহ ঐ ব্যক্তির সাহায্যকারী, যে তার দ্বীনকে সাহায্য করে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে মর্যাদা দান ও জয়ী করবেন। আল্লাহর কিতাব আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহর কিতাবই নূরে হিদায়াত এবং অন্তরের শিফা। এত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে পথ প্রদর্শন করেছেন। এতে আল্লাহ পাকের হালাল ও হারামকৃত বস্তুসমূহের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর শপথ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের সামান্যতম ভ্রুক্ষেপ নেই সে আমাদের উপর সৈন্য পরিচালনা করে (এটা বিদ্রোহী ও মুরতাদদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার সে তলোয়ার আমাদের হাতে রয়েছে তা শত্রুদের উপর ব্যবহার করা হত। ঐ তলোয়ার আমরা হাত থেকে রেখে দেইনি। আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের বিরোধী ও শত্রুদের সাথে এভাবে জিহাদ করব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সঙ্গী হয়ে করেছি। সুতরাং বিরোধীরা যেন এটা ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং নিজেদের উপর যুল্ম না করে।[১]

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর এ সমস্ত আয়াত তিলাওয়াত করার সাথে মুহূর্তের মধ্যে সবার বিহ্বলতা দূর হয়ে যায়, গাফলতের পর্দা চোখ থেকে উঠে যায়। সবার এ দৃঢ়বিশ্বাস হয় যে, নবী (সা) ইনতিকাল করেছেন। তখন সবার মনে হয়েছে যে, এর পূর্বে যেন কখনো এই আয়াত শোনেনি। ফলে তারা বারবার এ আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকে (যারকানী, তাবাকাত ইবন সা'দ)।

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার অবস্থাও এই হয়, যেন আমি আজ এই আয়াত তিলাওয়াত করেছি এবং স্বীয় চিন্তাধারা থেকে মত পরিবর্তন করি।[২]

হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) বলেন, হযরত ফারূক আযম (রা) খুব ভালভাবে জানতেন যে, নবী (সা) একদিন ইনতিকাল করবেন। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল এই যে, হুযুরের যা অবস্থা হয়েছে তা মৃত্যু নয় এবং অদৃশ্য কোন বিষয়ে নিমগ্ন থাকার কারণে বাহ্যিক অঙ্গের কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। যেমন ওহী নাযিল হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা এরূপ হয়ে যেত, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর বক্তৃতার ফলে হযরত উমর ফারূকের এ ধারণা পরিবর্তন হয় এবং প্রকৃত অবস্থা তাঁর নিকট প্রকাশ হয়ে যায়। (কুররাতুল আয়নাইন, পৃ. ২৭০) এরূপ সংকটময় মুহূর্তে এরূপ ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রকাশ হযরত সিদ্দীকে আকবরই (রা)-এরই পরিপূর্ণ দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর নিকট যখন নবী (সা)-এর এ অবস্থায় তাঁর চোখ অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। হেঁচকি হচ্ছিল এবং মাটির পাত্রে ফুটন্ত পানির মত বুকের শ্বাস নির্গত হচ্ছিল। এ অবস্থায় দরূদ ও সালাম পাঠ করতে করতে পবিত্র হুজ্‌রায় প্রবেশ করেন, কিন্তু এরূপ দুঃখ ও বিষাদ সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তা এবং বক্তৃতার মধ্যে সামান্য ত্রুটি বা ভারসাম্যহীনতা ছিল না।

নবী (সা)-এর পবিত্র চেহারার আবরণ খুলে কপালে চুমো খেলেন এবং বিলাপ করে কেঁদে কেঁদে বলেন, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক। আপনি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় পবিত্র ছিলেন। আপনার ইনতিকালে নবুওয়াত এবং ওহী চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল, যা অন্য কোন নবীর ইনতিকালে বন্ধ হয়নি। আপনি প্রশংসার ঊর্ধ্বে এবং বিলাপ ও ক্রন্দন থেকে অমুখাপেক্ষী। আপনার পবিত্র সত্তা এ দৃষ্টিকোণ

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৩; যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৮০।

২. তাফসীরে কুরতুবী, ৪ খ, পৃ. ২২৩

থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, আপনার ইনতিকালে জনগণ সান্ত্বনা লাভ করবে। আপনি এটা অবগত আছেন যে, আপনার জন্য আমরা সবাই দুঃখ ও বিষাদে সমব্যথী। আপনার মৃত্যু যদি আপনার অভিপ্রায় অনুযায়ী না হতো (কেননা আল্লাহ তা'আলা তো আপনাকে অধিকার প্রদান করেছিলেন কিন্তু আপনি স্বয়ং আখিরাতকে গ্রহণ করেছেন), তা হলে আমরা আপনার ইনতিকালের কারণে আমাদের জীবন উৎসর্গ করতাম। যদি আপনি আমাদেরকে অধিক ক্রন্দন করতে নিষেধ না করতেন, তাহলে আমরা ক্রন্দন করতে করতে আমাদের চোখের পানি নিঃশেষ করে দিতাম। অবশ্য দু'টি বিষয় এরূপ যা দূরীভূত করা আমাদের অধিকারভুক্ত নয়। এক তিরোধানের বেদনা, দ্বিতীয় দুঃখ ও বেদনায় দেহ দুর্বল হয়ে যাওয়া। এ দু'টি বিষয় পরস্পর পৃথক হতে পারে না। হে আল্লাহ! আমাদের এ অবস্থা আমাদের নবীকে পৌঁছিয়ে দাও। হে মুহাম্মদ (সা)! আপনার প্রেমিকগণকে আল্লাহর দরবারে স্মরণ রাখুন। আমাদের আশা, আমরা আপনার সদয় দৃষ্টি ও বিবেচনায় থাকব।

যদি আপনি[১] আপনার আত্মিক প্রেরণা ও সাহচর্য দ্বারা আমাদের অন্তরে সান্ত্বনা দিয়ে না যেতেন তাহলে আমরা এই মর্মান্তিক তিরোধানের বেদনা কখনো সহ্য করতে পারতাম না।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) হুজরা থেকে বাইরে আগমন করেন এবং লোকজনের সান্ত্বনার জন্য খুত্‌বা দান করেন।

খুতবার[২] অবশিষ্ট অংশ

أشهد ان لا اله الا اللهُ وَحده وصدق وعده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلله الحمد وحده ـ

---

১. এটা পূর্বে উল্লেখিত রিওয়ায়েতের বাকী অংশ যা 'রাওযুল উনুফ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। পূর্ববর্তী অংশ রওযুল উনূফ এবং ইহইয়াউল উলূম উভয় গ্রন্থে উল্লেখ ছিল ঐ অংশ শেষ হওয়ার পর উভয় কিতাবের সূত্র উল্লেখ করা হয়। এবার রওযুল ইনুফে উল্লেখিত বাকী অংশ উল্লেখ করা হলো ঃ

فلولا ماخلفت من السكينة لم نقم من الوحشه أللهم ابلغ نبيك عنا واحفظه فينا ثم خرج لماقضى الناس عراتهم وقام خطيباً فيهم بخطبة حلها الصلاة على النبى محمد صلى الله عليه وسلم وقال فيها اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له الى الخطبةُ روض الانف صفـ٢٧٦ج٢

২. এ পর্যন্ত খুতবা ইহ্ইয়াউল উলূমের ইত্তিহাফের ৩০২ পৃ. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু দরূদ শরীফ ব্যতীত খুতবার কিছু অংশ রওযুল উনুফের ২য় খণ্ডের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। অত:পর অর্থাৎ ثم قال ايها الناس من كان يعبد محمداً الخ ..... ولاتنتظروه فيلحق بكم ـ পর্যন্ত উভয় কিতাবে বর্ণিত আছে।

وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخاتم انبياءه واشهد ان الكتاب كما نزل وان الدين كما شرح وان الحديث كما حدث وان القول كما قال وان الله هو الحق المبين ـ

أللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك و امينك وخيرتك وصفوتك بافضل ما صليت به على احد من خلقك اللهم واجعل صلواتك ومعافاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وامام المتقين محمد قائد الخير وامام الخير و رسول الرحمة اللهم قرب زلفة وعظم برهانه وكرم مقام وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون وانفعنامقامه المحمود يوم القيامة واخلفه فينا فى الدنيا والاخرة وبلغه الدرجة والوسيلة منَ الجنة اللهمَّ صلى على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد ـ

ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات من كان يعبد الله فان الله حى لم يميت وان الله تقدم لكم فى امره فلا تدعوه جزعا وان الله تبارك و تعالى قد اختار لنبيه عليه السلام ما عنده على ماعندكم وقبضه الى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبنيه فمن اخذبهما عرف ومن فرق بينهما انكر ـ يأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولايفتنكم عن دينكم وعاجنوا الشيطان بالخير وتعجزوه ولا تستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم ـ۱

فلما فرغ من خطبته قال ياعمر أنت الَّذى بلغنى عنك اِنَّك تقول على باب نبى الله والَّذى نفس عمر بيده مامات نبى الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم كذا كذا وقال الله عز وجل فى كتابه انك ميت وانهم ميتون ـ

১. অতঃপর فلما فرغ من خطبته থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু রওযুল উনুফে বর্ণিত আছে।

فقال عمر والله فكان لم اسمع بها فى كتاب الله تعالى قبل الان لما نزل بنا اشهد ان الكتاب كما نزل وان الحديث كما حدث و ان الله تبارك وتعالى حى لايموت انا لله وانا اليه راجعون صلوات الله على رسوله وعند الله نحتسب رسوله ـ١

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ তাঁর নবীর সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দার (নবীর) সাহায্য করেছেন, কাফিরদের দলকে পরাজিত করেছেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কুরআনুল করীম এমনিভাবে বিদ্যমান আছে, যেভাবে তা নাযিল হয়েছে এবং দীন এমনিভাবে আছে, যেমনিভাবে শরী'আত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাদীস এভাবে রয়েছে, যেভাবে নবী করীম (সা)-এর পবিত্র মুখ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বাণী এমনিভাবে রয়েছে যেভাবে নবী (সা) ইরশাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা হলেন হক ও সত্য এবং সত্যকে তিনি প্রকাশ করেন।

হে আল্লাহ! তুমি তোমার বিশেষ রহমত নাযিল কর মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, যিনি তোমার মনোনীত বান্দা, রাসূল, নবী, হাবীব, আমীন এবং তোমার সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাঁর উপর এরূপ উত্তম সালাত ও সালাম নাযিল কর যা তুমি তোমার কোন খাস বান্দার উপর নাযিল করেছ। হে আল্লাহ! তুমি তোমার রহমত, বরকত ও আফিয়ত নাযিল কর সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, ইমামুল মুত্তাকীন, খায়র ও কল্যাণের নেতা এবং রহমতের রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর। হে আল্লাহ! তাঁর নৈকট্য লাভকে আরো বৃদ্ধি কর। তাঁর দলীলকে বৃহত্তর কর, তাঁর মাকামকে আরো মর্যাদাবান কর। তাঁকে মাকামে মাহমূদে (শাফা'আতের মাকাম) প্রতিষ্ঠিত কর, যার উপর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীগণ ঈর্ষা করবে। কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তাঁর শাফা'আত দ্বারা উপকৃত ও ফায়দা দান কর। ইহকাল ও পরকালে তুমি তাঁর বিনিময়ে আমাদেরকে স্বীয় রহমত দান কর এবং তাঁকে বেহেশতে উচু মর্যাদা নসীব কর। হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মদ (সা) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি তোমার খাস রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল কর। যেমনিভাবে তুমি হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি নাযিল করেছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও মহিমান্বিত।

অতঃপর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা) ইবাদত করবে, সে জেনে রাখুক মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন। যে ব্যক্তি

১. রাওযুল উনুফ, ২খ. পৃ ৩৭৬

আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ইনতিকালের সম্পর্কে পূর্বেই তোমাদেরকে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে নবীর জন্য তাঁর নৈকট্যকে পসন্দ করেছেন এবং প্রতিদানের দিকে তাঁকে আহবান করেছেন। নবীর পর তোমাদের হিদায়তের জন্য স্বীয় কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর নবীর সুন্নাত তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাত আঁকড়ে ধরেছে, সে হক ও সত্যের পরিচয় লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে (যেমন-কুরআন মানে কিন্তু সুন্নাতকে মানে না) তাহলে সে হক ও সত্যের পরিচয় লাভ করতে পারল না। হে বিশ্বাসীগণ! হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও। নবী ইনতিকালের কারণে শয়তান যেন তোমাদেরকে দীন থেকে দূরে নিয়ে না যায়। তোমাদেরকে ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার পূর্বে কল্যাণকে দ্রুত গ্রহণ কর। কল্যাণের অগ্রগামী হয়ে শয়তানকে অক্ষম বানিয়ে দাও। শয়তানকে এতটুকু সুযোগ দিবে না, যাতে সে তোমাদের সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে কোন ফিতনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) খুতবা সমাপ্ত করে হযরত উমরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে উমর! তুমি ঐ ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমার নিকট এই সংবাদ এসেছে যে, তুমি নবীর দরজার উপর দাঁড়িয়ে এ কথা ঘোষণা করেছ যে, নবী মৃত্যুবরণ করেননি। তুমি কি অবগত নও যে, রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যু সম্পর্কে অমুক অমুক দিন এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআনে বলেছেন ঃ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ (তুমি অবশ্যই মারা যাবে এবং তারাও অবশ্যই মারা যাবে)।

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার অবস্থা এই হলো যে, আমি যেন আল্লাহর কিতাবের এই আয়াত এর পূর্বে কখনো শুনিনি। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, কুরআন এমনিভাবে আছে যেভাবে নাযিল হয়েছে। হাদীস এভাবে রয়েছে, যেভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা চিরঞ্জীব। তাঁর উপর কখনো মৃত্যু আপতিত হবে না, انا لله وانا اليه راجعون। আল্লাহ তা'আলার রহমত তাঁর রাসূলের উপর বর্ষিত হোক। আমরা আল্লাহর দরবারে আশাবাদী যে, তিনি আমাদেরকে এ বিপদে সাহায্য করবেন।"

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় আনসারগণের সমাবেশ

একদিকে তো এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। কিছুক্ষণ পর আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্রিত হলেন এবং নবী (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন এ বিষয়ে আলোচনা হতে লাগালো। মুহাজিরগণ হযরত সিদ্দীকে আকবরকে বললেন,

আপনিও সাকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করুন। আমরাও আপনার সাথে থাকব। হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমরকে সাথে নিয়ে সাকীফায় গমন করেন।

হযরত আবূ বকর ও উমরের এ আশংকা হয় যে, মুসলমানরা তাড়াহুড়া করে এমন কারো হাতে বায়'আত যেন না করে, যার ফলে এটা ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং মুসলমানদের জন্য বিপদ হয়ে যায়। যখন এ বিষয়ের সমাধান হয়ে গেল এবং সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবরকে খলীফা ও রাসূল (সা)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মেনে নেয়া হলো, তখন পরবর্তী দিবসে নবী (সা)-এর দাফন কাফনের কাজ সম্পন্ন করা হলো। সাকীফায় সোমবার বিকালে লোকজন একত্রিত হয়েছিল। কেননা সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন। এরপর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) সুখ নামক স্থান থেকে আগমন করেন এবং খুতবা প্রদান করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনার পর সন্ধ্যের দিকে সাকীফায় সমাবেশের ঘটনা ঘটে।

আহ্লে বায়তের সবাই নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত ছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারূক আযম আনসারগণের একত্রিত হওয়ার সংবাদ শুনে সাকীফায় গমন করেন। তাঁদের এই চিন্তা ছিল যে, নবী করীমের (সা) ইনতিকাল হয়েছে এবং ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নবী (সা) আমাদেরকে আগত ফিতনা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। এ সময় যেন উম্মাতের মধ্যে কোন বিচ্ছিন্নতার ফিতনা সৃষ্টি না হয়। যার ফলে ইসলামের সমস্ত ব্যবস্থাপনা ও আদর্শ ধ্বংস হয়ে না যায় এবং নবুওয়াতের ২৩ বছরে ইসলামের যে শৃংখলা ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আল্লাহ না করুন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে উম্মাতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ছিন্ন হয়ে যাবে যা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন হবে। যদি কোন বাদশাহ্ ইনতিকাল করে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন উত্তরাধিকার মনোনীত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দাফনের কাজ সম্পন্ন হয় না। এরূপ মুহূর্তে দাফনের চেয়ে উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিষয়টি অধিক গুরুত্ব বহন করে থাকে। রাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ এ চিন্তা করেন, যাতে রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। অসতর্কতার সুযোগে যাতে শত্রুরা আক্রমণ করে না বসে। যার ফলে সমগ্র দেশের ধ্বংস হওয়ার আশংকা থাকে। বরং অনেক সময় যুক্তিসঙ্গত কারণে বাদশাহ্র মৃত্যুর সংবাদ গোপন রাখা হয় এবং উত্তরাধিকার মনোনয়নের পর তা প্রকাশ করা হয়।

বাদশাহ্র ইনতিকালের পর যদি রাজ্যে দু'জন আমীর মনোনীত হয়, তাহলে অবশ্যই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। একই সাম্রাজ্যে দু'জন খলীফা মনোনীত হওয়া অনিষ্টতা ও ধ্বংস হওয়ার কারণ হয়ে যায়। নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর মুনাফিক ও কাফিরদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ও গোলযোগ সৃষ্টির আশংকা ছিল। এ সময় ইসলামের ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার হিফাযত করা ছিল প্রাথমিক কাজ। এ ছাড়া হযরত সিদ্দীকে আকবরও হযরত উমর ফারূক (রা) এ ধারণা করেন যে, দাফন-কাফন তেমন কঠিন

কাজ নয়, বরং এ কাজ আহলে বায়ত করতে সক্ষম। সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এতে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন নেই।

নবী (সা) ২৩ বছরে ইসলামের অগ্রগতি ও প্রতিষ্ঠা এবং কুফরী মিটিয়ে দেয়ার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, এখন তা কল্পনা করাও যাচ্ছে না। এখন তিনি অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালবাসী হয়েছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য কাজসমূহের জন্য যদি কোন প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করা না হয়, তাহলে এটা আশংকা করা যায় যে, মুহূর্তের মধ্যে ইসলামী সাম্রাজ্যের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং এত বছরের দুঃখ-কষ্ট, গাযওয়া, সারীয়া, তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়েছে তা মুহূর্তে নিষ্ফল ও অর্থহীন হয়ে যাবে, এর ফলে পূর্বের ন্যায় কুফরীর দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে এবং শয়তান লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করতে থাকবে। যেহেতু নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, সুতরাং এখন যদি কুফরীর অন্ধকার দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে লোকজন কোথা থেকে হিদায়াতের আলো পাবে।

چونکه شدخورشید ومارا کردداغ * چاره نبود درمقامش ازچراغ

"যেহেতু হিদায়াতের জ্যোতি (নবী করীম (সা) আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বিদায় নিয়েছেন, তাই তাঁর শুন্যস্থান বিকল্প ব্যবস্থা না করে তো (ইসলামও উম্মাহ্‌র) উপায় নেই।"

এ জন্য হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) এ চিন্তা করলেন যে, রাসূল (সা) ইনতিকালের সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকার মনোনীত করা উচিত, যাতে ইসলামী সাম্রাজ্য ও তার প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকে এবং ওঁৎপেতে থাকা কোন মুনাফিক ও ইসলামের শত্রু মাথা উঁচু করতে না পারে। এর মধ্যে সমস্ত উম্মাতের কল্যাণ ও সফলতা নিহিত রয়েছে।

সুতরাং পূর্ণাঙ্গ দুরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ফিতনা-ফাসাদের সুযোগ ও আশংকা বন্ধ করে দিতে হবে এবং মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃংখলা থেকে হিফাযত করতে।

এদিকে আনসারগণ উত্তরাধিকারী নির্ধারনের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, একজন আমীর হবেন আনসার থেকে, একজন হবেন মুহাজির থেকে, এটা ছিল এক বিরাট ফিতনা। একই সাম্রাজ্যে দু'জন আমীর হওয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ারই নামান্তর। সুতরাং হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) এ বিষয়ের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। যখন উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিষয়টি সমাধান হয়ে যায়, তখন শান্তভাবে কাফন-দাফনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

چشم بداند یش که برکنده باد عیب نما یدهنرش درنظر

"কুজনরা সর্বদা ব্যস্ত থাকে ছিদ্রান্বেষণে, তারা ভাল গুণাবলীকেও ত্রুটি আকারে উপস্থাপন করে।"

হযরত আবূ বকর (রা) সাকীফায় ফিতনা রোধ করার জন্য গমন করেন কিন্তু লোকজন হযরত আবূ বকরকেই খলীফা মনোনীত করেন। এতে হযরত আবূ বকরের কোন হাত নেই। তিনি বিষয়টি বিলম্ব করছিলেন, কিন্তু লোকজন একমাত্র তাঁকেই এ পদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত মনে করেন। হযরত আবূ বকরের খিলাফতের ব্যাপারে কোন চিন্তা ও খেয়ালই ছিল না। শুধু ফিতনা ফাসাদ দমন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর এ ব্যাপারে কোন খবরই ছিল না যে, খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করা হবে ।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

নবী (সা.)-এর দাফন-কাফন ও গোসল

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর হাতে বায়'আত সম্পন্ন করার পর লোকজন নবী (সা)-এর দাফন-কাফনের কাজে নিয়োজিত হন। গোসল প্রদানের পূর্বে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, পবিত্র দেহ থেকে কাপড় খোলা হবে কিনা। কোন সিদ্ধান্ত হয়নি, এমনি মুহূর্তে সবার উপর তন্দ্রা সৃষ্টি হয় এবং অদৃশ্য থেকে এ আওয়ায শ্রুত হয় যে, আল্লাহর রাসূলকে উলঙ্গ করো না। পরিধানের কাপড়সহ গোসল দাও। সুতরাং পবিত্র পিরহানের সাথেই নবী (সা)-কে গোসল প্রদান করা হয়। পরে তা খুলে নেয়া হয়।

হযরত আলী (রা) গোসল প্রদান করেন। হযরত আব্বাস (রা) এবং তাঁর দু'পুত্র ফযল ও কসম পার্শ্ব পরিবর্তন করে দেন। হযরত উসামা ও শাকরান পানি ঢালেন।[১] গোসলের পর সহুলের তৈরি তিনটি কাপড়ের দ্বারা নবী (সা)-কে দাফন করা হয়। এ মধ্যে কোর্তা ও পাগড়ী ছিল এবং গোসলের সময় পরিহিত পিরহান খুলে রাখা হয়।[২]

দাফন কাফনের পর এ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তাঁকে কোথায় দাফন করা হবে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, নবীগণকে ঐ স্থানে দাফন করা হয় যেখানে তাঁদের রূহ করয করা হয়। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ) সুতরাং ঐ স্থানে রাসূল (সা)-এর বিছানা সরিয়ে কবর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু এতেও পরস্পর মতানৈক্য সৃষ্টি হয় যে, কোন প্রকারের কবর খনন করা হবে। মুহাজিরগণ বলেন, মক্কার নিয়মানুযায়ী বগলী কবর খনন করতে হবে। আনসারগণ বলেন, মদীনার পদ্ধতি অনুযায়ী লহদ কবর তৈরি করতে হবে। আবূ উবায়দা বগলী এবং আবূ তালহা লহোদ কবর তৈরি করার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের উভয়কে ডাকার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যে ব্যক্তি প্রথম আসবে সে তার কাজ করেন। আবূ তালহা প্রথম আগমন করেন এবং নবী (সা)-এর জন্য লাহাদ কবর তৈরী করেন।[৩] কবর উটের পিঠের উঁচু হাড়ের আকৃতির মত উঁচু করা হয়। (বুখারী)

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৬০।

২. ইত্তিহাফ, ১০ খ, পৃ. ৩০৪।

৩. যারকানী, ৮ খ, পৃ. ২৮৯-২৯২; তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ৫৯

সমীক্ষা ঃ প্রত্যেক নবীর কবর তাঁদের ইনতিকালের জায়গায় হওয়ার অর্থ হলো তাঁদের যে স্থানে ইনতিকাল হবে সেখানেই দাফন করা উত্তম। যদি কোন বিশেষ কারণে অন্য কোথাও দাফন করা হয়, তাহলে তাতে দোষের কিছু নেই।

জানাযার নামায

সুনানে ইবন মাজাহ শরীফে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, মঙ্গলবার দিন নবী (সা)-এর কাফন পরিধান করানোর পর পবিত্র জানাযা রওযার কিনারায় রেখে দেয়া হয়। এক-এক দল সেখানে আগমন করে একাকী নামায আদায় করে বাইরে চলে আসত। কেউ কারো ইমামত করত না।

শামাইলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত, লোকজন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযা কি পড়া হবে। তিনি বললেন, হ্যাঁ! জানাযা পড়। তারা জিজ্ঞাসা করলো, কিভাবে পড়বো ? হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, এক-এক দল পবিত্র হুজরায় গমন করে তাকবীর বলবে। অতঃপর দরূদ ও দু'আ পাঠ করে বের হয়ে আসবে। এরপর অন্য এক দল হুজরায় প্রবেশ করবে এবং তাকবীর বলার পর দরূদ ও দু'আ পাঠ করে ফিরে আসবে। এমনিভাবে সমস্ত লোক নামায আদায় করবে।

কাযী আয়ায (র) বলেন, সহীহ হলো এই যে, নবী (সা) জন্য জানাযার নামায পড়া হয়। এটাই অধিকাংশ ইমামদের মত। এটাকে ইমাম শাফিয়ী 'কিতাবুল উম্ম' নামক গ্রন্থে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সা) এর জন্য জানাযার নামায আদায় করা হয়।

কেউ কেউ বলেন, নবী (সা)-এর উপর জানাযার নামায আদায় করা হয়নি বরং লোকজন পবিত্র হুজরায় দলে দলে প্রবেশ করতেন এবং সালাত, সালাম এবং দরূদ ও দু'আ পাঠ করে ফিরে আসতেন।

ইবন সা'দের এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) একটি দল নিয়ে পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করেন এবং জানাযার সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করেন ঃ

السلام عليك أيها النبى ورحمة الله اللهم أنا نشهد انه قد بلغ ما انزل اليه ونصح لامته وجاهد فى سبيل الله حتى اعز الله دينه وتمت كلمة فاجعلنا ياالهنا ممن تبع القول للذى انزل معه واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه فانه كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لانبتغ بالايمان بدلا ولانشترى به ثمنا ـ

" হে নবী! আপনার উপর সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। হে আল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ সমস্ত কিছু উম্মাতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন যা কিছু তাঁর উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি উম্মাতদেরকে নসীহত করেছেন। তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দীনকে জয়ী করেছেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন যারা আপনার ওহীর অনুসরণ করেছে। আমাদেরকে তাঁর সাথে একত্র করে দিন, যাতে তিনি আমাদেরকে এবং আমরা তাঁকে ও তাঁর পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হই। তিনি মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। আমরা ঈমানের পরিবর্তে কোন প্রতিদান ও মূল্য কামনা করছি না।" লোকজন তাঁদের সাথে আমীন বলেন, যখন পুরুষগণ সম্পন্ন করেন তখন মহিলা এবং এরপর শিশু-কিশোরগণ একই ভাবে জানাযার নামায আদায় করেন।"[১]

সমীক্ষা ঃ এই রিওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর জানাযার নামায আদায়ের কথা উল্লেখ রয়েছে এবং এ বিষয়টি মুতাওয়াতির ও অকাট্য। সুতরাং তিনজন খলীফা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি বলে শী'আ সম্প্রদায় যে মন্তব্য করেছ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিবেক বিরোধী।

মুসনাদে বাযযার ও মুসতাদরেক হাকিমে বর্ণিত, নবী (সা) একবার মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হওয়া অবস্থায় আহলে বায়তের সবাইকে হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে ডাকালেন। আহল বায়তগণ আরয করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জানাযার নামাযে কে ইমামতি করবেন? রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, আমার কাফন পরিধান সম্পন্ন হওয়ার পর তোমরা কিছু সময়ের জন্য হুজরা থেকে বের হয়ে যাবে সর্বপ্রথম আমার উপর হযরত জিবরাঈল নামায আদায় করবেন, অতঃপর হযরত মিকাঈল, এরপর হযরত ইসরাফীল অতঃপর হযরত মালাকুল মাউত, অতঃপর অবশিষ্ট ফেরেশ্তাগণ নামায আদায় করবেন। অতঃপর তোমরা একের পর এক দল ভিতরে প্রবেশ করবে এবং আমার উপর সালাত ও সালাম পেশ করবে।

আল্লামা সুহায়লী বলেন, আল্লাহপাক নবী (সা) সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরা ও নবীর জন্য রহমতের দু'আ কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৬)

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৬৫।

এ আয়াতে প্রত্যেক মু'মিনকে আলাদা আলাদা সালাম পেশ করার জন্য নির্দেশ রয়েছে। যেভাবে রাসূল (সা)-এর জীবিতকালে ইমাম ও জামা'আত ব্যতীত সালাত ও সালাম পেশ করা ফরয ছিল তেমনিভাবে নবী (সা)-এর ইনতিকালের পরও কোন ইমাম ও জামা'আত ব্যতীত সালাত ও সালামের ফরয পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা হয়েছে।[১]

দ্রষ্টব্য ঃ ইবন দাহীয়া বর্ণনা করেন, ত্রিশ হাজার লোক রাসূল (সা)-এর জানাযার নামায আদায় করেন।

দাফন

নবী (সা) সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় ইনতিকাল করেন। এটা ঐ দিন ও ঐ সময় ছিল, যখন তিনি হিজরত করে মদীনায় প্রবেশ করেন। বুধবার দিন রাসূল (সা)-কে দাফন করা হয়। এটাই অধিকাংশ উলামা ও ঐতিহাসিকদের মতামত। অনেক রিওয়ায়াত এ সম্পর্কে এত সুস্পষ্ট যে, এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই। কেউ কেউ বলেছেন, মঙ্গলবার দিন দাফন করা হয়।

হযরত আলী, হযরত আব্বাস এবং তার দু'পুত্র ফযল ও কসম নবী করীম (সা) কে কবরে রাখেন। দাফন শেষ করে কবরকে উটের পিঠের উঁচু হাঁড়ের মত করা হয় এবং পানি ছিঁটানো হয়।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) দাফন সম্পন্ন করে শত আফসোস করে, রক্তের অশ্রু প্রবাহিত করে এই বিষাদময় মুসীবতে انا لله وانا اليه راجعون পাঠ করতে করতে বাড়ি ফিরে যান।

কয়েকটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী করীম (সা)-ইনতিকাল সম্পর্কে পাঠকবৃন্দ অবগত হয়েছেন। এবার আমরা ইনতিকাল সম্পর্কিত কিছু সূক্ষ্মতত্ত্ব পেশ করব।

سُبْحَانَكَ لاَعِلْمَ لَنَا اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

"আপনি পবিত্র, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের আর কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারা ঃ ৩২৯)

১. পরকালের সফরের প্রস্তুতি হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত। আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত বা সংবাদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহী বা অদৃশ্য ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

میان عاشق ومعشوق رمز بست * کراماً کاتبین راهم خبر نیست

১. তাবাকাতে ইবন সা'দ, ২ খ, পৃ. ৭৪

" প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে যে গোপন রহস্য বিরাজ করে, কিরামান কাতেবীনও সে সম্পর্কে খবর রাখে না।"

পূণ্যবান ব্যক্তিকে কোন কোন সময় ইল্হাম ও সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুর আগাম খবর দেয়া হয়ে থাকে। নবুওয়াত সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু সত্য স্বপ্ন (رؤيا صالحه) উম্মাতের মধ্যে এখনো বাকী রয়েছে, যার মাধ্যমে কোন কোন সময় ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং কখনো ইঙ্গিতের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। তবে এ বিষয়টিতে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে যে, স্বপ্ন দেখা কারো ইচ্ছাধীন নয়। স্বপ্ন দেখানো আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতাধীন, যাকে ইচ্ছা, যে সময় যতটুকু এবং যেভাবে ইচ্ছা, দেখাবেন। ইচ্ছা বা অভিপ্রায় না হলে দেখাবেন না, এখানে কোন নিয়ম-নীতির ব্যাপার নেই।

এই ধাঁ ধাঁর রহস্য কেউ নিজেও বের করতে পারেনি আর অন্যের দ্বারাও তার জট খুলাতে পারেনি।

সাধারণভাবে মু'মিনদেরকেও কখনো কখনো স্বপ্ন এবং বয়সের চাহিদা, আবার কখনো রোগগ্রস্ত করার মাধ্যমে সতর্ক করা হয়ে থাকে যে, সময় নিকটবর্তী। কখনো কখনো সমবয়স্কদের ইনতিকাল প্রত্যক্ষ করে এ খেয়াল হয়ে থাকে যে, আমার সমবয়সীরা দুনিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সুতরাং আমাকেও তৈরি হতে হবে। মৃত্যু আগমনের সবচেয়ে সুস্পষ্ট নিদর্শন হলো বয়স ষাট বছরে পৌঁছে যাওয়া এবং বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হওয়া, যার পর দলীল সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন আল্লাহপাক বলেছেন ঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاۤءَكُمُ النَّذِيْرُ ـ

"আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে ইচ্ছা করলে সতর্ক হতে পারতে। তোমাদের নিকট তো সতর্ককারী এসেছিল।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

মোটকথা সতর্ক করার পন্থা একটি নয়, অনেক পন্থায় মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায়। এরপর এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম হলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা ও নিষ্পাপ। তাঁদের মাগফিরাত নিশ্চিত। আমরা পাপী, আমলহীন, অনুপযুক্ত, আপাদমস্তক ত্রুটি ও অন্যায়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং মৃত্যুর প্রস্তুতিতে কোন ত্রুটি হওয়া উচিত নয়। যতটুকু সম্ভব তাওবা ও ইসতিগফার করতে হবে এবং এ দু'আ পাঠ করবে ঃ

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ـ اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই দুনিয়া ও আখিরাতে আমার অভিভাবক। আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০১)

২. কাগজ চাওয়ার ঘটনা

কাগজ প্রদানের ঘটনা সম্পর্কে শী'আ সম্প্রদায় হযরত ফারূক আযম (রা)-এর উপর এই অভিযোগ উত্থাপন করে যে, অন্তিমকালে আল্লাহর নবীকে ওসীয়্যত করা থেকে তিনি বাধা প্রদান করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করার জন্য কাগজ প্রদান করেন নি। এভাবে নবী (সা)-এর নাফরমানী ও নির্দেশ অমান্য করেছেন।

জবাব

এ অভিযোগের জবাব হলো এই যে, নবী করীম (সা)-এর নির্দেশের সম্বোধিত ব্যক্তি হযরত উমর (রা) একা ছিলেন না, বরং পবিত্র হুজরায় উপস্থিত সবাইকে কাগজ, কলম প্রদানের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (সা)-এর হুজরায় উপস্থিত অধিকাংশই আহলে বায়ত বা নবী পরিবারের লোকজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। যদি হযরত উমর (রা) কাগজ ও কলম সরবরাহ না করে থাকেন তাহলে হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসকে কে নিষেধ করেছে? যখন হযরত আলী ও আব্বাস (রা) কাগজ কলম সরবরাহ করেন নি, তখন এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের একই মত ছিল। যা হযরত উমরের মত ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ অন্তিম মুহূর্তে এবং রোগের তীব্রতার সময় কষ্ট দেয়া উচিত নয়। যদি কাগজ আনার নির্দেশ ওয়াজিব বা ফরয অর্থাৎ অবশ্য করণীয় কর্তব্য হিসেবে হত, তাহলে উপস্থিত সবাই পাপী এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ লংঘনকারী হতো। একমাত্র হযরত উমরের এখানে বিশেষত্ব কী ছিল যে, তাঁকেই অভিযোগের মূল লক্ষ্য বানানো হবে।

অধিকন্তু এ আলোচনা ও কথাবার্তার পর পাঁচ দিন পর্যন্ত রাসূল (সা) জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার কাগজ-কলম নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ প্রদান করেননি এবং আহলে বায়তের কেউ অথবা অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের কেউ এ ব্যাপারে কিছু বলেন নি।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ নির্দেশ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক ছিল না। নতুবা রাসূল (সা) স্বয়ং এটা অবশ্যই লিখিয়ে দিতেন। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ـ

" হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করুন যদি তা না করেন, তাহলে তো আপনি তাঁর বার্তা প্রচার করলেন না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

হযরত আলী এ পাঁচ দিনের মধ্যে কোন এক সময় কাগজ কলম চেয়ে এই বাধ্যতামূলক কাজ অবশ্যই বাস্তবায়ন করতেন এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন না। হযরত উমর (রা) নবী করীম (সা)-এর হুজরার পাহারাদার ছিলেন না যে, যার ফলে কোন ব্যক্তি তাঁর অনুমতি ব্যতীত কাগজ-কলম নিয়ে লিখিয়ে নিতে পারেন নি। হযরত উমরের আবেদন ছিল এরূপ যেমন-হযরত আলীকে রাসূলুল্লাহ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সন্ধিপত্র থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দ তুলে দেয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন কিন্তু হযরত আলী (রা) এ নির্দেশ পালন করেন নি। হযরত আলীর এই নির্দেশ পালন না করা বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও নাফরমানীর মধ্যে গণ্য হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল পরিপূর্ণ মহব্বত ও মর্যাদার নিদর্শন, যা হাজারো আনুগত্যের সমান।

হযরত উমরের এটা বলা حسبنا كتاب الله (আমাদের জন্য কুরআন যথেষ্ট) এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের হাদীসের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ এই যে, দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখন দীনের কোন নুতন বিধান বাকী নেই। সম্ভবত স্নেহবশত আপনার এ আশংকা হয়ে থাকতে পারে যে, আমরা আপনার পর গোমরাহীর মধ্যে মগ্ন হয়ে না যাই। হযরত উমর (রা) মহব্বত ও সহানুভূতির কারণে আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট স্বীকার করবেন না। আল্লাহর কিতাব আমাদেরকে গোমরাহী থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং হযরত উমরের এ আরযে পূর্ণাঙ্গ মহব্বত ও কল্যাণ নিহিত, নাফরমানী ও আদেশ অমান্যকরণের লেশমাত্র নেই।

যদি এটা বলা হয় যে, নবী (সা) খিলাফত সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করানোর অভিপ্রায় করেছিলেন। এ অবস্থায় আমরা বিষয়টিকে দু'টি অবস্থায় সাথে সংযুক্ত বলব। এক, হযরত আবূ বকরের খিলাফত সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করানো কামনা করেছেন অথবা হযরত উমরের। প্রথমত রাসূল (সা) স্বয়ং এ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত মুলতবী ঘোষণা করে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং মু'মিনগণ আবূ বকর ব্যতীত কারো খিলাফত কবূল করবেন না। এ বিষয়টি নবী করীম (সা) আল্লাহ তা'আলা এবং মুসলমানদের ইজমা' ও ঐক্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যদি হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করানোর বিষয়টি কামনা করতেন, তাহলে শী'আদের মতে এর প্রয়োজন ছিল না। কেননা এ ঘটনার পূর্বে হাজার হাজার লোকের উপস্থিতিতে গাদীরেখুমের ময়দানে হযরত আলীর বিলায়েতের খুতবা প্রদান করেন এবং হযরত আলীকে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর অভিভাবক বলে ঘোষণা প্রদান করেন। এ ঘটনা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুতরাং এই প্রচার ও সাধারণ ঘোষণার পর একটি সীমাবদ্ধ হুজরার মধ্যে কয়েকজন আহলে বায়তের সামনে ঐ লিখিত বক্তব্যের কি প্রয়োজন রয়েছে?

৩. হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর ইমামত

অসুস্থ অবস্থায় নবী (সা) কর্তৃক হযরত সিদ্দীকে আকবরকে নামাযের ইমাম মনোনীত করা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হযরত শায়খ জালালউদ্দীন সুয়ূতী (র) তারীখুল খুলাফায় উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস হলো মুতাওয়াতির। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত আলী, আবদুল্লাহ, ইবন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবন উমর, আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ এবং হযরত হাফসা (রা) পৃথক পৃথক রিওয়ায়াত করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রা) তিনবার অস্বীকার করেছেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (সা) বারবার এটাই বলেন যে, আবূ বকরকে নামায পড়াতে বল। অসংখ্য হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, নবী (সা) মুসলমানদেরকে এ বিষয়ে তাকীদ প্রদান করেন যে, নামাযে এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম নির্ধারণ কর যিনি ইলম্ কিরা'আত এবং তাক্ওয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ। শী'আ সম্প্রদায়ের মতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ব্যতীত কাউকে ইমাম নির্বাচন করা জায়েয নেই।

এ নির্দেশাবলীর দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা) কর্তৃক হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে ইমাম নিয়োগ করাই প্রমাণ করে যে, রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে হযরত আবূ বকর সবচেয়ে জ্ঞানী ও মুত্তাকী ছিলেন। যেমন-সমস্ত মুফাস্সীরের ইজ্মা হলো এই যে, সূরা লাইল এর আয়াত وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى الاية (এবং এর থেকে অর্থাৎ প্রজ্বলিত অগ্নি দূরে রাখা হবে আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিকে) হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং আয়াতে اتقى (সর্বাধিক মুত্তাকী) দ্বারা হযরত আবূ বকরকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আল্লাহপাক আরো ইরশাদ করেন ঃ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট ঐ ব্যক্তি মর্যাদাবান যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করে) শী'আ সম্প্রদায় কি বলবেন যে, যদি হযরত আবূ বকর (রা) কাফির, ফাসিক অথবা মুনাফিক হবেন তাহলে নবী করীম (সা) তাঁকে কেন ইমাম বানিয়েছেন এবং নামাযে কেন তাঁর পিছনে ইকতিদা করেছেন। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত উমর, হযরত আলী, হযরত উসমান ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম কিভাবে তাঁর পিছনে নামাযে ইকতিদা করেন?

হাফিয আল্লামা ইবন কাসীর (র) বলেন ঃ

والمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ابابكر اماماً للصحابة كلهم فى الصلاة التى هى اكبر أركان الاسلام العملية قال الشيخ أبو الحسن الاشعرى وتقديمه له امر معلوم بالضرورة من دين الاسلام قال وتقديمه له دليل على انه علم الصحابة واقرأهم لما ثبت

فی الخبر المتفق علی صحة بین العلماء أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوم القوم اقراهم الکتاب الله فان کانوا فی القرأة سواء فاعلماهم بالسنة سواء فاکبرهم سنا فان کانوا فی السن سواء فاقدمهم مسلما (اسلاما) قلت وهذا من کلام الاشعری رحمة الله ممایـنبغی ان یکتب بمأ الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات کلها فی رضی الله عنه وارضاه ـ(১)

"উদ্দেশ্য হলো এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-কে ইমাম নিয়োগ করেন, যাতে তিনি তাদের নামায পড়ান। প্রকাশ থাকে যে, ইসলামের করণীয় আরকানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রুকন হলো নামায। ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর বলেন, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকরকে ইমামতের জন্য সামনে পেশ করা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, হযরত আবূ বকর (রা) সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে ইলম ও মর্যাদায় সর্বোত্তম। কেননা হাদীসে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, কাওমের ইমামত ঐ ব্যক্তি করবেন যিনি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। যদি কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে সবাই সমকক্ষ বা সমপর্যায়ের জ্ঞানী হন তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবে, যিনি নবীর সুন্নাত তথা হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানী। যদি ইলমে হাদীসেও সবাই সমান জ্ঞানী হন তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবেন যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ (হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমান বৃদ্ধ ব্যক্তিদের দেখে লজ্জাবোধ করেন)। যদি বয়সে সবাই সমান হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি ইমামত করবেন যিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এই হাদীসের সহীহ হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের ঐকমত্য রয়েছে।

হাফিয ইবন কাসীর (র) বলেন, ইমাম আবুল হাসান আশ'আরীর এ কথা ও মতামত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করার মত। হযরত আবূ বকর (রা) এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন।"

শী'আ সম্প্রদায় এ কথা স্বীকার করেন যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) নবী করীম (সা)-এর পবিত্র হুজরায় প্রায়ই যাতায়াত করতেন। কিন্তু তিনি হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কাউকে ইমামতের জন্য নির্দেশ বা অনুমতি প্রদান করেন নি।

সাহাবায়ে কিরাম এ ইমামতকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর খিলাফতের উপর দলীলরূপে গ্রহণ করেছেন। ইবন আসাকির হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রাসূল (সা) যখন হযরত আবূ বকরকে ইমামতের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, আমরা তখন উপস্থিত ছিলাম। সুস্থ ছিলাম অসুস্থ ছিলাম না। সুতরাং যে ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সা) দীনের ব্যাপারে আমাদের ইমাম নিয়োগ করা পসন্দ করেছেন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২৩৬।

আমরা দুনিয়ার কার্যক্রমের জন্য তাঁকে ইমাম নির্বাচন করা কেন পসন্দ করব না। এ ছাড়া নবী করীম (সা)-এর সর্বশেষ খুতবায় হযরত সিদ্দীক আকবরের (রা) দরজা ব্যতীত সমস্ত দরজা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান ইত্যাদি হযরত আবূ বকর ফযীলত ও খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

৪. একটি সন্দেহ ও এর অপনোদন

সন্দেহ হলো এই যে, মুসনাদে আহমাদে হযরত সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسد الابواب الشارعة فى المسجد وترك باب على.

"নবী করীম (সা) নির্দেশ প্রদান করেন যে, মসজিদের দিকে যতগুলো দরজা খোলা রয়েছে সবগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক, একমাত্র হযরত আলীর দরজা ব্যতীত। (মুসনাদে আহমাদ, ১ম খ, পৃ. ১৭৫) সুতরাং মুসনাদের এই রিওয়ায়াত এবং বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। যাতে এই নির্দেশ রয়েছে যে, আবূ বকরের দরজা ব্যতীত সব দরযা বন্ধ করে দেয়া হোক।

জবাব ঃ উপরোক্ত হাদীসের জবাব হলো এই যে, মুসনাদে আহমাদের রিওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়েতের সমপর্যায়ের নয়। যদি মুসনাদের রিওয়ায়াত সহীহ হয়, তবুও বুখারী ও মুসলিমের রিওয়ায়াত দ্বারা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা ছিল মৃত্যু রোগের সময়ের সর্বশেষ নির্দেশ এবং হযরত আলী (রা) সম্পর্কে নির্দেশ ছিল অনেক পূর্বের। এটা ছিল ঐ সময়ের নির্দেশ যখন মসজিদ নির্মাণের কাজ চলছিল এবং হযরত আলী (রা) মসজিদের দিকের দরজা দিয়ে যাতায়াত করতেন। হযরত আবূ বকর (রা) সম্পর্কে মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে নির্দেশ প্রদান করেন যে, একমাত্র আবূ বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের দিকে আগমনের জন্য অন্যান্য দরজা বন্ধ করে দেয়া হোক। সর্বশেষ নির্দেশ পূর্ববর্তী নির্দেশকে খণ্ডন করে থাকে।

৫. হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইমামতের সময়কাল

ইমাম যুহরী (র) আবূ বকর ইবন আবূ সাবূরা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীক আকবার (রা) লোকজনকে নিয়ে সতের নামাযে ইমামত করেন। কারো কারো মতে বিশ নামায পড়িয়েছেন।[১] والله اعلم

আল্লামা সুহায়লী বলেন, হযরত হাসান বসরীর এক মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) দশ দিন অসুস্থ ছিলেন। এর মধ্যে নয়দিন হযরত আবূ বকর (রা)

---

১. মূল বাক্য হলো قال الزهرى عن أبى بكربن أبى سبرة ان ابابكر صلى بهم سبع عشرة صلاة وقال غير عشرين صلاة - আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ. পৃ. ২৩৫।

লোকজনকে নামায পড়িয়েছেন। দশম দিন রাসূল (সা) উসামা ও ফযল ইবন আব্বাস (রা)- এর সহযোগিতায় মসজিদে গমন করেন এবং হযরত আবূ বকরের পিছনে নামায আদায় করেন। এ হাদীস দারাকুতনী রিওয়ায়েত করেছেন। এ হাদীসটি গারীব।[১]

৬. ইনতিকালের তারিখ

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন নবী করীম (সা) ইনতিকাল করেন। কিন্তু ইনতিকালের তারিখ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। প্রসিদ্ধ মত হলো এই যে, ইনতিকাল হয়েছিল ১২ তারিখে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, বিদায় হজ্জে আরাফাতের ময়দানে নবী (সা) জুমু'আর দিন উকূফ করেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ছিল জুমু'আর দিন এবং যিলহজ্জ মাসের ১ম তারিখ ছিল বৃহস্পতিবার। এ হিসাব অনুযায়ী পরবর্তী বছরে ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার হতে পারে না। তাই তিন মাস অর্থাৎ যিলহজ্জ, মুহাররম ও সফর মাস ত্রিশ দিন হিসেবে গণনা করা হোক অথবা ঊনত্রিশ দিন হিসেবে অথবা কোন মাস ত্রিশ দিন এবং কোন মাস ঊনত্রিশ দিনে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন উলামায়ে কিরাম ইনতিকালের তারিখ ১৩ রবিউল আউয়াল গণ্য করেন। আবার কেউ ১৪, কেউ ১৫ রবিউল আউয়াল মনে করেন। কেউ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। যেমন হাফিয ইবন রজব (র) لطائف المعارف নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

কোন কোন আলিম বলেছেন, মক্কা ও মদীনার তারিখের মধ্যে পার্থক্য সূর্য উদয়ের স্থানের পার্থক্যের কারণে হয়েছে এবং মদীনা শরীফে রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ বৃহস্পতিবার হলে সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল হবে। والله اعلم

আরো বিশদ বিবরণের জন্য মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবীর ফাতওয়া ৩য় খণ্ড দেখুন।

সমীক্ষা ১ঃ হাফিয ইবন কাসীর (র) বলেন, বুখারীর এই রিওয়ায়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, নবী করীম (সা) সোমবার ভোরে ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হননি। শক্তি না পাওয়ার কারণে হুজরায় ফিরে গিয়েছেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা হলো ঃ

وارخى النبى صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات

"নবী করীম (সা) পর্দা উত্তোলন করেন কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে মসজিদে গমন করতে পারেন নি। অবশেষে না তিনি ইনতিকাল করেন।"

---

১. রাওযুল উনূফ, ২ খ, পৃ. ৩৬৯।

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন, এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু এটা বর্ণনাকারীর ধারণা। কেননা বুখারী ও মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে যে. রাসূল (সা) ফজর নামাযে অংশগ্রহণ করেননি। বর্ণনাকারীর মনে পূর্ববর্তী যোহর নামাযে অংশগ্রহণই ফজরের বলে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বশেষ নামায হিসেবে রাসূল (সা) মসজিদে যে নামায আদায় করেন, তা ছিল বৃহস্পতিবার দিন যোহরের নামায, যে নামাযের পর তিনি খুতবা প্রদান করেন। অতঃপর জুমু'আ, শনিবার ও রবিবার অতিবাহিত হয় কিন্তু রাসূল (সা) মসজিদে আগমন করেননি। সোমবার ভোরে পবিত্র হুজরা থেকে বের হলেও দুর্বলতার কারণে ফিরে গিয়েছেন।[১]

হাসান বসরীর এক মুরসাল রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, নবী (সা) দশ দিন অসুস্থ ছিলেন এবং আবূ বকর (রা) নয়দিন লোকজনের ইমামত করেন।[২]

সমীক্ষা ২ ঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় আল্লাহর নবীর স্বীয় স্থানে কাউকে ইমাম নির্ধারণ করা, স্বীয় মুসাল্লার উপর তাকে দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন বাদশাহ কর্তৃক কাউকে তাঁর সিংহাসনে বসিয়ে কোথাও চলে যাওয়ার মত। নবী করীম (সা)-এর নামাযের মুসাল্লা বাদশাহর সিংহাসন থেকে কত মর্যাদাসম্পন্ন। এ জন্য নবী (সা)-এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কিরাম হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং তাঁকে তাঁদের ইহকাল ও পরকালের ইমাম নির্বাচন করেন। কেননা, যেভাবে উম্মাতের চেয়ে নবীর উত্তম হওয়া জরুরী তেমনিভাবে নবীর খলীফা ও উত্তরাধিকারী ঐ ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি সর্বাধিক উত্তম।

খিলাফতে রাশেদা হলো নবীর উত্তরাধিকারী। এটা দুনিয়ার কোন সিংহাসন বা রাজার উত্তরাধিকারী নয়। তাই সাহাবায়ে কিরাম যাকে সর্বাধিক উত্তম মনে করেছেন তাঁকেই নবী (সা)-এর খলীফা নির্বাচন করেন।

সমীক্ষা ৩ ঃ এত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর (রা) রাসূল (সা)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইমাম ছিলেন এবং শী'আদের এই উক্তি যে, নবী (সা) তাঁকে পদচ্যুত করেন এটা সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য।[৩]

৭. সাকীফায়ে বনূ সায়েদা এবং খিলাফতের বায়'আত

সোমবার দ্বিপ্রহরের সময় নবী (সা) অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে অনন্তকালের পথে প্রস্থান করেন। ইন্তিকালের সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। কেউ কেউ মনে করেন, রাসূল (সা) এখনো ইনতিকাল করেননি। তবে এ

---

১. রাওযুল উনূফ, ৭ খ. পৃ. ৩৬৬।

২. যারকানী, ৮ খণ্ড. পৃ. ২৭৪।

৩. যারকানী, ৫খ, পৃ ২৭৪

ধারণা শুধু রাসূল (সা)-এর প্রতি অত্যধিক মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কারণে হয়েছিল, অজ্ঞতার কারণে নয়। এ মর্মান্তিক সংবাদ শুনে হযরত আবূ বকর (রা) কেঁদে ফেলেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন।

বিকালে এক ব্যক্তি এসে হযরত আবূ বকরকে এ সংবাদ প্রদান করে যে, আনসারগণ সাকীফায়ে বনী সায়েদায় একত্র হয়েছে এবং সা'দ ইবন উবাদার হাতে বায়'আত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করছে। কোন কোন আনসার এ মতামত প্রকাশ করে যে, একজন আমীর হবেন আনসার থেকে এবং একজন হবেন কুরায়শ থেকে। ধারণা ছিল এই যে, খিলাফতের হক তাদের বেশি। কেননা আনসারগণ দীনের সাহায্য করেছেন। এবং আল্লাহর রাসূলকে তাদের দেশে স্থান দিয়েছেন। নবী (সা)-এর সাথে একাত্ম হয়ে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। কেউ কেউ এ সত্যের বিরোধিতা করলেন, পরস্পর বিতর্ক হতে লাগলো।

ক্রমান্বয়ে এ সংবাদ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর নিকট পৌছলো, তাঁরা উভয়ে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) সহ মতানৈক্যের সমাধানের জন্য এবং যাতে কোন ফিতনা সৃষ্টি হতে না পারে, তজ্জন্য সাকীফায়ে বনী সায়েদায় গমন করেন। পথে আসিম ইবন আদী এবং উয়াইম ইবন সায়েদার সাথে সাক্ষাত হয়। তাঁরা হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে সেখানে গমনের জন্য বাঁধা প্রদানে ইচ্ছা করে কিন্তু তা হয়নি। তাঁরা যত দ্রুত সম্ভব সাকীফায় আনসারদের সমাবেশে উপস্থিত হন। সেখানে তখনো পরস্পর বিতর্ক চলছিল।

হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা) যখন সাকীফায় পৌঁছেন তখন হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) সেখানে কম্বল গায়ে জড়িয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। আনসারগণ তাঁকে আমীর নির্বাচন করার জন্য বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছেন।

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা)-এর বক্তৃতা

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) দাঁড়িয়ে আল্লাহপাকের প্রশংসা জ্ঞাপনের পর এ বক্তৃতা প্রদান করেন ঃ

أما بعد : فنحن الانصار وكتيبة الاسلام وأنتم يامعشر قريش رهط بيننا وقد دفت الينا دافة من قومكم فاذاهم يريدون ان يغصبونا الامر -

"আমরা আনসার অর্থাৎ ইসলামের সাহায্যকারী ও ইসলামের বাহিনী। হে কুরায়শগণ! (মুহাজিরগণ) তোমরা আমাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল (তোমরা অল্প সংখ্যক এবং আমরা অধিক সংখ্যক), তোমাদের কাওমের একটি ক্ষুদ্র দল আমাদের এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখন তারা আমাদের থেকে আমাদের খিলাফতের অধিকার জোরপূর্বক নেয়ার চেষ্টা করছে।"

অপর এক রিওয়ায়েতে বর্ণিত, হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) তাঁর বক্তৃতায় বলেনঃ

يامعشر الانصار لكم سابقة وفضيلة ليست لاحد من العرب ان محمداً صلى الله عليه وسلم لبث فى قومه بعض عشرة سنة يدعوهم فما امن به الا القليل ماكانوا يقدرون على منعه ولاعلى اعزاز دينه ولا على دفع ضيم حتى اراد الله بكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة ورزقكم الايمان به وبرسوله والمنع له ولاصحابه والاعزازله ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم اشد الناس على عدوه حتى استقامت العرب لامر الله طوعًا وكرها واعطى البعيد المقادة صاغرا فدانت لرسوله باسيافكم العرب وتوفاه الله وهو عنكم راضٍ قرير العين ـ استبدوا بهذه الامر دون الناس فانه لكم دونهم ـ

"হে আনসারগণ! তোমরা দীন ইসলামের ব্যাপারে এরূপ অগ্রগামী ও ফযীলতের অধিকারী যা তোমাদের ছাড়া আরবে অন্য কেউ হাসিল করতে পারেনি। নবী (সা) তের বছর স্বীয় কাওমের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন কিন্তু খুব কম লোকই ঈমান গ্রহণ করে। নবী (সা)-এর হিফাযত করা, তাঁর দীনের মর্যাদা দান করা এবং মাথা উঁচু করার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। এমন কি কোন শত্রুর যুলম ও অত্যাচার প্রতিহত করার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল না। যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ফযীলত ও মর্যাদা প্রদানের কামনা করেন, তখন সম্মান ও মর্যাদার আসবাব ও উপায় তোমাদেরকে দান করেন এবং তোমাদেরকে ঈমান গ্রহণের তাওফীক দান করেন। নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণের হিফাযত ও স্বীয় দীনের হিফাযত তোমাদের মাধ্যমে করিয়েছেন। আল্লাহর শত্রুদের সাথে তোমরা জিহাদ করেছ এবং আল্লাহর শত্রুদের উপর তোমরা অত্যন্ত কঠোর বলে প্রমাণিত হয়েছ। ফলে সমস্ত আরববাসী আল্লাহর নির্দেশের প্রতি মাথা নত করে এবং দূরবর্তীগণও বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করে। তোমাদের তলোয়ারের মাধ্যমে সমস্ত আরববাসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুগত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে ওফাত দান করেন। রাসূল (সা) যখন দুনিয়া থেকে ইনতিকাল করেন, তখন তিনি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন এবং নবী (সা)-এর পবিত্র চোখ তোমাদের কারণে ঠাণ্ডা অর্থাৎ তিনি সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। সুতরাং তোমরা খিলাফতের এ দায়িত্ব গ্রহণ কর। এটা তোমাদের হক, অন্য কারো নয়।"[১]

উপস্থিত সবাই এ বক্তৃতা পসন্দ করেন এবং চারদিক থেকে এর প্রশংসামূলক শ্লোগান হতে থাকে। বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

১. ইবন আসীর, ২ খ. পৃ. ১২৫

মুহাজিরগণ বিরোধিতা করে বলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে প্রথম সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছি। নবী (সা)-এর গোত্র ও দল এবং তাঁর সাথেই হিজরত করেছি অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ও দেশত্যাগ করে এখানে আগমন করেছি। কোন কোন আনসার বলেন, উত্তম হলো এই যে, দু'জন আমীর নির্বাচন করা হোক। একজন আনসার থেকে, একজন মুজাহির থেকে। উভয় আমীর পরস্পর পরামর্শ করে খিলাফতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। হযরত সা'দ ইবন উবাদা শোনামাত্রই বলেন, এটা হলো প্রথম দুর্বলতা।

হযরত উমর (রা) কিছু বলার ইচ্ছা করেন কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, তুমি চুপ থাক। হযরত উমর (রা) যেহেতু হযরত আবূ বকরকে অসন্তুষ্ট করা সমীচীন মনে করেন না, ফলে তিনি বসে পড়েন। হযরত আবূ বকর (রা) বক্তৃতা শুরু করেন।

হযরত সিদ্দীক আকবরের ভাষণ

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) মহান আল্লাহর হামদ ও সানার পর বলেন ঃ

ان اللّه قد بعث فينا رسولا شهيدا على امة ليعبدوه ويوحدوه وهم يعبدون من دونه الهة شتى من حجر وخشب فعظم على العرب ان يتركوا دين اباءهم فخص الله المهاجرين الاولين من قومه بتصديقه والمواساة له والصبر معه على شدة اذى قومهم ويكذبهم اياه وكل الناس لهم مخالف زار عليهم فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم فهم اول من عبد الله فى هذه الارض وامن بالله وبالرسول وهم اولياءه وعشيرته واحق الناس بهذه الامر من بعده لاينازعهم الاظالم وانتم يامعشر الانصار من لاينكر فضلهم فى الدين ولاسابقتهم فى الاسلام رضيكم الله انصار الدينه ورسوله وجعل اليكم هجرة فليس بعد المهاجرين الاولين عندنا بمنزلتكم فنحن الامراء وانتم الوزراء لاتقاونون بمشورة ولاتقضى دونكم الامور - (١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি উম্মাতকে পথ প্রদর্শন করেন, যাতে লোকজন এক আল্লাহর ইবাদত করে। এ সমস্ত লোক নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে পাথর ও কাঠের তৈরি মূর্তির পূজা করত। বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করা আরবদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়। অতঃপর আল্লাহ

১. ইবন আসীর, ২ খ. পৃ. ১২৫

তা'আলা রাসূল (সা)-এর কাওম থেকে অগ্রবর্তী মুজাহিরগণকে খাস তাওফীক দান করেন, যারা সর্বপ্রথম নবী (সা)-কে সত্য বলে বিশ্বাস করেন এবং সাহায্য ও সহযোগিতা করেন. কাওমের পক্ষ থেকে কঠোর নির্যাতন ও উৎপীড়নের সময় ধৈর্যধারণ করেন। অথচ ঐ সময় সমস্ত লোক তাঁদের বিরোধী ছিল কিন্তু সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও লোকজনের শত্রুতার কারণে ভীত হয়নি। এ অবস্থায়ও নবী (সা)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করেননি। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন করে। এ সমস্ত লোকই হলেন নবী (সা)-এর সাথী ও আত্মীয়-স্বজন এবং এ সমস্ত লোকই নবী (সা)-এর পর খেলাফতের সর্বাধিক হকদার, যালিম ব্যতীত কেউ এ বিষয়ে ঝগড়া করতে পারে না। হে আনসারের দল। তোমাদের মর্যাদা ও দীন ইসলামে তোমাদের অগ্রগামিতার ব্যাপারে কারো কোন বিরোধিতা নেই। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পসন্দ করে স্বীয় রাসূল ও দীনের সাহায্যকারী বানিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলকে তোমাদের নিকট হিজরত করিয়েছেন। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের মুহাজিরগণের পর আমাদের নিকট তোমাদের মর্যাদা অনেক বেশি যা অন্য কারো নেই। অতঃএব আমরা হলাম আমীর এবং তোমরা হলে উযীর। তোমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে না।"

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আনসারদের জবাবে বলেছেন ঃ

ماذكرتم من خير فانتم أهل وماتعرف العرب هذا الامر الالهذا الحى من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارًا (بخارى شريف صفـ.١.١ كتاب المحاربين)

" হে আনসারগণ! তোমরা নিজেদের উত্তম কাজ ও ফযীলতের যে বর্ণনা করেছ নিশ্চয়ই তোমরা এটার হকদার, কিন্তু আরববাসীগণ আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে কুরায়শ গোত্র ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্ব মানবে না। কেননা, কুরায়শ গোত্র বংশ মর্যাদা, অভিজাত্য ও বাড়ি ঘরের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ।" (বুখারী শরীফ)

হযরত আবূ বকরের কথার মর্মার্থ ছিল এই যে, খলীফা এমন কাওম থেকে হতে হবে যাদের নেতৃত্ব ও বংশ মর্যাদা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, যাতে জনগণ তাঁর নেতৃত্ব ও ইমারতের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং তাঁর আনুগত্য প্রকাশে কোন লজ্জা বা অনীহা প্রকাশ না করে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার মর্যাদা, সম্মান এবং বুযুর্গী স্বীকৃত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসাধারণ তাঁর আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয় না। বরং তাকে ঘৃণা ও নীচু মনে করে। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, কুরায়শদের ফযীলত ও মর্যাদা সমস্ত আরবে স্বীকৃত এবং আউস ও খাযরাজ

গোত্রকে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে না। আনসার থেকে যদি আমীর নির্বাচন করা হয়, তাহলে আরব গোত্র তাঁর আনুগত্যের উপর সম্মত হবে না এবং দেশের জনসাধারণ তার নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। অধিকন্তু খিলাফত ও নেতৃত্বের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিষয় হলো এই যে, জনসাধারণ আমীরের উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং তাঁর নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা) আনসারগণের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

يامعشر الانصار انا والله ماننكر فضلكم ولابلائكم فى اسلام ولاحقكم الواجب علينا ولكن قد عرفتم ان هذا الحى من قريش بمنزلة من العرب فليس بها غيرهم وان العرب لن تجتمع الاعلى رجل منهم فنحن الامراء وانتم الوزراء فاتقوا الله ولاتصدموا الاسلام ولاتكونوا اول من احدث فى الاسلام الاوقد رضيت لكم احد هذين الرجلين لى اى عمر ولابى عبيدة فليهما بايعتم فهو لكم ثقة الحديث -(১)

"হে আনসারগণ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের ফযীলত, ইসলামের খেদমত ও সাহায্য এবং আমাদের কাছে তোমাদের অধিকারের কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তোমরা এটা খুব ভালভাবে অবগত রয়েছ যে, আরব দেশে কুরায়শ গোত্রের যে সম্মান ও মর্যাদা বিদ্যমান, তা অন্য কোন গোত্রের নেই এবং আরববাসীগণ কুরায়শ গোত্রের কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো নেতৃত্বের উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না (ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোন রাজ্য চলতে পারে না)। সুতরাং কুরায়শ আমীর হবে এবং আনসারগণ উযীর হবে। সুতরাং হে আনসারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলামের মধ্যে সর্বাগ্রে বিদ্‘আত প্রচলনকারী হয়ো না। আমার মতে খিলাফতের জন্য এ দু'ব্যক্তি উপযুক্ত, একজন হলেন উমর অপরজন হলেন আবূ উবায়দা, এদের মধ্যে যাঁর হাতে বায়‘আত গ্রহণ কর তিনিই তোমাদের জন্য নির্ভরযোগ্য আমীর হবেন।"

হযরত সিদ্দীকে আকবরের এ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার পর হাব্বাব ইবন মুনযির ইবন জামূহ দাঁড়িয়ে বলেন, সবচেয়ে উপযুক্ত হলো যে, একজন আমীর আমাদের (আনসার) থেকে, একজন তোমাদের (মুহাজির) থেকে, হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, الائمة من قريش। (খলীফা ও আমীর কুরায়শ থেকে হবে)।

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৯।

আল্লামা কারী (র) বলেন, এ হাদীস সহীহ এবং চল্লিশজন সাহাবা থেকে বর্ণিত আছে। যেমন-শারহে শামায়েল লিল আল্লামাতুল কারী।[১]

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক থেকে বর্ণিত. হযরত আবূ বকর (রা) এ সময় বলেছেন ঃ

انه لايحل ان يكون للمسلمين اميران فانه مهما يكن ذلك يختلف امرهم واحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعون فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لاحد على ذالك صلاح وان هذا الامر فى قريش ما اطاعوا الله واستقاموا على امره قد بلغ كم ذالك او سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصبرين فنحن الامراء وانتم الوزاراء اخواننا فى الدين وانصارنا عليه ـ

"নিশ্চয়ই এটা সঠিক নয় যে, মুসলমানদের দু'জন আমীর নির্বাচিত হবে। এর দ্বারা মুসলমানদের কার্যক্রম ও আহ্কামের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে এবং দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে, পরস্পর ঝগড়া সৃষ্টি হবে। এ সময় সুন্নাত পরিত্যক্ত হবে, বিদ্'আত প্রকাশ পাবে, বিরাট ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। এতে মুসলমানের কোন কল্যাণ নেই। খিলাফতের দায়িত্ব কুরায়শদের উপর ন্যস্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত কুরায়শগণ আল্লাহপাকের আনুগত্য করবে এবং তাঁর নির্দেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে– এ হাদীস তোমাদের নিকট পৌঁছেছে অথবা তোমরা স্বয়ং রাসূল (সা) থেকে শ্রবণ করেছ। পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, ভীরু হয়ে যাবে। তোমাদের কল্যাণ হবে। ধৈর্যধারণ কর, আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যধারণকারীদের সাথে আছেন। সুতরাং আমরা হলাম আমীর এবং তোমরা হলে উযীর ও আমাদের দীনি ভাই এবং দীনের কাজে আমাদের সাহায্যকারী।"

হযরত ফারূকে আযম (রা) বলেন, দু'টি তলোয়ার একটি কোষে রাখা যায় না এবং এক নারীর দু'জন স্বামী হতে পারে না অর্থাৎ এক সাম্রাজ্যে দু'জন আমীর কিভাবে হতে পারে।

হযরত ফারূক আযমের জবাব ছিল যুক্তি সমৃদ্ধ এবং হযরত সিদ্দীকে আকবরের জবাব ছিল তাত্ত্বিক। নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট ইরশাদ বর্ণনা করে দিয়েছেন। বশীর ইবন সা'দ আনসারী (রা) বলেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ হাদীস শ্রবণ করেছি। অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরগণ এ হাদীসের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। হাবীব ইবন মুনযির সহ যে সমস্ত আনসার খিলাফতের ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন, এ হাদীস শোনার সাথে সাথে তাঁদের ধারণা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সমাবেশে আমীর নির্বাচনের ব্যাপারে যে তর্কাতর্কি চলছিল, তা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়, সবাই চুপ হয়ে যান।

১. কানযুল উম্মাল, ২ খ, পৃ. ২১৯।

ওহী লিখক হযরত যায়িদ ইবন সাবিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অতএব নবী (সা)-এর খলীফা ও মুহাজিরগণের মধ্য থেকে হবে। আমরা যেভাবে নবী করীম (সা)-এর সাহায্যকারী ছিলাম, তেমনিভাবে আমরা তাঁর খলীফারও সাহায্যকারী হয়ে থাকব। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাত ধরে বললেন, ইনি তোমাদের খলীফা, তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর।[১]

হযরত সা'দ ইবন উবাদার স্বীকৃতি

قال الامام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبوعوانة عن داؤد بن عبد الله عن حميد بن عبد الرحمن قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر فى صائفته من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فذاك أبى وامى ما اطبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة فذكر الحديث قال فانطلق أبوبكر وعمر يتعادان حتى اتوهم فتكلم أبوبكر فلم يترك شيئا أنزل فى الانصار الاذكره قال ولقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوسلك الناس واديًا وسلكت الانصار واديا لسلكت وادى الانصار لقد علمتم ياسعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد قريش ولاة هذا الامر خير الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد صرفت نحن الوزراء وانتم الامراء ـ

"ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল (র) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের সময় হযরত আবূ বকর (রা) মদীনা থেকে অদূরে তাঁর বাড়িতে ছিলেন। সংবাদ শোনার সাথে সাথে তিনি মদীনায় ফিরে এসে পবিত্র হুজরায় প্রবেশ করেন এবং পবিত্র চেহারা থেকে চাদর উত্তোলন করে কপালে চুমো খেলেন। অতঃপর বলেন, আমার পিতামাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমার নিকট সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র। সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলেন, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন এবং কা'বার মালিক চিরঞ্জীব। বর্ণনাকারী বলেন, যখন তিনি অবগত হলেন, তখন হযরত আবূ বকর ও উমর দ্রুতগতিতে সাকীফায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতায়

---

১. হযরত ফারূক আযমের এ উক্তি সীরাতে হালবীয়ায় উল্লেখ আছে। মূল عبارت হলো এই যে,

وفى رواية (اى عن عمر) قلت سيفان فى عمد واحد لايكونان هيهات لايجتمع فحلان فى مغرس كذا فى السيرة الحلبيه صفـــ٣٥٨ ووقع فى حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره فى قصة الوفات فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر واخذ بيد أبى بكر اسيفان فى عمد واحد لايصطحان الخ كذا فى فتح البارى صفحـــ٢٥ج٧ مناقب ابوبكر رضى الله عنه

আনসারগণের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে যা কিছু নাযিল হয়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তিনি এটাও বলেন যে, তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন, যদি জনগণ একটি ময়দানে চলে এবং আনসারগণ অন্য ময়দান দিয়ে চলে, তাহলে আমি আনসারগণের সাথে চলব।' আল্লাহর শপথ, হে সা'দ! তুমি খুব ভালভাবে অবগত আছ যে, একবার যখন তুমি নবী করীম (সা)-এর মজলিসে উপবিষ্ট ছিলে, তখন রাসূল (সা) ইরশাদ করেন, কুরায়শই খিলাফতের নেতৃত্বে থাকবে। তাদের মধ্যে উত্তম উত্তমদের অনুগত থাকবে এবং মন্দ মন্দ লোকদের অনুগত থাকবে। সা'দ ইবন উবাদা (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-কে বলেন, আপনি সত্য বলেছেন, আমরা হলাম উযীর এবং আপনার হলেন আমীর।"

এ রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) সা'দ ইবন উবাদা (রা)-কে কসম দিয়ে বলেছেন, তোমাদের উপস্থিতিতে নবী করীম (সা) বলেছেন, খিলাফতের আমীর কুরায়শদের মধ্য থেকে হবে। হযরত সা'দ لَقَدْ صَدَقْتَ বলে হযরত আবূ বকরের সত্যতা ঘোষণা করেছেন। এ জন্য হাফিয ইবন কাসীর এ রিওয়ায়েতের জন্য একটি বিশেষ শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন, তাহলো ঃ

ذكر اعتراف سعد بن عبادة بصحة ماقاله الصديق يوم السقيفة[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)[২] থেকে বর্ণিত, যখন আনসারগণ এটা বলেন, منا أمير ومنكم أمير "এক আমীর আমাদের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে", তখন হযরত উমর (রা) বলেন, হে আনসারগণ! তোমরা অবগত আছ

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৭।

২. في رواية النسائى وأبى يعلى والحاكم وصححه عن ابن مسعود انه قال لما قالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فاتاهم عمر بن الخطاب فقال يامعشر الانصار الستم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر ابابكر ان يوم الناس فايكم يطيب نفسًا ان يتقدم على أبى بكر فقالت الانصار نعوذ بالله ان نتقدم على ابى بكر كذا فى شرح الشمائل فقالت الانصار منا أمير ومنكم أمير فقال عمر من له مثل هذه الثلاث (اى فضائل الثلاث التى لابى بكر) - ثانى اثنين اذهما فى الغار (٢) اذ يقول لصاحبه لاتحزن (٣) ان الله معنا - الحديث فاثبت الله تعالى فى هذه الاية ثلاثة فضائل لابى بكر الاؤل ثانى اثنين والثالث اثبات الصحبة له فى قوله تعالى اذيقول لصاحبه لاتحزن الثالثة اثبات المعية فى قوله تعالى ان الله معنا فاثباته تعالى تلك الفضائل الثلاث بنص القران يؤذن باحقية للخلافة - كذا فى شرح الشمائل للشيخ عبد الرؤف والعلامة القارى صفحـــ ٢٢. وقال الحافظ العسقلانى فى الفتح صفحـــ ٢٥ج٧ ووقع فى حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره فى قصة الوفاة فقالت الانصار منا امير ومنكم امير فقال عمر واخذ بيد ابى بكر اسيفان فى غمد واحد لايصطلحان واخذ بيد ابى بكر فقال من له هذه الثلاثة اذهما فى الغار من هما اذ يقول لصاحبه من صاحبه لاتحزن ان الله معنا مع من من ثم بسط يده فبايعه ثم قال بايعوه ثم قال فبايعه الناس - فتح البارى صفحـــ ٢٥ج٧ مناقب أبى بكر-

যে, নবী করীম (সা) হযরত আবূ বকরকে ইমামের দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামী হওয়া পসন্দ করে ? আনসারগণ বলেন, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমরা কিভাবে হযরত আবূ বকর (রা) থেকে অগ্রগামী হব, (নাসাঈ, আবূ ইয়ালা, হাকীম, শারহে শামাইল, আল্লামা কারী, ২ খ, পৃ. ২১৯)

মূল অর্থ হলো এই যে, হযরত আবূ বকরকে বিশেষ তাগিদ ও জোর-জবরদস্তি করে নবী (সা) কর্তৃক ইমাম এবং স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করা এটা এ বিষয়ের দলীল ও প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সা) এর দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন হযরত আবূ বকর (রা)।

শামাইলে তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, যখন আনসারগণ বলেন ঃ منا أمير ومنكم أمير তখন উমর ফারূক (রা) হযরত আবূ বকরের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং প্রকাশ্য ঘোষণা করেন যে, বল, এ তিনটি বৈশিষ্ট্য হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা)-কে কুরআন মজীদে, ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ বলেছেন, হযরত আবূ বকরকে নবী করীম (সা) এর ثانى বা (দ্বিতীয়জন) বলেছেন এবং নবী (সা)–এর গুহার সঙ্গী আখ্যায়িত করেছেন। দ্বিতীয়ত হযরত আবূ বকর (রা)-কে বিশেষ প্রিয়জন চিহ্নিত বলেছেন ঃ

اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَاتَحْزَنْ। তৃতীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকরের জন্য স্বীয় বিশেষ সহচরত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا। অন্যথায় ইলম ও পরিসীমার দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ তা'আলার সাহচর্য বা সঙ্গ হলো ব্যাপক এবং সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। যেমন– আল্লাহ বলেছেন ঃ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (এবং আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন) এ তিনটি ফযীলত হযরত আবূ বকরের জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যার দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবূ বকরই সবচেয়ে উত্তম এবং তিনিই খিলাফতের অধিকযোগ– (كذافى شرح الشمائل للعلامة القارى والشيخ المناوى صفحه، ٢٢ج٢) হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে মাত্র তিনটি ফযীলত উল্লেখ করেছেন যা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু আয়াতের বর্ণনার প্রেক্ষাপটে হযরত সিদ্দীকে আকবরের ফযীলতের আরো দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যেমন ঃ

ان لاتنصروه فقد نصره الله - اذ أخرجه الذين كفروا الاية

এ আয়াতে হযরত আবূ বকর ব্যতীত সবাইকে রাসূলের সাহায্য পরিত্যাগ করার জন্য তিরস্কার করা হয়েছে।

কেননা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) নবী করীম (সা)-এর সাথে ছিলেন এবং সাহায্যকারী ছিলেন। ফলে আবূ বকর (রা) তিরস্কার থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন।

দ্বিতীয় এই যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী করীম (সা)-এর সাহায্য হযরত আবূ বকরের সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা হযরত আবূ বকর (রা) নবী (সা)-এর সাথে ছিলেন। সুতরাং রাসূল (সা)-এর মত হযরত আবূ বকরও আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্ত ছিলেন। তাই তিনিই খিলাফতের অধিকযোগ্য।

তৃতীয় এই যে, فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةَ عَلَيْهِ এর মধ্যে সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী عليه এর ضمير হযরত আবূ বকর সিদ্দীক-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শান্তি হযরত আবূ বকরের উপর নাযিল করেছেন। কেননা তিনিই নবী (সা)-এর মহব্বতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ প্রশান্তি প্রদানের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেন।

চতুর্থ হলো, এই যে, বর্ণিত আয়াতে হযরত আবূ বকরকে ثانى اثنين অর্থাৎ দু'জনের মধ্যে দ্বিতীয় বলে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা এইদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবূ বকর (রা) ইলম ও আমলের পূর্ণতায় নবী (সা) এর পরবর্তী ও স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এবং তিনি হেরা গুহায় রাসূল (সা)-এর সাথী ছিলেন।

পঞ্চম হলো এই যে, قوله تعالى اذيقول لصاحبه এর মধ্যে صاحب (সাথী) দ্বারা মুফাস্‌সিরগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলেন, হযরত আবূ বকর (রা)-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীমে বিশেষভাবে হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে নবী (সা) বিশেষ সাথী, খাঁটি বন্ধু, আপাদমস্তক আন্তরিকতাপূর্ণ বলেছেন। এর দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা)-এর সাথী ও বন্ধুত্ব হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবনে তিনি সাথী ও বন্ধু ছিলেন, আলমে বরযখ, আলমে আখিরাত, ময়দানে হাশর এবং হাউযে কাওসারেও তিনি রাসূল (সা)-এর সাথী থাকবেন। বেহেশতেও তিনি নবী (সা)-এর সাথী থাকবেন। এ জন্য কোন কোন উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকরের সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে অস্বীকার করে, সে কাফির। কেননা আল্লাহ পাকের বাণী الصاحب -এর মুনকির বা অস্বীকারকারী।

ষষ্ঠ হলো এই যে, হযরত আবূ বকরকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা) বলেছেন, لاتحزن (হে আবূ বকর তুমি চিন্তান্বিত ও ব্যথিত হওনা) এ বাণী এই বিষয়ের প্রমাণ বহণ করে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক নবী (সা)-এর আশিক, জীবন উৎসর্গকারী ও সহব্যথী ছিলেন।

সপ্তম হলো এই যে, لَاتَحْزَنْ এর পর রাসূল (সা) বলেছেন, اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا এবং বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলা সঙ্গী ও সাথী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

(العلامة القارى فى شرح الشمائل)[১]

অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, উমর ও আবূ উবায়দা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের দু'জনের মধ্যে যার হাতে ইচ্ছা তোমরা বায়'আত গ্রহণ কর। হযরত উমর ও আবূ উবায়দা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! এটা অসম্ভব যে, আপনি থাকতে আমরা খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করব। আপনি মুহাজিরগণের মধ্যে উত্তম, দ্বীনে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম রুকন নামাযে আপনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খলীফা এবং স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। হে আবূ বকর। আপনি হাত প্রসারিত করুন, আমরা আপনার হাতে বায়'আত গ্রহণ করব।

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত উমরকে বলেন, হাত প্রসারিত কর, আমি তোমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করব। হযরত উমর (রা) আবূ বকরকে বলেন, আপনি হলেন সর্বোত্তম। আবূ বকর (রা) বলেন, انت أقوى منى (তুমি আমার চেয়ে শক্তিমান) এর উপর বিতর্ক চলতে থাকল। অবশেষে হযরত উমর (রা) বলেন, আমার শক্তি আপনার ফযীলতের সাথে মিলে কাজ করবে। অর্থাৎ যিনি উত্তম তিনি আমীর হবেন। যিনি শক্তিশালী তিনি তার উযীর হবেন। (শারহে শামাইল, আল্লামা আলী কারী, ২ খ, পৃ. ২৩১)

এরপর হযরত উমর (রা) পুনরায় বলেন, হাত প্রসারিত করুন। যখন হযরত উমর এবং হযরত আবূ উবায়দা (রা) বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন বশীর ইবন সা'দ আনসারী (রা) অগ্রসর হয়ে সর্বাগ্রে হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর হযরত উমর ও হযরত আবূ উবায়দা (রা) বায়'আত গ্রহণ করেন।

হাব্বাব ইবন মুনযির (রা) যখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, বশীর ইবন সা'দ হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, তখন চিৎকার করে বললেন, তুমি আত্মীয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখলে না এবং চাচাত ভাই (সা'দ ইবন উবাদার) আমীর হওয়া পসন্দ করলে না এবং তার প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করলে। বশীর ইবন সা'দ জবাবে বলেন, আল্লাহর শপথ! মূলকথা হলো এই যে, আমি মুহাজিরগণ থেকে তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া পসন্দ করিনি। এ ছাড়া আওস গোত্রের লোকজন খাযরাজ গোত্রের লোকের আমীর নির্বাচিত হওয়া পসন্দ করে না। তাঁদের আশংকা ছিল এই যে, যদি একবার সা'দ ইবন উবাদাকে আমীর নিয়োগ করা হয় এবং আমীরের পদ খাযরাজ গোত্রে চলে যায়, তাহলে কখনো আওস গোত্র এ মর্যাদা লাভ করতে পারবেনা। আওস গোত্রের নেতা উসায়দ ইবন হুযায়র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আওস গোত্রের লোকদেরকে এ পরামর্শ প্রদান করেন যে, উঠ এবং হযরত আবূ বকরের হাতে

১. শরহে শামায়েল, আল্লামা আলী কারী, ২, খ, পৃ. ২২০

বায়'আত গ্রহণ কর। তারা তৎক্ষণাত হযরত আবূ বকরের বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁদের বায়'আত গ্রহণ করার সাথে সাথে হযরত সা'দ এবং খাযরাজ গোত্রের লোকদের অভিপ্রায় নস্যাৎ হয়ে গেল।

অতঃপর চতুর্দিক থেকে লোকজন হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দলে দলে আগমন করে। এমন কি কোথাও পা রাখার স্থান বাকী থাকল না। সা'দ ইবন উবাদা (রা) এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। কেউ বলে উঠলো, দেখ! সা'দ ও আবূ বকর মরে না যায়। হযরত উমর (রা) বললেন, আল্লাহ তাকে মারবেন। সা'দ (রা)-উঠে ঘরে চলে যান এবং লোকজন বায়'আত গ্রহণ করে নিজেদের ঘরে ফিরে যান।

বিশেষ বায়'আতের পর সাধারণ বায়'আত

মোটকথা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) মুহাজির ও আনসারগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হন। বায়'আতের পর সমাবেশ শেষ হয়ে যায়। এ বায়'আত সোমবার বিকালে অনুষ্ঠিত হয়, যে দিন রাসূল (সা) ইনতিকাল করেন। অর্থাৎ ১২ রবিউল আউয়াল ১১ হিজরী। সোমবার বিকালে বিশেষ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয় এবং ইনতিকালের দ্বিতীয় দিন মঙ্গলবার মসজিদে নব্বীর মিম্বরে সাধারণ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়।

সাকীফার বায়'আতের[১] দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার জনসাধারণ মসজিদে নব্বীতে একত্রিত হয়। সাহাবায়ে কিরাম, মুহাজির ও আনসার সবাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত উমর (রা) প্রথমে মিম্বরে উপবেশন করে এক সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। এ সময় হযরত আবূ বকর চুপ করে উপবিষ্ট ছিলেন।

সাধারণ বায়'আতের পূর্বে মসজিদে নব্বীতে হযরত উমরের বক্তৃতা

হযরত উমর (রা) বলেন, আমার আশা ছিল, নবী (সা)-এর ইনতিকাল আমাদের সবার শেষে হবে। তবুও যেহেতু রাসূল (সা) ইনতিকাল করেছেন, তবুও আল্লাহর দীনে কোন ক্রটি সৃষ্টি হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে এক নূরে হিদায়ত (কুরআন) বিদ্যমান রেখেছেন যা তোমাদের জন্য হিদায়াতের উপায় এবং রাসূলের সহচর তোমাদের মধ্যে হযরত আবূ বকর (রা) রয়েছেন। যিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর হেরা গুহার সাথী দু'জনের মধ্যে একজন এবং নবী (সা)-এর বিশেষ সাথী ও বন্ধু।

---

১. قال الحافظ ابن كثير قلت كان هذا (اى امر البيعة فى السقيفة) فى بقية يوم الاثنين فلما كان الغد صبيحة يوم الثلاثاء اجتمع الناس فى المسجد فتمت البيعة من المهاجرين والانصار قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما، كذا فى البداية والنهاية صحـ٢٤٨ج٥

সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে তিনিই ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হওয়ার অধিকযোগ্য ও হকদার। সুতরাং হে মুসলমানগণ, তোমরা উঠ এবং হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ কর।[১]

الزهرى أخبرنى انس بن مالك انه سمع خطبة عمر الاخيرة حين على المنبر وذالك الغد من يوم توفى رسول الله صلى الله٢-جلس عليه وسلم وأبوبكر صامت لايتكلم قال كنت أرجو ان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يد برنا يريد بذالك ان يكون اخرهم فان يكن محمد قدمات فان الله عز وجل قد جعل بين اظهركم نور تهتدون به هدى الله محمد صلى الله عليه وسلم وان ابابكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانى اثنين وانه اولى المسلمين بامورکم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة قد بايعون قبل ذالك فى سقيفة بنى ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر ـ

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত ফারূক আযম (রা) বলেছেন, তোমরা বল! হযরত আবূ বকর ব্যতীত অন্য কার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ঃ ثَانِیَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِی الْغَارِ বলেছেন। কোন ব্যক্তি রয়েছেন, যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলের বিশেষ সাথী বলেছেন ঃ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ কোন ব্যক্তি রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁর সাথে রয়েছেন اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

মূলকথা হলো এই যে, এগুলো এরূপ উত্তম গুণ এবং যা হযরত আবূ বকরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। বিশ্বজগতে অন্য কেউ এ সমস্ত গুণের দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ নেই। অতঃপর খিলাফতের হকদার হিসাবে কে তাঁর অংশীদার হতে পারে। এটা অত্যন্ত গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, যাকে আল্লাহ তা'আলা ثانى اثنين বলেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। সুতরাং হে মুসলিমগণ! তোমরা এ অদ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট অগ্রসর হয়ে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাতের পর এটা হলো দ্বিতীয় হাত।

শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র) 'মানতিকুত তায়র' এ বলেন ঃ

خواجئه اول که اول يار ء ست * ثانى اثنين اذهمافى الغار ادست

"প্রথম সম্মানী জনই তাঁর (নবীর) প্রথম বন্ধু; ছুর গুহায় যিনি ছিলেন দ্বিতীয় (আবু বকর (রা) মহান ব্যক্তিত্ব।"

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৮ মূল ভাষ্য এরূপ

صدردین صدیق اکبر قطب حق * درهمه چیزازهمه برده سبق

"(যিনি) ধর্মের প্রধান কাণ্ডারী, মহা সত্যবাদী ও সত্যের দিশারী সর্ব বিষয়ে সবার চেনে যিনি ছিলেন অগ্রগামী।

هرچه حق ازبارگاه کبریا * ریخت درصدر شریف مصطفے

"মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যত কিছু বাস্তব ও যথার্থ; তা মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা) এর পবিত্র বক্ষে মহান আল্লাহ ঢেলে দিয়েছেন।"

اوهمه درسینئه صدیق إیخت * لاجرم تابود ازتحقیق ایخت

"আর তার সবকিছুই আবু বকর সিদ্দীকের অন্তরেও ঢেলে দেয়া হয়েছে; নিশ্চিত, তার সবকিছুই ছিল সত্য ও যথার্থ।"

چون توکردی ثانی اثنین قبول * ثانی اثنین اوبود بعد ازرسول

"আপনি (আল্লাহ) যখন তাঁকে দ্বিতীয় জনরূপে কবুল করেছেন; তাই (নবীর ইন্তেকালের পরও) তিনিই হচ্ছেন রাসূলের বিকল্প ২য় জন অর্থাৎ নবীজী (সা) ধর্মের প্রথম কাণ্ডারী এবং সিদ্দিকে আকার হবেন দ্বিতীয় কাণ্ডারী।"

হযরত সিদ্দীকে আকবরের নিকট বায়'আত নেয়ার আবেদন

হযরত উমর (রা) খুতবা সমাপ্ত করার পর হযরত আবূ বকরের নিকট আরয করেন اصْعَدِ الْمِنْبَرَ (মিম্বরের উপর আরোহণ করুন) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) একটু বিলম্ব করেন কিন্তু হযরত উমর (রা) বারবার তাগিদ করতে থাকেন। তখন হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরের উপর গিয়ে উপবেশন করেন এবং জনসাধারণ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[১]

সাধারণ বায়'আতের পর হযরত সিদ্দীকে আকবরের প্রথম খুতবা

হযরত উমরের বারবার অনুরোধে হযরত আবূ বকর (রা) মিম্বরে উপবেশন করেন কিন্তু নবী করীম যে সোপান বা সিঁড়িতে উপবেশন করতেন, সেটা বাদ দিয়ে নিচের সোপানে বসেন। মুসলিম জনতা তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। বায়'আত গ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে এক খুতবা প্রদান করে বলেন ঃ

أمابعد ايها ألناس فانى قد وليت عليكم ولست بخير كم فان أحسنت فاعينونى وان اسأت فقومونى الصدق امانة والكذب خيانة

---

১. قال الزهرى عن انس بن مالك سمعت عمر يقول يومئذ لابى بكر اصعد المنبر فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس علمة، كذا فى البداية والنهاية صفــ ٢٤٨ ج٥

والضعيف فيكم قوى عندى حتى ازيح علته ان شاء الله تعالى والقوى فيكم ضعيف حتى اخذ من الحق ان شاء الله تعالى لايدع قوم الجهاد فى سبيل الله الاضربهم الله بالذل ولاتشيع فى قوم قط الفاحشة الاعمهم الله بالبلاء اطيعونى ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وهذا اسناد صحيح ـ(১)

"আম্মাবাদ। হে লোকসকল আমাকে তোমাদের আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই। যদি আমি উত্তম কাজ করি তাহলে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে। যদি আমি কোন অন্যায় কাজ করি, তাহলে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। সততা হলো আমানত এবং মিথ্যা হলো খেয়ানত। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দুর্বল সে আমার নিকট শক্তিশালী যতক্ষণ না আমি তার কষ্ট দূর করে দেই অর্থাৎ তার হক আদায় করে দেই। ان شاء الله তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল। যতক্ষণ না আমি তার থেকে হক আদায় করব। যে কাওম আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ ঐ কাওমকে অপদস্থ করেন। যখন কোন জাতির মধ্যে নির্লজ্জতা, ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন সমস্ত জাতির উপর কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয়ে থাকে। তোমরা আমার আনুগত্য করবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি। যখন আমি আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানী করব. তখন আমার আনুগত্য করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন নামাযের জন্য উঠ, আল্লাহ তোমাদের উপর রহমন করুন।"

মূসা ইবন উকবা মাগাযীতে এবং হাকিম মুসতাদরিকে হযরত আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হাকিম এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

خطب أبوبكر فقال والله ماكنت حريصا على الامارة يوما وليلة قط ولاكنت راقبا ولاسألتها الله فى سر وعلانية ولكننى اشفقت من الفتنة ومالى من الامارة من راحة لقد قلدت امرا عظيما مالى به من طاقة ولايداً لابتقوية الله كذا فى شرح الشمائل للعلامة القارى ـ(২)

"হযরত আবূ বকর (রা) খুতবা প্রদান করেন এবং এতে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো ইমারত ও খিলাফত কামনা করিনি, না দিনে এবং না রাতে। এর দিকে

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৮; শারহে শামাইল, ২ খ, পৃ. ২২১; কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১২৯

২. শারহে শামায়েল, ২য় খ. পৃ. ২২২

কখনো আমার আসক্তি হয়নি। গোপনে বা প্রকাশ্যে কখনো আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট খিলাফতের জন্য দু'আ করিনি। অবশ্য আমার এই ভয় হয়েছে যে, কোন ফিতনা সৃষ্টি না হয়। নিতান্ত অপারগ হয়ে আমি এই খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। খিলাফতের মধ্যে আমার জন্য কোন শান্তি নেই। আমার গর্দানের উপর বিরাট বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যা উত্তোলনের ক্ষমতা আমার নেই, তবে আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন।"

কানযুল উম্মাল গ্রন্থে খিলাফত অধ্যায়ে হযরত সিদ্দীক আকবরের খুতবা এভাবে উল্লেখ করেছে ঃ

عن أبى بكر انه قال يأيها الناس ان كنتم ظننتم انى اخذت خلافتكم رغبتة فيها او ارادة استيثار عليكم وعلى المسلمين فلا والذى نفسى بيده ما اخذتها رغبتة فيها ولا استيثارا عليكم ولا على احد من المسلمين ولا حرمت عليها ليلة ولاعلانية ولقد امرًا عظيما لاطاقة لى به الا ان يعين الله تعالى ولوردت انها الى اى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعدل فيها فهى اليكم رد ولابيعة لكم عندى فادفعوا لمن احببتم فانما انا رجل منكم - رواه أبونعيم فى فضائل الصحابة -

"হযরত আবূ বকর (রা) খুতবায় বলেন, হে লোকসকল! যদি তোমাদের এই ধারণা হয় যে, আমি আগ্রহী হয়ে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, অথবা মুসলমানদের উপর স্বীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কামনা করেছি, তাহলে ঐ আল্লাহ তা'আলার শপথ করে বলছি– যাঁর হাতে আমার জীবন, আমি এই কামনায় খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। আমি দিবারাতের একটি মুহূর্তেও খিলাফতের জন্য লোভ বা আকাঙ্ক্ষা করিনি। আর না প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহর দরবারে এ জন্য দু'আ করেছি। খিলাফত একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা পরিচালনা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন। আমার আশা ছিল এই যে, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে (সাহাবীকে) খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক যিনি মুসলমানদের মধ্যে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এখন আমি তোমাদেরকে এটা বলছি যে, তোমাদের খিলাফত এবং আমীরের পদ তোমাদেরকে ফেরত দেয়া হলো এবং তোমরা আমার হাতে যে বায়'আত গ্রহণ করেছ তা শেষ করা হলো। এখন যাকে ইচ্ছা এই খিলাফত ও আমীরের পদ অর্পণ কর। আমিও তোমাদের মধ্যে একজন।"[১]

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১

৮. হযরত আলী (রা) বায়'আত গ্রহণ

সমস্ত লোকের বায়'আত গ্রহণের পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সেখানে হযরত আলী এবং হযরত যুবায়রকে দেখতে পেলেন না। ফলে তিনি তাঁদের উভয়কে ডেকে আনার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। আনসারগণের মধ্য থেকে কয়েকজন উঠে গিয়ে হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা)-কে ডেকে নিয়ে আসেন। (কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১)

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা) বলেন, হে রাসূলের (সা) চাচাত ভাই ও মেয়ের জামাই! তোমরা কি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছা পোষণ করছ? হযরত যুবায়রকে একই কথা বলেন। হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) বলেন, হে রাসূলের (সা) খলীফা! আপনি আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন না। আমরা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক নই। অতঃপর বলেন ঃ

قال على والزبير ما غضبنا الا لا أخذنا عن المشورة وانانرى ابابكر أحق الناس بها انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخيره ولقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى بالناس وهو حى ـ اسناد جيد والله الحمد والمنة ـ(١)

"হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) বলেন, আমাদের কোন বিষয়ে দুঃখ নেই তবে ভাবনা হলো যে, আমাদেরকে খিলাফতের বিষয়ে পরামর্শে শরীক করা হয়নি। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের দৃঢ় আস্থাও বিশ্বাস যে, খিলাফতের সর্বাধিক যোগ্য ও হকদার হলেন হযরত আবূ বকর (রা)। তিনি নবী করীম (সা)-এর হেরা গুহার সাথী। তাঁর ফযীলত, মর্যাদা ও কল্যাণ সম্পর্কে খুব উত্তমভাবে আমরা অবগত রয়েছি।"

নবী করীম (সা) তাঁর জীবিতকালে লোকদের নামায পড়ানোর জন্য ইমাম নির্ধারণ করেন (এটাও তাঁর উত্তম হওয়ার দলীল)। এ রিওয়ায়াতের সনদ অতি উত্তম (جيد)।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে [২]

وفى رواية انه رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا

"হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আবূ বকরকে আমাদের দ্বীনের জন্য পছন্দ করেছেন, আমরা কি তাঁকে আমাদের দুনিয়ার জন্য পছন্দ করব না?"

একথা বলেই হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়র (রা) হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। (হাকীম, ইযালাতুল খাফা, ২ খ, পৃ. ২৭) হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) হযরত আলী (রা) ও হযরত যুবায়রের নিকট ওজর পেশ করে বলেন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৫; ইযালাতুল খাফা, ১ খ, পৃ. ৩১২।

২. শারহে শামায়েল, ২ খ, পৃ.২২২।

আল্লাহ্র শপথ এ আমীর হাওয়ার জন্য আমার সামান্যতম লোভ ছিল না, কখনো অন্তরে এর জন্য আগ্রহ ছিল না এবং কখনো গোপনে ও প্রকাশ্যে এর জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিনি। অথচ এ বিষয়ে আমার ফিতনার[১] আশংকা হয়েছে। অর্থাৎ এ আশংকা সৃষ্টি হয় যে, যদি খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি তোমাদের আগমন পর্যন্ত বিলম্ব করি, তাহলে কোন ফিতনা বা গোলযোগ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।[২]

শী'আ সম্প্রদায়ে বলে, হযরত আলীকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি এবং কেউ ডাকেনি। এক্ষেত্রে শী'আ সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমরকে কে জিজ্ঞাসা করেছে এবং কে ডেকেছে? ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার ভয়ে তাঁরা নিজেরাই বনী সায়েদায় উপস্থিতি হয়েছেন। এছাড়া খিলাফতের কাজ তাঁদের দৃষ্টিতে এমন কোন বিরাট কিছু ছিল না যার জন্য কারো কারো আসা-যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বস্তুত হযরত আলী ও যুবায়র (রা) প্রথমেই হযরত সিদ্দীক আকবরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন,

وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبى سعيد الخدرى ان عليا بايع أبابكر فى أول الامر -

"ইবন হিব্বান এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এ রিওয়ায়াতকে সহীহ বলেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আলী ও হযরত যুবায়র (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।[৩]"

---

১ قال الامام أحمد حدثنا على ابن عباس حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنى يزيد بن سعيد عن عبد الملك بن عمير عن رافع الطائى رفيق ابى بكر الصديق فى غزوة ذات السلاسل قالت وسألته عما قيل فى بيعتهم فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الانصار وماكلمهم به وماكلم به عمر بن الخطاب وما ذكرهم به من امامتى اياهم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه فبايعونى لذلك وقبلتها منهم تخوفت ان تكون فتنة بعد هاردة وهذا اسناد جيد قوى ومعنى هذا ان رضى الله عنه انما قبل الامامة تخوفا ان تقع فتنة اربى من تركه قبولها رضى الله عنه ماوارضاه - كذا فى البداية والنهاية صفحـــ٢٤٧ج٥

অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে–

فقال راى أبوبكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والناس حديث عهد بكفر فخفت عليهم ان يرتدوا وان يختلفوا فدخلت فيها وانا كاره ولم يزل بى أصحابى فلم يزل يعتذر حتى عذرته - رواه ابن راهويه والعدنى والبغوى وابن خزيمة كذا فى كنز العمال صحفـ ١٢٥ ج٣

২. ইযালাতুল খিফা, ২ খ, পৃ. ২৭; সীরাতে হালাবীয়া, ৩ খ, পৃ. ৩৬০।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ৩৭৯।

হাফেয ইবন কাসীর (র) বলেন, সহীহ ও সঠিক হলো এই যে, হযরত আলী (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা) কখনো হযরত আবূ বকর (রা) থেকে পৃথক হননি। সর্বদা তাঁর পিছনে নামায আদায় করেছেন।[১]

অধিকন্তু হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) ব্যতীত অন্যান্য সাহাবা থেকেও বর্ণিত। হযরত আলী (রা) শুরুতেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এটা হাকীম ব্যতীত আবূ দাঊদ তায়ালিসী, ইবন সা'দ, ইবন আবূ শায়বা, ইবন জারীর, বায়হাকী এবং ইবন আসাকির রিওয়ায়াত করেছেন।[২]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আলী (রা) ছ'মাস পর হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম বায়হাকী ইবন হিব্বানের রিওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কোন কোন উলামায়ে কিরাম উভয় রিওয়ায়েতের মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, হযরত আলী (রা) প্রথমত এক বায়'আত গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন ফিদাকের ঘটনার কারণে দুঃখ ও বেদনার অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এছাড়া হযরত ফাতিমার অসুস্থতার ফলে হযরত আবূ বকরের নিকট যাতায়াত করা হ্রাস পায়, তখন জনগণের মধ্যে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, হযরত আলী (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের উপর সন্তুষ্ট নন। সুতরাং এ সন্দেহ দূর করার উদ্দেশ্য হযরত আলী (রা) সাধারণ সমাবেশে দ্বিতীয়বার বায়'আত গ্রহণ করেন। কাজেই এ দ্বিতীয় বায়'আত মূলত প্রথম বায়'আতের নবায়ণ ছিল।[৩]

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা) হযরত আবূ বকরকে তাঁর বাড়ি আগমনের জন্য দাওয়াত প্রেরণ করেন। সাথে সাথে এটা বলেন যে, আপনার সাথে যেন কেউ না আসে (ইঙ্গিত ছিল হযরত উমরের দিকে, কেননা তিনি ছিলেন কঠোর এবং আবূ বকর ছিলেন কোমল)। হযরত উমর (রা) শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি একাকী গমন করবেন না। হযরত আবূ বকর (রা) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই গমন করব। আমার এই আশংকা নেই যে, তারা আমার সাথে কোন অসৌজন্যমূলক আচরণ করবেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) সেখানে গমন করেন। হযরত আলী আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার পর বলেন,

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৯।

২. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ৩৭৯

ان قد عرفنا فضلك وما اعطا الله ونم تنفس عليك خيرا ساقة الله اليك ولكنك استبددت *-علينا بالامر وكنانرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا ابى بكر فلما تكلم ابوبكر قال والذى نفسى بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الى ان اصل قرابتى واما الذى شجر بينى وبينكم من هذه الاموال فلم الى فيها عن الخير ولم اترك امرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها الاصنعة فقال على لابى بكر موعدك العيشة للبيعة فلما صلى أبوبكر الظهر فى المنبر فتشهد وذكر شان على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذى اعتذراليه ثم استغفر وتشهد على ـ فعظم-[১] حق ابوبكر وحدث انه فلم يحمله على الذى ضع نفاسة على ابى بكر ولا انكار للذى فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا فى هذا الامر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا فى انفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا اصبت ـ[২]

* قوله ولكنك استبددت بالامر قال المازرى ولعل عليا اشار الى ان ابابكر استبد عليه بامور عظام كان مثله عليه ان يحضره فيها ويشاوره اوانه امثار الى انه لم يستشر فى قعد الخلافة له اولا ـ والعذر لابى بكر ان خشى من التأخر عن البيعة الاختلاف لما كان وقع من الانصار كما تقدم فى حديث السقيفة فلم ننتظر ـ فتح البارى صفـ ٣٧٩ج٧

"হে আবূ বকর! আমরা আপনার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। যে কল্যাণ ও মর্যাদা অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়েছে, তা আমরা অবগত আছি। এতে আমাদের সামান্যতম হিংসা নেই। কিন্তু আমাদের অভিযোগ হলো এই যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত তা সম্পন্ন করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটাত্মীয় হওয়ার কারণে পরামর্শের মধ্যে আমাদের অধিকার রয়েছে। হযরত আলী (রা) এমনিভাবে তাঁর অভিযোগ পেশ করছিলেন, এদিকে হযরত আবূ বকরের চোখ থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন, নবী করীম (সা)-এর আত্মীয়দের প্রতি

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খণ্ড , পৃ. ২৪৯।
২. ফাতহুল বারী ,৭ খ. পৃ. ৩৭৮।

সম্মান প্রদর্শন বা তাঁদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা আমার আত্মীয়দের চেয়ে আমার নিকট অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়। ফিদাকের মালামাল ও বনী নযীরের সম্পর্কে পরস্পর যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে আমি সেখানে দানের ব্যাপারে কোন কার্পণ্য করিনি এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নীতি পরিত্যাগ করিনি। যেভাবে তিনি এ সমস্ত মালামাল বিতরণের ব্যবস্থা করতেন, আমিও সেভাবেই করেছি। হযরত আলী (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরকে বললেন, আপনার সাথে আমার অঙ্গীকার হলো এই যে, দ্বিপ্রহরের পর আমি বায়'আত গ্রহণের জন্য হাযির হব। হযরত আবূ বকর (রা) যুহর নামাযের পর মিম্বরের উপর আরোহণ করে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর হযরত আলীর মর্যাদা, তাঁর বায়'আত না করা এবং বিলম্ব করার ওযর বর্ণনা করেন এবং ইসতিগ্‌ফারের পর মিম্বর থেকে অবতরণ করেন। এরপর হযরত আলী (রা) আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকরের ফযীলত ও অধিকারের কথা বর্ণনা করেন এবং তাঁর হাতে বায়'আত করেন। সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করেন যে, আমার বায়'আত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ার অর্থ এই নয় যে, হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের উপর আমার কোন ঈর্ষা ছিল এবং না তার ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে আমার কোন অনীহা ছিল, বরং শুধু এতটুকু অভিযোগ ছিল যে, খিলাফতের ব্যাপারে আমাদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) এককভাবে কাজ করেছেন এবং আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পন্ন করেছেন। এর ফলে আমরা অন্তরে কিছুটা দুঃখ পেয়েছি। মুসলমানগণ হযরত আলীর এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং সবাই তাকে أصبت وأحسنت (সঠিক ও সুন্দর বলেছেন) বলেন।

এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা দিবালোকের ন্যায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত আবূ বকরের ফযীলত ও খিলাফতের ব্যাপারে হযরত আলীর সামান্যতম সন্দেহ ছিল না এবং তাঁর খিলাফতের ব্যাপার কোন ঈর্ষা ছিল না। আগ্রহ ভরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন এবং অভিযোগ ছিল অধিক মহব্বতের কারণে। অন্যদের প্রতি কোন অভিযোগ হয় না বরং এ রিওয়ায়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকরের প্রতি হযরত আলীর মহব্বত পূর্ণাঙ্গভাবে বিরাজমান ছিল। বায়'আত থেকে পিছিয়ে থাকার মূলে কোন হিংসা-বিদ্বেষ কার্যকর ছিল না। হযরত আবূ বকর বনী সায়েদায় নিজের প্রতি বায়'আত নেয়ার জন্য গমন করেননি, বরং মুহাজির ও আনসারগণের পরস্পর বিবাদ মিটানোর জন্য গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর নিজের বায়'আতের জন্য অনুরোধ করেননি; বরং উপস্থিত সবাই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় যদি বায়'আত গ্রহণ না করতেন তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির আশংকা ছিল। এছাড়া বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এরূপ দুর্বল ও বিপদজনক মুহূর্তে এটা বলা যে, অমুককে ডাকা হয়নি,

অমুকের সাথে পরামর্শ করা হয়নি, কখনো যুক্তিযুক্ত হয়নি। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন হযরত আলীকে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বললেন, তখন সমস্ত অভিযোগ মুহূর্তে দূরীভূত হয়ে গেল এবং আন্তরিকভাবে তিনি হযরত আবূ বকরের নিকট বায়'আত করেন।

আল্লামা হালাবী (র) সীরাতে হালাবীয়াতে উল্লেখ করেন যে, মুহাজির ও আনসারগণ বনী সায়েদায় একত্রিত হওয়ার পর হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আলী আলীকে ডেকে আনার জন্য লোক প্রেরণ করেন। হযরত আলী আগমনের পর হযরত আবূ বকর (রা) বলেন ঃ

ماخلفك ياعلى من أمر الناس قال خلفنى عظيم المعتبة ورا اتيكم استقليتم برايكم فاعتذر اليه ابوبكر بخوف الفتنة لواخر ثم اشرف على الناس وقال ايها الناس هذا على ابن أبى طالب لابيعة لى فى عنقه وهو بالخيار عن امر الاوانتم بالخيار جميعا فى بيعتكم فان رأيتم لها غيرى فانا اول من يبايعه فلما سمع ذالك على زال ماكان والنفر (١)قد داخله فقال اجل لاترى لها غيرك امدر يرك فبايعه هو الذين كانوا معه الخ ـ١

"হে আলী, বায়'আত গ্রহণের ব্যাপারে তুমি কি কারণে বিলম্ব করেছ? হযরত আলী (রা) বলেন, একটি বিরাট অভিযোগ ও বেদনার কারণে বিলম্ব হয়েছে। তা হলো এই যে, আমাদের সাথে পরামর্শ ব্যতীত আপনি খিলাফতের (আমীর নির্বাচন) বিষয়টি সম্পন্ন করেছেন। হযরত আবূ বকর (রা) ওযর পেশ করে বলেন, ঐ সময় অত্যন্ত দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। বিষয়টি স্থগিত করা হলে ফিতনা সৃষ্টির আশংকা ছিল। অতঃপর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) লোকজনের উদ্দেশ্য বললেন, হে লোকসকল! আলী ইবন আবূ তালিব (রা) তোমাদের সামনে রয়েছেন। এখনো তিনি আমার নিকট বায়'আত করেননি। আমার নিকট বায়'আত করা বা না করা এ বিষয়ে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। হে মুসলমানগণ! যদিও তোমরা আমার নিকট বায়'আত গ্রহণ করেছ কিন্তু তোমাদের বায়'আত ফিরিয়ে নেয়ার অধিকারও তোমাদের রয়েছে। যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কারো হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে যাকে ইচ্ছা দ্বিতীয়বার তাঁকে আমীর নির্বাচন করার অধিকারও তোমাদের রয়েছে। অন্য আমীরের হাতে সর্বপ্রথম বায়'আতকারী ব্যক্তি হব আমি। হযরত সিদ্দীক আকবরের এ কথা শোনার সাথে সাথে হযরত আলীর অন্তর থেকে সমস্ত দুঃখ-বেদনা দূরীভূত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলেন, হে আবূ বকর! আমরা খিলাফতের জন্য আপনার চেয়ে

১. সীরাতে হালাবীয়া, ৩ খ, পৃ. ৩৬

অন্য কাউকে যোগ্যতম মনে করি না। আপনি হাত প্রসারিত করুন। তখন হযরত আলী (রা) এবং সেখানে উপস্থিত সবাই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত করেন।

হযরত সা'দ ইবন উবাদা (রা) এর বায়'আত

সাকীফায়ে বনী সায়েদায় সমস্ত লোক হযরত আবূ বকর (রা)-এর হাতে বায়'আত করে কিন্তু সা'দ ইবন উবাদা (রা) বায়'আত করতে অস্বীকার করে বাড়ি গমন করেন। কিছু দিন পর্যন্ত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) তাঁর সাথে কোন যোগাযোগ করেননি। হযরত উমর (রা) বলেন, সা'দ থেকে অবশ্যই বায়'আত নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বশীর ইবন সা'দ বলেন, তিনি একাকী লোক তাঁকে ক্ষমা করুন এবং তাঁকে তাঁর অবস্থায় থাকতে দিন। একবার অস্বীকার করেছেন, দ্বিতীয়বার উৎপীড়ন করলে তাঁর গোত্রের লোকজন তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে এবং এতে রক্তপাতে আশংকা সৃষ্টি হবে। সবাই এ মতামত পছন্দ করলো। কিন্তু সা'দ ঐ ঘটনার পর হযরত আবূ বকরের পিছনে নামাযে অংশগ্রহণ করেননি (হয়ত অন্য কোন মসজিদে আদায় করেছেন) এবং তাঁর সাথে কোন কথাও বলেননি। অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকাল করেন। হযরত আবূ বকরের ইনতিকালের পর হযরত সা'দ (রা) সিরিয়া গমন করেন এবং সেখানেই ইনতিকাল করেন। ইমাম তাবারী (র) বলেন হযরত সা'দ (রা) কিছুক্ষণ পর ঐ দিনেই হযরত আবূ বকরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। والله اعلم

খিলাফতের দায়িত্ব থেকে হযরত সিদ্দীক আকবরের অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ফিতনা ও অনৈক্য সৃষ্টির আশংকায় এবং জনগণের বারবার অনুরোধ ও তাগিদের কারণে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্তরে বেদনা নিয়ে বলেন, তুমি এই আমানতের বোঝা অর্থাৎ খিলাফতের দায়িত্ব কেন আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে দুঃখ ও বিষাদ নিয়ে নিজের ঘরে বসে থাকেন। হযরত ফারূক[১]

বর্ণনার মূল ভাষা হলো ঃ

১. عن موسى بن ابراهيم عن رجل من ال ربعية ان بلغه ان ابابكر حين استخلف قعد فى بيته حزينا فدخل عليه عمر فاقبل عليه يلومه وقال انت الذى كلفتنى هذا الامر وشكا اليه الحكم بين الناس فقال له عمر او ماعلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الوالى اذا اجتهد فاصاب الحقّ فله اجران وان اجتهد فاخطأ الحق فله اجر واحد مكانه سهل ـ على ابى بكر

ابن راهويه وخثيمة فى فضائل الصحابة ـ كنز العمال صفحه ١٣٥ ج٥ كتاب الخلافة (ابن راهويه وخثيمه فى فضائل الصحابة)

আযম (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট গমন করেন, তখন তিনি হযরত উমরকে খুব ভর্ৎসনা করেন এবং অভিযোগ করে বলেন, তুমি আমাকে এ বিপদে জড়িয়েছ। জনগণের মধ্যে ফয়সালা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। হযরত ফারূক আযম (রা) সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনার কি রাসূলের ঐ ইরশাদ মনে নেই যে, ওলী এবং হাকীম যদি ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে, তা হলে তাদের জন্য ঐ ফয়সালায় দু'টি পুরস্কার রয়েছে। যদি ইজতিহাদে ভুল হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য একটি পুরস্কার। এটা শুনে হযরত আবূ বকরের চিন্তা কিছু হাল্কা হলো।[১]

অন্য এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, বায়'আতের পর হযরত আবূ বকর (রা) তিন দিন দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকেন। যখন মসজিদে আগমন করতন তখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতেন,[২]

أيها الناس قد اقتكم بيعتكم فبايعوا من أحبتم كل ذلك يقوم اليه على بن أبى طالب فيقول لا والله لانقيلك ولا تستقيلك من ذا الذى يؤخرك وقد قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ[৩]

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের বায়'আত ফিরিয়ে দিচ্ছি। যার কাছে ইচ্ছা তোমার বায়'আত কর। তিনি বার বার এটা বলতেন। প্রত্যেকবার হযরত আলী (রা) দাঁড়িয়ে জবাবে বলতেন, আল্লাহর শপথ! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আপনাকে ফিরিয়ে দেব না এবং আপনার কাছ থেকে ফিরিয়েও নেব না। কে আপনাকে পিছনে হটিয়ে দেবে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে আগে বাড়িয়ে দিয়েছেন।"

কাহিনী

عن يحى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص بعمان او بالبحرين فبلغتهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتماع الناس على أبى بكر فقال له اهل الارض من هذا الذى اجتمع الناس عليه ابن صاحبكم قال لاقالوا فاخوه قال لا قالوا فاقرب الناس اليه قال لا قالوا فما شأنه قال اختاروا خيرهم فأمروه فقالوا لن يزالوا بخير مافعلوا هذا (ابن جرير)- ৪

---

১. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৫।

২. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৪০।

৩.

৪. কানযুল উম্মাল, ৩ খ, পৃ. ১৩৬।

"ইয়াহ্ইয়া ইবন সাঈদ কাসিম ইবন মুহাম্মদ থেকে রিওয়ায়েত করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের সময় আমর ইবনুল আ'স (রা) আম্মান অথবা বাহ্‌রাইনে অবস্থান করছিলেন। যখন সেখানে মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের সংবাদ এবং সর্বসম্মতক্রমে হযরত আবূ বকরের খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ পৌঁছে, তখন সেখানকার বাসিন্দাগণ আম্‌র ইবনুল আ'স (রা) এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তির খিলাফতের উপর লোকজন ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, ইনি কে? তিনি কি তোমাদের নবীর পুত্র? আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, না। লোকজন বলল, তাহলে তিনি নবীর ভাই? তিনি বললেন, না। লোকজন বললো, তাহলে কি তিনি তোমাদের নবীর নিকট আত্মীয়? আমর ইবনুল আ'স বললেন, না। তিনি নিকটাত্মীয় নন। লোকজন বললো, তাহলে ঐ ব্যক্তির এরূপ কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার ফলে লোকজন ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাঁকে খলীফা নির্বাচিত করেছে ? আমর ইবনুল আ'স (রা) বলেন, যে ব্যক্তি সবার মধ্যে সর্বোত্তম, তাঁকেই লোকজন আমীর নির্বাচন করেছে। তখন লোকজন বললো, তারা (মদীনার লোকজন) সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এরূপ করতে থাকবে।"

খুলাফায়ে রাশেদীনের ব্যাপারে যারা হিংসা পোষণ করে, তাদের বিষয়ে শেখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার (র) বলেন ঃ

اے گرفتار لعصب مانده * دائما دربغض ودرحب مانده

"হে অন্যায় পক্ষপাতিত্বকারীগণ! যারা সর্বদা গোঁড়ামীতে আবদ্ধ রয়েছ; এক পক্ষে সর্বদা হিংসা ছড়াচ্ছ, আরেকদিকে (হযরত আলী) মহব্বত প্রদর্শন করছ।"

درخلافت نیست میل اے بخبر * میل کے آیدابوبکر عمر

"হে গাফিল! স্মরণ রেখো, খিলাফত বিষয়ে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি; হযরত আবু বকর ও ওমরের মত মহা মনীষীগণ কিভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন?"

میل گر بودے دران دومقتدا * هردو کردندے یسرد ایبشوا

"এ অনুসরণীয় দু'মনীষীর মধ্যে যদি কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব থাকতো তাহলে তাঁরাই কোন ছেলে চোকরাকে খলীফা নির্বাচন করতেন।"

کے روا داری که أصحاب رسول * مرد ناحق راکنندا زجان قبول

"রাসূলের সাহাবীদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ কিভাবে বৈধ হতে পারে যে, তাঁরা কোন অনুপযুক্তজনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করবেন?"

یانشانندش بجائے مصطفے * بر صحابه نیست این باطل روا -

"কিংবা তাঁরা নবী মোস্তফা (সা) এর স্থলাভিষিক্ত কোন অযোগ্যকে স্থির করতে পারেন? সাহাবাদের বিষয়ে তেমন বাতিল মনোভাবই অবৈধ।"

اختیا رجمله شان گرنیست راست * اختیار جمع قرآن بس خطا است

"এঁদের সকলের মনোনয়ন (আবু বকরকে) যদি বে-ঠিক হয়ে যায়, তাহলে তো (পরোক্ষভাবে) পবিত্র কুরআন সংকলনও বে-ঠিক হয়ে যায়!"

بلکه هرچه أصحاب پیغمبر کنند * حق کنندو لائق حق درکنند

"বরং নবী সাহাবাগণ যা-ই করেন, সঠিক ও যথার্থ করে থাকেন এবং মহান আল্লাহর কাঙ্খিত কিছুই করে থাকেন।"

گرخلافت ازهوامی راندمی * خویش رابرسلطنت بنشاندمی

"তাঁরা যদি প্রবৃত্তি অনুযায়ী খিলাফত বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন, তাহলে নিজেরা নিজেদের পেশ করতেন।" (অথচ কোন একজন সাহাবীই নিজেকে পেশ করেননি, দাবী করেননি)

(হযরত ওয়েস করনী (র) সম্পর্কে নবীজী (সা) ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন, তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁকে পেলে তাঁর দ্বারা দু'আ করিয়ে নিতে সাহাবাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। সেই ওয়েস করনী (র) নিজ মায়ের ইন্তেকালের পর হযরত ওমর (রা) এর খিদমতে এলে যে কথোপকথন হয় সেই দিকে ইঙ্গিত করছেন হযরত ফরীদ উদ্দিন আত্তার (র)। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন অনেকটা সাহাবী হযরত আবু যর (রা) এর মতে দুনিয়া বিমুখ।)

چوں عمر پش اوس آمزمجوش * گفت افگندم خطافت رازدوش

"হযরত ওমর (রা) হযরত ওয়েস করনী (র) -এর সামনে আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন, আমি অর্পিত খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেব!"

این خلافت گرخربد ارے بود * می فردشم گربد بنارے بود

"রাষ্ট্র পরিচালনায় দায়িত্ব যদি ক্রয় বিক্রয়যোগ্য কোন ব্যাপার হত, তাহলে তা (সর্বনিম্ন) ১ টাকাতেই তা আমি বিক্রয় করে ফেলতাম (অর্থাৎ এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিতাম)"

হযরত ওয়েস করনী (রহ) ওমরের যবানী উক্ত বাক্য শুনে বলরেন ঃ

چون اوہس این حرف بشنود ازعمر * گفت توبگذازوفارغ درگزر

"আপনি যেমন আছেন তেমনি থাকেন, দায়িত্ব চালিয়ে এবং নিশ্চিন্তে দায়িত্ব পালন করে যান।"

توبیفگن هرکه می خواهدذراه * باربرگهردردو تایش گاه

"আপনি তা এমন কাউকে অর্পণ করবেন যারা তা কামনা করে (লাভ করে), তাহলে (ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আপনি জবাবদেহিতার মুখোমুখী হবেন।"

খলীফা ওমর (রা) যখন খিলাফতের দায়িত্ব পরিত্যাগ করার কথা প্রকাশ করলেন ততক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গী সাথীদের অনেকেই দাঁড়িয়ে গেলেন (বিস্ময়ে)!

چون خلافت خواست افکند امیر * آن زمان برخاست ازیاران نفیر

"এবং সকলেই নিবেদন করলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি তেমনটি করতে যাবেন না: আল্লাহর দিকে চেয়ে জনগণকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবেন না।"

جمله گفتندش مکن اے بیشوا * خلق راسرکشته ازبهرخدا

"হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) উক্ত দ্বায়িত্ব আপনার প্রতি সোপর্দ করে গেছেন তিনি তা না বুঝে-শুনে করেননি বরং যথাযোগ্যতা বাছাই করেই তা করে গেছেন।"

عهده درگردنت صدیق کرد * آن نه برعمیاکه برتحقیق کرد

"আপনি যদি তাঁর নির্দেশ ও অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে এ মুহূর্তেই যেন আপনি তাঁকে কষ্ট দিলেন।"

گر قومی بیچی سرازفرمان او * ایں زمان ازتوبرنجد جان او

"হযরত ওমর (রা) (ওয়েস করনী ও সভাসদদের) এঁদের এ সব শক্ত দলীল প্রমাণ যখন শুনলেন, ইসলামী খিলাফতের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি আরও জরুরী রূপে তাঁর কাছে প্রতিভাত হল।"

چون شنودایں حجت محکم عمر * کارازین حجت بردشد سخت تر

"সুতরাং যাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণের বেলায় এমন অনীহা তাদের বিষয়ে মন্তব্য করতে সাবধান হওয়া উচিত।"

ازربان توصحابه خسته اند * درزبان بت پرستان رسته اند

(তাই) হে শ্রোতা! সাহাবাদের মৌখিকভাবে কোন খারাপ মন্তব্য করে আহত করা মানেই, মূর্তিপুজক কাফির অবিশ্বাসীদের দায়িত্ব পালন করে তাদের মুখ পৌঁছানো।"

درفضولی مس کنی دیوان سیاه * گرئے بردی گزربان دای نگاه

(আর তা হচ্ছে,) অন্যায় অনর্থ কর্মে জড়িয়ে পড়ে আপনার নিজের আমলনামাকে বরবাদ করা। (অতএব এ সব না করে যদি) যবানের হিফাযত করেন বৈধ সীমায় ভেতর থেকে মেপে মেপে কথা বলেন তাহলে আপনি বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হবেন।" (মানতাকাত্ তায়র, পৃ. ২৮-৩১)

৯. ওসীয়্যতের মাসয়ালা

সমস্ত মুহাজির ও আনসারের সম্মতিক্রমে হযরত সিদ্দীক আকবরকে খলীফা নির্বাচন করা এ বিষয়ের ওপর প্রমাণ বহন করে যে, নবী (সা) কোন ব্যক্তির খিলাফতের জন্য ওসীয়্যত করেননি যে, আমার পর অমুক ব্যক্তি খলীফা হবে। সুস্পষ্টভাবে কোন ব্যক্তির খিলাফতের জন্য নাম উল্লেখ করেননি। না হযরত আবূ বকরের, না হযরত আলীর, অবশ্য হযরত সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। সারা জীবন হযরত আবূ বকরের সাথে এরূপ ব্যবহার করেছেন যা বাদশাহ তার উত্তরাধিকারীর সাথে করে থাকেন।

শী'আ সম্প্রদায় বলেন, হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওসীয়্যতপ্রাপ্ত ও খলীফা ছিলেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশার নিকট জিজ্ঞাসা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কি হযরত আলীর জন্য ওসীয়্যত করে গিয়েছেন? হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এটা কে বলেছে? অন্তিমকালে আমি হুযূরকে আমার বুকের সাথে লাগিয়ে বসে ছিলাম। এ অবস্থায় তিনি ইনতিকাল করেছেন। আমি অবগত নই যে, কখন নবী (সা) হযরত আলীর খিলাফত সম্পর্কে ওসীয়্যত করেছেন।

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যখন হযরত উমর ফারূকের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হয় এবং লোকজন তাঁর জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ

الا تستخلف يا أمير المؤمنين فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير منى يعنى أبابكر وان اترك فقد ترك من هو خير منى يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন কাউকে আপনার উত্তরাধিকার নির্বাচন করে দিচ্ছেন না? হযরত উমর (রা) বলেন, যদি আমি কাউকে খলীফা নির্বাচন করি, তা হলে এতে কোন দোষ নেই। কেননা আমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রা) ইনতিকালের সময় স্বীয় খলীফা নির্ধারণ করেছিলেন। যদি আমি কাউকে খলীফা নির্ধারণ না করি, তাহলে এতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা সর্বোত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) কাউকে খলীফা নির্ধারণ করেন নি।

২. হযরত আলীর নিকট অন্তিম মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করা হয় ঃ

الا تستخلف علينا فقال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف ولكن ان يرد الله بالناس خير فسيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم ـ أخرجه البيهقى واسناده جيد ـ

"হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কেন আমাদের জন্য কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিচ্ছেন না? হযরত আলী (রা) বলেন, নবী করীম (সা) কাউকে খলীফা মনোনীত করেন নি। সুতরাং আমি কেন তা করব? তবে লোকজনের কল্যাণ প্রদানের অভিপ্রায় যদি আল্লাহ তা'আলার থাকে, তাহলে আমার পর লোকজনকে কোন উত্তম ব্যক্তিকে মনোনীত করার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে দেবেন। যেরূপ আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের পর লোকজনকে একজন উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবূ বকরের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ করে দেন। (হাদীসটি ইমাম বায়হাকী রিওয়ায়াত করেছেন এবং এর সনদ খুবই উত্তম)।

৩. সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত, হযরত আব্বাস (রা) নবী (সা)-এর মৃত্যুরোগের (مرض الوفات) সময় বলেন, আল্লাহর শপথ, তোমরা তিন দিন পর লাঠির গোলাম হয়ে যাবে। অর্থাৎ রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের সময় নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা নবী (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও যে, তাঁরপর কে খলীফা হবে। হযরত আলী (রা) বলেন, এ বিষয়ে আমি রাসূল (সা)-এর নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

৪. সুফিয়ান সাত্তরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা) একবার খুতবায় বলেন ঃ

يأيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد الينا فى هذه الامارة شيئا حتى رأينا من الرأى ان تستخلف أبابكر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله ثم ان أبابكر رأى من الرأى ان يستخلف عمر فاقام واستقام حتى مضى لسبيله - هذا كله من البداية والنهاية -

"হে লোকসকল! রাসূলুল্লাহ (সা) ইমারত ও খিলাফতের ব্যাপারে কোন ওসীয়্যত করেননি। নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা নির্বাচিত হন এবং তিনি অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে খিলাফত পরিচালনা করে ইনতিকাল করেন। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) ওসীয়্যত ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হযরত উমরকে খলীফা মনোনীত করেন। হযরত উমর (রা) অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে খিলাফতের, কাজ বাস্তবায়ন করার পর ইনতিকাল করেন।"

৫. বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) তাঁর খুতবায় বলেন, যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং এ সহীফা যাতে দিয়ত (রক্তপাত) ও অন্যান্য বিষয়ের আহকাম রয়েছে, ব্যতীত অন্য কোন কিতাব ও কোন ওসীয়তনামা রয়েছে, তা হলে সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলছে।

শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে, নবী (সা) আলীর জন্য খিলাফতের ওসীয়্যত করে গিয়েছেন। আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে, যদি মহানবী (সা) হযরত আলীর

খিলাফতের ব্যাপারে নাম উল্লেখ করতেন, তাহলে সাহাবায়ে কিরামের জন্য এটা বাস্তবায়ন না করা অসম্ভব ছিল। যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য জানমাল, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত উৎসর্গ করেন। তাঁদের সম্পর্কে এ খারাপ ধারণা পোষণ করা যে, তারা নবী (সা)-এর ওসীয়্যত বাতিল করে দিয়েছেন, এটা কুরআনুল করীমকে সুস্পষ্ট মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর। এটা সাহাবায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থি। যদি হযরত আলী অথবা হযরত আব্বাসের প্রমুখ কারো খিলাফতের ব্যাপারে ওসীয়্যত করা হত, তাহলে এটা অবশ্যই মুতাওয়াতির-ব্যাপকভাবে প্রচারিত হত। এটা গোপন করা স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব ছিল। অবশ্যই তা মজলিসে পেশ করা হতো। যেমন হযরত আবূ বকর (রা) যখন আনসারগণের সামনে হাদীস পেশ করে বলেন ঃ الائمة من قريش তখন আনসারগণ সাথে সাথে এ হাদীসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁদের আমীর হওয়ার বাসনা পরিত্যাগ করেন।

যদি খিলাফতের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন নির্দেশ থাকত, তাহলে কেউ না কেউ ঐ মজলিসে বলত যে, তোমরা কেন এ বিষয়ে বিতর্ক করছ। রাসূল (সা) অমুক ব্যক্তিকে তো ইমামত ও খিলাফতের জন্য নির্দিষ্টভাবে নাম উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) যদি হযরত আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কাউকে অর্থাৎ হযরত আলী অথবা হযরত আব্বাসকে মনোনীত করে যেতেন, তাহলে এটা প্রকাশ না করা সাহাবায়ে কিরামের জন্য অসম্ভব ছিল। সাকীফায়ে বনী সায়েদায় খলীফা মনোনয়নের জন্য সমাবেশ হয়েছিল। যদি খিলাফতের ব্যাপারে নবী (সা)-এর কোন বাণী থাকত তাহলে আনসারগণ منا أمير ومنكم أمير উল্লেখ করতেন না এবং সাকীফায়ে বনী সায়েদায় কারো মুখ থেকে এ কথা বের হয়নি যে, রাসূল (সা) গাদীরে খুমের খুতবায় من كنت مولاه على مولاه দ্বারা হযরত আলীর খিলাফতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এখন এ আলোচনার প্রয়োজন নেই। যদি হযরত আলীর নিকট খিলাফতের ব্যাপারে দলীল থাকত, তাহলে সাহাবায়ে কিরামের নিকট তা পেশ করতেন। যদি তাঁরা মেনে না নিতেন, তাহলে তিনি হযরত আবূ বকর ও উমরের বিরুদ্ধে অবশ্যই জিহাদ ঘোষণা করতেন, যেমন হযরত মু'আবিয়ার সাথে জিহাদ করেছেন। বিশেষ করে যখন আবূ সুফিয়ান হযরত আলীকে বললেন, তুমি বায়'আতের জন্য হাত প্রসারিত কর, আমি তোমার হাতে বায়'আত করব। যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে আবূ বকরের মুকাবিলায় সমস্ত ময়দান সাওয়ার ও পদাতিক দ্বারা ভর্তি করে দেব।

হযরত আলী (রা) কঠোরভাবে জবাব প্রদান করেন যে, যাও, আমাকে তোমার নসীহত করার প্রয়োজন নেই। তোমরা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার পাঁয়তারা করছ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আলীর নিকট খিলাফতের ব্যাপারে কোন বাণী বা ওসীয়্যত বিদ্যমান ছিল না। তিনি আন্তরিকভাবে হযরত সিদ্দীক

আকবরের খিলাফতকে হক ও রাশেদাহ্ মনে করতেন। তাঁর খিলাফতের বিরুদ্ধে কিছু বলা ফিতনা-ফাসাদ মনে করতেন।

হযরত আলীর নিকট যদি সিদ্দীক আকবরের খিলাফত হক ও ন্যায় না হত, তাহলে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যই মুকাবিলা ও জিহাদ করতেন। যেমন হযরত মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে করেছেন। কেননা আসাদুল্লাহ আল-গালিব হওয়ার পর আদাউল্লাহ বা আল্লাহর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা না করা হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের ভীরুতা ও ঈমানী দুর্বলতা। সুতরাং হযরত আলীর এ চুপ থাকা যদি নিরুপায় ও বাধ্য হওয়ার কারণে ঘটে থাকে তাহলে এরূপ ব্যক্তি আমীর ও খলীফা হওয়ার উপযুক্ত নন। যদি এটা বলা হয় যে, হযরত আলী (রা) শক্তি থাকা সত্ত্বেও খিলাফত ও ওসীয়্যতের কথা তাকিয়্যার কারণে প্রকাশ করেননি, তাহলে এটা কাপুরুষতা ও ভীরুতা এবং মুনাফেকী। সুতরাং ভীরু ও মুনাফিক খলীফা হতে পারে না।

শী'আ সম্প্রদায় বলেন, পূর্ববর্তী তিন খলীফার প্রতি হযরত আলীর অনুগত থাকা, মসজিদে তাঁদের পিছনে নামায আদায় করা, তাঁদের মত কুরআন তিলাওয়াত করা, কোন বিষয়ে তাঁদের বিরোধিতা না করা এগুলো সবই ছিল তাকিয়্যার কারণে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে এই যে, হযরত আলী (রা) যখন স্বীয় খিলাফতকালে খুতবা প্রদানকালে তিনজন খলীফার ফযীলত বর্ণনা করতেন, সুতরাং এটাও যদি তাকিয়্যার জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করবো যে, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) কিরূপ আসাদুল্লাহ (আল্লাহর বাঘ) ছিলেন, যিনি তিনজন খলীফার ইনতিকালের পরও তাঁদেরকে ভয় পেতেন এবং ভয় পেয়ে তাঁদের প্রশংসা করতেন! আফসোস আসাদুল্লাহ বা শেরে খোদা হয়ে মৃত্যুকে ভয় করেন, খলীফা ও বাদশাহ্ হওয়ার পরও তাঁদের মত ও নীতি অনুযায়ী আহকাম জারী করেন। মাশাআল্লাহ, হযরত আলী (রা) এরূপ ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। যেমনটি শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, হযরত আলী (রা) বাস্তবেই ছিলেন শেরে খোদা এবং তাঁর বাহির ও ভিতর একই ছিল। শী'আ সম্প্রদায় বলেন, তাঁর বাহির ও ভিতর ছিল আলাদা। বান্দা শুধু প্রকাশ্য অবয়ব প্রত্যক্ষ করে থাকে। অন্তরের খবর আল্লাহ ভাল জানেন। হযরত আলী (রা) যখন বাহ্যিকভাবে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে তিনজন খলীফার প্রশংসা করেন, তখন মুসলমানদের ফরয হলো এই যে, হযরত আলী (রা)-কে সত্যবাদী মনে করবে। শী'আদের মতে হযরত আলী (রা) নিষ্পাপ ছিলেন। নিষ্পাপ ব্যক্তির আনুগত্য করা ফরয এবং তাঁর নাফরমানী করা ফাসেকী। মূলত এ বিষয়ে পক্ষের স্বীকৃতি রয়েছে যে, হযরত আলী (রা) সিদ্দীক আকবরের খিলাফতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং এমনিভাবে হযরত উমর ফারূক ও হযরত উসমান (রা)-এর ফিলাফতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

তিনজন খলীফারই বিশেষ পরামর্শদাতা ছিলেন। যত যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোতে পরামর্শসহ সর্বাবস্থায় তাঁদের সাথে শামিল ছিলেন এবং গনীমতের মাল থেকে নিজের অংশগ্রহণ করেছেন। নামাযে তাঁদের পিছনে ইকতিদা করেছেন। দীনের মাসয়ালার ব্যাপারে তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করতেন। এ সমস্ত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট দলীল যে, হযরত আলী (রা) তিন খলীফার খিলাফতকে আন্তরিকভাবে হক মনে করতেন। হায়দারে কারার সাহিবে যুলফিকার -এর এই পঁচিশ বছরের আমলকে তাকিয়্যার উপর অনুমান করা শুধু শী'আ সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, হযরত আলী (রা)-এর দাসের বা গোলামের মর্যাদা ও এর চেয়ে অনেক উচ্চ যে, আমরা অন্তরে যাকে কাফির মুনাফিক ও খেয়ানতকারী মনে করি, বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ ব্যবহার করব এবং তাদের পিছনে নামায আদায় করব, তাদের প্রদত্ত কুরআন তিলাওয়াত করব। لاحول ولاقوة الابالله

স্বয়ং নবী করীম (সা) কেন আমীর বা খলীফা মনোনীত করেন নি

জবাব ঃ এর জবাব হলো এই যে, নবী (সা) -এর উপর আমীর বা খলীফা নির্বাচন বা মনোনীত করা ওয়াজিব ছিল না। এ মাসায়ালাটি তিনি মুসলমানদের ইজতিহাদ এবং পরামর্শের উপর ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে তারা তাদের দূরদৃষ্টির দ্বারা কাউকে নিজেদের আমীর নির্বাচন করবে এবং ইঙ্গিতে স্বীয় পবিত্র উদ্দেশ্য এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, হযরত আবূ বকরকে নিজের জায়গায় নামাযের ইমাম নির্ধারণ করেন। এটা খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত ছিল। যখন তিনি এটা উপলব্ধি করলেন যে, আমার এ ইঙ্গিত সাহাবাদের জন্য যথেষ্ট হবে, ফলে তিনি হযরত আবূ বকরের ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা এই যে, মুসলমানগণ আবূ বকর ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হবে না।

আল্লামা সুয়ূতী 'তারীখুল খুলাফা'তে উল্লেখ করেছেন যে, নবী (সা) কাউকে খলীফা নির্ধারণ না করার কারণ মুসনাদে বাযযারের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن حذيفة قال قالوا يارسول الله الاستخلف علينا قال ان استخلف عليكم فتعصوا خليفتى نزل عليكم العذاب - أخرجه الحاكم فى المستدرك -

"হযরত হুযায়ফা (রা) বর্ণনা করেন লোকজন আরয করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের জন্য কেন একজন আমীর ও খলীফা নির্বাচন করে যাচ্ছেন না? তিনি বললেন, যদি আমি কাউকে খলীফা নির্বাচন করি আর তোমরা যদি তার নাফরমানী কর, তাহলে তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হবে। (হাকীম, মুসতাদরাকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন)।

১০. খিলাফতের বিষয় আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্যের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আ সম্প্রদায়ের মধ্যে খিলাফতের মাসায়ালাটি হলো সবচেয়ে বিরাট মতপার্থক্যের বিষয়। সুতরাং আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করব যে, মতপার্থক্যের উদ্দেশ্য ও বিষয়টি কি?

শী'আদের মতে খিলাফতের দায়িত্ব নিকটাত্মীয় ও বিবাহের সূত্র সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। তাই শী'আদের মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর খিলাফত হযরত আলীর পাওয়ার কথা ছিল। কেননা তিনি নবী (সা)-এর নিকটাত্মীয় ও জামাতা ছিলেন।

আহ্‌লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে খিলাফত লাভের জন্য শর্ত হলো নৈকট্য লাভ ও ঘনিষ্ঠতা অর্জন করা, আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর তা নির্ভর করে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর তা'আলা ও তাঁর রাসূলের অধিক ঘনিষ্ঠ হবেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খলীফা এবং নবীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। খিলাফতের সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। যদি আত্মীয় বা গোত্রের কারণে খিলাফত হাসিল হত, তাহলে মহানবী (সা)-এর পর তাঁর চাচা হযরত আব্বাস অথবা তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) খলীফা হতেন। বরং এ ক্ষেত্রে হযরত ফাতিমা (রা) খলীফা হতেন এবং কোন পুরুষ তাঁর পক্ষে খিলাফতের কাজ বাস্তবায়ন করতেন। হযরত ফাতিমার পর ইমাম হাসান দ্বিতীয় খলীফা, তাঁর পর ইমাম হুসায়ন তৃতীয় খলীফা এবং ইমাম হুসায়নের পর হযরত আলী (রা) জীবিত থাকলে তিনি চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত হতেন।

মোটকথা যদি খিলাফতের যোগ্যতা আত্মীয়তা উপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে শী'আদের নীতি অনুযায়ী হযরত আলী চতুর্থ খলীফা হতেন। সুতরাং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত যদি হযরত আলীকে চতুর্থ খলীফা নির্বাচন করে থাকেন তাহলে এতে অপরাধ হবে কেন। আনসার ও মুহাজিরদের বায়'আতের মধ্যেমেই হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। শী'আগণ তাঁকে কিছুই প্রদান করেন নি। যদি জামাতা হওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত উসমান গণী (রা) ক্রমানুসারে খিলাফতের অধিক হকদার ছিলেন। কেননা তিনি পর্যায়ক্রমে নবী (সা)-এর দু'কন্যাকে বিয়ে করেন। এজন্য তিনি মুসলিম মিল্লাতের নিকট যিন্‌নূরাইনের (ذى النورين।) বিশেষ উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। বস্তুত হুযুরের যে দু'জন কন্যার পর্যায়ক্রমে হযরত উসমানের সাথে পরিণয় হয়েছিল—তাঁরা উভয়ই রাসূল (সা)-এর জীবিতকালেই ইনতিকাল করেন। কিন্তু এটা খিলাফতের অধিকারকে বাতিল করেনি। কেননা পরিণয়ের কারণেই তাঁর এ মর্যাদা হাসিল হয়েছিল। স্ত্রীর জীবিত থাকা বা না থাকার মধ্যে এতে কোন পরিবর্তন হয়নি। যেমন হযরত ফাতিমার ইনতিকালের পরও হযরত আলীর জামাতার মর্যাদা বহাল ছিল। হযরত আলীর এ মর্যাদা হযরত ফাতিমার ইনতিকালের কারণে রহিত হয়ে যায়নি।

এবার অপর একটি বিষয় হলো, শী'আগণ বলেন, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম এ দু'কন্যা মহা নবী (সা) এর ঔরষজাত ছিলেন না, বরং হযরত খাদীজার প্রথম স্বামীর ঔরষজাত ছিলেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট মিথ্যাচার ও ধোকা। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত তাদের কালিনী শরীফে পরিষ্কার বর্ণিত আছে ঃ

وتزوج خديجة وهو البس بضع وعشرين سنة فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وام كلثوم وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر والفاطمة (اصول كافى كلينى صفحہ ٢٨٧ مولود النبى ﷺ)

"নবী (সা) বিশ বছরের কিছু অধিক বয়সে হযরত খাদীজার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে হযরত খাদীজা গর্ভ থেকে কাসিম, রুকাইয়া, যয়নাব এবং উম্মে কুলসুম জন্মগ্রহণ করে এবং নবুওয়াত লাভের পর তাইয়্যেব, তাহির ও ফাতিমা (রা) জন্ম গ্রহণ করে। (উসূলে কাফী, কালিনী, পৃ. ২৭৮, নবী করীম (সা)-এর জন্ম অধ্যায়)

মূলত হযরত ফাতিমার মত রুকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমও নবী (সা)-এর কন্যা ছিলেন। এদের মধ্যে হযরত ফাতিমা নবুওয়াতের পর এবং রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম নবুওয়াতের পূর্বে জন্ম লাভ করেন। কিন্তু পূর্ব ও পরে জন্মগ্রহণ খিলাফতের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। হযরত আলীর জামাতা হিসেবে যে মর্যাদা ছিল তাঁর (হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার) ইনতিকালের পরও বিদ্যমান ছিল। তাঁর ইনতিকালের কারণে জামাতার মর্যাদা হ্রাস পায়নি। হযরত উসমান -এর ব্যাপারে একই নীতি প্রযোজ্য।

খিলাফতের ব্যাপারে শী'আ সম্প্রদায়ের বিস্ময়কর চিন্তাধারা উম্মতের জন্য মারাত্মক অনিষ্টকর। তারা বলেন, নবী (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত আলী (রা) দু'দিন পর্যন্ত স্বীয় পরিবারবর্গকে সাথে নিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য মুহাজির-আনসারগণের বাড়িতে গমন করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে তাঁর খলীফা মনোনীত করেছেন। এ সমস্ত লোক আমার খিলাফত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা আমার হক ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর। কিন্তু চার ব্যক্তি ব্যতীত কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। সুতরাং হযরত আলী (রা) অসহায় অবস্থায় বললেন, তোমাদের মত চার ব্যক্তি দ্বারা আমার কি হবে? (মূল ঘটনা 'হাক্কুল ইয়াকীন ও তাযকিরাতুল আইম্মা' গ্রন্থে দেখা যেতে পারে)।

সাইয়্যেদেনা হযরত আলী (রা) সম্পর্কে আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হলো এই যে, এ সমস্ত ঘটনা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিবেক বিরোধী। হযরত আলী (রা)-এর মত একজন মর্যাদাবান সাহাবীর উঁচুমানের আল্লাহ-প্রীতি ও নিঃস্বার্থপরতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ

নবী (সা) সারা জীবন দরবেশ ও ফকীরের মত যাপন করেছেন। দু'দু'মাস পর্যন্ত ঘরে তাওয়া চড়িয়ে রুটি তৈরি করা হত না, পাকা ও কাঁচা খেজুর আহার করে দিন কাটিয়েছেন। কম্বল পরিধান করতেন এবং চটের উপর বসতেন। সুতরাং নবী (সা)-এর নিকট এমন কি থাকতে পারে যা ইনতিকালের পর তিনি স্বীয় ওয়ারিসগণের জন্য রেখে যেতে পারেন? উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া -এর ভাই হযরত আমর ইবন হারিস (রা) বলেন ঃ

ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهمًا ولاديناراً ولاعبداً ولا امة ولاشيئا الابغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة ـ صحيح بخارى كتاب الوصايا ـ

"নবী (সা) ইনতিকালের সময় কোন দিরহাম, দীনার এবং কোন গোলাম বা বাঁদী রেখে যাননি। কেবল একটি সাদা খচ্চর, হাতিয়ার এবং কিছু জমি যা তিনি জীবিতকালে মুসলমানদের মধ্যে সাদাকা বা ওয়াকফ করে দিয়েছেন।" (বুখারী শরীফ ওসীয়্যত অধ্যায়)

আমর ইবন হারিসের হাদীসে যে জমির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা তিনটি সম্পত্তির কথা বুঝানো হয়েছে ঃ

১. মদীনার সম্পত্তি, মদীনার সম্পত্তির দ্বারা বনূ নযীর থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তি বুঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ তা'আলার নবী (সা)-কে ফায় (فيء) হিসেবে দান করেছেন। কুরআনুল করীমে এর উল্লেখ রয়েছে। এ জমি সর্বদা রাসূল (সা)-এর অধিকারে ছিল। এ জমির উৎপাদন থেকে তিনি স্বীয় পরিবারের বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন। যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা দ্বারা হাতিয়ার, ঘোড়া এবং জিহাদের আসবাবপত্র ক্রয় করতেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, পৃ. ৭২৫, সূরা হাশর)

২. খায়বারের জমি, যা তিনি অংশ হিসেবে পেয়েছেন,

৩. ফিদাকের অর্ধেক জমি যা তিনি খায়বার বিজয়ের পর খায়বারবাসী থেকে সন্ধিসূত্রে লাভ করেছেন। খায়বার ও ফিদাকের উৎপন্ন ফসল থেকে দুর্যোগ ও আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করতেন।

এ সমস্ত জমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মনে করা হত এবং অমৃত্যু নবী (সা)-এর অধিকারে ছিল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রাসূল (সা)-কে এ জমি ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাসূল (সা) এ জমির উৎপন্ন ফসল ও আয় থেকে পরিবারবর্গের শুধু প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতেন এবং অবশিষ্ট উৎপন্ন ফসল ও আয় দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রয়োজনে ব্যয় করতেন। নিজেদের সুখশান্তির জন্য

(মা'আযাল্লাহ) একটি পয়সাও ব্যয় করতেন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মালিক হিসেবে ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মুতাওয়াল্লীর মত। এ সমস্ত জমি ছিল আল্লাহর অর্থাৎ ওয়াক্ফ এবং নবী (সা) আল্লাহর তা'আলার নির্দেশে এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তাঁর নির্দেশেই ব্যয় করতেন। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ ছিল যে, এ সমস্ত জমির আয় থেকে স্বীয় পরিবারবর্গের বছরের ব্যয় প্রদান করবে, তাই রাসূল (সা) বনী নযীরের সম্পত্তির আয় থেকে উম্মুল মু'মিনীনদের বছরের ব্যয় প্রদান করতেন।

নবী (সা) এর ইনতিকালের পর আহলি বায়তের এ ধারণা হলো যে, এ সমস্ত জমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মালিকানাধীন এবং নিজস্ব সম্পদ ছিল। ফলে ওয়ারিস হিসেবে আহলি বায়তের মধ্যে বণ্টন করা উচিত। এ কারণে হযরত ফাতিমা (রা) খায়বার, ফিদাক এবং বনী নযীরের সম্পত্তি থেকে হযরত আবূ বকরের নিকট স্বীয় অংশ প্রদানের জন্য দাবী করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) জবাবে বলেন, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "আমরা নবীগণ না কারো সম্পদের ওয়ারিস হয়ে থাকি এবং কেউ না আমাদের সম্পদের ওয়ারিস হয়ে থাকে। আমরা যা কিছু সম্পদ ত্যাগ করে যাব তা আল্লাহর রাহে সাদাকা ও খায়রাত হয়ে যাবে।" অবশ্য যে ব্যয় এতে নির্ধারিত রয়েছে, তা নিয়মানুযায়ী অব্যাহত থাকবে এবং যে সমস্ত কাজে নবী করীম (সা) ব্যয় করতেন হযরত আবূ বকর (রা) একইভাবে ঐ কাজে ব্যয় করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পরিবারবর্গ ঐ সম্পদ থেকে ততটুকু ভোগ করবে, যতটুকু নবী করীম (সা)-এর যুগে ভোগ করতেন। আল্লাহর শপথ, নবী (সা)-এর আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইহ্সান করা আমার নিকট স্বীয় আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইহসান করার চেয়ে অধিক প্রিয়।

হযরত সিদ্দীক আকবরের এ জবাবে হযরত ফাতিমা (রা) পছন্দ হয়নি এবং তিনি ব্যথিত হন। কেন ব্যথিত হলেন তা জানা যায় না। অথচ হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার সম্মানিত পিতা নবী করীম (সা)-এর সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ওযর স্পষ্ট। কিন্তু হযরত ফাতিমার (রা) কষ্ট ও বিষাদের কারণে অত্যন্ত ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত ছিলেন।

হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী (সা)-এর বাণীর উপর আমল করে তাঁর সম্পত্তি থেকে ওয়ারিস হিসেবে কাউকে কিছু প্রদান করেন নি। এমনকি স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা, হযরত উমরের কন্যা হযরত হাফসা এবং অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনকে ওয়ারিস হিসেবে কিছুই প্রদান করেন নি। অবশ্য হযরত ফাতিমাকে সম্মত ও খুশি করানোর জন্য তাঁদের বাড়ি গমন করেন এবং তাঁদের নিকট ওযর পেশ করেন। ফলে হযরত ফাতিমা (রা) হযরত সিদ্দীক আকবরের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।

হাফিস ইবন কাসীর[১] বলেন, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) প্রথমত মীরাস (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) বণ্টন করাকে অস্বীকার করেন। অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা) সম্ভবত হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট এ আবেদন করে থাকবেন যে, খায়বার ও ফিদাকের জমির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আলীর উপর সোর্পদ করা হোক এবং হযরত আলী এ জমির পর্যবেক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব পালন করবেন। হযরত আবূ বকর (রা) এটাও অস্বীকার করে বলেন, নবী করীম (সা)-এর মত আমি নিজেই এর ব্যস্থাপনার দায়িত্ব পালন করব। এ কথায় হযরত ফাতিমা (রা) মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির কারণে ব্যথিত হন।[২]

হযরত সিদ্দীক আকবরের পর হযরত উমর (রা) দু'বছর পর্যন্ত এ সমস্ত জমির ব্যবস্থাপনা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। দু'বছর পর যখন হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) ঐ বিষয়ে আলোচনা করেন তখন হযরত উমর (রা) নবী (সা) এবং হযরত সিদ্দীক আকবর (রা)-এর ব্যবস্থাপনার উদ্ধৃতি দিয়ে পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ওযর পেশ করেন। অবশ্য মন আকৃষ্ট করার জন্য এ পদ্ধতি বের করলেন যে, মদীনার সম্পত্তি বনূ নযীরের জমির ব্যবস্থাপনা হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর হাতে দিয়ে বলেন, তোমরা উভয়ে যৌথভাবে এ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন কর। তাদের থেকে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তোমরা এর আয় ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে বণ্টন করবে রাসূলুলুল্লাহ (সা) যাদের মধ্যে বণ্টন করতেন। এ অঙ্গীকারের

---

১. এর মূলভাষ্য এরূপ ঃ

لما أخبرها الصديق انه قال لانورث ماتركنا فهو صدقة فججها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص الصريح فسألته ان ينظر على فى صدقة الارض التى بخيبر وفدك فلم يجها الى ذالك لانه رأى ان حقا عليه ان يقوم فى جميع ماكان يتولا لارسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضى الله عنه فحصل لها (وهى امرأة من البشر ليست براجية العصمة) عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت (البداية والنهاية صفـ٢٤٩ج٥)

অতঃপর ইবন কাসিরের গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

وكانها سألته بعد هذا ان يجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجها الى ذالك لما قدمناه فتعتت عليه بسبب ذالك وهى امرأة من بنات ادم تأسف كما ياسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روينا عن أبى بكر انه ترشى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها انتهى ثم ذكر حدث الاسترضاء فراجعه ـ

২. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫ খ, পৃ. ২৪৯।

মাধ্যমে তাঁদের উপর এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এটা মীরাস নয়; বরং এটা হলো ওয়াকফ। হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রা) এটা গ্রহণ করেন এবং মালিক না হয়ে যৌথভাবে উভয়ে মদীনার সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হয়ে গেলেন।

খায়বার ও ফিদাকের জমির ব্যবস্থাপনা হযরত উমর (রা) নিজের হাতে রাখেন। এভাবে হযরত উমর (রা) নবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি দু'ভাগে বণ্টন করেন। একটি হলো বনূ নযীরের সম্পদ অর্থাৎ মদীনার সম্পদ যার আয় থেকে আহলি বায়ত ও উম্মুল মু'মিনীনের বাৎসরিক খরচাদি প্রদান করা হতো। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর উপর অর্পণ করেন। কেননা তাঁরা উভয়ে আহলি বায়তের প্রয়োজনীয়তা খুব ভালভাবে অবগত ছিলেন। এজন্য উভয়ে মুতাওয়াল্লী হওয়ার আশা পোষণ করতেন। কেননা নবীর ওয়াকফ-এর মধ্যে নিকটাত্মীয়েরও হক রয়েছে, বরং তাদের হক ও অধিকার অগ্রগণ্য। ফলে হযরত উমর (রা) মনে করেন যে, এ সমস্ত সম্পত্তির মুত্তাওয়াল্লী তাদেরকে নিয়োগ করা যথার্থ হবে এবং لانورث ماتركنا صدقة এ হাদীসের আলোচনা সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে। এজন্য এখন এ আশংকা নেই যে, লোকজন এটা মীরাস মনে করবে। তদনুসারে বনূ নযীরের সম্পত্তি তাদের উভয়ের নিকট মুতাওয়াল্লী হিসেবে অর্পণ করেন। অপর সম্পত্তি অর্থাৎ ফিদাক ও খায়বারের সম্পত্তির আয় যেহেতু জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো, ফলে খলীফা হিসেবে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা হযরত উমর (রা) নিজের দায়িত্বে রাখেন। বেশ কিছু দিন হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রা) ঐকমত্যের ভিত্তিতে মদীনার সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন। কিন্তু কিছু দিন পর উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। কেননা একই সম্পত্তির দু'জন মুতাওয়াল্লী হলে মতপার্থক্যের কারণে উভয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই ফয়সালার জন্য উভয়ে হযরত উমরের নিকট গমন করে আবেদন করেন যে, মদীনার সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীগিরি দু'ভাগে বণ্টন করে দিন। এক অংশের মুতাওয়ালি হযরত আলীকে এবং অপর অংশের মুতাওয়ালি হযরত আব্বাসকে বানিয়ে দিন। যাতে পরস্পর মতানৈক্য ও বিরোধ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। কিন্তু হযরত উমর (রা) এর বিরোধিতা করে তা অস্বীকার করেন এবং এমত পেশ করেন যে, যদি প্রত্যেক মুতাওয়াল্লীর অংশ আলাদা করে দেয়া হয়, তাহলে এটা মীরাস বণ্টনের মত হয়ে যাবে। এজন্য হযরত উমর (রা) মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব দু'ভাগে বণ্টন করার বিষয়টি অস্বীকার করেন এবং এটা কিয়ামত পর্যন্ত হবে না বলে ঘোষণা প্রদান করেন। (আশ্আতুল লুম'আত, ৩য় খ, পৃ. ৪৮০. ফায় অধ্যায়)

এবং এও বলেন যে, যদি তোমাদের দ্বারা মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে এ জমি আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি পূর্ববর্তীদের ন্যায় নিজেই এর ব্যবস্থা গ্রহণ করব। হযরত আব্বাস ও হযরত আলীর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রত্যেককে তার

অংশ অনুযায়ী পৃথকভাবে মুতাওয়াল্লী করা হোক, যাতে বিরোধ ও মতানৈক্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। তাঁরা মুতাওয়াল্লীগিরি বণ্টন চেয়েছেন, মীরাসের বণ্টন নয়। কিন্তু হযরত উমর (রা) এটা অনুমোদন করেননি। কারণ ভবিষ্যতে মানুষ যাতে এ মুতাওয়াল্লীগিরি বণ্টন দ্বারা মীরাসের বণ্টন মনে না করে।

কিছু দিন পর্যন্ত যৌথভাবে মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব চলতে থাকে। পরে হযরত আলী (রা) হযরত আব্বাসের অধিকার উঠিয়ে দেন এবং সমস্ত সম্পত্তির উপর তিনি নিজের একমাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সঠিক ও ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে এর যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। হযরত আলীর এককভাবে এ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়া এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, এ সম্পত্তি হযরত আলীর নিকটও ওয়াকফ ছিল, কারো মালিকানা বা মীরাস ছিল না। কেননা একজন মুতাওয়াল্লীর দ্বারা অপর মুতাওয়াল্লীর অধিকার রহিত করা যুলম নয়, বরং অনেক সময় কল্যাণ চিন্তা করে এরূপ করা হয়ে থাকে। অবশ্য কারো মালিকানা এবং মীরাসের উপর অধিকার গ্রহণ করা যুলম। হযরত আলী (রা) শী'আদের নিকট নিষ্পাপ এবং আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকটও তিনি নিষ্পাপ। কারো মালিকানা এবং মীরাসের উপর হস্তক্ষেপ করা বা ছিনিয়ে নেয়া তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি এটা মীরাস হতো তাহলে এতে হযরত আব্বাস ব্যতীত উম্মুল মু'মিনীনদের অংশ থাকত এবং এটা প্রদান করাও জরুরী হতো।

হযরত আলী ও হযরত আব্বাস কর্তৃক (রা) হযরত উমর (রা)-এর নিকট অর্ধেক অর্ধেক করে জমির বণ্টন করে মুতাওয়াল্লী করে দেয়ার আবেদনের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, উভয়ের মধ্যে বিরোধ শুধু মুতাওয়াল্লী নিয়োগ সম্পর্কে ছিল, মীরাস সম্পর্কে ছিল না। মীরাস বণ্টন করে দেয়ার মধ্যে কোন জটিলতা বা অসুবিধা নেই; বরং যৌথ মালিকানাধীন কোন বস্তুকে দু'জন মালিকের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া বিবেকবুদ্ধি এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে উত্তম। এছাড়া তাঁদের থেকে হযরত উমরের এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা যে, তোমরা এ জমির আয় নবী করীম (সা) এর মত ব্যয় করবে। ঐ বিষয়টিও প্রমাণ করে যে, হযরত উমর (রা) তাঁদের মুতাওয়াল্লী বানিয়ে ছিলেন, নতুবা এ শর্তের কি অর্থ হতে পারে। যদি মীরাস হিসেবে বণ্টন করতেন, তাহলে মীরাসের মালিক তো হলেন অংশীদারগণ। স্বীয় বস্তু ব্যবহারের একমাত্র ক্ষমতা হলো মালিকের। সুতরাং মালিকের নিকট থেকে এ ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণ করার কোন অর্থ হয় না। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত এর বিরোধী কোন নির্দেশ প্রদান করব না বলে হযরত উমরের উক্তি প্রমাণ করে যে, নবী করীম (সা) এর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হযরত আলী ও হযরত আব্বাসকে মুতাওয়াল্লী হিসেবে প্রদান করেছেন মীরাস হিসেবে নয়। কেননা মীরাস বণ্টনের মধ্যে কোন জটিলতা নেই। প্রত্যেক ওয়ারীসকে তার অংশ প্রদান করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

বরং প্রথমবার হযরত উমরের নিকট হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের গমন শুধু মুতাওয়াল্লীর পদ হাসিলের জন্য ছিল। যেমন ادفعها الينا শব্দ দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কেননা دفع শব্দের অর্থ কোন বস্তু কারো নিকট সোপর্দ করা, মীরাস এবং মালিক হওয়ার সূত্রে কোন বস্তুর দেয়ার উপর دفع শব্দ আরোপ করা যায় না। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা) মুতাওয়াল্লী হিসেবে কাউকে কিছু দেয়া পছন্দ করেননি। কেননা হযরত ফাতিমার মীরাস লাভের আবেদন, ঘটনা তখন তাজা ছিল এবং এ ঘটনা সবাই অবহিত ছিল। এ সময় যদি মুতাওয়াল্লী হিসেবেও সম্পত্তি প্রদান করতেন, তাহলে সবাই এটা মীরাস মনে করত। এজন্য হযরত আবূ বকরের প্রতি হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের অসন্তোষ ছিল যে, তিনি তাদেরকে মুতাওয়াল্লী প্রদানেও সম্মত হননি এবং এটাও আশ্চর্য নয় যে, মানবীয় দুর্বলতার কারণে তাঁদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, যদিও এই হাদীস لانورث ماتركنا صدقة নিঃসন্দেহের সহীহ। কিন্তু আমাদের অভিভাকত্বের অধিকার ও যোগ্যতার মধ্যেও সন্দেহ নেই, তথাপি এ জমি যা হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) স্বীয় অধিকারেই রেখেছেন, নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে।

হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের এ ধারণা অথবা কোন উক্তির কারণে হযরত উমরের মনোবেদনা সৃষ্টি হয়। ফলে তিনি সতর্কতা ও অভিযোগের সুরে বলেন, তোমরা কি হযরত আবূ বকরকে মিথ্যাবাদী, পাপী ও খেয়ানতকারী মনে করছ। যেমন, আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে কোন অসতর্কতা অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়, তখন অতিরঞ্জিতভাবে এটা বলে থাকে যে, তোমরা কি আমাকে ভাই বা বন্ধু মনে কর না, অথচ অন্তরের অন্তস্থলে তাদের মহব্বত স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কিন্তু প্রকাশ্য কোন কথা বা ঘটনা সংঘটিত হলে এরূপ বলে থাকে। নিন্দা ও তিরস্কারের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন আল্লাহ্‌র কালামেও এরূপ বাকপদ্ধতি রয়েছে। যেমন– ঃ

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْاَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَ هُمْ نَصْرُنَا ـ

"অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো এবং ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসল।" (সূরা ইউসুফ ঃ ১১০)

মূলত আম্বিয়ায়ে কিরাম আন্তরিকভাবে এটা বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। একদিন অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে কিন্তু মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির কারণে যখন আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তরে অনিচ্ছাকৃত অস্থিরতা ও পেরেশানী সৃষ্টি হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরকে অভিযোগের সুরে বলেন, সাহায্য পৌঁছানোর মধ্যে একটু বিলম্ব হওয়ায় এই ধারণা করছ যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীগণের সাথে মিথ্যা অঙ্গীকার করেছেন। এমনিভাবে হযরত উমর (রা) যখন প্রত্যক্ষ করেন যে, হযরত আলী এবং হযরত আব্বাসের কথায় হযরত সিদ্দীক

আকবরের বিরুদ্ধে মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তখন তিনি আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বসুলভ তিরস্কার ও অভিযোগের সুরে তাঁদের বলেন, তোমরা কি হযরত আবূ বকরকে মিথ্যাবাদী ও খেয়ানতকারী মনে করছ? আল্লাহর শপথ! হযরত আবূ বকর তো একজন নেককার সত্যপথের কাণ্ডারী ও হকপন্থী ছিলেন। বস্তুত হযরত উমর (রা) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের অন্তরে হযরত সিদ্দীক আকবরের মহব্বত এরূপ দৃঢ়ভাবে স্থায়ী হয়ে রয়েছে যে, যা কোনভাবেই দূরীভূত হবে না। সুতরাং যার দ্বারা দুঃখ ও বেদনা সৃষ্টি হতে পারে এরূপ বাক্য উচ্চারণ করা কোন সত্যিকার মহব্বতকারীর শানের উপযোগী নয়।

ফিদাকের বাগানের হাকীকত

ফিদাকের বাগানটি ছিল একটি ক্ষুদ্র খেজুরের বাগান। এ বাগানের আয় থেকে নবী (সা) স্বীয় পরিবারবর্গের সারা বছরের জীবকা নির্বাহের ব্যয় প্রদান করতেন। বাকী যা কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন প্রথম খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন হযরত ফাতিমা (রা) উক্ত বাগান ওয়ারিস হিসেবে তাঁকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) জবাবে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শুনেছি তিনি বলেছেন, "আমরা নবীগণের কেউ ওয়ারিস হয় না এবং আমরাও কারো ওয়ারিস হই না। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করি তা সাদাকা ও ওয়াকফ হিসেবে গণ্য হবে।" হযরত ফাতিমা (রা) এটা শুনে লজ্জিত ও চিন্তিত হন। অতঃপর এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলেননি।

ফিদাকের বাগান একটি সাধারণ বাগান ছিল। এটা লাখো-কোটি টাকার জমিদারী ছিল না। যার সম্পর্কে এটা বলা যায় যে, এ বিশাল বাগান ছিনিয়ে নিয়ে খলীফা এর আয় দ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গকে নিয়ে রাজকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করছেন। কোন খলীফা এ বাগানকে তাঁর সন্তান-সন্ততির জন্য বায়নামা অথবা হেবানামা লিপিবদ্ধ করে দেননি, বরং শরী'আতের বিধান অনুযায়ী পাওনাদারদের মধ্যে বাগানের আয় বণ্টন করতেন। এমনকি যখন হযরত আলী (রা) খলীফা নির্বাচিত হন, তখন উক্ত বাগান যথারীতি তাঁর অধিকারে চলে আসে। এবং তিনি পূর্ববর্তী খলীফাদের নীতি এই বাগানের ব্যাপারে অব্যাহত রাখেন। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ এতে প্রবেশাধিকার পেত না। হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতের সময় পূর্ববর্তী খলীফাদের মত এই বাগানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ অধিকারে রাখেন। শী'আদের মতানুযায়ী যদি ফিদাকের বাগান আহলি বায়তের হক হয়ে থাকে এবং পূর্ববর্তী খলীফাগণ ছিনিয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে হযরত আলী (রা) স্বীয় খিলাফতকালে ছিনিয়ে নেয়া বস্তু কেন হকদারগণকে ফিরিয়ে দেননি?

শী'আগণ এর জবাবে বলেন, ফিদাকের বাগান যেহেতু ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ইমামগণের নীতি হলো এই যে, ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফিরিয়ে দেয়া হলেও তারা গ্রহণ করেন না। সুতরাং শী'আদের জবাবে আহলি সুন্নাত আল জামা'আত বলেন, শী'আদের মতে ফিদাকের বাগান যেমন ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তেমনি খিলাফতও ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কি কারণে হযরত আলী (রা) এক সাধারণ বস্তু পরিত্যাগ করেন এবং খিলাফতের মত এক বিরাট বস্তুকে গ্রহণ করেন? খিলাফত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে তাঁর ধারণাও হয়নি। অতঃপর ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বলে দাবিকারীদের এ খেয়াল উদিত হয়নি যে, খুলাফায়ে কিরাম তাঁদের খিলাফতের সময় ফকীর ও দরবেশদের মত জীবন যাপন করেছেন এবং আহ্লি বায়তের সদস্যদেরকে ৫০/৬০ হাজার দীনার প্রদান করতেন। প্রত্যেকবারের দানের মূল্য কি ফিদাকের বাগানের চেয়ে কম হবে? এছাড়া একবারের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য, হযরত উমর ফারূকের খিলাফতকালে ইরানের শাহজাদী শহরবানু অত্যন্ত শান ও মর্যাদার সাথে গ্রেফতার হয়ে আসেন। তখন খলীফা হযরত আলী ও হুসায়নকে গনীমতের অংশ দেয়ার পর তিনজনকে অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। এছাড়া শহরবানুকে সমস্ত অলংকারসহ হযরত হুসায়নকে দান করেন। যার প্রত্যেকটি মণিমুক্তা এত মূল্যবান ছিল যে, একটি মুক্তার মূল্য দ্বারা অনেকগুলো ফিদাকের বাগান ক্রয় করা যেত। সুতরাং যদি ধরে নেয়া যায় যে, ফিদাকের বাগান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে কিন্তু এর পর এত অধিক মূল্যবান হাদীয়া প্রদান করেছেন যার দ্বারা অসংখ্য ফিদাকের মত বাগান ক্রয় করা যেত। কাজেই শী'আগণ বিচার করতে পারেন যে তাদের অভিযোগ কি বেহুদা বা অনর্থক নয়? যদি কেউ কারো এক পয়সা ছিনিয়ে নিয়ে এক হাজার দান করে তাহলে সে কি কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত নয়?

শী'আদের নিকট আবেদন, শত শত বছর যাবত যে ইরানে লাখো লাখো শী'আ বাস করছে, ঐ ইরান ফারূক আযম (রা) কর্তৃক বিজিত হয়েছে। সুতরাং এখানে কি ছিনিয়ে নেয়া ফিদাক বাগানের ক্ষতিপূরণ শেষ হয়নি?

একটি সন্দেহ এবং এর অপনোদন

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট নবী করীম (সা)-এর পরিত্যক্ত জমির মীরাস হিসেবে অংশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন, তখন হযরত আবূ বকর (রা) বলেন, আম্বিয়া কিরামের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেউ ওয়ারিস হয় না। নবীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আল্লাহর পথে সাদাকা হয়ে থাকে।

فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبابكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيت -

(হযরত আবূ বকরের কথায়) "হযরত ফাতিমা (রা) অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং আবূ বকরকে ত্যাগ করে চলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায় থাকেন।"

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) নবী করীম (সা)-এর ইরশাদ لانورث ماتركنا صدقة শ্রবণ করার পর কেন অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হলেন, সন্তুষ্ট হওয়া ও রাসূলের বাণী গ্রহণ করার পরিবর্তে তিনি এর বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করেন। হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) ত নবী বাণীর ভিত্তিতে বাধ্য ও অপারগ ছিলেন।

শী'আদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) ছিলেন নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক। ফলে তাদের মাযহাবের উপর একটি কঠিন প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে আকরাম (সা)-এর ইনতিকালের মাধ্যমে যখন এক হৃদয় বিদারক ঘটনার সৃষ্টি হয় এমন সময় দুনিয়ার একটি সামান্য বস্তুর জন্য বিবাদ সৃষ্টি করা এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বীয় পরম সম্মানিত পিতার শ্বশুর ও স্থলাভিষিক্ত খলীফার সাথে সালাম কালাম বন্ধ করে দেয়া তাঁর নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি কিনা?

এই সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাব প্রদান যেভাবে আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের দায়িত্ব রয়েছে, তেমনিভাবে শী'আ সম্প্রদায়েরও দায়িত্ব রয়েছে। তাদের এ জবাব প্রদান করা উচিত যে, হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) কেন অন্যায়ভাবে রাগ বা অসন্তুষ্ট হলেন? রাফেযীদের মতামত বাতিলের মত খারেজীদের চিন্তাধারার ব্যাপারেও আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এই মত পোষণ করে যে, হয়ত কোন খারেজী হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের মধ্যে এ বল্গাহীন উক্তি করতে পারে যে, নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল সর্বসাধারণের জন্য এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ছিল। এরূপ মুসীবতের সময় প্রথমত মীরাসের দাবি উত্থাপন করা উচিত হয়নি এবং তা হযরত ফাতিমার দুনিয়াবী স্বার্থবিমুখতা ও তাক্ওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। শী'আদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অথচ হযরত আবূ বকর (রা) যখন নবী (সা)-এর বাণী উল্লেখ করলেন তখন তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করা উচিত ছিল। বেদনা ও ক্রোধ প্রকাশের কি অর্থ হতে পারে? এ ঘটনায় হযরত সিদ্দীক আকবরের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না। হযরত ফাতিমার (রা)-এর ধারণা ও দাবি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে। এ ব্যাপারে জবাব প্রদানের জন্য আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ও শী'আ সম্প্রদায়-উভয়েই দায়িত্ব রয়েছে। শী'আ সম্প্রদায় তাদের জবাব নিয়ে চিন্তা করুন। আহ্লি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পক্ষ থেকে আহ্লি বায়তের প্রতি সর্বতোভাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা)-এর সর্বাঙ্গীন পবিত্রতার সপক্ষে মতামত ও যুক্তি পেশ করা হলো।

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের জবাব

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমার (রা) অসন্তুষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে। কোন কোন রিওয়ায়াতের فغضبت فاطمة এবং বুখারী মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে فوجدت فاطمة উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-বুখারী শরীফের ২য় খণ্ডের ৬০৯ পৃষ্ঠায় গাযওয়া খায়বার অধ্যায়ে فوجدت فاطمة على أبى بكر উল্লেখ করা হয়েছে। وجدت শব্দটি যেভাবে غضبت (ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, এমনিভাবে حزنت শব্দের অর্থ (ব্যথিত, বেদনার্ত বা অসন্তুষ্টি ইত্যাদি) বুঝবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) যখন হযরত সিদ্দীক আকবরের নিকট নিজের মীরাসের অংশের দাবি করেন এবং হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) নবী (সা)-এর এ হাদীস তাঁর নিকট বর্ণনা করেন, তখন এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, হযরত ফাতিমা (রা) স্বীয় দাবির কারণে অনুতপ্ত ও দুঃখিত হয়ে থাকতে পারেন। কেননা আম্বিয়া, মুরসালীন এবং কামিল ওলীগণের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, যদি তাদের থেকে সামান্যতম বেইনসাফী অথবা কোন প্রকার ভুলত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহলে তাঁরা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। যেমন ভুল করে হযরত আদম (আ)-এর গম ভক্ষণ করার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, হযরত নূহ্ (আ)-এর পুত্রের মুক্তি ও নাজাতের জন্য দু'আ করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং হযরত মূসা (আ)-এর জনৈক ব্যক্তিকে হত্যা করে অনুতপ্ত হওয়ার ঘটনা স্বয়ং কুরআনুল করীমে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং হযরত ফাতিমা (রা) এ বিষয়ে অনুতপ্ত হয়েছেন যে, আমি অজ্ঞতা সত্ত্বেও সে মীরাসের জন্য দাবি পেশ করলাম। যদি আমি প্রথম থেকেই لانورث ماتركنا صدقة হাদীস সম্পর্কে অবগত হতাম, তাহলে কখনো মীরাসের জন্য দাবি পেশ করতাম না। অতঃপর এই অনুতপ্ত হওয়া থেকেই হযরত ফাতিমার অসুস্থতা আরম্ভ হয়। যার ফলে হযরত সিদ্দীক আকবরের সাথে যোগাযোগ হ্রাস পায় এবং পূর্বের ন্যায় দেখা-সাক্ষাত অব্যাহত থাকেনি। রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের ব্যথাও অন্তর থেকে দূরীভূত হয়নি। তবে কথাবার্তা ও সালাম একেবারেই বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। এরূপ অবস্থায় তিন দিনের অধিক থাকা হারাম। আজীবনের জন্য তো প্রশ্নই আসে না। অবশ্য সবাই এটা অবগত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার মুহরিম ছিলেন না, যার সাথে সর্বদা তাঁর কথাবার্তা ও সালামের সুযোগ হবে এবং এ ঘটনার কারণে তা পরিত্যাগ করা হয়েছে। কেননা মুহরিম ব্যতীত অন্য কারো সাথে বিনা প্রয়োজনে সালাম প্রদান ও কথা বলা জায়িয নয়।

সুতরাং হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা)-এর আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল মূলত এ অনুতাপ, স্বীয় অসুস্থতা ও পিতার ইনতিকালজনিত মর্মবেদনা। বাহ্যিক অবস্থা

পর্যবেক্ষণকারীগণ ধারণা করেছেন যে, হয়ত এ আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণ অসন্তুষ্টি ছিল, ফলে এ বর্ণনাকারীগণ তাদের ধারণা অনুযায়ী غضبت শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথবা নিচের বর্ণনাকারীগণ وجدت এর মূল রিওয়ায়াতের غضبت এর অর্থ মনে করে غضبت শব্দের সাথে روايت بالمعنى বা অর্থটি বর্ণনা করেছেন। মূলত এবং সঠিক রিওয়ায়েত হলো وجدت فاطمة অর্থ حزنت এবং غضبت فاطمة অর্থের রিওয়াতে যা বর্ণনাকারী অসন্তুষ্টি মনে করে স্বীয় ধারণা অনুযায়ী রিওয়ায়েত করেছেন। মূলত ক্রোধ বা অসন্তুষ্টি ছিল না। বরং এই অসন্তোষ ও দুঃখভারক্রান্ত হওয়া ছিল মানবীয় ও স্বভাবজাত দাবী যা তাদের মহত্বের পূর্ণতা প্রমাণ করে এবং সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ীভাবে ব্যথিত ও পেরেশানী হওয়া শানে নবুওয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন–হযরত মূসা ও হারূনের মধ্যে সংঘটিত হয়। এটাকে ঝগড়া বলা যাবে না। এরূপ ঘটতেই পারে এবং এটা খুব দ্রুত দূরীভূত হয়ে যায়। বরং অনেক সময় তা অধিক মহব্বতের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং পূর্বের চেয়ে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. যদি আমরা এটা মেনেও নিই যে, হযরত ফাতিমা (রা) এ বিষয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তবুও এর দ্বারা হযরত সিদ্দীক আকবরের ত্রুটি প্রমাণিত হয় না। সম্ভবত হযরত ফাতিমা (রা) কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে হযরত আবূ বকর (রা)-এর উপর অসন্তুষ্ট হন। কোন খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নবী ও রাসূলগণের মধ্যেও ক্রোধ ও রাগের উদ্রেক হয়ে থাকে। অথচ তাঁরা নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। যেমন হযরত মূসার হযরত হারূনের উপর রাগান্বিত হওয়া কুরআনুল করীমে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত মূসা ও হযরত হারূন যেভাবে নিষ্পাপ ছিলেন, তেমনিভাবে মীরাসের বিষয়ে হযরত ফাতিমা ও হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) উভয়ে নিষ্পাপ ছিলেন।

৩. এতদসত্ত্বেও যদি শী'আ সম্প্রদায় হযরত আবূ বকর (রা)-এর ত্রুটি রয়েছে বলে মনে করে, তাহলে যখন তিনি ভরাক্রান্ত হৃদয়ে হযরত ফাতিমার ঘরে গিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে সম্মত করিয়েছেন, তখন শী'আদেরও সন্তুষ্টও সম্মত হয়ে যাওয়া উচিত। হযরত ফাতিমা (রা) তাদের ধারণা অনুযায়ী নিষ্পাপ। কাজেই নিষ্পাপ ব্যক্তির অনুসরণ করা জরুরী। কিন্তু বিরোধিতা করা জায়েয নয়। হযরত ফাতিমার সম্মত হওয়ার পর যদি কেউ সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন থাকে যে, হযরত ফাতিমা (রা) এরূপ বেদনা ও হৃদয় বিদারক ঘটনার সময় কেন মীরাসের দাবি করলেন। এর জবাব হলো এই যে, এতে ধন সম্পদেরই লোভ ছিল না বরং নবীর বরকত এবং পিতার স্মৃতিচিহ্ন হাসিল করার দৃষ্টিভঙ্গি এতে নিহিত ছিল। এছাড়া হালাল রিযকের অন্বেষণ করা আওলিয়া ও মুত্তাকীগণের তরীকা। কাজেই নবীর পরিত্যক্ত সম্পদের চেয়ে হালাল অন্য কিছুই হতে

পারে না। যাতে কোন প্রকার হারাম বা মাকরূহ থাকার কোন সন্দেহ বা আশংকা নেই। সুতরাং হযরত ফাতিমা (রা) এই ধারণা পোষণ করেন যে, যদি নবী (সা)-এর পরিত্যক্ত সম্পদ আমার হস্তগত হয়, তাহলে হালাল রিযিকের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত হতে পারব এবং নবী (সা)-এর বরকত ও স্মৃতি মনের সান্ত্বনা লাভের উপায় হবে।

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

শী'আ সম্প্রদায় বলে থাকে হযরত সাইয়্যেদা ফাতিমা (রা) হযরত আবূ বকর (রা) উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ فاطمة بضعة منى من اغضبها فقد غضبنى। "ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা, যে ফাতিমাকে অসন্তুষ্ট করবে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো"

সুতরাং এটা অবগত হওয়া উচিত যে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) এর অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা غضب ও اغضاب-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। غضب -র অর্থ ক্রোধান্বিত হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া اغضاب। -এর অর্থ বুঝেশুনে বা স্বজ্ঞানে অন্যকে অসন্তুষ্ট করা। মূলত হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) (মা'আযাল্লাহ) হযরত ফাতিমাকে অসন্তুষ্ট করেননি; বরং তিনি শুধু নবী করীম (সা)-এর নির্দেশ ও বাণী প্রচার করেছেন, পালন করেছেন। হযরত ফাতিমা (রা) উক্ত হাদীস না জানার কারণে হযরত আবূ বকরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। শী'আ সম্প্রদায় বলুন, কোন কারণ ব্যতীত তিনি কেন অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তো তাঁর অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রবক্তা নয়। আমাদের মতে হযরত ফাতিমা (রা) নবী করীমের উক্ত হাদীস অবগত না হওয়ার কারণে মীরাসের দাবি করেছেন, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর হাদীস বর্ণনা করেন তখন এই অন্যায় দাবি উত্থাপন করার কারণে হযরত ফাতিমা (রা) লজ্জিত হলেন, এই লজ্জার কারণে হযরত সিদ্দীক আকবরের সাথে যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পায়। লোকজন এটাকে অসন্তুষ্টি মনে করেছে। নতুবা হযরত আবূ বকর (রা) হযরত ফাতিমার মুহরিম ছিলেন না যার সাথে সর্বদা সালাম-কালাম অব্যাহত থাকবে। অতঃপর তা বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফল অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ হবে। হযরত ফাতিমা (রা)-এর আলাপ একটি বিশেষ প্রয়োজনে ছিল। যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়, তখন সালামের প্রয়োজনও বাকী থাকেনি।

উল্লেখ্য যে, হযরত আলী (রা) সর্বাবস্থায় হযরত আবূ বকরের সাথে ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর পিছনে নামায আদায় করেন। এদিকে হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) বিনয় ও সৌজন্যের খাতিরে হযরত ফাতিমার বাড়ি গমন করেন এবং হযরত ফাতিমা অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা এই আশংকায় তাঁর নিকট ওযর পেশ করেন। ফলে তিনি হযরত সাইয়্যেদাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করে বাড়ি ফিরে আসেন। মা'আযাল্লাহ! হযরত আবূ বকর

(রা) খিলাফত ও আমীরের পদের জন্য আগ্রহী ছিলেন না। যার ফলে হযরত ফাতিমার খোঁজ-খবর না নেয়ার মানসিকতা হযরত সিদ্দীক আকবরের অন্তরে কখনো সৃষ্টি হয়নি; বরং নবী (সা)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমার অসন্তুষ্টির আশংকা করে তিনি অস্থির হয়ে উঠেন এবং তাঁর বাড়িতে গমন করে তাঁকে কথাবার্তা ও আলোচনার মাধ্যমে রাযী ও সন্তুষ্ট করেন।

শী'আ সম্প্রদায় যদি এ আবেদনকে যথেষ্ট মনে না করেন এবং হযরত আবূ বকরকে অভিযুক্ত করেন, তাহলে তাদের নিকট আরয হলো এই যে, হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) হযরত ফাতিমাকে কতটুকু অসন্তুষ্ট করেছেন। বরং হযরত আলী (রা) যখন আবূ জাহলের কন্যাকে বিবাহ করার কামনা ও ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন হযরত ফাতিমাকে ততোধিক অসন্তুষ্ট করেন। যার ফলে রাসূল (সা) খুতবা প্রদান করে বলেন ঃ فاطمة بضعة منى من اغضبها فقد اغضبنى সুতরাং শী'আগণ বলুন, হযরত আলী (রা) কিসের উপর ভিত্তি করে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে হযরত আবূ বকরের নিকট ইরশাদে নববী لانورث ماتركنا صدقة দলীল বিদ্যমান ছিল। কিন্তু হযরত আলীর নিকট এ ধরনের কোন দলীল বিদ্যমান ছিল না; বরং পারিবারিক বিষয়ে প্রায়ই হযরত আলী ও হযরত ফাতিমার মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ ও মতানৈক্য সৃষ্টি হতো। ফলে একদিন পরস্পর মনোমালিন্যের কারণে হযরত আলী (রা) ক্রোধান্বিত হয়ে মসজিদে নব্বীতে গিয়ে শুয়ে থাকেন। নবী (সা) এ কারণে হযরত আলীকে আবূ তুরাব (ابوتراب) উপাধিতে ভূষিত করেন।

নবী করীম (সা) -এর মীরাস

হযরত সিদ্দীক আকবর, হযরত ফারূক আযম, হযরত উসমান গণী, হযরত আলী মুর্তাযা এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) ইরশাদ করেন ঃ "আমরা অর্থাৎ নবীগণের সম্পদে কোন মীরাস হয় না। আমরা যা কিছু পরিত্যাগ করে যাব, ঐ সমস্ত আল্লাহর পথে সাদাকা ও কল্যাণের কাজে ব্যবহৃত হবে।"

এতে হিকমত হলো এই যে,

১. আল্লাহপাকের সৃষ্টির সবাই যাতে এটা অবগত হয়ে যায় যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সত্যের দাওয়াত ও দ্বীনের তাবলীগের জন্য যা কিছু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার, তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্য করেছেন। এতে দুনিয়ার কোন বস্তু পাওয়ার কামনা ছিলনা। এমনকি এতে সন্তান-সন্ততির কোন অংশ নেই।

২. আম্বিয়ায়ে কিরাম হলেন উম্মতের জন্য রূহানী পিতা। সুতরাং তাদের সম্পদ সমস্ত উম্মতের জন্য ওয়াকফ হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্য তা নির্দিষ্ট হবে না।

৩. আম্বিয়ায়ে কিরাম সর্বদা মহান আল্লাহর দরবারে হাযির থাকেন এবং প্রকৃত মালিকের ক্ষমতা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান থাকে। এজন্য

নবীগণ নিজেকে কোন বস্তুর মালিক মনে করেন না। যেমন কোন বুযর্গ বলেছেন ঃ الانبياء لايشهدون ملكا مع الله। "নবীগণ আল্লাহর সামনে অন্য কারো মালিকানা দেখতে পায় না"

সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে প্রকৃত মালিকের (আল্লাহ তা'আলার) মালিকানা যেহেতু গোপন থাকে, ফলে তারা নিজেকে কৃত্রিম মালিক মনে করে। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজদেরকে কৃত্রিম বা রূপক হিসেবেও মালিক মনে করেন না। যে বস্তু তাদের হাতে আসে তা আল্লাহ তা'আলারই মনে করেন এবং এ ধারণা পোষণ করেন যে, আমরা আল্লাহর তা'আলার দস্তরখানে বসে আছি। এর থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য আমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ কারণে এ সমস্ত মালের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং ইনতিকালের পর ঐ মাল ও সম্পদে মীরাস ও ওসীয়্যত প্রযোজ্য হয় না।

হায়াতুন্নবী (সা)

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হলো এই যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) ইনতিকালের পর তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন এবং নামায ও ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের এই কবরের জীবন সম্পর্কে যদিও আমাদের কোন অনুভূতি বা ধারণা নেই কিন্তু নিঃসন্দেহে এটা হলো দৈহিক জীবন। কেননা আত্মিক জীবন তো সাধারণ মু'মিনদের, এমনকি কাফিরদেরও থাকে।

সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত আছে যে, কবরে মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করেন কিন্তু জবাব দিতে পারেন না। নবী করীম (সা) এর বদর যুদ্ধের শহীদগণের উদ্দেশ্যে সম্বোধন বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ

مامن أحد يمر بقبر اخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه الاعرفه ورد عليه السلام - رواه ابن عبد البر وصححه أبو محمد عبد الحق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه فى قبره رواه أحمد وغيره -

"যখন কোন ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইয়ের কবরের নিকট গিয়ে গমন করার সময় তার উপর সালাম পেশ করেন তখন ঐ মৃত ব্যক্তি তাকে চিনতে পারে এবং তার সালমের জবাব দিয়ে থাকে"। হাকিম ইবন আবদুল বার এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। নবী করীম (সা) আরো বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে চিনতে পারে যে তাকে গোসল

দিয়ে থাকে, তার খাট উঠিয়ে থাকে এবং কবরের মধ্যে দাফন করে থাকে।" ইমাম আহমাদ (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (যারকানী. ৫ খ, পৃ. ৩৩৪)

মুসনাদে আবূ ইয়ালায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে ঃ الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون। "আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত ও নামাযে নিমগ্ন রয়েছেন।"

শায়খ জালালউদ্দিন সুয়ূতী (র) এ হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং আল্লামা মুনাভী ফয়যুল কাদীর (শারহে জামি' সাগীর, ৩ খ. পৃ. ১৮৪) উল্লেখ করেন যে, এ হাদীস সহীহ। আল্লামা সুয়ূতী (র) হায়াতে আম্বিয়া সম্পর্কে বলেছেন, এ সমস্ত হাদীস মুতাওয়াতির স্তরে পৌছেছে এবং أبناء الاذكياء بحياة الأنبياء নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

حيات النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الادلة ذلك وتواترت به الاخبار الدالة على ذالك ـ

"নবী করীম (সা)-এর পবিত্র রওজায়ে জীবিত থাকা এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের তাঁদের কবরে জীবিত থাকা অকাট্য ও নিশ্চিত ইলম দ্বারা জানা যায়, কেননা হায়াতে আম্বিয়া দলীল ও হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা প্রমাণিত।"

এ হাদীস দ্বারা শুধু আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এটা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, যেভাবে এ দুনিয়ার জীবনে আম্বিয়ায়ে কিরাম ইবাদতে মগ্ন থাকেন, তেমনিভাবে কবরেও ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছেন। বালাগাতের নীতি হলো এই যে, বাক্যের মধ্যে সর্বশেষ শব্দটিকে নিয়েই বাক্য আবর্তিত হয়ে থাকে। সুতরাং الانبياء أحياء فى قبورهم يصلون। এর মধ্যে উদ্দেশ্য হলো কবরে নবীগণের সালাত ও ইবাদতের কথা বর্ণনা করা। আসল হায়াত ফয়সালাকৃত বা পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। يصلون শব্দের পূর্বে ভূমিকা হিসেবে হায়াতের উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এই যে, নবীগণের পবিত্র দেহ যদিও এই জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু দেহ পূর্বের মতই ইবাদতে মগ্ন রয়েছে। আমলসমূহ পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রয়েছে। আমলসমূহের মধ্যে নামাযের বিষয় এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, ঈমানের পরই নামাযের স্থান এবং নামায আম্বিয়ায়ে কিরামের চোখ শীতলকারী।

মোটকথা নবীগণের হায়াত শুধু আত্মিক নয়, বরং দৈহিকভাবেই তাঁরা কবরে জীবিত। কেননা মৃত্যুর পর আত্মিক হায়াত, শ্রবণ ও অনুভূতি শুধু আম্বিয়ায়ে কিরামের সাথেই বিশিষ্ট নয় বরং সমস্ত মানবজাতি এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, নবী কারীম (সা) ইরশাদ করেন, জুমু'আর দিন তোমরা অধিক পরিমাণে আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমাদের এই দরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়। সাহাবাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ঃ

كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون بليت فقال ان الله حرم على الارض ان تأكل أجساد الأنبياء ـ أخرجه أبوداؤد وقال البيهقى له شواهد وقال العلامة القارى رواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وصححه وقال النووى اسناده صحيح ـ

"কিভাবে আমাদের দরূদ ও সালাম আপনার নিকট পেশ করা হবে। অথচ ইনতিকালের পর আপনার পবিত্র দেহ মাটির সাথে মিশে যাবে। তখন নবী করীম (সা) বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ গ্রাস করা মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন।" আবূ দাঊদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (মিরকাত, ২ খ, পৃ.২১০)

সাহাবায়ে কিরামের এই প্রশ্ন ও নবী করীম (সা)-এর জবাব দ্বারা এটাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এখানে হায়াত দ্বারা দৈহিক হায়াতকে বুঝানো হয়েছে, শুধু রূহানী হায়াত উদ্দেশ্য নয়। যদি একমাত্র পবিত্র রূহের উপর দরূদ পেশ করা উদ্দেশ্য হত, তা হলে সাহাবাগণের এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে যেত। কারণ শুধু রূহের উপর আমল পেশ করার জন্য দেহের অস্তিত্ব জরুরী নয়, তা হলে রাসূলে করীম (সা) জবাবে এটা বলতেন যে, দেহ নিয়ে তোমাদের প্রশ্ন করার কোন প্রয়োজন নেই। তোমাদের জন্য দরূদ ও সালাম আমার রূহের উপর পেশ করা হবে। শুধু রূহের উপর আমল পেশ করা নবীগণের সাথে নির্দিষ্ট নয়, বরং সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, মৃত ব্যক্তি সালাম ও কথাবার্তা শ্রবণ করে থাকে। কোন কোন দিন তাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের আমল পেশ করা হয়। যেমন আল্লামা সুয়ূতী (র) রচিত "শারহিস- সুদূর ফী আহওয়ালিল মাওতা ওয়াল কুবূর" (شرح الصدور فى أحوال الموتى والقبور) নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দেহের সাথে রূহের মিলিত অবস্থায় কবরে উম্মাতের আমল পেশ হওয়া একমাত্র নবী করীম (সা)-এর বৈশিষ্ট্য। (শারহে মিশকাত, আল্লামা কারী, ২ খ, পৃ. ২০৯)

সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফে হযরত আবুদ- দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন ঃ বিশেষভাবে জুমু'আর দিন তোমরা আমার উপর অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ কর। জুমু'আর দিন হলো পেশ করা বা হাযিরার দিন। এই দিন অসংখ্য ফিরিশতা হাযির হয়ে থাকে। হযরত আবুদ- দারদা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল!

وبعد الموت قال ان الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبى الله حى يرزق رواه ابن ماجه قال الدميرى رجاله ثقات كذا فى فيض القدير -

"ইনতিকালের পরও কি আপনার উপর দরূদ পাঠ করা হবে? তখন নবী করীম (সা) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মাটির উপর আম্বিয়া কিরামের দেহ গ্রাস করা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং প্রত্যেক নবী কবরের মধ্যে জীবিত আছেন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়।" (ফয়যুল কাদীর, ২ খ. পৃ. ৮৭)

যারকানী বলেছেন, এ হাদীস কয়েকজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী মারফূ' হিসেবে হযরত আবুদ-দারদা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে মাজাহ শরীফে তা বর্ণিত হয়েছে। (যারকানী, ৫ খ, পৃ. ৩৩৬)

শায়খ তাকীউদ্দিন (র) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত উমর ফারূক (রা) মসজিদে নববীতে স্বর উঁচু করা অপসন্দ করতেন এবং যে ব্যক্তি মসজিদে নববীতে উঁচু স্বরে কথা বলত, তাকে সাবধান করে বলতেন, "তোমরা উঁচু স্বরে কথা বলে রাসূলে করীম (সা)-কে পবিত্র রওযায় কষ্ট দিয়েছ।" এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর মতে নবী করীম রওযা শরীফে পবিত্র দেহ ও রূহের সমন্বয়ে জীবিত আছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لاَ تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِىِّ وَلاَ تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ الاية

"হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা পরস্পরের সাথে যেভাবে উঁচু স্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উঁচু স্বরে কথা বলো না ...।" (সূরা হুজুরাত)

এই দুনিয়ার হায়াতেও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি কবরের জীবনেও তাঁর সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।

মসজিদে নববীর সংলগ্ন কোথাও যদি পেরেক বা অন্য কিছু লাগানোর আওয়ায নবী করীম (সা)-এর হুজরা পর্যন্ত পৌঁছত, তখন হযরত আয়েশা (রা) সাথে সাথে বলতেনঃ

لاتؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেরেকের আওয়ায দ্বারা কষ্ট দিও না।"

শায়খ সুবকী (র) বর্ণনা করেন সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম এবং পূর্ববর্তী নেককারগণের আমল ছিল এই যে, নবী (সা)-এর আদব ও সম্মানার্থে মসজিদে নববীতে স্বর উঁচু করতেন না। যেমন আল্লাহ পাক বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى

"যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাক্ওয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৩)

একবার হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আদবের সাথে হাঁটু পেতে বসে আরয করলেন ঃ ادنو منك يارسول الله হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আপনার নিকটবর্তী হয়ে বসব? তিনি অনুমতি প্রদান করেন। হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে ক্ষীণ আওয়াযে ওহী পেশ করেন।

এমনিভাবে ইনতিকালের পূর্বে যখন মালাকুল মাউত নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হলেন, তখন আদব ও সম্মানার্থে ক্ষীণ স্বরে রূহ কবয করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُوْنَ

"যারা ঘরের বাহির থেকে আপনাকে উঁচু স্বরে আহ্বান করে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।" (সূরা হুজুরাত ঃ ৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا بلغته

"যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দরূদ পাঠ করে আমি স্বয়ং তা শুনে থাকি এবং যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উপর দরূপ পাঠ করে তা হলে ফিরিশতার মাধ্যমে তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।"

সুতরাং এখানে নিকটবর্তী ও দূরের দৈহিকভাবে জীবিত থাকার সূত্রে রূহানী হায়াতের সূত্রে নয়।

আল্লামা মুনাভী (র) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন ঃ

وذالك لان لروحه تعلقا بمقر بدنه الشريف وحرام على الارض ان تأكل أجساد الأنبياء فحاله كحال النائم الذى ترقى روحه بحسب قواها الى ماشاء الله لم بحسب قدره عند الله فى الملكوت الاعلى ولها بالبدن تعلق ولذا أخبر بسماعه صلاة المصلى عليه عند قبره وذا لايبنافيه مامر لى خبره حيثما كنتم فصلوا علىَّ من ان معناه لاتتكلفوا المعاودة الى قبرى فان صلواتكم تبلغنى حيث كنتم ما ذالك

الا لان الصلاة فى الحضور مشافهة أفضل من الغيبة لكن المنهى عنه هو الاعتياد الرافع للحشمة المخالف لكمال الصية والاجلال ـ

"এর কারণ হলো এই যে, নবী (সা)-এর পবিত্র রূহ্ তাঁর পবিত্র দেহের সাথে সমন্বিতভাবে কবরে অবস্থান করে। আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ গ্রাস করা মাটির উপর প্রাকৃতিকভাবেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র রওযায় রাসূল (সা)-এর অবস্থা একজন শায়িত ব্যক্তির অবস্থার মত। তাঁর রূহের ঊর্ধ্বগমন হয়ে থাকে। আল্লাহর দরবারে তার মর্তবা অনুযায়ী আলমে মালাকূতে ঊর্ধ্বগমন হয়ে থাকে। এতদসত্ত্বেও দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

এ কারণেই নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার উপর দরূদ ও সালাম পেশ করবে, আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করব। এ হাদীস ঐ হাদীসের বিরোধী নয় যাতে বলা হয়েছে, তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ প্রেরণ কর। এ হাদীসের অর্থ হলো এই যে, বার বার আমার কবরের নিকট হাযির হওয়ার জন্য কষ্ট করো না। তোমাদের দরূদ ও সালাম যে কোন স্থান থেকে আমার নিকট পৌঁছানো হয়"।[১]

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রওযা পাকে উপস্থিত হয়ে দরূদ ও সালাম পেশ করা দূর থেকে সালাম ও দরূদ পেশ করা থেকে উত্তম। অবশ্য খুব ঘন ঘন হাযির হওয়ার কারণে মহানবীর দরবার বা রওযা পাকের মর্যাদার অনুভূতি হ্রাস পাওয়ার আশংকায় তা নিষেধ করা হয়েছে।

মুসনাদে বায্যারে উত্তম সনদের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) থেকে মারফূ' হাদীস বর্ণিত, উম্মতের আমলসমূহ নবী করীম (সা)-এর নিকট পেশ করা হয় এবং মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা হয়।

এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, নবী করীম (সা) এবং অন্যান্য নবীগণ কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের পবিত্র দেহ কবরে বিনষ্ট হয় না এবং ইনতিকালের পর তাঁদের ইবাদত বন্ধ হয় না; বরং তাঁরা নামায আদায় করেন, হজ্জ পালন করেন, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে রিযিক প্রদান করা হয়। পবিত্র রওযায় গিয়ে যদি কেউ সালাম পেশ করেন তা হলে স্বয়ং তিনি শুনেন এবং সালামের জবাব প্রদান করেন। উম্মাতের আমলসমূহ কবরেই নবী (সা)-এর নিকট পেশ করা হয়। এ সমস্ত বিষয় অকাট্য দলীল হিসেবে প্রমাণ করে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত হলো দৈহিক এবং পবিত্র দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক বিদ্যমান। মোটকথা আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, রাসূল (সা)-এর ইনতিকালের পর উম্মাতগণ তাঁর পবিত্র দেহ কবরে দাফন

১. ফয়যুল কাদীর, ৬ খ, পৃ. ১৭০।

করেছেন এবং শরী'আতে পবিত্র রওযা যিয়ারতের তাগিদ করেছে। কবরেই নবী (সা) নামায আদায় করেন এবং আল্লাহ পাকের পাকের পক্ষ থেকে কবরেই রিযক প্রদান করা হয়। পবিত্র দেহ কবরে দাফন করার বিষয়টি প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা প্রমাণিত। যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই এবং পবিত্র দেহ কবর থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। হাদীস মুতাওয়াতির দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের যে হায়াত প্রমাণিত, তা কবরের হায়াত, আসমানের হায়াত নয়।[১]

কবরে পবিত্র দেহসমূহ আমানত রাখা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত হলো দৈহিক এবং কবরে রূহের মূল সম্পর্ক হলো দেহের সাথে। বস্তুত এ সমস্ত রিওয়ায়াতের দ্বারা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ইনতিকালের পর নবী করীম (সা)-এর প্রকৃত অবস্থান[২] হলো পবিত্র কবর, যেখানে নবী (সা)-এর পবিত্র দেহ সংরক্ষিত কিন্তু আসমানে নয়।

ঐ স্থানেই পবিত্র দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক রয়েছে এবং সেখানেই রাসূল (সা)-এর নিকট উম্মাতের আমলসমূহ পেশ করা হয়। পক্ষান্তরে ঊর্ধ্বজগতের সাথেও নবী (সা)-এর পবিত্র রূহের সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় অনুযায়ী যদি নবী (সা) এর পবিত্র রূহ ঊর্ধ্ব জগত এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করে, তা হলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলার এ ক্ষমতা রয়েছে যে, তাঁর মনোনীত বান্দাকে যেখানে ইচ্ছা পরিভ্রমণ করাবেন। পরকালের বিষয় ও দুনিয়ার অবস্থার সাথে কিয়াস করা বোকামী ও অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) শারহে শিফায়[৩] উল্লেখ করেন।

المعتقد المعتمد أنه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره كسائر الأنبياء فى قبورهم وهم أحياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوى والسفلى كما كانوا فى الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عراشيون وباعتبار القالب فرشيون والله سبحانه أعلم بأحوال أرباب الكمال هذا شرح شفاء ـ

"পূর্ববর্তী ওলামায়ে কিরাম বুযুর্গদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো এই যে, নবী করীম (সা) স্বীয় কবরে জীবিত আছেন। যেমন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং একই সময় ঊর্ধ্বজগত ও নিম্নজগত (علم علوى وعالم سفلى) উভয়

১. জযবুল কুলূব, পৃ. ২০৪।

২. قال الحافظ فى الفتح صفحـــ ٣٢٩ج٣ واما أجسادهم فهى فى القبور، فتح البارى باب التلبيه اذا انحدر فى الوادى ـ

৩. শারহে শিফা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২।

জগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে– যেমন দুনিয়ার জীবনে উভয়ের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ইনতিকালের পরও তেমনিভাবে উভয় জগতের সাথে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। নবীগণ কাল্‌ব -এর ভিত্তিতে আরশের সাথে সম্পর্কিত এবং দেহের ভিত্তিতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা নবীগণের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।"

درنیابد حال پخته هیچ خام * پس سخن کوتاه باید والسلام

"পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত মনীষীদের অনেক বাস্তব অবস্থা অপরিপক্করা বুঝে উঠতে পারে না, তাই সালাম দিয়ে কথা সংক্ষিপ্ত করা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।"

আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) নিঃসন্দেহে তাঁদের কবরে জীবিত আছেন এবং নামায ও ইবাদতে নিমগ্ন আছেন। কিন্তু পবিত্র মি'রাজের সময় নবী করীম (সা) এর সাথে মোলাকাতের উদ্দেশ্যে মসজিদে আক্‌সায় একত্র করা হয় এবং যাকে ইচ্ছা আকাশে আহ্বান করেন। এটাই সর্বজন স্বীকৃত যে, নবীগণের এ মোলাকাত রূহ ও দেহের সমন্বয়ে হয়েছে। যেমন শায়খ নুরুল হক দেহলভী (র) তায়সীরুল কারী[১] শারহে বুখারীতে[২] উল্লেখ করেছেন,[৩]। এটাও হতে পারে যে, লাইলাতুল মি'রাজে নবীগণের দেহ মুবারক কবরে অবস্থান করে এবং মসজিদে আকসায় নবী (সা)-এর সাথে মোলাকাতের জন্য তাঁদের পবিত্র রূহকে তাঁদের মূল দেহের আকৃতি স্বরূপ তৈরি করে একত্র করা হয়। কিন্তু সর্বজন স্বীকৃত বিষয় হলো এই যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম কবরে যে দেহ নিয়ে সংরক্ষিত রয়েছেন, দুনিয়ার ঐ দেহ নিয়ে মি'রাজে মোলাকাতের জন্য একত্রিত হয়েছেন। মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার দৃষ্টিতে আত্মিক, দৈহিক, দুনিয়া ও আসমানের সর্বপ্রকার মোলাকাত একই সমান। শুধু প্রাকৃতিক ও বাহ্যিকভাবে অসম্ভব মনে হওয়ার কারণে নবী করীম (সা)-এর হাদীসের বিরোধিতা করা অজ্ঞতা ও দীনের পরিপন্থি ধারণার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত প্রকৃত রহস্য আল্লাহ তা'আলা ভাল অবগত আছেন যে, কি অবস্থা ও কোন মর্যাদা সহকারে মোলাকাত হয়েছিল।

হাদীসে বর্ণিত আছে, মু'মিনদের কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয় এবং বেহেশতের বাগানে পরিণত করা হয়। সুতরাং পবিত্র রওযাকে যদি ফিরদাউস সদৃশ্য এবং

---

১. তায়সীরুল কারী, ২ খ, পৃ, ৩১২।

২. প্রাগুক্ত। ২ খ. পৃ. ১৪২,

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খণ্ডে হাফিয ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন ঃ

واشتشكل روية الأنبياء فى السموات مع ان أجسادهم مستقرة فى قبوره
بالارض واجيب بان أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم او احضرت اجسادهم
لملاقاة النبى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفا وتكريما ويويده لاحديث
عبد الرحمن بن هاسم عن أنس ففيه وبعث له ادم ومن دونه من الأنبياء ـ

ঊর্ধ্বজগতে পরিণত করা হয়, তা হলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। হযরত উসমান (রা)-এর নিকট অবরোধের সময় আরয করা হয় যে, আপনি সিরিয়া গমন করুন, যাতে আপনি সেখানে এই ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকতে পারেন। তখন তিনি বললেন, আমি হিজরতের স্থান (মদীনা মুনাওয়ারা) এবং নবী (সা)-এর নৈকট্য ও সাহচর্য ত্যাগ করতে পারব না।

একবার হযরত আলী (রা) নিজের বাড়ির কপাট তৈরি করার পূর্বে এই নির্দেশ প্রদান করেন যে, মদীনা থেকে দূরে গিয়ে কপাট তৈরি কর। যাতে এগুলো তৈরির শব্দ মসজিদে নববীতে না পৌঁছে এবং এ শব্দের কারণে যাতে কষ্ট না হয়। (যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ২ খ. পৃ. ৩০৪; শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৭৩)

আবূ নু'আঈম ও অন্যান্য গ্রন্থকার হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যেব থেকে রিওয়ায়াত করেন, যে সময় হাররার ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন মসজিদে নববীতে আমি ব্যতীত কেউ ছিল না। যখন নামাযের সময় উপস্থিত হতো তখন নামাযের আযান হয়নি। আমি পবিত্র রওযা থেকে আযান শুনে নামায আদায় করেছি। (যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৫ খ, পৃ. ৩৩২)

এ ঘটনার দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, রূহ মুবারক ঐ দেহের সাথে সম্পর্ক রয়েছে যা রওয়ায়ে আকদাসে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সাইয়্যেদ সামহুদী 'ওফাউল ওফা' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৪০৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ

وأما ادلة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الابدان كحالة الدينا مع الاستغناء عن الغذاء ومع قوة النحوذ فى العالم وقد اوضحنا المسئلة فى كتابنا المسمى بالوفا لما لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم -

"আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত সম্পর্কে সমস্ত দলীলের দাবি হলো এই যে, নবীগণ কবরে তাঁদের পবিত্র দেহের সাথেই জীবিত আছেন যেভাবে দুনিয়ায় দেহের সাথে জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ নবী (সা)-এর কবরের জীবন দৈহিক জীবন হওয়ার মধ্যে দুনিয়ার জীবনের সাদৃশ রয়েছে। পার্থক্য হলো এই যে, কবরের জীবনে দৈহিক জীবন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পানাহার থেকে মুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা দান করেছেন।"

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈদের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমস্ত আলিম, নেককার ও মু'মিন ব্যক্তিদের মধ্যে এ ধারা চলে আসছে যে, যদি কেউ মদীনা শরীফে নবী করীম (সা)-এর যিয়ারতে গমন করে, তখন তাঁর মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর খেদমতে সালাম পেশ করে থাকে। উম্মাতে মুহাম্মদীর মধ্যে অনেক আওলিয়ায়ে কিরাম রয়েছেন যাঁরা রাসূল (সা)-এর রওযা মুবারকে সালাম পেশ করেন এবং রওযা থেকে

ওয়া আলাইকাস সালাম-এর আওয়ায নিজ কানে শ্রবণ করে থাকেন। (ফায়যুল কাদীর ২ খ. পৃ. ৪৭৯)

جان می وهم در آرزو اے قاصد آخر بازگو
در مجلس آن نازنمن حرفے كه از نامی رود

"(নবী প্রেমে) আশায় আশায় জীবন শেষের পথে, হে বাহক পথিক! অবশ্যই পৌছাবে নবী দরবারে আমার আবেদন (সালাম) এ সব স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে (কিভাবে) আমাদের পক্ষে সমালোচনা ঠিক হতে পারে।"

এটা এ বিষয়ের দলীল ও প্রমাণ বহন করে যে, কবরে পবিত্র দেহের সাথে রূহ মুবারকের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সেখানে সালাম পেশ করা হয় এবং সেখান থেকে সালামের জবাব শ্রবণ করা যায়।

একটি সন্দেহ ও এর জবাব

কুরআনুল করীমে নবী (সা)-এর ইনতিকাল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ 'নিশ্চয়ই আপনিও মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।" (সূরা যুমার ঃ ৩০)

রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ انی رجل مقبوض "নিশ্চয়ই আমাকে কবয করা হবে।" হযরত সিদ্দীক আকবর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের দিন তাঁর খুতবায় বলেন ঃ فان محمداً قد مات "অতঃপর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সা) ইনতিকাল করেছেন।" এ সংবাদ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং ইনতিকাল সম্পর্কে এ সমস্ত দলীল থাকা সত্ত্বেও হায়াতুন্নবীর অর্থ কি হতে পারে?

জবাব ঃ আল্লাহ তা'আলার অকাট্যবাণী ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ "জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী"। (সূরা আনকাবূত ঃ ৫৭)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী (সা) কিছু সময়ের জন্য মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা)-কে জীবিত করেন এবং তিনি পবিত্র রওযায় দৈহিকভাবে জীবিত রয়েছেন। নবী করীম (সা)-এর পবিত্র দেহ গ্রাস করা আল্লাহ পাক মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন। তাঁর এ হায়াত, শহীদগণের হায়াতের চেয়ে অনেক উত্তম। (শারহে মাওয়াহিব, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৩; মাদারিজুন নবুওয়াত, ১ খ. পৃ. ১৬৬, ৫ম অধ্যায়, নবী (সা)-এর ফযীলতের বর্ণনা)।

ইমাম বায়হাকী উল্লেখ করেন ঃ

قال الامام البيهقى فى كتاب الاعتقاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت اليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء

"ইমাম বায়হাকী (র) 'কিতাবুল ই'তিকাদে' উল্লেখ করেন, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের রূহ্ একবার কবয করার পর তাঁদের রূহ পুনরায় তাঁদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। অতঃপর নবীগণ আল্লাহপাকের নিকট শহীদগণের মত, বরং তাঁদের চেয়ে উঁচু মর্যাদা নিয়ে কবরে জীবিত আছেন।" (ওফাউল ওফা, ২ খ, পৃ. ৪০৬)

শহীদগণের হায়াত সম্পর্কে আল্লামা আলূসী (র) রূহুল মা'আনী গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন ঃ

واختلف فى هذه الحياة فذهب كثير من الصلف الى انها حقيقة بالروح والجسد ولكنا لاندركها فى هذه النشأة استدلوا بسياق قوله تعالى عندربهم يرزقون وبان الحياة الروحانية التى ليست بالجسد ليست من حواصهم فلايكون لهم امتياز بذلك على من عداهم وذهب البعض الى انها روحانية -

"শহীদগণের হায়াতের হাকীকত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। পূর্ববর্তী অধিকাংশ আলিমগণের মত হলো এই যে, দেহ ও রূহের সমন্বয়ে গঠিত হলো এই হায়াত। কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে পারি না। দলীল হিসেবে তারা পেশ করেছেন আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ بَلْ اَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ 'বরং জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) প্রকাশ থাকে যে, রিযিক তো দেহের জন্য প্রয়োজন। রূহের হায়াত শহীদগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়। মু'মিন হোক অথবা কাফির রূহানী হায়াত সমস্ত মুর্দার মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং আয়াত بَلْ اَحْيَاءُ দ্বারা দৈহিক হায়াত উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো রূহানী হায়াত। অতঃপর শহীদগণের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কি? অথচ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শহীদগণের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট এবং অন্যদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। প্রকাশ থাকে যে, ঐ বৈশিষ্ট্য হলো দৈহিক হায়াত। কোন কোন আলিমের মতে, শহীদগণের হায়াত হলো রূহানী।[১]

সুতরাং শহীদগণের হায়াত যেখানে দৈহিক, সেখানে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম যাঁরা শহীদগণের চেয়ে অনেক উত্তম ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তাঁদের হায়াত অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই দৈহিক হবে।

---

১. قال السيوطى وقل الاوقد جمع مع النبوة وصف الشهادة فيدخلون فى عموم قوله تعالى - ولاتحسبن الذين قتلوا الاية - زرقانى صفحـ٣٣٢ ج٥

আল্লামা সুবকী (র) বলেন, নবীগণের চেয়ে উঁচু মর্যাদা লাভ করা শহীদগণের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া শহীদগণের এ মর্যাদা লাভ করা (দৈহিক হায়াত) নবীগণের শরী'আত ও মিল্লাতের একামতের জন্য জীবন উৎসর্গের কারণে হাসিল হয়েছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যারা আল্লাহর পক্ষে জিহাদ করবে এবং শাহাদাত বরণ করবে, এই সমস্ত শহীদের মত সাওয়াব নবী করীম (সা)-এর আমলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হবে। নবী (সা)-এর মর্যাদা এ সমস্ত শহীদের চেয়ে হায়াতের দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদা-সম্পন্ন হবে। কেননা দীনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা ও স্থাপনকারী হলো নবী (সা) তাই নবী (সা)-এর একক হায়াত দুনিয়ার সমস্ত শহীদগণের হায়াতের চেয়ে অধিক ক্ষমতা ও উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন হবে (শিফাউস সিকাম, পৃ. ১৪০) এ ছাড়া নবী করীম (সা) শহীদও ছিলেন।

সুতরাং হযরত শায়খ জালালউদ্দীন সূয়ুতী (র) বলেন, খুব কম নবীই এরূপ ছিলেন, যেখানে নবূওয়াতের মর্যাদা শাহাদাতের মর্যাদার সাথে একত্র জমা করা হয়নি। কাজেই আম্বিয়ায়ে কিরাম নবী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবিত এবং শহীদ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেও জীবিত। কেননা আল্লাহ পাকের বাণী ঃ

وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"যারা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেছে, তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯) এর আওতার অন্তর্ভুক্ত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শাহাদাতের মর্যাদা ও অবস্থায় ইনতিকাল করেছেন। কেননা তিনি ঐ বিষের ক্রিয়ায় ইনতিকাল করেছেন যা ইয়াহূদীরা খায়বারে, তাঁকে প্রয়োগ করেছিল। (বুখারী)

أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقى عن ابن مسعود قال لان احلف تسعا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا احب الى من ان احلف واحده انه لم يقتل وذالك ان الله اتخذه نبيا واتخذه شهيدا -(১)

"ইমাম আহমাদ, আবূ ইয়ালা, তাবারানী, হাকিম এবং বায়হাকী রিওয়ায়াত করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, আমি ন' বার এ শপথ করব যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শাহাদাত বরণ করেছেন। এটা উত্তম এর থেকে যে, আমি একবার এই শপথ করব যে, নবী করীম (সা) শাহাদাত বরণ করেন নি। এর কারণ হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা নবী (সা) কে নবীও মনোনীত করেছেন এবং শহীদের মর্যাদাও দান করেছেন।

১. যুরকানী, ৫ খ, পৃ. ৩৩২।

বরং নবী (সা) হলেন 'সাইয়্যেদুশ শুহাদা'[১] বা শহীদগণের নেতা। কেননা সমস্ত শহীদের আমল নবী (সা)-এর আমল নামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং নবী করীম (সা)-এর হায়াত সমস্ত শহীদের হায়াত থেকে উত্তম ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লামা শিহাব খাফাজী (র) বলেন ঃ

الأنبياء والشهداء أحياء وحياة الأنبياء أقوى اذا لم يسلط عليهم الارض فهم كالنائمين والنائم لايسمع ولاينطق حتى يتبه حاشيه حياة الأنبياء للبيهقى -

"আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং শহীদগণ উভয়ই তাঁদের কবরে জীবিত কিন্তু নবীগণের হায়াত শহীদগণের হায়াত থেকে অনেক উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন এবং নবীগণের পবিত্র দেহ গ্রাস করার ক্ষমতা মাটিকে দেয়া হয়নি। আম্বিয়াকে কিরামের পবিত্র দেহ কবরে, যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। তাঁদের অবস্থা শয়নকারীদের মত। যেমন শয়নকারী নিদ্রিত অবস্থায় জবাব প্রদানে অক্ষম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দিকে দৃষ্টি না করে।"

হায়াতুন্নবী (সা) সম্পর্কে হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবীর সমাধান ও সমন্বয় সূচক বক্তব্য

আহলি সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত রয়েছেন। তাঁদের পবিত্র দেহ মাটির যে কোন ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিরাপদ রয়েছে এবং কবরে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন রয়েছেন। আরব-অনারবের দার্শনিকবৃন্দ, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, আওলিয়া ও আরেফীন এ বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষদিকে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও বুযর্গ হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) হায়াতুন্নবী (সা)-এর উপর 'আবে হায়াত' শীর্ষক একটি পৃথক গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, মা'রিফাত ও বিস্ময়কর তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ এবং اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এর আলোকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন, হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে।

---

১. সাইয়্যেদ সামহূদী (র) وفاء الوفاء গ্রন্থে (২য় খণ্ড, ৪০৫ পৃ.) উল্লেখ করেছেন ঃ

لاشك فى حياة صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وكذاسائر الأنبياء عليهم السلام أحياء فى قبورهم حياة اكمد من حياة الشهداء التى اخبرالله تعالى بها فى كتابه العزيز ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء واعمال الشهداء فى ميزانه

তাঁদেরকে কাফন পরিধান করানোর পর কবরে দাফন করা হয়েছে। অতঃপর দার্শনিকবৃন্দ ও মুহাদ্দিসগণ বলেন, নবীগণের একবার মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার জীবিত করা হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁরা কবরে জীবিত থাকবেন। নবীগণের উপর যদিও কিছু সময়ের জন্য মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে কিন্তু তা স্থায়ী ও অনন্তকালের জন্য নয় বরং অস্থায়ী ও কিছু সময়ে জন্য ছিল।

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল পবিত্র কুরআন ও হাদীস, ইজ্মায়ে উম্মাত ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ের উপর ই'তিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী, অবিশ্বাস ও অস্বীকার করা জায়িয নয়। আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত ও অবস্থা সাধারণ মু'মিন থেকে আলাদা। সাধারণ মু'মিনের মৃত্যুর দ্বারা তার হায়াত সমাপ্ত হয়ে যায় এবং নবীগণের ইনতিকালে তাঁদের হায়াত সুপ্ত থাকে। কাজেই পুনরায় তাঁদেরকে জীবিত করার ফলে তাঁরা কবরে চিরঞ্জীব থাকেন। যেমন মেঘের ছায়ায় সূর্যের আলো ঢাকা পড়ে যায় আবার মেঘ দূরীভূত হলে সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মা'আযাল্লাহ! মাওলানা নানুতুবীর বক্তব্যের অর্থ–কখনো এ নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর মৃত্যু সংঘটিত হয়নি। বরং তিনি নবীগণের ইনতিকালে বিশ্বাস করা আবশ্যক ও জরুরী মনে করেন। এবং তাঁর সমস্ত বক্তব্য নবীগণের ওফাতকে প্রতিষ্ঠা ও স্থির করে থাকে। এতে অস্বীকারের লেশমাত্রই নেই। যেমন দার্শনিকদের মধ্যে এ মতানৈক্য রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সিফাত ও গুণাবলী আল্লাহপাকের মূল সত্তার অন্তর্ভুক্ত অথবা অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সিফাতের অবস্থা নির্ধারণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, মূল ও সিফাতের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। একইভাবে হযরত নানুতুবীর সমস্ত বক্তব্য, আম্বিয়া কিরামের মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। এবং তিনি মৃত্যুর বিশ্বাসকে আবশ্যিক ও প্রয়োজনীয় মনে করেন। মাওলানা নানুতুবী বলেন, আমি আম্বিয়ায়ে কিরামদেরকে তাঁদের দুনিয়ার দেহের সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবিত মনে করি এবং আল্লাহপাকের কালাম ঃ اِنَّكَ مَيِّتٌ ও كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত নবীর ইনতিকালের ব্যাপারে বিশ্বাস জরুরী মনে করি।[১]

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে নবীগণের জীবন মৃত্যুর অন্তরালে গোপন থাকে। তাঁদের ইনতিকালের দ্বারা হায়াত শেষ হয় না। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের ইনতিকাল তাঁদের হায়াতের জন্য পর্দা স্বরূপ। হায়াত বন্ধ হওয়া হায়াত নিঃশেষ হওয়া নয়।[২]

---

১. লাতায়েফে কাসেমী, পৃ. ৪০৩।

২. আবে হায়াত, মাওলানা কাসেমী, পৃ. ৪২-৪৩।

বরং ইনতিকালের সময় আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত আরো অধিক উজ্জ্বল হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যেমন কোন প্রদীপ হাড়ি বা কোন পাত্রে রেখে কোন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া এবং প্রদীপ নিভে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিভে যাওয়াতে প্রদীপের আলো দূরীভূত হয়ে যায় কিন্তু প্রদীপ কোন পাত্রে রেখে ওপরে কোন ঢাকনা রেখে দেওয়ার ফলে আলো ঢেকে যায় কিন্তু দূরীভূত হয় না। বরং ঢাকনা দেয়ার ফলে সমস্ত আলো চারদিকে ছড়িয়ে না পড়ে ঐ পাত্রে জমা হয়, যার ফলে আলোর উজ্জ্বলতা আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সাধারণ মু'মিনের মৃত্যুর মাধ্যমে তার হায়াতের নূর অনন্তকালের জন্য নিভে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের মাধ্যমে তাঁদের হায়াতের নূর নিভে যায় না; বরং কিছু সময়ের জন্য আবৃত হয়ে যায়। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে পার্থক্য প্রতীয়মান হয় না, প্রদীপ যদি নিভে যায় অথবা কোন পাত্রে রেখে দেয়ার কারণে এর আলো ঢেকে যায়, তা হলে অন্ধকার ঘরে উভয় অবস্থা একই সমান দৃষ্টিগোচর হবে।[১]

বাহ্যিক ইনতিকালের কারণে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরে গোপন হয়ে যাওয়া চিল্লায় গমন অথবা পর্দার অন্তরালে গমন অথবা নির্জনতা অবলম্বন মনে করা হবে।[২] আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরে জীবিত থাকা সম্পর্কে হযরত মাওলানা নানুতুবী (র) নিম্নলিখিত দলীল পেশ করেছেন।

১. হযরত আম্বিয়াতে কিরাম কবরে তাঁদের পবিত্র দেহ পূর্বের মত সঠিক থাকে। মাটি তাঁদের পবিত্র দেহ গ্রাস করতে পারে না, ফলে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকেন।

২. চিরদিনের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামের বিবিগণের পুনর্বিবাহ হারাম হয়ে যায়।

৩. আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পদে কেউ অংশীদার হয় না।

উপরোল্লিখিত তিনটি দলীল দ্বারা হায়াতে আম্বিয়া প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এটাও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র রূহের সম্পর্ক তাঁদের দেহের সাথে কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং ইনতিকালের পরও আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক পূর্বে মতই বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে শহীদগণের মৃত্যুর কারণে দুনিয়ার দেহের সাথে তাদের রূহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং জান্নাতের দেহের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ কারণেই শহীদগণের সম্পদে মীরাস (অংশীদারিত্ব) বন্টন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পদে মীরাস বন্টন হয় না। অথচ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ করেন,

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২-৪৩।

একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।" (সূরা নিসা ঃ ১১)-এর নির্দেশের মধ্যে সবাই অন্তর্ভুক্ত। সর্বসাধারণ হোক অথবা রাসূল হোক। এছাড়া শহীদগণের স্ত্রীদের ইদ্দত পালনের পর বিবাহের অনুমতি ও বিধান রয়েছে। এতে শহীদগণের হায়াত শেষ হয়ে যাওয়ার দলীল প্রমাণিত হয়, কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো ঃ لاَتَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِه اَبَدًا "নবী করীম (সা)-এর স্ত্রীগণকে কখনো বিবাহ করো না।" অর্থাৎ উম্মাহাতুল মু'মিনীন -এর সাথে চিরদিনের জন্য বিবাহ বন্ধন হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (সা)-এর ইনতিকালের পরও বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি। যেমন ঃ ازواجه امهاتهم এর প্রমাণ বহন করে যে, স্ত্রীর সম্পর্ক পূর্বের মতই বিদ্যমান। কেননা ازواجه শব্দটি زوجه এর বহুবচন। এটা হলো সিফাতে মুশাব্বাহ (صفت مشبه) যা অব্যাহত অবস্থাকে নির্দেশ করে। এমনিভাবে পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে وَلاَتَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاءُكُمْ "নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না।" (সূরা নিসা ঃ ২২) সুতরাং যেখানে উম্মুল মু'মিনীনগণের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়নি, সেখানে উম্মুল মু'মিনীনগণ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَاءِ الاية "এবং নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ব্যতীত সকল সধবা তোমাদের নিষিদ্ধ।" (সূরা নিসা ঃ ২৪) আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।[১]

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহের স্থায়িত্ব রূহ ও দেহ ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। শহীদগণের মধ্যে হায়াত সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় মাটির দেহের সাথে কোন সম্পর্ক বাকী থাকে না। শহীদ ও সাধারণ মু'মিনের পার্থক্য এই যে, শহীদগণের রূহের প্রথম দেহ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর অন্য দেহের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ হিসাবে তাদের আত্মিক ও দৈহিক উভয় হায়াত হাসিল হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উম্মাতের অন্যান্য মু'মিন বান্দাদের এর জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না। মোটকথা দুনিয়ার দেহের সাথে উভয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহ দুনিয়ার দেহের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রাখতে পারে যে, তাদের মাল-সম্পদ ও স্ত্রীগণকে তাদেরই সম্পদ ও স্ত্রী হিসেবে মনে করা হবে, অন্য কাউকে বিবাহের অনুমতি প্রদান করা না হবে এবং অংশীদারগণকে উত্তরাধিকার বন্টন ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হবে না? কেননা রূহের সাথে দেহের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণেই স্ত্রী ও ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়ে থাকে; একমাত্র রূহের প্রয়োজনে নয়। সুতরাং দেহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর স্ত্রী ও ধন-সম্পদের সাথে যে সমস্ত বিষয় ও বস্তু সম্পর্কিত ছিল, তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং

১. পূর্বোক্ত ১৮৫।

শহীদগণের হায়াত থাকা সত্ত্বেও তাদের স্ত্রীগণের অন্যান্য মুসলিম নারীর মতই ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর বিবাহের অধিকার থাকবে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মীরাস জারী হবে। অর্থাৎ তার অংশীদারগণ সম্পদের অংশ পাবে। শহীদগণের ইনতিকালে তাঁদের প্রথম হায়াত অবশ্যই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং কুরআন মজীদ ও হাদীসে তাঁদের যে হায়াতের উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো দ্বিতীয় হায়াত। আল্লাহ তা'আলার বাণী : عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ দ্বারা ঐ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তবে আম্বিয়া কিরামের হায়াত বিচ্ছিন্ন হয় না। এ জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এবং নবী (সা)-এর সম্পদে তাঁর বৈবাহিক সূত্রের অধিকার ও মালিকানা পূর্বের ন্যায় বিদ্যমান থাকবে এবং অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে বিবাহ করার অধিকার ওয়ারিসগণের মাল ও সম্পদ বন্টনের অধিকার থাকবে না। বস্তুত আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু এবং সাধারণের মৃত্যুর মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। একদিকে নবী করীম (সা)-এর ইনতিকাল পর্দার অন্তরালে গোপন রাখা হয়েছে, অন্যদিকে সাধারণ লোকের হায়াত সমাপ্তির মাধ্যমে মৃত্যুর প্রকাশ্য বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। সম্ভবত এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত নবী করীম (সা) কে "اِنَّكَ مَيِّتٌ" বলে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন এবং অন্যান্যদেরকে اِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ বলে পৃথকভাবে সম্বোধন করেছেন। যেমন সংযুক্ত আয়াত ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ (অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরা তো পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে। (সূরা যুমার : ৩১) সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে اِنَّكُمْ مَيِّتُوْنَ বলেন নি। সুতরাং ঐ মৃত্যুই মর্তবার পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে।

সুতরাং যেভাবে নবী (সা)-এর হায়াত এবং মু'মিনের হায়াতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং যেভাবে নবীর নিদ্রা ও মু'মিনের নিদ্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে নবী করীম (সা) বলেছেন :

تنام عيناى ولاينام قلبى وكذالك الأنبياء تنام أعينهم ولاتنام قلوبهم (بخارى)

"আমার চোখ নিদ্রা মগ্ন হয় কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না। এমনিভাবে আম্বিয়াগণের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় এবং তাঁদের অন্তর নিদ্রামগ্ন হয় না।"

এমনিভাবে নবী করীম (সা)-এর মৃত্যু এবং মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, النوم اخو الموت (নিদ্রা মৃত্যুর ভাই) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ يَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ

"আল্লাহ জীবসমূহের (মানুষের) প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও (হরণ করেন) নিদ্রার সময়।" (সূরা যুমার ঃ ৪২) আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে মৃত্যু এবং নিদ্রাকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং উভয়ের হাকীকত توفى এবং امساك। বর্ণনা করেছেন।

সাধারণ মু'মিনদের স্বপ্নের অবস্থায় রূহের হরণ ও বিরত রাখার কারণে তার জ্ঞান ও অনুভূতি বন্ধ রাখা হয় কিন্তু স্বপ্নে আম্বিয়ায়ে কিরামের এরূপ হয় না। এ কারণেই নবীগণের স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থায় ওহীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবীগণের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় এবং তাঁদের অন্তর জাগ্রত থাকে। তাঁদের স্বপ্ন জাগ্রত অবস্থায় ওহী নাযিলের মত গণ্য হয়ে থাকে। যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى [হযরত ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল (আ) কে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, এতে তোমার অভিমত কি বল? –সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০২] এ আয়াত এ বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে। স্বপ্নের সময় সাধারণ মু'মিনের জ্ঞান ও অনুভূতির শক্তি স্থগিত করা হয় কিন্তু হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের সময় ও জ্ঞান যথাযথ বিদ্যমান থাকে। এ পর্যন্ত হযরত মাওলানা নানুতুবী (র) এর আলোচনার সারাংশ সমাপ্ত করা হলো।

এ গ্রন্থের রচয়িতা হযরত মাওলানা ইদ্রিস কান্দুলভী (র) বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত এবং নবী করীম (সা)-এর হাদীস দ্বারা হায়াতুন্নবীর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) আত্মিক ও দৈহিকভাবে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে হযরত জিবরাঈল হযরত মিকাঈল এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত আদমকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং খিলাফতের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করেছেন। মাটির দেহকে নূরের তৈরি দেহের (ফিরিশতার) সিজ্দার স্থান বানিয়েছেন এবং হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামকে দৈহিকভাবে সাধারণ মানুষের উপর সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের দেহ এরূপ পবিত্র, সূক্ষ্ম ও সুগন্ধময় করে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁদের দেহ থেকে যে ঘাম নির্গত হয়, তা মিশক আম্বর থেকেও সুগন্ধময় হত।[১]

---

১. ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরের ২য় খণ্ডের ৪৫৫ পৃষ্ঠায় পবিত্র কুরআনের আয়াত ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العلمين (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম ও নূহ এবং হযরত ইবরাহীমের ও হযরত ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন) এর তাফসীরে আল্লামা হুলায়মীর কথা বর্ণনা করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম দৈহিক ও আত্মিক দিক দিয়ে দুনিয়ার সবার থেকে আলাদা ও মর্যাদাসম্পন্ন। (বিস্তারিত তাফসীরে কবীর দ্রষ্টব্য)।

أخرج البيهقى وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يارسول الله انك تدخل الخلاء فاذا خرجت دخلت فى اثرك فما ارى شيئًا الا الى اجد روائحة المسك قال انا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شئ ابنلعته الارض ـ(خصائص كبرى، ص٧٠ج١

"ইমাম বায়হাকী (র) ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পায়খানা থেকে বের হওয়ার পর আমি আপনার পর পর সেখানে গমন করি কিন্তু আমি সেখানে কিছুই দেখতে পাই না, শুধু মিশক-আম্বরের সুগন্ধি পেয়ে থাকি। নবী (সা) বলেন, আমরা নবীদের বিশেষ মর্যাদা হলো এই যে, বেহেশতের রূহসমূহের মতই আমাদের দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। যে কোন বস্তুই নবীগণের দেহ থেকে বের হয়, তা জমি ও মাটি শোষণ করে নেয়।"

অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ বেহেশতবাসীর রূহের মত সূক্ষ্ম ও পবিত্র হয়। বেহেশতবাসীর দেহ থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা যেমন মিশক আম্বর থেকে অধিক পবিত্র ও সুগন্ধময় হয়, তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা মিশক আম্বর থেকে অধিক সুগন্ধময় হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহের প্রকৃতি, হাকীকত, মানসিক অবস্থা ও গঠন প্রকৃতি বেহেশতবাসীর মতই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণেই আম্বিয়ায়ে কিরামের পবিত্র দেহ ইনতিকালের পর বেহেশতের রূহ ও দেহের মত ধ্বংস ও পচন থেকে নিরাপদ থাকে। এজন্য আলিমদের একটি দল নবী (সা)-এর উচ্ছিষ্ট ও মলমূত্র পবিত্র বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। (শারহে শিফা, ১ খ. পৃ. ১৬০)

হাদীসে বর্ণিত আছে, একবার যখন রাসূল (সা) শিঙ্গা লাগালেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে নির্দেশ প্রদান করেন যে, এ নির্গত রক্ত এরূপ কোন স্থানে ফেলে আসবে সেখানে কারো দৃষ্টিগোচর না হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) ঐ রক্ত নিজেই পান করে ফিরে আসেন। নবী (সা) জিজ্ঞাসা করেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি কি করেছে? আরয করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ রক্ত অত্যন্ত গোপন স্থানে রেখে দিয়েছি যেখানে কারো দৃষ্টিগোচর হবে না। রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবত তুমি তা পান করেছে। আফসোস! (আবূ ইয়ালা, তাবারানী, হাকিম ও বায়হাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)[১]

উম্মে আয়মান ও উম্মে ইউসুফ কর্তৃক নবী করীম (সা)-এর প্রস্রাব পান করা এবং তাদের কখনো কোন অসুখ না হওয়া এটাও হাদীসে বর্ণিত আছে।[২]

১. খাসায়েসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ৬৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

মনে হয় হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের দেহ হলো তাঁদের পিতা হযরত আদম (আ)-এর দেহের নমুনা। যিনি বেহেশতে আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতে তৈরি হয়েছেন। এজন্য ইনতিকালের পর মাটির ধ্বংস থেকে নিরাপদ ও হিফাযতে থাকেন। সেভাবে বেহেশতবাসীর দেহ কোন পরিবর্তন থেকে নিরাপদ থাকবে, তেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহও ইনতিকালের পর কোন পরিবর্তন থেকে হিফাযতে থাকবে। হযরত আদমের মূল ও প্রিয় সন্তান হলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ الولد سر لابيه। সুতরাং এটা আশ্চর্য নয় যে, ماخلقت بيدى-এর নূর ও বরকত এবং কুদরতী হাতে সৃষ্টি করার প্রভাব আম্বিয়া কিরামের মধ্যে তাদের সম্মানিত পিতা হযরত আদম (আ) থেকে অংশীদার হিসেবে লাভ করেছেন। যে বস্তু মনোনীত ও বাছাই করার উপাদানের অন্তর্ভুক্ত-এর অংশীদারিত্ব শুধু مصطفين الاخيار পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে এবং ইনতিকালের পর নবীগণের দেহ নিরাপদ থাকা হযরত আদমের ঐ মনোনীত হওয়ার উপাদানের অন্তর্ভুক্ত যার অংশীদারিত্ব বিশেষ মনোনীত বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে কাযী ইয়াযের আল-শিফা ও খাসাইসুল কুবরা পর্যালোচনা করুন।

যে ব্যক্তি আম্বিয়ায়ে কিরামের দৈহিক ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে তার এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ থাকবে না যে, নবীগণ যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মতই হায়াতের অধিকারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নবীগণের হায়াতের হাকীকত ও অবস্থা সাধারণ মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সমস্ত দুনিয়ার জাগরণ ও উপলব্ধি তাঁদের জাগরণের সাথে ততটুকু সম্পর্ক নেই যে সম্পর্ক দরিয়ার সাথে একফোঁটা পানির হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্নের অবস্থা হলো এই যে, স্বপ্নের সময় নবীগণের চোখ নিদ্রামগ্ন থাকে কিন্তু অন্তর সজাগ থাকে। যেমন বুখারী শরীফের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবীদের নিদ্রা অযূ ভঙ্গে কারণ হয় না। যেমন ঃ

نوم النبى عند الامام الأعظم لاينقض الوضوء حتما فاعلم

"ইমাম আযম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নবীগণের নিদ্রা অযূ ভঙ্গের কারণ হয় না।" হাদীসে আরো বর্ণিত আছে ঃ ماتثاب نبى قط وما احتلم قط (নবীগণের কখনো হাই উঠে না এবং নবীগণের কখনো স্বপ্নদোষ হয় না)। কেননা হাই উঠা এবং স্বপ্নদোষ শয়তানের খেলা হয়ে থাকে। আম্বিয়ায়ে কিরাম এর থেকে পবিত্র থাকেন।[১]

১. যারকানী, শারহে মাওয়াহিব, ৫ খ, পৃষ্ঠা, ২৪৮।

আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন ওহী। যেমন হযরত ইবরাহীম এর ঘটনা ঃ

اِنِّى اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرٰى আয়াত এর সুস্পষ্ট দলীল এবং অসম্ভব যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বপ্ন اضغاث احلام (অর্থহীন স্বপ্ন) এর পর্যায়ের হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظ حتى تكون هو يستقظ لانا لاندرى ما يحدث له فى نومه (بخارى) -

“সাহাবায়ে কিরাম বলেন, নবী করীম (সা) যখন শয়ন করতেন তখন আমরা তাঁকে জাগ্রত করতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি নিজে জাগ্রত না হতেন। কেননা আমরা অবগত নই যে, স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী (সা)-এর উপর কি বিষয় নাযিল হয়। সুতরাং তাঁকে জাগ্রত করে এই ওহী বন্ধ বা বিচ্ছিন্ন করার কারণ কেন হব? (বুখারী শরীফ, কিতাবুত তায়াম্মুম, পবিত্র মাটি ও মুসলিমের অযু, ১ খ, পৃ. ৪৯; কাসতাল্লানী, ১ খ, পৃ. ৩৬; ফাতহুল বারী, ১ খ, পৃ. ৩৮০)।

হযরত মূসা (আ) যখন শয়ন করেন তখন হযরত ইউসা (আ) বলেন, لا أوقظه অর্থাৎ আমি হযরত মূসাকে (আ) জাগ্রত করব না। (বুখারী)

সুতরাং যেভাবে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াত, তাঁদের জাগরণ এবং তাঁদের স্বপ্ন সাধারণ মু'মিনদের হায়াত, জাগরণ এবং স্বপ্ন থেকে পৃথক, তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের পরও সাধারণ মু'মিনের মৃত্যু থেকে আলাদা ও পৃথক।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا এর মধ্যে সাধারণ মানুষের মৃত্যুকে দু'ভাগে বিভক্ত করছেন। একটি হলো নিদ্রার মৃত্যু অপরটি হলো মৃত্যু। প্রকাশ থাকে যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের توفى منام বা স্বপ্নে মৃত্যু সাধারণ মানুষের توفى منام থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বপ্ন দেখার সময় সাধারণ মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অনুভূতি ও জ্ঞান স্থগিত হয়ে যায় কিন্তু স্বপ্নের সময় আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুভূতি স্থগিত হয় না। কেননা তাঁদের চোখ নিদ্রামগ্ন হয় কিন্তু অন্তর জাগ্রত থাকে। অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের নিদ্রা বা স্বপ্নের সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে অচেতন মনে হয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে তাঁরা জাগ্রত থাকেন।

এমনিভাবে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল সাধারণ মানুষের মৃত্যু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক এবং স্বপ্নের মত বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁদের ইনতিকাল হলেও অন্তরালে তাঁদের হায়াত গোপন থাকে।

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের সম্পর্কে এ ইতিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী ও আবশ্যক যে, মানবীয় চাহিদার কারণেই তাঁরা শয়ন করেন কিন্তু এ ইতিকাদ জরুরী নয় যে, তাঁদের শয়ন আমাদের শয়নের মত, বরং তাঁরা স্বপ্নেও জাগ্রত থাকেন। এমনিভাবে

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে এ ইতিকাদ ও বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এবং كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের উপরও মৃত্যু সংঘটিত হয়ে তাকে। তবে এ বিশ্বাস জরুরী নয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু আমাদের মৃত্যুর মত। যেভাবে আমরা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকি, তেমনিভাবে নবীগণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকেন। বরং এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ আদবের পরিপন্থি যা নিঃসন্দেহে নিজের মধ্যে অপরাধ গোপন রাখার নামান্তর। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় মর্তবা অনুযায়ী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।

مرگ هر ایك اے پسر همورنگ اوست * پیش دشمن دشمن وبردوست دوست

"হে বৎস, প্রত্যেকের মৃত্যু অবস্থা অনুযায়ী সংঘটিত হয়, দুশমনের সামনে দুশমন এবং বন্ধুর সামনে বন্ধুর ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি আমল অনুয়ায়ী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে থাকে।"

خلق درباز اریکسان مے روند * آں یکے درذوق ودیگر دردمند

"এ দুনিয়ার বাজারে অর্থাৎ সমাজে মানুষ একত্রে চলাচল করে বসবাস করে। একজন আবেগে উৎফুল্ল হয়, আবার অন্যজন দুঃখিত ও ব্যথিত হয়।"

هم چنیں درمرگ یکسان مے رویم * نیم درخسران ونمیے خسرویم

"এভাবে আমরা মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছি, কেউ ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত হয়ে আবার, সফল হয়ে এ দুনিয়া ত্যাগ করছে।"

নৈকট্য লাভকারীগণের মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা করে আরিফ রূমী বলেছেন ঃ

ظاهرش مرگ دبباطن زند گی * ظاهرش ابترنهاں پائنیدگی

"মৃত্যু এমন একটি জিনিস, যা বাহ্যত দেখতে মৃত্যু মনে হয় এবং চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া মনে হয় কিন্তু বাহ্যিকভাবে ধ্বংস বা হারিয়ে যাওয়া মনে হলেও এর মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে অনন্ত জীবন।"

মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে শুধু এই যে, মাওলানা নানুতুবীর ব্যাখ্যা আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালে হায়াত গোপন রাখা হয়েছে, হায়াত সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়নি। এরূপ ব্যাখ্যা নয় যে, যা অস্বীকার করার সুযোগ রয়েছে।

হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (র) স্বীয় রচিত গ্রন্থ 'আবে হায়াত' এবং অন্যান্য লেখায় এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ এবং كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ -এর প্রেক্ষাপটে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকাল সম্পর্কে ইতিকাদ ও বিশ্বাস একান্ত জরুরী। শুধু এর

প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারে কিছু বিষয় রয়েছে। প্রকাশ তাঁকে যে, সাধারণ বিষয়ের ঐক্য থাকার ফলে এটা জরুরী নয় যে, সম্মান-মর্যাদা, সিফাত বা গুণাবলী ও অবস্থার মধ্যে ঐকমত্য হতে হবে। মর্যাদা ও মর্তবার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য হবে।

گر فرق مراتب نکنی زند بقی

"ভালভাবে জেনে রেখো! সৃষ্টিকুলের বাহ্যিক অবসর (চেহারা) ই হচ্ছে অস্তিত্বহীনতা। বরং ধ্বংসের ওপর দাঁড়িয়েই তা তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।"

সুতরাং যেভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিদ্রা ও স্বপ্নে তাঁদের জাগরণ ও সচেতনতা গোপন থাকে, এমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালে যদি তাঁদের হায়াত গোপন থাকে তাহলে এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই।

মনীষীগণ বলেন, সম্ভাবনা বিদ্যমান, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এগুলোর অস্থায়ী বিদ্যমানতার মধ্যে এদের অস্তিত্বহীনতা গোপন রয়েছে। হযরত খাযা বাকীবিল্লাহ (র) বলেছেন ঃ

بشناس که کائنات رودرعدم اند * بل درعدم ایستاده ثابت قدم اند

"জেনে রাখ প্রত্যেক সৃষ্টির পেছনে রয়েছে তার অনস্তিত্ব এবং তার অনস্তিত্বের মধ্যে তার স্থায়িত্ব বিরাজমান রয়েছে।"

সম্ভাব্য বিষয়ের বিদ্যমানতা মূলত হাকীকত বা যথার্থতার বিদ্যমানতা নয়। শুধু এক বাহ্যিক দৃষ্টির অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

كل مافى الكون وهم اوخيال * او عكوس فى المرايا أوظلال

"বিশ্বজগতে যা কিছু রয়েছে সবই কল্পনা বা খেয়াল অথবা প্রতিবিম্ব ও আলোকচিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমাদের এ অস্তিত্বই অস্তিত্বহীনতার আয়না, যার মধ্যে প্রতি পদে পদে অস্তিত্বহীনতা উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষ যখন রোগগ্রস্থ হয় তখন সে তার হায়াতের মধ্যে মৃত্যু দেখতে পায় এবং এটা আমাদের জন্য আয়না স্বরূপ যাতে মানুষ তার মৃত্যু অবলোকন করে। যেখানে কোন বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয় সেখানে স্বীয় অস্থায়ী ক্ষমতার পর্দায় স্বীয় মূল অক্ষমতা দৃষ্টিগোচর হয়। যখন কোন সূক্ষ্ম মাসয়ালা সামনে উপস্থিত হয় এবং বিবেক এর সমাধানের জবাব প্রদান করে তখন স্বীয় লব্ধ জ্ঞানের পর্দায় নিজের প্রকৃত অজ্ঞানতার পর্দা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

সুতরাং এমনিভাবে যদি কোন আলিমে রাব্বানী ও আরিফ বিল্লাহ এবং চতুর্দশ' শতাব্দির একজন মৌলভী অর্থাৎ মাওলানা নানুতুবী স্বীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মাধ্যমে হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের ইনতিকালের পর্দায় তাঁদের মূল হায়াত অবলোকন করেন তাহলে এটা অসম্ভব হবে কেন?

নিঃসন্দেহে হায়াত এবং মউত বা জীবন-মরণ একটি অপরটির বিপরীত ও বিরোধী। কিন্তু একটি বিপরীতের আওতায় অপর বিপরীতের গোপন হয়ে যাওয়া আম্বিয়ায় ও ওলীগণের মধ্যে স্বীকৃত। আরিফ রূমী (র) বলেছেন ঃ

در عدم هستی برا درچون بود * ضد اندر ضد کے مکتون شود

"অবিনশ্বরতার মধ্যেই নশ্বরতা রয়েছে এবং বিপরীত বস্তুর মধ্যেই বিপরীত বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।"

মাওলানা রূমী মসনবী শরীফে আল্লাহর বাণী ঃ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ الاية এর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

যখন পূর্ববর্তী নেককারও ওলামায়ে রাব্বানীর পবিত্র হায়াত ও যিন্দিগীর কথা মনে আসে তখন এটা প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের জীবন মৃত্যু সদৃশ এবং আমাদের জাগরণ স্বপ্ন সদৃশ অর্থাৎ আমাদের এই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ জীবন আমাদের মৃত্যু গোপনকারী। আমাদের নামসর্বস্ব জাগরণের মধ্যে আমাদের গাফিলতির স্বপ্ন লুক্কায়িত রয়েছে। আমাদের অবস্থা হলো এই যে,

وخبّرنی البواب انك نائم * فقلت اذ استيقظت ايضًا فنائم

"প্রহরী আমাকে এ সংবাদ প্রদান করে বলে যে, তুমি নিদ্রিত কিন্তু আমি বলি যখন আমি জাগ্রত তখনও আমি নিদ্রিত।" (কেননা জাগ্রত অবস্থায়ও আমি নিদ্রিত ব্যক্তির মতই গাফিল রয়েছি)।

হযরত মাওলানা আরিফ রূমী (র.) বলেন ঃ

اَزمودم مرگ من درزندگی است
چوں رهم زیں زند گی پانبد گی است

"আমি এটা উপলব্ধি করেছি যে, আমার মৃত্যুই আমার জীবন এবং আমার জীবনের অবসানই আমার স্থায়িত্ব।"

ইমাম কুরতবী (র) আম্বিয়ায়ে কিরামের হায়াতের দলীল বর্ণনা করার পর উল্লেখ করেন ঃ

يحصل من جملته القطع بان موت الأنبياء انما هو راجع الى ان غيبوا عنا بحيث لاندركهم وان كانوا موجودين أحياء ولايراهم احد من نوعنا الا من خصه الله تعالى بكرامة من أولياءه انتهى كذا فى شرح المواهب للزرقانى صفحــ٢٣٤ ج٥ وكذا فى أبناء الاذكياء بحياة الأنبياء للسيوطى صفحــ١٤٩ ج٢ از مجموعة رسائل سيوطى -

"এ সমস্ত দলীল দ্বারা হায়াতুন্নবী সম্পর্কে দৃঢ় ও অকাট্য জ্ঞান লাভ করা যায় যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত শুধু এই যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা তা অনুভব করতে সক্ষম নই। যদিও তাঁরা জীবিত ও বিদ্যমান এবং আমাদের কেউ তাঁদেরকে দেখতে পায় না। তবে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁর কোন ওলী ও নেক বান্দাকে কিরামত বা অলৌকিকভাবে জাগ্রত অবস্থায় কোন নবীর যিয়ারত নসীব করেন তা অবশ্য হতেই পারে।" (শারহে মাওয়াহিব যারকানী, ৫ খ. পৃ. ২৩৪; আবনাইল আসফিয়া বি হায়াতিল আম্বিয়া লিস-সূয়ূতী, ২ খ, পৃ. ১৪৯)

আল্লামা শিবলী, আল্লামা সুয়ূতী, আল্লামা যারকানী এবং হাফিস ইবন কায়্যিম-এর মতে এটাই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যুর হাকীকত শুধু এই যে, তাঁদেরকে আমাদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা নিঃসন্দেহে জীবিত, যদিও আমরা আমাদের চোখে তাঁদের হায়াত পর্যবেক্ষণ বা অবলোকন করতে সক্ষম নই। যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি মূলত জীবিত কিন্তু তার জীবিত থাকা আমরা অনুভব করতে পারি না। সমস্ত মুহাদ্দিসের এটাই মত।

ইমাম বায়হাকী (র) جزء حيات الأنبياء গ্রন্থের শেষ দিকে উল্লেখ করেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের মৃত্যু কোন দিক দিয়েই মৃত্যু নয় এবং তাঁদের মৃত্যুর হাকীকত শুধু সংজ্ঞাহীনতা অনুভূতি লোপ পাওয়ার পর্যায় পড়ে। আল্লামা মুনাভী 'ফয়যুল কাদীর' গ্রন্থের ৫ম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন যে, কখনো কখনো অনুভূতি স্থগিত হয়ে যাওয়াকে মৃত্যু আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। যেমন হাদীসে নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর الحمد لله الذى أحيانا بعدما أماتنا واليه النشور পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। এ হাদীসে أحيانا দ্বারা জাগ্রত করা এবং اماتنا দ্বারা শয়ন বা শায়িত করানো বুঝানো হয়েছে। نوم বা নিদ্রার উপর মৃত্যু শব্দটি আরোপ করা হয়েছে। শায়খ ইবন আল্লান মক্কী 'শারহে কিতাবুল আযকার'[১] এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আল্লামা যুবায়দী শারহে কামূসে[২] মউতের অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

این سخن رانست هرگز اختتام * ختم کن والله اعلم بالسلام

"এ আলোচ্য বিষয় তো কখন বলে শেষ করা যাবে না। মহান আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত, তাই সালাম নিবেদন করে ইতি টানলাম।"

মহানবী (সা) এর পবিত্র স্ত্রীগণ

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهٰتُهُمْ

১. শরহে কিতাবুল আযকার, ১ খ, পৃ. ২৮৭।
২. কামূস ১ খ, পৃ. ৫৮৬।

"নবী করীম (স) মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা।" (সূরা আহযাব ঃ ৬)

মু'মিনদের ঈমানের অস্তিত্ব ও তাদের আত্মিক জীবন নবীগণের সাথে সম্পর্ক এবং সান্নিধ্যের কারণে হাসিল হয়ে থাকে। এজন্য নবীগণ হলেন মু'মিনদের জন্য আত্মিক পিতা। যেমন এক কিরাআতে আছে। وَهُوَ اَبٌ لَهُمْ নবী হলেন পিতার স্থলাভিসিক্ত এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ হলেন সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মা-এর মত।

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا ـ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى - وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ـ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا - وَاذْكُرْنَ مَايُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

"হে নবী পত্নিগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তা হলে অন্য পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলী যুগের মত নিজদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী পরিবার! আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় হলো তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করা এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করা। আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা যা তোমাদের গৃহে পাঠ করা হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সর্ববিষয়ে পরিজ্ঞাত।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২-৩৪)

কতিপয় প্রয়োজনীয় সূক্ষ্ম বিষয়

১. উম্মাহাতুল মু'মিনীন এই অতীব মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি ঐ স্ত্রীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট যাঁরা নবী (সা)-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়ে তাঁরই আওতাধীন জীবন যাপন করেছেন। কিন্তু বিবাহ উৎসব এবং ঘনিষ্ঠতা লাভের পূর্বেই যাদেরকে তালাক প্রদান করেছেন, তাদের জন্য উপাধি ব্যবহার করা যাবে না।

২. এ জন্যই নবীপত্নিগণকে মু'মিনদের সম্মানিত 'মা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পর তাঁদের সাথে কোন ব্যক্তির বিবাহ

করা অবৈধ ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ আ'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلاَاَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا - اِنْ تُبْدُوْا شَيْئًا اَنْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا -

"তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া সংগত নয় এবং তাঁর ইনতিকালের পর তাঁর পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য কখনো বৈধ নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা বড়ই অপরাধ। যদি তোমরা কোন বিষয় প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

একজন আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন লোকের জন্য এটা চিন্তা করা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে, তার স্ত্রী তার পর অন্য কোন ব্যক্তির সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হবে। প্রকাশ থাকে যে, নবী (সা) ব্যতীত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন বিরাট ব্যক্তি আর কে হতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, যখন তাঁদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীন ঘোষণা করা হয়েছে, অতঃপর কারো সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া তাঁর মর্যাদা ও মর্তবার পরিপন্থি।

তৃতীয়ত, স্বীয় পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা বিবেক ও সামাজিক সর্বদিক দিয়ে কদর্য ও গর্হিত কাজ। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَانَكَحَ اٰبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلاَّ مَا قَدْ سَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَّسَاۤءَ سَبِيْلاً -

"নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতৃপুরুষ যাদেরকে বিবাহ করেছে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। পূর্বে যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই অশ্লীল, অতিশয় ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট আচরণ।"(সূরা নিসা ঃ ২২)

اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً। এর দ্বারা বিবেকের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা বিবেকের দৃষ্টিতে ও সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা ও ঘৃণ্য কাজ এবং وَسَاءَ سَبِيْلاً দ্বারা প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিতেও ঘৃণ্য– এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও গর্হিত আচরণ। হযরত বারাআ ইবন আযিব (রা) বর্ণনা করেন, আমি আমার মামাকে দেখলাম তিনি ঝান্ডা নিয়ে কোথাও যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি জবাবে বললেন, এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। নবী (সা) তাকে হত্যা করার এবং তার মালামাল বাজেয়াপ্ত

করার জন্য আমাকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। (আবদুর রাযযাক, ইবন আবূ শায়বা, আহমদ, হাকিম ও বায়হাকী থেকে বর্ণিত)।

সুতরাং জন্মদাতা পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করা যেখানে বিবেক, শরী'আত ও সামাজিক সর্বদিক দিয়ে ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ, সেখানে আত্মিক পিতা অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করার চিন্তা করা অধিকতর ঘৃণ্য ও গর্হিত কাজ হবে।

চতুর্থত, যদি কোন মহিলা দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তার পূর্ববর্তী স্বামীর সৌন্দর্য ও গুণাবলী বর্ণনা করে, তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর স্বাভাবিকভাবেই তা অপসন্দ হবে। এ জন্য ইসলামী শরী'আত জাগতিক ও আত্মিক পিতার বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করার বিষয়ে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, যাতে স্বীয় জাগতিক ও আত্মিক পিতার ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার ক্রোধ বা বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। বিশেষ করে আত্মিক পিতা অর্থাৎ নবীর প্রতি ঈর্ষা-বিদ্বেষ বা ক্রোধ রাখা কুফরী করার নামান্তর।

পঞ্চম হলো, এই যে, উম্মুল মু'মিনীন যারা নবী (সা)-এর বিবাহ বন্ধনে থেকে বিশেষভাবে নারীদের সম্পর্কে অতি জরুরী আহ্‌কাম ও মাসয়ালা অবগত হয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে কোন দোদুল্যমানতা ব্যতীত সকলের নিকট পৌঁছে যাবে। যদি নবী (সা) এর ইনতিকালের পর অন্যের সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন তাহলে উম্মুল মু'মিনীনগণের রিওয়ায়াতের সনদ ও নির্ভরযোগ্যতার মধ্যে দুর্নাম রটনারকারীগণ সামলোচনা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

আয়াতে تـطـهـيـر মূলত উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যেমন আয়াতের পূর্বাপর বিষয়বস্তু এর প্রমাণ বহন করে। এ সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উম্মুল মু'মিনীনকে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু রাসূল (সা) হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসায়ন এবং হযরত ফাতিমা (রা)-কে এই নীতি ও বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদেরকে একত্র করে দু'আ করেছেন ঃ

اللهم هؤلاء أهل بيتى اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا -

"হে আল্লাহ! এরাও আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তাদের থেকেও পংকিলতা দূরীভূত কর এবং তাদেরকে পবিত্র কর।" যেমন আয়াত لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ "যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই স্থাপিত হয়েছে তাক্ওয়ার উপর।" (সূরা তাওবা ঃ ১০৮)

মূলত মসজিদে কুবা সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে, কিন্তু নবী (সা) মসজিদে নব্বীকেও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা মসজিদে নব্বী অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই এর হকদার। এমনিভাবে আয়াতে تـطـهـيـر মূলত উম্মুল মু'মিনীনগণ সম্পর্কে

নাযিল হয়েছে। কিন্তু নবী (সা)-এর পরিবারবর্গ যেহেতু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এর হকদার, সুতরাং রাসূল (সা) তাঁদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বাকী উম্মুল মু'মিনীনগণ তো পূর্ব থেকেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

উম্মুল মু'মিনীন বা পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যা এবং বিবাহের ক্রমধারা

নবী (সা)-এর এগারজন স্ত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জন তাঁর জীবিতকালেই ইনতিকাল করেন। একজন হলেন হযরত খাদীজা (রা) অন্যজন হযরত যয়নাব বিন্ত খুযায়মা। নবী (সা)-এর ইনতিকালের সময় ন'জন স্ত্রী জীবিত ছিলেন।

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتزوجت شيئًا من نسائى ولازوجت شيئًا من بناتى الابوحى جاءنى به جبرئيل عن ربى عز وجل، أخرجه عبد الملك بن محمد النيسابورى بسنده ـ١

"হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, না আমি নিজে বিবাহ করেছি এবং না স্বীয় কন্যাকে বিবাহ দিয়েছি– যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আমার নিকট আগমন না করেছেন।"

এ হাদীস হযরত আবদুল মালিক ইবন মুহাম্মদ নিশাপুরী স্বীয় মুসনাদে রিওয়ায়াতে করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা বিন্‌তে খুওয়াইলিদ (রা)

সবার ঐকমত্য অনুযায়ী উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা)-এর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তিনি ছিলেন প্রথম মুসলমান। কোন পুরুষ ও মহিলা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর থেকে অগ্রগামী ছিলেন না। হযরত খাদীজা (রা) কুরায়শ বংশের ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল খুওয়াইলিদ এবং মাতার নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ্। কুরায়শ পর্যন্ত বংশধারা হলো খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ইবন আবদুল উয্‌যা ইবন কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌঁছে বংশধারা নবী (সা)-এর সাথে মিলে যায়।[২] যেহেতু হযরত খাদীজা (রা) জাহিলিয়াতের চাল-চলন ও অনৈতিকতা থেকে পবিত্র ছিলেন, এ জন্য নবী করীম (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বেও তিনি তাহিরা (পবিত্রা) নামে খ্যাত ছিলেন।

আবূ হালা ইবন যুরারাহ তামীমির সাথে হযরত খাদীজার প্রথম বিবাহ হয়েছিল। তাদের ঔরষ থেকে হিন্দ এবং হালা দু'পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হিন্দ এবং হালা ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়েই সাহাবী ছিলেন। হিন্দ ইব্‌ন আবূ হালা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষী ও বাগ্মী

১. উয়ূনুল আসার, ২ পৃ. ৩০০।

২. আল ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৮১।

ছিলেন, নবী করীম (সা)-এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত রিওয়ায়াত তাঁর থেকে বর্ণিত আছে।

আবূ হালার ইনতিকালের পর তিনি আতিক ইবন আয়েয মাখযূমীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের থেকে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করে। তাঁর নাম ছিল হিন্দ। হিন্দ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবার মর্যাদা লাভ করেন, কিন্তু তাঁর থেকে রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়নি। কিছু দিন পর আতিকও ইনতিকাল করেন এবং হযরত খাদীজা পুনরায় বিধবা হয়ে পড়েন।[১]

নাফিসা বিনতে মুনীবা থেকে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা) অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন এবং ধনাঢ্য মহিলা ছিলেন। যখন বিধবা হয়ে গেলেন তখন কুরায়শ গোত্রের প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই তাঁকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু নবী (সা) যখন হযরত খাদীজার ব্যবসার মালামাল নিয়ে সফরে গমন করেন এবং বিরাট লাভবান হয়ে ফিরে আসেন, তখন হযরতের দিকে তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেন। নাফিসা বলেন, রাসূল (সা)-এর এ ব্যাপারে মনোভাব অবগত হওয়ার জন্য তিনি আমাকে প্রেরণ করেন। সুতরাং আমি রাসূলের নিকট গমন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, কি কারণে আপনি বিবাহ থেকে বিরত রয়েছেন? রাসূল (সা) বললেন, আমার হাতে অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। আমি বললাম, যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্পর্কে আপনাকে আশ্বস্ত করা হয়, তাহলে তো কোন আপত্তি থাকবেনা? নবী (সা) বললেন, তিনি কে ? আমি (নাফিসা) বললাম, খাদীজা। রাসূল (সা) এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২]

মূল কারণ হলো এই যে, নবুওয়াতের আবির্ভাবের সময় যত নিকটবর্তী হয়ে আসছিল, ততই নবী (সা)-এর কারামত ও আবির্ভাবের সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কখনো তাওরাত ও ইঞ্জিলের উলামার বাণী থেকে, কখনো গণকদের ভবিষ্যত উক্তি থেকে আর কখনো অদৃশ্য আওয়াজ থেকে। তাওরাত ও ইঞ্জিলের যে কোন আলিম রাসূলকে প্রত্যক্ষ করতেন, তারা এটা বলতেন যে, এই শিশু, এই যুবকই শেষ যুগের ঐ নবী হবেন যার সম্পর্কে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) ভবিষ্যতবাণী করেছেন।

এ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে হযরত খাদীজা (রা) যথেষ্ট অবগত ছিলেন। ইতিপূর্বে স্বীয় গোলাম মায়সারা থেকে সিরিয়া সফরের ঘটনা ও জনৈক পাদ্রীর কাহিনী জেনেছেন। বাহিরা নামক পাদ্রীর ঘটনা এর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অপরদিকে হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবন নওফেল তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিরাট আলিম ছিলেন। তিনি শেষ যুগের নবীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এ সমস্ত ঘটনার কারণে হযরত

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২০।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৮৩।

খাদীজার অন্তরে নবী (সা)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কামনা ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় একদিন একটি ঘটনা সংঘটিত হয় যে, জাহেলিয়াতের এক ঈদে মক্কার মহিলারা একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) উপস্থিত ছিলেন। দেখা গেল, এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো ঃ

انه سيكون فى بلد كن نبى يقال له أحمد فمن استطاع منكن ان تكون زوجة له فلتفعل فحصبنه الا خديجة فاغضت على قوله - رواه المدائنى عن ابن عباس - (১)

"হে নারীগণ! অচিরেই তোমাদের শহরে একজন নবীর আবির্ভাব হবে এবং তাঁর নাম হবে আহমাদ। তোমাদের মধ্যে যে তাঁর স্ত্রী হতে ইচ্ছুক, সে যেন এটা সম্পন্ন করে। এই আহ্বানকারীকে সমস্ত মহিলা পাথর নিক্ষেপ করে কিন্তু হযরত খাদীজা (রা) বিরত থাকেন এবং চুপ থাকেন। এ সৌভাগ্য হাসিলের জন্য হযরত খাদীজার মন পূর্ব থেকেই আকাঙ্ক্ষিত ছিল। তবে এ অদৃশ্য স্থান থেকে আহ্বানকারীর আহ্বান তাঁর কামনা-বাসনার আগুনকে আরো তীব্রভাবে বৃদ্ধি করে।

ইবন ইসহাকের বর্ণনা, হযরত খাদীজার গোলাম মায়সারা যখন সিরিয়ার সফর থেকে ফিরে আসে এবং নাসতূরা নামক পাদ্রীর কথাবার্তাসহ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে তখন হযরত খাদীজা তা শ্রবণ করে বলেন ঃ ان كان ما قال اليهودى حقاما ذاك الا هذا "যদি এই ইয়াহূদী গণকের কথা সত্য হয়, তা হলে ইনিই হবেন সেই মহান ব্যক্তি"।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈদের সময় নারীদের একত্র হওয়ার ঘটনা গোলাম মায়সারার সফর থেকে ফিরে আসার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। হযরত খাদীজার নাম তাহিরা রাখা হয়নি, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকজনের মাধ্যমে 'তাহিরা' বলানো হয়েছে, যাতে তাঁর পবিত্রতা প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন নবী করীম (সা)-কে লোকজনের দ্বারা 'আমীন' বলানো হয়েছে। যাতে নবী (সা)-এর আমানতদারী ও সততা জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হয় এবং এতে কারো সমালোচনা করার সুযোগ না থাকে। যেহেতু হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন স্বীয় যুগের মরিয়ম। এ জন্য হযরত মরিয়মের মত তাঁকেও وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ "হে মরিয়ম আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।" (আলে ইমরান ঃ ৪২)-এর মর্যাদা থেকে বিশেষ অংশ হাসিল করেছেন এবং 'তাহিরা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রকাশ থাকে যে, এরূপ পবিত্র নারীর মনের আকর্ষণ কোন পবিত্র ব্যক্তির দিকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা সত্য বলেছেন

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২০

এবং তাঁর চেয়ে সত্যবাদী কে হতে পারে? الطيبات للطيبين والطيبون لطيبت। "সচ্চরিত্রা নারী সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।" (সূরা নূর ঃ ২৬)

সবাই অবগত আছে যে, নবুওয়াত ও রিসালত কোন বাদশাহী নয়। দুনিয়ার আনন্দ উল্লাসের সাথে এর সামান্যতম সম্পর্কও নেই, নবী করীম (সা)-এর ঘরে দিরহাম ও দিনারের একটি রাত্র জমা থাকার সুযোগ নেই, তবে কোন পাওনাদারের অপেক্ষায় কিছু সময় হয়ত রাখা হত। সপ্তাহ এবং মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, ঘরে চুলা জ্বালানো হত না, রাত শেষ হয়ে যেত কিন্তু ঘরে প্রদীপ জ্বালানো হত না। এটাও সবাই অবগত আছে যে, ধন-সম্পদ, অলংকার ও আনন্দ-উল্লাসের প্রতি নারীদের আকর্ষণ প্রকৃতিগত স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু মক্কার সমস্ত সরদার ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির হযরত খাদীজার প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করে নবী (সা)-এর দিকে আগ্রহী হওয়া তাঁর পবিত্রতারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা হযরত খাদীজার জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার অনুমান করা যায়। নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনের কামনা করা সাধারণ বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। চূড়ান্ত পর্যায়ের তীক্ষ্মবুদ্ধি ও বিচক্ষণতাই এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কেননা জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা এটা ধারণা করা যায় যে, নবীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো, দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করে দারিদ্রতা গ্রহণ করতে হবে, এটাকে উত্তম মনে করতে হবে। নবীর স্ত্রী হওয়ার কামনা অর্থ দারিদ্রতা কামনা এবং দুঃখ ও বিপদকে আহ্বান করা।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি এই ওসীয়াত করে যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে যেন দান করা হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর এরূপ ব্যক্তিকে ঐ ধন-সম্পদ প্রদান করতে হবে যিনি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাহিদ বা পরকালের জন্য সংসার বিমুখ বা পরকালকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন (كذا فى تنبيه المغترين للشعرانى صفـ٥٠)। কেননা সবচেয়ে বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি অস্থায়ীকে ছেড়ে চিরস্থায়ী বস্তুকে গ্রহণ করেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হতে পারে যে পরকালের চিরস্থায়ী নি'আমতের পরিবর্তে এক মুর্দারকে ক্রয় করে। আল্লাহপাক বলেছেন ঃ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ "সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে ও পরিচালিত নয়।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬)

হযরত খাদীজা (রা) সমস্ত কিছু চিন্তা-ভাবনা করে নিজের পক্ষ থেকে যোগাযোগের সূচনা করেন এবং মক্কার সর্দার ও নেতাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দেন। বলাবাহুল্য, যে পবিত্র নারী দুনিয়াকে ত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করার দৃঢ় সংকল্প

গ্রহণ করেছেন, তিনি দুনিয়ার অন্য কোন বস্তুর দিকে কিভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবেন, ধন-সম্পদের সাথে যাঁর কোন সম্পর্ক নেই, সন্তানদের প্রতি তাঁর কিভাবে আকর্ষণ থাকতে পারে? কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা নেতার ধন-সম্পদ তাঁকে কিভাবে প্রলুব্ধ করতে পারে, যিনি স্বীয় ধন-সম্পদই আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

নবী (সা) তাঁর প্রিয় চাচা আবূ তালিবের পরামর্শক্রমে এ পয়গাম কবূল করেন। হযরত খাদীজার পিতা খুইয়ালিদ পূর্বেই ইনতিকাল করেছেন কিন্তু তাঁর চাচা আমর ইবন-আসাদ বিবাহের সময় জীবিত ছিলেন এবং বিবাহ্ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

নির্ধারিত তারিখে হযরত আবূ তালিব হযরত হামযা (রা) সহ গোত্রের অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে হযরত খাদীজার বাড়ি আগমন করেন। বিবাহের রীতিনীতি সম্পন্ন করার পর আবূ তালিব বিবাহের খুতবা পাঠ করেন (গ্রন্থের প্রারম্ভে তা উল্লেখ করা হয়েছে) এবং পাঁচশ দিরহাম মাহর নির্ধারণ করেন।[১] বিবাহের সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর এবং নবী (সা)-এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আকদের মজলিসে ওয়ারাকা ইবন নওফেলও উপস্থিত ছিলেন। আবূ তালিবের খুতবা শেষ হওয়ার পর ওয়ারাকা ইবন নওফেল সংক্ষিপ্ত খুতবা পেশ করেন।[২]

ওলীমা

কোন কোন রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, ইজাব কবুলের পর হযরত খাদীজা (রা) একটি গাভী যবেহ করে খাবার তৈরি করেন এবং মেহমানদেরকে আপ্যায়ন করেন।[২]

সারকথা

হযরত খাদীজার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক স্তর সম্পন্ন হলো, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ নবীর আবির্ভাব) এখনো বিলম্ব। আশা-নিরাশার দোলা ও অপেক্ষার অস্থিরতা ও চিন্তা সর্বদা অব্যাহত থাকে। একদিনের ঘটনা, নবী (সা) হযরত খাদীজার নিকট গমন করেন। হযরত খাদীজা (রা) দেখেই রাসূলকে জড়িয়ে ধরেন এবং বুকের সাথে চেপে ধরে বললেন ঃ

بأبى وأمى والله ما أفعل هذا شئ ولكنى أرجوا أن تكون أنت النبى الذى ستبعث فان تكن هو فاعرف حقى ومنزلتى وادع الاله الذى بعثك لِى قالت فقال لها والله لئن كنت انا هو قد اصطنعت عندى مالا اضيعه أبدا وان يكن غيرى فان الاله الذى تضعين هذا الاجل لايضعك أبدا ـ(৩)

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

৩. ফাতহুল বারী, ৭ খ, পৃ. ২০০।

"আমার পিতামাতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক, এ কাজ দ্বারা আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তবে আমার আশা হলো এই যে, সম্ভবত আপনিই ঐ নবী যাঁর অচিরেই আবির্ভূত হওয়ার কথা। সুতরাং আপনিই যদি ঐ নবী হন তাহলে আমার হক স্মরণ রাখবেন এবং যে আল্লাহ্ আপনাকে নবুওয়াত দান করে মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন তাঁর মহান দরবারে আমার জন্য দু'আ করবেন। নবী (সা) জবাবে বললেন, যদি আমিই ঐ নবী হই, তাহলে হলে জেনে রাখ, তুমি আমার উপর এরূপ ইহ্সান করেছ যা আমি কখনো ভুলতে পারব না। যদি আমাকে ব্যতীত অন্য কেউ নবী হয় তাহলেও এটা স্মরণ রাখবে যে, যে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি এ কাজ করেছ, তিনি কখনো তোমার এ আমলের প্রতিদান থেকে তোমাকে বিফল করবেন না।"

যুবায়র ইবন বাকার থেকে বর্ণিত, হযরত খাদীজা (রা) বার বার ওয়ারাকা ইবন নওফলের নিকট গমন করে নবী (সা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ওয়ারাকা ইবন নওফেল বলতেন ঃ

ما اراه الانبى هذه الامة الذى بشربه موسى وعيسى عليهم السلام

"আমার ধারণা হলো এই যে, তিনিই ঐ নবী যাঁর সম্পর্কে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ) সুসংবাদ প্রদান করেছেন।"

এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত খাদীজা (রা) ওয়ারাকার নিকট গমন করে নবী (সা)-এর অবস্থা বর্ণনা করেন। তখন ওয়ারাকা এক কাসীদা (পংক্তিমালা) আবৃত্তি করেন। যার কিছু পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

هذى خديجة تاتنى لاخبرها * ومالنا بخفى الغيب من خبر
بِاَن اَحمد ياتيه فيخبره * جبريل انك مبعوث الى البشر

"এই খাদীজা বার বার আমার নিকট আগমন করে যাতে আমি তাকে সংবাদ প্রদান করি। কিন্তু আমার নিকট অদৃশ্যের কোন খবর নেই যে, জিবরাঈল আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম নিয়ে নবী (সা)-এর নিকট আগমন করবেন এবং এ সংবাদ প্রদান করবেন যে, আপনাকে লোকজনের নিকট নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।"

فقلتُ على الذى ترجين ينجزه * لك الاله فرجى الخير وانتظرى

"ওয়ারাকা বলেন, আমি খাদীজাকে জবাব দান করেছি যে, আশ্চর্য নয় যে, যার তুমি কামনা করেছ, আল্লাহ্ তা পূর্ণ করবেন। তুমি আল্লাহ্পাকের দরবারে কল্যাণের আশা রাখ এবং অপেক্ষা কর।"

ওয়ারাকা ইবন নওফেলের এ কাসিদা মুসতাদরাকে উল্লেখ আছে। হাকেম ও যাহাবী এর উপর চুপ রয়েছেন। ওয়ারাকার আরো কাসীদা রয়েছে যার দ্বারা ওয়ারাকার আকাঙ্ক্ষা ও অপেক্ষার বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়।[১]

সন্তান সন্ততি

হযরত খাদীজার গর্ভে নবী (সা)-এর ঔরস থেকে চার কন্যা যথা– যয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা এবং দু'পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করেন। (বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা হবে)। পুত্র সন্তানগণ শিশুকালেই ইনতিকাল করেন। কন্যাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁদের বিবাহ দেয়া হয়েছে।

ইনতিকাল

নবুওয়তের দশম বছর এবং হিজরতের তিন বছর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা) মক্কা মু'আয্‌য্‌মায় ইনতিকাল করেন এবং হাজ্জু নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। নবী (সা) স্বয়ং কবরে নেমে দাফনের কাজ সম্পন্ন করেন। জানাযার নামায ঐ সময় পর্যন্ত শরী'আতের দ্বারা প্রচলিত হয়নি, পঁচিশ বছর নবী (সা)-এর সাথে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন। যতদিন পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত রাসূল (সা) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। হযরত খাদীজা (রা) পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। انا لله وانا اليه راجعون

ফযীলত ও মর্যাদা

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত জিবরাঈল (আ) নবী (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হযরত খাদীজা (রা) আপনার জন্য খাবার নিয়ে আগমন করছে। যখন আপনার নিকট পৌঁছবে, তখন আপনি তাঁকে তাঁর পরওয়ারদিগারের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলবেন এবং তাঁকে বেহেশতের এমন এক মহলের সুসংবাদ প্রদান করবেন যা একটি মুক্তা দিয়ে তৈরি করা হবে, ঐ মহলের কোন হৈ চৈ হবে না এবং কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট হবে না। নাসাঈ শরীফের রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, হযরত খাদীজা এ সুসংবাদ শুনে জবাবে বলেন ঃ

ان الله هو السلام وعلى جبريل السلام عليك يارسول الله السلام ورحمة الله وبركاته وزاد ابن السنى من وجه اخر وعلى من سمع السلام الا الشيطان ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সালাম অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার উপর কিভাবে সালাম পেশ করব। হে জিবরাঈল। আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল।

১. রাওযুল উনুফ, ১ খ, পৃ. ১২৫-১২৭।

আপনার উপর আল্লাহ্ পাকের শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক (যার ওসীলায় আমার উপর এ রহমত ও বরকতসমূহ নাযিল হয়েছে)।

ইবন সুন্নার রিওয়ায়েতে এরূপ এবং আরো অতিরিক্ত বর্ণিত আছে, তাদের উপরও সালাম বর্ষিত হোক যারা এটা শুনেছে একমাত্র শয়তান ব্যতীত।"

এ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য ফাতহুল বারী ১ খ, পৃ. ১০৫, নবী করীম (সা) ও হযরত খাদীজার বিবাহ ও ফযীলত অধ্যায় এবং যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ. পৃ. ২২২ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

হাফিয ইবন কায়্যিম (র) বলেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে কাউকে সালাম প্রেরণ করা এমন এক ফযীলত ও মর্যাদাসম্পন্ন বিষয়, যাতে হযরত খাদীজা (রা)-এর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। অর্থাৎ অন্য কারো এ সৌভাগ্য হয়নি।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন তিনজন, হযরত খাদীজা, হযরত ফাতিমা এবং হযরত আয়েশা। কিন্তু এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এই তিনজন মধ্যে কে সর্বোত্তম। হাফিয ইবন আবদুল বার (র) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর একটি মারফূ' রিওয়ায়েতে এ প্রশ্নের সমাধান রয়েছে। ঐ রিওয়ায়েতে হলো এই ঃ

سيدة نساء العلمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم اسية قال هذا حديث حسن

"বিশ্বজগতের নারীদের নেত্রী হলেন হযরত মরিয়ম (আ), অতঃপর হযরত ফাতিমা (রা), এরপর হযরত খাদীজা (রা) অতঃপর হযরত আসিয়া। ইবন আবদুল বার (র) বলেন, এ হাদীসটি হাসান। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যারকানী শারহে মাওয়াহিব, ৩ খ, পৃ ২২৩ এবং ফাতহুল বারী ও তাফসীরে রূহুল মা'আনীর সূরা আলে-ইমরানের আয়াত يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعٰلَمِيْنَ এর তাফসীর দেখা যেতে পারে।

উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)

হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের কিছুদিন পর হযরত সাওদা (রা)-এর সাথে মহানবী (সা)-এর বিবাহ হয়। বংশ মর্যাদায় তিনি কুরায়শী ছিলেন। তাঁর বংশ সূত্র হচ্ছে, সাওদা বিনতে যামআ' ইবন কায়স ইবন আবদ শামস ইবন উদ-ইবন নসর ইবন মালিক ইবন হসল ইবন আমির ইবন লূয়াই-। (সীরাতে ইবনে হিশাম, উয়ূনুল্ আসার)

লূয়াই-ইবন গালিব পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর বংশ তালিকা মহানবী (সা)-এর বংশের সাথে মিশে যায়। মায়ের নাম শামস বিন্‌তে কায়স ইবন আমর ইবন যায়দ আনসারীয়া। তিনি আনসার গোত্র বনী নাজ্জারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল আপন চাচাত ভাই সুকরান ইবন আমরের সাথে। সাহাবায়ে কেরাম যখন হাবশায় (আবিসিনিয়া) দ্বিতীয়বার হিজরত করেন, তখন তিনি স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করেন। হাবশা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তনের সময় পথে স্বামী ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় স্বামী আবদুর রহমান নামে একটি পুত্র সন্তান রেখে যান। আবদুর রহমান মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। জালূলার যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

মহানবী (সা) হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের ফলে খুবই বিষন্ন ও ভারাক্রান্ত ছিলেন। সে সময় একদিন খাওলা বিনতে হাকীম তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে খাদীজার অবর্তমানে ভীষণ বিষণ্ন মনে হচ্ছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ঘরের ব্যবস্থাপনা ও সন্তানদের দেখাশুনা প্রতিপালনের সব দায়িত্বই তাঁর ছিল। খাওলা বললেন, আমি কি আপনার জন্য কোথাও বিয়ের পয়গাম (প্রস্তাব) দেব? তিনি উত্তরে বললেন, ঠিক আছে, এসব কাজের জন্য মহিলারাই উপযোগী।

তিনি আরও বললেন, কোথায় পয়গাম দিতে চাচ্ছ? খাওলা বললেন, যদি আপনি কুমারী চান, তাহলে আপনার সবচেয়ে প্রিয়জন-এর কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করুন। আর যদি বিধবা চান, তাহলে সাওদা বিনতে যাম'আ উপযুক্ত আছে। যিনি আপনার উপর ঈমান এনেছেন এবং আপনার অনুগত হয়েছেন। মহানবী (সা) বললেন ঃ দু'জায়গায়ই পয়গাম পাঠাও। খাওলা প্রথমে সাওদার নিকট গেলেন এবং বললেন, আমি তোমার জন্য মহানবী (সা)-এর পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে বিষয়টি তুমি আমার পিতার সাথে আলোচনা কর। তাকে জাহিলী পদ্ধতিতে সালাম করবে। খাওলা বলেন, আমি তার পিতার নিকট গিয়ে জাহিলী পদ্ধতিতে أَنْعَمَ صَبَاحًا 'শুভ সকাল' বললাম। তিনি প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, খাওলা। তিনি মারহাবা বলে প্রশ্ন করলেন, কেন এসেছ? আমি বললাম, তোমার মেয়ের জন্য মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিবের পক্ষ হতে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। তিনি বললেন, এটা ত বিয়ের জন্য মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান (কুফূ), কিন্তু এ বিষয়ে সাওদার মতামত কি, তা আমার জানা নেই। আমি বললাম, সে এ বিষয়ে আগ্রহী। এরপর মহানবী (সা) সেখানে আগমন করলেন এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হল।

হযরত সাওদার ভাই আবদুল্লাহ ইবন যাম'আ তখনও ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি। যখন বিয়ের সংবাদ সে অবগত হল, লজ্জায় মাথায় মাটি ঢেলে দিল। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি এজন্য খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন। যখনই তাঁর এ ঘটনার কথা মনে পড়ত, তিনি বলতেন, সে সময় আমি কতই না মূর্খ ছিলাম যে,

মহানবী (সা) আমার বোনকে বিয়ে করেছেন এজন্য আমি দুঃখ অপমানে মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছি। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ হাসান সূত্রে (সহীহ) বর্ণনা করেছেন।[১]

হযরত সাওদা (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) -এর বিবাহ সমসাময়িককালে হয়েছিল। এজন্য সীরাত বিশারদদের মধ্যে এ নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায় যে, কোন বিয়েটি প্রথমে হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, হযরত সাওদা (রা)-এর বিয়েই প্রথমে হয়েছিল।[২] এক সময় মহানবী (সা) সাওদা (রা)-কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন। তখন সাওদা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমাকে আপনার দাম্পত্যে থাকার সুযোগ দিন। আমার কামনা যে, আল্লাহ তা'আলা হাশরের ময়দানে আমাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে উঠাবেন। যেহেতু আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি, এজন্য আমি আমার সাথে আপনার রাত্রি যাপনের পালা হযরত আয়েশাকে দিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেন। কোন কোন বর্ণনায় তিনি তাঁকে তালাক দিয়েছিলেন এবং আবার ফিরিয়ে নেন্ বলে উল্লেখ আছে (সঠিক তথ্য আল্লাহই ভাল জানেন)।[১]

আকৃতি ঃ হযরত সাওদা (রা) শরীরের কাঠামো দীর্ঘ ও ভারী ছিল। রসিক স্বভাবের ছিলেন। কখনো মহানবী (সা)-কে হাসাতেন। ২৩ হিজরীতে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের শেষভাগে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। (বুখারী সহীহ্ সনদে তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)।

৫৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন বলেও বর্ণনা আছে। ওয়াকিদী এটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলেছেন।[৪]

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা)

হযরত আয়েশা (রা) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা ছিলেন। মাতার নাম যয়নাব ও উপনাম উম্মে রুমান।[৫] হযরত আয়েশা (রা)-এর কোলে কোন সন্তান হয়নি। তবুও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ ইবন যুবায়েরের নামে নিজকে উম্মে আবদুল্লাহ উপনামে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত সাওদা (রা)-এর পরে দশম হিজরীর শাওয়াল মাসে মহানবী (সা) তাঁকে বিবাহ করেন। খাওলা বিনতে হাকীম মহানবীর পক্ষ হতে

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২৭।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২২৭।

৩. আল-ইসাবা, ৪খ, পৃ. ৪৩৮

৪. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪৩৮

৫. উম্মে রুমান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুবারক হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। সিদ্দীকে আকবার (রা) হিজরত করে মদীনায় পৌছার পর উম্মে রুমান আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রা)-কে সাথে নিয়ে মদীনা হিজরত করেন। প্রসিদ্ধ মতে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দেহ কবরে নামান এবং তাঁর মাগফিরাতের জন্য দু'আ করেন। বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন ইসাবা, ৪র্থ, পৃ ৪৫০।

প্রস্তাব পেশ করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, মুত্ঈম ইবন আদী তার ছেলের জন্য আয়েশার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমি তাতে সম্মতি দিয়েছিলাম। وَاللّٰهِ مَا اَخْلَفَ اَبُوْبَكْرٍ وَعْدًا قَطُّ "আল্লাহর কসম, আবূ বকর কখনো ওয়াদা খেলাফ করে নাই।"

এ কথা বলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সোজা মুত্ঈম-এর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, বিয়ের ব্যাপারে তোমার চিন্তা-ভাবনা কি? মুত্ঈমের স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিল। মুত্ঈম তাকে বলল, তোমার মতামত কি? স্ত্রী হযরত আবূ বকর (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ তোমার সাথে বিয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমার দারুণ আশঙ্কা রয়েছে যে, আমার ছেলে আবার ধর্ম ত্যাগী না হয়ে যায়। সে নিজ পিতৃপুরুষের ধর্ম বর্জন করে তোমাদের ধর্মে দাখিল হয়ে যাবে। আবূ বকর বললেন ওহে মুতঈম, তুমি কি বল? সে বলল ঃ বলল ঃ তুমি তো আমার স্ত্রীর বক্তব্য শুনেছ। এভাবে সে ও তার স্ত্রী দু'জনে একমত হয়ে প্রস্তাব প্রত্যাহার করল। এবার হযরত আবূ বকর (রা) বুঝলেন ও অনুধাবন করলেন যে এবার ওয়াদা ভঙ্গের দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে না। এভাবে তিনি সোজা নিজ ঘরে ফিরে এসে খাওলাকে জানালেন, আমি প্রস্তাবে সম্মত আছি, মহানবী (সা) যখন ইচ্ছা আগমন করবেন। এরপর মহানবী (সা) তাশরীফ নেন এবং বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। মাহর হিসেবে চারশত দিরহাম নির্ধারণ করা হয়।

হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে বিবাহ হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ছয় বছর। হিজরতের সাত-আট মাস পরে শাওয়াল মাসেই নব বধূর স্বামীগৃহে গমনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স নয় বছর হয়েছিল। মহানবী (সা)-এর সাথে তাঁর দম্পত্য জীবন ৯ বছর ছিল। মহানবী (সা)-এর ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর। তারপর তিনি ৪৮ বৎসর জীবিত ছিলেন। ৫৭ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। ওসীয়ত অনুযায়ী অন্যান্য পবিত্র বিবিদের মত তাঁকে রাতে জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় ৬৬ বছর বয়স হয়েছিল।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার নামাযের ইমামতি করেন। কাসিম ইবন মুহাম্মদ, আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবন আবু আ'তীক, এবং হযরত যুবায়র (রা)-এর দু'ছেলে আবদুল্লাহ ও উরওয়া দু'জনই তাঁকে কবরস্থ করেন।[১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। মহানবী (সা) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নারীর বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার

১. যারকানী, ৩ খ পৃ. ২২৯।

পক্ষ হতে ওহী না নিয়ে এসেছে, ততক্ষণ আমি কোন নারীকে বিবাহের সিদ্ধান্ত করিনি। এভাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর ব্যাপারেও এমনটি হয়েছিল। মহানবী (সা) বলেন জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে জানালেন আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের মেয়ের সাথে আপনার বিয়ে দিয়েছেন। জিবরাঈলের সাথে আয়েশার একটি ছবিও ছিল। ছবিটি আমাকে দেখিয়ে বললেন সে আপনার স্ত্রী।[১] বিষয়টি বুখারী মুসলিমের হাদীসেও আছে।

নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সূক্ষ্মদৃষ্টির মত গুণাবলী পিতা থেকে অর্জন করেছিলে। তাঁর মাতা ছিলেন উম্মু রুমান। যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা) মন্তব্য করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন সুন্দরী হূর দেখতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে উম্মু রুমানকে দেখতে পারে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২]

এজন্য মহান আল্লাহ জালালুহুর করুণা ও অনুদান তার জন্য প্রত্যাশিত ছিল যে, প্রিয় নবীর গুহার সাথী ও প্রিয়জনের পূত-পবিত্র মেয়ে শিশু অবস্থায়ই নবীর দাম্পত্যে ও শিক্ষায় দিয়ে দেয়া হবে।

কেননা তাঁর হৃদয়-শরীর সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ছিল। কোন পাপের ছবি তখনো এ শিশুর উপর অংকিত হয়নি। নিষ্পাপ সময়ে ছিলেন। পিতা মাতার পক্ষ হতেও কোন পাপের ছবি পরিলক্ষিত হয়নি। পিতা ছিলেন সিদ্দীক। আর মা-ত সুন্দরী হূরের নমূনা। এধরনের পূত পবিত্র কাঠামোতে নবুওয়াতের বিদ্যার যে শিল্পচিত্রও চিহ্নিত হবে তা স্বচ্ছ স্বভাবতই নির্ভুল ও স্থায়ী রূপ লাভ করবে, যা কখনো ম্লান হবে না।

এভাবেই তিনি নয় বৎসরে (হযরত আয়েশা) এত ব্যাপক বিস্তীর্ণ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। মহানবী (সা) ইন্তিকালের পর প্রবীন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোন বিষয়ে জটিলতা বা সন্দেহের সৃষ্টি হলে তা হযরত আয়েশা (রা) এর নিকট পেশ করা হতো। সাহাবায়ে কেরামের যুগে হযরত আয়েশা (রা) এর জ্ঞান এবং ইতিহাস ও বিধিবিধান বিষয়ক দক্ষতা ছিল স্বীকৃত। এমনকি এমনও বলা হয়েছে যে, ইসলাম বিধি বিধানের এক চতুর্থাংশ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম যদি কখনো কোন বিষয়ে সন্দেহ পড়তেন তখন হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করতেন। এবং তাঁর নিকট সে সমস্যার কোন সমাধান অবশ্যই পাওয়া যেত। -(তিরমিযী)

---

১. মহান আল্লাহ তা'আলা ছবি প্রেরণ করেছেন এ বিষয়টি দিয়ে মানুষের ছবি চর্চাকে বৈধতা দেয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করা ঠিক হবে না, এবং এ বিষয়ে (শরী'আতের বিধান যেমন) হাদীসে ছবির চর্চাকে নিষেধ করা হয়েছে এবং ছবি চর্চাকারী গুনাহগার হবে (এ ধরনের বিধান প্রযোজ্য হবে)।

২. যারকানী , ৩ খ, ৩৩৪ পৃ.

ইল্ম-জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা

ইমাম যুহরী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) এর ইল্ম বা জ্ঞান অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীন ও সব মহিলাদের সাথে তুলনা করলে তাঁর অবস্থান—সেরাও বিজয়ী হবে।

ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অলংকারের দিক থেকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে আমীর মু'আবিয়া (রা) বলেন : আমি বক্তা হিসেবে হযরত আয়েশা (রা) থেকে প্রাঞ্জলভাষী ও অলংকারপূর্ণ বক্তৃতার কোন বক্তা দেখিনি। (তাবারানী) আরবের ইতিহাস এবং ঘটনাবলী তাঁর আয়ত্তে ছিল। অনেক কবিতাও মুখস্থ ছিল। যখন কোন বক্তব্য দিতেন তখন তিনি কোন কবিতা অবশ্যই শুনাতেন। (আবু যিনাদ)[১]

যুহদ-ভোগ বিলাস বিমুখতা

এতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার বাস্তব চিত্রের উল্লেখ ছিল। এখন তাঁর অবৈষয়িক ভোগ-বিলাসীতাবিহীন চরিত্রের একটি ঘটনা শুনুন। কেননা সত্যিকার মর্যাদা ও পূর্ণতার মাপকাঠি-জ্ঞান ও নির্লোভ-অবৈষয়িক চরিত্রের মধ্যেই নিহিত আছে। পার্থিব বিষয়ের লোভ, ভালবাসা ও ভোগ বিলাস সব পাপের মূলসূত্র। একইভাবে যুহদ বা অবৈষয়িকতা নির্লোভ সব পূণ্যের ও কল্যাণের ভিত্তি।

اَللّٰهُمَّ زَهِدْنَا فِى الدُّنْيَا رَغِّبْنَا فِى الْاُخْرٰى -

"হে আল্লাহ! দুনিয়ার লোভনীয় বিষয় থেকে আমাদেরকে বিরত রাখ, এবং পরকালের প্রতি আমাদেরকে আগ্রহী কর।" আমীন!

ঘটনাটি হচ্ছে, উম্মু দারদা (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে আসা যাওয়া করতেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা) এর কাছে দু'বস্তা মুদ্রা প্রেরণ করেন। তাতে প্রায় একলাখ আশি হাজার দিরহাম ছিল। সন্ধ্যায় দেখা গেল, একটি দিরহামও বাকী নেই। সেদিন তিনি রোযা ছিলেন। ইফতারের সময় খাদেমকে ইফতার দিতে বললেন। খাদেম ইফতার হিসেবে রুটি ও যায়তুনের তেল এনে দিল। উম্মু দারদা (রা) বললেন, এক দিরহামের গোশত আনলে ভাল হত। হযরত আয়েশা (রা) বললেন : আগে স্মরণ করিয়ে দিলে তা আনার ব্যবস্থা করতাম।

উরওয়া ইবন যুবায়র (রা) বলেন : আমি দেখেছি, হযরত আয়েশা (রা) সত্তর হাজার দিরহাম বিতরণ করতেন কিন্তু তাঁর গায়ে তালি লাগানো পোশাক ছিল। এসব মহত্ব ও বদান্যতার কারণেই মহানবী (সা) তাঁকে অধিক ভাল বাসতেন। শুধু কুমারী হওয়ার কারণে যদি এমনটি হত, তা হলেও হযরত খাদীজা (রা)-কে ভুলে যেতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল এই যে, তিনি সর্বদা খাদীজা (রা)-এর স্মৃতিচারণ করতেন। শুধু তা-ই নয়, যখন কোন পশু যবাই করতেন তখন হযরত খাদীজা (রা)-এর বান্ধবী

১. যারকানী, পৃ. ৩৩৪

মহিলাদেরকে খুঁজে খুঁজে গোশ্ত বিতরণ করতেন। যতদিন খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন তিনি অন্য কোন মহিলাকে বিয়ে করেন নি। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্তমানেও তিনি আটটি বিয়ে করেছেন এবং সকলেই বিধবা ছিলেন। এসব বিবাহের উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্!) যদি শুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা চরিতার্থ করাই হত তা হলে তিনি একজন বিধবাকেও বিয়ে করতেন না। হযরত উম্মু সালামা (রা) এবং হযরত সাফিয়্যা (রা) তাঁরা ত হযরত আয়েশা (রা) থেকে অধিক সুন্দরী ছিলেন না (তা হলে তিনি এসব বিধবাকে কেন বিবাহ করতে গেলেন)? বস্তুত শুধুমাত্র দ্বীনের শিক্ষা চর্চাই তাঁর একাধিক বিবাহ করার উদ্দেশ্য ছিল। বিষয়াবলী ও বিধান বলী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত তা তাঁর পবিত্র পত্নীদের মাধ্যমেই সহজে নারী সমাজের মধ্যে প্রচারিত হতে পারতো। আসলে তাঁরা সকলেই মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রী ছিলেন। পক্ষান্তরে মসজিদে নববীতে পুরুষদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ দেয়া হত। আর ঘরে পূত-পবিত্র বিবিদেরকে শিক্ষা দেয়া হত। কেননা পরবর্তী সময়ের জন্য এ বিবিগণ উম্মাতের নারীদের জন্য শিক্ষিকা হিসেবে পরিগণিত হবেন। সব বিবিই তাঁদের নিজস্ব যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর আয়েশা সিদ্দীকা (রা) শিক্ষা ও জ্ঞান লাভে অন্যান্য বিবিদের থেকে অগ্রগামী ছিলেন।

وَذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

এজন্যই উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রা) এবং হযরত ফাতিমাতুয্ যুহ্রা (রা), এরপর হযরত আয়েশা সিদ্দিকী (রা) সবচেয়ে মর্যাদাবান ও নেককার হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

সারকথা

আলোচনার সারাংশ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই হযরত আয়েশা (রা)-কে পূর্ণতা ও নৈতিকতার উৎকর্ষ দান করেছেন। তারপর পয়গাম্বর (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তাঁকে তাঁর দাম্পত্যে গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর আকর্ষণীয় সাহচর্যে ও প্রশিক্ষণ দানে সেই স্বভাবগত পূর্ণতার প্রকাশ ঘটবে এবং তাঁর জ্ঞান ও মহত্ব দ্বারা দুনিয়াবাসী উপকৃত হবে। তাই হয়েছিল। প্রবীণ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

হযরত উমর ফারূক (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর, হযরত আবু মূসা আশ'আরী এবং আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ সাহাবীগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, প্রবীণ তাবিঈদের মধ্যে সাঈদ ইবন মুসায়্যাব, আম্র ইবন মায়মূন, আলকামা ইবন কায়স, মাসরূক, আবদুল্লাহ ইবন হাকীম, আস্ওয়াদ ইবন ইয়াযিদ, আবূ সালামা ইবন আবদুর রহমান প্রমুখ তাবিঈ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

এসব কাহিনী ও অবস্থার পরও কি কোন সমালোচক ও অপবাদকারীর একথা বলার সুযোগ আছে যে, নাউযুবিল্লাহ্। এই বিবাহ প্রবৃত্তির লালসা পূরণের স্বার্থে হয়েছিল? বরং সত্য হচ্ছে, এ বিয়ে মহা প্রভুর আসমানী নির্দেশে হয়েছে।

মর্যাদা ও মহত্ব

১. হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন একদিন মহানবী (সা) বললেন : হে আয়েশা! এই যে জিবরাঈল তোমাকে সালাম জানাচ্ছে। আমি বললাম, আলাইহিস্‌সালাম ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহূ, এবং আমি নিবেদন করলাম হে রাসূল! আপনি তাঁকে দেখছেন, আমি কিন্তু দেখছি না।

২. হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলল্লাহ (সা) বলেছেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতার মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছেন। কিন্তু মহিলাদের মধ্যে শুধু মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউন পত্নী আসিয়া ব্যতীত কেউ পূর্ণতার মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। আর আয়েশার মর্যাদা অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে খাদ্যের মধ্যে সারীদের ন্যায় (তৎকালীন আরবে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ মজাদার খাদ্য বিশেষ)।

উক্তি দু'টি হাদীসই ইমাম বুখারী মানাকিব (মর্যাদা) অধ্যায়ে আয়েশা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন।

৩. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কিছু বৈশিষ্ট্য ও স্বভাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে আমাকে দান করা হয়েছে। যা হযরত মরিয়ম (আ) ব্যতীত আর কোন মহিলাকে দান করা হয়নি। আল্লাহর শপথ! বিষয়টি আমি অহংকার প্রকাশের জন্য বলছি না, বরং আল্লাহ্ তা'আলার (নিয়ামতকে প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য) তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

(১) বিবিদের মধ্যে আমি ব্যতীত কেউ কুমারী ছিলেন না।

(২) বিয়ের পূর্বে ফেরেশ্‌তা আমার ছবি নিয়ে নাযিল হয়েছেন এবং রাসূল (সা)-কে দেখিয়ে বলা হয়েছে : এই যে আপনার বিবি। আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে আপনি তাকে বিয়ে করবেন।

(৩) রাসূলুল্লাহ, (সা) আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন।

(৪) মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সব চেয়ে প্রিয়জন যিনি ছিলেন, আমি হচ্ছি তাঁর কন্যা। আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আসমান থেকে কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।

(৫) আমি পবিত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছি। পূত-পবিত্রের কাছে ছিলাম এবং আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য মাগফিরাত ও উত্তম রিযিকের ওয়াদা করেছেন।

(৬) আমি জিবরাঈলকে দেখেছি। আমি ব্যতীত অন্যান্য বিবিগণ জিবরাঈলকে দেখেননি।

(৭) আমি মহানবী (সা)-এর সাথে একই কম্বলের ভিতর ছিলাম, সে অবস্থায় জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসতেন। অন্য কোথায়ও এভাবে ওহী নাযিল হয়নি।

(৮) আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রাত্রি যাপনের পালা দু'দিন দু'রাত ছিল এবং অন্যান্য বিবিদের পালা একদিন একরাত ছিল। ২য় দিনটি হযরত সাওদা (রা)-এর ছিল। তিনি বার্ধক্যে পৌছার কারণে হযরত আয়েশা (রা)-কে তাঁর অংশ দান করে দিয়েছিলেন।

(৯) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের সময় হযরতের মাথা মুবারক আমার কোলে ছিল।

(১০) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওফাতের পর আমার হুজরায় তাঁকে দাফন করা হয়েছে।[১]

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা বিনতে ফারূকে আযম (রা)

হযরত হাফসা (রা) হযরত উমর ফারূক ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কন্যা ছিলেন। মাতার নাম যয়নাব বিনতে মাযয়ন (রা) হযরত হাফসা নবুয়্যতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন, যখন কুরায়শগণ কা'বাঘরের নির্মাণ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। প্রথম বিবাহ খুনাইস ইবন হুযাফা সাহ্মী (রা)-এর সাথে হয়েছিল। স্বামীর সাথে মদীনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের পর স্বামী খুনাইস ইন্তিকাল করেন।[২]

হাফসা (রা) যখন বিধবা হলেন হযরত উমর (রা) হযরত উসমান গনী (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তাঁকে বললেন, আপনি যদি সম্মত হন তাহলে হাফসাকে আপনার সাথে বিবাহ দেব। হযরত উসমান (রা) উত্তর দিলেন, চিন্তাভাবনা করে বলব। তারপর যখন উসমান (রা) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল তখন হযরত উসমান (রা) অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। হযরত উমর (রা) বর্ণনা করেন, তখন আমি আবূ বকরের সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, আপনি যদি চান তাহলে আমি হাফ্সাকে আপনার নিকট বিয়ে দেব। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) কথা শুনে চুপচাপ রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। উমর (রা) বলেন, এতে আমি মনঃক্ষুণ্ন হলাম। তারপর তিন কি চার দিন গত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের জন্য বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। তখন আমি তাঁর সাথে হাফসাকে বিয়ে দিয়ে দিলাম। এরপর একদিন আবূ বকর সিদ্দীকের সাথে দেখা হলে তিনি বললেন, উমর! তুমি হয়ত বা আমার উপর মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ। আসলে আমি জানতাম রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছেন। এজন্য আমি চুপচাপ ছিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোপন ব্যক্তিগত বিষয়কে প্রকাশ করে দেয়া সঠিক বলে মনে করি। তিনি যদি তাঁকে বিয়ে না করতেন তা হলে আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করতাম। এভাবে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী তৃতীয় হিজরীতে নবী করীম (সা) হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন।

---

১. মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৯ খ, পৃ. ২৪১

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৩৬

এক সময় মহানবী (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে তালাক দিলেন। তখন জিব্‌রাঈল (আ) ওহী নিয়ে এলেন।

ارجع حفصه فانها صوامة قوامة وانها زوجتك فى الجنة

"হযরত হাফসাকে আপনি ফিরিয়ে নিন্, তিনি অধিক রোযাদার ও অধিক ইবাদতকারী মহিলা এবং জান্নাতে আপনার বিবি।"

এরপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। (ইবন সা'দও তাবারানী)[১]

৪৫ হিজরী সনে তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। তখন হযরত মু'আবিয়ার খেলাফত যুগ ছিল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬০। মারওয়ান ইবন হাকাম জানাযা নামাযের ইমামতি করেন।[২]

উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে খুযায়মা (রা) উপাধি উম্মুল মাসাকীন

নাম যায়নাব। জাহিলী যুগ থেকেই তিনি বদান্যতা ও দানশীলতার কারণে গরীবের মা বা 'উম্মুল মাসাকীন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতার নাম খুযায়মা ইবন হারিস হিলাল। প্রথম বিবাহ হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা)-এর সাথে হয়েছিল। ৩য় হিজরীতে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশ (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। বিধবার জন্য নির্ধারিত শোক সময় অতিবাহিত হবার পর রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বিবাহ করেন।

৫০০ দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বিয়ের দু'তিন মাস পরেই ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে জানাযার নামাযের ইমামতি করেছেন। জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।[৩]

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা বিনতে আবূ উমায়্যা (রা)

উম্মু সালামা তাঁর উপনাম নাম ছিল। তাঁর নাম ছিল হিন্দ। তাঁর পিতা ছিলেন আবূ উমায়্যা কারশী মাখযূমী। মায়ের নাম আতিকা বিনতে আ'মর ইবন বারী'আ। প্রথম বিবাহ চাচাত ভাই আবূ সালামা ইবন আবদুল আসাদ মাখ্‌যূমীর সাথে হয়েছিল। স্বামীর সাথে মুসলমান হয়েছেন এবং তাঁর সাথে হাবশায় হিজরত করেছেন। তারপর মক্কায় ফিরে এসে পুনরায় মদীনায় হিজরত করেন (এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা হিজরত অধ্যায়ে গত হয়েছে)।

হযরত আবূ সালামা (রা) বদর, উহুদ যুদ্ধে শরীক হয়েছেন। ওহুদ যুদ্ধে তিনি বাহুতে মারাত্মকভাবে আহত হন। একমাস চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে যান। ৪র্থ হিজরীতে রাসূল (সা) মুহাররামে একটি অভিযানে তাঁকে আমীর করে প্রেরণ করেন, ২৯ দিন পর ফিরে আসেন। এরপর তাঁর ক্ষতস্থানে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং হিজরী ৪র্থ সালের ৮ই জমাদিউস সানীতে ইন্তিকাল করেন।[৪]

---

১. আল-ইসাবা, ৪ খণ্ড

২. যুরকানী, ৩ খ, পৃ. ৩৩৮

৩. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৪৯; উয়ূনুল আসার, ২ খ. পৃ. ৩০৩

৪. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৪।

উম্মু সালামা (রা) বলেন, একবার আমার স্বামী আবূ সালামা ঘরে আসলেন এবং বললেন, আজ আমি রাসূল (সা) থেকে একটি হাদীস শুনে এসেছি। হাদীসটি আমার নিকট দুনিয়ার সব কিছু থেকে উত্তম। তা হচ্ছে কোন ব্যক্তি যদি কোন সমস্যা বা বিপদ মুসীবতে পতিত হয়, তখন যদি সে ইন্নালিল্লাহ্ ... পড়ে এবং এরপর দু'আ করে–

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَخْلِفْنِىْ فِيْهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا -

"হে আল্লাহ্! আমার এই বিপদে আমি তোমার নিকট উত্তম বিনিময় আশা করি। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদের পর আমাকে এর চেয়ে তুমি উত্তম বিনিময় দান কর।"

এই দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাকে উত্তম বিনিময় দান করবেন। (নাসাঈ)

উম্মু সালামা (রা) বলেন, আবূ সালামা ইন্তিকাল করার পর আমার এই হাদীসটি মনে পড়ে গেল। যখন আমি এই দু'আ করার ইচ্ছা করলাম; তখন মনে মনে ভাবলাম আমার জন্য আবূ সালামা থেকে উত্তম কে হতে পারে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন এজন্য আমি দু'আটি পড়লাম। ফলস্বরূপ আমার নির্ধারিত শোক দিবসের পর রাসূল (সা) আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন যার থেকে উত্তম ব্যক্তি আর কেউ হতে পারে না।[১]

মহানবী (সা) যখন তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন তখন তিনি কয়েকটি ওযর উল্লেখ করলেন।

(১) আমার বয়স বেশি।

(২) আমার সন্তান আছে, আমার সাথে ইয়াতীম শিশু আছে।

(৩) আমার আত্মমর্যাদাবোধ বেশি–(এজন্য আপনার সাথে অপ্রত্যাশিত কিছু হতে পারে) রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর আপত্তির জবাবে বললেন : আমার বয়স তোমার থেকে বেশি। তোমার সন্তান রাসূলের সন্তান হবে। আর আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করব যেন তোমার মার্যাদাবোধ (যার স্পর্শকাতর স্বভাবের তুমি আশংকা করছ, তার ক্ষতিকর দিক) তোমার থেকে চলে যাক। বস্তুত রাসূলুল্লাহ (সা) দু'আ করেছিলেন এবং তা যথার্থই হয়েছিল।

হিজরী ৪র্থ সনের শাওয়াল মাসে তাঁর সাথে বিবাহ হয় (শাওয়ালের শেষ সপ্তাহ)। হযরত আনাস (রা) থেকে মুসনাদে বায্যার-এ বর্ণিত আছে মাহরানার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু সামগ্রীও তাঁকে দিয়েছিলেন যার মূল্য দশ দিরহাম হবে।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, তিনি একটি লেপ্ যার ভিতর তুলার মত খেজুরের ছাল ছিল, একটি পেয়ালা এবং একটি রেকাবী ও একটি যাঁতা (গম পেষার) তাঁকে দিয়েছিলেন।[২]

---

১. আল ইসাবা, ২ খ, পৃ. ৩৩৫

২. যুরকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪১।

ওফাত

তাঁর মৃত্যুর সন নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী (রা) তারীখে কাবীরে বলেছেন, তিনি ৫৮ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেছেন। ঐতিহাসিক ওয়াকিদী বলেছেন ৫৯ হিজরীর কথা। আর ইবন হিব্বান বলেন, ৬১ হিজরীর দিকে তিনি ইন্তিকাল করেছেন, যখন ইমাম হাসান (রা) এর শাহাদাতের সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল। আবু নু'আঈম বলেন, ৬২ সনে ইন্তিকাল করেছেন। আসকালানী আল-ইসাবা গ্রন্থে ৬২ সনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ৮৪ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন। উম্মুল মু'মিনীনদের মধ্যে তিনি সর্বশেষ ইন্তিকাল করেছেন। (আল-ইসাবা ৪ খ, পৃ. ৪৫৯- অনুচ্ছেদ ঃ হিন্দ বিনতে আবূ উমায়্যা)

প্রথম স্বামীর পক্ষের দু'সন্তান উমর এবং সালামা এবং আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমায়্যা ও আবদুল্লাহ ইবন ওহাব ইবন যাম'আ কবরে অবতরণসহ দাফনে শরীক ছিলেন। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

মর্যাদা

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামার উচ্চ মর্যাদা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি স্বীকৃত ছিল। হুদায়বিয়ার সময় যখন রাসূল (সা) সবাইকে কুরবানীর জানোয়ার যবাই করার জন্য এবং মাথা মুণ্ডানোর জন্য তিনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউই তা পালন করছিল না, উম্মু সালামাকে যখন তা অবগত করানো হলো, তিনি বললেন : হে রাসূল! সাহাবায়ে কিরাম এই চুক্তির বিষয়ে দুঃখভারাক্রান্ত, আপনি এদেরকে এ বিষয়ে আর কিছু বলবেন না, বরং আপনি নিজে আপনার জানোয়ার প্রথমে কুরবানী করে ফেলুন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলুন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন তাঁর কুরবানীর জানোয়ার যবাই করতে শুরু করলেন, তখনই সাহাবায়ে কিরামও নিজ নিজ পশু যবাই করে মাথা মুণ্ডাতে শুরু করলেন। হযরত উম্মু সালামার মতামত ও পরামর্শে এ ধরনের একটি জটিলতার অবসান হলো। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন! তাঁর আকৃতি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন : যখন উম্মু সালামাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বিয়ে করলেন তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের কারণে আমার মধ্যে ঈর্ষার সৃষ্টি হয়েছিল।[১]

উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা)

হযরত উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) এর ফুফী উমায়মা[২] বিনতে আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যা ছিলেন। অর্থাৎ সম্পর্কে তিনি মহানবী (সা)-এর ফুফাত বোন ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দাম্পত্যে আসার পূর্বে তাঁর সাথে

১. আল-ইসাবা, ৪ খ. পৃ ৪৫৫

বিবাহ হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পালিতপুত্র ও আযাদ করা গোলাম হযরত যায়িদ ইবন হারিসার সাথে। তাঁদের মধ্যে পরস্পর মিলমিশ না হওয়ার কারণে তিনি তাঁকে তালাক দিয়ে দেন।

হযরত যায়িদ (রা) ছিলেন আযাদকৃত গোলাম, পক্ষান্তরে হযরত যায়নাব ছিলেন অভিজাত বা মর্যাদাবান বংশের। তিনি নবী (সা)-এর ফুফাত বোনও ছিলেন। আরব সমাজে আযাদকৃত গোলামের সাথে মর্যাদাবানদের বিয়েকে অপমানকর মনে করার কুসংস্কার ছিল। ফলে রাসূল (সা) যখন হযরত যায়িদের জন্য যায়নাবের বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন, তখন যায়নাবের ভাই এবং যায়নাব দু'জনই এ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ বিষয়ে তখন আল-কুরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَمُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا -

এই আয়াতের মু'মিন বলতে আবদুল্লাহ ইবন জাহাশকে অর্থাৎ হযরত যায়নাব (রা) এর আপন ভাইকে বুঝানো হয়েছে। এবং মু'মিনা বলতে হযরত যায়নাবকে বুঝানো হয়েছে। এখানে আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে, কোন বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা দেয়ার পর কোন মু'মিন বা মু'মিনার এই সুযোগ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালাকে অস্বীকার করবে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁরা দু'জনই এই প্রস্তাবে রাযী হয়ে যান। তারপর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ে ত হয়ে গেল কিন্তু যায়নাবের দৃষ্টিতে যায়িদ নগণ্য ও তুচ্ছ হিসেবে মনে হচ্ছিল। এজন্য ঘরে দু'জনার মধ্যে মিলমিশ পয়দা হয়নি, বরং পরস্পর মতপার্থক্য লেগেই ছিল। যায়িদ যায়নাবের বেপরোয়াভাব নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে প্রায়ই অভিযোগ করতেন। এরপর তিনি যায়িদকে তালাক দেয়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে তালাক থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, তুমি আমার মাধ্যমে এই বিয়ে করেছ, এইজন্য তুমি যদি তালাক দাও, তা-হলে আমার জন্য আমার বংশের নিকট তা অপমানজনক হবে। তারপর বারবার যখন তাদের পারস্পরিক ঝগড়া ও অভিযোগ আসতে লাগল তখন তিনি মনে মনে ভাবলেন তাদের সম্পর্ক যদি ছিন্ন হয়েই যায়, তা-হলে তাঁকে তিনি স্বয়ং বিয়ে করা ব্যতীত যায়নাবের মানসিক অবস্থার উন্নতি করা যাবে না। কিন্তু পিছনে মূর্খ লোকদের ও মুনাফিকদের কানাঘুষার আশংকা করলেন। তারা সমালোচনা করবে ও অপবাদ ছড়াবে যে, তিনি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও পালিত পুত্রের বিষয়ের

২. উমায়মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে। আল ইসাবা দ্র.।

বিধান এমনটি নয়। তৎকালীন আরবে দীর্ঘ দিন থেকে এ কুসংস্কার চালু ছিল যে, পালিত পুত্রের পরিত্যক্ত বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা খুবই গর্হিত কাজ। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাও ছিল যে, মহানবী (সা)-এর কর্মের মাধ্যমে এই কুসংস্কার বিলোপ করা। ফলে ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা)-কে জানিয়ে দিলেন–যায়িদের তালাকের পর যায়নাব আপনার দাম্পত্যে আসবে। তা হলে লোকের এ ধারণা পাল্টে যাবে যে, পাতানো ছেলের বউকে আর নিজ ছেলের বউকে বিয়ে করা এক ধরনের নয়। কিন্তু ভবিষ্যত ঘটবে এধরনের অহীর নিদের্শনকে তিনি বিশ্বাস করার পরেও দুষ্ট ও কপট লোকদের কুৎসা ও সমালোচনার আশংকায় জনসম্মুখে প্রকাশ করা থেকে বিরত রইলেন। তিনি এমন অবস্থায় সময়ের অপেক্ষায় রইলেন। সময়ের ব্যবধানে অবশ্যই সবকিছু প্রকাশিত ও বাস্তবায়িত হবে। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতেও এ বিষয়টি প্রকাশ ও ব্যক্ত করার জন্য বলা হয়নি। এ জন্য মহানবী (সা) বিষয়টি আল্লাহর পরিকল্পনা হিসেবে গোপন করে রাখেন। এবং প্রকাশ্য বিধান অনুসারে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান সমঝোতার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি যায়িদকে তালাক না দেয়ার পরামর্শ দেন ও স্ত্রীর বেপরওয়া দুঃখজনক অবস্থানকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার জন্য চেষ্টা করতে বলেন।

কোন ব্যক্তি যদি ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হয়, যা আল্লাহ তা'আলার সিদ্ধান্তে অবশ্যই বাস্তবে ঘটবে, তবুও তাঁকে বর্তমান অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণ হিসেবে প্রচলিত ও প্রকাশ্য বিধানের অনুসরণ করে যেতে হবে। তাকদীরী ফায়সালা সময়মত অবশ্যই প্রকাশিত হয়ে যাবে।

পরিশেষে একদিন হযরত যায়েদ (রা) এসে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার অবস্থা নাজুক ও আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ায় আমি যায়নাবকে তালাক দিয়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) চুপচাপ রইলেন।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত যায়নাব (রা)-এর তালাকোত্তর নির্ধারিত সময় পূর্ণ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) যায়িদ (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমিই যায়নাবের নিকট যাও এবং আমার পক্ষ হতে তাকে বিয়ের প্রস্তাব পেশ কর (তাতে বিষয়টি প্রকাশ্যে প্রচারিত হবে যে, যায়িদের সম্মতিতে ঘটনাটি হয়েছে) হযরত যায়িদ মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব নিয়ে যায়নাবের গৃহে গমন করেন। ঘরের দরজার সামনে বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়ালেন (যদিও তখনও পর্দার বিধান কার্যকর হয়নি, তবুও তা ছিল পূর্ণাঙ্গ তাক্‌ওয়ার দাবি)। তারপর বললেন, হে যায়নাব! আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) পাঠিয়েছেন তোমার নিকট তাঁর বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার জন্য। হযরত যায়নব (রা) সাথে সাথে জবাব দিলেন। আমি এ বিষয়ে এখন কিছু বলতে পারব না, যতক্ষণ না আমি আমার মহা প্রভুর সাথে পরামর্শ করি (ইস্‌তিখারা করি)। তিনি তখন উঠে গিয়ে ঘরে নির্ধারিত নামাযের স্থানে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে ইসতিখারায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

যেহেতু হযরত যায়নাব (রা) পৃথিবীর কোন মানুষের সাথে পরামর্শ করেন নি, বরং আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট পরামর্শ চেয়েছেন এবং আল্লাহর নিকটেও কল্যাণ কামনা করেছেন যিনি সতিকার অর্থে মু'মিনদের প্রকৃত মহামনিব, বন্ধু, অভিভাবক, এজন্য আল্লাহ তা'আলা নিজ অভিভাবকত্ব-ফেরেশতাদের উপস্থিতিতে হযরত যায়নাবের বিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) সাথে দিয়েছেন। আসমানে এই ঘোষণা হয়ে গেল, এখন যমীনেও এর ঘোষণা প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। অতঃপর জিবরাঈল (আ) এই আয়াতটি নিয়ে নাযিল হলেন ঃ

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا -

'অতঃপর যখন যায়দ তার সাথে নিজ প্রয়োজন শেষ করল, (তালাক দিয়ে দিল) তখন আমি যায়নাবের বিয়ে তোমার সাথে দিয়ে দিলাম।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৭)

তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবের গৃহে গমন করলেন এবং অনুমতি না নিয়েই ঘরে প্রবেশ করলেন। (মুসলিম-আহমদ, নাসাঈ) ফাতহুল, বারী, তাফসীর অধ্যায় ঃ অনুচ্ছেদ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ الاية[১]

এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হযরত আয়েশা (রা) ঘরে তাশরিফ আনেন তখন এই আয়াত নাযিল হয়। যখন ওহী শেষ হয় তখন মুচকী হেসে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, কে আছ, যে গিয়ে যায়নাবকে সুসংবাদ দিবে বলে তিনি

اِذْ يَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ

আয়াত শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে তিলাওয়াত করে শুনালেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন আয়াতগুলো তিলাওয়াত শেষে হলো, তখন আমার মনে আসল যায়নাব এমনিতেই অধিক সুন্দরীই তারপরে তাঁর বিয়ে আসমানে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হয়েছে এই ব্যাপারে তিনি গর্ববোধ করবেন।[২]

এই বর্ণনা থেকে মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা) যায়নাবের ঘরে গমন করার পূর্বেই বার্তাবাহকের মাধ্যমে খবর পৌঁছায়ে ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার বিয়ের ব্যাপারে এই আয়াতগুলো নাযিল করেছেন।

হযরত যায়নাব (রা) যখন অবগত হলেন তখন সিজ্‌দায় লুটিয়ে পড়লেন। (ইবনে সা'দ)[৩]

হযরত যায়নাব (রা) খোদায়ী ফায়সালা ও আসমানী ওহী পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন এজন্য মহানবী (সা)-এর তাঁর ঘরের অভ্যন্তরে দাখিল হওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। আয়াতে 'বিবাহ দিয়ে দিলাম' শব্দ ও আসমানী বিয়ের ঘোষণা এবং রাসূলুল্লাহ

---

১. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২৪৫।

২. আল ইসাবা, ১ খ, পৃ. ৩১৩।

৩. প্রাগুক্ত।

(সা) বিষয়টি অবগত করানোর পর মৌখিক ও বাস্তবে কবুল করে নেয়া. শোকরানা, সিজ্‌দা আদায় করা এবং আনুষ্ঠানিক বিয়ের প্রস্তাব পূর্বেই যায়িদের মাধ্যমে পৌঁছা, এসব কিছু আনুষ্ঠানিক ও প্রচলিত বিবাহের থেকে অধিক বাস্তবতা পূর্ণ ছিল।

ঘরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তোমার নাম কি? যেহেতু তাঁর আসল নাম ছিল বাররাহ তিনি তা জানালেন। মহানবী (সা) বাররাহ -এর পরিবর্তে 'যায়নাব' নাম রেখে দিলেন। (ইবন আবদুল বার)

এই ঘটনার পর কিছু মুনাফিক কুৎসা রটনা করতে শুরু করল। তারা বলল, মহানবী (সা) একদিকে বলে থাকেন পুত্রবধু বিয়ে করা হারাম। অন্যদিকে তিনি নিজেই পুত্রবধু বিয়ে করেছেন। এ ধরনের কপট লোকদের সমালোচনার জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٠

"হযরত মুহাম্মদ (সা) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন্, কাউকে তোমরা তাঁর ছেলে মনে করবে না বরং তিনি আল্লাহর রাসূল (এবং তিনি তোমাদের রূহানী পিতা, তোমরা তাঁর রূহানী ছেলে) তিনি আখেরী নবী। আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু জানেন।"

হযরত যায়নাব (রা)-এর বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা বিশেষজ্ঞদের নিকট এমনটিই, যা এখানে আমরা বর্ণনা করেছি। ইসলাম বিরোধী লোকেরা ও ধর্মদ্রোহীরা তাদের এ কথাকে প্রচার করেছে যে, নাউযুবিল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার যায়নাবের প্রতি দৃষ্টি পড়েছিল, তখন তাঁর অন্তর তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। তখন তিনি সুব্হানাল্লাহ্ ...... পড়েছিলেন। আর تُخْفِى فِىْ نَفْسِكَ আয়াতের মধ্যে যায়নাবের ভালবাসা তাঁর হৃদয়ে লুক্কায়িত থাকার অর্থে বর্ণিত হয়েছে! এই গল্প মুনাফিকরা মিথ্যা ও অপবাদ হিসেবে বানিয়েছে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি কখনোই এ ধরনের কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। এ ধরনের গল্পের কোন ভিত্তি নেই। অধিকাংশ মুফাস্‌সির এ ধরনের রটনাকে মিথ্যা মনগড়া ও অপবাদ বলে বর্ণনা করেছেন। যা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন, সূত্রবিহীন এবং যুক্তিবিরোধী। কেননা হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)এর আপন ফুফাত বোন। তিনি বাল্যকাল থেকেই তাঁকে দেখে আসছেন। তিনি তাঁকে বহুবার দেখেছেন ও তাদের পরস্পরে কোন পর্দা ছিল না। আর তখনো পর্দার বিধানও আসেনি, এ জন্য হযরত যায়নাব (রা) বিয়ের আগে-পরেও তাঁর মুখোমুখি হয়েছেন। বিষয়টি এমন নয় যে, বিয়ের পরই তিনি তাঁকে প্রথম দেখেছেন। যদি তাঁকে তাঁর খুব পছন্দই হতো তাহলে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে যায়িদের সাথে বিয়ে দিলেন কেন? যেখানে হযরত যায়নাব ও তাঁর অভিভাবকগণ অনেকটা বিপদে পড়েই সম্মত হয়েছেন। তিনি

কেন সে সময় নিজে তাঁকে বিয়ে করেননি? আর তাঁকে তখন বিয়ে করতে চাইলে আত্মীয়-স্বজন খুশি হয়েই তা কবূল করত।

নবীর দৃষ্টির পবিত্রতা

যৌক্তিক বুদ্ধি ও তথ্য সূত্র থেকে নিশ্চিতভাবে বিষয়টি প্রমাণিত যে, আল্লাহর নবীগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি পূত-পবিত্র নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকে। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা) কতিপয় অপরাধী ব্যক্তির রক্ত বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন তাদেরকে যদি কা'বা ঘরের গিলাফ ধরা অবস্থাও পাও তবুও তাদেরকে অব্যাহতি দিবে না, বরং হত্যা করে ফেলবে। তাদের অন্যতম ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবূ সারাহ। হযরত উসমান (রা) তার হাত ধরে মহানবী (সা)-এর দরবারে নিয়ে এলেন। তিনি বার বার মহানবী (সা)-কে আবেদন করছিলেন যে, তার বায়'আত গ্রহণ করুন, অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করে দিন। নবী (সা) চুপ্চাপ ছিলেন। তারপর বার বার অনুরোধ করার পর তিনি বায়'আত মঞ্জুর করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সমবেতদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, আমিও চুপচাপ ছিলাম যে, তোমাদের মধ্যে একজন উঠে আবদুল্লাহকে হত্যা করে ফেলবে। একজন আনসারী আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল, চোখে কেন ইশারা করলেন না? তিনি বললেন :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنَّ يَكُوْنَ لَهٗ خَائِنَةُ الْأَعْيُنِ ـ

"কোন নবীর জন্য এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি তাঁর চোখ দ্বারা খেয়ানতের কাজ করবেন।"

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَاتُخْفِى الصُّدُوْرِ ـ

এতে বুঝা গেল নবীর চক্ষু খেয়ানত থেকে পূত্র পবিত্র হয়ে থাকে। যেমনিভাবে নবীগণ নিষ্পাপ, তেমনিভাবে নবীদের চক্ষুও নিষ্পাপ।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

এই আয়াত থেকেও জানা যায়, অবৈধ বস্তু থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখা ঈমানের পরিচায়ক। মহানবী (সা) হচ্ছেন সব মু'মিনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। এ বিষয়ে গোটা সৃষ্টি একমত ও আস্থাশীল।

সারা বিশ্বের ঈমান যেমন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঈমানের অতি সামান্য ছায়ামাত্র, তেমনি সারা বিশ্বের দৃষ্টির পবিত্রতা ও লজ্জা তাঁরই দৃষ্টির পবিত্রতা, শালীনতা ও লজ্জার সামান্যতম ছায়ামাত্র। অনুরূপ তাঁর পূত-পবিত্র সত্তা ও প্রবৃত্তির লালসা থেকে মুক্ত ছিল এবং তাঁর ব্যক্তিগত সাথী, যা প্রতিটি মানুষের জন্য নির্ধারিত রয়েছে একজন করে শয়তান, সেও মহানবীর পরশে এসে বাধ্য হয়েই তাঁর অনুগত হয়েছে। উত্তম ও

কল্যাণের দিক ব্যতীত কোন কিছুর দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়ার সামর্থ্যই তাঁর ছিল না। (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ আয়াতের তাফসীর।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, কপট লোকদের বক্তব্য অনুসারে এই আয়াতে تخفی فی نفسك ما اللّه مبديه -দ্বারা যায়নাবের ভালবাসা হৃদয়ে লুক্কায়িত রাখা অর্থ– সম্পূর্ণভাবে ভুল, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত বরং সত্যি কথা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ জানিয়েছিলেন, যায়িদের তালাকের পর যায়নাব আপনার দাম্পত্যে আসবে। এভাবে যে বিষয়টি তাঁর অন্তরে লুকানো অবস্থায় ছিল তা ছিল এই বিয়ের আগমন সংবাদ। যে কথা আল্লাহ তা'আলা পরবর্তী সময়ে زَوَّجْنَاكَهَا শব্দ দ্বারা প্রকাশ করে দিয়েছেন تخشى الناس শব্দের অর্থ হচ্ছে তিনি বিষয়টি প্রকাশ করতে লজ্জা করছিলেন যে, তিনি কাউকে বলবেন তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও। ভয় বলতে যে জিনিসের শরম করা অথবা আশংকা করা বুঝানো হয়েছে, তা হচ্ছে, মুনাফিকরা কুৎসা রটাবে ও সমালোচনা করবে অথবা লোকজন খারাপ ধারণা করে নিজেদের পরিণাম নষ্ট করবে।

সুদ্দী ও ইমাম যায়নুল আবেদীনের বর্ণনায় উক্ত আয়াতের অর্থ এভাবে করেছেন। তিরমিযী এই বর্ণনাকে উত্তম বলে বর্ণনা করেছেন। আর এটাকে ইবনে হাজার আসকালানী (র) [১] তাঁর বিখ্যাত হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারী গ্রন্থে সূরা আহ্যাবের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন।

১. মূল ভাষা হলো ঃ

وقد أخرج أن أبى حاتم هذه القصة من طريق السّدى فساقها سياقًا واضحًا ولفظه بلغنا ان هذه الاية نزلت فى زينب بنت جعش وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك ثم انها رضيت بماضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها ايه ـ ثم اعلم عزوجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انها من ازواجه فكان يستحى ان يأمر بطلاقها وكان لايزال يكون بين زيد وزينب مايكون من الناس فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وان يتقى الله وكان يخشى الناس ان يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدًا وعنده من طريق على بن زيد عن على بن الحسين ابن على ـ قال اعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وامسك عليه زوجك قال الله تعالى قد اخبرتك انى مزوجكها وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وقد اطنب الترمذى الحكيم فى تحسين هذه الرواية وقال انها من جواهر+

ইমাম কুরতুবী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে ইমাম যায়নুল আবেদীনের বক্তব্য উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ

قال علماءنا رحمة الله عليهم وهذا القول أحسن ماقيل فى هذه الاية وهو الذى عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهرى والقاضى بكر بن العلاء القشيرى والقاضى أبى بكر بن العربى وغيرهم الخ (تفسير قرطبى تفسير سوره احزاب) -

"আমাদের উলামায়ে কেরামের মতামত হচ্ছে এই আয়াতের তাফসীরে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা সর্বোত্তম মত। বিজ্ঞ আলিম, দক্ষ মুফাস্‌সিরীন, যেমন ইমাম যুহরী, কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী ও কাযী বকর ইবন আ'লা কুশায়রী প্রমুখের একই মত।"[১]

বিয়ের তারিখ ও দেনমোহর

হাফিয ইবনে সায়্যেদুন নাস (র) বলেন, হিজরী ৪র্থ সনে হযরত যায়নাবের সাথে মহানবী (সা)-এর বিয়ে হয়। কেউ ৫ম হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন। তখন হযরত যায়নাব (রা)-এর বয়স ৩৫ হয়েছিল।[২] চারশত দিরহাম মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছিল (সীরাতু ইবনে হিশাম)। ইবনে ইসহাক লিখেছেন এই বিয়ে হযরত যায়নাবের ভাই আবূ আহমাদ ইবন জাহাশ দিয়েছেন। বাহ্যিকভাবে পূর্বের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। তবে হয়ত বা পরবর্তী সময়ে বিয়েও পড়ানো হয়েছিল (আল্লাহ্ই ভাল জানেন)।

العلم المكنون وكان لم يقف على تفسير السدى الذى اوردته وهو اوضح سياقًا واصح اسنادا اليه لضعف على بن زيد بن جدعان (ثم قال الحافظ) ووردت اثار اخرى ونقلها كثير من المفسيرين لاينبغى التشاغل بها والذى اوردته منها هوا المعتمد والحاصل ان الذى يخفيه النبى صلى الله عليه وسلم هوا أخبار الله اياه انها ستصير زوجته والذى كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امراة ابنه واراد الله ابطال ما كان اهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى بامر لاابلغ فى الابطال منه وهو تزوج امرأة الذى يدعى ابنا ووقوع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع الخبط فى تأويل متعلق الخشية والله أعلم - (فتح البارى ج ٨ ص - ٤٠٣ تفسير سورة الاحزاب)-

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৪ খ, পৃ. ১৯০।

২. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৪।

অলীমা

এই বিয়ে যেহেতু মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজ অভিভাবকত্বে আয়োজন করেছেন এবং এ বিষয়ে আল-কুরআনের আয়াতও নাযিল করেছিলেন। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) এই বিয়ে উপলক্ষে মেহ্মানদারী বা অলীমা বিশেষ গুরুত্বের সাথে আয়োজন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত যায়নাবের বিয়েতে যত গুরুত্বের সাথে পর্যাপ্ত মেহমানদারীর (অলীমা) আয়োজন করেছেন, অন্যান্য বিবিদের কারো ক্ষেত্রে তা তিনি করেননি। একটি ছাগল যবাই করেছিলেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করে গোশত রুটি তৃপ্তিসহকারে আহার কারিয়েছিলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে সব লোক চলে গেল, কিন্তু তিন ব্যক্তি অপেক্ষা করে গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে গেল। মহানবী (সা) চক্ষু লজ্জার কারণে তাঁদেরকে কিছু বলতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনি মজলিস থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন যেন তাঁরা বুঝতে পারেন। তারপর তিনি হযরত আয়েশা (রা) ঘরে প্রবেশ করলেন। হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে মোবারকবাদ জানালেন। এভাবে তিনি অন্যান্য বিবিদের ঘরেও চক্কর দিয়ে বেড়ালেন। তখন এই আয়াতগুলো নাযিল হলো ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلاَّ اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِيْنَ اِنَاهُ - وَلٰكِنْ اِذَادُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَانِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ - اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيِ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ وَلَايَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ -

"ওহে ঈমানদারগণ! নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। তবে যখন তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হবে আপ্যায়নের জন্য। যখন যাবে খানা পাকানোর অপেক্ষা করবে না। বরং যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে খাদ্য প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে তোমরা এখন আস, তখনই তোমরা আসবে। অতঃপর খানা খেয়ে উঠে চলে আসবে। গল্প গুজবে লেগে যাবে না, তাহলে নবীর কষ্ট হবে অথচ তিনি লজ্জার কারণে তা বলবেন না। তবে আল্লাহর হক কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। অন্যদিকে যদি তোমরা বিবিদেরকে প্রয়োজনীয় কোন প্রশ্ন করতে চাও, তা হলে পর্দার আড়াল থেকে জানতে চাইবে। এটি হচ্ছে তোমাদের ও তাঁদের অন্তরের পবিত্রতা ও সততা।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

মর্যাদা

হযরত যায়নাব (রা) অন্যান্য পবিত্র বিবিদের মধ্যে গর্ববোধ করে বলতেন, তোমাদের বিবাহ তোমাদের অভিভাবকগণ দিয়েছেন, আর আমার বিয়ে সাত আকাশের উপর আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। (তিরমিযী)

প্রকৃতপক্ষে এটি গর্ববোধ ছিল না, বরং নিয়ামতের প্রচার ছিল। নিয়ামতদাতার মহব্বত তাঁকে এই মহান বিশাল নিয়ামতের প্রচার করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই জন্য মহানবী (সা) নিজেও এসব কথা শুনতেন এবং নীরব থাকতেন।

ইমাম শা'বী (র) বর্ণনা করেন হযরত যায়নাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতেন– হে আল্লাহর রাসূল আমি তিন কারণে আপনার সাথে গর্ব করতে পারি।

১. আপনার দাদা ও আমার নানা একই ব্যক্তি। অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব। এক বর্ণনায় আছে–আমি আপনার ফুফীর মেয়ে।

২. আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে আমার বিবাহ আসমানে দিয়েছেন।

৩. বিবাহের বিষয়ে হযরত জিবরাঈল আমীনের ভূমিকা ছিল।[১]

عن عائشة انها قالت كانت زينب بنت جحش تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومارأيت امرأة قط خيرًا في الدين من زينب واتقى الله وأصدق حديثا واوصل للرحم وأعظم صدقة ـ

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ মহানবী (সা)-এর সাথে ঘনিষ্ঠতায় আমার সমকক্ষ ছিলেন। আমি তাঁর থেকে কোন মহিলাকে অধিক দ্বীনদার, আল্লাহকে অধিক ভয়কারী, সবচেয়ে সত্যবাদী, অধিক আত্মীয়ের হক আদায়কারী ও অধিক সাদাকাকারী আর দেখিনি।

ইমাম যুহরীর বর্ণনায় আরও আছে ঃ

واشد تبذلا لنفسها في العمل الذى تتصدق به وتتقرب به الى الله عز وجل ـ

"আর তাঁর মত নিজে অধিক পরিশ্রম করে সাদাকাকারী এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী কোন মহিলা আমি দেখিনি।" (ইসতি'আব ইবনে আবদুল বার)

পরহেযগারী ও সৌজন্যবোধ

মুনাফিকরা যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ রটনা করল (যা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে), তখন সরলতার কারণের হযরত যায়নাবের

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৬

বোন হামনা বিনতে জাহাশ তাতে জড়িয়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) যখন যায়নাবকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তখন তিনি এভাবে জবাব দেন :

يارسول الله أحمى سمعى وبصرى والله ما علمت عليها الاخيرا- (رواه البخارى)

"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার চক্ষু ও কানকে হিফাযত করি। আল্লাহর শপথ! আমি আয়েশার ব্যাপারে ভাল ছাড়া আর কিছু জানি না। (বুখারী)

এটা ত জানা কথা যে, হযরত আয়েশা (রা) হযরত যায়নাবের সতীন ছিলেন। তারপরেও তিনি জানতেন হযরত আয়েশা (রা) মহানবী (সা)-এর সবচেয়ে প্রিয়তমা। তিনি ইচ্ছা করলে সে সময় হযরত আয়েশা (রা) সম্পর্কে এমন কিছু কথা বলে দিতে পারতেন যার কারণে আয়েশার সাথে মহানবী (সা)-এর সম্পর্কের অবনতি হতে পারত। কিন্তু তিনি ভদ্রতা ও তাক্ওয়ার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। শুধু তা-ই নয় তিনি মন্তব্য করলেন :

وَ اللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا اِلاَّ خَيْرًا

"আল্লাহর কসম! আমি আয়েশার ব্যাপারে ভাল বৈ অন্য কিছু জানি না।"

সহীহ্ বুখারীতে তাঁর তাক্ওয়া ও ভদ্রতার স্বীকৃতি হযরত আয়েশা (রা) এর যবানীতে রয়েছে :

فَعَصَمَهَا اللّٰهُ بِالْوَرْعِ .

"আল্লাহ তা'আলা যায়নাবের ভদ্রতা ও তাক্ওয়ার কারণে তাঁকে এ ফিতনা থেকে হিফাযত করেছেন।"

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় এভাবে আছে :

وَاِنَّ اللّٰهَ عَصَمَهَا بِالْوَرْعِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তাক্ওয়ার সাহায্যে তাঁকে ফিতনা থেকে হিফাযত করেছেন"।[১]

ইবাদত

ইবাদতে হযরত যায়নাব (রা) খুব যত্নবান ছিলেন। বিনয় ও সতর্কতার সাথে তিনি ইবাদত করতেন। যখন হযরত যায়িদ (রা) তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)এর পক্ষ হতে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে ইস্তিখারার নামাযে মশগুল হয়ে যান।

হযরত মায়মূনা (রা) বর্ণনা করেন—একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গনীমতের অর্থসম্পদ মহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করছিলেন, এর মধ্যে হযরত যায়নাব (রা) কিছু কথা বললেন। হযরত উমর (রা) তাঁকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, উমর! তাকে

১. আল ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩১৩।

কিছু বল না। অর্থাৎ যায়নাবের সাথে আপত্তি করো না, কেননা إِنَّهَا أَوَّاهَةٌ "নিশ্চয়ই সে কোমল হৃদয়ের অধিকারী।"

এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আওয়াহ্ অর্থ কি? তিনি উত্তরে বললেন, আওয়াহ্ বলতে বিনয়ী ও সতর্কতাকে বুঝানো হয়। তাঁরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

وَإِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَحَلِيْمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ -

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যোবর্তনকারী"।[১]

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) নিজ গৃহে গমন করেন। হযরত উমরও তাঁর সাথে ছিলেন। সেখানে দেখতে পেলেন হযরত যায়নাব (রা) নামায ও দু'আয় ব্যস্ত আছেন। তখন তিনি মন্তব্য করলেন ঃ إِنَّهَا لَأَوَّاهَةٌ "নিশ্চয়ই সে বড় নরম হৃদয়ের মহিলা।" (তাবারানী)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) হযরত যায়নাব (রা) সম্পর্কে বলেন :

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً صَنَاعًا تَصَدَّقَ بِذَالِكَ كُلَّهُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ - (الاصابه)

"তিনি খবুই নেককার এবং অধিক রোযাদার ও বেশি তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন। হাতের কাজ করে অধিক উপার্জনকারী ছিলেন, যা তিনি সবই গরীব-মীসকীনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।"

যুহদ-ভোগ-বিলাসও দুনিয়া বিমুখতা

হযরত উমর (রা) যখন প্রথম হযরত যায়নাবের বাৎসরিক ভাতা প্রেরণ করলেন, তিনি মনে করলেন, হয়তবা এগুলো সব পবিত্র বিবিদের অংশ। তখন তিনি মন্তব্য করলেন, আল্লাহ হযরত উমরকে ক্ষমা করুন, তিনি এখানে আরও অধিক অংশ দিতে পারতেন।

قَالُوْا هٰذَا كُلُّهُ لَكِ قَالَتْ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاسْتَتَرَتْ دُوْنَه بِثَوْبٍ -

"লোকেরা বলল, এসবটুকুই আপনার। তিনি বললেন : সুব্হানাল্লাহ! এবং তা কাপড়ের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিলেন যেন সে অর্থ তাঁর দৃষ্টিতে না পড়ে।"

তারপর বারযাহ্ বিনতে রাফি'কে নির্দেশ দিলেন মুদ্রাগুলোকে একদিকে জড়ো কর এবং একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখ। তারপর বললেন, কাপড়ের ভিতর থেকে অমুক ইয়াতীমকে বাটিভরে দিয়ে আস। তারপর বাটিভরে অমুককে দেও। এভাবে সে অর্থ বণ্টন হতে থাকল, শেষে নামমাত্র কিছু বাকী রইল। শেষে বারযাহ বললেন : আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন ঃ এই অর্থে আমারও কিছু হক আছে। তিনি বললেন : ঠিক

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৭

আছে কাপড়ের নিচে যা আছে তুমি নিয়ে নাও। বারযাহ বলেন, কাপড় উঠিয়ে দেখি ৮৫ দিরহাম আছে। যখন সব অর্থ বণ্টন হয়ে গেল, তখন তিনি হাত তুলে মুনাজাত করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكْنِى عَطَآءُ عُمَرَ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا -

"হে আল্লাহ! এ বছরের পর উমরের ভাতা যেন আমাকে আর না পায়।" (ইবন সা'দ)

অপর একটি বর্ণনায় আছে, হযরত যায়নাব (রা)-এর বাৎসরিক ভাতা বারহাজার দিরহাম ছিল। তা এক বছর মাত্র তিনি পেয়েছিলেন। যখন বার হাজার দিরহাম বায়তুল মাল থেকে তাঁর নিকট পৌঁছল, তিনি বার বার বলছিলেন

اَللّٰهُمَّ لَايُدْرِكْنِىْ هٰذَا الْمَالُ مِنْ قَابِلٍ فَاِنَّهُ فِتْنَةٌ

"হে আল্লাহ! আমাকে যেন ভবিষ্যতে এই অর্থ সম্পদ আর না পায়। নিশ্চয়ই এগুলো ফিতনা (প্রতিবন্ধক)।"[১]

এই কথা বলে তিনি তাঁর প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন এবং অভাবীদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। হযরত উমর (রা)-এর নিকট যখন এই খবর পৌঁছল, তিনি মন্তব্য করলেন, মনে হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ব্যাপারে কল্যাণ ও বরকতের ফায়সালা করেছেন। সাথে সাথে তিনি আরও এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন এবং সালাম জানিয়ে সংবাদ পৌঁছালেন যে, যেহেতু আপনি বার হাজার দিরহাম খয়রাত করে ফেলেছেন, এজন্য এই এক হাজার দিরহাম আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য রেখে দিন। হযরত যায়নাব (রা) ঐ এক হাজার দিরহামও ঐ মুহূর্তে বণ্টন করে দিলেন।[২]

মৃত্যু

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন পবিত্র বিবিদেরকে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার হাত অধিক লম্বা, সে-ই মৃত্যুর পর আমার সাথে সবার আগে মিলিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বক্তব্য দানশীলতা ও বদান্যতার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ ছিল। কিন্তু বিবিগণ এটিকে শাব্দিক অর্থে বুঝেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওফাতের পর বিবিগণ যখন একত্রে সমবেত হতেন, তখন কার হাত লম্বা তা নির্ণয়ের জন্য পরস্পরের হাতের মাপ গ্রহণ করতেন।

হযরত যায়নাব (রা) আকৃতিতে ছোট ছিলেন। যখন তিনি সবার আগে ইন্তিকাল করলেন তখন প্রমাণিত হলো, তাঁর হাত দান-সাদাকায় সবচেয়ে বড় ছিল। তিনি হাতের কাজ জানতেন। হাতের কাজ করে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতেন এবং তা প্রায় সবই দান-সাদাকা করে দিতেন। মৃত্যু নিকটবর্তী হলে তিনি বললেন :

১. ফাতহুল বারী, ৩ খ, পৃ. ২২৮।

২. আল-ইসাবা, (যায়নাব বিনতে জাহাশ প্রবন্ধ)।

"আমি আমার কাফনের কাপড় তৈরি করে রেখেছি। হযরত উমর (রা) হয়তবা আমার কাফনের জন্য কাপড় পাঠাবে। একসেট কাফনে ব্যবহার করবে, অন্য সেট সাদাকা করে দিও। ওফাতের পর হযরত উমর (রা) খুশবু মেখে কাফনের জন্য পাঁচটি কাপড় প্রেরণ করলেন। হযরত উমরের প্রেরিত কাপড়ই তাঁকে কাফন পরানো হয় এবং তাঁর নিজের প্রস্তুত করা কাপড় তাঁর বোন হাম্‌না (রা) সাদাকা করে দেন।" (ইবন সা'দ)

হযরত উমর (রা) বলেন, হযরত যায়নাব (রা) যখন ইন্তিকাল করেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকাকে এভাবে বলতে শুনেছি ঃ

لقد ذهبت حميدة متعبدة مفزع اليتامى والارامل -

"আফসোস! আজকে এমন এক মহিলা চলে গেলেন যিনি প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! অধিক ইবাদতকারী ছিলেন, ইয়াতীম ও বিধবাদের আশ্রয়স্থল ছিলেন।"

হিজরী ২০ সনে তিনি পবিত্র মদীনায় ইন্তিকাল করেন। হযরত উমর (রা) জানাযার নামাযে ইমামতি করেছেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ৫০ অথবা ৫৩ বছর হয়েছিল। মহানবী (সা)-এর সাথে বিবাহের সময় বয়স ৩৫ ছিল। (আল্-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩১৪)

পর্দার উপর সামগ্রিক পর্যালোচনা

যিনা একটি অনৈতিক কাজ ও অপরাধ। এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল নবী-রাসূল (আ) আলিম, জ্ঞানী, দার্শনিক ও আত্মমর্যাদাবান মানুষ একমত। রুচিবোধ ও সম্মানবোধের জন্য যিনা একটি প্রতিবন্ধক। নৈতিক অধঃপতন ও চরিত্র ধ্বংসের সর্বনিম্ন কাজ হচ্ছে যিনা। মানুষের জীবনের একটি বাস্তবতা হচ্ছে, মহিলাদের প্রতি তাকালে পুরুষ অকৃষ্ট হয়। পুরুষগণের মনে মহিলাদের সাথে মিলিত হবার লালসা সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে মহিলাগণও পুরুষদের প্রতি তাকালে তাদের মনে পুরুষের প্রেম সৃষ্টি হয়। যা কখনো অবৈধভাবে অর্থাৎ বিনা বিবাহের কামনা ও প্রবণতা চরিতার্থ করার মাধ্যমে পরিণত হয় এবং উভয় পক্ষের ইজ্জত সম্মান, বংশ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হবার কারণ হিসেবে দেখা দেয়। এ বিষয়ে বাস্তব চিত্রগুলো খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্য হিক্‌মত ও মর্যাদাবোধের দাবি হচ্ছে, এর প্রবেশপথ বন্ধ করতে হবে। এজন্যই পবিত্র শরী'আত যিনা থেকে হিফাযতের জন্য বিভিন্ন বিধানের ব্যবস্থা করেছে।

১. আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلاَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى -

"আর তোমরা ঘরে থাক এবং জাহেলী যুগের ন্যায় সাজগোজ করে বের হয়ো না। (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

২. যদি ঘরে থেকে পর পুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তা হলে বিধান এ রকম

لاَتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا

"যদি তোমাদের পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহলে কোমল, আকর্ষণীয় করে কথা বলবে না। কেননা যার হৃদয়ে কুপ্রবৃত্তির রোগ আছে সে তোমাদের হৃদয়ে লোভের সৃষ্টি করবে। এজন্য সোজা সাদামাটা কথা বলবে।" (সূরা আহযাব ঃ ৩২)

৩. মহিলাদেরকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে তেমনি পুরুষদেরকে হুকুম দেয়া হচ্ছে ঃ

وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ -

"হে পুরুষগণ! যখন তোমরা নারীদের থেকে কোন কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এই প্রশ্ন করার পদ্ধতি তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতার জন্য উত্তম মাধ্যম।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

৪. পুরুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমরা যেন অন্য নারীদের প্রতি দৃষ্টি স্থির করে না দেখ ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ -

"হে রাসূল! মু'মিনদেরকে বলুন, তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখ এবং নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযত কর।" (সূরা নূর ঃ ৩০)

৫. শরী'আতে মহিলাদের আযান, ইকামত ও ইমামতি নিষেধ করেছে।

৬. মহিলাদের প্রকাশ্য নামাযেও তাদের আওয়াজ করে কিরা'আত পড়াকে নিষেধ করেছে।

৭. হজ্জের মধ্যেও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়াকে মহিলাদের জন্য নিষেধ করা হয়েছে।

৮. যুবতী মেয়েদের জন্য পরপুরুষকে সালাম করাও না জায়েয করা হয়েছে।

৯. পরপুরুষের শরীরের কোন সেবা পরমহিলা দিয়ে করা নিষিদ্ধ।

১০. আয়নায় অথবা পানির ছায়ায়ও বেগানা মহিলা দেখা নিষেধ, এভাবে বেগানা মহিলার ছবি দেখা জায়েয নেই। কেননা ছায়া, থেকে ছবি আরও বেশি শক্তিকর হতে পারে।

১১. বেগানা মহিলার আলোচনা দ্বারা স্বাদগ্রহণ নিষেধ।

১২. বেগানা মহিলার কল্পনা দ্বারা মানসিক তৃপ্তি অর্জনও হারাম।

১৩. এমনকি কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে বিনোদনের সময়ও বেগানা মহিলার স্থির কল্পনা নিষেধ।

১৪. পরপুরুষের সামনের অবশিষ্ট খাদ্য মহিলাদের জন্য গ্রহণে যদি তৃপ্তির মনোভাব থাকে, তাহলে সে খাদ্য গ্রহণও ভাল নয়।

১৫. বেগানা মহিলার সাথে করমর্দন বা হাতাহাতি করা নিষেধ। কোন কোন মূর্খপীর এমনটি করে হাত ধরে বায়'আত গ্রহণ করে, যা নাজায়িয, মহিলাদের বায়'আত নিতে হবে মুখে ও পর্দার আড়াল থেকে কথা দ্বারা হবে হাতে হাতে হবে না। জ্ঞানীগণ আত্মমর্যাদাবান ব্যক্তিগণ চিন্তা করে দেখুন, যেনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য উত্তম এবং ইজ্জত-আবরু রক্ষার জন্য এর থেকে উত্তম আর কি ব্যবস্থা হতে পারে যা শরী'আত শিক্ষা দিয়েছে। এ উপমহাদেশে লজ্জাশরম, আত্মমর্যাদাবোধের চমৎকার উদাহরণ এক সময়ে ছিল, কিন্তু অধুনা নোংরা নতুন সংস্কৃতি তাদের সাহিত্যের মাধ্যমে সব নষ্ট করে দিয়েছে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

মহানবী (সা)-এর একটি দীর্ঘ ভাষণ আছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে ঃ

اَلنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ -

"নারীগণ শয়তানের একটি জাল।" যার সাহায্যে যে পুরুষদেরকে শিকার করে। জালে আটকিয়ে প্রবৃত্তি লালসার পূজারী করে লোকদেরকে নিয়ে তামাশা করে। এ বিষয়ে নবী হযরত সুলায়মান (আ)এর একটি বাণী আছে ঃ

اِمْشِ وَرَاءَ الاَسَدِ وَلاَتَمْشِ وَرَاءَ الْمَرْأَةِ -

"সিংহের পিছনে ছুটতে পার কিন্তু কোন নারীর পিছনে নয়।"

অর্থাৎ সিংহের পিছনে চললে যত ক্ষতির আশংকা আছে তার থেকে অধিক আশংকা নারীর পিছনে চললে হতে পারে।

একজন দার্শনিক বলেছেন ঃ

اِيَّاكَ وَمُخَالَطَةِ النِّسَاءِ فَاِنَّ لَحْظَاتِ الْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَلَفْظُهَاسَمٌّ -

"মহিলাদের সাথে অধিক মেলামেশা থেকে বিরত থাক। কেননা মহিলাদের দৃষ্টি হচ্ছে তীর, আর তাদের কথা হচ্ছে বিষ।"[১]

পর্দার সুফল ও পর্দাহীনতার কুফল

শরী'আত যেসব প্রয়োজন পর্দার নির্দেশ দিয়েছে তা হচ্ছে :

১. যেন যিনা থেকে হিফাযতে থাকা যায়,

২. ইজ্জত-আব্রু ও মহিলাদের শরীর ও চেহারা কুদৃষ্টি থেকে নিরাপদ থাকে।

৩. বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যে কোন কালিমা আসবে না। সন্তানদের উপরও কোন অপবাদ কুধারণা আসবে না। যেন কেউ সন্দেহ করতে না পারে যে, এই সন্তান তার

১. ফায়যুল কাদীর, ২ খ, পৃ. ১৭৭।

মায়ের অথবা তার বাপের কি-না। তেমনিভাবে পিতাও দৃঢ় আস্থার সাথে বলতে পারবে যে, এটি আমার ছেলে, আমার মেয়ে। কিন্তু বেপর্দা মহিলার ছেলেমেয়ের সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিত করে বলা যাবে না যে, এরা তার স্বামীর সন্তান।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে প্রতি তাকালে দেখতে পাবেন, সেখানে বেপর্দা ও নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে যিনা এত ব্যাপক হয়েছে যে, এর ফলে অবৈধ বা জারজ সন্তানের এত প্রাধান্য যে, নিজ বংশধর বলে কাউকে সনাক্ত করা মুশকিল হবে।

৪. পর্দার ফলে পুরুষ ও নারীর মনের শয়তানী কুধারণা থেকে পবিত্র থাকা যাবে। বেপর্দা হয়ে পুরুষ-নারী যখন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন শয়তান তাদের অন্তরে মন্দ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ পেয়ে যায়।

৫. পর্দার দ্বারা নারীর ইজ্জত-সম্মান স্বামী ও বংশের মর্যাদা থাকবে। একজন পুরুষ যখন দেখে তার স্ত্রী, মেয়ে অথবা বোন অন্য পুরুষের সাথে কথাবার্তা ও মেলামেশা করছে, তখন বুদ্ধিমান ও মর্যাদাবান পুরুষ হলে অবশ্যই তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আর আত্মমর্যাদাবোধ বিহীন ও বুদ্ধিবিহীন লোকের ব্যাপারে আমাদের কোন মন্তব্য থাকতে পারে না। এসব মর্যাদাবোধবিহীন লোকের চেহারাও আমরা দেখতে চাই না। এ ধরনের লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা জরুরী এবং এদের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাথে উঠাবসা করা শরী'আতে দৃষ্টিতে যৌক্তিক কারণেও উচিত নয়।

কাহিনী

অভিশপ্ত ইবলীস মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার জন্য মহান আল্লাহর নিকট মজবুত ফাঁদ প্রদানের জন্য আবেদন জানাল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ফাঁদ তার সম্মুখে পেশ করা হলো। অবশেষে স্ত্রী লোকের জাল বা ফাঁদ দেয়া হলে ইবলীস খুশীতে নর্তন কুর্দন করতে লাগল।

মাওলানা রুমী (র.) তাঁর মূল্যবান কিতাব মসনবীর ৫ম খণ্ডে লিখেছেন ঃ

گفت ابلیس لعین دادار را

دام زفتے خواهم این اشکار را ۔

"অভিশপ্ত শয়তান প্রার্থনা জানাল, হে বিশাল জগতের মালিক! আমাকে একটি শক্ত ও মজবুত জাল দান করুন যা আমি আমার এ কাঙ্খিত শিকারের (মানবজাতিকে প্রথভ্রষ্ট করণ) উদ্দেশ্যে ব্যবহার কর।"

"ইবলিস যখন আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে বিতাড়িত হল, তখন সে কসম খেয়ে বলেছিল ঃ

فَبِعِزَّتِكَ لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ۔

"তোমার ইজ্জতের শপথ, অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করব, তাদের পালিয়ে যাবার সুযোগ থাকবে না। তবে তোমার নিষ্ঠাবান ও প্রিয় বান্দাদেরকে আমি পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হব না।"

তারপর ইবলিস মহান ইনসাফ বরদার আল্লাহ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ জানাল, মানুষকে শিকার করার জন্য আমার মজবুত জাল প্রয়োজন, যেন তাতে ঢুকানোর পর মানুষ আর তা ছিন্ন করে বের হতে না পারে। আল্লাহ তা'আলা তখন ইবলিসের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে তার জন্য কয়েকটি জাল পেশ করেন।

زروسیم دگله اسپش نمود

که بدین تانی خلائق رار بود ۔

"(তার আবেদনের প্রেক্ষিতে) তাকে সোনা রোপা ও ঘোড়ার পাল প্রদানের, প্রস্তাব করা হল যে, তুমি এসব সৃষ্টি দ্বারা বনী আদমকে তোমার পক্ষে নিয়ে যেতে পারবে।"

মহান আল্লাহ তা'আলা প্রথমে শয়তানের সামনে জাল হিসেবে পেশ করলেন স্বর্ণ, রৌপ্য ও ঘোড়ার পাল। তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি এসব বস্তু দ্বারা মানুষকে আটকাতে সক্ষম হবে, কেননা মানুষ স্বভাবগতভাবেই এসব বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট। এজন্য এসব কিছুর মাধ্যমে মানুষকে শিকারের ফাঁদে ফেলা সহজ হবে।

এই রকম কথাই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন ঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۔

گفت شاباش وترش اَویخت لنج

شدکر نجیده وترش همچوں ترنج ۔

"শয়তান তা প্রথমত কিছুটা সমর্থন করল বটে কিন্তু পরক্ষণেই দুঃশ্চিন্তায় তার ঠোঁট ঝুলিয়ে দিল। সে বিমর্ষ হল এবং তা ও অনেকটা মাকাল ফলের অনুরূপ।" (অর্থাৎ স্বর্ণ রৌপ্যের প্রতি তো মানুষ আকর্ষিত হবে বটে কিন্তু তাতে তো কোন স্বাদ পাবে না। অনেকটা মাকালের মতো দেখতে সুন্দর হলে কি হবে? কামড় দিলে তো মজা পাবেন।)

শয়তান হক তা'আলার নিকট আরয করল ফাঁদ হিসেবে এসব ভাল, তবে আরও শক্তিশালী ফাঁদের প্রয়োজন।

پس جواهرهازمعدنها ئے خوش

کردان پس مانده راحق پیش کش

"অতঃপর মহান আল্লাহ্ এই বিতাড়িতকে নিজের সৃষ্টির বিভিন্ন মণিমুক্তা জহরতের মূল্যবান খনিজ পেশ করলেন।"

যখন লোভনীয় বিষয়ের ফাঁদ শয়তানের নিকট পসন্দনীয় হল না তখন সে আরও কিছু প্রত্যাশা করল। তার চাহিদা অনুযায়ী তারপর সুন্দর গহনা যা কানে পরিধান করা হয়, পেশ করা হল।

گیر این دام دگررا اے لعین

گفت زین افزون وہ نعم المعین ۔

"(এবং বললেন) নাও! এ আরেকটি জাল হে অভিশপ্ত! শয়তান বলে উঠল ঃ হে সর্বোত্তম সাহায্যকারী সত্তা। এটিও একটি অন্যতম ফাঁন্দ বটে কিন্তু আমাকে আরও শক্ত একটি জাল দান করুন।"

সুন্দর গহনা পেশ করে শয়তানকে বলা হল ফাঁদ হিসেবে গহনাকে গ্রহণ কর। শয়তান বলল, পূর্বের লোভনীয় বিষয়ের মত গহনাও তেমন শক্তিশালী ফাঁদ নয়। আমাকে আরও অধিক কার্যকর ফাঁদ দান করুন।

چرب و شیرین وشرابات ثمین

دادش وبس جامه ابریشمیں

"মহান আল্লাহ্ অতঃপর তাকে সুস্বাদু সুমিষ্ট বল-বর্ধক ও পানীয় এবং রেশমী কাপড়ের অনুরূপ দামী দামী বস্ত্রের জাল গ্রহণের প্রস্তাব করলেন।"

শয়তানের আবেদনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য মানুষকে ধোঁকা দিতে ফাঁদ হিসেবে মদ পান ও রেশমী কাপড়কে দেখালেন এবং শয়তানের জন্য কার্যকর এসব ফাঁদ গ্রহণ করতে বলল

শয়তান ফরিয়াদ করল ঃ

گفت یارب بیش ازیں خواهم مدد

تابه بندم سان بحبل من مسد

"সে আরজ করল, প্রভু হে! আপনার দরবারে আরও বেশী সাহায্যের নিবেদন করছি! যেন তাদের এমন মজবুত রশি দ্বারা বাঁধতে পারি যা ছিন্ন করা অসম্ভব হয়।"

শয়তান বলল, হে মাওলা! এটা থেকেও অধিক কিছু আমি চাচ্ছি। যেন আমি বনী আদমকে মজবুতভাবে আমার শিকারে বাঁধতে পারি। যে বাঁধ থেকে তারা বের হতে পারবে না এবং আপনার দরবারে দিকে দৌড়াতে না পারে।

تاکه مستانت که نرؤّ پردلند * مرددارا ایں بندهارابگسلند

تابدین دام درسنهائے هوا * مردتوگردد زنا مرداں جدا

"এতে করে যারা তোমার প্রেমে সত্যিকার প্রেমিক, যারা সত্যিই আল্লাহ্ভক্ত তারা এই জালকে ছিঁড়ে এবং প্রবৃত্তির পুজারী বান্দার তাতে আটকা পড়ে নর-নারীর পার্থক্যের অনুরূপ আসল-নকলের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত হয়ে যায়।"

হ্যাঁ, তবে অবশ্যই সে সব লোক যারা তোমার মহব্বতের শরাবে দেওয়ানা তারা অবশ্যই বাস্তব ময়দানের পুরুষ। তারা তোমার মহব্বতে হৃদয়কে সিক্ত করে রেখেছে সে সকল পুরুষ আমার এসব শক্তিশালী ফাঁদ ও রশি ছিন্ন করে বেরিয়ে যাবেই। তারা পৃথিবীর সোনা-রূপা, সৌন্দর্য-গহনার প্রতি মনোযোগী হবে না।

আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ اِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ। দুনিয়ার ও প্রবৃত্তির পূজারী লোকেরা এ ফাঁদে আটকে যাবে। আর এভাবে তোমার পথে সবল পুরুষ ও দুর্বল লোকদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হবে। এজন্য আমি এখন মজবুত ফাঁদ চাচ্ছি যার মাধ্যমে পুরুষ ও দুর্বল লোক সবাইকে আটকে রাখা সম্ভব হয়।

دام دیگر خواهم ائے سلطان بخت
دام مردانداز وحیلت ساز سخت

"তারপরও সে বলল, হে মহা সম্রাট! আপনার কাছে আরেকটি এমন জাল প্রার্থনা করছি যা বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমন কার্যকরী হবে যে, যে কোন রকম চেষ্টা-তদবীর করেও তা থেকে পরিত্রাণ সুকঠিন হবে।"

হে দুনিয়ার মালিক! আমি আরও শক্তিশালী ফাঁদ চাই। যে ফাঁদকে অতিক্রম করা সক্ষম পুরুষদের পক্ষে সম্ভব নয়। কোন কৌশল অবলম্বন করে যেন এ ফাঁদকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না হয়।

خمرچنگ آودر پیش اونهاد * نیم خنده زد بداں شدنیم شاد

"মহান আল্লাহ তার সামনে মদ ও বাদ্য বাজনার জাল পেশ করলেন। এতে সে অর্ধেক পরিমাণ খুশীর হাসি হাস্‌ল এবং আধা সন্তুষ্ট হল।"

তখন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা শয়তানের জন্য আরও ফাঁদ প্রদর্শন করলেন। তাঁর সামনে মদ ও বাদ্যযন্ত্র রাখা হল। তাতে শয়তান কিছুটা খুশি হল। সে অর্ধেক হাসল ও মুচকি হেসে বুঝাল এ ফাঁদে কিছুটা কাজ হবে এবং তা পূর্বের যে কোন ফাঁদ থেকে উত্তম। তারপরেও সে এতে পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি। তার অর্ধেক হাসির অর্থ হল, এ ফাঁদও স্থায়ী মজবুত ব্যবস্থা নয়। মানুষকে ধ্বংস করার জন্য আরও শক্তিশালী ফাঁদ সংগ্রহের জন্য সে দরখাস্ত করল।

سوئے اضلال ازل پیغام کرد * که برارازقعر فتنه کرد

(অতঃপর যে আরও বড় জালের প্রার্থনা জানাল এভাবে) "পথভ্রষ্ট করার আদি ভাগ্য লিপিতে যেন তাকে শামিল করা হয়: যেন সে সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত ফিতনা ফাসাদের গভীর তলদেশ ও তার নিয়ন্ত্রণে এসে যায়।"

نے یکے ازبند گانت موسی است * پرده هادر بحر اوازگرد بست

"কেবল মূসার মতো নয় যিনি তোমার একজন বান্দা (নবী) ছিলেন এবং সমুদ্রের তলদেশে ধুলোবালির পর্দা ও দেয়াল প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।" (আমাকে বরং তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা প্রদান কর যেন)

آب از هر سو عنان را وا کشید * از تگ دریا غبارے شد بدید -

"সর্বদিকের পানিই আমি শুকিয়ে দিতে পারি, সমূদ্র তলদেশে থেকে ধুলোবালি যেন প্রত্যক্ষ করা যায়।"

শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করল যেন তাঁকে এমন গুমরাহীর ফাঁদ দেয়া হয় যা ফিত্নার সাগরের মত হবে। সাগরের গভীরতা থেকে শয়তান ধূলোবালি ছড়াবে যা দেখে দুনিয়ার মানুষ সাগরকে পানি না ভেবে শুষ্ক প্রান্তর হিসেবে ভুল করবে। আর তার সে সাগরে ডুবে মরে যাবে। যেমনিভাবে হযরত মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ উম্মত সাগরকে শুষ্কপথ ভেবে সাগরে ডুবে মরে গিয়েছিল। হে প্রভু! তুমি আমার জন্য ফেত্নার সাগর বানিয়ে দাও। যেখানে আমি বনী আদমকে টেনে এনে ডুবিয়ে হালাক করব। হযরত মূসা (আ) যেমন পানিতে ডুবে মরা থেকে তাঁর অনুগত উম্মাতকে রক্ষা করেছিলো এবং প্রতিপক্ষ বাহিনীকে নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো। তেমনিভাবে আমি যেন ফেতনার নদীতে ডুবিয়ে মানুষকে গুমরাহ করতে পারি আর আমি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে হযরত মূসা (আ) এর মত ইমাম ও নেতা হতে পারি। হযরত মূসা (আ) ছিলেন হিদায়তের ইমাম আর আমি শয়তানের হব গুমরাহীর ইমাম।

(সম্ভবত শয়তান লৌহে মাহফূযে হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে ভাগ্য লিখন দেখে আগাম ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল)। আল্লাহই ভাল জানেন।

دام محکم ده که تا گردد تمام * وافگنم درکام ایشان چوه لجام

درکمند آرم کشم شان کش کشان* تاکه نتوانند سرپیچید ازاں

"আমাকে মজবুত জাল দান কর, যেন উদ্দিষ্ট লক্ষ্য একেবারে পূর্ণ হয়ে যায় এবং মিশন সফল হয়ে যায়। এবং তা লাগামের অনুরূপ তাকের মুখে লাগিয়ে ইচ্ছে মত আমি ঘুরাতে পারি।"

শয়তান বলল, এমন ফাঁদ ও জাল প্রদান কর যা চূড়ান্ত ও কার্যকর। মানুষের মুখে যেন তা লাগামের মত লাগিয়ে দিতে পারি যা ছিন্ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমি তখন ইচ্ছামত তাদেরকে যেদিকে চাইব, নিয়ে যেতে পারব। দুনিয়ার প্রবৃত্তির তামাশা দুনিয়াবাসী দেখতে পাবে (তাদের করুণ পরিণতি)।

چوکه خوبی زنان با اونمود * که زعقل وصبر مرداں می ربود -

"ফান্দে ফেলে, কোমরে রসি বেঁধে যেন তার ইচ্ছে মত এদিকে সেদিক টেনে নিতে পারি: তাতে তারা আমায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিকেই মাথা ঘুরাতে পারবে না।"

"শয়তান যখন কোন ফাঁদেই পুরোপুরি খুশি হতে পারেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা শেষ পর্যন্ত নারীদের রূপ-সৌন্দয্য সাজসজ্জা তাকে দেখালেন যা পুরুষের বুদ্ধি-বিবেক ছিনিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান এবং যাও তোমার জন্য উপযোগী কার্যকর এ ফাঁদে নিয়ে যাও আর লোকদেরকে গোমরাহ্ করার চেষ্টা কর। আর ফেত্‌নার সাগরের গভীর থেকে ধুলাবালি উড়াতে থাক।

پس زدانگشنك برقص اندرفتاد * كه بده زد ترسيدم برمراد -

"(পরিশেষে) মহান আল্লাহ যখন শয়তানকে নারী জাতির রূপ সৌন্দর্যের জাল দেখালেন; যাতে কিনা পুরুষ জাতির বুদ্ধি বিবেক-ধৈর্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

যখন শয়তানকে স্ত্রীলোকের রূপ-সৌন্দর্য দেখানে হল, তখন শয়তান মনের সুখে নাচতে শুরু করল। নাচতে নাচতে সে হাতে তালি দিতে লাগল। সে বুঝতে পারল স্ত্রী লোকের রূপ-সৌন্দর্য হল ফিতনার সাগর। এটা থেকে রক্ষা ও নিরাপদ থাকা কোন মানুষের সম্ভব হবে না। এবার শয়তান বলতে লাগল হে প্রভু! তাড়াতাড়ি আমাকে এ ধরনের নারী ফিতনার ফাঁদ প্রদান করুন। আমি এবার আমার লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হব। মানুষকে শিকার করার জন্য একটি কার্যকর ফাঁদ। নিম্নে ফিতনার অবস্থা সম্পর্কে বলা হচ্ছে ঃ

چوں بديدآں چشمهائے برخمار * كه كند عقل وخردرا درخمار

"নারী জাতিরূপ জাল দর্শনে সে মহাখুশিতে নাচ-গান হাত-তারী দেয়া শুরু করল (এবং বলল) : এ জাল দ্বারাই আমি সর্বাগ্রে আমার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হব।"

সে নারীর দৃশ্যে দেখল যে, নারীর চোখের দৃষ্টিতে এমন যাদুকরী মদিরা রয়েছে যা বুদ্ধি-বিবেককে পর্দা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

واں صفائے عارض آدن لبران * كه بسوزد چوں سپنداپں دل براں -

"সে যখন দেখল নারী জাতির নয়নযুগলের অন্তরালে এমন আকর্ষণ লুকানো যে, তা বৃদ্ধি বিবেকের ওপর পর্দা টেনে দেয়।"

সে নারী দৃশ্যে দেখল সুন্দরীদের গালের শুভ্রতায় হৃদয়ে পেট্রোলের আগুনের ন্যায় জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

روے خبال وابرو ولب چو عقيق * گوئيا خورتافت ازپرده رقيق

"আর এ চিত্ত হরনকারী দেয় মুখাবয়বের লাবণ্যতা এতই আকর্ষনীয় যে, আগর কাঠের মতো তা দর্শকের অন্তরকে জ্বালিয়ে দেয়।"

সে আরও দেখল তাদের মুখমণ্ডল ও গাল আনারের মত লাল ঠোঁট চমকাচ্ছে। যেমন সূর্য হালকা পর্দার আড়ালে চমকায়।

قدچوں سرو خرامان دره چسمن *

خدا همچوں يا سمين ونسترن

"(সে আরও দেখল ঃ) নারীজাতির দেহ সৌন্দর্য ও আকর্ষনীয় চলন বাগানের ফুলবৃক্ষ বিশেষের ন্যায় বাতাসে হেলেদুলে ফুলবৃত্তের মত নারীর চলনভঙ্গিও আকর্ষণীয়) : গাল-যুগল যেমন কিনা বাগানে ফুটন্ত ইয়াসমীন ও নাসরীন ফুলের ন্যায়।"

چوں که دیدان غبغ بر حسب اوسك
چوں تجلی حق از پردہ تنك۔

" নারী জাতির উক্ত সব যাদুকরী ও মনোহরী কেরেশমা প্রত্যক্ষ করে সে মহাখুশীতে উদ্বেলিত হয়ে উঠল; যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মহান সত্তার আসল রূপ সৌন্দর্যেরই হালকা ছিঁটা বা বিচ্ছুরণ মাত্র।"

নারীদের আবারও রূপের চমক দেখে শয়তান বুঝেছে মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে শিকার ধরার জন্য নারীরাই সর্বোত্তম কার্যকর অস্ত্র হতে পারে.............।

عالم شد واله وحیران ودنگ * زاں کرشم وزاں دلال نیك شنگ۔

"এই আল্লাহ প্রদত্ত যাদুকরী আকর্ষণ, শ্রেষ্ঠ দিশারী (মন্দ অর্থে) ও অপহরকের প্রভাবে জগত-সংসারের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী দিশেহারা ও বিস্ময়ে বিভোর।"[১]

উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস ইবন যিরার (রা)

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা) বনী মুস্তালিকের সরদার হারিস ইবন যিরার-এর কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ মুস্তালিক গোত্রের মুসফাহ্ ইবন সাফওয়ান এর সাথে হয়েছিল। সে মুরাইসী যুদ্ধে নিহত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে অনেক পুরুষ, মহিলা ও শিশু বন্দী হয়। তাদের মধ্যে জুওয়াইরিয়াও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে স্বাধীন করে দেন এবং তাঁকে চারশত দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেন। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা বনী মুস্তালিক যুদ্ধের অধ্যায়ে গত হয়েছে। ৫ হিজরীতে মহানবী (সা) এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২০ বছর। অতঃপর রবিউল আউয়াল ৫০ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তৎকালীন মদীনার গভর্ণর মারওয়ান ইবন হাকাম জানাযার নামাযের ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[২]

ইবাদত-বন্দেগীতে আগ্রহী ছিলেন। ইবাদতের জন্য ঘরে মসজিদ নামে একটি স্থান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকালের দিকে হযরত জুওয়াইরিয়ার ঘরে তাশরীফ নিলেন, তিনি বলেন, তখন আমি মসজিদে ইবাদত মশগুল ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে গেলেন। তারপর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে আবার আগমন করলেন, তখনো

---

১. মসনবী, ৫ খ, পৃ. ৪১৩।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৬৫।

ইবাদতের অবস্থায় আমাকে মশগুল দেখে বললেন, তুমি সে সময় থেকেই এ অবস্থায় আছ? আমি বললাম জ্বি। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে কয়েকটি কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি– তা হচ্ছে ঃ سُبْحَانَ اللّٰه عَدَدَ خَلْقِهِ তিনবার سُبْحَانَ اللّٰه رَضَانَفْسه তিনবার سُبْحَانَ اللّٰه زنة عرشه তিনবার سُبْحَانَ اللّٰهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ তিনবার এগুলো তুমি পড়বে। (তিরমিযী)

মুসলিম ও আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে তিনি বললেন, আমি তোমার পরে এ চারটি কালেমা তিনবার করে পড়েছি, অথচ তুমি সকাল থেকে শুরু করে যত তাসবীহ্ পড়েছ তার সাথে এগুলোকে একত্রে ওজন করলে এই চার কালেমার ওজন বেশি হবে। আর সেগুলো হচ্ছে ঃ

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضانفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ـ (زرقانِى ص ٢٥٥)

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবাহ বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা)

তাঁর নাম রামলাহ্, উম্মু হাবীবাহ্ তাঁর উপনাম ছিল। বিখ্যাত কুরায়শ সরদার আবূ সুফিয়ান ইবন হারব (রা) এর কন্যা ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সাফিয়্যা বিনতে আবুল আ'স, যিনি হযরত উসমান (রা–-এর ফুফু ছিলেন। নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। প্রথম বিবাহ ওবায়দুল্লাহ ইবন জাহাশের সাথে হয়েছিল।

উম্মু হাবীবাহ (রা) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামী ও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা দু'জনই হাবশায় হিজরত করেছিলেন। সেখানে তার একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। যার নাম হাবীবাহ রাখা হয়েছিল এবং তিনি মেয়ের নামে উম্মু হাবীবাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছু দিন পর স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টান হয়ে যায়, কিন্তু উম্মু হাবীবাহ সর্বদা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

উম্মু হাবীবাহ (রা) বর্ণনা করেন, ওবায়দুল্লাহ মুরতাদ হওয়ার পূর্বে আমি স্বপ্নে তাকে ভীষণ ও কুৎসিত আকৃতিতে দেখেছি। এতে আমি ভীষণ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম। সকালে আমি অবগত হলাম যে সে ঈসায়ী হয়ে গেছে। আমি তাঁকে আমার স্বপ্নের বিষয় অবহিত করলাম। কিন্তু তাতে তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম না। বরং সে মদের নেশায় মত্ত ছিল। এ অবস্থায়ই সে মারা যায়। কিছু দিন পর আমি পুনরায় স্বপ্ন দেখলাম কেউ যেন আমাকে উম্মুল মু'মিনীন বলে আওয়াজ দিচ্ছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, এদিকে বিধবা নারীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বিয়ের প্রস্তাব এসে পৌঁছল (ইবন সা'দ)।

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আম্‌র ইবন উমাইয়াকে বাদশাহ্ নাজ্জাশীর নিকট এই বার্তা দিয়ে পাঠালেন–উম্মু হাবীবাহ্ যদি আমার সাথে বিয়েতে সম্মত হয়, তা-হলে আপনি উকীল হিসেবে বিয়ের আয়োজন করে তাঁকে আমার দরবারে পাঠিয়ে দিবেন। হযরত নাজ্জাশী (রা) আবরাহা নামক নিজ দাসীকে এই সংবাদ দিয়ে হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) এর নিকট পাঠালেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমার বিষয়ে এই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তুমি সম্মত হলে একজন উকীল নির্বাচন কর। হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) মহানবী (সা)-এর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং খালিদ ইবন সাঈদ ইবন আ'সকে তাঁর উকীল নির্বাচন করলেন। এই সুসংবাদ ও আনন্দের পুরস্কার হিসেবে নিজ হাত পায়ের মূল্যবান গহনা নাজ্জাশীর উদ্দেশ্যে উপহার হিসেবে দিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় হযরত নাজ্জাশী হযরত জা'ফর (রা) সহ সকল মুসলমানকে একত্রিত করে নিজে বক্তৃতা দিয়ে বিয়ে পড়ায়ে দিলেন। তিনি বক্তৃতায় এ কথাগুলো বলেছিলেন ঃ

ألحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وانه الذى بشربه عيسى بن مريم صلى الله عليهما وسلم أما بعد ـ فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى ان ازوجه ام حبيبة بنت أبى سفيان فاجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصدقتها أربعمائه دينار ـ

"যাবতীয় প্রশংসা স্তুতি মহান আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সব কিছুর মালিক মহাপবিত্র পরাক্রমশালী বিজয়ী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিশ্চয়ই তাঁর সুসংবাদ দিয়েছিলেন হযরত ঈসা ইবন মরিয়ম (আ)। তারপরের বক্তব্য হচ্ছে ঃ

আল্লাহর রাসূল (সা) আমার নিকট লিখিত সংবাদ পৌঁছিয়েছিলেন আমি যেন উম্মু হাবীবার সাথে তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই। আমি তাঁর আহবান অনুযায়ী তা সম্পন্ন করেছি এবং আমি উম্মু হাবীবার জন্য চারশত দিনার মোহর ঘোষণা করলাম।"

সাথে সাথে তিনি চারশত দিনার হযরত খালিদ ইবন সাঈদের নিকট সমর্পণ করলেন। অতঃপর খালিদ ইবন সাঈদ উঠলেন এবং নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করলেন ঃ

ألحمد لله أحمده واستعينه واستغفره وأشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ـ

أما بعد فقد اجبت الى مادعا اليه رسول الله صلى الله عليه وزوجته أم حبيبة بنت أبى سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم۔

"আল-হামদুলিল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও স্তুতি ঘোষণা করছি এবং তাঁর নিকট মাগফিরাত কামনা করি। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, আল্লাহ একক তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হক দ্বীন ও হিদায়াত সহকারে প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি সকল দীনের উপর এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকদের তা অপছন্দনীয়।

তারপর কথা হচ্ছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রত্যাশা অনুযায়ী তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেছি এবং আমি উম্মু হাবীবাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য এতে বরকতের ফায়সালা করুন।"

সমবেত জনতা উঠে যাওয়ার ইচ্ছা করলে নাজ্জাশী বললেন, আপনারা বসুন! আম্বিয়ায়ে কিরামের নিয়ম ও সুন্নাতের অনুসরণে বিয়ের পর আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তারপর খাদ্য পরিবেশন করা হয় এবং সকলে খাওয়া দাওয়া সেরে প্রত্যাবর্তন করেন। যখন মোহরের অর্থ উম্মু হাবীবার নিকট পৌঁছল তখন তিনি দাসী আবরাহকে ৫০ দিনার প্রদান করলেন। আবরাহা এই ৫০ দিনারসহ পূর্বে তাঁর দেয়া গহনাদি তাঁকে ফেরত দিয়ে বললেন : বাদশাহ নাজ্জাশী আপনার নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করতে জোর নিষেধ করেছেন। আপনি বিশ্বাস করুন আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ঈমান এনে তাঁর অনুসারী হয়েছি এবং আল্লাহ তা'আলার দীন ইসলাম গ্রহণ করেছি। আজকে মহান বাদশাহ তাঁর রাণীদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদের কাছে যত খুশবু ও আতর আছে অবশ্যই তা নবী বিবি উম্মু হাবীবার নিকট উপহার হিসেবে পাঠাবে।

এভাবে পরের দিন আবরাহ রাণীদের অনেক উপহার নিয়ে হযরত উম্মু হাবীবার নিকট আসল। হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) বলেন, আমি সেসব সুগন্ধি সামগ্রী সযত্নে রেখে দিলাম এবং সাথে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর দরবারে নিয়ে আসলাম। তখন আবরাহা বললেন, আপনার নিকট আমার একটি আবেদন আছে, তা হচ্ছে আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে আমার সালাম জানাবেন এবং হযরতকে বলবেন, আমি তাঁর দ্বীনের অনুসারী হয়েছি। আমার রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আবরাহার অবস্থা এরূপ ছিল। যখন আমি চলে আসি তখনও সে বলতেছিল দেখুন। আমার আবেদনটুকু যেন ভুলে না যান। যখন আমি মদীনায় পৌঁছলাম এই সব ঘটনার কথা মহানবী (সা) নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি মুচকি হাসছিলেন শেষ পর্যন্ত আমি আবরাহার সালাম পৌঁছালাম। তখন তিনি বললেন[১] وعليها السلام ورحمة الله وبركاته

১. সাফওয়াতুস, সাকওয়া, ২ খ, পৃ. ২২; যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৩।

হযরত উম্মু হাবীবাহ (রা) ৪৪ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। দামেশকে ইন্তিকাল করেছেন বলেও এক বর্ণনায় আছে। তবে মদীনায় ইন্তিকালের বর্ণনাই অধিক গ্রহণযোগ্য। তাঁর জন্ম নবুওয়াতের ১৭ বছর পূর্বে হয়েছিল হিসেবে মৃত্যুর সময় তার বয়স ৭৪ বছর ছিল। এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিয়ের সময় তাঁর বয়স ৩৭ বছর ছিল।[১]

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবার মৃত্যুর সময় তিনি আমাকে খবর দিলেন। আমি উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তুমি ভাল করে জান সতীনদের মধ্যে পারস্পরিক কিছু হয়ে থাকে। যা কিছু হয়েছে তুমি আমাকে মাফ করে দিও। আল্লাহ্ আমাকে ও তোমাকে মাফ করুক। আমি বললাম সব কিছু মাফ! আল্লাহ তা'আলা আমাকেও তোমাকে মাফ করুন। তখন উম্মু হাবীবাহ্ (রা) বললেন, আয়েশা, তুমি আমাকে খুশী করেছ, আল্লাহ্ যেন তোমাকেও খুশী রাখে। তারপর তিনি উম্মু সালামাকে ডাকলেন এবং তাঁর সাথেও এই ধরনের কথাবার্তা বললেন। (ইবন সা'দ)[২]

উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনৃত হুয়্যি (রা)

হযরত সাফিয়্যা বনী নাযীর গোত্রের সারদার হুয়াই ইবন আখতাব-এর কন্যা ছিলেন। আখতাব ছিল হযরত মূসা (আ) এর ভাই হযরত হারূন (আ)-এর অধস্তন বংশধর। হযরত সুফিয়্যার মায়ের নাম ছিল দাররাহ্। প্রথমে হযরত সাফিয়্যার বিয়ে সালাম ইবন মিশবামের সাথে হয়েছিল। তার সাথে বিচ্ছেদের পর কিনানা ইবন আবীল হাকীমের সাথে বিয়ে হয়েছিল।[৩] কিনানা খায়বারের যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত সাফিয়্যা যুদ্ধে বন্দী হন। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বাধীন করে দিয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁকে মুক্ত করাকে মোহর হিসেবে গণ্য করেন। খায়বার থেকে এক মনযিল দূরে সাহবা নামক স্থানে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হল এবং সেখানে প্রীতি আপ্যায়নের (অলীমা) ব্যবস্থা করা হয়।[৪]

ধুমধামের সাথে প্রীতি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। চামড়ার একটি দস্তারখানা বিছানা হয় এবং হযরত আনাস (রা)-কে ঘোষণা দিতে বলা হয় যে, যার কাছে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে যা কিছু আছে, তা যেন একত্রিত করা হয়। কেউ খেজুর আনল, কেউ পনীর, কেউ ছাতু আর কেউ ঘি ইত্যাদি। যখন খাদ্য সামগ্রী একত্রে জড়া করা হলো তখন সকলে সমবেতভাবে এক সাথে আহার করলেন। এই প্রীতি আপ্যায়নে গোশত ও রুটি কিছুই ছিল না। (বুখারী মুসলিম) সাহবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনদিন

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৪৫।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ২৩৬; সাকওয়াতুস সাকওয়া, ২য় খ, পৃ. ২৪।

৩. কোন স্বামী থেকেই কোন সন্তান হয়নি। উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৭।

৪. উয়ূনুল আসার, ২ খ, পৃ. ৩০৭।

অবস্থান করলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) পর্দায় অবস্থান করলেন। যখন সেখানে থেকে রওয়ানা করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে তাঁকে উটে আরোহণ করালেন এবং নিজ চাদর দিয়ে তাঁকে পর্দা করলেন, যেন কেউ তাঁকে না দেখে। কার্যত এটি একটি ঘোষণা ছিল যে, তিনি দাসী নন্ বরং উম্মুল মু'মিনীন। (বুখারী ও মুসলিম)[১]

হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মহানবীর স্ত্রীর মর্যাদা পেলেন মহানবী (সা) তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের উপর একটু নীল দাগ দেখতে পেলেন। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, এ দাগ কিভাবে হয়েছে? তখন হযরত সাফিয়্যা (রা) বর্ণনা করলেন : একদিন আমি আমার পূর্ব স্বামীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম আকাশের চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি ঘুম থেকে উঠে আমার স্বামীকে আমার স্বপ্নের কথা বলার সাথে সাথে সে আমাকে প্রচণ্ডভাবে একটি চড় মারল এবং বলল, তুমি (ইয়াসরিব) মদীনার শাসককে কামনা করছ। অর্থাৎ সে মহানবী (সা)-কে ইঙ্গিত করেছিল। (হযরত ইবন উমর (রা)-কে তাবরানীর বর্ণনা)[২]

হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তিনি হারিসা ইবন নু'মানের গৃহে উঠেন। তাঁর সৌন্দর্যের কথা প্রচারিত হওয়ায় মদীনার অনেক আনসারী মহিলা তাঁকে দেখতে ভীড় করেন। এমনকি চোহরায় পর্দা দিয়ে লুকিয়ে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে দেখতে যান, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে চিনে ফেলেন। পরক্ষণে তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে প্রশ্ন করেন : আয়েশা! কেমন দেখলে? জবাবে তিনি জানালেন হ্যাঁ, এই ইয়াহূদীয়াকে দেখে এলাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি এভাবে বল না। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম গ্রহণ উত্তমভাবেই করেছে। (ইবনে সা'দ)[৩]

একদা মহানবী (সা) হযরত সাফিয়্যার নিকট আগমন করে দেখলেন সাফিয়্যা কাঁদছে তিনি তাঁকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, হযরত আয়েশা এবং হযরত হাফসা তাঁকে অপমান করে বলেছে—আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অধিক মর্যাদাবান, কেননা আমরা তাঁর বিবি হওয়ার সাথে সাথে তাঁর চাচাদের কন্যাও বটে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি তাদেরকে কেন এভাবে বলতে পারলে না যে, তোমরা আমার থেকে কিভাবে অধিক মর্যাদাবান হতে পার, আমার আদি পিতা হচ্ছেন হযরত হারূন (আ) আর আমার চাচা হচ্ছেন, হযরত মূসা (আ) এবং আমার স্বামী হযরত মুহাম্মদ (সা)! (তিরমিযী)[৪]

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৭।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৭।

৩. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৪৭।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭; ৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললাম সাফিয়্যা এতটুকুতেই যথেষ্ট, সে এরকম এরকম অর্থাৎ এতটুকু ছোট। তিনি বললেন : আয়েশা ! তুমি এমন খারাপ শব্দ বলেছ যা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে সমুদ্রের পানি ময়লা হয়ে যাবে। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)।

একবার সফরে হযরত সফিয়্যাও রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলেন। তাঁর উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন হযরত যায়নাব (রা)-এর অতিরিক্ত উট ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন : সাফিয়্যাকে তুমি একটি উট দিয়ে দিলে ভাল হয়। উত্তরে হযরত যায়নাব বললেন : আমি এই ইয়াহূদীকে উট দেব ? তিনি একথা শুনে খুব নাখোশ হলেন। এমনকি দু'তিন মাস তিনি যায়নাবের কাছে যাননি। (ইবনে সা'দ)[৩]

একবার মহানবী (সা)-এর মৃত্যুরোগের সময় সমস্ত নবী সহধর্মিনী তাঁর খিদমতে একত্র হলেন। তখন হযরত সাফিয়্যা বললেন : হে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর রোগ তাঁর পরিবর্তে আমাকে দাও। বিবিগণ এ কথা শুনে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

وَ اللّٰهِ اِنَّهَا لَصَادِقَةٌ

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই সে সত্যবাদী (ইবনে সা'দ)

আবূ উমর (ইবন আবদুল বার) বলেন, হযরত সাফিয়্যা (রা) খুব বুদ্ধিমতী, জ্ঞানী ধৈর্যশীলা ও মর্যাদার অধিকারী নারী ছিলেন। একবার হযরত সাফিয়্যার এক দাসী হযরত উমর (রা)-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করল যে, হযরত সাফিয়্যা ইয়াহূদী সংস্কৃতি অনুকরণে শনিবারকে গুরুত্ব দেন এবং ইয়াহূদীদের সাথে ভাল আচরণ করেন।

হযরত উমর (রা) হযরত সাফিয়্যা (রা) থেকে বিষয়টি জানতে চাইলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা) জবাবে জানালেন : যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে শনিবারের পরিবর্তে শুক্রবার দান করেছেন তখন থেকে আমি শনিবারকে আর পছন্দ করি না। অন্যদিকে আমার কিছু ইয়াহূদী আত্মীয় আছে, আমি তাদের আত্মীয়ের হক অনুযায়ী ভাল আচরণ করি। তিনি হযরত উমর (রা)-কে এই জবাব জানিয়ে পাঠালেন অন্যদিক সেই বাঁদীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আমার বিরুদ্ধে একাজে কে উস্কে দিয়েছে? সে সত্যি সত্যি জবাব দিল শয়তান আমাকে প্ররোচনা দিয়েছে। হযরত সাফিয়্যা (রা) বললেন : ঠিক আছে, তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।[১]

বিখ্যাত তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রা) বর্ণনা করেন, হযরত সাফিয়্যা (রা) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাঁর কিছু সোনার গহনা ছিল, তিনি কিছু হযরত ফাতিমা (রা)-কে দিলেন এবং কিছু অন্যান্য মহিলাদেরকে দিয়ে দিলেন। (ইবন সা'দ)[২]

সুবহানাল্লাহ্, তিনি নবী (সা)-এর দাম্পত্যে এসে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসী জীবনের সমাপ্তি টানেন। ৫০ হিজরীর রমযান মাসে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।[৩]

---

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৪৭।

২. প্রাগুক্ত।

৩. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৫৯।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা[১] বিনতে হারিস (রা)[২]

হযরত মায়মূনা (রা)-এর পিতার নাম ছিল হারিস এবং মাতার নাম ছিল হিন্দ। ৭ম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধি-উত্তর মক্কা শরীফে কাযা উমরা পালন সময়কালে তাঁকে মহানবী (সা) বিবাহ করেন। ইবন সা'দ বলেন : তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ বিবাহিতা পত্নী ছিলেন। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ (সা) আর কাউকে বিবাহ করেননি। প্রথমে হযরত মায়মূনা (রা)-এর বিবাহ আবূ রুহম এর সাথে হয়েছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে বিবাহ হয়। ৫০০ দিরহাম মোহর নির্ধারণ করা হয়েছিল।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত মায়মূনার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন, তখন তিনি হযরত আব্বাস (রা)-কে তাঁর উকীল নির্বাচন করেন। হযরত আব্বাস (রা) হযরত মায়মূনা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেন। (আহমাদ ও নাসাঈ)

বিভিন্ন বর্ণনায় এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, বিয়ের সময় তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন না-কি ইহরামমুক্ত অবস্থায় ছিলেন। ইমাম বুখারীর নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে : তিনি মুহরিম অবস্থায় ছিলেন। পবিত্র মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে সরফ নামক স্থানে গিয়ে বিয়ের বাসর অনুষ্ঠিত হয়। কোন কোন বর্ণনা এমনও আছে যে, বিয়ে ও বাসর সরফেই হয়েছিল এবং ৫১ হিজরীতে যে স্থানে বাসর হয়েছিল একই স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর জানাযার নামায পড়ান।[৫] তাঁকে কবরে নামান হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস, ইয়াযীদ ইবন আসাম এবং আবদুল্লাহ্ ইবন শাদ্দাদ ও আবদুল্লাহ খাওলানী। তাঁর প্রথম তিনজনের তিনি খালা হতেন এবং চতুর্থজন তাঁর পালিত ইয়াতীম সন্তান ছিলেন।[৩]

এখানে ১১ জন পবিত্র বিবির আলোচনা করা হলো। যারা মহানবী (সা)-এর সাথে বিবাহিত সূত্রে দাম্পত্য জীবনে ছিলেন। তাঁরা সকলেই 'উম্মুহাতুল মু'মিনীন' উপাধিতে ভূষিত ও বিখ্যাত ছিলেন।

এই ১১ জনের অতিরিক্ত আরও কয়েকজন মহিলার সাথে মহানবী (সা)-এর বিয়ে হয়েছিল কিন্তু মিলিত হওয়া বা সংসার করার পূর্বেই তারা পৃথক হয়ে গেছেন। যেমন আসমা বিনতে নু'মান জাওনিয়াহ ও আমরাহ্ বিনতে ইয়াযীদ কিলাবিয়াহ। তাঁদের আলোচনা এখানে করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি এজন্য আলোচনায় আসেনি।[৪]

---

১. হযরত মায়মূনা (রা) হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর খালা ছিলেন।

২. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৪১১।

৩. আল-ইসতি'আব, ৪ খ, পৃ. ৪০৮।

৪. তাঁর সাথে বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন ফাতহুল বারী, ৯ খ, পৃ. ৩১০-৩১৫।

দাসীগণ

মহানবী (সা)-এর পবিত্র দাসী পত্নী-ছিলেন চারজন। তাঁদের মধ্যে দু'জন বিখ্যাত ছিলেন

১. হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)

হযরত মারিয়া (রা) দাসী ছিলেন। মহানবী (সা)-এর ছেলে হযরত ইব্রাহীম তাঁর উদর থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসকান্দারিয়ার রাজা মুকাওকাশ হাদিয়া স্বরূপ মহানবী (সা)-কে হযরত মারিয়াকে দান করেছিলেন। তিনি হিজরী ১৬ সনে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী' গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

২. হযরত রায়হানা বিনতে শামঊন (রা)

হযরত রায়হানা বনী নযীর অথবা বনী কুরায়যা গোত্রের ছিলেন। যুদ্ধবন্দীনী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা) দরবারে উপস্থিত হন এবং দাসী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সংসারে ছিলেন। ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের পর ইন্তিকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

এক বর্ণনায় আছে তাঁকে মুক্ত করে রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করেছিলেন। (আল্লাহ্ ভাল জানেন)

৩. নাফীসা (রা)

হযরত নাফীসা (রা) প্রকৃতপক্ষে হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ উম্মুল মু'মিনীন-এর দাসী ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, একবার হযরত সাফিয়্যা (রা) প্রসঙ্গে মহানবী (সা) হযরত যায়নাবের উপর নাখোশ হয়ে দু'তিন মাস ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সা) আবার রাযী হলেন, হযরত যায়নাব (রা) খুশি হয়ে নিজ দাসী নাফীসাকে তাঁকে দান করেন।

এছাড়া আরও একজন দাসী ছিলেন যার বিস্তারিত নাম ধাম জানা যায় না। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২৭১-২৭৪)

বহু বিবাহ[১] প্রসঙ্গ

১. একজন মহিলার জন্য একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তি হচ্ছে ঃ

পৃথিবীর ইতিহাস এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামের পূর্বেই গোটা দুনিয়ায় বহু বিবাহ প্রচলিত ও স্বীকৃত ছিল। একজন পুরুষের একাধিক পত্নী থাকায় এই প্রচলন থেকে আম্বিয়ায়ে-কিরামও ব্যতিক্রম ছিলেন না।

হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর দু'জন স্ত্রী ছিলেন। হযরত ইসহাক এবং হযরত মূসা (আ)-এরও একাধিক পত্নী ছিল।

---

১. একজন স্ত্রীর যদি কয়েকজন স্বামী থাকে তা হলে সকল স্বামীরই স্ত্রীর প্রতি তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয় অধিকার সাব্যস্ত হবে। হয়তবা একই সময় একাধিক স্বামীর স্ত্রীর প্রতি চাহিদা ও প্রয়োজন দেখা দিবে। তখন তাদের পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে ঝগড়া হবে। এমনকি তা হত্যা পর্যন্ত গড়াতে পারে। (বাকী অংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর বহুসংখ্যক পত্নী ছিলেন। এবং হযরত দাঊদ (আ)-এর পত্নী সংখ্যা ছিল একশত। ইঞ্জিল ও তাওরীত কিতাবেও অন্যান্য নবীদের বহুপত্নী বিষয়ক আলোচনার উল্লেখ রয়েছে। বহুপত্নী বিষয়ে কোন আসমানী কিতাবেই কোন আপত্তির সামান্যতম কথাও উল্লেখ নেই।

হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইয়াহইয়া (আ) দু'জন নবী বিয়েই করেননি। তাঁদের বিপত্নীক হওয়া যদি দলীল হিসেবে নেয়া হয় তাহলে এক বিয়ে ও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। হাদীসে আছে, হযরত ঈসা (আ) আকাশে গমনের পূর্বে বিয়ে করেননি কিন্তু পুনরায় যমীনে অবতরণের পর তিনি বিবাহ করবেন এবং তিনি সন্তানের পিতাও হবেন। যেমনটি হাদীসে রয়েছে। মোটকথা এজন্য কোন ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানের এ বিষয়ে অভিযোগ করার কোন অধিকার যে ইসলাম এসেই বহু বিবাহ প্রচলন করেছে। বরং ইসলাম এসে পত্নীর সংখ্যা সীমিত করে দিয়েছে। তা হচ্ছে, চার জনের সংখ্যার অতিক্রম করা যাবে না।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের

২. পুরুষ স্বভাবগতভাবে শাসক হয়ে থাকে এবং স্ত্রী তার অধীন। এজন্য তালাকের অধিকার পুরুষকে দেয়া হয়েছে। পুরুষ যতক্ষণ স্ত্রীকে মুক্ত না করে ততক্ষণ সে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহবদ্ধ হতেও পারে না, যেভাবে দাসদাসী মনিব কর্তৃক মুক্ত না হলে নিজে নিজে মুক্ত হতে পারে না। দ্বিতীয় পুরুষকে বিয়ে করতে পারে না। যেমন দাসী ও গোলাম নিজেরা স্বাধীন হতে পারে না, যতক্ষণ না মালিক তাদেরকে মুক্ত করে দেয়। এমনিভাবে স্ত্রীও নিজে নিজে বিয়ে থেকে মুক্ত হতে পারেনা, যতক্ষণ না স্বামী তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে না দেয়।
গোলামদের জন্য যেখানে আযাদ করে দেয়ার নিয়ম আছে মহিলাদের জন্য তেমন তালাক। বহু স্বামীর ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে, এক মহিলার কয়েকজন স্বামী তার উপর কর্তৃত্ব করবে এভাবে অধিক কর্তার কর্তৃত্ব অধীনস্থের লাঞ্ছনার কারণ হয়ে পড়বে। এ জন্য একজন কর্তার অধীনে অনেক অধীনস্থ থাকা কোন সমস্যার বিষয় নয়। একজন কর্মকর্তার অধীনে হাজারে হাজার কর্মচারী থাকতে পারে। একজন রাজা বা শাসকের অধীনে দেশের সকলে প্রজা হতে পারে। এটি কোন অপমান বা কষ্টের কারণ হতে পারে না। এতে বুঝা গেল, একজন স্ত্রীর বহু স্বামী হলে তা তার জন্য চরম অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। শুধু তা-ই নয়, একাধিক স্বামীর খেদমত করা এবং সবাইকে খুশি করা অসম্ভব ও দুঃখ-যাতনার বিষয়। এজন্যই ইসলামী শরী'আত একজন নারীকে দুই বা চারজন স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়নি। যাতে করে নারী অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অপমান থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। চারজন স্বামী একই স্থানে অবস্থান করুক অথবা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করুক, একজন স্ত্রীর পক্ষে সকলের খেদমত করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? যেসব নারী একাধিক স্বামীর প্রচলনের কথা বলেন তাদেরকে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

৩. যদি একজন মহিলার কয়েকজন স্বামীর সাথে সম্পর্ক থাকে তাহলে সন্তান জন্মগ্রহণের পর সন্তানদের সাথে স্বামীর পরিচয় একক থাকবে না-কি যৌথ থাকবে? সন্তান কিভাবে বন্টন করা হবে? যদি একটি সন্তান হয় তবে চার পিতার মধ্যে কিভাবে বন্টন করা হবে। আর যদি কয়েকটি বাচ্চা হয় এবং বাচ্চাগুলো পিতাদের মধ্যে বন্টনের প্রশ্ন আসে তবে লিঙ্গের ভিন্নতা, চোহারার বিচিত্রতা, চারিত্রিক পার্থক্য; শক্তিমত্তার বিভিন্নতা, বুদ্ধিমত্তার বৈষম্য নিরুপণ করা সম্ভব হবে না।
(পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন)

বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে, লজ্জাস্থানের হেফাযত ও নৈতিক পবিত্রতা রক্ষা করা ও যিনা থেকে হিফাযতে থাকা। চার পত্নীর মধ্যে প্রত্যেকের নিকট তিন রাত পরপর ফিরে আসার নিয়মে দাম্পত্য চাহিদার মধ্যে তেমন কোন প্রভাব পড়বে না।

ইসলামী বিধান ভারসাম্যপূর্ণ ও চূড়ান্ত ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা চালু করেছে। জাহেলিয়াতের যুগের মত সীমাহীন বিয়ের যেমন অনুমতি দেয়নি, যেখানে যৌন প্রবৃত্তির দরজা খুলে যায়, তেমনিভাবে বিষয়টি এতটা সংকুচিতও করা হয়নি যে এক পত্নীর অধিক বিয়ে করা যাবে না, বরং মধ্যবর্তী অবস্থানে থেকে চার পত্নী পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। যাতে–

১. বিয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক পবিত্রতা, লজ্জাস্থানের বৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন। দৃষ্টির পবিত্রতা রক্ষা করা এবং সুন্দরভাবে সন্তান, বংশধর জন্ম। শুধু তা-ই নয় বিয়ের মাধ্যমে যিনা ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কোন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবে অধিক শক্তিশালী এবং স্বচ্ছল হয়ে থাকে, তাদের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট না-ও হতে পারে। আল্লাহ প্রদত্ত স্বাস্থ্য সামর্থ ও আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণে যিনি চার পত্নীর অধিকার পূরণ করার মত সামর্থ্যবান হয়েছেন। এ ধরনের পুরুষদেরকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধা দিলে নৈতিক পবিত্রতা ও তাক্ওয়া সীমালঙ্ঘিত হতে পারে এবং যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পক্ষান্তরে একজন সমার্থ্যবান কোটিপতি পুরুষ যদি তার বংশের চারজন মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিয়ে করেন যে তাদের দরিদ্রতা ও দুঃখ ভারাক্রান্ত অবস্থার পরিবর্তন করে তারা সুখ-সাচ্ছন্দ্যের মধ্যে প্রবেশ করবে। এর মাধ্যমে মহিলাগণ

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার জের)

এ বিচিত্র পার্থক্যের কারণে সন্তানগুলো বন্টন করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনিতর অবস্থায় পিতাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কি অবস্থা আত্মপ্রকাশ করবে তা বলা মুশকিল।

তদুপরি সন্তানদের মধ্যে স্নেহ মমতার ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া আল্লাহই জানেন আরও কত ফিতনার সৃষ্টি হবে যা নিয়ম শৃংখলার পরিবর্তে ধ্বংসের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আতে একজন মহিলার জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে। হিন্দুদের কোন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে এক স্ত্রীলোকের একই সাথে পাঁচ জনের বিবাহ বৈধ। এ ধরনের মর্যাদাহীনদের আদৌ অনুভূতি নেই যে, একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে কখনো একজনের সাথে যৌন মিলন আবার আরেক জনের সাথে যৌন মিলন সরাসরি মর্যাদাহানীকর ও সৌজন্য পরিপন্থী। ইসলাম ইজ্জত ও পবিত্রতার ধর্ম। এতে এ ধরনের মর্যাদাহানীকর ও অসৌজন্য বোধের কোন স্থান নেই। হ্যাঁ, যদি কোন স্ত্রী লোক মর্যাদা ও সৌজন্য বোধের জলাঞ্জলী দিয়ে কিছু করতে চায় সে অধিকার তার আছে। হিন্দুদের মত সে যদি পাঁচজন স্বামী গ্রহণ করতে চায় করতে পারে। আম্বিয়া কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত إذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت "যদি তোমার লজ্জা শরম বিলুপ্ত হয়ে থাকে তবে যা ইচ্ছে করতে পার।"

আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করবে। আশা করা যায় এ ধরনের নিয়্যতে বিয়ে ইসলামের দৃষ্টিতে ইবাদাতের মর্যাদার কাজ হিসেবে পরিগণিত হবে এবং জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি জাতীয় খেদমত ও সম্প্রীতি হিসেবে বিবেচিত হবে। একজন ধনী ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ দ্বারা যদি দশহাজার নারী-পুরুষ মাসিক মজুরীর হিসেবে দশ হাজার বংশের লোক প্রতিপালিত হতে পারে, সেখানে সে ধনী ব্যক্তির চারজন মহিলাও তার ঘরে সংসারে প্রবেশ করতে পারে যেখানে তারা আরাম আয়েশ ও নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে জীবন যাপন করবে। বুদ্ধি-বিবেচনায় দৃষ্টিভঙ্গি ও শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি কোন খারাপ কিছু হতে পারে না।

যদি কোন বাদশাহ অথবা দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী অথবা কোন ধনী শিল্পপতি অসুস্থ হয়ে পড়েন, তিনি যদি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করেন যে, আমি চারজন মহিলাকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। প্রত্যেক মহিলাকে এক লক্ষ টাকা মোহর দিব এবং প্রত্যেককে একটি করে বাংলো করে দেব। যারা এই শর্তে আমার সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী, তাদেরকে আবেদন পেশ করতে পারে।

এমন অবস্থায় ঐসব তথাকথিত প্রগতিশীল মহিলাগণই সবই প্রথমে আবেদন করবেন। যারা বহু বিবাহ বিষয়ে আন্দোলন করছেন। এসব পশ্চিমা সংস্কৃতির ধারক মহিলাগণ সবার আগে নিজেরা ও নিজ কন্যা-ভাতিজী-ভাগিনীসহ সকলে মিলে আমীর ও মন্ত্রীদের বাংলোতে নিজেরা উপস্থিত হয়ে ভীড় করবেন। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, এদের ভীতজনিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশ তলব করতে হবে।

যদি আমীর ও মন্ত্রীগণ এ ধরনের মহিলাকে বহু বিবাহের পত্নী হিসেবে বিয়ের বিষয়টি স্থগিত রাখেন, তা হলে এ অভিজাত মহিলাগণই বহু বিবাহের সুফল মন্ত্রীদের বুঝানোর চেষ্টাই লেগে যাবেন।

২. মহিলাগণ সব সময় স্বামীর শয্যাসঙ্গী হওয়ার মত অনুকূল অবস্থায় থাকে না। কেননা প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক মহিলা প্রতিমাসে ৫-১০ দিন প্রতিকূল অবস্থায় থাকেন। অর্থাৎ রক্তস্রাবের সময়ে অবশ্যই পুরুষের সাথে মিলিত হবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অন্যদিকে গর্ভবতী অবস্থায়ও মহিলাদেরকে স্বামীর সাথে শয্যাসঙ্গী হবার ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। যাতে গর্ভস্থ সন্তানের কোন ক্ষতি না হয়।

কখনো এমনও হয় যে, একজন স্ত্রী গর্ভবতী বা সন্তান প্রসবের পরবর্তী প্রতিকূল অবস্থায় থাকার কারণে স্বামীর সাথে শয্যাসঙ্গী হবার জন্য উপযোগী থাকে না। এমতাবস্থায় স্বামীর চাহিদা অনুযায়ী তাঁকে ব্যভিচার থেকে নিরাপদ থাকার জন্য যুক্তিপূর্ণ কথা হচ্ছে তাকে হয় বিবাহের অনুমতি দেয়া উচিত, অন্যথায় পুরুষ চরম চাহিদার সময় অবৈধ পথে তা পূরণ সচেষ্ট হবে এমন আশংকা থেকে যায়।

একটি কাহিনী

এক বুযর্গের স্ত্রী অন্ধ হয়ে যায়। তিনি প্রথম স্ত্রীর খেদমত করার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বুদ্ধিজীবিগণ ফাতওয়া দিন, কারো যদি প্রথম স্ত্রী অন্ধ হয়ে যায় তখন স্বামী হয় বিয়ে এজন্য করেছেন যেন দ্বিতীয় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীর খেদমত এবং তার শিশু সন্তানদের প্রতিপালন করতে পারেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহ করা কি মানবিক ও যুক্তিযুক্ত হবে না?

৩. কখনো কোন মহিলা অসুস্থতার কারণে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে, ফলে তার সন্তান ও বংশ-বৃদ্ধির যোগ্যতা থাকে না। আর পুরুষের প্রকৃতি হচ্ছে প্রজন্ম রেখে যাওয়া। এই অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীকে বিনা দোষে তালাক দেয়া, অথবা তাকে দোষারোপ করে তালাক দেয়া (যেমন ইউরোপ সচরাচর হচ্ছে) উত্তম হবে, না-কি স্ত্রীর দাম্পত্য অধিকার রক্ষা করে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেয়া ভাল হবে।

সম্মানীত পাঠক বলুন, কোনটি উত্তম।

যদি কখনো সরকার জাতীয় প্রয়োজনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করে, তা হলে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পুরুষগণ একাধিক বিবাহ করবে। যাতে অধিক সন্তানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। জাহেলী যুগে কেউ ত দরিদ্রতার ভয়ে কন্যা শিশুকে হত্যা করত, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার যুগে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ঔষধ ও উপকরণের মাধ্যমে যেভাবে পর্দাহীনতা, অশ্লীলতা ও ব্যভিচারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে, তা অনেকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না।

৪. বাস্তব অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ আদম শুমারীর চিত্র থেকে জানা যায় পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। এটা বহু বিবাহের পক্ষে একটি প্রমাণ স্বরূপ। পুরুষ থেকে নারীর জন্ম বেশি হয়। মৃত্যু হয় বেশি পুরুষের। যুদ্ধে পুরুষরাই মৃত্যুবরণ করে। সড়ক দুর্ঘটনা, খনিতে আটকা পড়া, নদীতে ডুবে যাওয়া, এভাবে বিভিন্ন স্থানে অধিক সংখ্যক পুরুষ মারা যাচ্ছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে নারীর মৃত্যু কম হচ্ছে। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি একাধিক বিবাহের অনুমতি না থাকে তাহলে অতিরিক্ত মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তার দায়িত্ব কে নেবে? তেমনিভাবে অবিবাহিত মহিলাদের জৈবিক চাহিদা পূরণের বৈধ ব্যবস্থার অভাবে কিভাবে তারা অনৈতিক ব্যভিচার থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হবে? এরূপক্ষেত্রে একাধিক বিবাহ হচ্ছে নারীর নিরাপত্তা ও ইজ্জত-আবরুর একমাত্র রক্ষা কবচ। ইসলাম এর মাধ্যমে নারীদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছে, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। ইসলাম তাদেরকে কষ্ট-নির্যাতন থেকে রক্ষা করেছে, শান্তি ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। তেমনিভাবে লোকদের অপবাদ থেকেও হিফাযত করেছে। যখন কোন মহাযুদ্ধ হয় তখন নিহত লোকের সিংহভাগ থাকে পুরুষ। তখন নারীদের সংখ্যা বিশেষ করে বিধবাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। সে সময় দরদী মানুষের দৃষ্টি

বহুবিবাহের ইসলামী বিধানের প্রতি ধাবিত হয়। মাত্র পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। মহাযুদ্ধের পর জার্মান ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে, যেখানে একাধিক বিয়ের বৈধতা ছিল না কিন্তু বিধবাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের অভ্যন্তরীণভাবে একাধিক বিবাহকে বৈধতার ফাত্ওয়া দিতে হয়েছে।

যারা একাধিক পত্নীর বিষয়টিকে খারাপ মনে করেন, তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যখন নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি হয়, তখন তাদের জৈবিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য আপনাদের নিকট কি সমাধান রয়েছে? এবং অসংখ্য বিধবা ও অসহায় মহিলাদের সমস্যা ও বিপদ নিরসনে আপনারা কি বিধান রচনা করেছেন?

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র) তাঁর রচিত 'আল মাসালিহুল আকলিয়া" গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"বিগত আদম শুমারীতে শুধুমাত্র বাংলায় পুরুষ ও মহিলাদের পরিসংখ্যানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেশি। এটি হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে বহু বিবাহের পক্ষে জোরালো সমর্থন। এ ব্যাপারে কারো সন্দেহ হলে ভারতের আদম শুমারীর সরকারি কাগজপত্র সংগ্রহ করলে প্রমাণিত হবে, পুরুষের চেয়ে মহিলাদের সংখ্যাই অধিক। এজন্য আমরা এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিতে যাচ্ছি যে, ইউরোপের যেসব দেশ নিজেদেরকে একাধিক বিয়ে থেকে মুক্ত ও পবিত্র মনে করতে যাচ্ছে, সেসব দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় কত বেশি। যেমন বৃটেন ১ম মহাযুদ্ধের পূর্বে ১২,২৯,৩৫০ অতিরিক্ত মহিলা ছিল, একপত্নী হিসেবের বিধান কার্যকর থাকলে এদের ভাগ্যে স্বামী জুটতো না। ১৯০০ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ফ্রান্সে পুরুষের তুলনায় মহিলার সংখ্যা ৪,২৩৭০৯ জন বেশি। জার্মানীতেও ১৯০০ সালের আদম শুমারীতে প্রতি হাজার পুরুষের বিপরীতে ১০৩২ জন নারী অতিরিক্ত ছিল। অবস্থা ছিল যেন গোটা দেশে ৮,৮৭,৬৪৮ জন অতিরিক্ত নারী ছিল যাদেরকে বিবাহ করার মত কোন পুরুষ ছিল না। এভাবে দেখা যাচ্ছে ১৯০১ সালের আদম শুমারীতে সুইডেনে ১,২২,৮৭০ জন অতিরিক্ত মহিলা এবং স্পেনে ১৮৯০ সালের আদম শুমারীতে ৪,৫৭,২৬২ জন্য অতিরিক্ত মহিলা ছিল। অন্যদিকে অষ্ট্রিয়াতে ১৮৯০ সালের আদম শুমারীতে মহিলাদের সংখ্যা ছিল পুরুষদের থেকে ৬,৪৪,৭৯৬ জন বেশি।

এবার আমরা প্রশ্ন করতে চাই, আমরা একাধিক পত্নীকে খারাপ মনে করি বলে অহমিকাভাব দেখানো সহজ কিন্তু আমাদেরকে বলুন কমপক্ষে চল্লিশ লাখ মহিলার জন্য কি বিধি ব্যবস্থা নেয়া যায়, কেননা এক বিবাহের সুবাদে ইউরোপে স্বামী পাবার সুযোগ নেই। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে বিধান মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনে বানানো হয়ে থাকে, তা অবশ্যই মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য হতে হবে। যে বিধান একাধিক

পত্নীকে নিষিদ্ধ করছে, যা চল্লিশ লক্ষ নারীকে এই ঘোষণাই দিচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের প্রাকৃতিক ও জৈবিক চাহিদার বিপরীতে চল। পুরুষের প্রতি যেন তাদের কোন আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। কিন্তু এটি অবাস্তব ও অসম্ভব একটি বিষয়। এর পক্ষে বাস্তবতা নেই। বস্তুত এর ফলাফল দাঁড়াবে এই যে, বৈধ পথকে রুদ্ধ করে দেয়ার কারণে তারা অবৈধ পথ অবলম্বন করবে। এভাবেই ব্যভিচারের সয়লাব বয়ে যাবে। সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই; বরং বাস্তবতা হচ্ছে হাজারো জারজ সন্তান প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে।" (থানবী)

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে পাশ্চাত্য অধিবাসীগণ ইসলামের একাধিক পত্নির বিধানকে নিছক বিলাসিতা বলে ঘৃণা করছে। অন্যদিকে অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যভিচারের বাজার গরম করাকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করছে, যা সমস্ত নবীরই শরী'আতে হারাম এবং সকল জ্ঞানীগণ যাকে ঘৃণা করেন ও অশ্লীলতার কাজ মনে করেন। কিন্তু সংস্কৃতির দাবিদার পাশ্চাত্য এর ঘৃণ্য দিকের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে না। একাধিক বিবাহকে যেখানে আম্বিয়া কেরাম ও জ্ঞানী দার্শনিকগণ বৈধ ও কল্যাণকর বলে মত দিয়েছেন, সেখানে তাদের দৃষ্টিতে তা হচ্ছে নিন্দিত। তাদের নিকট একাধিক পত্নী গ্রহণ অন্যায়। কিন্তু ব্যভিচার ও ভিন্ন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক কোন অপরাধ নয়। তথাকথিত এইসব প্রগতিশীল জাতি একাধিক পত্নীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আইন চালু করেছে, কিন্তু ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করে কোন আইন তৈরি করেনি।

৫. আসলে বহু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক চরিত্রকে রক্ষা করা তাক্ওয়া-পরহেযগারীর মত নিয়ামতকে এর মাধ্যমে হিফাযত করা। যারা বহু বিবাহের বিরোধিতা করে, তাদের ভিতরকার প্রবৃত্তি ও প্রকাশ্য কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যেসব লোক বহু বিবাহকে অস্বীকার করে তারা বাস্তব জীবনে অপবিত্র নোংরা। অর্থাৎ তারা যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত থেকে প্রকারান্তরে তাদের কামনা বাসনা ও চাহিদার মাধ্যমে বহু বিবাহকেই প্রত্যাশা করে থাকে। অন্যথায় তারা এক স্ত্রীতেই খুশি থাকত। বস্তুত এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা যিনি সর্বজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী, তাঁর বিধানে মানুষের ব্যাপক চাহিদা ও অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রেখে এমন বিধান ঠিক করেছেন যার মাধ্যমে চরম আবেগী ও বিলাসী মানুষও পবিত্রতা ও নৈতিক চরিত্রের সীমার মধ্যে অবস্থান করতে সক্ষম হবে।

মহানবী (সা) একাধিক বিয়ে কেন করেছিলেন?

হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ধ্বংস ও সমস্যা থেকে বের করে নিয়ে আসা। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণাঙ্গ বিধান এবং নির্বাহী সংবিধান তথা আল-কুরআন নাযিল করেছেন। যারপর কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন কোন বিধানের প্রয়োজন হবে না। অন্যদিকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র যিন্দেগীকে নমুনা স্বরূপ বানিয়েছেন, মানুষ যা দেখে কাজ করবে। এজন্য বলা যায়, শুধুমাত্র কোন

বিধান মানুষের সংশোধনের জন্য যথেষ্ট হয় না যতক্ষণ না সে বিধানের বাস্তব মডেল বা নমুনা তার সামনে উপস্থিত না থাকে– যার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হবে। পৃথিবীবাসী দেখেছে, মহানবী (সা)-কে মহান আল্লাহ তা'আলা যে বিষয়ের দাওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তিনি কথা ও কর্মের মাধ্যমে তার সামান্যতম ব্যতিক্রম করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

মানব জীবনের দু'টি দিক

প্রত্যেক মানুষের জীবনে দু'টি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে বাহ্যিক দিক আরেকটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ দিক। কারো জীবনের কাজকে মূল্যায়ন করতে হলে তার জীবনে দু'টি দিকের পর্দাই উন্মোচন করতে হবে।

বাহ্যিক জীবন হচ্ছে, যা একজন মানুষ সাধারণ মানুষের সামনে যাপন করে থাকে। জীবনের এই অংশকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে ব্যাপক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়।

অভ্যন্তরীণ জীবন বলতে ঘরোয়া জীবনকে বুঝায়, যার মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক অবস্থার সার্বিক রূপ পাওয়া যায়। প্রতিটি মানুষ নিজ গৃহের চার দেয়ালে মুক্ত স্বাধীন থাকে। পরিবার ও ঘরের লোকদের নিকট সে অকৃত্রিম হয়ে থাকে। তার চরিত্র ও নৈতিকতার দুর্বল দিকগুলো পরিবারের সদস্যদের নিকট গোপন থাকে না। এই অবস্থায় মানুষের বাস্তব জীবনের মূল্যায়ন করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে তার ঘরোয়া জীবন সমাজের নিকট উন্মুক্ত করা।

এমনিভাবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনেরও দু'টি দিক ছিল। এক বাহ্যিক জীবন এবং ঘরোয়া জীবন। বাহ্যিক জীবনের যাবতীয় অবস্থা ও পরিচিতি, সাহাবায়ে কিরাম দক্ষতা ও পূর্ণতার সাথে পৃথিবীর নিকট উপস্থাপন করেছেন, যার তুলনা দুনিয়ার কোন জাতির মধ্যে এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই। তারা নিজ নবীর বিস্তারিত জীবন ও অবস্থাকে নিশ্চিতভাবে ও পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি, বরং এর দশভাগের একভাগও দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অবস্থান ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পবিত্র বিবিগণ জগতবাসীর নিকট প্রকাশ্যে উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্যে মহানবী (সা)-এর গৃহের অবস্থা, ইবাদত, তাহাজ্জুদ, রাত্রি জাগরণ, দরিদ্রতা-কৃচ্ছ্রতা এবং চারিত্রিক ও নৈতিক জীবনের চিত্র ও কর্মময় জীবনের গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল বিষয় দুনিয়ার মানুষের সামনে এসে গেছে। এভাবে মহানবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী জীবনের পরিচ্ছন্নতা স্বচ্ছতা, আল্লাহর দরবারে জবাবদিহীতা দিবালোকের মত স্পষ্ট ও আলোকিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে। রাতের আঁধারে যখন আলিমুল গায়ব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ দেখার ছিল না, তখনও মহানবী (সা) কিভাবে আল্লাহর ইবাদতে আন্তরিকতা ও আবেগ-অনুরাগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন এ বিষয়ে সূরা মুয্যাম্মিলে সঠিক চিত্র অংকিত হয়েছে।

এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত খাদীজা (রা) ছাড়াও আরও দশজন মহিলাকে বিবাহ করেছেন। যেন একদল নারী মহানবী (সা)-এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারেন। কেননা স্ত্রীগণ যতটা স্বামীর নিবীড় ও ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়ে অবগত হতে পারে, অন্যদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব হয় না। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বহু বিবাহ করেছেন। যার মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থা এবং তাঁর পারিবারিক জীবনের চিত্র নিখুঁতভাবে দুনিয়াবাসীর সামনে এসে যাবে। একদল ব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসার কারণে কারো মনে এ বিষয়ে কোন ধরনের দ্বিধা-দ্বন্ধ ও সংশয় থাকবে না। আর শরী'আতে যেসব বিধান বিশেষভাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও তা পুরুষের নিকট বর্ণনা করা লজ্জাজনক এবং পর্দার খেলাফ, এ ধরনের বিধানাবলী পবিত্র স্ত্রীদের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে। বস্তুত মহানবী (সা)-এর বহু বিবাহ (নাউযুবিল্লাহ) কুপ্রবৃত্তির তাড়নার কারণে ছিল না।

এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর একজন কুমারী ব্যতীত অবশিষ্ট সকল স্ত্রী বিধবা ছিলেন। যারা সুন্দরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন না অথবা অর্থ-সম্পদের অধিকারী হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন না। বস্তুত এর বিপরীত অবস্থাই ছিল। কেননা তাঁদের জীবনে ভোগ-বিলাসিতার কোন উপকরণ ছিল না, আসলে উদ্দেশ্য ত শুধু এটাই ছিল যে, নারীদের সাথে সম্পৃক্ত শরী'আতের বিধানাবলী নারীদের মাধ্যমেই প্রচার প্রসার হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র বিবিদের গৃহগুলো উম্মাতের জন্য মা ও শিক্ষিকার ক্লাসরুম ছিল।

যেই পূণ্যময়ী বরকতের ঘরে দু'মাস পর্যন্ত চুলায় হাঁড়ি উঠে নাই, শুধুমাত্র পানি ও খেজুর খেয়ে তাঁর ও বিবিদের দিন কেটেছে, আর যিনি দিনে মজসিদে ও রাতে জায়-নামাযে দাঁড়িয়ে কাটাতেন এবং এভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলিয়ে দিতেন। তাঁর সম্পর্কে ভোগ-বিলাসিতার কল্পনাও করা যায় না।

মহা নবী (সা)-এর সন্তানবৃন্দ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সন্তানদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হচ্ছে, তাঁর তিন ছেলে এবং চার কন্যা সন্তান ছিল।

১. কাসেম ; ২. আবদুল্লাহ ; যাঁদের তায়্যিব ও তাহির নামেও ডাকা হতো। ৩. ইবরাহীম; ৪. যায়নাব; ৫. রুকাইয়্যা; ৬. উম্মু কুলসুম; ৭. হযরত ফাতমাতুয্ যুহ্রা। কন্যাদের সংখ্যার ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, কন্যাদের সংখ্যা চার এবং তাঁরা সকলেই বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা বিবাহিতা ছিলেন। হযরত ইবরাহীমের ব্যাপারেও কোন দ্বিমত নেই। তিনি মুক্তদাসী হযরত মারিয়া কিব্তীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শিশু বয়সেই ইন্তিকাল করেছেন। হযরত ইবরাহীম ব্যতীত সকল সন্তানই হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অন্য কোন বিবির পক্ষ হতে তাঁর কোন সন্তান ছিল না। হযরত খাদীজা (রা) থেকে যত পুত্র

সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই শিশু বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এজন্য তাঁদের সংখ্যার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সীরাত বিশেষজ্ঞ আলিমদের অধিকাংশের মতামত হচ্ছে, হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভ থেকে দু'জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছেন। একজন হচ্ছেন কাসেম আর দ্বিতীয় জন হচ্ছেন আবদুল্লাহ্। আর আবদুল্লাহ্র উপনাম ছিল তায়্যিব ও তাহির। কেউ বলে থাকেন তায়্যিব ও তাহির নামে তাঁর দুই পুত্র ছিল। যাঁরা হযরত কাসেম এবং হযরত আবদুল্লাহর অতিরিক্ত ছিলেন। এই মতের ভিত্তিতে হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভের পুত্রের সংখ্যা ও কন্যার সংখ্যা সমান সমান হয়ে যায়। কেউ বলে থাকেন, হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভ থেকে ছয়জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৫ম ও ৬ষ্ঠ জনের নাম হচ্ছে মুতায়্যাব ও মুতাহ্হার।[১] (আল্লাহই সঠিক জানেন)।

হযরত কাসেম (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর সন্তানদের মধ্যে হযরত কাসেম প্রথম জন্মগ্রহণ করেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি দু'বছর বেঁচে ছিলেন। কেউ বলেছেন তিনি কিশোর বয়সে পৌঁছে ইন্তিকাল করেছেন। এই পুত্রের সাথে সম্পৃক্ত করেই মহানবী (সা)-কে আবুল কাসেম উপনামে আখ্যায়িত করা হয়।[২]

হযরত যায়নাব (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর জ্যৈষ্ঠ কন্যার নাম যায়নাব, এ বিষয়ে সকলে একমত। নবুওয়াতের দশ বছর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করেছেন, বদর যুদ্ধের পর হিজরত করেছেন। আপন খালাত ভাই আবুল আ'স ইবন রাবী-এর সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হযরত যায়নাব (রা)-এর হিজরতের বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধের বন্দীদের ঘটনার অধ্যায়ে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। ৮ম হিজরীর ১ম ভাগে ইন্তিকাল করেন। এক পুত্র সন্তান ও এক কন্যা স্মৃতি স্বরূপ রেখে যান। পুত্রের নাম আলী এবং কন্যার নাম উমামা ছিল।

আলীর বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। বিখ্যাত মত হচ্ছে, কিশোর বয়সে পিতা আবুল আ'স (রা)-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। এক বর্ণনা হচ্ছে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন।

উমামার সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর গভীর স্নেহের সম্পর্ক ছিল। তিনি তাঁর খুবই প্রিয় ছিলেন। কখনো উমামা নামাযের সময় মহানবী (সা)-এর পিঠে চড়ে বসতেন। তখন তিনি তাঁকে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

বর্ণিত আছে, একবার মহানবী (সা)-এর কাছে হাদীয়া স্বরূপ একটি মুক্তার মালা আসল। সব পবিত্র বিবিগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে ঘরের এক কোণে

---

১. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৩।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৪।

উমামা মাটি নিয়ে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এই হার আমি আমার সবচেয়ে প্রিয়জনকে দেব। সবাই ভাবল হারটি তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কেই দিবেন। কিন্তু তিনি উমামাকে কাছে ডাকলেন এবং পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর চোখ মুছে দিলেন। তারপর তাঁর গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন।[১]

হযরত ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পরে হযরত আলী (রা) হযরত উমামাকে বিবাহ করলেন। যখন হযরত আলী (রা) শাহাদত পেলেন সে সময় তিনি হযরত মুগীরা ইবন নাওফলকে ওসীয়্যত করে যান যেন তিনি হযরত উমামা (রা)-কে বিবাহ করেন। কেউ বলেন মুগীরা (রা)-এর ঘরে হযরত উমামার এক ছেলে জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নাম ছিল ইয়াহইয়া। আর কেউ বলেন, উমামার কোন সন্তান হয়নি। হযরত উমামা (রা) হযরত মুগীরা (রা)-এর কাছে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২]

হযরত রুকাইয়্যা (রা)

হযরত রুকাইয়্যা এবং হযরত উম্মু কুলসুম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'কন্যা আবূ লাহাবের ছেলেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কেননা হযরত রুকাইয়্যা (রা) উত্‌বা ইবন আবূ লাহাব এবং হযরত উম্মু কুলসুম-এর উতায়বা ইবন আবূ লাহাব-এর সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাসর হয়নি (যেহেতু তারা কমবয়স্কা বালিকা ছিলেন)। যখন কুরআনের আয়াত تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ নাযিল হলো, তখন আবূ লাহাব ছেলেদেরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি মুহাম্মদের মেয়েদেরকে তালাক না দিয়ে দাও তাহলে তোমাদের সাথে আমার উঠাবসা হারাম হয়ে যাবে। পিতার নির্দেশ পালন করে দু'ছেলেই বাসরের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে দিল। হযরত নবী করীম (সা) হযরত উসমান (রা)-এর সাথে হযরত রুকাইয়্যা (রা)-কে বিয়ে দিলেন। হযরত উসমান (রা) যখন হাবশায় হিজরত করেন তখন হযরত রুকাইয়্যা (রা) তাঁর সাথে সহযাত্রী ছিলেন। হিজরতের পর কিছুদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁদের খোঁজখবর পাননি। এক মহিলা (হাবশা থেকে এসে) জানালেন যে, সে তাদের দু'জনকেই হাবশায় দেখেছেন। তখন তিনি বললেন ঃ

صَحِبَهُمَا اللّٰهُ اَنَّ عُثْمَانَ اَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ بِاَهْلِهٖ بَعْدَ لُوْطٍ -

"আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'জনের সাথে থাকুন! নিশ্চয়ই উসমান হচ্ছে নবী লূতের পর পরিবারসহ প্রথম হিজরতকারী" (ইবনুল মুবারক)।

সেখানে হিজরতের পর তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যার নাম ছিল আবদুল্লাহ। যিনি ছয় বছর জীবিত থেকে ইন্তিকাল করেন।

---

১. ইবন সা'দ, আহমাদ, আবূ ইয়া'লা।
২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ১৯৫।

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন সে মুহূর্তে হযরত রুকাইয়্যা (রা) অসুস্থ ছিলেন। এজন্য হযরত উসমান (রা) বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। যেদিন হযরত যায়িদ ইবন হারিসা মুশরিকদের পরাজয় এবং মুসলমানদের বিজয়ের সুসংবাদ নিয়ে মদীনায় পৌঁছলেন সেদিন হযরত রুকাইয়্যা (রা) ইন্তিকাল করেন। এদিকে হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা)-ও বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কেননা তিনি অসুস্থ রুকাইয়ার সেবার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। যখন তাঁর দাফন-কাফনে সবাই ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় তাকবীর ধ্বনি শুনা গেল। হযরত উসমান (রা) উসামাকে জিজ্ঞেস করলেন, উসামা দেখ কিসের আওয়াজ হচ্ছে। উসামা দেখতে পেলেন হযরত যায়িদ ইবন হারিসা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উটনীর উপর সাওয়ার হয়ে মুশরিকদেরকে নিহত হওয়ার সুসংবাদবার্তা নিয়ে আগমন করেছেন। ইন্তিকালের সময় হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর বয়স বিশ বছর হয়েছিল।[১]

হযরত উম্মু কুলসূম (রা)

হযরত উম্মু কুলসূম (রা) এই উপনামেই বিখ্যাত ও এই নামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্য নাম জানা যায় না। হযরত রুকাইয়্যা (রা)-এর ইন্তিকালের পর ৩য় হিজরীতে রবীউল আউয়াল মাসে হযরত উসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ হয়। ছয় বছর হযরত উসমান (রা)-এর দাম্পত্যে ছিলেন। কোন সন্তান জন্ম হয়নি। নবম হিজরীর শা'বান মাসে ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানাযার নামায পড়িয়েছেন। হযরত আলী, ফযল ইবন আব্বাস এবং হযরত উসামা ইবন যায়িদ (রা) তাঁকে কবরে নামিয়েছেন। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) কবরের পাশে বসে ছিলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল।[২]

হযরত উম্মু কুলসূমের প্রথমে আবূ লাহাবের ছেলে উতায়বার সাথে বিয়ে হয়। পিতার কথামত সে তাঁকে তালাক দিয়ে দেয়। আবূ লাহাবের দ্বিতীয় ছেলে উত্বাও তালাক দিয়ে ক্ষান্ত ছিল না, বরং সে তালাক দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ আমি আপনার দীনকে অস্বীকার করি এবং আপনার মেয়েকেও তালাক দিয়ে দিলাম। সে আমাকে পছন্দ করে না আর আমিও তাকে পছন্দ করি না। তারপর সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর চড়াও হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জামা ছিঁড়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে বদ্দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার উপর কোন হিংস্র জানোয়ারকে চড়াও করুন। অতঃপর এক সময় কুরায়শের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার পথে রওয়ানা করে। পথে যুরকা নামক স্থানে কাফেলা যাত্রা বিরতি করে। আবূ লাহাব ও উতায়বা সে কাফেলায় ছিল। রাতে একটি বাঘ আসল। বাঘটি কাফেলার

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩০৪।

২. যারকানী, ৩ খ,পৃ. ১৯৯।

সদস্যদের চেহারা দেখে তাদের ঘ্রাণ নিচ্ছিল। যখন উতায়বাকে দেখতে পেল তখন তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। এভাবে উতায়বা মারা যায়। বাঘটি অদৃশ্য হয়ে গেল এবং তার কোন হদীস পাওয়া গেল না। বিস্তারিত ঘটনা ইনশাআল্লাহ মু'জিযা অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।[১]

হযরত উম্ম কুলসূমের ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ (সা) ফরমান, যদি আমার দশটি মেয়েও থাকত, তা হলে এ অবস্থায় একের পর এক মেয়েকে আমি উসমানের সাথে বিয়ে দিতে থাকতাম।[২]

হযরত ফাতিমা (রা)

ফাতিমা তাঁর নাম এবং যাহ্‌রা ও বতুল তাঁর উপাধী ছিল। তাঁকে বতুল এজন্য বলা হত যে বতুল অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন। তিনি মর্যাদা ও পূর্ণতার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যান্য মহিলার চেয়ে অনন্যা ছিলেন। অথবা আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার গুণের কারণে এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঔজ্জ্বল্যের কারণে যাহ্‌রা নামে অভিহিত ছিলেন।

ইবন আবদুল বার (র) বলেন, নবুওয়াতের প্রথম বৎসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইবন জাওযী বলেন, নবুওয়াতে পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন যখন কুরায়শগণ পবিত্র কা'বার সংস্কার করছিল।[৩]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সকল কন্যা সন্তানের মধ্যে হযরত ফাতিমা (রা) সবচেয়ে কনিষ্ঠ ছিলেন। সবচেয়ে বড় ছিলেন হযরত যায়নাব (রা), তাঁর পর হযরত রুকাইয়্যা (রা) অতঃপর হযরত উম্মু কুলসূম সর্বশেষ হযরত ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেন।[৪]

২য় হিজরীতে হযরত আলী (রা)-এর সাথে বিবাহ হয়। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল পনর বছর, সাড়ে পাঁচ মাস। আর দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী উনিশ বছর দেড় মাস। হযরত আলী (রা)-এর বয়স সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে যে, তিনি কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক বর্ণনা হচ্ছে, আট বছর আর অপর বর্ণনায় তিনি দশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী বিবাহের সময় হযরত আলী (রা)-এর বয়স ২১ বৎসর ৫ মাস হয় এবং দ্বিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী ২৪ বছর দেড় মাস হয়। (যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২০৪)

হযরত ফাতিমা (রা) এর বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাবলীতে গত হয়েছে। হযরত ফাতিমা (রা)-এর ৫ জন সন্তান হয়েছিল। তিনজন পুত্র এবং দু'জন কন্যা। ১. হাসান, ২. হুসায়ন, ৩. মুহসিন, ৪. উম্ম কুলসূম ও ৫. যায়নাব (রা)

১. প্রাগুক্ত।

২. মাজমাউয যাওয়াহিদ, ৯ খ. পৃ. ২১৭।

৩. যারকানী, ৩ খ. পৃ. ২০২।

৪. আল-ইস্তি'আব, ইবন আবদুল বার, ৪ খ, পৃ. ৩৭৩ টীকা আল-ইসাবা।

হযরত ফাতিমা (রা) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে তাঁর বংশধারা অব্যাহত থাকেনি। মুহসিন বাল্যবয়সে ইন্তিকাল করেন। হযরত উম্মু কুলসূমের সাথে হযরত উমর (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল কিন্তু কোন সন্তান জন্ম হয়নি।

অন্যদিকে হযরত যায়নাবের বিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাফরের সাথে হয়েছিল এবং তাঁদের সন্তানও হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের ছয়মাস পর ১১ হিজরীতে রমযান মাসে হযরত ফাতিমা (রা) ইন্তেকাল করেন। হযরত আব্বাস (রা) নামাযে জানাযা পড়িয়েছেন। হযরত আলী (রা), হযরত আব্বাস (রা), হযরত ফযল ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে কবরে নামান।[১]

মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রিয়তম কন্যা ছিলেন হযরত ফাতিমা (রা)। তিনি অনেকবার ইরশাদ করেছেন ঃ হে ফাতিমা! তুমি কি এ বিষয়ে খুশি হবে না যে, তুমি জান্নাতে সকল মহিলার নেত্রী হবে। এক বর্ণনায় আছে, তুমি পৃথিবীর সব নারীর নেত্রী, হযরত মরিয়ম (আ) ব্যতীত সকলেই তাঁর আওতায় হবেন। যখন নবী করীম (সা) সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমার সাথে দেখা করতেন এবং এভাবে সফরে বের হওয়ার সময়ও সর্বশেষ তাঁর সাথে দেখা করে রওয়ানা হতেন।

হযরত ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণনার জন্য আলাদা একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য এখানে আমরা সংক্ষেপে শেষ করছি।

হযরত ইবরাহীম (রা)

হযরত ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সর্বশেষ সন্তান, যিনি ৮ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে হযরত মাবিয়া কিবতীয়া (রা)-এর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের সপ্তম দিবসে তাঁর আকীকায় দু'টি দুম্বা যবেহ করা হয়। মাথা মুড়িয়ে চুল বরাবর রৌপ্য সাদাকা করা হয়েছে। চুলগুলো মাটিতে দাফন করা হয়েছে এবং ইবরাহীম নাম রেখেছেন। আউয়ালী (উপশহরে) এলাকায় এক দুধ মার কাছে রেখেছেন। মাঝে মধ্যে তিনি সেখানে তাশরীফ নিতেন, কোলে নিয়ে আদর করতেন। প্রায় পনর কি ষোল মাস পর্যন্ত জীবিত থেকে দশম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। যেদিন হযরত ইব্‌রাহীম ইন্তিকাল করেন সেদিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তৎকালীন আরবের বিশ্বাস ছিল, যদি কোন মহান ব্যক্তিত্ব মারা যায় তাহলে সূর্যগ্রহণ হয়। এজন্য এ কুসংস্কার বিশ্বাস দূর করার জন্য তিনি খুতবা দিলেন যে, কারো মৃত্যুতে সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণ হয় না, বরং চাঁদ-সূর্য আল্লাহর নিদর্শন এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সতর্ক করে থাকেন। যখন এমনটি দেখবে, তখন তোমরা নামায পড়বে, দু'আ করবে এবং সাদাকা করবে।[২]

---

১. আল-ইসাবা, ৪ খ, পৃ. ৩৭৯।

২. যারকানী, ৩ খ, পৃ. ২১৪।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক (আকৃতি)

হযরত নবী আকরাম (সা) অধিক দীর্ঘও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না, বরং তিনি মধ্যম অবয়বের ছিলেন। কেশ মুবারক ঘন ছিল। মাথা মুবারক এবং দাঁড়ি মুবারকের আনুমানিক ২০ থেকে ২৫টি কেশ মুবারক সাদা হয়েছিল। চেহারা মুবারক অনুপম সুন্দর ও নূরানী ছিল। যিনিই মহানবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী চেহারা দেখেছেন তিনিই তাঁর চেহারা মুবারককে ১৪ তারিখের পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় আলোকিত বলে উল্লেখ করেছেন।

তাঁর পবিত্র শরীরের ঘামে বিশেষ ধরনের সুগন্ধি ছিল। পবিত্র চেহারা মুবারক থেকে যখন ঘামের ফোঁটা নির্গত হত, তখন মুক্তা মনে হতো। হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রেশমের কাপড়কে মহানবী (সা)-এর শরীর মুবারক থেকে অধিক নরম ও কোমল দেখিনি। মেশক আম্বর সুগন্ধিকেও রাসূলুল্লাহ (সা)এর দেহ মুবারকের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুঘ্রাণযুক্ত পাইনি।

মুহ্‌রে নবুওয়াত

পৃষ্ঠদেশে দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে ডান কাঁধের কিছুটা কাছাকাছি স্থানে মুহ্‌রে নবুওয়াত ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে কবুতরের ডিমের মত লাল গোশতের টুক্‌রা ছিল।

এই মুহর হযরত নবী (সা) এর নবুওয়াতের বিশেষ নিদর্শন স্বরূপ ছিল। যার আলোচনা পূর্বের আসমানী কিতাব এবং আম্বিয়ে কেরামের ভবিষ্যদ্বাণীতে ছিল। ইয়াহূদী আলিমগণ এই নিদর্শন দেখে তাঁকে শনাক্ত করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হচ্ছেন শেষ যমানার নবী, যাঁর সুসংবাদ পূর্বের নবীগণ দিয়েছেন। এবং তাঁরা নবীর নিদর্শন (মুহরে নবুওয়াত)-এর বর্ণনা করেছেন তা তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। এটি যেন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সীল ও সনদ স্বরূপ ছিল। (মাদারেজুন্ নবুওয়াত) ১ খ, পৃ. ২১।

আল্লামা সুহায়লী (র.) বলেন , মুহ্‌রে নবুওয়াত হযরত নবী (সা)-এর বামদিকে কাঁধের নিকট ছিল। এর কারণ হচ্ছে মানুষের শরীরে শয়তান প্রবেশের এটিই পথ। পিছনের দিক থেকে এসে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার সৃষ্টি করে। এজন্য তাঁর দেহ মুবারকের এই স্থনে মুহরে নবুওয়াত স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। এর ফলে শয়তানের আসার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর পবিত্র হৃদয়ে কোন পথেই শয়তান কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারবে না।[১]

কোন কোন বর্ণনায় এমনও আছে যে, হযরত নবী (সা) এর পৃষ্ঠদেশের মুহরে নবুওয়াতের মধ্যে জন্মগতভাবে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' (مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ) লেখা বুঝা যেত।

---

১. খাসাইসুল কুবরা, ১ খ, পৃ. ৬০।

اخرج ابن عساكر والحاكم فى تاريخ نيسابور عن ابن عمر قال كان خاتم النبوة على ظهر النبى صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله (خصائص الكبرى للسيوطى)

"হাফেয ইবন আসাকির ও হাকেম তারীখে নিসাপূরে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পৃষ্ঠে মুহরে নবুওয়াত গোশতের পিণ্ডের মত ছিল এবং গোশ্‌তের মধ্যেই লেখা ছিল محمد رسول الله 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।"[১]

আল্লামা যারকানী (র) বলেন ঃ এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, কিছু দুর্বল সূত্রের বর্ণনা। শায়খ আবদুর রাউফ মানাবী (র) শামাইল গ্রন্থের ভাষ্যে (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০) লিখেছেন যে, হাফেয কুতুবুদ্দীন হালবী এবং অনুগামী হাফেয মুগালতাঈ এই বর্ণনাকারীদের বিষয়ে দোষত্রুটির সমালোচনা করেছেন, কিন্তু এ বিষয়ে অন্য কোন রিওয়ায়াতও সহীহের মর্যাদায় পৌঁছেনি। আল্লামা কারীও শামায়েলের ভাষ্যে (১ খ, পৃ ৫৯) লিখেছেন, এই রিওয়ায়াতটি প্রতিষ্ঠিত বর্ণনার পর্যায়ে পড়ে না।

মাথার চুল বেশির ভাগ সময় কাঁধ পর্যন্ত এবং কখনো কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকত। চুলে চিরুনি করতেন। চোখে সুরমা ব্যবহার করতেন। যদিও প্রাকৃতিকভাবে চোখে সুরমার ব্যবস্থাও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নয়ন প্রশস্ত ও দৃষ্টিনন্দন ছিল এবং খুব কালো ও লালিমায় মিশ্রিত ছিল। বক্ষদেশ থেকে শুরু করে নাভী পর্যন্ত সরু খুবই সুন্দর একটি রেখা ছিল। উভয় বাহু ও কাঁধ মাংসল ছিল। হযরত নবী (সা) যখন হাঁটতেন, মনে হত তিনি ধীর পদক্ষেপে উপর থেকে নিচে নামছেন। মোটকথা এমনিভাবে তাঁর পবিত্র দেহ মুবারক পবিত্র চেহারা মুবারকসহ তাঁর বাহ্যিক অবয়ব ও আধ্যাত্মিক নৈতিক দিক সব দিক থেকেই তিনি অনুপম সুন্দর ছিলেন। মুচকি হাসতেন, কখনো অট্টহাসি দিতেন না। হাদীসে আছে, অবয়বে ও চরিত্রে তাঁর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধিক সাদৃশ ছিল।

দাঁড়ি মুবারক

দাঁড়ি মুবারক ঘন ছিল। নবী (সা) দাঁড়ি ছাঁটতেন না, তবে গোঁফ ছাটতেন, কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে বেড়ে যাওয়া দাঁড়ি ছাটতেন, যেন দেখতে অসুন্দর মনে না হয়। দাঁড়ি রাখা সমস্ত নবী (আ.)-এর সুন্নাত ছিল। নাউযুবিল্লাহ, দাঁড়ি রাখা সামাজিক ও দেশী প্রথা হিসেবে ছিল না, যেমনটি আজকাল কোন কোন অজ্ঞ ও গুমরাহ লোক মনে করে থাকে।

১. প্রাগুক্ত, যারকানী ও শারহে মাওয়াহিব, ১ খ, পৃ. ১৫৬।

দাঁড়ি শুধুমাত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সুন্নাত ও ইসলামের নীতিই নয়, বরং সকল নবীর, যাঁদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, সকলেরই সুন্নাত। যেমন হাদীসে আছে مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ সকল নবী ও রাসূলের সুন্নাত।

গীর্জায় বর্তমানকালেও হযরত ঈসা (আ)-এর যে ছবি রাখা হয় তাতে তাঁর দাঁড়ি আছে। অন্যদিকে খ্রিস্টান ও ইয়াহূদী আলিমদের অধিকাংশই দীর্ঘ দাঁড়ি রাখেন। অতএব এসব ধর্মীয় ব্যক্তির দাঁড়ি রাখাও প্রত্যক্ষ এ কথার প্রমাণ স্বরূপ যে, দাঁড়ি নবীদের সুন্নাত। হযরত হারূন (আ)-এর দাঁড়ির আলোচনা কুরআনুল করীমে আছে ঃ

يَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلاَ بِرَأْسِيْ

আরবদেশে যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতীয়তার অনুসারী ছিল, তারা দাঁড়ি রাখত। আর বেশির ভাগ মুশরিক দাঁড়ি কামিয়ে ফেলত। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ اِحْفُو الشَّوَارِبَ وَاعْفُوْا لُلِّحَى -

"মুশরিকদেরকে বিরোধিতা কর। তাদের মত দাঁড়ি কামাবে না, আম্বিয়ায়ে কিরামের সুন্নাত অনুযায়ী গোঁফ কামাও এবং দাঁড়ি বড় কর, আর মুশরিকদের সাদৃশ হওয়া থেকে নিজেদেরকে হিফাযত কর। এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের আকার-আকৃতি পোশাকের অনুসরণ কর। সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের আকৃতিও জনপ্রিয় হয়ে থাকে। তেমনিভাবে - مَغضوب عليهم ولا الضّالين ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুসরণে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও পথভ্রষ্টতার আশংকা রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, দাঁড়ি সকল নবী ও রাসূল এবং সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও সকল ওলী আল্লাহর চিরন্তন সুন্নাত এবং এটা ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। দাঁড়ি না রাখা মারাত্মক অপরাধ। ইসলামের নিদর্শনকে প্রকাশ্যে অপমান করা ও দাঁড়ি নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা কুফরের শামিল। কেননা দাঁড়িকে তিরস্কার ও অপমান করার মানে হচ্ছে সকল নবী ও রাসূলকে অপমান ও তামাশা করা এবং সকল শরী'আতে সাব্যস্ত একটি হুকুমকে অপমান করা। আর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং চৌদ্দশত বছরের সকল আলিম, আওলিয়ায়ে কিরাম, সালেহীন ও ইসলাম, রাষ্ট্রের শাসকবৃন্দকে বোকা ও মূর্খ সাব্যস্ত করা হয়। দাঁড়ি নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপকারীদের এ কথা বুঝে আসে না যে, ৫০ বছর পূর্বে তাদের বংশের সকল পিতা, দাদা, পরদাদা সকলেই দাঁড়ি রাখতেন। এসব বিদ্রুপকারীর নিকট তাহলে তাদের পিতা, দাদা পরদাদার উপর মূর্খতার সাইনবোর্ড লাগিয়েছিলেন। আল্লাহ এ ধরনের অবুঝকে বিবেক দান করুন।

পুরুষের জন্য দাঁড়ি এবং নারীদের জন্য বেণী

মাথার চুল এবং বেণী নারীদের জন্য যেমন সৌন্দর্য ও সাজ হিসেবে পরিগণিত, তেমনিভাবে পুরুষের জন্য দাঁড়িও সাজ হিসেবে স্বীকৃত।

এই জন্যই নারীদেরকে মাথার চুল বড় করতে বলা হয়েছে এবং চুল কামাতে নিষেধ করা হয়েছে। নাসায়ীতে হযরত আলী (রা) থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে ঃ

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ تَحْلُقَ الْمَرْأَةُ رَاْسُهَا ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) নারীদেরকে নিজেদের মাথার চুল কামাতে নিষেধ করেছেন।"

পুরুষদেরকে চুল রাখা ও কামিয়ে ফেলার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। তবে তাদের এ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, পুরুষ যেন চুলকে এতটা লম্বা না করে যাতে নারীর মত মনে হতে পারে। বরং তার জন্য একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এই নির্ধারিত সীমা সে যেন অতিক্রম না করে। অর্থাৎ কানের লতি পর্যন্ত অথবা কাঁধ পর্যন্ত।

قال النبى صلى عليه وسلم نعم الرجل خريم لولا طول جمته وأسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فاخذ مشفرة فقطع بها جمته الى اذنه ورفع ازاره الى نصف ساقيه (رواه أبوداؤد عن ابن خجلة)

হযরত নবী (সা) বলেন, খারীম আসাদী উত্তম লোক, যদি তার মাথার চুল কাঁধের সীমা থেকে দীর্ঘ না হতো এবং তার পরিধেয় টাখ্নুর নিচে না পড়ত। যখন খারীমের নিকট রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কথা পৌছল, তিনি কাঁচি নিয়ে কানের লতি পর্যন্ত চুল কেটে ফেললেন এবং পরিধেয় পায়ের অর্ধেক গোছার মধ্যে রাখলেন।"

যারা মাথা মুণ্ডাতে চায় তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি মাথা মুণ্ডাও তা হলে সব চুল মুণ্ডাতে হবে। কিছু রেখে কিছু চুল মুণ্ডানো যাবে না। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে রিওয়ায়াতে আছে ঃ

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأٰى صَبِيًّا قَدْ عَلَقَ بَعْضَ رَأْسَهٗ وَتَرَكَ بَعْضَهٗ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ اِحْلِقُوْا كُلَّهٗ اَوِ اتْرُكُوْا كُلَّهٗ ـ

"হযরত নবী (সা) একবার একটি ছেলেকে দেখালেন, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো আর কিছু অংশ মুণ্ডানো হয়নি। তখন মহানবী (সা) তাদের এমনটি করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন ঃ হয় পুরোটা কামাবে অথবা পুরো মাথা স্বাভাবিক অবস্থায় রাখবে।" (মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে ঃ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَيَنْهٰى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ وَالْقَزَعُ اَنْ يَتْرُكَ بِنَاصِيَةِ شَعْرٍ وَلَيْسَ فِىْ رَأْسِهٖ غَيْرِهٖ وَكَذٰلِكَ شَقَّ رَأْسَهٗ وَهٰذَا وَهٰذَا ـ

"আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কাযা' করতে নিষেধ করতে শুনেছি। ওবায়দুল্লাহ বলেন, আর কাযা' হচ্ছে ঃ কপালের দিকের কিছু চুল রেখে অবশিষ্ট মাথায় চুল না রাখা অথবা এভাবে এভাবে দু'পাশে চুল রেখে বাকী মাথায় চুল না রাখা।"

এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে ইয়াহূদীদের অনুসরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সুনানে আবূ দাঊদ এ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। فَاِنَّ ذٰلِكَ زِى الْيَهُوْدِ অর্থাৎ এটি ইয়াহূদীদের আচরণ ও রীতি। যখন এটা ছোট ছেলেদের জন্য নাজায়েয হলো, তখন বড়দের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রথম পর্যায়ের তা অবৈধ হবে। একইভাবে খ্রিস্টানদের অনুসরণও নাজায়েয হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টিগত ও প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। মহিলাদেরকে নাজুক ও কোমল স্বভাব এবং প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে বানিয়েছেন। এজন্য তাদেরকে রূপ ও সৌন্দর্য এবং মাথায় চুল দান করেছেন। অন্যদিকে পুরুষদেরকে প্রশাসক বানিয়েছেন। সে অনুযায়ী তাদেরকে বলিষ্ঠ করে তৈরি করেছেন। পুরুষের চেহারা ও আকার প্রকৃতি শৌর্য ও বিক্রম ও দর্শনীয়। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের চেহারা দাঁড়ি গোঁফ এর রং লাগিয়েছেন এবং তাদের অঙ্গে সক্ষমতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করেছেন। তাদের গঠনে তেজিভাব সৃষ্টি করেছেন। তাদের চালচলনে বীরত্ব ও সাহসিকতার ছাপ পয়দা করে দিয়েছেন। তাদের হৃদয়ে গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী কামনার স্বপ্ন সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে নারীদের স্বভাব প্রকৃতিতে নাজুকতা ও কোমলতা এবং প্রজনন, দুগ্ধপান, শিশুপালন-এর চাহিদা তৈরি করেছেন। এজন্যই দেখা যায়, আজ পর্যন্ত কোন সরকার নারীদেরকে দিয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করেনি। কেননা সৈন্যদের জন্য বীরত্ব প্রয়োজন, নাজুকতা ও কোমলতা প্রত্যাশিত নয়। আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও মহিলাদেরকে গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরি করেছেন। এজন্যই পুরুষদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন নারীদের মত না হয়। তেমনিভাবে নারীরাও যেন পুরুষদের মত না হয়, তা হলে প্রকৃতির বিধান লংঘন করা হবে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর নিজস্ব বিষয়গুলো গ্রহণ করবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইসলাম পুরুষদেরকে রেশমী ও জরির কাপড় পরিধান করা যা নারীদের জন্য নির্দিষ্ট কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। তেমনিভাবে পুরুষগণ গহণা পরিধান করবে না, পায়ে ঝুমুর-নুপুর পরবে না, মাথায় টিক্ লাগাতে পারবে না। হাতে বালা চুড়ি পরতে পারবে না এবং সম্পূর্ণ লাল পোশাক পরবে না। চলাফেরায় মেয়েলি চাল ধারণ করবে না এবং দাঁড়ি কামাবে না বরং দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে রাখবে ও গোঁফ কেটে রাখবে। দাঁড়ি লম্ব করা এবং গোঁফ কেটে রাখা আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাত এবং প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

হযরত নবী (সা)-এর যামানায় অগ্নিপুজকরা প্রকৃতি বিরোধী এসব কাজে জড়িত ছিল। তারা গোঁফ বড় রাখত এবং দাঁড়ি কেটে ফেলত। এজন্য হযরত নবী করীম (সা)

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা অগ্নিপুজকদের বিরোধিতা কর। তারা প্রকৃতি বিরোধী কাজ করে, তোমরা দাঁড়ি ছেড়ে দিয়ে (বড়) রাখ এবং গোঁফ কেটে রাখ।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وارخو اللحى وخالفوا المجوس -

"রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, তোমরা অগ্নিপুজকদের বিপরীত গোঁফ কেটে ফেল এবং দাঁড়ি বড় করে রাখ।"

অনেক হাদীসেই এই প্রসংগটি এসেছে যে, দাঁড়ি বড় করে রাখা এবং গোঁফ কেটে রাখা নবীদের সুন্নাত এবং প্রাকৃতির বিষয়ের সাথে স্বভাবসম্মত যে, ছোট ও বয়স্ক লোক, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে পার্থক্যের চিহ্ন থাকা প্রয়োজন তা দাঁড়ির মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এছাড়াও দাঁড়ি সৌন্দর্যের প্রতীক, বীরত্ব ও সাহসিকতারও প্রতীক, ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখুন।

পরীক্ষার পদ্ধতি

সমবয়সী কিছু যুবক কিছু মধ্য বয়সী এবং বৃদ্ধ বয়সী লোককে সমবেত করুন, তারপর দাঁড়িওয়ালা ব্যক্তিদেরকে এক কাতারে এবং দাঁড়িবিহীনদেরকে ভিন্ন কাতারে দাঁড় করান। এবার দুই কাতারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখুন, কোন কাতারকে সুন্দর মনে হয়, আর কোন কাতারকে অসুন্দর মনে হয়। এক নযরেই দাঁড়ির সৌন্দর্য বুঝা যাবে। যেমন কেশের বেণীওয়ালীকে বেনীবিহীন মহিলা থেকে সুন্দর ও নান্দনিক মনে হবে। এভাবে দাঁড়িওয়ালা পুরুষ সমবয়সী দাঁড়িবিহীন পুরুষ থেকে তাদের ন্যায় অধিক সুন্দর ও ভাল মনে হবে। ইচ্ছা করলে যে কেউ তা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

কলেজে কিছু ছাত্র দ্বীনদারও আছে, যারা দাঁড়ি রাখে। সেসব নওজোয়ান দাঁড়িওয়ালাদেরকে সমবয়সী দাঁড়িবিহীন নওজোয়ানদের সাথে একসাথে দাঁড় করিয়ে দেখা যাবে কারা অধিক সুন্দর।

অথবা লণ্ডন ও জার্মানীর এমন দু'জন সমবয়সী নওজোয়ানকে সমবেত করুন যাদের দাঁড়ি গজাবার সময় মাত্র শুরু হয়েছে। ছয় মাস পর্যন্ত তারা দু'জন দাঁড়ি কামাবে না। তারপর একজন দাঁড়ি কামাবে আর অন্য সমবয়সী দাঁড়ি কামাবে না। তখন দু'জনকে দাঁড় করিয়ে দেখা যাবে কাকে অধিক সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয়। আপনি এক নযরেই ফায়সালা দিবেন যে, দাঁড়িওয়ালা খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয়, দাঁড়িবিহীন যুবক নয়।

সুতরাং যেমনিভাবে চুল লম্বা রাখাও বেনী করা স্ত্রী লোকদের অংকার তেমনি পুরুষের জন্য দাঁড়ি অলংকার বিশেষ। যদি অলংকার সংরক্ষনের কেউ প্রয়োজন মনে না করেন, তবে মহিলাদেরকে মাথা মুড়ানো উচিত।

কাহিনী

কথিত আছে, ইউরোপের কোন এক এলাকায় কিছু মহিলার খেয়াল চাপল যে, তারা মাথা নেড়ে করে ফেলবে, তাতে তাদের মগজের তাপ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষের ন্যায় তাদের মেধা ও ধীশক্তি বৃদ্ধি পাবে ও মস্তিষ্কের উন্নতি হবে। মহিলারা যখন কয়েকবার মাথা নেড়ে করল তখন তাদের মুখে দাঁড়ি গজাতে শুরু করল। তখন তারা মাথা নেড়ে করা বন্ধ করে দিল।

মাসয়ালা

কতিপয় ফিকহ্‌বিদ লিখেছেন, তোমরা বল কোন দাঁড়ি কামান জরুরী? তারপর তারা জবাব দিয়েছেন, মহিলাদের যদি দাঁড়ি গজায় তাহলে তা কামিয়ে ফেলা জরুরী।

মহানবী (সা)-এর পোশাক

হযরত নবী (সা)-এর পোশাক সাদাসিধা সাধারণ ও জৌলুসবিহীন ছিল। তাঁর যিন্দেগী ছিল বিলাসিতাবিহীন ও দরিদ্র ধরনের। তাঁর সাধারণ পোশাক ছিল তহবন্দ (লুঙ্গী), চাদর, কোর্তা ও জুব্বা এবং তালিযুক্ত কম্বল।

তিনি সবুজ পোশাক পছন্দ করতেন তবে তাঁর পোশাক সাধারণত সাদা হতো।

চাদর ঃ ইয়ামেনী চাদর যাতে সবুজ ও লাল ডোরা (রেখা) হতো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রিয় ছিল। তা ইয়ামেনী চাদর হিসেবে পরিচিত ছিল। সম্পূর্ণ লাল চাদরকে তিনি নিষেধ করতেন।

টুপি ঃ টুপি মাথার সাথে মিশে থাকত। খুব উঁচু টুপি কখনো ব্যবহার করেননি। আবূ কাবশা আগারী (র) থেকে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের টুপি মাথার সাথে মিলে থাকত, উঁচু হত না।

পাগড়ী ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) পাগড়ীর নিচে অবশ্যই টুপি রাখতেন। তিনি ফরমান, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে, আমরা পাগড়ীর নিচে টুপি পরিধান করি। (আবূ দাঊদ)

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন পাগড়ী পরিধান করতেন তখন পিঠে দু'কাঁধের মাঝখানে পাগড়ীর মাথা ঝুলিয়ে দিতেন। কপালে ডান কাঁধের দিকে অথবা বা কাঁধের দিকেও ঝুলিয়ে দিতেন। অথবা কখনো হয়ত থুতনীর নিচেও পাগড়ীর প্রান্ত ঝুলিয়ে রাখতেন। মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বদর যুদ্ধে এবং হুনায়নের যুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য পাগড়ীবিশিষ্ট ফিরিশতা প্রেরণ করেছেন। যে বিষয়ে পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ـ

পায়জামা ঃ হাদীসে আছে, হযরত নবী (সা) মিনার বাজারে পায়জামা বিক্রি হতে দেখলেন তখন তিনি তা পছন্দ করলেন এবং মন্তব্য করলেন ঃ এটি তহবন্দ থেকে

পর্দার জন্য অধিক কার্যকর। তিনি পায়জামা খরিদ করেছেন, তবে তিনি তা পরিধান ও ব্যবহার করেছিলেন কি-না তা জানা যায় না।

কামীস ঃ (কোর্তা) ঃ কামীস তাঁর খুব প্রিয় পোশাক ছিল। কাঁধের সাথে কোর্তা গিরা দেয়া হতো। আবার কখনো বুকের দিকে খোলা হতো।

লুঙ্গী ঃ (তহ্বন্দ) ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) এর সব পোশাক পায়ের টাখ্নু থেকে উপরে থাকত। বিশেষ করে তাঁর তহবন্দ বা লুঙ্গী পায়ের গোছার মাঝামাঝি পর্যন্ত হতো।

মোজা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) মোজা পরতেন এবং মোজার উপর মাসেহ্ করতেন।

বালিশ ঃ তাঁর বালিশ চামড়ার খোলের তৈরি হত। ভেতরে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি করা ছিল। আবার কখনো মহানবী (সা) খালি চাটাইয়ে শয়ন করতেন। চাটাই বা বস্তা তাঁর বিছানা ছিল।

আংটি ঃ পবিত্র হাত মুবারকে রূপার আংটি ব্যবহার করতেন। হযরত নবী (সা) যখন রোম সম্রাট কায়সার ও হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাসীসহ অন্যান্যদেরকে ইসলামের দাওয়াতী পত্র লেখার সংকল্প করেন, তখন তিনি অবহিত হন যে, শাসক ও রাজা-বাদশাহগণ মোহর বা সীল ব্যতীত কোন পত্র গ্রহণ করেন না। তখন তিনি রূপার একটি আংটি তৈরি করেন। যাতে তিন লাইনে উপর থেকে মুহাম্মদ, রাসূল, আল্লাহ লিখা ছিল।

জুতা মুবারক ঃ নবী (সা)-এর জুতা চপ্পল বা স্যান্ডেলের ন্যায় ছিল যে, নিচে তলি এবং উপরে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল যাতে তিনি আঙ্গুল স্থাপন করতেন।[১]

নবী (সা) -এর কম্বল মুবারক

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ

অন্য আয়াতে ইরশাদ ফরমান ঃ

يَاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -

اے برادر در لباس صوف باش

باصفتهائے خدا موصوف باش -

'হে ভায়েরা! সূফীদের পোষাক ইখতিয়ার কর, মহান আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হও।"

রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পশমের তৈরি একটি কালো কম্বলও ছিল যাতে তালি লাগানো ছিল। যা খিরকা (গুদড়ী) নামে অভিহিত ছিল। কালো পশমী তালি লাগানো কম্বল আম্বিয়ায়ে কেরামের বিশেষ ভূষণ হিসেবে প্রচলিত (সুন্নাত)– যা আল্লাহর অলীগণ ও দরবেশগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। আজকে আফসোস হচ্ছে, এই রীতি বর্তমান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। সূফীদেরকে এইজন্যই সূফী বলা হতো যে, তাঁরা

১. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ৪৫।

নবীদের অনুকরণে পশমী কম্বল পরিধান করতেন এবং দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়ে চিন্তামুক্ত হয়ে শাহী আসন অভিজাত পোশাককে দরবেশী কম্বলের মুকাবিলায় নগণ্য ও তুচ্ছ মনে করেছেন।

گرچه درویشی بود سخت اے پسند
هم نه درویشی نه باشد خوب تر'

"হে বৎস! যদিও দরবেশী অবলম্বন কঠোর মনে হচ্ছে; তারপরও প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে দরবেশীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।"

قال ابن مسعود كانت الأنبياء يركبون الحمر ويلبسون الصوف ويحتلبون الشاة رواه الطيالسي، وعنه صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وكمته صوف وجبة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من حمار ميت رواه الترمذى وقال غريب والحاكم صححه على شرط البخارى زرقانى -

"হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন ঃ হযরত আম্বিয়া কেরাম গাধায় আরোহণ করতেন, পশমের পোশাক পরিধান করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন। আবূ দাঊদ তায়ালিসী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (সা) থেকে ভিন্ন একটি বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে দিন হযরত মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার কথা হয়েছিল, সেদিন হযরত মূসা (আ)-এর গায়ে পশমের কম্বল ছিল ও পশমী টুপি ছিল এবং তাঁর জুব্বা ও পায়জামাও পশমী ছিল। আর মৃত গাধার চামড়া দিয়ে তাঁর জুতা তৈরি ছিল। এই হাদীসটি তিরমিযী রিওয়ায়াতে করেছেন এবং তিনি এর সনদের দিক থেকে হাদীসটিকে গরীব বলেছেন। হাকেমও হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, ইমাম বুখারীর শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ।"[১]

হযরত আবূ বুরদা ইবন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত আয়েশা (রা) একটি মোটা কম্বল যাতে তালি লাগানো ছিল এবং একটা মোটা কাপড়ের তহবন্দ (লুঙ্গী) বের করে দেখালেন এবং বললেন, নবী (সা)-এর ইন্তিকাল এ দু'কাপড় পরিহিত অবস্থায় হয়েছে।

এখানে হযরত আয়েশা (রা)-এর উদ্দেশ্য ছিল মহানবী (সা)-এর জীবনের অনাড়ম্বর ও বিলাস ও জৌলুসবিহীন সাদাসিধা জীবন যাপন পদ্ধতিকে তুলে ধরা যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনধারা এমনটিই ছিল (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইবন মাজাহ)[২]

১. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ১৬।

২. যারকানী, ৫ খ, পৃ. ২৫।

এ বিষয়ের প্রতি আদর সোহাগের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يايها المدثر এবং يايها المزّمل

এই আয়াতে মর্ম অনুযায়ী আল্লাহর নিকট কম্বল ও চাদর অত্যন্ত প্রিয় পোশাক হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এজন্য ওহে কম্বলধারী! বলে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করেছেন। এজন্যই হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র) লিখেছেন ঃ আউলিয়ায়ে কেরামের নিকট সূরা মুযযাম্মিল সূরা খিরকাহ নামে অভিহিত, যেখানে খিরকার আদব ও শর্তাবলীর আলোচনা আছে। দেখুন, তাফসীরে আযীযী।

হযরত নবী (সা)-এর পোশাক হযরত ইব্‌রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুরূপ ছিল। (নাউযুবিল্লাহ, তা জাতীয় ও দেশীয় পোশাক ছিল না।)

হযরত নবী করীম (সা)-এর পোশাক কোন জাতীয় বা দেশীয় লোকাচারের অনুসরণে ছিল না, বরং অহীয়ে রাব্বানী তথা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনার আলোকে ছিল। আরবে প্রাচীন যুগ থেকে চাদর ও তহ্বন্দ-এর প্রচলন চলে আসছিল। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাকও এরূপ ছিল। এ বিষয়ে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আযারবাইজানের আরবদেরকে চাদর পরতে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, এটি হচ্ছে তোমাদের পিতা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাক।

أما بعد فاتزروا وارتد عليكم بلباس أبيكم اسمعيل واياكم
والتنعم وزى العجم -

"তহ্বন্দ ও চাদর পরিধান কর এবং আপন পিতা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পোশাক অবশ্যই ধারণ করবে।"

নাউযুবিল্লাহ! নবী (সা)-এর পোশাক সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক অনুকরণে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে ও তাঁর নির্দেশনার দ্বারা জাতির বিশ্বাস, আখ্লাক ও কর্মকাণ্ড এবং ইবাদত, সামাজিকতা সব কিছুর বিষয়ে হেদায়েত ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এমনকি কথাবার্তার আদব শিষ্টাচারও শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

জীবন ও সমাজের এমন কোন অধ্যায় নেই যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি কোন ইঙ্গিত ইশারা অথবা নির্দেশনা (ইলহাম) ছিল না, এটা অসম্ভব বরং তা ছিল অসম্ভব যে, নবী (সা) সাধারণ লোকদের রীতিনীতি প্রথার অনুসরণ করবেন। নবী (সা)-এর পোশাকের বিষয়েও নির্দেশনা ছিল যে, এটি জায়েয, এটি হারাম ইত্যাদি। শুধু তা-ই নয়, এক্ষেত্রে মুসলমান ও কাফিরের পোশাক আলাদা বৈশিষ্ট্যের হয়ে গিয়েছিল। আর এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর অনেক হাদীস রয়েছে যেখানে তিনি কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বিরোধিতা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে যে পোশাকে অহংকার, অপব্যয় ও বিলাসিতা

জৌলুস প্রকাশ প্রায় তা থেকেও নিষেধ করেছেন। আল্লাহর দুশমনদের পোশাকের অনুকরণ করতেও নিষেধ করেছেন, তারা রেশমী পোশাক পরিধান করতো, তিনি তা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি ঐ পোশাককেও নিষেধ করেছেন যা আল্লাহর দুশমনদের সাদৃশ হওয়ার কারণ হয়। মুশরিকেরা অহংকার করে লুঙ্গী-প্যান্ট-পায়জামা (ইযার) টাখ্নুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) তা নাজায়েয ঘোষণা করেছেন। জরীর কারুকাজ করা পোশাক পরতে (পুরুষের জন্য) নিষেধ করেছেন যেন অহমিকা, বিলাসিতা ও অপব্যয়ের সুযোগ না থাকে। মুশরিকরা টুপির উপর পাগড়ী পরে না। মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

فرق مابيننا وبين المشركين العمائم على القلانس -

"আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, আমরা টুপির উপর পাগড়ী পরিধান করে থাকি।"

এভাবে হযরত নবী (সা) মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পোশাকের ক্ষেত্রে পার্থক্য ও বিভাজন প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

خالفوا المشركين اوفروا للحى واحفوا الشوارب -

"কাফিরদের বিপরীত কর, দাঁড়ি বড় কর যার গোঁফ ছোট কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ নিজেরদের আকার-আকৃতি কাফিরদের মত করবে না, তোমাদের মৌলিকত্ব কাফিরদের থেকে অবশ্যই ভিন্নতর হতে হবে।

قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাদৃশ অবলম্বন করে সে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হবে।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, রাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা))

এই হাদীসের ভাষ্যে আল্লামা কারী (র) বলেন ঃ এই হাদীসে তাশাব্বুহ বা সাদৃশ বলতে পোশাকের অনুকরণ ও বাহ্যিক বেশভূষার অনুকরণকে বুঝানো হয়েছে। নৈতিক ও চারিত্রিক মুশাব্বাহ বা সাদৃশ অনুকরণের বিষয়কে তাশাব্বুহ বলা হয় না, বরং 'তাখাল্লাকা' বলা হয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আ'স (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

اِنَّ هٰذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسُهَا -

"এইসব কাফিরদের মত পোশাক (কাপড়), তাই তোমরা এগুলো পরবে না।"

যা হোক, এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পোশাক ও তাঁর যাবতীয় আচরণ আল্লাহ তা'আলার মরযী অনুযায়ী ছিল। সম্প্রদায়িক জাতীয় ও দেশীয় সংস্কৃতির অনুসারী ছিল না। যদি রাসূলুল্লাহ (সা) জার্মানী বা লণ্ডনে আবির্ভূত হতেন তবে

সেখানেও তিনি লন্ডনের বেহায়া ও পশুত্বকে সংস্কার ও সংশোধন করতেন। যেমনটি তিনি মক্কার অসভ্য লোকদেরকে করেছিলেন। তাদের প্রবৃত্তির গোলামী থেকে তাদেরকে আল্লাহর বন্দেগীতে, পর্দাহীনতাকে ও অশ্লীলতাকে পবিত্রতা, স্বচ্ছতা ও শালীনতায় পরিবর্তন করেছিলেন। এজন্য কোন আহমক ব্যক্তির এ ধরনের কল্পনার অবকাশ নেই যে, নাউযুবিল্লাহ–যদি হযরত নবী (সা) লন্ডন অথবা জার্মানীতে আবির্ভূত হতেন তা হলে তিনি পশ্চিমা রীতিনীতি ও বেশভূষার অনুকরণ করতেন। এ ধরনের কল্পনা হীনমন্যতা নীচতা ও গোলামী চিন্তার এবং বিবেক বিবর্জিত বোকামী চিন্তার ফানূস ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না, যা পাগলামী বৈ কিছু নয়। হযরত নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার অহীর অনুসারী ছিলেন। اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوْحٰى اِلَىَّ

নাউযুবিল্লাহ কোন নবী দেশ ও সম্প্রদায়ের অনুসারী হতে পারে না বরং নিজ সম্প্রদায়কে তাঁর আনুগত্য করার দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকেন এবং صِبْغَةُ اللّٰه বা আল্লাহর রঙে রঙীন করে থাকেন।

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُوْنَ ـ

সিবগাতুল্লাহ বা আল্লাহর রঙ অনুযায়ী মুসলমানদের জীবন রঙীন করা এতে নির্ভর করে যে, মুসলমানগণ পোশাক-পরিচ্ছেদে কাফিরদেরকে সম্পূর্ণ পরিহার করবে। জীবনের সব শাখা ও প্রশাখায় কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুরোপুরি ঈমানের রঙে জীবনের সব দিককে রঙীন করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে পেশ করা হচ্ছে।

কাফিরদের মত হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা অর্থাৎ কাফিরদের সাদৃশ অবলম্বন জনিত সমস্যার বিষয়ে সাধারণ আলোচনা

আল-হামদুলিল্লাহ! এ বিষয়টি পূর্বের আলোচনায় ভালভাবে স্পষ্ট হয়েছে যে, নবী করীম (সা) নিজ পোশাক যথা লুঙ্গী, চাদর, জুব্বা (কুর্তা) পাগড়ী ও প্রকাশ্য বেশভূষায় স্বীয় পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অনুসারী ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ দেশ ও সম্প্রদায় এবং মক্কার মুশরিকদের অনুসারী ছিলেন না। যৌক্তিক হচ্ছে, সত্য ও হকের সন্ধানীদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতার জন্য এই সমস্যার স্বরূপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

বস্তুত বিজাতির অনুকরণ সমস্যা ইসলামের জন্য একটি জটিল সমস্যা। কেননা এ অনুকরণ চলতে থাকলে ইসলামের অনেক বিধান পালন করা সম্ভব হবে না। এ জন্য দেখা যায়, যারা পশ্চাত্যের সৃষ্ট সংস্কৃতির ভক্ত এবং যারা ইসলামের বিধি-বিধানের সীমা ও শর্তাবলী থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চায়, তারা প্রথমেই হামলা করে বসে ইসলামের এই অনুকরণ বিষয়ে। তারা তাদের সকল প্রচেষ্টাকে এই লক্ষ্যে নিয়োজিত

করে যেন তাদের জন্য পরবর্তী সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়। যেন ইসলামের শিক্ষা ও ইউরোপীয় তমদ্দুন বা সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে। এরা কথায়-বার্তায় থাকবে মুসলমান, কিন্তু লেনদেন, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে সূরতে-আকৃতিতে পোশাক-পরিচ্ছদে ইংরেজ হয়ে যায়।

این خیال است ومحال است وجنون -

"এমনটি একান্তই কল্পনা বিলাস, অসম্ভব ও মাতলামীর নামান্তর।"

যেহেতু ইসলামী শরী'আতে কাফিরদের অনুকরণের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, এজন্য তাফসীর, হাদীস, ফিকহ্, আকাইদের কোন গ্রন্থ এমন নেই যেখানে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়নি।

ফুকাহা ও ইসলামী পণ্ডিতগণ অনুকরণ সমস্যাকে মুর্তাদ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। মুসলমান যে কাজ করলে ইসলামের সীমা থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে যেতে পারে এমন বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে কাফিরদের অনুকরণ। এর প্রত্যেকটি বিষয়ের আলাদা গুরুত্ব ও হুকুম রয়েছে।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর জগত বিখ্যাত আলিম শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়া খারানী (র) (মৃ. ঃ ৭২৮ হি.) এই সমস্যার স্বরূপ স্পষ্ট করার জন্য اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم নামে একটি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেখানে তিনি অনুকরণ সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রমাণাদি তথা কুরআন-হাদীসের সূত্র সহ যুক্তি ও বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যেখানে দ্বীনি ও দুনিয়াবী জীবনকে শিরক-এর অপবিত্রতা ও অন্ধকারের অনুকরণ থেকে ইসলামের অনুসারীদেরকে সতর্ক করা হয়নি এবং এ কথাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে, সিরাতুল মুস্তাকীমের দাবি হচ্ছে, মাগদূবে আলাইহিম ওয়ালাদ্দালীন-অভিশপ্ত ও বিপথগামী দুই জাতি অর্থাৎ যথাক্রমে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অনুকরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

বর্তমান ইংরেজ ও পাশ্চাত্যের যুগের এ পর্যায়ে এই অনুকরণের ফিতনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে দ্বীনের উলামায়ে কেরাম নিজের পুরো প্রচেষ্টা এ বিষয়ে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু এ পর্যায়ে অনুকরণ সমস্যা বিষয়ক কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনার গ্রন্থ রচিত হয়নি, যে গ্রন্থে এ সমস্যার শাখা-প্রশাখা সবদিকের উপর সাজানো গোছানো আলোচনা ও দলীল–প্রমাণ ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে এবং যাতে সংশয়বাদী ও কুমন্ত্রণাকারীদের কুমন্ত্রণা কুধারণা বিদূরিত করে এসবের মূল উৎপাটনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেন এ বিষয়ে এগুলোর কোন সুযোগ ও অবকাশ না থাকে। পরিশেষে আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের মুরব্বী, আলিমদের শিরোমণি মাওলানা

কারী হাফেয মুহাম্মদ তায়্যিব (র)[১] দ্বীনি এই প্রয়োজন ও চাহিদা প্রেক্ষিতে التشبه فى الاسلام বা 'ইসলামে অনুকরণ' নামে দুই খণ্ডে এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে কিতাবটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যার তুলনা দ্বিতীয়টি নেই। হাকীমুল উম্মাত মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানবী (র) উক্ত গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন ঃ

"আল্লাহর হামদ ও দরূদের পর। এই বইটি আমি অধম শব্দে শব্দে পড়েছি। এক একটি শব্দের দ্বারা যেন হৃদয়ে আনন্দ ও চোখে আলো নির্গত হচ্ছিল। অনুকরণ বিষয়টি এত পূর্ণাঙ্গ, বিস্তারিত ও দলীলভিত্তিক লেখা হয়েছে যে, এরকম কোন লেখা আমি আর দেখিনি। সূক্ষ্ম চিন্তা করে ও অনেক দূর থেকেও যা অনুধাবন করা কষ্টকর এমন দিকটিও তিনি উন্মোচন করেছেন। অনেক দূরবর্তী সন্দেহ-সংশয়কেও লেখক সমূলে উৎপাটনের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পুস্তকটিকে উপকারী ও মকবূল হিসেবে গণ্য করুন এবং উত্তম কথা বা كلم طيب এর মধ্যে শামিল করুন। এই বিষয়ের শানে اليه يصعد الكلم الطيب এর মর্যাদা দান করুন। এ বিষয়ে উদ্ধৃত হয়েছে: هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد

এজন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ হচ্ছে যে, যদি আপনারা অনুকরণ সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত প্রামাণ্য বক্তব্য জানতে চান তাহলে التشبه فى الاسلام বা 'ইসলামের অনুকরণ' বইটি পড়ে দেখতে পারেন। এখানে আমি অধম সংক্ষিপ্তভাবে এ সমস্যা নিয়ে একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করছি। এ নিবন্ধের বেশিরভাগ অংশ اقتضاء الصراط المستقيم এবং التشبه فى الاسلام পুস্তকদ্বয় থেকে নেয়া হয়েছে। আর হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র)-এর বিভিন্ন ওয়ায ও বয়ান থেকেও এ সংক্ষিপ্ত লেখায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যেন সম্মানিত পাঠকদের জন্য উপলব্ধি ও নির্দেশনার জন্য সহায়ক হয়। এ বিষয়ে আমি আল্লাহর উপর নির্ভর করছি।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

হাদীস হচ্ছে ঃ

بَدَأَ الْاِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا فَطُوْبٰى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলাম সূচনাকালে অপরিচিত ছিল অর্থাৎ বন্ধু সহযোগীবিহীন ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ছিল। তারপর খিলাফতে রাশেদার যুগে এসে ইসলামের চমক, বিজয় ও বরকত সূর্যের আলোর ন্যায় সব দিকে ছড়িয়ে যায়। রোম সাম্রাজ্যের ও পারস্য সাম্রাজ্যের বাদশাহ কায়সার ও কিস্‌রার গদি ও রাজত্বকে ইসলাম উল্টিয়ে দেয়। ইসলাম সুস্থ

১. অধ্যক্ষ, দারুল উলূম দেওবন্দ, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দিন।

সমাজ ব্যবস্থা ও আল্লাহর দাসত্বের সভ্যতা দিয়ে কায়সার ও কিস্‌রার মেকী ও প্রতারণামূলক সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতাকে তার অনুসারীদের সরেযমীনে পদদলিত করেছে। সে খেলা পৃথিবীবাসী প্রত্যক্ষ করেছে।

হযরত নবী (সা)-এর দশ বছর ব্যাপী জিহাদ এবং হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা)-এর দশ বছর ব্যাপী জিহাদ ও বিজয়ের ধারাবাহিকতায় আল্লাহর সাহায্যে দশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের প্রভাবের বরকতে ও নেতৃত্ব পৃথিবীতে বিজয়ী ছিল। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা দুনিয়ার সকল সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর বিজয়ী হয়েছিল। তৎকালীন পৃথিবীর জাতিসমূহ ইসলামের সভ্যতা সামাজিকতাকে নিজেদের জন্য সম্মানের বিষয় মনে করত। খিলাফতে আব্বাসিয়ার যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি হয়েছিল। শিল্প-সংস্কৃতির লিপিকথা উন্নতির শীর্ষে উপনীত হয়েছিল। তৎকালীন ইউরোপের অধিবাসীরা ছিল মূর্খ ও বর্বর। তারা মুসলমানদের থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখেছে ও প্রযুক্তি-শিল্পকলা, কৃষ্টি-সভ্যতার সবক নিয়েছে।

পার্থিব জগতের চরম উন্নতিতে মুসলমানরা পৌঁছল। তারপর যখন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ভোগ-বিলাসিতায় মত্ত হলো এবং মীর জাফর এবং মীর সাদেকদের মত মুনাফিকরা মন্ত্রী হলো।

گربه میروسگ وزیردموش را دیوان کنند
اینچینیں ارکان دولت ملك راویران کنند ـ

"যদি বিড়ালকে নেতা বানানো হয়, কুকুরকে মন্ত্রী বানানো হয় এবং ইঁদুরকে বিচারের মাসনাদে বসানো হয়, (তাহলে) এমন সব কর্তা-ব্যক্তিরা রাষ্ট্রের সর্বনাশই করে ছাড়বে।"

ফলাফল ও পরিণামে ইসলামী রাষ্ট্রের সূর্য উপনিবেশ তাদের হাতে অস্তমিত হলো। ইসলামের হাতে পদদলিত জাতিসমূহ নেতৃত্বে আসনে বসল। মুসলমানগণ অসৎকার্য ও ভাগ্যের নির্মাম পরিহাসে শাসকের অবস্থা থেকে শাসিতের উপস্থায় উপনীত হলো। আর শাসিতরা শাসক হল।

কিছুদিন মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অপমান লাঞ্ছনা ও পরিবর্তিত অবস্থার চেতনা ছিল। কিন্তু পর্যায়ক্রমে ধীরেধীরে মুসলমানগণ তাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কবূল করে নিতে আরম্ভ করল। মুসলিম দেশের অধিবাসীদের মধ্যে এমনি পরিবর্তনের রং লাগল যে, মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য করার মত কিছুই বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশিষ্ট রইল না।

হাদীসের মর্ম ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী وَسَيَعُوْدُ غَرِيْبًا ইসলাম প্রাথমিক যুগের ন্যায় আবার অপরিচিত বন্ধুহীন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ -

এটা এই কারণে হয়নি যে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় কোন খূঁত বা অপূর্ণতা ছিল আর নতুন সমাজ ব্যবস্থায় কল্যাণ, পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রগতি রয়েছে, বরং নতুন সমাজ ব্যবস্থায় প্রবৃত্তির ভোগ-লালসা ও অহমিকায় ভরপুর ছিল। কুপ্রবৃত্তি এ ধরনের ভোগ-বিলাসিতা ও কাম উত্তেজনার ব্যবস্থাকে চরম প্রিয়রূপে গ্রহণ করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার সহজ সরল প্রথা, বিনয়, অল্পেতুষ্টি, আল্লাহর দাসত্ব, সংযমী আচরণ এসবকে তারা পছন্দ করে না।

হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) এমন আমীর ও শাসন ছিলেন যাঁদের ভয়ে তৎকালীন পৃথিবীর দুই বৃহৎ রাজশক্তিধারী পারস্য সম্রাট কায়সার ও রোম সম্রাট কিস্‌রা থরথর করে কাঁপত। অন্যদিকে তাঁরা দু'জন ছিলেন আধ্যাত্মিক মুরব্বি। কম্বল পরিধান করতেন, মসজিদে ইমামতি করতেন, যাঁদেরকে দেখে লোকেরা তাদের জীবন আচরণকে সংস্কার ও সংশোধন করতেন।

মহান আল্লাহ্ আলিম হাকীম-এর তাক্‌দীর ও ফায়সালা অনুযায়ী ফিরাউন, নমরূদ ও আ'দ জাতির ন্যায় ইউরোপের লোকদেরকে কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। যাদের মাধ্যমে প্রবৃত্তি ও ভোগবাদী বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থার সূচনা হয়। লুক্কায়িত প্রবৃত্তিপূজা বিকশিত হয়ে উঠে। বস্তুত ক্ষমতা, রাষ্ট্র ও সরকার যে বিষয়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় সাধারণ মানুষের প্রকৃতি স্বভাব তা মেনে নেয় ও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন যে সমাজে কুপ্রবৃত্তির মুক্ত চর্চার সুযোগ পাওয়া যায় এবং সরকার ও রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তা হাসিল করার ক্ষেত্রেও কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না, সেখানে নিঃসন্দেহে এমন সমাজই গড়ে উঠবে যা আল্লাহর সৃষ্টির জন্য মহা বিপর্যয় ও ফিতনার সৃষ্টি করবে।

দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, মুসলমানরাও আজকে সে পথেই যাচ্ছে। যে জাতি মুসলমানদের পূর্ব পুরুষদের থেকে পশ্চাদপদ ছিল, মুসলমানদেরকে ট্যাক্স দিত, পিছনে পিছনে দৌড়াত, আজকের মুসলমানগণ তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শ-ঐতিহ্যকে পরিহার করে তাদের ভ্রান্ত পথে, গযবের পথে ধাবিত হচ্ছে। অর্থাৎ তারা غير المغضوب عليهم এবং الضالين বা ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণ অনুসরনের ধ্বংসের পথে চলছে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, প্রাচ্যের আলো কেন পশ্চাত্যের অনুকরণের প্রতি আকৃষ্ট হলো?

আমার মুসলমান ভাইসব! এই দুনিয়া ধ্বংসশীল।

تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ - (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০)

উত্থান-পতন এই হচ্ছে দুনিয়ার প্রকৃতি। উন্নত সভ্য যে সব জাতি আম্বিয়ায়ে কিরামের মুকাবিলায় من اشد منا قوة আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে? এর শ্লোগান দিয়েছে এবং উন্নত জীবন ও প্রগতিশীল সমাজরূপে সমসাময়িক পৃথিবীতে অগ্রসরমান ছিল।

যে কথা আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

عَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا لَمْ يَخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ - (সূরা ফাজ্‌র ঃ ৮)

এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের চাদর, কম্বল, পাগড়ী, রুমাল, তহ্‌বন্দ, পায়জামাকে তামাশা-বিদ্রুপ করে, পরিণামে সবাই বরবাদ হয়ে গেছে।

فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ - وَهَلْ تَحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ اَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا

(সূরা মারিয়াম : ৯৮)

তাদের নাম-নিশানাও মুছে গেছে। কাউকে আল্লাহ তা'আলা সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আবার কাউকে যমীনে পুঁতে দিয়েছেন। কারও উপরে আসমান থেকে পাথর নিক্ষেপ করেছেন অথবা বিকট শব্দ দিয়ে হালাক করে দিয়েছেন।

كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدٌ - (সূরা ক্বাফ ঃ ১৪)

এখানে আমি সংক্ষেপে মুসলমান ভাইদের খেদমতে অনুকরণ সমস্যার স্বরূপ নিয়ে কিছু কথা উপস্থাপন করতে চাই। আশা করি বিষয়টি নিয়ে মুসলমানগণ চিন্তা ভাবনা করবেন ঃ

ان اريد الا الاصلاح ما اسطعت وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب -

অনুকরণের স্বরূপ

আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনে যা কিছু আছে চাই জীবজন্তু হোক অথবা বস্তু বা উদ্ভিদ হোক, সবকিছু একই উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং একই স্থানে সমবেত হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি বস্তুই আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য করে ভিন্ন ভিন্ন করে বানিয়েছেন। যেন পরস্পরের আলাদা বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হয়, যার মাধ্যমে পরস্পরের পরিচিতি হতে পারে। বস্তুত আলাদা পার্থক্যের কারণ শুধু বাহ্যিক অবয়ব কাঠামো আকৃতি, রং রূপ। এই বাহ্যিক পার্থক্য রয়েছে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যেও; সিংহ, গাধা, ঘাস, জাফরান, সুগন্ধি, ঘর, পায়খানা, জেলখানা, হাসপাতাল সব কিছুর মধ্যে। প্রকাশ্য আকৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতেই এসব হয়েছে। যদি এসবের কোন একটি ইউনিট তার আলাদা আকৃতি প্রকৃতি বর্জন করে ভিন্ন ইউনিটের আকার প্রকৃতি গ্রহণ করে, তাহলে তা আর পূর্বের শ্রেণীভুক্ত থাকবে না, বরং তা শেষের শ্রেণীভুক্ত হবে। তেমনিভাবে যখন পুরুষ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতা পরিহার করে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে,

মেয়েলোকের মত পোশাক পরে, মেয়েলিভাবে কথা বলে এমনকি মেয়েদের সব ব্যবহার আচরণ শুরু করতে থাকে, তখন তাকে পুরুষ না বলে, হিজড়া বলা হবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে পুরুষ হিসেবে তার কোন পরিবর্তন আসেনি, শুধু পোশাক ও ফ্যাশনে সূরতে পরিবর্তন এসেছে। এ থেকে জানা গেল বস্তুগত দুনিয়ায় যদি প্রত্যেক শ্রেণী তার স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য হেফাযত না করে, বরং পরিবর্তন ও সংমিশ্রণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, তখন সে শ্রেণীর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়বে।

জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতা

এভাবে জাতি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতাকে পৃথিবীর বিচিত্র বস্তুর ভিন্নতার সাথে তুলনা করে উপলব্ধি করুন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি অভ্যন্তরীণ ও নৈতিক ভিন্নতার প্রেক্ষিতে তারা অন্যান্য জাতি ও সমাজ থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি নিয়ে পৃথক আছে। মুসলমান জাতি, হিন্দুজাতি, খ্রিস্টান জাতি ও ইয়াহূদী সম্প্রদায় একই পিতার সন্তান হওয়ার পরেও তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়েছে। জাতীয়তা ও ধর্মের ভিন্নতার কারণেই তাদের পার্থক্য রয়েছে শুধু তা-ই নয়, বরং তাহযীব, তামাদ্দুন (সভ্যতা, কৃষ্টি) এবং সামাজিক ভিন্নতা পোশাকের ধরন কিংবা খাওয়া পরার পদ্ধতিতে তারা পরস্পরে ভিন্ন। এক আল্লাহর ইবাদতকারী হিসেবে মুসলমানদের আকার-আকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে। ইবাদতের বিশেষ পদ্ধতির ও প্রকৃতির কারণেই একজন একত্ববাদী মুসলিম মূর্তি পুজারী মুশরিক থেকে আলাদা এবং একজন খ্রিস্টান পারসী (অগ্নিপূজারী) থেকে ভিন্ন।

বিভিন্ন জাতির ভিন্নতার কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছাড়া আর কি হতে পারে? বিশেষ আকার-আকৃতির সংরক্ষণ না করা হলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখা যায় না। জাতীয়, ধর্মীয়, আর্দশিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলে সেই জাতিই টিকে থাকে। আর যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতি তার নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র এবং আকার-আকৃতি পরিত্যাগ করে ভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে ভিন্ন জাতির অনুকরণ করে নিজেদেরকে তাদের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে, তাহলে সেই জাতি অবশ্যই হালাক হয়ে যাবে। ধরাপৃষ্ঠে তারা নিজেদের অস্তিত্ব কোনভাবেই টিকিয়ে রাখতে পারবে না।

অনুকরণের পরিচিতি ও সংজ্ঞা

এসব বাস্তবতা পরিষ্কার হবার পর অনুকরণের পরিচয় শুনুন, তাহলে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অনুমান করা যাবে।

১. নিজের অস্তিত্ব, আকৃতি ও প্রকৃতি বর্জন করে ভিন্ন জাতির অস্তিত্ব, আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে যাওয়াকে অনুকরণ (তাশাব্বুহ্) বলে। অথবা

২. নিজ অস্তিত্বকে অন্যের ব্যক্তিত্বের সাথে বিলীন করে দেখাকে অনুকরণ (তাশাব্বুহ) বলে। অথবা

৩. নিজের আকৃতি-প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে অন্যের আকৃতি-প্রকৃতিকে গ্রহণ করাকে অনুকরণ বলে। অথবা

৪. নিজের মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকে ছেড়ে দিয়ে অন্যের বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা কবূল করে নেয়াকে অনুকরণ বলে। অথবা

৫. নিজের ও সমাজের আকৃতি ও চরিত্রকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদের আকৃতি ও চরিত্রকে আপন করে নেয়াকে অনুকরণ বলে।

এজন্যই শরী'আত হুকুম দিচ্ছে যে, মুসলমানদেরকে বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য সংস্কৃতি থেকে পৃথক হতে হবে। পোশাক, আকৃতি ও মৌলিকতা সব দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। শারীরিকভাবে কোন নির্দশন অবশ্যই ধারণ করতে হবে, যেমন– দাঁড়ি, খতনা এবং প্রকাশ্য নিদর্শন হচ্ছে পোশাক। এই দু'টি সনাক্ত চিহ্ন ছাড়া পরিচিতি হতে পারে না। তেমনিভাবে শুধু এ দাঁড়িও যথেষ্ট নয়, কেননা বালকদের দাঁড়ি হয় না। তখন তাদেরকে কিভাবে সনাক্ত করা হবে। শুধু তা-ই নয় অমুসিলমদের মধ্যেও কোন কোন সম্প্রদায় দাঁড়ি রাখে। এজন্য পোশাক ছাড়া সনাক্তকরণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য পোশাক ও দাঁড়ি মুসলমানের পরিচয়ের জন্য জরুরী।

অনুকরণ নিষেধের হুকুমের কারণ নাউযুবিল্লাহ গোঁড়ামী ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির নয় বরং আত্মমর্যাদাবোধ ও নিরাপত্তাই এর কারণ। যার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী জাতীয়তাকে অন্যদের সাথে সংমিশ্রণ ও অনুকরণের হালাকি থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। যে জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আদর্শের হেফাযত করে না, সে জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দাবি করার অধিকার রাখে না।

কাফিরদের অনুকরণের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ

১. আকীদার ক্ষেত্রে ও ইবাদতের মধ্যে কাফিরদের অনুকরণ কুফরী।

২. ধর্মীয় প্রথার অনুকরণ হারাম। যেমন খ্রিস্টানদের ন্যায় বুকে ক্রস লটকানো এবং হিন্দুদের মত পৈতা পরা অথবা কপালে তিলক লাগানো। এ ধরনের অনুকরণ নিঃসন্দেহে হারাম, যাতে কুফরীর আশংকা আছে। কেননা প্রকাশ্য ঘোষণায় কুফরী সংস্কৃতি গ্রহণ করা আন্তরিক সমর্থনের নিদর্শন।

এই দ্বিতীয় প্রকারের অনুকরণ যদিও প্রথমটি থেকে কিছুটা খাটো, তথাপি পেশাব ও পায়খানার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও কেউ যেমন পেশাব পান করা পছন্দ করবে না, তেমনিভাবে ইবাদত ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উৎসবপর্বে কাফিরদের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা কুরআনের শিক্ষা ও সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ইমাম ইবন তাইমিয়া (র) তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব اقتضاء الصراط المستقيم -এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছেন।

৩. সামাজিক ও অভ্যাস এবং সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনুকরণ মাকরূহে তাহ্‌রিমী। উদাহরণ স্বরূপ, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব পোশাক যা তারা ব্যবহার করে থাকে, যা তাদের জন্যই সম্পৃক্ত আর এসবের ব্যবহারকারীকে সেই সম্প্রদায়ের

সদস্য হিসেবে মনে করা হয়, যেমন খ্রিস্টানদের টুপি (হ্যাট) হিন্দুদের ধূতি, যোগীদের খড়ম এসব কিছু নাজায়িয ও নিষিদ্ধ এবং এসব ব্যবহার করাকে বিজাতীয় অনুকরণ হিসেবে শামিল করা হয়। বিশেষ করে যখন অহমিকা প্রকাশ করে অথবা ইংরেজদের মত নিজেকে বানানোর জন্য এসব পরিধান করা হয়, তখনও আরও বেশি গুনাহ্ হবে। যোগীদের বেশভূষা গ্রহণ করার ন্যায় ইংরেজদের বেশভূষা গ্রহণ করলেও একই ধরনের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

এভাবে কাফিরদের ভাষা-পরিভাষা কথাশৈলী অনুকরণ করার মধ্যে যদি এই মনোভাব থাকে যে, এভাবে আমরা ইংরেজদের অনুকরণ করে তাদের সমাজের সাথে মিশে যাব, তাহলে তা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। আর যদি ইংরেজি শিক্ষার উদ্দেশ্য ইংরেজদের মত হওয়া না হয়, বরং উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষা হয়– কাফিরদের সাথে যোগাযোগ ব্যবসা বাণিজ্য, পত্র যোগাযোগ ইত্যাদির জন্য হয়, তা হলে তা দূষণীয় নয়।

৪. নতুন আবিষ্কার, ব্যবস্থাপনা, দ্রব্যসামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র এসব ক্ষেত্রে অন্য জাতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়িয আছে। যেমন কামান, বন্দুক উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ী, মেশিনগান ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে অনুকরণ নয়। ইসলামী শরী'আত আবিষ্কারের পদ্ধতি নির্দেশ করেনি। আবিষ্কার, শিল্প প্রযুক্তি, লিপিকলা এসব মানুষের বুদ্ধি-বিবেক ও অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর ছেড়ে দিয়েছে। তবে এসবের ব্যবহারে বিধি নির্দেশ রয়েছে। কোন শিল্প, লিপিচিত্র, জায়িয, কোন্‌টি কতটুকু জায়িয, কি পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করা হবে, তা শরী'আতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষার উদ্দেশ্য থাকতে হবে, উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা হবে না। একজন চিকিৎসক জুতা বানানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেন না, তবে তিনি এই শিক্ষা দেন যে, এভাবে জুতা পরে চললে মগযের ক্ষতি হতে পারে অথবা পা যখম হতে পারে। তেমনিভাবে ইসলাম আবিষ্কার শিক্ষা দেয় না, তবে দ্বীন শিক্ষা দেয় যেন আবিষ্কার এমন না হয় যার দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি হতে পারে। এসব হচ্ছে ঐসব আবিষ্কারের হুকুম, যেগুলোর বিকল্প মুসলমানদের কাছে নেই। যদি মুসলমানদের কাছে অনুরূপ আবিষ্কার বা সামগ্রী থাকে, সেক্ষেত্রে এই অনুকরণ মাকরূহ হবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে ফার্সী তীর ধনুক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আরবী ধনুক ও ফার্সী ধনুক কার্যকর ক্ষেত্রে একই মানের ছিল। শুধু কাঠামোগত পার্থক্য ছিল। ইসলামে গোঁড়ামী নেই, মর্যাদাবোধ আছে। এজন্য যে সামগ্রী মুসলমান-কাফির উভয়ের কাছে রয়েছে এবং তার মধ্যে বাহ্যিক কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া কোন পার্থক্য নেই, সে সব ক্ষেত্রে কাফিরদের অনুসরণ নিষেধ। এছাড়াও এটা অপরাধ ও মর্যাদার পরিপন্থী। কেননা এতে বিনা কারণে কিংবা অযৌক্তিক প্রয়োজনে অমুসলিম সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষী ও অনুসরণ করতে হবে। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ নেই। তারা নিজেদের ঘর সম্পর্কে

বেখবর হয়ে আছে; বরং নিজেদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অন্যদের সমাজ ও প্রথার অনুসরণ ও আনুগত্য শুরু করেছে। মুসলমানদের উপমা মাওলানা রূমী এভাবে দিয়েছেন ঃ

یک سبد پرنان ترابرفرق سر * توهمی جوئی لب نان در بدر -

"রুটিভর্তি একটি ঝুড়ি/টুক্রি তোমার মাথার তালুতে রয়েছে অথচ তুমি রুটির (ফেলে দেবার যোগ) কিনারার তালাশে দ্বারে দ্বারে ঘুরছ!"

تابزانوئے میان قعرآب * وزعطش وجوع گشتی خراب -

"তুমি হাঁটু পরিমাণ গভীর পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছো তা সত্ত্বেও তুমি ক্ষুৎ পিপাসায় জীবন বিপন্ন করছ?"

তবে হ্যাঁ, যে সব নতুন আবিষ্কার এবং নতন অস্ত্র বা সামগ্রী মুসলমানদের হাতে নেই, সে সবকিছু (আবিষ্কার) মুসলমানগণ তাদের জরুরী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার ও ভোগ করতে পারবে, তা জায়েয। কিন্তু শর্ত হচ্ছে, এসব ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাফিরদের মত নিয়্যত ও মনোভাব হতে পারবে না। শুধুমাত্র নিজস্ব প্রয়োজনে এসব নূতন আবিষ্কার ও সামগ্রী ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামী শরী'আতে আছে। কাফিরদের অনুকরণের উদ্দেশ্যে হলে এসব নতুন আবিষ্কারের সামগ্রী ব্যবহারকে শরী'আত অনুমোদন করে না।

মদ্য পান করার পদ্ধতিতে দুধ পরিবেশন ও পান করাতেও শরী'আত অনুমতি দেয় না। দুধ খেতে মদ খাওয়ার পদ্ধতি অনুসরণ করার মানে হচ্ছে সাকীর হৃদয়ে মদের প্রতি আসক্তি রয়েছে যা সে হৃদয়ে লুক্কায়িত রেখেছ। তেমনিভাবে কোন বৈধ দ্রব্যের ব্যবহার যদি কাফিরদের পদ্ধতিতে করা হয়, তা হলে বুঝতে হবে তার অন্তরে কাফিরদের প্রথা ও পদ্ধতির প্রতি আসক্তি ও অনুরাগ রয়েছে।

যা হোক, যেভাবে কাফিরদের মতামত অনুকরণ কাম্য নয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলারও প্রত্যাশা হচ্ছে যে, তাঁর প্রিয় বান্দাগণ তাঁর দুশমনের অনুকরণ করবে না। তাদের অনুসরণের কোন কাজ করবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَ لاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

কাফিরদের অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ

দ্বীন ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন আদর্শ। অতীতের সকল মতবাদ, বিধান ও জাতীয় আদর্শকে রহিত করে ইসলাম এসেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এই অনুমতি দেয় না যে, তারা রহিত মতবাদের অনুসারীদের অনুকরণ করবে। শুধু তা-ই নয়, অন্যদের অনুকরণ আত্মমর্যাদাবোধেরও পরিপন্থী।

যেভাবে প্রতিটি জাতির ও প্রতিটি মতবাদের মৌলিক কাঠামো পৃথক, তেমনিভাবে এর আকৃতি-প্রকৃতির একটি ভিন্নরূপ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রকাশ্য আকার ও আকৃতি

প্রকৃতি, বেশভূষা পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যম। এসবের ভিত্তিতেই জাতি ও সম্প্রদায় পারস্পরিকভাবে সামাজিকতা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিগণিত হয়। যখন কোন সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ গ্রহণ করে, আকার-আকৃতি ধারণ করে, তখন তাদের নিজস্ব জাতীয়তা ও আদর্শ ভূলুণ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, নিজ জাতীয় আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বকে অন্য জাতীয় আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের নিকট বিসর্জন দেয়া আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ। এর আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ইসলাম কোন কিছুর অধীন ও অনুসারী নয়। তেমনিভাবে ইসলামের সামাজিক বিধান, সংস্কৃতি ও স্বাধীন ও স্বতন্ত্র, এক্ষেত্রে সে কারও অধীন বা অনুগামী নয়।

কোন সরকারের জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে তার সরকারী সেনাবাহিনীকে দুশমনের সৈন্যদের ইউনিফরম (উর্দি) পরিধান করাকে অথবা শত্রুর ঝাণ্ডা নিজ বাহিনীর সাথে বহন করবে; বরং কোন সৈনিক এমনটি করলে তাকে হত্যা করার উপযুক্ত বলে মনে করা হবে।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সেনাবাহিনী মুসলমানদের জন্যও এই অনুমতি হতে পারে না যে, তারা শয়তানের বাহিনীর আকৃতি ধারণ করবে। যা দেখে দর্শকদের সন্দেহ হবে। অথবা কোন সরকারের কোন বিদ্রোহী বাহিনী যদি কোন বিশেষ পোষাক বা নিদর্শন ধারণ করে, তাহলে সেই সরকার নিজ সেনাবাহিনীর জন্য বিদ্রোহীদের অনুকরণের অনুমতি দিবে না।

অবাক হবার মত বিষয় হচ্ছে যে, কোন বৃটিশ জেনারেল জার্মানী বা রুশ ইউনিফরম ব্যবহারকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা দিবে। কেননা জার্মানী ও রুশ বৃটিশের শত্রু, কিন্তু আল্লাহর রাসূল (সা)-এর কি এই ঘোষণা দেয়ার অধিকার নেই যে, আল্লাহর দুশমনদের বেশভূষা অনুকরণ করা অপরাধ? مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

যারা আল্লাহর দুশমনদের অনুকরণ করবে, তাদের পোশাক পরবে এবং তাদের উর্দি পরিধান করবে, নিঃসন্দেহে তারাও আল্লাহর দুশমন হিসেবেই গণ্য হবে।

"ইসলাম হচ্ছে নূর আলো- আর কুফর হচ্ছে অন্ধকার।
ইসলাম হচ্ছে হক – আর কুফর হচ্ছে বাতিল।
ইসলাম সুন্দর অনুপম –কুফর অসুন্দর কুৎসিত।
ইসলাম হচ্ছে দিনের আলো–কুফর হচ্ছে রাতের অন্ধকার।
ইসলাম হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা–কুফর হচ্ছে অপমান ও লাঞ্ছনা।"

এজন্যই ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অন্ধকার, অপমান ও বাতিলের পোশাক পরতে ও সম আকৃতি ধারণ করতে অনুমতি দেয় না। যেন তারা তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে যায়।

ইসলামের হাকীকত তথা মৌলিকত্ব কুফরের হাকীকত থেকে আলাদা। এভাবে ইসলাম চায়, তার অনুসারীরা আকৃতি-প্রকৃতি, পোশাক-বেশভূষায় শত্রুদের থেকে আলাদা থাকুক।

সারকথা

শরী'আতে অন্যের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা কোন গোঁড়ামী বা সংকীর্ণতার ভিত্তিতে হয়নি, বরং আত্মমর্যাদাবোধ, নিরাপত্তা, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের ভিত্তিতে হয়েছে। কোন সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আলাদা সম্প্রদায় বলা যাবে না যতক্ষণ না তারা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধারণে আলাদা না হবে।

ইসলামী উম্মাহ্কে কুফর, ধর্মদ্রোহিতা, নাস্তিকতা থেকে নিরাপদ থাকার কোন উপায় নেই যতক্ষণ না ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বসমূহকে নিরাপদ রাখা না যাবে এবং কাফিরদের অনুকরণ থেকে রক্ষা করা না যাবে। কেননা অনুকরণের অর্থ হচ্ছে, নিজ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন করে দেয়া।

قَالَ تَعَالَى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদের মত হয়ো না।" (আলে ইমরান ঃ ১৫৬)

মু'মিন আল্লাহর বন্ধু, কাফির আল্লাহর তা'আলার দুশমন। অতএব কাফিদের থেকে আলাদা ও পৃথক থাকা ও পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। সরকারের অনুগতদের জন্য এটা মানায় না যে, তারা বিদ্রোহীদের অনুকরণে একই রং ধারণ করবে এবং একই পোশাক পরিধান করবে।

وَقَالَ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْمُوْسٰى ـ

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সেই সমস্ত লোকদের মত হবে না যারা মূসা (আ)-কে কষ্ট দিয়েছিল।" (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

وَ قَالَ تَعَالٰى : اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ ـ

"মুসলমানদের এ সময় কি হয়নি যে, আল্লাহর যিক্র ও তাদের উপর নাযিলকৃত হকের সামনে তাদের হৃদয় ভীত হয়ে যাবে? এবং তারা সেই লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের মত হবে না। যাদের উপর দীর্ঘ যুগ অতীত হয়েছে। তারপর তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পাপিষ্ঠ।" (সূরা হাদীদ ঃ ১৬)

অর্থাৎ আশংকা হচ্ছে তোমরা যদি ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণ কর, তাহলে তোমাদের হৃদয়ও কঠিন হয়ে যাবে এবং সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা চলে যাবে।

قَالَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ اَوْحَى اللّٰهُ اِلَى النَّبِىَّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ اَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَاتَدْخُلُوْا مَدَاخِلَ اَعْدَائِى وَلَا يَلْبَسُوْا مَلَابِسَ أَعْدَائِى وَلَا يَرْكَبُوْا مَرَاكِبَ اَعْدَائِى وَلَا يَطْعَمُوْا مَطَاعِمَ اَعْدَائِى فَيَكُوْنُوْا اَعْدَائِى كَمَاهُمْ اَعْدَائِىْ ـ (كتاب الزواجر)

"মালিক ইবন দীনার (র.) বলেন ঃ পূর্বের একজন নবীর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা অহী প্রেরণ করে বলেছিলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও যে, তোমরা আমার শত্রুদের গমনাস্থলে গমন করবে না। আমার দুশমনেরা যেরূপ পোশাক পরে, তোমরা তা পরবে না। আমার দুশমনেরা সে সাওয়ারীতে আরোহণ করে, তোমরা তাতে আরোহণ করবে না। যেখানে আমার শত্রুরা খাদ্য গ্রহণ করে, তোমরা সেখানে খাদ্য গ্রহণ করবে না। অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে তাদের থেকে পৃথক থাক। অন্যথায় তোমরাও তাদের ন্যায় আমার শত্রু হয়ে যাবে।[১]

অহীর শেষ বাক্য فَيَكُوْنُوْا اَعْدَائِىْ كَمَاهُمْ اَعْدَائِىْ এরূপ পবিত্র আল-কুরআনেও মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করার পর বলেছেন اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ তাহলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ـ

"যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারা তাদের মধ্যে পরিগণিত হবে।"

অন্য দিকে হাদীসে আছে ঃ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ অর্থাৎ যারা কোন সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে তারা তাদের মধ্যেই শামিল হবে।

অনুকরণের ভয়াবহতা ও ফলাফল

অন্যদের আকৃতি ও বেশভূষা গ্রহণ করাতে ভয়াবহ ক্ষতি রয়েছে ঃ

১. প্রথম পরিণাম ফল হচ্ছে ঃ ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পৃথক কোন সত্তা অবশিষ্ট থাকবে না। হক আদর্শ বাতিল মতবাদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যাবে। সত্যকথা হচ্ছে ঃ প্রকৃতপক্ষে খ্রিস্টানদের অনুকরণ মানে হচ্ছে, নাউযুবিল্লাহ্ নাসারা মতবাদের দরযা ও বারান্দায় প্রবেশ।

২. অন্যদের অনুকরণ করা আত্মমর্যাদাবোধের পরিপন্থী। পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় নিদর্শন ও পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে বুঝা যাবে এই ব্যক্তি অমুক

১. কিতাবুল যাওয়াযির, হাজার মাক্কী, হাইসামী, ১ খ, পৃ. ১১।

সম্প্রদায়ের। এজন্য এই পদ্ধতি ছাড়া আর সহজ কি পদ্ধতি হতে পারে যে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন পোশাক পরিধান করা হবে না, বরং মুসলিম জাতি নিজেদের পোশাক বেশভূষা অনুসরণ করবে। বস্তুত এটি ইসলামী মর্যাদাবোধের জন্য অপরিহার্য যে, আমরা নিজেদের বেশভূষার অনুসরণ করব এবং অন্যদের মুকাবিলায় আমাদের বিশেষ পরিচিতি হবে।

৩. কাফিরদের সমাজ সভ্যতা ও পোশাক গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তাদের নেতৃত্ব ও আচরণকে মেনে নেয়া, শুধু তা-ই নয়, বরং নিজেদের হীনমন্যতা ও তাদের অধীন হবার স্বীকৃতি ও ঘোষণা, যার অনুমতি ইসলাম দেয় না। অন্যের বেশভূষা গ্রহণ করা মানেই হীনমন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রজা শাসকের আনুগত্য করতে বাধ্য হয়ে থাকে, তাকে খুশি করার জন্য সে শাসকের মত পোশাক পরে। যেখানে ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও আলাদা স্বাধীন আদর্শ, সেখানে তাদের অনুসরণ আনুগত্য কেন করা হবে?

৪. কাফিরদের অনুকরণের আরও খারাপ দিক হচ্ছে ঃ ধীরে ধীরে কাফিরদের প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হতে থাকবে, তাদের মত হওয়ার জন্য চাহিদা পয়দা হবে, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلاَ تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارَ وَمَالَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُوْنَ -

"যারা যুলম করেছে তোমরা তাদের দিকে ঝুঁকোনো যেন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণে তোমাদেরকে আগুনে না পায়। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ তোমাদের অভিভাবক-বন্ধু নেই। তাঁর কাছে ছাড়া তোমরা আর কোথায়ও সাহায্য-সহযোগিতা পাবে না।" (সূরা হূদ ঃ ১১৩)

অমুসলমানদের পোশাক ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা তাদেরকে ভালবাসার নিদর্শন, যা শরী'আত কোন অবস্থাই অনুমোদন করে না। আল্লাহ তা'আলা ইরাশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু ও সাথী। তোমাদের মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদের মধ্যে হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা যালিমদেরকে হিদায়াত করেন না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫১)

এটা কি যুলম নয় যে, ঈমান-ইসলামের দাবি করা হবে, আল্লাহ্ ও রাসূলের মহব্বতের ঘোষণা করা হবে, আর আকার আকৃতি বেশভূষায় আল্লাহর দুশমনদের হবে?

কোন বাদশাহ অথবা কোন সরকার এটা বরদাশত করবে না যে, সরকারের আনুগত্যের ঘোষণা দিয়ে সরকারের শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব রাখা হবে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক হবে এবং তাদের সাথেও ব্যবসা করা হবে। এসব কাজ আইনত অপরাধ।

আহ্কামুল হাকিমীন তাঁর দুশমন এবং তাঁর দূত উযীরদের অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের অস্বীকারকারী ও বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও তাদের সাথে মাখামাখি, বেশভূষা ও আকৃতিতে পোশাকের অনুকরণকে যদি নিষেধ করা হয়, তাহলে নাক কুঞ্চিত করা হবে কেন?

৫. এরপর আস্তে আস্তে ইসলামী পোশাক এবং ইসলামী সভ্যতাকে উপহাস করার সুযোগ পাবে। ইসলামী পোশাককে অবহেলা করবে এবং পরিধানকারীদেরকেও তুচ্ছ মনে করবে। তারা যদি ইসলামী পোশাকে তুচ্ছই না মনে করবে, তাহলে তারা কেন ইংরেজি পোষাক গ্রহণ করছে?

৬. ইসলামী বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিবে। মুসলমানদের চেহারা-সূরত কাফিরদের মত দেখে মনে করা হবে যে, এরা ইয়াহূদী অথবা নাসারা বা হিন্দু। যদি কখনো কোন লাশ পাওয়া যায়, সূরত দেখলে দ্বিধাদ্বন্ধে পড়ে যেতে হবে যে, এর জানাযা পড়া হবে-কি-না এবং তাকে কোন করবস্থানে দাফন করা হবে?

৭. যখন ইসলামী পরিচিতি বর্জন করে অন্যদের বেশভূষা গ্রহণ করা হয়, তখন নিজ সমাজে তার কোন মর্যাদা থাকে না নিজ সমাজে যার ইজ্জত থাকে না, তখন অন্যদের কি ঠেকা পড়েছে যে, তারা তাকে সম্মান করবে। নিজের সমাজে যার ইজ্জত থাকে, অন্য সমাজের কাছেও তার সম্মান থাকে।

৮. অন্য জাতির পোশাক গ্রহণ করা নিজ সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার প্রমাণ।

৯. পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, ইসলামের দাবি করা হচ্ছে, অথচ পোশাক, খাদ্য সামাজিক সভ্যতা, ভাষা, সাংস্কৃতিক জীবনধারা সবকিছুই ইসলামের দুশমনদের মত। এই অবস্থায় ইসলামের দাবির কি প্রয়োজন আছে? যারা ইসলামের শত্রুদের অনুকরণকে নিজেদের জন্য ইজ্জত-সম্মানের ও গর্বের বিষয় মনে করে, ইসলামে এ জাতীয় মুসলমানের কোন প্রয়োজন নেই।

একথা বুঝের অপেক্ষা যে, কাফিরদের বেশভূষা গ্রহণ করার কি প্রয়োজন আর লাভই বা কি? বিনা প্রয়োজনে কাফিরদের পোশাক গ্রহণ করার ইচ্ছা এমনটি হতে পারে যে, আমরাও কাফির হতে চাই। (নাউযুবিল্লাহ!) আকৃতিতে হলেও কাফির হয়ে যাব অথবা অন্যভাবে বলা যায়,

আমরা তথাকথিত প্রগতিশীল হবার জন্য আমাদের শত্রুদের পোশাক, আকার-আকৃতি গ্রহণ করতে চাচ্ছি। নাসারাগণ ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কুরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে।

اِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ـ

হিন্দুস্থানের সীমানা বণ্টনের সময় নাসারাদের দুশমনি প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদেরকে যতবেশি অঞ্চল দেয়া যায় বৃটিশ সে চেষ্টাই করেছে এবং দেয়াও হয়েছে আর মুসলমানদেরকে বঞ্চিত করেছে।

বৃটেন বাহির থেকে চার লাখ ইয়াহূদী আমদানী করে ফিলিস্তিনে বসিয়ে ফিলিস্তিনকে খণ্ডিত করল। অথচ ভারতে যেখানে চার লাখ ও আট লাখ মুসলমান ছিল, সেখানে ফিলিস্তিনের মত বৃটিশের সে এলাকাকে ভাগ করা উচিত ছিল। বর্তমানে (১৯৬০ সালে) ফিলিস্তীনে ইয়াহূদীদের সংখ্যা ও মুসলমানদের সংখ্যা আট লাখ, অন্যদিকে উত্তর প্রদেশেই মুসলমানের সংখ্যা আশি লাখ। যে পদ্ধতিতে ফিলিস্তীনকে বিভক্ত করা হলো, একই নিয়মে উত্তর প্রদেশেও আলাদা রাষ্ট্র হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এখানে খ্রিস্টানদের দুশমনী সূর্যের ন্যায় পরিষ্কার। তারপরেও কেন মুসলমান তাদের সামাজিকতাকে গ্রহণ করছে? আসলে লোকেরা মনে করে থাকে, ইংরেজদের পোশাক, বেশভূষা শাসক ও মর্যাদাবানদের প্রতীক যার মাধ্যমে তারা ইংরেজদের মত আকৃতি ধারণ করে তাদের মত মান-মর্যাদা পাবে। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, সম্মান-মর্যাদা অর্জন করা হয় এজন্য যে, অন্যদের মুকাবিলায় তা প্রয়োগ করে প্রত্যাশা পূরণ করা হবে। নিজ সমাজে দাপট প্রদর্শন করার জন্য ইজ্জত ও মর্যাদা হাসিল করা হয় না। দাবি করা হয় নিজ সম্প্রদায়ের সমবেদনার কিন্তু বাস্তবে নিজ সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি দেখানো হচ্ছে চরম ঘৃণা ও অবজ্ঞা। পক্ষান্তরে ভিন্ন জাতির প্রতি ভালবাসাও সহানুভূতি রয়েছে।

গিরগিটের মত ঘন ঘন রং পরিবর্তনের মধ্যে কোন ধরনের ইজ্জত কি থাকে? যে তারা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ইউরোপকে দেখছে এবং যে পোশাকের ফ্যাশনে ইউরোপকে গ্রহণ করেছে; এইসব পাশ্চাত্য প্রেমিকও সেই ফ্যাশন ও পোশাক গ্রহণ করছে? যে কারো প্রেমে পড়ে, সে প্রিয়তমার নিকট অপদস্থ হবেই। এখন ভেবে দেখা উচিত আমরা কি আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুলাফায়ে রাশেদীনের প্রেমিক হবো, না-কি ভোগবিলাসী ইউরোপের প্রেমে পড়ব? মনে রাখতে হবে যে, প্রেমের ভিত্তিই নীতি স্বীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উন্নয়নের রাজপথ

এ বিষয়ে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, ইসলামের আলো পবিত্র মক্কার আকাশ থেকে গোটা যমীনে সম্প্রসারিত হয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তন আসল। তাদের দ্বীনি ও পার্থিব উন্নতি অর্জিত হল। আসমানী শরী'আত প্রসারের নিমিত্ত তাদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্বসহ প্রতাপশালী রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। আর এই অর্জনের কারণ এটা ছিলনা যে, তারা রাষ্ট্রীয় বিষয়কে খুব গুরুত্বের সাথে আয়ত্ত

করেছিল অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-প্রযুক্তি শিক্ষণে তারা অধ্যবসায়ী ছিল। অথবা সুদী অর্থনীতি চালু করেছিল অথবা সাম্রাজ্য ও অর্থনৈতিক শক্তি হয়েছিল; বরং তাদের শক্তি, উন্নতি ও বিজয়ের উৎস ছিল মহানবী (সা)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ আসমানী বিধানের আলোর মশালের তাঁরা ছিল ধারক বাহক। এটি ছিল তাঁদের প্রধান হাতিয়ার, এটিই ছিল তাঁদের সেনাবাহিনী। তাদের বিজয় ও সৌভাগ্যের ঝাণ্ডা এ ছাড়া ভিন্ন কিছু ছিল না। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তারা প্রতাপশালী বিশাল সাম্রাজ্য কায়েম করল যার পদতলে রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি ও পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতির মান-মর্যাদা-ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল।

এই সত্যটি এত স্পষ্ট যে, এর দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। ইয়াহূদী ও নাসারা ঐতিহাসিকরাও একথা সাক্ষী দিচ্ছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) পবিত্র মক্কা মুকাররমায় প্রেরিত হয়েছেন। তিনি একাকী মূর্খ বর্বর আরবদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। আসমানী কিতাবের তালীম দিয়ে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে ইনসাফ ও শাসনের এমন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীর নির্মাতা হিসেবে অল্প সময়ের মধ্যেই যমীনে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়ে গেলেন। অথচ তাঁদের নিকট অর্থ-সম্পদ ছিল না। সামরিক শক্তিও ছিল না। তারা ভিন্ন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করেনি আর তার সুদকেও হালাল ঘোষণা করেনি। তাদের এসব মহৎ অর্জন ছিল ইসলামী শরী'আতের অনুসরণ অনুকরণেরই বরকতে।

বিশ্বনবী (সা)-এর ইন্তিকালের পরে সিদ্দীকে আকবর (রা) তাঁর খলীফা হলেন। তিনিও তাঁর খিলাফতের যুগে শরী'আতের বিধানের পুরোপুরি অনুসরণ অনুকরণ করেছেন। তাঁর যামানায় যেসব গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কসম খেয়ে ঘোষণা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে যাকাত হিসেবে দেয়া একটি রশি দিতেও যদি তারা অস্বীকার করে আমি তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ ঘোষণা করব। তিনি মুরতাদ ও নবুওয়তের দাবিদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করে তাদেরকে মূলোৎপাটন করেছেন।

এভাবে পরবর্তী যুগে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের যে জৌলুস ও শান শওকত ছিল, তা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের বরকতেই ছিল। তৎকালীন পৃথিবীর বিশাল সাম্রাজ্যগুলোও তাঁকে ভয় পেত।

চিন্তা করে দেখুন, উম্মাতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী নবীয়ে উম্মীর অনুসরণের বরকতে সাহাবায়ে কিরাম হযরত সুলায়মান (আ) ও হযরত যুলকারনাইন (আ)-এর ন্যায় সামাজ্যের অধিকারী হয়েছেন। যার মাধ্যমে রোম সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। তাদের সামরিক বাহিনী ও তাদের সমাজ ও সভ্যতাকে

সাহাবায়ে কিরাম পদদলিত করেছেন। কাজেই সাহাবায়ে কিরামের পথ গ্রহণ করলে উন্নতি হবে। ইমাম মালিক (র) বলেছেন ঃ

لايصلح اخر هذه الامة الابماصلح به اولها

"এই উম্মাতের শেষ যুগের ব্যক্তিদের সফলতা ও যোগ্যতা সেই বিষয়ের মাধ্যমেই আসবে, প্রথম যুগের ব্যক্তিরা যার দ্বারা সফলতা ও যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।"

ইসলামী শরী'আতের শাসন পরিচালনার জন্য এমন নীতিমালা চালু করেছিলেন যা পৃথিবীর মানুষ ইতিপূর্বে দেখেও নাই এবং শুনেও নাই। সেই নীতিমালায় অনুসরণে উন্নতি আসবে। অন্যদের অনুকরণে উন্নতি আসতে পারে না। ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনুকরণের মাঝে উন্নতি নেই। শুধু পোশাক অপমান ও হীনতা প্রতিহত করতে পারে না। উন্নতি ও উন্নয়ন নববী মডেলেই সম্ভব। যে মডেলের অনুকরণে খুলাফায়ে রাশেদীন, খুলাফায়ে বনূ উমাইয়া এবং খুলাফায়ে আব্বাসীয়ার যুগে উন্নতি হয়েছিল। সে যুগের উন্নতি কাফিরদের অনুকরণে হয়নি, বরং নববী অনুকরণের ভিত্তিতেই হয়েছিল।

আমাদের অধঃপতনের কারণ আম্বিয়ায়ে কিরামের অনুকরণকে পরিহার করে অন্যদের অনুকরণ করা। কেউ মনে করে থাকে যে, ইসলামী পোশাক ইংরেজদের দৃষ্টিতে অবহেলার ও অবমূল্যায়নের বিষয়। এই ধারণা বিশেষ ক্ষেত্রে হতে পারে। বস্তুত মর্যাদার মূল্যায়নের মাপকাঠি নির্ভর করে যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের উপর, পোশাকের উপর নয়। লন্ডনের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় অনেক হিন্দু নেতা ইংরেজ পোশাক পরে যোগদান করেছিল কিন্তু গান্ধী গিয়েছিলেন লেংটি পরে। ইংরেজ সরকার লেংটি পরা ফকীর গান্ধীকে যতটুকু মর্যাদা দিয়েছিলেন ইংরেজদের পোশাক পরা নেতাদেরকে তা দেননি।

দিল্লীতেও বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নর ও নেতাদের বৈঠকে যারা ইসলামী লেবাস পরে আসতেন তাদের মর্যাদা ও সম্মান কোর্ট-প্যান্টওয়ালাদের থেকে বেশি ছিল।

অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, মুসলমানগণ যতই কাফিরদের সমাজ ও সভ্যতার রঙ্গে নিজেদেরকে রঙ্গীন করার প্রচেষ্টা করুক না কেন, ইয়াহূদী ও নাসারাগণ মুসলমানদের উপর খুশি হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানগণ ইসলামের অনুসারী থাকবে। এই বিষয়টিই মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -

"হে রাসূল! ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যাবৎ আপনি তাদের মতবাদের অনুসরণ করুন।" (সূরা বাকারা ঃ ১২০)

অতএব, হে মুসলমানগণ! যদি উন্নতি প্রত্যাশা করেন, তাহলে সে পথই অনুসরণ করুন, যেপথে প্রাথমিক যুগে ইসলামের উন্নতি হয়েছিল। চারদিকে ইসলামের বিজয়

নিশান পৃথিবীতে উড়েছিল (বিজয় ডংকা বেজেছিল)। ইতিহাস এ বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষী যে, খুলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়া এবং আব্বাসীয় যুগে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ উন্নতি করেছিল, বর্তমানে আমেরিকা বৃটেন একত্রে মিলেও সে উন্নতি করতে পারেনি।

পাশ্চাত্যের সম্প্রদায়সমূহ জাহিলী আরবদের চেয়েও অধিক বর্বর ছিল। আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে চর্চা ও উন্নতি হয়েছিল, তা থেকে পাশ্চাত্যের লোকেরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। তারা নিজ ভাষায় এসব বিষয় অনুবাদ করেছে এবং এর মাধ্যমে তারা উন্নতি করে যে পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তা দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আজকে ইসলামের অনুসারীদের জন্য জরুরী হচ্ছে এই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়কে মাতৃভাষায় অনুবাদ করা, যেন সাধারণ মানুষ তা থেকে উপকৃত হতে পারে। তা হলে কলেজে গিয়ে ১৪ বছরব্যাপী বিদেশী ভাষা শিক্ষা করার জন্য ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না। তেমনিভাবে কষ্টের উপার্জন থেকে ২০–২২ হাজার টাকা বিদেশী ভাষা শিক্ষার জন্য নযরানা দেয়ারও প্রয়োজন হবে না।

ইংরেজি পোশাকের অর্থনৈতিক ফলাফল

আগেকার সময়ে নিজেদের জামা-কাপড় বাসা-বাড়িতেই সেলাই করা হত। বিশেষ করে নারীদের কাপড় ঘরেই হত। দর্জির নিকট মহিলাদের কাপড় সেলাই দূষণীয় ছিল। যখন ফ্যাশনের দরজা উন্মুক্ত হলো, তখন বাসা-বাড়ির সব কাপড়ই দর্জির দোকানে যেতে লাগল। ফলে আয় বাড়ল না, তবে ব্যয় বেড়ে গেল। এখন কর্জ কর অথবা অবৈধভাব উপার্জন কর। ইংরেজদের মত দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য ইংরেজদের মত অর্থ প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে সব সময় মাথায় এই চিন্তা-চেতনাই থাকে যেভাবেই হোক ইংরেজদের মত জীবন যাপন করতে হবে।

ইসলামের বদনামকারীদের নিকট প্রশ্ন রাখতে চাই যে, তোমরা কিভাবে ইসলামী পোশাককে বাদ দিয়ে ইংরেজদের পোশাককে প্রাধান্য দিয়েছ? ইসলামী পোশাকে কি কোন শারীরিক ক্ষতি আছে ? এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হোক ইসলামী পোশাক ও ইংরেজি পোশাকের মধ্যে কোনটিতে ক্ষতির দিক আছে। অথবা যদি ইসলামী পোশাকে হীনতা ও অমর্যাদা প্রকাশ পায়, তাহলে ইসলামের দাবি করারই বা প্রয়োজন কি? কেননা পশ্চিমারা ত মুসলমান ও ইসলামকে তুচ্ছ ও হীন মনে করে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَاالنَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -

ইসলামের জন্য এই ধরনের মুসলমানের প্রয়োজন নেই যা গিরগিটের মত রং বদলায়। নতুন নতুন ফ্যাশনে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমাসক্ত হয়। যারা স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয়তা

বিবর্জিত, যাদের নিজেদের প্রতি নির্ভরশীলতা নেই, নিজস্ব আদর্শ ও ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা নেই, তারা আর যাই করুক, তাদের পক্ষে কোন সরকার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

সারকথা

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের খলীফাগণ নিষ্ঠার সাথে শরী'আতের অনুসারী ছিলেন ততদিন তাঁরা সম্মানিত ছিলেন, শুধু তা-ই নয়, বরং বিরোধীদের দৃষ্টিতেও তাদের সম্মান-মর্যাদা ছিল। দুশমনের অন্তরে তাঁদের ভয় জাগ্রত ছিল। তাঁদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য-সহায়তা বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ،
وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ـ

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য কর তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সহায়তা করবেন এবং তোমাদের কদম মযবূত করে দিবেন।"

"আর তোমরা যদি সত্যিকার মু'মিন হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৭)

তারপর যখন ক্রমান্বয়ে শাসকদের মধ্যে ইসলামের অনুশাসন অনুশীলনের ঘাটতি হতে শুরু করল এবং ভোগ-বিলাসিতায় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ব্যাপক হলো, তখন ক্রমান্বয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের বুনিয়াদও কমজোর হতে শুরু করল, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমাও ছোট হতে শুরু করল।

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُمَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ـ

"আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে।" (সূরা রা'দ ঃ ১১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে তাঁর তত্ত্বাবধান ও মেহেরবানী থেকে বঞ্চিত করেন না, যতক্ষণ না সে নিজের আচরণ ও পথ-মত আল্লাহ তা'আলা থেকে পরিবর্তন করে।

অনুকরণের ক্ষতি সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সতর্কতা

হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় যখন ইসলামের বিজয়ের সীমানা সম্প্রসারিত হল, পারস্য ও রোম সম্রাটের গদী উল্টে গেল, তখন হযরত উমর ফারূক (রা) চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অনারবদের সাথে সংমিশ্রণের ফলে ইসলামী বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এসে যায় কি-না। এজন্য তিনি মুসলমানদেরকে তাকীদ করেছেন যেন তারা অমুসলমানদের অনুকরণ থেকে বিরত থাকে। তাদের পোশাক বেশভূষা গ্রহণ না করে। পক্ষান্তরে অমুসলমানদেরকেও সতর্ক করেছেন যে, তারা যেন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিতরে থাকে। মুসলমানদের বেশভূষা গ্রহণ না

করে। মুসলমানদের মত তহবন্দ-পাগড়ী না পরে। তা হলে পরস্পরের সংমিশ্রণ ও শনাক্ত বিষয়ে সমস্যা হবে না, আর এভাবে অনুকরণ ও মিশে যাওয়ার প্রবণতার দরজা বন্ধ থাকবে।

মুসলমানদের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর ফরমান

روى البخارى فى صحيحه عن عمر رضى الله عنه انه كتب الى المسلمين المقيمين ببلاد فارس اياكم وزى اهل الشرك

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি পারস্যের মুসলমানদেকে উদ্দেশ্য লেখা পত্রে উল্লেখ করেছেন, তোমরা মুশরিকদের পোশাক, বেশভূষার ব্যাপারে সতর্ক থাকবে (তা অনুসরণ করবে না)। (ইক্তিযা....... গ্রন্থের পৃ. ৬০)

অন্য আরেকটি রিওয়ায়াতেও তিনি বলেছেন ঃ

أما بعد فاتزروا وارتدوا وا شعلوا وعليكم بلباس أبيكم اسماعيل واياكم والتنعم وزى العجم وتمعددوا واخشوشنوا واخلو لقوا الحديث

"হে মুসলমানগণ! লুঙ্গী (তহ্বন্দ) ও চাদরের ব্যবহার বজায় রাখ এবং জুতা পর। তোমাদের আদি পিতা হযরত ইসমাঈল (আ) এর পোশাক অবশ্যই ধারণ করবে (তহ্বন্দ-চাদর) ভোগ-বিলাসিতা ও অনারবদের পোশাক বেশভূষা থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ... মোটা ও পুরানো কাপড় পর, যা বিনয়ী লোকদের পোশাক।" (ফাতহুল বারী)

মুসনাদে আহমাদে আছে আবূ উসমান নাহ্দী বলেন ঃ আমরা যখন আযারবাইজানে ছিলাম তখন হযরত উমর ফারূক (রা)-এর পক্ষ হতে আমাদের সেনাবাহিনীর প্রধান উতবা ইবন ফারকাদ -এর বরাবরে একটি ফরমান পৌছল–

ياعتبة بن فرقد اياكم والتنعم وزى اهل الشرك ولبوس الحرير -

"হে উতবা ইবন ফারকাদ। তোমরা সকলে সতর্কতার সাথে ভোগ-বিলাসিতা ও কাফিরদের বেশভূষা পরিহার করবে এবং রেশমী পোশাক পরিধান করবে না।" (ইকতিযা সিরাতুল মুস্তাকীম, পৃ. ৬০)

কাফিরদের প্রতি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নির্দেশ

হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সেই ফরমান যা তিনি সিরিয়ার খ্রিস্টানদের জন্য প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিস্বরূপ পুরো সাম্রাজ্যে জারি করেছিলেন, যে ফরমানের শর্তানুযায়ী সিরিয়ার নাসারাগণ জান-মাল ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তা লাভ করেছিল।

ان نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا ان ارادوا الجلوس ولانتشبه بهم فى شئ من ملابسهم فى قلنسوة ولاعمامة ولانعلين ولافرق شعر ولانتكلم بكلامهم ولانكتنى بكناهم ولاتركب السروج ولانتقلد السيوف ولانتخذ شيئا مِنْ السلاح ولانحمله ولا ننقش خوايتمنا العربية ولانبيع الخمور وان نجز مقادم رؤسنا وان نلزم زينا حيث كنا ان نشد الزنانير على اوساطنا وان لانظهر الصليب على كنا لسنا وان لا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شئ من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولانضرب بنوتيسنا فى كنائسنا الاضربا خفيفا ولانرفع اصواتنا مع صوتانا ولا نظهر النيران معهم فى شئ من طرق المسلمين -

"আমরা সিরিয়ার খ্রিস্টানগণ নিজেদের জীবন, অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে আমীরুল মু'মিনীন উমর ফারূকের নিকট নিরাপত্তার প্রত্যাশা করি। আমরা নিজেদের পক্ষ হতে এসব বিষয়ের জন্য শর্ত হিসেবে নিজেদের জন্য করণীয় হিসেবে এসব ঘোষণা করছি যে, (১) আমরা মুসলমানদেরকে ইযযত-সম্মান করব। (২) মুসলমান যদি আমাদের মজলিসে বসতে চায় আমরা তাদের জন্য বসার সুযোগ করে দেব। (৩) আমরা কোন বিষয়ে মুসলমানদের অনুকরণ করব না। যেমন, পোশাক, টুপি, পাগড়ী, জুতা ও আকৃতির ক্ষেত্রে। (৪) আমাদের কথাবার্তার ধরনও মুসলমানদের মত হবে না। (৫) আমরা মুসলমানদের মত নাম-উপনাম রাখব না। (৬) ঘোড়ার উপর আরোহণ গদী (যিন) ব্যবহার করব না। (৭) আমরা তলোয়ার সাথে করে ঝুলায়ে রেখে চলব না। (৮) কোন অস্ত্র তৈরি করব না এবং অস্ত্রধারণ করব না। (৯) আমরা আমাদের মুদ্রায় আরবী চিত্র অংকন করব না। (১০) আমরা মদের কারবার করব না। (১১) মাথার সামনের অংশে চুল কেটে রাখব (লম্বা চুল রাখব না)। (১২) আমরা যেখানেই থাকি নিজ আকৃতিতে থাকব। (১৩) আমরা গলায় পৈতা লটকিয়ে রাখব। (১৪) আমাদের গীর্জায় ক্রস উঁচু করে রাখব না। (১৫) মুসলমানদের বাজারে ও পথে প্রকাশ্যভাবে আমাদের ধর্মের প্রচার করব না। (১৬) আমরা গীর্জার ঘণ্টা আস্তে বাজাব। (১৭) আমরা মৃতদের কফিন বহনের সময় জোরে শ্লোগান দেব না। (১৮) আমরা শবযাত্রার আগুন নিয়ে যাব না। এটি অগ্নি পূজকদের জন্য, যারা অগ্নিপূজা করত। এই রিওয়ায়াতটি নির্ভরযোগ্য ও উত্তম। (সিরাতুল মুস্তাকীম, পৃ. ৫৮)

আবদুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী বলেন, হযরত ফারূক আযম (রা) সিরিয়ার নাসারাদের সাথে যে সব শর্তে নিরাপত্তা চুক্তি করেছিলেন, আমি নিজে তা লিখেছি। (তাতে আরও কিছু শর্তাবলী নিম্নরূপ ছিল) ঃ

ان لانحدث فى مدينتنا ولافى ماحولها ديرا ولا كنيسة ولاصومعة راهب ولانجددماخرب منها ولانحى ماكان خططا للمسلمين

وان لانمنع. كنائسنا ان ينزلها احد من المسلمين فى ليل اونهاروان نوسع ابوابها للمارة وابن السبيل وان ننزل من رأينا من المسلمين ثلاثة ايام نطعمهم ولا نووى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ولانكتم غشا للمسلمين ولانعلم اولادنا القران ولانظهر شركًا ولا ندعوا اليه احدًا ولا نمنع احدا من ذوى قرابتنا الدخول فى والاسلام ان ارادوا ـ

(১৯) আমরা আমাদের জনপদে নতুন কোন গীর্জা বানাব না। (২০) গীর্জা বিনষ্ট হয়ে গেলে তা নতুন করে সংস্কার করব না। (২১) মুসলমানদের ভূমি-সীমার মধ্যে আমরা আবাদ করব না। (২২) দিবারাত্রের যে কোন সময়ে হোক কোন মুসলমানকে গীর্জায় প্রবেশে বাধা দেব না। (২৩) আমরা পথিক ও পর্যটকদের জন্য গীর্জায় স্থান করে দেব। (২৪) তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের মেহমানদারী করব। (২৫) আমাদের কোন গীর্জায় অথবা কোন ঘরে কোন গোয়েন্দাকে স্থান দেব না। (২৬) মুসলমানদের সাথে আমরা প্রতারণামূলকভাবে কোন কিছুকে গোপন করব না। (২৭) আমরা আমাদের শিশুদেরকে কুরআন শিক্ষা দেব না। (২৮) আর শিরক প্রথাকে আমরা প্রকাশ্যে করব না। (২৯) এবং কাউকে আমরা শিরক কাজে আহ্বান জানাব না। (৩০) আমাদের কোন আত্মীয়কে ইসলাম গ্রহণে বাধা দেব না।

আবদুর রহমান ইবন গানাম আশ'আরী বলেন ঃ আমি যখন এতটুকু লিখে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর সামনে দেখার জন্য রাখলাম, তখন তিনি এই লিখার সাথে আরও সংযোজনের জন্য বললেন। ঃ

ولانضرب أحدًا من المسلمين شرطنالكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فان نحن خالفنا فى شئ مما شرطناه لكم ووظننا على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم مايحل من اهل المعاندة والشقاق ـ

(৩১) আমরা কোন মুসলমানকে মারব না। অর্থাৎ আমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দেব না। আমরা এইসব শর্তের বিনিময়ে আমাদের ধর্মের লোকদের জন্য নিরাপত্তা লাভ করেছি। তারপর আমরা যদি এ শর্তাবলীর মধ্যে কোন কিছু অমান্য করি, তাহলে আমাদের চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি বাতিল বলে গণ্য হবে। তখন মুসলমানগণ তাদের দুশমনের সাথে যে ব্যবহার করে, তা আমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে।[১] (সূরা তাওবার তাফসীর)

একটি বিভ্রান্তির জবাব

বিভ্রান্তি হচ্ছে ঃ যদি কোন ব্যক্তি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ইংরেজি পোশাক অথবা হিন্দুয়ানী পোশাকে ডুবে থাকে, তা হলে তার জন্য তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাসে (আকীদায়) কোন পার্থক্য হবে কি-না? অথবা এই পোশাক পরিধান করে সে কি কাফির হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ আপনি যদি কিছু সময়ের জন্য পুরুষের পোশাক পরিত্যাগ করে দিনে ঘরে গিয়ে বেগম সাহেবের সেলোয়ার-কামিস, লাল রেশমী ও জরীর জামা বানারসি দোপাট্টা হাতে চুড়ি পায়ে খাড়ু এবং মালা পরিধান করুন। এবার বের হয়ে অফিসে গিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসুন। এবার কি আপনি বেগম সাহেবা হয়ে গেলেন ? আর অভ্যন্তরীণভাবে আপনার পুরুষত্বের মধ্যে কি কোন পরিবর্তন আসবে? অফিসে আপনার চেয়ারে বসতে কি আপনি বিব্রতবোধ করবেন ? অনুমান করা যায়, বিধি-বিধান হিসেবে আপনি বিব্রতবোধ করবেন। যেখানে আপনি মনে করছেন বাহ্যিক অনুকরণে তেমন কিছু আসে যায় না আর যখন ইংরেজী পোশাকে মুসলমান কাফির হয় না, তখন আপনি কি বেগম সাহেবার পোশাক পরে বেগম সাহেবা হয়ে যাবেন ? শুধু মেয়েলি পোশাক ব্যবহার করে তার পুরুষত্বের মধ্যে কি পরিবর্তন হতে পারে? এভাবে বলা যায়, কেউ যদি হিজড়ার কাপড় পরিধান করে, তাহলে কি সে প্রকৃতপক্ষে হিজড়া হয়ে যাবে? স্ত্রীলোকের পোশাক পরে তাৎক্ষণিকভাবে কোন পুরুষ মহিলা হয়ে যাবে না। তবে আল্লাহ না করুন! কিছুদিন হিজড়া ও মেয়েলি পোশাক পরিধান করার পর দেখা যাবে আমল ও আখ্‌লাকে কিছুটা মেয়েলি হিজড়াভাব এসে যাবে। কথাবার্তা ও চালচলন ধরন মেয়েলি ও হিজড়া মার্কা হয়ে যাবে। কেননা বাইরের প্রভাব অভ্যন্তরে পড়বে। সকল বুদ্ধিমান একমত যে, যেভাবে ভিতরের প্রভাব বাহিরের পড়ে তেমনিভাবে বাহিরের প্রভাবও ভিতরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ভাল কাজে অন্তর আলোকিত হয় এবং মন্দ কাজে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যদিও ইংরেজি ও হিন্দুয়ানী পোশাকে তাৎক্ষণিভাবে আকীদার ক্ষতি না হলেও একথার নিশ্চয়তা কোথায় যে, আগামীকাল অভ্যন্তরীণ

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২ খ, পৃ. ৩৪৭।

আকীদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে না। মনে রাখবেন, যতদিন আমাদের আকীদা ভিতর থেকে নিরাপদ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ইংরেজি ও হিন্দুয়ানী পোশাকের দ্বারা নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরণের অপরাধ হবে। এ বিষয়ে মহানবী (সা)-এর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

আল্লাহ না করুন! আল্লাহ না করুন!

যেদিন আপনাদের প্রকাশ্য আবরণ অভ্যন্তরে পৌঁছবে এবং ইসলামী বিশ্বাসেও ক্ষতিও কমতি এসে যাবে, তখন বুঝবেন যে, আপনারা শুধু নাসারা ও মুশরিকদের অনুকরণকারী নন্, বরং নাসারা ও মুশরিক হয়ে গেছেন। তাদের জন্য যা হুকুম, এদের জন্যও তাই হবে। যদিও মুখে ইসলামের দাবী করে। এ ধরনের ইসলামকে লৌকিক ইসলাম বলা হয়, শারঈ ইসলাম বলা যায় না। শারঈ ইসলাম ত হচ্ছে শরী'আতের বিধানের ভিত্তিতে যা হবে।

আইন অনুযায়ী পাকিস্তানী বলা হয় তাকে, যে পাকিস্তানের সরকারের আইন মান্য করে। যে সরকারের দুশমনের উর্দি ব্যবহার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে। যে ব্যক্তি পাকিস্তানের আইনের ও শাসনের সমালোচনা করে এবং ভারতের উর্দি পরিধান করে বাজারে ঘুরাফেরা করে, যদিও সে জাতীয়তায় পাকিস্তানী কিন্তু সরকারি আইন অনুযায়ী সে সরকারের শত্রুদের মধ্যে শামিল হবে।

আমাদের উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বের জবাব পাওয়া গেছে যে, কেউ যদি বলে মেয়েলি পোশাক পরিধান করলে এর খারাপ দিক হচ্ছে ঃ পুরুষ ও মহিলা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী (অতএব এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর রূপ ধারণ করা দূষণীয়)। উত্তর হচ্ছে ঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মু'মিন ও কাফির ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তারা পরস্পরের অনুকরণ করার সুযোগ নেই। যেমন সরকারের দৃষ্টিতে অনুগত নাগরিক ও বিদ্রোহী আলাদা শ্রেণী হিসেবে স্বীকৃত এবং তাদের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন। যদিও তারা একই পিতার সন্তান হোক বা একই পরিবারের দুই ব্যক্তি হোক। একইভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মু'মিন ও কাফির আলাদা শ্রেণী, তাদের প্রত্যেকের বিধি-বিধানও আলাদা। هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ এভাবে সব সভ্য সরকারের আইন হচ্ছে সরকারের দুশমন ও বিদ্রোহীকে মন্ত্রীর পদ দেয়া হয় না। একইভাবে ইসলামের কথা হলো, ইসলামের দুশমনকে ইসলামী সরকারের আমীর বা উযীর বানানো যেতে পারে না।

اندکے پیش توگفتم غم دل ترسیدم

که دل ازروه شوی ورنه سخن بسیار است ۔

"আপনার সকাশে সামান্য ত্রুটির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তঃকরণে জড়সড় হয়ে পড়েছি; বিষণ্ন হৃদয়ে কালাতিপাত করছি; নতুবা আরও অনেক কিছু বলার ছিল।"

ইসলামী পোশাকের পরিচিতি

قَالَى تعالى : وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ـ

"তাক্ওয়ার পোশাক, এটাই উত্তম" (সূরা আ'রাফ)

"এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত, হয়ত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ২২১)

কোন কাজকে ইসলামী বলার জন্য দু'টি শর্ত জরুরী। এক, রাসূলুল্লাহ (সা) যে কাজ করেছেন। দ্বিতীয় হলো রাসূলুল্লাহ (সা) যার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিষেধ করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন তা ইসলামী হবে না। আর যে বিষয়ে তিনি অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি করেছেন, তাকে ইসলামী বলা হয়। যেমন ঃ যবের রুটি খাওয়া তাঁর বাস্তব সুন্নাত। এর উপর আমল করা উত্তম। আর ময়দার রুটি, বিরিয়ানী, মোরগের সুপ জায়েয। কেননা মজাদার ও ভাল কিছুর জন্য শরী'আতে অনুমতি আছে। কুকুর, শূকর, মদ খাওয়া ইসলামে হারাম। কেননা শরী'আতে এসবের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এরূপ পোশাকের ব্যাপারেও অনুমান করুন। যে পোশাক রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে ব্যবহার করেছেন যেমন কোর্তা, লুঙ্গী, চাদর, জুব্বা এবং পাগড়ী ইসলামী পোশাক। আর যেসব পোশাক মহানবী (সা) নিজে ব্যবহার করেননি যেমন ঃ পায়জামা, সেমিজ, শাহী জুতা, শেরওয়ানী, সদরিয়া (কোর্ট)। তবে এসব পোশাকের বিষয়ে তাঁর শরী'আতে অনুমতি পাওয়া যায়, নিষেধ নেই। অন্যদিকে রেশমি পোশাক, উজ্জ্বল লাল রং এবং টাখনুর নিচে কাপড় পরার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এজন্য রেশমি ও জাফরানী পোশাক ইসলামে নিষিদ্ধ হিসেবে বলা যায়।

পবিত্র কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফে আল্লাহর দুশমন কাফিরদের অনুকরণ করতে নিষেধ করা প্রমাণিত। এজন্য কাফিরদের মত পোশাক পরিধান করা দেখে দর্শকদের ভুল হয় এই ব্যক্তি ইয়াহূদী, নাসারা না-কি অগ্নিপূজক বা হিন্দু। এ ধরনের পোশাক নিঃসন্দেহে ইসলামী পোশাক নয়। গান্ধীর ধূতি, ইংরেজদের টাই-কোর্ট ও গাউন ফ্যাশন সব কিছুর ক্ষেত্রে বিধি প্রযোজ্য। এখানে তথাকথিত প্রগতিশীলদের অভিযোগ লক্ষণীয়, তারা উলামায়ে কিরামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাকে যে, যদি কোর্ট-প্যান্ট অইসলামী পোশাক হয়, তাহলেও আলিমদের লম্বা জামা, শেরওয়ানী, সেমিজ, শাহী জুতাও (পাম্পসু) অইসলামী পোশাক হবে। কেননা মহানবী (সা)-এবং সাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন এর কোন প্রমাণ ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থে নেই।

উত্তর ঃ যেসব কিছুর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) কথা ও কাজের মাধ্যমে অনুমতি দিয়েছেন, তাকে শারঈ ও ইসলামী বলা যাবে। আর যেসব কাজ তিনি নিষেধ করেছেন, তাকে অইসলামী ও শরী'আত বিরোধী বলা হয়। যদিও মহানবী (সা)-এ ধরনের কোর্তা, শেরওয়ানী, জুতা পরিধান করেননি এবং এ ধরনের খাবার পোলাও, জর্দা, কোফ্‌তা, শামি কাবাব গ্রহণ করেননি, তবে মজাদার ভাল কিছু গ্রহণ করার অনুমতি তিনি দিয়েছেন। কিন্তু শর্ত হল তা শরী'আতের সীমার মধ্যে হতে হবে। এই ধরনের ভাল মজাদার ও বিলাসিতার উপকরণ খিলাফত রাশেদার যুগে প্রচলন হয়েছে। যতটুকু আরাম ও ভোগের সামগ্রী শরী'আতের সীমার মধ্যে ছিল, তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম আপত্তি করেননি। তবে কিছু মর্যাদাবান ব্যক্তি ভোগ-বিলাসিতাকে পরিহার করে চলতেন। পাতলা কাপড় ব্যবহার এবং স্বর্ণ ও রূপার মুদ্রা সঞ্চয় করতে তাঁরা নিষেধ করতেন।

موسیا اداب دانا دیگرند
سوختہ جانان روانان دیگرند

"বিজ্ঞানদের রুচি বা ত্যাগ তিতিক্ষার প্রকৃতি এক রকম; পার্থিব জগতের প্রতি একেবারে নিরাসক্তদের রুচি অন্যরকম (বাস্তবে উভয়েই বৈধ ও কল্যাণসীমার ভেতরেই থাকেন)।"

সারকথা

যে সব পোশাক, খাদ্য-পানীয়, বেশভূষা ও সামাজিকতা শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে হবে, তা ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে। পক্ষান্তরে যেসব পোশাক, খাদ্য-পানীয়, বেশভূষা ইসলামী শরী'আতের আওতার বাইরে হবে, তা অনইসলামী বলা হবে।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ -

"এটাই আল্লাহর সীমারেখা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করল, নিশ্চিত সে নিজের উপর অবিচার করল।" (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

এখানে অধম লেখক সীরাতুল মুস্তাফার তৃতীয় খণ্ডের এ পর্ব শেষ করছি।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

بسم الله الرحمن الرحيم

দালাইলে নবুওয়াত ও রিসালাতের দীললসমূহ অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর মু'জিযাসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বান্দাদের হিদায়েতের জন্য মানুষের মধ্যে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। যাতে পবিত্র মহান ব্যক্তিত্বদের মাধ্যমে তাঁর বিধানাবলী বান্দাদের নিকট পৌঁছে। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ -এর ভুলে যাওয়া ওয়াদাকে স্মরণ করে দেয়ার জন্য এবং নিজের প্রমাণ নিদর্শনকে পূর্ণাঙ্গ করার নিমিত্তে যে কথা আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"যেন হযরত আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত ও তাবলীগের পর কোন জীবের আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে কোন ওযর আপত্তি করার অবকাশ না থাকে।" (সূরা নিসা ঃ ১৬৫)

নবী-রাসূলগণ যেহেতু মানুষই হয়ে থাকেন এজন্য তাঁদের প্রকাশ্য রূপ ত অন্য মানুষে থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এজন্যই আল্লাহর তা'আলা তাঁদেরকে মু'জিযা দান করেছেন, যা তাঁদের সত্য ও হক হবার পক্ষে দলীল-প্রমাণ স্বরূপ সাব্যস্ত হয়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ

فَذٰلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ -

"এই লাঠি এবং সাদা হাত তোমার মহাপ্রভুর পক্ষ হতে মু'জিযা ও তোমার নবুওয়াতের নিদর্শন এবং প্রমাণ।" (সূরা কাসাস ঃ ৩২)

প্রত্যেক দাওয়াতের জন্যই প্রমাণ প্রয়োজন আর দলীল হতে হবে দাওয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যিনি নবী হিসেবে ঘোষণা দিবেন তাঁর বক্তব্য হবে আমি মহান আল্লাহ তা'আলার মনোনীত, তাঁর দূত বা প্রতিনিধি, তাঁর বিধান এবং হিদায়াত নিয়ে আমি এসেছি। একথা সত্যায়িত করার জন্য গায়েবী পদ্ধতিতে এমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ জরুরী, যা কোন জীব বা সৃষ্টির পক্ষে করা অসম্ভব। যখন মানুষ নবী কর্তৃক এমন বিষয় সংঘটিত হতে দেখবে যা স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়, তখন তারা এটিকে মহান আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক কীর্তি ও ক্ষমতার প্রকাশ বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁকে আল্লাহ পাকের দূত হিসেবে বিশ্বাস করবে।

মানুষ ধারণা করবে যে, এই কাজ রাসূলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর ইচ্ছায় তা হয়না কোন কৌশলী প্রযুক্তি দ্বারাও তা সম্ভব নয়, বরং তা মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় প্রকাশ পেয়েছে। কেননা এ ধরনের কৃতিত্ব দেখানো মানুষের ক্ষমতা, তদবীর এবং প্রযুক্তির বাইরে। এতে বুঝা গেল যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত। তাঁর অনুসরণে বান্দা আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। তাঁর দামন বা আঁচল ধরে

মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা হাসিল করতে পারবে। হিংসাও সংকীর্ণতামুক্ত হৃদয় মু'জিযা দেখে নবীকে সত্যায়িত করতে দ্বিধা করবে না। হৃদয় তাকে নবীর প্রতি বিশ্বাসী হতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করে। তার হৃদয়ে নবীকে মিথ্যা ও অস্বীকার করার সুযোগ থাকে না। রিসালাতের দাওয়াত এক গুরুত্বপূর্ণ মহান বিষয়। অতএব একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রমাণও সে ধরনের বিশাল ও মহান হতে হয়। এজন্য মু'জিযা, যা আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও দোর্দণ্ড প্রতাপের নমুনা হিসেবে হয়ে থাকে, সকল নবীর হাতেই মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। নবীদের ব্যক্তিত্ব ও বিজয়ের সামনে কারও পদযুগল চলে না। প্রবৃত্তির স্বাধীনতার পতাকা হাত থেকে খসে পড়ে। যৌক্তিক প্রমাণাদির পরেও দুশমনের ঝগড়া ও বিতর্কের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয় না। কিন্তু মু'জিযা ও স্পষ্ট আয়াত প্রত্যক্ষ করার পরে শুধু পঙ্কিলত সংকীর্ণতা ও দুর্ভাগ্য ব্যতীত কুফর ও অস্বীকার করার কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না। মু'জিযা সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আ) আর সর্বশেষ নবী অর্থাৎ খাতমুন্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা), যাঁর দ্বারা নবুওয়্যাতের পরিসমাপ্তি হয়েছে, তাঁর নবুওয়াতে দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে, চারিত্রিক সুকুমার বৃত্তি পরিপূর্ণ হয়েছে। যখন এ লক্ষ্য অর্জিত হলো দ্বীন ও নৈতিক চরিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করল, তখন তাঁর পরে আর কোন নবীর প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রইল না। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খুলাফায়ে কিরাম এবং দ্বীনের উলামায়ে কিরাম ইসলামের সক্রিয় সহযোগী ও রক্ষণাবেক্ষণকারীর দায়িত্বে রয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের ভূমিকা ইসলামের তত্ত্বাবধান ও প্রচারের জন্য যথেষ্ট। মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম।"

খাতিমুল আম্বিয়া নবী মুহাম্মদ (সা)-এর পর যে কেউ নবুওয়াতের দাবি করলে তা ভণ্ডামি ও আকার্যকর হবে। প্রকৃতপক্ষে নবীয়ে উম্মি (সা) (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) কোন মু'জিযা ও নিদর্শনের প্রয়োজন নেই। তাঁর চেহারা-আকৃতি প্রকৃতি, চরিত্র, চালচলন, কথাবার্তা, কার্যাবলী সব কিছুই ছিল তাঁর মু'জিযা। তিনি ছিলেন সততার নিদর্শন। লোকেরা তাঁর চেহারা দেখেই বলে দিত যে, এই চেহারা কোন মিথ্যুকের হতে পারে না।

دردل هرامتی کزحق مزه است * روے واوازپمیر معجزاست

مرد حقانی کی پیشانی کانور * کب چهتا رهتاهے پیش ذی شعور

"উম্মত হবার যোগ্য প্রতিটি এমন মানুষ যার মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে, প্রিয় নবীর চেহারা দর্শন, বাক্য শ্রবণই তার ক্ষেত্রে মু'জিয়ার অনুরূপ কাজ করবে।" অর্থাৎ তাদের ঈমানের সৌভাগ্য হবে।"

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র চরিত্র, সুন্দর কর্ম, অবস্থাবলী, কার্যাবলী, স্বভাব-প্রকৃতি, তাঁর শৃংখলা, ব্যবস্থাপনা এবং সাংগঠনিক কৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, এসব কিছুর প্রতি যদি দৃষ্টি নিবন্ধ করা যায়, তা হলে দেখা যাবে তিনি কিভাবে সফলতার সাথে বিচিত্র স্বভাব, বিপরীতধর্মী প্রকৃতিকে আল্লাহর বিধানের আওতায় এনে সুবিন্যস্ত করেছেন। শুধু তা-ই নয়। মহানবী (সা) আল্লাহর সৃষ্টিকে (বিশেষ করে মানুষকে) যে শরী'আতের বিধান প্রদান করেছেন তার বাস্তবতা ও সূক্ষ্মতা, শিক্ষা, দৃষ্টিকোণ, গভীরতা, নিপুণতার বাস্তবায়ন ও দৃষ্টান্ত সম্পর্কে উম্মাতের বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম, আইন বিশারদ ও গবেষকগণ গোটা যিন্দেগীব্যাপী অধ্যয়ন ও গবেষণা করে দিশেহারা এবং অবাক হয়েছেন। এসব বিষয়ে যদি গভীর পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে সুস্থ বিবেকে এ বিষয়ে সামান্য সংশয় থাকবে না যে, এসব বিষয়ের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া গায়েবী সহায়তা ব্যতীত শুধু কোন মানবীয় শক্তি বা কোন কৌশল ও প্রচেষ্টা দ্বারা সম্ভব ছিল না। এ ধরনের নৈতিক মর্যাদা এবং পূর্ণাঙ্গ শরী'আতের উপস্থাপন কোন মিথ্যা ও ধোঁকাবাজ মানুষের পক্ষে কল্পনাও করা যায় না। সকলের জানা আছে, মহানবী (সা) নিরক্ষর ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষামুক্ত ছিলেন। তিনি কারো কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা করেননি তিনি কোন গ্রন্থও অধ্যয়ন করেননি। তিনি শিক্ষা অর্জনের জন্য সফরও করেননি, এবং সব সময় তিনি অশিক্ষিত আরবদের মাঝেই ছিলেন। তিনি ইয়াতীম ও দরিদ্র ছিলেন। এ অবস্থায় লেখাপড়া ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারা তাঁর যবানে জারি হয়ে যাওয়া এবং এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা তাঁর কণ্ঠে ব্যাখ্যা হওয়া, এর উদাহরণ প্রাচীন ও আধুনিক কারো মধ্যেই নেই। মহাপ্রভুর অহী ব্যতীত তা অর্জন করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব নয়। শুধু মানুষের নিজস্ব সামর্থ্য এবং অধ্যবসায় এসব বিষয় অর্জন করতে অক্ষম ও অসমর্থ।

এজন্যই এসবের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, তিনি ছিলেন অতুলনীয় ও অনন্য নৈতিক চরিত্র ও সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব। যা এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন মহান রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তা'আলা যার উপর গযব নাযিল করেন তাকে বদ আখ্‌লাক ও বদ আমল বানিয়ে দেন। আরব ও অনারবে সহায়-সম্বলহীন তাঁর খাদিমগণ যেভাবে সাফল্য ও বিজয় অর্জন করেছেন এটাও প্রমাণ পেশ করে যে, রাব্বুল আলামীনের অনুগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতা মহানবী (সা)-এর সাথে ছিল।

ইমাম গাযালী (র) বলেন ঃ এসব প্রকাশ্য বিষয় সত্যতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপরেও আমরা প্রকাশ্য বিষয়ে ছাড়াও আরও কিছু সূক্ষ্ম নিদর্শন অর্থাৎ কিছু মু'জিযা উল্লেখ করতে চাই। তাহলে একজন নগণ্য বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের মধ্যও তার সত্যতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। তারপর ইমাম গাযালী (র) সংক্ষিপ্তভাবে নবী করীম (সা)-এর কিছু সংখ্যাক মু'জিযার ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন।[১]

---

১. ইহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন, ২ খ, পৃ. ৩৪২.

মু'জিযার সংখ্যা

ইমাম বায়হাকী (র) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযার সংখ্যা এক হাজারে পৌঁছেছিল। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ এক হাজার দু'শত ছিল। কতিপয় আলিম তাঁর মু'জিযা তিন হাজার বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ইমামগণ মহানবী (সা)-এর মু'জিযার উপর আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ঃ ইমাম বায়হাকী, দালাইলু ন্নবুওয়াত এবং ইমাম আবূ নঈম-এর গ্রন্থ।[১] আল্লামা জালালউদ্দীন সূয়ূতী (র) 'খাসায়েসুল কুবরা' নামে মু'জিযার উপর আলাদা একটি কিতাব লিখেছেন, তাতে তিনি একহাজার মু'জিযার কথা উল্লেখ করেছেন।

সত্য কথা হচ্ছে, হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযার সংখ্যা অসংখ্য অগণিত। কেননা তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজ, প্রতিটি অবস্থা ছিল কল্যাণকর ও অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং শিক্ষায় ভরপুর। এ কারণে তা হতো স্বভাব-প্রকৃতির জন্য ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাও যা ছিল তাঁর মু'জিযা। খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ প্রাচীনকালের ৬৭টি মু'জিযা লিখেছেন। তারা হযরত মাসীহ্ (আ) আসমানে যাওয়া পর্যন্ত ২৭টি মু'জিযা হিসাব করেছেন। তারপর তাঁর হাওয়ারীদের মধ্যে ২০টি মু'জিযা গণনা করা হয়। তবে তাদের কাছে এসব মু'জিযা বর্ণনার কোন নির্ভরযোগ্য—পরম্পরা সূত্র নেই। তেমনিভাবে নেই বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা ও মান সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বা প্রমাণ। পক্ষান্তরে হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মু'জিযার বিবরণ নির্ভরযোগ্য সরাসরি যুক্তপরম্পরা অনুযায়ী সংখ্যার দিকে থেকে হাজারের অধিক মু'জিযা বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে শত শত বর্ণনা পরম্পরাযুক্ত ও প্রসিদ্ধ। সমস্ত নবী (আ)-এর তুলনায় তাঁর মু'জিযা ও মান ভিন্নতর মাত্রার এবং আধিক্য ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা দখল করে আছে।

মু'জিযার শ্রেণী বিভাগ

মহানবী (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাত যেহেতু ছিল সমস্ত পৃথিবীর জন্য, এজন্য কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন চাহিদা পূরণে সক্ষম মু'জিযা ও নিদর্শন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। যার মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছু নবুওয়াতের দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ হবে। জগতের কোন শ্রেণী তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান থেকে বাহিরে থাকবে না। আর এ কারণেই মু'জিযা নবুওয়াতের দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ হয়ে থাকে। যখন তাঁর মু'জিযা জগতের সব শ্রেণী থেকে হয়ে থাকে, তখন জগতের সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীই তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষী হবে।

এসব মু'জিযার মাধ্যমে তাঁর মান ও মর্যাদা আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলদের উপর দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর একক মু'জিযা সকল নবী (সা)-এর মু'জিযা থেকে অধিক। তাঁর নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব মু'জিযা দান করেছেন তা দু' শ্রেণীর।

এক, বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা, আরেকটি হলো—অনুভূতিভিত্তিক মু'জিযা। বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা হচ্ছে যা বুঝতে আকলের বা বুদ্ধির দরকার হয়। এ ধরনের মু'জিযা বুঝার জন্য দার্শনিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী মানুষের প্রয়োজন। অনুভূতিভিত্তিক মু'জিযা স্বভাব-প্রকৃতি বিরোধী বিষয়াবলী। এগুলো অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। এ ধরনের মু'জিযা চাহিদা প্রত্যাশী লোকেরা সাধারণত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নির্বোধ ও মেধাহীন হয়ে থাকে বুদ্ধির নিরীখে কিছু বুঝা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

প্রথম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা : হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি ও জীবন-চরিত্র এবং তাঁর অনন্য চারিত্রিক মাধুর্য, সন্দুর অনুপম কর্মসমূহ, তাঁর বাস্তব কর্মের পূর্ণতা ও জ্ঞানের পূর্ণতার মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল ছিল। যারা তাঁর আকৃতি ও জীবন-চরিত্রকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁদের নিকট ভালভাবে এ কথায় বিশ্বাস জন্মে যেত যে, তিনি এমন পবিত্র ও বরকতময় ব্যক্তি যাঁর চরিত্রে ও কার্যাবলীতে জ্ঞানের পূর্ণতা ও কর্মের কামলিয়াত সমবেত। এ ধরনের নমুনা না কেউ কোন দিন দেখেছে, না শুনেছে। অতএব তিনি অবশ্যই মহান প্রভুর প্রিয় ব্যক্তিত্ব হবেন। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা জগতে অনন্য বৈশিষ্ট্যের এক অনুপম ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতি দিয়ে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। এই ধরনের পূর্ণতা কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়।

انتخاب دفتر تکوین عالم ذات او
برتراز ابات جمله انبیاء ایات او-

"জগত সৃষ্টির আদিতেই তাঁর (নবীর) সত্তাকে এমন অসাধারণ সৃষ্টিরূপে নির্বাচিত করে রাখা হয়েছিল যে, তামাম নবী-রাসূলদের সমূহ নিদর্শন-মু'জিযার চেয়েও শ্রেষ্ঠতম তাঁর নিদর্শনসমূহ।"

مشرق صبح وجود ما سوامشکواة او
مستنیراز طلعت ادهر قریب وهر بعید

"ভোরের দিগন্তে উজ্জ্বল আলো, অপরাপর সবকিছুই তাঁর আলোকচ্ছটার কাছে ঋণী; তাঁর উদয়ের আলোর দ্বারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই আলোকিত।"
(মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (র)

দ্বিতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হক তা'আলা হযরত নবী (সা)-কে পূর্ণাঙ্গ এবং অসম্ভব সৃষ্টি গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআনুল কারীম দান করেছেন। পবিত্র কুরআন হলো নবুওয়াতের স্থায়ী মু'জিযা। কুরআনে

হাকীমে রয়েছে তাত্ত্বিক বিভাগ, প্রায়োগিক বিজ্ঞান, নৈতিক বিজ্ঞান এবং লোকাল কৌশল, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা (রাজনীতি), বাহ্যিক পবিত্রতা, লুকানো পবিত্রতাসহ সব কিছুর বিদ্যা, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ও কেন্দ্রবিন্দু।

উল্লেখযোগ্য যে, এ ধরনের অসম্ভব ও অনন্য গ্রন্থ একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষায় ব্যক্ত হওয়া, যিনি কোনদিন কোন শিক্ষক বা কোন মক্তব অথবা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, কোন আলিম ও বিজ্ঞানীর সোহবতেও ছিলেন না, বিদ্যালয়ের দরজায়ও যাননি। তাই এই কুরআন রাব্বানী অহী ও আল্লাহ তা'আলার শিক্ষা, রহমানী ইলহাম এবং গায়েবী আসমানী নির্দেশনা ব্যতীত আর কি হতে পারে। কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহানবী (সা)-এর শ্রেষ্ঠতম মু'জিযা। কুরআনের দিকে যাওয়া পরম্পরা সূত্রের কোন বিচ্ছিন্নতা ও বিরতি নেই, বরং এমন ব্যাপক পরম্পরা সূত্রে বর্ণিত যার নযীর পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে নেই। কুরআন এমন নির্ভুল জ্ঞানের গ্রন্থ এবং নিশ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। বড় জ্ঞানী বুদ্ধিজীবীরা প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম যে, কুরআনের জ্ঞান, বিজ্ঞান অবিকৃত রূপ, ভাষার প্রাঞ্জলতা, বর্ণনার সাবলীলতা, নিখুঁত অভিজ্ঞতায় ভরপুর এমন দ্বিতীয় আরেকটি গ্রন্থ পৃথিবীতে আর আছে কি-না। এক্ষেত্রে কুরআন ভবিষ্যতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ হিসেবে থাকবে ইনশা'আল্লাহ্। কেউ-এর মুকাবিলা করতে পারবে না। এরপর আমরা আর কি বলতে পারি যা কুরআন আজ থেকে চৌদ্দশত বছর থেকে ঘোষণা করে আসছে ঃ "যার সাহস হয় সে আমার জবাব লিখে দিবে।" কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো সামর্থ্য হয়নি কুরআনের একটি ছোট সূরার মত রচনা পেশ করা। মহানবী (সা)-এর যমানা থেকে শুরু করে সব যুগেই আরবী সাহিত্যের বড় বড় পণ্ডিত ভাষাবিদ যারা দ্বীনের বিরোধী ছিল, তারা কেউই-এর জবাব দিতে পারেনি।

মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) তাঁর রচিত না'তে বলেন ঃ

خاص کردش حق باعجاز کتاب مستطاب

حجت وفرقان ومعجز محکم وفصل خطاب ۔

"মহান আল্লাহ্ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক গ্রন্থ দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানীত করেছেন যা কিনা প্রমাণ্য, পার্থক্যকারী, অলৌকিক, মজবুত ও অখণ্ডণীয়।"

نجم بخمش دربراعت مست برزآ فتاب

حرف حرف اوشفاهست هدی بهر رشید ۔

"যে গ্রন্থখানা নক্ষত্ররাজির মতো অসংখ্য কল্যাণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার, এমনকি তা সূর্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ; যার প্রতিটি বর্ণে বর্ণে রয়েছে মুক্তি এবং হিদায়েত প্রার্থীর জন্যে রয়েছে পথ-নির্দেশ।"

কুরআনুল করীমে দাওয়াত এবং প্রমাণ দু'টিই রয়েছে

হাফেয ফযলুল্লাহ তুরবশতী (র) তাঁর আকীদা পুস্তক المعتمد فى المعتقد।[১] গ্রন্থে বলেন ঃ হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম যখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হকের দাওয়াতের জন্য আর্দিষ্ট হন তখন তাঁদের দাওয়াতের পক্ষে দলীল ও প্রমাণ হিসেবে মু'জিযা প্রাপ্ত হন। বস্তুত তাঁদের দাওয়াত ও প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকত কিন্তু আমাদের নবী (সা)-কে শুধু এক্ষেত্রে কুরআন মজীদই দেয়া হয়েছে। যেখানে দাওয়াত ও প্রমাণ দু'টোই একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। কুরআনুল করীমের অর্থ বক্তব্যের দিক থেকে দাওয়াত আর শব্দ, বাক্য ও উপস্থাপনার অভিনব পদ্ধতির দিক থেকে দাওয়াতের নিদর্শন। কুরআনের নিদর্শন তার মূল উপাদান যার অভ্যন্তরে দাওয়াতও রয়েছে। কুরআনুল কারীমের মর্যাদার এটি একটি আন্তরিক দিক যে, কুরআনে দাওয়াত ও নিদর্শন দু'টিই সমবেত এবং কিয়ামত পর্যন্ত এদু'টি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য এটুকুই।

তৃতীয় বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হাফেয তুরবশ্তী (র) বলেন ঃ মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবনের অবস্থাও তাঁর নবুওয়াতের দলীল। তাঁর জীবনের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় তিনি ছিলেন ইয়াতীম। তাঁর নিকট এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যা দিয়ে তিনি মানুষকে অনুগত করতে পারতেন। তিনিই এতটা সম্পদশালীও ছিলেন না যার কারণে কুরাইশগণকে লোভ-লালসায় সেদিকে আকৃষ্ট করতেন। তিনি কোন রাষ্ট্র ও সরকারের প্রধানও ছিলেন না উত্তরাধিকারীও ছিলেন না যার কারণে লোকেরা প্রাপ্তির আশায় তাঁর আনুগত্য করবে। বরং তিনি ছিলেন সহায়-সম্বল বন্ধুবিহীন। তাঁর দাওয়াতে কেউ একত্রিত হতো না। এমন কি এ বিষয়ে তাঁর নিকটত্মীয়রাও তাঁর বিরোধী ও দুশমন ছিল। তিনি তাওহীদের আহ্বানকারীরূপে এসেছেন। তখন আরব বদ্বীপের সকলে শিরক ও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। সন্ত্রাস, ব্যভিচার, খুনাখুনি ইত্যাদি সে জাতির স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। যখন নবী (সা)-এর দাওয়াত বিজয়ী হলো, তখন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। তাঁরা সকলে একই অন্তর, একই কণ্ঠ এবং এক প্রাণ হয়ে দ্বীনে হকের উপর একমত হয়ে গেলেন। তাঁদের লোভ-লালসা, প্রবৃত্তি সব মন্দ স্বভাব একত্রিত হয়ে চারিত্রিক সৌন্দর্য উত্তমরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সত্য দ্বীনের অনুসরণে তাঁদের আগ্রহ এতটা প্রবল ছিলে যে, দ্বীনের জন্য যে কোন দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ-কুরবানী, পরিবার ও সন্তানের বিচ্ছন্নতা সব কিছু গ্রহণ করতে তাঁরা তৈরি হয়ে গেলেন। তাঁরা জীবন ও সম্পদকে পানির মত আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত করলেন যার

১. পুস্তিকাটি মূলত ফার্সীতে।

মধ্যে পার্থিব স্বার্থ চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা এই জাতিকে যোগ্যতর বানিয়েছিলেন। সবচেয়ে বিশাল দুই সাম্রাজ্যেকে একই সময়ে তাঁদের করতলগত করে দিলেন। রোম সম্রাট কায়সার ও পারস্য সম্রাট কিসরার ধনভাণ্ডার মসজিদে নব্বীর বারান্দায় ঢেলে দিলেন। জনৈক কবি কত চমৎকারই না বলেছেন ঃ

"সূর্যের প্রমাণের ক্ষেত্রে কেবল সূর্যকেই পেশ করা যায়; (কারণ তার চেয়ে বড় প্রমাণ পেশ করার মতো আর তো কিছুই নেই।) তারপরও যদি কেউ আরও বড় প্রমাণ প্রার্থনা করে তাহলে তাকে চন্দ্র দেখিয়ে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

درفشانی نے تیری قطروں کو دریاکردیا ۔

دل کو روشن کردیا انکھوں کوبینا کردیا ۔

خودنہ تھے جوراہ پراوروں کے ھادی ھوگئے ۔

کیا نظرتھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا ۔

"ভাগ্য চোখের অশ্রুকে করে দিয়েছে সাগর,
অন্তরকে আলোকিত করে দিয়েছে, চোখকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে।
যে নিজের পথ চিনত না সেই হলো পথপ্রদর্শক,
কেমন দৃষ্টি ছিল যা সেই মৃতকে জীবন্ত করে দিল।"

মানুষ যখন উক্ত অবস্থা ও বিপ্লবের পর্যালোচনা করবে, গভীর চিন্তা করবে, তখন দৃঢ়বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি হবে যে, এ ধরনের খ্যাতিমান কার্যাবলী কোন বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা-ভাবনা প্রসূত প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে না। মানুষের চেষ্টা-প্রচেষ্টার ধাপ এই পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। এ খোদায়ী কারিশমা ও আসমানী সহযোগিতা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ আলীম, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান-এর হুকুম ও তাক্দীর ব্যতীত কোন বান্দার পক্ষে এ ধরনের অর্জন ও প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন দখল থাকতে পারেনা। পবিত্র কুরআনে ও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

وَلَوْ اَنْفَقْتَ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۔

"হে নবী! আপনি যদি এ জাতির মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টির জন্য যমীনের সব ধন-সম্পদও ব্যয় করতেন তবুও আপনি তাদের মধ্যে ভালাবাসা ও সহানুভূতি তৈরি করতে সক্ষম হতেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে পরস্পরে ভালবাসা সৃষ্টি করে ছিয়েছেন।" (সূরা আন্ফাল ঃ ১৩)

৪র্থ বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা) তাওরাত ও ইঞ্জিলের আলিমদের সামনে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমার আবির্ভাব ও বিজয়ের ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলে খবর

দিয়েছিলেন। আর বিগত সকল নবীকেই আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছিলেন যে, শেষ যামানার এক নবী সর্বশেষ নবী হিসেবে আগমন করবেন যার নবুওয়াত সমস্ত জগতবাসীর জন্য প্রযোজ্য হবে। অতএব হে আসমানী কিতাবের ধারক-বাহকগণ! তোমরা আমার উপর ঈমান আন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই দাওয়াত ও নিদর্শন উপস্থাপনের পর থেকে আহলে কিতাব ঈমান আনয়ন করেছে এবং এই কথার সাক্ষ্য দিয়েছে যে, নিশ্চয়ই তিনি সেই নবী যাঁর সংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল।

তবে অনেক আহ্‌লে কিতাব হিংসার বশবর্তী হয়ে ঈমান আনেনি, অথচ তারা মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এই সুসংবাদ প্রচার করত ও বলত, মক্কার আধিবাসীদের মধ্য হতে শীঘ্রই শেষনবীর আবির্ভাব হবে। তাদের ভয় ছিল, শেষ যামানার নবী (সা)-এর আনুগত্য করলে তাদের নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। এজন্য তারা ঈমান আনে নি। কিন্তু তাদের কুরআনের এই আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ ছিল না যে, কুরআনে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তাওরাত ও ইঞ্জিলে উল্লেখ আছে, শুধু তা-ই নয়, কুরআন এই দাবিও করেছে যে, তার সাহাবায়ে কিরামের আলোচনাও তাওরাত ও ইঞ্জিলে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِىْ الْاِنْجِيْلِ -

আহ্‌লে কিতাবের আলিমদের এই কথা বলার সুযোগ ছিল না (নাউযুবিল্লাহ) যে, কুরআন যে নবী (সা)-এর কথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে আলোচিত হয়েছে বলে সংবাদ দিয়েছে তা মিথ্যা। নবীর আলোচনা ও তাঁর সাহাবাদের আলোচনা তাওরাত ও ইঞ্জিলে নেই। যে সময় কুরআন নাযিল হচ্ছিল সেই সময় তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবীয়ে উম্মী (সা) -এর উল্লেখ ছিল আর হাজার হাজার ইয়াহূদী ও নাসারা আলেম বর্তমান ছিল। যদি কুরআনের বক্তব্য অসত্য হতো—তা হলে ত তারা তা ফাঁস করে দিত, ফলে ইয়াহূদী ও নাসারাদের মধ্যে যারা ইসলামে দাখিল হয়েছিল তা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যেত এবং নতুন করে কেউ ইসলাম গ্রহণ করার জন্য ইয়াহূদী ও নাসারাদের ধর্ম ত্যাগ করত না।

৫ম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

যে সময়ে হযরত নবী (সা) পৃথিবীতে আগমন করেন সে সময় তামাম দুনিয়া গুমরাহীতে ডুবে ছিল। গুমরাহীর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সে সময় পৃথিবীতে ৬টি ধর্মমত চালু ছিল।

১. অগ্নিপূজার ধর্ম ঃ ইরান ও পারস্যের এলাকা থেকে শুরু করে খোরাসান এবং তুর্কিস্তান পর্যন্ত এ ধর্ম ছিল। পারস্য সম্রাট কিস্‌রা এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। অগ্নিপূজক বা মাজূসীরা দুই খোদার দাবিদার ছিল (ইয়াযদান্ ও আহরমান) তারা অগ্নিপূজা করত, মৃত জীব খেত, কন্যা ও বোনকে বিয়ে করত, ফুফু ও খালার তো প্রশ্নই উঠে না।

২. ঈসায়ী ধর্ম ঃ এই ধর্ম সিরিয়া, ইরাক ও অন্যান্য এলাকায় ছিল। রোম সম্রাট কায়সার যেহেতু ধর্মীয় দিকে থেকে খ্রিস্টান ছিল, এইজন্য ঈসায়ী ধর্ম রোম সাম্রাজ্যের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিপালিত হচ্ছিল। তারা 'তিন খোদা' 'পুত্র বানানো' এবং মাসীহকে খোদায়ী আরোপ করা এসবের দাবিদার ছিল।

৩. ইয়াহূদী ধর্ম ঃ যারা তাওরাত মানত, তাদের মধ্যে চরম বৈপরীত্য ছিল। আর তাদের অহমিকার পর্যায় এমন ছিল যে, নবীদেরকে এবং আলিমদেরকে হত্যা করা তারা নিয়মে পরিণত করে ফেলেছিল। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে বলেন ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ -

"তারা অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত এবং যারা ইন্সাফের নির্দেশ দিত (ওলামা) তাদেরকেও হত্যা করত।"[১]

ইয়াহূদীরা বেশির ভাগ খায়বার ও মদীনার আশেপাশের এলাকায় বসবাস করত। সুদ খাওয়া, নবীদের কিতাব বিকৃত করা, দ্বীনকে বিক্রি করা, ঘুষ খেয়ে বিধির পরিবর্তন এসব তাদের মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

৪. মুশরিক বা পৌত্তলিক ঃ যারা মূর্তিপূজা করত। আরব ও হিন্দুস্থানে এ ধর্মের প্রচলন ছিল।

৫. সাবেয়ীন ধর্ম ঃ যারা আধ্যাত্মিকতার কথা স্বীকার করত, গ্রহ-তারার পূজা করত। এই ধর্ম ইরাক এবং হার্‌রান এলাকায় বেশি ছিল। নমরূদের যামানায় বেশির ভাগ মানুষ এই ধর্মের অনুসারী ছিল। যাদের হিদায়েতের জন্য আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّابِئِيْنَ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ - (সূরা হাজ্জ ঃ ১৭)

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আবির্ভবের সময়ে প্রচলিত ৫টি ধর্মের কথা উল্লেখ আছে।

৬. দাহ্‌রিয়া ধর্ম ঃ উপরের আয়াতে যে পাঁচটি ধর্মের আলোচনা আছে, এগুলো বিখ্যাত ধর্ম ছিল। এছাড়াও দাহ্‌রিয়া নামে একটি সম্প্রদায়ে ছিল যার উল্লেখ আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন ঃ

وَقَالُوْا مَاهِيَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ - (সূরা জাসিয়াহ ঃ ২৪)

১. সূরা আলে ইমরান ঃ ২১।

অন্য স্থানেও দাহ্‌রিয়াদের আলোচনা কুরআনে আছে। এদের সম্পর্কে লেখকের একটি পুস্তক اثبات صانع عالم وابطال دهريت وما ديت। পাঠকগণ তা দেখতে পারেন।

পৃথিবীতে দীন ইসলামের আগমন

হযরত নবী (সা) যখন সত্য দীন নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন উক্ত ধর্মমতগুলো চালু ছিল। রাষ্ট্র সরকার ও রাজা-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় এসব ধর্মের চর্চা চলছিল। ইসলাম ছিল প্রচলিত এসব ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর যিনি এই ইসলাম নিয়ে আগমন করলেন তিনি ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে একজন অনাথ সম্পদবিহীন ও একজন নিরক্ষর মানুষ। তিনি বিভিন্ন ধর্মকে প্রতিহত করে প্রমাণ নিয়ে দ্বীন ইসলামকে দুনিয়াবাসীর সামনে পেশ করলেন। তাঁর উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণ দেখে জগতবাসী অবাক হয়ে গেল। অনেক বড় বড় পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী ইয়াহূদী-নাসারার সাথে নবী (সা)-এর বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও মহানবী (সা) কর্তৃক উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণকে সামান্যতম দুর্বল করতে সক্ষম হয়নি। অথচ তিনি ছিলেন নিরক্ষর ব্যক্তিত্ব, যিনি লেখাপড়া জানতেন না। পবিত্র কুরআনুল করীম এবং হাদীসসমূহ বাতিল ধর্মের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণে ভরপুর। আর এগুলো এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, নিশ্চয়ই তিনি মহান রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত ও আল্লাহ্ কর্তৃক অহীপ্রাপ্ত ছিলেন। কেননা তিনি নিরক্ষর হবার পরেও অকাট্য দলীল ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা হককে প্রতিষ্ঠিত করা এবং পৃথিবীর সকল ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বাতিল করে দেখানো তাঁরপক্ষে আল্লাহর নির্দেশ ও আল্লাহর মেহেরবানীর সহযোগিতা ব্যতীত অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল। তের বছর অব্যাহতভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ চালানোর পর যখন হক প্রকাশ্য রূপ নিল এবং সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না, তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ তিনি মক্কা মুকাররমা থেকে হিজরত করলেন। হিজরতের একবছর পর আল্লাহর হুকুমে জিহাদ ও যুদ্ধের সূচনা করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও সাহায্য অনুযায়ী সফলতা ও বিজয় লাভ করলেন। আর যুদ্ধক্ষেত্রে ও অভিযানে গায়েবী বিষয়ক কারিশমাঁ দেখে বুঝা গেল; সম্পদ-সম্বল ও উপায়-উপকরণবিহীন বিস্ময়কর কার্যাবলী সম্পদ ও উপকরণের মালিকদেরকে মুকাবিলা করে ব্যর্থ করে দিয়েছে এসব ফকীর-মিসকীনেরা।

তাদের এই অপমান ও পরাজয় আসমানী সহযোগীতাবিহীন মুসলমনাদের পক্ষে অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল। পরিশেষে তারা যখন অপারগ হয়ে গেল, তখন হকের সামনে মাথা নত করে দিল এবং দলে দলে দ্বীনের মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

৬ষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর গায়েবের সংবাদ দেয়া ও পরবর্তী সময়ে সে সংবাদ সামান্যতমও ব্যতিক্রম না হওয়া এবং ভুল না হওয়া (তাঁর মু'জিযা ছিল)। তিনি

অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলী ও পূর্বের কথা এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন ও তিনি উপস্থিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তিনি যেন কানেও শুনেছেন। মুনাফিক ও বিরোধীদের মনের গোপন কথা আগাম খুলে বর্ণনা করা—যা হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, এসব বিষয়ে একথার প্রকাশ্য প্রমাণ যে, তিনি অহীর ধারক-বাহক ছিলেন। এই জন্য তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী শুধুমাত্র বুদ্ধি দিয়ে করা সম্ভব ছিল না; বরং তার ভবিষ্যতবাণী বুদ্ধি, অনুমান ও ইঙ্গিত এবং নির্দেশক কোন কিছু দিয়েই খোদায়ী অহী ও মহান সর্বভৌম প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন অবস্থাতেই সম্ভব ছিল না।

৭ম বুদ্ধিবৃত্তিক মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর দু'আ কবূল হওয়া এটিও তাঁর সত্য নবী হবার সরাসরি প্রমাণ। তিনি আল্লাহর দরবারে যত দু'আ করেছেন তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবূল হয়েছে।

অনুভূত মু'জিযাসমূহ

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৈতিক ও বুদ্ধিভিত্তিক নিদর্শন ব্যতীতও—যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, অনেক প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ নিদর্শন দান করেছেন। যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা অনুভব করা যায়। যেমন ঃ মক্কার কাফিরদের চাহিদা অনুযায়ী তিনি হাতের আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরা করে দেন। তাঁর আঙ্গুলের মাধ্যমে পানির ঝরণা প্রবাহিত হয় যা দিয়ে প্রায় দেড় হাজার সাহাবী পানির প্রয়োজন পূরণ করেছেন। সকলে অযূ করেছেন পশুদেরকেও পান করিয়েছেন, তারপরে প্রয়োজনমাফিক পাত্রে মশকে পানি ভর্তি করে রেখেছেন। সামান্য খাদ্য দিয়ে বিশাল বাহিনীর সদস্যদের পরিতৃপ্তি লাভ করে। তিনি গাছকে আহবান জানালে গাছ উপস্থিত হয় এবং বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে সালাম করে। বিষাক্ত রান্নাকরা বকরীর গোশত তাঁকে সম্বোধন করে একথা বলে ঃ আপনি খাবেন না, দুশমনেরা আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত করেছে। তাঁর হাতের পাথর তাসবীহ পড়তো, এসবই তাঁর মু'জিযা ছিল। পর্যবক্ষেকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মানিত বান্দা এবং তাঁর রহস্যের ধারক, প্রতিনিধি সর্বোপরি আল্লাহর দূত। যিনি আল্লাহর বিধানাবলী ও হিদায়েত নিয়ে আগমন করেছেন। এজন্য মহান আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কুদরত ও অনন্য কারিশমাঁ তাঁর হাত দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আর এসব কিছু মহান স্রষ্টার প্রতিনিধিত্বের মান ও অন্য বৈশিষ্টের নিদর্শনা। মানুষের ক্ষমতা এ ধরনের কারিশমাঁ প্রকাশ করতে অক্ষম ও ব্যর্থ, আর এমন সব আশ্চার্যজনক দুর্লভ এবং অসম্ভব বিষয় প্রকাশ হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভবও নয়, বাস্তবও নয়। এভাবে জানা গেল যে, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। তিনি এমন অদৃশ্য সত্তা কর্তৃক

সাহায্যপ্রাপ্ত, যে সত্তার ক্ষমতার হাতে প্রকৃতির যুগ-জগত ও আকাশ সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ। তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রিয় বান্দা আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দু'টুকরা করে দেন। যখন তিনি প্রত্যাশা করেন আঙ্গুলের দ্বারা বাহ্যিক উপকরণবিহীন ঝরণা জারি করে দেন। এভাবে প্রকৃতি বিজ্ঞানী উপকরণ নির্ভরশীল ব্যক্তিদের এ কথা জানা হবে কোন সত্তা এমনও আছেন যিনি কোন নিয়মনীতি ও উপকরণের অধীন নন।

নবুওয়াতের দাবিদার এই মহান ব্যক্তির হাত দিয়ে গায়েবী কারিশমাঁ প্রকাশ হচ্ছে। তিনি সর্বশক্তিমান সত্যপ্রভুর দূত। আকাশের অস্তিত্ব, যুগ ও জগতের সৃষ্টি যাঁর হাতে তিনি সার্বভৌম মালিক। তাঁর পক্ষে নবীর মাধ্যমে এসব কারিশমাঁ প্রকাশের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ সৃষ্টির নিকট এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া যে, যেমনিভাবে নবী (সা)-এর কণ্ঠ ভাষা ও ভাষ্য, সর্বজ্ঞানী আল্লাহর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দর্পণ, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পবিত্র হাত সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরতি হাতের দর্পণ, যার মাধ্যমে গায়েবী কুদরতের দুর্লভ ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারিশমাঁ প্রকাশ হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সে কথাই বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ -

"যারা তোমার হাতে শপথ করে মূলত তারা আল্লাহর সাথে শপথ করে"। (সূরা ফাতহ্ ঃ ১০)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى -

"তুমি যখন বালি ছুঁড়ে মেরেছিলে তখন আসলে তুমি তা ছুঁড়ে মারনি, বরং আল্লাহ্ই তা ছুঁড়ে মেরেছিলেন।" (সূরা আনফাল ঃ ১৭)

একজন মানুষের হাতে এ ধরনের আশ্চর্যজনক আলৌকক ঘটনা সংঘটিত হওয়া, যা একজন মানুষের ক্ষমতার আওতার বাইরে, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই ব্যক্তির হাতের পিছনে গোপনে সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতের ছোঁয়া রয়েছে। আর এই নবীর হাত দিয়ে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা বাস্তবে আল্লাহ তা'আলারই কাজ, নবীর কাজ নয়।

امارميت اذرميت گفت حق * كارحق بركار هاوارو سبق

"মহান আল্লাহ্ তাঁর শানে ইরশাদ করেছেন ঃ তিনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন (কাকিরদের চোখে ধুলো) তা (প্রকৃতপক্ষে) আপনি নিক্ষেপ করেননি; তাঁর সমূহ কর্মকাণ্ড মহান আল্লাহর পূর্ব ইচ্ছে ও প্রদত্ত শক্তিতেই সংঘটিত হয়ে থাকে।"

گر بپرانيم تيران نے زماست * مان كمان وتيراندازش خداست

"যে সময়টিতে আমরা ধণুকে তীর পুরে তা নিক্ষেপ করে থাকি; সে সয়টিতে আসলে আমাদের কামানের গোলা ও তীর ইত্যাদি মহান আল্লাহরই কুদরাতীভাবে অথবা ফিরিশতাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন।

যখন এসব মর্যাদার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে সমাজে একথা ভালভাবে জানা যাবে যে নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা ও তাঁর প্রতিনিধি এবং আল্লাহর দূত, তখন লোকেরা তাঁকে আনুগত্য করার হক্‌দার মনে করবে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য হবে বলে অনুধাবন করবে।

সারকথা

মু'জিযা প্রদানের হিক্‌মত হচ্ছে ঃ জনসাধারণ তাঁর নবুওয়াতের প্রতি আস্থাশীল হবে যে, তিনি সত্যনবী নবী (সা)-এর জন্য তার মু'জিযাসমূহ তাঁর দূত ও প্রতিনিধিত্ব পদবীর জন্য সূত্র ও উপকরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁর অগণিত মু'জিযা ছিল, আমরা এখানে তাঁর ঐসব মু'জিযা আলোচনা করছি যা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সূত্রের পরম্পরায় সবগুলো হয়ত সংখ্যাতিরিক্ত সীমায় পৌছেনি, কিন্তু সামগ্রিক সূত্রে বহুল সূত্রের সীমায় পৌঁছেছে, যেগুলোর ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, হযরত আলী (রা)-এর বীরত্বের বর্ণনাসূত্র এবং হাতিম তাই-এর দানশীলতার বর্ণনা যদিও সংখ্যাতিরিক্ত বর্ণনা হিসেবে আসেনি, তবে সামগ্রিক বর্ণনায় এককভাবে এ দু'টি হাদীসের বর্ণনা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যেখানে সন্দেহ-সংশয়ের সুযোগ নেই। এজন্যই হয়ত আলী (রা)-এর বীরত্ব ও হাতিম তাই-এর বদান্যতা পৃথিবীতে প্রবাদ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে।

ইয়াহূদীদের নিকট হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযার লাঠি এবং সাদা হাত-এর মু'জিযা নবুওয়াতের প্রমাণ, তেমনিভাবে নাসারাদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ ও অন্ধকে সুস্থ করা -এর নবুওয়াতের প্রমাণ। তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মু'জিযাও তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ ও দলীল। হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযাকে নাসারাদের অস্বীকার করা আর ইয়াহূদীদের হযরত ঈসা (আ) মু'জিযাকে অস্বীকার করা একই পর্যায়ের।

নবীর মু'জিযার ব্যাখ্যা

এখানে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযার কিছু ব্যাখ্যা পেশ করতে চাই। ইতিপূর্বে সামগ্রিকভাবে মু'জিযার আলোচনা করা হয়েছে।

মু'জিযার সংজ্ঞা

মু'জিযা হচ্ছে এমন বিষয় যা প্রকৃতির নিয়মনীতির বাইরে হয়, যা নবুওয়াতের দাবিদারগণের হাতে প্রকাশ পায়। সমগ্র পৃথিবী ও জগতবাসী তার মুকাবিলা অথবা তদ্রুপ করতে অক্ষম ও ব্যর্থ হয়। আর এভাবেই তাঁর বিরোধী ও অস্বীকারকারীদের নিকট বিষয়টি ফুটে উঠে যে, এ ব্যক্তি স্রষ্টার প্রিয়পাত্র যার জন্য স্রষ্টা নবীর

দুশমনদেরকে অক্ষম, পরাভূত ও নিরুত্তর করার জন্য কুদ্‌রতের কারিশমা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন, যেন মানুষের কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, গায়েবী সাহায্য তাঁর পশ্চাতে রয়েছে। আর এই ব্যক্তি কোন যাদুকর বা জ্যোতিষী নন যে, কেউ তাঁর মুকাবিলা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। কারো যদি সংশোধন, কল্যাণ আর সফলতা অর্জন করার লক্ষ্য থাকে, তা হলে এই মহান ব্যক্তিত্বের উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে। যেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ তা'আলা নিজের খলীফা, প্রতিনিধি, দূত ও নির্ভরযোগ্য করে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর ও বিরোধীতা করার পরিণাম ধ্বংস ও অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে?

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ـ

"অপেক্ষা কর, দেখতে পাবে মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কেমন হয়।" (সূরা নাহল ঃ ৩৬)

ইল্‌মী মু'জিযা ও আমলী মু'জিযা

মু'জিযা দু'প্রকার। এক, আমলী মু'জিযা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, ইলমী মু'জিযা। আমলী মু'জিযা হচ্ছে, নবী কর্তৃক এমন কাজ বা এমন কথা প্রকাশ পাওয়া, যে ধরনের করতে সকলে অক্ষম।

পক্ষান্তরে ইল্‌মী মু'জিযা হচ্ছে নবী কর্তৃক এমন জ্ঞান ও বিদ্যা প্রকাশ পাওয়া যার মুকাবিলা করা বা তদ্রূপ কিছু করতে সমগ্র দুনিয়া অসম্ভব ও অক্ষম।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের নবী (সা)-কে দু'ধরনের মু'জিযাই ব্যাপক পরিমাণে দান করেছেন, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

কুরআনুল হাকীম শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

হযরত নবী (সা)-এর মু'জিযার মধ্যে সবচেয়ে বড় মু'জিযা হচ্ছে, কুরআনুল করীম যা ইল্‌মী বা একাডেমিক মু'জিযা। এই মু'জিযাটি নবী (সা)-এর জন্য সমস্ত নবীদের মু'জিযা থেকে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী। সবাই স্বীকার করেন কাজ থেকে বিদ্যার মূল্য অনেক বেশি। এজন্যই প্রতিটি বিষয়ের প্রশিক্ষককে সম্মান করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই শ্রমিক থেকে অফিসারের বেতন বেশি হয়ে থাকে। এই মর্যাদা বিদ্যার ও জ্ঞানের-অথচ শ্রমিকের পরিশ্রমই বেশি। কুরআনুল করীম হযরত নবী (সা)-এর ইল্‌মী মু'জিযা, আর এ মু'জিযাটি তাঁর সর্বোত্তম মু'জিযা। অপর কোন নবীকে অনুরূপ মু'জিযা দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীর মু'জিযা ছিল সময়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআনুল করীম এমন মু'জিযা যা অস্তমিত বা হারিয়ে যাবার পথ নেই। কুরআন নাযিল হয়েছে ১৩৮৩ বছর হয়েছে* কিন্তু এখনো তা কোনরূপ পরিবর্তন, বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন থেকে মুক্ত রয়েছে। ইন্‌শা'আল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের মু'জিযা এ অবস্থাতেই বর্তমান থাকবে যে অবস্থায় তা নাযিল হয়েছিল।

* মূল পুস্তকটি রচনাকারীন সময়।

কুরআন মু'জিযা হওয়ার বিভিন্ন কারণ

উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন গ্রন্থে কুরআনুল করীমের মু'জিযার বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে কুরআনুল করীমের মু'জিযার কয়েকটি দিক তুলে ধরব যা সরাসরি ও স্পষ্ট।

প্রথম কারণ ঃ হযরত মূসা (আ)-এর যমানায় যাদুবিদ্যার ব্যাপক চর্চা ছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লাঠি ও সাদা হাতের মু'জিযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আ)-এর যমানায় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রোগী সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা দান করেছেন। আর আমাদের নবী (সা)-এর যুগে ভাষা-সাহিত্য ও অলংকারশাস্ত্রের চর্চা ছিল। এ প্রেক্ষাপটে আরবগণ অনারবদেরকে মূক বা আজম বলে আখ্যায়িত করত। এখনও সেই আজম শব্দ চালু আছে। সুতরাং সবচেয়ে বড় মু'জিযা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরআন দান করেছেন। কুরআনের শব্দ ও বাক্যের অলংকার, প্রাঞ্জল্য, সাবলীলতা ও হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা, শ্রোতা-বক্তাকে অক্ষম ও পরাজিত করে দেয়। এটিই মু'জিযার সংজ্ঞা। কুরআনের সাথে মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পৃথিবীর মানুষ সক্ষম নয়। মু'জিযা কিন্তু নবীরও ক্ষমতার বাইরের বিষয়। কুরআনুল করীম হযরত নবী (সা)-এর বক্তব্য নয় বরং মহান আল্লাহ তা'আলার বাণী। যেমনি কুরআনের অনুরূপ রচনা করতে অন্য সকল মানুষ অক্ষম, তেমনিভাবে নবী (সা)-এর ব্যক্তিগত ক্ষমতারও বাইরে। তাঁর বাণীকে হাদীস বলা হয়। কুরআন ও হাদীসের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আরবের ভাষাবিদ ও নান্দনিক উপস্থাপকদের নিকট তিনি এভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ - "তোমরা যদি কুরআনকে আল্লাহর বাণী হবার ক্ষেত্রে সন্দেহ কর তাহলে সকলে মিলে-এর মত একটি ছোট সূরা রচনা করে দেখাও!"

কুরআন পৃথক পৃথকভাবে কাফিরদের সকলকেই মুকাবিলা করার জন্য দাওয়াত দিয়েছে। কিন্তু আরবের উন্নত ভাষাবিদগণ সকলেই কুরআনের মত করে কিছু রচনা করতে অক্ষম হলো। অথচ কুরআন ত আরবদের নিজস্ব ভাষা ও অক্ষরে রচিত হয়েছে। কুরআন তাদের ব্যবহৃত আরবী ভাষাতেই ছিল। শুধু তা-ই নয়, মহানবী (সা) নিজে ছিলেন নিরক্ষর। তিনি কারো নিকট লেখাপড়া শিখেননি। তিনি কোন শিক্ষিত লোকের সান্নিধ্যেও ছিলেন না। তারপরেও যখন আল-কুরআনের মত অকল্পনীয় ধরনের অলংকারসমৃদ্ধ এক তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপূর বাণী তাঁর পবিত্র কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো, তখন তা এ কথার অকাট্য দলীল যে, তা আল্লাহর কালাম ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। এটি কোন মানুষের কথা নয়। এই বাণীর সাথে নবী (সা)-এর স্পর্শ শুধু এতটুকু যে, হযরত জিবরাঈল আমীন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অহী হিসেবে যে বাণী বহন

করে তাঁর নিকট নিয়ে এসেছেন, তিনি কমবেশি না করে হুবহু মানুষের কাছে আল্লাহর অহী এই কুরআন পৌঁছে দিয়েছেন, যেন মানুষ তা থেকে হিদায়েত পেতে পারে। কাযী আয়ায (র) তাঁর গ্রন্থ 'আশ-শিফা'তে উল্লেখ করেছেন ঃ আল-কুরআনে অলংকার হিসেবে সাত হাজারেরও অধিক মু'জিযা রয়েছে। আর এজন্য إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ -এর মত একটি ছোট সূরাতে ১০টি শব্দ রয়েছে। সমস্ত কুরআনুল করীমে প্রায় সত্তর হাজার শব্দ রয়েছে। যদি ধরে নেয়া হয় প্রতি আয়াতে ১০টি শব্দ আছে এ হিসেবে ৭ হাজারের অধিক আয়াত হতে পারে এবং কুরআনের মু'জিযা ৭ হাজারের অধিক হবে।

একটি প্রশ্নের জবাব ঃ কোন কোন আহম্মক লোক বলে থাকে, দুনিয়াতে আরও কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলোর মত অন্য কোন গ্রন্থ নেই, যেমন ঃ ফেরদৌসীর শাহনামা এবং শেখ সা'দীর গুঁলিস্তা।

জবাব ঃ এ প্রশ্নের ধরনে বুঝা যায়, এসব লোকের মু'জিযার হাকীকত এবং কুরআনের মু'জিযা সম্পর্কে ধারণা নেই। কুরআনুল করীমের মু'জিযা বা অক্ষম কারী পদ্ধতি ছিল এই যে, আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাত্ত কণ্ঠে আরবের কাফির তথা অস্বীকারকারীদেরকে বজ্রকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, "কুরআনুল করীম আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং কুরআন আমার মু'জিযা। এ বিষয়ে যদি তোমার সংশয় সন্দেহ কর তাহলে কুরআনের মুকাবিলায় সুন্দর উন্নত শব্দে ও চমকপ্রদ বাক্য-বিদ্যা সম্বলিত বাণী রচনা করে উপস্থাপন কর।" ২৩ বছর ব্যাপী অব্যাহতভাবে তিনি তাদের নিকট এই আহ্বান ও চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন। অথচ তাদের একজন ব্যক্তিও কুরআনের মত একটি আয়াত বা কাব্যও রচনা করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষও কুরআনের মুকাবিলা ও প্রতিযোগিতা থেকে অক্ষম ও ব্যর্থ হয়েছে। যারা এ ধরনের বক্তব্য ও প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তাদেরকে বলতে হবে এ পদ্ধতিতে মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার দাওয়াত বা চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর কোন গ্রন্থের বেলায় কোথাও কখনো দেয়া হয়েছিল কি-না? আর এই ধরনের আহ্বানই বা কে কোথায় দিয়েছে ? অক্ষমতাই বা কোথায় প্রকাশিত হয়েছে ? শুধুমাত্র কোন রচনার তুলনা না থাকলেই তাকে মু'জিযা বলা যায় না। নিজকে ভাষাগত সৌন্দর্য অথবা পূর্ণতা ও পরিপক্কতার কারণে কোন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি বা কোন রচনা বা গ্রন্থকে উপমাহীন বলা হয়ে থাকে, কিন্তু এ কথার অর্থ এই নয় যে, এই রচনা অথবা এর রচয়িতা মু'জিযা।

কখনো মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা ও তথ্যের অভাবে কোন কিছুকে তুলনাহীন মনে করে থাকে যদিও বাস্তবে-এর সমতুল্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে। শাহনামার মুকাবিলায় মির্জা মুহাম্মদ তুরানী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা ফেরদৌসীর শাহ্নামার চেয়ে উত্তম। সে গ্রন্থে কৃবি ফেরদৌসীর শাহনামার দুর্বল দিকের সমালোচনা করা হয়েছে।

কোন জিনিসের মু'জিযা হওয়ার জন্য তার অলৌকিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রমী হওয়া জরুরী। তাতে বস্তুগত ও বাহ্যিক উপায় উপকরণের কোন প্রভাব

থাকে না। যাদু এবং মু'জিযার মধ্যে এটাই পার্থক্য যে, যাদু শিক্ষা। প্রশিক্ষণ ও পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায় কিন্তু মু'জিযা এমন কোন বিষয় নয় যা শিক্ষা প্রশিক্ষণ নিয়ে অর্জন করা যাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শেখ সা'দী এবং কবি ফেরদৌসী দীর্ঘদিনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, অধ্যয়ন-অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং বহু বছর বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে উস্তাদদের সেবা করে বিদ্যা অর্জন করেছেন। তারপর বছরের বছর পরিশ্রম করে অনেক চেষ্টার পর তাঁর রচনা অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। এটা কোন বিস্ময়েরও কিছু নয়, আর একে মু'জিযাও বলা যায় না।

সব যুগেই প্রত্যেক ভাষায় বড় বড় পণ্ডিত-সাহিত্যিক বিগত হয়েছেন। যেমন ঃ আরবী ভাষায় বদীউজ্জামান হামাদানী এবং হারিরী, তাই বলে তাদের রচনা মু'জিযা ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ ফার্সী ভাষায় শেখ সা'দী, কবি ফেরদৌসী, ইংরেজি সাহিত্যে মিল্টন, সংস্কৃত ভাষায় কালীদাস এবং উর্দূ ভাষায় মুহাম্মদ হোসাইন আযাদ, আলতাফ হোসাইন হালীসহ অনেকে।

তাঁদের রচনা যদি তাঁদের সমসাময়িকদের রচনা থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে, তবে তা বছরের পর বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফসল, মু'জিযা নয়। এ প্রেক্ষিতে কোন কোন বুদ্ধিমান ফযীর রচিত গ্রন্থ তাফসীরে বেনুক্তা-কে উল্লেখ করে থাকেন। এ গ্রন্থের ব্যাপারেও বলা হয় যে, এটি অনন্য ও তুলনাহীন, আজ পর্যন্ত-এর প্রতিপক্ষ কেউ হতে পারেনি। এ কথার জবাব খোদ ফয়যীর ভাষায়ই শুনুন।

العلوم كلها صداع الاعلم كلام الله وكلام الله لاعد لحامده ولاحد لمكارمه ولاحصر لرسومه ولااحصاه لعلومه وما علم علوم كلام الله كلها احد الا الله ورسوله واولوالعلم ما علموا الاعدادا ـ

"আল-কুরআনের বিদ্যা ব্যতীত সব বিদ্যা হচ্ছে মাথা ব্যাথার কারণ। কুরআনের বাণীর গুণাগুণ অগণিত। তাঁর সৌন্দর্যের কোন সীমা, পরিসীমা নেই। কুরআনের জ্ঞান অফুরন্ত, যাকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কুরআনের পুরো জ্ঞান ও বিদ্যা আর কারও জানা নেই। সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিতের সব জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি একত্রিত করলে কুরআনের সীমাহীন বিদ্যার সামান্য অংশই হবে।"

এই হচ্ছে আল্লাহর কালাম সম্পর্কে খোদ ফয়যীর স্বীকৃতি ও ঘোষণা। তারপরে কুরআনের সমকক্ষতার পক্ষে তাঁর রচনা ও তাঁকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করা বোকামী, ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতায় ছাড়া কিছুই হতে পারে না। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, শেখ সা'দী, কবি ফেরদৌসী এবং ফয়যী প্রমুখের সাহিত্য আল-কুরআনের সাথে চ্যালেঞ্জ করার মত হত, তাহলে তো নবীয়ে উম্মি (সা)—তাঁর জন্য আমার পিতামাতা

উৎসর্গিত হোক-এর অনেক গোলামের গোলামও এদের মত অনেক রচনা এসবের মুকাবিলায় রচনা করে পৃথিবীবাসীর সামনে উপস্থাপন করতেন।

আল-কুরআনের মু'জিযা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

আল-কুরআনের মু'জিযা হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ঃ এই কুরআন হিদায়েতের জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ। অতএব যে ব্যক্তির কুরআনুল করীমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান ও অন্বেষণ করবে, এ গ্রন্থে সে পাবে আকীদা-বিশ্বাস, নেক আমল, সভ্যতা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সামাজিকতা, শাসন পদ্ধতি, রাজনীতি, রূহানী উন্নতি, আল্লাহর পরিচিতি বা মারিফাতের, আত্মশুদ্ধি, শাসন বা নির্দেশনা, ইনসাফ ও সামাজিক ন্যায়বিচার, আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর প্রতি সেই সমস্ত নীতিমালা এবং উপায়- উপকরণ; যার মাধ্যমে লোকেরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে এবং তার হৃদয় ও কণ্ঠে বিনাদ্বিধায় সাক্ষ্য দিবে যে, নিঃসঙ্গেহে আল-কুরআন আল্লাহর কালাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাব। দুনিয়ার সকল আলিম, বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা একত্রিত হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যার এমন ভাণ্ডার উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে না। অথচ নিরক্ষর জাতির একজন নিরক্ষর সদস্য পৃথিবীর সামনে এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ পেশ করেছেন যা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ ও সফলতার নিশ্চয়তা দেয়, স্রষ্টার অধিকার, মানুষের অধিকার, ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়। পৃথিবীর সমস্ত বাতিল ধর্মমত যথা ঃ ইয়াহূদীবাদ, খ্রিস্টবাদ, পৌত্তলিকতা, অগ্নিপূজা ও সাবয়ীত্ব ইত্যাদিকে অকাট্য দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছে। কোন ধর্মেরই কুরআন উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমাণকে অস্বীকার করার সামর্থ্য নেই। এ আলোচনা থেকে কি নিশ্চিতভাবে মনে হয় না যে, আল-কুরআন অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত গ্রন্থ?

আল-কুরআন মু'জিযা হওয়ার তৃতীয় কারণ

আল-কুরআনের প্রতিপক্ষকে অক্ষম করার তথা মু'জিযা হওয়ার তৃতীয় কারণ হচ্ছে। আল-কুরআনে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যার নাম-নিশানও ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা হুবহু বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন ঃ হিজরতের পূর্বে পারস্যদের মুকাবিলায় রোমানদের বিজয়ের খবর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ -

দুই ঃ বদর যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের খবর ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ -

আর ইসলামের বিজয়ের সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ -

ইনশা'আল্লাহ পরবর্তী আলোচনায়ও আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর আলোচনা আসবে। যা হোক, কুরআনুল করীম ভবিষ্যত বিষয়ে যত সংবাদ দিয়াছিল এবং যেভাবে দিয়েছিল, পরবর্তী সময়ে তা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তেমনিভাবে আল-কুরআনে বিগত আম্বিয়ায়ে কিরামের কাহিনী ও পুরানো জাতির ঘটনাবলী সামগ্রিক অবস্থা সমবেতভাবে আলোচিত হওয়া, যেমন সয়্যিদেনা হযরত ইব্রাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ইউসুফ (আ), হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য নবীদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। আর যুলকারনাইন ও গুহাবাসীদের কাহিনী (আস্হাবে কাহাফ)সহ আরও অনেক ঘটনাবলী যেসব ঘটনা আহ্লে কিতাবদের আলিমদেরও পুরোপুরি জানা ছিল না। নিরক্ষর নবী (সা) যখন এসব কাহিনী তাদের সামনে পেশ করেছেন তখন তারা কেউ তা অস্বীকার করতে পারেনি।

পাঠকগণ ও জ্ঞানের উৎসাহী ব্যক্তিগণ যদি বিস্তারিতভাবে কুরআনের ইজাজ বা প্রতিপক্ষকে অক্ষম করার নিয়ম-পদ্ধতি জানতে চান, তা হলে বিখ্যাত লেখক কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী (র) কর্তৃক রচিত 'ইজাযুল্ কুরআন' (اعجاز القران) নামক গ্রন্থ এবং কাযী আয়াযের 'শিফা' গ্রন্থে ইজাজ অধ্যায় অধ্যয়ন করতে পারেন। উর্দূভাষায় এই অধম লেখকও 'ইজাজুল কুরআন' নামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছি, তাও দেখতে পারেন।

নবী (সা)-এর হাদীস আরেকটি মু'জিযা

পবিত্র কুরআনুল করীমের পর নবী (সা)-এর শিক্ষার দ্বিতীয় মু'জিযা হচ্ছে তাঁর হাদীস। অন্যভাবে হাদীসকে শরী'আত ও মিল্লাত নামেও ব্যাখ্যা করা হয়। হাদীসের পূর্ণতা ও ব্যাপকতা দেখে একজন নগণ্য বুদ্ধির ব্যক্তিরও এই বিশ্বাস পয়দা হবে যে, এ ধরনের উঁচু বুদ্ধিবৃত্তিক কথা, প্রকৃতি ও স্বভাব সুলভ বিধান এবং আইন-এর উৎস মহান আল্লাহ আলিমুল হাকীম ব্যতীত সম্ভব হতে পারে না। এককভাবে কোন মানুষ নিজস্ব মেধা দিয়ে হাদীসের মত বক্তব্য দিতে পারে না। বিশেষ করে যেখানে নবী (সা) নিরক্ষর ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি লেখা পড়া জানতেন না। তাঁর ভাষা ও কণ্ঠ থেকে এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ ও বিবেককে জাগানো বক্তব্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ঝরণা কিভাবে জারী হতে পারে ? বরং নিরক্ষর নবীর পবিত্র ভাষা ও কণ্ঠ থেকে যে বক্তব্য প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্য দিয়ে তিনি পর্দার অন্তরালের অদৃশ্য কথাকেই প্রকাশ করেছেন। হযরত মূসা (আ) বৃক্ষ থেকে যে বক্তব্য শুনেছেন প্রকৃতপক্ষে তা বৃক্ষের নিজস্ব বক্তব্য ছিল না, বরং তা মহান রাব্বুল আলামীনের বক্তব্য ছিল। বৃক্ষটি ছিল টেলিফোনের মত মাধ্যম, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার গায়েবী বক্তব্য হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত পৌঁছছিল এভাবে এই নিরক্ষর নবী (সা)-কে (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) বুঝতে হবে। তাঁর পবিত্র ভাষার মুখপাত্র হিসেবে যা বের হত তা ছিল প্রকৃতপক্ষে অহীয়ে রাব্বানী, আওয়াজে ইলাহী। নাউযুবিল্লাহ, তা তাঁর মনগড়া কথা ছিল না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

گفته او گفته الله بود * گرچه ازحلقوم عبد الله بود -

"তাঁর কথা/বাণী প্রকৃত আল্লাহরই বাণী হয়ে থাকে; যদিও তা তাঁর বান্দার (নবীর) মুখ-নিসৃত হয়ে থাকুক।"

আর এজন্যই ইসলামী শরী'আত যেসব বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়, তা কুসংস্কার ও অমূলক ভিত্তিহীন কথা থেকে সম্পূর্ণভাবে পূত-পবিত্র। শুধু তা-ই নয়, বরং তা পরম্পরা সূত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ও স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী যথার্থ প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যার উপর দৃঢ় প্রত্যয় করা যায় যে, তা বাস্তব ও সত্য।

ইসলামী শরী'আত উন্নত চরিত্রের যেসব বিধান দিয়েছে, প্রাচীন আসমানী গ্রন্থে ও পরবর্তী গ্রন্থেও তার নজির পাওয়া যায় না। আর ইসলামী শরী'আত ইবাদত, সামাজিক লেনদেন ও কার্যাবলী এবং কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে যা নির্দেশ দিয়েছে, তা বেশুমার কল্যাণ ও হিকমতে পরিপূর্ণ-হাদীসে মানুষের অধিকার ও আল্লাহর অধিকারের যে ব্যাখ্যা এবং ইহকাল ও পরকালের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত জটিল সমস্যার যে সমাধান শরী'আত পেশ করেছে, তা মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি বিবেক দ্বারা সম্ভব ছিল না। এ ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি হচ্ছে তাওরাত, ইঞ্জিল সহ প্রাচীন ও আধুনিক কোন গ্রন্থই ইসলামী শিক্ষা ও বিধানের মুকাবিলা করতে পারবে না।

পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ নবী, জ্ঞানী, শাসক-রাজা, উলামা বিগত হয়েছেন কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সকল কথা-কাজ, তৎপরতা-নীরবতা যেভাবে বর্ণিত প্রকাশিত সতর্কতার সাথে সংরক্ষিত হয়েছে-এর নজির তাঁদের কারো ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত সংরক্ষণের সাথে জড়িতরা তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম, কথাবার্তা, বর্ণনার ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে তো করেছেনই, উপরন্ত যারা এসব কাজ করেছেন তাঁদের জীবন ও কর্মও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এজন্য 'আসমাউর রিজাল শাস্ত্র' বা ব্যক্তি তথ্য বিজ্ঞান নামে এবং পরম্পরা বিজ্ঞান ও হাদীসের পদ্ধতি বিজ্ঞান বা উসূলে হাদীস নামের শাস্ত্রও রচিত হয়েছে। এসব বিষয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে ঃ মহানবী (সা)-এর হাদীসকে নিশ্চিতভাবে ও নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা। এভাবে তাঁর প্রতিটি কাজকর্ম, বাণী ও অবস্থা দীর্ঘ বর্ণনার পরম পরম্পরের দ্বারা সংরক্ষিত দেখে পাঠকদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস পয়দা হবে যেন তা চাক্ষুস দর্শনের সমতুল্য। ছয়টি শীর্ষ হাদীস গ্রন্থসহ অন্যান্য সহীহ হাদীসের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে যে, কি ধরনের অনুপম ও বিস্ময়কর নৈপুণ্য ও দক্ষতার সাথে এসব গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর হাদীসের ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দেসীন বা হাদীস বিশারদগণ (আল্লাহ তা'আলার তাঁদের কবরকে তাঁর রহমতের নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন) নবী (সা)-এর হাদীস নির্বাচন ও সংগ্রহ, সংকলন, সংরক্ষণের জন্য কি ধরনের পরিশ্রম করে [illegible] প্রণয়ন করেছেন।

মুয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ও ইবন মাজাহ সহ অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাবলী বিশ্বাসীদের সামনে বর্তমান আছে। কোন ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির সামর্থ্য নেই যে, এসব গ্রন্থের হাদীসের একটি শব্দও কমবেশি করতে পারে।

তারপর এসব হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি হাদীসের বর্ণনার মান ও বর্ণনাকারীর অবস্থা ও মর্যাদা সম্পর্কে মূল্যায়ন করে মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন ঃ এই হাদীসটি সহীহ্ অথবা হাসান বা গরীব, (দুর্বল), মুনকার (অপরিচিত) ইত্যাদি।

তারপর লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, নবী (সা)-এর বাণী ও কার্যাবলী যা হাদীস নামে পরিচিত, হাদীসের রিওয়ায়েতকারীদের প্রথম স্তরে ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা)। আল-হামদুলিল্লাহ! তাঁদের অবস্থা ত এই ছিল যে, সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে একজন ব্যক্তিও এমন ছিলেন না তাঁর মধ্যে মিথ্যা লেশমাত্রও থাকতে পারে। সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা (বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক) একলক্ষ চব্বিশ হাজার ছিল। এ বৃহৎ সংখ্যার একটি জামাতের মধ্যে একজন সদস্যের ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত একথা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি মিথ্যা কথা বলেছিলেন। উম্মী নবী (সা) (তাঁর জন্য আমার পিতা মাতা কুরবান হোক)-এর মু'জিযা ছিল যে, তিনি এমন সুসজ্জিত একটি বাহিনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যাঁদের একজন লোকও মিথ্যা কথা বলতেন না। তাঁদের পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের রাবীগণও সাধারণত জীবনে মিথ্যা বলা ও অসাবধানতা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তাঁদের প্রবল বিশ্বাস ছিল নবী (সা)-এর বরাত দিয়ে নিজের কোন কথা বর্ণনা করা মহাপাপ (কবীরা গুনাহ্)।

বর্তমানে দুনিয়ার কোন হযরত মসীহ্ (যিশু)-এর অনুসারী হিসেবে দাবিদারগণ কি বলতে পারবেন তাঁদের বর্ণনার সনদ বা পরম্পরা সূত্র কি ? কোন সূত্রে এবং কাদের মাধ্যমে তাঁরা ইঞ্জিল এবং হাওয়ারীদের পত্র বা প্রবন্ধগুলো পেয়েছেন? বর্ণনাকারী লোকদের পরিচয়ই বা কি? তাঁদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কয়জন এবং তাঁরা কারা ও কতটুকু তাঁদের নির্ভযোগ্যতার মান। অথবা কারা নির্ভরযোগ্য নন্? বস্তুত খ্রিস্টান পণ্ডিত ও পাদ্রীগণ একটি কথাও যুক্ত পরম্পরা সূত্রে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন না। পক্ষান্তরে আমাদের মুহাদ্দিসীনে কিরামের অবস্থা হচ্ছে, সূত্রবিহীন একটি শব্দও তাঁরা নবী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলেন নি। হাদীসের বিখ্যাত গ্রন্থগুলো সেই পরিচ্ছন্ন যুগে সতর্ক, সচেতন ও নির্ভরযোগ্য লোকদের মাধ্যমে সংকলিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। তাঁদের রচনা ও সম্পাদনায় সে যুগেই মানুষ পড়তে, শিখতে ও চর্চা করতে শুরু করে দিয়েছে। আজও সে গ্রন্থগুলো অবিকৃত অবস্থায় পরম্পরা সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষিত লোকেরা তা অধ্যয়ন করছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে, মহান পবিত্র বরকতময় ব্যক্তিত্বের বাণী, গুণাবলী ও কার্যাবলী সংরক্ষণের

জন্য এসব ব্যবস্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে শুধুমাত্র মানুষের চেষ্টা ও প্রচেষ্টায় তাঁর হাদীস সংরক্ষণের জন্য এতবড় ব্যবস্থাপনা– আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সহযোগিতা ও রহমত ব্যতীত সম্ভব ছিলনা, বরং তা খোদায়ী কারিশমাঁ, যা পর্দার অন্তরালে নবীয়ে উম্মী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষরণের জন্য উদিত হয়েছিল। ইল্‌মে হাদীস বা হাদীস বিজ্ঞান এবং এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ও বিদ্যাসমূহর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, গোটা বিশ্বের ইতিহাসে এমন মর্যাদার ইতিহাস দ্বিতীয়টি আর নেই। বস্তুত যে ব্যক্তিত্ব কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির হিদায়েত ও নেতৃত্বের জন্য নির্ধারিত, তাঁর জীবন ও কর্ম, বাণী ও কার্যাবলী এ ধরনের মর্যাদার অবস্থায়ই সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মকে কোন সন্দেহ ও সংশয়ে পতিত হতে হবে না। যারা উম্মী নবী (সা)-এর উপর পবিত্র জীবনকে সরাসরি দেখতে চান, তারা হাদীসের তাঁকে দেখতে পারবেন।

উপরে যে আলোচনা করা হলো, তা কিন্তু নবী (সা)-এর ইজাজ তথা তাঁর হাদীসের মু'জিযার আলোচনা ছিল। যার সাথে হাদীসে রিওয়ায়েতের সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ হাদীসের শব্দাবলীর নজিরবিহীন সংরক্ষণ প্রক্রিয়া বিষয়েই ছিল।

কেউ যদি নবী (সা)-এর হাদীসের মু'জিযাকে রিওয়ায়েত ও ফিকহ হিসেবে দেখতে চান তা হলে তাকে মুজতাহিদ ইমামবৃন্দ এবং ফকীহদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করতে হবে। যেখানে আপনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, ইসলামী শরী'আতের বিধান কতটা গভীর ও সূক্ষ্ম এবং এসব বিধান থেকে প্রয়োজনীয় উপবিধিসমূহ বের করার ক্ষেত্রে উম্মাতের উলামায়ে কিরাম এবং মিল্লাতের ফকীহগণ কি পরিমাণ পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। জীবনের কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায় সহ মেধা-মনন ব্যয় করে শরী'আতের বিধানের পর্যালোচনায় জীবন শেষ করেছেন। তাঁরা যেন এ ঘোষণা দিয়ে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন ঃ

نْه حسنش غايتے دارنه سعدى راسخن پايان
بمير دتشنه مستسقى ودريا همچنيں باقى -

"তাঁর সৌন্দর্যের কোন কুল-কিনারা নেই, শা'দীর বক্তব্য ভাষণেরও কোন সীমা শেষ নেই; (এটি যেমন কিনা) পিপাসায় কাতর ব্যক্তি পিপাসা নিয়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল অথচ সমুদ্র যেমন পানি– ভর্তি ছিল তেমনই রয়ে গেল।"

হযরত নবী (সা)-এর জন্য মুহাদ্দিসীনে কিরাম একটি মু'জিযা স্বরূপ ছিলেন। অন্যদিকে ফকীহ্গণও নবীয়ে উম্মী (সা)-এর আরেকটি মু'জিযা ছিলেন। পার্থক্য এতটুকু ছিল যে, প্রথম মু'জিযা রিওয়ায়েত নামে ছিল আর দ্বিতীয় মু'জিযা দিরায়াত বা বর্ণনা বিষয়ক প্রজ্ঞা ছিল।

মুসলিম উম্মার উলামায়ে কিরাম নবী (সা)-এর তৃতীয় মু'জিযা

সামগ্রিকভাব এ উম্মাতের উলামায়ে কিরাম ও সালেহীন নবী (সা)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের মু'জিযা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত বানিয়েছেন এবং আম্বিয়ায়ে কিরামের উত্তরাধিকারী করেছেন।[১] এ উলামায়ে কিরামকে আল্লাহ তা'আলা এমন অতুলনীয় মেধা, মুখস্থ বিদ্যা ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক ব্যক্তিদের মধ্যে এর সমকক্ষ পাওয়া যায় না। মুহাদ্দিসীনদের ধীশক্তি ও স্মৃতিশক্তি কিরামান-কাতেবীনদের নমুনা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ও ফকীহদেরকে ইজতিহাদ তথা গবেষণার শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন। প্রজ্ঞা, অনুভূতি ও পয়েন্ট শনাক্ত করার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা ও গভীর পর্যবেক্ষণে ঘনিষ্ঠ ফিরিশ্তাদের নমূনা করে বানিয়েছেন। তেমনিভাবে আওলিয়ায়ে কিরাম আরেফীনকে প্রেম-ভালবাসার দৌলত দিয়ে আরশে আযীম ও বায়তুল মা'মূরের দিনরাত্রি তাওয়াফকারী ফিরিশতাকে নমুনা বানিয়েছেন। কোন জাতির মধ্যে ইসলামের উলামায়ে কিরামের মত দক্ষ, যোগ্য মেধাবী পণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তির তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাঁদের সমমর্যাদা ও তাঁদের রচনার সম পর্যায়ের কোন কীর্তি নযরে পড়বে না।

পশ্চিমা জাতি শিল্পপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভিনব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ইঞ্জিল ও তাওরাতের কোন রচনা বুখারী বা মুসলিমের মত নযরে আসে না। যাতে তাওরাত ও ইঞ্জীল আদ্যপ্রান্ত স্মরণে আসে এবং না ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান ও ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র)-এর মত রিজাল শাস্ত্রবিদ ও হাফেয জন্ম নিয়েছে। যে জাতি তাদের নবীগণের গ্রন্থসমূহ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে পরিবর্তন সাধন করেছে। এমন সম্প্রদায়ের মাঝে আহমাদ ইবন হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (র)-এর ন্যায় হাফিযে হাদীস জন্ম নেয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয় এবং না ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ইমাম আযম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মত মুজতাহিদ ফকীহ দৃষ্টিগোচর হয়– যাঁরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, বিশ্বাস ও ইবাদত, মু'আমিলাত ও মু'আশিরাত (সামাজিক আদান-প্রদান ও লেনদেন বিধিমালা, রাজনীতি, ও রাষ্ট্র পরিচালনার মত সকল বিষয়কে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোকে বিন্যস্ত করতে পারেন এবং না আবুল হাসান আশ'আরী, আবূ মানসূর মাতুরিদী ও ইমাম গাযালী ও ইমাম রাযী, এদের মত কোন যুক্তিবিদ্যার পণ্ডিত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। তর্ক ও বিতর্কের মজলিসে যখন বের হতে হয় তখন ইসলামী আকীদার যথার্থতা তুলে ধরার জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল এবং বর্ণনাভিত্তিক প্রমাণসহ উপস্থাপনের জন্য একটি বাহিনী আলিমদের সাথে আছে। বাতিলের গর্দানে তাঁদের যুক্তির তীক্ষ্ণ তীর বিদ্ধ হচ্ছে। এভাবে ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এবং কাফিররা অপমানিত ও পরাজিত হয়েছে। এই খেলা দুনিয়াবাসী প্রত্যেক্ষ করেছে এক

১. দেখুন, যারকানী ঃ শারহে মাত্তয়াহিবে লাদুন্নিয়া

সময়। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবি জুনায়দ, শিবলী, বায়যিদ সহ অন্যান্যদের মত বুযর্গ, আবেদ, যাহিদ ও আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহর অলী প্রেমিক কোন জাতির মধ্যে পয়দা হয়নি।

তেমনিভাবে খলীল ইবন আহমাদ ও সিবওয়াইহ্ এর মত ব্যাকরণ বিষয়ক পণ্ডিত, ইমাম কুসাই, আবদুল কাহের জুরজানী, সা'দ উদ্দীন তাফতাযানীর মত অলংকার শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র এ জাতির মধ্যেই পয়দা হয়েছে, অন্যকোন জাতির মধ্যে এমন পাওয়া যাবে না। আর তাওরাত ও ইঞ্জিলের পুরো কোন হাফেযও পাওয়া যাবে না। তাদের মধ্যে মুসলিম সমাজের উলামায়ে কেরামের মত কোন শ্রেণীও পাওয়া যায় না। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ এবং নাসারা পাদ্রীগণ, হিব্রু বা সুরইয়ানী ভাষায় অথবা ইংরেজি ভাষায় রচিত এমন কোন গ্রন্থ কি দেখাতে পারবেন যা লিসানুল আরব অথবা কামূস, তাজুল উরূস এর মত রচনা হবে ? জামাল উদ্দীন ইবন হাজিব এবং জামীর মত গ্রন্থকারদের কথা আর না-ই বললাম। মীযান-মুনশা'আব, সরফে মীর, নাহ্ব মীর, এ ধরনের প্রাথমিক স্তরের কোন গ্রন্থও ইয়াহূদী পণ্ডিত পাদ্রীগণ রচনা করেছেন কি-না দেখান। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বলা হল, এ থেকে অন্যান্য বিষয় হলো অনুমান করা যাবে।

ইয়াহূদী ও নাসারাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ও চাহিদা এই যে, ইসলামের আলেম উলামা এবং মূসা (আ)-এর শরী'আত ও ঈসায়ী শরী'আতে আলেম ও পণ্ডিতদের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করে দেখুন! শুধুমাত্র শিল্প প্রযুক্তির উন্নতির দিক তাকালে হবে না– কেননা এসব উন্নতি নৈতিক-চারিত্রিক উন্নতি নয়, বরং এসব কারিগরি বিদ্যা। এসবে ধীরে ধীরে উন্নতি হবেই। উল্লেখ্য যে, ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বাস্তব জীবন ও নৈতিকতার উন্নতি মহানবী (সা)-এর শরী'আতের অনুসরণের বরকতে হয়েছে। এটা কি ইসলামের মু'জিযা নয় যে, ইসলামী শরী'আতের অনুসরণের বরকতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে অনন্য উলামায়ে কেরাম ও পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছে, যা অন্য কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না।

৪র্থ মু'জিযা ঃ গায়েবী আওয়াজ, না অনেক গণক জ্যোতিষের কাছেও মরুভূমি এবং পাহাড়ের চূড়া শুনা গেছে যে, এই নবী, তিনি সত্য নবী, তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁকে অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া যাবে। এ ধরনের মু'জিযার বিবরণ বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন 'খাসাইসুল কুবরা' (লেখক ইমাম সুয়ুতী পৃ.১০১-১১০)।

৫ম মু'জিযা ঃ ৫ম মু'জিযা এই যে, বৃক্ষ-পাথর থেকে ঘোষণা আসা যে তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য যেমন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ। হে আল্লাহর রাসূল! তোমাকে সালাম। একবার রাসূলুল্লাহ (সা) গাছকে আহ্বান করেন, তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে গাছ উপস্থিত হয়। আবার যখন ফিরে যেতে হুকুম দিলেন তখন গাছগুলো চলে যায়।

নবী করীম (সা) সম্পর্কে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ভবিষ্যদ্বাণী

সামষ্টিক দলীল হিসেবে তাঁর নবুওয়াতের অন্যতম দলীল হচ্ছে অতীতের নবীগণ আপন উম্মাতের নিকট শেষনবী মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন যে, শেষ যামানার এক পূর্ণাঙ্গ নবী আরবদেশে প্রেরিত হবেন।

আর এজন্য আহলে কিতাবগণ (ইয়াহূদী ও নাসারা) সেই নবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এজন্য অনেক নিষ্ঠাবান আহলে কিতাব আলেম নবী (সা)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত শুনেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবন সালাম (রা) আর অনেক আহলে কিতাবের আলেম নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে থেকেই তাঁর আগমন সুসংবাদ প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁরা নবী (সা)-এর আগমনের সাক্ষ্যও প্রদান করতেন। লোকদেরকে তারা বলে বেড়াতেন যে, শেষ যামানার নবীর আগমনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। অথচ তাদেরই অনেকে প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে নবী (সা)-এর প্রতি আনুগত্য না করে তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগেছিল এবং তাঁর সাথে দুশমনি করতে শুরু করেছিল।

সে কথাই আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاۤءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ -

"আমি যে সকল লোককে কিতাব অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিল দিয়েছি তারা জানে যে, তিনি সেই নবী যার সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। আর আহলে কিতাবগণ তাঁর আকার আকৃতি দেখে তাঁকে তাদের সন্তানদের ন্যায় চেনে। আর নিশ্চয়ই তাদের একদল সত্যকে গোপন করে অথচ তারা তা জানে যে তা সত্য।" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৬)

যদি নবী (সা)-এর নবুওয়াতের সুসংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জিলে না-ই আলোচিত হত তাহলেও ইয়াহূদী এবং নাসারাদের আলেমগণ একত্রিত হয়ে এর গতিরোধ করত। যেসব মজলিসে এ বিষয়ে তিলাওয়াত করা হত ঃ

اَلنَّبِىُّ الْاُمِّىِ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ -

তারা ত তখন প্রকাশ্যভাবে প্রতিরোধ করে বলত যে, কুরআনের এ বক্তব্য মিথ্যা। শুধু তা-ই নয় তারা সকল ইয়াহূদী এবং নাসারাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করত। আর মক্কার মুশরিক যারা ছিল রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রধান দুশমন, তাদেরকেও এ বিষয়ে অবহিত করত। যারা ইয়াহূদী ও নাসারা থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদেরকেও এ বিষয়ের দ্বারা ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালত। অথচ তিনি ইয়াহূদীদের শিক্ষালায়ে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, আমি সেই নবী যার ঘোষণা তাওরাত ও ইঞ্জীল

দেয়া হয়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা নবী (সা)-এর এসব সুসংবাদ বিষয়ে নিশ্চিত ও পূর্ণআস্থাশীল ছিলেন।

ইতিহাস গ্রন্থ ও নবী জীবনী পুস্তক থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায় যে, উল্লেখিত বিষয়টি অধিকাংশ ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতের অতীতের আসমানী কিতাবে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্ম ও নবী হিসেবে আবির্ভাবের সময় জানা ছিল।

১. অতএব তৎকালীন ইয়ামেনের শাসক সাইফ যী ইয়াযন আবদুল মুত্তালিবকে নবী (সা) এর জন্মের কিছুকাল পূর্বে জানিয়েছিলেন যে, আপনার বংশে শেষ যামানার নবী পয়দা হবেন।

২. তাঁর বার বছর বয়সে তাঁকে নিয়ে আপন চাচা আবূ তালিব সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে এক নাসারা আলেম বুহায়রা পাদ্রী বালক মুহাম্মদ (সা)-কে দেখে আবূ তালিবকে বলেছিলেন, তোমার ভাতিজাকে সতর্কতার সাথে রাখবে, সে শেষ যামানার নবী হবে। আমি আসমানী কিতাবে শেষ যামানার নবীর যত নিদর্শন দেখেছি, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। ইয়াহূদীরা তাঁর জীবনের জন্য হুমকী স্বরূপ দুশমন হবে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩. দ্বিতীয়বার তিনি ২৫ বছর বয়সে সিরিয়ায় সফর করেন। সে সময়ও পাদ্রী নাস্তুরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করে সফরসঙ্গীদেরকে বলেছিলেন, এ ব্যক্তি শেষ যামানার নবী হবেন। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে শেষনবীর যে সব আলামত লিখিত আছে, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব ঘটনাও এ গ্রন্থের প্রথমদিকে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৪. নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন হযরত খাদীজা (রা) নবী (সা) কে তাঁর চাচাত ভাই ওরাকা ইবন নওফাল-এর নিকট নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তিনিও বলেছিলেন যে, এতো শেষ যামানার নবী, যার সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটির আলোচনাও বইয়ের প্রথমে গিয়েছে।

৫. হযরত সালমান ফারসী (রা) প্রথম জীবনে অগ্নিপূজক ছিলেন। তারপর তিনি সেধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী হয়েও তিনি হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাননি। তাই তিনি ইয়াহূদী ধর্মে বর্জন করে ঈসায়ী হয়ে যান। ঈসায়ী আলেমগণ শেষ যামানার নবী সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা তিনি ভালভাবে স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন। হযরত নবী (সা) যখন মদীনা শরীফে হিজরত করে আগমন করেন তখন নবী (সা)-এর খবর জানতে পেয়ে হযরত সালমান ফারসী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। তিনি হযরত নবী (সা)-এর পবিত্র নূরানী চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইনিই শেষ যামানার নবী যাঁর ব্যাপারে আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আসছিলাম। এ ঘটনাটিও পূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৬. তৎকালীন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীও পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলিয়ে দেখে নবী (সা)-কে শেষনবী হিসেবে গ্রহণ করেছেন ও মুসলমান হয়েছেন। এ ঘটনাটিরও ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৭. ৭ম হিজরীতে নবী (সা) যখন রোম সম্রাট হিরাকল কায়সারের নিকট ইসলামের দাওয়াত জানিয়ে পত্র লিখেছিলে, তখন কায়সার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অবস্থা জানতে চেয়ে যখন অবগত হলেন তখন তিনিও স্বীকার করলেন যে, ইনিই শেষ যামানার নবী, যে সম্পর্কে অতীতের আসমানী কিতাবে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। যার জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। এ কাহিনীও পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী

প্রথমে আমরা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুসংবাদগুলো উল্লেখ করব। এটাকে ভাল মনে করা হচ্ছে যে, আমরা প্রথমে সত্য সন্ধানী পাঠককে সতর্ক করার জন্য কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেতে চাই যাতে তারা আহলে কিতাবদের দ্বারা প্রতারিত না হয়।

প্রথম বিষয়

ইয়াহূদী ও নাসারাদের এটি অন্ধবিশ্বাস যে, কোন নবীর নবুওয়াত প্রমাণ করার জন্য শর্ত হল পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক তাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী থাকতে হবে এবং আগত নবীর আলামতসমূহও লোকদেরকে অবহিত করা হবে। নবুওয়াতের দাবিদার, যে নবীর মধ্যে এসব আলামত পাওয়া পাওয়া যাবে, তাকে সত্য নবী মনে করা হবে। অন্যথায় তাঁকে মিথ্যা নবী মনে করা হবে। আর ইয়াহূদী ও নাসারাদের আলেমগণ তাঁদের নিজস্বভাবে নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বলেন যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী বা সুসংবাদ নেই। ইসলামের উলামায়ে কিরাম যেসব ভবিষ্যদ্বাণী নবী (সা)-এর জন্য পেশ করে থাকেন তা হযরত নবী (সা)-এর জন্য প্রযোজ্য নয়।

১. ইসলামের পণ্ডিতদের বক্তব্য হচ্ছে প্রথমত, মাপকাঠির এই মনগড়া সূত্রই ভুল, কেননা নবুওয়াত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য সাবেক নবীর পরবর্তী নবীর ব্যাপারে খবর দেয়া জরুরী বিষয় নয়। যদি পরবর্তী নবীর নবুওয়াত পূর্বের নবীর খবরের উপর নির্ভরশীল হত তা হলেও আবার পূর্ববর্তী নবীর নবুওয়াত পরবর্তী নবীর সত্যায়নের ওপর নির্ভরশীল হতো। এভাবে নির্ভরশীলতার এক অবারিত ধারাবাহিকতা অনিবার্য হয়ে পড়তো।

২. হযরত হিযকিল ও হযরত দানিয়াল এবং হযরত আশ্‌ইয়াসহ অন্য কয়েকজনের নবী হওয়ার বিষয়টি আহ্‌লে কিতাবদের নিকট স্বীকৃত বিষয়। তাদের কারো সংবাদই পূর্বের আসমানী কিতাবে ছিল না। এ থেকে বুঝা গেল, নবুওয়াত নির্ভর করে মু'জিযা ও নবুওয়তের নিদর্শনের উপর। অবশ্য পূর্বের নবী পরবর্তী নবী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান

পরবর্তী নবীর জন্য সম্মানজনক বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। তবে এক্ষেত্রে হযরত নবী (সা)-এর ব্যাপারে সাবেক আম্বিয়ায়ে কেরামের সুসংবাদ ইনশাল্লাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান থাকায় বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

৩. নাসারা আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, সাবেক আম্বিয়ায়ে কেরাম হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর আগমন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। কিন্তু ইয়াহূদী পণ্ডিতদের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সবাই তা অস্বীকার করেন। আর খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ হযরত মসীহের ব্যাপারে সাবেক নবীদের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেন। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ তাকেও ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং তা হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করেন। অতএব ইয়াহূদীরা যেমন হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করে, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীকেও অস্বীকার করা হয়।

৪. আর সাবেক নবী পরবর্তী নবী সম্পর্কীয় সংবাদে এটা জরুরী নয় যে, আগত নবীর গুণাবলী, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করবেন যে, তাঁকে দেখেই সাধারণ মানুষ ও বিশেষ শ্রেণী সকলেরই তাঁর উপর আস্থা এসে যাবে। বস্তুত বিষয়টি যদি এতই সহজ ও সরাসরি হওয়ার অবকাশ থাকে তাহলেও মু'জিযা ও নবুওয়াতের নিদর্শনাবলী এবং প্রমাণ-দলীলের কোন প্রয়োজন ছিল না।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ বনী ইসরাঈলের অনেক নবী যেমন ঃ আশইয়া, আরমিয়া, দানিয়াল, হিযকিল ও হযরত ঈসা (আ) অনেক ভবিষ্যত ঘটনাবলী সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছেন। বখতে নসর, ফুরেশ, আলেক্‌জান্ডারসহ অনেক কিছু সংঘটিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তেমনিভাবে রোম, মিসর, কাবুল সহ অন্যান্য শহর ও জনপদে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। স্বাভাবিক বিবেক এ বিষয়টি অসম্ভব মনে করে যে, যেখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম এ ধরনের ছোটখাট বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। সেখানে বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না। কেননা মহানবী (সা)-এর আগমন ও নবুওয়াত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। এ থেকে বুঝা যায়, আম্বিয়ায়ে কেরাম অবশ্যই বিশ্বনবী (সা)-এর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীতে আহলে কিতাবগণ তাদের কিতাব থেকে তা বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তারপরেও তাদের কিতাবে যতটুকু বর্তমান রয়েছে তাতেও তারা ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্বনবীর জন্য প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করতে চেষ্টা করছে।

তৃতীয় বিষয় ঃ নাসারাদের দাবি হল, হযরত ঈসা (আ) শেষ নবী ছিলেন। তাঁর পরে আর কোন নবী আসা অসম্ভব। আর মুসলমানদের বক্তব্য হচ্ছে, নাসারাদের এ দাবি সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন।

১. হযরত ঈসা (আ) নিজে কখনো বলেন নি যে, আমি শেষনবী, আমার পরে কোন নবী আসবে না। ইঞ্জিলে কোথায়ও নেই যে, হযরত ঈসা (আ) শেষনবী।

২. আর হযরত ঈসা (আ) এ কথাও বলেননি যে, আমার আসমানে চলে যাবার পর কোন সত্যনবী আসবেন না; বরং তিনি তারপর একজন মহান রাসূল আসার অর্থাৎ 'ফারকালীত' -এর সুসংবাদ দিয়েছেন, তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। এজন্য আহলে কিতাবের পণ্ডিতগণ ফারকালীতের আগমনের অপেক্ষায় ছিল, কেননা তাঁর প্রতিশ্রুতি ইঞ্জিলে রয়েছে। এ পেক্ষাপটে মুন্টানাস নিজকে প্রকৃত ফারকালীত দাবি করেছে এবং অনেক লোক তার অনুসরণও করেছে।

৩. শুধু তাই নয়, নাসারাগণ হাওয়ারী ও পুলুসকে নবী বলে মনে করে অথচ তাঁদের সকলেই ঈসা (আ)-এর পরে বর্তমান ছিল।

৪. ইঞ্জিলের কিতাবুল আ'মাল অধ্যায়ের একাদশ অনুচ্ছেদে লেখা আছে ঃ

২৭ ঃ সে সময় কয়েকজন নবী জেরুজালেম থেকে এন্তাকিয়া আগমন করবে।

২৮ ঃ তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'আগবস' সে দাঁড়িয়ে আত্মার নির্দেশনায় ব্যক্ত করল যে, সমস্ত পৃথিবীতে আকাল আসবে আর তা কালুদিস (রোম সম্রাট বা কায়সারের) যুগে সংঘটিত হবে।

এখানে ইঞ্জিলের বক্তব্য থেকে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, জেরুজালেম থেকে এন্তাকিয়ায় কয়েকজন নবী আগমন করবেন, যাদের একজনের নাম আগবাস, আরবী কপিতে আগাবুস ছিল। বিষয়টি দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, এ ঘটনা হযরত ঈসা (আ)-এর পরেই হয়েছিল। অতএব যখন হযরত ঈসা (আ)-এর পরে নবী হওয়া প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আর হযরত ঈসা (আ) শেষনবী হতে পারেন না।

৫. আর মথির ইঞ্জিলের সপ্তম অধ্যায়ের ১৫ নং অনুচ্ছেদে হযরত মাসীহের শিক্ষা ও নির্দেশনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, "তোমরা ভণ্ড নবীদের থেকে সাবধান থাকবে।" এ প্রসঙ্গে বক্তব্য দীর্ঘ হয়েছে। যেখানে হযরত মাসীহ সতর্ক করেছেন যে, আমার পরে অনেকে নবুওয়াতের মিথ্যাদাবি করবে এবং তারা আমার নামেও মিথ্যা নবুওয়াতের দাবি করবে, অর্থাৎ তারা এভাবে বলবে যে, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ্। (যেমন ঃ কাদিয়ানের এক ভণ্ড বলেছে, আমি প্রতিশ্রুত মাসীহ্)। তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। কেননা তারা ভেতরে হিংসা রাখে। হযরত মাসীহ (আ) সতর্ক করেছিলেন যে, আমার পরে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের ধোঁকায় পড়বে না। তিনি কিন্তু এভাবে বলেননি যে, আমার পরে কোন নবী আসবে না, বরং তিনি নবুওয়াতের দাবিদারদেরকে পরীক্ষা করে সত্য-মিথ্যা বাছাই করতে বলেছেন। তারপর ইউহানার পত্র অধ্যায়ের ৪র্থ অনুচ্ছেদে আছে "হে প্রিয়, তুমি প্রতিটি রূহকে বিশ্বাস করবে না বরং রূহকে পরীক্ষা করবে, সে-কি খোদার পক্ষ থেকে না-কি অন্য কিছু, কেননা অনেক মিথ্যা নবী পৃথিবীতে এসে দাঁড়িয়েছে......।" মোটকথা এই যে, নাসারাদের মূল শিক্ষা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হল যে, হযরত ঈসা (আ) শেষনবী ছিলেন না।

৪র্থ বিষয় ঃ নাসারাগণ বলে থাকে, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতা দাসী ছিলেন। অতএব বংশ মর্যাদায় ও আভিজাত্যে বনী ইসমাঈল বনী ইসরাঈলের সমকক্ষ হতে পারে না।

তাদের এ ধরনের আপত্তির জবাব হচ্ছে ঃ

প্রথমত ঃ ইয়াহূদীদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় আছে, হযরত হাজেরা মিসরের বাদশাহ কোন এক ফেরাউনের কন্যা ছিলেন, দাসী বা চাকরাণী ছিলেন না। তাওরাতের নির্ভরযোগ্য মুফাস্‌সির শালুমালু ইসহাক জন্ম কিতাবের ১৬ অধ্যায়ের প্রথম আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন.........

"অর্থাৎ যখন মিসর অধিপতি সারা -এর কারণে প্রকাশিত কারামত প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমার মেয়ে অন্য ঘরে রাণী হয়ে থাকার চেয়ে তাঁর গৃহে (হযরত সারার) দাসী হয়ে থাকা উত্তম।"[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল, হযরত হাজেরা প্রকৃতপক্ষে দাসী বা চাকরাণী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মিসরের ফিরাউনের কন্যা যাকে বাদশাহ হযরত সারার খেদমতে দান করেছিলেন। যখন বাদশাহ হযরত সারার কেরামতি দেখেন তখন তার বিশ্বাস জন্মে যে, হযরত সারা ও তাঁর স্বামী হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। এজন্য বাদশাহ হযরত সারার খুব সম্মান ও ইযযত করেছেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার জন্য নিজ কন্যা হযরত সারাকে দান করেন। এভাবে তৎকালীন সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী ২য় স্ত্রী প্রথম স্ত্রীয় খেদমত করার সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয় জবাব ঃ তিনি যদি দাসীও থেকে থাকেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। হযরত ইউসুফ (আ)-কেও ত গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। বিশেষ করে যেখানে তাওরাতে দু'টি প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ আছে, একটি ইসমাঈলী প্রতিশ্রুতি ও আরেকটি হল ইসহাকী প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ তা'আলা দু'জনের জন্যই বরকত প্রদানের কথা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানিয়েছিলেন। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বিজয় সন্তানদের মধ্যে বরকত এবং মর্যাদাবান উম্মাতের প্রতিশ্রুতি তাওরাতের ভাগ্য (তাভীন) অধ্যায়ের এবং ৩য় অধ্যায়ে কর্মসমূহে (আমাল) স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, **"বনী ইসমাঈলে একজন আজীমুশ্‌শান নবী আবির্ভূত হবেন।"** তারপরেও আল্লাহ তা'আলার বরকতের ওয়াদাকে উল্লেখ না করে গোপন করা এবং কাল্পনিক ত্রুটিকে প্রচার করে বেড়ানো বিবেকের দৃষ্টিতে ও ঐতিহাসিক বর্ণনায় অপরাধ।

---

১. আরদুল কুরআন, সুলায়মান নদভী, ২ খ. পৃ.৪১ এবং কাসাসুল কুরআন, হিফযুর রহমান, ১ খ, পৃ.৯০।

নাসারাদের উচিত রুমবুলুস দারুমস এবং অগস্টাস-এর ছেলেদের কথা মনে করে লজ্জিত হওয়া, অন্যদিকে যিহুদা ও জন ওরইয়ার অবস্থা যাকে হযরত মসীহের দাদা হিসেবে তারা উল্লেখ করে থাকে তার অবস্থা সম্পর্কে সামান্য খেয়াল করলেও তারা লজ্জায় মাথা তুলতে পারবে না। নাউযুবিল্লাহ! ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতগণের অবস্থা অবাক হবার মত যে, তারা হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম, যার সম্পর্কে হযরত মাসীহের বংশ পরম্পরায় দাদা পরদাদা বা পূর্ব পুরুষ হন তাদের প্রতি শিরক, মূর্তিপূজা মদ্যপান এবং যেনা-ব্যভিচারের মত অপবাদও আরোপ করে থাকে। আর এ বিষয়কে অপমান ও অপবাদ হিসেবেও মনে করে না। পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাতার হযরত হাজেরার খাদেমা হওয়াকে অপমানকর হিসেবে মনে করে। এখানে আমরা পূর্ববর্তী নবীদের হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণী থেকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত কিছু ভবিষ্যদ্বাণী নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করতে চাই। (পাঠকগণ যদি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হন তাহলে ফার্সী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'ইযালাতুল্ আওহাম' এবং আরবী ভাষায় 'ইযহারুল হক' লেখক মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানাভী, যিনি মক্কা মুয়াযযামার সুলুতিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁর গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।)

সংক্ষিপ্ত সার

হযরত হাজেরা মিসরের শা'সকের কন্যা ছিলেন। বাদশাহ হযরত সারার বুযর্গী দেখে তাঁর খেদমত করার জন্য তাঁকে পেশ করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে নিয়ম ছিল যে, আমীরদের যদি কন্যা উপহার দেয়া হত, তারা সেবিকা হত। এজন্য সহীহ বুখারীতে হাদীসের শব্দ এভাবে এসেছে ঃ তাঁকে হাজেরার খেদমতে দেয়া হল। নাসারাগণ কর্তৃক সেবিকাকে সরাসরি দাসী বলে অনুবাদ করে দেয়া স্পষ্ট বে-ইনসাফী।"

প্রথম সুসংবাদ (তাওরাত সফর ইস্তিসনা ঃ অধ্যায় ১৮ শ্লোক বা আয়াত ১৮)

১৮ ঃ "মহাপবিত্র প্রভু আমাকে বলেছেন ঃ তারা যা বলেছে উত্তম বলেছে। আমি তাদের জন্য তাদের ভাইদের মধ্যে থেকে তোমার মত নবী প্রেরণ করব এবং আমার কালাম তার মুখ দিয়ে প্রকাশ করব। আমি তাকে যা বলব সে-তাই প্রকাশ করবে।" ১৯ ঃ "আর সে ব্যক্তি এমন হবে যে, আমার কথা যা সে আমার নামে ব্যক্ত করবে তা মান্য করবে না, আমি তার হিসাব নেব।"

২০ ঃ "যে নবী এ ধরনের ধৃষ্টতা দেখাবে যে, আমি তাকে যা বলিনি সে আমার নামে তা বলবে, এমনটি করলে তাঁকে হত্যা করতে হবে।"

২১ ঃ "যদি তুমি মনে কর যে, আমি কিভাবে জানব যে এ কথা আল্লাহর কথা নয়, তাহলে তুমি জেন রাখ, যখন নবী আল্লাহর নামে কিছু বলে তা সে যা বলেছে তা যদি বাস্তবে না হয় তা হলে বুঝতে হবে তা আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য নয়।"

ইসলামের অনুসারীগণ মনে করে থাকেন যে, উল্লিখিত সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় প্রযোজ্য। আর ইয়াহূদীরা মনে করে থাকে যে, এসব বক্তব্য ইউশার বেলায় প্রযোজ্য, আর নাসারাগণ মনে করে থাকে যে, এগুলো হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য প্রযোজ্য। সত্য হচ্ছে, এসব বক্তব্য শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা এ সুসংবাদ ত ঐ নবীর জন্য হবে যিনি হযরত মূসা (আ)-এর সমকক্ষ পর্যায়ের হবেন এবং বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন না, বরং বনী ইসরাঈলের ভাই অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে থেকে হবেন। আর সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীতে আগত নবীর গুণাবলীর কথাও আলোচিত হয়েছে। এজন্য মুসলমানগণ মনে করেন, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কেউ নন।

প্রথম যুক্তি হল ঃ এ সুসংবাদে উল্লেখ আছে যে, আমি বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য হতে তোমার সমকক্ষ একজন নবী প্রেরণ করব। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সে নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। এ বিষয়ে ঘোষণা এক-দুই ব্যক্তির জন্য ছিল না, বরং বনী ইসরাঈলের সব শাখা ও সম্প্রদায়ের জন্য ছিল। এ ঘোষণা সমগ্র বনী ইসরাঈলের জন্য সামগ্রিকভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ সমস্ত বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার ন্যায় এক নবী প্রেরণ করব। এ থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সে নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। যদি নবী ইসরাঈল থেকে হবেন তা হলে এভাবে বলা হত যে, তোমাদের মধ্য হতে একজন নবী হবে।

এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ

"আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪)

লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে এভাবে বলা হয়নি যে, তোমাদের মধ্য হতে সে নবী আবির্ভূত হবেন। যেভাবে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ

বস্তুত হযরত মূসা (আ) সমস্ত বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে ঘোষণা করেছেন এবং কোন বিশেষ শর্তকে সম্পৃক্ত না করে এভাবে বলে দিয়েছেন যে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে সে প্রতিশ্রুত নবী আসবেন। একথা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈদের ভ্রাতৃপ্রতিম বংশ বনী ইসমাঈলে হবেন। কেননা বনী ইসমাঈল বনী ইসরাঈলের ভাই। নাসারাগণ বলে থাকে, 'বনী ইসরাঈলের ভাইদের মধ্য থেকে বলে বনী ইসরাঈলই বুঝানো হয়েছে, নাসারাদের একথা, ভাষা, যুক্তি,

বিজ্ঞান সব কিছুরই পরিপন্থি। যেমন ঃ যখন বলা হয় 'যায়দের ভাই' তখন যায়েদ নিজে কি ভাইদের মধ্যে শামিল থাকবে? না, যায়দ ভাইদের মধ্যে শামিল নয়, বরং যায়দ আলাদা। ব্যাকরণ অনুযায়ী যায়দের ভাই যায়দ থেকে আলাদা। পৃথিবীতে কোথাও এই প্রচলন নেই যে, কেউ নিজে নিজেকে ভাই বলে বা নিজের ওপর ভাই শব্দের ব্যবহার করে। তাই বনী ইসরাঈলের ভাই বলে বনী ইসরাঈল অর্থ করা মুর্খতা ও বোকামী ছাড়া কিছু হতে পারে না। আরও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যেমন ঃ বলা হয়-যায়দ বনী তামীমের ভাই, হূদ সম্প্রদায় আ'দ সম্প্রদায়ের ভাই, সালেহ সম্প্রদায় সামূদ সম্প্রদায়ের ভাই। তবে এভাবে বলা হয় না যে, আ'দ সম্প্রদায় আ'দের ভাই, সামূদ সম্প্রদায় সামূদের ভাই, বনূ হাশিম বনূ হাশিমের ভাই। তেমনিভাবে বনী ইসরাঈল বনী ইসলাঈলের ভাই এভাবে বলা অশুদ্ধ ও মূর্খতা এবং বোকামী। এজন্য বনী ইসরাঈলদের ভাইদের মধ্যে বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝানো বা তাদের বংশধর ও প্রজন্মকে বুঝানো পুরোপুরি বোকামী। আর বাইবেলের জন্ম পুস্তকের ১৬ অধ্যায়ের ১৩ অনুচ্ছেদে বনী ইসরাঈলের মুকাবেলায় হযরত ইসমাঈল (আ) এবং তাঁর সন্তানদের প্রসঙ্গে এভাবে আলোচনা করা হয়েছে ঃ

১৩ ঃ "তিনি তাঁর সকল ভাইদের সামনে জীবন যাপন করবেন।" আর তাওরাতের জন্ম সফরের ২৫ অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

"হযরত ইসমাঈল (আ) তার সকল ভাইদের বর্তমানে মৃত্যুবরণ করেছেন।"

এখানে দুই বক্তব্যেরই বনী ইসমাইলের ভাইয়েরা বলতে বনী আয়স ও বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে সকলে একমত। অন্যদিকে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এ বিষয়েও একমত যে, শুধুমাত্র বনী আয়স-এর মধ্যে কেউ নবী হননি। এ বিষয়ে তাদের দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যেসব সন্তান কাতূরার গর্ভ থেকে হয়েছে, তাদের মধ্যে কাউকে নবুওয়াত ও বরকত -এর কোন ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা করেননি। আর হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বরকতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

আহলে কিতাবদের একটি বিকৃতির উল্লেখ

আহলে কিতাবের পণ্ডিতগণ এ সুসংবাদে একটি শব্দ সংযোজন করেছেন। তা হল "আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমার ভাইদের মধ্য হতে তোমার সমকক্ষ বা তোমার মত একজন নবী প্রতিষ্ঠা করবেন।" (দেখুন এ অধ্যায়ের ১৫ অনুচ্ছেদ)। (এ শব্দ বৃদ্ধির কারণ হল) যেন এ সুসংবাদ হযরত নবী করীম (সা)-এর সত্যায়ন বলে গণ্য না হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'তোমাদের মধ্যে' শব্দটি পরবর্তী সময়ে সংযোজিত হয়েছে। এ বিকৃতির প্রমাণ হল ঃ তাওরাতের সফর অধ্যায়ে ১৮ অনুচ্ছেদে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে যা বলেছেন– তাতে কথাটি এভাবে আছে যে, "আমি তাদের ভাইদের মধ্য হতে তোমার মত একজন নবী নাযিল করব।"

এখানে 'তোমাদের মধ্যে' শব্দটি নেই। তেমনিভাবে কর্ম অধ্যায়ে তৃতীয় অনুচ্ছেদের ২২ নং বাক্যেও এ বিষয়ের আলোচনা আছে। সেখানে 'তোমাদের মধ্য' শব্দটি নেই। আর হযরত মাসীহের হাওয়ারীগণ যেখানে এ বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন, তারাও কিন্তু কোথায়ও এবাক্য অর্থাৎ 'তোমাদের মধ্যে' কখনো উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায়, বিষয়টি পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছে।

যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ শব্দটি সংযোজিত নয়, তবুও এর অর্থ ত এরূপ হতে হবে যে, তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত-গুযার লোকদের মধ্যে হতে আর তার অর্থ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকে হবে।

সারকথা ঃ হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের ১২টি বংশের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবীকে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করবেন। একথা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈল থেকে হবে না। যদি বনী ইসরাঈল থেকে প্রতিশ্রুত নবী হবার ইচ্ছা থাকত তাহলে এভাবে ঘোষণা হত যে, তাদের মধ্যে অথবা তাদের প্রজন্ম থেকে নবীর আগমন হবে। এমন ক্ষেত্রে ভাইদের মধ্য থেকে শব্দের প্রয়োজন ছিল না। ভাইদের মধ্য থেকে হবে বলে বলিষ্ঠ ঘোষণা এ কথাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, প্রতিশ্রুত নবী তাদের পরবর্তী বংশধারা ও রক্তধারায় হবে না।

হযরত ইউশা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) দু'জনই বনী ইসরাঈলী ছিলেন। তাঁরা বনী ইসরাঈলের ভাইদের অর্থাৎ বনী ইসমাঈলের মধ্যে থেকে ছিলেন না। এজন্য তাঁরা দু'জন সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তব রূপ হতে পারেন না। সেই প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তবরূপ শুধুমাত্র সেই নবীই হতে পারেন যিনি বনী ইসমাঈলের হবেন। বনী ইসরাঈলের নবীগণ এই সুসংবাদের লক্ষ্য হতে পারেন না।

দ্বিতীয় কথা ঃ এ সুসংবাদে উল্লেখ আছে, "তোমাদের মত একজন নবী প্রেরণ করব।" আর হযরত ইউশা (আ) হযরত মূসা (আ) এর মত ছিলেন না। এবং হযরত ঈসা (আ)ও হযরত মূসা (আ) এর মত ছিলেন না। বরং তারা দু'জনই ছিলেন বনী ইসরাঈলী। তাওরাতের সফর অধ্যায়ের ৩৪ পাঠে আছে ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত মূসা (আ)-এর মত আর কেউ ছিল না আর হবেও না।"

শুধু তা-ই নয়, হযরত ইউশা (আ) হযরত মূসা (আ)-এর শিষ্য ছিলেন। মুরব্বি ও অনুসারীকে সমকক্ষ মনে করা হয় না। অন্যদিকে হযরত ইউশা হযরত মূসা (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আর সুসংবাদে রয়েছে, আমি একজন নবী প্রেরণ করব এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেই নবী ভিন্ন এক সময়ে আবির্ভূত হবেন। হযরত ইউশা হযরত মূসা (আ)-এর যমানায়ই নবী হয়েছিলেন। অতএব তিনি সুসংবাদের বাস্তব রূপ কিভাবে হতে পারেন?

এতে প্রমাণিত হল হযরত ঈসা (আ)ও হযরত মূসা (আ)-এর মত ছিলেন না। নাসারাদের নিকট ত হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র অথবা তিনি নিজেই খোদা আর হযরত মূসা (আ) হলেন আল্লাহর বান্দা, তিনি আল্লাহর পুত্রও নন্ অথবা আল্লাহও নন। এজন্য হযরত মূসা (আ)-এর মত হযরত ঈসা (আ) (অন্তত) তাদের ধারণা অনুযায়ী সমকক্ষ হতে পারেন না।

পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস হচ্ছে হযরত ঈসা (আ) শূলীতে নিহত হয়ে নিজ উম্মাতের অপরাধ মোচনের দায়িত্ব নিয়েছেন আর হযরত মূসা (আ) না শূলিতে নিহত হয়েছেন আর না তিনি উম্মাতের অপরাধের দায়ভার গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর শরী'আতে তিনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি, যিনার শাস্তি, বিচার ব্যবস্থা, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গোসল, পবিত্রতা, এসব বিধি-বিধানের ব্যাপারে নীরব রয়েছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতে এসব বিষয়ের আলোচনা আছে। এজন্য হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতের সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর শরী'আতের মিল রয়েছে। হযরত মূসা (আ) যেমনিভাবে আলাদা শরী'আতের প্রবর্তক ছিলেন, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)ও আলাদা শরী'আতের প্রবর্তন করেছেন। আমাদের নবীর শরী'আতে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ, দণ্ডবিধি, শৃংখলাবোধ, সতর্কতাবিধি, জিহাদ, মৃত্যুদণ্ড, হারাম-হালালের বিধিসহ সব ধরনের এবং সব বিধি বিধান ও নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রকাশ্য-সূক্ষ্ম সব বিধান ও ব্যবস্থা রয়েছে।

হযরত মূসা (আ) যেভাবে তাঁর উম্মাত তথা বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের খপ্পর থেকে মুক্ত করে ইযযত ও মর্যাদাবান করেছেন, তেমনিভাবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরব জাতি তথা তাঁর উম্মাতকে রোম ও পারস্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বাণী শিক্ষা দিয়েছেন। কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডারের মালিকানা মুসলমানদেরকে অর্পণ করেছেন। আর যেভাবে হযরত মূসা (আ) ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহ করে পারিবারিক জীবন গড়েছিলেন, তেমনিভাবে আমাদের নবী (সা) পূর্ববর্তী নবীদের নিয়মধারা অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। এ সাদৃশ্য বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً -

"আমি তোমাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, তোমাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদানকারী হিসেবে। যেমনিভাবে আমি ফিরাউনের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম।" (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৫)

আরও দেখার বিষয় হচ্ছে ঃ হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইউশা (আ) কিন্তু কখনো সমকক্ষ বা সাদৃশ্যের দাবি করেননি। আর যদি বলা হয় সমকক্ষ হবার অর্থ হল যে, প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈলে হবে, তখন বলা যায়, তা হলে হযরত ঈসা (আ)

এবং হযরত ইউশা (আ)-এর বিশেষত্ব কি ? হযরত মূসা (আ)-এর পর বনী ইসরাঈলে হাজার হাজার নবী আগমন করেছেন। তাহলে প্রত্যেক নবীই ত প্রতিশ্রুত নবীর বাস্তব নমুনা হতে পারেন। আর হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইউশা (আ)-এর জন্য যদি কোন পর্যায়ে সমকক্ষতা সাব্যস্ত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে আমাদের নবী (সা)-এর মধ্যে হযরত মূসা (রা)-এর সাথে মিল আছে এরকম মিল সেখানে পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় ঃ উক্ত সুসংবাদে এতটুকু কথাও উল্লেখ আছে যে, "আমি তাঁর মুখে আমার বাণী (নিক্ষেপ) প্রেরণ করব।" অর্থাৎ সেই নবীর নিকট তাওরাত ও যবূরের মত লিখিত কিতাব নাযিল হবে না, বরং আল্লাহর ফিরিশতা মারফত অহী নাযিল হবে এবং তিনি নিরক্ষর নবী হবেন। ফিরিশতা থেকে শ্রবণ করে আল্লাহ তা'আলার কালাম মুখস্ত করবেন। নিজের মুখে পড়ে তিনি উম্মাতকে অহী শুনাবেন। এসব কথার বাস্তব উদাহরণ আমাদের নবী (সা) (তাঁর জন্য আমাদের পিতামাতা কুরবান হোক) ছাড়া আর কারো জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"তিনি নিজের থেকে কোন কথা বলেন না, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ওহীই তিনি বর্ণনা করেন।" (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)

চতুর্থ ঃ সে সুসংবাদে এ বিষয়টিও ভালভাবে রয়েছে যে, যারা উক্ত প্রতিশ্রুত নবীকে অমান্য করবে, তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখানে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা পরকালের শাস্তির অর্থে বুঝানো হয়নি, কেননা যে কোন নবীকে অমান্য করলেই পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এজন্য দুনিয়ার শাস্তি প্রতিশ্রুত নবীর অমান্যকারীর ক্ষেত্রে সে নবীর বিশেষ মর্যাদা হিসেবে দেখা হয়। বরং দুনিয়ার শাস্তির ক্ষেত্রে জিহাদ, কিতাল (যুদ্ধ) দণ্ডবিধি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অর্থে বুঝানো হয়েছে। আর এ বিষয়টি হযরত ঈসা (আ) এবং হযরত ইউশা (আ)-এর বেলায় প্রযোজ্য ছিল না, বরং শেষনবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বেলায় এসব বিষয়ে ও শর্তাবলী পুরোপুরিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তব ছিল।

পঞ্চম ঃ এ সুসংবাদে একথাও ছিল যে, যদি সে নবী (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহর অহীর ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেন তা হলে তাকে হত্যা করা হবে। আমাদের নবী করীম (সা) নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়ার পরও তাঁকে হত্যা করার হয়নি। তবে দুশমনেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও প্রচেষ্টা চালিয়েও সফল হতে পারেনি। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ -

"হে মুহাম্মদ! তুমি আল্লাহ তা'আলার নি'আমতসমূহকে স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা তোমাকে বহিষ্কার করে দিবে। তারা ষড়যন্ত্র করছিল আর আল্লাহ তা'আলা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, বস্তুত আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠ কৌশলী।" (সূরা আনফাল ঃ ৩০)

আর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ "তুমি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ থাকবে।" যখন কোন ধরনের দুর্ঘটনা হত, তখনই নবী (সা)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেত। তাই যদি নবী (সা) প্রতিশ্রুত নবী না হতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি নিহত হতেন। তবে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন। তাই একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায়, যদি হযরত ঈসা (আ)-কে সেই প্রতিশ্রুত নবী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় তা হলে (নাউযুবিল্লাহ) তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে ধরতে হবে। আর এ প্রসঙ্গটির প্রতি আল-কুরআনে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْلاَ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَتَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

"যদি আমি তোমাকে দৃঢ়পদ না রাখতাম তাহলে আশংকা ছিল যে, তুমি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়তে। তখন আমি তোমাকে জীবন ও মৃত্যুর দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করাতাম। তখন তুমি আমার শাস্তি থেকে রক্ষার জন্য কোন সাহায্যকারী খুঁজে পেতে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৪-৭৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ـ

"যদি সে (মুহাম্মদ সা) আমার উপর সামান্যতম মিথ্যা আরোপ করত তাহলে আমি তাকে ডান হাতে পাকড়াও করতাম, তারপর তার গর্দানের প্রধান শিরাটি কেটে ফেলতাম।" (আল হাক্কা ঃ ৪৪)

তাওরাতের বিংশতম পাঠে উল্লেখিত হয়েছে যে, "যদি সে নবী আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে তা হলে যে নিহত হবে।" তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন সাধারণভাবে একজন নবী নিহত না হওয়া সত্য নবী হওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ বা যুক্তি নয়। কেননা অনেক সত্য নবী যারা শহীদ হয়েছেন এতে তাঁদের ব্যাপারে বিরূপ ধারণা হতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"আর তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত।" (সূরা বাকারা)

বিশেষ করে নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত সত্যতা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে পড়বে। বরং প্রতিশ্রুত নবী নিহত না হওয়া শুধুমাত্র তাঁর জন্য সত্য নবী হবার প্রমাণ। তাওরাতের এ বাক্য থেকে তা-ই বুঝা যায়।

"যে নবী এ ধরনের অপরাধ করবেন........ তাঁকে হত্যা করা হবে।" দু'টি কথারই সর্বনাম দিয়ে প্রতিশ্রুত নবীকেই বুঝানো হয়েছে। যদি সাধারণভাবে হক নবীর জন্য একটি প্রযোজ্য হত তা হলেও (নাউযুবিল্লাহ) হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত ইয়াহইয়া (আ) কে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করতে হয়। এমনকি নাসারাদের আকীদা অনুযায়ী যেহেতু হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন তা হলেও তাঁকে (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। এসব আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, আসলে এ সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত নবীর জন্য প্রযোজ্য ছিল, যার জন্য সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। যদি সাধারণভাবে নবীদের জন্য তা প্রযোজ্য বলে ধরা হয় তাহলে ইয়াহূদী ও অইয়াহূদী যারা হযরত ঈসা (আ)-কে নবী বলে বিশ্বাস করে না, তারা এটিকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে।

ষষ্ঠ ঃ সুসংবাদে একথাও ছিল যে, প্রতিশ্রুত নবীর বক্তব্য তথা ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হবে। আল-হামদুল্লিাহ! মহানবী (সা)-এর সকল ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছে, সামান্যতম ব্যতিক্রম হয়নি। আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে একথা ঘোষণা করছি কিয়ামত পর্যন্ত এ সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবীর কোন ভবিষ্যদ্বাণীর কোন ভুল কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আর এসব গুণ আমাদের নবী (সা)-এর মধ্যে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত ছিল যে, তাঁর দুশমন ও হিংসুকেরাও তাঁকে আলামীন তথা বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী পদবীতে ভূষিত করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কেউ স্বীকার করুন বা না করুন, এ গুনাহ্গার বান্দা নবীয়ে উম্মীকে (তাঁর জন্য আমার পিতামাতা কুরবান হোক) সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী হিসেবে উদিত সূর্য ও দিবালোকের চেয়ে অধিক বিশ্বাস করি। আর মহান আল্লাহ তা'আলা যাঁর কোন শরীক নেই, তাঁর নাম শপথ করে তাঁকে সাক্ষী করে সমস্ত ফিরিশতাদেরকে সাক্ষী করে হৃদয়ের প্রশান্ত চিত্তে, নিষ্ঠা ও আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহভাবে তিনি সত্যবাদী ও সত্যায়িত নবী। মানব জাতির মধ্যে তিনি সবচেয়ে অধিক সত্যবাদী ও সত্যপন্থী।

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنَا عَلٰى ذٰلِكَ اٰمِيْنَ

সপ্তম ঃ তাওরাত কিতাবের কার্যাবলী অধ্যায়ের ৩য় খণ্ডের ৭ম পাঠ অধ্যয়ন করলে পরিষ্কারভাবে মনে হয়, প্রতিশ্রুত ও প্রত্যাশিত নবী হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ঈলিয়া (আ) নন, বরং সব নবী থেকে ব্যতিক্রমী নবী। তাওরাতের কথাটি এরূপঃ

"এখন হে ভাইয়েরা, আমি জানি তোমরা বোকামী করেছ, যেমন তোমাদের নেতারাও করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল নবীর মুখে পূর্বে থেকে যে খবর দিয়েছিলেন যে, মাসীহকে দুঃখকষ্ট করতে হবে।"

১৯ ঃ "তারপর তোমরা তাওবা কর ও মনোযোগী হও যেন তোমার পাপ মুছে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন।"

২০ ঃ "আর মাসীহকে তারপর প্রেরণ করা হবে যার ঘোষণা তোমাদের মধ্যে পূর্বেই হয়েছে।"

২১ ঃ "অবশ্যই আসমান এজন্য বাকী থাকবে যে, নবীদের কণ্ঠে যে সব বিষয়ে প্রথম থেকে উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো যতদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।"

২২ ঃ "তারপর হযরত মূসা বাবা-দাদাদেরকে বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রভু, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী প্রেরণ করবেন, সে যা বলবে তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।"

২৩ঃ "যারা সেই নবীকে মান্য করবে, সে যা বলবে তা তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে।"

২৪ ঃ "যারা সেই নবীকে মান্য করবে না তারা ধ্বংস হয়ে যাবে",

২৫ ঃ "বরং সামওয়াল থেকে শুরু করে পরবর্তী সব নবী তাদের উভয়ের খরব দিয়েছে।"

২৬ ঃ "তোমরা নবীদের প্রজন্ম ও সে যুগে আল্লাহ তা'আলা বাপ-দাদাদের সাথে ওয়াদা করেন যখন আব্রাহামের সাথে বলেছেন, তোমার পরবর্তী প্রজন্ম থেকে সমস্ত দুনিয়া বরকত পাবে।"

উক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, হযরত মাসীহ্ (আ)-এর সুসংবাদ এবং কষ্টের কথা যা ইয়াহূদীদের পক্ষ হতে তিনি ভোগ করেছিলেন এবং আকাশ থেকে তাঁর অবতরণের কথাও উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে হযরত মূসা (আ) তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈলকে সংবাদ জানিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাইদের অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের মধ্যে একজন নবী প্রেরণ করবেন এবং হযরত মূসা (আ) ব্যতীত সব নবীই সেই প্রতিশ্রুত নবী আগমনের খবর জানিয়েছেন। যখন প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত নবী প্রকাশিত হবেন ততদিন পর্যন্ত এ আকাশ-যমীন অবশ্যই স্থায়ী থাকবে। আর সে যুগে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা লাভ করবে যা তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে করেছিলেন যে, তোমার মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ বরকত লাভ করবে।

পরিশেষে বলা যায়, হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ)-এর সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) হযরত ইব্রাহীম (আ)-সহ সমস্ত নবী (আ) প্রদান করেছেন ও যার প্রতীক্ষা এ ধরনের বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, "নিশ্চয়ই আসমান-যমীনের সবকিছু সে সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা প্রথম থেকেই সব নবীর মাধ্যমে যে মহান নবীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি আপন অবস্থায় আগমন করবেন।"

এ বিষয়ে পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া গেল যে, প্রতিশ্রুত ও প্রত্যাশিত সে নবী ঐ সমস্ত নবী থেকে ভিন্ন এক সত্তা যারা হযরত ঈসা (আ) থেকে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত

আগমন করেছিলেন। এজন্য এর ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)-এর যামানার কেউ হতে পারে না। তাই হযরত ইউশা ও হযরত মাসীহ্ ইবন মরিয়মকে -এর সুসংবাদের পাত্র ঠিক করা কিভাবে যৌক্তিক হতে পারে ?

অষ্টম ঃ ইউহান্না ইঞ্জিলে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "যখন ইয়াহূদীগণ জেরুজালেম থেকে গণক ও যাদুকরদেরকে প্রেরণ করল, যে তোমরা তাদেরকে প্রশ্ন করবে তুমি কে ? আর তিনি স্বীকার করে বলেছেন যে, তিনি মাসীহ নন্, তখন তারা তাকে প্রশ্ন করল, তুমি তাহলে কি ইলিয়া ? সে বলল ঃ না আমি তা নই। তারা বলল, তাহলে কি তুমি সেই নবী ? সে জবাব দিল না। " এসব কথা থেকেও সাফ বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মাসীহ ও হযরত ইলিয়া (আ) ব্যতীতও তারা একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। তাঁর পরিচিতি ও প্রতিশ্রুতি এত ব্যাপক ছিল যে, হযরত মাসীহ্ (আ) ও হযরত ইলিয়া (আ) এর নামের মত তাঁর নাম উল্লেখেরও তেমন প্রয়োজন ছিল না, বরং তারা বলে ছিল 'সেই নবী' এতটুকু যথেষ্ট ছিল।

যদি হযরত মাসীহ (আ) এ সুসংবাদের মূল ব্যক্তিত্ব হতেন তাহলে তিনি কার প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিনি যে নবীর প্রতীক্ষা করেছিলেন তিনি আমাদের নবী (সা) ছিলেন। এজন্য আহ্লে কিতাব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জন্য 'সেই নবী' শব্দ ব্যবহার করত। আর সব সময় মুসলমানগণ হযরত বলে নবী (আ)-কে বুঝিয়ে থাকেন।

নবম ঃ ইউহানার ইঞ্জিলের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪০ নং পাঠ থেকেও বুঝা যায় যে প্রতিশ্রুত নবী হযরত ঈসা (আ) থেকে আলাদা একজন নবী। ইঞ্জিলে বলা হয়েছে ঃ

৪০ ঃ তখন তাদের উত্তম লোকেরা তা শুনে বলল ঃ আসলে এ হচ্ছে 'সেই নবী' আর অন্যরা বলল ঃ এ হল মাসীহ্। প্রতিশ্রুত নবীকে হযরত মাসীহ-এর মুকাবিলায় উল্লেখ করার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, সে প্রতিশ্রুত নবী হযরত ঈসা (আ) থেকে ভিন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। অতএব 'সেই নবী' হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত নবী আর কোন নবী হতে পারেন? হযরত নবী (সা)-এর যামানার ইয়াহূদী ও নাসারাদের অনেক আলেম এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত সত্য নবী যাঁর সংবাদ হযরত মূসা (আ) দিয়েছিলেন আর তিনিই সে সুসংবাদের বাস্তব ব্যক্তিত্ব। তাদের মধ্যে থেকে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। মুখায়রিক ইয়াহূদী ও যাগাতীর ঈসায়ী তাদের অন্যতম ছিলেন। আবার অনেকে এসব বিষয়ে স্বীকার করলেও মুসলমান হয়নি যেমন ঃ রোম সম্রাট হিরাক্ল, আবদুল্লাহ ইবন মরিয়া ইয়াহূদী তারা স্বীকার করেছে তিনিই সেই সত্য নবী যার প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ হযরত মূসা (আ) ও হযরত ঈসা (আ) দিয়েছিলেন কিন্তু এরা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

দ্বিতীয় সুসংবাদ ঃ (তাওরাতের জন্ম পুস্তক ১৭ থেকে ২০ পাঠ)

"ইসমাঈলের মাধ্যমে আমি তোমার সন্তানদের মধ্যে বরকত দেব ও তাদেরকে ব্যাপক করব। তাঁদের মধ্যে বারজন নেতা পয়দা হবে আর আমি তাদেরকে নিয়ে বিশাল জাতি গঠন করব।"

আর এ অধ্যায়ের ৮ম পাঠে বলা হয়েছে ঃ

"আর আমি তোমাকে এবং তোমার পরে তোমার বংশকে কিন্'আনের সমস্ত রাজত্ব দান করব।"

১৬ নং পাঠে বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ তা'আলার ফিরিশতাগণ হযরত হাজেরাকে বলল ঃ "তুমি গর্ভবতী, তুমি একটি ছেলে প্রসব করবে। ছেলের নাম রাখবে ইসমাঈল। সে দুঃসাহসী হবে। তার হাত সকলের উপরে থাকবে। অন্যদের হাত তার নিচে থাকবে। সে তার সকল ভাইয়ের সংগে জীবন যাপন করবে।"

আর ২৫ ঃ পাঠে বলা হয়েছে ঃ-

"তাঁর ছেলে ইসহাককে আল্লাহ তা'আলা বরকত দিয়েছেন।"

সারকথা হল, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁদেরকে তিনি বরকত দান করবেন, বস্তুত তা-ই হয়েছে। হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তানগণ বরকত পেয়েছেন। কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত নবুওয়াত ও রিসালাত তাঁদের বংশের মধ্যে চলেছে। হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশে নবী ও রাসূল হয়েছিল। তারপর যখন দ্বিতীয় ওয়াদা পূরণে সময় এল, তখন নবুওয়াত ও রিসালাতের বিষয়টি বনী ইসরাঈল থেকে পরিবর্তিত হয়ে বনী ইসমাঈলে স্থানান্তরিত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ অনুযায়ী মক্কার পাহাড়ের চূড়া থেকে সিনাই পর্যন্ত সৌভাগ্যের বিজলী চমকায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

তাওরাতের জন্ম পুস্তকের ২১ অধ্যায় থেকে জানা যায়, হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজাযে পবিত্র মক্কা উপত্যকায় রেখে ফিরে যান। হযরত সারার ইন্তিকালের পর হযরত ইবরাহীম (আ) পবিত্র মক্কা উপত্যকায় আগমন করেন। সে সময় হযরত ইসমাঈল (আ) যুবকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে মিলে কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ

"সে সময়কে স্মরণ কর, যখন হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ) বায়তুল্লাহর দেয়াল তুলছিলেন। তাঁরা এ দু'আ করছিলেন হে রব! আমাদের এ কাজ তুমি কবূল কর, নিশ্চয়ই তুমি সবকিছু শোন এবং জান। আর হে রব! তুমি

আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একদল লোককে তোমার অনুগত (মুসলমান) বানাও।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৭-১২৮)

পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, এখানে কার সন্তান বলা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে তো বুঝা যায় যে, এ সন্তান বলতে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা পবিত্র মক্কা উপত্যাকা ও কা'বার আশেপাশে বসতি করেছেন। এই সন্তানদের জন্য প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا এভাবে দু'আ করেছেন। তারপর তিনি দ্বিতীয় দু'আতে বলেছেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً (اى فى هذه الذرية هاجرة واسمعيل) مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ

"হে রব! তাদের মধ্যে (অর্থাৎ হাজেরা ও ইসমাঈলের সন্তানদের মধ্যে) এমন একজন রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার কিতাব তিলাওয়াত করবে। লোকদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দিবে এবং (কুফর ও শিরক্ থেকে) তাদেরকে মুক্ত করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানী।" (সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

আল্লাহ তা'আলা যেভাবে আল-কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আর উল্লেখ করেছেন তেমনিভাবে দু'আর জবাবও উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ ـ

"আল্লাহ তা'আলা নিরক্ষর লোকদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলার আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিক্‌মত শিক্ষা দেয়। তাঁরা ইতিপূর্বে প্রকাশ্যভাবে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।" (সূরা জুমু'আ ঃ ২)

সারকথা ঃ পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে হযরত নবী (সা)-এর থেকে অধিক বরকতওয়ালা কেন্'আনের যমীনে কোন সন্তান কি ছিল? নবী করীম (সা) থেকে বড় ও উঁচু হাতের মালিক কি কেউ ছিল? যাকে ও যার হাতে যমীনের ভাণ্ডারের চাবী প্রদান করা যেতে পারে? আর বারজন নেতা বলতে বারজন খলীফা বুঝানো হয়েছে। নবী (সা) বলেন ঃ

يدور رحى الاسلام الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش ـ

"ইসলামের চাকা বারজন খলীফার হাতে ঘুরবে আর তারা সকলেই হবে কুরায়শ।"

মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সুনিপূণ কৌশল হিসেবে হযরত ইসহাক (আ) এর বংশধরদের দেয়া বরকত থেকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদেরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কেননা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশেই হযরত বিশ্বনবী (সা) জন্মগ্রহণ করবেন ও করেছেন।

যদি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশের জন্য প্রতিশ্রুতি প্রথমে প্রতিফলিত হত তা হলে তো নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যেত, কেননা শেষনবী ও রাসূলের পরে তো আর কেউ নবী-রাসূল হতে পারে না। আর এ জন্য হযরত ইসহাক (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে অধিক সংখ্যায় নবী হয়েছেন। বনী ইসমাঈলদের জন্য এ নি'আমতের কথা এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ اِذْجَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ হযরত ইব্রাহীম (আ) হযরত ইসমাঈল (আ) এর জন্য এভাবে দু'আ করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً ـ

"হে আমাদের রব! তাদের মধ্যে প্রেরণ কর এক মহান রাসূল।" তিনি কিন্তু এভাবে বলেননি' رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رُسُلاً "হে আমাদের রব! আপনি তাদের মধ্যে আরও অনেক নবী প্রেরণ করুন।" এতে ভালভাবে বুঝা গেল, হযরত ইবরাহীম (আ) বনী ইসমাঈলে এমন একজন নবী প্রেরণের জন্য দু'আ করেছিলেন যাঁর পরে আর কোন নবীর প্রয়োজন না হয়। তিনি একক শব্দ 'রাসূল' ব্যবহার করেছেন বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে 'রুসুল' বলেননি।

وعن أبى العالية فى قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يعنى امة محمد صلى الله عليه وسلم فقيل له قد استجيب لك وهو كائن فى اخر الزمان وكذا قال السدى وقتادة ـ ابن كثير ـ

"আবুল আলিয়া (র) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত ইবরাহীম (আ) এ দু'আ করেন رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বলা হয়েছে, তোমার দু'আ কবূল হয়েছে আর সে নবী আসবে শেষ যামানায়। কাতাদাহ্ ও সুদ্দী থেকেও এরূপ বর্ণিত হয়েছে। (ইবন কাসীর, ১ খ. পৃ. ৩৩১)

كائن فى اخر الزمان সে শেষ যামানায় হবে বলে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমি আমার পিতা ইব্রাহীম (আ) এর দু'আ ঃ اَنَا دَعْوَةُ اَبِىْ اِبْرَاهِيْمَ আর এজন্যই হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এ দু'আ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের জন্য বিশাল মর্যাদা ও অনুগ্রহ স্বরূপ। তাই আমরা اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ পড়ার পর كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পড়া কৃতজ্ঞতা হিসেবে জরুরী করে নিয়েছি। অথবা বিষয়টি এভাবে বলা যায়, আমরা দুরূদের সময় নবী ও

রাসূলের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (আ)-কে নির্দিষ্ট করে তাঁর সে দু'আরই প্রতিউত্তর দিচ্ছি।

رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّالْحِقْنِىْ بِالصَّالِيْنَ وَاجْعَلْ لِّىْ لِسَانَ صِدْقٍ فِىْ الْاٰخِرِيْنَ - (সূরা শু'আরা ঃ ৮৪)

আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিক্‌মতও দান করেছিলেন এবং সালেহীনের মধ্যেও শামিল করেছেন। সর্বশেষে শেষ যামানার উম্মাত তাঁর জন্য যে দু'আ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ শব্দাবলী দ্বারা জারী রেখেছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তানদেরকে বরকত দেয়ার ওয়াদা ছিল এ জন্য كَمَا بَارَكْتَ শব্দ যুক্ত করা হয়েছে। হয়ত বারজন নেতা বলে খলীফাদেরকে বুঝানো হয়েছে ও খতমে নবুওয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পর নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে এবং খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের ধারা অব্যাহত থাকবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ উম্মাতের জন্য খিলাফত ব্যবস্থা চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ -

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যোগ্যতর কর্ম করেছে, আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে যমীনের খিলাফত দান করবেন।" (সূরা নূর ঃ ৫৫)

وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ بَعْدِىْ ثَلَاثُوْنَ عَامًا

وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلْفَهُ نَبِىٌّ وَاِنَّهُ لَانَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ -

"হযরত নবী (সা) বলেন ঃ নবুওয়তের খিলাফত আমার পরে ৩০ বছর থাকবে।" রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ফরমান ঃ "বনী ইসরাঈলের শাসন ব্যবস্থা নবীগণ করতেন। যখন কোন নবী গত হতেন তখন আরেকজন নবী তাঁর গদীনশীন হতেন, কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না তবে খলীফাগণ থাকবে।" (বুখারী)।

তৃতীয় সুসংবাদ তাওরাতের সফর ইস্তিসনা ৩৩ অধ্যায় আয়াত ২ ঃ

جَآءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَآءَ وَاَشْرَقَ لَهُمْ مِنْ سَاعِيْرَ وَتَلاَءلاَّ مِنْ جِبَالَ فَارَانَ وَاَتَّى مِنْ رَبْوَاتِ الْقُدْسِ وَعَنْ يَمْيْنِهٖ نَارُ شَرِيْعَةٍ ـ

কোন কোন তাওরাতের কপিতে এরূপও আছে ঃ

جَآءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَآءَ وَاَشْرَقَ لَنَا مِنْ سَاعِيْرَ وَاشْتَعْلَنُ مِنْ جِبَالٍ فَارَانَ

আর অনুবাদে এভাবে আছে ঃ

"তিনি বললেন ঃ (হযরত মূসা আ) আল্লাহ তা'আলা সিনাই ও সাঈর থেকে উদিত হলেন তারপর মক্কার উপত্যকায় প্রকাশিত হলেন। দশ হাজার পবিত্র সত্তার সাথে আগমন করলেন, তাঁর ডান হাতে শরী'আতের মশাল ছিল।"

এ আয়াতে তিনটি সুসংবাদ উল্লেখিত হল ঃ (১) তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ) এর উপর তাওরাত নাযিল হওয়া বুঝানো হয়েছে। (২) সাঈর একটি পাহাড়ের নাম। যা নাসেরা নামক স্থানের হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থানে অবস্থিত। এতে হযরত ঈসা (আ) এর উপর নবুওয়াত ও ইঞ্জিল নাযিল হবার কথা বলা হয়েছে। (৩) ফারান বলে মক্কার পাহাড়কে বুঝানো হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী করীম (সা)-এর নবুওয়াত ও কুরআন নাযিলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হেরা গুহা ফারান পাহাড়ে অবস্থিত। সেখানে সবার প্রথমে اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ থেকে শুরু করে প্রথম ৫টি আয়াত নাযিল হয়েছিল। তাওরাতের জন্ম অংশে ২১ অধ্যায়ের ২০ নং পর্বে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর প্রসঙ্গ এভাবে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

২০ ঃ "আল্লাহ তা'আলা ঐ ছেলের সাথে ছিলেন, সে বড় হয়েছে, বিরানভূমিতে থেকেছে এবং সে তীরন্দাজ হয়ে গড়ে উঠেছে।"

২১ ঃ "সে ফারানের উপত্যকায় থেকেছে।" হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বসতি পবিত্র মক্কায় হবার বিষয়টি ঐক্যমতে স্বীকৃত। এতে জানা গেল তাওরাতের আয়াতে যে নবুওয়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা ফারান পাহাড় থেকে প্রকাশিত হবে এবং দৃশ্যত পাহাড়কে আলোকিত করে দিবে। এখন পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নবুওয়াত ব্যতীত আর কোন নবুওয়াত ছিল যা ফারান পাহাড় থেকে সূচনা হয়ে দুনিয়াকে হিদায়েতের আলোকে আলোকিত করেছে। ফারান পাহাড়ের নবুওয়াত নিশ্চয়ই সাঈর ও সিনাঈ পর্বতের নবুওয়াত থেকে অধিক দীপ্তিমান ছিল। শরী'আতের মশাল বলতে কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনে জিহাদের বিধান, দণ্ডবিধি ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। দশ হাজার পবিত্র সত্তা বলতে ফেরেশ্তাদের বাহিনী বুঝিয়েছে অথবা মক্কা বিজয়ের সময়ে দশ হাজার সাহাবায়ে কিরামের অভিযাত্রী

বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। আর নাসারাদের মত অনুযায়ী হযরত মাসীহের সাথে বারজন হাওয়ারী ছিলেন। তারা সকলে জান বাঁচানোর জন্য পালিয়ে যায়। আর একজন ইয়াহুদা নামক হাওয়ারী ত্রিশ দিরহাম ঘুষ নিয়ে প্রভুকে ধরিয়ে দেয়।

এ সংবাদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা ও বক্তব্যের সুন্দর উপস্থাপনাতে চিন্তার খোরাক আছে। প্রথমত, বলা হয়েছে ঃ جَاءَ الرَّبُّ مِنْ سِيْنَاءَ "প্রভু সিনাঈ থেকে আগমন করেছেন", এর পর বলা হয়েছে ঃ وَاَشْرَقَ مِنْ سَاعِيْرَ "তারপর সাঈরে উদিত হলেন", শেষে বলা হয়েছে ঃ وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ "ফারান পাহাড়ে আলোকিত হলেন"। এতে বুঝা যায়, তাওরাতের নাযিল হওয়া ছিল প্রভাতের উদয় আর ইঞ্জিলের নাযিল হল সূর্যের উদয় এবং সবশেষে পবিত্র আল-কুরআনের আগমন হল দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায়। এভাবে কুফরের অন্ধকার রাতের আঁধার কেটে ঈমান ও হেদায়েতের সুবহে সাদিকের সূচনা হয়েছিল হযরত মূসা (আ)-এর যামানায়। আর ফিরাউন, কারূন ও হামানের মত কাফির নেতাদেরকে আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হতে হয়েছিল।

যখন হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ)-এর আবির্ভাব হল, তখন হিদায়েতের সূর্যও পূর্বাকাশে উদিত হল। আর যখন হযরত নবীয়ে আকরাম (সা) প্রকাশিত হলেন তখন হিদায়েতের সূর্য মধ্য দিবসে এসে পৌঁছে। পৃথিবীর এমন কোন যমীনের অংশ বাকী ছিল না যেখানে এ সূর্যের আলো পৌঁছেনি। পবিত্র কুরআনুল করীমে এ বিষয়ে সুসংবাদ দিয়েছে ঃ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِسِيْنِيْنَ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنَ - তীন ও যায়তুন যেহেতু মুকাদ্দাস যমীনে উৎপন্ন হয়, যেখানে হযরত ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ জন্য হযরত ঈসা (আ)-এর রিসালাতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। আর 'বালাদে আমীন' (শান্তিনগর) বলে পবিত্র মক্কাকে বুঝানো হয়েছে, যেখানে নবুওয়াত ও রিসালাতের সূর্য উদিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মক্কার পরিচয় বলতে গিয়ে 'আল-আমীন' নিরাপদ শব্দ ব্যবহার করেছেন যাতে এর প্রতি ইশারা রয়েছে যে, বিশ্বনবী হযরত নবী মুহাম্মদ (সা) মহাপ্রভুর রহমতের ভাণ্ডারকে আমানত স্বরূপ এ নিরাপদ শহরে সোপর্দ করা হয়েছে। তেপান্ন বছর এ আমানতে ইলাহীকে এ পবিত্র নগরী হেফাযত করেছে। যখন পরিবেশর পরিস্থিতি নাজুক হয়ে গেল, তখন এ শান্তিনগরী বাধ্য হয়ে এ পবিত্র আমানত পবিত্র মদীনায় সোপর্দ করে দেয়।

সারকথা ঃ এখানে তিনজন নবীর সুসংবাদ উপস্থাপন করা হলো। সর্বশেষে খাতিমুল আম্বিয়া (সা)-এর সুসংবাদের আলোচনা হয়েছে। খতমে নবুওয়াত বুঝানোর জন্যই এভাবে উপস্থাপন করা হলো। বিরোধীরা বলে থাকে, ফারান পাহাড় সিনাঈ এলাকার একটি নাম, যেহেতু ঐ এলাকায় হযরত মুহাম্মদ (সা) আবির্ভূত হন নি, অতএব এ সুসংবাদ তাঁর বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না। তাদের এ আপত্তির

জবাব হল ঃ তাওরাতে জন্ম অধ্যায়ের একুশ অনুচ্ছেদের ১৩ আয়াত থেকে ২১ আয়াত পর্যন্ত লেখা আছে। "হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল এবং হযরত সারা পরস্পর নারায হবার কারণে মুকাদ্দাস এলাকা ছেড়ে ফারান পাহাড়ের সমতলে বসতি স্থাপন করেন।" এতে বুঝা যায়, ফারান সে এলাকাই হবে যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণ বসতি স্থাপন করেছিল। আর নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত যে, তারা বর্তমানের পবিত্র মক্কার উপত্যাকার হেজায ভূমিতেই বসতি স্থাপন করেছিলেন (যেখানে বর্তমান কা'বা ও বায়তুল্লাহ স্থাপিত) এখানে তাঁর বংশধরগণ বসবাস করেছেন। এতে আরও বুঝা যাচ্ছে যে, ফারান হল পবিত্র মক্কার এলাকার একটি পাহাড়, যেখানে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ) বসতি স্থাপন করেছিলেন। সামেরী তাওরাতের আরবী অনুবাদ যা জার্মানীর পণ্ডিত কর্তৃক ১৮৫১ গাংগন নামক স্থানে মুদ্রণ করেছে, তাতে হযরত ইসমাঈল (আ) বসতিস্থল হিসেবে যা লিখা হয়েছে তা হল ঃ

وَسَكَنَ فی بریة فاران (ای الحجاز) واخذت له امرأة من ارض مصر (كون الدنيا) -

হযরত দাঊদ (আ) সামুয়েল নবীর ইন্তিকালের পর ফারান পাহাড়ের পাদদেশে আগমন করেছিলেন। সেখানে তিনি একটি যবূর সংকলন করেছিলেন, তাতে দুঃখ ভরে তিনি বলেছেন, আমি কায়দারের অবস্থানস্থলে অবস্থান করেছি। (দেখুন : সামুয়েল নবী অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫, যবূর)।

এতে সাফ বুঝা যায় কায়দার ফারানে থাকত। উল্লেখযোগ্য, কায়দার হচ্ছে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ২য় ছেলে। আশরিয়া গ্রন্থ থেকে জানা যায়, কায়দার ও তার সন্তানেরা পশ্চিমা দেশে বসবাস করতেন। বতলিমূস (লেখক) তাঁর আবাসস্থল হিসেবে মধ্যবর্তী এলাকা শনাক্ত করেছেন। এ সবের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, হিজাযের এলাকা ও ফারান একই স্থান হবে। বিশ্ব নবী (সা)-এর প্রকাশ পবিত্র মক্কায় হয়েছে যা হিজাযের মশহূর শহর। (আল-বাশারাতুল আহমদিয়া) আতশী শরী'আত বলতে যা বুঝায়, তাহল শরী'আতের বিধান, জিহাদ, মৃত্যুদণ্ড, দণ্ডবিধি, লঘুদণ্ড। আর বিশ্ব নবী (সা)-এর নবুওয়াত ছিল বৈষয়িক ও রাজত্ব সম্পৃক্ত করে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ) এর নবুওয়াত বৈষয়িক ও রাজত্ব বিষয়ক ছিল না।

৪র্থ সুসংবাদ ঃ তাওরাত সফর ইস্তিসনা : ৩২ অধ্যায়, পাঠ নং ২১।

তারা আমাকে তাদের বোকামীপূর্ণ কথা দিয়ে রাগান্বিত করেছে, সে সব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আমাকে মর্যাদাবান করেছিলেন। অতএব আমিও তাদের মধ্যে যারা মর্যাদাবান তাদেরকে বেকুফদের থেকে আলাদা করব।"

এখানে সুসংবাদে বে-আকল বলে আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা হযরত নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে মূর্খতা ও গুমরাহিতে লিপ্ত ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিধি-বিধান থেকে বেখবর তৎকালীন আরব সমাজ মূর্তিপূজা ব্যতীত অন্য ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বে-খবর ছিল। ইয়াহূদী ও নাসারা তাদেরকে খুব হীন চোখে দেখত। তারা তাদেরকে মূর্খ ও নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করত। কিন্তু এক সময় যখন ইয়াহূদী ও নাসারারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মূল শিক্ষা ভুলে গিয়ে তাওহীদের স্থলে শিরকে লিপ্ত হল, তখন আল্লাহ তা'আলা আত্মমর্যাদার জোশে এসে উম্মি নবী (সা)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ بْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ـ

"ইয়াহূদীগণ হযরত উযায়ের (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে আর নাসারারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র বানিয়েছে"। (সূরা তাওবা ঃ ৩০)

আল্লাহ তা'আলা এ সময় ওয়াদা অনুযায়ী মূর্খ ও নিরক্ষর লোকদের নিকট হযরত নবী (সা)-কে প্রেরণ করেন। যাদের হাতে আল্লাহ তা'আলা আপন দীনকে সম্মানিত করেছেন এবং ইয়াহূদী ও অন্যান্যদেরকে (যারা দীনকে প্রত্যাখ্যান করেছে) তাদের হাতে নিহত করেছেন। মিসর ও সিরিয়া তাদের দখলে এসেছে।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِىْ الْاُمِيِّيْنَ رَسُوْلاً مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنَ ـ

"আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করে তিনি মহান বাদশাহ, পবিত্র সত্তা, মহা পরাক্রমশালী ও মহা বিজ্ঞানী। তিনি জ্ঞানসত্তা যিনি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে তাদের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত (হুবহু অনুশীলন) করেন। তিনি তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন, তাদেরকে কিতাব ও হিক্মত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে পুরোপুরি পথভ্রষ্টতায় ছিল। (সূরা জুমু'আ ঃ ১-২)

'নিরক্ষর' বলতে আরবের মূর্খ সম্প্রদায়কে বুঝায়। আর হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইউশা (আ)-এর সম্প্রদায় মূর্খ ও জ্ঞানহীন ছিল না। বনী ইসরাঈলকে তাদের সাথে তুলনা করে মর্যাদাবান করা হয়নি; বরং এ সুসংবাদ আরবদের ব্যতীত অন্যদের বেলায় সত্য ও বাস্তব হতে পারে না। তারপর বেকুফ সম্প্রদায় বলতে ইউনানীও (গ্রীক) সঠিক হতে পারে না– যেমনটি বলা হয়েছে কোমীয় পুস্তকে। গ্রীকদের বেলায় তা

এজন্য প্রযোজ্য হতে পারে না– কেননা তারা সে সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহলে তারা কিভাবে অবুঝ সম্প্রদায়ের বাস্তব নমুনা হতে পারে? গ্রীকের পণ্ডিত সক্রেটিস-প্লেটো, বিস্টালসহ পণ্ডিতগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের কয়েক শতাব্দী পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে অভিজ্ঞ আলেম ও পণ্ডিত ছিলেন।

৫ম সুসংবাদ ঃ তাওরাত ঃ সফর পাদায়েশ অধ্যায় জন্ম, ৪৯ পাঠ

১. হযরত ইয়াকূব (আ) আপন ছেলেদেরকে ডাকলেন ও বললেন, তোমরা সমবেত হও আমি তোমাদেরকে আগামী দিনের সংঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ জানাব।

২. হে ইয়াকূবের সন্তানেরা! তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবে আর শোন নিজ পিতা ইসরাঈলের কথা মান্য করবে। তারপর দ্বিতীয় পাঠে ইয়াহুদা থেকে শাসন কেন্দ্র আলাদা করবে না এবং শাসক তার পায়ের তলায় আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত না শায়লা আগমন করবে। তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা তার নিকট এমন হবে। উক্ত আয়াতে জানানো হয়েছে যে, শেষ যামানায় শায়লা প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত তাদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকবে।

মুসলমানগণ বলে থাকেন শায়লা হযরত নবী (সা)-এর উপাধি। অন্যদিকে নাসারারা শায়লা হযরত ঈসা (আ)-এর উপাধি বলে মনে করে। নাসারাদের এ দাবি যৌক্তিক নয়। কেননা বক্তব্যের বর্ণনাধারা অনুযায়ী শায়লাকে ইয়াহুদা থেকে আলাদা ব্যক্তিত্ব মানতে হবে। কেননা বলা হয়েছে যে, শায়লার আবির্ভাবের সাথে ইয়াহুদার রাজত্বের অবসান হবে। যদি শায়লা ইয়াহুদার অন্তর্ভুক্ত হয় তা হলে কিভাবে তার আবির্ভাবে ইয়াহুদার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়? বরং সে ইয়াহুদা হলেও ইয়াহুদা রাজত্ব অব্যাহত থাকে।

বাইবেল ও মথির ইঞ্জিল কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় সামান্য দৃষ্টিপাত করলেই এ কথা ভালভাবে জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ)-এর বংশধারা ইয়াহুদা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, বরং তিনি হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর আর হযরত দাঊদ (আ) সেই ইয়াহূদার বংশধর এ ব্যাপারে সবাই একমত। এজন্য শায়লার বাস্তব নযীর সে নবীই হতে পারেন যিনি ইয়াহুদা বংশ থেকে আলাদা বংশের লোক এবং তিনি শেষ যামানায় প্রকাশিত হবেন বলেও প্রথম পাঠের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে, তোমাদেরকে আমি আগামী দিনে যা সংঘটিত হবে তার খবর জানাব।

উক্ত দু'টি বিষয় হযরত নবী (সা) এর বেলায় প্রযোজ্য ও বাস্তব হতে পারে। তিনি ইয়াহুদার বংশধর ছিলেন না, বরং তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি শেষ নবী হবার কারণে তাঁর আগমনও হয়েছিল শেষ যামানায়। তাঁর আবির্ভাবের পরে ইয়াহূদী বংশের নিকট যতটুকু রাজত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল, তা অবসান হতে শুরু করে। বনূ নযীর ও খায়বারের ইয়াহূদীদের দূর্গ তাঁর সময়ই বিজিত হয়েছিল। আর এ বাক্য

"সম্প্রদায় তার নিকটে সবাই সমবেত হবে।" সাধারণভাবে নবী হিসেবে আবির্ভূত হবার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"হে নবী তুমি বলে দাও, হে লোকেরা আমি তোমাদের সকলের নিকট প্রেরিত হয়েছি।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৮)

হযরত ঈসা (আ) হযরত নবী (সা) থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيلَ

"তাঁকে রাসূল করা হয়েছে বনী ইসরাঈলের নিকটে।"

এছাড়াও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন লোক হযরত নবী (সা)-এর নিকট সমবেত হয়েছে এবং তাঁর দীনে দাখিল হবার জন্য দলে দলে এসেছে। এ ধরনের অবস্থা হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায় হয়নি।

১১ নং পাঠে আছে ঃ

"তিনি নিজ গাধা আঙ্গুর গাছের সাথে বাঁধবেন।"

'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যখন হযরত নবী (সা) খায়বার বিজয় করলেন সেখানে তিনি একটি কালো রং-এর গাধা দেখতে পেলেন। তিনি গাধার সাথে কথা বললেন। তিনি গাধাকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমার নাম কি? সে জবাব দিল আমার নাম ইয়াজিদ ইবন শিহাব। মহান আল্লাহ তা'আলা আমার দাদীর বংশে ৬০ টি এমন গাধা জন্ম দিয়েছেন যাদের উপর নবী ব্যতীত কেউ আরোহণ করেনি। আমি আশা করি আপনি আমার উপর আরোহণ করবেন। আমি ছাড়া আমার দাদীর বংশের আর কেউ জীবিত নেই। আর আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যেও আপনি ব্যতীত আর কেউ বাকি নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপর আরোহণ করলেন। এ গাধাটি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ইন্তিকালের পরে তাঁর বিরহ যাতনায় একটি কুয়ায় পড়ে মারা যায়।

(এভাবে একাদশ পাঠে আছেঃ) "তিনি আপন কাপড় ও পোশাক আঙ্গুরের পানি দিয়ে ধুয়ে নিবেন।" এ বাক্যে হিব্রু ভাষা থেকে অনুবাদের সময় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ছিলঃ "তিনি তার কাপড় ও পোশাক আঙুরের পানি থেকে ধুয়ে নিবেন।"

অর্থাৎ সে শেষ যামানার নবীর শরী'আতে মদ হারাম ঘোষণা করা হবে। যেভাবে অন্যান্য নাপাকী থেকে কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করার হুকুম দেয়া হয়, তেমনিভাবে মদ থেকেও কাপড় পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দেয়া হবে।

হয়ত এমনও হতে পারে এখানে আল্লাহ তা'আলার গভীর ভালবাসার মর্ম বুঝানো হয়েছে। আর হযরত নবী করীম (সা)-এর মর্যাদাও এ থেকেও অনেক ঊর্ধ্বে। তিনি যেন অহংকার ব্যতীতই প্রাচীন ও আগত সকলের শ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর উম্মাতের মধ্যে হাজার হাজার শুধু নয়, বরং লাখো লাখো এমন ব্যক্তিও গত হয়েছেন, যাদের আল্লাহর ভালবাসার ক্ষেত্রে ভিন্ন উম্মাতের মধ্যে সমকক্ষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(১২ নং পাঠে আছে ঃ) "তাঁর চক্ষুদ্বয় হবে লাল আর দাঁত হবে দুধের চেয়েও সাদা।" এ আয়াতে সে প্রতিশ্রুত হযরত নবী (সা)-এর হুলিয়া মুবারক-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর চোখ লালচে এবং দাঁত সাদা হবে। এ বিষয়ে যারকানী 'শারহে মাওয়াহিব' গ্রন্থে লিখেছেন, যখন হযরত নবী (সা) ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়ার বসরায় আগমন করেছিলেন যেখানে তিনি ছায়াবিশিষ্ট একটি গাছের ছায়ায় অবস্থান করেছিলেন। যেখানে নাস্তূরা পাদ্রীর আস্তানা ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথের গোলাম মায়সারাকে পাদ্রী প্রশ্ন করেছিল যে, তাঁর চোখে কি লালিমা থাকে? মায়সারা জবাবে তাঁকে জানান রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চোখে সব সময়ই লালিমা থাকে। তখন নাসতূরা বললঃ ইনি শেষ যামানার নবী। হায় আমি যদি তাঁর নবুওয়াতের প্রকাশকাল পেতাম!

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর 'তারীখে মিসর' (মিসরের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখেছেনঃ যখন হযরত হাতিব (রা) হযরত নবী কারীম (সা)-এর পত্র নিয়ে মিসরের রাজা মাকূকাসের দরবারে যান তখন মিসরের রাজা বললেনঃ শেষ যামানার নবীর অন্যতম নির্দশন হচ্ছে, সব সময় তাঁর চোখে লালিমা থাকবে। তখন হযরত হাতিব (রা) বললেন হ্যাঁ, নবী (সা)-এর চোখের লালিমা কখনো হারিয়ে যায় না। মাসায়েল গ্রন্থে আছে– اشكل العينين অর্থাৎ এমন চোখ সাদার মধ্যে যেখানে লালিমা রেখা থাকে। কোন বর্ণনায় 'আদ্‌আজু' শব্দ আছে। যার অর্থ হল চোখের মধ্যে কালো হওয়া। যা হোক, দু'টি বর্ণনার মধ্যে বৈপরীত্য নেই। সৌন্দর্য ও অনুপমের জন্য কালো ও লালিমার প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র কালো অথবা শুধুমাত্র লালিমায় সুন্দর হয় না।

কবি কি সুন্দর বলেছেন ঃ

"দৃষ্টি কেড়ে নিত তাঁর চক্ষু যুগল
কালো-সাদার বাগানে লালিমার ফুল,
শ্রেষ্ঠতম জনের সাদা-কালো নীলিমা
অনুপম আঁখি নীরে গোলাকে ভরা।
আলো উবুল স্রোতাধারা যেন টগবগ করছে,
আঁধার রাতেও জ্বলজ্বল ঝরে ফুটন্ত জ্বলছে।
হৃদয়ে যাদু দিয়ে টেনে নিয়ে যায়,
গভীর অরণ্যে অমানিশায়ও তাঁকে চেনা যায়।
মুখোমুখি দেখে অবাক করা মুখ,
পিছনেও একটুও কম নেই।"

৬ষ্ঠ সুসংবাদ ঃ যবূরে হযরত দাউদ (আ) এর ভাষায় ঃ ৪৫তম অধ্যায়

আমার হৃদয়ে সুন্দর অনেক বিষয় উদিত হয় তার মধ্যে আমি বাদশাহর জন্য যা তৈরি করি তা বর্ণনা করি। আমার ভাষা বিজ্ঞ লেখকের কলম। (২) সৌন্দর্যে তিনি বনী আদমের মধ্যে সেরা। তোমার ঠোঁটে অনুগ্রহ লেগে দেয়া হয়েছে, এ জন্য প্রভু তোমার জন্য চিরদিনের জন্য মুবারক করেছেন।

(৩) হে পাহলোয়ান! তোমার তলোয়ার যা তোমার ভূষণ আর সম্মানের বাহন হিসেবে নিজ পাঁজরে ঝুলায়েছে। (৪) আর নিজ সম্মানের উপর আরোহণ করে তোমার সততা ও তোমার ভদ্রতার মাধ্যমে সৌভাগ্যের প্রাপ্তির জন্য এগিয়ে যাও। আর তোমার ডান হাত অনুদানের কাজ শিখাবে। (৫) তোমার তীর শক্তিশালী, তোমার পিছনে লোকেরা লুটিয়ে পড়ে। তা সে বাদশাহর দুশমনের হৃদয়ে আঘাত করে। (৬) হে চিরন্তন প্রভু! তোমার রাজত্বের দণ্ডপথ নির্দেশনার কাঠি। (৭) তুমি সততার বন্ধু, মন্দের শত্রু, এজন্য তোমার খোদা তোমাকে তোমার সাথীদের থেকে অধিক পছন্দ করেন। (৮) তোমার সততা পোশাক থেকে চন্দন ও গোলাপের সুগন্ধি বের হয়ে তুমি হাতির দাঁতের মাঝেও ভাল আছ। (৯) শাহযাদীগণ তোমাকে ইজ্জত করে। রাণী সোনার গহনা পরে তোমার ডানে দাঁড়িয়ে থাকে।

(আর দ্বাদশ আয়াতে আছে ঃ) আর সূর– এর কন্যা হাদিয়া নিয়ে আসবে। জাতির ধনী লোকেরা তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

(তারপর ১৬ নং আয়াতে আছে ঃ) (১৬) তোমার সন্তান পিতা ও পূর্বপুরুষদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তখন তারা গোটা যমীনের নেতৃত্ব পাবে। (১৭) আমি সমস্ত পূর্বপুরুষকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেব আর সকল মানুষ যুগযুগ ধরে তোমার প্রশংসা করবে। সকল আহলে কিতাবের নিকট বিষয়টি স্বীকৃত।

যবূরে হযরত দাউদ (আ) শানদার অতি মর্যাদাবান একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ভক্তি ও ভালবাসার সাথে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর কিছু গুণ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ প্রতিশ্রুত নবী যখন প্রকাশিত হবেন, তখন তাঁর মধ্যে এসব গুণ থাকবে ঃ

(১) তিনি রাজা ও সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশালী হবেন। (২) তিনি খুবই সুন্দর হবেন। (৩) তাঁর ভাষা হবে সাবলীল, প্রাঞ্জল ও নান্দনিক। (৪) যুগের বরকতময় ব্যক্তি হবেন। (৫) তিনি খুবই শক্তিশালী হবেন। (৬) পাগড়ি পরবেন। (৭) সত্যবাদী ও হক পন্থী হবেন। (৮) ভাগ্যবান হবেন। (৯) তাঁর ডান হাত দিয়ে বিস্ময়কর অভিনব বিষয়ের কারিশমাঁ প্রকাশিত হবে। (১০) তীরন্দাজ হবেন। (১১) আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর অনুগত হবে। লোকেরা তাঁর অনুসারী হবে। (১২) কিয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তার বিধান কার্যকর ও চালু থাকবে। (১৩) তাঁর শাসনের দণ্ড মযবূত থাকবে। (১৪) তিনি সত্যের বন্ধু মন্দের শত্রু হবেন। (১৫) তাঁর কাপড় থেকে সুগন্ধি বের হবে। (১৬) তাঁর ঘরে

শাহযাদীদের আগমন হবে। (১৭) হাদিয়া ও উপহার আসতে থাকবে। (১৮) পিতার অবর্তমানে সন্তানদের নেতৃত্ব ও শাসন কায়েম হবে। (১৯) সকল অনুসারীর মধ্যে যুগ ও শতাব্দী ধরে বংশ পরম্পরায় তাঁর স্মৃতি ও আলোচনা অব্যাহত থাকবে। (২০) যুগ থেকে যুগ লোকেরা তাঁর প্রশংসা করবে।

ইসলামের অনুসারীদের নিকট এসব সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর বেলায়ই প্রযোজ্য। আর ইয়াহূদীরা মনে করে যে, হযরত দাঊদ (আ)-এর পর এখনো এ গুণের সমাহার কোন নবীর মধ্যে হয়নি। নাসারাদের মতামত হচ্ছে, এসব গুণ হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায় প্রযোজ্য। আর মুসলমানগণ মনে করেন যে, এ সুসংবাদ -এর বাস্তব নমুনা হলো হযরত নবী (সা), কেননা সুসংবাদে যে সব গুণের কথা আলোচিত হয়েছে তা শুধুমাত্র নবী করীম (সা)-এর বেলায়ই বাস্তব ও সত্য।

যেমন রাজত্বের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে দিবালোকের মত স্পষ্ট বরং দ্বিপ্রহরের সূর্য থেকেও অধিক আলোকিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রের রাজত্বই দান করেছেন। তিনি আল্লাহর বিধানকে রাজত্বের পদ্ধতিতে কার্যকর করেছেন। নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) ও ইয়াহূদীদের হাতে বাধ্য ও পরাজিত ছিলেন। হযরত নবী (সা) ইয়াহূদী কর্তৃক বাধ্য হবার প্রশ্নও উঠে না, বরং তিনি তাদেরকে তাদের দূর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, নবী করীম (সা) দীন-দুনিয়ার বাদশাহ ছিলেন। তিনি সমস্ত নবী, রাসূলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কোন নবী রাসূলকে কুরআনের মত মু'জিযা আর পূর্ণাঙ্গ বিধানাবলী সম্বলিত দীন ও শরী'আত দেয়া হয়নি। যার মধ্যে পার্থিব ও পরকালীন সফলতা, মুক্তি ও উন্নতির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছার জন্য তিনি এমন সরল রাজপথ তৈরি করেছেন, যে পথে নিরাপদে যাতায়াত করা সম্ভব। তাঁর উপস্থাপিত জীবনের এ পথে সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিকতা, রাজনীতি-কূটনীতি ও নাগরিক ব্যবস্থা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা ও বিধান রয়েছে। বাস্তব পূর্ণতার এক বিশাল ব্যবস্থাই এখানে বর্তমান। সমস্ত অনুপম নান্দনিক ও পূর্ণাঙ্গ রূপের এ ব্যবস্থা ও বিধানাদী শুধুমাত্র ইসলামেই রয়েছে যা মহানবী (সা) আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হয়েছেন।

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসলামই হচ্ছে একমাত্র দীন।" (সূরা আলে ইমরান)

এটি হল সে পূর্ণাঙ্গ দীন যার আবির্ভাবে সকল দীন-ধর্মের প্রদীপ নিভে যায়।

رات محفل میں ہراك مه پاره گرم لاف تها ـ
صبح كوخورشيد جونكلا تومطلع صاف تها ـ

"যখন তিনি (নবী (সা)) নিজ হাত দ্বারা তলোয়ারের ন্যায় ইঙ্গিত করলেন শঙ্কিত মনে; অলৌকিকভাবে তা নিক্ষিপ্ত হল চাঁদের মধ্যভাগে এবং তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।"

এ জন্য বলা যায়, যে নবীর উপর নাযিলকৃত কিতাব সকল আসমানী কিতাব ও সহীফা থেকে সর্বোত্তম, তাঁর শরী'আতের বিধানও হবে সকল শরী'আতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ। তাঁর মু'জিযাও আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সকলের মু'জিযা থেকে সর্বোচ্চ স্থানের মর্যাদার।

তাঁর উম্মাতও একইভাবে অন্যান্য সব উম্মাত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতি, বিশ্বাস-নৈতিকতা, রাজনৈতিক, চরিত্র ও নান্দনিকতা সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। আর সে নবী দীন দুনিয়ার বাদশাহ হবেন, আদি-অন্ত সকল মানুষের নেতা হবেন, এ ব্যাপারে দ্বিধা-সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

২. তাঁর সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য এত অনুপম ও নান্দনিক ছিল যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে অধিক সুন্দর কোন মানুষ দেখিনি। যেন চাঁদ তাঁর চেহারা মুবারকে বিস্ফোরিত হত। যখন তিনি মুচকি হাসতেন তখন দাঁত মুবারকের চমক দেয়ালে বিকীরিত হত।

সাহাবী কবি হাস্সান ইবন সাবিত (রা) বলেন ঃ

وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطُّ عَيْنِىْ * وَاَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ -
خُلِقْتَ مُبَرَّدًّ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ * كَاَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ

"প্রিয়তম আমার চোখ দেখেনি কভু তোমা থেকে অধিক সুন্দর আর কোন নারী প্রসব করেনি, তোমার থেকে সুন্দর, তুমি মুক্ত পবিত্র সকল খুঁত থেকে, যেন তুমি জন্মেছ নিজ কামনা মতে।"

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মিসরের রমণীগণ হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখে নিজ হাতের আঙ্গুল কেটে ফেলেছিল, আর যদি তারা আমাদের হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) কে দেখত, তাহলে তারা কলিজা টুকরা টুকরা করে ফেলত।

اے زلیخا اس کونسبت اپنے یوسف سے نہ دے
اسپہ سرکٹتے ھیں دائم اور اس پرانگلیاں -

মহানবী (সা) এর অনুপম সৌন্দর্য ও রূপ জগত বিখ্যাত ছিল। রূপ-সৌন্দর্যের সাথে তাঁর শান-শওকত, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্যও ছিল। তাঁর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রাখতে লোকেরা সক্ষম হত না।

৩. তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, নান্দনিক শব্দ প্রয়োগ, অনুপম উপস্থাপনা সর্বজন স্বীকৃত ছিল। তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত তথ্য ও তাঁর পবিত্র শব্দ ও কথা

তৎকালীন অবস্থাসহ পরম্পরাযুক্ত সূত্র অনুযায়ী বর্ণিত ও সংরক্ষিত আছে। যার ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্যের অলংকার ও যথার্থ ও সুন্দর উপস্থাপনার অনুমান করা যায়।

৪. তাঁর বরকতের বিষয়টি যা সুসংবাদের ও ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ হয়েছে তা যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মুসলমানের নামাযে পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ-প্রাচ্য পাশ্চাত্যে সব স্থানে প্রতিফলিত হচ্ছে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

"হে আল্লাহ! বরকত দাও মুহাম্মদ (সা)-এর উপর, তাঁর বংশধরদের উপর, যেমনিভাবে বরকত দিয়েছিলে হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই তুমি মহান ও প্রশংসাযোগ্য।"

বরকতের সম্পৃক্ততার জন্য এর থেকে অধিক কিছুর কি আর প্রয়োজন আছে? আর এই দু'আ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তরে করা হয়।

৫. শক্তি ও বীরত্বের অবস্থাও তাঁর এমন ছিল যে, তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পাহলোয়ান রোকানা তাঁর সাথে শক্তি ও বীরত্বে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। একদিন ময়দানে রুকানার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দেখা হয়েছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সা) -কে জানালঃ তুমি যদি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাজিত করতে পার তাহলে আমি তোমাকে সত্য নবী মনে করব। রাসূল (সা) প্রথম বারেই তাকে ধরাশায়ী করলেন। সে দ্বিতীয়বার লড়তে চাইল এবারও নবী (সা) তাকে পরাজিত করলেন। রুকানা পরাজিত হয়ে অবাক হল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর, তবে আরও অবাক করা বিষয় দেখাব। সে বলল, এ থেকেও অবাক করা বিষয় কি হতে পারে? রাসূলুল্লাহ (সা) দূরের একটি গাছকে ডাকলেন। গাছ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর তিনি গাছকে ফিরে যেতে বললেন। গাছ তা শুনে নিজ স্থানে চলে গেল।

৬. তাঁর সাথে তলোয়ার থাকা এবং জিহাদে তৎপর থাকাও পরিচিত বিষয়। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ) না ছিলেন তলোয়ারের সাথে আর না ছিলেন জিহাদে। খ্রিস্টানদের কথা অনুসারে তিনি এতটাই দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন যে, তিনি ইয়াহূদীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতেও সক্ষম ছিলেন না।

৭. রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সত্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর ছিলেন। যে কথা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ -

"তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও হক দীনসহ প্রেরণ করেছেন। যেন তিনি সমস্ত দীনের উপর এ দীনকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা তাওবা ঃ ৩৩)

একবার নাসর ইবন হারিস কুরায়শদেরকে বলল :

قد كان محمد فيكم غلاما حدثًا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظم امانة حتى اذا رأيتم فى صدغيه الشيب وجاكم بما جاءكم قلتم انه ساحر لا والله ما هو بساحر -

"মুহাম্মদ (সা) তোমাদের মধ্যেই বড় হয়েছে তিনি সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, সবচেয়ে অধিক সত্যবাদী, সবচেয়ে আমানতদার। যখন তিনি তোমাদের দিকে অগ্রসরমান হলেন এবং তোমাদের নিকট সত্য দীন নিয়ে এলেন তখন তোমরা তাঁকে যাদুকর, গণক বলতে শুরু করলে। আল্লাহর শপথ তিনি যাদুকর নন।"

রূম সম্রাট হিরাক্ল যখন আবূ সুফিয়ানকে মহানবী (সা) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল যে, তোমরা তাকে মিথ্যা কথার জন্য অভিযুক্ত করেছ কিনা? তখন আবূ সুফিয়ান জবাবে বলেছিল, আমরা কখনো তাঁকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।

৮. সৌভাগ্যবান হবার বিষয়টিও বাস্তব, কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে সৌভাগ্য ও কল্যাণ দান করেছেন আজ পর্যন্ত তা আর কাউকে দান করা হয়নি।

৯. ডান হাতে বিস্ময়কর কর্ম ও আশ্বর্যকর কারিশমাঁ প্রকাশ হবার কথা থেকে তাঁর হাতে চাঁদ দু'টুকরা করার মু'জিযার প্রতি ইশারা রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ও হুনায়নের যুদ্ধে একমুঠো মাটি নিয়ে মুশরিকদেরকে অন্ধ করে দেয়াও ছিল তাঁর ডান হাতের বিস্ময়কর কর্মের বাস্তব নমুনা।

১০. তীরন্দায হওয়া, হযরত ইসমাঈল (আ) -এর বংশের জন্য ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয়। কাজেই হাদীসে আছে ঃ

ارموا بنى اسمعيل فان اباكم كان راميًا -

"হে বনী ইসমাঈল! তীরন্দাযী কর, কেননা তোমাদের পিতা তীরন্দায ছিলেন।"

আরেকটি হাদীসে আছে ঃ

من تعلم الرمى ثم تركه فليس منا -

"যে তীর চালনা শিক্ষা করার পর তা ছেড়ে দিয়েছে, তার সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই।"

১১. তাঁর পিছনে লোকদের সমবেত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি তাঁর অনুগত হওয়া। এ বিষয়টি দিবালোকের মত পরিষ্কার। কেননা অল্প কিছুদিনের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসল তখন আপনি দলে দলে লোকদেরকে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখলেন। অতএব আপনি আপনার রবের তাসবীহ্ ও প্রশংসা করতে থাকুন এবং ইস্তিগফার পড়তে থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অধিক তাওবা কবূলকারী।" (সূরা নাস্‌র)

১২-১৩. তাঁর শরী'আত যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে। এ বিষয়ে কুরআনের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ঃ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرٰى وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।"

দীর্ঘ চৌদ্দশ' বছর বিগত হয়েছে, আল-হামদু লিল্লাহ আল-কুরআনের সামান্যতম কোন কিছু শব্দ বা বর্ণেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। ইনশাআল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত আল কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থাকবে। ইয়াহূদী ও নাসারাদের ও তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলের অবস্থা কি করেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর তাঁর শাসনের সরল লাঠি এবং সততার লাঠি তো সব সময় তাঁর হক প্রতিষ্ঠার ও বাতিলকে প্রতিহত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল।

১৪. মহানবী (সা) সত্যের বন্ধু ও মন্দের দুশমন ছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ـ

"নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের দরদী। তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মু'মিনদের জন্য দয়ালু ও সহানুভূতিশীল।" (সূরা তাওবা ঃ১২৮)

يٰاَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ـ

"হে নবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন, এবং তাদের উপর কঠোরতা আরোপ করুন।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

রাসূল (সা) -এর উম্মাতদের গুণাবলী এভাবে বলা হয়েছে ঃ

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ – اَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ـ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَيَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ ـ

"তারা কাফিরদের সাথে কাঠোর এবং নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল।"[৩] "মুমিনদের সাথে বিনয়ী আর কাফিরদের সাথে শক্ত।" (সূরা ফাতহ্ ঃ ২৯)

"তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। কোন সমালোচকের সমালোচনার পরোয়া করে না।" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

হয়ত মন্দ বলতে আবূ জাহলকে বুঝানো হয়েছে, কেননা সেই ছিল অনিষ্টের হোতা। তেমনিভাবে সত্যায়নের দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) -কে বুঝানো হয়েছে যিনি সত্য ও সততার মূর্তপ্রতীক ছিলেন। আর নিশ্চয়ই হযরত আবূ বকর (রা) হযরত নবী (সা) -এর একান্ত বন্ধু হবার যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন।

১৫. তাঁর কাপড় থেকে খুশবু বের হত। এমনকি এক মহিলা রাসূল (সা)-এর ঘাম এজন্য জমা করেছিলেন যেন নতুন বউ সাজাতে কাপড়ে তা ব্যবহার করতে পারেন।

১৬. ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে অনেক শাহযাদা রাজপুত্র মুসলমানদের খাদিমে পরিণত হয়েছিল। পারস্য সম্রাট কিসরার শাহযাদী হযরত হুসায়ন (রা)-এর গৃহে ছিলেন।

১৭. হাবশার রাজা নাজাশী, বাহরাইনের রাজা এবং ওমানের বাদশাহসহ অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ্ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়েছিলেন। শাসক আমীর-ওমারাগণ রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে মূল্যবান হাদিয়া পৌঁছাতে পেরে গর্ববোধ করতেন। কিবতি রাজা মাকূকাস রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর খিদমতে তিনটি দাসী, একটি হাবশী গোলাম, একটি সাদা খচ্চর, একটি সাদা গাধা ও একটি ঘোড়া সহ মূল্যবান কাপড় হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।

১৮. রাসূলুল্লাহ (সা) -এর পরে কুরায়শদের খিলাফত চালু ছিল। তাঁর সন্তানদের মধ্যে হযরত হাসান (রা) খলীফা হয়েছিলেন। হযরত হাসান (রা)-এর বংশধরদের মধ্যে শত শত খলীফা ও শাসক হয়েছে। হেজায, ইয়ামন, মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশ ও জনপদে তাঁরা শাসন ও রাজত্ব করেছেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ইমাম হুসায়ন (রা)-এর বংশে ইমাম মাহ্দী (আ) এসে সমস্ত দুনিয়ায় খিলাফত পরিচালনা করবেন।

১৯-২০. মহানবী (সা) -এর সুনাম ও খ্যাতি কিয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। প্রত্যেক দিন ৫ বার আযানে মুসলমানগণ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ঘোষণার সাথে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللّٰهِ ঘোষণা করে থাকেন। কোন সমাবেশ, মাহফিল, ওয়ায দু'আর অনুষ্ঠান এমন নেই যেখানে নবী (সা) -এর স্মরণ ও আলোচনা করা হয় না। মুহাম্মদ ও আহমাদ নাম সমার্থক। আর আসমানী কিতাবের সুসংবাদে আহ্মাদ শব্দটি স্পষ্ট ভাষায় ছিল কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শব্দটিকে পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এসব গুণ হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত আর কারো ব্যাপারে বাস্তব ও সত্য হতে পারে না।

খ্রিস্টানদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মাসীহ ইবন মারইয়াম এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। এ জন্য তারা ৫৩ নং পাঠ যা সহীফায়ে ইয়াসইয়া (আ) -এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। হযরত ঈসা মাসীহ (আ) -এর বেলায় সুসংবাদ বলে মনে করে থাকে। আর তা হচ্ছে ঃ

"আমাদের পয়গামে কে বিশ্বাস দিলেন এবং খোদার হাত কার উপর প্রকাশিত হল? তার ঢাকঢোলে কোন আকর্ষণ ছিল না, কোন আবেদনও ছিল না যে, আমরা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করব কি বা তার কোন দৃষ্টান্তও ছিল না যে, আমরা সেদিকে ঝুঁকে পড়ব। তিনি মানুষের মধ্যে নগণ্য ও হীন অবস্থায় ছিলেন?"

অন্য পাঠে আছে ঃ "তিনি আমাদের পাপের উৎস প্রতিহত করেছেন। আমাদের মন্দ কাজকে দূর করেছেন।" নাউযুবিল্লাহ্, যখন নাসারারা হযরত ঈসা (আ) -এর ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস করে, তখন যবূরে বর্ণিত এর বিপরীত গুণের প্রতিফলন তিনি কিভাবে হতে পারেন? আমাদের বিশ্বাস সহীফায়ে ইয়াসইয়া এর ৫৩ নং আয়াত পরিষ্কারভাবে নতুন সংযুক্তি তথ্য বিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের ধারণা ও বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) কখনোই এরকম হতে পারেন না। হযরত ঈসা (আ) ছিলেন পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মানিত মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। একই সাথে বলা যায়-এসব সুসংবাদের উপলক্ষ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন না। কেননা পাগড়ী পড়া, তীরন্দায মুজাহিদ এসব পরিচিতি তাঁর ছিল না এবং তাঁর শরী'আত ও স্থায়ী ও চিরস্থায়ী ধরনের ছিল না। তিনি সকলের জন্য সাধারণভাবে আবির্ভূত হননি। তাঁর গৃহে কোন শাহযাদী আসেনি যে তার পত্নী বা দাসী হতে পারে। বস্তুত তিনি বিবাহই করেননি এবং তাঁর কোন পিতা ও পিতামহ ছিলেন না।

৭ম সুসংবাদ ঃ যাবূরের ১৫৪৯ অনুচ্ছেদে হযরত দাঊদ (আ)

১. খোদার শোকর কর, প্রশংসা কর লোক সমাবেশে তাঁর স্তুতি গাও।

২. ইসরাঈল স্রষ্টার উপর খুশী ছিল আর বনী ইসরাঈল নিজেদের বাদশাহর মাধ্যমে খুশি হবে।

এসব সুসংবাদে প্রতিশ্রুত নবীকে বাদশাহ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে যোগ্য ও পবিত্র ব্যক্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত নবী রাজা হবেন। তাঁর শাসনের তরবারি আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ও আল্লাহর গযবের ক্ষেত্রে কাফিরদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তিনি তাঁর সাথী ও সমর্থকদের নিয়ে কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

এসব কিছুর পরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর অনুসারীদের গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে আর যা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি হযরত মুহাম্মদ (সা) -এর উম্মাতের বেলায় প্রযোজ্য। তাঁরা এমন যারা বিছানায়ও আল্লাহর যিকির করেন। যে কথা আল্লাহ তা'আলা

বলেছেন ঃ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهِ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ "তারা দাঁড়িয়ে, বসে ও বিছানায় গিয়েও আল্লাহর যিকির করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

আর এই উম্মাত সবক্ষেত্রে সব পর্বে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা বা তাক্‌বীর করে থাকে। যেমন ঃ জিহাদের ময়দানে, প্রতিদিন আযানে, ঈদুল ফিতরে, ঈদুল আযহা, ঈদ পরবর্তী তিন দিনে, হজ্জের দিনগুলোতে, এবং মিনায় অবস্থানকালে, মুযদালিফায়, আরাফাতে। এসব স্থানে আল্লাহ্ আকবার তাক্‌বীরের প্রবল ঘোষণা হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ইয়াহূদী ও নাসরারা তাকবীর করে না বরং ইয়াহূদী বা িংগায় আওয়াজ দেয় নাসারারা ঘন্টা বাজায়। আল্লাহ আকবার শ্লোগান শুধুমাত্র হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) -এর উম্মাতের সংস্কৃতি। মুহাজির ও আনসারদের দু'দিক তীক্ষ্ণ তরবারির মাধ্যমে রূম-সিরিয়া সহ অন্যান্য রাজ্য বিজয় করেছেন। আর তাঁরা বড় বড় অনেক রাজা ও আমীরকে বন্দী করেছেন। আলোকিত সুসংবাদের বাস্তব নমুনা নাসারাদের নিকট হযরত সুলায়মান (আ) হতে পারেন না। কেননা আহ্‌লে কিতাবদের বিশ্বাস (নাউযুবিল্লাহ) তিনি শেষ বয়সে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন ও মূর্তিপূজা শুরু করেছিলেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর বেলায়ও এ সুসংবাদ প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বিশ্বাস হল হযরত ঈসা (আ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়েছেন এবং বেশির ভাগ হাওয়ারীকে বন্দী করা হয়। তাঁরা অন্য বাদশাহ ও আমীরদেরকে কিভাবে গ্রেপ্তার করবে? সুসংবাদে আছে, প্রতিশ্রুত ব্যক্তি বাদশাহ হবেন। আর একথা পরিষ্কার যে, হযরত ঈসা (আ) বাদশাহ ছিলেন না। নৈতিক রাজত্ব তো সকল নবীর বেলায়ই প্রযোজ্য, এখানে ঈসা (আ) -এর বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না।

আরেকটি বিষয় হল কাফিরদের সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে বন্দী করা আর এসব কিছুই ইবাদতের মধ্যে শামিল। এ ক্ষেত্রে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

কেননা হযরত মূসা (আ) -এর পরে হযরত ইউশা ইবন নূন (আ) জিহাদ করেছেন এবং এভাবে হযরত সুলায়মান (আ) -এর জিহাদ করা ইয়াহূদী ও নাসারা সকলের নিকটই স্বীকৃত বিষয়। এ জন্য পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তব নমুনা হযরত ঈসা (আ) হতে পারেন না। যবূরে এ বিষয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলেছে যে, আগত নবী বাদশাহ হবেন। নিজের সাথীদেরকে নিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। স্বৈরাচার শাসকদেরকে হত্যা করবেন, বন্দী করবেন এবং তাঁর সাথীগণ তাকবীর বা আল্লাহু আকবর শ্লোগান দিবেন।

আর যবূরের ভবিষ্যদ্বাণীর সকল বিষয়ই মহানবী (সা) -এর হাতেই প্রকাশিত ও প্রতিফলিত হয়েছে।

৮ম সুসংবাদ ঃ যবূর ঃ৭২ অধ্যায় প্রথম পর্ব

(১) হে খোদা বাদশাহকে ইনসাফ দান কর আর বাদশাহর সন্তানকে সততা প্রদান কর। (২) সে তোমার বান্দাদের মধ্যে সততার হুকুম দিবে এবং তোমার গরীব বান্দাদের সাথে ইনসাফ করবে। (৩) পাহাড় মানুষের জন্য নিরাপদ হবে, টিলায়ও সততা পৌঁছবে। (৪) সে জাতি দরিদ্রদের সাথে ইনসাফ করবে, অভাবীদেরকে রক্ষা করবে, যালিমদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিবে। (৫) যতদিন চাঁদ ও সূর্য অবশিষ্ট থাকবে তোমাকে লোকেরা সমীহ করবে। (৬) তুমি বৃষ্টি ও মেঘের ন্যায় যমীনকে সিক্ত করবে, লতাপাতা উর্বর করবে। (৭) যতদিন চাঁদ অবশিষ্ট থাকবে, তুমি সততার সাথে থাকবে ও নিরাপত্তা দিবে। (৮) সমুদ্রের সীমা ছাড়িয়ে নদ-নদী পেরিয়ে যমীনে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। (৯) মরুভূমির অধিবাসীরা তাঁর সামনে আনুগত্য প্রকাশ করবে আর তাঁর শত্রুরা ভূলণ্ঠিত হবে। (১০) দ্বীপের রাজারা এবং সাবার রাজা তাঁর জন্য হাদীয়া পেশ করবে। (১১) সকল রাজা তাঁকে মান্য করবে, সকল সম্প্রদায় তাঁর অনুগত হবে। (১২) দরিদ্র ও আর্তের সেবা ও সহযোগিতা করবে। (১৩) গরীব দুঃখী মানুষকে রক্ষা করবে। তারা তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিবে, গযব ও যুলম থেকে রক্ষা করবে। তাদের কাছে রক্তের মূল্য গুরুত্ব পাবে। (১৫) তিনি বিজয়ী হতে থাকবেন। সাবা রাজ্যের সোনা তাঁকে প্রদান করা হবে। তার প্রতি শুভ কামনা ও সাধুবাদ প্রতিদিন ব্যাপক হারে চর্চা হবে। (১৬) যমীনের উৎপাদনের সীমা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছবে। ফল ও ফসল লেবাননের গাছের ন্যায় সারিসারি হবে আর শহরের লোকেরা শস্য-শ্যামল ঘাসের ন্যায় সজীব ও তারুণ্যে পূর্ণ হবে। (১৭) সূর্য যতদিন অবশিষ্ট থাকবে, তার সুনামও ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। গোটা জাতি তার প্রতি শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানাবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যবূরে এমন নবীর আবির্ভাবের সংবাদ দেয়া হয়েছে যিনি আল্লাহর পক্ষ হতে নবুওয়াত-রিসালাত প্রাপ্তির সাথে সাথে রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতাও প্রাপ্ত হবেন। তাঁর রাজত্বের সীমা এত ব্যাপক হবে যে, গভীর মহাসাগরও তার আওতায় আসবে। তাঁর ইনসাফ ও সততার সাথে তাঁর সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি গরীব, অসহায়, অভাবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবেন। আলিমদেরকে পরাজিত করে দিবেন, দুশমনেরা তাঁকে ভয় পাবে। পৃথিবীর রাজাগণ তাঁকে হাদিয়া প্রদান করবে। সকল গোত্র সম্প্রদায় তাঁর আনুগত্য করবে। চারদিক থেকে প্রতিদিন তাঁর প্রতি শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানানো হবে। অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন থাকবে। যতদিন সূর্য আছে, তাঁর নামও পরিচিত থাকবে।

বিবেকবান ব্যক্তিগণ! সাধারণভাবে চিন্তা করে দেখুন, উল্লেখিত বিষয় সাধারণভাবে চিন্তা করে দেখুন, উল্লেখিত গুণাবলী হযরত ঈসা মাসীহ (আ) -এর মধ্যে ছিল না, বরং

আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যেই এসব গুণ পুরোপুরি বর্তমান ছিল। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ) ও হযরত যুল-কারনাইন (আ)-এর ন্যায় বিশাল রাজত্ব দান করেছিলেন এর মাধ্যমে তিনি মানুষের সমাজে ইনসাফ ও সততার ভিত্তিতে সুশাসন কায়েম করেছিলেন। পৃথিবীর মানুষ তাঁর স্বচ্ছতা ও ন্যায় বিচারের শাসন ভিন্ন কোন নমুনা প্রত্যক্ষ করেনি। যালিমদের থেকে মযলূমদের বদলা নেয়া হয়েছে আর যমীনকে যুলম ও গযবমুক্ত করা হয়েছে। মহা-সাগর, মরুভূমি, বন-জঙ্গল সব এলাকায় তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুশমনেরা তাঁকে ভয় পেত, বড় বড় রাজারা তাঁর সামনে মাথা নত করে উপহার সামগ্রী তাঁর দরবারে প্রেরণ করেছে। তিনি ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ ও যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। তাঁর শাসনের স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচারের ধারাবাহিকতাকে চরম উন্নীত করে হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা) এবং ফারূকে আযম (রা) বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন। যত দিন চাঁদ-সূর্য আছে, পৃথিবী বাকী থাকবে, তাঁর নাম নামাযে, দুরূদেও মিহরাবে উচ্চারিত হতে থাকবে। শুধু তাই-ই নয়, খুতবাতে তাঁর নামের সাথে হযরত খুলাফায়ে রাশেদীনের নামও সম্মানের সাথে উচ্চারিত হতে থাকবে– যারা পৃথিবীতে ইনসাফ ও সততার ঝাণ্ডা বুলন্দ করে গেছেন।

ইয়াহূদী পণ্ডিতদের প্রতি প্রশ্ন, তোমরা সততার সাথে এ কথার জবাব দাও যে, ইনসাফ ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শাসন পরিচালনায় যে ভবিষ্যদ্বাণী যবূরে করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা) ব্যাতীত আর কে, কোথা ও কবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? উল্লেখিত গুণাবলী ও পরিচয় হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর হাওয়ারীদের বেলায় বাস্তবায়িত হবার কোন চিত্র দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব জ্ঞানী ও গুণীজনের প্রতি আবেদন, নিবেদন যবূরের ১১২ থেকে ১১৩ অনুচ্ছেদ এবং উল্লেখিত ৭২ অনুচ্ছেদ ও পরিশিষ্টে উল্লেখিত গুণ হযরত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানবী (র) -এর ফার্সী ভাষায় রচিত্র গ্রন্থ 'ইযালাতুল্ আওহাম' (ازالة الاوهام)। পৃষ্ঠা ৪৭০ থেকে ৪৭৫ দেখা যেতে পারে।

৯ম, সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে মালকী (আ) ৩য় অধ্যায় ১ম পাঠ

দেখ আমি আমার রাসূলকে প্রেরণ করব এবং সে আমার পূর্বে আমার পথকে সংস্কার করবে----

"সে অবশ্যই আসবে। মহা প্রভু বলেন, তাঁর আগমনের দিনকে কেউ রহিত করতে পারবে না। তিনি অবশ্যই প্রকাশিত তাঁর সামনে কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যে খোদার তোমরা তালাশ কর, হ্যাঁ খাতনার রাসূল আসবে তোমরা খুশী হবে।"

এই সুসংবাদে এমন রাসূলের কথাই বলা হয়েছে যিনি খতনার প্রচলন করবেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর আগমনের পূর্বে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ খাতনাকারী রাসূলের প্রতীক্ষায় ছিল। রূম সম্রাট কায়সারও সে খাতনাকারী রাসূলের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল যা সহীহ বুখারীর হাদীসে হিরাকল থেকে জানা যায়। তবে আধুনিক কপিতে খাতনার রাসূল -এর স্থলে প্রতিশ্রুত রাসূল শব্দ পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুত বলতে খাতনাকে বুঝানো হয়। যেমন জন্ম সফর (আদি পুস্তক) -এর ৭ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ "আর আমার প্রতিশ্রুতি যা আমার সাথে তোমাদের সাথে হয়েছে তা হল, তোমার পরে তোমার বংশে এমন একজন হবে যাকে তোমরা স্মরণ রাখবে। তার সকল সন্তান (বংশধর) খাতনা করবে। তোমরা খাতনা কর। আর এটি হল তোমাদের সাথে আমার প্রতিশ্রুতির প্রতীক।"

১০ম সুসংবাদ ঃ সহীফা হাবকুক (আ) ৩য় অধ্যায় ৩য় পাঠ

তায়মানের প্রভু হতে, আর তিনি মহাপবিত্র ফারান পাহাড় থেকে এসেছেন। তাঁর মর্যাদার আলোকে আকাশ চমকে উঠেছে আর যমীনে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, প্রত্যেক শত্রু-মিত্রের মুখে তাঁর নাম' মুহাম্মাদ-আহমাদ'। প্রাচীন আরবী একটি কপিতে এভাবে আছে। অর্থাৎ তামাম যমীন আহমাদ (সা)-এর প্রশংসায় ভরে গেছে। কিন্তু হিংসুকেরা এ বাক্যটিকে যবূরে বর্তমান রাখেনি। পরবর্তী সংস্করণে তারা এ কথাটি বাদ দিয়েছে। বস্তুত সমস্ত দুনিয়া তাঁর হিদায়তে আলোকিত হয়েছে।

১১শ সুসংবাদ : সহীফা ইয়াস্ইয়া (আ) ২১ অধ্যায়, ৬, ৭ আয়াত

মহা প্রভু আমাকে বলেছেন ঃ "পৃথিবীতে যা দেখবে বর্ণনা করবে। তিনি দু'জন আরোহীকে আগমন করতে দেখেছেন। একজন গাধার উপর আরোহী, আর একজন উটের উপর আরোহী।

এই সুসংবাদে ইয়াসইয়া (আ) দু'জন নবীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

এক ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি ইশারা করে গাধার উপর আরোহী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হযরত ঈসা মাসীহ (আ) গাধার উপর আরোহণ করে ইয়ারশলম বা বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন করেছিলেন।

দুই ঃ হযরত নবী করীম (সা)-এর প্রতি ইশারা করে উটের আরোহী বলে উল্লেখ করেছেন যা আরবের বিখ্যাত বাহন। অতএব মহানবী (সা) যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করেন তখন তিনি উটে আরোহী ছিলেন। তারপর নবম আয়াতে বাবেল শহরের পতনের কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বাবেলের পতন হয়েছে, হযরত মাসীহ বা হাওয়ারীদের সময় বাবেল শহরের পতন হয়নি।

১২শ সুসংবাদ ২১ অধ্যায়, আয়াত ১৬ ও ১৭ এতে আরবের ইল্হামি বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ খোদা তা'আলা আমাকে এভাবে বলেছেন ঃ (১৬) এক বছরের মধ্যে

কেদারদের সমস্ত প্রভাব ভূলুণ্ঠিত হবে। (১৭) তীরন্দায লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে অন্যদিকে কেদারদের বাহাদুরগণের পতন হবে। ইসরাঈলের খোদা এভাবেই বলেছেন।

তাই দেখা যায় যে, হিজরতের এক বছরের মধ্যে বদরের যুদ্ধে কেদার অর্থাৎ কুরায়শদের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাদের নেতারা সকলে নিহত হয় এবং সত্তরজন বন্দী হয়, অনেকে আহত হয়। বনী কেদার যে বনূ ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়টি তাওরাত ও অন্যান্য ইতিহাস থেকে প্রমাণিত ও নাসরাদের পণ্ডিতদের স্বীকৃত। ২৪ অধ্যায়ের **২৩ নং ১৩শ সুসংবাদ আয়াতে** বলা হয়েছে ঃ "চাঁদ ম্লান হয়ে গেছে, সূর্য লজ্জিত যে, যখন খোদায়ী বাহিনী সীবুন পাহাড় ও ইয়ারশলমে তাদের মর্যাদাবান দলের পূর্বে প্রভাব প্রতিপত্তির সাথে রাজত্ব করবে।"

আর হযরত নবী (সা) অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদার সাথে রাজত্ব করেছেন। চাঁদের রূপ পরিবর্তন মানে তার অবস্থার পরিবর্তন হওয়া আর তা দু'টুকরা হয়ে যাওয়া। যে কথা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ـ

"কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে চাঁদ দু' টুকরা হয়ে গেছে।" (আল-কামার ঃ ১) 'সূর্যও লজ্জিত হয়েছে' খায়বার যুদ্ধের সময় সূর্যকে তার গতি স্তিমিত করতে হয়েছে।

১৪শ সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে ইয়াসয়া (আ) ২৮ অধ্যায় ঃ ১৩ আয়াত ঃ এভাবে বলা হয়েছে ঃ

"খোদায়ী কালাম তাদের প্রতি এভাবে হবে যে, হুকুমের পর হুকুম আসবে এভাবে ধারাবাহিকভাবে বিধানের পর বিধান। কিছু বক্তব্যের পর আবার বক্তব্য।"

তাই লক্ষ্য করা যায় যে, পবিত্র আল-কুরআন ঠিক এভাবে কিছু অংশ কিছু অংশ করে পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। অন্যদিকে খ্রিস্টান পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে ইঞ্জিল আল্লাহর কিতাব নয়, বরং ইঞ্জিল হল হযরত ঈসা (আ)-এর সাহাবী বা হাওয়ারীদের বক্তব্য। উল্লেখিত সহীফার বক্তব্য থেকে জানা গেল, আলোচিত কিতাব অবশ্যই আল্লাহর কিতাব হতে হবে।

আমরা জানি হযরত ঈসা (আ)-কে যে ইঞ্জিল দেয়া হয়েছিল, তা একবারেই নাযিল হয়েছিল। কুরআনের মত পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়নি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً ـ

"আমি কুরআনকে টুকরো টুকরো করে নাযিল করেছি যেন তুমি মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পার আর আমি কুরআনকে পর্যায়ক্রমে বারবার নাযিল করেছি।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০৬)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً ـ

"আর কাফিরেরা বলে কুরআন একসাথে সবটুকু নাযিল হল না কেন? (আপনি জানিয়ে দিন,) আমি এভাবে নাযিল করেছি যেন আপনার হৃদয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠিত থাকে আর এজন্যই আমি পর্যায়ক্রমে কুরআনের পাঠ অবতরণ করেছি।" (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

পঞ্চদশ সুসংবাদ সহীফায়ে ইয়াসাইয়া ৪২ অধ্যায়ের ১ম আয়াত

"তোমরা দেখ, আমার প্রিয় সম্মানিত বান্দা যাকে আমি নিরাপত্তা দিয়েছি। আমি তার উপর খুশি আমি তার উপর আমার রূহ্ রেখেছি। সে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।"

এই সুসংবাদটিও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য প্রযোজ্য। কেননা তাঁর নামের মধ্যে আবদুল্লাহও একটি নাম ছিল। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ "যখন আবদুল্লাহ দাঁড়ালেন"। আরও অন্যান্য আয়াতেও কুরআনে মহানবী (সা)-কে আবদুল্লাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ ـ

"আল্লাহ তা'আলা পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

"সে সকল বিষয়, যা আমি আমার বান্দার উপর নাযিল করেছি।" (সূরা বাকারা ঃ ২৩)

পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দাহ্ নন্ বরং তিনি প্রভু বা খোদা, এজন্য তিনি এ সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হতে পারেন না। মনোনীত সম্মানিত বিষয়টি হযরত মুস্তফা (সা)-এর বেলায় অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা মুস্তাফা রাসূল (সা)-এর অন্যতম বিখ্যাত নাম। 'আমি তাঁর উপর খুশি শব্দটিও হযরত রাসূল (সা)-এর 'মুরতাযা' নামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী 'আমি তাঁর উপর খুশি এ কথা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) শূলবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। অথচ নাসারাগণ মনে করে থাকেন, যে ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়, সে অভিশপ্ত ব্যক্তি। যেমন গালীতের ৩য় পত্র থেকে ১৩শ পত্র থেকে জানা যায়। "মাসীহ আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়েছেন। এজন্য আমরা লটারী করে বিধানকে অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছি। কেননা লেখা আছে যে শূলবিদ্ধ হয়, সে অভিশপ্ত হয়। এ কথা থেকে জানা গেল,

নাউযুবিল্লাহ নাসারাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর উপর সন্তুষ্ট নন।

মূলকথা ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমাদ মুরতাযা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই আল্লাহর মনোনীত সম্মানিত বান্দা ও রাসূল, যার উপর আল্লাহ তা'আলা রাযী-খুশি আছেন। সীরাতের গ্রন্থে মহানবী (সা)-এর নামসমূহের মধ্যে মুরতাযা ও রাদিয়া লেখা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর সাহাবায়ে কিরামের নামের সাথে রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের পরিচিতি ও সংস্কৃতির অংশ হয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর রাজি-খুশি হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আপনার সাথে শপথ করেছে"। (সূরা ফাতহ ঃ ১৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ـ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ ـ

"মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। যারা তাঁর সাথে আছেন তারা কাফিরদের সাথে কঠোর আর নিজেদের মধ্যে পরস্পরে সহানুভূতিশীল। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে রুকূ'রত ও সিজ্‌দারত অবস্থায় তাঁরা আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের চেহারায় তাক্‌ওয়া ও সিজ্‌দার প্রভা প্রকাশিত। তাদের পরিচয় ও মর্যাদার কথা তাওরাত ও ইঞ্জিলে আলোচিত হয়েছে"। (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

৪. রূহ অর্থ আল্লাহর অহী যার উপর হৃদয় ও আত্মার অস্তিত্ব নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا ـ

"এভাবে আমি তোমার নিকট আমার হুকুমের অহী প্রেরণ করেছি।"

আল-হাম্‌দুলিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা মৃত হৃদয় ও আত্মাকে জীবন্ত করার জন্য তাঁর উপর এমন এক রূহ্ অর্থাৎ কুরআন নাযিল করেছেন যার মধ্যে হাজারো মৃত হৃদয় জীবন ও যিন্দেগী লাভ করেছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ

"আমি এমন কুরআন নাযিল করেছি যেখানে মু'মিনদের জন্য সরাসরি চিকিৎসা ও রহমত রয়েছে।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

৫. আদালত বা ন্যায়বিচার প্রসঙ্গ ঃ মহানবী (সা) নবী হিসেবে আগমন করে আল্লাহর নির্দেশে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ -

"অতঃপর এইভাবে আহবান কর এবং-এর উপর দৃঢ় থাক যে বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর তাদের কামনা-প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না। আর বল, আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর নাযিল করা কিতাবের উপর এবং আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তোমাদের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।" (সূরা শূরা ঃ ১৫)

ইনসাফ, প্রতিষ্ঠা প্রভাব ও মর্যাদার বিষয় এজন্য নাসারাদের দাবি অনুযায়ী এগুণও হযরত ঈসা (আ)-এর উপর প্রযোজ্য হতে পারে না। কেননা তাদের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ)-এর এতটুকু শক্তি ও প্রভাব ছিল না যা দিয়ে তিনি তার নিহত হওয়া ও শূলবিদ্ধ হওয়াকে রোধ করতে পারতেন আর প্রভাব-প্রতাপ ত দূরের কথা।

৬.আবার উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আছে ঃ

"তিনি চিৎকার করে কথা বলবেন না। বুক উঁচু করে রাখবেন না, বাজারে তিনি আওয়াজ করবেন না।" এ আলোচনা ও কথাও হযরত নবী (সা)-এর ক্ষেত্রে হুবহু বাস্তব সত্য ও প্রতিফলিত। সহীহ বুখারীতে বাজারে ঘুরাফেরা করার অপছন্দ অনুচ্ছেদে আতা ইবন ইয়াসির (রা) থেকে রিওয়ায়াত আছে যে, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবন আ'স (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যে সব গুণ তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে, তা আমাকে শুনান। জবাবে তিনি অনেকগুলো গুণ উল্লেখ করলেন। সামষ্টিকভাবে সে গুণগুলো হল ঃ

ليس بفظ ولا غليظ ولاسخاب بالاسواق -

"তিনি কঠোর হৃদয়ের নন্, কর্কশভাষী নন এবং বাজারে তিনি উচ্চস্বরে হাঁকডাক করেন না (জোরে আওয়াজ করেন না)।"

৭. উল্লেখিত অধ্যায়ের ৩য় আয়াতে আছে ঃ তাঁর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হবে। অর্থাৎ তিনি নবী হিসেবে শাসক ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতাও হবেন। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ) নামেমাত্র শাসকও ছিলেন না। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি, অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থাও করেননি। অতএব-এর বাস্তব নমুনা আমাদের নবী (সা)-ই হতে পারেন। স্থায়ী ইনসাফের বিষয়টিও নবী (সা)-এর বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা তাঁর শরী'আত ও সুশাসন অব্যাহত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। ইন্শা'আল্লাহ এই ধারা অব্যাহত থাকবে। কোন জাতি এ ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের

সমকক্ষ হতে পারবে না। অন্য কোন উম্মত তাদের নবীর শরী'আত পালনে ও বাস্তবায়নে নবী (সা)-এর উম্মাতের দশভাগের একভাগও সক্ষম হয়নি। তাঁর শরী'আত অব্যাহত থাকার বক্তব্য থেকে তিনি শেষনবী হওয়ার প্রতি ইশারা রয়েছে। যখন তাঁর শরী'আত কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এজন্য আর অন্য কোন নবী প্রেরণের প্রয়োজন নেই। কেননা নতুন কোন নবী আসলে নতুন শরী'আত হবে এবং পূর্বের তাঁর শরী'আতের অব্যাহত ধারা ব্যাহত হবে।

৮. উক্ত অধ্যায়ের চতুর্থ আয়াতে আছে ঃ "তার কোন বিলুপ্তি হবেনা বরং অব্যাহতভাবে চালু থাকবে যতদিন যমীন আবাদ থাকবে। তাঁর হিদায়েত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে যমীন ধ্বংস হবেনা।"

নবী করীম (সা)-এর যখন ইন্তিকাল হল তখন দেখা গেল এ যমীনে তাঁর হিদায়েত পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

"আজকের দিনে আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমি তোমাদের উপর আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম আর তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে আমি পসন্দ করলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ـ

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সরাসরি বিজয় দিয়েছি।" (সূরা ফাতহ ঃ ১)

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ـ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছল।"

আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষেত্রে সবকিছু কার্যকরী হয়েছে। এমনও হতে পারে হিদায়েতের পুরো বাস্তবায়নের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা হযরত সিদ্দীকে আকবরের খিলাফতের প্রতি ও ইঙ্গিত করা হয়েছে, কোন কোন আলেম তা-ই মনে করে থাকেন।

অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে হিদায়েতের সাথে সততা ও সাদাকাতের সম্পর্ক রয়েছে, আর সাদাকাতের সাথে সিদ্দীকের সম্পর্ক আছে। তেমনিভাবে আদল ও ইনসাফের সাথে মর্যাদার সম্পর্ক রয়েছে। হযরত রাসূলে করীম (সা)-এর ইনতিকালের সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা)-কে ইমাম বানিয়ে একথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার ইন্তিকালের পরে হযরত আবূ বকরেরই খলীফা হওয়া উচিত, তাহলে সাদাকাত ও হিদায়েত প্রতিষ্ঠিত হবে।

৯. ৬ষ্ঠ আয়াতে এভাবে আছে ঃ "তোমার হাত ধরে রাখব ও তোমার নিরাপত্তা দেব।" এই কথাটিও রাসূলুল্লাহ (সা) ব্যতীত অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে না, কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করেছেন ও ওয়াদা করেছেনঃ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মানুষের হাত থেকে হিফাযত করবেন।" (সূরা মায়িদা ঃ ৬৭)

বস্তুত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে নাসারাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ) -এর জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১০. তারপর ৬ষ্ঠ আয়াতে যে নূরের কথা বলা হয়েছে যে, লোকদের জন্যও প্রতিশ্রুতির জন্য তোমাকে নূর দেয়া হবে এতে নূরে হিদায়েত ও নূরে শরী'আতই বুঝায়। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا۔

"হে মানুষ! তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ হতে প্রমাণ এসেছে, এবং আমি নাযিল করেছি তোমাদের নিকট স্পষ্ট নূর।" (সূরা নিসা ঃ ১৭৪।)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

"যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁকে সাহায্য করেছে ও এই নূরের আনুগত্য করেছে যা আপনার উপর নাযিল হয়েছে, এই লোকেরা সফলকাম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৭।)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۔

"হে নবী! আমি তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ করে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আহ্যাব ঃ ৪৫)

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۔

"কাফিরেরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নূরকে অবশ্যই পূর্ণতা দিবেন, যদিও মুশরিক বা তা অপছন্দ করে। (সূরা সাফ্ফ ঃ ৮)

১১. ৭নং আয়াতে "নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি অন্য কাউকে দান করব না" একথা হযরত নবী (সা)-এর বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সঠিক– কেননা তিনি বলেন ঃ

أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء قبلى

"আমাকে আল্লাহর পক্ষ হতে যেসব জিনিস প্রদান করা হয়েছে তা ইতিপূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি।"

যেমন খতমে নবূওয়াত ও রিসালাত, সকল মানুষের জন্য নবী হিসেবে দাওয়াতের দায়িত্ব, মাকামে মাহমূদ, মহান শাফা'আত, সপ্ত আকাশের মি'রাজ, এসব বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, শান-শওকত একমাত্র আমাদের নবী ব্যতীত অন্য কোন নবী-রাসূলকে দেয়া হয়নি। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেসব বিষয় দান করেছেন তার মধ্যে আছে ঃ স্পষ্ট আয়াত, চারিত্রিক উৎকর্ষতার মর্যাদা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, যা অন্য কোন নবীকে এতটুকু দান করা হয়নি। বিশেষ করে আল-কুরআনের মত মু'জিযা, যার সামনে সকলকেই মাথানত করতে হয়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

"এসব আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তা দান করে থাকেন।" (সূরা হাদীদ ঃ ২১)

১২. ১১তম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "আরবের মরুভূমিতে ও জনপদে কেদার পার্বত্য এলাকায় তিনি তাঁর আওয়াজ বুলন্দ করবেন। সাথে একই গান গাইবে পাহাড়ের চূড়ায়ও তা পৌঁছবে। তিনি আল্লাহর মহিমা শান প্রকাশ করবেন।

কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর এক সন্তানের নাম, যিনি মহানবী (সা)-এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। মরুভূমি ও পাহাড়ী এলাকা ও ফারান-এর বর্ণনা বলতে সেসব এলাকাকেই বুঝানো হয়েছে যেখানে হযরত ইবরাহীম (আ) হযরত হাজেরা (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-কে রেখে এসেছিলেন। যা জন্ম পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ২১)। সে স্থানে এক সময় মক্কার জনপদ গড়ে উঠেছে। কেদার জনপদ বলতে মক্কা শহরকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরগণ বসতি তৈরি করেছেন। অর্থাৎ এসব কথা দ্বারা রাসূল (সা)-এর জন্মস্থানের আলোচনাই করা হয়েছে যে, পবিত্র মক্কায় মহানবী (সা) জন্মগ্রহণ করবেন। আর তাঁর উম্মাত এই জনপদে পাহাড়ে-মরুভূমিতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর এবং লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা শ্লোগান মুখরিত করে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ঘোষণা করবে। সকলে সব সময় আল্লাহু আকবার শ্লোগান দেয়া এটা মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মাতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উম্মতেরা উচ্চস্বরে আযান ও তাকবীর দিয়ে নামায আদায় করে থাকেন। নাসারারা ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে ইবাদত করে থাকে। শুধু তা-ই নয়, বরং তারা এক আল্লাহর ঘোষণা না দিয়ে ত্রিত্ববাদ ও আকৃতির শ্লোগান দিয়ে থাকে। তাদের ধারণা ও বিশ্বাস হল হযরত মাসীহ খোদা হযরত মরিয়ম-এর পেটে আকৃতি ধারণ করে বান্দাদের মুক্তির জন্য শূলবিদ্ধ হয়েছেন।

অতএব সেখানে আল্লাহর তাক্‌বীর অনুপস্থিত। সুসংবাদে আরও আছে যে, প্রতিশ্রুত নবী কেদার ইবন ইসমাঈল এবং বংশধর হবেন। এজন্য সুসংবাদের প্রতিশ্রুত নবী বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি হতে পারেন না। কেননা তারা সকলেই হযরত ইসরাঈলের সন্তান ছিলেন, কেউ কেদার ইবন ইসমাঈলের বংশধর নন। অন্যদিকে সালা মদীনা মুনাওয়ারার একটি পাহাড়ের নাম। সুসংবাদে উল্লেখিত উক্ত পাহাড়ের নাম উল্লেখ করে মহানবী (সা)-এর হিজরতস্থল পবিত্র মদীনাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রকৃত বিষয় আল্লাহই অধিক অবগত।

সারকথা

প্রতিশ্রুত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ প্রিয়পাত্র ও সম্মানিত বান্দা। তিনি উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী, সারা জাহানের বাদশাহ ও হিদায়েতের পথপ্রদর্শকের পদে আসীন হবেন। প্রতিশ্রুত নবী বনী কেদার তথা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশে হবেন। তিনি বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে হবেন না। কেননা কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ছেলে ছিলেন একথার উপর সকলেই একমত।

সুসংবাদের বাস্তব নমুনা হযরত ঈসা (আ) হতে পারেন না। কেননা তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত, বনী কেদারের মধ্যে তিনি শামিল ছিলেন না।

গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও হিদায়েতের দায়িত্ব তার আজও হয়নি। ইঞ্জিল কিতাবও শুধু বনী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকদের হিদায়েতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, সমস্ত মানব জাতির জন্য সাধারণভাবে তিনি নবী হয়ে আসেন নি। তিনি কোন শাসন পরিচালনা করেন নি। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন নি। অতএব এসব সুসংবাদ হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর কিভাবে প্রযোজ্য হতে পারে? এসব সুসংবাদে যে সব গুণ ও যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, তা কেবল সবগুলো হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। অতএব তিনিই-এর বাস্তব নমুনা তাঁর জন্য এ সুসংবাদ।

১৬শ সুসংবাদ ঃ সহীফায়ে ইয়াসইয়া (আ), ৫২ অধ্যায়, ১৩ পাঠ

"দেখ, আমার বান্দা ভাগ্যবান হবে সম্মানিত মর্যাদাবান ও প্রশংসিত হবে।"

এই সুসংবাদে আমার বান্দা বলে হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর প্রশংসিত গুণাবলী ও সৌভাগ্যকে বুঝানো হয়েছে। তিনি প্রশংসিত, এ গুণ তাঁর নামের সাথে যুক্ত। কেননা 'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থই হল প্রশংসিত। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এত উচ্চমার্যাদা দান করেছেন, যে মর্যাদার কথা কেউ কোনদিন শুনেওনি, দেখেওনি। নাসারাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা চিন্তা করে দেখুন, হযরত ঈসা (আ) এসব উচ্চমর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন কিনা? নাসারাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী যদি হযরত ঈসা (আ) উচ্চ মর্যাদা ও সৌভাগ্য অর্জন করতেন তা হলে তাঁকে শূলবিদ্ধ হয়ে অসম্মানজনক অবস্থায় পতিত হতে হত না। এ ধরনের অবস্থা কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

ব্যক্তিত্বের জন্য উপযোগী হতে পারে না। ইসলাম হযরত ঈসা (আ)-এর বিষয়ে এ ধরনের অসম্মানজনক বিশ্বাস থেকে মুক্ত। ইসলামের আকীদা হল হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা ও রাসূল। তাঁকে আল্লাহ দুশমনদের থেকে হিফাযত করে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন।

১৭শ সুসংবাদ ঃ অধ্যায় ৬০, প্রথম অধ্যায়

প্রসঙ্গ মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারাহ

(১) উঠ আলোকিত হও! (হে মক্কার যমীন) তোমার আলো এসেছে এবং আল্লাহর মহিমা তোমার উপর উদিত হয়েছে। (২) দেখ যমীন অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, মানুষের মধ্যেও অন্ধকার পড়বে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট প্রকাশিত হবেন এবং তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে। (৩) লোকেরা তোমার রাজত্বে ও আলোতে তোমার পরশে চলবে।

তারপর মদীনার যমীনের বর্ণনা। (৪) চোখ উঠিয়ে চারদিকে দেখ, সকল মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার নিকট আসছে। তোমার ছেলেরা দূর থেকে আসবে এবং তোমার মেয়েদেরকে কোলে করে রাখা হবে। (৫) তখন তুমি এসব দেখে উজ্জ্বল হবে, তোমার হৃদয় উজ্জীবিত হবে, প্রশস্ত হবে। কেননা সাগরের তরী তোমার দিকে আসবে সমাজের সম্পদ তোমার কাছে আসবে। (৬) উটের সারি সোনা-রূপার মুদ্রা, সারা রাজ্যের সম্পদ, অফুরন্ত সম্পদ সব তোমার হাতে আসবে আর আল্লাহর প্রশংসা করে সুসংবাদ শুনাবে। (৭) কেদারের সকল জনতা তোমার নিকট জমা হবে। উট বকরী সবই তোমার দরবারে সমবেত করা হবে। তোমার মরযী অনুযায়ী তা যবেহ করার স্থানে পৌঁছবে। আর আমি আমার শানের ঘরকে মর্যাদা দেব। (৮) এই কে যার দিকে মেঘ উড়ে যাচ্ছে, কবুতরের ন্যায় বাসার দিকে উড়ছে। .... (৯-২২ পর্যন্ত)।

এই অধ্যায়ে প্রথম আয়াতে মক্কা মুকাররমাকে বুঝানো হয়েছে। মক্কার আলো ও নূরে উদ্ভাসিত বলতে সুসংবাদে নূর ও আলো হিসেবে হযরত নবী (সা)-এর নবুওয়াত অথবা পবিত্র আল-কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। পবিত্র আল-কুরআনে হযরত নবী (সা)-কে এবং কুরআনকে স্পষ্ট 'নূর' বলা হয়েছে।

২. শত শত বছর থেকে যমীনে কুফর ও শিরকের এবং গুমরাহীর যে অমানিশা ও যুলুম ছেয়ে গিয়েছিল হযরত নবী (সা)-এর নবুওয়াত ও কুরআনের নূরের মাধ্যমে তা দূরীভূত হয়েছিল।

৩. আমীর, ফকীর ও বাদশাহ্ সবাই সে নূরের উদয়ে আলো পেয়ে চলতে লাগল।

৪. ধীরে ধীরে সে নূর যমীনের চারদিকে সম্প্রসারিত হতে লাগল। বিভিন্ন সম্প্রদায় এ নূরের নিকটে সমবেত হতে লাগল। মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে এই নূর রোমের জনপদে, মরক্কোর ঘরে, প্রাচ্যের পারস্যে, কাশগড় (চীন), খাত্তান, হিন্দুস্তান ও সিন্ধুর লোকালয়ে গিয়ে পৌঁছল।

৫. লাখো মুসলমান পায়ে হেঁটে ও বাহনে আরোহী হয়ে আমীর-গরীব সবশ্রেণীর লোক বায়তুল্লাহর হজ্জ করার জন্য পবিত্র মক্কায় সমবেত হতে লাগলেন। অসংখ্য উট ভেড়া-দুম্বার সারি সারি পাল মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে পৌঁছল। আর উট ও বকরীর পালের এমন দৃশ্য আরব ও মক্কার ন্যায় আর পৃথিবীর কোন এলাকায় দেখা যায় না।

৬. আল্লাহ যুল-জালাল-এর প্রশংসা স্তুতি ও পরিচয়কারী দলে দলে কা'বার চত্বরে সমবেত হতে লাগলেন।

৭. যমীনের শাসকগণ মুসলমান ও মক্কার অধিবাসীদের জন্য লাখ লাখ দিরহাম ও দিনার উপহার হিসেবে প্রেরণ করতে লাগলেন।

৮. মাদইয়ান হযরত ইবরাহীম (আ)-এর একজন সন্তানের নাম ছিল যিনি হযরত কাতূরার গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। তিনি মাদায়েনে বসতি স্থাপন করেছিলেন। কেদার হযরত ইসমাঈল (আ)-এর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। এ বিষয়টি তাওরাত কিতাবের সৃষ্টি বা আদি পুস্তকে সরাসরি বর্ণিত হয়েছে। মাদায়েনবাসী ও সাবার লোকেরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর, যারা পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তারা প্রতি বছর হজ্জ করার জন্য উট ও গাধায় আরোহণ করে বায়তুল্লাহর নিকট উপস্থিত হতেন। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ)-এর শ্লোগানে প্রান্তর-পাহাড় মুখরিত হয়ে গেল। কেদারের সমস্ত মেষ সেখানে জড়ো হতে লাগল। আর নাবীত বলে পূর্ব ও উত্তর আরবের গোত্রদেরকে বুঝানো হয় (নাবীত হযরত ইসমাঈল (আ)-এর অন্যতম ছেলে ছিলেন)। অর্থ হলো ইয়ামেনের সাবার গোত্রসমূহ এবং কেদারের পশুর পাল অর্থাৎ কুরায়শের লোক নাবীতের মোটা শরীরের লোকেরা চার দিক থেকে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও প্রশংসা করতে করতে তাঁর খিদমতে হাযির হবে।

৯. কবুতরের ন্যায় মানুষ উড়ে উড়ে কা'বার নিকট পৌঁছবে এবং তাওয়াফ করবে।

১০. সে সময় লেবাননের যে মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তা মক্কা মুকাররমার পক্ষে অর্জিত হবে। মক্কা শরীফ খাতিমুন্ নবী (সা)-এর জন্মস্থান হবে এবং এখানে তাঁর বসতি হবে আর তাঁর সাথী-সাহাবীগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের নমুনা হবে।

১১. কা'বা অভিমুখে যে আগ্রাসন ও হামলা অগ্রসর হবে, তা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন ঃ হাতী বাহিনীর বিখ্যাত ঘটনা।

১২. আল্লাহর পবিত্র স্থান অর্থাৎ খানা-কা'বা পরিপাটি ও সুসজ্জিত হবে। প্রত্যেক বছর কা'বাঘরে গিলাফ লাগানো হবে।

১৩. এই পবিত্র শহরের নাম হবে চীহুন। তা এজন্য যে, ইয়ারশলমের একটি পাহাড়ের নাম হল সায়হুন তেমনিভাবে সায়হুন পবিত্র মক্কারও নাম। যেমন শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) তাঁর 'মাদারিজুন নবুওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (৪র্থ খণ্ড ১ম অধ্যায়)

১৪. মহানবী (সা)-এর পরে যিনি তাঁর খলীফা ও শাসক হয়েছেন, তিনি শান্তির প্রতীক ছিলেন এবং তাঁর বিধি-বিধান পৃথিবীর জন্য, স্বচ্ছতা ও সততার মূর্ত প্রতীক হয়েছে।

১৫. পৃথিবী ইনসাফ ও সততা স্বচ্ছতা এবং শান্তি ও নিরাপত্তার বাস্তবায়ন এত ব্যাপক হয়েছিল যে, এমন কোন জনপদ অবশিষ্ট ছিল না যেখানে যুলুমের আওয়াজ বুলন্দ হত।

১৬. তিনি উম্মাতের জন্য এমন বিধান (শরী'আত) রেখে গেছেন যার নূর ও আলো চিরকাল দীপ্তমান থাকবে।

১৭. তাঁর নূর ও শান-শওকত চিরস্থায়ী হবে।

১৮. যা কোনদিন ঢলে পড়বে না, অস্তমিতও হবে না।

১৯. তাঁর সকল সাহাবী হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন।

২০. এক ছোট অংশ থেকে হাজারে এবং নগণ্য সম্প্রদায় থেকে শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে।

নিবেদন ঃ পাঠকগণ রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবীদের (রা) সম্পর্কে যবূরের ইয়াসইয়া পুস্তকের ৫৪ অধ্যায় থেকে ৬৫ পর্যন্ত দেখতে পারেন। (ইযহারুল হক ঃ লেখক মাওলানা রহমতুল্লাহ কিরানবী, ২য় খণ্ড, আরবী এবং ইযালাতুল আওহাম, পৃ. ৪৯৫-৫০৫ ফারসী)।

সুসংবাদ হযরত দানিয়াল (আ)-এর কিতাব

হযরত দানিয়াল কিতাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দীর্ঘ কাহিনীর উল্লেখ আছে। পাঠকদের জন্য আমরা তার সারাংশ উপস্থাপন করছি।

বখতে নসর যিনি ব্যবিলনের রাজা ছিলেন। একবার তিনি ভয়ানক একটি স্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন দেখে ভুলে গেলেন। এতে তিনি আরও বেশি পেরেশান হলেন। রাজা হযরত দানিয়াল (আ)-কে তাঁর অবস্থা জানালেন। হযরত দানিয়াল (আ) অহীর মাধ্যমে অবগত হয়ে তার স্বপ্ন ব্যক্ত করলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করলেন।

৩১. রাজা স্বপ্নে দেখেন ঃ একটি সুন্দর মূর্তি যা সুন্দর হওয়ার সাথে ভয়ানকও বটে। মূর্তিটি রাজার সামনে দণ্ডায়মান ছিল।

৩২. মূর্তির মাথা নির্ভেজাল স্বর্ণের, বক্ষ ও বাহু রূপার, উরু ও নিতম্ব তামার, হাঁটু লোহার এবং পায়ের কিছু অংশ লোহা ও কিছু মাটি দ্বারা তৈরি। এ ধরনের ভয়ানক অলৌকিক মূর্তি রাজা প্রত্যক্ষ করতে ছিলেন।

৩৩. হঠাৎ করে একটি পাথর বের হল। পাথরটি কারো হাতের সহযোগিতা ছাড়াই নিজে নিজে বের হয়ে মূর্তির পায়ে লাগল যা লোহা ও মাটির ছিল এবং তাকে টুকরা টুকরা করে দিল।

৩৪. সোনা, রূপা, লোহা, তামা ও মাটি (যা দিয়ে মূর্তিটি গঠিত ছিল) সব কিছুকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হল। তা ভূষি ও ছাই-এর মত হয়ে গেল ও বাতাসে উড়ে যেতে লাগল। এমনকি এর কোন অস্তিত্বই অবশিষ্ট রইল না। পাথরটি যে মূর্তিটিকে আঘাত করে এ অবস্থা করেছিল, ধীরে ধীরে সেটি একটি পাহাড়ে পরিণত হল। সমস্ত পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হল। (স্বপ্ন শেষ)

রাজা এ স্বপ্ন দেখেছিল কিন্তু পরক্ষণে তার স্মৃতি থেকে তা হারিয়ে যায়। হযরত দানিয়াল (আ) অহীর মাধ্যমে তা অবহিত হন যে, রাজা এ ধরনের একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। অহীর মাধ্যমেই অবগত হয়ে তিনি রাজাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়েছিলেন। আর তা হল ঃ এ স্বপ্নের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি রাজত্বের কথা বলা হয়েছে। স্বর্ণের মাথা বলতে ব্যবিলনের রাজত্ব বুঝানো হয়েছে। তোমার রাজত্ব স্বর্ণের ন্যায়। আর তোমার পরে আরও একটি রাজত্ব আসবে যা রূপার মত হবে এবং তোমার রাজত্ব থেকে নিম্নমানের হবে। তারপর তৃতীয় রাজত্ব আসবে যা তামার মত হবে। তারপর চতুর্থ রাজত্ব আসবে যা লোহার মত মযবূত হবে। তারপর পঞ্চম রাজত্ব শুরু হবে যার পায়ে কিছু লোহা ও কিছু মাটি হবে। অর্থাৎ সে রাজত্বে কিছু দুর্বলতা মিশ্রিত থাকবে। লোহা ও মাটি মিশ্রিত থাকবে। সেই রাজত্বে শক্তিশালী ও দুর্বলতার সম্মিলিত ও সংমিশ্রিত রূপ থাকবে। কখনো সে রাজত্বে শক্তি থাকবে, কখনো দুর্বল অবস্থায় চলবে। এই পঞ্চম রাজত্বের যুগে অদৃশ্য জগত থেকে একটি পাথর প্রকাশিত হবে যা কারো হাতের সহযোগিতা ব্যতীত নিজে নিজেই আল্লাহর পক্ষ হতে আসমান থেকে অবতীর্ণ হবে। তা শেষ রাজত্বের পাদদেশে পতিত হয়ে তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেবে এবং ভূষি ও তুলার মত করে দিবে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এমনকি তার নাম-নিশানাও বাকি থাকবে না। ক্রমান্বয়ে সে পাথর পাহাড়ে পরিণত হবে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত পৃথিবীতে সম্প্রসারিত হবে।

জেনে রাখুন, এখানে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব ও তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাত এবং তাঁর আসমানী রাজত্বকে একটি পাথরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর সেখানে আরও বলা হয়েছে ঃ এই পাথর শীঘ্রই পর্বতের আকৃতিতে পরিণত হবে। অর্থাৎ প্রথমদিকে তা ছোট রাজ্য থাকবে, তারপর সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে যাবে। তা-ই দেখা যায়, হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খেলাফতের যমানায় রোমের কায়সার ও পারস্যের কিসরার মর্যাদাও রাজত্ব খতম হয়ে যায়। আর এভাবে

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ

"যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও দ্বীনে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন সমস্ত দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করতে পারেন।"

এই আয়াতে যেই প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছিল তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।
হাদীসের প্রতিশ্রুতি ঃ

هلك كسرى فلا كسرى بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده

(কিসরা'কায়সার ধ্বংস হবার পর আর কায়সার কিসরা হবে না) সত্যে পরিণত হয়েছিল।

আসমানী রাজত্ব ও পাথর যমীনে এসে বিশাল সাম্রাজ্যকে পিছে ফেলেছে। তিনি আসমান থেকে যে শরী'আতী বিধানপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে।

আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

এখানে প্রাসংগিকভাবে হযরত আতেকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের একটি স্বপ্ন উল্লেখযোগ্য। যা সীরাতের বিখ্যাত গ্রন্থাবলীতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ স্বপ্নের বিবরণ অবগত হলে পাঠকগণের পক্ষে হযরত দানিয়ালের সুসংবাদের মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হবে। আবূ জাহল-এর নেতৃত্বের কুরায়শদের এক হাজার সৈন্যের বাহিনী সাতশত উট একশত ঘোড়া ও অন্যান্য যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সহ যুদ্ধের জন্য বদর প্রান্তরের অভিমুখে রওয়ানা হয়। তাদের রওয়ানা হবার প্রাক্কালে হযরত আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিব এ স্বপ্ন দেখেন ঃ

এক উটের আরোহী মক্কায় আগমন করলেন এবং আব্‌তাহ্ নামক স্থানে উট বসালেন তারপর বিকট আওয়াজে এ ঘোষণা করলেন ঃ

الا انفروا يا آل غدر لمصارعكم فى ثلاث -

"হে গাদ্দার সম্প্রদায়! তোমরা তিন দিনের মধ্যে তোমাদের বধ্যভূমিতে পৌঁছে যাও।"

তারপর সে উট আরোহী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করল। সে কা'বাঘরের ছাদে আরোহণ করেও একই ঘোষণা করল। তারপর সে আরোহী আবূ কুবায়শ পাহাড়ে আরোহণ করেও একই ঘোষণা দিল। তারপর উপর থেকে একটি পাথর নিচে নিক্ষেপ করল। পাথরটি নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মক্কার মধ্যে এমন কোন ঘর অবশিষ্ট রইল না যেখানে পাথরের টুকরা বা কণা পৌঁছেনি। হযরত আতিকা তাঁর স্বপ্ন হযরত আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রকাশ করেন। হযরত আব্বাস (রা) তখন ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি তাঁর একান্ত বন্ধুদের নিকট এই স্বপ্ন বর্ণনা করেন এবং তাঁরা অনুমান করতে সক্ষম হন যে, শীঘ্রই সম্প্রদায়ের উপর কোন মুসীবত পতিত হবে। আর এ স্বপ্নের কথা জানাজানি হতে হতে আবূ জাহল পর্যন্ত পৌছে গেল। মসজিদুল হারামে হযরত আব্বাসের সাথে আবূ জাহলের সাক্ষাত হল। তখন আবূ জাহল হযরত আব্বাসকে বলল ঃ ' হে আবুল ফযল! এতদিন তো তোমাদের পুরুষেরা নবুওয়াতের

দাবিদার ছিল, এবার মহিলারাও নবুওয়াতের দাবি করতে শুরু করেছে। হযরত আব্বাস বললেন, বিষয় কি ? আবূ জাহল আতিকার স্বপ্নের কথা বলল। এভাবে এ স্বপ্নের চর্চা চলছিল ঠিক এমন সময় যমযম গাফ্ফারী আবূ সুফিয়ানের কাফেলার হুমকিতে পতিত হবার সংবাদ নিয়ে মক্কায় পৌছঁল। সে মক্কায় পৌঁছে গায়ের জামা ছিঁড়ে বাতাসে উড়াতে লাগল, নিজ উটের নাক কেটে চিৎকার করে ঘোষণা করল হে কুরায়শ সম্প্রদায়! তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার সংবাদ শোন। কালবিলম্ব না করে কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য রওয়ানা হও। এই ঘোষণা শোনার সাথে সাথে কুরায়শগণ অস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সহ প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে বদর প্রান্তরে পৌঁছল এবং এই স্বপ্নের বাস্তবতা সরাসরি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করল।

এ ঘটনার প্রতি গভীর চিন্তা করে দেখুন। হাদীসে আছে, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা বা খাল খননের সময় একটি বিরাট শক্ত পাথর বের হয়েছিল। হযরত নবী (সা) তিনবার কোদাল মেরে পাথরটিতে আঘাত করেছিলেন। তাতে পাথরটি টুকরা টুকরা হয়ে যায়। আর পাথরটি থেকে আলোর ঝলক বের হয়েছিল। সে আলোতে সিরিয়া, পারস্য ও ইয়ামেনের শহরগুলো পরিলক্ষিত হয়েছিল। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, এসব শহর ও রাজত্ব মুসলমানের হাতে কোন সময় বিজিত হবে।

১৯শ সুসংবাদ মথির ইঞ্জিল ঃ ৩য় অধ্যায়, ১ম পাঠ

"ইউহান্না ও ইয়াহূদার দু'জনার বক্তব্যেই এই আহবান ও ঘোষণা করতে থাকে, তাওবা কর, শীঘ্রই আসমানের বাদশাহ্ আগমন করবেন।"

এই ইঞ্জিলের ৪র্থ অধ্যায়ের থেকে ১৭তম অধ্যায় পর্যন্ত পাঠে আছে ঃ "সে সময় থেকে ইউসু ঘোষণা করতে শুরু করেছে যে, তাওবা কর কেননা আসমানের বাদশাহ শীঘ্রই আগমন করবেন।"

আসমানী বাদশাহ বলতে কোন আসমানী কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে যে, আসমান থেকে এমন কিতাব নাযিল হবে যেখানে সব বিধি-বিধান উল্লেখ থাকবে। আর সুনিপূণ ভাবে ও মর্যাদার সাথে এসব বিধানের প্রচার ও প্রসার হবে। আল্লাহর অবাধ্য ও আইন অমান্যকারীদের জন্য দণ্ডবিধি কার্যকর হবে। বস্তুত এই শাসন ব্যবস্থা শুধু দুনিয়ার বৈষয়িক ব্যবস্থাই নয়। যেমন অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা, আবার তা শুধু আসমানী বা নৈতিক ব্যবস্থাই হবে না, বরং জাগতিক ও আসমানী রাজত্বের সংমিশ্রিত রূপ, যেখানে সম্মান-মর্যাদা, শান-শওকতের সাথে প্রতিটি বিধি-বিধান যৌক্তিকভাবে যমীনে কার্যকর করবে। আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলে এখানে যেমন শাস্তির কঠোরতা আছে, তেমনিভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখানে উল্লেখিত দু'টি শাসনের দিকই মহানবী (সা)-এর যামানায় এবং খুলাফায়ে রাশেদার যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

আল্লাহর শাসন ও আসমানী শরী'আত এ যুগে নাযিল হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িতও হয়েছে। কায়সার ও কিসরার সিংহাসন উৎপাটন করা হয়েছে। আল্লাহর দুশমনের সাথে জিহাদও করা হয়েছে। চোর ও ছিনতাইকারীদের উপর দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ব্যভিচারকারীদেরকে যিনার শাস্তি স্বরূপ পাথর মারা হয়েছে। মদ পানকারীদেরকে কোরা (চাবুক) মারা হয়েছে। দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখুন, আসমানী বাদশাহী এটাকেই বলে। এ ধরনের শাসন ও রাজত্বকে যদি আসমানী শাসন বলা না যায়, তা হলে আপনারা দেখান আসমানী বাদশাহী আর কি হতে পারে?

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ -

২০শ সুসংবাদ ঃ মথির ইঞ্জিল ঃ ২১ অধ্যায়, ৪২ পাঠ

ইয়াসু তাদেরকে বললেন ঃ "তোমরা কখনো কি নুশতোতে পড়নি যে, যেই পাথরটি রাজগীরেরা অপছন্দ করেছিল তা কোণায় শেষ প্রান্তে হবে।"

এটি খোদার পক্ষ হতে হয়েছে, আমাদের নিকট তা আশ্চর্যজনক। এজন্য আমি তোমাদেরকে বলছি; খোদার বাদশাহী তোমাদের থেকে নিয়ে খাওয়া হবে। অন্য এক সম্প্রদায়কে-এর ফল আহরণের জন্য দেয়া হবে। যে এ পাথরের উপর পড়বে, টুকরা হয়ে যাবে, যার উপর পতিত হবে গলে যাবে। রাজগীর বলতে বনী ইসরাঈলকে বুঝায় প্রান্তের বা কোণার পাথর বলতে আমাদের নবী কারীম খাতিমুন্নাবিয়ীন মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। কেননা বনী ইসরাঈলের দৃষ্টিতে তিনি অপ্রিয় পাথরের মত ছিলেন। বনী ইসরাঈলেরা সব দিক থেকে তাঁকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় ও সাহায্যে তিনি সর্বশেষ প্রান্তের পাথর তথা শেষনবী হবার গৌরব অর্জন করেছেন। প্রান্তের পাথর বলতে বুঝিয়েছে স্থাপনার উপরের অংশের খালি স্থান (চাদের শূন্যস্থান) তা সে পাথরে পূর্ণ হবে। এভাবে নবুওয়াতের প্রাসাদের শূন্যস্থান হযরত নবী (সা)-এর মাধ্যমে পূর্ণতা পেয়েছে। এভাবেই নবুওয়াতের প্রাসাদ পরিপূর্ণ হয়েছে।

كما روى أبو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله الاموضع من زاويته فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت اللبنة وأنا خاتم النبيين -

رواه البخارى فى كتاب الأنبياء وفى رواية انا سددت موضع اللبنة وختم بى البنيان وختم بى الرسل -

যেমনটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার ও পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে উদাহরণ হচ্ছে, একটি ঘর উত্তমভাবে পরিপাটি করে বানানো হয়েছে কিন্তু এক ইট পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট রইল। লোকেরা ঘরটি দেখছিল এবং বলছিল, একটি ইট কেন লাগানো হলো না ? আমি খাতিমুন্নাবী, আমিই শেষ ইট হয়ে শূন্যস্থানে স্থাপিত হয়েছি। আমার মাধ্যমে নবুওয়াতের ঘরের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আমার মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারা সমাপ্ত হয়েছে।" (বুখারী)

এখানে পাথর পতিত হবার বিষয়টি হল; তাঁর উপর যা পড়বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, আর যার উপর তিনি পতিত হবেন সে-ও টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। কেননা বদরের প্রান্তরে কুরায়শ বাহিনী তাঁর উপর চড়াও হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মক্কা বিজয়ের সময় মহানবী (সা) তাদের উপর চড়াও হয়েছিলেন। এবারও তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। আর এভাবে পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম ইরান-সিরিয়া, রূম-সম্প্রদায় ও জনপদে পতিত হয়েছিলেন এবং সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। ফল ও ফসল সংগ্রহকারী সম্প্রদায় হল বনী ইসমাঈল। যারা হযরত নবী (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফল ও ফসল অর্জন করেছেন, রাজ্য ও শাসনের অধিকারী হয়েছেন। এভাবে আসমানী বাদশাহীতে তিনি শরীক হয়েছিলেন।

এজন্য এসব সুসংবাদের বাস্তব নমুনা খাতিমুন্নাবিয়্যিন সায়্যিদুল আওয়ালীন ওয়া আখিরীন হযরত মুহাম্মদ (সা) ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হযরত ঈসা (আ) যেহেতু হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন, এজন্য তিনি বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি কিভাবে অপ্রিয় পাথরের সাথে তুলনীয় হতে পারেন। দ্বিতীয়ত তিনি শেষ নবীও হতে পারেন না যা ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে। আহলে কিতাবীরা হযরত ঈসা (আ) ছাড়াও আরেকজন নবীর জন্য অপেক্ষমান ছিল। ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে, যখন হযরত ইয়াহইয়া (আ) আগমন করেন তখন ইয়াহূদীরা তাঁকে প্রশ্ন করে, তুমি কি সেই প্রতিশ্রুত....!

তৃতীয়ত হযরত ঈসা মাসীহ (আ) নিজে কারো উপর চড়াও হন্‌নি আর যখন ইয়াহূদীরা তাঁর উপর চড়াও হয় তখন নাসারাদের বক্তব্য অনুযায়ী তিনিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যান।

হযরত ঈসা (আ) কখনো এমনটি বলেননি যে, আমি শেষ নবী, আমার আসমানে চলে যাবার পর আর কোন সত্য নবী আসবেন না।

২১শ সুসংবাদ ঃ ইউহান্না, ১৪শ অধ্যায় পাঠ ১৫

১৫। যদি তোমরা আমাকে ভালবাস তা হলে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে। ১৬। আমি পিতার কাছে আবেদন করব যেন তিনি তোমাদের জন্য আরেকজন সাহায়তাকারী প্রদান করেন। ২৬। যিনি শান্তির ব্যবস্থাকারী ও পবিত্র আত্মা, যাতে পিতা আমার নামে

প্রেরণ করবেন, তিনি তোমাদেরকে সকল বিষয় শিখাবেন এবং আমি তোমাদেরকে যেসব কথা শিখায়েছি তা তিনি পুনরায় তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিবেন। ২৯। আমি তিনি আগমনের আগাম বার্তা এজন্য জানিয়ে দিচ্ছি যেন তোমরা তাঁর আগমন হলে ঈমান আন। ৩০। এরপর আমার আর কোন বক্তব্য নেই। কেননা বিশ্বনেতা আগমন করবেন। আমার নিকট তাঁর থেকে বেশি কিছু নেই।

এবং অধ্যায় ১৫, পাঠ ২৭ এ আছে। যখন সেই সাহায্যকারী আসবেন যাকে আমি পিতার পক্ষ হতে প্রেরণ করব, অর্থাৎ সত্য আত্মা আমার সাক্ষ্য প্রদান করবে।

এবং ১৬ অধ্যায় ঃ পাঠ ৭-এ আছে

৭। আমি তোমাদের সাথে সত্য কথা বলছি ঃ আমার বিদায় হয়ে চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী, কেননা আমি যদি না যাই তা হলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আগমন করবেন না। আমি গিয়ে তাঁকে প্রেরণ করব। ৮। তিনি আগমন করে পাপ যুলুম কমাবেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ১০। হিদায়াতের বিষয়ে আমি পিতার নিকট যাচ্ছি, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না। ১২। আমার আরও বক্তব্য আছে। যদি এখন বলি তোমরা তা বরদাশত করতে পারবে না। ১৩। কিন্তু যখন সেই পবিত্র আত্মা আগমন করবেন, তখন তিনি সত্যের সকল পথ প্রদর্শন করাবেন। তিনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না বরং তাঁকে যা শুনান হবে তিনি তা-ই বলবেন। তিনি ভবিষ্যতের সংবাদও দিবেন। ১৪। তিনি আমার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ করবেন।

মথির ইঞ্জিল তৃতীয় অধ্যায় পাঠ-১-এ আছে ঃ "যিনি আমার পরে আসবেন তিনি আমার থেকে শক্তিশালী হবেন, আমি তার জুতা বহন করার উপযুক্তও নই।" (শেষ)

এই হচ্ছে হযরত ঈসা (আ)-এর বক্তব্য যিনি আকাশে গমনের পূর্বে হাওয়ারীদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, তোমরা ইয়াহূদী ও অন্যান্যদের ষড়যন্ত্র ও হত্যা প্রচেষ্টা দেখে মোটেও ভয় পেও না। আর আমার কষ্ট দেখে তোমরা পেরেশান ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে না। আমি শীঘ্রই এ দুনিয়া ছেড়ে এমন স্থানে চলে যাব যেখানে কোন দুঃখ-কষ্ট নেই। অর্থাৎ আমি আকাশে আল্লাহর কাছে চলে যাব, সেখানে অনেক স্থান আছে। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আবার যমীনে পতিত হব। তারপর তিনি আগত একজন ফারকালীতের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন। এক সময় আমি ব্যতীতও একজন ফারকালীত (রাসূল) প্রকাশিত হবেন। তিনি এসে আমার মর্যাদার কথা বর্ণনা করবেন। তিনি আমাকে অমান্যকারীদেরকে শক্ত শাস্তি দিবেন। অর্থাৎ ইয়াহূদী ও অন্যান্যদেরকে শাস্তি দিবেন। তিনি দীন-দুনিয়ার নেতা হবেন। তিনি এত উঁচু মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হবেন যে, আমার নিকট তাঁর সম্পর্কে কোন বক্তব্য নেই। পবিত্র কুরআনে এ সুসংবাদের কথা এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِى إِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ـ

"সে সময়কে স্মরণ কর, যখন ঈসা ইবন মরিয়ম বললেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। আমি তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং সুসংবাদদাতা এক মহান রাসূলের যিনি আমার পরে আগমন করবেন আর তাঁর নাম হবে আহ্মাদ।" (সূরা সাফফ্ ঃ ৬)

মূল সুসংবাদে 'আহমাদ' শব্দ ছিল। এমন কি বার্নাবাসের বাইবেলে বর্তমানেও তা পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ইঞ্জিলের অনুবাদ ইবরানী বা হিব্রু ভাষা থেকে গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়, তখন গ্রীকগণ তাদের অভ্যাস অনুযায়ী অনুবাদের ক্ষেত্রে নামেরও অনুবাদ করে ফেলে। তখন তারা 'আহমাদ' শব্দের অনুবাদ করেছে 'পীরাকালীতুস'। তারপর যখন গ্রীক থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হল, তখন পীর কলুতূসকে ফারকালীত শব্দ করা হয়। একযুগ পর্যন্ত এভাবেই তা ছিল। পরবর্তী সময়ে উর্দূ-ফার্সী অনুবাদেও 'ফারকালিত' শব্দ ছিল। একসময় এক রূহুল কুদুস বা 'পবিত্র আত্মা' বলে নতুন শব্দ যোগ করা হয়। খ্রিস্টানগণ 'রূহুল কুদুস' শব্দকে বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করত। তারপর ধীরে ধীরে শব্দটির বিলুপ্ত ঘটে। আবার কেউ ফারকালীত-এর স্থলে রূহুল হক বা রূহুল কুদুসও লিখেছে। আবার কেউ সাহায্যকারী, কেউ অন্য শব্দ ব্যবহার করে বাইবেলের মূল কপি থেকে শব্দটি বাদ দিয়ে দিয়েছে।

ফারকালীত শব্দের তাহকীক

'ফারকালীত' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আরবীকরণ করা হয়েছে। গ্রীক ভাষায় শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর সবগুলো অর্থই পবিত্র আহ্মাদ ও মুহাম্মদ শব্দের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে নাসারা পণ্ডিতগণ 'ফারকালীত' শব্দের কয়েকটি অর্থ করে থাকেন।

১. কেউ বলেছেন ঃ 'ফারকালীত' অর্থ হল সান্ত্বনা প্রদানকারী, আরবীতে যাকে معزى মু'আযযা বলা হয়।

২. কেউ বলেছেন, সাহায্যকারী।

৩. সুপারিশকারী যিনি উম্মাতের জন্য সুপারিশ করবেন।

৪. উকীল বা অভিভাবক।

৫. অধিক প্রশংসাকারী।

৬. প্রশংসিত, পরম সুন্দর, আরবীতে যাকে 'মুহাম্মাদ' বলা হয়।

৭. আবার কেউ বলেছেন 'ফারকালীত' হল জনগণের আশার স্থল।

৮. কোন কোন সংস্করণে রাসূল শব্দের অর্থও দেখা যায়।

৯। রূহুল হক।

১০. নির্ভরযোগ্য বলেও কেউ অর্থ করেছে।

যদি আসল গ্রীক বা ইউনানী ভাষায় ফারকালীতের অর্থ 'পারাকালীতুস' ধরা হয় তা হলে-এর অর্থ দাঁড়ায় সাহায্যকারী, অভিভাবক বা উকীল এবং মূলশব্দ যদি পীরকালীতুসও হয়, তবুও এসব শব্দ 'মুহাম্মদ, আহমাদ' হামদ-এর সমার্থক হয় অথবা নিকটবর্তী অর্থ হয়।

ইঞ্জিলের প্রাচীন সকল কপিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী কপিতেও 'ফারকালীত' শব্দটির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক সংস্করণে উক্ত শব্দের স্থলে অনেকাংশে রূহুল হক ও সাহায্যকারী শব্দ পাওয়া যায়। অনেক বিকৃতি পরিবর্তনের পরে ফারকালীত শব্দ ও তার বিভিন্ন গুণাবলী যা বর্ণিত হয়েছে, তা পুরোপুরি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও আখ্‌লাকের সাথেই অধিক মিল রয়েছে। ফারকালীতের যে ধরনের অর্থই করা হোক না কেন, সব দিক ও অর্থ থেকেই মহানবী (সা) ই তার বাস্তব নযীর হয়ে থাকেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল প্রতিনিধি, দূত, উকীল, এবং হক আত্মা, সত্য আত্মা, সঠিক বা পরম আত্মা। তিনি পাপাত্মা, মিথ্যাবাদী এসব খারাপ গুণ থেকে মুক্ত ছিলেন। তেমনিভাবে তিনি উম্মাতের সুপারিশকারী, সুসংবাদ প্রদানকারী, সতর্ককারীও বটে। তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, তিনিই সবচেয়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনাকারী। এসব ভাল গুণ তাঁর নামের সাথে যুক্ত। কোন গুণ তাঁর ব্যক্তিগত নামের সাথে যুক্ত, আবার অনেক গুণাবলী তাঁর উপাধি ও উপনামের সাথে মিশে রয়েছে। যেমন তিনি মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহমূদ, উকীল, শাফী, সাহায্যকারী, রূহুল হক। হাম্‌দ শব্দটি তাঁর নামের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যা আধিক্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত নবী (সা) আল্লাহ তা'আলার বাস্তব প্রশংসা। 'ফারকালীত' শব্দের সবচেয়ে বিশুদ্ধ অনুবাদ হল 'আহমাদ'। এজন্য পবিত্র আল-কুরআনে এ বিষয়ের সুসংবাদে তাঁকে 'আহমাদ' নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ـ

পবিত্র আল-কুরআনে এ আয়াতটি যখন এবং যে সমাজে নাযিল হয়েছিল, সেখানে অনেক ইয়াহূদী ও নাসরা আলেম বা পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। যদি-এ সুসংবাদ পূর্ববতী আসমানী কিতাবে না থাকত তাহলে তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করত এবং এটি মিথ্যা তথ্য বলে সমাজে শোরগোল উঠাত এবং যেসব ইয়াহূদী ও নাসারা আলেম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাও এ আয়াতের ভিত্তিতে ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে যেতেন। কিন্তু নতুন মুসলমান যারা ইয়াহূদী ও নাসারা থেকে এসেছেন তাঁদের সাক্ষ্য

এবং উপস্থিত ইয়াহূদী ও নাসারা আলেমগণের এ বিষয়ে নীরবতা এ সত্যকে মেনে নেয়ার জন্য প্রমাণ স্বরূপ ছিল। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন বিষয়টি যদি সত্য হত তাহলে ইয়াহূদী ও নাসারাদের সমস্ত আলিম কেন ইসলাম গ্রহণ করলেন না?

জবাব

নাসারা আলেমদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ ও আগমনের কথা তাওরাতে আছে। কিন্তু এসব ভবিষ্যদ্বাণী থাকার পরেও এবং হযরত ঈসা (আ)-এর অনেক মু'জিযা প্রত্যক্ষ করার পরেও ইয়াহূদী আলেমরা হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-এর উপর ঈমান আনেনি, বরং তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। সংকীর্ণতা, পার্থিব স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসায় জর্জরিত হয়ে তারা হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত কবূল করেনি। শুধু তা-ই নয়, তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, তাওরাতে হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে কোন ভবিষ্যদ্বাণী নেই, তাঁর কোন উল্লেখও নেই। তেমনিভাবে নাসারাদের আলেমগণও স্বার্থপরতা ও হৃদয়ের সংকীর্ণতার কারণে তাঁকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নেয়নি। অথচ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইনিই সেই নবী মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ) যাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন হিরাকল ও মাকূকাস স্পষ্টভাষায় স্বীকার করেছে যে, তিনিই সেই নবী। যাঁর সুসংবাদ ইঞ্জিলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের ক্ষমতাও রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যারা আশংকায় সত্যকে মেনে নিতে পারেননি, ইসলামে দাখিল হতে পারেননি। নাসারা আলেমদের মধ্যে যারা আন্তরিক ও সত্যের সন্ধানী ছিলেন, যেমন হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী, যাগাতর রুমি, ইবন নারতূর, অন্যান্য, তাঁরা সকলেই ঈমান আনয়ন করেছেন। আবার অনেক নাসারা আলেম ইয়াহূদী আলেমদের মত সাফ বলে দিয়েছে না, ইঞ্জিলে কোন সুসংবাদ নাই। নাসারা আলেমদের এসব মিথ্যা যেমনটি ছিল তেমনি ছিল ইয়াহূদী আলেমদের ও ছিল হযরত মাসীহ (আ)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ও তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদকে অস্বীকার করা। নাসারা আলেমদের বক্তব্য হচ্ছে যে, এই সুসংবাদে ফারকালীতের আগমনের মধ্যে রূহুল কুদুসের-হাওয়ারীদের জন্য নাযিল হয়েছে। তারপর যখন হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উত্তোলন করা হলো এবং হাওয়ারীগণ একস্থানে সমবেত ছিল, তখন রূহ তাদের উপর নাযিল হল। রূহের নাযিল হবার কিছুক্ষণ পর তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগল।

নাসারাদের এসব বিশ্বাস অন্ধধারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বরং এসব সুসংবাদ ত কোন বুযর্গ ও অসাধারণ ব্যক্তির জন্য হতে পারে। যাকে খোদার পক্ষ হতে ইলহাম করা হবে। সে-ত আল্লাহর পক্ষ হতে যা নির্দেশিত হবে তা-ই সে বলবে। সে নিজের পক্ষ হতে কিছু বলবে না। এই সুসংবাদে রূহুল কুদুস অর্থাৎ জিবরাঈল আমীনের নাযিল হবার সাথে কোন সম্পৃক্ততা নেই অথবা কোন ফিরেশতার সাথে এমন সুসংবাদের কোন সম্পর্ক নেই। ফারকালীতের আগমন বার্তায় একজন মহান রাসূলের আগমনের সংবাদ রয়েছে, যিনি সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী হবেন।

হযরত মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী (তাফসীরে হাক্কানীর লেখক) লিখেছেন ঃ কলকাতায় মুদ্রিত এক পাদ্রী পুস্তিকার 'ফারকালীত' সম্পর্কে লিখেছেন (১২৬৮ হি) 'ফারকালীত' শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে আরবীতে আমদানী করা হয়েছে। যদি মূল ইউনানী বা গ্রীক ভাষার 'ফারাকালীতুস' শব্দ ধরা হয়, তাহলে-এর অর্থ দাঁড়ায় সাহায্যকারী ও উকীল বা অভিভাবক। আর যদি মূল পীরকালীতুস হয় তাহলে-এর অর্থ 'মুহাম্মাদ- আহমাদ' শব্দের অর্থের কাছাকাছি হয়। এজন্যই মুসলমানগণ এই সুসংবাদের দলীল এ থেকে নিয়ে থাকে, তারা মূল পীরকালীতুস বুঝেছে। কেননা তখন-এর অর্থ 'মুহাম্মাদ-আহমাদ' শব্দের কাছাকাছি অর্থ হয়। এজন্য মুসলমানগণ দাবি করে থাকেন যে, হযরত ঈসা (আ) মুহাম্মাদ বা আহমাদের খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে মূলশব্দ ফারাকালীতুস। আমাদের বক্তব্য হল, আসলে মূলশব্দ পীরকালীতুসই। গ্রীক লিপিতে অনেক উদাহরণ আছে। এভাবে ভুলে ফারকালীতুস পড়া হয়েছে। (ইজ্হারে হক, -২ খ, পৃ. ১৫৫)

ইউনানী বা গ্রীক ভাষায় 'পীরকালীতুস' শব্দ হবার বড় প্রমাণ হচ্ছে। সেন্ট জুরুম যখন ল্যাটিন ভাষায় ইঞ্জিল অনুবাদ করতে শুরু করেন তখন সে পীরকালীতুসের স্থানে 'ফারাকালীতুস' লিখে দেন। তাতে বুঝা যায়, যে পুস্তক থেকে অনুবাদ করা হয়েছে তাতে পীরকালীতুসই ছিল।[১]

উপরোক্ত আলোচনাকে বাদ দিলেও আমাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা সে সুসংবাদে আগত ফারকালীতের অনেক গুণে কথা বলা হয়েছিল। সে সব গুণ পুরোপুরিভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে সত্য ও বাস্তবভাবে হুবহু মিলে যায়।

প্রথমঃ আমি যতক্ষণ না যাব তিনি আসবেন না।

দুই ঃ তিনি আমাকে সাক্ষ্য দিবেন।

তিন ঃ তিনি ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, পাপ-পঙ্কিলতা নিয়ন্ত্রণ করবেন।

চার ঃ তিনি আমার উপর যারা ঈমান আনেনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

পাচ ঃ তিনি সত্যপথ দেখাবেন।

ছয় ঃ তিনি আগত দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করবেন।

সাত ঃ তিনি নিজের পক্ষ হতে কোন তথ্য জানাবেন না, বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে যে তথ্য দিবেন তিনি তা-ই বলবেন।

আট ঃ তিনি বিশ্বনেতা হবেন।

নয় ঃ তিনি আমার সব কথা তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবেন।

দশ ঃ তোমাদের জন্য তখনকার অসম্ভব ও জটিল বিষয়ে তিনি সম্ভবও সহজ ও করবেন। এবং তিনি বিধি-বিধানের অসম্পূর্ণ বিষয়কে পূর্ণতা দান করবেন। এই দশটি গুণের সব কয়টিই হযরত নবী (সা)-এর বেলায় সত্যও বাস্তব ছিল।

---

১. তাফসীরে হাক্কানী।

১.নবী করীম (সা)-এর আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বিদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। একজন নবী বিদায় হবার সাথে আরেকজন নবী আগমন নির্ভরশীল তখন হতে পারে যখন দ্বিতীয়জন শেষনবী হবেন। অন্যথায় একজন নবীর বিদায়ের সাথে পরবর্তী নবীর আগমন নির্ভরশীল হতে পারে না। কেননা পরবর্তী নবী শেষনবী না হলে প্রথম নবীর বর্তমানে পরবর্তী নবী আগমন করাতে কোন সমস্যা নেই। প্রথম নবী বিদায়ের সাথে ২য় নবী আগমনের শর্ত যখনই জুড়ে দেয়া হবে তখনই পরবর্তী নবী শেষনবী হবেন তা ধরে নেয়া যায়। মোটকথা হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, আগত ফারকালীত ও রূহে হক শেষ নবী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ-

"মুহাম্মাদ (সা) তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষনবী"। (সূরা আহযাব ঃ ৪০)

হযরত মাসীহ (আ) খাতিমুন্নবী ছিলেন না। কেননা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ত তাঁর পরেও একজন নবীর প্রতীক্ষায় ছিল। আর রূহের আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বিদায় বা প্রস্থানের সাথে শর্তযুক্ত ছিল না। রূহের আগমন হযরত ঈসা (আ)-এর বর্তমানেও হতে পারে।

২. নবী করীম (সা) হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন ঃ

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ - وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا -

"তারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করতে পারেনি, পারেনি শূলে চড়াতে। কিন্তু তারা সন্দেহের মধ্যে পড়েছে। যারা হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে বিতর্ক করে, নিশ্চয়ই তারা সন্দেহের মধ্যে আছে। এ বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই শুধুমাত্র কিছু ধারণা ব্যতীত। আর তারা তাঁকে হত্যা করেনি তা নিশ্চিত, বরং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিকট উঠিয়ে নিয়েছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরাক্রমশালী।" (সূরা নিসা ঃ ১৫৭)

৩. ইনসাফ ও হিদায়াত নিশ্চিত করেছেন।

৪. তিনি হযরত ঈসা মাসীহ (আ)-কে অস্বীকারকারীদের শাস্তি প্রদান করেছেন। কারো সাথে জিহাদ ও যুদ্ধ করেছেন আবার কাউকে দেশান্তর করেছেন। যেমন খায়বারের ইয়াহূদী ও বনূ নযীরের ইয়াহূদী ও বনূ কায়নুকার ইয়াহূদীদের ঘটনাবলী থেকে তা বুঝা যায়। রুহুল কুদুস কাউকে কোন বিষয়ে বাধ্য করেননি, কাউকে শাস্তি

দেননি। অর্থাৎ নাসারাদের দাবি অনুযায়ী 'ফারকালীত' রূহুল কুদুস বা হযরত মাসীহ (আ) কিন্তু হযরত মাসীহ কোন শাসন প্রতিষ্ঠান করেননি। সরকার পরিচালনা করে পুরস্কার ও তিরস্কারের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন কোন প্রমাণ নেই। এমনকি তাঁর হাওয়ারীগণও কোন শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তারা মানুষকে উপদেশাবলী প্রদান করে দাওয়াতী কাজ করতেন। সেখানে শাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। বস্তুত কোন অবস্থায়ই হযরত মাসীহকে 'ফারকালীত' হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। যবুরের অবাধ্যতার বর্ণনা সম্বলিত আয়াতের প্রসংগে তাদের বিরোধিতার কারণ বলা হয়েছে যে, "তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি।" এ কথার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, 'ফারকালীত' ও সাহায্যকারী উকীল ও সুপারিশকারী হযরত ঈসা (আ)-এর অস্বীকারকারীদের বর্তমানে প্রকাশিত হবেন। অন্যদিকে রূহুল কুদুস মাসীহের প্রকাশ ও আর্বিভাবে হাওয়ারীদের সামনে হয়েছে। হাওয়ারীগণ মাসীহকে অস্বীকার করতেন না, বরং তাঁর অনুগত ও সহযোগী ছিলেন। তবে হাওয়ারীগণ অস্বীকারীদেরকে কোন শাস্তি দেননি এবং শাস্তি প্রদানে তারা সক্ষমও ছিলেন না।

৫. রাসূলুল্লাহ (সা) সততা ও হিদায়েতের রাজপথ নির্দেশ করেছেন যা ইতিপূর্বে এতটা যোগ্যতার সাথে সম্ভব হয়নি। তাঁর শরী'আতের জোরালো বিশ্বাসসম্মত বিধানাবলী তার সফলতা ও যোগ্যতার প্রমাণ।

৬. ভবিষ্যত ও অনাগত দিনের এত অসংখ্যক সংবাদ তিনি দিয়েছেন যার কোন নযীর পাওয়া যায় না। তাঁর সংবাদ ও সুসংবাদের সব কিছু হুবহু প্রতিফলিত হয়েছে ও হবে। কিয়ামত পর্যন্ত-এর ব্যতিক্রম হবে না।

৭.-এর বড় কারণ হল, তিনি নিজের থেকে কিছু বলেননি, বরং আল্লাহ থেকে নির্দেশিত হয়ে বলেছেন। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى -

৮. তিনি ছিলেন সমস্ত জগতের নেতা। দুনিয়ার সকল মানব সম্প্রদায়ের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। সকল মানবজাতি তাঁর নেতৃত্ব ও দাওয়াতের আওতায় ছিল। নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড ও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য তিনি প্রেরিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না।

৯. নাসারারা হযরত মাসীহ (আ)-এর শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে ফেলেছে, আর তিনি তাদেরকে সে শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে তাওহীদ ও তিন খোদার বিষয়টি ছিল। তিনি মাসীহ (আ)-এর মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি রদ করে দিয়েছেন এবং তাঁর আসমানে উত্তোলনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَنُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلاَيَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

"তুমি বলে দাও, হে আহলে কিতাব! তোমরা এমন একটি কথার দিকে এস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। আর তা হল, আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদত করব না এবং আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করব না। আর আমরা পরস্পর কাউকে আল্লাহ ব্যতীত মবূদ বানাব না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَآئِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ -

"আর মাসীহ বললেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার রব ও তোমাদেরও রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তা'আলার তার উপর জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না"। (সূরা মায়িদা ঃ ৭২)

১০. মহানবী (সা)-এর আবির্ভাবের পর তিনি যেসব শিক্ষা দিয়েছেন যা হযরত মাসীহ (আ)-এর যামানায় বনী ইসরাঈলগণ রপ্ত করতে পারেনি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী বিষয়ক বিদ্যা দীনের শরী'আত বা বিস্তারিত বিধানাবলী, জীবন ও জগত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিধান, প্রকৃতি, জলস্থল, সাগর-নদী, আকাশ, খনি সব বিষয়ের বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছে। ইতিপূর্বেকার আসমানী বিধানাবলী ছিল অসম্পূর্ণ। মহানবী (সা)-এর উপস্থাপিত দীন ও বিধান সবকিছুকে পূর্ণতা দান করেছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টিকে এভাবে বলেছেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন-বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত (অহীকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। আর আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা ঃ ৩)

হযরত নবী (সা)-কে কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য এমন পূর্ণাঙ্গ সাংবিধান ও ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে যা দুনিয়ার যোগ্যতা ও সফলতার জন্য মাপকাঠি। এ ব্যবস্থার অধিকার ও সুব্যবস্থাবলী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিক্ষণতা দেখে পৃথিবী অবাক হয়ে যায়। অনাগত জীবনের ঘটনাবলী ও নতুন প্রেক্ষাপটের জন্য প্রযোজ্য ব্যবস্থা হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক উপস্থাপিত ও নির্ধারিত বিধানাবলীর মাধ্যমে জানা যেতে পারে। ইয়াহূদী ও নাসারা পণ্ডিতদের নিকট এ বিষয়ে কোন বিধানাবলী নেই যার ভিত্তিতে জাতি ও উম্মাতের আইনজীবীগণ ফায়সালা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। বর্তমানে নাসারাদের নিকট

এমন কোন শরী'আত বা বিধানাবলী নেই যার ভিত্তিতে কোন বিধান কার্যকর করা যায়। তবে হ্যাঁ, বর্তমান যুগের নাসারাদের নিকট শিল্প, লিপিকলা, প্রযুক্তি ও কারিগরীবিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান ও কৌশল ভালভাবে আছে। কিন্তু সমাজে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কোন আসমানী বিধান তাদের নিকট নেই– যার ভিত্তিতে তারা সমাজ ও সরকার পরিচালনা করতে পারে। পশ্চিমা জাতি ও দেশে যেসব সংবিধান ও আইন রয়েছে, তা তাদের কিছু চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতের কল্পনা প্রসূত ব্যবস্থা। ইসলামী শরী'আত বা বিধানাবলীর ন্যায় আসমানী কোন আইন ও সংবিধান তাদের নিকট নেই। মাসীহী আলেমগণ ইঞ্জিল ও তাওরাতে এসব সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীকে রূহুল কুদুস-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করে থাকেন। যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে গমনের ৪৭ দিন পর হাওয়ারীদের মাঝে অবতরণ করেছিলেন। তাদের এ বক্তব্য কয়েকটি কারণে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন বলে মনে হয়।

১. রূহ্ নাযিল হওয়া হযরত মাসীহ (আ)-এর বিদায়ের সাথে নির্ভরশীল ছিল না, কেননা রূহ্ ত হযরত মাসীহের সাথে সর্বদাই ছিল।

২. রূহ হিদায়েত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেনি, এবং হযরত মাসীহের উপর ঈমান না আনার অপরাধে কোন ইয়াহূদীকে শাস্তি প্রদান করেনি। পক্ষান্তরে হযরত নবী (সা) কাফির-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করেছেন এবং ইয়াহূদীদেরকে অনেক শাস্তি দিয়েছেন এবং তাদের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন। দুনিয়ার কোন জনসমষ্টিকে শাস্তি দিতে হলে সরকার ব্যতীত সম্ভব নয়। আগত ফারকালীত ও তার সাহায্যকারীগণ দুনিয়ার শাসক ও বাদশাহ হবেন। যিনি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবেন। আর তাওরাতের ১৪তম অধ্যায়ের ৩০ নং পর্বে পৃথিবীর নেতা আগমনের উল্লেখ আছে, তাতে দুনিয়ার শাসক হবার কথা বুঝায়। যার শাসন ও কর্তৃত্ব প্রভাবের কথা পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৩. হযরত মাসীহ (আ)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাকিদ দেয়া অযৌক্তিক। কেননা হাওয়ারীগণ ইতিপূর্বেই রূহুল কুদুসের প্রতি ঈমান রাখতেন। অতএব "তিনি যখন আগমন করবেন তখন তোমরা তাঁর উপর ঈমান আনবে।" এ কথার কি যুক্তি থাকতে পারে? হযরত মাসীহের তাকীদ ও সতর্কবাণী থেকে বুঝা যায়, আগত ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করাও তোমাদের জন্য অসম্ভব নয়। তাই বলা যায়, ফারকালীত দ্বারা যদি রূহকে বুঝানো হত, তাহলে এ বিষয়ে এত গুরুত্বারোপ ও সতর্কবাণীর প্রয়োজন ছিল না। কেননা যাদের হৃদয়ে রূহ আগমন করবে তাদের জন্যও রূহকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। রূহুল কুদুসের নাযিল হওয়া বিশ্বাসের জন্য সহায়ক। তেমনিভাবে রূহুল কুদুসের আগমন নবীর জন্য ও নবুওয়াতের প্রতি আস্থার জন্য জোরালো প্রমাণ। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগত বিষয়ের প্রতি মানুষের গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। প্রবল কল্পনাশক্তি যে বিশ্বাসকে আহত করতে পারে না।

৪. এসব সুসংবাদের ধরন ও প্রকৃতি থেকে বুঝা যায়, আগত ফারকালীত হযরত ঈসা (আ) থেকে ভিন্ন একজন ব্যক্তিত্ব হবেন। ১৬তম আয়াতের শব্দে আছে, তাঁকে দ্বিতীয় একজন সাহায্যকারী দেয়া হবে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায়, তিনি আলাদা সত্তায় ও আকৃতিতে আবির্ভূত হবেন। অতএব 'ফারকালীত' বলে যদি রূহুল কুদুস বুঝান হয় তা হলেও হযরত ঈসা (আ) ও রূহুল কুদুস একই ব্যক্তি হন, আলাদা ব্যক্তি নন। কেননা নাসারারা মনে করে যে, রূহুল কুদুস ও হযরত ঈসা (আ.) একই সত্তা এবং রূহুল কুদুস যখন হাওয়ারীদের মধ্যে আগমন করেছেন তখন ভিন্ন আকৃতিতে আগমন করেননি, বরং যেভাবে কারো উপর জ্বিন সওয়ার হলে সে নিজ মুখে জ্বিনের বক্তব্য পেশ করে থাকে, ঠিক হাওয়ারীদের হৃদয়েও রূহুল কুদুস এভাবে ভর করে আগমন করে বক্তব্য রেখেছেন।

৫. সুসংবাদে আরও ছিল, "আমি তোমাকে যা বলেছি তিনি তা স্মরণ করিয়ে দেবেন।" অথচ নাসারাদের কোন কিতাবে এ কথার প্রমাণ নেই যে রূহুল কুদুস আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

৬. সেই সুসংবাদেও এ কথাও ছিল, "তিনি আমার প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করবেন।" আর এই গুণ শুধুমাত্র হযরত নবী (সা)-এর বেলায় সত্য হতে পারে। কেননা তিনি আগমন করে ইয়াহূদী ও মুশরিকদের সামনে হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, যারা ছিল নবী হযরত ঈসা (আ)-এর অস্বীকারকারী। আমাদের নবী (সা) একমাত্র নবী যিনি হযরত ঈসা (আ)-এর রিসালাতের ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে রূহুল কুদুস হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের মাঝে অবতরণ করেছেন যেহেতু হাওয়ারীগণ পূর্ব থেকেই হযরত মাসীহ (আ)-কে স্বীকার করতেন, এজন্য তাদের জন্য সাক্ষ্য প্রদানের প্রয়োজন ছিল না। সাক্ষ্য প্রদানের বিষয়টি তো অস্বীকারকারীদের সামনেই গুরুত্ব পায়। বিশ্বাসীদের সামনে সাক্ষ্যের তেমন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু নবী (সা)-এর জন্য এ সাক্ষ্য প্রদান ছিল বিপরীত। তিনি ইয়াহূদীদের সামনে যারা হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করত ও দুশমনী রাখত, তাদের সামনে পরিষ্কারভাবে হযরত ঈসা (আ) এর রিসালাত ও নবুওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এবং তাঁকে হত্যা করার দাবি ও শূলবিদ্ধ করার কথারও প্রতিবাদ করেছেন। একই সাথে হযরত ঈসা (আ) এর আকাশে উত্থানের বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৭. হযরত মাসীহ (আ) ফারকালীত সম্পর্কে বলেছেন, আমার মধ্যে তাঁর কিছু নেই। এ বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় তাঁর বক্তব্য রাসূল (সা)-এর বেলায়ই প্রযোজ্য। কেননা মাসীহ আর রূহুল কুদুসও অভিন্ন। অতএব একথাও সেখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

৮. এছাড়া একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, এই রূহ আগাম কোন বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যার ভিত্তিতে রূহকেই সে সুসংবাদের বাস্তবায়ন বলা যাবে?

৯. এ সুসংবাদের বক্তব্য ও ধরন অনুযায়ী বুঝা যায় যে, আগত দ্বিতীয় ফারকালীত ও দ্বিতীয় সাহায্যকারী মানুষের আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে আগমন করবেন। আর হযরত ঈসা (আ)-এর মত মানুষের বেশে সত্যের দাওয়াত দেবেন ও জনসাধারণকে সান্ত্বনার বাণী শোনানোর জন্য আগমন করবেন। এজন্য ফারকালীত বলতে রূহুল কুদুসকে শনাক্ত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। কেননা রূহুল কুদুসও আলাদা মানুষরূপে না এসে জিব্রের মত অন্য মানুষের হৃদয়ে নাযিল হয়েছিল (যেমনটি নাসারাগণ ব্যাখ্যা করে থাকেন)।

১০. হযরত ঈসা (আ) আকাশে উঠে যাওয়ার পর সাধারণ নাসারাগণ ফারকালীতের জন্য প্রতীক্ষারত ছিল এবং তারা মনে করত যে, একজন মহান নবী আগমন করবেন। এমন কি ঈসায়ী দ্বিতীয় শতাব্দীতে মুন্‌তাস ঈসায়ী নামে এক ব্যক্তি দাবি করল ঃ আমি ফারকালীত যার সংবাদ হযরত মাসীহ (আ) দিয়েছিলেন। অনেক লোক তার উপর ঈমানও এনেছিল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ময়ূর মাসীহী তার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখেছেন। এই পুস্তক ১৮৪৮ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল ইয়াহূদী ও নাসারাদের আলেমগণ 'ফারকালীত' বলতে কোন মানুষকেই বুঝিয়েছেন, রূহুল কুদুসকে নয়।

'লুবুবুত তাওয়ারিখ-এর লেখক যিনি একজন খ্রিস্টান লিখেছেন ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানগণ একজন নবীর প্রতিক্ষায় ছিল। এজন্য নাজ্জাশীরা হযরত জাফর (রা) থেকে হযরত নবী (সা)-এর সংবাদ পেয়ে ঈমান আনেন এবং তিনি মন্তব্য করেন, তিনিই সেই নবী যাঁর সংবাদ হযরত ঈসা (আ) ইঞ্জিল কিতাবে দিয়েছেন। আর নাজ্জাশী ইঞ্জিল কিতাবের যেমন আলেম ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি ছিলেন একজন বাদশাহ। এজন্য তিনি ভয়-ভীতির পরোয়া করতেন না (তাই সত্যের ঘোষণা ও তথ্য অকপটে তুলে ধরেছেন)। যেমনিভাবে বাদশাহ মাকূকাশ রাসূলুল্লাহ (সা) এর পত্রের জবাবে লিখেছেন ঃ

سلام عليك أما بعد فقد قرأتُ كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا اليه وقد علمت أن نبيا قد بقى وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك ـ

"আপনাকে সালাম, আমি আপনার পত্র পড়েছি। পত্রে আপনি যা উল্লেখ করেছেন আমি তা বুঝেছি এবং আপনি যে আহ্বান জানিয়েছেন তাও বুঝেছি। আমার জানা ছিল একজন নবী আগমন করার বাকী আছেন আর আমি মনে করেছিলাম তিনি সিরিয়া থেকে প্রকাশিত হবেন। তবে আমি আপনার দূতকে সম্মান করেছি।"

মাকূকাশ যদিও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তবে একথা স্বীকার করেছেন যে, একজন নবী আগমন করার এখনো বাকী আছে। জারদ ইবন আলী যিনি নিজ সমাজে

একজন বড় আলেম ছিলেন (খ্রিস্টান)। তিনি যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করেন,তখন বলেন ঃ

و الله لقد جئت بالحق ونطقت بالصدق لقد وجدت وصفك فى الانجيل وبشربك ابن البتول فطول التحية لك والشكر لمن أكرمك لا أثر بعد عين ولاشك بعد يقين يدك أشهد أن لا اله الا اللّه وانك محمد رسول الله ـ

"আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই আপনি হক নিয়ে আগমন করেছেন। আপনি সত্য বলেছেন। নিশ্চয়ই আমি আপনার গুণাবলী ইঞ্জিল কিতাবে পেয়েছি। হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম আপনার সুসংবাদ দিয়েছেন। আপনাকে স্বাগতম, খোশ-আমদেদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনাকে যারা সম্মান করেছে, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রত্যক্ষ করার পর চিহ্নের (প্রমাণ) প্রয়োজন নেই, বিশ্বাসের পর আর দ্বিধা নেই। আপনি হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।"

এর ভিত্তিতেই রোমের সম্রাটসহ প্রভাবশালী শাসক এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক আলেম তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি দিয়েছেন। উক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হল যে, ইঞ্জিলে হযরত মহানবী (সা)-এর নাম ও সুসংবাদ লিখিত ছিল, যা দেখে অনেকে তাঁর উপর ঈমান এনেছেন এবং অনেক তাঁর আগমনে প্রতীক্ষায় ছিলেন। তবে আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে তাওফীক দিয়েছেন এবং দুনিয়ার স্বার্থপরতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি, তারা তাঁর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের দৌলত অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاۤءُ وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ـ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىْ لَوْلاَ هَدٰنَا اللّٰهُ ـ

১১. ১৬তম আয়াতের বক্তব্য যে, "তিনি সব সময় তোমাদের সাথে থাকবেন। এ কথার অর্থ এমন নয় যে 'ফারকালীত' সবসময় তোমাদের সাথে থাকবে। কেননা নাসারাদের বক্তব্য অনুযায়ী ফারকালীত মানে রূহুল কুদুসও তাদের সাথে সবসময় ছিলেন না; বরং এ কথার মর্ম হল, তাঁর শরী'আত বা বিধান ও দীন সব সময় থাকবে। এ দীনকে রহিত বা সংস্কার করে আর কোন দীন আসবে না।

১২. চতুর্থ অধ্যায়ের ১৭তম আয়াতের বক্তব্য ঃ "সত্য আত্মা দুনিয়া হাসিল করতে সমর্থ হবে না, কেননা দুনিয়া তাঁকে দেখবে না জানবেও না।" একথার মর্ম হল ঃ দুনিয়াতে তাঁর যথার্থ মর্যাদা বুঝা যাবে না। তিনি সমস্ত জগতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব হবেন।

খ্রিস্টানদের কতিপয় সন্দেহ ও সংশয়ের অপনোদন

এক. রূহুল হক এবং রূহুল কুদুস বলে তৃতীয় আকনূম বুঝায়, অতএব রূহুল হক ও রূহুল কুদুস বলে শেষনবী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কিভাবে বুঝান যথার্থ হয়?

জবাব ঃ আধুনিক ও প্রাচীন যুগের কখনোই আকনূম তৃতীয় শব্দটি রূহের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, বরং সালেহ, তালেহ, হাদী, মুদিল শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইউহান্না তাঁর প্রথম পত্রে (চতুর্থ অধ্যায়) বলেন ঃ

১. হে প্রিয়জন, প্রত্যেক রূহকেই বিশ্বাস করবে না। রূহকে পরীক্ষা করবে যে, সে আল্লাহর কাছ থেকে আগত নাকি অন্য কিছু।

২. খোদার পক্ষ হতে কে আসল তাকে তোমরা এভাবে বুঝতে পারলে যে রূহ স্বীকার করবে যে, ইসূ মাসীহ্ শরীরীরূপে আগমন করেছেন, তিনি খোদার তরফ হতে এসেছেন।

৩. আর যে ইসূ রূহকে স্বীকার করবে না সে খোদার পক্ষ হতে আসেনি।

৬ষ্ঠ আয়াতে আছে। "এভাবে আমি সত্য রূহ এবং ভ্রান্ত রূহকে জেনে নিই।" এখানে রূহ বলে সত্যের উপদেশদাতা এবং ভুল পথের আহবানকারীকে বুঝান হয়েছে। কেউই আকনূম সালিসকে এখানে বুঝাননি।

দুই ঃ এখানে সুসংবাদে হাওয়ারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। অতএব রূহের অবতরণ হাওয়ারীদের বর্তমানে তাদের জীবদ্দশায় হতে হবে। অন্যদিকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আবির্ভাব তাদের কয়েকশত বছর পরে হয়েছে।

জবাব ঃ হাওয়ারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলার কারণ হল যেহেতু সে সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন। এজন্য এভাবে বলা হয়েছে। অন্যথায় এর উদ্দেশ্য শুধু তাঁরা নন। যেমন মথির ইঞ্জিলে ৩৬নং আয়াত থেকে ৬৪ নম্বর আয়াতের মধ্যে আছে ঃ "আমি তোমাদেরকে একথা বলছি যে, তারপর তোমরা ইবন আদমকে আকাশের মেঘের মধ্য থেকে আসতে দেখবে। ইতিমধ্যে দু'হাজার বছর বিগত হয়েছে অথচ যাদের সামনে একথা বলা হয়েছে, তারা এ দৃশ্য দেখেনি যে, হযরত ঈসা (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করেছেন। তাই যেভাবে এখানে যারা হযরত ঈসা (আ)-কে নাযিল হতে দেখবেন, তারাই এ সংবাদের লক্ষ্য। তেমনিভাবে এ সুসংবাদের লক্ষ্যও তারা, যারা রূহুল হক ও ফারকালীতের আবির্ভাবের সময় বর্তমান থাকবেন।"

তিন ঃ ইউহান্নার ইঞ্জিলের চতুর্থ অধ্যায়ে যে নেতার আলোচনা এসেছে, সে প্রসংগে কোন কোন অন্ধ ও গোঁড়া খ্রিস্টান তামাশা করে বলে থাকে যে, নেতা বলতে এখানে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে।

জবাব ঃ নেতা বলতে 'শয়তান' অর্থ করা সুস্পষ্ট মূর্খতা ও অজ্ঞতা ছাড়া কিছু হতে পারে না। গোঁড়ামী ও প্রতিহিংসার ভিত্তিতে বিশ্বনেতা শব্দকে শয়তান অর্থে ব্যবহার

করা অভিধান ও পরিভাষা সবদিক থেকেই ভুল এবং ধরন ও প্রকৃতির বিপরীত। কেননা প্রথম থেকে শেষ আলোচনা পর্যন্ত 'ফারকালীত' বা রূহুল হকের গুণাগুণের আলোচনা আছে। যখন ফারকালীতের আবির্ভাব হবে তখন তাঁর উপর ঈমান আনার উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং তাঁর পক্ষে এভাবে বলা হয়েছে ঃ "কেননা দুনিয়ার নেতা আসছে।"

জগতের নেতা বলতে বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে বুঝাতে হবে। অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) এখানে শয়তান অর্থ নেয়া হলে তার আগমন মর্যাদার কারণ কিভাবে হতে পারে? এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর নেতা বলতে ফারকালীত ও রূহুল হকই বুঝায়। যাঁর হাতে দুনিয়ার পাপী ও অপরাধীরা শাসন ও বিচারের মাধ্যমে শাস্তি পাবে। ইউহানার ইঞ্জিলে ১৬তম অধ্যায়ে একাদশ পাঠে যা আছে, তাতে পৃথিবীর নেতাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং এটা বিকৃতি ও পরিবর্তন। বক্তব্যের ধরন প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্পূর্ণ উল্টো। একদিকে বলা হচ্ছে, ফারকালীতের মান-মর্যাদার কথা, অন্যদিকে তাঁকে শয়তান সনাক্ত করা, তা কি করে সম্ভব হতে পারে? তারপরে আবার খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ এসব দ্বারা রূহুল কুদুস অর্থও নিয়ে থাকেন। এসব কিছু মূর্খতা বোকামী ও শয়তানী ভিন্ন আর কিছু নয়। তারপর হযরত মাসীহ-এর ঘোষণা যে, "বিশ্বনেতা আগমন করবেন" একথাও পরিষ্কার যে, তিনি এখনো পৃথিবীতে আগমন করেন নি। শয়তানের বিষয়ে ইয়াহূদী-নাসারা ও মুসলমান সকলেই একমত যে, মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের ইতিহাসের প্রথম থেকেই শয়তান পৃথিবীতে বহাল তবিয়তে আছে। লোকেদের সাথে বিভিন্ন প্রকৃতির শয়তান সক্রিয় রয়েছে। এখানে যেখানে শয়তানের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, শয়তান আসবে, তা এতদিন শয়তান কি ছিল না অথবা পূর্বে শয়তান কোথায় চলে গিয়েছিল, তৃতীয়ত, নেতার কথা মথির ইঞ্জিলে দ্বিতীয় অধ্যায়ে হযরত মাসীহ ইবন মরিয়ম (আ) বলেছেন ঃ "হে বায়তুল লাহাম ইয়াহুদার এলাকা, তুমি ইয়াহুদার শাসকদের মধ্যে অবশ্যই ছোট নও। কেননা তোমার মধ্যে হতে একজন নেতা আসবেন যিনি আমার উম্মত বনী ইসরাঈলকে পরিচালনা করবেন।"

এখানে নেতা বলতে হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। যেমন সপ্তম ও পরবর্তী আয়াত পড়লে তা ভালভাবে বুঝা যায়। অন্যদিকে আসমানী কিতাবে নেতা ও শাসকের শব্দ আল্লাহ তা'আলার উপরও কখনো বুঝানো হয়েছে। তবে নেতা বলে শয়তানকে বুঝানো কোন অবস্থায়ই সঠিক হতে পারে না।

মথির ইঞ্জিলের ১৩তম অধ্যায়ের সুসংবাদ

আয়াত ৩নং তিনি তাদের সামনে একটি উদাহরণ পেশ করে বললেন যে, আসমানের বাদশাহ এই সরিষার বীজের মত, যা কোন মানুষ হাতে নিয়ে ক্ষেতের মধ্যে বপন করেছে। (৩২) বীজ থেকে ছোট চারা গজিয়েছে। আস্তে আস্তে যখন বড় হল,

তখন ফলের থেকে বড় হল। এক সময় বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়। পাখিরা এসে সে গাছের ডালে বাসা করে।

আসমানী বাদশাহী বলতে ইসলামী শরী'আতকে বুঝায়। যা প্রাথমিক অবস্থায় সরিষার মত ছিল। তারপর কিছু দিনের মধ্যে যমীন এতটা প্রসারতা লাভ করল যে, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে ও উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে গেল।

আল-কুরআন এ সুসংবাদ সম্পর্কে ইশারা করে বলা হয়েছে ঃ

وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْأَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ـ

"তাদের উদাহরণ ইঞ্জিলে আছে। যেমন ফসলের মত, তিনি যমীন থেকে চারা বের করেন। তারপর তাকে করেন, তা মোট হয়ে গেলে নিজের কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাড়ায়। তা দেখে কৃষক খুশি হয়ে যায়। এর মাধ্যমে (ইসলামের ফসলের মাধ্যম) কাফিরদেরকে নাখোশ করা হয়।" (সূরা ফাতহ ঃ ২৯)

এমনও হতে পারে এ উদাহরণের দ্বারা কালেমায়ে তায়্যিবাকে পবিত্র গাছের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى السَّمَاءِ تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ـ

"হে নবী! আপনি কি দেখেননি যে, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। পবিত্র কালেমার উদাহরণ একটি পবিত্র গাছের, যার শিকড় মযবূত আর ডালপালা আকাশে সম্প্রসারিত, সব সময় আল্লাহর হুকুমে ফল দান করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করে থাকেন। যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (সূরা ইব্রাহীম ঃ ২৪)

মথির ইঞ্জিল ঃ সুসংবাদ, প্রথম পর্ব

আসমানী বাদশাহী এমন এক ঘরের মালিকের মত যিনি খুব সকালে বের হয়েছেন যেন আঙ্গুরের বাগানে শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারেন। তিনি দৈনিক এক দিরহাম পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে শ্রমিক নিযুক্ত করে বাগানে পাঠালেন। তারপর তিনি কিছু বেলা হবার পর বাজারে গিয়ে কিছু শ্রমিককে বেকার অবস্থায় পেয়ে তাদেরকেও বাগানে পাঠালেন এবং বললেন, কাজ করে যাও, তোমরাও পারিশ্রমিক পাবে। তারপর তিনি মধ্য দিনে ও বিকেলেও একই অবস্থায় আরও শ্রমিকদেরকে বাগানের কাজে নিয়োগ করলেন। তারপর তিনি দিনের মাত্র একঘণ্টা বাকী থাকতেও বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা

শ্রমিকদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা জানাল, আমাদেরকে কেউ কাজে নিযুক্ত করে নি, আমরা বেকার। তখন তিনি তাদেরকেও বাগানের কাজে নিযুক্ত করেন। সন্ধ্যা বেলায় বাগানের মালিক সকল শ্রমিককে ডেকে প্রত্যেককে সমপরিমাণ এক দিরহাম করে পারিশ্রমিক প্রদান করেন। যখন তিনি সকল শ্রমিককে ডেকে পাঠান এবং এক দিরহাম করে পারিশ্রমিক প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সকলকে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করেন, তখন তারা বাগানের মালিকের নিকট অভিযোগ করে, যারা মাত্র এক ঘন্টা কাজ করেছে তাদেরকে এক দিরহাম দেয়া হল আর আমরা যারা সকাল থেকে সারা দিন কাজ করেছি, আমরাও এক দিরহাম পেলাম! আমরা সারাদিন রৌদ্র ও গরম সহ্য করে কঠোর পরিশ্রম করেও যা পেলাম, একঘণ্টা কাজ করে আমাদের সমান পাওয়া কি আমাদের উপর বে-ইনসাফী নয়? মালিক তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের সাথে কোন বে-ইনসাফী করা হয়নি। কেননা তোমাদের সাথেও এক দিরহাম দেয়ার চুক্তিতেই তোমাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে যারা কম সময় কাজ করেছে, তাদেরকে এক দিরহাম দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে তোমাদের আপত্তি করার কি কোন সুযোগ আছে? আমি আমার সম্পদ যদি কাউকে বেশি দেই তা হলেও অন্য কেউ তো আপত্তি করতে পারে না। এভাবে প্রথম ব্যক্তি শেষের হবে এবং শেষের ব্যক্তি প্রথম হবে।

ঘরের মালিক হলেন রাব্বুল আলামীন। আঙ্গুরের বাগান হল দীনে ইলাহী আর শ্রমিক হচ্ছে উম্মাতসমূহ। শ্রমিকদের শেষ দল বলতে যাদেরকে বলা হয়েছে, তারা হল আখিরী নবীর উম্মাত, যারা এক ঘণ্টা কাজ করেছে। তারা সকলের শেষে হয়েও সকলের প্রথমে থাকবে।

সহীহ বুখারীতে আছে ঃ

عَن ابن شهاب عن سالم به عبد الله عن أبيه انه أخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما بقاءكم فيما صلف قبلكم من الامم كما بين صلوة العصر الى غروب الشمس اوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى اذا انتصف النهار عجزوافاعطوا قيراطًا قيراطًا ثم اوتى أهل الانجيل الانجيل فعملوا الى صلواة العصر ثم عجزوافاعطوا قيراطًا قيراطًا ثم اوتينا القرآن فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين الى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين واعطينا قيراطًا قيراطًا ونحن اعثر عملا قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيئ قالوا لا قال فهو فضلى اوتيه من أشاء (صحيح بخارى باب المواقيت)

"ইবন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে তিনি তার পিতা থেকে তিনি জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তিনি বলতে শুনেছেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের অবস্থান ও তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতের পৃথিবীতে অবস্থানের উদাহরণ হচ্ছে। আসরের নামায থেকে মাগরিবের নামাযের সময় পর্যন্ত। তাওরাত ওয়ালাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছে, তারা সে অনুযায়ী কাজ করেছে। যখন দিনের অর্ধেক হল তখন তারা ক্লান্ত হয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়ে গেল (তারা কাজ সম্পন্ন করতে পারল না)। অতএব তাদেরকে এক কিরাত করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হল। তারপর ইঞ্জিল ওয়ালাদেরকে ইঞ্জিল দেয়া হল তারা আসরের নামায পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তারা ক্লান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়ল। তখন তাদেরকেও এক কিরাত পরিমাণ করে পারিশ্রমিক দেয়া হল। তারপর আমাদেরকে কুরআন দেয়া হল। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করলাম, তখন আমাদেরকে দু'কিরাত পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হল। পূর্বের দু'কিতাবের ধারকগণ বললেন ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এক কিরাত পরিমাণ পরিশ্রম দেয়া হল, আর তাদেরকে দু'কিরাত পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হল। অথচ আমরা অধিক সময় পর্যন্ত কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা উত্তরে বললেন ঃ আমি কি পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে যুলুম করেছি? তারা বলল, না, তা করেন নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, এটি হলো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা আমি আমার অনুগ্রহ অধিক দিয়ে থাকি।" (বুখারী নামাযের ওয়াক্ত অধ্যায়)

মথির ইঞ্জিলের বক্তব্য প্রথমকে শেষের এবং শেষেরকে প্রথম করার যে কথা, তা বুখারীর হাদীসও প্রমাণিত।

حدثنا أبوهريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون (بخارى)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমরা সকলের শেষের, তবে সকলের অগ্রগামী نحن الاخرون السابقون। যুগের নিয়মে আমরা সকলের শেষে রয়েছি। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে আমরা আল্লাহর ফযলে সকলের অগ্রগামী হবে।

সুসংবাদ ঃ বার্নাবাসের ইঞ্জিল

نقل القسيس سيل فى مقدمة ترجمة للقران العظيم من انجيل برناباس وطبعت ١٨٥٤ وانتشرت ثمَّ طبعوا الكتاب مرة ثانية فاخرجوها وحذفوها وهى مانصها اعلم يابرنابا ان الذنب وان كان صغيرا يجزى الله عليه لان الله تعالى غير راضى عن الذَّنب ولمَّا

اجتنى امتى وتلاميذى لاجل الدُّنيا سخط اللّه لاجل هذا الامر و اراد باقتضاء عدله ان يجزيهم فى هذا العالم على هذه العقيدة الغير اللائقة ليحصل لهم النجاة من عذاب جهنم ولايكون لهم اذية هناك وانى وان كنت بريئًا لكن بعض الناس لما قالوا فى حقّى انَّهُ اللّه وابن الله كره الله هذا القول واقتضت مشيته بان لاتضحك الشياطين يوم القيمة على ولاتستَهزِونَ بِ فَاستحسن بمقتضى لطفه ورحمة ان يكون الضحك والاستهزاء فى الدنيا بسبب يهوداه ويظن كل شخص انى صلبت لكن هذه الاهانة والاستهزاء يبقيان الى ان يجئُ مُحمّد رَسول الله فأِذا جاء فى الدنيا ينبه كل مؤمن على هذا الغلط وترتفع هذه الشبهة من قلوب الناس انتهت ترجمة بحروفها قال فى اظهار الحق فان اعترضوا ان هذا الانجيل رده مجالس علماء هم فنقول لاعتبار لردهم وهذا من الاناجيل القديمة ويوجد ذكره فى كتب القرن الثانى والثالث فعلى هذا قبل ظهور نبينا صلى الله عليه وسلم بمائتى سنة ولايقدر احد ان يخبر بمثل هذا الامر من غير الهام كما لايخفى على ذو الافهام قال والبشارة الثانية قال الفاضل الحيدد على القرشى فى كتابه المسمى خلاصة سيف المسلمين الذى هوفى لسان الاردو اى الهندى فى صحيفة الثالثة والستين ان القسيس اوسكان الارمنى ترجم كتاب اشعيا عليه السلام باللسان الارمنى فى سنة ١٦٦٦ع وطبعت سنة ١٧٣٣ع وفيه الباب الثانى والاربعين هذا الفقرة ونصه ـ وسبحوا اللّه تسبيحًا جديدًا واثر سلطنة على اظهره واسمه أحمد ـ

"পাদ্রী সাইল তাঁর পবিত্র কুরআনের তরজমার ভূমিকায় বার্নাবাসের ইঞ্জিল থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এ ইঞ্জিল ১৮৫৪ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয়বার মুদ্রণের সময় সুসংবাদটি বাদ দিয়েছেন। পাদ্রী সাইল সুসংবাদটি ইঞ্জিল থেকে বর্ণনা করেছিলেন। তা হল ঃ হে বার্নাবা! পাপ ছোট হলে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময় দিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা পাপকে অপসন্দ করেন। যখন আমার উম্মত ও আমার ছাত্রগণ দুনিয়ার জন্য পাপ করে, তখন আল্লাহ এজন্য রাগান্বিত হন। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভ্রান্ত আকীদার কারণে দুনিয়াতে

শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করলেন, যেন তারা পরকালে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি পায়। সেখানে যেন তাদের কোন কষ্ট না হয়। যদিও আমি তাদের এসব বাতিল আকীদার সাথে সম্পর্কহীন। তবুও যেহেতু তাদের কেউ আমাকে আল্লাহ ও আল্লাহর পুত্র বলে, আর আল্লাহ এসব কথা খুবই অপসন্দ করেন। আল্লাহ তা'আলার প্রত্যাশা ও ইচ্ছা অনুযায়ী সব কিছু হয়। কিয়ামতের দিন যেন আমাকে নিয়ে শয়তান কৌতুক বা হাসাহাসি না করে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহ ও রহমতে চাইলেন ইয়াহূদীদের কারণে এসব হাসি দুনিয়াতেই থাকুক। তাদের সকলে এ ধারণা পোষণ করে যে, আমাকে শূলিতে ঝুলানো হয়েছে। কিন্তু এ অপমান হযরত মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। যখন তিনি পৃথিবীতে আগমন করবেন, তখন তিনি মু'মিনদেরকে ভুল ধারণা থেকে মুক্ত করবেন। তাদের হৃদয় থেকে বাতিল ধারণা বিদূরিত হবে..... ।

গায়বের সংবাদ-ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী
সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ مِنْ اَنْبَاۤءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ـ

"[এ নূহ (আ) এর ঘটনা] গায়বের খবর যা আমি তোমাকে অবহিত করেছি। অহী নাযিলের পূর্বে তুমি এ বিষয়ে অবহিত ছিলে না, তোমার সম্প্রদায়ও অবহিত ছিল না। অতএব [তুমিও নূহ (আ)-এর মত কাফিরদের বিষয়ে] সবর কর। অবশ্য শুভ পরিণাম মুত্তাকিদেরই হবে।" (সূরা হূদ)

হযরত নূহ (আ)-এর সময়ে কাফিরেরা কিছু সময় পর্যন্ত খুব হৈ-হুল্লড় করেছিল। কিন্তু তাদের শেষ পরিণতি ডুবে মরা ছিল। অন্যদিকে নূহ্ (আ)-এর সাথীরা সফলকাম হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দালাইলে নবুওয়াত ও রিসালাতের নিদর্শন যা কুরআন ও হাদীসে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে আছে। এসব ঘটনা সংঘটিত হবার পূর্বে সংবাদ দেয়া হয়েছে। যা ছিল অভিজ্ঞতা, অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেকের বাইরে। তারপর তাঁর সংবাদের ঘটনাবলী হুবহু যথাসময়ে সংঘটিত হয়েছে। যেমন ঃ বদরযুদ্ধের সময় যুদ্ধ শুরুর একদিন পূর্বে বলেছিলেন ঃ আগামীকাল অমুক এ স্থানে এবং অমুক ঐ স্থানে নিহত হবে। নিহতস্থলে নিশানও লাগানো হয়েছিল। পরের দিন দেখা গেল, প্রতিটি চিহ্নিত স্থানে প্রতিটি নিহত ব্যক্তির লাশ পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়া ও ইরাকের বিজয় সংবাদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি যে ক্রমধারা অনুযায়ী খবর দিয়েছিলেন, ঠিক সে ক্রমিকানুসারেই উক্ত বিজয় হয়েছিল। এজন্যই লোকেরা তাঁর সত্যপথের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন

করেছে। তাঁর সত্য মত ও পথের প্রমাণ স্বরূপ তাঁর সত্য ও বাস্তব প্রমাণাদি তাঁর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনে প্রত্যক্ষকারীদেরকে বাধ্য করে। বারবার অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি গায়বের যে সংবাদ দিয়েছেন, তা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। এজন্য তাঁকে সত্যবাদী ও সঠিক বলে বিশ্বাস করতে সকলে বাধ্য হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, তাঁর অন্যান্য সংবাদও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। কেননা একজন মানুষের পক্ষে নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে এমন ভবিষ্যদ্বাণী পেশ করা সম্ভব নয় যা একজন মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বাইরে। অতএব এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীই বুঝায় যে, তিনি গায়বের মালিকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তা এজন্য যে, গায়বের মালিকের নির্দেশনা ব্যতীত এ ধরনের বিষয়ে কোন মানুষের পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। তা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, অমুক সময়ে এ বিষয় সংঘটিত হবে আর তাঁর বলা অনুযায়ী তা-ই হচ্ছে এটা গায়বের মালিকের কথা জানা ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব হতে পারে না। আর এজন্যই এ সত্যের পতাকাবাহী হিদায়াতের কাণ্ডারীর উপর ঈমান আনা জরুরী। যেভাবে কোন রাজা-বাদশাহ্ কখনো কোন মন্ত্রী-উযীরকে তার একান্ত গোপনীয় রহস্যময় কিছু বিষয় অবহিত করেন। আর সে উযীর যদি সে বিষয়ে প্রয়োজনে বিশেষ লোকদের নিকট তা দিয়ে সতর্ক করেন এবং অবহিত করেন, তখন সচেতন লোকেরা বুঝে যে, এ উযীর বাদশাহর খুবই নিকটের ও আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব।

এভাবে গায়বের মালিক আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো তাঁর রাসূলকে অহীর মাধ্যমে কোন গায়বী বিষয় অবহিত করেন, যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আর লোকেরা আরও উপলব্ধি করবে যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও সম্মানিত রাসূল। এজন্য তিনি তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এভাবে আম্বিয়ায়ে কেরাম ও রাসূলগণ এমন সব সংবাদ দিয়েছেন যা সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে উর্ধ্বে। মানুষ বিশ্বাস করে যে, এসব কথা আলিমুল গায়েব আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন। তিনি অবহিত না করলে তা বলা সম্ভব হত না। আর এজন্য মুনাফিকেরা ভয়ে থাকত, কখন জানি তাদের গোপন মুনাফিকী প্রকাশ করে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা সে কথাটিই পবিত্র আল–কুরআনে বলেছেন ঃ

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ -

"মুনাফিকরা ভয় পায় যে, তাদের রবের পক্ষ হতে তাদের উপর এমন সূরা নাযিল হবে যাতে (প্রকাশিত হবে) তাদের অন্তরে যা কিছু আছে।" (সূরা তাওবা ঃ ৬৪)

সাধারণ মানুষের চাহিদা হল, কোন পথ প্রদর্শক ও হিদায়াতকারী এসে তাদেরকে নির্দেশনা দিবে। আর সাধারণ মানুষ হাদীকে মান্য করতে পারবে। কেননা এ ধরনের

ঘটনাবলী যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির আওতার বাইরের বিষয়, তা ঘটনার অনেক পূর্বে সংবাদ দেয়া বে-নিয়ায ও সার্বভৌম মহান সত্তার নির্দেশ ব্যতীত অসম্ভব।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী

বৈশিষ্ট্য

অতীতের অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যেমন বনী ইসরাঈলের নবীগণ অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তা তাঁদের সংবাদে নেই। কেননা তাঁদের সংবাদে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অনেক কিছু বুঝবার ও বুঝানোর অবকাশ ছিল। কিন্তু মহানবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল খুবই স্পষ্ট ও সরাসরি। যেমন ঃ রোম সাম্রাজ্যের বিজয়, খিলাফতে রাশেদা, ইয়ামন বিজয়, সিরিয়া বিজয়, ইরাক বিজয় এবং কায়সার ও কিসরার সাম্রাজ্যের উপর দখল ও কর্তৃত্বসহ সকল সংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণীই ছিল স্পষ্ট ও সরাসরি। তাতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া এসব সংবাদ ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী। যা দেখে ও শুনে পৃথিবীবাসী অবাক ও আশ্চর্য হয়ে যেত, ভাষা ও মুখ স্তব্ধ হয়ে যেত। তিনি ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাবলী ও বিপদাপদ সম্পর্কে যখন বর্ণনা দিতেন, তখন মনে হত যেন তিনি চাক্ষুষ দেখে তা বর্ণনা করছেন। এখান আমরা কুরআনে বর্ণিত কিছু আগাম সংবাদ এবং তারপরে হাদীসে উল্লেখিত কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করব।

১ আল-কুরআন সংরক্ষিত থাকার সংবাদ

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَى وَاِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ

"আমি এই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি এর সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করব।" (সূরা হিজর ঃ ৯)

কারো পক্ষে কুরআনে সামান্যতম সংযোজন-বিয়োজন ও বিকৃতি করা সম্ভব নয়। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছে। ইতিমধ্যে চৌদ্দশ বছর গত হয়েছে, আল-হামদু লিল্লাহ, কুরআনের একটি হরকতও পরিবর্তন হয়নি। এভাবে অবিকৃত অবস্থায় কুরআন এ দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত রয়েছে, যে অবস্থা কুরআন মহানবী (সা) এর উপর নাযিল হয়েছে, সে অবস্থায়ই বর্তমান আছে। শুধু মুসলমান নয়; বরং দুনিয়ার সকলে কুরআনের এ মু'জিযার কথা স্বীকার করে। ইসলামের দুশমনেরা কুরআনের অবিকৃতরূপকে বিকৃত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ তারা একটি শব্দ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ তা'আলা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন, তা একশত ভাগ সত্যে পরিণত হয়েছে। পক্ষান্তরে তাওরাত ও ইঞ্জীল এর ব্যাপারে যে বিকৃতি হয়েছে, তা ইয়াহূদী ও নাসারাদের নিকটও স্বীকৃত।

২. কুরআনের চিরন্তন মু'জিযার ভবিষ্যদ্বাণী

قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَن يَّأتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَايَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ـ

"হে নবী! আপনি লোকদেরকে বলুন, যদি মানুষ ও জিন্ন সকলে একত্রিত হয়ে কুরআনে মত রচনা আনতে চেষ্টা করে, তবে কুরআনের মত তা করতে সক্ষম হবে না, যদিও তারা পরস্পরকে এ কাজে সহযোগিতা করে।" (বনী ইসরাঈল ঃ ৮)

৩. নবীর নিরাপত্তার ভবিষ্যদ্বাণী

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ـ

"আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা দিবেন।" নবুওয়াতের প্রথমদিকে নবী (সা) বন্ধু ও সাহায্যকারীবিহীন ছিলেন। আরবের সকলে এমনকি সমস্ত পৃথিবী তাঁর দুশমন ছিল। সে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিরাপত্তার ওয়াদা করেন যে, আপনি পেরেশান হবেন না, আল্লাহ তা'আলা আপনার হিফাযতকারী। দুশমন আপনার নিরাপত্তা নষ্ট করে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল-হামদু লিল্লাহ আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুশমন থেকে রক্ষা করেছেন। এমন কি হিজরতের সময় যখন কাফিরেরা তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত করল, তখন তিনি হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পবিত্র বিছানায় শায়িত রেখে সূরা ইয়াসীনের প্রথমদিকের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করে—এক মুষ্টি মাটি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করে তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যান। তারপর হযরত আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে যান। তাঁকে সাথে নিয়ে সাওর গুহায় তাশরীফ নিয়ে যান। এ বিষয়ে এই আয়াতে নাযিল হয়েছেঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْيُخْرِجُوْكَ ـ

(সূরা আনফাল ঃ ৩০)

৪. ইসলাম বিজয়ী হবার সংবাদ

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

"তিনি সে সত্তা, যিনি নিজ রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও হক দীন দিয়ে, যেন রাসূল তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকেরা তা অপসন্দ করে।" (সূরা ফাতহ ঃ ২৮)

আল-হামদু লিল্লাহ্, আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা পূরা করেছেন। ইসলাম বিজয়ী হয়েছে ইয়াহূদী, নাসারা, মজূসীসহ সকল মতবাদের উপরে। বিজয়ী হয়েছে মর্তিপূজাসহ সকল বাতিল ধর্মের উপর। কোন ধর্ম ও মতবাদের নৈতিক শক্তি নেই যারা দলীল-প্রমাণ দিয়ে ইসলামের মুকাবিলা করতে পারে।

৫. রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের সংবাদ

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاۤءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ لَايُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ -

"রূম পরাজিত হয়েছে। (অর্থাৎ রূমের নাসরারা)। আরবের নিকটের যমীনে (পরাজিত হয়েছে)। তারা পরাজয়ের পর কয়েক বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। পূর্বের বিষয়টাও আল্লাহর ইখ্তিয়ারে ছিল, পরেরটিও আল্লাহর ইখ্তিয়ারের আওতায়। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায়ই পরাজয় এসেছে, পরে আল্লাহর ইচ্ছায়ই বিজয় আসবে এবং সে দিন মুসলমানগণ খুশি হবে (যে দিন রোম পারস্যের উপর বিজয়ী হবে) আল্লাহর সাহায্যে। (মুসলমানগণ কাফিরদের উপর বিজয়ী হবে হুদায়বিয়ার চুক্তি করে)। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তিনি পরাক্রমশালী ও মেহেরবান। আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন (পারস্য ও মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন) আল্লাহ তা'আলা ওয়াদার খেলাফ করেন না, কিন্তু বেশি ভাগ মানুষ তা বুঝতে পারে না।" (সূরা রূম ঃ ১-৬)

এসব আয়াতে বিরাট এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরতের পূর্বে এসব আয়াত মক্কায় নাযিল হয়েছে। ঘটনার বিবরণ হল, একবার রোমীয় ও ইরানীদের মধ্যে যুদ্ধ হল। ইরানীরা রোমীদের উপর বিজয়ী হয়। এ সংবাদে মক্কার পৌত্তলিকেরা আনন্দিত হয়ে মুসলমানদেরকে তিরস্কারের সুরে বলতে লাগল, ইরানীরা আমাদের মত মূর্তিপূজারী, তারা আহলে কিতাব রোমীদেরকে পরাজিত করেছে। অতএব আমরাও মুসলমানদেরকে পরাজিত করে বিজয়ী হব। মুসলমানগণ তাদের কথা শুনে যখন মন খারাপ করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলো নাযিল করেন। যেখানে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, যদিও এ সময়ে রোমীরা পরাজিত হয়েছে, তবে দশ বছরের মধ্যেই রোমীরা পারস্যবাসীদের উপর বিজয়ী হবে। এটি আল্লাহর ওয়াদা যা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। তারপর সাত বছর পুরো হবার আগেই কুরআনে ভবিষ্যদ্বাণী পুরো হয়েছিল। রোমীরা ইরানীদের উপর বিজয়ী হয়েছে। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আল্লাহ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

(৬) খেলাফতে রাশেদা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِىْ ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا يَعْبُدُوْنَنِىْ وَلَايُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا - (সূরা নূর ঃ ৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহ তৎকালীন সালেহীন মু'মিনদেরকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে তিনটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এক ঃ তোমাদেরকে এমন খিলাফত ও বিশাল রাজত্ব দেয়া হবে যা ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈলের মধ্যে হযরত দাঊদ (আ)-কে বে-নযীর খেলাফত ও রাজত্ব দেয়া হয়েছিল।

দুই ঃ খিলাফতে রাশেদার যুগে দীন ইসলামকে তিনি এমন শক্তি, প্রতিপত্তি ও শাসন ক্ষমতা দান করবেন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে সকল দীনের উপর ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় ঃ মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফিরদের ভয় বিলকুল মুছে যাবে এবং তারা নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ও নিরাপদে আল্লাহর ইবাদত করবে। আর এ ধরনের বক্তব্য অনেক হাদীসে আছে। তারপর আল-হামদু লিল্লাহ খুলাফায়ে রাশেদার হাতে এসব প্রতিশ্রুতি পূরো হয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম কায়সার ও কিস্‌রার ধনভাণ্ডারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। যখন এসব বিষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন সাহাবায়ে কিরাম সর্বহারা বা সহায়সম্বলহীন কঠিন জীবনযাপন করছিলেন। বৈষয়িক উপকরণ না থাকায় কাফিরদের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলেন। রাতে শয়ন করার সময়ও ভীত থাকতেন। না জানি কেউ আমাদের উপর হামলা করে বসে। যুদ্ধ করার মত শক্তি-সামর্থ্যও ছিল না। শাসন ও কর্তৃত্ব করার মত কোন সামাজিক শক্তিও ছিল না। চারপাশের সমস্ত গোত্রই ইসলাম ও মুসলমানের দুশমন ছিল। সকলে ছিল মুসলমানের রক্ত পিপাসু। ইরানে অগ্নিপূজকদের রাজত্ব ছিল, রোমে ছিল ঈসায়ীদের সরকার। দু'টি দেশই আর্থ-সামাজিক ও সামরিক শক্তির দিক থেকে ছিল পরাশক্তি। অন্যদিকে মুসলমানগণ ছিলেন সহায়-সম্বলহীন। শুধু তা-ই নয়, কায়সার ও কিস্‌রার মুকাবিলা করার মত কোন রাজশক্তিও দুনিয়ায় ছিল না। এমনি বৈরী প্রেক্ষাপটে ত্রিশ বছরের খিলাফত ও সরকারের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যা প্রকাশ্য উপকরণের ভিত্তিতে নির্ভরশীল না হয়ে গায়েবী সাহায্যেই সম্ভব হয়েছিল। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই হিজায, নজদ, ইয়ামন, খায়বার ও বাহরাইনসহ আরবের অধিকাংশ রাজ্য মুসলমানদের দখলে এসেছিল। আর নাজ্জাশী মুসলমান হয়েছিলেন। ফলে হাবশা শত্রুভূমি থেকে দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছিল। হিজর ও সিরিয়ার কোন কোন ঈসায়ী গোত্র জিযিয়া দিতে শুরু করেছিল।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফতকালে পারস্যের কিছু এলাকা, বসরা এবং সিরিয়ার কিছু এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে। হযরত উমর ফারূক (রা)-এর খিলাফতের সময় সিরিয়া ও সমগ্র মিসর, পারস্যের বেশিরভাগ দেশ মুসলমানগণ জয় করেন। কায়সারের চূড়ান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুধু তার প্রভাব ক্ষয় করতেই ব্যয় হয়েছে। কায়সার চারদিকে হাত-পা ছুঁড়েও প্রাসাদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়নি। পারস্যের বেশির ভাগ এলাকা যা কায়সারের অধীন ছিল, তা কায়সারের পরাজয়ের পর হযরত ফারূক আযমের অধীনে চলে আসে। কায়সারের ভাণ্ডার ও ধন-সম্পদ হিসাব করে মুসলমানদের মধ্যে করা বণ্টন হয়। এসব এলাকায় ইসলাম ও তাওহীদের ডংকা বাজতে লাগল। কোন কোন এলাকা থেকেও শিরক ও কুফরের নাম-নিশানাও মুছে গিয়েছে এবং কোন কোন এলাকায় কুফর পরাজিত হয়েছে। নিরাপদ পরিবেশে মুসলমানগণ আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলেন। হযরত উসমান (রা)-এর যামানায় মুসলমানগণ বিজয়ের পতাকা নিয়ে আফ্রিকার উত্তর সীমান্তের দেশ মরক্কো পেরিয়ে স্পেন, কায়রোয়ান ও অতলান্তিক সাগরের তীরে গিয়ে পৌঁছেছে।

পূর্বদিকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত সব দেশ বিজিত হয়েছিল। উসমান গনী (রা)-এর খিলাফতের যামানায় কিস্‌রার সরকারের বিলুপ্তি ঘটে। তাদের কোন নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকেনি। হিজরী ৩০ সনে কিস্‌রা মৃত্যুবরণ করে। তখন থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজস্ব মদীনার ভাণ্ডারে আসতে থাকে। সমগ্র বিশ্ব তখন মুসলমানদের অনুগত ছিল। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে পৃথিবীর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে ছিল। যেমন নাদির শাহ যখন হিন্দুস্তানের সম্রাট মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করল, তখন মনে হয়েছে যে, গোটা হিন্দুস্থানে নাদির শাহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অথচ তখন দাক্ষিণাত্যে তার আনুগত্য ছিল না। তেমনিভাবে যখন রূম সাম্রাজ্য পরাজিত হল, তখন রূম সাম্রাজ্যের অধীন ফ্রান্সও পরাজিত হল। তখন মনে হয়েছে ইসলামের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের এমন শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, যেন গোটা পৃথিবীর সমগ্র দেশ ও সরকার মুসলমানদের অধীন হয়ে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা)-এর ওয়াদা মুতাবিক এত অল্প সময়ের মধ্যে শতশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। নাসারা অগ্নিউপাসক ও মুশরিকেরা হাজারো চেষ্টা-তদবির ও প্রাণান্তর চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে ইসলামের মুকাবিলা করেও পরিশেষে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রচেষ্টাও আয়োজন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাদের চরম বিরোধিতা, শত্রুতা ও প্রতিরোধ শুধু ব্যর্থই হয় নি, বরং ইসলামের উন্নতি ও বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। ইসলামের পতাকাবাহীগণ

পৃথিবীর ভূভাগের ৫০ শতাংশ ভূমির সীমায় পৌঁছে বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছে। গ্রীকের সীমায় পৌঁছেছে। তারপর তুর্কিস্তানের উত্তরের সীমান্তে পৌঁছেছে। এভাবে এ বাহিনী এগিয়ে সত্তর ভাগ সীমানা পেরিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত এলাকায় ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত আলী (রা)-এর যামানায় যদিও নতুন কোন দেশ বিজিত হয়নি, কিন্তু ইসলামের উন্নতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় নি। কেননা হযরত আলী (রা) ও হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর বিবাদ ছিল দু'ভাইয়ের মতপার্থক্য। তবে কুফরের মুকাবিলায় তাঁরা দু'ভাই এক ছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের বিজয় কাহিনী নিয়ে অনেক বিশাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যার থেকে দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় ইসলামের যে উন্নতি হয়েছে। এর নযীর পাওয়া যাবে না। কায়সার ও কিস্‌রার রাজত্ব উল্টে গেছে। যমীনের অর্ধেক অংশ বিজিত হয়েছে। তাঁরা দীনে হক ও ইসলামকে শিরক ও কুফরের উপর বিজয়ী করেছেন। পৃথিবীতে ইনসাফ ও সুবিচার দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

৭. খায়বার বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৮. পারস্য ও রোম বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِىْ قُلُوْبِهِمْ - فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا - وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَاْخُذُوْنَهُ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا - وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِىَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ـ وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ـ

(সূরা ফাতহ ঃ ১৮-২১)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বায়'আতে রিদওয়ান বা হুদাবিয়ার সন্ধিতে যারা শরীক হয়েছিল, তাদেরকে নিকটবর্তী খায়বার বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিলেন। যা আল্লাহ তা'আলার বাণী واثابهم فتحا قريبًا এবং রোম বিজয়ের প্রতিশ্রুতির প্রতি এবং واخرى لم تقدروا عليها বলে পারস্য ও রোম-এর বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল-হামদু লিল্লাহ, এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মাধ্যমে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে। খায়বার মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায়ই বিজিত হয়েছে। পারস্য ও রূম হয়েছে হযরত উমর (রা)-এর যামানায়।

৯. আরবের গোত্রসমূহের পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ * اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعُ مُنْتَصِرُ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ -

আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়েছে। আরবের গোত্রগুলো এত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল যে, তাদের ইসলামের মুকাবিলা করার জন্য মাথা উঁচু করার শক্তিও ছিল না। হিজরী ৪র্থ বছরে ইয়াহূদী বনী নযীর পরাজিত ও নির্বাসিত হয়েছিল। আর ৫ম হিজরীতে বনী কুরায়যা নিহত হয়েছে। ৭ম হিজরীতে খায়বার বিজয় হয়েছে এবং ইয়াহূদীগণ পরাজিত হয়ে মুসলমানদেরকে জিযিয়া কর প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।

১০. মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا - (সূরা নাসর)

৮ম হিজরীতে মক্কায় বিজয় হয়। নয় ও দশ বছরে চারদিকের আরব গোত্রসমূহ এবং সিরিয়া ও ইরাকের জনসাধারণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঈমান আনয়ন করে ও দলে দলে দীন ইসলামে শমিল হয়।

১১. পরিখার যুদ্ধ বা আহযাব যুদ্ধের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهٗ وَمَازَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا -

অন্যদিকে হাদীসে আছে ঃ

سيشتد الاخر اجتماع الاحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم -

"শীঘ্রই আরবের বিভিন্ন গোত্র একত্রিত হয়ে তোমাদের উপর হামলা করবে, তবে শেষ পর্যন্ত তোমরাই তাদের উপর বিজয়ী হবে।"

বাস্তবে তা-ই হয়েছিল, আহযাব যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন গোত্র সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করেছিল। আল-হামদু লিল্লাহ, পরিশেষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদা সত্যে পরিণত হল। মুসলমানদেরকে আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করলেন ও কাফিররা পরাজিত হয়ে ফিরে চলে যায়।

১২. ইয়াহূদীদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী যে, তারা মৃত্যু কামনা করবে না

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ـ (সূরা আহযাব ঃ ২৪)

হযরত নবী (সা) ইয়াহূদীদেরকে বলেছিলেন ঃ "যদি তোমরা তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হও যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয়জন, তা হলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, তারপর সাথে সাথে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঃ তোমরা কখনোই মৃত্যু কামনা করবে না। বাস্তবে তা-ই হয়েছিল। তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে নি। এ বিষয়ে সূরা জুমু'আতেও এভাবে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظَّالِمِيْنَ ـ

১৩. ভীতি সঞ্চারের ভবিষ্যদ্বাণী

سَنُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَمَاْوٰهُمُ النَّارُ ـ (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫১)

যেমন হামরাউল আসাদ যুদ্ধে অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের অন্তরে প্রবল ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন। অথচ তারা উহুদে সবেমাত্র বিজয়ী হয়েছিল। তথাপি তাদের পুনরায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে সাহস হয়নি। একই অবস্থা হয়েছিল আহযাব বা খন্দক যুদ্ধে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْجَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا

(সূরা আহযাব ঃ ৯)

হাদীসে আছে ঃ نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور ـ

"আমাকে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে আর আদ জাতি ঘূর্ণিঝড়ে বরবাদ হয়েছে।"

১৪. মুরতাদ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ - يُجَاهِدُوْنَ

فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَايَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নবী (সা)-এর জীবদ্দশায় আগাম সংবাদ দিয়েছেন যে, সামনের দিনগুলোতে মুসলমানদের থেকে কিছু মানুষ মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যাবে। তখন মুরতাদদের মুকাবিলা করার জন্য কিছু মুসলমান দাঁড়িয়ে যাবে ও যুদ্ধ করবে। যুদ্ধকারী এসব মুসলমান আল্লাহর প্রিয়জন হবে। তারপর হযরত সিদ্দীকে আকবর আবূ বকর (রা)-এর যামানায় মুরতাদ ফিতনা প্রকাশ পায়। হযরত আবূ বকর (রা)-এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরাম মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করেন।

১৫. হযরত নবী (সা)-এর ওফাত সংবাদ

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ - وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا - فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, এ সূরাতে হযরত নবী (সা)-এর শেষ বিদায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও বিজয় আসবে, তখন দলে দলে মানুষ ইসলামে দাখিল হবে। তখন তুমি বুঝবে যে, তোমাকে প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এবার তুমি আল্লাহর তাসবীহ্ ও প্রশংসায় ব্যস্ত হও এবং ইস্তিগফার করতে থাক ও আখিরাতের সফরের প্রস্তুতি নিতে থাক।

কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী এতক্ষণ আলোচনা হয়েছে। এখন হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা হবে।

হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত হুযায়ফা ইবন ইয়ামন (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার হযরত নবী (সা) তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলীর উল্লেখ করলেন। যে যে যতটুকু স্মরণ রাখতে পেরেছে, স্মরণ রেখেছে। অন্যথায় ভুলে গেছে। এ সম্পর্কে আমার সঙ্গি-সাথীরা অবহিত আছেন। তাঁর প্রদত্ত সংবাদের অনেক কিছু আমি ভুলে গিয়েছি। তবে যখন সেসব সংবাদের ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তখন তা স্মরণ হয়ে যায়। অর্থাৎ সংঘটিত হবার পর আমার মনে পড়ে যায়, এটির কথাও নবী (সা) বলেছিলেন– যেমন অনুপস্থিত কোন লোকের স্মরণে তার ছবি স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। তারপর যখন তার সাথে দেখা হয় তখন পরিচিত হওয়া যায় যে, সে অমুক ব্যক্তি। (যারকানী, ফাতহুল বারী, পৃ. ২০৮)

এখন আমরা সংক্ষেপে এমন কিছু বিষয়ের কথা তুলে ধরব যা ঘটবার পূর্বেই হযরত নবী (সা) বলেছিলেন। এ বিষয়ে হাদীসগ্রন্থ ও সংকলন গ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করব, যেন কেউ বিস্তাতিরভাবে জানতে চাইলে তার সুযোগ থাকে।

১. খিলাফতে রাশেদার সংবাদ অসংখ্য হাদীসে উল্লেখ আছে।

২. খিলাফতে রাশেদার মেয়াদকাল ত্রিশ বছর হবার সংবাদ। (যারকানী, পৃ. ২২৩ ৭ম খণ্ড)

৩. প্রথম দুই খলীফার সংবাদ যে, তোমরা আবূ বকর ও উমরের অনুসরণ করবে।

৪. খিলাফতে রাশেদার বিষয়ে অধিক হারে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে খিলাফতে রাশেদা ক্রমধারা জানা যায়।

৫. ইসলামী সাম্রাজ্যের বিশালতত্ব ও ব্যাপক বিজয়ের সংবাদ তিনি দিয়েছেন। তিনি ফরমায়েছেন ঃ আমাকে হাতের মুষ্টিতে যতদূর যমীন দেখানো হয়েছে, আমার উম্মাতের রাজত্ব ততটুকু পর্যন্ত ব্যাপক হবে। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২১০)

৬. কায়সার ও কিস্‌রার পতনের সংবাদ দিয়েছেন (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ৩০৭)

৭. খিলাফতে রাশেদার পর রাজবংশের শাসনের সংবাদও তিনি জানিয়েছেন। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২২১)

৮. এছাড়া তিনি বিভিন্ন শহর ও রাজত্বের উপর মুসলমানদের বিজয় সংবাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে রয়েছে ঃ সিরিয়া, ইরাক, মিসর, বায়তুল মুকাদ্দাস ও ইস্তাম্বুল।

৯. বদরের যুদ্ধের পূর্বদিন তিনি দুশমন বাহিনীর নিহতদের নাম ও স্থান উল্লেখ করেছেন। যার নামের সাথে যেস্থান তিনি উল্লেখ করেছেন, তারা ঠিক সেখানেই নিহত হয়েছে।

১০. উবাই ইবন খালফ সম্পর্কে তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, নবী (সা) তাকে হত্যা করবেন।

১১. খন্দক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আজকের পর কুরায়শগণ আমাদের উপর আর হামলা করার সাহস করবে না; বরং আমরাই তাদের উপর চড়াও হব।

১২. তিনি মদীনায় থেকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন। (যারকানী, ৭ খ, পৃ. ২০৬)

১৩. মুতার যুদ্ধে যুখন মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি শহীদ হলেন, ঠিক সেসময় মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা) চলমান অবস্থার বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশন করেন এবং তাঁদের শাহাদাতের সংবাদ অবহিত করেন।

১৪. তিনি শি'আবে আবূ তালিব উপত্যকা থেকে সংবাদ দেন যে, কুরায়শরা মুসলমানদেরকে সামাজিক বয়কট করার জন্য নিজেরা যে চুক্তিনামা স্বাক্ষর করেছিল, যা তারা কা'বাঘরে ঝুলিয়ে রেখেছিল, তার লেখা শুধুমাত্র আল্লাহর নাম ব্যতীত পোকায় খেয়ে ফেলেছে। (যারকানী, ২১০ পৃ.)

১৫. ইন্তিকালের পূর্বে তিনি হযরত ফাতিমা (রা)-কে সংবাদ জানান যে, তাঁর ইন্তিকালের পর আহলে বায়তের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত ফাতিমা তাঁর সাথে পরকালে মিলিত হবেন।

১৬. রাসূলুল্লাহ (সা) মৃত্যুর রোগের সময় তাঁর বিবীদেরকে বলেছিলেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিক দান-সাদাকাকারী, সে প্রথমে আমার সাথে পরকাল মিলিত হবে। তাতে দেখা গেল হযরত যয়নাব (রা) যিনি পবিত্র বিবীদের মধ্যে অধিক দানশীল ছিলেন, তিনি সমস্ত বিবীদের প্রথমে ইন্তিকাল করেন।

১৭. হযরত উমর (রা) সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, উমর হল ফিতনার তালা ও প্রতিরোধক। অর্থাৎ যতদিন উমর (রা) জীবিত থাকবেন ফিতনা বের হতে পারবে না। তারপর দেখা গেল, বাস্তবে তা-ই হল। হযরত উমর (রা)-এর অবর্তমানে ফিতনা-ফাসাদ মুসলমানদের মধ্যে সূত্রপাত হতে লাগল।

১৮. তিনি হযরত উসমান (রা) ও হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাতের আগাম সংবাদ জানিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত উসমান (রা) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ তুমি দুশমনের আঘাতে শহীদ হবে এবং তুমি জান্নাতী হবে। বাস্তবে হুবহু তা-ই হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে, তোমার মাথায় এক বদবখত লোক আঘাত করবে। তাতে তোমার শরীর রক্তাক্ত হয়ে যাবে; বাস্তবে তাই হয়েছে।

১৯. জামাল যুদ্ধের আগাম সংবাদও তিনি দিয়েছিলেন।

২০. সিফফীন যুদ্ধের ভবিষ্যত সংবাদও দিয়ে জানিয়েছিলেন।

২১. হযরত আয়েশা (রা)-এর অভিযানে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিলেন।

২২. হযরত আম্মার (রা)-কে তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন, বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে। তারপর বিদ্রোহী দলের হাতেই হযরত আম্মার (রা) শহীদ হয়েছিলেন।

২৩. হযরত ইমাম হাসান (রা) সম্পর্কে হযরত নবী (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে মুসলমানদের দু'টি বিরাট দলের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা করবেন।

২৪. হযরত ইমাম হুসায়ন (রা)-এর শাহাদাতের সংবাদও তিনি পূর্বেই জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন ঃ তোমাকে আমার উম্মাতের লোকেরা হত্যা করবে।

২৫. সাবিত ইবন কায়সের শাহাদাতের সংবাদ।

২৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)-এর কঠিন পরীক্ষার সংবাদ।

২৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-কে একটি রাজবংশের পিতা হবার সংবাদ (আব্বাসীয় খিলাফত)।

২৮. আসওয়াদ আনসী, নামক মিথ্যা নবীর দাবিদারের সংবাদী সে মিথ্যা নবীর দাবি করেছিল। নবী (সা) তার নিহত হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সে যে রাতে নিহত হয়, মদীনায় নবী (সা) তার খবর সাহাবায়ে কিরামকে জানান।

২৯. পারভেজের নিহত হবার সংবাদ।

৩০. হযরত আব্বাস (রা)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে আসা সম্পদের সংবাদ। হযরত আব্বাস (রা) বদর যুদ্ধে বন্দী হন। যখন তাঁর নিকট মুক্তিপণ চাওয়া হল, তখন তিনি জানান, মুক্তিপণ দেয়ার মত অর্থ তাঁর সংসারে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আপনি উম্মুল ফযলের নিকট যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্ব রাতে যে অর্থ রেখে এসেছিলেন, তা দিয়ে মুক্তিপণ দিন। অথচ এ বিষয়টি কারো জানা ছিল না।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সা) আরও অনেক সংবাদ দিয়েছেন। যেমন হাদীস অস্বীকারকারীদের সংবাদ, দাজ্জাল, খারিজী, মিথ্যা নবীসহ অনেক আগাম সংবাদ তিনি জানিয়েছিলেন। কিয়ামতের আলামতসহ অনেক বড় বড় বিস্ময়কর ঘটনার খবরও তিনি দিয়েছেন। তাঁর দেয়া সংবাদের অনেক কিছুই কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহর অহীর সহযোগিতা ব্যতীত দেয়া সম্ভব নয়। সক্ষিপ্তভাবে এখানে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর কিছু আলোচনা হল।

أللهم صل على سيدنا محمد وعلى واله وصحبه وسلم

বরকতময় মু'জিযার দান

প্রত্যেক নবী ও রাসূল-এর ব্যক্তিসত্তা ও গুণাবলীর সাথে মু'জিযা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু নবী করীম (সা) যেভাবে সকল নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠনবী ছিলেন, তেমনিভাবে তাঁর মু'জিযার মধ্যে পূর্ণতা ও বরকতের প্রাচুর্য ছিল, যা অন্য নবীদের মু'জিযার মধ্যে এত ব্যাপকভাবে ছিল না। যেমন, সামান্য খাদ্যেও একটু পানি দিয়ে একদল বিশাল বাহিনী তৃপ্তি সহকারে আহার করেছে। এ ধরনের অবস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নস্থানে হয়েছিল।

১. খন্দক যুদ্ধের সময় হযরত জাবির (রা)-এর গৃহে মাত্র এক ১টি রুটি দিয়ে নবীসহ অনেক সাহাবী তৃপ্তি সহকারে আহার করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

২. হযরত আবূ তালহা (রা)-এর বাড়িতে তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-সহ দু'তিন-জনকে দাওয়াত করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের জন্য প্রস্তুত আহার দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)

সকল সাহাবীকে পেটপুরে খাইয়েছিলেন (যাদের সংখ্যা একশতের মত ছিল)। (বুখারী ও মুসলিম)।

৩. একবার তিনি এক সা'-(সাড়ে তিন সের) ওজনের বকরীর গোশ্ত দিয়ে আশি (৮০) জন ব্যক্তিকে তৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করিয়েছেন। (বায়হাকী)

৪. হুদায়বিয়াতে কূপে পানি ছিল না। তিনি তাঁর উযূর অবশিষ্ট পানি শুকনো কূপে ঢেলে দিলেন। ঝরণার মত পানি এসে ভরপুর হয়ে গেল। যার পানি ১৫০০ (পনেরশত) মানুষ নিজেরা খেয়েছেন, ব্যবহার করেছেন এবং পশুকে খাইয়েছেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

৫. একবার মহানবী (সা)-এর সেনাবাহিনীতে সাহাবীদের পানি সংকট দেখা দিল। তিনি তাঁর উযূর ছোট পাত্রে যেখানে ভালভাবে পুরো হাত ঢুকানো যায় না, তিনি তাতে হাত মুবারক রাখলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে এমনভাবে পানি বের হতে লাগল যে, সকল সাহাবী পান করলেন ও উযূ করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

৬. তাবুকে একবার কূপ শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর অযূর অবশিষ্ট পানি তাতে ঢেলে দিলেন। তখন এত ব্যাপক হারে পানি এসে কূপ ভর্তি হয়ে গেল যে, সকলে পানি ব্যবহার করে তৃপ্তি লাভ করলেন।

৭. একবার মহানবী (সা)-এর দরবারে এক পেয়ালা দুধ আনা হলো। তখন তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-কে হুকুম দিলেন ঃ সকল আহলে সুফ্ফাকে ডেকে আন। তাঁদের সংখ্যা তখন সত্তর থেকে আশির মধ্যে ছিল। এত ব্যাপক সংখ্যক ক্ষুধার্ত সাহাবী তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করলেন। তারপরও পেয়ালায় পূর্বের পরিমাণ দুধ অবশিষ্ট ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

৮. হযরত যায়নাব (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (সা) বিবাহ করেন, তখন হযরত আনাস (রা)-এর মা হযরত উম্মু সুলায়ম (রা) সামান্য আহার প্রস্তুত করে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট পেশ করলেন। তিনি অনেক সাহাবীকে দাওয়াত করলেন এবং নির্দেশ দিলেন দশজন করে একসাথে বসে যাও এবং খেতে শুরু করো। দশজন দশজন করে প্রায় তিনশত সাহাবী এ সামান্য খাদ্য থেকে গ্রহণ করে তৃপ্তি সহকারে আহার করেছেন। শেষে প্রথম থেকে কিছু বেশি খাদ্য অবশিষ্ট ছিল। সুবহানাল্লাহ্। (সহীহ্ মুসলিম)

দু'আ কবূল হওয়া

মু'জিযার মধ্যে অন্যতম দিক হচ্ছে ঃ মহানবী (সা) যেসব দু'আ করেছেন তা কবূল হয়েছে।

এ ধরনের মু'জিযাকে ভাষাঅস্ত্রও বলা হয়। ভাষা অস্ত্র বলে বুঝানো হয় কণ্ঠ থেকে যে কথা বের হয়, বাস্তবে তা কার্যকরী হয়ে যায়। যেভাবেই বিষয়টিকে দেখা হোক না কেন, এটি তাঁর আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা হওয়ার ও সাহায্য পাওয়ার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কণ্ঠ ও ভাষা দিয়ে যা প্রকাশ করেন, তা হুবহু হয়ে যায়। হযরত নবী (সা) তাঁর পবিত্র যবানে যা বলেছেন, কঠিন পাথর ভেদ করেও তা-ই অংকিত হয়েছে। তিনি যার ব্যাপারে যা কিছু বলেছেন, তা তার জন্য হুবহু তা-ই হয়েছে। যেমনঃ

১. হযরত আনাস (রা)-এর জন্য তিনি দু'আ করেছেন, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দারিদ্র্য দূর করে ধনী বানিয়ে দেয়। নবীজির দু'আয় তিনি আজীবনের জন্য ধনী হয়ে গেছেন।

২. হযরত নবী (সা)-এর দু'আর বরকতে সাহাবী হযরত আবদুর রহমান (রা) সাধারণ অবস্থা থেকে লক্ষপতি ধনীতে পরিণত হয়েছিলেন।

৩. হযরত সা'দ (রা)-এর জন্য তিনি দু'আ করেছেন যে, হে আল্লাহ তুমি সা'দের দু'আ কবূল করো। এরপর হযরত সা'দ আল্লাহর নিকট যে দু'আ করতেন আল্লাহ তা কবূল করতেন।

৪. হিজরতের সময় হযরত নবী (সা)-এর পিছনে দুশমন হিসেবে সুরাকা অগ্রসর হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকটবর্তী হলে তিনি দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ সুরাকার ঘোড়াকে যমীনে দাবিয়ে দাও। সাথে সাথে হাঁটু পর্যন্ত ঘোড়া মাটিতে দেবে যায়। যখন সুরাকা ঈমান এনে ক্ষমাপ্রার্থী হয় এবং তিনি পুনরায় দু'আ করেন তখন ঘোড়া যমীন থেকে বের হয়।

৫. বাল্য বয়সে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) জন্য ইল্ম ও খিদমতের জন্য তিনি দু'আ করেছেন। যার বদৌলিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কণ্ঠ দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝরণাধারা জারী হয়েছিল।

৬. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর জন্য হযরত (সা) স্মরণশক্তি ও মেধার জন্য দু'আ করেছিলেন। যার ফলে পরবর্তী সময়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) যা কিছু শ্রবণ করতেন, কিছুই ভুলতেন না।

৭. হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর মায়ের ঈমান ও হিদায়াতের জন্য দু'আ করেছেন। ফলে তিনি হিদায়াত পেয়েছেন। (বুখারী)

৮. একবার মহানবী (সা) এক ব্যক্তির গৃহে তাশরীফ নিলেন। ঘরের লোকদেরকে একটি চাদর জড়িয়ে দু'আ করলেন। তাঁর দু'আর সাথে ঘরের দরজাও আমীন আমীন বলতে লাগল। তিনবার আমীন বলেছে।

৯. মক্কার কুরায়শরা যখন হযরত নবী (সা)-এর চরম বিরোধিতা ও তাঁর প্রতি কঠোর যুলুম শুরু করল, তখন এক পর্যায়ে তিনি তাদের জন্য বদদু'আ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের উপর দুর্ভিক্ষ নাযিল কর। তাঁর দু'আর ফলে কুরায়শদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়েছিল।

১০. মদীনা মুনাওয়ারায় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। জুমু'আর দিনে এক ব্যক্তি খুতবার সময় দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করার আবেদন করলেন। তিনি দু'আ করলেন সাথে সাথে বৃষ্টি হতে শুরু করল।

রোগীকে সুস্থ করার মু'জিযা[১]

১. খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা)-এর চোখ উঠা রোগ হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর চোখে নবী (সা)-এর মুখের লালা লাগিয়ে দেন। সাথে সাথে তাঁর চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। তারপর আর কখনো হযরত আলী (রা)-এর চোখে রোগ হয়নি। বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কাযী ইয়াযের 'শারহে শিফা' ও 'শারহে মাওয়াহিব' দেখা যেতে পারে।

২. হযরত কাতাদা ইবন নু'মান (রা)-এর চোখ আঘাতে বের হয়ে পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) হাত মুবারক দিয়ে চোখটি তুলে লাগিয়ে দিয়েছেন। ফলে চোখটি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হয়ে গেল। এমনকি দ্বিতীয় চোখটির চেয়ে এ চোখটি অধিক ভাল মনে হল।

৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবন আতীক ইয়াহূদী নেতা আবূ রাফিকে হত্যা করে ফেরার পথে সিঁড়ি থেকে পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলেন। ভাঙ্গা পায়ে রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র হাত বুলিয়ে দিলেন। সাথে সাথে পা এমনভাবে ঠিক হয়ে গেল যেন আদৌ পা ভাঙ্গেনি। (বুখারী, আবূ রাফে হত্যা অধ্যায়)

৪. সাওর পাহাড় গুহায় হিজরতের পথে হযরত আবূ বকর (রা)-কে সাপে কেটেছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) মুখের লালা লাগিয়ে দেয়ায় সাথে সাথে তিনি সুস্থ হয়ে যান।

৫. একবার এক অন্ধ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে আসেন। তিনি তাঁকে একটি দু'আ শিখিয়ে বলেন ঃ উযূ করে দু'রাক'আত নামায পড়ে আমার উসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে। আল্লাহ তোমার প্রয়োজন পূরো করবেন। অন্ধ ব্যক্তি নির্দেশ অনুযায়ী তা করল। বর্ণনাকারী উসমান ইবন হানীফ বলেন ঃ আমরা তখনো মজলিস থেকে উঠিনি, এতক্ষণে সে অন্ধ সাহাবী দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। (তিরমিযী ও হাকেম)

১. মুল্লা আলী কারী (র) প্রণীত শারহে শিফা, ১ খ, পৃ. ৬৫০।

৬. হাবীব ইবন আবূ ফুদায়ক-এর পিতার চোখে পর্দা পড়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) কিছু পাঠ করে ফুঁ দিয়ে দিলেন। সাথে সাথে তার দৃষ্টি ফিরে এল। (তিরমিযী, বায়হাকী ও ইবন আবূ শায়বা)

৭. বিদায় হজ্জের সময় এক মহিলা তাঁর এক বোবা ছেলে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং বললেন! আমার ছেলেটি কথা বলতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) পানি চাইলেন, পানি দিয়ে তিনি হাত ধুলেন, কুলি করলেন। তারপর বললেন ঃ এ পানি ছেলেটিকে পান করাও, কিছু পানি তার গায়ে ছিঁটাও। পরবর্তী বছর মহিলাটি ছেলেটিকে নিয়ে এল। তখন ছেলেটি পূর্ণ সুস্থ ও কথা বলতে পারে। (ইবন মাজাহ)

৮. হযরত মুহাম্মদ ইবন হাতিব (রা) ছোট বয়সে মায়ের কোল থেকে আগুনে পড়ে গিয়েছিলেন। তাতে তার শরীরের কিছু অংশ পুড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) পুড়ে যাওয়া স্থানে মুখের লালা লাগিয়ে দিলে সাথে তা ভাল হয়ে যায়। (আবূ দাঊদ ও মুসনাদে আহমাদ)

৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর দুর্বল স্মৃতিশক্তির বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করলেন যে, আমি আপনার থেকে যেসব কথা শ্রবণ করি, তা ভুলে যাই। তখন নবী (সা) তাঁকে বললেন ঃ তোমার চাদর বিছাও, তারপর তিনি চাদরে দু'হাত দিয়ে কিছু রাখলেন। তারপর বললেন, তুলে নাও এবং তোমার বক্ষে লাগাও। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ আমি তাই করলাম। তারপর আমি আর কোন কথাই ভুলি না। (বুখারী ও মুসলিম)।

১০. এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়ে জানালেন যে, তার ভাইকে জ্বিনে আছর করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে উপস্থিত করতে বললেন। রুগীকে উপস্থিত করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে তাকে ফুঁক দিলেন। সে সময়েই সে সুস্থ হয়ে গেল। জ্বিনের কোন প্রভাব তার মধ্যে রইল না। (ইবনে মাজাহ)

দশটি পূর্ণাঙ্গ মু'জিযা

রুগীকে সুস্থ করার বিষয়ে মহানবী (সা)-এর আরও অনেক মু'জিযার কথা আছে। কোন ক্ষেত্রে তিনি কিছু পড়ে ফুঁক দিয়েছেন। কখনো বা তিনি লালা বা থুথু লাগিয়েছেন অথবা হাতে মুছে দিয়েছেন, তাতে রোগী সাথে সাথে সুস্থ হয়ে গেছে।

মৃতকে জীবিত করা

প্রকৃতপক্ষে আম্বিয়ায়ে কিরাম মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। মানুষের অন্তরের ও রূহের চিকিৎসা করার জন্য তাঁরা প্রেরিত হয়েছেন। তবে ব্যতিক্রম হিসেবে

কখনো কখনো আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের হাত দিয়ে এমন শারীরিক রোগের চিকিৎসাও করেছেন যা অনেক চিকিৎসকও করতে অক্ষম ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে মৃতকেও জীবিত করে দেন। যার মাধ্যমে মানুষ নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে বুঝতে পারে। আর এ ধরনের মু'জিযা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকারের মু'জিযা দান করেছিলেন। রুগীকে সুস্থ করা এবং মৃতকে জীবিত করার মু'জিযার থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বঞ্চিত করেননি। তাঁর হাতে কয়েকজন মৃতও জীবিত হয়েছিল। (যারকানী)

ইমাম কুরতবী (র) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'তাযকিরা'-তে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নবী (সা)-এর হতে বহু সংখক মৃতকে জীবিত করেছিলেন। (আল্লামা মুল্লা আলী কারী, শারহে শিফা দ্র.)

১. হযরত আনাস (রা) থেকে (দুর্বল সূত্রে বর্ণিত) হাদীসে আছে, এক অন্ধ বুড়ির একটি যুবক ছেলে মারা যায়। মৃতের লাশের উপর চাদর ঢেকে দেয়া হল। অন্ধ বুড়ী ছেলের মৃত্যুতে খুবই দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত হলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল হে পরওয়াদিগার আল্লাহ তা'আলা! তুমি নিশ্চয়ই জান আমি শুধু তোমার জন্যই ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং পূর্তিপূজা বর্জন করেছি। তোমার মহব্বতে আমি তোমার রাসূলের নিকট হিজরত করে চলে এসেছি। হে আল্লাহ! আমার উপর মূর্তিপূজারীদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সুযোগ দিও না। আমার উপর এমন বিপদ আপতিত কর না যা বরদাশ্ত করার শক্তি আমার নেই। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ হযরত নবী (সা) এবং তাঁর সাথে বারোজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ করে দেখা গেল, সে যুবক জীবিত হয়ে মুখের কাফন সরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সে আমাদের সাথে আহার করল। সে যুবক রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পরেও জীবিত ছিল। তাঁর জীবিত অবস্থায় তার মা মারা যান। ইবন আদী ও ইবন আবূদ দুনিয়া বায়হাকী ও আবূ নুয়াইম বর্ণিত। (বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন যারকানী, ৫ খ, পৃ. ১৮৩)

২. দালায়েলে বায়হাকীতে আছে রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লোকটি বলল ঃ আমি আপনার উপর ঈমান আনব যদি কয়েকদিন পূর্বে মারা যাওয়া আমার মেয়েকে জীবিত করে দিতে পারেন। তিনি বললেন, তার কবর আমাকে দেখিয়ে দাও। লোকটি তাঁকে কবরস্থানে নিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটির নাম নিয়ে ডাকলেন। জ্বি হাযির বলে ডাকে সাড়া দিয়ে মেয়েটি জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে আসল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কী

পিতামাতার সাথে পৃথিবীতে আসতে পছন্দ কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তা'আলার নিকট থাকা পিতামাতা থেকে উত্তম। আমি দুনিয়া থেকে পরকালকে বেশী ভাল পেয়েছি। (শিফা, কাযী ইয়ায, পৃ. ১৬০; যারকানী- ৫ খ, পৃ. ১৮২)

৩. হযরত আয়েশা (রা) রিওয়ায়েত করেছেন, বিদায় হজ্জের সময় একবার রাসূলুল্লাহ (সা) ভারাক্রান্ত মনে আমার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেন। তারপর তিনি খুশীমনে আবার ফিরে আসলেন। আমি প্রশ্ন করে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার পিতামাতাকে জীবিত করে দেয়ার দু'আ করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জীবিত করে দিলেন তাঁরা আমার উপর ঈমান এনেছেন। তারপর পুনরায় পরলোকে গমন করেছেন। মুহাদ্দিসগণ মৃতকে জীবিত করার এসব হাদীসকে খুবই যাঈফ বা দুর্বল সূত্রে বর্ণিত বলে উল্লেখ করলেও মর্যাদার বিষয়ে এসব হাদীস বর্ণনাকে জায়িয বলেছেন। (যারকানী)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী ও আল্লামা যারকানী বলেন ঃ পিতামাতাকে জীবিত করার বিষয়ে তিনটি মত মুহাদ্দিসীনের মধ্যে রয়েছে ঃ

এক. এ হাদীসটি মাউযূ অর্থাৎ জাল হাদীস। এ বক্তব্য ইবন জাওযীর;

দুই. এ হাদীসটি যাঈফ। এ মত ইমাম ইবনে কাসীরের ;

তিন. ইমাম কুরতুবীর মত হচ্ছে এ হাদীস মাউযূ নয়, বরং যাঈফ।

হাফিয শামসুদ্দীন (র)-এ বিষয়ে বিতর্কের প্রসঙ্গে একটি কবিতা রচনা করেছেন।

حبا الله النبى مزيد فضل * على فضل وكان به رؤفا ـ

فاحيا امه وكذا اباه * لايمان به فضلا لطيفا

فسلم نا لقد بذا قدير * وان كان الحديث به ضعيفًا ـ (زرقانى)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) উপরোক্ত তৃতীয় মতটি গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন।

وجماعة ذهبوا الى احياءه * أبويه حتى امنوا لاتخرفوا

وروى ابن شاهين حديثا مسندا * فى ذاك لكن الحديث مضعف

(زرقانى)

৪. হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, খায়বারে এক ইয়াহূদী মহিলা বিষ মিশ্রিত বকরীর ভূনা গোশ্ত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাদীয়া স্বরূপ পেশ করে। তিনি তা থেকে কিছু আহার করেন এবং উপস্থিত সাহাবীগণও তা থেকে কিছু খেয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা হাত উঠিয়ে নাও। এ

ভূনা বকরী আমাকে জানিয়েছে যে, যে বিষ মিশ্রিত। কাযী ইয়ায (র) বলেছেন, এ ঘটনা বিষাক্ত বক্‌রী নামে প্রসিদ্ধ। হাদীসের ইমামগণ তাঁদের প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আকীদা বিশারদগণ এ বিষয়ে বিতর্ক করেছেন। ইমাম আবূল হাসান আশ'আরী এবং কাযী আবূ বকর বাকিল্লানী (র) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আপন কুদরতে এ মুর্দা বকরীর মধ্যে কথা, বর্ণমালা ও ধ্বনি পয়দা করে দিয়েছেন। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা গাছ-পাথরকে কথা বর্ণ ও ধ্বনি শিক্ষা দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বকরীর গোশতকে নিজ অবস্থায় ও আকৃতিতে রেখে তার মধ্যে কথা বলার শক্তি পয়দা করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সে গোশ্‌তের মধ্যে জীবন পয়দা করেছেন। জীবন পাওয়ার পর গোশ্‌ত কথা বলেছে। (শিফা, কাযী ইয়ায, পৃ. ১৫৯)

৫. হযরত নবী (সা) মসজিদে নব্বীতে খেজুর গাছের একটি খুঁটিতে হেলান দিয়ে খুত্‌বা দিতেন। তারপর যখন মিম্বার বা সিঁড়ি তৈরি হল, তখন তিনি মিম্বারে খুত্‌বা দিতে শুরু করেন। সে সময় খেজুর গাছে খুটি বিরহ বেদনায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বার থেকে নেমে গিয়ে খেজুর খুঁটিটির সাথে শরীর লাগিয়ে পরশ লাগালেন। তখন সে কান্নায় বিরতি দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এ খুঁটি সবসময় আমার খুত্‌বা শুনেছিল। এখন সে আমার খুত্‌বা শুনা থেকে বঞ্চিত হয়ে কাঁদতে লাগল। (বুখারী) কাযী ইয়ায, ও মুহাদ্দেসীন বলেন-এ হাদীস সহীহ ও ব্যাপক সূত্রে বর্ণিত। বেশ কয়েকজন সাহাবী এ হাদীসের বর্ণনাকারী।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, খুটির কান্নায় মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করা মানে হল মৃত তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসা। কিন্তু কাঠের খুঁটি ত নির্জীব প্রাণহীন বস্তু। তার মধ্যে কখনো প্রাণীর জীবনের নাম-নিশানাও ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিরহে কান্না অতি অবাক করা ঘটনা। (ইমাম শাফিঈ, বায়হাকী) তেমনিভাবে মু'জিযা হিসেবে গাছ ও পাহাড় থেকে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্' বলা এবং হযরত নবী (সা)-এর হাতের ইশারায় মূর্তিদের লুটিয়ে পড়া, তাঁর মজলিসে খাদ্য থেকে তাসবীহের আওয়াজ আসা, মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে কম কিছু নয়। তারপর তাঁর আহ্বানে গাছ চলে আসা এবং আবার নিজ স্থানে ফিরে যাওয়া। এসব কিছু মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা থেকে কোন অংশে ছোট বলা যায় না।

যা হোক, মৃতকে জীবিত করা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও সনদ হিসেবে এগুলোকে সহীহ সূত্র বলা হয় না তথাপি এতটুকু বলা যায়

যে, মৃতকে জীবিত করার মু'জিযা মহানবী (সা)-এর জন্য পাওয়া যায়। এসব বর্ণনাকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা যায় না।

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ঈসা (আ)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিযা যা কুরআনে বলা হয়েছে তা হল وَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ অর্থাৎ তিনি মাটির ঢেলায় ফুঁ দিতেন তখন তা আল্লাহর হুকুমে পাখি হয়ে যেত। বর্ণিত আছে। এসব ছোট পাখি কিছু দূর পর্যন্ত উড়ে যেত, তারপর মরে যেত। তাতে প্রকৃত পাখি ও এসব মু'জিযার পাখির মধ্যে পার্থক্য বুঝা যেত। তবে এ মু'জিযার কথা চার ধরনের ইঞ্জিলের সবকটিতে উল্লেখ নেই। তারপর কথা হচ্ছে ঃ চড়ুই পাখির মু'জিযা মৃতকে জীবিত করা থেকে অধিক মর্তবার। কেননা মৃত মানুষ যে অবস্থায় মারা গেল তাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আনা অতটা অবাক করা বিষয় হতে পারে না, বরং অস্তিত্বহীন প্রাণীকে মাটির ঢেলা থেকে প্রাণীতে রূপান্তরিত করা অধিক আশ্চর্যজনক।

মৃতকে জীবিত করার পর অসুস্থকে সুস্থ করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আর রুগীকে সুস্থের মু'জিযার পর কাশ্‌ফ বা ভবিষ্যত বিষয়ের সংবাদের মু'জিযা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ـ

"আমি তোমাদেরকে জানাব তোমরা কি খাও এবং নিজেদের ঘরে কি জমা করে রেখেছ।"

এ মু'জিযা হযরত ঈসা (আ)-এর জন্যই শুধু খাস ছিল না, আরও নবী যারা বনী ইসরাঈলী ছিলেন এ ধরনের আগামীতে সংঘটিতব্য বিষয়ের এবং আগাম সংবাদ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র আল-কুরআনে রূমীদের বিজয়ের সংবাদ সাত–আট বছর পূর্বে দেয়া হয়েছে এবং খায়বার ও সিরিয়া বিজয়ের খবরও পূর্বে দেয়া হয়েছিল। নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ)-এর ২৭টি মু'জিযার কথা বলে থাকে। যার মধ্যে প্রধানতম হল ঃ মৃতকে জীবিত করা। এ মু'জিযার ঘটনা ইঞ্জিলে তিনটিমাত্র উল্লেখিত হয়েছে।

এক ঃ প্রথম মুর্দা নাইন শহরের অধিবাসী ছিল তার শবযাত্রা শুরু হয়েছিল। তার মা রোদন করছিল। হযরত মাসীহ শবাযাত্রা থামিয়ে দিলেন ও বললেন ঃ হে যুবক! উঠে পড়! মুর্দা উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল। সে হযরত মাসীহ ও তার মাকে চুমু দিল। উপস্থিত সকলে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, আপনি বড় নবী, যিনি আমাকে জীবিত করে উঠিয়েছেন। (দেখুন, ইঞ্জিল, ৭ম অধ্যায় ১১ থেকে ১৭ পাঠ)

দ্বিতীয় ঘটনা, এক মৃত মেয়েকে জীবিত করা। যা মথির ইঞ্জিলের ৯ম অধ্যায়ের ১৮ থেকে ২৪ পাঠে উল্লেখ আছে।

তৃতীয় ঘটনা হচ্ছে ঃ তাঁর প্রিয়জনকে জীবিত করা যিনি সম্পর্কে মরিয়মের ভাই ছিলেন। তার মৃত্যুর পর দাফন কাফনের চার দিন গত হয়েছিল। হযরত মাসীহ তাশরীফ নিলেন এবং বড় আওয়াজে ডাকলেন। হে যা'যার। বের হয়ে এস! সেত ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিল, সে এখন কাফনে হাত-পা বাধা অবস্থায় বের হয়ে আসল। তার মুখমণ্ডল রুমাল দিয়ে ঢাকা ছিল। তিনি বললেন, ঢাকনা সরিয়ে তাকে যেতে দাও। উক্ত ঘটনার বিবরণ ইউহান্নার ইঞ্জিলের ১১ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে।

ইয়াহূদীরা এসব মু'জিযার ব্যাপারে বলে থাকে, এ তিন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মরেনি। বেহুঁশ অবস্থায় তাদের দম আটকে গিয়েছিল। অনেক সময় অধিক বেহুঁশীর কারণে কাউকে মৃত বলে মনে করা হয়। এজন্যই বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় সরকারীভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করে কাউকে মৃত ঘোষণা না করা হলে তাকে দাফন করার অনুমতি দেয়া হয় না।

ইসলামের অনুসারীদের কথা হল ঃ হযরত মাসীহ্ (আ)-এর মৃতকে জীবিত করার বিষয়টি কুরআনের বিবরণের ভিত্তিতে আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি। অন্যথায় নাসারা আলেমদের নিকটও এসব মু'জিযা বা ঘটনার এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য পরম্পরা সূত্র নেই, যা তারা পেশ করতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সমস্ত মু'জিযা সহীহ্ পরম্পরা সূত্রের মাধ্যমে বর্ণিত আছে। দুর্বল ও মুরসাল সূত্রে বর্ণিত কিছু থাকলেও ভিন্ন পরম্পরা সূত্রেও তা বর্ণিত হয়েছে। কোন বিষয় বিভিন্ন সূত্রে ও পদ্ধতিতে বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তা ভিত্তিহীন নয়। সনদের আধিক্য পরম্পর বর্ণনাকে শক্তিশালী করে। এভাবে যাঈফ বর্ণনাও সবল বা সহীহ্ বর্ণনার মর্যাদায় চলে যায়। ইয়াহূদী ও নাসারাদের নিকট না আছে এ ধরনের পরম্পরা বর্ণনার সূত্র, না আছে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ। এজন্য বাইবেলের এসব মু'জিযার রিওয়ায়াতকে কোন মানসম্পন্ন বর্ণনা বলা যায় না।

নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

আসমানী কিতাবের সকল আলিমের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, নবুওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মানিত মর্যাদাবান কিছু বান্দাকে নবী করে মানুষের সমাজে প্রেরণ করেন। তাঁদের নিকট অহী নাযিল করেন। যেন তাঁরা মানুষকে সত্য ও হকের দিকে পরিচালনা করেন এবং তাদেরকে স্থায়ী মুক্তি ও শান্তির পথ ও পদ্ধতি অবগত করেন। আহলে কিতাবের আলিমগণ বনী ইসরাঈলের নবুওয়াতের যে ভিত্তি সাব্যস্ত করেছেন, তা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। শুধু তাই নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নবুওয়াত ও তার দালায়েলে রিসালাত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের থেকে অধিক ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তাঁর নবুওয়াত বর্ণনা বা রিওয়ায়াতের দিক থেকে অধিক সহীহ, পবিত্র ও সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত। নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রধান দিক হচ্ছে ঃ বিশ্বাস, প্রত্যয় বা আকীদা, ইবাদত, আদাব-আখ্‌লাক এবং বিধি-বিধান, সামাজিকতা।

দ্বিতীয় হচ্ছে ঃ দালাইলে নবুওয়াত বা রিসালাতের প্রমাণ অর্থাৎ মু'জিযা।

তৃতীয় দিক হল ঃ ভবিষ্যদ্বাণী।

৪র্থ হচ্ছে ঃ বিশ্ব সংস্কার এবং পঞ্চম হল হিদায়াতের বাণী। আর হযরত মুহাম্মদ (সা) এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সমস্ত নবী (আ)-এর মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন।

নাসারাদের গুমরাহ হওয়ার কারণ

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সমস্ত নবী (আ)-এর নবুওয়াতের নিদর্শন ও মু'জিযা দান করেছেন। যেন এসব নিদর্শন ও মু'জিযা নবুওয়াত ও রিসালাতের জন্য প্রমাণ বা দলীল হয়। তেমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক মু'জিযা যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত তাঁকে দান করেছেন। নাসারারা এসব নিদর্শন ও কুদরত দেখে তারা এসবকে আল্লাহর দেয়া কুদরত মনে না করে হযরত ঈসা (আ)-এর নিজস্ব কুদরত বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। বস্তুত এসব কুদরত ছিল আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। তারা বিশ্বাস করতে লাগল যে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হযরত মাসীহের ভিতরে অনুপ্রবেশ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ), তিনি তার সাথে মিশে গিয়েছেন। তিনি আর খোদা এক হয়ে গেছেন।

মুসলমানদের সমাজেও কুসংস্কার দেখা যায় যে, আউলিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে তারা অতি ভক্তি করে। যেমন তারা তাদের প্রয়োজনীয় হিদায়াত ও বিপদ-আপদে আউলিয়ায়ে কিরামকে ডেকে থাকে। তারা মনে করে থাকে, নেক বান্দাদেরকে এসব বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা ও ইখ্‌তিয়ার দেয়া হয়েছে। তারা যাকে চায় উপকার বা ক্ষতি করতে পারে। এ ধরনের লোকেরা সালেহীন বান্দাকে খোদা বা মাবূদ মনে করে না, বরং এসব বুযর্গকে খোদার বান্দাই মনে করে, এজন্য তাদেরকে ইসলামের সীমার বাইরের হিসেবে মনে করা হয় না। কিন্তু এ ধরনের বিষয় নাসারা ও শিরকের সাথে মিলে যায়। তাদের এ ধরনের কাজ বিশ্বাসের দিক থেকে তাদেরকে মুশরিক না বললেও অথবা মুসলিম জাতিসত্তা থেকে বাইরে না গেলেও এসব অবশ্যই শিরক, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম সকলেই আল্লাহর প্রিয় মর্যাদাবান বান্দা। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হল যে, তাঁরা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহকে চেনার পথ দেখাবেন। মানুষের চরিত্র-নৈতিকতাকে পরিশুদ্ধ করবেন। তাঁদের হাতে প্রকাশিত

যেসব মু'জিযা ও প্রাকৃতিক নিয়ম বহির্ভূত ঘটনাবলী রয়েছে, তা নবীদের জন্য তাদের নবুওয়াতে প্রমাণ ও নিদর্শনস্বরূপ। কিন্তু নাসরারা এসব মু'জিযাকে নবুওয়াতের প্রমাণ মনে না করে খোদায়ীর প্রমাণ মনে করেছে। তারা বুঝেনি যে, এসব কাজ হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম নিজ ইখ্তিয়ারে করতে পারেননি, বরং খোদায়ী কুদরতের কারিশমাঁ যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবীদের মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য নবীদের হাতে আল্লাহ তা'আলা তা প্রকাশ করেছেন। এসব মু'জিযা প্রকাশের ক্ষেত্রে নবীদের ইচ্ছা ও ক্ষমতা তেমন কোন ভূমিকা পালন করেনি।

আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জগতের ব্যাপারে এমন কোন স্বাধীন নিজস্ব ক্ষমতা প্রদান করেননি যা তাঁরা নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী যখন খুশি করতে পারেন। এমনকি নিজ আত্মীয়-পরিবারের সদস্য ও পিতামাতাকে হিদায়াত করার সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হননি। তাঁরা যাকে ইচ্ছে হিদায়াত করতে সক্ষম ছিলেন না। হযরত নূহ্ (আ) আপন ছেলেকে হোদয়েত করতে পারেন নি। তেমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আ) তাঁর পিতা বা চাচা আযরকে হিদায়াত করতে পারেননি। হযরত নবী (সা)-এর আপন চাচা আবূ তালিব এবং আবূ লাহাবকে হিদায়াত করার ক্ষমতা তাঁর হয়নি। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

إِنَّكَ لَاتَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَّشَاءُ ـ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রিয়জনকে হিদায়াত করার ইখ্তিয়ার তোমার নেই কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন।" (সূরা কাসাস ঃ ৫৬)

এ ধরনের অনেক আয়াত পবিত্র কুরআনে আছে যে, কারো উপকার ও ক্ষতি করার একক ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। আর যে সত্তা উপকার ক্ষতি করার যোগ্যতা রাখে না, সে ইবাদতের যোগ্যও হতে পারে না।

হযরত নবী (সা)-এর পর খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলে তাঁরা কায়সার ও কিস্রার ক্ষমতার আসন উল্টিয়ে দিয়েছিলেন এবং অর্ধ পৃথিবী জয় করেছিলেন। বিজয়ের পর যুলুম ও শিরকের জড় ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং অনৈকিতা-অশ্লীলতা হতে যমীনকে পবিত্র করেছিলেন। হকের তাওহীদ ও দ্বীনে ইলাহী ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁরা সফলতার উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে নাসারাদের সরকার তাওহীদের পরিবর্তে তিন খোদার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মদপান ও অনৈতিকতার বেশুমার দরজা তারা খুলে দিয়েছে, তা দুনিয়াবাসীকে নিকট পরিষ্কার।

এমন কি নবীগণ নিজেদের ক্ষতি করার ক্ষমতাও লাভ করেননি। কখনো নবীদেরকেও প্রতিপক্ষের হাতে অনেক ক্ষতি ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। তাঁরা

নিজেদেরকে একক ক্ষমতায় সেসব কষ্ট ও বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হন নি। এমন কি নবীদেরকে কখনো নিহত হতেও হয়েছে। এ বিষয়ে আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ رَشَدًا ـ

"হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দিন, আমি তোমাদের কল্যাণ ও উপকারের যেমন মালিক নই, তেমনিভাবে তোমাদের হিদায়াতেরও মালিক নই।" (সূরা জিন্ন ঃ ২১)

দীনের তিনটি বুনিয়াদী নীতিমালা

দীনের কিছু বুনিয়াদী নীতিমালা রয়েছে, যেসব নীতিমালা নিয়ে সকল নবী পৃথিবীতে আগমন করেছেন। আর এসব নীতিমালার ওপর মানুষের কল্যাণ ও সফলতা নির্ভরশীল। মূলনীতিগুলো হল ঃ তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর আগমনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তামাম দুনিয়ায় গুমরাহীতে ডুবে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর কুরআন নাযিল করলেন। তিনি হিদায়াত ও সংস্কার কর্মসূচী নিয়ে আগমন করলেন। মৌলিক ও শাখা সব গুমরাহী ও কুসংস্কারেরই তিনি সংশোধন করেছেন। উক্ত তিনটি মৌলিক বিষয়ে যে গুমরাহী ছিল, সর্বপ্রথম তিনি তা সংশোধন করেছেন।

প্রথম মৌলিক নীতি তাওহীদ

দীনের সবচেয়ে বড় ও মৌলিক ভিত্তি হল তাওহীদ। তাওহীদের ব্যাপারে সেসময় সকল জাতি ও সমাজ গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল।

ইয়াহূদী ঃ ইয়াহূদীরা যদিও নবীদের শিক্ষা ও দাওয়াতের সাথে পরিচিত ছিল, কিন্তু তারাও তাওহীদের বিষয়ে গুমরাহ হয়ে গিয়েছিল। তারা আল্লাহ তা'আলাকে মানুষের মত মনে করতো যে, আল্লাহ্ কখনো কখনো ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে যান। মানুষকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি লজ্জিত ও নাযুক অবস্থায় পড়েন। কখনো খোদ ইসরাঈলীদের হাতের পুতুল অথবা ইসরাঈলী প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন না। ইসরাঈলদেরকে বরকত না দিয়ে খোদার কোন উপায় নেই।

নাসারা ঃ নাসারারা সরাসরি শিরকের শিকার হয়েছে এবং তিন খোদার শিরকী আকীদা আবিষ্কার করেছে। আল-কুরআনে তাওহীদের তালীম তুলে ধরেছে এবং তিন খোদার বাতিল আকীদাকে প্রতিহত করেছে।

দ্বিতীয় নীতি নবুওয়াত ঃ মুশরিকরা নবুওয়াতের অস্বীকারকারী ছিল। কেননা তারা নবুওয়াতকে মানব প্রকৃতির জন্য অসম্ভব বলে মনে করে। ইয়াহূদীরা যদিও নবুওয়াতের বিষয়কে স্বীকার করে কিন্তু তারা নবীদেরকে মিথ্যা অপবাদ, ধোঁকা ও

প্রতারণার মাধ্যমে রক্তাক্ত করতেও কার্পণ্য করে না। তারা নবীরা কবীরা গুনাহ বা কঠিন পাপে জড়িয়ে যেতে পারেন বলেও মনে করে। শুধু তাই নয়, ইয়াহূদীরা নবুওয়াতকে তাদের বনী ইসরাঈলের জন্য খাস বৈশিষ্ট্য ও অধিকার বলে মনে করে। নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ নবূওয়াতকে বনী ইসরাঈলের বাইরে নিতে পারবেন না। তেমনিভাবে নাসারারাও মনে করে বনী ইসরাঈলের বাইরে কেউ নবী হতে পারে না। নাসারারা হযরত ঈসা (আ) এবং হাওয়ারীদেরকে ব্যতীত আর কাউকে নিষ্পাপ মনে করে না। নাসারারা ইয়াহূদীদের উল্টো হযরত মাসীহকে খোদা মনে করে এবং খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে। পবিত্র কুরআনুল করীম মুশরিক, ইয়াহুদী ও ইসরাঈলীদের নবুওয়াতের বিষয়ে বাতিল আকীদার সংস্কার ও সংশোধন করেছে।

তৃতীয় মৌলিক আকীদা কিয়ামত ঃ অর্থাৎ পুরস্কার ও তিরস্কার বিষয়ে আকীদা

দীনের তৃতীয় বুনিয়াদ হল আখিরাতের উপর ঈমান আনা এবং আমলের ভিত্তিতে শাস্তি ও পুরস্কার এবং হিসাবের বিষয়ে বিশ্বাস করা। মুশরিকরা এবং মূর্তিপূজারীরা আকীদার কঠোরতারকে স্বীকার করে না এবং শাস্তি ও পুরস্কারের বিশ্বাস করে না। ঈসায়ীরা পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে বাতিল বিশ্বাস পোষণ করে। তারা মনে করে, মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া যাবে। তারা বিশ্বাস করে, মুক্তিদাতা হযরত ঈসা (আ) নিজে মুক্তিপণ হয়ে মানুষদেরকে পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) তাদের সকলে মুক্তিপণ আদায় করবেন। ইয়াহূদীদের আকীদা হল, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের পক্ষে আর জান্নাত শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য।

ইসলামের শিক্ষা

পুরস্কার ও শাস্তির বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, ঈমান ও আমলে সালেহের ভিত্তিতে তা হবে। ঈমান ও কুফরের বিষয়ে যে শাস্তি ও পুরস্কারের বিধান আছে, এক্ষেত্রে বংশ, জাতীয়তা, সম্প্রদায়, এসব কোন কিছুতেই কোন প্রাধান্য বা পার্থক্য করা হবে না; বরং সূক্ষ্ম ও নিখুঁতভাবে ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে ঈমান ও নেক আমলের সাওয়াব বা পুরস্কার এবং মন্দকার্মের জন্য শাস্তি ও তিরস্কারের ব্যবস্থা হবে। শাস্তিতেও ইনসাফ পুরোপুরি কার্যকরী করা হবে। সামান্যতম ব্যতিক্রম বা বেশি বদলা নেয়া হবে না। পুরস্কার ও অনুদানেও ইনসাফ করা হবে এবং দয়া ও সহানুভূতির প্রাধান্য থাকবে। একটি ভালকাজের বিনিময়ে দশগুণ পাওয়া যাবে। আল্লাহর মরযী অনুযায়ী তা আরও বেশিও হতে পারে। কুরআনুল করীমে এ বিষয়টিকে অর্থাৎ হিসাব ও জবাবদিহীতাকে গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছে বারবার পুনরুল্লেখ করেছে। বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ও অনুপম আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে যুক্তি-প্রমাণ সহকারে প্রতিষ্ঠিত করে উল্লেখ করেছে।

যেমন ঃ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ ঃ

"তোমরা কি মনে করেছ যে, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না?" (সূরা মু'মিনূন ঃ ১১৫।)

অন্য আয়াতে বলেন ঃ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يَتْرَكَ سُدًى ـ اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ـ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ـ اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ـ

"লোকেরা কি মনে করে যে, তাদেরকে দায়িত্বহীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে? তুমি কি হে মানুষ! একবিন্দু শুক্র ছিলে না, তারপর আনাকে (ঝুলন্ত রক্তের টুকরা) তারপর আল্লাহ তা'আলা বিন্যস্ত করে বানিয়েছেন পুরুষ ও নারী করে। তারপর তিনি কি সক্ষম হবেন না পুনরায় মৃতকে জীবিত করতে?" (জীবিত করে তোমার নিকট হিসাব নিতে) (সূরা কিয়ামা ঃ ৩৬-৪০।)

দার্শনিকেরা কিয়ামতের কথা স্বীকার করে শুধুমাত্র আত্মিক কিয়ামতের কথা বলে থাকে। তারা শারীরিকভাবে পরকাল স্বীকার করতে চায় না। ইসলাম আত্মা ও শরীরের সাথে দ্বিতীয় জীবনের কথা শিক্ষা দেয়। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণকারীগণ শুধুমাত্র রূহানী কিয়ামত ও রূহানী হাশর হবে বলে মনে করেন। তাদের দৃষ্টি শারীরিক ভোগ-বিলাসিতা তুচ্ছ বিষয়, আর তা পশুত্ব ছাড়া কিছু নয়। অথচ তারা নিজেরা শারীরিক ভোগ-বিলাসিতায় খুবই মত্ত থাকে। তারা বুঝতে পারে না, মানুষ শরীর ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত। এ সম্মিলিত সত্তার মানুষ আল্লাহর বিধানের আওতায় পড়ে। এজন্য শাস্তি ও পুরস্কার দু'টোর উপরই কার্যকরী হওয়া উচিত।

অতএব যে দীন সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ এবং ভিত্তি, মৌলিকতা, শাখা-প্রশাখাসহ যৌক্তিক ও প্রমাণ-দলীল সহ পূর্ণতা যেখানে রয়েছে, সে ব্যবস্থার অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা সে কথাই বলেন ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلاَمَ دِيْنًا ـ

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ ـ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ـ وَهُوَ فِىْ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

মহানবী (সা)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

মহানবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও কামালিয়াত বলতে যা বুঝায় তা হল ঃ আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র তাঁকে কিছু বিষয় দান করেছেন যা অন্যান্য নবীদেরকে দান করেননি। হাদীসে রাসূল (সা) বলেছেন ঃ "আমাকে এমন কিছু বিষয় দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোন নবী কে দেয়া হয় নি।"

১. আমাকে সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে নবীগণ শুধুমাত্র নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন আর আমি গোটা মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا،

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ـ

আমি শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই। আমার মাধ্যমে নবীর ধারাবাহিকতার পরিসমাপ্তি হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ ـ

অন্য আয়াতে আছে ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

৩. আমাকে জাওয়ামিউল কালেম অর্থাৎ ব্যাপক অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রাঞ্জল শব্দ প্রয়োগে বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে। যেমন তাঁর হাদীসের কোন শব্দ ব্যাপক অর্থ বুঝান হয়। মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ সামগ্রিকভাবে-এর অনুপম উদাহরণ। এসব হাদীস তথা মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হচ্ছে ঃ সকল পরিশুদ্ধ আকীদা, সহীহ্ আমল, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও দীন-দুনিয়ার বিধি-বিধান, আইন-সংবিধান ও নিয়মনীতির সামষ্টিক রূপ।

৪. আমাকে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দান করে বিজয় ও সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এক মাসের দীর্ঘ পথ দূরের দুশমনও আমার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। এটি গায়েবী সহযোগিতা যে, এক মাসের দূরত্বের দুশমনের হৃদয়েও তাঁর ভয় ও প্রভাব সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَنُلْقِي فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ -

অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ -

৫. সমস্ত যমীনকে আমার ও আমার উম্মাতের জন্য সিজ্‌দা করার স্থান করা হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে। অর্থাৎ সব স্থানে নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, মসজিদ হোক বা মসজিদ না হোক। আমার জন্য উযূ গোসলের বিকল্প হিসেবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করার বিধান দেয়া হয়েছে। সব স্থানে তায়াম্মুম করার অনুমতি আমাকে দেয়া হয়েছে। আমার জন্য মাটিকে পবিত্রকারী করা হয়েছে।

৬. আমার জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নবীর জন্য গনীমতের মাল হালাল ছিল না।

৭. আমার অনুসারী উম্মাতের সংখ্যা সকল নবীর অনুসারী উম্মাতের চেয়ে অধিক হবে। হাদীসে আরও আছে, কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মাত একশত বিশ কাতারে শামিল হবে। এর মধ্যে আশি কাতারই হবে আমার উম্মাতের।

৮. আমাকে মহান শাফা'আতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন প্রথম যুগের ও শেষ যুগের সকল উম্মাত আমার শরণাপন্ন হবে। আমি সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে শাফা'আত করব।

৯. আমি সব নবীর প্রথমে আমার উম্মাতকে নিয়ে পুলসিরাত পার হব।

১০. আমি সকলের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করব। আবূ বকর আমার ডানে এবং উমর আমার বাঁয়ে থাকবে। জান্নাতে সকল নবীর জন্য হাউয থাকবে কিন্তু আমার হাউয সকলের হাউয থেকে বড় ও সুসজ্জিত থাকবে।

امين واخردعواناأن الحمد لله رب العلمين والصلاه والسلام على حبيبه سيد الاولين والاخرين وعلى اله وأصحابه وعلماء امته وأولياء زمرته أجمعين وعلينا معهم ياأرحم الراحمين ويا أكرم الاكرمين وأجواد الاجوادين وخيرالمسئولين وياخيرالمعطين، امين يارب العلمين ـ

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

ইফা—২০১৩-২০১৪—প্র/১৪২(উ)—৩২৫০